শবর চরিত

(অখণ্ড সংস্করণ)

নলিনী বেরা

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কোলকাতা-৯

অক্ষর বিন্যাস : কাকলী টাইপোগ্রাফি
৭৯ রামমোহন প্লেস, কোন্নগর, হুগলি

মুদ্রাকর : শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণি, কোলকাতা-৪

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

উৎসর্গ

বিগত প্রায় দশটা বছর আমি আছি রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়া-গুড়কুঁদা-শরাবন-শতুরা-ফুলটুসি-শিশুবালা-সোমবারি-নিয়তি-সাবিত্রী-ঢালো-আদরী-ভাদরী-নুকু-ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনী-হাড়িয়া-সুরুয়া-নাকফুড়ুরি-লাইবুকা-নীলুয়াদের সঙ্গে। ছিলাম ডুব্‌কা-ডুংরিতে বনে-ঝাড়ে বনকুঁদরী-বনকান্না-বনকাঁকড়ো আলু-তুণ্ডা ভেলা-ভুড়রু-কেঁদ্‌-কষাফল আহরণে, গোই-গোধি-ঢ্যাম্‌না-খঙ্গা-বঙ্গা শিকারে। ছিলাম নামাল খাটায়, দাঁতনে, কড়িয়া-বামনদায়। লেখা শেষ করে এই মুহূর্তেই মনে হল, আমি বুঝি স্বজনহারাই হলাম। বিষাদ ছুঁয়ে যাচ্ছে মনে। ব্যথাতুর হৃদয়ে স্মরণ করি মহাপ্রাণ চুনি কোটালকে। তাঁকে উপন্যাসে চিত্রিত করার স্পর্দ্ধা আমার নেই, তাঁর লেখা কিছু কবিতা ব্যবহার করেছি এইমাত্র! তবু উপন্যাস উপন্যাসই। কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় এ-বই তাঁকেই উৎসর্গ করছি।

লেখক

লেখকের অন্যান্য বই

ভাসান

খালাস

এই এই লোকগুলো

ইরিনা এবং সুধন্যরা

অপৌরুষেয়

হলুদ বনের টুসু

ঈশ্বর কবে আসবে

যে আছে অপেক্ষা করে

নলিনী বেরার গল্প

শ্রেষ্ঠ গল্প

নাকফুল

হোমগার্ডের জামা

প্রথম পর্ব



দুটিতে জঙ্গল থেকে বেরুল।

একজন ঢ্যাঙা, আর একজন বেঁটে-বামন। রাইবু আর গুড়গুড়িয়া। গোঠটাঁড়ের মাঠ ভেঙে এখন উত্তরমুখো চলেছে, চলেছে হাওয়ার টানে ভাসতে ভাসতে। সরুবালি লালধুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে চলেছে। গোঠটাঁড়ের মাঠে যা ধুলো!

আগে গুড়গুড়িয়া পিছনে রাইবু, দু'জনের কাঁধে তিন-তিন ছ', ছ-ছ বারটা শালবল্লা। একহাত সামনে, কুড়ুল শুদ্ধু আরেক হাত পিছনে, শালবল্লায় ঠেস মারা। কাঠ-কাঁধে এভাবেই গোঠটাঁড়ের মাঠ ভেঙে হাঁটছে, যেন তাড়া দিচ্ছে কেউ। হেই হাটো হাটো, রাজার বাগান থেকে হাটো!

দুটিতে তাড়া খাওয়া জন্তু। দু'পা গিয়ে রাইবু বাঁ পা ঠুকে মারে, যেন লাথি খাও। আর যেন আপনার মনে বলে, বন থেকে বেরুল চিতি, চিতি বলে তোর পাতে—।

পাতে না জঙ্গলবাবুদের মুখে। বলে আপনার মনে রাইবু হাসল।

থুতু ফেলল, তার দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও। তারপর হাঁটতে থাকল, হেঁটে গোঠটাঁড় মাঠ ভেঙে লবকেশরপুর গ্রামে যাবে। মনা সাউয়ের বাড়িতে বারটা শালবল্লার বরাত, দরদাম করা আছে।

গোঠটাঁড় মাঠের পশ্চিমে এখন হেঁসোর মতো চাঁদ, দু'চারটা কয়েতবেলের গাছ, আর তার গন্ধ। এসবের ঘ্রাণ নিতে নিতে হেঁপো কুকুরের মতো লোকদুটো এগুচ্ছে।

এসময় কালে-কুকালে গোঠটাঁড় মাঠের ভিতর কারও সনে দেখা হলে কথা-বলা বারণ।

যদি বল, কে যায় হে?

জবাবে শুনবে, তোমার বাপ।

না শোনার ভান করে যদি বল, কী বললে?

শুনবে, শালা কী বউকে বিধবা করবে?

তখনই বুঝতে হয় এরা রাতকুটুম, চরে খেতে বেরিয়েছে, বেশি ঘাঁটালে হিতে বিপরীত হবে।

রাইবু বা গুড়গুড়িয়ার সে সব জানা ব্যাপার। জঙ্গলের মানুষ, অত খোঁজে কাজ কিবা!

গুড়গুড়িয়া!

হুঁউ বল-অ।

বলছি চিনিবাস মা'জন ত শালবল্লা মেঙেছিল?

হুঁউ মেঙেছিল।

আজ দিলে হয় নাই?

মনা সাউকে ফাঁকি দিয়ে?

নাই, তাকেও দিব।

ফের একেও দিবে!

হুঁউ দিব-অ।

গুড়গুড়িয়া রাইবুর হেঁয়ালি ধরতে পারে না, তার পা ফেল মারে।

রাইবু তাকে খোঁচা দেয়, তাড়াতাড়ি চ।

লোকদুটো এবার নাবালে নামল। গোঠটাঁড় মাঠ ভেঙে আর কিছুদূর গেলে ঢালু গড়ান মতো। এরপরে নদী। তার আগে চষা ক্ষেত, মুগচনার বিল;আখবিল। বিলে পাতা ঝজ্ঝড় করে।

দুটিতে নাবাল পেরুল, নদী পেরুল, পেরিয়ে লবকেশরপুর গ্রামে উঠে গেল।

রাত এখন আধাআধি, চরাচরে জনমানুষ জাগত নেই। কোথাও ঝিঁ-ঝিঁ-বা ডাকল, রিঁ-রিঁ-ই-ই-রিঁ-ই-ই—

পিছনের পুকুর পাড় দিয়ে কলাবন, তারপর দাঁড়কলমী ঝোপঝাড়। এসব পেরুলে মনাসাউয়ের খামার, রাইবু আর গুড়গুড়িয়া ঢুকে গেল।

আধা জোছনায় টুরিব্যাঙ মরাহাজা পুকুরে গর্তের মুখে বসে টুরটুরায়, তার শব্দও কানে ঘণ্টির মতো বাজে।

ঢ্যাঙা আর বেঁটেবামন, হাফ-প্যান্ট আর আটহাতি ধুতি পরে খামারে কাঠ ফেলে দু-দুটি মানুষ, রাইবু আর গুড়গুড়িয়া, কাঁধের ধুলোবালি কাঠের চঁচ্ যে যার ঝেড়ে নিতে ব্যস্ত।

মনা মা'জন আছ নাকি? মনা মা'জন—

কে?

বেরিয়েই দেখ-অ!

রাইবু না?

হুঁউ।

মহাজন লুঙ্গির গিঁট খুলে ফের গিঁট দিতে দিতে বেরুল, কথা না বলে ঘরের পিছন দিকে গেল, শারীরিক কাজ সারল। ফিরে এসে হাঁ-মুখে টুস্কি, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে হাই-এ।

এনেছিস?

হুঁউ, সরেস মাল মা'জন।

তোর সরেস ত! দ্যাক জারলটারুল-বা আর কিছু—

ন্নাই মা'জন, খাঁট্টি শালবল্লা, শুঁকে দেখ-অ।

মনাসাউ রসরস বল্লাগুলো শুঁকে দেখল। সদ্য কাটা, মাত্র ছাল ছাড়িয়ে আনা আছে। সে উবু থেকে সোজা হল।

কী যে ভাব মা'জন, তোমাকেও ঠকাব?

বিশ্বাস কি?

গুড়গুড়িয়া খচ্ করে বলে বসে, উটি নাই যদি ত ছেড়ে দেও আর কুথাও বেচি!

বলে পাছার ধুলো ঝেড়ে দাঁড়াল।

গুড়গুড়ে, তুই থাম। তাকে রাইবু থামায়।

তারপর বলে, মা'জন ওর কথা ধত্তব্যে আনো ন্নাই।

মনাসাউ যেন বিরক্ত, উবু হ'য়ে ফের কাঠ দেখল, তারপর গুনতি করল, এক-এক করে বারটা। তারপর ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

আর রাইবু খামারে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখল, হেঁসোর মতো চাঁদ। এখন ভাবুরগাছে লটকে আছে। আর রাত-বা কতটুকু?

আনচান করে রাইবু গুড়গুড়িয়ার কাছে এসে তার দেহে চিমটি দিল।

অমন দাবড়ে উঠলি যে?

লোকটার খুঁতখুঁতানি বাই দেখে।

ন্নাকি ঘুম পাচ্ছিল?

ঘুম্না।

উর'ম লোক থাকে, উসব সইতে হয় রে গুড়গুড়ে।

ঘর থেকে বেরিয়ে মনা সাউ টাকা দিল, চাঁদের দিকে টাকা রেখে রাইবু চোখ বড় করে

দেখল। টেনে-টুনে দেখল, কাঁটা ছেঁড়া-বা আছে! তারপর খুশি হল। টাকাটা ধুতির খুঁটে বেঁধে টাকাশুদ্ধু খুঁটটা ট্যাঁকে গুঁজে নিতে নিতে, ওদিকেই চেয়ে থেকে বলল, ঘুম পাচ্ছে? চ তবে।

গুড়গুড়িয়াকে বেশিদূর যেতে দিল না রাইবু, মনা সাউয়ের পুকুরপাড় অব্দি এসে তাকে হ্যাৎ করে ঝোপঝাড়ের ভিতর টেনে নিল। কলাবন আর দাঁড়কলমীর জঙ্গল, একে-তাকে জড়িয়ে নানাবিধ ল'গাছ, নাহাঙ্গশাক বেশ ডাঁটো হ'য়ে উঠেছে, তার উপর দু'জনে দাঁড়িয়ে।

কী বলছ?

বলছি, আগে বস ন।

নাহাঙাশাকের উপর রাইবু বসে পড়ল, তার দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও।

কী বলছ, বল-অ?

বলছি, ধৈয্য ধর।

বলে রাইবু বিড়ি ধরাল, শালপাতার চুটা। টানল, টেনে গুড়গুড়িয়াকে দিল।

ঐসব কাজে বুদ্ধি ধত্তে হয়।

ফুসুর-ফুসুর যা বলার গুড়গুড়িয়াকে বলে রাইবু শুল, নাহাঙাশাকের উপর নমথম শুয়ে পড়ল। তার আর কোনো চিন্তা নেই, থাকছে না, নির্ভাবনায় শুয়ে থেকে মনা সাউয়ের ফের ঘুমিয়ে পড়া অব্দি যা অপেক্ষা করা। তার দু'চোখে ঘুম ছিল সে তো রাইবু দেখেছে।

আধঘণ্টা ধরে টুরিব্যাঙের শব্দ শুনল। এত যে ব্যাঙ ডাকে, পোকা গোঙায়, তার হেতু কী! জল-ঝড় বা হতে পারে। রাইবু সন্তর্পণে উঠে পুকুরের পাড় অব্দি হেঁটে গেল। পৃথিবী চুপচাপ, রাইবু সুযোগমতো দু'ঘুঁটির দানটা এবার চেলে দেবে।

গুড়গুড়িয়া আয়, খানিক সাবধানে আসিস!

চারপেয়ে জন্তুর মতো লোকটা কুড়ুকুড়ু হেঁটে রাইবুর পিছু ধরল। কিছুটা এগিয়ে রয়েছে রাইবু। তার ভঙ্গিও পিছুর মতো। দূর থেকে আচমকা মনে হবে, দুটিতে যাচ্ছে—আগে বর, পিছনে বউকুকুর। আঁধার খুঁজে তারা নিরাপদ জায়গায় উঠে যাবে।

খামারে এসে রাইবু দেয়াল ঘেঁষে খাড়া হল, গুড়গুড়িয়াও। এতটা হামা দিয়ে আসা! এখন হাঁপাচ্ছে, ফোঁ ফোঁ দম ফেলছে। নিজেকে সামলে-সুমলে ফিসফিস করল, আরে গুড়গুড়ে আস্তে!

তারপর দেয়ালের ধার ঘেঁষে, যতটা পারা যায় ঘাড় টেনে দিল।

মনা সাউয়ের খামারে দুটো জলের কলসি, মুড়োঝাঁটা, তাছাড়া কিছু নেই। রাইবু চোখ খুলে চরাচর দেখে নিল। না, নেই কেউ, জনমাম্মি নেই কোথাও। নিমেষে তিন তিন ছ'টা শালবল্লা, দু'কাঁধে ফেলে রাইবু হাঁটতে থাকল। পিছনে গুড়গুড়িয়া।

পুকুর পেরিয়ে আর কিছুদূর যেতে, তিনটে কুকুর ভুকভুক করে লবকেশরপুর ঘাটঅব্দি ঠেলে আনল। দশ মিনিটের পথ দু'তিন মিনিটে কাবার। 'বাবা-বাছা' 'আয় তু তু' বলে কয়েও রাইবু ঠাণ্ডা করতে পারল না, অবোধ জীব একদম বাউলা ছিল। গুড়গুড়িয়া কুড়ুল দেখাতে খানিক যা ভড়কে গেছিল, এখন জলের ধারে লাইন বেঁধে ফের ভুকভুক করছে।

জল ছেড়ে এপারে এসে রাইবু আর গড়ানের দিকে গেল না। সোজা পুবমুখো, ডহর হ'য়ে ডাঙাসাইয়ে ঢুকে যাবে। ওখানে চিনিবাস দলুই সরেস মাল দেখলে হামলে পড়বে। যেন মুখ হাঁ করে আরেক যুগ থেকে বসা, পেলে টপাটপ গিলে খাবে।

একটা রাতচরা দু'চারবার 'টিট্টিঙে টিট্টিঙে'রব তুলে ডাকল, মাথার উপর ঘুরল ফিরল, তারপর ডহর ছেড়ে যেতে লাগল বাদার দিকে। রাইবু আর কিছুদূর হেঁটে চিনিবাসের চল্লাতলে উঠে গেল।

কী দরে দিবি?

তোমার সঙেও ফের দরাদরি!

ও-সব রাখ, ঠিক কত হলে দিবি?

রলাপিছু দু'টাকা।

তারমানে দু-বারও চব্বিশ? যাঃ কুড়িটাকা দিব।

মা'জন, তা'লে মরে যাব!

তবে তোর জিনিস তুই নিয়ে যা।

বেশ যখন বলছ, আর দু'টাকা দিব্বে।

ন্না, কুড়িটাকাই দিব-অ।

তাই দেও।

টাকা নিয়ে রাইবু আর দাঁড়াল না, হড়বড়িয়ে নেমে এল। ডহর ঘুরে ফের গড়ানে উঠে যাবে, গোঠটাঁড় হ'য়ে ফের জঙ্গলে। লোধাপাড়া পৌঁছুতে তার ভোর হবে।

জঙ্গলে ভোর, একটু আগেই হয়েছে। এখন ঝকঝকে রোদ। একটা শালিকপাখি একটা কাককে লোধাপাড়ার দিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে জঙ্গলে। কাকটা পেট ভাসিয়ে উড়ছে। পিছুনে একদঙ্গল লোধামেয়ে, বেরিয়েছে সকাল সকাল। যাবে জঙ্গলে, ঝাঁটি কুড়োতে পাতা ছিঁড়তে। এখন জষ্টিমাস, জাম-জামরুলের কাল। খুঁজলে বন-আলু, নানাবিধ ফলমূলও পাওয়া যাবে। তারা এর তার গায়ে ঢলতে ঢলতে হল্লা করে হাঁটছিল।

দলের ভিতর রাইবুর বউ শিশুবালা, বোন সোমবারি, আর জটালোধার বউবুড়িও ছিল। তারা দোরখুলির জঙ্গল পেরিয়ে নারদার কাছাকাছি যাবে। ধারেকাছের জঙ্গলে ঝাঁটি নেই, যা ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে সাফা। তাই দূরের বনভূমিতে যাওয়া, যেখানে অন্ন আছে।

কাকটা আচমকা বাঁক নিল, ঘুরে ভাসতে ভাসতে আসছে লোধাপাড়ার দিকেই। তার পিঠ বরাবর শালিকটা, এখনও তেড়ে আসছে। ঘাড় হেলিয়ে কাকটার পিঠে-মাথায় ঠুকরে দিচ্ছে। দিয়ে ফের উড়ছে, উড়ছে। কাকটা উড়তে উড়তে মেয়েদের দলের ভিতর এসে গেল।

এত নিচু দিয়ে উড়ছিল যে, শিশুবালার চোখে-মুখে ডানার ঝাপটা লাগল।

মরণ!

একটুক পাখীকে কাকটার ডর দ্যাক!

বোধায় চুরিটুরি করেছে?

তবে ত চোর!

এতক্ষণ দলের ভিতর সোমবারি চুপ ছিল, কাক আর শালিকপক্ষীকে যেতে দিয়ে সোমবারি বলল, চোর-চুন্নীদের পিঁপড়াকেও ভয়।

আর সবাই হাসল।

আমরা বা কী কত্তে যাচ্চি, চুরি ত?

হঁ-উ।

জটালোধার বউবুড়ির কথায় সোমবারি যা সায় দিল না, আর সবাই 'হঁউ' দিল।

আমি কিন্তুক শাক তুলতে, খালধারে।

কী শাক লো, শুশনি? জটালোধার বউ জানতে চায়।

হঁউ, তাছাড়া টকশাকও আছে। বলে সোমবারি তার জিভ থেকে জল টানল।

যেখানেই যাও তোমার একজনকে ডর আছে, হঁউ ডর। বুড়ী জানাল।

কাক্কে?

একজনকে।

যাও, কে-সে বলবে ত?

কে আবার, যার তুমি মন লিবে।

হো-হো করে বুড়ী হাসল।—আমাদের সাবোধানে যেত্তে হবে, জঙলে গাড়বাবুরা খুব ঘুরছে-ফিরছে। বুড়ী হাসি থামিয়ে বলল। তার কথা শুনে গোটা দলটা খানিক চিন্তিত, তারপর জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল।

এ জঙ্গলের নাম তপোবন, তপোবন জঙ্গলমহাল।

রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া
তপোবনের কাননে
বাল্মীক তপোবনে—
লবকুশ ধরেছেন ঘোড়া হে
বিনা রণে নাই ছাড়েন।।

এ-সব কিংবদন্তী জঙ্গলের জনমানুষ জানে, তার অর্থ বুঝেও।

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার কিছু কিছু অংশ জুড়ে তপোবন জঙ্গলমহাল। এতে আছে সীতাকুণ্ড, যজ্ঞকুণ্ড। হনুমান চৌকি, তাড়কারাক্ষসীর হাড় আর আশ্রম। আর আছে সীতানালা, নাকি চিরদুঃখী সীতার অশ্রুতে গড়া ছোটনদী! তার দু'ধারে ঘাসবন, ঝামাপাথর। চাগড়া চাগড়া রসকলির তিলকমাটি। আর জলে পুরু ভেলভেটের তুল্য শুশনিশাক, ঝোপঝাড়ে টকশাক। লোধাজনমানুষ দু'হাতে ঝোপ ফেড়ে ঢুকে যায়, যেন মায়ের গর্ভে ঢোকে। তারপর দেহতত্ত্বের গোলকধামে বিচরণ। তারপর দু'হাতে ঝোপ ফেড়ে বেরিয়ে আসা।

দলটা এবার বড়রাস্তায় উঠে যাবে, এ রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে টানা আছে। আর তার দু'ধারে ঝোপঝাড়ের ভিতর গরু, চুরনী গরুর গলায় কাঠের ঘণ্টি বাঁধা, তার শব্দ ঢের দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। যা শোনা-না-শোনার ভেদ, ভেদার্থ চরানে বাগালরা বুঝে ভাল।

বুঝি নাই খালধারে যেত্তে তোর অত বাই কেনে?

বলছি ত শাক তুলতে।

রাখ তোর শাক-তোলা, আসল রহস্যটা কী ভেঙ্গে বল?

নাম্নী, সবকথায় উর'ম কর-অ নাই ত, আমার রাগ হয়।

রাগ হয়, বেশ তা'লে আর বলব নাই! বুড়ী ফিক করে হেসে ফেলল।

দলটার ভিতর যে সবচেয়ে হলবলি, খারাপ কিছু বলে যেতেও যার বাধে না, সে ভুবনের বউ ফুলটুসি। সে কথা বলল।

বুড়ীদিদি, ছুঁড়িটা খালধারে যাক, আর বিলেবাতানে যাক, তোমার কি-তাতে, বলদেখি?

জটালোধার বউবুড়ী হাসল, সে জানে ভুবনবউ কোনো কিছু জানতে চায় না, বলতে চায়। বলতে তাকে দিল।

তুমিও ত ছুঁড়ি ছিলে, যুবাকালের কথা একবার ভাবদেখি। দলছুট হ'এঞে—

হ'এঞে বনে-বাদাড়ে, খালধারে টাঁড়েটাঁড়ে একলা ঘুরে বেড়াতে কী মন যেত্ত নাই, ন ইচ্ছা হত্ত নাই?

বলে ভুবনবউ হাসল, তারপর বলল, যদি অসীকার কর-অ তবে জানব মিছা বলছ, হুঁউ মিছাই বলছ।

অসীকার-বা কে কচ্ছে! জটালোধার বউ হেসে ভুবনবউকে সায় দিল।

বুড়ীদিদি, তা'লে বলি তোমাকে, আমার বাপের দেশ বড়সোলে এক বাঁধ ছিল, তাতে উছুডুবু জল। কলমী আর শুশনিশাকের বন, দেখলেই মন যেত 'তুলি তুলি'। তুলতম, তুলতে তুলতে কী যে হত্ত নাই! আর কিছু ভাল লাগত নাই। তখন বাঁধের ধারে জঙলে—

হঁউ জঙলে টঙস টঙস ঘুরতম, আর শরীল অসকস করলে ভাবতম-সে আসুক, আমার কাঁধদুটা চেপে ধরুক, তার যা ইচ্ছা করুক।

আঃ মরণ! 'সে' আবার কে? শিশুবালা ভুবনবউকে ঠেলে দিল।

সে? সে ত সে-ই গো, তার কুনো বাখান নাই, নাকি বুড়ীদিদি? বলে ভুবনবউ জটাবুড়ীর মতামত জানতে চায়।

বুড়ী বলে, হঁউ তা ত বটে, সে একজন আছে। তাকেই ত ডর, ছুঁড়িকে ত তার কথাই বলি।

তা'লে শুনলি ত, এবার বুঝে সুঝে খালধারে যা।

তা ফের যাব নাই। সোমবারি মুখিয়ে উঠল, উ-সবে আমার কুনো ডরভয় নাই। বলে রাস্তা ছেড়ে সে হাঁটতে থাকল, হাঁটতে থাকল খালধারের দিকে।

বাকী দলটা দোরখুলির এই জঙ্গল পেরিয়ে যাবে নারদার কাছাকাছি। তারা একচোট হেসে রাস্তাবরাবর দক্ষিণমুখো যেতে থাকল।

খালধারে সোমবারি। এতক্ষণ সে আঁটারি-কুড়চির জঙ্গলে ঘুরেছে, দু'হাতে জঙলী লতার পালাপতর ছিঁড়েছে, আর আড়চোখে আরেকটা জিনিসকে দেখেছে, দেখেই চিনেছে। সেটি তার বুক, তার যৌবন। ভুবনালোধার বউ তাকে 'ভাল্ল মতন চিহ্নত' দিয়েছে। তারপর ঘাড় নামিয়ে ডান-বাম বুকের দু'দিক যতখুশি দেখেছে। তারপর হেঁচকা মেরে ঘাড় পিঠে তুলে হেঁটেছে।

ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে আসতে গিয়ে তার বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়েছে, বুক ঢিবঢিব করেছে। তার মনে হয়েছে, ভুবনবউয়ের 'সে ত সে-ই' আসছে, বনশিরিষের তলায় গাবগুবির জঙ্গল থেকে আসছে। সোমবারি অঙ্গের বসন ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়েছে, তারপর তৈরী থেকেছে। তারপর ভেবেছে, ভুবনালোধার বউ তাকে যেন ধুতুরার বীজ দিয়েছে খেতে, ঝোলাগুড়ে লটোপটো করে তা সে খেয়েছে। আর সেই থেকে বিষজ্বালা, যার দহনে সে এখন জ্বলে।

সোমবারি খালের জলে নেমে গেল। ঠাণ্ডাজল, দু'পায়ের পাতা ঢেকে হাঁটু অব্দি উঠে আছে। শিরশিরানি ভাব। কিচকিচ করে পাখি ডাকছে, জলপিপি ডাকল। ত্যামন জন্তুজানোয়ার এ জঙ্গলে নেই, সব ত উড়িশায়, আরো গভীর জঙ্গলে। গোপীবল্লভপুর পেরিয়ে পঁড়াচেঁচা-সারিয়ার পথ ধরলে উড়িশা খুব কাছেই।

পানিপিপাসা ছিল, জল থেকে গুড়মনগাছের দল, যার শরীর চিঙড়ির খোসার মতো, দু'হাতে সরিয়ে সোমবারি জল খেল, আঁজলা করে। আরেকটু গভীর হলে ঘাড় হেলিয়ে জন্তুর মতো শুষে খেত।

খালের জলে আর কিছুদুর হাঁটল। তারপর শাক দেখল, ভেলভেটের মতো, ছোট পদ্মের প্যাতার মতো। বিচিত্র শাকসব, খেলে ঘুম হয়। সোমবারি আপনার মনে তুলতে থাকল।

খালটাও বিচিত্র, এঁকেবেঁকে গেছে। এখান থেকে আশ্রমে যেতে চাও, এক এক করে সতেরবার একখালের জল পেরোও। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর ফাঁকা মাঠ, বাঁশপতরি ঘাসে ভরা। সাঁওতাল চাষীরা কদো বুনে, গুঁদলি বুনে। তার থেকে পচাই হয়। কাঁচা কদো চিবিয়ে খাও, তোমার মাথা ঘুরবে।

কদো না গুঁদলি না, বাঁশপত্‌রিঘাসের একচিলতে মাঠ পেরিয়ে সোমবারি আরেক খালে নেমে গেল। তারপর জল ছেড়ে ঝোপে। একটু যেতেই টকশাক, কচি কলাপাতা রঙের। মন দিয়ে সেসব তুলতে থাকল। তারপর শুনল, কুর-র-র-র-র!—গুঁড়ুরপাখ ডাকছে। "অম্মারে" বলে সোমবারি হুসহুস করে নেমে এল। পাখ না তোমার মরণ! এক জাতের সাপ আছে, নাকি বয়সকালে তার ডানা হয়, সে তখন ওড়ে, আর গুঁড়ুরপাখের মতো ডাকে, কুর-র-র-র-র। উড়বার কালে তার ছায়া যার শরীরে লাগে সে অসাড়, জন্মের মতো পঙ্গু না তো মৃত্যু হয়, না দংশালেও মরে! সোমবারি ভয়ে ত্রাসে নেমে এল। তারপর খাল পেরিয়ে আরেক খালের দিকে হেঁটে গেল।

আজ তার কী হল, মন যেতেও চায়, ফের চমকেও ওঠে, সোমবারি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, আর চমকে চমকে উঠছিল। চমকানো মুহূর্তে সে দু'ধারের ঝোপঝাড় থেকে পাতা ছিঁড়ছিল। আর ভাবছিল, সে আসুক, আমার কাঁধদুটো চেপে ধরুক, তার যা ইচ্ছা করুক।

তারপরেই, খসখস ঝুরঝুর! সামনের ঝোপ ফেড়ে কে যেন আসছে, বড় সুস্থির গতি তার। সোমবারি আঁতকে উঠল, তারপর দৌড়ুল দু'তিন গজ, ফের থামল। ঝোপটার দিকে তাকিয়ে শরীর নাচাল, মনে শক্তি আনল। আয় রে বাপের বেটা নিরবংশা, আয়! বলে ঢিল ছুঁড়ল, ছুঁড়তেই থাকল। যতক্ষণ না দেখল, মানুষ না, একটা শেয়াল ঝোপ ছেড়ে মরি-কি-বাঁচি দৌড়ুচ্ছে। সোমবারি পেট খুলে হাসল, অ-রে বাপের বেটা, তুই! তারপর দৌড়ুল।

এক এক করে খাল পেরুল। তাড়কারাক্ষসীর হাড়, যার নিচে গেল সনে হাঁতড়ে হাঁতড়ে সের পাঁচ মাগুর, চ্যাঙগড়ুই ধরেছিল। তারপর হনুমানচৌকি, সীতাকুণ্ড, আর আশ্রম। নিগমামন্দিরের গায়ে ঠেস মেরে সোমবারি দাঁড়াল। ঢের পথ দৌড়ে এসেছে, খানিক জিরোক, তারপর যাবে।

একে গ্রীষ্ম, তায় ফুরফুরে হাওয়া, একটা পাটার সাপ, টুটাফাটা মন্দিরে চেরা জিভে হাওয়া খাচ্ছে। সোমবারি ছাঁত করে সরে এল। তারপরেই চোখাচোখি, একদম সাধুবাবার সনে।

বাব্বা, হেতায় কী করে থাক গ'!

সাধুবাবা হাসল, বলল, কেন?

এত যে সাপখোপ রাতভিত—

ডংশালে—

'ও-হো' বলে সাধুবাবা অট্টহাস্য করল।

হাসছ যে গ' বাবা?

তোর কথা শুনে।

কেনে, সাধু বলে কী কাল তোমাকে পার দিবে?

তা দেবে না, কিন্তু আমি অমর—

সোমবারি ফিক করে হেসে ফেলে।

শাক এনেছি গ' সাধুবাবা, তুমি যে-শাক মেঙেছিলে।

'ও-হো' বলে সাধুবাবা ফের অট্টহাস্য করল। তারপর বলল, তুই বেটি বড় ভাল, আর জন্মে আমার মা ছিলি—

সোমবারি আর কিছু বলল না, সাধুবাবার 'ভোগঘরে' কলাপাতায় তারমতো শুশনিশাক রেখে ভাবল, লোকটা বড় ভাল, লোধারা তাকে বড় মান্যি করে, তার আশ্রম বড় নিরাপদ স্থান।

একা এসেছে, দলে ভিড়ে এসেছে, নারীপুরুষ মিলেমিশে এসেছে, লোকটা একদিনের তরেও কম খাতির—

ততক্ষণে সাধুবাবা 'ভোগঘরের' দোরগোড়ায় এসে গেছে।

সোমবারি লোকটার চোখে আজ কী দেখতে কী দেখল, ভয় পেয়ে ঘর ছেড়ে বেরুল।

আর আসব নাই গ' সাধুবাবা।

কেন রে?

খানিক চুপ থেকে সোমবারি বলল, কেনে আবার, এন্নি। বলে দৌড়ুল। জঙ্গলের ভিতর সে এখন হরিণী, সে তার মৃগনাভীর গন্ধ পেয়ে দৌড়ুচ্ছে।

বড়রাস্তায় উঠে এসে সোমবারি দেখল, ঝোপেঝাড়ে সেই গরু, গরুর গলায় ঘণ্টি বাজছে। চরানে ছা-ছানারা হেথা-হোথা নুড়ি খেলছে, একম-দুকম-টিলিঙ ঠয়া। ঘুমুচ্ছে-বা। সোমবারি গাছের গুঁড়িতে ঠেস মেরে খানিক জিরোল। তারপর ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে থাকল, যাবে লোধাপাড়া।

ঝোপ ফেড়ে বেরুবে, সোমবারি গুড়গুড়িয়াকে দেখতে পেল। দু'তিনটে ঝোপের ওপারে দাঁড়িয়ে। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, এখন গুড়গুড়িয়া-বা কী করছে?

শুন-অ!

ডাক শুনে সোমবারি থম মেরে দাঁড়াল।

শুন্নো, কথা আছে।

কী কথা? ওখান থিক্যেই বল।

গুড়গুড়িয়া হাসল।

বলবি ত! সোমবারি ধমক দিল।

খাকি রঙের হাফ-প্যান্টুল, পায়ে দড়িবাঁধা টায়ারের চটি—গুড়গুড়িয়া বলল, বলছি রাঝুকে বলিস—

কী?

যে আজ আর যাব নাই।

শুধু এই?

হুঁউ।

উঁ-হু, তোর চোখ বলছে তুঁই আরো কিছু বলবি?

গুড়গুড়িয়া ভরসা পেয়ে এবার গুছিয়ে হাসল, তারপর এগুল।

প্রায় সামনা-সামনি এসে গেছে, আরেকটু হলে বনের ভিতর একলা হরিণীকে বনবাঘা খাবে। হরিণী গর্জে উঠল, উর'ম চোখ তোর গেলে দিবরে নিরবংশা! যা হট যা!

এমনসময় কারা যেন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে—

ওরা কারা, কারা?

জটাবুড়ীর গোটা দলটা ফিরে আসছে, দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছে। কারোর বেশ-বাসের ঠিক নেই, কারোর কাপড় খুলে লুটোচ্ছে। জটাবুড়ীর চিমসে উদোম বুক মরাছাগলের ছালের মতো, তাতে এখন ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

সামনা-সামনি হলে সোমবারি বলল, নান্নী, ওরকম ছুট্টো যে?

জটাবুড়ী হাত পা নেড়ে, হাবভাবে বলে, আগে চ, এই লাটাটুকু পার হঞে চ। ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এসে বুড়ী বলল, কী-ই আবার, নরসিঙ্গাগাড় খেদাচ্চে।



ঘুম ভাঙলে রাইবু দেখল, বেলা ঢের হয়েছে, জঙ্গল থেকে শিশুবালা ফেরেনি। ভোরভোর মহালটাও ফাঁকা থাকে, এসময় ঢুকে কাঠফাট চুরি করলে ধরপাকড়ের ভয় থাকে না, তাই জঙ্গলে যাওয়া। রাইবু শিশুবালার চিন্তায় লাফিয়ে উঠল, বউটা এখনও আসছে না, চিন্তার কথা বটে।

সারারাত ঘুম ছিল না, পুটুর পুটুর হাঁটা। মাল চালাচালি করা, আর শেষরাতে এসে গোধুতের মতন ঘুমে ঢলে পড়া। যেন শরীরের কলকব্জা খুলে পড়ে। তার কতদিন নারীসঙ্গ হয়নি, রাইবুর চোখে শিশুবালার কচি পুঁইডাঁটার মতো চকচকে মুখটা মনে এল। কী খায়, না দুধ না ঘি-ভাত, তবু শরীর—শরীর ছিল্ ছিল্ করে। শিশুবালার সর্বাঙ্গ মনে আসায় রাইবু এখন ষাঁড়ের মতো, তার নাকের দু'ফুটোয় একযোগে গরম শ্বাস পড়ল।

ঘুম ঝেড়ে ফেলে বাইরে এসে দেখল, কোথাও তড়িঘড়ি হেঁটে যাচ্ছে ভুবন। পিছনে কাঁদতে কাঁদতে তার মেয়ে নুকু। হয়ত কাজে যাচ্ছে, হয়ত মেয়েটাও যাবে বলে বায়না ধরেছে, ভুবন মোটেও নিতে চায় না। যেতে যেতে বার কয়েক তাকাল। রাইবু উঠোনে দাঁড়িয়ে শরীর ভাঙছিল, চোখাচোখি হল। তার মন গেল বলতে, ভুবন রে, তোর বউ মহাল থেকে ফিরেছে? বার কয়েক বলি বলি করেও রাইবু কোনো কথাই বলল না। ভুবন চলে গেল।

চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে চোখ জ্বালা করল রাইবুর, ঘুম পুরোপুরি না হলে এরকমটা হয়, কিরকিরে জ্বালা, তারপরেই আরাম। কুয়াশার মতো ঝরে পড়ে রিম রিম। রাইবু সেই মিঠে আরামের আশায় চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল আরো। তারপর চোখ বড় করে তাকাল, নুকু ফিরে আসছে। তার গালে চোখের জল এখন মার্কা হ'য়ে বসে। তাহলে ভুবন তাকে নেয়নি, হয়ত চড়চাপড় মেরে ফিরিয়ে দিয়েছে। রাইবুর মনটা বিষণ্ণতায় ভরে গেল। তার ছেলেপুলে নেই, আর হবেও না।

কী রে নুকু, বাপ তোকে ঠ্যাঙাল? যেতে চেয়েছিলি, লিল নাই, উল্টে ঠ্যাঙা মেরে খেদাল? কী-ই বাপরে তোর!

নুকুকে রাইবু মনে মনে অনেক কথাই বলে ফেলে, বাস্তবিক বলে না কিছুই। খালি বলে, নুকু রে, তোর মা বন থিক্যে ফিরেছে?

নুকু তার রুখো চুল একহাতে ঠেলে নাকে শব্দ করল। যেন সে কাঁদছিল, তার কান্না এখনও থামেনি, এসব বুঝাতে চাইল। রাইবুর কথার জবাব দিতে তার বয়ে গেছে, সে টুরটুর করে আড়ালে হেঁটে গেল। এক কুনকে মেয়ের দেমাক দেখে রাইবু ফিক করে হেসে ফেলে, আর তক্ষুণি ভুবনবউয়ের মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে এল। নুকুর মুখে রাইবু ভুবনবউয়ের আদল দেখতে পেয়েছে।

শিশুবালা আসছে না চিন্তার কথা বটে, ভারি চিন্তিত হল রাইবু। তবে কী গার্ডবাবুদের খপ্পরে পড়ে গেল? যেরকম শিয়াল-খেদা শুরু করেছে লোকগুলো! সোমবারিও গেছে, খারাপ কিছু হলেও হতে পারে, কার মনে-বা কী আছে বলা যায়? তার উপর সোমবারি যে রকম সুন্দরী, শিশুবালা যেরকম আঁটোসাঁটো, ভুবনবউ যেরকম হলবলি। খাবলে ধরতে

কতক্ষণ? যেন চনমন করে জেগে উঠল রাইবু, পরক্ষণে ভাবল, আরে ধুস, জঙ্গল হল মা! তাবৎ লোধামানুষ তো তার ছা-ছানা। সেই জঙ্গল-মায়ের রাজত্বে চরাচর সুখে আছে, সর্বলোক কুশলে আছে, কারো কোনো বিঘ্ন নেই!

চিন্তায় ছেদ টেনে শালপাতার বিড়ি ধরাল রাইবু। টানল, তারপর ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। গত রাতের করকরে নোটগুলো চালবাতায় গোঁজা, রাইবু নেড়েচেড়ে দেখল। দেখতে দেখতে চোখে-মুখে হাসি, মনা মা'জনকে কী ঠকান ঠকিয়েছে! খুব হাসল, তারপর তার মনে হল সাকরেদ গুড়গুড়িয়া তো আসছে না। আসার কথা ছিল। ব্যাটাচ্ছেলের ফের হল কী?

একটু যা বোকা, ভীতু ভীতু, গায়ে কিন্তু অসুরের বল! আরো চালাকচতুর হতে হবে। তারপর ভাবল, শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে গুড়গুড়িয়াও খুব কাজের হবে, আর তা অল্পদিনেই। কী ভেবে রাইবু ফের হাসল। তার আচমকা মনে হল, ব্যাটাচ্ছেলের নজর একটু ইয়ের, মানে ইয়ের দিকে—। সোমবারির মুখটা দু'চারবার ডগোমগো করে ভেসে উঠলে রাইবুর মন খারাপ হ'য়ে যায়। সে অন্য কিছু ভেবে এই মনখারাপ হওয়াটাকে চাপা দেয়ার চেষ্টায় থাকে, আর তখনই তার ডাক আসে।

রাব্বু অ-রাব্বু রাব্বুরে-এ-এ-এ! পাশের ঘর থেকে তার বুড়োবাপ কঁকিয়ে ডাকছে।

এতক্ষণে খেয়াল হল তার, একজন রোগাভোগা মানুষ ঘুপচীতে শুয়ে, একলা। তার খাওয়া হয়নি এত বেলাঅব্দি, হয়ত দিয়ে যেতেই ভুলে গেছে শিশুবালা, রাইবু অতিশয় ব্যস্ত হ'য়ে হাঁপাহাঁপি শুরু করল।

কী বলছ, বাপ? বলে দেখল, বুড়ো মুতে ভাসিয়েছে কাঁথাকাপড়, তার বটকা গন্ধ চারদিকে। গা গুলিয়ে উঠল রাইবুর। তবু বাপ, একদম রক্তের সম্পর্ক, তাই ঘেন্না করল না। ধুতি-ছেঁড়া নেঙটটা পাল্টে দিল, আসছে হাটে একটা চারহাতি নতুন গামছা কিনে দেবে, তাও ভেবে রাখল।

টুকচার সভ্যসুভ্য থাকবে ত?

আর থাকাথাকি!

কেনে?

কেনে কী রে, খালমু'য়ে যেতে হবে নাই? বুড়োর চোখে জল, পিচুঁটি আর জলে মাখামাখি, সাদা রেখায় গাল বেয়ে খানিকটা গড়িয়েও পড়ল।

রাইবু মুছে দিল। তার চোখেও জল এসে যাচ্ছিল, সামলে নিল। বলল, এত জলদি চলে গেলে আমাদের কে দেখবে বাপ, বলদেখি? তার স্বর খুব আদুরে লাগল।

এ কথায় বুড়ো তার বেঁচে থাকাটা কত জরুরী যেন টের পেয়ে যায়, তার শরীর অল্প নড়ে ওঠে, বলে, আর কে দেখবে, জঙ্গল—জঙ্গলই ত লোধাদের মা-বাপ।

তা হোক, তবু উসব ছাড়-অ। বলতে বলতে ভেজা কাঁথা রাইবু পাল্টে দিল। বলল, খেয়েছ?

হঁ, তোর 'বহু' খাবারদাবার দিয়েছে।

রাইবু ফের অবাক হল, বলল, তব্বে উর'ম চ্যাঁচাচ্ছ কেনে?

বুড়ো ভুলে গেছে, কী জন্যই বা আকুলি-বিকুলি ডাকছিল! মনে করতে না পেরে খানিক সময় হাঁ করে চেয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, অষুধ।

অষুধ?

হঁ, লালভেঁড়রার ক্ষীর টুকচার আনিস ত।

আনব।

খেঁ-খেঁ করে একটা মুরগী রোগাভোগা মানুষটার ঘুপচীতে ঢুকে হেগে দিল।

একরাতে বেরিয়ে জীবটাকে রাইবু এনেছিল, এখন তেড়ে গেল। মুরগী তাড়িয়ে এসে বাপের কানে প্রায় ফিসফিস করে বলল, আজ একটা জিনিস তোমাকে খাওয়াব।

কী-ই, খাসির মাংস?

ঠিত তাই, কিন্তুক কী করে বুঝলে?

বুড়ো সেকথার জবাব না দিয়ে বলল, খুউব অরুচি রে বাপ, এবার তা'লে যাবে।

বাপের ঘর ছেড়ে রাইবু রাস্তায় এসে দাঁড়াল, জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে। শিশুবালার ওপর খানিক বিরক্তও। কী যে করে শিশুবালা, এতটা বেলা অব্দি জঙ্গলে! ঘরে খাওয়ার যোগাড়যন্তর রাখতে হবে, করতে হবে—হাঁ-হাঁ-মরদ খেতে চাইলে উপায়? শিশুবালা খুব বুঝদার, আর পাঁচটা লোধাবউয়ের চেয়ে বুদ্ধিমান, মরদটার জন্যে খাবার কী আর করেনি? ঢুঁড়ে দেখলেই পাওয়া যাবে, রাইবু দেখবে কী? ধুস, ত্যামন গা করল না। আসলে হাতে কড়কড়ে নোট গত রাতের, নিজেকে রাজা-উজীর ভাবছে। ফুর্তি ফুর্তি ফুর্তি,—ফুর্তি উপছে পড়ছে চোখে-মুখে। টেনে একটা শিস ছাড়ল, আর দেখল পাখিটা খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু! কী পাখি? তারপর ভাবল, আজকাল কত রকমের পাখি এই বনটাতে আসছে যাচ্ছে, তার ক'টাকেই-বা রাইবু চেনে-জানে? অথচ চিনলে ভাল হত, নাম জানলে সুখ হত। রাইবু যেন অতিমাত্রায় বনভূমির প্রেমে পড়ে গেল। সে পাখিদের উড়ে যেতে, গাছের পাতা নড়তে, এইসব আরো অনেককিছু খুব মন দিয়ে দেখতে থাকল।

এক এক সময় আসে, আসেই—তখন তার অদ্ভুত লাগে, সে আর তখন রাইবু থাকে না। রাজাটাজা হয়ে যায়, বনের রাজা, জঙ্গলমহালের রাজা। এই যে এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে কত কী ভাবছে, আসলে সে আপনার মনে টুরটুর হেঁটে যাচ্ছে, যাচ্ছে জঙ্গলের দিকেই। শতেক লোধা-লোধানী তাকে নমো করছে, বলছে, হুই দ্যাক রাজা যাচ্ছে, শব্বর রাজা! নমো কর নমো কর! এ কথা সোমবারিকে, শিশুবালাকে কতবার বলেছে, তারা ত্যামন গা করে না। বলে, ও তোমার মনের ভুল! হয়ত খিল খিল করে হেসেছে, আর তারপর বলেছে, অম্মা রাজাই ত, রাজা না?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাইবু দেখল, গজল্লা করে গোটা দলটা আসছে, হাত-পা নেড়ে অনেক কিছু বলতে বলতে। যেন কিছু একটা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এত। তাছাড়া যেজন্য জঙ্গলে যাওয়া— সেই শুকনো ঝাঁটি, কাঁচা শালপাতা, দাঁতন নেই দেখে রাইবু ভাবল, নিশ্চিত কিছু একটা ঘটেছে। কী ঘটতে পারে, ভাবতে ভাবতেই গোটা দলটা সামনাসামনি এসে গেল।

জটাবুড়ী বিশহাত দূর থেকে প্রায় দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, রাইবু রে, এর তুই বিহিত কর!

হেঁ, তুমি বিহিত কর-অ। ভুবনবউ তার শরীর হেলিয়ে রাইবুর গাঁ ঘেঁষে বলল।

দেখে শিশুবালার অঙ্গ জ্বলে গেল, সে দাতে-দাঁত কেটে দাঁড়িয়ে পড়ল। সোমবারি হাসছে।

আঃ ব্যাপারটা কী, বলবে ত? রাইবু পষ্টাপষ্টি বলতে বলল।

অনেকে বলতে যাচ্ছিল, জটাবুড়ী থামিয়ে দিল সকলকে, তোমরা থাম-অ, আমাকে বলতে দেও।

আচ্ছা রাইবু, লোধামাড়ষ ত জঙলের জীব?

পরিবেশ গম্ভীর হয়ে গেল মুহূর্তে, খালি সোমবারি হাসছে।

জীব।

জঙ্গলের পোকা?

পোকা।

জীব বল পোকা বল, সবারই পেট আছে, আছে নাই?

আছে।

পেট খেত্তে চায়?

চায়।

খেত্তে চাইলে খাবার খুঁজতে হয়?

হয়।

তা'লে বাপধন এবার বল-অ, জঙ্গলের জীব খাবার খুঁজতে যাবে কুথা?

রাইবুর থুতনি ধরে বুড়ী নাড়তে থাকল।

কেনে, জঙ্গলে। বলে রাইবু 'আঃ কী কচ্ছ, ছাড়-অ' বলতে বলতে দু'চার পা পিছিয়ে এল।

আর জঙ্গলের রাজা যদি খেদ্দায়?

কে তোমার জঙ্গলের রাজা? রাইবু বলতে যাচ্ছিল রেগে, পারল না, তার চোখ সোমবারির চোখে, সোমবারি হাসছে।

সে অন্যকথা বলল, গাড়বাবুরা বুঝি খুব তাড়া দিচ্ছে?

তবে আর জানছ কী, নরসিঙাগাড় খেদাচ্চে।

ঘরে এসে রাইবু বউকে হ্যাৎ করে বুকের ভিতর টেনে নিল। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, তার মনেও রোদ ঝাঁ-ঝাঁ। রিঁ-রিঁয়াপোকা যেমন সোনালগাছের ডালে ঘুরপাক খায়, ঘুরতে ঘুরতে বোঁ বোঁ আওয়াজ করে, রাইবুর মনের ভিতরও কী-এক আওয়াজ, তখন থেকে হ'য়ে যাচ্ছে। বাইরে, উঠোনের কলসী টেনে বুগবুগ আওয়াজ তুলে সোমবারি পা ধুচ্ছে, ধুচ্ছে তো ধুচ্ছে।

শিশুবালা অলস হাতে রাইবুকে ঠেলে দিল, কী হচ্ছে যা তা?

কী আবার। রাইবু হাসল। ঠেলা খেয়ে মাত্র সামান্যই সরে এসেছে, ফের তা পূরণ করল।

খেয়েছ? অন্যকথা শিশুবালার।

রাইবু ঘাড় নাড়ল।

তবে ছাড়-অ, খেত্তে দিই?

থাক না, ততক্ষণে শিশুকে কজায় ফেলে দিয়েছে রাইবু।

শিশুবালা আঁতকে উঠল, কী-ই হচ্ছে, সোমবারি আছে নাই? রহো দেখে আসি।

রাইবু ছেড়ে দিল, শিশুবালা ঘুপচী থেকে বেরিয়ে এদিক সেদিক দেখল, সোমবারি জল ঢেলে শাক ধুচ্ছে, সে ফিরে এল।

তোমার ত ইয়ে আছে।

ইয়ে?

ন্যাকা, [illegible]-অ নাই। শিশুবালা ঠেস মেরে বলল।

রাইবু রীতিমত অবাক।—কী যা-তা বলছ?

বলছি, ভুবনার ফুলটুসির সঙে তোমার ইয়ে নাই?

রাইবু নিচু করে হাসল, তোমার মাথা খারাপ, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি—

ঠিক ত?

ঠিক।

আলগা কাপড়ের মতো শিশুবালা এবার খসে পড়ল, তার শরীর এখন রাইবুর হাতের মুঠোয়, তাকে নিয়ে খেলছিল সে। খেলতে খেলতে বলল, বঙ্কা মাহাতো আর কত টাকা পাবে?

শিশুবালা অলস গলায় বলল, আ-ন্নে-ক। তার স্বর খুব আদুরে লাগল, পোষা বিড়াল-টিড়ালের মতো।

তাও কত-অ?

শিশুবালা রাইবুর চোখের দিকে একবার চেয়ে দেখল। হয়ত ভাবল, এই লোকটা কাল রাতে কাঠ বেচে টাকা পেয়েছে, তা বলে এত্ত? সে বিড়বিড় করে হিসেব করল, তারপর বলল, চাট্টাকা।

দিয়ে আসবে।

খানিক বাদে বড় বড় শ্বাস ফেলে রাইবু ফের বলল, বঙ্কা মাহাতোর সরু সরু চিকন চাল নাই?

থাকবে নাই কেনে!

আজ আনবে, ও বেলা খাসির মাংস আর সরু চাউড়ের ভাত।

তারপর কোঁত পেড়ে বলে, বাপের মুখে অরুচি।

একসময় গভীরতম সুখে ডুবে থেকে বলে, আছা কী পাখ বল-অ ত?

কোথায় কি?

অই যে ডাকে, টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু?

আঃ ছাড়-অ! বলে ধড়ফড় করে উঠে বসল শিশুবালা। বলল, সোমবারি—

দোর থেকে একটা ছায়া ছাঁত্‌ করে সরে যাচ্ছে, রাইবু চোখ চেয়ে দেখল।

বিকালে আড়বেলায় গুড়গুড়িয়ার ডাকে দিবানিদ্রা রাইবুর ভেঙে গেল। শিশুবালা এখনো ঘুমুচ্ছে, সোমবারি নেই। তবু ভয়ে ভয়ে রাইবুকে ডাকছে গুড়গুড়িয়া, পাছে সোমবারি এসে পড়ে। তার চোখে চোখ রাখে আর সেই দুপুরের রহস্যটা তুলে ধরে বলে, কী বে গুড়গুড়িয়া, কী হচ্ছিল তোর, জঙ্গলে সেই তখন? বলে দিতে পারেও রাইবুকে, আর রাইবু তখন কী ভাববে, ভাববে কি? না, লোক ভাল রাইবু, অতকিছু ভাববে না। তা হোক তবু ভয়ে-ভাবনায় গুড়গুড়িয়া হাঁক দিয়ে বলছে, উঠো, উঠে পড়ো!

তড়িঘড়ি উঠে রাইবু মুখে-চোখে জল দিল,—সেই কিরকিরে জ্বালা। আর তারপরেই আরাম, বুঝো কিত্তি!

ও বেলা আইলি নাই যে?

জঙ্গলে টঙস টঙস করে ঘুরে বেড়ানোর কথা বেমালুম চেপে গিয়ে গুড়গুড়িয়া বলে, এম্নি।

এম্নি? আর সেইটা হৈল নাই যে?

হব্বে।

হাসে রাইবু, বলে, এখন?

হুঁ-উ।

তব্বে চ। চরানে ছা-ছানারা আড়বেলায় বনে-জঙলে ভেড়া-ছাগল চরাতে কিন্তু ভয় পায়।

পাক। রাইবুকে খুশি রাখতে গুড়গুড়িয়া বলে, সেই আছে নাই— যেখানে শর সেখানে শব্বর? তুমি-আমি যেখানে শিকার ঠিক সেখানে। মিলবেই, এখন চল-অ ত।

রাইবু খুশি হ'য়ে যায়। বলে, হ্যাঁ, ক'দিন ধরেই বাপের মুহে অরুচি। যদি মেলে—

সোমবারি গলা খাঁকারি দিল, তার মানে সে এসে গেছে।

গুড়গুড়িয়ার পিলে গুড়ুম! দুপুরবেলায় শিশুবালার সঙ্গে অমন অসভ্য ব্যাপারটা সোমবারি দেখে ফেলল,—সেই লজ্জায় ভাল করে তাকাতে পারছে না তার দিকে রাইবুও। তখনই টায়ারের চটি পায়ে গুড়গুড়িয়া কেটে পড়ল।—আসো তুমি, আমি জলের দিকে যাচ্ছি। এই বলতে বলতে।

বস্তা হাতে রাইবু এবার সোমবারির মুখোমুখি। বলে, একটু বাহির হই রে।

এই ডুবুডুবু বেলায় না গেলেই কী হত্ত নাই?

যাব-অ আর আসব। রাইবুর মুখে-চোখে হাসি।

কুন শুভকাজে যাচ্চ শুনি? যাচ্চ ত চুরি কত্তে?

চুরি লয় বহিন, লোধাজাতের জাত-বেওসা। কথা ফুরোয় না, জোড়াশালগাছের ওধারে সিঁটি বাজল। মুখে আঙুল পুরে গুড়গুড়িয়া বাজাচ্ছে।

ঐ তুমার সাকরেদের সিঁটি, দৌড়ও।

রাইবু দৌড়ুল না। ধীরেসুস্থে হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোর বহুদিদিকে বলিস, বঙ্কার উখান থিক্কে সরু আর চিক্কন চাল আনতে। বলেই উত্তরমুখো হাঁটা, হন হন করে।

জোড়াশালের ওধারে গুড়গুড়িয়া বেরুল। একটা শুকনো মড়মড়ে শালপাতা নিয়ে আঙুল দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় খেলছে। বলল, ভয় করে।

ভয়? কাক্কে?

বহুত ভয়। গুড়গুড়িয়ার চোখে-মুখে কুতকুতে হাসি।

বলবি ত কাকে?

বলব-অ? খানিক থেমে গুড়গুড়িয়া বলে, সম্মারিকে।

সোমবারিকে? ভয়? হো হো করে হাসল রাইবু, তার হাসি হিল হিল করে সারা জঙ্গলে এখন চারিয়ে যাচ্ছে। আচমকা আপনার মনে গুম হ'য়ে যেন বলেও, হুঁ, ভয়ের কারণ বঠে সোমবারি।

লম্বা শ্বাস ছেড়ে গুড়গুড়িয়া এবার অকারণে দৌড়ায়। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে, অ-রাস্তার উপর দিয়ে।

তার ছটফটানি দেখে রাইবু হাসে, আর বলে, অমন দামড়ার মতন দৌড়ালি যে? কুনদিকে যাবি আগে ঠিক কর।

গুড়গুড়িয়া থামে, চেঁচিয়ে সে জানায়, যাবে রুখনীমারা। দিল্লীশ্বর মাহাতোর চ্যাঙচ্যাঙে খাসি আছে। চরে বেড়ায়। ঘাস খায়, আঁটারি-কুড়চির পাতা খেতে ঝোপঝাড়ে ঢোকে।

রাইবুর জিভে লালসার জল টসটসায়, বলে, আর বলিস নাই। আগে চ তা'পরে কত্ত-অ মুরাদ জানা যাবে।

গুড়গুড়িয়ার রাগ হয়। ঝুপকা ঝুপকা কেঁদু পাতার ঝাড়ে ফুটবলের মতো সট মারে রাগে। গুড়খালোধার ছেলে নীলু, নীলেশ্বর ফুটবল খেলে। গুড়গুড়িয়া দেখেছে, ছররার মতন ছুটতে পারে নীলু। সেইরকম কায়দায় সে এখন পাতাপতর ফরফর ছিঁড়ে ফেলে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে তার আচমকা মনে আসে, আচ্ছা ছেলে হিসাবে সে কী খুব খারাপ? একদিন বলে দেখবে রাইবুকে।

ছোট ছোট ঝোপঝাড় ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে রাইবুলোধাও এগুচ্ছিল। গুড়গুড়িয়াকে থামতে দেখে বলল, ওভাবে দৌড়াস নাই গুড়গুড়িয়া, পায়ে খোঁচ লাগবে।

গুড়গুড়িয়া খাকি হাফ-পেন্টুলের দু'পকেটে হাত গলিয়ে চেঁচিয়ে বলল, বেলা ঝিরিঝিরি, জলদি কর-অ, না'লে পস্তাবে।

কাছে এসে রাইবু বলে, আর এইটুক্কু ত, সাবোধানে যেতে হবে।

হাঁপাচ্ছ? কথার ভিতর দিয়ে রাইবুর কাছাকাছি যেতে চাইছে গুড়গুড়িয়া।

হাতের বস্তা আর কাঁধের টাঙিটা তাকে দিল, দিয়ে পাছা গেড়ে ধুলোতে বসে গেল।

বসলে যে?

খানিকটা বসি। ক'রাত পরপর উজাগর গেছে, ঘুম নাই। শরীলটা কাহিল।

না এলেই হত!

যেন ঘোর থেকে জেগে উঠল রাইবু। না ন্না, কাহিল কী, চ!

ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর গিরগিটির মতো গুটিগুটি রাইবু আর গুড়গুড়িয়া সুখজুড়ির মাঠের দিকে এগুচ্ছে। একসময় চিমটি কেটে গুড়গুড়িয়াকে জানান দিল রাইবু।

কী?

শুনতে পাচ্ছিস?

ঘণ্টির আওয়াজ ত?

হঁ, চরানে বাগালরা হল্লা কচ্ছে।

সুখে আহ্লাদে গুড়গুড়িয়া বিড়বিড় করে বলল,

রাম-লখোন দুই ভাই
বাণ মারে ঠুই-ঠাই।

সুখজুড়ির মাঠে পড়ন্ত বেলার রোদ গড়াচ্ছে, তার ভিতর চরানে ছা-ছানার ভিড়। গরু-ছাগল আপনার মনে চরে খাচ্ছে। ধারেই জঙ্গল, আঁটারি-কুড়চির ঝোপ। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আর কিছুদূর হাঁটা দিলেই রুখনীমারা। দিল্লীশ্বর মাহাতোর দোতলা টিনের ছাউনি ঘরের টুই দেখা যাচ্ছে। টুইয়ের উপর টিনপাতের মোরগ হেলছে দুলছে।

গুড়গুড়িয়া ঝোপের ভিতর নিজেকে লুকিয়ে রেখে দু'চোখ ভরে দেখছে। ওর দু'চোখের দেখা এখন দূরবীনকেও ফেল মারে। বর-বরিয়াতি লতার উপর হলুদ আর ছাইরঙের গিরগিটি, মাথা তুলে গুড়গুড়িয়াকে দেখছে।

গুড়গুড়িয়া বলল, স্যাঙাত?

গিরিগিটি বলল, হুঁউ বল-অ!

আরেক ঝোপ থেকে রাইবু ফিসফিস করে বলল, ধুস, বেড়ে চালাক আছে ত খাসিগুলা! মসমস করে পাল্‌হা খাচ্ছিল ঝোড়টার একদিকে, যেই দেখল অগ্নি ম্যা ম্যা করে দৌড়।

গুড়গুড়িয়া বলল, রাস্তার উ দিকে যাও, লোকজন দেখ-অ। পার ত ছানাগুলাকে ভুলাও।

রাইবু হামা দিয়ে রাস্তার দিকে বেশ কয়েকটা ঝোপ পেরিয়ে এল। তারপর খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতেই রট করে আওয়াজ, যেন কোমরটা ভেঙে গেল। এখন চারপাশ চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে। মানুষ-উঁচু ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে সুখজুড়ির মাঠ, মাঠ ভরতি গরু-ছাগল, চরানে ছা-ছানারা। আর ত্যামন চোখে পড়ে না। গলার যা আওয়াজ পাচ্ছে। চট করে রাইবু রাস্তায় নেমে হাঁটতে থাকল রুখনীমারার দিকে। একদম ভালমানুষের মতো, যেন আপনার কাজে গাঁয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়েই চরানে ছা-ছানাদের দিকে চট-জলদি তাকাল। রাইবুর চোখে পড়ল চ্যাঙ-চ্যাঙে কালো খাসি জঙ্গলের সঙ্গে বড় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে পাতা খাচ্ছে। এ-সময় তার কালো কালো সরষেদানার কথা মনে এল। একমুঠো দ্রব্য দাও ঢুকিয়ে জীবটার কানে, ঘুরে ঘুরে জীবটা টাটকা-টাটকি মরে যাবে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনও।

কিছুদূর হেঁটে গিয়ে রাইবুর মনে এল, পার ত ছানাগুলাকে ভুলাও। গুড়গুড়িয়া বলেছে। ভুলানোর চেষ্টা করে রাইবু দেখবে কী?

ফিরে আসছে রাইবু। যাহোক করে তাক লাগিয়ে দেবে চরানে বাগালগুলোকে। আর সেই ফাঁকে কাজ হাসিল করে গুড়গুড়িয়া কেটে পড়বে। ফিরে এসে দেখল, ছেলেরা দুটো লাইন করে মাঠের এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, প্রত্যেকের হাতে প্রায় একহাত লম্বা কাঠি। রাইবু বুঝল, এবার কাঁঠিনাচ হবে, নাচতেও শুরু করল। কাঠিতে কাঠিতে ঠোকাঠুকি, আর নাচ আর গান। কে যেন বলল, মহেনকামার যে'রম করে গায়, বকা সে'রম করে গা দেখি। রাইবু শুনতে পাচ্ছে, বকা গাইছে,

উপরে সুরুযের আলো নিচে তাতা বালি।
চলিতে না পারেন সীতা করিছেন বিকলি।।

ভুলেছে, ভুলেছে। দু'হাতের চেটোয় তালি ঠুকে রাইবু পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। আর ঠিক জঙ্গলে ঢোকার মুখে সে দেখল, কালো চ্যাঙচ্যাঙে খাসিটা কার টানে হড়াৎ করে ঢুকে যাচ্ছে লোধাঝোড়ের ভিতর। আর কে রুখে, রাইবু নিমেষে গুড়গুড়িয়ার কাছে। বোকা একগুঁয়ে ছেলেটা ততক্ষণে কব্জা করে ফেলেছে। দু'হাতে মুখটা চেপে নিজের সমস্ত ভার জীবনটার পেটের উপর ছেড়ে দিয়েছে। রাইবু গিয়ে বাকী কাজটা করে দিল। গুড়গুড়িয়ার পায়ের কাছে পড়ে থাকা টাঙিটা হাতে নিয়ে জীবটার ব্রহ্মতালুতে দু'তিন ঘা, দিতেই জীবটা ছটফটিয়ে মরে গেল। দু'চোখ চকচক করে গুড়গুড়িয়া বলল, তব্বে!

হেঁ মা'জন, সরু চাল আছে?

দোরখুলির বঙ্কা মাহাতো তার ভূষিমালের দোকানে বসে ঘরের জন্য লম্পোতে তেল ভরছে, চুঙিতে পলা করে তেল ঢালার বুগবুগ আওয়াজ, তাছাড়া খদ্দেরের ভিড়।

শুনতে পেল না।

রাইবুলোধার বউ শিশুবালা ফের বলল, হেঁ মা'জন আছে?

কী?

সরু সরু চাল।

কী বল্লি?

দোরগোড়ায় দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়ে শিশুবালা বলল, কালা নাকি?

বঙ্কা মাহাতো শুনল, শুনেও হাতের খদ্দের ছাড়ল, তারপর বলল, আছে কিন্তুক আগের টাকা দে আগে।

শিশুবালা আঁচলে বাঁধা দুটো দু'টাকার নোট নখ দিয়ে টিপে দেখল, ঠিক আছে। তারপরেও আঁচলের খুঁটটা কোমরে গুঁজে রাখল।

কাঠকুঠা দিয়ে শোধ দিব-অ মা'জন, এখন সেরটাক দেও।

উসব বুজরুকি ছাড় লোধানী, টাকা না ফেললে চাল আর দিচ্ছি নাই।

হাসল শিশুবালা। বলল, তা'লে কী খাব মা'জন?

তার আমি কী জানি।

সর্ব্বেশ্বর মাহাতো এতক্ষণ খাটিয়ায় বসে স-ব শুনছিল, সুযোগ বুঝে বলল, হেঁ বঙ্কা, রাইবু কি চুরি-চোট্টামি ছেড়ে দিল?

লোধানীকেই শুধাও! বঙ্কা মাহাতো হাসল।

রাগে রি-রি করছে গা শিশুবালার, তবু হেসে বলল, না মা'জন উ-সব কাজে রাইবু কুনোদিনও ছিল নাই, আর থাকবেও নাই।

একঝুড়ি শুঁটকীমাছ বঙ্কা মাহাতোর ছোটবেটী দোকানে রেখে গেল বিক্রীর জন্য। শুঁটকী মাছের গন্ধে সর্ব্বেশ্বর মাহাতো আর শিশুবালার একযোগে জিভে জল ঝরল।

সর্ব্বেশ্বর 'চোর' থেকে 'শুঁটকী'তে চলে গেল।

কত করে কিনলি?

বঙ্কা দর বলল।

কার কাছে? বিপিন বিশোই?

ধরেছ ঠিক।

ততক্ষণে শিশুবালা শুঁটকী ছেড়ে পাঁঠার মাংসে চলে গেছে। ডুবুডবু বেলায় লোকটা বেরিয়েছে, ফিরল কি?

খোঁচা দিয়ে শিশুবালা বলল, দিবে ত দেও মা'জন।

বলচি না।

শিশুবালা আর দেরি করতে পারল না, সন্ধে হয়ে আসছে। আঁচলের খুঁট খুলে দুটো নোট বাগিয়ে ধরল, দেখে নেও। ফের বেশি দিলম নাই ত?

টাকা নিয়ে বঙ্কা মাহাতো বলল, কালকে ক'গোছা পাতা আর দাঁতন এনে দিস ত।

দিব-অ। এখন চাল দেও।

চাল নিয়ে শিশুবালা তড়িঘড়ি উঠে গেল। সে এখন দোরখুলি ছেড়ে কিছুটা উটকো মাঠ বুলান-হদহদি আর কুচো জঙ্গল পেরিয়ে লোধাপাড়ায় উঠে যাবে। সন্ধ্যে হতে আর ত্যামন দেরি নেই, কাকপক্ষীরা ফিরছে।

বঙ্কার ঘর থেকে বেরিয়ে শিশুর মনে এল, আচ্ছা সে যদি বঙ্কার বউ হত? বঙ্কা মাহাতোর বউ? তার খুবই সুখ হত। হত কী? বনে-জঙ্গলে সাপখোপের ভিতর এটা-ওটা টুঁড়তে হত না, দিব্যি খেতে পেত, সরু সরু চিকন 'চাউড়ের' ভাত। শাড়ি ব্লাউজ, কত কী পরতে পেত কাপড়-চোপড়। ভরপেট খেয়ে দুপুরে ভাতঘুম, রোদে-রোদ্দুরে ঘুরতে হত না। আড়বেলায় রূপার গাড়ু থেকে এক খিলি সাজা পান, দক্তা মিশানো, মুখেপুরে এবাড়ি-সেবাড়ি ফুরফুর ঘুরে বেড়ানো। খালি যা রাত হলে তুলোর তুল্য বিছানায় বঙ্কার দরুন শুয়ে থাকা—

—উ-ল-টু-টু! —ল-টু-টু!—টু—টুউ-উ-উ—! শিশুবালার চিন্তাটাকে পাখির ডাকটা কেটে দিল। সে এখন পাখিটার, সেই সঙ্গে রাইবুর কথাটাও ভাবছে। রাইবু তা'লে এই পাখিটার কথাই অত করে বলে? আজ সকালেও বলেছে। বনের পাখ তুমি, তুমার ডাকে দ্যাখো আমার পাপ চিন্তাটা ধোঁয়ার মতন উবে গেল। এতক্ষণ কত কী হাবিজাবি ভাবছিলম। রাইবু-ই জঙ্গল-মহালের রাজা, রাইবুর তুল্য মানুষ সংসারে মোটেও নাই। এসব ভেবে শিশুবালা এখন আগের ভাবনাটাকে চেপে দিচ্ছে।

আর এসময়ই ভুবনালোধার বউ কুচোজঙ্গল আর বুলান-হদহদি ফেলে রেখে এদিকেই আসছে, আসছে দোরখুলির দিকে। সামনা-সামনি হতে হাসল।

কোত্থেকে আনলে? দোরখুলি? বঙ্কার ঘর থিক্যে? দেখি ত, কির'ম চাউড় দেখি?

শিশুবালা দেখাল। বলল, কিছুতেই দিবে নাই দিদি। নগদা চাট্টাকা দিতে সেরটাক দিল।

চাট্টাকা সের, বলছ কী?

সরু সরু চাল যে।

ওর'ম চাল বঙ্কা মাহাতো মাগনাই দিবে। বলে তাচ্ছিল্যভাবে ভুবনবউ হাঁটতে থাকল।

বেলা এখন জঙ্গলে দেপে বসে যাচ্ছে।

আসতে আসতে আচমকা ঘুরে ভুবনবউ ফিক করে হেসে ফেলে, তারপর চেঁচিয়ে বলল,

যাও, মরদ তুমার ভাল্লমত তরকারির যোগাড় দিঞেছে।

শিশুবালা শুনতে পেল কী পেল না, কুচোজঙ্গলটার ভিতর ঢুকে গেল। হিল হিল করে হাওয়া দিচ্ছে আঁটারি-কুড়চির ঝোপেঝাড়ে, ডগাগুলো হাতিশুঁড় কী লাউডগী সাপের মতো দুলছে। মাথার উপর চালের পুঁটলী বাঁধা আঁচলটা, দু'হাত জড়ো করে শিশুবালা নমো করল। সুখে থাক-অ সুখে রা-খ-অ জঙ্গল-মা, তোমার রাজত্বে ছা-ছানারা ভাল থাক। মনের ভরমে পাপ চিন্তা করেছি, তা'বলে ক্ষেমা দেও।

কী মনে হতে শিশুবালা দৌড়ুল।

দোরখুলির রাস্তায় এখন ধুলো, গরুবাছুর ফিরছে। পিছু পিছু জন-মানুষ এলে ধুলোয় ঢেকে যাবে, ভুবনের বউ ঢেকে গেল।

আঁচলের এক খুঁট নিয়ে নাকের নিচে এতক্ষণ এপাশ-ওপাশ করছিল, এখন পুরোপুরি নাক-মুখে চেপে দিল। বিড় বিড় করে বললও, মর্ না নির্বংশার ধুলা!

আচমকা একটা গরু আরেকটা গরুর পিঠে হুড়মুড়িয়ে উঠে যেতে গোটা দলটা ভিড়কে গেল। তার হেপা সামলাতে লোধানীকেও ছিটকে আসতে হল পিছনে। পিছনে, পিছনে। চরানে বাগালরা কিন্তু নির্বিকার, যেন এদৃশ্য তাদের জল-ভাত। মাঠে-বাটে তো হামেশাই হচ্ছে, হচ্ছে না?

প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল লোধানী, পরক্ষণে হেসে ফেলল। সেই থেকে মুখ টিপে হাসছে, বঙ্কা মাহাতোর দোকানে ঢুকেও ভুবনবউ ফুলটুসি হাসছিল।

হাসছ যে?

হাসি বন্ধ রেখে লোধানী বলল, তেল দেও, ক্রাসিন। কোমর থেকে দড়িবাঁধা শিশি বের করে হাতে দিল লোধানী। দিয়েই হাসল।

ফের হাসছ?

ঋাসরে কী শুঁকামাছের গন্ধ! চাট্টি দেও দোকানী।

আগে বল-অ হাসছ কেনে? বঙ্কার স্বর বড় মোলায়েম।

লুঙ্গি পরে বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে খিঁচে নিল। নিয়ে ফের বসল।

কই ব-ল-অ?

অত্তো কথায় কাজ কী, চাউড় দেও। যে চাউড় রাইবুর বহুকে দিলে।

চালটাল দিয়ে বঙ্কা ফিস ফিস করে বলল, যাও, আমি যাচ্ছি।

দোকানে আরো দু'চারজন খদ্দের ছিল, তাদের বলল, জলের দিকে যাচ্ছি, ফিরে এসে দিব। খানিক দাঁড়াতে হবে।

দাঁড়াব, তুমি যাও। জল-ঘাট যাবে, বাধা দিলে চলে?

ঝাঁপ বন্ধ করে বঙ্কা ঘরের দিকে গেল। তারপর, ঘটি হাতে বেরুল।

রাস্তায় নেমে আরেকজনকেও যেতে দেখল বঙ্কা মাহাতো, তারও আগে আরেকজন। নুড়ো জেলে বৈকুণ্ঠ 'আই-আর-এইট' ধানের ক্ষেতে যাচ্ছে পাহারা দিতে, তার আগে লোধানী। চালের পুঁটলি মাথায়, অন্ধকারে মনে হচ্ছে, ছায়া যাচ্ছে।

বৈকুণ্ঠকে দেখে মন খারাপ হ'য়ে গেল বঙ্কা মাহাতোর। না হয় পেকেছে, তা বলে সাত-তাড়াতাড়ি জাগতে যাবার দরকার কী? মন খারাপ একটুর জন্য, পরক্ষণে মনে এল, বৈকুণ্ঠ তো যাবে বাঁদিকে ঠাকুরবাঁধে।

গলা খাঁকারি দিতেই বৈকুণ্ঠ পিছন ঘুরল।

বঙ্কা?

হঁ বৈকুণ্ঠ।

কোথায়?

এই জলের দিকে, জল-ঘাট।

অন্ধকারে আর কদ্দুর যাবে, কাছাকাছি বস-অ।

বসচি বৈকুণ্ঠ।

আর খানিকটা হেঁটে বৈকুণ্ঠ বাঁদিকে গড়ানে নেমে গেল। আর তার পরেই বঙ্কা মাহাতোর দৌড়। দৌড়ে জঙ্গলের মুখটাতে লোধানীকে ধরে ফেলল।

আর পারছি নাই লোধানী, ফাঁকা দেখে কোথাও শুয়ে পড়-অ।

শুয়ে পড়ে ফুলটুসি বলে, এ জঙ্গলে লোতুন, কী পাখ দোকানী বল-অ ত?

পাখ? কোথায়?

শুনতে পাচ্ছ নাই?—টি-ট-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! কির'ম ডাকে!

বড়ো ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বঙ্কা বলে, ধুস, কোথায় কী, মনের ভ্রম!



বড়খাঁকড়ির হাট, নদী পেরুলে লবকিশোরপুর, আর তার পরেই বড়খাঁকড়ির হাট, বসে প্রতি শুক্কুরবার। বন ঢুঁড়ে কিছু ছাতু পেয়েছিল রাইবু, যাকে বলে ব্যাঙের ছাতা। তার কত রকম নাম,—কাড়ানছাতু-পরবছাতু-কুড়কুড়িয়া-বড়বালি-ছোটবালি! ঠিক রাইবু না, জঙ্গল ঢুঁড়ে বউ শিশুবালাই পেয়েছিল, বড়বালি ছোটবালিতে মেশামেশি। তাই নিয়ে রাইবু হাটে এসেছে বেচতে।

দুপুর দুপুর এসেছে, হাট বসতে আরো খানিকটা বাকি। গামছায় বাঁধা ছাতুর পুঁটলিটা হাতে ঝুলিয়ে রাইবু ঘুরতে থাকল। বড়খাঁকড়ি হাই-ইস্কুলের ওদিকটায় ঘুরে এসেছে, কী বড় ইস্কুল! ভিতরেও গেছে একদিন, টিপকল থেকে জল টিপে খেতে, গুড়গুড়িয়াও ছিল সঙ্গে। নাকি গরমেন্ট লোধাদের জন্যে লোধাপাড়ায়ও এর'ম ইস্কুল খুলবে, একথা রাইবু শুনে আসছে তো বহুৎদিন।

ডিসপেনসারির কাছেই একটা মস্ত অর্জুনগাছ, তার তলায় বসে রাইবু শালপাতার চুটা, মানে বিড়ি ধরাল। দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ফুসফুস, ছাড়তে ছাড়তে তার মনে এল, এই ধোঁয়া দিয়ে গোটা জগৎটাকে ঢেকে দেবে। দ্রুত টেনে দ্রুত ছাড়তে থাকল ধোঁয়া, চুটা ফুরালে ফের চুটা ধরাল। একসময় ধোঁয়া ডিসপেনসারির গা অব্দি পৌঁছালে রাইবু আপনার মনে হাসল, পুচুর করে একদলা থুতু ফেলে বলল, শাল্লা!

ডাগতরখানায় মাগনা ওষুধ দেয়, পয়সাকড়ি লাগে না—এ খবর রাইবু জানে। জানলেও সে কোনদিন ওষুধ খায় না, তার ত্যামন অসুখ হয় না, আর হলেও বনের লতাপাতা শিকড়বাকড় আছে। অর্জুনতলায় বসে রাইবু এখন ভাবছে, ওষুধের বা গুণাগুণ কী? কি র'ম স্বাদ? ডিসপেনসারির সাদা সুন্দর মতো ঘরটার দিকে তাকিয়ে থেকে তার তলপেটে বুড়বুড়ি কাটল। সে দুচাট্টা বুড়বুড়িকে ভুলিয়ে রাখতে আকাশে ভাসমান পক্ষীর দিকে তাকাল, আর বিড়বিড় করে বলল,

শবর চরিত

ক্যারকেটা আমার বেটা

ঢেপচু আমার নাতি—

ডিসপেনসারির অদূরে টালির চালঅলা মাটির ঘর, উপেন কমপাউন্ডারের বাসাবাড়ি। রাইবু দেখল, ডাগতরবাবু গলায় নল ঝুলিয়ে ডাগতরখানায় আসছে। মাথার মধ্যিখানে চকচকে টাক, চুল নেই। পরনে নীললুঙ্গি, খালি গা, টায়ারের ফিতে আঁটা কাঠের খড়ম। খটখট আওয়াজ তুলে আসছে, চোখে-মুখে সুখী ঘুমের ছাপছোপ। তাকে দেখে রাইবুর তলপেটে আরো অজস্র বুড়বুড়ি নাচন-কুদন জুড়ে দিল। সে আর থাকতে পারল না, মুহূর্তের জন্য তা ভুলেছিল যখন কম্পাউন্ডারের শাড়িপরা মেয়ে ছুটতে ছুটতে বাপের ফেলে আসা চশমাটা দিয়ে গেল। দেখেই রাইবু ভেবেছিল, এর'ম মেয়েকে 'বেহা' করে সুখ। আর তারপরে পাপ চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে লদোপদো দৌড়ুল। হাটের কাছেই কুসমীখাল, তার পাড়ে চাকুন্দা ঝোপঝাড়ে রাইবু জল-ঘাট সারল। ক'দিন ধরে হাবিজাবি খেয়ে পেটটা খারাপ যাচ্ছে তার।

হাটের কাছাকাছি আসতে না আসতেই ফের বুড়বুড়ি। রাইবু দেখল, ডাগতরখানা ভরে গেছে রুগীমানুষের ভিড়ে, সেও একজন রুগী হ'য়ে তাদের ভিতর ভিড়ে গেল।

কী হ'য়েছে?

পেটটা ভাল নাই ডাগতরবাবু।

ব্যথা কচ্চে?

জল কাটছে, বুড়বুড়ি।

উপেন কমপাউন্ডার পেটটা খিমচে ধরতেই রাইবু আঁতকে উঠল।

অত্ত চাপ দিবেন নাই ডাগতরবাবু, রোগাভোগা মানুষ, কী খাই?

সব দেখে উপেন কমপাউন্ডার বলল, ক্রিমি।

তা'লে কী হব্বে? রাইবু জোড় হাত করে বলল।

অ্যান্টিপার ছ'চামচ খা, সেরে যাবে।

রাইবু হাঁ করলে, একটা ছোট শিশি উপেন কমপাউন্ডার উপুড় করে ঢেলে দিল।

তোর পুঁটলিতে কী?

মিষ্টি ওষুধ তখনও জিভে চাটছে রাইবু। বলল, ছাতু।

ছাতু? আই মীন ছত্রাক, এ কাইন্ড অব ফাংগাস? মাশ্‌রুম্‌?

রাইবু কী বুঝল, বলল, লিবেন?

না, তুই হাটে বেচ, দু'পয়সা পাবি।

তুমি ভালমানুষ, তুমাকেও দিতে মন চায় ডাগতর।

আরেকদিন দিস, আজ হাটেই বেচ। উপেন কমপাউন্ডার হাসল।

খুলে ফেলেছিল রাইবু, ফের বাঁধতে গিয়ে শুনল, ডাগতরবাবু পাশে বসা আরেক বাবুলোককে কী সব বলছে।

দে আর ভেরি সিম্পল্‌ এন্ড ইনটারেস্টিং। তুমি আদিত্য, এদের নিয়েই তো লিখতে পারো?

বাবুলোকটি বড়খাঁকড়ি হাই-ইস্কুলের মাষ্টার, এতক্ষণ চোখের উপর বই রেখে পড়ছিল, রাইবুকে বলল, কি নাম?

রাইবু পুঁটলি বেঁধে বলল, কী-ই আবার, রাইবুলোদ্ধা।

কি করো?

রাজত্বি।

উপেন আর আদিত্য দু'জনেই হাসল খানিক হো হো করে।

হাঁসছেন? লোকে ত বলে, রাইবুই জঙ্গলমহালের রাজা। ঘুঁমায় ঘুঁমায়ও দেখতে পাই, হাতির পিঠে চলেছি, দু'ধারের লোকজন নমো কচ্চে।

আর হাসতে না পেরে উপেন কমপাউন্ডার বলল, এবার যা, হাট তোর বসে গেছে।

হাটে এসে ছাতু বেচতে খুব বেশি সময় লাগে না রাইবুর, নগদানগদি দু'টাকা হাতে এসে গেল। খানিক নুন কিনল, হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিতে কিছুটা সরষে তেল। তারপর হাট থেকে বেরুবার মুখে ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে দেখা।

কবে আইলে গো তৈলকবাবু?

এই তো গতকাল রাইবু, তারপর?

তা'পরে আর কী, কুনোরকম—

শিকার-টিকার চলছে? তোর সেই চোরাই বন্দুকটা? আছে তো ?

চারপাশ দেখে নিয়ে রাইবু বলল, আছে।

একদিন খরগোশ মারতে যাব, রেডি থাকিস।

টিপা-লাইট এনেছ ?

এনেছি রাইবু, এক-আধ ব্যাটারীর নয় একদম পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ।

তা'লে ত আলোয় আলোময়।

যাব্বার আগে দু'চারখানা ছর্‌রা দিবে ত তৈলকবাবু?

এক-একটা ছর্‌রার যা দাম রাইবু, তবু দেব। আগের বার তো দিয়েছি, দিই নি?

তা দিয়েছ। তা'লে যাই তৈলকবাবু?

যা।

বড়খাঁকড়ির হাট থেকে বেরিয়ে রাইবু মাঠ ভাঙল কিছুটা, এসব মাঠ কার্তিকছোলা জামাইনাড়ু ধানের মাঠ, এখন ধান নেই, শুকনো মাঠে খড়ি উড়ছে। মরাহাজা ট্যাঙট্যাঙে গড়কাটার খাল, বর্ষায় এর হুজ্জুতি-বা কত, রাইবু টুরটুর করে গড়কাটার খাল পেরিয়ে হাসল, ডাগতরখানায় আজ সে খুব মজা করেছে।

হাটুরে লোকজন যাচ্ছে আসছে এদিক সেদিক, লবকিশোরপুরের দিক থেকে এইমাত্র একটা লোককে দৌড়ুতে দেখল রাইবু, খালি গা, হাঁটুর উপর লুঙ্গিটা ঢেউয়ের মতো উড়ছে। কত লোকের কত রকম কাজ, রাইবু অত গা করল না। তারপর যখন দেখল, লোকটা দৌড়ুতে দৌড়ুতে এদিকেই আসছে, আর তাকেই ডাকতে ডাকতে আসছে, তখন ভয় পেয়ে দৌড়ুল সে-ও। তাকে দৌড়ুতে দেখে লবকিশোরপুরের দিক থেকে দৌড়ে আসা লোকটা নিমেষের জন্য থমকে দাঁড়াল। আর তখনই লোকটাকে চিনে ফেলল রাইবু, লবকিশোরপুরের মনা মহাজন।

নদীবালিতে এসে মনা মহাজন রাইবুকে ধরে ফেলল।

ছিঃ রাইবু, অতটা ছ্যাঁচড়ামো মানুষের সঙ্গে করে?

কী, কী হ'এেছে মনা মা'জন, অমন দৌড়াতে দৌড়াতে আইলে, খুলে বল-অ দেখি?

ধ্যাস্টামো করিস না, তোর উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল রে রাইবু, অমন বিশ্বাসে তুই কী না বিষ দিলি?

হায় দেখ-অ, অবিশ্যাসের কী করেছি, খুলে বলবে ত?

লুঙ্গির গিঁট খুলে ফের গিঁট বাঁধল মনা সাউ। বলল, খুলে বলবটা কী, তুই তো সব জানিস রাইবু।

এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি মা'জন, কিচ্ছু জানি নাই, কিচ্ছু শুনি নাই, তুমি যে কী বলছ!

জানিস না?

নাই মা'জন, মিছা বলছি নাই, বিশাস কর-অ।

সূয্যি ডুবছেন, অই পশ্চিমে জোড় হাত করে বলদেখি, তুই কিছু জানিস না?

পচ্ছিমে কেনে, পুব-পছিম-উতর-দখিণ যে দিকেই নমো করে বলতে বলবে বলছি, আমি কিছু জানি নাই মা'জন।

আর অবিশ্বাস হল না মনা মহাজনের, লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলল, যে বারটা শালবল্লা দিলি, সেই রাতে সেই বারটাই কে ফকোটে মেরে দিল, বল্লে কী বিশ্বাস করবি?

তা করব নাই মা'জন, কিন্তু কে এমন করল? জ্ঞাতি-গুষ্টিদের ভিতর কাউকে সন্দ হয়?

কী করে বলি বল? অমন দরকারী জিনিস, অতগুলো টাকা?

উ-সব ভেবে মন খারাপ কর-অ নাই মা'জন, আর বারটা দিব-অ, টুকচার কম দামেই দিব-অ।

তাই দিস রাইবু, বড়ো উবগার হয়।



ঘোড়াটাপুর জঙলে দুপহরবেলা কার ছাইলা কাঁদে, অঁ-হাঁ অঁ-হাঁ? ছাইলা কাঁদে কেনে বলদেখি? ভুবনালোধার মন বলে, দুদ্দুর ছাইলা ফের কাঁদে নাকি? উসব মিছাকথা, বদলোকেদের ফিক্কিরবাজি, যাতে দুপহরবেলা জঙলে তুমি নাই সেঁধাও।

ভুবনলোধা ঠিক দুপুরবেলা ঘোড়াটাপুর জঙ্গলে আলু খুঁড়ছিল। মাটি ত্যামন নরম নয় যে হাতের শাবল হুসহুস ঢুকে যাবে, কষ্ট হচ্ছিল। তার উপর শিকড়টাও বেয়াড়া, এদিক সেদিক ঢুকে গেছে, আলতু-ফালতু ছেড়ে এখন মূল শিকড়টাকে খোঁজো। খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি, তালাশ পেলে তবে খোঁড়ো, ভুবনলোধা সেভাবেই খুঁড়ছিল। তো হঠাৎ কী হল, শাবল ছুঁড়ে ফেলে গাছ দেখছে রুমরুম। পা ফাঁক করা দৈত্যের তুল্য জোড়া পিয়াশাল, তাকে আঁকড়ে আঁউলা-ঝাঁউলা বনআলুর ঝাড়। ভুবন জানে, এসময় জঙ্গলে নানান জাতের খামআলু-পানআলু-চুরচু-ছাগলআঁতি, আরও কত হেনতেন। পোড়া সিদ্ধ যে করেই খাও তোমার সোয়াদ থাকছে। লোধাপাড়ায় প্রত্যেকে খায়, হাবিজাবি চাই কী বাবুলোকরাও আকছার কিনছে, জলখাবার হিসাবে জমেও বেশ।

ভুবন যেখানে বসে আলু খুঁড়ছিল তার চারদিকে শাল-আসন গাছ। এসব গাছের রসে ধুনো হয়, যে ধুনো দ্যাবতার চরণে সেবা লাগে, তাও বেচে ভুবনলোধা দু'চার পয়সা পায়। আসনগাছে তসরপুতলী ভাল গুঁটি বাঁধে, তসরগুটি বাবুরা চড়াদামে কিনেও। চারদিকে পাতাপতর দেখতে গিয়ে ভুবনলোধা ভাবে, ভগবানের সংসারে কোন্ দব্যটা বা ফেলান যাচ্ছে বলদেখি? কিছু না। সামান্য কেঁদুপাতা, তাই দিয়েও ত বিড়ি হচ্ছে, হচ্ছে নাই?

বিড়ির কথা মনে আসতে ভুবনের কানে হাত। এই দেখ একেই বলে মানুষ অভ্যাসের দাস। এত থাকতে কানের ভাঁজ কুটকুট করে কেন? না আধপোড়া বিড়ি কানের খাঁজে গুঁজে

রাখা ভুবনের স্বভাব, হাত আপনার মনে উঠেও যায়। দ্রব্যটা হাতে নিয়ে ফুঁকে ফুঁকে দেখে সারবস্তু আছে না ফোপরা? আছে। দেয়াশলাই জ্বেলে ভুবন এবার মউজে বিড়ি টানে ফুকফুক, মাত্র ক'টান, আর তার পরেই তো শব্দটা তাকে কব্জা করে ফেলে। —অঁ-হাঁ! একবার, ভুবন দু'হাতের ধুলোবালি ঝেড়ে নিজেকে শক্ত রাখে। দুদ্দুর, ছেলে ফের কাঁদে নাকি? উসব মিচ্ছাকথা, বদলোকেদের ফিকিরবাজি, যাতে দুপহরবেলা জঙ্গলে তুমি নাই ঢোকো। অঁ-হাঁ—। দু'বার তিনবার বারবার। ভুবন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচায়, ফুলটুসি, এ ফু-ল-টু-সি...

ভুবনলোধার বউ ফুলটুসি কাছে পিঠে কোথাও কাড়ানছাতু-কুড়কুড়িয়া কী পরবছাতুর সন্ধানে ছিল, ভাতঅলা কুরকুটও খুঁজছিল। ছাতু বল-অ কুরকুট বল-অ, সব তোমার ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে, চিরে কুটে দেখতে হয়, ঝোলেঝালে যে ভাবেই খাও মোটমাট সোয়াদ থাকছে। ভুবনের বউ কুরকুটঅলা উঁচু গাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে শব্দটা শোনে, আর চোখেও দেখে। সে তো ভেবে মরে, অমন পাখ-পাখালির ছানাও মানুষের তুল্য কাঁদে? কাঁদে কী কাঁদছে! ভুবনবউ ফের ঘাড় লম্বা করে দেয়, তারপর তাউত করে দেখে, ঢ্যাঙা ঘাড় কাঁড়াল-কোঁড়ল ছানাগুলো আঁকপাঁক করে, গুগনির ছানাই হবেন। ফুলটুসি পাখি ছেড়ে এবার কুরকুট দেখে, তেনারাও আছেন বাসায় তেনাদের, এত্ত উঁচুতে যে লোধানীর মনে সুখ থাকে না, না'লে জল এতক্ষণে উছলে উঠে আসত জিভে! ভুবনের বউ তবু চেষ্টা ছাড়ে না, আপনার মনে দ্রব্যটা বাগে আনবার ফন্দি খুঁজে, আর তক্ষুণি পাতাপতর ফেড়ে ডাকটা ফুলটুসির কানে বিঁধে যায়। —ফুলটুসি, এ ফু-ল-টুসি...। ডাক শুনে ঘাড় উঁচিয়ে ফুলটুসি বারবার পাখি দেখে আর কুটকুট করে হাসে।

বউ কাছে এলে ভুবন ভরসা পায়, তার ধড়ফড়ানি থামে, খানিক আগের অবস্থা বউকে বলতে মন যায় না, লজ্জা! তার বউ কিন্তু বুঝে, স-ব, মুখ টিপে হাসেও, তবু আসল রহস্য ভুবনের কাছে ভাঙে না। ভুবন ধীরেসুস্থে বসে পড়ে বলে, কঠিন মাট্টি বঠে রে ফুলটুসি।

লোধানী মাথা ঝাঁকায়, রা কাড়ে না, রা কাড়লে কুটকুট হাসি যদি মুখ ফস্কে খচাঙ করে বেরিয়ে যায়? সেই ভয়। ফুলটুসি শাবল হাতে এবার জোড়া পিয়াশালের তলায়, আলু খুঁড়তে লেগে গেছে।

ভুবন বলেছে ঠিকই, মাটি শক্ত, শাবল যেতে চায় না। তবে দু-এক ধাপের পরেই নরম, শাবলের চটা মাটিতে পড়ে যে আওয়াজ দিচ্ছে তার থেকেই ফুলটুসি বুঝে গেছে।

থামল একটু, কাঁধের কাপড় হাত বরাবর ঝুলে গেছে, তুলে ফেব কাঁধে ফেলল।

বাঁ হাতের বগল আর বুক চোখে পড়তে ভুবন চনমন করে জেগে ওঠে। শাবলের এক-একটা চটা আর ফুলটুসির গতরের হিলহিলানি, ভুবন ঘোরে পড়ে যায়। চাট্টি শাকপাতা আর ফলমূল, এসব খেয়েও গতরের ঝকমকানি কী করে থাকে! সে কিছুতেই ভেবে পায় না।

এক পা ছড়িয়ে বসেছিল, একপা গুটোনো, ভাঙা হাঁটুর উপর একহাত, আরেক হাত মাটিতে ঠেস মারা। এভাবেই ভুবন বউকে দেখছিল।

শাবলের গোঁত্তা দিয়ে বউ খানিকটা থম মারে, থম মেরে ফের উথলে ওঠে। এই যে থম মারা, মেরে উথলে ওঠা—এটাই ভুবনকে শেষতক কব্জা করে বসে, চনমন করে উঠে ঝোপের দিকে খানিকটা ঢুকেও যায়, বাউলার তুল্য কটা ডালপালা শুধুমুদুই ভেঙে ফেলে। ফের ফিরে এসে গুঁজ হ'য়ে বসা, এক দিগদারির কম্মো নয়? দোনোমনো হ'য়ে ভুবন বসে পড়ল।

আপনার মনে আলু খুঁড়ছিল ফুলটুসি, ভুবনের অত যে হেঁসরফেঁসর দেখতে পায়নি, এবার দেখল। এতক্ষণে শাবলও হুস হুস ঢুকে যাচ্ছে, ভুবনবউ ফের গা-গতর হিলিয়ে শাবলের গোঁত্তা মারল।

একসময় নেশা ধরে যায়, ঢ্যাঙা পায়ে দৌড়ে ভুবন ফুলটুসিকে ঝাপটে ধরে তার পিঠের উপরই বসে পড়ল।

পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে ফুলটুসি বলল, যাও ত যাও, রাদ্দিন খালি এ্যাই? খাবাবার মুরাদ নাই খালি লদ্ধাছনা খালাসের আশ, অ-রে!

ফুলটুসি গরগর করে রাগে।

পিঠ থেকে সরে গিয়ে ভুবন হাঁপায়, আর কোনো উচ্চবাচ্য করল না, হেনস্তা বলে হেনস্তা, এর'ম?

হাঁফ ধরলে আস্তে-উস্তে বলল, লোদ্ধাদের ঘেন্না করিস, নাই?

একথায় ফুলটুসি দরকচা মেরে যায়, ভুবনের ঠেস-মারানি কথা তাকে সাঁড়াশির তুল্য চেপে ধরল।

বাবুদের রকমসকম দেখে তোর বাবু হত্তে মনত্ যায়, নাইরে ফুলটুসি?

ফুলটুসি চুপচাপ, ভুবনলোধা এবার উঠল, উঠে ফুলটুসির সামনাসামনি বসে পড়ল।

—কিন্তুক জরাশবরের বংশধর, বেরাম্ভণের থিক্যেও বড়। বলতে বলতে খোঁড়া মাটি গোল্লা করে এদিক-সেদিক ছুঁড়ে ফেলার খেলায় খানিক মেতে থাকল।

তোকে বলি ফুলটুসি, ভগবান স্বয়ং একবার গাছে বসেছিলেন পা ঝুলাঞে, পদ্মফুলের পারা রাঙা পা দু'খান। ত জরাশবর মিরগির কান ভেবে কাঁড় ছেড়ে দিল-অ, আর সে-কাঁড়ে—

খানিক থেমে থেকে ভুবন বলে, আর সে-কাঁড়ে ভগবান মরে গেল। কিন্তুক বলে গেল, জরা রে তুঁই বেড়ে পুণ্যিমান, এবার থিক্যে তোর জাত হবে বেরাম্ভণের থিক্যেও বড়। ভুবন উঠে দাঁড়াল।

জানলি ফুলটুসি, ইসব কথা ভাল্লমতন বুঝতে গেলে তোকে যেত্তে হবে বড়সোলের গজনালোধার কাছে, উসব গজনা বলে ভাল।

ভুবনের বউ ফুলটুসি শাস্তরের কথা শুনতে শুনতে আলুটা হাতের কাছে পেয়ে গেল, এতবড় আলু এর আগে কোনদিনও দেখেনি, খুশিতে উথলে উঠে টেনে হিঁচড়ে তাকে তুলতে চায়, পারল না একা।

একসময় বিরক্ত হ'য়ে বলল, হাঁ করে দেখছ যে, মরদের পাবা হাত খুলে লাগতে পার-অ নাই?

দিনমান জঙ্গলে কাটিয়ে ভুবনের গা গতরে ব্যথা, বউকে বলেছিল জাড়ার তেল টুকচার উশুম-উশুম মালিশ দিতে, বউ দেয়নি।

লোধানীর সেই এককথা, খাবাবার মুরাদ নাই যে মরদের তার অত্তো রস কেনে?

নিজের উপর ধিৎকার ধরেছিল ভুবনের, বউয়ের কথায় হাত-পা রি-রি করলেও বলল না কিছুই। বললে ফুলটুসিও ছেড়ে দিত না।

চাটাইয়ে শুয়ে আধপোড়া বিড়িমুখে সে-সব কথা এখন ভাবছে।

মাগীকে হাটুয়াপাড়ার ভূতে কব্জা করল, সারকথা ভুবন তুই শুনে রাখ। ভুবনের মন ভুবনকে বলল। আর তক্ষুণি ঘুমটাও চটে গেল, নিমেষে কাড়বাঁশের তুল্য হয়ে ভুবন ফের শুয়ে পড়ল।

ছা-ছানার কেলর-বেলর তার কানে যাচ্ছে, খুট করে মনে এল, বড় উর্বরা ফুলটুসি, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খালাস দিতে পারে, অমন জিনিসও এদিক-সেদিক হ'য়ে যাচ্ছে? ভুবন ভেবে আর থলকূল পেল না।

বড় মেয়ে নুকু লেখাপড়া শিখতে আজকাল অনেক দূরের ইস্কুলে যায়, নাকি লোধাদের দরুন গরমেন্ট খুব ভাবছে!

ভাবে ভুবনও, ভাবে আর কুটকুট করে হাসে।

ধুদ্দুর, লোধাজাইতে উ-সব ফের করে কে? পেটের ভিতর ঢেউ ভাঙতেই ভুবন রান্নাঘরে।

রাঁধাশালে বউ ফুলটুসি কোলের বাচ্চাটাকে দুধ দিচ্ছিল, পাশে নুকু। শিলেট-পেনসিল হাতে, হজোবজো লিখলেও মুখ্খু ফুলটুসি ধরতে পারছে না। —ঠিকেই লিখছিস ত নুকু? বলে এক-আধবার হুঁকরে উঠলেও তার চোখ পড়ে আছে খিরিসতলার দিকে। আপনার মনে সে এখন হাসল।

জন-পক্ষ হলে এতক্ষণে চাঁদ উঠত, খিরিসতলা আলোয় ঝিঁঝরা হ'য়ে যেত। আজ সেসবের দেখা নেই, দু'চাট্টা বাঘযুগ্নী আলোর ফুড়গুনি জ্বেলে এদিক সেদিক চলে যাচ্ছে।

হাই তুলে ভুবন বলল, খিদ্দা পায় রে ফুলটুসি, খেত্তে দে!

বলামাত্র কোলের বাচ্চা ফেলে লোধানী উঠে গেল, বাচ্চাটা একা পড়ে চিল-চিৎকার করছে, ভুবন অতোশতো ধর্তব্যে নিল না।

খানিকবাদে এক গামলা জল-ভাত আর বন-আলু সিদ্ধ হাতের কাছে পেয়ে খেতে বসল।

ঘুমে ঢুলছিল নুকু, থম মেরে খানিক দেখল ফুলটুসি, তারপর গাঁক করে এক কিল।

মেয়েটা পিঠে হাত রেখে মুখ হাঁ'করে, আওয়াজ নেই।

চোঁক করে গামলার শেষ জলটুকু শুষে নিতে গিয়ে ভুবন বলল, ফুলটুসি যেত্তে দে. আমাদের জাইতে উ-সব ফের হয় নাকি?

কথা শুনে লোধানী আরেক কিল ঝেড়ে দিল, এতক্ষণে কান্নার আওয়াজটা হুরহুর করে উঠে আসে।

'ধ্যাত্তেরে' বলতে বলতে ভুবন গামলার ভিতর মুখ-হাত আঁচিয়ে নিল।

খানিকবাদে ভিতর-ঘর থেকে আগুনের ফুড়গুনি আসছে দেখে ফুলটুসি বুঝল, বিড়িমুখে ভুবন কোথাও বেরুচ্ছে। আলোয় এলে তার বগলে ভাঁজ করা চট আর হাতে ঝকঝকে দা দেখতে পেল ফুলটুসি।

ইসব লিয়ে ইর'ম সময় কুথা চল্লে?

ভুচুঙ করে বাইরে গলে গিয়ে ভুবন বলল, ধান্দায়।

ফুলটুসি হাঁ করে ভুবনের চলে যাওয়া দেখল খানিক, তারপর ফিরে এল।

নুকু ফের ঢুলছিল।

চোর লব্ধার ছানা চোর ছাড়া-বা কী হবে! বলতে বলতে নুকুকে মারধোর শুরু করল লোধানী।

আর করতেই সেই পাখিটা,—টি-উ-ল—টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! জঙ্গলের বুক চিরে লতাপাতার ভিতর দিয়ে হাওয়া কেটে কেটে ভেসে যাচ্ছে— উ-ল-টু-টু! —ল-টু-টু! -টু-টু-উ-উ—

কী মনে হতে লোধানী দু'হাত জড়ো করে নমো করল।

সাধুবাবার আশ্রম থেকে আধমাইলের ভিতর গুড়গুড়িয়া গাছ কাটছিল, করা-৮ ঃ করা-চ-অ—

টুকরো কাঠের কুচি কাটা জায়গা থেকে ছিটকে ঝোপঝাড়ের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল। তার শব্দ, গাছ কাটার শব্দ—এছাড়া আর কিছু ছিল না। গুড়গুড়িয়া সকাল-সকাল একটা জোয়ান

শালগাছকে বনভূমিতে ডালপালাসমেত ফেলে দিতে যাচ্ছিল, আচমকা তার হাতের বুড়িয়াটা নরসিঙ্গ গার্ডের হাতে।

তোর বাপের বন রে গুড়গুড়িয়া যে কাটছিস?

হকচকিয়ে গুড়গুড়িয়া দেখল, চারদিকে খাকী হাফ পেন্টুল, নরসিঙ্গা গার্ড একা নয়।

সে তার দু'পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, ছেড়ে দে নরসিঙ্গা!

ফরেষ্ট গার্ড নৃসিংহ মাহাতো দু'হাত বাঁধতে বাঁধতে বলল, আগে পাঁচকাহিনা বীট অফিসে চ, তারপর ত।

সীতানালা খালধারে দলবল এসে গেলে গুড়গুড়িয়া বলল, খুলে দে নরসিঙ্গা জল খাব।

হাঁ কর, ছরছর করে ছাড়ছি। কেউ একজন বলল।

গুড়গুড়িয়াও খচাণ্ড করে বলল, নিজের মুখেই ছাড় না নির্বংশা!

যে বলেছিল সে গুড়গুড়িয়ার পিঠে হাঁটু দিয়ে টুঁস মারল। খু-ব যে ফুটানি, চুরি করবি আবার বড় বড় বাত?

তা বলে মারবে তুমি? রাগে গুড়গুড়িয়া কাঁপছে। জেল-হাজত দেও, মারবে তুমি কুন আইনে?

নৃসিংহ থামল, জল খাবি খা, অতো বকিস না।

হাতদুটো বাঁধা, গুড়গুড়িয়া খালে নেমে ঘাড় নিচু করে জন্তুর তুল্য খেল, সীতানালার জলে তার প্রতিবিম্ব এখন ভেঙেচুরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। গুড়গুড়িয়া সট মারল বাঁ পায়ে, খানিকটা জল ছিরছার করে ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল সেই আবার জলে। দড়ির টানে গুড়গুড়িয়া ডাঙায় উঠে এল ফের।

যদি দেখা হ'য়ে যায় সোমবারির সাথে, এই জঙ্গলে? সে টঙস টঙস করে ঘুরে বেড়ায়, তার ভয় ডর নেই কোনও, তা'লে বলবে তাকে গুড়গুড়িয়া, হেঁ সোমবারি আমাকে দেখে তোর কুনোপ্রকার মায়া হচ্চে নাই, মায়া? গুড়গুড়িয়া স্পষ্ট শুনল সোমবারি বলছে, মায়া? চোর-ছ্যাচ্চড়কে অত্তো দয়ামায়া বা কীসের? আর তোর প্রতি তো আমার দয়ামায়া নাই রে গুড়গুড়িয়া।

কেনে নাই সোমবারি, আমি কী খারাপ?

খারাপ বলে খারাপ, তোর চোখ বলছে।

ওর'ম চোখ ত তোরও আছে সোমবারি, নাই?

ওর'ম চোখ তোর গেলে দিব-অ রে নির্বংশা! সোমবারির সেই কথাটা মনে পড়ায় গুড়গুড়িয়া এখন নিজেকে গুটিয়ে রাখল। আর এসময়ই নৃসিংহ মাহাতো তাড়া দিল ওকে, ওঠ রে গুড়গুড়িয়া, ক্যারিয়ারে ওঠ!

ছ' ছটা সাইকেল সাধুবাবার আশ্রমে জমা ছিল, তার একটাতে উঠে বসলে নৃসিংহ গার্ড সাবধান করল, পালাবি না গুড়গুড়িয়া, খবরদার!

সাধুবাবার সাক্ষাৎ পেল না, হয়ত ধ্যানে মগ্ন নিগমা মন্দিরে, সে তখন আপনার মনে বলল, ভাল আছো গো সাধুবাবা? এই দেখ-অ, কীর'ম বামালসুদ্ধ আমি চালান হ'য়ে যাচ্ছি পাঁচকাহিনায়, মন্ত্রের জোর থাকে তো রুখো। অনেক বলেছি সাধুবাবা, নরসিঙ্গা ছাড়ল নাই।

নৃসিংহ মাহাতো মুচকি মুচকি হাসছিল, পেটের কথা মুখে এনে বলল, রাইবুর বহিন সোমবারির সঙ্গে তোর কী সম্পক্ক, গুড়গুড়িয়া?

সোমবারির কথায় গুড়গুড়িয়া অস্থির হল, মুখে কিছু বলল না।

ফের খোঁচা দিল নৃসিংহ, বললে ছেড়ে দেবো, বল?

অন্ত কথায় কাজ কী নরসিঙ্গা, চোর ধরেছিস চালান দিবি। গুড়গুড়িয়া দাবড়ে উঠল।

ওঃ, তারমানে বলবি না?

কিছু না বলে গুড়গুড়িয়া পিছনের ক্যারিয়ারে গুঁজ হ'য়ে বসে থাকল।

বসে থেকে ভাবল, এখন লাফ মেরে বনে-বাদাড়ে দৌড়ুলে কী হয়, হাত দু'টো যা বাঁধা?

নরসিঙার লম্বা লম্বা পা, এক দৌড়ে ধরে ফেলবে, আর ধরে ফেললেই ঠ্যাঙাবে, অত সাহস গুড়গুড়িয়ার হল না, সে বসে থেকে তাই এখন গাছ দেখছে। দু'ধারে শাল-আসন গাছ, বর-বরিয়াতিলতার ঝোপকুঞ্জ। আর এভাবেই নারদা-চাঁদাবিলার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে পাঁচকাহিনার গর্ভে ঢুকে গেছে।

গুড়গুড়িয়া বুঝল, এই রাস্তাটা ফাঁকা, ফাঁকাই থাকে এখন-তখন। ত্যামন চেনালোক কী মিলবে যে লোধাপাড়া যাবে? বলবে রাইবুকে, তুমার গুড়গুড়িয়া গুড়গুড় করে চালান হ'য়ে যাচ্ছে পাঁচকাহিনার দিকে, হাত থাকে ত ছাড়াও?

ভেবে নিরাশ হল গুড়গুড়িয়া। দুদ্দুর, গুড়গুড়িয়ার তরে কে অত্ত ভাবে? কেউ না, একমাত্র রাইবু যা, তাও ত নিজের সুখে। ভেবে-চিন্তে গুড়গুড়িয়া বড় হতাশ হল।

সে এখন যেখান দিয়ে সাইকেলের পিঠে চড়ে যাচ্ছে, তার থেকে লোধাপাড়ার দূরত্ব কম করেও ছ'মাইল। হাঁক দিলে হাঁকটা বন-জঙ্গল ফেড়ে লোধাপাড়ায় যাবে কী?

আচ্ছা, হাজতে চালান হ'য়ে গেলে রোজ রোজ কির'ম খেতে টেতে দিবে, ভাত ত থাকবেই?

সব ভেবে গুড়গুড়িয়া একপ্রকার জেদী, উগ্রচণ্ড হ'য়ে উঠল, যা থাকে কপালে হোক গে!

আর তখনই দেখতে পেল ভুবনাকে, ভুবনলোধা কাপড়ের একখুঁট কোমরে জড়িয়ে আরেক খুঁট পুঁটলি করে কাঁধে ফেলেছে। কাছাকাছি হলে ভুবন চোখ বড় করে দেখল, নরসিঙা ধরে নিয়ে যাচ্ছে গুড়গুড়িয়াকে, তার হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা।

অমন বাঁধাছাঁদা দেখে ভুবনলোধারও হ'য়ে গেছে, সে রাস্তা ছেড়ে ভয়ে-ত্রাসে বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল, সাইকেল রেখে আরেক ফরেস্টগার্ড তাকে ধরে ফেলল দৌড়ে।

অমন পালাচ্ছিস যে? তোর পুঁটলিতে কি, দেখা?

কী আবার চাট্টি ফলমূল, তাও দেখবে?

ফরেস্টগার্ড কোমরের ভোজালিটা ভুবনলোধার নাভিমূলে ধরে হুঙ্কার ছাড়ল, যা বলছি জলদি দেখা, না'লে পেটের ভিতর সিধেই ঢুকে যাবে।

নাই গাড়বাবু, নাই, দু'হাত তুলে ভুবন মানা করল, বলল, দেখাচ্চি, আগে উর'ম অস্তরটা নাইকুণ্ডুল থিক্যে সরাও।

অস্ত্র সরিয়ে রাখলে ভুবন বলল, এই দেখ-অ চাট্টি ভুড়রু আর কেঁদফল, তার জন্য এ্যা-ত্তো! বলেই কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল ভয়ে।

তার কিত্তি দেখে গুড়গুড়িয়া আপনার মনে হাসল, শালা খাসি!

ভুবন ছাড়া পেয়ে দৌড়ুল, লাল মোরাম দেয়া রাস্তায় পিছলে পিছলে দৌড়ুচ্ছে আর দেখছে পিছন ঘুরে, নরসিঙার দল কদ্দূর গেল?

গুড়গুড়িয়া এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, ভুবনার মুখ থেকে খবরটা পেয়ে যাচ্ছে রাইবু।

আঙিনায় বসে কাঁচা শালপাতা নিমকাঠিতে গাঁথছিল, দশটা-বারটা পাতা জুড়ে দিলেই থালা। আর এই থালা বাবুদের বিয়ে-সাদিতে লাগে, শহর-বাজারে, হোটেলেও চলে। রাইবু আপনার মনে বুনছিল, বড় সুখেই বুনছিল।

ঘুপচিতে সোমবারি বসা, কোথাও গিয়েছিল ঘুরতে, সারা দিনমান টঙস-টঙস করে ঘোরা, এই এক স্বভাব সোমবারির, তাকে দেখেও সুখ পাচ্ছিল রাইবু।

একটা ছবি তার মনে আসছে, বঙ্কা মাহাতোর ঘরে যাত্রা বসল সেবার, যাত্রার নাম

'ললিতা পালা'। ধান্দায় বেরিয়ে মজে গিয়েছিল রাইবু আর গুড়গুড়িয়া, চুরিচামারি ছেড়ে যাত্রা দেখেছিল সারারাত।

শবরের মেয়ে ললিতাকে নিয়েই পালা, খায় দায় আর ভরা যৌবন নিয়ে জঙ্গলে সোমবারির তুল্য ঘোরে। দিন যায়, তো একদিন আসে এক দ্বিজবর, মানে এক ব্রাহ্মণ ছাতা-লাঠি নিয়ে। শবর,—সে এক লোধা—দ্বিজবরকে বলে, আম্বুর কন্যার হস্তে টিকে পানিগ্রহণ করতি হেব—

দ্বিজবর বলল, দূরছন্ত! তোর কন্যাটা কালা ভুষ্কুন্ডাটা, উহার হস্তে কী করি পানিগ্রহণ করিবু?

শবর বলল, ও কথা কহিতে হেবনি। আম্বুর কন্যাকু অষ্ট অলঙ্কার দেই সাজায়ে আনিবু।

দ্বিজবর বলল, হঁ যদি তোর কন্যাকু ঘষি-মাজি সফা করিতে পারু তা হলে আম্বে উহার হস্তে পানিগ্রহণ করিতে পারি।

শবর বলল, এথুরে বস-অ, আম্বে আম্বুর কন্যাকু সাজায়ে আনি—

বিভাস্থলে সাজে তাক্কুরো।
ললিতা নামে কন্যা মোহরো।।

তারপর কী যে হল ললিতার, সেই বেরাম্ভণের সঙ্গে বন ছেড়ে একদিন পালাল। আর সেই থেকে শবর পাগলা, খালি জঙ্গলের কালিয়া দ্যাবতাকে পূজা দেয় আর রোদন করে বলে,

লে রে কালিয়া দ্যাবতা, হামার পূজা লে।
দে রে কালিয়া দ্যাবতা, হামার ললিতাকে দে।।

কালিয়াদ্যাবতা আর কথা শোনে না, আর ফিরে আসে না ললিতা, রাইবুলোধা আপনার মনে বিড়বিড় করল,—লে রে কালিয়াদ্যাবতা, হামার পূজা লে। দে রে কালিয়াদ্যাবতা, হামার সোমবারিকে দে। বলতে বলতে সোমবারির দিকে তাকাল, তার হাত নিমকাঠিতে পাতা বুনছে, তারপর ঠিক করল সোমবারির সঙ্গে গুড়গুড়িয়ার বিয়ে দেবে। —তা'লে আর তুমার ভাবনা থাকছে নাই, তবু একটা লম্বা শ্বাস রাইবুর বুক থেকে বেরিয়ে বাইরের বাতাসে মিশল। আর তখনই ডাকটা জঙ্গলের বুক চিরে পিছলে যাচ্ছে, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

শুনছিস সোম্বারি? হাতের বোনা ছেড়ে কান খাড়া রাখল রাইবু।

কী?

অই যে কীর'ম ডাকে!

কান খাড়া রাখল সোমবারিও, শুনল না।

কত্তো পষ্ট ডাক, তাও শুনলি নাই সোম্বারি? বলেই উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে পড়ল রাইবু।

হাতে তীর-ধনুক নেই, তবু বিড়বিড় করে বলল, আজ উকে বিঁধব।

যেমন বসেছিল, বসেই থাকল সোমবারি। বলল, ভরম, মনের ভরম ছাড়া বা আর কী!

ধ-গাছে দুটো ঢেপচু বসেছিল, ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিল রাইবু, কিন্তু অচেনা পাখিটার হদিস পেল না। উড়ে গেছে কোথাও, এই চরাচরে নতুন, খুঁজে পেতে হবে তাকে,—এহেন চিন্তায় খানিক বিভোর থাকল রাইবু।

জঙ্গলের দিক থেকে ভুবন দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছে, লোকটা ভীতু প্রকৃতির, দেখেই রাইবু হেসে ফেলল।

হাসচ? আর উদিকে তুমার হ'য়ে গেছে।

কী ভুবনা? অত্ত হাঁপাচ্ছিস?

কী আবার, গুড়গুড়িয়াকে ধরে চালান দিচ্ছে নরসিঙা।

কুনদিকে?

পাঁচকাইনার দিকেই বলে ত মনে হয়।

কিছু কী বলল?

বলল, রাব্বুকে বলিস হাজোত থিক্যে খালাস কত্তে। ভুবন মিথ্যে করে বলল।

খুব চিন্তায় পড়ে গেল রাইবু।

তুই যা ভুবনা আমি দেখছি। বলেই সে হাঁটতে থাকল, যাবে রুখনীমারার দিকে।

দিল্লেশ্বর মা'জন, ইবারের মতন বাঁচ্চাও! পা দুটো ছুঁতে গেল রাইবু।

কেরাসিনতেলে ন্যাকড়া চুবিয়ে তার সাইকেলের কালিঝুলি ধুয়ে নিচ্ছিল দিল্লেশ্বর, যা ত যা, ডিসটাব করিস না।

তুমাকে ছাড়া আর কাক্কে করব মা'জন?

হেঁ, আর কাক্কে করব মা'জন, রাইবুর কথায় ভেঙচে উঠল দিল্লেশ্বর।

আমার চ্যাঙচ্যাঙে খাসিটা যেকালে খেলি, তখন? তখন দিল্লেশ্বর মহাজনের কথাটা মনে ছিল না?

নাই মা'জন নাই, কুন শালা মিছ্যকথা বলে?

তোরা খাসনে তা'লে?

নাই মা'জন, এই তুমার পা ছুঁয়ে বলছি। ফের পা ছুঁতে গেল রাইবু।

প্যাডেলে হাত দিয়ে চাকা ঘুরাচ্ছে দিল্লেশ্বর, আর দেখছে কাদামাটি ছিটকে সরে যাচ্ছে গা থেকে টায়ারের।

বলল, একগলা জলে দাঁড়িয়ে বললেও কী লোকে তোদের বিশ্বাস করবে?

তাবলে তুমো করবে নাই?

কী করে করি বল, তোদের জাতটার কুনো ঠিক আছে?

রেগে কাঁই হ'য়ে যাচ্ছিল রাইবু, গুড়গুড়িয়ার খালাসের চিন্তায় খালি যা মুষড়ে থাকল।

তুমি মা'জন গরীবের মা-বাপ, গুড়গুড়িয়াকে বাঁচ্চাও! তুমি বললে নরসিঙা ছেড়ে দিবে ঠিক, দেখ-অ।

ঢের হয়েছে রাইবু, এখন যা। তোদের হ'য়ে কাউকে বলতেও আমার ঘেন্না হয়।

অরে লাটের বাট, ধনদৌলতের খুব যে তেলানি! আপনার মনে বলে রাইবু প্রকাশ্যে হুরহুর করে কেঁদে ফেলল।

মা-বাপ-হারা গুড়গুড়িয়ার বেড়ে কষ্ট গো মা'জন, হাজতে গেলে আর সে বাঁচবে নাই।

বাঁচুক মরুক তার আমি কী জানি? রাগে গরগর করে দিল্লেশ্বর ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

আঙিনায় পড়ে থাকা সাইকেলটার দিকে চেয়ে থেকে চোখ টাটাল রাইবুর, দেব নাকি ঝেড়ে?

না, বড় বিপদ এখন গুড়গুড়িয়ার, লোধাদের সমগ্র বিপদ, মনেও সুখ নেই রাইবুর। সে বড় হতাশ হ'য়ে চলে যাচ্ছে, দিল্লেশ্বর মহাজন বড় নিরাশ করল তাকে।

রাইবু, অ রাব্বুরে!

হুঁ বল-অ।

ছাগলটা কে খেল-অ বলদেখি?

তার আমি কী জানি, মা'জন?

তুই লোধাদের মা-বাপ, জঙ্গলমহালের রাজা, আর তুই এটুকু জানিস না?

জানি দিল্লেশ্বর মা'জন জানি, শুনবে?

হুঁ, কে খেল ও'রম চ্যাঙচ্যাঙে খাসিটা?

বল্লে বিশাস করবে, বড়সোলের চামটু—?

আপনার মনে আরেক কিস্তি দিল্লেশ্বর মহাজনকে ঠকিয়ে দিয়ে রাইবু হাসল। কোথায় কে, দিল্লেশ্বর মাহাতো ঘরের ভিতর এখন সুখভোগ করছে, মনে হতেই রাইবু তার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল।

দোরখুলি পৌঁছে বঙ্কা মাহাতোকে বলতেই সে এক পায়ে খাড়া, পাঁচকাহিনা যাবে। ঘর থেকে সাইকেলটা টেনে উঠে বসল। —তা'লে এই কথাই থাকছে?

রাইবুলোধা সাইকেলের কাছাকাছি এলে তার কানে ফিসফিস করে বলল, তালে ঐ কথাই থাকছে? চুরির যাবতীয় জিনিস, বাসনকোসন, সোনাদানা,—স-ব আমার দোকানে বেচবি?

শালা বঙ্কাও কম চতুর নয়, তবু ঘাড় নাড়ল। প্যাডেল ঘুরিয়ে দু'পা যেতেই হাঁ-হাঁ করে উঠল রাইবু, ডাঁড়াও মা'জন, আমো পাঁচকাইনায় যাব-অ।

বেশ ত ক্যারিয়ারে ওঠ।



তিলকমাটি হুড়ি। হুড়ি, যাকে বলে পাহাড়, ছোটোমোটো। তবু আড়ে-দীর্ঘে দু'ক্রোশ, পদতলে চর তার, তাতে কুরথিকলাইয়ের চাষ এখন ঢালাও, হালি মেঘের তুল্য সবুজ মখমল নদীর পাড় অব্দি পাতা। রাইবুলোধা সবুজ মখমলের উপর মসমস করে হাঁটছিল।

দুয়ারসিনি থান পেরুলে ফাঁকা। ফাঁকা, যতক্ষণ না পাতিনায় পা দিচ্ছ। পরপারে তালডাঙরা, ফুলবনিগ্রাম, একদম গায়ে গায়ে। দুয়ারসিনি থান পেরুতে গিয়ে রাইবুলোধার খালি মনে হবে বলিদানের অর্গলাটা দু'পায়ে ঘাপ করে বসে গেল! দু'পা ঝাড়তে ঝাড়তে ছুটতে ছুটতে সে তখন দু'তিন লাফে জায়গাটা মেরে আনে। এর পরেই তো তিলকমাটি, ফাঁকা।

তিলকমাটিতে ডর-ভয় নেই, স্যাঙাত আছে। ত্যামন ধুকপুকানি বাড়লে হাতের কড়ে আঙুল দাঁতে ছুঁয়ে বুকে থুতু দাও, দিয়ে স্যাঙাতকে ডাকো, স্যাঙাত ছায়া-ছাঁয়রা রূপে তোমার আগে কখন বা পিছে থেকে বুকে বল-সাহস দেবে। দেখতে দেখতে তিলকমাটি হুড়ি তুমি অনায়াসে তরে যাবে।

রাইবুলোধা আপনার মনে হাঁটছিল। দু'ধারে কুরথিকলাই, ফুড়ুঙ-ফাড়াঙ ফল ধরে। চাট্টি কুরথিফল হাতে নিয়ে রাইবু নখে টিপে দেখল। না, ত্যামন পুরুষ্টু না, এখনও দুধ। ফালা ফালা করে ক'টা দানা মুখে পুরে চিবোয়, কষ বেয়ে সাদা দুধ। রাইবু ছি-থু করে ফেলে দেয়।

এভাবেই সে পশ্চিমে হাঁটছিল, সূর্য এখন নদীর মাথায় দেপে বসে যাচ্ছে। দেপে বসে যাচ্ছে, দেপে বসে যাচ্ছে।

যেতে যেতে শিয়াল দেখল, ভুঁড়াশিয়াল, হুড়ি থেকে নেমে উলুম-ঝুলুম ঘাটে যাচ্ছে, গালদুটো ভুসো মাখা, যেন হাঁড়ি টুঁড়ে এইমাত্তর এল।

রাইবু কী না কী ভেবে হাঁক ছাড়ল, স্যাঙাত হে-হে-হে-হে। তার হাত দুটো মুখের দুপাশে

জড়ো করা, আর বুক? ধুকপুক করছে। একা থাকলে এরকমই হয়।

একবার থম মেরে ভাবল, শিয়াল, শিয়াল ছাড়া কী-বা হতে পারে, শিয়ালই। পরক্ষণে বড় ধন্দে পড়ে যায়, ফের হাঁক ছাড়ে, স্যাঙাত হে-হে-হে-হে! ডাকটা তিলকমাটির গায়ে লেগে ঠিকরে ফিরে আসে, অ্যাঙাত হে-হে-হে-হে!

রাইবু কান খাড়া রেখে শুনল, আছি হে-হে-হে-হে!

স্যাঙাত বলছে, ভয় কী-হে, আছি। আছি আছি।

রাইবু তবু ভরসা পায় না, ছুট মারল। তার দেখাদেখি শিয়ালটাও, যেদিক থেকে আসছিল ফের সেদিকেই, দু'চারবার ঘাড় ঘুরিয়ে খালি যা খিঁক খিঁক করল।

খানিকটা এগিয়ে রাইবু দেখল, আরেকজন আসছে। পশ্চিম থেকে আসছে, বড় ত্বরিতে চলে আসছে। আড়বেলা, আরেকটু হলেই সূর্য টুঙ করে খসে যাবে।

রাইবুও তড়িঘড়ি হাঁটে, ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছনটা দেখল,—কদ্দুর এসেছে আর কদ্দুর বা যেতে হবে। আরে ব্বাস, কালোমাথা উঠন্তি-ডুবন্তি যে! তার মানে পিছনেও লোক আসছে।

রাইবু নমো করল, স্যাঙাত তুমি তা'লে আছ-অ, এই তিলকমাটি হুড়িতেই আছ-অ।

পশ্চিমের লোকটা এবার রাইবুর মুখোমুখি, অচেনা লোক, সাঁঝমুখে কুটুমবাড়ি-বা যাচ্ছে। চিনতে পারল না রাইবু। তবু, লজ্জায় পড়ে গেল, 'স্যাঙাত-হে' ডাকটা কী আর লোকটা শুনেনি? শুনেছে। রাইবুর মতে একচোট হেসেও নিয়েছে। ফাঁকা ফৈফিক্কির তিলকমাটির চরে পেলু বা ভীতু লোকছাড়া আর কোনো বুড়বক 'স্যাঙাত-হে' বলে হাঁপাহাঁপি করে? করে না। তার উপর মরি-কী-বাঁচি দৌড়োদৌড়ি? রাইবু হেঁট হ'য়ে লোকটাকে পাশ দিল।

ক্রমে আরো দু'তিনটে লোক কাটিয়ে চেতলার খাল পার হ'য়ে রাইবু পাতিনায়। ঝি-বউরা সরকারী পাতকুয়োয় ঘড়রী ঘুরিয়ে জল তুলছিল, তাদের বালতিতে আঁজলা পেতে চোক চোঁ-ও-ক করে জল খেল রাইবু, যা তেষ্টা অন্তরে! তারপর পাতিনা ছেড়ে তালডাঙরা, তালডাঙরা ছেড়ে সোজাপথে ফুলবনি, মম্মথলোধার ঘুপচিতে ঢুকল।

বেরুলোও খানিক বাদে, সঙ্গে মম্মথ। গুড়গুড়িয়া ধরা পড়েও ছাড়া পেয়েছে, তবু বিপদ সমগ্র লোধাদের, বড়ো বিপদ, তাই একটা পাঁঠা খুঁজছে, চুরি করা নয় নগদানগদি টাকায় কেনা। বড়ামথানে দেবে, মানত আছে।

রাইবু চরাচর ঘুরে দেখেছে স-ব দাগী পাঁঠা, কোথাও না কোথাও খুঁত আছে। মম্মথ ফুলবনিতে নিখুঁত কালোপাঁঠার খোঁজ দিয়েছিল, তাই আসা। এদিক-ওদিক ঘুরে একটা ঘুপচিতে ঢুকে মম্মথলোধা হাঁক দিল, চারুদিদি, ঘরকে আছ-অ?

বুকের কাপড়ে হাওয়া-বাতাস খেতে খেতে চারু এলে মম্মথ ফের বলল, উটি দেখাও! বলেই গেঁট মেরে বসে পড়ল। তার দেখাদেখি রাইবুও।

চারুদিদি খোঁদড় থেকে একটা কালো ভুসভুসে জীবকে ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে। পাঁঠা দেখে রাইবু আঁতকে উঠল, এত্তে কতটুকুবা মাংস?

রাইবুর কথায় মম্মথ দাঁতে জিভ কাটল, উর'ম কথা মুখেও আনিস নাই রাইবু—দ্যাব্‌তার ভোগ, তোর পাপ হবে।

ততক্ষণে রাইবু জীবটাকে উল্টে পাল্টে দেখতে লেগেছে।

ইবাবা এতেও খুঁত, এই দেখ-অ! বলেই জীবটার পিছনের ঠ্যাঙ দুটো মেলে ধরে দেখাল।

চারুদিদি হাসছে।—উটি খুঁত লয়। বলেই কী জিনিস বুঝিয়ে বলল। মথোর বোনাই বাঁশের চঁচ দিয়ে জীবটাকে খাসি করতে গেছিল, ঘা দিয়েছ কী নাই দিয়েছে চারুদিদি দাবড়ে দিয়েছিল।—উটি থাক, পাঁঠা হবে। ত সেই থিক্যে—

চারুদিদি আরো দু'চার কথার পরে, জাতেই উঠল নাই ত খুঁত কী, হেঁ মথো? বলল। মন্মথও ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

এম্নিতেই মনমেজাজ খিঁচড়ে আছে রাইবুর, তড়বড়িয়ে বলে উঠল, জলঘাট যাব, কম্মটা সেই থিক্যে চিপে আছি, চ।

রাস্তায় নেমে রাইবু পাঁঠা খোঁজার স-ব বৃত্তান্তই বলে, কী না করেছে, কোথায় না ঘুরেছে, টঙ টঙ করে নয়াগ্রামেও গেছে। সব দাগী, নিখুঁত একটাও না। শুনেটুনে মন্মথ বলল, পাবি পাবি, দ্যাব্তার ভোগ দ্যাব্তাই জুটাবে, ঠাণ্ডামাথায় খানিক খুঁজাখুঁজি কর।

চারুদিদির বাড়ি থেকে রাইবু আর কোথাও গেল না, সোজা মন্মথর বাড়ি।

মন্মথর বউ কাছে এসে বলে, হৈল কিছু?

আরে ধুউর! রাইবু আগ বাড়িয়ে বলল।

মন্মথর বউ নতুন, মাস তিনেক বিয়ে-থা হয়েছে, এক ঝলক দেখা বিয়েতে, তাও কথাবার্তা হয়নি একফোঁটা। আজ দুম করে বলে ফেলল রাইবু। বলেই কুঁকড়ে গেল না, আরো দু'চার কথা রস করে বলতে থাকল।

শেষঅব্দি মন্মথর বাপ ছিদাম হাঁকল, হেই মথো রাত হৈল, ইবার খাবাদাবা কর।

খেতে বসে রাইবু দেখল, কাঁশকুটের বাটিভরতি ডাল, দু'তিনটে তেজপাতা গোঁজা, গাঢ় ডাল।

খাচ্ছে আর আপন মনে বলছে রাইবু, ব্বাসরে অম্রুতো!

ডাল শেষ করে পাতা তিনটেও কচমচিয়ে খেয়ে ফেলল, অম্রুতো-বা লেগে আছে! খালি যা তেতো, তা হোক।

খাওয়া সেরে বাহির-ঘরে খেজুরপাতার চাটাই বিছিয়ে বড় আরামে শুয়ে থাকল রাইবু।

ভোর ভোর না বলেই যাবে, মথোকে বলেও রেখেছে, উঠতে তবু দেরী হল। পেটটায় ভালমন্দ পড়েছে, ঘুমটা জাঁকিয়ে এসেছিল।

মন্মথ মন্মথর বউ, কেউ-ই ওঠেনি, খালি বাপটা। উঠে ক্ষেতের ঘাস থেকে শিশিরের জল দিচ্ছে চোখে। রাইবুকে যেতে দেখে বলল, যাচ্ছ? চাট্টি খেয়ে গেলে হৈত নাই, বাপ?

ন্নাই, কাজকাম আছে। বলে ত্বরিতে পা চালাল রাইবু, তাকে ফুলবনি-তালডাঙরা-পাতিনা-তিলকমাটি হুড়ি পেরিয়ে যেতে হবে লোধাপাড়া।

লোধাপাড়া, লোধাপাড়া

পাতিনায় ঝাড়েশ্বরমুদীর দোকানে ধোয়ামুগের ডাল, গুচ্ছের তেজপাতা কিনে রাইবু উঠন্তিবেলায় তিলকমাটি হুড়ি ভেঙে লোধাপাড়ায় ঢুকল। ভোগের পাঁঠা না, ডাল-তেজপাতা। রসিয়ে রাঁধতে শিশুবালাকে এই বেলায়ই বলবে, বেশ থকথকে রসরস। রাইবু 'হেই-হুস-হুস' বলে ঘুপচির চালে বসা একটা কাককে অকারণে উড়িয়ে দিল। আসলে মউজ, ফুর্তি ধরেছে। দু'পায়ে হাঁটুঅব্দি ধুলো রাস্তার, তাই নিয়ে ঘুপচির ভিতর, একদম ভিতরঘরে ঢুকে গেল রাইবু।

বউ নেই, গেছে জঙ্গলে, রাইবুর মন হেঁসফেঁস করে, সোমবারিও নেই।

শিশুবালা এলে বলে, ইসব ইবেলায় রাঁধ-অ! খেত্তে মন যায়।

বউয়ের বড় আলিস্যি, গোঁতোমিতে যদি-বা না রাঁধে, তাই পাখি-পড়া বলা, তেজপাতা দেও, দিয়ে রসিয়ে রাঁধ-অ, জুতসই রাঁধ-অ!

বলে ঘুরতে বেরোয় রাইবু। খিরিসতলা জোড়াশালতলা ধ-তলা পেরিয়ে লোকটা ঠাকুরবাঁধের দিকে টুরটুর হেঁটে গেল।

ফিরে এল যখন, তখন বেলা ঠিক মাথায়, মানে দ্বি-প্রহর। মেঝেয় জল ছিটিয়ে খেতে বসল, খাবার দিতে দেরি দেখে রাইবু হাঁহফাঁই করে,—কই দিলে?

শিশুবালা একগামলা জল-ভাত আর ডাল ধরে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, ব্বাসরে, দে বলতে তর নাই!

রাইবু দেখল, ডালে তেজপাতা নেই, জল-জল। ভাত ছাড়াই খানিকটা খেয়ে দেখল, ত্যামন স্বাদও নেই। ভিতরে কী একটা ঘুরে ঘুরে রাইবুর ব্রহ্মতালু ছুঁয়ে দিল, ঢিলের পিছনে দড়িদড়া বেঁধে হাত ঘুরিয়ে মহাব্যোমে ছেড়ে দিলে যা হয়। ঘুরতে ঘুরতে লাট খেতে খেতে উঠে যায়, যাকে বলে উপর-টুলটুলি। এও তাই। চণ্ডালের তুল্য রাগটা খাবি খেতে খেতে রাইবুর ব্রহ্মতালুতে উঠে গেল, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বউকে লাথি মারল সে।

হারামজাদী, তেজপাতা কুথা? তেজপাতা?

বলেই এঁটো-হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রাইবু, জঙ্গল ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে একদম কুমারডুবি জলায়।

জলা মার হচ্ছে। কাজলপাতিশাক, নলখাগড়ার দঁকে কাদায় ভূত হ'য়ে মাছমারারা হল্লা করছে। দাড়ুয়া, যাকে বলে বাগদাচিঙড়ি, সেই মাছ—চিতল-সোল-গড়ুই-সিঙি—যাবতীয় মৎস্য মায় পুঁটি-দাঁড়িকিনি পেট উল্টে মার খাচ্ছে। রাইবু মিশে গেল মাছমারাদের দলে।

যেখানে কাজলপাতিশাক পুরু ভেলভেটের মতো, তার তলায় সোল-গড়ুই বেশি। নলখাগড়ার দঁকে বাগদা বেশি। মাছমারাদের নাচন-কুদনে জলার জল-কাদা লাট খায়, মাছগুলো আঁকপাঁক করে, বেশিদূর যেতে পারে না, ছিরছিরিয়ে থেমে যায়। আর তখনই মাছমারাদের বক-চক্ষু শেল হ'য়ে হাতের থাবড়ায় বিঁধে নিচ্ছে। হদ হদ করে মাছ উঠছে খলুইয়ে, মাছ রাখবার জায়গায়, রাইবু বেশি বাগদাই মারছে।

বাগদা, বাগদা।

গুড়খালোধার বোহিন সাবিত্রী তখন থেকে ছোঁক ছোঁক করছে রাইবুর ধারে-কাছে। কাজলপাতিশাক আর গুগলি তুলছিল, শাকে-গুগলিতে পেট তার পোয়াতির তুল্য ফোলা ফোলা। একটু আড়পাগলী, কোমর বেঁকিয়ে জলে ডান কান ছুঁইয়ে গেঁড়ি খুঁজছে, মাছ তেমন পাচ্ছে না।

রাইবু বলল, এই লে সাবি, চিঙড়া।

সাবিত্রী খপ্ করে মাছটা পেটের খোঁচড়ে পুরে নিল, তারপর খাড়া হ'য়ে বলল, আরো দেও রাইবুদাদা। মুখে ফিকফিকে হাসি।

রাইবু তাচ্ছিল্য করে বলল, যাঃ!

এগো দেও না গো। সাবিত্রী আরেকটু ঘনিষ্ঠ হল।

আরেকটা দিল রাইবু, ক্রমে আরেকটা, একসময় উপুড় করে ঢেলে দিল।

দিঞে দিলে?

হুঁউ।

বউদিদি যদি কিছু বলে?

বল্লেই বা।

সাবিত্রীর চোখে কুটকুটে হাসি, ফের কাজলপাতিশাক তুলে, গেঁড়ি-গুগলি তুলতে থাকে। ফাঁকতালে রাইবুকে বলে, এত্ত দিলে, আমোও কিছু দিব-অ।

কী দিবি? রাইবু অবাক হ'য়ে বলে।

দিব-অ।

ছলকে ছলকে রাইবু নলখাগড়ার বনের ভিতর ঢুকে যায়, দাড়িঅলা বাগদাচিঙড়ি দাবড়ে ধরে, পিছু-পিছু সাবিত্রীও ঢুকে যায়।

রাইবুর প্রায় কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে, টুকচার রাত করে ধ'তলে আস-অ, দি-ব-অ—

রাইবু চিঙড়ি ছেড়ে একদাবড়া কাদা সাবিত্রীর কোচড়ে ছুঁড়ে মারল। তারপর দৌড়ুতে দৌড়ুতে খালধার, সীতানালার জলে জলকাদা ধুয়ে গামছার একখুঁট হাতে ধরে রোদে-হাওয়ায় শুকোল।

খানিক বাদে একদঙ্গল মানুষ, খালপাড় বরাবর এগিয়ে আসছে, সামনে এলে রাইবু দেখল, একটা পার্টির মিছিল, মিছিলে মন্মথও আছে।

আরে চ কইলকাতা, পার্টির মিটিঙ আছে।

কইলকাতা?

হঁউ, বাসে-টেরেনে ফিরি, মাগনা কইলকাতা ঘুরে আসবি, চ।

হেঁ মথো, উখেনে পাঁঠা মিলে?

পাঁঠা, পাঁঠা।

খু-ব মিলে, এখন চ দেখি।

চ তবে।

রাইবুর হাতে একটা ফেষ্টুন গুঁজে দিল মন্মথ, সেই ফেষ্টুন সারারাস্তা লতপত লতপত উড়েছে, কলকাতার এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে শেষতক ছবির মতো ফাঁকা মাঠে এসে জিনিসটা মাটির ভিতর গোঁত্তা মেরে পুঁতে দিল রাইবু!

কত উড়বি উড়!

ভাগে আলুরদম আর খানকতক রুটি মিলেছে, বসে বসে খেল তাই, তারপর লোকারণ্যে শুয়ে পড়ল।

মাঝে মাঝে চচ্চড় করে হাততালি, রাইবু চমকে চমকে উঠছিল। এসময় মন্মথ বলে, শুন, শুন্নে রাখ!

রাইবু চোখ খুলে ফের চোখ বুজল।

একসময় মন্মথই রাইবুকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে দিল, চ ইবার ঘরকে।

এত্‌খনে হৈল?

হঁউ।

রাইবু ঘুম-স্বরে বলল, পাঁঠা দেখবি যে?

নাই রাইবু, উ-সবের আজ আমদানী নাই, কুথাও ত দেখছি নাই।

ইবাবা, কইলকাতায়ও আকাল?

হতে পারে!

ফিরতি পথে শর্ট-কাট করল রাইবু, নদী পেরিয়ে ফুলবনি মন্মথর বাড়ি, পীড়াপিড়িতে রাইবু থেকে গেল। রাত অনেক, এখন যাওয়াও ঝঁকমারি, তাছাড়া মথোর বউ—বাকী রাতটা রস করে গল্প করে কেটে যাবে, রাইবু থেকে গেল।

গল্প না, বাহির-ঘরে শুয়ে শুয়ে রাইবু শুনল— একটা শিয়াল ডাকছে, দূরে কোথাও। তার দেখাদেখি একটা কুকুর, ডেকে ডেকে চলে যাচ্ছে শিয়ালটার ডাকের পিছু পিছু, তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। শিয়াল-কুকুরে পোট খায় না।

অনেকটাই দূরে চলে যেতে রাইবু শুনল— গুজগুজ ফুসফুস! মথো, মথোর বউ চাপা স্বরে কথা বলছে।

শিশুবালাও উসুরফুসুর করছে হয়ত, একলা ঘরে ঠিকমত ঘুম নেই, ঘুম নেই মার-খাওয়া গতরে, বিবস বিরসমনে ঘুম নেই চিন্তায়। নেই, শিশুবালার চরাচরে ঘুম নেই।

রাইবু ভাবতে ভাবতে বড় সাবধানে ঘুপচীর আগড় খুলে ফেলল, ফাঁকা জোছ্না। ফিনফোটা আলোর সমুন্দরে সে এখন ভাসবে। ভাসছে, ডবকে ডবকে ভাসছে।

দু-চাট্টা কুকুর, ফুলবনি-তালডাঙরা-পাতিনার গ্রাম পেরিয়ে চেতলাখাল, খালপারে হুড়ি তিলকমাটির—কী দেখতে কী দেখবে! একলা থাকলে এরকমই হয়।

দমভরে জল খেল রাইবু, শুকনা মুড়ি চিবোলে টাগরা শুকিয়ে যায়। আচমকা তার মনে হল, কিছু একটা নড়ছে, পতপত ফুরফুর। রাইবু একহাত লাফিয়ে উঠে দেপে বসে গেল,—দেখেছে, সাদা থান পরা বসে আছে রুমরুম! ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে রাইবু ষাট-সত্তর গজ পিছোল।

পুকুর একটা, আধাআধি জল, তায় শালুক শস্য ফুটে আছে। থম মেরে ভাবল রাইবু, কী-ওটা? কী-বা হ'তে পারে! তারপর ছুটে গেল সেদিকেই, তার মুখের 'কে-কে' শব্দটা খেঁকশিয়ালের খিঁকখিঁক'-এর তুল্যমূল্য লাগছিল।

না, কিছু না। ফণিমনসার কাঁটায় একটা ধুতিছেঁড়া আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। রাইবু পেট খুলে হাসল। এম্নি তো কতকিছু হতে পারে, শ্মশানে-মশানে চিড়কিন জ্বলা,—কোথাও কিছু নাই, ফাঁকা, তো চিড়িক করে জ্বলে উঠল! নাকি বাচ্চা পেটে পোয়াতি মরলে চিড়কিন হয়! বাজে কথা, হাড়ে হাওয়া-বাতাস লাগলে একরকম গ্যাস হয়, সেই গ্যাস দপ্ করে জ্বলে ঝটিতি নিভে যায়, জনমাড়ষ ভাবে, আলো ভূতে জ্বালে, ভূত না ভূতের বাপ। মহাজনপাড়ায় রাইবু এসব কথা কতবার শুনেছে, তবু ধন্দ যায় না।

খালপাড়ে কলাইয়ের ক্ষেতের উপর দিয়ে সেই হাঁটা, মসমস, তাও খানিকটা, তারপর দৌড়। ডাইনে-বাঁয়ে আগে-পিছে চতুর্দিকে আলো, আলোয় আলোময়। সরষের ভিতর ভূত, রাইবু আলোর ভিতর ভূত দেখল। মরে যাবে, পচে যাবে, গলে যাবে, বাসি মড়া হ'য়ে যাবে রাইবু! অতএব বোঁ-ও-বোঁ করে দৌড়, দৌড়ুচ্ছে। একসময় দুয়ারসিনি থানের ভিতর ঢুকে এল।

থানে তেল-সিঁদুর মাখানো মাটির হাতিঘোড়া, গাছগাছড়ার শিকড়-বাকড়, চারিয়ে চতুর্দিকে ছেয়ে আছে, তার মাঝে বলিদানের অর্গলা, রাইবু হোঁচট খেল। তার মনে হল, অর্গলাটা দু'পায়ে ঘাপ করে বসে যাচ্ছে, পা থেকে গলায়। জ্ঞান হারাল রাইবু, জ্ঞান যখন ফিরল প্রায় সকাল, ঘুম থেকে জেগে ওঠা জনমানুষ এভাবে তাকে পড়ে থাকতে দেখে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে, রাইবু ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল।

হাঁটুতে ব্যথা, দু'চার জায়গায় নুন-ছালও ছড়ে গেছে। সে ভেবে চিন্তে দেখল, সামান্য তেজপাতা, তার জন্য এত্ত কাণ্ড ঘটে গেছে?

পরক্ষণে ভাবল, তেজপাতা কী, মথোর বউকেই ভাল লেগেছে, ভালও বেসে ফেলেছে রাইবু।

ইটা কিন্তু পাপ, ই-সব পাপের ফল,—খণ্ডন চায়। তাকে যে-করেই হোক বলির পাঁঠাটা খুঁজতে হবে।



বর-বরিয়াতি ছাগল আঁতি।
বরের মাকে লে'গল তাঁতি।।

'হই-হই, লে'গল লে'গল-অ' বলতে বলতে একদঙ্গল মেয়েমানুষ হুড়হুড় করে জঙ্গলে ঢুকে শুকনো ঝাঁটি, পাতাপতর ছিঁড়ে নিচ্ছে,—কারো হাতে দা-কাটারি, কুঠার হাতে কেউ কেউ। কচিকাঁচা শালগাছ টুঙ করে কেটে ফেলে, ফালা ফালা চিরে শুকোয় রোদ্দুরে, তারপর আঁটি বেঁধে বেচে দেয় বড়খাঁকড়ির হাটে।—এরা লোধা নয়, মাহাতো-সাঁওতাল-ভূমিজ, হরেক জাতের ঝি-বউরা, জঙ্গল এদেরও দানাপানি দেয়।

এদের ভিতর জরিলালের মা আছে, এই আষাঢ়ে জরিলালের বিয়ে, তাই সে এখন বরের মা, তাকে খোঁটা দিয়ে গান, "বর-বরিয়াতি ছাগলআঁতি"—গাইছে বিন্দা, সে জরির মায়ের গায়ের উপর ঢলে পড়ে গাইছিল। জরির মা তাকে একহাতে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, আরেকহাতে ঝাঁটি কুড়োচ্ছিল, পাতা ছিঁড়ছিল আর গালিগালাজ কবছিল লোধাদের, যত খুশি।

চোর লোধাদের জ্বালায় ধারেকাছে কাঠ পাবার যো আছে?

নাই ত জরিয়ার মা, কত্তো বড় জঙ্গল, দেখতে দেখতে সাফা!

জঙ্গল বলে জঙ্গল, তোর বাঘ-ভালুক হুঁকরে চরে বেড়াত, আর কদিন পরে খেঁকশিয়ালও থাকবে নাই, তুই দেখিস।

বিন্দাদূতী একটা বড় শুকনা ঝাঁটি ঝোপ থেকে টানছিল, তার টানাটানিতে পুরো ঝোপটা হিলহিল করে নড়ছে।

জরির মা চিল্লে উঠল, সরে যা মুখপুড়ি, সরে যা, থোঁকা থোঁকা আলকুসি তোর মাথার উপর, দেখছিস নাই?

আলকুসি? ওর'ম বিছুটি ত সাবা অঙ্গে বাদ্দিন জ্বালাচ্ছে জবিয়ার মা, ফের লতুন করে কী জ্বলব?

বলে টানাটানি ছেড়ে হাত চালিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে, বুখো পিঠে তার অজস্র কাটাকুটি, যেন কালো শ্লেটে সাদা খড়ির দাগ, বিন্দাদূতী হাসছিল।

বল্লি কি, সারা অঙ্গে জ্বালা?

জ্বালাই ত জরির মা, জ্বালা না?

বিয়েসাদি কব, ও-জ্বালা জুড়াবে।

দাঁড়িয়েছিল বিন্দাদূতী, ফেব টানাটানি শুরু করল। ফাঁকার ভিতর ঝাঁটিটা টেনে এনে চুল খুলে বাঁধল, হাতের দা মাটিতে।

বল্লি কী বিয়ে? এ জন্মে আর হল নাই জরিয়ার মা।

নাই কেনে?

কেনে আবার, দিলে ত?

হাসল বিন্দাদূতী, সে হাসি সুখের নয়, রাগেব। বলল, বাপ মুখপোড়া পাবলে আরেকটা বিয়ে করে।

যা বিন্দা, ওর'ম বলিস নাই, সুরথদাদা লোক ভাল।

বলতে বলতে জরিলালের মা আরো ভিতরে, জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে গেল।

আরেকজনও এভাবেই ঝোপ ফেড়ে এগুচ্ছিল, সে সোমবারি। কোঁচড় ভরতি কুড়কুড়িয়াছাতু যজ্ঞিডুমুরের ফলের মতো, ক'দিন আগের বৃষ্টিতে ভেজা ভুঁই থেকে তুলে নিয়ে এগুচ্ছিল, শিয়রচাঁদা সাপ যেরূপ শুকনো পাতার উপর বুক দিয়ে হাঁটে, সোমবারি হাঁটছিল।

সে, এতক্ষণ শুনেছে রুখনীমারা-দোরখুলির মাহাতো মেয়েরা চোর বলেছে লোধাদের, গালমন্দ করেছে যতখুশি, কোমর বেঁধে ঝগড়া করবার আশ গিয়েছিল সোমবারির, থেকে থেকে খালি আপনার মনে বলেছে, চোর লয় বা কে, চোর ত তোরাও।

এ্যাই লোধামাইয়া, কী করিস?

জরির মাকে ঘাড় তুলে দেখল সোমবারি, তার কথার জবাব দিল না, খালি হেঁট হ'য়ে ছাতু কুড়োনোর ভান করল, ছাতু কী আর সব জায়গায় থাকে? জরিলালের মা অস্থির হ'য়ে একটা ঢাউস কেঁদুপাতা দা দিয়ে দুফাঁক করে বলল, কালা নাকি? কী করছিস, বলবি ত?

কী আবার, ছাতু কুড়াচ্চি।

নাকি চুরিচামারির ধান্দা?

লালনেত্রে অজস্র রাগ, কোঁচড় খুলে সোমবারি বলল, চোখ মেলেই দেখ-অ না!

কী ছাতু দেখি, কুড়কুড়িয়া?

দু'চাট্টা পাকা ছাতু নখে টিপে শাঁস বের করল জরির মা, কালচে রঙের, মুখে পুরে বলল, দিবি?

কিছু না বলে সোমবারি তার যৌবন হিলিয়ে আরো ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল, তার চলে যাওয়া দেখল জরির মা, দেখেশুনে বলল, খালভরি!

টিলিঙ ডুবুল্ ডুবুল্। টিলিঙ ডুবুল্ ডুবুল্। —আওয়াজটা মুখ দিয়েই করছিল গুড়গুড়িয়া, সাঁওতালদের ধামসামাদলের আওয়াজ। আঁটারি-কুড়চির ঝাঁটি কেটে সে এখন জঙ্গলের বেশ কিছুটা জায়গা ঘিরে নিতে ব্যস্ত, আজই বড়খাঁকড়ির তৈলোকবাবু শিকারে আসবে, খেড়িয়া শিকার। খেড়িয়া তার মানে খরগোশ।

পদ্ধতিটা এই, যে ঝোপে খরগোশের বাস তার চারদিকের জায়গা ডালপালার বেড়া দিয়ে ঘিরতে হবে, বেড়া দু-তিন হাত উঁচু, তার বেশী উঁচুতে লাফাবে সে মুরোদ তোমার বুনোখেড়িয়ার নেই। ঘেরা চৌহদ্দির ভিতর তাড়া খেয়ে জীবটা ভয়ে-ত্রাসে দৌড়ুলে পাঁচব্যাটারীর টর্চ টিপে দাও, তার ফোকাসে অন্ধ হ'য়ে ক'সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকবে জন্তুটা, সেই ফাঁকে বন্দুকের এক গুলিতেই কাবার—বুনো খরগোশের মাংস খেতেও সুস্বাদু।

গুড়গুড়িয়া ডালপালা ছেঁটে সেই মতো বেড়া দিচ্ছিল, প্রথমটায় রাইবু এসে দেখেশুনে 'চিহ্ন' দিয়ে গেছে, খরগোশের আস্তানা খুঁজে পেতে তার ত্যামন ভুল হয় না। একফাঁকে পাঁঠা খোঁজার স-ব বৃত্তান্ত, আর সেই তেজপাতা, সেই কলকাতা যাতায়াতের গল্পও বলেছে, শুনে-টুনে গুড়গুড়িয়া হেসেছে। সাধুবাবার আশ্রমের কাছেই খালধারে তেজপাতার তুল্য পাতাওয়ালা গাছ দেখেছে গুড়গুড়িয়া, তেজপাতা কী, একদিন তুলে এনে রাইবুকে দেখাবে।

আপনার মনে একটা চুরচু গাছের ঝোপে কোপ দিচ্ছিল গুড়গুড়িয়া আর আওয়াজ করছিল মুখে,—টিলিঙ ডুবুল্-ডুবুল্, টিলিঙ ডুবুল্ ডুবুল্—আর পাখিটা উড়ল খুব কাছ দিয়ে, বলতে কী মাথার উপর দিয়ে। রাইবু ত এর কথাই বলে? এর'ম ডাকই ত সে শুনেছে? জঙ্গলে একদম নতুন, গুড়গুড়িয়া কান-মন খাড়া রেখে ফের শুনল, পষ্টাপষ্টি শুনল, টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু!

ডাকছে সে, গুড়গুড়িয়া কাজ ফেলে দৌড়ুল, কি-প্রকার পাখি, পাখি কী, দেখি ত? খানিকটা দৌড়ে গুড়গুড়িয়া হতাশ হল, পাখিটাখির চিহ্ন নেই, ঠা-ঠা জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার, গুড়গুড়িয়া দু'হাত তুলে নমো করল।

কাকে নমো করছিস রে গুড়গুড়িয়া, কাক্কে?

হাসিতে ঠিকরে যেতে সোমবারিকে দেখল গুড়গুড়িয়া, ভগবানের সংসারে কী মনোহারী দৃশ্য, সে হাঁ হ'য়ে খানিক তাকিয়ে থাকল।

ওর'ম হাঁ করে কী দেখছিস এ্যাই?

কিছু না বলে গুড়গুড়িয়া ঢোঁক গিলল, তার চোখ সোমবারিকে গিলে খাচ্ছে।

বলবি ত গুড়গুড়ে, কী দেখছিস ওর'ম হাঁ করে, মরা ছাগলের তুল্য?

পাক্কি। কোনমতে গুড়গুড়িয়া বলল।

পাখি ন আর কিছু?

ভয়ে ভয়ে হাসল গুড়গুড়িয়া, বলল, না-ন্না, পাখিই। ঐ যে কি'রম ডাকে, টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু? পাখি হ'তে থাকল গুড়গুড়িয়া।

দেখে সোমবারিও হাসল, চিনিবাসের ভূত তোদের ঘাড়ে চাপল, কদ্দিন এখন ভোগাবে।

চলে যেতে যেতে বলল, হেঁ গুড়গুড়ে, তুই না মরদ?

বুঝতে না পেরে গুড়গুড়িয়া আরও দু'পা এগুল, আপনার মনে বলল, মরদই ত!

তা'লে অত্ত তোর ডর কেনে?

ডর? কাকে সম্বারি?

কাক্কে ফের, আমাকে তোর ডর লাগে নাই বুকে হাত দিঞে তাই বলদেখি?

গুড়গুড়িয়া দু-চাট্টা ঢোঁক গিলে হাসল, বলল, কী-ই জানি, কি'রম ডর ডর ত লাগে।

তালেই বুঝে দ্যাক।

বলতে বলতে সোমবারি তার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল, সেই ঝোপঝাড় ফেড়ে ঢুকে ভেসে যাওয়া, সোমবারি ডবকে ডবকে ভাসতে ভাসতে এগুচ্ছে।

আচমকা তার মনে হল, গুড়গুড়িয়া আসছে, ঘাড় ঘুরোতেই লোকটা হড়বড় করে ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল।

বুকে ঢিবঢিবানি শুরু সোমবারির, তবু মুচকি হেসে আরেকটু জোরে হাঁটল, আর দু'চারবার চিন্তাটা মনে এলে দৌড়ুল, রিটপিটে দৌড়, ভয় তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে এখন লোধাপাড়ার দিকে।

গুড়গুড়িয়া আর দৌড়ুল না, সোমবারির হেঁয়ালি সে ধরতে পারেনি আদৌ, খালি খালি ছুটছে। দড়ি বাঁধা টায়ারের চটি ঠিকমত দু'পায়ে আটকাতে গুড়গুড়িয়া বসল, লতাপাতার কাঁটায় ছড়ে গেছে দু'চার জায়গা দেখল, দেখেও ধর্তব্যে নিল না সে, পা ঝেড়ে দৌড়ুল ফের।

এবার অন্যদিকে, মুখের শিকার ফস্কে যাওয়া রাগী গরগরে জীব সে এখন, এলোপাথাড়ি দৌড়ুচ্ছে। দৌড়ে খালধারে কইমগাছের ঝোপে নিজেকে লুকিয়ে রেখে দেখল, সে জল খাচ্ছে।

জল খাচ্ছে, জল খাচ্ছে।

বিন্দাদূতী শুশনিশাক আর গুড়মনগাছের দল সরিয়ে জল খাচ্ছে, অস্থিরজলে তার প্রতিবিম্ব কেঁপে কেঁপে ভাসছে, চোখমুখ দেখতে দেখতে দু'হাত ডুবিয়ে জল তুলে মুখে দিল বিন্দা, ভেজাহাত মাথার চুলঅব্দি চলে যাচ্ছে, জরিয়ার মা ধারেকাছে নেই কোথাও।

কইমতলে গুড়গুড়িয়া লোভাতুর, বাঘ যেন হরিণকে খেয়ে খালধারে ঘাসভুঁয়ে

দাড়িগোঁফ মুছে নেবে, জনমাম্মিও জানবে না।

হেঁ গুড়গুড়ে, তুই না মরদ?

মরদ-ই ত।

তা'লে অত্ত ডোর ডর কেনে?

ডর? কাকে সম্বারি?

কাক্কে ফের, আমাকে তোর ডর লাগে নাই বুকে হাত দিঞে তাই বলদেখি?

গুড়গুড়িয়া বসেছিল, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, গা-হাত-পা ঘামছে।

রুখনীমারার কেউ হবে, রুখনীমারার কী?

যেই হোক, গুড়গুড়িয়া আজ আর কাউকে ছাড়ছে না,—জলটুকু খাক না'লে যুজবে কী করে?

কইমতলে বসেই মনে মনে বিন্দার সারাশরীরে হাত চালাচ্ছে গুড়গুড়িয়া।

ভাল লাগছে ত?

তোমার তুল্য পুরুষ আমার অঙ্গে হাত দিল, ভাল ত লাগবেই।

কী র'ম ভাল?

ভাল, যেন তোমার অম্রুতো।

খুশি হ'য়ে উঠছিল গুড়গুড়িয়া, আচমকা দেপে বসে গেল, একটা গুছিপোকা বড় সুস্থিরগতিতে হাঁটুঅব্দি উঠে এসেছে, ফেলে দিল।

আর তারপরেই দেখল, জঙ্গল ফুঁড়ে এক বুড়ি তার দু'হাতে শুকনো ঝাঁটি টানতে টানতে খালধারে,—একদম তেষ্টাকাতর জীবটার কাছাকাছি এসে গেল।

বিন্দাদূতী বলল, কী'রম ঠাণ্ডাজল, আয় জরিয়ার মা খাবি ত!

এখন ভোর, জঙ্গলে ডালপালা ছিঁড়ে-কুটে শিকার করেছে বড়খাঁকড়ির ত্রৈলোক্যবাবু, সর্বমোট তিনটে খরগোশ, দুটো নিয়ে রাইবুকে দিতে গেল আরেকটা।

ইট্টাও লিয়ে যাওগো তৈলকবাবু, তার বদলে আরেকটা ছর্‌রা দেও।

আর নেই রাইবু, থাকলে দিতাম না?

মোটে একটা দিলে, তাও যদি ফস্কে ত কাজের কাজ কিচ্ছু হবে নাই।

নেক্সটবারে এলে আবার দেব রাইবু, এখন ওতেই সন্তুষ্ট হ'।

ঝোলায় অতগুলা আছে তবু আরেকটা দিলে নাই? গুড়গুড়িয়া মুখ ফস্কে বলে দিল।

তাকে রাইবু দাবড়াল, তুঁই গুড়গুড়ে থামবি, ন্নাকি? তা'লে যাও তৈলকবাবু, রাতভর ঘুম নাই, খাঁইদাঁই ঘুমাও।

হুঁ রাইবু, যাই।

গুড়গুড়িয়া-রাইবু দু'টিতে খুশি খুব, ভালই কেটেছে রাতটা, তাছাড়া তৈলকবাবুর আয়োজন মন্দ ছিল না, দিশী-বিলাতী দু'বোতল, দিশীটাও খুব কড়া ধাতের, বলল ত ভুস্কিকামারের নিজহাতে গড়া। তারা কথা বলতে বলতে দু'টিতে এখন লোধাপাড়ার দিকে এগুচ্ছে, গুড়গুড়িয়ার হাতে মরা খরগোশ, চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে।

লোক কিন্তু ভাল রে গুড়গুড়িয়া।

হঁ ভাল, খালি যা মিছা কথা বলে।

অমন একটু-আধটু কে নাই বলে গুড়গুড়ে?

একটা অন্যকথা ভাবছে গুড়গুড়িয়া, রাইবুর কথা শুনছে না। সীতানালা খালধারে তেষ্টাকাতর জীবটা আঁজলা ভরে জল খাচ্ছে, জলে প্রতিবিম্ব তার, ভরতি যৌবনে ঝিমঝিম করছে গা, তার

সর্বাঙ্গ। গুড়গুড়িয়া জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, একটা থলথলে সবুজ গুছিপোকা তাকে সেই থেকে উস্তন খুস্তন করে কামড়ে দিল। ঘোর থেকে চনমনিয়ে জেগে গুড়গুড়িয়া বলল, হেঁ কী বলচ?

বলছি, আমার চোরাই বন্দুকটার উপর তৈলকবাবুর লোভ খুব।

তৈলকবাবুরও ত আছে?

থাকলেও, পুরনা জিনিস, এসব আজকাল পাওয়াই যায় না, কাজ কত্ত-অ পরিষ্কার।

তা'লে আর কী, দিএে দেও?

মাথা খারাপ, এর'ম অস্তর হাতছাড়া কল্লে যে কী বিপদ, তা ত বুঝিস গুড়গুড়ে?

আচমকা ছুঁচকো জঙ্গল থেকে জটালোধার বউবুড়ি বেরিয়ে এল, আর আগাস নাই রাইবু আর আগ্নাস ন্নাই।

কেনে-এ জটাদিদি?

কেনে কী রে, লোধাজাইতের আজ বড় বিপদ, ভয়ানক বিপদ তোকে হাঁ করে গিলতে আসছে।

উ-সব হিঁয়ালি ছাড়-অ, কী হ'য়েছে পষ্টাপষ্টি বল-অ ত? রাইবু গা ঝাড়া দিল।

রাইবুর হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে পোজ নিল গুড়গুড়িয়া, কেউ কিছু করেছে, ত বল-অ?

কেরদানি তোর রাখ বে গুড়গুড়িয়া, তোকে ধত্তে আসছে পুলিশ, খপ্পর রাখিস?

বল্লে কী পুলিশ? পুলিশ কেন্নে জটাদিদি?

তবে শুন রাইবু তোকে বলি, গেল রাইতে ডাকাতি হৈল তোর ডিল্লেশ্বর মাহাতোর ঘরে, সেইহেতু লোধাপাড়ায় হুজ্জুতি, পুলিশ ধত্তে আসছে তোদেরকে,—তা'লেই বুঝ?

বুঝেছি জটাদিদি, তুমি যাও, আমি-গুড়গুড়িয়া আর এখন যাচ্ছি নাই। বলে ফের হড়বড়িয়ে জঙ্গলে ঢুকে দৌড়ুতে থাকল যার যেদিকে খুশি, লদোপদো দৌড়ুচ্ছে।

সময় সন্ধে ছ'টা, স্থান রুখনীমারা দিল্লেশ্বর মাহাতোর আঙিনা, হাঁস-মুরগীগুলো বাথানে ঢুকছে, দিল্লেশ্বরের বউ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে পুকুরের দিক থেকে।

আর কতক্ষণ ডিল্লীশ্বর?

আরেকটু বসো মুচিরামদাদা, তিলোচন ডাকতে গেছে।

কি-ই বলে ডাকতে বলেছ তিলোচনকে?

বলেছি আজ সন্ধ্যায় দিল্লেশ্বর পানবিঁড়ির ব্যবস্থা রেখেছে, আপনারা দশ গেরামের পাঁজ্জন আসুন!

এ-হে একটুক ভুল করেছ যে, বিঁড়ি না বলে সিগ্রেট বল্লেই পারতে?

হুঁউ, ত্রুটি একটুক হ'য়েছে তা'বলে নিজগুণে ক্ষেমা দেও।

দশরথ মাহাতো, পঞ্চানন বেরা, রামচন্দ্র রাণা, পিতাম হাঁসদা, আরো কে কে দিল্লেশ্বর মাহাতোর আঙিনায় জড়ো হল, বিচার্য গতরাত্রে দিলেশ্বর মাহাতোর ঘরে ডাকাতি। চেঁছেপুছে একদম পুকুরচুরি,—কারা করল বল-অ-দিনি?

কারা ফের, লোধারা?

সে ত তুমো জানো, আমোও। কিন্তু হাত্তেনাতে ধত্তে কী আর পেরেছ?

তা পারি নাই।

তা'লে? বামালসুদ্দু ধত্তে না পারলে শুধুমুদুই একটা লোককে তুমি চোর বলবে, আইন আছে না?

উ-সব আইন-ফাইন ছাড়ো, কতগুলো চোরছ্যাঁচড় রাদ্দিন চুরিচামারি কচ্ছে, আর তুমি ধত্তে পারছ না বলে মুখ বুজে সয়ে যাবে?

আঃ রামচন্দ্র আস্তে, মাথাগরমের কাজ কী? তারচে' ঠাণ্ডা মাথায় ভাব-অ, কী করা যায়?

কি-ই আবার, তল্লাসি কর-অ, চোর ধরা পড়লে পেঁদাও, আমি ত এই বুঝি।

থানায় ডায়রি হয়েছে?

তা হ'য়েছে, আমার বড়শালা বিন্দাবন গিয়েছিল।

ধুদ্দুর! রামচন্দ্র রাণা ফের খিঁচে উঠল, শালাদের সঙে থানাপুলিশেরও হাত আছে।

দশরথ মাহাতো রাণার কথাবার্তার ধার ঘেঁষেও গেল না, ফের গোড়া থেকে শুরু করল।

ঘরে এতগুলো লোক, স-ব কী ঘুমোচ্ছিল? একটা লোকও লোকগুলোকে চিনল না, কির'ম লাগছে না?

দিল্লেশ্বর মাহাতোর পিসি থরপো মিটিঙের এককোনে দাঁড়িয়ে স-ব শুনছিল, এবাব হুড়হুড় করে বলল, খালভরাদের ঠিকেই চিনেছি, বেঁটে আর থাবা থাবা পা, দু'কাঁধে রোঁয়া রোঁয়া চুল, গুড়গুড়িয়ালোধাই ত।

হুঁ তোর চেনা ত!

হায় দেখ-অ, এত কাছ থেকে পষ্ট দেখলম, আর তুমি বলচ—

তুই থাম থবপো, ঘরের মে'মানুষ ঘরকে যা।

তা যাচ্চি, কিন্তুক লোক চিনতে আমার বাকি নাই, এই চোখে উকুন বাছি।

তা'লে আর কী, তোরাই মিটিঙ কর আমি উঠি, নাকি মুচিরাম?

দিল্লেশর মাহাতো হাঁ-হাঁ করে দশরথ মাহাতোর পায়ের কাছে ছুটে গেল, ক্ষেমা দেও দশরথদাদা, ও মুখপুড়ি কি-ইবা বুঝে, তাও ত কালা, শুনে কম।

উসব আঙ-বাঙ কথা, যার কুনো মাথামুড় নাই, কামের কথা হোক মুডল?

তোরাই বল না পিতাম।

কিছু ইদিক-উদিকও শুনছি। পিতাম হাঁসদা বলল।

ইদিক-উদিক?

এই ধর-অ মে'মানুষের গায়ে হাত-টাত।

বলছ কী, লোধাদের এদ্দুর আস্পদ্ধা!

তবে আর শুনছ কী, পঞ্চানদের মুখেই শুনে দেখ-অ।

পঞ্চানন বসে বসে মাটিতে হিজিবিজি কাটছিল, উঠে আসরের মাঝখানে এসে গেল।— জঙ্গল থেকে ঘুরে বিন্দা-জরিয়ার মা-ই ত বলছিল। সে বলল, তিলোচন, যা ত বিন্দাকে, জরিয়ার মাকে ডেকে আন।

বিন্দা এল, জরিয়ার মা এল না, তার খুব জ্বর, গা-হাত-পায়ে ব্যথা, শীত কবছে।

তা'লে তুই-ই বল বিন্দা, কী ঘটেছিল?

কী-ই আবাব, খালভরা কটমট করে তাকাচ্ছিল।

খালি এ্যাই?

তুমি কী আমাকে সন্দ কচ্চ?

এই পাঁচজনের সামনে খুলে বল বিন্দা, কী ঘটেছিল জঙ্গলে সেদিন, বলতেই হবে তোকে!

বলব না, যাও।

পঞ্চানন রাগে গরগর করছে, সেদিন ত বল্লি?

বিন্দা কেঁদে ফেলল, আছা উকি পাঁচজনের সামনে খুলে বলার জিনিস?

অঃ বুঝেছি। বলে দশরথ মাহাতো বিন্দাকে চলে যেতে বলল।

সভা খানিক নিস্তব্ধ, আচমকা রামচন্দ্র রাণা হুঁকরে উঠল, তুমি বুঝে কী-বা করবে?

পিতাম হাঁসদা বলল, আমাদের বউড়ী-ঝিউড়ীরা ত রাদ্দিন জঙ্গলে, কিছু একটা কত্তেই হবেক মুড়ল, চল-অ শালাদের বিঁধে দিই!

মিটিঙ থেকে ঘরে ঢুকে দিগ্নেশ্বর বউকে বলল, আর তোমার কোনো চিন্তা থাকছে না। বউ গোয়ালঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল, তাকে হাত ধরে টেনে আনল ভিতর-ঘরে।

তোমার কানের দুল কাল তল্লাসি চালালেই পেয়ে যাব।

হুঁ, আর তোমার ঘড়ি-সাইকেল?

শালারা ওদুটাও নিয়েছে, শ্বশুরের দেয়া কি'রম সুন্দর জিনিস দুটা!



আরেকটু রাত করে, থানার মদনসিপাই ডিউটি দিচ্ছিল, বাঁধানো বটগাছটার চাতালে বসে বসে ডিউটি, দু'হাত তো বন্দুকের মাথায়, মাঝে মধ্যে মদনের মাথাটাও ঝুঁকে এসে যোগ দিচ্ছে। আর তখনই মদন চোখ বড় করে চারদিকে দেখছে, চরাচর ঠিক আছে, গড়বড় নেই কোথাও। বড়সুখে মদন ফের চোখ বুজল।

হেনকালে হুজ্জুতি, জীপগাড়িটা পিঁপিঁ হামলাচ্ছে। ঘাসভুঁয়ে ছিল এতক্ষণ, মদনসিপাই দু'তিনবার ঘুরেও এসেছে, জনমান্নি নেই, তিতি-বিরক্ত সে ফের ঘুমুতে যায়। আচমকা দারোগাবাবুর চোখ-মুখ মনে আসায় ছুট ফটিয়ে উঠে পড়ে দু'তিনটা লম্বা স্যালুট ঠুকে দিল। মদন বুঝে নিয়েছে, দারোগাবাবু এসময় 'রেড'-এ গেলেও যেতে পারেন।

মদনার কিত্তি দেখে কান্তিড্রাইভার হেসে বাঁচে না, হাসতে হাসতে জীপ থেকে নেমে আসছে।

অ-রে শালা, তুম্মি! বলেই মদনসিপাই ফের চাতালে বসতে গেল, তার চোখ-মুখে এখন লোক চিনে ফেলার কুচিকুচি সুখ।

কান্তিও গা ঘেঁষে বসল, মদন তাকে কিছু বলতে গিয়েও পারল না, হাই। হাঁ-মুখে দু'চাট্টা টুস্কি, ব্যাস! মদন চাঙ্গা, জামার ভিতর হাত গলিয়ে কান্তির পেট খিমচে ধরে বলল, আজ আবার কোন দিকে রে শালা?

কান্তি উসখুস করে বলল, লোধাপাড়া।

লোধাপাড়া? মদনসিপাই পেট ছেড়ে কান্তির কাঁধের মাংস দাবড়ে ধরে বলল, তবে তো মার দিয়া কেল্লা!

কান্তিড্রাইভার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে বলল, সাহেবের যা মর্জ্জি।

মর্জ্জি? মদন ফিক করে হাসল। তার হাত ফের কান্তির জামার ভিতর ঢুকে যায়, কাতুকুতু দিয়ে বলে, দুনিয়ার যেখানেই চুরি হোক চামারি হোক শালা চোর খুঁজবে লোধাপাড়ায়, ভ্যালা মজ্জি তোর সাহেবের!

চো-ও-প! শুনছে। কান্তি মদনাকে খোঁচা মেরে থামায়, মদন থামে না। প্রায় ফিসফিস করে বলে, লোধাগুলাও তেন্নি, ভটরভটর শুনল ত ডাঁটো মাগ ফেলে রেখেই হাওয়া।

কান্তিও হাওয়ার তুল্য উথলে উঠে বলল, হাওয়া বলে হাওয়া, যতক্ষণ স্টার্ট—

ত্রিসীমায় ঘেঁষছে না, কান্তির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মদনসিপাই বলে, ততক্ষণ যা খুশি কর-অ, দেখছে বা কে?

মদনের জিভে জল এসে যায়, শুষে নিয়ে আচমকা কান্তিকে ঠেলে দিল, যাব্বে!

নিজে বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের তুল্য স্যালুট করল।

বড়া সা'ব!!

জঙ্গলরাস্তায় জীপটা এখন হোঁচট খেয়ে খেয়ে ছুটছে। স্টিয়ারিঙে কান্তিড্রাইভার, তার চোখ-মুখে ভিন্নজাতের সুখ, সামনের হেডলাইটের আলোয় অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে বেশ। কান্তি মাঝে মধ্যে নিচুতলার ঠোঁটকে উঁচুতলার খোঁদলে ঠেলে দিচ্ছে, তক্ষুণি জীপটা পিঁপিঁ আওয়াজ তুলে ছুটছে।

সারাদিনের গা মেজমেজানি এতক্ষণে ছাড়ল, মদ হ'ল ধন্বন্তরি। এখন এই জঙ্গলের ফুরফুরে হাওয়ায় দারোগা মনে-প্রাণে চাঙা, আপনার মনে গাইছেও,

ফুর ফুর ফুর হাওয়া দিল বাবুর বাগানে।
ছিঁড়ব ফুল গাঁথব মালা আমরা দুজনে।।

ভটরভটর আওয়াজ ঘোঁচ করে আচমকা বাঁক নিলে দারোগা বিড়বিড় করে, রাস্কেল!

যন্ত্রটা ধাতস্থ হলে পষ্টাপষ্টি বলে, রাস্কেল লোধারা কবে যে চৌর্যবৃত্তি ছাড়বে!

এত শুদ্ধ শব্দ কান্তিড্রাইভার বড়সাহেবের মুখ থেকে আগে কখনো শুনেনি, তাই শব্দটাকে আপনার মনে ভেঙে-চুরে খোলসা করে দেখে নিয়ে বলল, এ জন্মে না স্যার।

বলে ফেলে ভাবে, বড়সাহেবের মগজে নেশার মাত্রা আজ একটু বেশিই। ভটরভটর আওয়াজের ভিতরই দারোগাবাবুর বকরবকর, সব কটা রাস্কেলকেই আজ লক-আপে পুরে দেব।

তাই দিয়েন স্যার।

শরীরের অর্দ্ধেকটা ঝোপের ভিতর, অর্দ্ধেকটা রাস্তায়, দু'চাট্টা শিয়াল রাস্তা পেরুবার ধান্দায় এভাবেই ছিল, হেডলাইটের আলো চোখে লাগায় ফের গপাৎ করে ঢুকে গেল। তাই দেখে কান্তিড্রাইভার হাসে, এসব ভুঁড়াশিয়ালের চরিত্র তার জানা আছে।

লোধাপাড়ার ভিতর গাড়িটা সাঁক করে ঢুকে যেতেই মরদ লোধাগুলো ঘর ছেড়ে পড়পড়িয়ে দৌড়ুল জঙ্গলের দিকে। —দৌড় দৌড়—

আজ সব ব্যাটাকেই লক-আপে পুরবো, কান্তি, কুইক!

দারোগার হুকুম। কান্তি বুঝল, এ হুকুম মানা যায় না, দুপাশে শবরপল্লী, সামনে জঙ্গল, গাড়ি যাবে কোনদিকে? তাই কোনমতে সাইড করে গাড়িটা চালু রাখল, ভট্‌ভট্ আওয়াজ। এ আওয়াজ যতক্ষণ ভিড়কে-যাওয়া লোধাগুলো ততক্ষণ আর ঘরমুখো হবে না, এসব ভুঁড়াশিয়ালের চরিত্র তার তো জানা আছে।

দারোগা টর্চহাতে গাড়ি থেকে নেমে খিরিসগাছের তলায় খানিক থম মেরে দাঁড়ায়, আলো ঘুরিয়ে চারদিক দেখে, আর তারপর ঝড়ের বেগে ঢুকে যায়।

সঙ্গের দু'জন কনস্টেবলও গাড়ি থেকে ঝুপঝাপ নেমে পড়ে দৌড়ায় জঙ্গলের দিকে। তারা জঙ্গলের ভিতরে ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়েই এ-পাতা সে-পাতার উপর লাঠি দিয়ে ঢাব্-ঢুব্ আওয়াজ করে।

আওয়াজ করে, আওয়াজ করে।

কান্তিড্রাইভার গাড়িতে বসে এসব দেখে, আর কুটকুট করে হাসে, একসময় স্টার্ট ঠিক রেখে নিজেও গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকারে মিশে যায়।

কী নাম তোর?

কেন্নে, শিশুবালা?

বা-ব্বা, বিউটিফুল নাম ত! শিশুবালার মুখের উপর আলো।

শিশুবালা আঁকপাঁক করে চোখ-মুখ চাপা দিল দু'হাতে।

দারোগা আলো নিভিয়ে ফের জ্বালল, ফের, একসময় হেঁসফেঁস করে রাইবুর বউই বলল, আন্নাই দার্‌গাবাব্‌বু!

দারোগাবাবু ফিক করে হেসে ফেলে বলল, লাগছে? বেশ বেশ, এবার বল কালকের চোরাই মাল সব কো-থা? শিশুবালার চিবুকে দারোগার হাত।

শিশুবালা সিঁটিয়ে পড়ে থেকে বলল, উ-সব মিচ্ছুকথা, দার্‌গাবাব্বু!

ছিঃ দুষ্টু করে না, ছিঃ! বলতে বলতে দারোগা শিশুবালাকে বুকের ভিতর জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করল, একসময় নাজেহাল হ'য়ে বলল, ইডিয়েট, বুঝিস না আমার ঔরসে তোর পেটে লোধাবাচ্চা হবে না, হবে বামুনবাচ্চা,—এসব ভেবেও তোর সুখ হচ্ছে না, সুখ?

বামুন? বিশ্বাস করলি না, তবে এই দ্যাক—

দারোগা জামার ভিতর থেকে ধপধপে সাদা পৈতেটা টেনে এনে শিশুবালার চোখের সামনে তুলে ধরল।

শিশুবালা দু'চোখ বুজে ফেলে, যেন দেখতে পায়— ভগবান স্বয়ং গাছে বসে আছেন পা ঝুলাঞে, পদ্দোফুলের পারা রাঙা পা দুখান, ত রাইবুলোধা কাঁড়বাঁশ লিয়ে ইদিক-সিদিক ঘুরছে, ঘুত্তে ঘুত্তে গাছের উপর মিরগির কান দেখে কাঁড় ছেড়ে দিল্ল-অ, সেই কাঁড়ে ভগবান মরে যাচ্ছেন, আর বলে যাচ্ছেন, রাইবু রে তুঁই বেড়ে পুন্নবান, ইবার থিক্যে তোর জাত হবে বেরাম্ভণের থিক্যেও বড়।

চোখ খুলে শিশুবালা কিন্তু দেখে, দারোগা তাকে পুরোদমে কব্জায় ফেলে দিয়েছে।

লোধাপাড়ার বেপোট এলাকায় ঢুকে থানার বড়বাবু যখন অকুতোভয়, তল্লাসি চালাচ্ছে নির্ভয়ে, মনের সুখে, তখন দোরখুলির জঙ্গলে লোধাপাড়ারই পুরুষলোধারা লাটাপাটার আড়ালে লুকিয়ে বসে থেকে বেদম ভয়ে কাঁপছে ঠিরঠির করে।

একজন মেয়েলোধাও এসেছে তাদের সঙ্গে। সে সোমবারি। রাইবু তাকে হাতে ধরে নিয়ে এসেছে। খালভরা-বেধুয়ামড়াদের বিশ্বাস কী? কখন কে খুবলে দেয়—কে জানে!

সোমবারির অত ডর-ভয় নেই। সে আসতেও চায়নি। রাইবু তাকে ধরে এনেছে জোর করে। আয় সম্বারি, মায়ের গব্‌ভে যাই চ!

জঙ্গলমায়ের গর্ভে আঁটারি-চুরচু কইম-কুড়চি বহড়া-পড়াশের ঝোপঝাড়ে এখন লুকিয়ে বসে আছে ডরপুক লোধা-পুরুষরা। এখন সামান্য একটা পাতা হিল্‌লেও ডর্‌র।

হিল্‌লাস নাই।

কেউ যেন নাচার হয়ে খুক করে কেসে উঠল।

কাস্‌সিস নাই।

কেউ যেন হড়বড়িয়ে ঝোপ ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল।

হড়বড়াস নাই।

কেউ যেন আগুনের ফুড়গুনি ছড়িয়ে শালপাতার চুটা টানল।

টান্‌নিস নাই।

রাইবু মানা করল, রাইবু মানা করল।

রাইবু মানা করল। বলল, খালভরাদের জীপগাড়িটার চোখদুটা যে ইদিকেই কটমটাচ্ছে—ভুবনা, হুই দ্যাক!

সত্যি সত্যি কান্তিড্রাইভার গাড়িটার হেডলাইটের ফোকাস ফেলে রেখেছে জঙ্গলের এদিকেই। আলোর ধোঁয়া উড়িয়ে ফোকাস দুটি এতদূর পর্যন্ত এসেও পড়েছে।

সোমবারি দেখল সে-আলোধোঁয়ার রূপ কী! কত অজস্র রাতপোকা আলোর মোহে পড়ে এখন লটরপটর।

একটা-দুটা রাতচরা পাখিও ভুচুঙ করে গলে গেল এপার ওপার।

খালি রাতচরা পাখি কী আর। বাদুড়, চামচিকা। কত শত বাঘযুগনী পোকাও অঁটাদড়িতে টিপা-লাইট গুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক।

সোমবারির ধরতে মন করল। ধরি, ধরি।

সে উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত তুলে ধবল।

হাত নামা, সম্বারি!

কেনে?

কেনে কী রে, দারগা নিরবংশোরা দেখে ফেলবে।

অত্ত নাই, আমার হাতে সোনার চুর-বালা আছে যে বেধুয়ামড়াদের চোখে ঝকমকাবে?

নাই থাক, মুখে বলেও রাইবু মনে মনে বলল, আছে বহিন, আছে। তোর হাত যে সোনার চেয়েও দামী।

আর কী আশ্চর্য! একটু এগিয়ে, আলো ধোঁয়াব ফোকাসের ভিতর সেই হাত দুটোই মেলে ধরে একগুঁয়ে আর জেদী মেয়েটা গিল গিল করে হেসে উঠল।

দুধিয়ালতা বাঁধা এই হাতদুটা কত্ত দেখবি দ্যাক নো মার!

সে দুধেলতা বাঁধা হাতদুটো আড়াআড়ি মেলে ধরেছে।

সোনার চুড়ি না, কাচের চুড়িও না, বোনের শুধু শুধু লতার দড়িবাঁধা হাতদুটো দেখে এত বিপদেও এত দুঃখেও রাইবু হেসে ফেলল।

ভুবনা ভাবল, কার বা পোষমাস কার বা সর্বনাশ।

সে আর বসে থাকতে পারল না। কী-ই যে হচ্ছে উদিকে এত্ক্ষণে কে জানে!

ভয়ে ঠির ঠির করে কাঁপতে কাঁপতে সে উঠে দাঁড়াল।

উঠ্ঠিস নাই, ভুবনা!

হুঁ, আর কত্ক্ষণ বা বসে থাকব?

ভীতু ভীতু মানুষটা যেন নিজের ভয় ভাঙাতেই উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে পড়ে এমনভাবে হাত-পা নাড়ছে যেন তার দেহে এখন অযুত হাতির বল।

সে দু-চাট্টা ঝোপঝাড়ের ডগাল সজনেপাতা ছাড়ানোর মতো দুহুরে ছিঁড়ে ফেলল।

তার হাবভাব দেখে রাইবু বলল, হাতে হাতকড়া পরতে চাস ভুবনা?

ভুবনলোধা মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, হাতে দুধিয়ালতা পরার চাইতে সেও একরকম ভাল রে রাইবু।

বলেই ঝোপের আরো গভীরে লুকিয়ে পড়ল।

রাইবু ভাবল, এরকমই তো হয়। আজ তো নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার যেখানেই চুরি হোক চামারি হোক, দারোগাবাবু তালাশ করতে ঠিক আসবে লোধাপাড়ায়। পুরুষলোধারা হাতে হতকড়া পড়বার ভয়ে লদোপদো দৌড়াবে ডুবকা-ডুংরিতে। যতক্ষণ তল্লাশি চলবে ততক্ষণ

লোধারা ঘরমুখো আর হবে না। দার্‌গাবাবু থানায় ফিরে গেলে সুলুকসন্ধান করে তবেই তারা নিরাপদে ঘরে ফিরবে। আজ বলে নয় এই তো হয়ে আসছে সেই কোন্ মান্ধাতার আমল থেকে। আজ শুধু শুধু অধৈর্য হয়ে উঠল কেন ভুবন!

তবে কী ভুবনার মনে অন্য ভয়?

ফুলটুসি, ফুলটুসি। কী আর খায় বড়জোর—শাকপাতা, বনের ফলমূলটা! তবু যেরকম হলবলি বউটা। —লন্ধা নাই ত ধর শালা লন্ধানীকে। গিদ্‌ধড় 'হাটুয়া' লোকেদের বিশ্বাস কী!

জঙ্গলমহালের রাজা রাইবু মল্লিক, দোরখুলি শবরপল্লীর মাতব্বর রাইবুলোধা। জঙ্গলমহালের প্রজা ভুবন মল্লিকের জন্য একটুক মমতা অনুভব করল।

তার বড় ইচ্ছা হল ভুবনকে ডেকে এনে সে বলে, অ রে, ভুবন, ভুবনারে! আয় তোর বুকে কঁড়ে আঙুল দাঁতে কামড়ে থুতু ছিটিয়ে মালিশ করে দিই টুকচার। ডরে তোর বুক করে ধড়াস ধড়াস!

তার মনে মনে কী হচ্ছে ভুবনাই জানে।

তবে বাবুদের বকমসকম দেখে তাব বউটার মন যে চায় বাবু হতে—

সে তো ভুবনাব জানা কথা। —খাবাবার মুরাদ নাই খালি লন্ধাছানা খালাসের আশ্— কথায় কথায় ঠেস মেরে বউ যে কতবার দিনের মধ্যে বলে!

জঙ্গলের আরো গভীরে, দারোগার জীপগাড়ির চোখদুটোর ছটার বাইরে, যেখানে শাল-আসনের 'লিজ' নেওয়া বনভূমিতে 'তসব ঠয়া'র চাষ হয়, লোধাঝোড় ভেঙে এখন সেদিকেই বাউলার তুল্য চলে যাবে ভুবন।

সোনালগাছেব পাতা চিরে দু'ভাঁজ করে, ভাঁজে কাঠি গুঁজে, কাঠিখুঁচির একদিকে পাতাব একপাল্লা, আরেকদিকে আরেকপাল্লা জড়িয়ে, মুখে ফুঁ দিয়ে আচমকা কে যেন অন্ধকারে শিস দিয়ে উঠল বাঁশির মতো। সে-শিস আশপাশের ডুবকা-ডুংরিকে ভেদ করে কাঁড়ের তুল্য ছুটে চলেছে দোরখুলিব শবরপল্লীতে।

আবেকটু হলেই দারোগার কানেও বিঁধত। রাইবু এক-হেঁচকায় শিসটাকে ফিরিয়ে এনে গোখরোর মতো হিসিয়ে উঠল, কুন্ বানচোত্ বে?

খিলখিলিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল সোমবারি।

আবার কে, তুমার সাকরেদ!

এত বিপদেব মধ্যেও রাইবু আরেকবার হেসে উঠল।

হঁ গুডগুড়িয়া। গুড়গুড়িয়া ছাড়া আর কে বা হতে পারে। আমারো তাই ভাবা উচিত ছিল। মা নাই মউসী নাই। বিহা-সাদিও হইল নাই—হাতে হাতকড়া পড়লেই বা কী, না পড়লেই বা কী!

গুড়গুড়ে!

হুঁউ, বল-অ।

ধ্যাস্টামো করিস নাই।

কেনে?

কেনে কী, লন্ধাজাইতের আজ বড় বিপদ।

বিপদ ত দেখ্হরি ডার্কি বড়ামথানে পূজা দেও।

সেই জন্যেই ত পাঁঠা খুঁজছি সেই কবে থিক্যে রে গুড়গুড়ে। তুঁই ত জানিস, পাঁঠার জন্যে কুথায় কুথায় না ঘুরেছি—পাতনা-তালডাংরা-ফুলবনি-মলতাবনি— এমন কী কইলকাতাও ঢুঁড়েছি—

পাও নাই? গুরভার অবাক জিজ্ঞাসা।

পাব নাই কেনে, পাচ্ছি, তবে সব দাগী। খুঁতঅলা পাঁঠা।

ই বাবা!

গুরভা না শরাবণলোধা, কে যেন বলল, পাথরডহরায় মনা চৌধুরীর একটা চ্যাঙচ্যাঙে পাঁঠা আছে।

লোধাপাড়ায়, শবরপল্লীতে, নিজেদের ঝুপড়িতে দারোগা যখন আঁদালে-কাঁদালে ঠাইঠুই লাঠির বাড়ি মেরে চলেছে, বউড়িঝিউড়িদের আদর করে গাল-বুক টিপে দিচ্ছে, তখন পরিত্রাণের আশায় ডুব্‌কা-ডুংরিতে রাইবু-গুরভা-গুড়কুঁদা-গুড়গুড়িয়ারা বাবু হয়ে বসে বনদ্যাবতার পূজার জন্য একটা খুঁতহীন পাঁঠার সুলুক নিচ্ছে।

আছে, আছে।

পাথরডহরায় না থাক নাকবিন্ধিতে আছে, নাকবিন্ধিতে না থাকে চামরবাঁধে আছে। চামরবাঁধ ফেল মারে ত নাদনগাড়িয়ায় আছে।

সোমবারি বাঁ হাতের চেটোয় ডানহাতের চাপড় মেরে উল্লাসে গুনগুন করল—

মুচড়াঁই বাঁধিয়ে ঝুঁটি চুড়ে দিমু ফুল গ
মুচড়াঁই বাঁধিয়ে ঝুঁটি চুড়ে দিমু ফুল—

কট্‌ কট্‌ কটাশ! কট্‌ কট্‌ কটাশ!!

আচমকা একটা মুরগী লোধাবস্তি থেকে জোড়া পা শূন্যে তুলে পেট ভাসিয়ে চিৎকার করতে করতে উড়ে এল।

জীপগাড়ির আলোর ফুঁক-নলি দুটি পেরিয়ে গেল নিমেষে।

নিমেষে, নিমেষে।

এত নিমেষে যে কার মুরগী, কী মুরগী—গুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ানো গুরভা-গুড়কুঁদা রাইবু-গুড়গুড়িয়ারা চিনতেই পারল না।

ভুবনা, যে-ভুবনা বাউলার তুল্য ঢুকে পড়েছিল জঙ্গলে, সেও গুলির বেগে দৌড়ে ফিরে এল।

বলল, ব্বাস রে! পশুপক্ষীকেও দারগাবাবু রেহাই দিল নাই!

বনের মোরগ, বড়-খুকড়া ত এ নয়, ঘর-মোরগ ঘর-মুরগীই।

কিন্তু কাহার? কাহার রে?

মনে হয় ত আমার।

গুরভা বলল।

গুড়কুঁদালোধা বলল, নাই আমারই কট্‌কটি কাটুলটা। ডাকটা শুনলি ন্নাই—কট্‌ কট্‌ কটাস, কট্‌ কট্‌ কটাস? আর কটা দিন থাকলেই ডিম পাড়ত!

রাইবু বলল, উঁহু, মুরগী ত নয়, ষাঁড়া-খুকড়া। ষাঁড়া-খুকড়াই কী কখনো ডিম পাড়ে, গুড়কুঁদা?

আজ কী হয়েছে ভুবনের, সে ভুবনাই জানে। বলল, পাড়ে, সময় সময় পাড়ে বই কি।

সোমবারি বলল, উসব জরপের কথা ছাড়-অ। ভাম-কটাসের পেট্টে যাবার আগে জীবটাকে ঢুঁড়ে দেখলে হয় নাই?

তা হয়, তব্বে—

রাইবু বলল, উ বেধুয়ামড়ারা যাক আগে।

থানার জীপগাড়িটা আর নেই। চলে গিয়েছে। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় শবরপল্লী এতক্ষণ আলোয় আলোময় ছিল। নেই। এখন আবার যে-কে সেই।

অন্ধকার, অন্ধকার।

আগুনের ফুড়গুনির মতো দূরে দূরে জ্বলছে দুটি একটি ডিবা! অকস্মাৎ ভিনজাতের আলোর অর্ন্তধানের সঙ্গে সঙ্গেই, স্বদেশী, আরো গাঢ় অন্ধকার যেন শবরপল্লীকে ঘিরে ধরল।

ঘিরে ধরেছে, ঘিরে ধরেছে।

জীপগাড়িটা চলে গিয়েছে। কিন্তু রেখে গিয়েছে পোড়া পেট্রলের গন্ধ আর একরাশ ধোঁয়া।

ঘর-ফিরতি লোধাপুরুষদের এখন সেই ধোঁয়াকেও ভয়, সেই পেট্রলের গন্ধকেও। কে জানে চতুর দারোগা হয়ত আলো নিভিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে ধারে কাছে কোথাও। ঘরে ফিরলেই খপ্ করে হাতে হাতকড়া—

ন্নাই যাব-অ এখন। রহ-অ, সবুর কর-অ।

ই বাবা! পষ্ট দেখলম যে!

কী?

ধোঁয়া উগলাতে উগলাতে গাড়িটা গুড়গুড়াএঞে হুই নারদার দিকে চলে গেল।

গেল ত?

হুঁ- উ।

কিন্তু—

কী?

ফিরে আসতে কতক্ষণ?

তা বটে, তা বটে। যে যায় সে ত ফিরেও আসে। ফিরে ফিরে আসে।

অতএব শুরু হয়ে যায় অপেক্ষা। অপেক্ষা আর অপেক্ষা। কখনো দধি-ভারিয়া উঠে যায় মাথার উপর। পোহাতারা ফুটে উঠে পূবের মেঘপাতালে।

কখনো ডিবা হাতে, কেবলমাত্র আলোর শিসটুকুকে শাড়ির আঁচলায় কোনমতে ঢেকে, লোধানী জঙ্গলের দিকে এগিয়ে আসে। আর ভয় নাই।

লোধাপুরুষও একপা দুপা করে এগোয়।

দেখা হয়ে যায় মাঝপথে। পথের বাঁকে।

জ্বলন্ত ডিবাকে ছেড়ে শাড়ির আঁচলা এবার উঠে আসে লোধানীর মুখে। হাসিকে আড়াল করে লোধানী বলে, আহা-হা-হা, মরদ বঠে! আস-অ নুগা বদলাবদলি করি। আমারটা তুমি পিঙ্কো, তুমারটা আমি—

লোধাপুরুষ মুখ নিচু করে, মুচকো হেসে লোধানীকে পেরিয়ে যায়।

লোধানী একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থেকে যাওন্ত পুরুষটাকে দেখে পিছন থেকে। তারপর, মুচকি হেসে, এক ঝটকায় মুখের কাপড়টা ফেলে ফের ডিবা-ডিবরির শিসটুকুকে আড়াল করে সেও হাঁটতে থাকে।

পিছু পিছু। ঘরের দিকে।

ঘরের দিকে, ঘরের দিকে।

আজ ডিবা-ডিবরি হাতে লোধানীদের আসতে হল না। লোধাপুরুষরাই এগিয়ে গেল।

সবার আগে সোমবারি। দুধিয়ালতায় মোড়া হাতদুটো দোলাতে দোলাতে।

যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এতক্ষণ লোধাপুরুষরা ডুবকাড়ুংরিতে আতঙ্কে অস্থিরতায়

অধৈর্য্যে আঁটারি-কুড়চির ডাল ভেঙেছে। সজনেগাছের ডাল থেকে পাতা দুহরানোর মতো ভাঙা ডালের পাতা দুহরেছে। একবার এ-ঝোপের আড়ালে আরেকবার সে-ঝোপের আড়ালে পর্যায়ক্রমে বসতে বসতে পায়ের তলার বসুমতীকে করে তুলেছে দলদলি কাদা। তেমনি বামালের খোঁজে লোধাবস্তির এ-ঘুপচিতে ঢুকে বামাল না পেয়ে রাগে দম্ভে গোটা লোধাপাড়া তসরপাত করে ছেড়েছে দারোগা আর তার সাকরেদরা। এনামেল আর কাঁশকুটের রঞ্চটা ফাটাফুটো দু-চাট্টা থালাবাসন—তাও লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। ডাণ্ডা মেরে ফাটিয়েছে জলের কলসি। মাটির হাঁড়িকুঁড়ি। ঝুপড়ির দেয়ালে টাঙানো কাঁড়-কাঁড়বাঁশটা হাতে নিয়ে টঙ্কার দিয়ে দেখেছে। বলা নেই কওয়া নেই সেটাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে বড়দারোগা।

টঙ্কার যখন দিল তখন দাঁতে দাঁত কামড়ে যেন বলল, আহা কী যেন—হেঁ-এএএ লুব্ধক? বিয়াধ? নিষাদ?

হামি ঠিক শুনি নাই গ। হামার শুনার ভুলও হতে পারে। হি হি—

হাসল শিশুবালা।

দলটায় ক জন?

আমাদের ইদিকে ত একজনাই। মোট্টে একজন।

ডানহাতের চেটো শাড়ির আঁচলায় মুড়ে ঘাম-ঘাম চিবুকটা মুছতে মুছতে শিশুবালা ভাবল, কুনখানটায়? ইখানে? উখানে? পেত্থমটায় কুনখানে যে হাতটা রেখেছিল নির্বংশা? জড়াঞে ধরেছিল কী? জাঁকামাড়া?

ন্নাই। অত্ত সস্তা?

তবেব? হুই ভাবনাটা ভাবলম কী করে? হুই যে—ভগবান স্বয়ং বসে আছেন পা ঝুলাঞে, পদ্দোফুলের পারা রাঙা পা দুখান?

সত্যি সত্যি ভাবলম কী আর?

ন্নাই ন্নাই, উসব মনের ভরম।

ঘরে ফিরে ভুবনার যত রাগ গিয়ে আছড়ে পড়ল বউয়ের উপর। উবু হয়ে বসে, ভাঁজ করা হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে, হাতের উপর থুতনি গুঁজে খানিক থম মেরে বসেছিল সে।

বউয়ের হাঁটাচলা দেখছিল।

ঘরে এসেছিল বাবু-ভায়েরা। ফুলটুসি তাই বুঝি মনের সুখে ছলর বলর হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। বঙ্কা মাহাতোর দোকানের কেরাসিনে মিটির মিটির কুপী জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।

কী মনে হতেই ভুবনা ধড়ফড়িয়ে উঠে বউয়ের পিঠে দুমদুম কিলিয়ে দিল।

কী কারণ, কেন মারল—এসব কোনোকিছুই জিজ্ঞাসা না করে ফুলটুসিও ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসল।

লোধাপাড়ায়, এইরাতে তার কান্নার ফিতার সঙ্গে জড়িয়ে গেল "আয় তিতি তিতি" করে আরো একটা কান্নামিশ্রিত ডাক।

গুড়কুঁদালোধার কটকটি কাটুলটাই হারিয়েছে।



সকাল।

ঘুপচির ভিতর আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে রাইবুর মাঝে মাঝে 'আড়বেলা'-কে মনে হয় সকাল, সকালকে আড়বেলা। আজ যেমন হল।

মনে হল 'দুপহরে' ঘুমিয়ে সাঁঝবেলার এই একটু আগে, দিনমণি যখন 'কেরমে কেরমে' অস্ত যাচ্ছেন, পাখ-পাখালি কেলর বেলর করে জঙ্গলে বাসায় ফিরছে, জঙ্গল টুঁড়ে পাতাপতর ছিঁড়ে কাঠকুটো মাথায় নিয়ে লোধাজনমানুষ ঘরে ফিরছে, তাদের হেঁসর ফেঁসর আওয়াজও শোনা যাচ্ছে, তখনই ঘুমটা ভাঙল। ভেঙে গেল।

সকাল না আড়বেলা? দিনমণি অস্ত যাচ্ছেন? না, উদয় হচ্ছেন?

ভ্রম কেটে যেতেই তড়াক করে উঠে বসল রাইবু। আগেরদিন রাতের সব বৃত্তান্তই মনে পড়ল তার। একরাতেই গোটা লোধাপাড়ার যেন শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে বড়দারোগো।

দিয়েছে, দিয়েছে। তবু তো কেউ ধরা পড়েনি, কারোর হাতে হাতকড়া পড়েনি। পড়তে দেয়নি রাইবুই। ভাবনাটা মনে আসতেই সে ফের মনে মনে রাজা হয়ে গেল। বনের রাজা, জঙ্গলমহালের রাজা। চারদিক থেকে 'রব' আসতে লাগল—হুই দ্যাখ রাজা, হুই দ্যাখ রাজা! শব্বররাজা!

আঁধার ঘরে গাঁদার গুঁদুর, কানে আসতেই রাইবুর স্মরণে এল, সত্যিই তো, অন্ধকার ঘুপচিতে শুয়ে এখন রাজার বাপ মহারাজাই বা কী করছে? একমাত্র লোধাপুরুষটাকে হাতের কাছে পেয়ে মারের চোটে তার হাড়গোড় ভেঙে দেয়নি তো বড়দারোগা? যার দরুন বুড়া এখন কঁহরাচ্ছে?

বাপ!

কে? রাব্বু?

দারগা তুমার কিছু ক্ষতি করে নাই ত?

ন্নাই। আমাকে দেখতে পায় নাই। চাটাইটায় ধড়-দেহ মুড়ে আমি তখন 'গুড়ুপুটলুর।'

হি-হি—

তুমার বুদ্ধি আছে, রাইবুও হেসে বলল, কিন্তু ইভাবে কদ্দিন?

কদ্দিন কী রে, চাঁদ-সুরয যদ্দিন। সেই বলে নাই—ধান খাইল গুঁড়ির ষাঁড়ে, পড়ল বামাল তাঁতির ঘাড়ে? চুরি হৈল যথাতথা, চোর টুঁড়তে লোদ্ধাপাড়া। গেল রাতে হয়েছে, হয়ত আবার হবে আসছে রাতে। আসছে রাত কোনমতে পার পায় যদি ত পরশু। পরশু নাই হলে তরশু—

ই বাবা, ই যে চলতেই থাকবে?

থাকবে।

কিন্তু কেনে?

পাপে রাব্বু, পাপে।

কার পাপে?

তুমার-আমার, আমাদের বাপ-চৌদ্দপুরুষের।

ছাড়ান নাই?

থাকবে নাই কেনে, আছে। ঐ যে, কাইলা কুদরা বাড়ির ভূত, খুকড়া দিলেই চাপচুপ। খুকড়া-পাঁঠা মানসিক দিয়ে পূজা কর বড়াম থানে। দেখবি, সব-ব ঠাণ্ডা।

পাঁঠা ত খুঁজছি সেই কবে থিক্যে! কিন্তু বড়াম থানে পূজা—সে ত হয়ে গেছে সেই চোত-সাঁকরাতে, আবার হবে পোষের শেষদিনে। তাহলে এখন? এমন অসময়ে?

মাতব্বর রাইবু ধন্দে-মন্দে মাথা নাড়ে। বড় মাতব্বর তাকে শলা-পরামর্শ দেয়। বলে, দ্যাবতাব পূজার ফের সময়-অসময় কী রে বাপ? বেপদে পড়েছে লদ্ধাজনমাড়ষ, পাপে ধরা হয়েছে টলমল—ত, লও ঠাকুর ফুল-জল! বেশ, মনে ধন্দ থাকে যদি ত 'দিহরি'কে ডাক। ডেকে পাঁচজনের সামনে জিগাস কর।

বুড়ো মিঙ মিঙ করে, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে বিড়বিড় করে, বলল 'গম্‌হা পুনোই' কবে? আজ শরাবণমাসের কতদিন হৈল? কবে পুন্নিমা?

জঙ্গলে রাত-দিন মাস-ঋতু পূর্ণিমা-অমাবস্যার কে অত হিসাব রাখে। হাতের আঙুলের 'কড়' গুনে গুনে, আর নয়ত ছিটে-বেড়ার ছঁচ-মাটি-লেপা দেয়ালে 'রেখ' কেটে কেটে যেটুকু হিসাব রাখা যায়, রাখা! তাও তো দামাল লোধাশিশু খেলাচ্ছলে হামেশাই একটি 'রেখ' টানা থাকলে অনুরূপ আরেকটা, বা একটা কেন দশটা 'রেখ' টেনে দিয়ে হাণ্ডুল-মাণ্ডুল করে গুলিয়ে দেয় সব হিসাব। তখন ভরসা বাবু-ভায়ারা, 'হাটুয়ারা'। তখন ভরসা বড়সোলের গজনালোধা। পাঁজি-পঞ্জিকা সেই রাখতে পারে, কেবলমাত্র দেখতে পারে সে-ই। আর নয়ত কুড়চিফুল ফুটে বন-জঙ্গল ডোবকা-ডুংরি ধবোয় ধবো হয়ে গেলে, ঝরা-মরার পরে চেঁকাশাকের গাছে চিরোল চিরোল পাতা গজালে, ভেলা-ভুড়রু বেল-কৎবেল পানআলু-চুরচুআলুর অঢেল সন্ধান মিললে তামাম লোধাজনমানুষ জেনে যায় এখন খরার কাল। ঝোপ-ঝাড়ের ধারে, বালিপোত অঞ্চলে, রদবদিয়ে বালিছাতু ফুটলে, লাল ভেলভেটের তুল্য অজস্র ছাতুপোকা ঘুরে বেড়ালে, কাড়হানছাতু কুড়কুড়িয়াছাতুর জন্য বাবু-ভায়াদের হাটুয়া-জনমানুষদের আব্দার বাড়লে, এ-ডালের খাঁজে সে-ডালের খাঁজে পাতায় মোড়া ভাতঅলা লাল পিঁপড়ের বাসা বা 'কুরকুট-পটম'-এর দেখা মিললে, আর দেখতে নেই চলছে আষাঢ়-শরাবণ মাস। ঝড়িয়া-বর্ষার মরশুম। পরবছাতু, আঁউলা-বাঁউলা, বন-কাঁকড়ো-কাঁকবোল, বেনাবুদা ফুলে ফুলময় হয়ে উঠলে তবে জানবে পরবের মাস। দুর্গাপূজা, বাঁদনাপরবের কাল। আর শীত? তেলহীন রুখো দেহে খড়ি ফুটলে, ঠোঁট ফাটলে, টাঁড়-টিকরে ডুবকা-ডুংরিতে দিবারাত্র 'ধুনি' জ্বললে, হি-হি ঠাণ্ডায় কী ঘরে কী বাইরে 'দাঁতকপাটি' লেগে যাবারই যোগাড়, তখনই পউষ-মাইসর মাস। কুয়াশায় বন-জঙ্গল ঢেকে গেলে, চলনরাস্তা-নদীবালি শিশিরের ফোঁটায় কুয়াশার জলে ভিজে সপ্ সপ্ করলে, টুপ্ টুপ্ মহুল পড়লে, মনে রাখবে মাঘ-ফাল্গুন—'যুগিনীবাটিয়া' বড়ামপূজার আর দেরি নেই। দেরি নেই, আর দেরি নেই। পাঁজি-পুঁথি কী করবে? লোধা জন-মানুষদের, জঙ্গলমানুষদের এ-সবই তো মুখস্থ! "যতই দেখ পাঁজিপুঁথি আষাঢ় মাসের সাতদিনে হয় অম্বুবাচী।"

গমাপুন্নিমা, "কভু নাই গমা আজ পুন্নিমা"—সে কবে? কবে? বাপকে মুখে 'জানি নাই' বলে মনে মনে ছলকে উঠল রাইবু। তাই ত, গমাপূর্ণিমা, তার আর কদ্দিন বাকি?

হাতে পৈতা, 'বামনা' বা বামনঠাকুর আড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে। যাবে রুখনীমারা, নারদা। মাহাতোদের গ্রামে। যাবে বড়োডাঙা, থুরিয়া। সদ্‌গোপদের গ্রামে।

যাবে উপর-পাতিনা, নামো-পাতিনা। কুম্ভকারদেব গ্রামে।

চারআনা আটআনার বিনিময়ে পৈতা বেচবে। পৈতা কেনার জন্য ছা-ছানাদের ভিতর হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। শুধু কী ছা-ছানারা, বড়রাও মাথা নোয়াবে। অং বং চং—মন্ত্র পড়ে বামুনঠাকুর পৈতা পরাবে।

আষাঢ়-শরাবণে যাদের হাতে পয়সা নেই, তাদের ছা-ছানারা ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে চেয়ে থাকবে। আর দূর থেকে, অনেকদূর থেকে দেখবে ল্যাঙট-ল্যাংটি পরা লোধাবাচ্চারা।

তারা পৈতা পরবে না। তারা ত 'বেরাম্ভনে'র থেকেও বড়।

পৈতার জন্য না, রাইবু মনে মনে লালায়িত হয়ে উঠল 'তসর ঠয়া'র জন্য। ওই শুভদিনে অন্যের 'লিজ' নেওয়া জঙ্গলে, 'আড়া'তে, তারা তসর চাষের সূচনা করবে। এর চেয়ে বড় উৎসব লোধাদের কাছে আর কী হতে পারে!

ওই গম্‌হা-পুনোইয়ের দিনেই বড়ামথানে পূজা লাগা, রাইবু। ঐ দিনেই ত বনদুর্গা, গম্‌হাসুরকে নিধন করে লোধাশবরদের, আমাদের পূর্বপুরুষদের, রক্ষা করেছিল। ইসব লিয়ে গজনালোধা বলে ভালো—

বাপের কথার দিকে রাইবুর আর এখন মন নেই। তার মনে এখন অন্য চিন্তা। অন্য চিন্তা, অন্য চিন্তা। এতদিন তো অন্যের 'লিজ' নেওয়া 'আড়ায়' তারা তসরের চাষ করে এসেছে, এবার নিজেরা 'লিজ' নিলে হয় না?

রাইবু মনে-মন বলে, উরি ব্বাপ! কত ট্যাকার ধাক্কা!

তা হোক। এর-তার কাছে উধার চাইব। দিম্লেশ্বর মাজন, বঙ্কা মাজন—

চাইলেই পাবি? লদ্ধাদের ফের ধার-উধার?

দিবে, দিবে।

ঐ আশায় বুক বাঁধ রাইবু। ঐ বলে নাই—আশায় মরে চাষা—

বাপের কথায় 'হুঁ' 'হাঁ' কোনমতে জবাব দিয়ে তসরচাষের চিন্তায় রাইবু বাসিমুখেই বেরিয়ে পড়ল। সে যাবে রুখনীমারা-টটাসাহি-ভালিয়াঘাটি—না হয় জোড়াশালতলা-ধ'তলা পেরিয়ে ঠাকুরবাঁধের জলেই দাঁতনকাঠি ঘষে মুখ ধুয়ে নেবে বাইবু। খিদে পেলে ভাত-ভুজা না, চোঁক চোঁক করে না হয় জলই খেয়ে নেবে ভর-পেট।

হন্ হন্ করে হাঁটছিল রাইবু। দু'ধারের কোনো দিকেই তার নজর নেই।

শুন্নো!

কে? অ—

আলুথালু বেসামাল দেহে ফুলটুসি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—

হেঁ ইয়ার তুমি বিহিত কর-অ।

গা ঘেঁষে দাঁড়াল ভুবনবউ।

কাঁদছে বটে, তবে যেন চোখে-মুখে শোকের চিহ্ন নেই।

যাচ্ছিল শুভ কাজে, ভিতরে ভিতরে কী যেন খুট করে ভেঙে গেল রাইবুর। বলল, হয়েছে কী?

কী হয় নাই!

বলে আরো জোরে জোরে কেঁদে উঠল ফুলটুসি।

উলুক ভুলুক চাদ্দিক দেখে নিয়ে রাইবু বলল, আহ্ চুপ চুপ!

চুপ করেই ত ছিলম এ্যাদ্দিন। আরো জোরেই চেঁচিয়ে বলল ফুলটুসি।

চ্যাঁচাচ্ছো কেনে?

সাধে কী আর! জ্বালায়, জ্বালায়! আমার জ্বালা কেহই বুঝল নাই!

বলেই যেমন দু'পা এগিয়ে এসেছিল, তেমনি দু'পা পিছিয়ে গেল। একেবারে চলে যাবার ভান করল, ভনিতা করল।

শশব্যস্ত হয়ে রাইবু মাতব্বরের মতোই হুঁকরে উঠল, আচ্ছাই মুস্কিল ত! নাই বললে জানব কী করে?

ফণা নামিয়ে প্রায় দৌড়ে এল ফুলটুসি। রাইবুর দিকে পিছন ফিরে, পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখাল, এই দেকো, মারের চোটে উ-ঢ্যামনা ফুলাঁই দিছে।

মনোযোগ দিয়ে নারীশরীর দেখছে রাইবু। মারের চিহ্নমাত্র নেই। পিঠের উপর দু'হাতে নাগরা বাজানোর মতো দমাদ্দম কটা কিল মেরেছিল ভুবন, তার আবার ফোলাফুলি কী? দাগদুগো কী?

তবু রাইবু হাসি চেপে বলল, মারল কেনে?

ডাকাবুকো হলবলি মেয়েমানুষের পেশীদৃপ্ত বাহুমূল বর্ষার মাগুরমাছের মতো খলবলাচ্ছে।

খাটো শাড়ির আঁচলায় চাপাচুপি দিয়ে ভুবনবউ ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, হামি নাকি গেল রাইতে দারগাব সঙ্গে শুয়েছি!

দারগা, দারগা! দাঁতে দাঁত চেপে গতরাতের ঘটনাটা ফের স্মরণে নিয়ে এল রাইবু। ভুবনবউ বলে চলেছে, ই বাবা, চোর ধত্তে আইল দারগাবাবু লদ্ধাপাড়ায়! লদ্ধাপুরুষরা ভাগল জঙ্গলে। আর চোর নাই ধরে দারগাবাবু আমাকে ধরল, আমার সঙে শুয়ে বসে কাটাল, গুয়া-পান খাওয়াল—

হুঙ্কার দিয়ে উঠল ফুলটুসি।

অত্ত যদি সন্দেহ মনে, জঙ্গলে নাই সেধাএে ঘরে বসে বহু পাহারা দিলি নাই কেনে? কেন্নে? কেন্নে? কেন্নে?

মাটিতে জোরে জোরে পা ঠুকতে লাগল ফুলটুসি।

রাইবু তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করল।

ঘরে যাও, সাঁঝবেলাকে দেখছি।

ঝটিতে মাথার উপর ঘোমটা টেনে দিল লোধানী। দিয়েই শাড়ির একখুঁট দাঁতে চেপে হাসল।

বলল, ঠিক ত?

ঠিক।

আরে রাইবু? তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। বলল লক্ষ্মণ পাতর।

কেনে মা'জন?

একটা দরকারে। বলে লক্ষ্মণ পাতর ঠাকুরবাঁধে রাইবুর কাছেই বসল। হাফশার্টের পকেট ঝেড়ে বিড়ি দিতে গেল রাইবুকে, নে রাইবু, টান।

কী দিচ্ছ, বিঁড়ি?

বিড়িই, আমাদের মতন মানুয ফের সিগ্রেট—

বলছ কী মা'জন, তুমি হৈলে ধনকুবীর।

খু-উ-ব খুশি লক্ষ্মণ মহাজন, রাইবুকে বলল, তা'লে বলছিস?

আমি কী বলব, রাজ্যসুদ্দু লোক বলছে। যাগ্গে, কী দরকার বল-অ?

বলছি চোরাই বাসন-কুশন আছে?

খানিক থম মেরে থেকে রাইবু বলল, ন্নাই। তার স্বর বড় অচেনা লাগছে।

আছে ত দে না, বড়ই দরকার।

কী কাজে লাগবে মা'জন?

বিয়েতে যৌতুক দেব, নোতুন থালাবাসনের যা দাম! মাল ত একই, খালি যা দোকানে ফেলে মাজা-ঘষা।

তা ঠিক, কিন্তুক তোমার ত টাকা আছে, লতুন কিনলেই পার-অ।

ধ্যাত্তেরে, খালি টাকা-ই দেখছিস, লাভ-ক্ষতি বুঝবি না?

উ-সব বুঝে আমার-বা কী হবে মা'জন, তুমি আর কুথাও দেখ-অ।

বলে লক্ষণ পাতরের উঠে যাবার আগেই রাইবু উঠে পড়ল, তার মন আজ ভাল যাচ্ছে না। কোথায় লক্ষণ পাতরের কাছে তসর চাষের জন্য ধার চাইবে, তা নয়—

দোরখুলি আর লোধাপাড়ার ভিতর ফারাক যা ছুঁচকো জঙ্গল, আঁই-টাঁই কিছু ডাহিজমি, কী মনে হতে রাইবু ওদিকটায় ঘুরে গেল।

দু'ধারের ঝোপঝাড় দগদগিয়ে বেড়ে যাচ্ছে, জলে-মাটিতে বত্তর এখন, কাড়হানছাতু, পরবছাতু গজিয়ে ঝোপঝাড়ের তলা ভরে যাবার কথা, রাইবু ঝোপ ফেড়ে দেখল না, সে খালি আপন মনে দু'ধারের লতাপাতা ছুঁয়ে-ছিঁড়ে হাঁটছিল।

আচমকা দুটো ঢেপচুপাখি মাথার উপর বিড়বিড়িয়ে ডেকে ঝোপের দিকে উড়ে গেল, আর তক্ষুণি রাইবুর ঠোঁটের ডগায়ও সেই গানটা এসে গেল—

ক্যারক্যাটা হামার ব্যাটা
ঢেপচু হামার লাতি—

রাইবু থেমে গেল, কথা আসছে তো সুর আসছে না মনে। তার মন আজ কিছুতেই ভাল যাচ্ছে না।

'আসু ধান' বা আউস ধান পেকে-ওঠার সময় এখন। গাছের 'মুঢ়া' কেটে, অর্থাৎ কাটাগাছের গুঁড়ির শিকড়-বাকড় তুলে, ঝাঁটিজঙ্গল সাফ করে চাষীরা ডাহিজমিনে ধান বুনেছিল সেই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে। সে-ধান হালি-মেঘের মতো বর্ণ ধরেছিল আষাঢ়ে। তার উপর বাতাস দিলে ধানগাছগুলো নুয়ে পড়ে লহ লহ করত। যেতে আসতে রাইবু লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন হাত বুলিয়ে দেখেছে, ধানপাতার ধার আছে বটে, তবু কী নরম!

এসব ধানক্ষেত বাবু-ভাইদেরই। কোথায় তাদের গাঁ আর কোথায় তাদের এইসব ধানক্ষেত! উটবন্দী খাস না তার রায়তি— কে জানে। রাইবু জানে না।

সে শুধু জানে, তাদের জমি নেই। ছিলও না কোনো কালে, বাপ কথায় কথায় বলত, এখনও বলে, নাকি পুরুল্যার পারগোড়া-লড়াইডুংরি-লটপদা-গাড়াসাগমা, আরো কী কী গ্রামের খেড়িয়াশবররা চাষাবাদ করে, কোঠাবাড়িও আছে তাদের। খেতি না থাকলে অন্যের খেতিতে কাজ করে।

আর তাও না থাকলে?

নদীর বালিতে নাকি অঢেল সোনা আছে। ঘুম থেকে উঠো রে, যাও রে, নদী-বালিতে বসো রে, বসে বসে চালুনি দিয়ে ছাঁকো রে—সোনা, আর সোনা। এই ডুমো ডুমো কী আর, এই টুকু টুকু। সোনার কণা।

তা হোক, তবু—

রাইবুর বাপ বলে, একেই ত লদী বহন্তি উদিক থেকে ইদিকেই। একেই জল একেই বালি। তবু কী হেরফের দ্যাখ। ইদিককার বালি ছেঁকে মরে গেলেও এককণা সোনা পাবি নাই।

নদীপারে কাঠ বেচতে যেতে আসতে রাইবু দিনমানে পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়ে বালি ছড়িয়ে দেখেছে—কোথায় সোনা? বালির ভিতর খালি ত মরা গুগলির হাড় আর নয়ত মাছের আঁশ।

জঙ্গলের মধ্যে সুখজুড়িতে দু'ঘর সাঁওতাল, দোরখুলিতে একঘর তাঁতি, আর সব মাহাতোরা, ভূমিজরা। তাদের জমিজমা আছে লোধাদের নেই।

নাই কেনে বাপ?

অভিশাপে।

কাহার? কাহার অভিশাপে, বাপ?

শিবঠাকুরের।

রাইবুর বাপ গেড়াশবর বলে, বড়সোলের গজনালোধার মুখ থিক্যে শুনা, লদ্ধাদের চাষবাস শিখাতে পেত্থমে গরু-হাল দিল শিবঠাকুর। দিয়ে বলল, চাষবাস কর। জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈয়ারী কর। ত জঙ্গল কাটতে কাটতে শব্বরের খিদা-তেষ্টা পায়। কী খায়, কী খায়—ন, হালের বলদটাকেই কেটে খেয়ে ফেলল। কিসে করে খাইল—ন, হাতির কানের তুল্য সেগুনপাল্হায়। সেই থিক্যে জানবি সেগুনের ডগ ভাঙলেও রক্তের পারা রস গড়ায়। যাকে দিয়ে চাষবাস করবি, তাকেই কী না কেটে খেয়ে ফেললি! হায় হায়রে বোকার জাত! রাগে কাঁই শিবঠাকুর তেখন অভিশাপ দিল, বনেজঙলেই ঘুরে ঘুরে মরবি তোরা। তোদের কপালে চাষবাস নাই। সেই বলে নাই— 'কপালে নাইক ঘি. ঠকঠকালে হবেক কি?'

সুখজুড়ির গোবরাসাঁওতালের আউসধানের খেতির ধার দিয়ে হাঁটছিলি রাইবু, মন খুবই খারাপ। ধানগাছগুলোর ফাঁক-ফোকব দিয়ে কাটা গাছের মুড়ো থেকে গজিয়ে উঠেছে কিছু জেদী গাছপালা। বিশেষ করে কেঁদ গাছ।

ধানের দুধ এখনও গাঢ় হয়ে জমেনি। তবু কিছু টিয়া-হরিয়াল এদিক-সেদিক উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কটা দিন বাদেই পাহারাদারির পাক্কা বন্দোবস্ত হবে। মহাজন, বাবু-ভায়াদের বউড়িঝিউড়িরা, গরু-ছাগলের বাগালরা পর্যন্ত ধান জাগতে ডাহি-জমিনে এসে যাবে। দেখা যাবে হেথা-হোথা ভুসভুসে কালো ছাতা, রোদে-রোদ্দুরে যখন-তখন ঝলসে উঠবে মাজা-ঘষা কাঁসার ঘটি, কাঁশকুটের গিনা-বাটি-তাটিয়া।

তারপরই তো ধানকাটা।

মোচ্ছব, মোচ্ছব। মোচ্ছব লেগে যাবে না জঙ্গলে! ডিহিতে নয় ডাহিতে।

তখন পাশ দিয়ে ন্যাঙট-পরা কী ন্যাঙটাভুটুঙ লোধাবাচ্চাও গেলে-এলে ডাহিমালিকরা, ডাহিমালিকদের ছা-ছানারাও আড়চোখে দেখবে।

খেতির এককোণে একলপ্তে কিছুটা জমির ধানগাছের ধানশিষগুলো নেই, হয়ত গরুতেই ছিঁড়ে খেয়েছে। তবু বলবে, এই লোধাছানারাই চুরি করেছে, ধর ব্যাটাকে!

ন্নাই। দু'হাত মেলে ধরে দেখাবে। ন্যাঙট খুলেও ঝাড়বে, এই দ্যাক. নাই।

তুই নাই করিস. তর বাপ করেছে!

আর পারছে না রাইবু, তার গা গুলোচ্ছে, বমি বমি ভাব। সে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে খেতির পাশে বসে পড়ল।

কী হ'য়েচে?

পেটটা ভাল নাই ডাগতরবাবু।

ব্যথা কচ্চে?

জল কাটছে, বড়বুড়ি।

উপেন কমপাউণ্ডার পেটটা খিমচে ধরতেই—

অত্ত চাপ দিবেন নাই ডাগতরবাবু. রোগা ভোগা মানুষ, কী খাই?

সব দেখে উপেন কমপাউণ্ডার বলল, কিরমি।

তা'লে কী হবে?

অ্যান্টিপার ছ'চামচ খা, সেরে যাবে।

হাঁ করলে, একশিশি উপুড় করে ঢেলে দিল উপেন কমপাউন্ডার। রাইবুর মনে পড়ল, স-ব মনে পড়ল। মনে পড়তেই সে এখন হাতজোড় করে মনে মনেই বলল, তা'লে কী হবে?

অ্যান্টিপার ছ'চামচ খা, সেরে যাবে। নে, হাঁ কর—

অমন হাঁ করেঁ আছিস যে রাইবু? কী মতলব?

যেন নিজের ধানক্ষেত থেকেই ভুস করে ভেসে উঠল সুখজুড়ির গব্‌রাসাঁওতাল। মাথায় ছেঁড়াধুতির পাগড়ি, হাতে টাঙ্গি। গায়ে হেথা-হোথা ছেঁড়া ঝিল ঝিল গেঞ্জি।

চোখবুজে ছিল, চোখ খুলে কী পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই রাইবু কেঁদে ফেলল। তার চোখের কোণা থেকে জল গড়াচ্ছে ঠির ঠির।

সামলে-সুমলে বলল, পেটটা দুখাচ্চে ডাগতরবাবু। থুড়ি, গব্‌রাবাবু।

গোবরাকে 'গব্‌রাদাদা' বলে রাইবু, এখন মুখ ফস্‌কে 'গব্‌রাবাবু' বলল।

পেট ব্যথা-ট্যাথার ধারে-কাছেও গেল না গব্‌রাসাঁওতাল। জিজ্ঞাসা করল, তুমাদের গেরামে পুলিশ কেনে আইল, রাইবু? আবার চুরিটুরি করছিস বোধায়?

ন্নাই। পুলিশ মিছামিছি আমাদের জড়াচ্ছে।

রাইবু উঠে দাঁড়াল।

গোবরাসাঁওতাল কাঁধে টাঙ্গি নিয়ে তার ডাহিব চারধারে ঘুরপাক খাচ্ছে। একপাক ঘুরে এসে ফের রাইবুর মুখোমুখি।

ধানে থোড় এসেঁ গেছে। পাকতে আর দেরি নাই। ইসময় আমার পাকাধানে মহি দিস নাই রাইবু। দিলে কিন্তুক—

যেতে যেতে টাঙ্গি উঁচিয়ে গব্‌রা বলল, তদের সব শালার হাতগুলা কেটে লুব-অ!

রাইবু কিছু বলল না, হাসল, "ইঁক-উঁক" কী একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের করল গলা দিয়ে। তারপর হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে লাগল আনসাট্‌কা।

চোর চোর। খালি চোর অপবাদ। খালি খালি চোর অপবাদ।

হাঁটতে হাটতে ঝোপে-ঝাড়ে লাটায়-পাটায় পদাঘাত করল সে। এমনসময়ই পাখিটা ডেকে উঠল, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!—উ-ল টু-টু—টু-টু-উ—

আরোই তেতে গেল রাইবু। শালার পাখ আজ তোর চ্চ্‌রা ছিঁড়ে লিব্ব!

বলেই ডাকটার পিছ্ন পিছ্ন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগল সে।



ব্রহ্মাকুমার আর তার বউ ঢুকেছে জঙ্গলে। ব্রহ্মা—জাতে সে কুমোর। কুমোর কুমার, কুমহার কুম্ভকার যাই বল, ব্রহ্মার কাছে সবই এক-সমান। জাতে কী হবে? আসল কথা তো পেট।

পেটের দায়েই জঙ্গলে ঢুকেছে ব্রহ্মাকুমার। আর তার বউ লবঙ্গ।

মাঝে মাঝে ব্রহ্মা অবশ্য তার বউকে রগড় করে বলে, বম্ভাকুমারী। এখন যেমন আসনগাছের একটা আস্ত ডালকে চটাতে চটাতে সুর করে হাঁক দিল, হে বম্‌ভাকুমারি!

বউ লবঙ্গও আঁটারি-চুরচুর ঝোপ থেকে একটা শুকনা আঁটারিডালকে টেনে বের করার কসরৎ করতে করতে হেসে বলল, কী তসুক কুম্‌হার?

স্বামীর নাম স্ত্রীদের মুখে আনতে নেই, বুদ্ধিমতী লবঙ্গ তাই ব্রহ্মাকুমারকে বলল 'তসুক কুম্‌হার'। আর, ব্রহ্মা ত 'হে ব্রহ্মাকুমারি' বলে সম্বোধন করতেই পারে লবঙ্গকে। কারণ 'রামায়ণ' 'মহাভারত' 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' 'ভাগবত'—সব একধারসে পড়তে পারে সে—

"ব্রহ্মা বলে বধি মোরে কত পাবে ধন।
যত পাপ করিয়াছ কহিব এখন।।
শত শক্র মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়।।"

হাঁড়ি-কুঁদা গড়ে। মাটির হাঁড়ি-কলসি গড়বার নিমিত্ত যেটুকু মাটির প্রয়োজন হয়, তা তারা নদীধারের মাঠ ঘাট থেকে মাগনায় পেয়ে যায়। পয়সা লাগে না। আর নদীধারে হাঁড়ি-কুঁদা গড়বার সুসার মাটি যা আছে, ব্রহ্মাকুমার বলে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিতেও তা ফুরাবে না।

অভাব যেটুকু কাঠের। কাঠ না হলে কুমোরের চলে কী করে? হাঁড়ি-কুঁড়ি পোড়াবার 'পোআনশাল' যে কাঠ বিহনে ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুমদের খেলাঘর হয়ে যায়। হাঁড়ি কুঁড়ি পোড়ানো না থাকলে, দিনের পর দিন 'পোআন-শালা' বন্ধ থাকলে, কুমোরপাড়ার ছা-ছানারা কিশোর-কিশোরীরা পোআনের বাসি ছাই মেখে মেখে ভূত হয়।

যাত্রা করে। যাত্রাপার্টির মেল-ফিমেল সাজে। সিনেমার ডায়লগ দেয়, গান করে। উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন সাজে। মিঠুন-শ্রীদেবী হয়। বয়ঃসন্ধিক্ষণের, যৌনতার, প্রথম পাঠটা সেরে নেয় এখান থেকেই। ব্রহ্মা-লবঙ্গের বেলায়ও ঘটেছিল তাই।

তাই, তাই।

ব্রহ্মাকুমার বউয়ের যোগ্য-জবাবী-কথায় হেসে চুপ মেরে যায়। না, বউয়েব রসবোধ আছে। ব্রহ্মাকুমারের যোগ্য ব্রহ্মাকুমারীই বটে লবঙ্গ। দ্বিগুন, তিনগুন উৎসাহে এখন বুড়িয়া চালাচ্ছে ব্রহ্মাকুমার।

একদণ্ডও গেল না, ফের ডাক দিল সে।

মরা-হাজা শুকনা ডাল টানাটানি ছেড়ে, হাতের কাতান ফেলে, ঘুবে দাঁড়িয়ে কোমরের শাড়ি খুলে ফের শাড়ীটা গাছ-কোমর বেঁধে লবঙ্গ বুক-চিতিয়ে উত্তর করল, কী?

কার যেন পায়ের আওয়াজ, মরনী?

আচমকা চিন্তিত, বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে ব্রহ্মাকুমার বউকে আর 'ব্রহ্মাকুমারী' বলে না, বলে 'মরনী'। মানে মরণশীল প্রাণী।

বউ বলল, কোথায় কী? খালি ত বুড়িয়ার আওয়াজ।

ডাল-কাটা থামিয়ে দিয়েছিল ব্রহ্মাকুমার।

বলল, না মরনী বুটের।

বুটের? এই জঙ্গলে বাঘ-ভালুক নেই, থাকলেও তত ভয়ের হত না যত ভয় ঐ বুটেব। বুটপরা বাবুদের। যত নিঃশব্দেই হাঁটুন তেনারা, জংলী রাস্তায় মড়মড়ে পাতার উপর তাঁদেব ভারী বুটের দাপুটে আওয়াজ কাঠ-চোরদের কানে এসে বাজবেই বাজবে।

তার উপর সে-বুট যদি হয় নরসিঙার।

নরসিঙা গাড় বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সড়করাস্তা থেকে অনেকটা দূরে, ভিতরে, নিরালা-নির্জনে কাঠ কাটতে ঢুকেছে ব্রহ্মাকুমার। ভারী 'কুড়াল' নিয়েও আসেনি, যা দিয়ে কাঠ কাটলে আওয়াজ শোনা যাবে অনেক দূর থেকেই।

নিয়ে এসেছে ত 'বুড়িয়া'। ছোটো কুঠার। ছোটো ছোটো কোপে এতক্ষণ একটা আসন ডাল কাটছিল। কাটা হলে সাইজ মতো আরো ছোটো ছোটো টুকরো করে ভার সাজাবে।

আসনকাঠে পোআনে হাঁড়ি পুড়বে বেশ। কেঁদ্‌কাঠ হলে দিগদারির একশেষ! চিড়বিড় চিড়বিড় করে জ্বলতে জ্বলতে কাঠের চোকলা ছিটাবে চারদিকে। কাঁচা তাতল হাঁড়িতে সে চোকলা ঢুকে গিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে হাতে-গড়া অত মেহনতের জিনিসকে। তার উপর আছে কেঁদকাঠের কালো ধোঁয়া।

আসনকাঠের অতসব নেই। জ্বলেও বেশ, পুড়েও বেশ। তাছাড়া আসনকাঠের ছাই-এ ভালো ক্ষার হয়। সে-ক্ষার সোডার চেয়েও ভালো। কাপড় কাচলে কাপড় হয়ে যাবে একেবারে ধবো, লাউফুল।

লাউফুল, লাউফুল।

আশ-পাশের জঙ্গলে কেঁদকাঠের প্রাচুর্য খুব, আসন চাও তো ঢোকো গভীরে। গহীন জঙ্গলে।

'পারমিট' ছাড়াই ঢুকে পড়েছে ব্রহ্মাকুমার, আর তার বউ লবঙ্গ।

বুটের আওয়াজের কথায় লবঙ্গর হাত-পা কেঁপে উঠল, সে এদিক-ওদিক একটু এগিয়ে-পিছিয়ে দেখে এসে বলল, ও-তোমার মনের 'ভম'। আন শুনতে ধান শুনেছ। পাখ-পাখালির ডাকও ত হতে পারে। জঙ্গলে কতরকম পাখ!

হেঁ, অনেক পক্ষী, অ-নে-ক—

বুড়িয়াটা কোমরে গুঁজে, গাছ থেকে নামতে নামতে ব্রহ্মাকুমারও বউয়ের কথায় হেসে সায় দিয়ে গড় গড় করে মুখস্থ বলল—

"অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর।
নানাজাতি পক্ষী সব আছে একত্তর।।
সারস-সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা।।
শারী শুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্যরঙ্ক।
খঞ্জন-খঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কঙ্ক।।
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রবাজ আর শিকরা সঞ্চাল।।
বক-বকী বাদুড়-বাদুড়ী নুরি টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাঠঠোকরিয়া।।"

লাফ দিয়ে গাছ থেকে শেষ ধাপটুকু নেমেই চুলে-শাড়িতে উলুরি ঝুলুরি কাঠি খোঁচায় ভরতি বউকে জড়িয়ে ধরল ব্রহ্মাকুমার।

আহ্ কী হচ্চে, ছাড়-অ, বলেও অনেক জানা-স্বামীর কব্জায় তলিয়ে যেতে যেতে তার বুকে আলতো কিল মেরে বউ লবঙ্গ বলে উঠল, এই তুমার আওয়াজ?

হুঁ-উ, বুটের।

বুটের লয় মাশাই।

তবে কিসের?

কাঠঠোকরার।

দু'প্রহর বেলা। সত্যিসত্যি কিছু পাখি ডাকছে, কোথাও বা হনুমান লাফ দিল এ-ডাল থেকে সে-ডালে। ঝুপ!

বোঁটায় নামমাত্র লটকে থাকা ঝুনো পাকাফল ঝরে গেল। টুপ!

সূর্য মাথার উপর। তার ছাব্‌কা ছাব্‌কা রোদ গাছপালার ভিতর দিয়ে নেমে এসে কোথাও বা মাটি ছুঁয়েছে, কোথাও অ-ছোঁয়া। ঘাস-ভুঁইয়ে আলোর চক্রা-বক্রা খেল্।

খেলা-মত্ত ব্রহ্মাকুমার আর লবঙ্গ আশ মিটিয়ে খেলা ছেড়ে ঝটিতি উঠে পড়ল। এখনও মেলা কাজ বাকি। ডালটাকে জুত করে কেটে নামাতে হবে, ঝুড়তে হবে, সাইজ করে কাটতে হবে, বাঁধতে হবে—

কাঠঠোকরার মতো তিরতির করে ফের গাছে উঠে গেল ব্রহ্মাকুমার।

তলায় দাঁড়িয়ে, শাড়ী থেকে শরীর থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কপট রাগ দেখিয়ে লবঙ্গ বলল, কা-ঠ-ঠো-ক-রা।

ব্রহ্মাকুমার হাসল। —"পুরুষের আটগুণ স্ত্রীলোকের কাম।"

বাঁধা-ছাঁদা শেষ, ভার তুলতে যাবে, এমন সময় ফরেস্টগার্ড নৃসিংহ, আর তিন খাকী হাফ-পেন্টুল। গামবুট পায়ে।

পারমিট? কই দেখা?

নাই।

তবে যে গাছ কেটেছিস?

গাছ ত কাটি নাই।

গামবুট দিয়ে বাঁধা-ছাঁদা ছিঁড়ে নরসিঙা বলল, এগুলো কী তবে?

গাছের ডাল।

ভোজালিটা এবার ব্রহ্মার পেটে ঠেকিয়ে নৃসিংহ, ডাল জন্মায় না গাছ জন্মায়?

"হাতে অস্ত্র থাকিলে লোকের জ্ঞান নাশে।" —হাত দিয়ে খাপে ভরা ভোজালিটা ঠেলে সরিয়ে ব্রহ্মাকুমার মন্ত্র পড়ল।

অ রে সনাতন! ই যে পুবাণ-মহাভারত ঝাড়ে।

এই, তোর গেরাম, অ্যাড্রেস কুথা? তিনজনের একজন পিছনে হাঁটুর গুঁতো মেরে জিজ্ঞাসা করল।

ব্রহ্মাকুমারের বউ লবঙ্গ এগিয়ে এসে আপত্তি তুলল, মারছ কেনে? চোর ধরেছ চালান দেও। তাবলে মারবে তুমি কুন আইনে?

ই বাবা, মাগ-ভাতার সবার মুখেই এক কথা, গায়ে হাত দিয়ে আদর করলেও বলে কী না—মারবে তুমি কুন আইনে?

নৃসিংহ মাহাতো গজরাচ্ছে, পারমিট ছাড়াই ফরেস্টে ঢুকেছিস, ইচ্ছামতো জঙ্গলে কাঠ কাটছিস, চুরি কচ্ছিস—ধরলেই দেখাচ্ছিস আইন! ধর ত গঙ্গাধর, মরদটার সঙ্গে ই শালীকেও চালান করে দিই!

গঙ্গাধর গার্ড দু'পা এগোতেই ব্রহ্মাকুমার দু'হাত তুলে মানা করল, খবরদার। —"বলহীন নারী জাতি কি করিতে পাবে।"

কী করিতে পারে? সাধু সাজছ, সাধুবাবা? ডাঁটো মাগ নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে শাল-আসন দামী দামী কাঠ কেটে ফেড়ে ফেলছিস, এখন আমরা যদি তোর পরিবারকে ধরে—হেঁ..তুই কী করবি? কী করবি তুই?

নরসিঙার জিভ থেকে যেন জল গড়াচ্ছে।

অন্য তিনজনও হাসছে খিঁক খিঁক করে।

ভয়ে, ভাবনায় ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল ব্রহ্মাকুমার। হ্যাঁ, তাই ত সে কী

করতে পারে? সে পারে বড়জোর হাতের বুড়িয়াটায় দু'ঘা বসিয়ে দিতে। কপাকপ।

কিন্তু সে একা, আর তারা চারজন। একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর। সঙ্গে লবঙ্গ আছে অবশ্য। তার হাতেও একটা ধারওয়ালা 'কাতান' আছে। কিছু করে যদি ত—

মিঙমিঙে গলায় ব্রহ্মাকুমার বলল—

"পরস্ত্রী লইয়া যেবা করেছে রমন।
চিরকাল বধি ভোগে নরক সে জন।।"

নরসিঙ্গা বলল, কী-ই বিড়বিড় কচ্ছিস? লে, ভার তোল্। চ, পাঁচকাহিনায়। সঙ্গী-সাথীদের শুনিয়ে শুনিয়ে সে মন্তব্য করল, এই শালা লধা আর কুঁভাররা জঙ্গলটাকে সাফা করে দিল, মাইরি!

জাত তুলে কথা বলতে নাই নরসিংহ! যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল ব্রহ্মাকুমার। —জঙ্গল কার? তোমার বাপের?

তুই যে বাপ তুললি?

খচে মচে নরসিঙ্গা ভোজালি খুলে ফেলল।

পায়ে পড়ে গেল লবঙ্গ।

ইবারের মতন ক্ষেমা করে দেও গাড়দাদা। সকাল থেকে খাবাদাবা নাই। লোকটা ভোকেই আন্সান্ বকচে।

কোনো কথাই শুনল না নরসিঙ্গা, আর তার দলবল। কাঠের ভার-কাঁধে ব্রহ্মাকে চালান করে দিচ্ছে বীট অফিসে, পাঁচকাহিনায় জরিমানার টাকা আদায় না হলে নয়াগ্রাম হাজতে।

হাজতেও না মিটলে ঝাড়গ্রাম আদালতে।

ই বাবা, একপেট খিদা লিএ্যে ভার-কাঁধে লোকটা এখন যাবে অতদূর পাঁচকাহিনা? লয়াগ্গেরাম? হয়ত মরেই যাবে রাস্তায়।

ডুকরে কেঁদে উঠল লবঙ্গ।

বলল, লিয়ে যাচ্চ, যাও। তা ফের কাঁধে কাঠ-ভার কেনে? কুন আইনে?

ই মাগী ত ফের আইন দেখাচ্চে! তড়পে উঠল নৃসিংহ। ব্রহ্মাকুমারকে বলল, সাঙাত, কাঠ-ভারটা তাহলে তোমার ইস্তিরিকেই দেও। উ শালি-ই নিয়ে চলুক বীট অফিসে, পাঁচকাহিনায়। খুব ত তাগদ দেখছি।

নরসিঙার মুখ খারাপ করা কথাবার্তায় অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল ব্রহ্মাকুমারের। তবু কটমট চোখে তাকিয়ে বউকে মানা করল সে।

আগে আগে নরসিঙ্গা, তার পিছনে ভার কাঁধে ব্রহ্মা। তার পিছনে আর তিন ফরেষ্টগার্ড।

তারও পিছনে, একটু তফাতে লবঙ্গ। তার ঝাঁটি-বোঝাটা পড়ে থাকল আরো পিছনে। ঝোপঝাড়ের আড়ে। যত্ন করে বাঁধা কটা ঝুনো শুকনো পড়াশঝাঁটি, আঁটারিঝাঁটি। চুলহায় দিলে দাউ দাউ জ্বলত।

পড়ে থাকল, পড়ে থাকল। মাথায় করে নিয়ে এলে গাড়বাবুরা অবশ্য মানা করত না। শুকনা ঝাঁটি গাছের ফলমূল পাল্হা-পতরে 'পারমিট' লাগে না।

কিন্তুক আপনার লোক চলল হাজতে, কী হবে মোর ঝাঁটিকাঠে? লবঙ্গ কোনরকম মনস্তাপ রাখল না। শুধু ঝাঁটিকাঠই কী পড়ে থাকল নির্জন বনে? আসনগাছের তলে? ঘাস-ভূঁইয়ে?

আর যা থাকল সে ত জানে বনের পাখ, কাঠঠোকরা।

কাঠঠোকরা, কাঠঠোকরা।

'কাঠঠোকরা' বলে একবার ডেকে উঠবে কী লবঙ্গ? —হঁ ডাকি, ডাকি। ডাকলেও যে-বুঝার সে-ই ত বুঝবে। নরসিঙা আর তার সঙ্গীসাথীরা কী বুঝবে?

মনে মনে নিজেকে ভৎর্সনা করল লবঙ্গ। ধুস্! ফাল্না-তুস্কা কী সব ভাবছি!

এসে গেল সড়করাস্তা। নৃসিংহ মাহাতো ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল, বহুটাকে ইবার যেতে বল গঙ্গাধর।

গঙ্গাধরগার্ড দাঁড়িয়ে পড়ল।

লবঙ্গ গঙ্গাধরকেও ছাড়িয়ে গেলে, গঙ্গাধর প্রায় হাতে ধরে লবঙ্গকে পিছু টেনে বলল, পিছু পিছু আর যাস নাই। কথা শুন, ঘরকে যা। জরিমানার যোগাড় দ্যাক।

সড়করাস্তায় এসে পড়ায় বুকে বল-ভরসা পেয়ে যাচ্ছিল লবঙ্গ। দু'ধারের ডুব্কা-ডুংরিতে গরু চরাচ্ছে গরু-বাগালরা। সামনেই দোরখুলির লোধাপাড়া। কিছু হয় যদি তো আর কিছু না পারুক, পেট খুলে চ্যাঁচাবে।

লবঙ্গ এগিয়েই যাচ্ছিল, এগিয়েই।

নৃসিংহ এবার জোড়া গামবুটে লাথি মারল, রাস্তায়। বিরক্তিতে।

বলল, মাগীটাকে হটা সনাতন। না'লে অফিসে গেলে ক্যাচাল বাধাবে।

সনাতন, গঙ্গাধর পথ আগলে দাঁড়াল দুজনেই।

তৃতীয়জন, নেপালী গাড়বাবুটা, বলল, ফিকির মৎ করো। ডেরামে যাও, রূপেয়া লে আও। ফলো করতা কাহে?

লবঙ্গ কী বুঝল, নেপালী গার্ডবাবুটার পা ধরেই ডুকরে কেঁদে উঠল।

আরে ছোড়ো ইয়ার, ক্যায়া করতা... রাম রাম...

পা ছাড়িয়ে সে দৌড়ুল।

এসব সত্ত্বেও নির্বিকার ব্রহ্মাকুমার ভার কাঁধে তালে তালে হেঁটে চলেছে। অন্য কোনো দিকে মন দিলেই যেন তার তাল কেটে যাবে হাঁটার।

এতক্ষণে নরসিঙার গুঁতো খেয়ে বউয়ের দিকে সে তাকায়।

লবঙ্গ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর সড়ক ছেড়ে লোধাপাড়ার রাস্তা ধরে।

আড়বেলা। তবু রোদের দাপট খুপ। ঘেমে হাল্লাট হয়ে যাচ্ছিল লবঙ্গ। শাড়ির আঁচলটা মাথায় কোনক্রমে দেওয়া।

দোরখুলির রাইবুলোধার ঘুপচিতে পৌছে সে যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। এখানে এসে প্রাণ খুলে কাঁদতে পারে লবঙ্গ। রাইবুর বউ শিশুবালা তার 'ফুল' যে। তার সঙ্গে ফুল পাতিয়েছে ব্রহ্মাকুমারের বউ লবঙ্গ।

ব্রহ্মা-রাইবু কুটুম্ব। সয়া।

শিশুবালা-লবঙ্গ। সয়ানি।

রাইবু নেই, ঘরেই ছিল শিশুবালা। কান্না শুনে দৌড়ে বেরিয়ে এল। অম্মাগ, বলেই নিজের সাফাশাড়িতে প্রথমেই সয়ানির চোখের জল মুছিয়ে দিল। বলল, রহ্-অ আগে বস-অ ত। ঠাণ্ডা হও দেখিন।

প্রায় কোলেই বসিয়ে ছাড়ল শিশুবালা।

এক ঘটি ঠাণ্ডা জল এনে সোমবারি বলল, খাও বহুদিদি, গলাটা ভিজাও।

জটালোধার বউবুড়ি হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এল, জল খাবেক কী লো, আগে ত ঠাণ্ডা হোক।

হাঁ তাই ত। রোদে তেতে পুড়ে এলে জল দিতে নেই হুট বলতে। ছাতি ফেটে যায়, 'মিত্যু'ও হতে পারে।

একে একে প্রায় সবাই, লোধাপাড়ার সব মেয়েরাই জড়ো হয়েছে রাইবুর ঘুপচিতে, কুঁড়ে

ঘরে। ছা-ছানারাও হাজির। শুধু পুরুষরা, যে-কজন ধান্দায় না বেরিয়ে এখনও ঘরে আছে, কেবল তারাই কাছে ভিড়ল না। মাইয়া মানুষদের ব্যাপার, পুরুষরা সেখানে কী করবে?

হাত দুটি পিছনে মুড়ে তারা ঘোরাঘুরি করতে লাগল ঐ দূরে, আড়াল-আবডালে। তাছাড়া অন্য জাতির মেয়েমানুষের কাছে তারা মুখ দেখাবে কী করে? সে রাইবুই পারে, রাইবুর না হয় সয়ানি।

মাত্র এক ঘটি জল খেয়ে, আদরে-আপ্যায়নে বিগলিত ব্রহ্মাকুমারের বউ লবঙ্গ তার সয়ানিকে, তার ফুলকে, সবকিছুই খুলে বলল।

শুনেই শিশুবালা দৌড়ুল, দাঁড়াও টুকচার, তুমার ঝাঁটিবোঝাটা এন্নে দিই। মেহনতের জিনিস ছাড়বে কেন্নে?

শিশুবালা গেলে জটালোধার বউবুড়ি কপাল চাপড়ে বলল, সবোই হামাদের কপাল রে বহিন! জঙ্গল বিহনে লদ্ধার যেমন উপাস, কাঠ বিহনে কুঁভারদেরও সব্বনাশ। হঁ কী নাই?

ব্রহ্মাকুমার উপস্থিত থাকলে এসময় নিশ্চয় নিশ্চয় মুখস্থ বলত—

"অনাহারী কেহ থাকে বর্ষা চারিমাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস।"

ঝাঁটি-বোঝা মাথায় নিয়ে একা একাই বাড়ি ফিরল লবঙ্গ। সঙ্গে আনল 'ফুল'-এর দেওয়া আধ পন অর্থাৎ দশগণ্ডা পরবছাতু, সকালে তোলা, এখনো বালি লেগে আছে ডাঁটিতে। আর আনল, রাইবু এলে রাইবুকে বলে সয়া'কে ছাড়িয়ে আনার প্রতিশ্রুতি।

কাঁদুল-মাদুল হয়ে শিশুবালা বলেছে, না জানি খালভরাদের জিম্মায় সয়া আমার কত-কষ্টে আছে!



রাইবু যেন তেড়ে-ফুঁড়ে এগোচ্ছিল। এগোচ্ছিল বনের ভিতর দিয়ে। আশ্রমের দিকে। এগোচ্ছিল দু'ধারের কাঁচা পাতা-পতর ছিঁড়ে, শুকনো ডাল-পালা মাড়িয়ে। মড় মড়।

এদিকটায় জঙ্গল কিছুটা গভীর। বড় বড় গাছ, শাল-পিয়াশাল ধ-আসন মহুল-জারুল কুসুম-কইম অর্জুন-বহড়া। মাটিও খুব উঁচু-নিচু, হুড়ি-ধুড়ি।

তারউপর এর তলা ওর উপর দিয়ে বহে চলেছে সীতানালা। সীতানালা, সীতানালা। ঝিরি ঝিরি ধারায় বহে যাবার ঝির্-ঝির্ আওয়াজ—এখন যেন দু'কান পেতে স্পষ্ট শুনল রাইবু।

বৈশাখে, সামান্য আগে-পিছে চৈত্রে কী জৈষ্ঠে, অনাবৃষ্টি হলে পাপে ধরা ভরে গেলে আরেক রকম আওয়াজও অনেক দূর থেকেই শোনা যায়। খোল-করতাল-মৃদঙ্গ সহযোগে চব্বিশপ্রহর কী অষ্টম প্রহরব্যাপী রাম নাম, হরিনাম সংকীর্তনের আওয়াজ—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।

কোঁচাওয়ালা ধুতি, গায়ে লাউফুলের মতো ধবো গেঞ্জি, গলায় কাঠমালা, নাকের ডগায় কপালে চন্দনের ফোঁটা, আরো কত কারিকুরি—দু'হাত তুলে কীর্তনীয়ারা যখন ত্রিভঙ্গ হয়ে আশ্রমে নেচে কুঁদে কীর্তন করত, তখন জায়গাটাকে রাইবুর মনে হত 'স্বর্গধাম'।

চব্বিশপ্রহর কী অষ্টমপ্রহরের সময় নয় এখন, কীর্তনের 'ক'-ও শোনা যাচ্ছে না, তবু রাইবু দু'হাত জড়ো করে নমো করল। 'মোচ্ছব' হলে খাওয়া-দাওয়ার অভাব থাকে না।

কাঁচা কলাপাতায়, শালপাতার 'থালি'-তে সাদা সাদা ভাত আর কাঁচা মুগের ডাল—খাও রে দাও রে, যার যত খুশি। তবু ফুরোচ্ছে না, আসছে তো আসছে। এক পাঁতায় হাড়ি-মুচি-ডোম, কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয়, সব এক-সমান।

সাধুবাবাকে আজই বলবে রাইবু, ইর'ম মোচ্ছব তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের সবদিনই লাগাও দেখি। তবে জানব সাধুর সাধু মহাসাধু তুমি।

ভাবতে ভাবতে মোচ্ছবে খাওয়া-দাওয়ার সুখ মনে করে সীতানালা খালের জলে নেমে ভরপেট জলই খেয়ে নিল রাইবু। তারপর কী মনে হতে পরনের গামছা খুলে স্নান করল। পাখপাখালির জলে-ভিজা ডানা ঝাড়ার মতো দু'হাত দিয়ে অতি দ্রুত চুল ঝেড়ে নিল সে।

আর তারপর সাধুবাবার তপোবনে ঢুকে, আশ্রমের বাগানের কলাপাতা কেটে জলে ধুয়ে একেবারে 'ভোগঘরের' দরজায় হাজিব হয়ে হাঁক দিল, কুথা গেলে গ' সাধুবাবা, দও চাট্টি 'ভোগ' দও।

বলেই মেঝেতে বসে পড়ে সে তার বিছানো-কলাপাতার উপরকার জল ডান হাতের মুঠো দিয়ে ঘন ঘন মুছতে লাগল। তার আর তর সইছে না।

গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের উলুরি-ঝুলুরি আলো এসে পড়েছে আশ্রমের ঘরে-দোরে। নিগমা মন্দিরে।

'ধুনিকুণ্ডে' বা যজ্ঞকুণ্ডে ধুনি জ্বলছে। জ্বলছে তো জ্বলছে। যতবার আশ্রমে এসেছে রাইবু ততবারই সঙ্গে নিয়ে এসেছে শুকনো একফালি কাঠ। শুধু রাইবু বা কেন, যে-ই আসে আশ্রমদর্শনে সেই তো নিয়ে আসে। নিয়ে আসাই নিয়ম। কাঠের গুঁড়ি, চ্যালাকাঠ কী জুমড়া এনেই ফেলে দেয় অগ্নিকুণ্ডে। সে অগ্নি অনির্বাণ জ্বলে। জ্বলতে থাকে। কী শীত কী গ্রীষ্ম কী বর্ষা।

আজ, আজকেই, কী রকম বিভ্রম হয়ে গেল রাইবুর। কাঠ আনতে ভুলে গেল সে।

মনে পড়তেই 'ও-হো-ওওও' বলে পাতা ছেড়ে উঠে পড়ল। উঠেই দৌড়ুল—দৌড়, দৌড়, দৌড়—

হতচকিত সাধুবাবা, কী-ই জানি আপ্যায়নে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে গেল কী, মনে খেদ নিয়ে পিছু পিছু ডেকে চলেছে, যাস না, ফিরে আয় রাইবু, ভোগান্ন খেয়ে যাও শবরপুত্র!

সাধুবাবা সময় সময় রাইবুকে আদর করে আবেগ-আপ্লুত স্বরে ডাকে 'শবরপুত্র' বলে। আর সোমবারিকে 'শবরকন্যা'।

লোকটা বড় ভাল, লোধারা তাকে বড় মান্যি করে, তাব আশ্রম বড় নিরাপদ স্থান।

টুকচার আসচি, বলেই রাইবু দৌড়ুল হনুমানচৌকির ওদিকে। হনুমানচৌকি—সে আর এক তিলকমাটির 'ছড়ি'। সেখানে, সেই চৌকিতে বসে হনুমান নাকি পাহারা দিত লব-কুশের আশ্রম।

কতদিন এদিকটায় এসে রাইবু স্বচক্ষে দেখেছে, এক মস্ত মুখপোড়া হনু তার ইয়া লম্বা ল্যাজুড় প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়ে চৌকিতে বসে আছে, আশ্রমের উল্টোদিকেই মুখ করে।

কে জানে এ সেই কী না। সাধুবাবা তো বলে, রামভক্ত হনুমানের মরণ নাই। সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেছে, এখন কলিতেও সে আছে। আছে, আছে।

তবে আজ চৌকিতে হনুমানটিকে বসে থাকতে দেখল না রাইবু। চৌকি ফাঁকা। নির্ভয়ে চৌকির আশ-পাশের জঙ্গলে ঢুকে একটা শুকনো মূঢ়া-কাঠ হাতে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এল সে। এসেই সে-কাঠ ছুঁড়ে দিল অগ্নিকুণ্ডে।

ও, এইজন্য?

সাধুবাবা যেন খুশিতে উথলে উঠে আশীর্বাদ করল রাইবুকে। হাসল।

রাইবুও হাসল।

তবে মনে মনে বলল, সাধুবাবারা আজকাল বর-টর দিচ্ছে নাই কেনে? বর দিলেই ত পারে। এই যেমন, তোর ভক্তিতে খুশি হয়েছি রাইবু, তোকে এই বর দিলাম—তোর আনেক 'অশ্ব' হবে।

আর কবে হবে—

ফের হাত ধুয়ে সে পাতায় বসল।

কই কী দিচ্ছ, দও?

কী আর দেবে, একজনের খাবার বড়জোর দু'জনে ভাগ করে খাবে।

এতে রাইবুর এতটুকু আপত্তি আফশোষ নেই। সাধুবাবা রোজই তো দুধটা কলাটা মূলাটা পেট পুরে খায়। আজ না হয় একটু আধপেটা খেল।

দেখে ত মনে হয় না—বাবার রাগ-চাড় আছে। সব সময়ই ত হাসছে। অট্টহাস্য।

রাইবু খেতে বসল।

অট্টহাস্য করে সাধুবাবা বলল, এদিকে আজ কী মনে করে রাইবু?

রাইবু এঁটো হাত জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে বলল, মনের কথা ত মনই জানে সাধুবাবা।

এদিকে এলে রাইবুও কেমন সাধু-সাধু হয়ে যায়। সে-ও ভাল ভাল কথা বলতে চায়। কিন্তু ভাব আসে তো ভাষা আসে না। এই লোকটা তাদের খুব মান্য করে, এর উপর আবদার করে বড় বড় কথা, দুটো ছোট-বড় কথাও অনায়াসে বলা যায়।

হাঁ, মনের কথা মনে, সাধুবাবা চোখ বুজল, মনসা চিন্তিতম কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ। শুনলি ত—এবার খুলে বল দেখি, রাইবু?

কী-ই বলব বা। ঘুরছিলিম জঙ্গলে জঙ্গলে, ত ভোক লাগল। ভাবলম যাই সাধুবাবার আশ্রমে—'ভোগ' কী আর মিলবে নাই।

তা বেশ করেছিস। আর খাবি?

থাকলে আর টুকচার দও।

সম্পূর্ণ খাবার ঢেলে দিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল সাধুবাবা।

খা, তোদের খেতে দেখলেও সুখ আমার।

সাদা-শুকনো ভাত, ধোয়া মুগের ডাল, আলু-কাঁচকলার ঘেঁট। ডালটা 'দোনায়' ঢেলে খেলে বেশ 'হাঁপাবে' খাওয়া যেত। একেক গ্রাস ভাত আর গ্রাসে গ্রাসে ডালের জুস—

এক তরফা খাওয়া সেরে আর কোনো কথা নেই, নিগমামন্দিরের সিমেন্ট বাঁধানো চাতালের উপর 'নমথম' হয়ে শুয়ে পড়ল রাইবু!

শুয়েই ঘুমিয়ে গেল।

ঘুম থেকে উঠে সে দেখল, পাথরডহরার চৌধুরীমহাজন সাধুবাবার সঙ্গে একান্তে বসে জোর ষড়যন্ত্র করছে। শলা-পরামর্শ গুজুর-গুজুর ফুসর-ফুসুর।

রাইবুর মনে হল, ষড়যন্ত্রই।

সে একটা শালপাতার চুটা ধরিয়ে, উবু হয়ে বসে, ভাঁজ করা হাঁটুর উপর দু'হাত ভাঁজ করে রেখে, চোখ বুজে ধোঁয়া গিলছে, ধোঁয়া উগরাচ্ছে। আর মনে মনে বলছে—

দও দও কিছু টাকা দও সাধুবাবা, ইবার 'তসরঠয়ার' চাষটা নিজে নিজেই করি। মহাজনের খাতক হয়ে আর না। হরগিজ্ না।

টাকার কথায় অট্টহাস্য।

উসব পেঁদ ছাড়-অ, বিশাস হয় যদি ত দও, আর নাই যদি ত বল-অ, চলে যাই।

ফের অট্টহাস্য।

বুঢ়া বাপের কিরা, তসরঠয়া বিকে তুমার টাকা তুমাকেই দিয়ে দিব-অ, অ সাধুবাবা!

আর যদি নাই দিস? সব পেটেই খেয়ে ফেলিস? তোদের যা বড় বড় পেট—

যদি নাই দিই, যদি পেটেই খেয়ে ফেলি—তুমার ত আ-নে-ক আছে সাধুবাবা, সবোই ভক্তদের দেওয়া, তখন মনে কর নাই কেনে ভক্তদের জিনিস ভক্তদেরই দানধান করে দিয়েছ।

আচ্ছা, তাই মনে করব না হয়। ত কত টাকা চাস?

সে ত হিসাব করি নাই সাধুবাবা। ক-ত আর, বনটা 'লিজ' লিতে ফরেস্টারের কাছে যে নিলাম ডাক হবে—তার পুরোটাই তুমাকে দিতে হবে, আমার আর পয়সা কুথা?

দ্যাক রাইবু, আমি সাধুমানুষ, অ-ত পয়সা কুথাল্লে পাই!

তার আমি কী জানি? এই আমি হাত পাতলম, দও টাকা—

নিগমা মন্দির চত্বরে, চোখ বুজে, শূন্যে হাত পেতে বসে আছে রাইবু, বসেই আছে। ওদিকে চৌধুরীমহাজন আর সাধুবাবার কথা, শলা-পরামর্শ, ফুরোয় না আর ফুরোয় না।

কী অত কথা? ব্যাঙের মাথা। কী ব্যাঙ? টুরি ব্যাঙ। কী করে? টুর টুরায়, আর টুর টুরায়।

ধীরে ধীরে বেলা আড় হয়ে যায়। ছায়া লম্বা হতে থাকে। গাছের ছায়া, পাতার ছায়া। রাইবুর শূন্যে পেতে রাখা হাতের ছায়া।

রাইবুর হাতের ছায়াও বড় হতে হতে একসময় চৌধুরীমহাজন আর সাধুবাবাকে ছুঁয়ে ফেলে। তবু টাকা কই? টাকা ত আসে না। পাতা-হাত টন টন করে। আর তুলে রাখা যায় না।

ধ্যা-ত্তে-রি-কা! বলে শূন্যে পেতে রাখা হাতের চেটো দিয়ে নিগমা মন্দিরের দেয়ালে একটা চড় কষিয়ে ফের দৌড় শুরু করল রাইবু।

তপোবন ছেড়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে ভাসতে ভাসতে সে যেন এগিয়ে চলেছে গভীর বন থেকে অগভীর ডুবকা-ডুংরির দিকে। ডুবকা ছেড়ে গোঠটাঁড়ের মাঠ ভেঙে একসময় সে লবকেশ পুর গ্রামে যাবে। মহাজনদের ঘরে। গেল সনেই 'তসর ঠয়া'র চাষ-আবাদ বাবদ দাদন নেওয়া আছে। এখন তার কী হবে? চাষ উঠলেই তো দাদনবাবদ কাহন কাহন তসরগুটি 'আড়ায়' ঢুকে প্রায় কেড়েই নিয়ে যাবে মহাজনরা। তার বেলা?

চিন্তায় চিন্তায় হাল্লাট হয়ে যাচ্ছে রাইবু। তবু কী মনে করে মহাজনদের ঘরের দিকেই ফের এগিয়ে চলেছে সে।

পড়ন্ত বেলা। এখন যে-যার ঘরে ফেরারই পালা। গরুর গোঠ, যা সেই সকাল থেকে দাপিয়ে বেড়িয়েছে ডুবকা-ডুংরিতে, চুরনী গরুর গলায় বাঁধা 'ঠরকা' বা কাঠের ঘণ্টী ঘাড় নিচু করে ঘাস খাবার তালে তালে বেজে চলেছে সারা তল্লাট সারাটা দিন, এখন সে-সবকিছুরই ঘরে ফেরার পালা, থেমে যাবার কাল।

পাখিরাও, পাখ-পাখালিরাও, আরেকটু বাদে কেলর-বেলর করতে করতে গাছে ফিরবে, ঝোপে ফিরবে। গাছের চারধারে, ঝোপের চারধারে ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘুরে ঘুরে কলরব করতে করতে চুপ করে যাবে একসময়।

শুধু রাইবু তখনও হাঁটবে। হাঁটতে থাকবে, হাঁটতে থাকবে।

হাঁটতে হাঁটতে সে এখন দেখল, মাঝু-ডুব্‌কার ওদিকটায় আগুন! দপ্‌ করে জ্বলে আঁটারি-চুরচুর কুড়চি-পড়াশের মাথা ছাপিয়ে উপরে উঠছে নিচেয় নামছে। সেই সঙ্গে পড়ছে হাততালি, আর জমে উঠছে হুল্লোড়—

দেখতে নেই গরুবাগালরা, ছাগলচরানীরা গোঠ নিয়ে ঘরে ফেরার আগে বনের মাদাল পুড়িয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছে।

পায়ে পায়ে রাইবুও এগিয়ে গেল সেদিকে।

থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে গরুর গোঠ। গরুগুলো সারাদিন বন টুঁড়ে ঘাস-পাতা ঢুকিয়েছে পেটে। পেট এখন খাবারের ভারে দমসম। হদলস ফদলস।

আর লোভ নেই খাবারে, অরুচি। গরুগুলো তাই এখন অলস জাবর কাটছে। কোন্‌টা বা উচাটন মন নিয়ে আকাশমুখো।

আর কেউ আঁদালে-কাঁদালে টুঁসছে। গলার ঘণ্টা খুলে নেওয়া চুরনী গরুগুলো যা এখনও হামলে খেয়ে নিচ্ছে শেষ খাবল।

দু-একজন বাগাল ছেলে হাতে পইনা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে গোঠের চারধারে। ঘোরাঘুরি কী আর, পাহারা। পাহারা দিচ্ছে যাতে গোঠ ভেঙে একটাও না উধাও হয়ে যায়।

বাকিরা মেতে আছে আতা-পোড়ায়। বন টুঁড়ে ডুংরি ঘেঁটে 'ঘর-ছাড়া' 'ভাতি' মেহা-মাদাল যোগাড় করে তিল-খসার শুকনো গাছপালায় ধরিয়েছে আগুন। আতা পুড়ছে।

আতা পুড়বে, পুড়ে আতার খোসা আঙরা হবে। গাদা থেকে এক-একটা আঙরা-আতা হাতে ভেঙে চাখো রে খাও রে। লাগছে কেমন? না, অম্রুতো!

এখন গাদা ভাঙার পালা, খেলা শেষের খেলা। গণ্ডা গণ্ডা পোড়া আতা ভাগ হবে। যে-যার ভাগ কোঁচড়ে পুরে কতক খাবে, আর কতক নিয়ে যাবে ঘরে।

এক-আধটা পোড়া আতার জন্য শালপাতার চুটা ধরিয়ে বসে থাকল রাইবু।

বসে বসে গরু দেখল। গরুর শিং, কান, চোখ, জিভ আর ল্যাজুড়। ল্যাজুড়ের ডগায় চুলের চামর দেখল। সে-চামর অনবরত পেটের দু'দিকে বুলিয়ে চলেছে, বিঁচে চলেছে অবলা জীবগুলো।

সেসব জীব নিয়ে চাষাবাদ করে পরম সুখে কোথায় ঘর করবি, তা নয় কেটে কী না খেয়ে ফেললি?

বোকার মরণ! বুঢ়বক জাত কোথাকার! ছিঃ থুঃ করে শালপাতার চুটাও ফেলে দিল রাইবু।

মাছরাঁকার মতন বসে আছিস যে বড়ো?

পাহারাদার বাগালছোঁড়ার ধমক।

হেঁ হেঁ করে একরকম হাসল, গলা দিয়ে কোনো স্বর বের করতে পারল না রাইবু।

গরু চুরির মতলব নাকি?

ফের ধমক।

ন্নাই, প্রায় হাতজোড় করে ফেলল রাইবু, কী যে বলিস মহন!

তবে হাঁ করে কী গিলছিস?

ধুঁয়া। মেহা পুড়ার ধুঁয়াও খুব মিষ্টি লাগে। এক-আধখানা দিবি মহন?

তা না হয় দিব-অ। উদিকে খবর শুনেছিস?

কী?

তোর সয়া বেন্তাকুঁভারকে নরসিঙ্গ—

কী মহন?

কী আবার, এত্‌খনে ধরে-বেঁধে হাজতে। বহুটাকেও দিত, কী ভাগ্যে ছেড়ে দিল। এই ত

ইদিক দিয়ে সুরুক সুরুক কাঁদতে কাঁদতে গেল বহুটা!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রাইবু। থাকুক গে মেহা-পোড়া! সে এখন কোন্‌দিকে যাবে? সয়ার খোঁজে বীট-অফিসে? না, সয়ানীর সন্ধানে ঘরের দিকে?



আজ গামাপূর্ণিমা।

ঝরন নেই, ঝরন থেমে গেছে। মেঘমুক্ত 'মেঘপাতাল'। আকাশে হিড় হিড় দিড় দিড়ও নেই। মনে হচ্ছে রোদও উঠবে।

লোধাপাড়ায় আজ ভারি ব্যস্ততা। ভোর থেকেই।

পোহাতারা উঠতে না উঠতেই একবার ডাক দিয়ে গেছে রাইবু, এই ভুবনা, এই গুড়গুড়ে, এই গুরভা, এই গুড়কুঁদা, এই শরাবণ—

উঠ, উঠরে! আর ঘুমাস নাই। জাগত থাক।

উদ্দীপনা, উত্তেজনায় রাইবুর চোখে ঘুম নেই। সারা রাত।

সারা রাত, সারা রাত।

হেঁ কত-অ বড় 'জয়' বল-অ! হাতে করে কাহন কাহন 'তসরঠয়া' আর তুলে দিতে হবে না মহাজনদের ঘরে। এবার থেকে নিজেদের 'ঠয়া' নিজেরাই বেচব। আর কারো ফপরদালালি সইতে হবে না।

পাতর মহাজন, সাউ মহাজন, দঁড়পাট মহাজন মাহাতো মহাজনরাও 'লিজ' নিতে কম লড়াই লড়েনি। তবে ফরেস্টারবাবুটা লোক ভালো। লোধাদেরই দিয়ে দিল।

বলল,—

কী যেন বলল, বড় বড় কথা, জঙ্গলের অধিকার জঙ্গলবাসীদেরই দিতে হবে। তবে নাকি জঙ্গল ঠিক থাকবে।

রাইবু মনে-মন ভাবে— আরে বাবা, সেসব কথা আর বলতে!

লদ্ধাপাড়ার জট্টাদিদিও ত সে কথা ভাল্লমত জানে।

ফরেস্টারবাবুটা যখন কাগজে খসখস করে সই দিচ্ছে তখন নরসিঙাগাড় 'বিলাই চোখে' কটমট করে তাকাচ্ছে।

মনে মনে তড়পে উঠেছিল রাইবু, ওর'ম চোখ তোর গেলে দিব-অ রে নরসিঙা!

সেই জয়-পরাজয়ের ফয়সালা হয়ে গেছে কবেই।

আজ গম্‌হা পূর্ণিমা। আজ থেকেই তসর চাষের সূচনা করবে রাইবু-ভুবন-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা।

কদিন ধরেই বঙ্কামাহাতোর মুদিখানার দোকানে কাপড়কাচা সোডার কী বিক্রি, কী বিক্রি!

সোডা তো নয় সোড়া।

সড়া মাট্টি আচে মা'জন?

এক লোধানী শাড়ির আঁচলায় বাঁধা পুঁটলি মাটিতে থেপে রেখে বলল।

নাই, সোড়ামাটির অত কী-ই দরকার? আসনকাঠের ছাই দিয়েই কাচ না। কাপড় হয়ে যাবে লাউফুলের মতো ধবো।

অত কথায় কাজ কী। থাকলে দও, নচেৎ—

নচেৎ কী?

কী-ই আবার ভিনু দোকানে যাব-অ। সড়াই চাই।

খিঁক খিঁক হেসে বঙ্কা সোডামাটি ওজন করতে করতে বলল, অ-রে শালা, পৈসার যে খুব গরম!

বাবু-ভায়ারা 'শালা-শালী' বলে সম্বোধন করলেও লোধালোধানীরা গায়ে মাখে না। তারা ভাবে মহাজন তাদের আদর করেই ও কথা বলে। তার উপর বঙ্কা তো তাদের সুখের সাথী দুখেরও সাথী।

আদরে গলে গিয়ে লোধানী হাত পাতল, টুকচার ফাউ দও মা'জন!

বঙ্কাও উদ্বাহু। একটা শুকনা লঙ্কা কী এক ম্যাচড়ি হলুদ, আর নয়ত এক খামচা সোড়ামাটিই ঢেলে দিল লোধানীর হাতে।

লোধানী মনে-মন হাসতে হাসতে গেল।

এক লোধানী গেল তো আরেক লোধানী শাড়ির আঁচলায় বাঁধা পুঁটলি মাটিতে থেপে রেখে অবিকল একই ভঙ্গিতে বলল, সড়া মাট্টি আছে মা'জন?

এই লোধানীর উড়ো খুড়ো চুলে হয়ত একটুকরো খড় লেগে আছে।

কথা বলবার আগে বঙ্কা মাহাতো নিজেই সে-খড়টুকু সরিয়ে দিল।

লজ্জিত হয়ে লোধানী বলল, কী-ই পুআল ত?

পুআল অর্থাৎ খড়।

খিঁক খিঁক হেসে বঙ্কা বলবার সুযোগ পেয়ে যায়, কী জানি কার খড়গাদায় কী করে এসেছিস লোধানী! আমাকে ছুঁস নাই।

কী যে বল-অ মা'জন।

বলে সত্যিসত্যিই সরে যায় লোধানী। ছি, আর কদিন বাদে 'আড়ায়' ঢুকবে লোধাজনমানুষ! এখন ওসব মনে আনাও পাপ।

সোডা নিয়ে লোধানী চলে গেলে, দোকানঘরের খাটিয়ায় বসা সর্ব্বেশ্বর মাহাতো, কী তার মতো আর কেউ হেসে দোকানীর সঙ্গে জরপ করে।

তোর মুখে কুনো রাখ-ঢাক নাই, তুই বলতেও পারিস বঙ্কা।

বঙ্কা কিছু বলবার আগেই হয়ত আরেকজন লোধানী ঢুকেই ফুড়ুৎ ফাড়াৎ করে বলে চলে, দও দও, জলদি চাইর আনার সড়ামাট্টি দও দুকানী, তিলেক দাঁড়াবার অব্‌সর নাই।

সর্ব্বেশ্বর, কী তারমতো আর কেউ মুহূর্তে অবাক হয়ে যায়। লোধানীর পর লোধানী। সোডার পর সোডা চেয়ে যায়। এতদিন পয়সার অভাবে ক্ষার, চুলার ছাইয়ে লোধাপাড়ায় যে জগুলা মাটিলাগা কাপড় কাচত, আজ সে ট্যাকের পয়সা খরচ করে গুচ্চের সোডা নিয়ে যাচ্ছে কী হেতু?

দোকানীকে বলে, এ যে 'লোধাপাড়ায় লবং বিকা'!

লোধাপাড়ায় লবঙ্গ বেচতে গেলে লবঙ্গ কিনবে কে? তেমন পয়সাওয়ালা লোক কোথায়? অথচ আজ হুর হুর করে লবঙ্গর মতো কাপড়কাচা সোডা বিকোচ্ছে। কী কারণ? কী কারণ?

অভিজ্ঞ দোকানী উত্তর দেয়, ব্বাস রে! মনে নেই তোমার? রাখীপূর্ণিমার দিন শবররা তসর করতে কাচা কাপড় পরে 'আড়ায়' ঢোকে?

তাই ত বঙ্কেশ্বর, একদম ভুলে গেছি। আড়ায় ঢোকার নিয়ম অ-নে-ক। চান-টান করে কাচাকাপড় পরে ঢুকতে হবে। তার উপর ই বছর ত—

হাঁ বড়ভাই, তাবড় তাবড় মহাজনদের হ'রিয়ে এবার রাইবুলোধাই তপোবন জঙ্গল-মহাল তসর করতে লীজ নিয়েছে। এই ত কলির শুরু সবে। দিনে দিনে কত-অ দেখবে।

কলিযুগে নতুন নতুন কতকিছু দেখতে হবে। দোকানঘরেই দোকানদার, আড্ডাদার আর খরিদ্দারের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় কলিযুগের মাহাত্ম্য বর্ণন। স্বরূপ কথন।

কেউ বলল, কলিকালে ছোটজাতের মানুষও গায়ের জোরে, টাকার জোরে সকলের প্রভু হবে। হচ্ছেও ত, চাদ্দিকে দেখতে পাচ্ছো নাই? না'লে রাইবু—

শাস্তরে আছে মানুষ কলিযুগে বেগুনগাছে আঁকষি দিবে। তার মানেটা কী?

কাউকে মানে বলতে সে দিল না, মানে বলল সে নিজেই। বলল, তারমানে অল্প পরিশ্রম করলেই অনেক পুণ্যলাভ হবে।

দোকানস্থ আর সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কী কথার কী মানে। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে যে একটু জ্ঞানী গুণী, সেই সুধাংশু অতঃপর যথার্থ অর্থ করে দিল।

সুধাংশু বলল, তারমানে দেহ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসবে। এত বেঁটে-বাঁটকুল হবে যে, অত ছোট বেগুনগাছের বেগুন তুলতেও মই লাগাতে হবে আর নয়ত আঁকষি দিয়ে হিলিয়ে হিলিয়ে আম পাড়ার মতো বেগুন পাড়তে হবে।

সেই সূত্র ধরে আরেকজন মন্তব্য করল, কলিকালে আট, ন, দশ বছরের ছেলের ঔরসে পাঁচ, ছ, সাত বছরের মেয়ের গর্ভেও ছেলেপুলে হবে। বুঝো কিত্তি!

এতে বুঝাবুঝির বা কী আছে? দুপায়ের হাঁটু জড়ো করে দু'হাতের বেড় দিয়ে দোল খেতে খেতে কেউ একজন বলল, যে যুগের যে ধর্ম। কথায় বলে নাই, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে?

ফের হাসাহাসি। পুরাণ-ভাগবত বামায়ণ-মহাভারত বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র এদের ভালো মতো পড়া আছে। এত বেশি পড়া আছে যে, একটা শেষ হতে না হতেই, শেষ কবতে না করতেই আরেকটা প্রসঙ্গ ধরে ফেলে।

তাই 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'—কথাটা আগে আগে এসে পড়েছে। তাই বক্তা নিজের ভুল যে ভুল না, আর সবাইকে বুঝিয়ে বলে দিল।

আর সবাইও বুঝল। হাঁ, তা তো হতেই পারে। কলিকালে এরকম উন্টাপান্টা কতকিছুই তো হচ্ছে।

কলিযুগে ধর্মাধর্ম বলে কিছু থাকবে না। নিচুকুলে জন্ম নিয়েও উচ্চজাতের মেয়েকে বাহুবলে ভোগ করবে। এটাও বল-অ।

তার যুক্তিকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে আর কেউ বলল, এমনটা সত্য, ত্রেতা আব দ্বাপরেও ছিল। লোধাদের মধ্যেও ছিল। কেনে, 'লোলিতা পালা' যাত্রাতেই ত আছে—বিদ্যা আর লোলিতা—

'লোলিতা' না, বল-অ 'নোলিতা।'

হায় রে দ্বিজ-অ তাঙ্কুর-অ।
নোলিতা নামে কন্যা মোহোরা॥
সে যে কন্যা মোহোরা—

শুরু হয়ে যায় বসুশবর, বিদ্যাব্রাহ্মণ আর শবরকন্যা ললিতার কাহিনীকথা। দু-একজন তো মাঝে মাঝে, কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে, 'লোলিতা পালা' যাত্রায় দেখা উড়িয়া নাচের তাল ঠুকছিল পায়ে। যেন সে এখনই নেচে উঠবে, আর ঘুঙুরও বেজে উঠবে। তাই ঘুনাঘুণ তাই ঘুনাঘুণ—

এক গভীর জঙ্গল, তপোবন জঙ্গল-মহালের থেকেও ঢের ঢের বড় এক বনভূমিতে থাকত বসুশবর। ভাল নাম বসুশ্রবা। সঙ্গে থাকত তার যৌবনবতী কন্যা ললিতা।

এই দ্যাখো, ললিতা কী তার নিজের কন্যা? না, পালিতা? কথক হয়ত আমতা আমতা করে বলে, যাত্রায় ত আছে নিজের কন্যা। তা বাদে জানি না।

প্রশ্নকর্তা তাকে চেপে ধরে জানিয়ে দেয়, জেনে রাখ পুন্ন, শাস্ত্রে আছে বসুশ্রবার পালিতা কন্যা ললিতা। 'পালিতা' তারমানে কুড়হাঁয় পাওয়া মাইয়া। আর সে কুড়হাঁয় পাওয়া মাইয়ার জাত ছিল বেরাম্ভন। ইটাও জেনে রাখ।

বেরাম্ভনে বেরাম্ভনে মিল হয়েছিল। বিদ্যা বেরাম্ভন, ললিতাও বেরাম্ভন। রাজজোটক।

শাস্ত্রজ্ঞ লোকটাকে প্রায় দাবিয়ে বসিয়ে দিল সভাস্থ লোকজন। তাদের যুক্তি—তবে কেনে বলে লোধাশবররা বেরাম্ভনের থেকেও বড় জাত? তারা বামনাদের গড় করে না।

ধুস্! জামাইকে আবার গড় করবে কী!

রাজা ইন্দ্রদুম্নই বিদ্যাকে পাঠিয়েছিল বসুশ্রবার আরাধ্য কালিয়া দ্যাবতা নীলমাধবকে চুরি করে আনতে। ব্রাহ্মণ যুবক বিদ্যা বৃদ্ধের ছদ্মবেশে বসুশবরের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

টিকিধারী ব্রাহ্মণ ছিল খুব রাগী, আর উগ্রচণ্ড। কথায় কথায় ললিতাকে ছেড়ে যাবার ভয় দেখাত—দে, দে ললিতা, মোর ছতা-বাড়ি দে। মু চালি যিবু।

ছাতা আর লাঠি লুকিয়ে রেখে ললিতা বিদ্যার পায়ে ধরে মিনতি করত। কত-অ রোদন করত!

প্রাণোনাথো গো—

বিদ্যা বলে,

রাত্রি দুই দণ্ড থায়ে পিতা তোর যায়ে।
দুই প্রহরকু আসি গৃহরে মিলয়ে।।

ললিতা বলে, আম্ভুর পিতা বনাস্তবে ঠাকুরপূজা কবিতে যায়—

বনস্তরে ছন্তি নীলমাধব মুরতি।
তাহাকু যে পিতা মোর সর্বদা ভজন্তি॥

বিদ্যা আব্দার করে—প্রেয়সী আম্বে ঠাকুর দেখিতে যিবু।

অত সহজে কী আর শবর রাজি হয়! অগত্যা চোখ বেঁধে জামাইকে নিয়ে যায়। তার আগে ললিতা স্বামীকে বলে দেয়, বলি গো প্রাণনাথ, আম্ভুর পিতা যেত্য বেলে তুম্ভুর চক্ষুর অন্ধকানি বাঁধি লই যিবু তেত্য বেলে আম্ভুব কাছে মাঘি তিল অছি তাহাকু লই যাইতে হেব।

বিদ্যা বলে, তাহাকুঁ কি করিতে হেব?

ললিতা জানায়—তাহাকুঁ দুই পাথারে ছড়াই যাইতে হেব, পঞ্চম দিন পরে তাহা হইতে বৃক্ষ উঠিবু, তুম্বে তাহাকু দেখি চলি আসিবু!

তা, একদিন মাঘি তিলের চারাগাছ দেখে দেখে পথ চিনে সত্যিসত্যি ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে, বসুশ্রবার কালিয়াদ্যাবতা অর্থাৎ জগন্নাথদেবের দারুবিগ্রহকে চুরি করে বিদ্যাব্রাহ্মণ প্রস্থান করল।

উঁহু, ঠিক নয়। ললিতাকে বিদ্যা নিয়ে গেলেও কালিয়াদ্যাবতা আবার ফিরে এসেছিল বসুশ্রবার কাছেই। ঐ জন্যেই ত বসুশবরের ডায়লগ—লে রে কালিয়াদ্যাবতা হামার পূজা লে। দে রে কালিয়াদ্যাবতা হামার ললিতাকে দে। —ঐ এক ডায়লগেই আসর মাৎ করে দিত নাই বিজুয়া? 'এনকোর' হত নাই? কী গো রাজারাম?

তা হত, রাজারাম নামধেয় লোকটা বলল, লোধাশবরদের মেয়েজামাই ঐ ললিতা-বিদ্যার ছেলে অঙ্গপতির ছেলের ছেলে তস্য ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের, আর কত বলব, তার ছেলের ছেলেরাই এখনো পুরীর রথ টানে। তাদের হাতের ছোঁয়া না পেলে রথ চলে না— একী কম বড় কথা?

বঙ্কা মাহাতোর দোকানঘরের আড্ডা, কলিযুগের মাহাত্ম্যবর্ণন, লোলিতাপালা যাত্রাগানের কথকতাও বাসি, পুন্না হয়ে গেছে।

আজ সবকিছুকেই মলিন, অতীত করে দিয়ে উপস্থিত হয়েছে নতুন 'গম্‌হা পুনোই' বা গামাপূর্ণিমা।

দোরখুলির লোধাপাড়ায় বড়ামথানে, বনদুর্গার থানে পূজার আয়োজন করা হয়েছে। পূজা চড়িয়েই আজ রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা জঙ্গলে যাবে দল বেঁধে, পুরাতন 'তসর ঠয়া' 'তসর পুতলী'র জোগাড় দেখতে।

ভোর ভোর পোহাতারা উদয় হতে না হতেই জনে জনে ঘরে ঘরে হাঁক দিয়ে গেছে রাইবু। 'ডাকুয়া' যেজন সে তো নিজেই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। তাকেও ডেকে তুলেছে রাইবু।

বড়ামথান আগেই সাফা, ঝকঝকে করে রেখেছিল সোমবারি। 'দেহুরি' এসে জল ঢেলে গোবর লেপে দিল সর্বত্র।

দু-দুটো লম্বা শালগাছ, অদূরে ঝাঁকড়া ঝাঁপুড়ঝুঁপুড় একটা মহুলগাছ। শালগাছের তলায় ছোট-বড় একগাদা মাটির হাতিঘোড়া। লোধামানুষ ফি-বছর মানসিক শোধ করে মাটির হাতি দিয়ে ঘোড়া দিয়ে।

আজ নতুন নতুন হাতি-ঘোড়ায় বড়ামথান ভরিয়ে দিয়েছে রাইবুর সয়া ব্রহ্মাকুমার। 'মানসিক' ছিল। বড়ামথানে বউই তো মানত করে গিয়েছিল যেদিন নরসিঙা ব্রহ্মাকে ধরল।

বলতে কী রাইবুই ছাড়িয়ে এনেছে ব্রহ্মাকে। কৃতজ্ঞতায় ব্রহ্মা আর কিছু না পারুক নিজের হাতেব গড়া হাতি-ঘোড়ায় জমজমাট করে তুলেছে বড়ামথান। হাতের কাজও ভাল ব্রহ্মার। শিল্পী সে।

সয়ার হাতের কাজ দেখেছিস গুড়গুড়ে?

বলেই আর লোভ সামলাতে পারে না রাইবু। ছুটে গিয়ে একটা বড় হাতিকে হাতের বেড়ে জড়িয়ে ধরে খুব বড় করে হাসে।

কৃতজ্ঞতায় না কৃতকার্যতায়।

সে-ই তো ছাড়িয়ে এনেছে ব্রহ্মাকে।

হাঁই হাঁই করে উঠল দেহুরি, করিস কী রাব্বু! এখনও হাতির কপালে পূজার তেল-সিঁদুর পড়ল নাই!

শুদ্ধাচারী পূজার পুরোহিত তো মানা করবেই। পরনের নতুন ধুতি দেখিয়ে রাইবু বলল, লুয়া নুগা পরে আছি, দোষ কেটে যাবে দেহুরি। লে আরম্ভ কর।

পূজারী পূজা শুরু করল।

হাতি-ঘোড়ার সামনে বিজোড় সংখ্যক তুলসির পাতা পেতে দিল এক লাইন করে। পাতার উপর অতঃপর মাখিয়ে দিল তেল-সিঁদুর। হাতি-ঘোড়ার কপালও রাঙিয়ে দিল। শুকনো শালপাতায় গোলা তেল-সিন্দুরের বাকিটুকু। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে বলতে দেহুরি উঠে দাঁড়িয়ে পাতাসহ ছুঁড়ে দিল হাতিঘোড়ার দঙ্গলে, বড়ামথানের ঝোপেঝাড়ে।

তার আগেই রাইবু-গুরভা-ভুবন আর গুড়গুড়িয়াদের কপালও তেল-সিন্দুরে রাঙা। রাইবুই যা নতুন কাপড় পরেছে। বাকিরা বঙ্কা মাহাতোর দোকানের সোডায় কাচা।

তেল-সিন্দুর মাখা তুলসিপাতার উপর দেহুরি এক এক করে নৈবেদ্য রাখল। কী আর নৈবেদ্য—বড়জোড় পাকা রম্ভা মেশানো এক এক থাবা অদা চাল বা আতপ চাল।

সে-চালের উপর বিড়বিড় করে মন্ত্র বলতে বলতে দেহুরি মুঠোয় ধরা চিঁক চিঁক করা এই এতটুকু গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা সাদা মুরগীবাচ্চার ঠোঁট চেপে ধরল। উপস্থিত লোধাজনমানুষ উঁকি মেরে দেখল, চরে চরে খায় কী না!

খায় যদি ত শুভ, আর না-খায় যদি—

বড়ামথানে জোর হুল্লোড় উঠল, খেয়েছে, অরে খেয়েছে!

অবলা, ক্ষুধার্ত, হয়ত পায়ে দড়িতে বাধা ছিল এই কদিন, এখন মুখের সামনে চাল-কলা দেখলে সে তো ঘাড়গুঁজে খাবেই। কিন্তু খেতে দিলে তো!

এক খাবল খেয়েছে কী খায়নি, দেহুরি ছুঁড়ে দিল বলিদার গুরভালোধার দিকে। গুরভা আজ বলি দিয়ে বলির পুণ্য লাভ করবে। হাতে ধরেই সে খড়গের একঘায়ে ধ-মুণ্ড আলাদা করে দিল চিয়াঁটার। ছিটকানো রক্ত ছড়িয়ে দিল মাটির হাতিঘোড়ায়।

এক এক করে বলি পড়ল ঘরপ্রতি, যার যেমন ক্ষমতা। বলির খণ্ডাংশ নিয়ে হুল্লোড় করল বেশি ছোট ছোট ছেলেরাই।

একবারই তারা বড়ামথান ছেড়ে দৌড়ে গিয়েছিল দোরখুলির বড়রাস্তার ওদিকে। বাবুভায়াদের মহাজনদের পুরুত 'ব্রাহ্মণ' ডানহাতের কনুইয়ে একগাদা নতুন পৈতে ঝুলিয়ে লোভ দেখিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বড় রাস্তায়।

দেখতে পেয়ে রাইবুই হেঁকে উঠেছিল ছেলেদের, এ্যায়, এ্যায়! খবদ্দার!

ছেলেরা ভয়ে কেউ আর এক পা এগোয়নি। ওখানেই এর-ওর কাঁধে হাত রেখে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে জুলুজুলু চোখে দেখল।

দেখল ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবান-ভগবান মানুষটা গাছপালার আড়ালে মাহাতোদের ঘর-বাখুলের অন্দরে হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

পূজাও শেষ হবে। রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়া-ভুবনরাও জঙ্গলে ঢুকবে। পুরাতন 'তসরঠয়া' 'তসর পুতলী' সংগ্রহ করতে। বীজধান খুঁজে পেতে।

হঁ, সম্বারিও চলুক সঙে।

জটালোধার বউবুড়ি তো বলে, 'জঙল কইন্যা'। রাইবুর মনে পড়ে 'নোলিতা পালা'র নোলিতাকে।

জঙ্গলকন্যা বল জঙ্গলকন্যা, নোলিতা বল নোলিতা, তপোবন জঙ্গলমহালের অন্ধি-সন্ধি নাড়ি-নক্ষত্র সোমবারির ঠোঁটস্থ।

পড়া ধর, সব একধারসে মুখস্থ বলে যাবে—

কোথায় কোন্ জঙ্গলে চিরোল চিরোল চ্যাকাশাক ধরে আছে, কোথায় শুশনিশাকের দঙ্গল খালের জমি ভরাট করে ফেলেছে, কোথায় ধবো ধবো বকফুলে গাছের মাথা লহ লহ করছে, কোথায় কোনদিকে গেলে পাওয়া যেতে পারে পরবছাতু, শালপঙড়া-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া-বড়বালি-ছোটবালি-ই বা কোথায়, বন-কুঁদরি বন-কাঁকড়োর ফনফনে লতায় ঢেকে আছে কোন্ বন-ডুংরি, কোথায় ফলে ভেলা-বাদ্‌ভেলা-ভুড়রু-কষাফল, আঁউলা-বাঁউলায় মুহূর্তেই ঝুড়ি ভরে যাবে কোনদিকে গেলে, খেড়িয়াদের গোপন ডেরা আছে কোন্ ডুব্‌কায়, কোথায় ফাঁদ পেতে গুড়ুরপাখি ডাকলেই বনের গুড়গুড়িপাখি এসে যাবে গুড় গুড় করে, কোনদিকের জঙ্গলে মিলতে পারে কয়ের, কোথায় কোথায় ঘোড়ার কী গরুর লেজের চুলে বানানো ফাঁস এড়ে বসলেই কপ্‌তি এসে ডানা ঝটকাবে, পানআলু চুরকাআলু খামআলু, থুম্বাআলুর সুলুক আছে কোথায়, কোথায় 'কুরকুট-পটম', কোন্ শালগাছে, কোন্ আসনগাছে 'তসর ঠয়া' কেষ্ঠঠাকুরের মতো দুলছে—

সব, সব তার কণ্ঠস্থ!

সেই সোমবারি জঙ্গলে না গেলে হয়?

হুঁ, সম্বারিও চলুক সঙে।

সে শুদ্ধ আছে ত? কেউ একজন কু. বলল।

বোধহয় গুড়গুড়িয়া।

তার দিকে কটমট করে তাকাল সোমবারি। গুড়গুড়িয়ার মনে হল, এই সে বলে উঠবে, খালভরা!

সোমবারি সেসব কিছুই বলল না। সে খালি পরনের নূতন কোরা শাড়িটা একবার পরা-অবস্থায় আছড়ে দিল।

আর মনে মনে বলল, লুয়া নুগা পরে আছি যে গুড়গুড়িয়া, এই দ্যাক!

গুড়গুড়িয়া মাথা নত করে আছে। দেখল না।

দেখল ভুবনার বউ ফুলটুসি। কোত্থেকে দৌড়ে এসে শাড়িটা হাত মসকে দেখে নিল। বলল, পাইড়ে কী আঁকা?

দাদা-গরবে গরবিনী বোন বলল, লবঙ্গলতা।

এরপর লোধাজনমানুষ জঙ্গলে ঢুকে জঙ্গলের তসরপাত্ করে ছাড়ল। 'তসরপাত্' তার মানে নয় ছয়।

এ-ডাল ভাঙল সে-ডাল ভাঙল এ-গাছ টুঁড়ল সে-গাছ টুঁড়ল। 'তসর-ঠয়া' কেউ পেল গোছা গোছা, কেউ বা একটা-দুটা।

সে এক অবাক অন্বেষণ। রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়া-সোনবারি-ভুবনা-শরাবণ-গুড়কুঁদাবা একেক দিকে যাত্রা করল। একেক মানুষ। একেক গাছের উঁচু ডালের দিকে একেক নজর।

খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি।

গাছের মগ ডালের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে ব্যথায় ঘাড় টন টন করল। কে যেন খিল এঁটে দিয়েছে মাথার সঙ্গে আর পিঠের সঙ্গে। মাথামস্তক নত করবার উপায়ন্তর নেই।

পায়ে লতাঝোপের লতা, মাটির লতা, চীহড়, হাতিবান্ধা, দুধিয়া পায়ে জড়ায়, ছিঁড়ে যায়, ফের জড়ায়। যার নাম ধরতে নেই, দংশালে বলতে হয় 'লতায় ডংশেছে', সেই শিয়বচাঁদা চন্দ্রবোড়াও সরে যায় সর্ সর্, জঙ্গলের জীব পথ করে দেয় আরেক জঙ্গুলী জীবকে। যাও, নির্ভয়ে যাও।

বারে বারেই দেখা হয়ে যাচ্ছিল সোমবারির সঙ্গে গুড়গুড়িয়ার।

হুঁ, তুঁই ইচ্ছা করেই। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সোমবারি ফণা তুলল।

খাকি রঙের হাফ-পেন্টুল, পায়ে দড়িবাঁধা টায়ারের চটি, গুড়গুড়িয়া। যেন ভালমানুষ, কিছু জানে নাই।

বলল, কী?

এই যে বারে বারে ছামুতে আসছিস?

ই বাবা, শুন-অ নাই? বাবুভায়ারা বলে পিত্থিবীটা গোল, দুজন দুদিকে গেলেও দেখা হতে পারে মুখামুখি।

আর কী হতে পারে?

সোমবারি যেন মুখ টিপে হাসল। তার কোঁচড়-ভরতি 'তসরঠয়া'।

ভয়ে বা নির্ভয়ে গুড়গুড়িয়াও হাসল। পাতলা গোঁফ জোড়াটায় বাঁ হাতের দু' আঙুল বুলোচ্ছে আর হাসছে। অনবরত পিট পিট করছে চোখদুটো।

এই বুঝি সোমবারি বলে উঠবে, ও'রম চোখ তোর গেলে দিব রে নিরবংশা। তাই চোখ-পিটপিটানি থামাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে গুড়গুড়িয়া। কিন্তু পারছে না। বাড়ছে বৈ কমছে না।

আর কী হতে পারে, কই বল?

যেন পেটে গোঁত্তা মেরে পেটের কথা মুখে আনাতে চায় সোমবারি।

গুড়গুড়িয়া ভেবে আকুল হয়ে যাচ্ছে—এসময় তার কী বলা উচিৎ, তার কী করা উচিৎ। থলকুল না পেয়ে সে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গ্যাঁজলা-ওঠার মতো মুখ দিয়ে একরকম গোঙানি উঠছিল তার।

এক ঝটকায় তাকে পেরিয়ে গেল সোমবারি। যেতে যেতে বলল, আর যদি মুখামুখি হয়েছিস—

ত? গুড়গুড়িয়া যেন ঘাড় তুলেও নীরব থাকল।

ত? সোমবারি নিজে নিজেই প্রশ্ন তুলে মুখ-ঝামটা দিয়ে উত্তর করল, ত, তোর পোঙা ছিঁড়ে লুব-অ রে নিরবংশা!

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়েই থাকল গুড়গুড়িয়া। ঝোপঝাড় ফেড়ে সোমবারি গেল। গেল তো একটা ঝড়ও থামল।

শান্ত মনে শালপাতার চুটা ধরিয়ে টানল গুড়গুড়িয়া। একটু বাদেই কী মনে করে শালপাতার চুটাও ছুঁড়ে দিল, ছুঁড়ে দিল ট্যাঁকে গোঁজা সবকটা 'টসর-ঠয়া'ও, জঙ্গলে।

দিয়ে ঢেকুর তোলার মতো করে বলে উঠল, ধু-উ-স!

সন্ধ্যার মুখে মুখেই লোধাজনমানুষ, রাইবু-গুরভা 'ওড়গুড়িয়া-শরাবণ-সোমবারিরা ফিরে এল ঝুপড়িতে। সঙ্গে নিয়ে এল বন টুঁড়ে বীজ-তসর, গুচ্ছের তসর-ঠয়া।

যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরল তারা। শিশুবালা, ফুলটুসিরা তাদের 'চুমাঞে' ঘরে তুলল। ভুবনার বউ ফুলটুসি তো সোমবারিকে বরণ করার নাম করে কোলেই তুলে ফেলল।

জটালোধার বউবুড়ী হেসে বলল, কেমন 'বিহা-ঘর' 'বিহা-ঘর' লাগছে নাই? আয় ছুঁড়ি তকে হলদি মাখায়—

কে হলদি মাখায় মাগো,
কে হলদি মাখায়।
যে বঠে কইন্যার ভাজ গো সে হলদি মাখায়,
মাগো, সে হলদি মাখায়।।

এখন কত কাজ! খেয়ে-দেয়ে পুরুষরা 'ভুগড়ার' ভিতর বিশ্রাম করবে, মেয়েমানুষরা কাজের অছিলায় করবে ঘর-বাহির।

ঠোকাঠুকি লাগবে এর-তার গায়ে-গতরে। ইচ্ছে করেই যেন লাগাবে ছোঁয়াছুঁয়ি। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বলবে, ব্বাস রে! চলার যেন সাজুত নাই, টুকচার দেখে চলবে ত?

সোমবারির সঙ্গেই ধাক্কাধাক্কি লাগল সবচেয়ে বেশি শিশুবালার। সোমবারি 'টসর-ঠয়া'র বাণ্ডিল চুল্হার কাছে 'ইসান'-এ ছুঁইয়ে চৌদ্দ পুরুষকে গড় করে নতুন সুতোয় মালা গাঁথার মতো গাঁথতে লাগল।

তসর-ঠয়া বা তসরগুটি। নিগমা মন্দির এক। যার আগমও নেই নিগমও নেই। ভিতরে ঘুমিয়ে আছে তসর পুতলী। তসরগুটির মাথায় অবিকল লোহার আংটা, কালো রঙের।

লোধাজনমানুষ ছোট-বড় তসর-ঠয়ার মাঝবরাবর কেটে, তসর পুতলী ফেলে দিয়ে, একখণ্ড আরেক খণ্ডের ভিতরে ঢুকিয়ে মতিহারী দোক্তা খাওয়ার চুনের চমৎকার ডিবে বানায়। সখের। নিজেরা ব্যবহার করে, বেচেও।

সোমবারি তসর-ঠয়ার আংটায় আংটায় সুতো গলিয়ে 'আমসারের' মতো ঝুলিয়ে রাখছে ঝুপড়ির ভিতর-পিঁড়ায়।

কালে কালে তসর-পুতনী ঘর কেটে তসর-পত্‌লী বা প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসবে।

ডানা মেলে উড়বে-ঘুরবে তসর-ঠয়ার আশ-পাশে, নিজ নিকেতনে। কোত্থেকে এসে জুটবে পুরুষ প্রজাপতি। আর তারপর নেচে নেচে উড়ে বেড়াবে জোড়ায় জোড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে। মিলন ঘটবে স্ত্রী-পুরুষে। মহা মিলন, মহা সঙ্গম। ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়।

সমগ্র লোধাপাড়া তখন হয়ে যাবে এক অলৌকিক সূতিকাগার।

ভাবো, কতগুলো কেলে-কুলো মানুষ, নেংটিমাত্র পরনে, ভাত নেই পেটে, একঘটি জল খেয়েই যাদের দিন কাবার। অলম্বুসের মতো তারা ঘর-বাহির করছে, আর তাদের মাথার উপর দেহের উপর হাতের উপর পায়ের উপর উড়ে-ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের হাজারটা প্রজাপতি।

প্রজাপতি, প্রজাপতি।

ভুবনালোধার বউ ফুলটুসি তো বলে, পত্‌নী ফুল। যের'ম খসাফুল, সরষাফুল।

ডিমও তো পাড়ে সাদা সাদা রাই সর্ষের মতো। তবে সামান্য চাপা, পুরোপুরি গোল নয়!

ডিম যে-কালে পাড়ে, সে-সময় আমসারের মতো ঝুলন্ত 'তসর-ঠয়া'র নিচে পেতে দিতে হয় খেজুরপাতার নতুন চাটাই আর নয়ত নতুন গামছা। সোডায় কাচা কাপড়-চোপড়ও চলতে পারে।

বলির মুণ্ডুভাজা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাইবু। ঘুম যখন ভাঙল সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে।

গামাপূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে বেশ বড় করে। চরাচর নতুন আলোয় ভরে যাচ্ছে। লিজ নেওয়া তপোবন জঙ্গলমহালেও আলোর ফিন ফুটছে। আলো, আলো।

রাইবুর কী মনে হল কে জানে! সে একদৌড়ে ঘরের বাহির হয়ে হাঁক দিল, এ্যায় গুরভা! গুড়গুড়িয়া! এ্যায় শরাবণ! শত্রুঘন!

রাইবুর ডাক শুনে সবাই দৌড়ে এল, একজন ছাড়া। যে বসে থাকল সে ভুবন। ভুবনালোধা।

কী বলছ?

চাঙলাচ লাগা। আন চাঙু। ইবেলা সয়াও আসবে বলেছে।

হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠল গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা।

বলল, আমরাও মনে মনে ভাবছিলম। বলেই দৌড়ুল যে যার যন্ত্র আনতে। বাদ্য যন্তর।

কী আর আছে বড়জোর? 'চাঙু' আছে প্রায় ঘরে ঘরে। আর তরলবাঁশের বাঁশি? একটা ছিল শরাবণের। তাও তো নাকি গেছে মেরামতিতে।

চাঙনাচে অবশ্য চাঙুই লাগে। গোলাকার কাঠের পাতের তৈরি। একদিকটা চামড়ায় ঢাকা, আরেকদিক থাকে ফাঁকা। জায়গায় জায়গায় লটকানো থাকে দু-চারটা ঘুঙুর।

হাতে ধরে বাজাবার সে-কায়দা আলাদা। কেউ কেউ ডান হাতের কব্জিতেও বেঁধে নেয় একছড়া ঘুঙুর। তালে তালে হাত ঘুরালে ঘুঙুরও ঘুঙরাবে, তাই ঘুণাঘুণ! তাই ঘুনাঘুণ! আর চাঙুতে বোলও উঠবে, ঘেনী ঘেনীচ! ঘেনী ঘেনীচ!

পাঁতা-নাচ অর্থাৎ পঙক্তি করে নাচছিল তারা। পা দুটো এগিয়ে পিছিয়ে মাঝে মাঝে সামান্য উপরে তুলে। মাথা ঝুঁকিয়ে। হাতের আঙুল খেলে বেড়াচ্ছিল চাঙুতে।

নাচছিল গুরভা-গুড়গুড়িয়া-গুড়কুঁদারা, গাইছিল শত্রুঘ্ন। রাইবু বসে আছে রাজার মতো।

রাজাই তো। জঙ্গলমহালের রাজা। তাকে ঘিরে লোধাপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা। ভুবনার মেয়ে নুকু তো তার কোলেই বসে আছে।

টিলার উপর ভুবনা একা। হাউস-আহ্লাদে সে নেই। নেই তো নেই। গড়ানে সে হুড়মুড় করে নেমে গেল। যেন তোমার বিবাগী হয়ে চলে যাচ্ছে কোথাও।

মনে কুরু মনস্তাপ
আর দিমু নাকি জড়েই ঝাঁপ,
ঝাঁপ দিড়ে ডুবিঞে মরিমু গ'
কেম্‌নে লদী পাইরাঁই যামু।

শত্রুঘ্নলোধার গাওনার ভিতরই এসে পড়ল ব্রহ্মাকুমার। অকারণে শুকনা হাত দুটো খেটো ধুতির কোঁচায় মুছে নিয়ে দোহারকি ধরল—

দাদা গ, দিদি গ কেম্‌নে নদী পাইরাঁই যাব।

হাতে হাত বাজিয়ে ফের গোড়া থেকে—

মনে কুরু মনস্তাপ
আর দিব নাকি জলেই ঝাঁপ,
ঝাঁপ দিলে ডুবিঞে মরিব গ
কেম্‌নে লদী পাইরাঁই যাব।

দাদা গ, দিদি গ—

রঙ চড়িয়ে, একেকবার এক পা তুলে, তোলাপায়ের দু'দিকে দু'হাতের তালি বাজিয়ে বেড় দিয়ে ব্রহ্মাকুমার নাচতে নাচতে গাইতে থাকল।

লোধাদের বউড়ীরা শিশুবালাকে বারেবারেই ঠেলে দিচ্ছিল ব্রহ্মাকুমারের দিকে। —সয়া হাউস করছে, সয়ানি কী মুখে কুলুপ আঁইটে থাকতে পারে? যা রানী যা।

খাইছি রে বঁধু গাঁজার কলি
পথে যাতে যাতে ঢুলিয়ে পড়ি,.
ঢুলিয়ে পড়িছে শ্যামর গায়
ঢুলিয়ে পড়িছে বঁধার গায়
তবুও বঁধা ফিরে না চায়।

চাঙনাচের গান দিয়ে শুরু হয়েছিল আসর। সে-আসরে কখন ঢুকে পড়েছে পাঁতাশালিয়া, কখন ঢুকে পড়েছে ঝুমুর।

ব্রহ্মাকুমার সঙ্গে এনেছিল ক'বোতল মদ, মহুয়ার। নাকি মানত ছিল। তাই খেয়ে ফের গান নাচ হল।

আরো রাতের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে এল জটালোধার বউবুড়ী। হাসছে আর হাঁপাচ্ছে।

তাকেও একদোনা দিল রাইবু। খেয়ে-দেয়ে বুড়ি তো ফের হাসে, ফের হাসায়।

কেনে অত হাঁসছ? হাঁসাচ্ছ-বা?

সাধে কী আর, খব্বর আছে।

কী খব্বর?

মোটকথা শুন্নে রাখ রাইবু, আরেক দফা খাব্বা পাওনা হচ্ছে।

আরেক দফা খাওয়া পাওনা হচ্ছে। কিন্তু কিসে? জটালোধার বউবুড়ীর হেঁয়ালি ধরতে পারে না রাইবু, খালি বলে, কী খব্বর? কী খব্বর?

অবশেষে রাইবুর প্রায় কানে কানে বুড়ী বলে, শত্তুরার বহু সাফা ছানা পড়কাইছে।

অর্থাৎ কী না, শত্রুঘ্নলোধার স্ত্রী গৌরবর্ণের সন্তান প্রসব করেছে। কালো, ঘোর কালো, তা সে যত কালো হবে, লোধাদের তত ভালো। কালোর মধ্যে সাদা জন্মালে সে-এক ঝঞ্ঝাট, সে-এক অবৈধ ব্যাপার। 'বেধুয়া ছানা'।

জরিমানা দিতে হবে 'গ্রাম-ফান্ডে'। ছাড়ান, নিমন্ত্র যা-হোক করে খাওয়াতে হবে গ্রামের লোকেদের।

জটালোধার বউবুড়ী সেই আরেক দফা 'খাব্বা'-র কথাই শোনাচ্ছে রাইবুকে কানে কানে।

শুনেই রাইবু মনে মনে কোথায় যেন হেঁটে চলেছে। কিছুদুর যেতেই একটা দৃশ্য রাইবুকে পুরোপুরি নুইয়ে আছড়ে ফেলে দিল। সে দেখে ফেলল, বঙ্কা মাহাতো আর ফুলটুসি,—ঘাসভুঁয়ে শু'য়ে গড়াচ্ছে।

চড়াক করে রক্ত মাথায় উঠে গেল রাইবুর, অতিরিক্ত রাগে থম মেরে সে খালি রকমসকম দেখছে, দেখতেই থাকল।

বঙ্কা মাহাতো দৌড়ুচ্ছে, আর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে রাইবুকে, কাছা খুলে গেছে, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে বঙ্কার, কথা কিছুতেই আর বেরুচ্ছে না।

তবু রাইবু শুনল, বঙ্কা বলছে, ও কিছু না, কিছু ন্না রাইবু, লোধানীকে টুকচার 'জাঁকামাড়া' শিক্ষা দিচ্ছিলম, না'লে জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের সনে যুজবে কী করে?

খানিক থম মেরে দাঁড়িয়ে রাইবু দেখছে, ফুলটুসি ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ভেগে যাচ্ছে, সে-ও দৌড়ুল তার চোরাই বন্দুকটা গাছের চোরাকোটর থেকে নিয়ে আসতে।

ঘোরটা ভেঙে যেতেই রাইবু আসর ছেড়ে উঠে পড়ল। দৌড়ুল টিলার দিকে। যেখানে ভুবন।

ভুবন, অ্যাই ভুবন, ভুবনা রে! রাইবুর ডাকটা ছর্‌রার মতো ছুটে গেল।

কিন্তু কোথায় ভুবন? জ্যোৎস্নায় টিলা ভেসে যাচ্ছে। আর ভেসে যাচ্ছে।



'চারা' নিয়ে 'আড়ায়' ঢুকল রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা।

এতদিন ধরে ঘরের ছামুতে সযত্নে সুতোয় টাঙানো যে 'পুন্না' বা পুরাতন তসর গুটিগুলো ঝুলছিল, আসতে-যেতে ঘর-বাহির করতে গিয়ে ঘনঘন মাথায় ঠেকছিল রাইবু-শিশুবালার, বলা ভালো যেন ইচ্ছে করেই মাথায় ঠেকাচ্ছিল লোধা-লোধানীরা, সেইসব গুটিগুলো, দু-পাঁচটা ছাড়া, আপনা-আপনি ফেটে গিয়ে বের করে দিল অজস্র রঙীন প্রজাপতি, তসর-মথকে।

ভাঙা ঘরের চারধারেই তারা উড়ল-ঘুরল। অনেক দূরে কোথাও চলে গেল না।

লোধা-লোধানীদের পিঠে বসল, মাথায় বসল।

ঝুলন্ত তসর গুটিগুলোর নিচেই শুকনো ঝাঁটা দিয়ে কৃত্রিম বন-বাদাড় বানিয়ে রেখেছিল রাইবু-গুরভা-শরাবণরা। তসর-মথ তসর-প্রজাপতিরা নেচে নেচে বিচরণ করে বেড়াল সেখানেই।

তারপর কোথা থেকে উড়ে এল দলে দলে পুরুষ মথরা। কদিন ধরেই মেলা বসে গেল প্রজাপতির। লোধাপাড়ায়

রাইবু ধান্দায়, কাজে-কামে আর বাহির হয় না বড় একটা। বসে বসে শালপাতার চুটা টানতে টানতে মশগুল হ'য়ে কাণ্ডকারখানা দেখে।

আর মথ ও মথী, প্রজাপতি ও প্রজাপত্নীর আবির্ভাবে উপর্যুপরি মিলনে উত্তেজিত হয়ে ছট বলতে জড়িয়ে ধরে শিশুবালাকে।

শিশুবালা সবসময় পারেও না। কখনও সোমবারির, কখনো বুঢ়াশ্বশুরের ভয় দেখিয়ে ঘরের বাইরে সরে পড়ে। স্ত্রী প্রজাপতিরা যেমন ছলাকলা দেখিয়ে উড়ে যায়।

একেবারে কী আর উড়ে যায়? সেই তো ঘুরে ঘুরে আসে। শিশুবালা ঘরে ঢুকে ঠেস মেরে বলে, কাজ-কামের ধান্দা নাই, খালি ঘরে বসে বসে—

কথা অসমাপ্ত রেখে শিশুবালা ফের চলে যাবার, উড়ে যাবার ভান করলে এক দৌড়ে রাইবু তাকে ধরে ফেলে বলে, মুচকি হেসে শুধায়, খালি ঘরে বসে বসে কী রানী?

কী আবার—

শিশুবালা কথা 'পুরা' করে না। তার কথা পুরা হয় না, কথা অসমাপ্ত থেকে যায়।

জোড়ায় জোড়ায় প্রজাপতি এসে তাদের চুলে-মাথায় বসতে চায়। বসেও।

রাইবুর গায়ে বসলে শিশুবালা চিন্তায় পড়ে যায়। ভাবে, 'পত্‌নি' গায়ে বসলে ত আবার 'সাঙা' হয়। ফের 'সাঙা-বিহা' করবে নাকি রাইবু?

শিশুবালার গায়ে বসলে রাইবুও মনে মনে ভাবে, ফের 'সাঙাবিহা'র যোগ উঠল কী শিশুবালার? বাঁজা মেয়েমানুষের 'সাঙাল-বিহাঘর'?

কিন্তু কেউ সে-কথা প্রকাশ করে না। পারে না করতে। খালি অনবরত চেষ্টা করে চলে, যত সুন্দরই হোক যেন মথ-প্রজাপতি গায়ে না বসে, চুলে-মাথায় ছুঁয়ে না যায়।

তবু তো বসে, যায় ছুঁয়ে।

কখনো ইচ্ছা করেই ছুঁয়ে দেখে রাইবু, কখনো ভুলবশত হাত চলে যায় প্রজাপতির দেহে।

আর তখনই তসরের গুঁড়ো লেগে যায় হাতে, দেহে। আর মনেও।

না লেগে উপায়ন্তর বা কী? এ যে হুরী-পরীদের সঙ্গে বসবাস। এক ঘরে। এক আঙিনায়।

দিনকতক বাদে। সুতোয় বাঁধা ঝুলন্ত গুটিগুলোর তলায় পেতে রাখা নতুন খেজুরপাতার চাটাই ভরে গেল রাইসর্ষের দানার তুল্য ছোট ছোট দানায়।

ঠিক গোলাকার নয়, সামান্য চ্যাপ্টা মতো। তসর-প্রজাপতির ডিম।

কাজ বেড়ে গেল সোমবারি-শিশুবালা-ফুলটুসিদের। এখন কে যায় জঙ্গলে আলু খুঁড়তে, বাঁউলা তুলতে।

ঘরে বসে হলুদ মাখায় তসর-প্রজাপতির ডিমে। মা-প্রজাপতি হয়ে যেন ডিমে তা দেয় দিবারাত্র। অষ্টপ্রহর।

কিন্তু জঙ্গলে না গেলেও তো উপাস দিতে হয় দিনের পর দিন। না না করেও বাহির হতে হয় ঘরের।

জঙ্গলেও যায়, হাটেও যায়। মাথায় কাঠ নিয়ে, কোঁচড়ে ফলমূল নিয়ে। কিন্তু মন পড়ে থাকে ঘরে। আর ঘরে।

ঘরে যে হলুদ মাখানো ডিমের ভিতর ঘুমিয়ে আছে লোধাদেরই ছানাপোনা। বনের পোকা-পতঙ। ঘরে কোনো দুষ্কৃতিকারী না এসে পড়ে! কেউ না হামলে পড়ে খেয়ে যায় গসা গসা!

কাকপক্ষীকে ভয়, ভয় কুকুরকেও।

তারপর তো 'চারা' নিয়ে আজ 'আড়ায়' ঢুকল রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়া-শরাবণরা।

তপোবন জঙ্গলমহালের অনেকটা জায়গা জুড়ে, কয়েক শ একর বনভূমি 'লিজ' নেওয়া 'আড়া'। এ আড়ার আড়তদার এখন রাইবুলোধা।

রাইবুরাজা। শব্বররাজা। জঙ্গলমহালের রাজা।

ভাবখানা কী আর তার মনে আসছে না? সে আপনার মনে টুর টুর হেঁটে যাচ্ছে, হেঁটে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। আর শতেক লোধা-লোধানী তাকে দেখে নমো করছে। ছা-ছানাদের বলছে, হুই দ্যাক রাজা যাচ্ছে, শব্বর রাজা। নমো কর নমো কর।

নতুন হাঁড়িতে, আর এসব হাঁড়ির যোগান দিয়েছে রাইবুর সয়া ব্রহ্মাকুমহার, 'চারা' ভরে, সে-হাঁড়ি কাঁধে মাথায় নিয়ে শুদ্ধ বস্ত্রে শুদ্ধ মনে আড়ায় চলেছে রাইবু-শরাবণ-সোমবারি-গুড়গুড়িয়ারা। শালপাতার আসনপাতার ঠোঙা বানিয়ে তার ভিতর পুরে দিয়েছে হলুদ মাখানো তসর-প্রজাপতির ডিম।

একেকটা চুন-খয়ের-সুপারি দিয়ে বানানো পানের মতো। যার নাম 'পুঙি'। সেই পুঙি ভরতি হাঁড়ি নিয়ে গাড়ু নিয়ে 'চারা' নিয়ে লোধাদের আজ 'আড়া-যাত্রা'।

চারা নিয়ে আড়ায় চাষাবাদে যাওয়া। যেমন করে ধানের চারা এক জায়গা থেকে তুলে আরেক জায়গায়—চষা ভুঁইয়ে, থলথলে কাদা ভুঁইয়ে—রোপন করতে যাওয়া।

কে বলে লোধার জাত বোকার জাত? কে বলে লোধারা চাষ জানে না? লোধারাও বলে, এ-চাষ তারা ছাড়া আর কেউ জানে না। জানলেও 'ভাল্লমত' জানে না। তাই তো ঘুরে-ফিরে মহাজনরা তাদের কাছেই আসে।

ফি-বছর আসে। রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারাও ফি-বছর এ-কাজ করে।

তবু এ বছরটা একটু অন্যরকম।

অন্যরকম, অন্যরকম।

ভুলত্রুটি, ভুলভ্রান্তি যাই ঘটুক এবার তাদের জবাবদিহি করতে হবে না আর কারোর কাছেই। নিজেদের দোষ মাফ করে নেবে নিজেরাই। চড়-চাপড় আর খেতে হবে না কারোর হাতের।

দাদন নেওয়া টাকা কবেই ফুরিয়েছে। খরচ হয়ে গেছে পেটপূজায়। পেট-পূজাও শেষ। এখন ভুখা-শুখা পেটে কাজটা কোনমতে তুলে দিতে পারলেই পরের বছর কিস্তি মাৎ—

তখন কে রাজা কে প্রজা—সে দেখা যাবে।

টেমক দেখিয়ে, হৈ হৈ রৈ রৈ করতে করতে জঙ্গলে ঢুকে গেল রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা।

নিজের কুরথিকড়াইয়ের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল সুখজুড়ির গোবরাসাঁওতাল।

কাটা হয়ে গেছে 'আস ধান'। লোধারা তার একটা ধানশিষেও হাত দেয়নি।

গোবরা ভাবল, হুঁশিয়ারিতে নির্ঘাত কাজ হয়েছে। মার কে কার না ডর?

—ই ত ল্যায্য কথা, সাচমুচ কথা। এক জঙ্গলেই থাকবি আবার জঙ্গলের আরেক জীবকে তাব্‌লা দিয়ে চটাবি? তা ত হবেক নাই। আমরাও ত জঙ্গলীজীব বঠিন। লোকে ত বলে, লদ্ধা-সান্তাল দু'ভাই। অতদূর না হোক কাছাকাছি পাশাপাশি ত আছি।

গোবরা মাণ্ডি তার টাঙির মতো বেঁকানো গোঁফ জোড়াটায় হাত বুলোয়। কুরথিখেতির দিকে দেখে।

ধান তোলার আগেই পাশের খেতিতে কুরথি বুনেছিল গোবরা। এর মধ্যেই কুরথিলতির 'ডগ' শিশিরে জলে পুষ্ট হয়ে ঘোড়ামুখো, আকাশমুখো।

'সহরায়' পরবের আগে আগেই কলাই তুলতে পারবে বলে মনে হয় গোবরার।

'হাতির লেখেন' সহরায় পরব আসছে। তার আগেই ডাঙা ডুঙোড়ের কিছু ধান কার্তিকছোলা, জামাইলাড়ু কী কালোজিরা দ্যাখ দ্যাখ করে উঠেও যাবে।

সহরায় পরবে গোবরা মাণ্ডির একটা বিশেষ কাজ আছে। বড় চাষী হয়েও 'হাউসের' এ-কাজটা সে করবেই করবে। কামার-কুঁভার-ভুঁএ্যা-ভূমিজ-মাহাতোদের বাঁদনা পরবে 'গরু-খুঁটা' উৎসবে গোঠটাঁড়ের মাঠে সে গরু খেলায়।

তার একটা মরা গরুর চামড়া আছে। কবেকার পুরোনো। ফি-বছর উৎসবে সে সেই চামড়াটাই ঢালের মতো ব্যবহার করে গরু খেলায়—

অহি রে—
অরুণ বনে কেরি তরুণ লতা যে বাবু হো
লবঘনে ভাঙব যোত।
আর সেও যোতে বাঁধব কপিলাকা পুতা হো
খেলি খেলি আও ত মাতুয়াল।।

গান গাইতে হয় না গোবরা মাণ্ডিকে, গান গায় যে সে 'ঢ্যাঙুয়ান'এর লোক।

সে শুধু মরা গরুর চামড়া দেখিয়ে, ঘুঙুর-গেঁদাফুলের মালা গলায়, কপালে ধানের 'মৌড়', গায়ে নানা রঙের ছাপ মারা, খুঁটায় বাঁধা গরুকে খেলায়।

কুরথিকলাইয়ের খেতিতে দাঁড়িয়ে কানে যেন এখনই শুনতে পাচ্ছে গোবরা সেই গরু-খেলানোর বোল—দিড়ি দাঙ খেটে তাঙ দিড়ি দাঙ—

যেই 'বাঁদনা' সেই 'সহরায়'।

সহরায় পরবে খড়ের বাঁদর বানিয়ে, 'কেঁদ্‌রা' বাজিয়ে কত লোক পিঠাপুলি 'মাগনে' বেরোয়। ধনুকের ছড় টেনে কেঁদ্‌বা বাজায় আর খড়ের বাঁদর ডিগবাজি খায়—কখনো 'উপর-টুলটুলি', কখনো বা 'নামো-টুলটুলি'।

রাইবুদের 'হাউস' দেখে গোবরাও ঠিক করল, এবার বাঁদনা বা সহরায় পরবে সে খুব আচ্ছাই হাউস করবে। হাউস বলে হাউস!

কী ব্যাপার মাহাজন? লদীপারের মানুষ পথ ভুলে?

ঘাড় ঘুরোতেই গোবরাসাঁওতাল দেখল, মনা সাউ।

ফর্সা, নাদুস নুদুস শরীর। তার উপর ফর্সা জামাকাপড়। পায়ে কালো মচমচে জুতো।

একদম সামনাসামনি এসে পড়েছে।

মনা সাউ বলল, সাধে কী আর মাণ্ডিভাই? চোর-চোট্টামেনকু খুঁজি বুলিটি।

চোর-চোট্টা? কুরথিড়াহির দিকে নির্বিকার তাকিয়ে 'হড়' মানুষটির জিজ্ঞাসা।

হড়-সাঁওতালদের চোখে এই মহাজনমানুষরা সব 'দিকু'। ভিন দেশী।

মনা সাউ বলল, বুঝল নি? ধত্তে পারল নি? নোধারা ছাড়া আউ চোর-ছ্যাঁচড় কে বা অছি?

চুরিটুরি করেঁছে বোধায়?

হঁ, চুরি কী কহঠ— চুরির বড়া। সেবেলে ত ছ ছ বারটা শালরলা নগদানগদি মোকে বিকি দেই সোউ রাতরেই ঝাড়ি আরেক জেগায় বিকি দিলা।

ম'লা ঝেড়ে বিকে দিল আর তুমি হাত গুটাএে বসে থাকলে?

কিছিদিন বাদে দেখা হিতেই কইনু। স্বীকার গেলা নি।

ত ইবার কী মতলবে?

সখেদে মনা সাউ জানাল, এবারেও বারটা শালরলার দাদন নিয়েছিল রাইবু। আখশাল বসতে চলল সে-শালরলার সে-শালবল্লার এখনও পাত্তা নেই।

আখশালের কথায় ঠাই করে কী যেন মনে পড়ে গেল গোবরার। বাতাসে সামান্য শীত শীত ভাব। জাঁকিয়ে শীত পড়তে আর দেরি নেই। জাঁকিয়ে শীত পড়বে আর জমিয়ে 'আঁখুশাল' চলবে। শেষ 'ঝুড়ন' হয়ে গেছে সেই কবে। এবার তো আখ কাটারই পালা। কাটন, মাড়ন আর জ্বলন। ঝুড়ো, কাটো, মাড়ো আর জ্বাল দাও। বুগ বুগ করে আখের রস ফুটবে আখশালে আর নতুন গুড়ের সবাস ছুটবে দশদিকে।

গোবরা ভাবছে, আমাদের আর নদী কোথায়? নদীর ধার তো সব 'দিকু'দের। নদীধার ছাড়া আখের চাষ ভাল হয় না। কতরকম আখ! সুন্দরী, ট্যানা, নম্বরী, সুবল। আমাদের আছে খালি জঙ্গল। শাল-পিয়াশাল-ধ-আসন। কদো, গুঁদলি, জনার, আসধান আর কুরথি। বোকা হাড়ামের জাত জঙ্গল নিল নিল, একটা নদীধার নিতে পারল না? নদীধারেই তো সব গড়ে উঠেছে শহর-বাজার।

এখন গোবরা যাবে কোন্ দলে? দিকুদের, না লোধ.দের? বড় ধন্দে পড়ে আছে গোবরা মাণ্ডি।

অবশেষে 'যানে দো' গোছের ভঙ্গিতে বলে, মাহাজন কথায় বলে নাই—শিয়ালের গু খুঁজলে শিয়াল বলে আমি পর্বতে হাগি! সেই আর কী। এখন লোধাদের তুমি পাচ্ছ কুথা? তারা এখন 'আড়া' করছে, হঁ আড়া। এই ত দেখলম—চারা লিএে আড়ায় ঢুকল।

দোরখুলির দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল মনা সাউ। কুরথির বিল দেখছে গোবরার। হালি মেঘের তুল্য। শুঁড়ে শুঁড়ে জড়িয়ে ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছে কুরথিলতি। কাঁকালে কাঁকালে ধরে আছে কুরথি ছড়া।

হাতে ধরে দেখল মনা সাউ। এসব দ্রব্য নদীধারে হয় না, হয় জঙ্গলী ডাহি জমিতে। আমাদের আর ডাহি কোথায়?

লম্বা শ্বাস ছেড়ে মনামহাজন প্রস্তাব দিল, দাদন নিবা মাণ্ডিভাই?

দাদনের কথায় এতটুকুও চমকাল না গোবরা মাণ্ডি। সে সজাগ হয়ে যায়। এসব দিকু ব্যবসায়ীদের তার চেনা আছে। বিহারের পাটনাতক তার আতা-যাতা।

সে মাথা নেড়ে 'না' বলে দিল মনা-কে। এ-চাষ ঘরের জন্য, সে এ কখনো বেচবে না।

দুর্দিনে, আষাঢ়-শরাবণে, সামান্য কুরথিকলাইয়েরও মূল্য কত! জল আর নুনে সিদ্ধ করে খাও। চাল মিশিয়ে খিচুড়ি কর। বালি-কড়াইয়ে ভেজে ভেঙে ডাল কর। হঁাপরে খাও। চালভাজার মতো ভাজাই খাও কুড়ুর-মুড়ুর।

কত প্রকারে খাওয়া যায়। সু-কালে তুলে রাখলে আ-কালে সুখ। শুধু-মুদু বেচব কেন? বা-প্র।

মনা সাউকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল গোবরা মাণ্ডি।

মনাও বুঝে গেল এ-গিদ্ধড়ের জাতকে ঠকানো অত সহজ নয়।

রাইবুলোধার খোঁজে মনা সাউ 'আড়া'র দিকে হাঁটা দিলে টাঙ্গির মতো বেঁকানো গোঁফজোড়াটায় হাত বুলোতে বুলোতে গোবরা মাণ্ডি মনে মনে বলল, খালি কী আর শালরলার খোঁজে মহাজন? তুমার অন্যকুনো ধান্দা আছে। —হর হরতে হেন্দে বারাহি, মাএ্রম পে? কী? যা উত্তর, তুমি সেই। একটা কালো পিঁপড়া।

আড়ায় ঢুকে বড় বড় শালগাছ, আসনগাছের ডাল কাটছিল রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা।

শব্দ উঠছে—চটাস চটাস!

তা উঠুক। তবু নির্ভয়ে ডাল কাটছিল তারা। কারণ এবছর আড়া তাদেরই 'লিজ' নেওয়া।

নরসিঙার ক্ষমতা নেই হুট বলতে এসে হাত চেপে ধরে হুকুম করে, চ পাঁচকাহিনা।

ডাল তারা কাটতে পারে। গাছ না কাটলেই হল।

ডাল সম্পূর্ণ না কেটে নামমাত্র ঝুলিয়ে রাখছে। ডালের গোড়াটা পুরোপুরি মাটিতে না ফেলে ডালের ডগাটাই মাটিতে ছুঁইয়ে রাখছে। কোণাচ করে।

এটাই নিয়ম।

ঝুলে-পড়া ডালের গা ঘেঁষে রেখে দিচ্ছে কাহন কাহন 'পুণ্ডি'ভরা মাটির হাঁড়ি। তসর-প্রজাপতির ডিম। সঙ্গে কিছু কুচো আসনপাতা, কুলপাতা।

ডিম ফেটে নিয়ম মতো বাচ্চা বোরোবে দিন কতক বাদেই। একেকটা 'গুছিপোকা'র মতো ! ছোট ছোট। তারপর, কিলবিল করতে করতে কাটা ডাল বেয়ে উঠে যাবে ডালে, ছড়িয়ে পড়বে ডাল থেকে ডালে। গাছ থেকে গাছে। বন থেকে বনে। বনান্তরে।

কচি কচি চিরোল চিরোল পাতা খেয়ে ছেলেমানুষের মতো তারাও হাঁটবে— হাঁটি হাঁটি পা পা।

কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাবে শরীর, কিছুক্ষণ গুটিয়ে রাখবে। তারপর, আবার একটা লম্বা টান। উল্লম্ফন। আড়াময়। বনময়।

এখন রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা একমনে চারা বসাতে ব্যস্ত। আড়ার চারদিকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

শুধু সোমবারি সে-কাজে নেই। সে-চারাতে নেই। সে আছে অন্য কাজে। অন্য চারায়।

আড়ার জঙ্গলে ঝোপঝাড়ের ধারে ধারে সে 'জারা'র বীজ পুঁতছে। জারাডালের বীজ।

'জারা' হল একপ্রকার বরবটি। সাধারণ বরবটির চেয়ে বেশ কিছুটা লম্বা। সাদাটে নয়, সবুজ সবুজ। দানাও বেশ বড় বড়। জারাডাল বা জারার বীজ বিকোয়ও বেশ চড়া দামে।

তসরগুটি পাকবার আগে আগেই জারাতে পাক ধরবে। সে-জারা বাড়িতে এনে রোদে শুকিয়ে হাত মস্‌কে ঝুরে নিলেই হল। ঝরঝরে দানা। এককোণে টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো রং ধরা। বা আমকুচুর মতো।

সোমবারি জারার বীজ পুঁতছে আর কান পেতে শুনছে ডালকাটার, ডাল ভেঙে পড়ার আওয়াজ।

আওয়াজ শুনছে আর চমকে চমকে উঠছে, এই বুঝি কেউ এল ! ক্ষনেকক্ষণ উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছে। লাটা-পাটায় সর্‌সর্‌ শব্দ। ক্যাঁকলাশ হতে পারে, খেঁকশিয়ালও হতে পারে।

আর হতে পারে ভুবনার বউ ফুলটুসির 'সে ত সে-ই'। হুট বলতে গুড়গুড়িয়াও আসতে পারে।

মুচকি হাসে সোমবারি। না, গুড়গুড়িয়া আসবে না। এ-যে আড়া। তার উপর রাইবুর আড়া। গুড়গুড়িয়ার অত দঁক নেই যে আড়ায় ঢুকে কোনরকম কুপ্রস্তাব দেয়। এখন, ডরে পিঁপড়া গাড়ায় লুকায়।

নির্ভয়ে সোমবারি গান ধরে, চাপা স্বরে। গুনগুন করে—

ফুলেতে বস না ভমর ফুলের মধু দিব না
ষোল বছর বয়স লাগর এ কলঙ্ক লিব না।
ফুলের কুঁড়ি আমি বঁধু যৌবনে হাত দিও না।
তোমার সোহাগ আমি বঁধু সহিতে পারিব না।
আধফুটা কলিতে অলি কেনে কর কামনা
বড় হলে সময় এলে পুরাব তোমার বাসনা।

একটু একটু করে গাইছিল আর চারদিকে দেখতে দেখতে চমকে চমকে উঠছিল সোমবারি। কেউ যদি এসে পড়ে? আহা কেউ যদি—

ধরো সে, ভুবনালোধার বউ যাকে 'ভাল্লমত চিহ্নত' দিয়েছে, 'সে ত সে-ই' লো, যার কুনো বাখান নাই, যদি এসে পড়ে—

আপনার মনে ঝাঁজিয়ে উঠেছে সোমবারি, এলে বলব—এখন কেনে? বড় হলে সময় এলে পুরাব তোমার বাসনা।

এদিকে সোমবারি যখন 'সে ত সে-ই' আসার আশঙ্কায় শির শির করছে, তখন আড়ার আরেকদিকে গাছের ডাল কাটার ফাঁকে ফাঁকে গুড়গুড়িয়াও গান ধরেছে—

তুঁই হামার সরু সিঁথা তুঁই গলার মালাগাঁথা
তুঁহেই সাধের আয়না কাঁকই লো, হে ওহে ধনি।
তুঁই ধনি জামাজুতা তুঁহেই পাগড়ি টেরা।
তুঁহেই কানের ফুল লো সজনি ধনি।
তুঁই ভালবাসাবাসি তুঁই মুহের মুচকি হাঁসি
তুঁহেই চইখের চঞ্চল চাহনি লো, হে ওহে ধনি।

গান শুনে রাইবু তো মুচকি মুচকি হাসে।

মনে মনে বলে, শালা গুড়গুড়ে সম্বারির তরে পাগ্গল হঁই গেছে হে, ওহে। বঙ্কা মাহাতোর ঘরে করম একাদশীতে গাহা সেই ঝুমর শালা অবিকল তুল্লে ফেলেছে! হাই দ্যাখো!

রাইবুর ফের একবার মনে হল, ব্যাটাচ্ছেলে একটু যা বোকা ভীতু ভীতু। গায়ে কিন্তু অসুরের বল। তাকে আরো খানিক চালাক-চতুর হতে হবে!

কী গান তুল্লেছে! তুঁহেই কানের ফুল লো স-জনি ধনি। তারমানে কানফুল, কানপাশা।

হেঁ দিতে পারবি? রূপার হোক সোনার হোক? আর বিহা যে করবি খাওয়াবি কী?

গুড়গুড়িয়া যেন বলল, তোর ঘরেই বা সোমবারি কী খায়?

সোমবারির মুখটা দু'চারবার ডগোমগো করে ভেসে উঠতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল রাইবুর।

সে আর্তস্বরে ডেকে উঠল, সম্বারি! স-ম্ বা-রি-ই-ই-ই-ই!

ডাকটা বন-বাদাড় ভুঁই-ভাগাড় ফুঁড়ে-ফেড়ে কোথায় যেন দিগ্বিদিকে চলে যাচ্ছে।

গাছ থেকে ডাল থেকে ঝপ্ করে নেমে এল গুড়গুড়িয়া। রাইবুর সামনে বুক চিতিয়ে বলল, সম্বারির কী হৈল? অমন উথালি-পাথালি ডাকছ যে বড়?

ন্নাই, কাই সম্বারি, ধাতস্থ হয়ে বাইবু বলল, তোর খালি সম্বারি সম্বারি, সোম্বারিকে আমি কেনে ডাকব? উ ত পাখির ডাক।

কী পাখি? কুথায় পাখি?

ঐ ত ডাকছে—টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু? শুনছিস নাই গুড়গুড়ে?

ন্নাই, গুড়গুড়িয়া বলল, কুথাও কিচ্ছু নাই, পাখ নাই, পাখালি নাই, ও তুমার মনের ভরম। বরঞ্চ হুই দ্যাকো, মনামাজন লদোপদো আড়ায় ঢুকছে। জামাকাপড় খুলে লিঞে দিই শালাকে ছেড়ে ল্যাংটা করে?

গুড়গুড়ে, তুই থাম।

রাইবু দাবড়ে উঠল।

মনা মা'জন? আড়ায়? শুদ্ধ আছে ত? প্রায় দৌড়ে গেল রাইবু বিড়বিড় করতে করতে।

খুব কটু কথাই বলত। তাব আগেই মহাজনের 'ডেরেস' দেখে ভড়কে গেল। দ্যাবতার মতো ফর্সা লোমওয়ালা শরীর। লাউফুলের মতো ধবো জামা-কাপড়। হাঁপাচ্ছে।

দণ্ডবৎ করে রাইবু বলল, কী মনে করে মা'জন?

শালরল্লা দিবি বল্লি, কই দে?

গাছের সদ্য কাটা ডাল দেখিয়ে রাইবু বলে, ঐ যে ঝুলছে। আড়া উঠুক, তবে ত।

খুউব যে ফুটানি! আমাকে 'আড়া' দেখাচ্ছিস?

ন্নাই, মা'জন কুন শালা মিছাকথা বলে? তুমি হৈলে ধনকুবীর—

কবে তোর 'আড়া' উঠবে, তদ্দিনে আমার আখুশাল তো সাবাড় রে রাইবু?

নাই পুষায় যদি ত—

খচাং করে বলে বসল গুড়গুড়িয়া।

হুঙ্কার দিয়ে তাকে হাতের বেড়ে নিয়ে আসতে চায় রাইবু। পারে না।

সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে মনা সাউ। তবু হেসে বলে, দাদন নিবু ত তসরগুটির? নাকি তাও—

কথা শেষ করতে দিল না রাইবু। আগবাড়িয়ে বলল, ম্নাই, মা'জন ইবছর যা হবার সব লগদালগদি। লগদ-বিদায়। সেই বলে নাই— আজ লগদ কাল ধার, ধারের পায়ে নমস্কার?

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরবার সময় পায়ের মচমচে জুতার চাপে একটা পাকা বিরিবেগুনের ফল মাড়িয়ে ফেলল মনা সাউ অজান্তে।

আর মাড়ানোমাত্রই বিরিবেগুনের নাড়িভুঁড়ি ছিটকে উঠে ফর্সা ধুতি-জামার হেথা হোথা গাবিয়ে গালেও লাগল।

মুছে ফেলল না মনা সাউ। লোধাদের মাথার ঘিলু মনে করে রেখেই দিল। থাক।



জরিলালের বিয়ে হয়ে গেছে এর মধ্যেই। জরিব মা আব এখন বরের মা নয়।

"বর-বরিয়াতি ছাগল-আঁতি, বরেব মাকে লে'গল তাঁতি"—এই বলে আর কেউ তাকে এখন খেপায় না।

ঘরে তার বেটার বউ। সে এখন তার বেটাবউয়ের শাশুড়ী। সে এখন ঝাড়া হাত-পা নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে। বরঞ্চ বলা ভাল, বেশি বেশি করেই ঢোকে।

বিন্দাদূতীর বিবাহ হয়নি। তাকে বিয়ে দিতে তার বাপ সুরথ এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই নেয়নি।

বিবাহ? আর হবেও না। উদ্‌যোগ? আর নেবেও না। এইরকম ধারণার বশবর্তী হ'য়ে জরির মায়ের সঙ্গে বিন্দাদূতী জঙ্গলে ঢোকে। বেন বেশি বেশি করেই ঢোকে।

একজন বুড়ী একজন ছুঁড়ি, এই দুজন অসমবয়সী মেয়েমানুষ পারলে জঙ্গলটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ছাড়ে।

অবাধ গতিবিধি তাদের। জঙ্গলের হেন প্রান্ত নেই যা তারা চেনে না। হালে তাদের গতি রোধ করে দাঁড়িয়েছে লোধা-শবরদের 'আড়া'।

রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িবা-শরাবণদের সঙ্গে এই নিয়ে রোজ তাদের বচসা হয়। বাসিকাপড়-পরা কোথায় কী লটঘট করে আসা মেয়েমানুষদেব তারা ঢুকতে দেবে না আড়ায়।

কিন্তু শতেক বাধাবিপত্তির নিষ্পত্তি করেও আড়ায় ঢুকে পড়ে জরির মা, বিন্দাদূতী। বড়োডাঙা-চাঁদরপুর-লবকেশরপুরের-কাঠকুড়ানী মেয়েমানুষরা!

জঙ্গল যে এদেরও দানাপানি দেয়।

পাহারা যতই কঠিন হয়েছে ঢোকার জিদও বেড়ে গেছে ততই। লোধারা তাই বাধ্য হয়েছে আড়ার চারধারে 'কুঁড়িয়া' বেঁধে থাকতে। অষ্টপ্রহর পাহারাও দেওয়া হবে কাজকামের ধান্দাও দেখা হবে।

তামার তারের নুড়ির মতো মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরিয়ে গুটি বাঁধতে শুরু করেছে গুটিপোকারা। ধারে 'থোড়' আসার মতো, গর্ভাধানে দুধ জমার মতো।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রূপান্তরের আশায় আশায় অষ্টপ্রহর নুড়ি পাকাচ্ছে পোকারা। এ-সময় আড়ায় ঢুকে পাকা ধানে মই দেওয়ার মতো নরম তুলতুলে গুটির ক্ষতি করলে কার-বা সহ্য হয়? গুরভা-গুড়গুড়িয়ারাই বা আটকাবে না কেন?

তবু তো কাঠবিহনে ঝাঁটি-খুঁচিবিহনে অন্ধকার। রান্না হবে কী দিয়ে? এ তল্লাটে, কী কাছেপিঠের গঞ্জেও কয়লার ব্যবহার নেই। কাঠই ভরসা।

জঙ্গলে যাবার আগে বিন্দাদূতী জরির মা, রোজ যেমন করে, ডাক দিয়ে গেল পাড়ার এ-মুড়ো সে-মুড়ো—ও লো, কে কে যাবি আয়!

সকালের পাখাল, বাসি পান্তা কী পান্তার জলটুকুই খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে, কেউ বা—বসে বসে খাওয়ার অত সময় নেই—কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে চিবোতে চিবোতেই বেরিয়ে পড়ল।

আজ দলটা একটু ভারি হয়েছে। আছে শকুন্তলা-চাঁপা-থরপো-তরু-টুনিয়া। বিন্দাদূতী জরিয়ার মা তো আছেই।

জঙ্গলগামী দলটার সঙ্গে এসে জুটল আরো কেউ কেউ। এরা কাঠ কুড়োতে জঙ্গলে যাবে না, যাবে ধান কাটতে সোলমুড়োয়, দখিলসোলে, সরুবালিতল্লায়।

দে জরিয়ার মা, 'দক্তা-বনা' দে। শখ করে মতিহারি দোক্তা চুনে মিশিয়ে খেতে চাইল কেউ।

দোক্তার পাতা চুনে মিশিয়ে বানাবার সময় নেই। বানানো দোক্তাই সে চেয়ে নিল বুড়ীদিদির কাছ থেকে।

একটু খেল, বাকিটা গিঁট দিয়ে বেঁধে রাখল আঁচলে।

মুখে দিয়েই থুতু ফেলল।

—থুতু ফেললি যে? তা'লে আর দক্তা খাবার মজাটা কী পাইলি?

যে থুতু ফেলেছিল সে বলল, থুতু গিললে আমার যে মাথা ধরে ধন!

দোক্তাখোরদের মাথাও ধরবে, দোক্তাও খেয়ে যাবে। কিছুটা খাবে, কিছুটা বেঁধে রাখবে আঁচলে। সারাদিনের খোরাকি। নেশার দ্রব্য না হলেও তো চলে না।

চলে না, চলে না।

একই সঙ্গে চলেছে ছাগল-বাগালরা, গরু-বাগালরাও। ছাগল-বাগালরা দূরের জঙ্গলে যাবে না। তারা যাবে ছাগল চরাতে কাছে-পিঠের ডুবকা-ডুংরিতে। গরু-বাগালরা যাবে গভীর জঙ্গলে, সীতানালা খালধারে।

গরু চরানোও হবে, দুপুরের স্নানটাও সারা হবে। হোমিওপ্যাথি শিশির এক শিশি সর্ষের তেল তো 'গিরিহাই' দিয়েছে।

আরেক দলও যায়। ছোট-বড় ছেলে-মেয়েরা। এরা গরু চরায় না, ছাগল চরায় না। স্কুলে যায়, বা যেত, এখন যায় না। এদের প্রায় বিয়ের বয়স। এরা যাচ্ছে পিকনিক করতে, 'বনভুজনী' সারতে।

আগের দিন রাত্রেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে—ঘর পিছু চাল-ডাল-পুঁইখাড়া-আলতি-আলু। তেল-নুন-পেঁয়াজ-লঙ্কাও সঙ্গে আনবে।

অনেকে এনামেলের হাড়িকুঁড়ি। কুমড়া-বেগুন-বরবটি।

রান্না হবে কোনো বাঁধের ধারে, জলের ধারে। খালধারে। খুব ভিতরে তারা যাবে না। বাপ-ভাইয়েরও মানা আছে। মেয়েদেরই 'বনভূর্জনি' মেয়েরাই যাবে, বড় বড় জোয়ান ছেলেরা যেতে পারবে না।

বড় বড় মেয়েরা বড়জোর সঙ্গে নিতে পারবে ছোট ছোট ভাইয়েদের, ভাইপোদের,

বোনেদের। কোনো জোয়ান ছল করে যদি এসেও পড়ে, তার সঙ্গে যুবতীরা কথা বলবে না। চোখ তুলেও দেখবে না। হাসি তো না-ই।

হাসলে, কথা বললে তাদেরই সঙ্গের ছোট ছোট ভাইয়েরা বোনেরা বাড়ি ফিরে বলে দেবে—দিদি এই করেছে, ওই করেছে। অমুকের সঙ্গে।

বাব্বা! মেয়ে হ'য়ে জন্মানোর জ্বালা কী কম! কথায় বলে না—

বালিরাস্তায় মস্ মস্ বালি ভাঙতে ভাঙতে বিন্দা জরির মা-কে জানাল, আজ যে করেই হোক সে আড়ায় ঢুকবে। আড়ার ভিতর শুকনো ঝাঁটিকাঠের 'তুপ' সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

জরির মা জরপ করে হেসে বলল, গুড়গুড়িয়ায় ধরবে লো মুখপুড়ি। তখন কেঁদে কুল পাবি নাই।

গুড়গুড়িয়ার কথায় চমকে উঠল বিন্দা। গেলবারে খালভরার কামচোখ তো সে দেখেছে। কইমগাছের ওদিকটায় লাটায় লুকিয়ে জল খাচ্ছিল লোকটা। তাই নিয়ে কত বিচার, বিবেচনা হল।

ভয় লুকিয়ে, হেসে বিন্দাদূতী বলল, তবু ভাল জরিয়ার মা, একজনা ত ধরবে।

এ-কথায় 'জরির মা' নামের বিগতযৌবনা, প্রৌঢ়া, অনায়াসেই বুঝল, আহা রে, বিন্দার কী জ্বালা! মেয়েদের বিয়ে-সাদি না হলে জীবনটাই বৃথা। মেয়ে হয়ে জন্মালো, বিয়ে-সাদি হল না, ঘরকন্নাও করল না, ছা-ছানার মা হল না, তো মেয়ে হয়ে জন্মানোই বা কেন?

জরির মা ভাবল, তবু মেয়েদের যেটুকু আছে, যে ধন—সেটুকু তার 'সতীত্ব'। সেই-ই-খোয়া গেলে তার আর কী থাকল?

হাঁই হাঁই করে উঠল জরির মা। বলল, ওর'ম ভাবিস নাই রানী। ও-কথা মুখেও আনিস নাই। মেয়েদের ওটুকু গেলে আর কী থাকে ধন? দেখিস, বিয়ে-সাদি ঠিক একদিন হবেই। সুরথদাদা এখন পারছে না তাই! কেরমে কেরমে হবে। ধৈরয্ ধরতে হয়।

জরির মায়ের সান্ত্বনাবাক্যে দেহ-মন যেন শীতল হয়ে গেল বিন্দাদূতীর। কী বলল? বলল কী জরিয়ার মা? বিয়ে-সাদি ঠিক একদিন হবেই!

আমারও বেহা হবে, গায়ে-হলুদ হবে। গায়ের হলুদে কোরা নতুন শাড়ি 'গাবা' হয়ে যাবে। ঝুর ঝুর করে গাল থেকে চুলের গোড়া থেকে শাড়ি থেকে হলুদ-গুঁড়ো ঝরে পড়বে। দু'হাত মস্‌কালেও হলুদ-গুঁড়া। 'বাঁধাপনি' বসবে, কড়ি চালা হবে। আর 'কাঁকড়া ধরা'? তাও হবে?

> সবন্‌রেখার শিল-লড়া বড়ডাঙর হলুদ গো
> ভাল করে হলুদ বাঁটবি 'কনিয়ার' অঙ্গ সাজে গো।

সে প্রায় এক লাফে জরির মায়ের কাছে হাজির হয়ে, খুশিতে ডগোমগো হয়ে বলল, হেঁ তাহলে বলছিস—আমারো বেহাঘর হবে? আয় জরিয়ার মা, তোর গালে একটা চুমা দিই।

চুমা দিল বিন্দাদূতী জরির মাকে। জরির মাও পাল্টা চুমা দিল বিন্দাদূতীকে।

তারপর, দু'জনে হাসতে হাসতে বক বক করতে করতে জঙ্গলে ঢুকল। শকুন্তলা, থরপোদের দলটা এখনো পড়ে আছে পিছনে।

উপেনকম্পাউন্ডারের চেম্বারে রাইবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বড়খাঁকড়ি হাইস্কুলের মাষ্টার আদিত্যর। আদিত্য সেনগুপ্ত। শহুরে মানুষ। তার সঙ্গে সেবার খুব রগড় করেছিল রাইবু।

কী করো? বলায় উত্তর দিয়েছিল, রাজত্বি।

বলেছিল, লোকে ত বলে সে-ই জঙ্গলমহালের রাজা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে দেখতে পায়—হাতির পিঠে চড়ে যাচ্ছে। দুধারের লোকজন তাকে দেখে 'নমো' করছে।

উপেন কম্পাউন্ডার বলেছিল, দে আর ভেরি সিম্পল এণ্ড ইন্টারেস্টিং। তুমি আদিত্য, এদের নিয়েও তো লিখতে পারো?

সেই থেকে মাথায় ছিল আদিত্যর। একটা কিছু করবে। সঙ্গে উপেন কম্পাউন্ডারের দেওয়া একটা লোক নিয়ে সে চলেছে আজ লোধাবস্তিতে।

তার আগে বইপত্তর ঘেঁটে দেখেছে কিছু। দেখে খুব আগ্রহ বোধ করেছে। আজ সরেজমিনে দেখতে চলেছে সে।

কবে পড়েছে 'চর্যাপদ'-এ! এখনও মুখস্থ আছে—

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসহি সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা করগুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিত্য ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅ নত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এখন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।"

আর এতদূরের স্কুলে মাষ্টারি করতে এসে এত কাছের 'সবরী বালী'-কে একবার চোখের দেখা দেখে যাবে না আদিত্য? তাও কী হয়?

উপেন কম্পাউন্ডারের কথায় সেদিন চুপটি করে বসে থাকলেও মনে মনে আসার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল সে।

কিন্তু সে শুনেছে, লোধাবস্তিতে আসা অত সহজ নয়। হয়ত অচেনা লোক দেখে পরনের ঢাকী-ঢুলী মায় আন্ডারওয়্যারটিও খুলে নিয়ে একেবারে নাঙ্গা করে ছেড়ে দিল তোমাকে!

হয়ত কথাই বলল না। কথা বলা তো দূরঅস্ত, দূর থেকে দেখেই দৌড় লাগাল। বস্তিতে হাজির হয়ে তুমি দেখলে—সব ভোঁ ভোঁ।

কিচ্ছু নেই কেউ নেই। কটা কুঁড়েঘর। কটা ছাগল-মুরগী। কটা 'ল্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুম' ছানাপোনা।

তাই আঁটঘাট বেঁধে উপযুক্ত লোক নিয়েই যাচ্ছে আদিত্য।

কিন্তু উপেনবাবুর দেওয়া লোকটা নদী পেরিয়ে যতই এপারে আসতে লাগল ততই যেন কেমন অসহায় বোধ করল। নিজের উপর সে বিশ্বাস রাখতে পারছে না! বলতে কী, ভয়ই পাচ্ছে।

সে খুঁজে-পেতে আরেকজন বিশ্বস্ত লোককে ধরে আনল। আর এই করে অনেকটা বেলাও হয়ে গেল।

দোরখুলির লোধাবস্তির দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই কৌতূহল বাড়ছে আদিত্যর। আগের 'সবরী বালী' তো ময়ূরপালকের পোশাক পরত, গুঁজফুলের মালা পরত। না জানি এখনকার শবরীদের কেমন দেখতে? কিসের পোশাক? কিসের মালা?

একটা গান টোকা আছে আদিত্যর ডায়েরীতে—

ই মালা সরু সরু
ই মালা কত রে ভাল।
ই মালা গাঁথিতে সূতা নাই,

পরিতে লকো নাই—
ই মালা নদীজলে ভাসাঞে দিব।

মালা গাঁথা হচ্ছে, কিন্তু পরবার লোক নেই।

চারধারের দৃশ্যপট দেখতে দেখতে চলেছে আদিত্য। অরণ্য দেখতে দেখতে তার মনে পড়ছে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর কথা।

যেদিকেই চোখ যায় কাটাগাছের গুঁড়ি। যেন এক-একজন জঙ্গলপ্রহরী। কিছু পালাপতর মাথায় জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গুঁড়ির চারধারে বেড় দিয়ে গজিয়ে উঠেছে সবুজ, ঘনসবুজ ছোটছোট ডুংরি। কোথাও বসে আছে কাটা-গুঁড়িতে ল্যাজ-চেরা কালো কুচকুচে 'ঢ্যাপচু'! ফিঙেপাখি।

কোথাও মাছরাঙার মতো অনেকটা দেখতে বিচিত্রবর্ণের পাখি। তবে ঠোঁটটা মাছরাঙার মতো অত লম্বা নয়।

উপেনকম্পাউন্ডারের দেওয়া সঙ্গের লোকটি নয়, সে যাকে ধরে এনেছিল সেই লোকটি বলল, আমরা ত বলি, 'ট্যাঁসা'। জয়পাখি। ঐ পাখির পালক সঙ্গে থাকলে যেকোন কাজে সিওর জয় বলেই জয়পাখির পালক খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা।

দোরখুলির বড়রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকে বাঁক নিলেই ছাড়া ছাড়া লোধাবস্তি। পাতাব 'কুঁড়িয়া'। কোনটায় বা খড়ের চাল। ছিটে-বেড়ার দেওয়াল। 'ভুগড়া'-ই সব। একটা দুটো যা মাটির দেওয়াল।

বড় বড় গাছতলা। কুঁড়েঘরগুলির আশপাশে ছাগল চরছে, চরে বেড়াচ্ছে খুকড়া-মু । উঠোনে দুটো-একটা কানাভাঙা মাটির হাঁড়ি-কলসি। জল রাখার জায়গা।

দূর থেকে মনে হচ্ছিল কিছু মেয়েমানুষ, বাচ্চাকাচ্চাও এধারে ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে আদিত্য সামনাসামনি হতেই সব উধাও। একটা জনমান্মি নেই। পিল পিল করে কেউ ঢুকল ঘরের ভিতর, কেউ দৌড়ুল জঙ্গলে।

সব মেয়েমানুষ। একটাও পুরুষ নেই। এমন কী একটা বাচ্চাকাচ্চাও নেই বাইরে। পড়াশঝাঁটির বেড়ায় লটকে আছে ছেঁড়া কানি, ছেঁড়া কাঁথা। লটকে আছে গাছগুলির ফাঁককোকর দিয়ে আসা ছেঁড়া-ফাটা শীতের রোদ-রৌদ্র।

বড়খাঁকড়ি হাইস্কুলের বাংলার নতুন স্যার আদিত্য বৃথাই কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল শবরগ্রামের এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো।

উঁচু উঁচু পর্বত তো দূরঅস্ত, সামান্য টিলা-ঠিলাও নেই কাছে। তবে দু-একটা উঁচু জায়গা, গড়ান মতো আছে কিছু।

ঘুমন্ত কুকুরগুলো জেগে উঠে খানিক ঘেউ ঘেউ করল বটে, তবে তারা আবার ঘুমিয়েও পড়ল সাততাড়াতাড়ি।

ছাগল চরছে, যেমন চরছিল। খুকড়া-মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেমন ঘুরছিল। শুধু মেয়েমানুষগুলো তাদের ছানাপোনা নিয়ে ঘরে ঢুকে বাঁশের 'আগড়' টেনে দিয়েছে।

দু-একটা ছবি তুলল আদিত্য। আশপাশের। তার মন খারাপ। এতদূর কষ্ট করে এসেও কোনো মানুষজনের সঙ্গে দেখা হল না।

সঙ্গের লোকদুটো অনেক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করল। অভয় দিল। তবু কেউ বেরোচ্ছে না।

শুধু কিছুক্ষণ বাদে বাঁশের 'আগড়ের' ফাঁক দিয়ে একটা জলের ধারা সবেগে বেরিয়ে এল শূন্যে।

মনে হয় কোনো একটা বাচ্চাছেলেরই কীর্তি হবে। বেগ সামলাতে না পেরে বাঁশের আগড়ের ফাঁক দিয়েই—

তার ছবিও তুলল আদিত্য।

উচ্ছল জলধারা দেখে উপেনকম্পাউন্ডারের দেওয়া সঙ্গের লোকটা নয়, তার ডেকে-আনা লোকটাই মাঝখানে একবার বলে উঠেছিল, ধর ত বে শালাকে!

আচমকা বলায় জলের ধারা বিদ্যুদ্বেগে কমে গিয়েছিল বটে, আবার তা প্রত্যাশিত বেগেই পড়তে লাগল।

সেই বলল, পুরুষদের দেখা পাবেন না, পুরুষরা সব 'আড়ায়' গেছে।

'আড়া' তার মানে আরো গভীর অরণ্যের ব্যাপার। আরো গভীর জঙ্গলে ঢুকতে হবে।

সুযোগ তো থাকলই। কাৰ্ছেপিঠের স্কুলেই সে জয়েন করেছে। একদিন-না-একদিন প্রোগ্রামটা সে পুরা করবেই করবে।

আজ সঙ্গের মানুষ দুজনও খুব বেশী উৎসাহ দেখাল না।

ফেরার পথে টুকটাক প্রশ্ন করছিল আদিত্য। সঙ্গের নতুন লোকটি অনেককিছুই জানে, আদিত্যর মনে হল।

এরা কী খায়?

সাপ, উন্দুর ব্যাঙ। বনের ফলমূল, কেঁদ-বহড়া-ভেলা-ভুড়রু। খামআলু-পানআলু-আঁউলা-বাঁউলা-চুরকা। বাঁশকরোল-শালপগুড়া-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া—

ভাত খায় না?

ন্না।

উপেনকম্পাউন্ডারের লোকটি শুধরে দিয়ে বলল, খায়। তবে পেলে ত!

সে দেখলে আমরাই বা ঠিকমত ভাত খাই কজন? বলল নতুন লোকটা।

আমরা মানে? আদিত্য অবাক।

আমরা মানে, এই দেখুন স্যার, আর কী গরীব-দুখী নেই সংসারে?

কথা বাড়ায় না আদিত্য। পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে লোকটাকে দিল।

টাকা পেয়েই লোকটা দুহাত কপালে ঠেকিয়ে আদিত্যকে গড় করল।

চল্লাম স্যার। আবার যদি দরকার হয় ডাকবেন। আমার নাম সুদর্শন, ননমেট্রিক। পেশায় গাইড।

বলেই দৌড়ুল।

লোকটা চলে গেলে কম্পাউন্ডারের লোকটা বলল, খুব মাথাওয়ালা ছেলে ছিল স্যার। অভাবে আর মদে—ও এখন যাবে 'পাড়ায়'।

পাড়ায় মানে? হেসে আদিত্য জিজ্ঞাসা করল, শুঁড়িপাড়ায়?

না স্যার, খুকড়া-পাড়ায়, যেখানে মোরগের পায়ে 'কাত' বেঁধে মোরগলড়াই হয়। ওদিকে ও খুব 'হাউসি' কী না!

আড়ায় ঢুকবে জরিয়ার মা, বিন্দাদূতীরা।

শকুন্তলা-চাঁপা-থরপোরা আড়ায় না ঢুকেও আড়ার আশপাশে ঘুরে ঘুরে কাঠপাতা কুড়োচ্ছে। আড়ায় ঢোকার তাদের অত চাড় নেই।

কিন্তু বিন্দাদূতী নাছোড়। সে আড়ায় ঢুকবেই ঢুকবে। গুড়গুড়িয়াও ঢুকতে দেবে না।

কেনে, ঢুকতে দিবি নাই কেনে? ই জঙ্গল কি তোদের একার?

আমরা ইবচ্ছর জম্মা লিঞেছি।

বেশ করেছিস। তা বলে তাল্লাট-কে-তাল্লাট?

হঁ!

ব্বাস রে! এত টাকা পাইলি কুথায়ে?

তার উত্তর তক্কে দিতে হবে?

হঁ, দিতে হবে। নাই দিতে পারবি ত জঙ্গলে ঢুকতে দে।

চোখ পিট পিট করে মিঙমিঙে স্বরে গুড়গুড়িয়া বলল, যেখানে সেখানে যা তা করে আসবি আর আড়ায় ঢুকবি—তা ত হবে নাই।

বলামাত্র আর যায় কোথায়! উস্তন-খুস্তন করে মারল গুড়গুড়িয়াকে বিন্দাদূতী—

কী-ই করেছি রে খালভরা? বল, তোকে বলতেই হবে।

দৌড়ে এল জরির মা-বুড়ী। সে সালিশি করে বলল, কুকথা বলিস নাই রে লোধাছোঁড়া। ওর এখনো বেহাই হয় নাই ত কুকর্ম করবে কুথায়ে? দে ঢুকতে দে।

বড় লজ্জায় পড়ে গেল বিন্দাদূতী। জরিয়ার মায়ের মুখে আঁখ-ঢাক নাই।

জরির মা বলেই চলে, সারা জঙ্গলটা তোরা দখল করে বসে আছিস, আর আমরা যে কাঠপাতা কুড়াবো তার জায়গা কুথা?

তার আমি কী জানি? নরসিঙাকে শুধ্‌ধা, বল বীটবাবুকে।

গুড়গুড়িয়াও কম যায় না। জগদ্দল পাথর।

উপায়ান্তর না দেখে বিন্দাদূতী শুরু করে দিল গালমন্দ। সে মুখে গালিগালাজ দিচ্ছে, আর যতটা সম্ভব হাত বাড়িয়ে আড়ার ভিতর থেকে ঝাঁটিকাঠি টেনে আনছে।

গুড়গুড়িয়া ধমকে উঠল, খব্বরদার! টানা-হিঁচড়ায় জারার একটা 'লত'ও যদি ছিঁড়ে!

জারার লতা দেখে লোভ হচ্ছিল বিন্দাদূতীর। একহাত কেন, দু'হাত লম্বা লম্বা এককেটা বুনো বরবটি। না সার না গোবর, বুনোমাটিতে রদবদিয়ে বেড়ে উঠেছে।

লজ্জার মাথা খেয়ে বিন্দা বলল, দে ন একগোছা, এই লোকটা!

এখনো পুজ্জাই হয় নাই আর তক্কে দিঞে দিব-অ। অত্ত নাই! গুড়গুড়িয়া বলল।

আড়ার এদিকটায় পাহারায় আছে গুড়গুড়িয়া। কুঁড়িয়া বেঁধে। আগুনের একটা 'জুমড়া' অর্থাৎ জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ি ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে কুঁড়িয়ার সামনে।

তাতে মাঝে মাঝে শালপাতার চুটা ধরিয়ে নিচ্ছে গুড়গুড়িয়া। কঠিন পরীক্ষা! দিতেও মন চায় আবার দেওয়ার আইনও নেই। রাইবুর আড়ার আইন ভাঙবে—অত দঁক কী গুড়গুড়িয়ার আছে?

নেই, নেই। সে শুধু চুপচাপ থেকে চোখ পিটপিট করছে আর বিড়ি টানছে।

নিরুপায় বিন্দাদূতীকে এসময় হাত ধরে টান দিল জরিয়ার মা। বলল, আয় বিন্দা, উদিকটায় যাই, চ।

'বনভূজনি পাটি'তে মোট চৌদ্দজন। ছেলে-মেয়ে। মেয়েরাই বড়। এককালে তারা স্কুলে পড়ত, এখন আর যায় না। তাদের যোগ্য স্কুলই নেই গাঁয়ে, তো কথা কী।

স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের পাঠ তারা শেষ করেছে, দূরের বড় স্কুলে যাবার অনুমতি নেই তাদের।

তারা জঙ্গলের অতি গভীরে, এমন কী সীতানালা খালধারেও 'বনভূজনি' বসাবার অনুমতি পায়নি। বাপ-ভাইয়েরা নিষেধ করে দিয়েছে।

কাছেই, নাম-কে-বাস্তে জঙ্গল, জঙ্গল না ছাই ডুংরি, ঠাকুরবাঁধের কাছেই পিকনিক

বসিয়েছে তারা। বাঁধের জল আছে। তাছাড়াও কাছেপিঠে কয়েকটা মাহাতোদের গ্রাম, সাঁওতালপাড়া। কুয়োও আছে। কুয়ো তো বলে না, বলে 'চুঁয়া'।

রান্না হচ্ছে প্রায় হলুদ হয়ে যাওয়া পুঁইখাড়া। শ্রাবণ-ভাদ্রের লকলকে পুঁইডাটা তো আর নেই।

তবু প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই এসেছে দেড়-দুহাত পুঁইলতি। ছোট ছোট ম্যাচড়ি ধরা। এটাই সব থেকে সহজলভ্য কী না।

আর এসেছে 'আলতি' কচু। আলু নেই, আলুর পরিবর্তে। পুঁইডাঁটা-কচু-কুমড়োর ঘেঁট হচ্ছে।

কেউ বলল, মমতা, এর সঙ্গে চিংড়িমাছ হলে বেশ হত!

মমতা নামের বড় মেয়েটি বলল, ঠাকুরবাঁধে আর চিংড়ি কোথায় পাচ্ছ!

চাঁদা-পুঁটি-দাঁড়িকিনি—যে কোনোরকম মাছ হলেই তো হয়, মমতা?

'করছুলি' নাড়তে নাড়তে মমতা গিন্নিবান্নির মতো হেসে বলল, তা হয়।

আর বলামাত্রই দু'দল ছুটল দু'দিকে। একদল গেল ঠাকুরবাঁধে, আরেকদল দখিনসোলের সোঁতায়।

বর্ষার পরে পরেই সোঁতায় বুলান-হদহদিতে যেখানেই ঝিরিঝিরি জল সেখানেই ধানাগুলি-পুঁটি-দাঁড়িকিনি ভেসে বেড়ায়। মাছ তারা আনবেই আনবে। না হলে, মাছবিহনে অত সুন্দর ঘেঁটটাই যে বিস্বাদ হয়ে যায়!

এনামেলের ডেকচিতে ভাত ফুটছে বুগবুগ করে। দু-চারজন শালপাতা ছিঁড়ে এনে কাঠিখুঁচি, বিশেষত পড়াশ কুঁচি দিয়ে পাতা সেলাই করছে। ঠিকমত হচ্ছে না।

একজন বলল, লোধারা এইরকম করে। বলেই পাতা টেনে সে সেলাই-ফোঁড় শিখিয়ে দিল অন্যদের।

একজন ছোটমত ছেলে বায়না ধরল, আমি 'দোনা' বানাব, দোনা। দোনা না হলে ঝোল খাব কিসে?

কিন্তু কিসের ঝোল? 'বনভুজনি'তে কী ঝোলের কিছু ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করা আছে?

মমতা, মমতা। মমতাই নিরস্ত করল তাকে। বলল, সাত্যকি, এ কী তোর বিয়েবাড়ি যে মাংসের জুস্, মাছের ঝোল খেতে পাতার দোনা লাগবে? 'খালিপাতায়' ভাতের উপর ঢেলে নিলেই হবে।

আচ্ছা, তবে তাই হোক। 'দোনা' সে বানাবে না। তবে সে আর কী বানাবে?

আপাতত বানানোর আর কিছু নেই। নেই, নেই।

কাজছাড়া হয়ে সাত্যকি নামের ছোট ছেলেটি আকাশ দেখল—বনের আকাশ। শাল-পিয়াশাল-ধ-আসনগাছের ভিতরের আকাশ। পাখি দেখল—বনের পাখি। ঢ্যাপচু-ট্যাঁসা-কপ্‌তি-ক্যারকেটা-কয়ের-গুড়ুর। যা হোক একটা। কিছু না হোক, সূর্য তো দেখল—বনসূর্য। সব কেমন আলাদা আলাদা।

তারপর, মাথা নামাতেই দেখল মানুষ-বনমানুষ।

খেতে বসবার আগ-মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে লোধাশবরদের ছানাপোনারা। সব ল্যাংটাভুটুঙ। কার-বা পেটটা ডাবা। হাত-পা লিকলিকে।

একটু তফাতেই সার দিয়ে বসল সব। তাদের জঙ্গলে 'বনভুজনি' হচ্ছে আর তারা আসবে না? আসবেই আসবে।

তাদের দেখে 'বনভুজনি পার্টির' কেউ বা বিরক্ত হল। এল এল, আরেকটু পরে এলেই তো পারত। কেউ-বা হাসিমুখেই মেনে নিল সবকিছু, বিশেষ করে মমতা।

এতসব আয়োজন তারা একা কী কখনো খেতে পারে? অবশিষ্ট তো থাকবেই? ভাত, শেষ-উচ্ছিষ্ট।

গুঞ্জন উঠল, ছোটরা এসেছে আসুক, বড়রা না এসে পড়ে? এসে যদি লুট করে নেয় সবকিছু?

তাই তো, হ্যাঁ তাই তো।

না, না। তাও কী কখনো হয়? আর তাহলে আমাদের গ্রামের লোকেরা কী ছেড়ে দেবে? টাঙ্গি-তাব্‌লায় চটিয়ে দু-টুকরা করে ফেলবে না লোধাদের?

না, না। ভয়ের কিছু নেই, তারা কখনো আসে! অতএব, নির্ভয়ে হল্লা করতে করতে সার বেঁধে তারা সব খেতে বসল।

খাওয়ার আগে শালপাতাব 'খালি'-তে সামান্য জল দিয়ে হাত ঘষে ঘষে পরিষ্কার করল। সবচেয়ে ছোটদের পাতা ধোয়ার কাজটাই হল দেখবার মতো।

ভাত পড়ে গেছে 'পাতে'। তার আগে পাতার কোণায় কোণায় রেখে গেছে নুন-লঙ্কা।

ভাত ঢেলে দেওয়ার পরে তাদের মনে হল, তারা যেদিকে মুখ করে ভাত খেতে বসেছে, লোধাদের ছা-ছানারাও মুখ করে আছে সেদিকেই।

বড় মেয়েদের কেউ একজন বলল, আমরা খাব আর তারা বসে বসে দেখবে ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে! তাতে 'নজর' লেগে যাবে। আর 'নজর' লাগলে—

ঠিক হল, তাই ঠিক হল—'পাত'টি ঘুরিয়ে নেওয়া যাক। বলামাত্রই যে যার পাতা হাতে নিয়ে ঘুরে বসল। ছোটরা পাতা হাতে ঘুরতে পারল না, তাদেব পাতাটি বড়রাই ঘুরিয়ে দিল।

আর লোধাছেনারা মুখ 'আমষি' কবে বসে থাকবে?

বসে থাকুক না, আমাদের খাওয়ার পরে যা কিছু বাঁচবে—সব তো ওরাই পাবে। আর কে-বা আছে?

কেউ একজন বলল, ওদের দুটো কুকুরও বসে থেকে হ্যালহ্যাল করছে জিভ বের করে। ওদেরকেও দু'মুঠো দিতে হবে।

তা তো দিতেই হবে। আগে জীব পরে শিব।

খাওয়া শেষ হল। খাওয়াও বাঁচল। এবার লোধা ছা-ছানাদের পালা—

পালাক্রমে তাদের খেতে দিয়ে একে একে নাম জিজ্ঞাসা করল মমতা, সেই বড় মেয়েটি।

কী নাম?

লাইবুকা।

তোর?

সুরুয়া।

তোর?

পণ্ডড়া।

তোর?

নেড়ী।

তোর?

নাকফুঁড়রি।

তোর?

হাড়িয়া।

সবশেষে, লোধাদের ছা-ছানারাই বলল, কুত্তা দুটার নাম লিলে নাই?

হাঁ, কি?

ই-টা লীলাম্বর, উ-টা বাঘাম্বর।

শোনামাত্র 'বনভুজনি পার্টিতে' হাসির হল্লা পড়ে গেল। তাদের হাসির কারণ—লোধা ছা-ছানাদের নামের চাইতেও তাদের কুকুরগুলোর নাম যে সুন্দর!



জঙ্গল নেয় না, জঙ্গল দেয়।

জঙ্গলে বেড়ে-ওঠা গাছগাছড়ার জন্য কেউ চারাও লাগায় না, ঝারি ভরে জলও দেয় না। শৌখিন কাঁচি দিয়ে কেউ ডগাও ছাঁটে না, খুরপি হাতে মাটিতে নিড়েনও দেয় না। আগাছা হেঁটে ফেলা তো দূরের কথা, বরঞ্চ আগাছাই বড় বড় গাছ হয়ে যায়।

সে এক-আধজন যুগলপ্রসাদ কী সত্যচরণ থাকে হয়ত, যে লবটুলিয়ার ঘোর জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে নিজের পয়সা নিজের সময় ব্যয় করে বিলিতি লতার বীজ পোঁতে, 'হোয়াইট বিম্' 'রেড ক্যাম্পিয়ন্' 'স্টিচওয়র্ট', 'ফক্সগ্লাভ' 'উড অ্যানিমোন্', 'ডগ রোজ', 'হনিসাকল্'-এর গাছ লাগায়।

আজকাল অবশ্য ফরেস্টের বীটবাবুরা কাজুবাদামের গাছ, আকাশমণি, ইউকেলিপটাশের চারা লাগায়। তবে সেও একটু বড় হতে না হতেই ফের কেটেও ফেলে। বীটবাবুদের গামবুটের দাপট যেখানে যতদূর পর্যন্ত গিয়েছে, তাদের পায়ের চাপে গাড়ির চাকায় বরঞ্চ সেখানে কত ঘাস, গাছের চারা মরে হেজে শুকিয়ে গেছে।

জঙ্গল নেয় না, জঙ্গল দেয়।

গাছ দেয়, ডাল দেয়, পাতা দেয়, ফুল দেয়, ফল শিকড় দেয়। ছায়া দেয়, মায়া দেয়। সমস্ত উজাড় করেই দেয়। গাছ তো গাছ, জঙ্গলের মাটি—সেও নিজেকে ফাটিয়ে উগরে দেয় পাতালকোঁড়, ছাতু।

এবেলা যারা জঙ্গলে যায়, যায় কাঠ কুড়োতে পাতা তুলতে গরু চরাতে ছাগল চরাতে, যায় দেখতে ও দেখা করতে, ওবেলা রাত নামার আগে তাদের সবাইকেই জঙ্গল ফিরিয়ে দেয়।

কাউকেই নেয় না, কাউকেই না। আজ কী করে যে উল্টোটা ঘটে গেল, জঙ্গলের স্বভাববিরুদ্ধ!

লোধাবস্তির সন্ধানে এসেছিল আজ বড়খাঁকড়ি হাইস্কুলের বাঙলার নতুন স্যার। সে ঢুকেছিল জঙ্গলে লোধাশবরদের 'সাক্ষাৎকার' নিতে। সাক্ষাৎকার নিক আর নাই নিক, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছে কী পারেনি, সন্ধ্যার অনেক আগেই জঙ্গল তাদের চলে যাবার এত্তেলা পাঠিয়েছে, ফিরেও এসেছে তারা।

কাঠ কুড়োতে পাতা ছিঁড়তে জঙ্গলে ঢুকেছিল চাঁপা-থরপো-শকুন্তলা-জরির মা-বিন্দাদূতীরা। বিন্দাদূতী জরিয়ার মা চেষ্টা করেছিল জঙ্গলের আরো গভীরে 'আড়ায়' ঢুকতে। ঢুকতে তারা পারেনি বটে, তবে জঙ্গল তাদের একেবারে আটকেও রাখেনি।

সময়মত তারাও ফিরে এসেছে গ্রামে।

আর 'বনভুজনি পার্টি' পিকনিক পার্টি—তারা তো ফিরে এসেছে কবেই। এসে পুরাতন হয়ে গেল তারা। বনের ভাত বনেই হজম হয়ে গিয়েছিল, আরেকটু হলে তারা ফের বসবে রাতের খাবার খেতে।

এখন, ফিরে এসে কেউবা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়েও সে এখনও হয়ত মজে আছে 'বনভুজনিতে'। ছোট্ট ছেলেটি, কাজ খুঁজে না পেয়ে যে আকাশ দেখছিল, বনের আকাশ, সে হয়তো এখনও ঘুমের ঘোরে আকাশ দেখছে, বনের আকাশ। বনের পাখি, পাখির ডাক শুনছে।

কেউ বা নিদ্রাহীন চোখে জমিয়ে গল্প করছে বনভুজনির। বাড়ির বড়রা চুপিসারে, বড় বড় মেয়েদের অজান্তে, ছোট ছোট ছেলেদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছে—তাদের দিদিদের সঙ্গে পিকনিকে দেখা করতে কেউ এসেছিল কী না? বাইরের লোক?

তেমন কেউ দেখা করতে আসেনি শুনে তদন্তকারী ঘরের লোক হয়ত খুবই মুষড়ে পড়েছে। জমিয়ে রাত কাবার করবার এমন ফুরসৎটাই সে পেল না!

বাগাল ছেলেরা বাড়ি ফেরার আগেই গোঠটাঁড়ের মাঠে গরুগুলোকে একজোট করে গুনতি করেছে—রামে রাম, দুইয়ে দুই—। যে যে 'গিরিহা'র যা যা গরু সবই মিলে গেছে দেখে, গিরিহার গোহালে গরু 'খইড়িয়ে' এখন খড়গাদার গরম ওমে বিছানা পেতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাড়ির গিন্নী রাতের খাবার খাওয়ার জন্য জোরে হাঁকাহাঁকি করছে তাকে। তবু কিছুতেই চোখ খুলছে না। একেই বলে 'গোধুতের ঘুম'। 'গোধুত' বলেও গালাগাল দিচ্ছে গিরিহানী। এইবার সে কানে সুড়সুড়ি দেবে, আর নয়ত জলের ছিটা মারবে।

কোনো বাগালের ঘুমই নেই চোখে। বন থেকে সে কেটে এনেছে কুড়চিগাছের গুঁড়ি। ডিব্‌রী জ্বেলে বাটালি আর বারশি নিয়ে সে খুটখুট ঠুকঠুক করেই চলেছে। কুরে কুরে 'ঠরকা' বানাচ্ছে। গরুর গলায় বাঁধবার ঘণ্টি। চোরচুরনী গরুর গলায় ঘণ্টি বাজলে সহজেই তালাস পেয়ে যাবে বাগালের বাগান রাজাবাগাল।

আর কেউ আখড়ায় হাজির হয়ে গুরুর কাছে শুদ্ধ বস্ত্রে শুদ্ধ মনে মুখস্থ করছে সাপকাটির মন্ত্র, 'ছাড়ান-নিম্‌ছা', ভূত তাড়াবার তন্ত্র।

সেই বাগালরাও তাহলে আর জঙ্গলে নেই, জঙ্গল তাদেরও ফিরিয়ে দিয়েছে!

আরেকদলও জঙ্গলে যায়, তপোবনের জঙ্গলে। তারা সখের ভ্রমণার্থী। আসে উড়িশার বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ, মুরুডা থেকে। আমজুড়া, কেঁওনঝর থেকে। কী বিহারের ঘাটশিলা, মুসাবনী থেকে।

এদিকেই কোনো গ্রামে তাদের কুটুমবাড়ি। এত কাছে এসেও তপোবনের আশ্রম সে দেখবে না? বাল্মীকির আশ্রম, লবকুশের জন্মস্থল, সীতাধুনি, সীতার দাঁতনকাঠি, মায় হলুদ মেখে সীতাস্নানের হলুদজল, হনুমানচৌকি, তাড়কারাক্ষসীর হাড়? জঙ্গলের আরো গভীরে আরো একটা জিনিস আছে, অনেক চেষ্টা করেও অনেকে সে-জিনিসটা দেখেনি। নতুন ভ্রমণার্থীর দল সেই জিনিসটাই আবিষ্কার করবে। অচেনার আনন্দ। সেরকম ইচ্ছায় আঁই-টাঁই করেছে তারা, জঙ্গলে ঢুকে হারিয়ে গেছে, আবার ফিরে এসেছে।

কই, তারাও তো জঙ্গলে আটকে পড়েনি? সকাল সকাল তারাও ফিরে এসেছে যে যার গ্রামে, কুটুমবাড়িতে।

শুধু ফেরেনি মরনী।

ধানকাটা হচ্ছিল সোলমুড়ায়, দখিনসোলের মাথায়। জামাইলাড়ু-কার্তিকছেলা-কালোজীরে ধানসব।

ধান কাটা হচ্ছিল। মরনী সাঁওতালিনী ধান কাটছিল। কুদরা সাঁওতালের মেয়ে মরনী।

একা একাই ধান কাটছিল সে। একা একাই। লাটাপাটার ধারে, আঁটারি-চুরচুর বনধারে।

এক হাঁকের ভিতর রুখনীমারার দিল্লেশ্বরমহাজনের ঘর। নতুন বন্দুক এসেছে ঘরে। শূন্যে ক রাউন্ড ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছিল সে।

চোর-ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেতেই সে বন্দুক কিনেছে। তার উপর যখন-তখন ছাগল-খাসি চুরি হয়ে যাচ্ছিল তার।

কানের দুল এখনও ফেরত পায়নি মহাজনের বউ। দিল্লেশ্বর এখনও বউকে জপাচ্ছে,

সবুর কর, তোমার হকের জিনিস তোমার কাছেই ফিরে আসবে।

বউ যতবার শুনেছে ততবারই বলেছে, তার জন্য ভাবনা করি নাই গো, ওর'ম দুল বাপ আমার এম্নিই দিবে। শুধু চাওয়ারই অপেক্ষা।

বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছিল যখন-তখন, অতর্কিতেই। যেন-বা চোর-ছ্যাঁচড়দের জানান দিচ্ছিল দিল্লেশ্বর, ঘেঁষো না, অর এদিকটায় ঘেঁষো না হে। ঘেঁষলেই গুলিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়—

হঠাৎ হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে হুরহার ফুরফার পাখি উড়ে যাচ্ছিল গাছের মাথা থেকে, স-ব জড়ো হওয়া পাখি।

শীতের মরশুমও শুরু হয়েছে। খবর আছে, নদীচরায় খুব হাঁস বসছে। খড় হাঁস-বালি হাঁস-বিগড়িহাঁস-সরাল-শামখোল। একদিন সেসব শিকারে যাবে বলেও বন্দুকটা হয়ত জুত করছে দিল্লেশ্বর।

আর বন্দুকের আওয়াজে ধান কাটতে কাটতে চমকে চমকে উঠছিল মরনী। এমনিতে এতটুকুও ডরভয় নেই মরনীর। বুকের পাটা ছিল তার।

সেই মরনীকে নাকি জঙ্গল টেনে নিয়েছে! আর ফিরিয়ে দেয়নি। নাকি ফিরিয়ে দিয়েছে, ফিরিয়ে দেয়নি তার ইজ্জতকে। ধর্ষিতা হয়ে গেল মরনী। কে বা কারা জঙ্গলের লাটায় তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করল মরনীকে।

আঠারটা 'সারুল' আঠারটা 'সহরায়' পার করে এসেছে মরনী, সামনে উনিশ 'সহরায়'। বড়খাঁকড়ির হাটে গিয়ে সে কিনে এনেছিল মাথার জন্য বেলকুঁড়ি কাঁটা, খোঁপার জন্য রূপার পানপাতা। পরবের জন্য ক হাঁড়ি হাঁড়িয়াও পেতেছিল তাদের পরিবার।

স-ব, সব মাটি হয়ে গেল। কুদরা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে দৌড়ুল মাতব্বরদের কাছে। কই, গত সারহুলে কুলাই আর ভুজুর উপর 'রুমবগা' হয়েছিল, তারাও তো মুঠোর মেথি আর আতপ চাল ধরে ভবিষ্যদ্বাণী করেনি গ্রামের এই অমঙ্গলের কথা? বরঞ্চ ভালই বলেছিল তারা। বলেছে কী না?

যাহোক 'সারি সারজম' হয়ে গেছে সাঁওতালপাড়ায়। এইমাত্র শালগাছের তলায় বসে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে ফেলেছে মাতব্বরা। শালগাছের ডাঁটিতে 'গিরা' বেঁধে, তাতে সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা 'সারজম' পাঠানো শুরু করে দিল পারগানা থেকে পারগানায়। আর তারপর থেকেই শালগাছের ডগাগুলি সমানে নড়ে যাচ্ছে, সমানে!

জঙ্গল থেকে ফিরে মুখ-হাত-পা ধুয়ে, শাড়ি ছেড়ে দুপুরের জল-ঢালা ভাত খেল বৃন্দাদূতী। তারপর বাপের জন্য ভাত বেড়ে রেখে বেরোল পাড়া 'বুলতে'। পাড়াতে ইতিমধ্যেই জোর গুজব, কুদরা সান্তালের মেয়ে মরনীকে কে বা কারা—খালভরারা ধানকাটার বিলে একা পেয়ে—

বিন্দা শাড়ির আঁচলায় মুখটি মুছে, এই শীতেও পরনের শাড়িটাতেই মাথা-মুখ ঢেকে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে গিয়ে ঢুকল জরিদের বাড়িতে।

জরিলালের মা তখন দড়ির খাটিয়ায় বসে নিজে নিজেই তেল মালিশ করছিল পায়ে। বিন্দাকে দেখেই চোখে-মুখে দপ করে জ্বলে উঠল।

আয় রানী, আয়।

বসতে বসতে বিন্দা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, কী সব শুনচি, জরিয়ার মা?

রাঁধাশালের দিকে একবার উঁকি মেরে শশব্যস্ত হয়ে জরির মা বলল, তোকেও বারে বারে বলি রানী, জঙ্গলের অত ভিতরে ঢুকিস নাই, ঢুকিস নাই। না, আড়ায় ঢুকব, ঢুকব ত ঢুকবই। এখন শুনলি ত জঙ্গলে না ঢুকেও মরনীমাই—

তারা খুব আস্তে, ফিসফিস করে কথা বলছিল। কথা বলছিল আর বারেবারেই রান্নাঘরের দিকে দেখছিল জরির মা। ঘরে তার নতুনবউ, রাঁধাশালে খুন্তি নাড়ছে। পাছে সবকিছু সে শুনতে পায়।

বউও তেমন, উনুনের ধারে বসেও কানখাড়া রেখেছিল এদিকে। না জানি 'শাউড়ি' তার সম্পর্কে কত কী বলছে!

বিন্দা বলল, কিন্তুক আড়ায় আমাদের দোরখুলির সব পুরুষলোধারাই ছিল। তুঁই দেখেছিস, আমো। শকুন্তলা থরপোরাও সাক্ষী। তবে এ-কাজ তারা কখন করল?

তাই ত লো বিন্দা, কার মনে-বা কী আছে!

বিন্দাদূতী বলল, আমি তোকে জোর দিয়েই বলছি জরিয়ার মা, আমার মন বলছে-এ দোরখুলির রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়াদের কাজই না। অন্য কেউ, অন্য কুনো খালভরারা—

হাই তুলে জরিয়ার মাও বলল, হতে পারে। সিংধুই-বড়সোলের লোধারাও হতে পারে।

বলেই বিন্দাদূতীর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করল জরির মা, তুঁই ঠিক আছিস ত ধন?

একইভাবে জরিয়ার মায়ের অঙ্গেও হাত বুলিয়ে বিন্দা ফিক করে হেসে বলল, আর তুঁই?

তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে একটু উষ্ণতার জন্য অনেকক্ষণ বসে থাকল। আজ জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছে তারা।

রাত বাড়তে লাগল। রাত বাড়ছে, রাত গভীর হচ্ছে। গোঠটাড়ের মাঠ, কদমডাহি, ডাঙা-ডুংরোড়ে, গাছের মাথায়, ঘাসের ডগায় শিশির জমছে। এখন মাঠঘাটের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে শিশিরে-জলে পা ভিজে যাবে। এই শীতে পায়ের তলা কন্‌কন্‌ করবে।

তবু যেন কারা হেঁটে যাচ্ছে, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। একটা দুটো করে আলো, মিচকানো হেরিকেন, কী বিড়ির আগুন মাঝে মাঝেই মাঠ ভাঙছে।

মাঠ ভাঙছে। মাঠ ভাঙছে।

এখন তো শিয়াল-খেঁকশিয়ালদের মাঠে ঘাটে বিচরণের কাল। কাঁকড়ার খোঁজে খালধারে, বিলধারে। হাঁস-মুরগীর সন্ধানে গৃহস্থের খলায়, উঠোনে, খিড়কিতে। আর নয়ত বাঁশবনে, আখবিলে।

তা নয় দুম দুম করে এ কারা হাঁটছে? এরা কারা? রাতচরা? রাতের কুটুমরা?

কথা বল না, কথা বলা বারণ এখন। যদি বল, কে যায় হে?

জবাবে শুনবে, তোমার বাপ।

না শোনার ভান করে ফের যদি বল, কী বললে?

শুনবে, শালা কী বউকে বিধবা করবে?

রাত বাড়ছে, রাত বাড়ছে। গ্রাম এখন ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ এ-পাড়া সে-পাড়ায় ডেকে উঠছে কুকুর। একটা-দুটো নয়, একসঙ্গে।

গ্রামের কুলহিরাস্তা দিয়ে এত রাতে কে যায় হে? কারা যাও হে?

কারা যেন কথা বলছে চাপা স্বরে, ফিসফিস করে। —কী অত কথা?

ব্যাঙের মাথা। জোরে বল হে, জোরে বল!

কে অত বুড়িয়াতে তাবলাতে টাঙ্গিতে পাথরে ঘষে ঘষে 'শান' দিচ্ছ? এত রাতে জঙ্গলে যাবে কাঠ কাটতে, কাঠ ফাড়তে?

আজ যেও না, যাও না হে, জঙ্গল আজ অ-জঙ্গল হয়েছে। 'ভুরখা ইপিল' 'ভোর পোহাতি তারা তো উঠুক আগে।

তবু, তবু গলা খাঁকারি কে দিচ্ছ? কারা অত জোরে জোরে হাঁটছ? থামো না হে, থামো!

ঝোপেঝাড়ে লাটায়পাটায় গাছের ডালে এত রাতে এত পাখি 'ভদকাচ্ছে' কেন? কঁহর-কঁহর কোন্ পাখি এত রাতে গোঙায়? 'কঁহরায়'? উদ্‌বিড়াল-ভাম-খাটাসে কী ধরল তাকে? আহা, বেচারা!

নদীজলে মাঝে মাঝেই এত কী 'উরাল' দিচ্ছে? জল-ঘূর্ণি? নাকি হব্‌লস ফব্‌লস আওয়াজ তুলে কারা যেন নদী পার হচ্ছে এত রাতে?

নদীবালিতে পায়ে চলার ভস্ ভস্ আওয়াজ। মিচকানো হেরিকেন হাতে কারা যায় হে? কারা?

লাইট, ডে-লাইট জ্বালিয়ে, পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ মেরে মাছমারারা সারারাত ধরে তরোয়াল হাতে মাছ মারে। লাইট, টর্চলাইটের ধাঁধালো আলোয় ভাসন্ত মাছ বহন্তি নদীজলেও থির হয়ে যায়। তখন 'থিরন্ত' মাছের দেহে মারো তলোয়ারের কোপ! মেরেই সবুর করো। নদীজলের উপরে ভেসে উঠবে ধড়-মুণ্ড। ছেঁকে নাও, আর খলুইয়ে ভরো। মাছে মাছ!

সেই মাছমারার দল কী এত রাতে? কিন্তু লাইট, ডে-লাইট, টিপা-লাইটই বা কোথা? এ যে মিচকানো হেরিকেন, কী মুখ-বিড়ির আগুন?

আগে আগে নদীবালিতে 'চিড়কিন' জ্বলত। কোথাও কিছু নেই, নদী-বালিতে শ্মশানে-মশানে চিড়িক করে জ্বলে উঠত আগুন। নাকি 'চিড়কিন ভূতেই' হঠাৎ হঠাৎ আগুন জ্বালাত। কতদিন যেতে-আসতে লোকের চোখে পড়েছে।

আজকাল আর সেসব কোথায়! আবিষ্কার হয়েছে—ভূতে নয়, একপ্রকার দহনশীল গ্যাস আপনা-আপনিই জ্বলে ওঠে।

তো, সেই চিড়কিনভূতের আলোও তো এ নয়। অন্যরকম, অন্যরকম। অন্যরকম কতগুলো আলো এপার ওপার করে যাচ্ছে। তবে কী নদীতে বান এল এই অসময়ে? শীতে?

বান এলে নদীধারের মানুষ এরকম আলো নিয়ে ছোটাছুটি করে বটে, তবে তার সঙ্গে মিশে থাকে মানুষের হৈ হৈ, গরুছাগলের ডাক। কিন্তু এ যে একেবারেই হিমশীতল, বরফকঠিন!

অতি সাবধানী গৃহস্থ সকাল সকাল ঘরে ঢুকে দরজায় হুড়কো দিয়েছে। ঘুমোচ্ছে না, জেগেই শুয়ে থেকে ফিসফিস করে কথা বলছে। —কী জানি, কার মনে বা কী আছে!

হাওয়া নেই। আজ তবু যেন গাছপালাগুলি বড়বেশি নড়ছে। বাঁশঝাড়েও মট্‌মট্ শব্দ যেন একটু বেশিই বা। শিমুলগাছ থেকে কিছু বাদুড় ঝপ করে উড়ে গেল নদীর দিকে। নদীর দিক থেকে, পাকুড় কী অর্জুনগাছ থেকে শকুনছানা অবিকল মানুষের বাচ্চার স্বরে কেঁদে উঠল।

আজ কদিন ধরেই সাঁওতালপাড়ার ওদিক থেকে 'সহরায় পরবের' আখড়ায় ধামসা-মাদলের বোল শোনা যাচ্ছিল। দাঃ দা হেতাং দাতিং দাতাং। আজ সব চুপচাপ, সুনসান। তাদের পোষা শুকরিগুলো পর্যন্ত সময়ে অসময়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ডেকে উঠছে না।

বনের ভিতর, রাস্তার ধারের শালগাছগুলোর মাথা যেন নড়ছে। একটু বেশিই নড়ছে। 'সারজম্ গিরা' চলছে। শালের ডাল ভেঙে ভেঙে সিঁদুর লেপে খবর যাচ্ছে, টেলিগ্রাফের খুঁটির মতো। পাড়া থেকে পাড়ায়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পারগানা থেকে পারগানায়, জিলা থেকে জিলায়।

তাই শালের ডাল এত 'হিলছে'। বাও নেই বাতাস নেই, তবু যেন নড়ছে। ধুলমাদুল নড়ছে।

একটা ডাল যেন-বা আচমকা খসে পড়ে গেল টুঙ করে। নাকি 'বীর' ভর করলে এরকম হয়। তার মানে 'বীরবাতাস' বইছে চারধারে।

ধানকাটা ন্যাড়া শীতের মাঠ। কোথাও কিছু না, ঢিস্ ঢিস্ করে আল ভেঙে চাট্টি শুকনো ধুলো উড়ে গেল এই শীতরাতে, এই শিশিররাতেও।

কুদরাদের ঘরের দলিজে 'দাঁতিয়ায়' তোলা ছিল কেঁদরাটা। কে টেনে নিয়েএই নিশুতি রাতেও সাঁওতালপাড়ায় আচমকা বাজাতে শুরু করল একটানা—র‍্যাঁ-এঃ চঃ র‍্যাঁ-এঃ চঃ!

বাজাচ্ছে না কাঁদছে?

কাঁদো, কেঁদরা কাঁদো!

'ভুর্‌খা ইপিল', ভোরের শুকতারা আর কখন উঠবে? কবে শেষ হবে এই কেঁদরা-কঁহরিয়া রাত?

অসুস্থ, মুখে গ্যাঁজলা-ওঠা মেয়েটার ঘরের বাহির-বারান্দায় বসেছিল কুদরা। মেয়ের বাপ। দু'হাঁটুর মাথায় দু'হাতের বেড়ে মাথা গুঁজে। একটা ডিবা জ্বলছিল কুদরার পায়ের কাছে।

কী মনে হতেই পা বাড়িয়ে ডিবাটা 'ঘন্টে' দিল কুদরা।

সোমবারি দৌড়ুচ্ছে, তার চোখের সামনে ভুবনালোধাকে ওরা খুন করল, বড় দারোগা গুড়গুড়িয়াকে ধরে নিয়ে গেছে থানায়, এই জঙ্গলে রাইবু কোথায় লুকিয়েছে, সোমবারি মরি-কি-বাঁচি দৌড়ুল। যাবে তপোবনে সাধুবাবার আশ্রমে, সময়ে-অসময়ে লোধাদের দেখে লোকটা, আজ লোধাজাতের সমূহ বিপদ, অত বড় বুকের মানুষটা আজ কী-আর দেখবে না,—তার ছা-ছানাদের? ভয়ে-ভাবনায় কেঁপে-কেঁপে সে দৌড়ুচ্ছে, লোধাপাড়ায় এত্‌খনে কী জানি কী হৈল?

ভুবনালোধা ঘুমুচ্ছিল দুপুরের ভাত-ঘুম, তার গা ঘেঁষে শুয়েছিল মেয়ে নুকু। তাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলে দিল লোকগুলো, আর তারপর কী চিল-চিৎকার নুকুর! তা সত্ত্বেও লোকগুলো এক কোপে ভুবনাকে কেটে দু'ফাঁক করে ছেড়ে দিল। ধড়-মুণ্ডু আলাদা আলাদা লাফাচ্ছে, ফুলটুসি ঘরে নেই, —সোমবারি দেখল। দেখেটেখে দৌড়ুল, আর লোধাপাড়ায় না একদম জঙ্গলে, রাইবু-শিশুবালা কে-যে কোনদিকে বুঝতে পারল না।

রক্তারক্তি ঘটে যাচ্ছে, চোখের সামনে শালপাতায় যেন ডুমোডুমো রক্তের ঢেলা দেখল। আসলে সোমবারি আপনার মনে ভাবছিল সেই খুনোখুনীর দৃশ্যটা। ভাবতে ভাবতে, আর রাইবুর কথা ভাবতে ভাবতে সোমবারি দৌড়ুচ্ছে।

তোর নাম তো রাইবু, আয় তোর হাতদুটা কেটে দিই?

রাইবু-ই ত, জঙ্গলমহালের রাজা রাইবু না? কিন্তু হাত কাটবে কেনে বাবু?

বাঃ এই হাতদুটাই তো যা করার করে, চুরি বল চামারি বল,—একদম অত্তিষ্ঠ করে তুলেছিস রাইবু?

আমি চুরি করি নাই,—করি নাই গ'! ক্ষেমা দেও।

এই নে তা'লে ক্ষেমা, সোমবারি যেন পষ্টাপষ্টি শুনল, টাঙির এক কোপে লোকগুলো রাইবুর হাতদুটো কেটে ফেলল, আর শোনামাত্র সে আঁতকে উঠে চেঁচাল, রাব্বু অ-রাব্বু, আমার দাদারে-এ-এ-এ—

ডাকটা দিগুদিগু করে এ-ঝোপ ও-ঝোপ টিকরোল ভুঁইভাগাড় পেরিয়ে, কাছেপিঠের বনভূমিতে আছড়াল। রাইবু শুনল না, সে নেই ধারে-কাছের জঙ্গলে, ভয়ে-ত্রাসে কোথাও পালিয়েছে, হয়ত নারদা-নিগুই-পুকুরিয়া-ঘোড়াটাপুর জঙ্গলে হয়ত বা নিরাপদেই আছে,—অকারণ ভেবে মরছে সোমবারি।

ক্যাঁকলাশ, তার মানে গিরগিটি দেখল সোমবারি, লাল-হলুদ বর্ণের গিরগিটি।— অ-রে রক্তচুষা, রক্ত চুষে চুষে ওর'ম মুণ্ডু নাড়িস? ক্ষণেকক্ষণ লাল হচ্ছিস ওর'ম কার রক্তে? লোধাদের? আপনার মনে বিড়বিড় করে সোমবারি কেঁদে ফেলল, হুরহুরিয়ে কাঁদছে সোমবারি।

সোমবারি কাঁদছে! অঝোরঝর অঝোরঝর!

সীতানালার জলে কোথাও আওয়াজ হ'ল. খবলস্! শিয়াল খাল পার হ'ল, নাকি ভয়াতুর লোধা খাল পেরিয়ে আর কোথাও নিরাপদে চলল?

যাও লোধামাড়ষ যাও, আমো যাচ্চি!

হায় দেখ-অ যাবে কেনে? জঙ্গল তোমার মা, তোমাকে মাই দেয়, তা সত্ত্বেও যাবে কেনে?

আর কেনে? যেন্তে হয়, না গেলেই ত 'মিত্যু'। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব?

খালি মার খাবে কেনে, মারবেও।

ওদের লোকবল বেশি, মেরে পার পাব নাই।

তা ঠিক।

আপনার মনে বলাবলি করে সোমবারি পথ হাঁটছে, সাধুবাবার আশ্রম আর খুব দূরে না, আশ্রমে যতবার এসেছে দূর থেকে দেখেছে আশ্রমের মাথায় শালপাতায় ঠোকাঠুকি লেগে শিরশিরানি হাওয়া দিচ্ছে। সব থেকে উঁচু গাছটার পাতা সব থেকে সবুজ, তার উপর রোদের কুচি লাগলে কচিকলাপাতার রঙ ধরে, তাতেই সোমবারি ডুবে যায়।

ডুবে থেকে শুনল— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! উ-ল টু-টু! —ল-টু-টু! টু-টু-উ!! রাইখুর সেই পাখ, ডাকতে ডাকতে ভাসতে ভাসতে এখন উড়ে যাচ্ছে, ডাক শুনল সোমবারি, চোখে দেখল না। আপনার মনে খালি বলল, অ-রে নিরবংশা, তুঁই ইখানেও? আর কিছু বলতে তার মন গেল না, তার মন এখন ভাল নেই, সে অতিকষ্টে আশ্রমে উঠল।

ধ্যানাসনে বসেছিল সাধুবাবা, চোখ খুলে বলল, আমি ধ্যানে জানলাম, তুই এসেছিস মা-জননী?

হেঁ গ' বাবা, কিন্তুক বড় বিপদে পড়ে আসেঞ্ছি। বলতে পারল না সোমবারি, খালি গুঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

অ্যাদ্দিন আসিস নি কেন রে? বলেই 'ও-হো হো' করে অট্টহাস্য সাধুবাবার, বুঝেছি, আমার উপর রাগ করেছিস!

সোমবারি কেঁদে ফেলল।

কাঁদছিস মা-জননী?

কাঁদতে কাঁদতে সাধুবাবার দু'পা জড়িয়ে ধরে বলল, এগ' বাবা গ' বাঁচ্চাও! লোদ্ধাদের কেটে ফেল্ল গ'!

সোমবারির মুখে স-ব বৃত্তান্তই শুনল সাধুবাবা, শুনেটুনে নিনাদ করল, হে রঘুপতি রাঘব সীতাপতি রাম! নিষ্পাপ লোধাদের তুমি দেখো প্রভু!—ভুবনাকে ওরা কেটে ফেলল মা-জন্নী?

একদম দু'টুকরা!

ভুবনা বড় ভাল ছিল রে।

ছিলই ত।

সাধুবাবা চোখ বুজে খানিক দাঁড়িয়ে থাকল, চুপচাপ।

এত দুঃখেও সোমবারি ফিক করে হেসে ফেলল, সাধুবাবা তুমি কী ভগবানের সঙে কথা বলচ?

সাধুবাবা তক্ষুনি কথা বলল না, খানিক বাদে বলল, নারে বেটি, ভুবনার আত্মার শান্তি কামনা করে দু মিনিট নীরবতা পালন করছি।

সোমবারি কিছু বুঝল না, তার চোখের সামনে খালি রক্তচোষা ক্যাঁকলাশ, ক্যাঁকলাশটা ভুসভাস মাথা তুলছে, তার চারদিকে আরো অজস্র ক্যাঁকলাশকে মাথা তুলে ঘুরে বেড়াতে দেখল সে, তার দুনিয়া এখন ক্যাঁকলাশে ভরে যাচ্ছে। ক্যাঁকলাশ, ক্যাঁকলাশ।

খুব যে কাহিল লাগে মা-জন্নী, কিছু খাবি?

সোমবারি মাথা নাড়ল, তার খিদে নেই, সবটাতেই অরুচি।

বলল, এগ' বাবা না।

কেন-অ রে, চাট্টি গুড়মুড়ি জলে ভিজিয়ে খা?

সাধুবাবা শালপাতার থালায় চাট্টি গুড়মুড়ি দিলও, সোমবারি খেল না।

আর মন-খারাপ করে কী-ই বা হবে মা-জন্নী, খা!

সোমবারি আরেকবার ডুকরে কেঁদে উঠল। খানিক রোদন করল, তবু খেল না।

এখন লোধাপাড়ায় ফিরে যাওয়াও তো হুজ্জুতি, যা আগুন জ্বলছে!

আগুন! সোমবারি আঁতকে উঠল।

আগুন না তো কী? আগুনই, ওরা আগুন নিয়ে খেলছে!

ফের ধ্যানে বসল সাধুবাবা, মাত্র দু-তিনমিনিট, তারপর অস্থির হ'য়ে উঠে দাঁড়াল।

ফল ভাল দেখছি না, যতসব অশুভ ছায়া। বলেই অস্থির পদচারণা শুরু করল সাধুবাবা।

কী, কী-ই দেখলে গ' বাবা, ধেয়ানে?

আশ্রমও নিরাপদ না মা-জন্নী, খুনীরা এখানেও আসছে।

তালে? হকচকিয়ে সোমবারি উঠে দাঁড়াল, যেন ফের দৌড়ুবে জঙ্গলে।

আরে না না, ভয়ের কী, ব্যবস্থা কিছু একটা হবে। বলে সাধুবাবা অভয় দিল সোমবারিকে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে জঙ্গলে, যজ্ঞকুণ্ড আর সীতাধুনিতে আরেকটা চেলাকাঠ ছুঁড়ে দিল সাধুবাবা। সোমবারি জানে সীতাধুনির আগুন কোনোদিনও নেভে না, শত বর্ষাতেও না।

নমথম শুয়ে পড়ে সে যজ্ঞকুণ্ডকে গড় করল।

আর দেরি করা ঠিক হবে না, যাওয়া যাক।

এগ' কুথা যাবে গ' বাবা?

আর কোথাও কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে।

সে-ই ভাল, কিন্তুক—

কী?

রাব্বু যাব্বে নাই?

অঃ বাইবু? রাইবুও যাবে, আগে তো আমার মা-জন্নীকে রেখে আসি?

সোমবারি থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, খানিক অগ্র-পশ্চাৎ ভাবে, সাধুবাবার সঙে যাওয়াটা কী ঠিক হবে?

পরক্ষণেই মনে পড়ে—

আমি যে মনঝরি শিশিরের জালি
সিঁদুরের বুঁদি
পরের রানী গ—

লোকটা বড় ভাল, লোধারা তাকে বড় মান্যি করে, বারবার মনে হতে সোমবারি দোনোমনো ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল, গেলে কুনো বিপদ হবে নাই ত গ' বাবা?

বাবাজী বড় রেগে গেল, বলল, এখনও অবিশ্বাস? তা'হলে আর কী, যা লোধাপাড়ায় ফিরে যা, খুনীরা জোরজবরদস্তি ধরুক তোকেও, যা-তা করুক, যা-তা অত্যাচার—খুন-ধর্ষণ—

না-গ্নাই, কী বুঝে আঁতকে উঠল সোমবারি, এগ' বাবা গ' তুমি লোদ্ধাদের বাপ-মা, তোমার সঙে যাব, ডর কী? হুঁ।

তা'লে আয় বেটি, আমার হাত ধর।

বলেই সাধুবাবা যাত্রাপালার রাজারাজড়ার ঢঙে হাতটা বাড়িয়ে ধরল, এরকম দামাল যুবতীর স্পর্শ তার কত-অ-কাল ঘটেনি, কত্ত-অ-কাল!!

দ্বিতীয় পর্ব



এখন সকালবেলা।

টিনের ছাউনি ইটের দেওয়াল দেওয়া ঝুপড়ীর ভিতর থেকে লোকটা বেরুল, তার পিছন পিছন একটা রোগাভোগা 'বারোবনিয়া' মুরগী।

বারো বর্ণের মুরগীটা উঠোনে বেরিয়েই হেগে দিল পুচুর করে, তারপর একলাফে পড়ল গিয়ে শাক-সব্‌জির খেতের উপর।

কীই বা খেত-খামার! হেট্ হেট্ করে তবু জীবটাকে তাড়িয়ে দিল লোকটা।

এই টাঁড়-টিকরে অসময়ে কী যেন শাকের বীজ বুনেছে রাইবু। পুড়ুংপাড়াং উঠন্তি শাকচারা। নাহাণ্ডা-স্মরন্তি-ঘলঘসি-ঘোড়াকানা-শুশনি-চ্যাকা-বনকুদড়ি—বনে-বাতানে কতই তো শাকপাতা! তবু পড়াশ-ঝাঁটির বেড় দিয়ে সখের সব্‌জি চাষ! খুঁটির মাথায় বসানো কালোহাঁড়ির কাকতাড়ুয়া।

কী পারে? হাটুয়াদের মতো, বাবু-ভাইয়েদের মতো? বেড়া ভেঙে যায়, খেলানি-জ্বালানির অভাব পড়লে শিশুরা, শিশুবালারাই বেড়া ভেঙে দেয়। বেড়ার পড়াশঝাঁটি চুলোয় দেয়। বীজ থেকে পোঙ উঠতে না উঠতেই, পোঙ থেকে চিরোল চিরোল পাতা গজাতে না গজাতে শুগ্‌নি ছাগল আখ্‌কুটে খুকড়াই ঠুকরে দেয়। ঠুঁটো করে দেয়। নটেগাছটি মুড়োয়।

তবু—

এটা তার ঘর। এরকম আরো দু-দশটা ঘর দোরখুলির লোধাপাড়ায় নাকবিন্ধি-পেটবিন্ধি-পাতিনার শবরপল্লীতেও আছে। খুনোখুনি কাটাকুটির বছর মহামান্য সরকারবাহাদুরই বানিয়ে দিয়েছে। সরকারের তরফে বঙ্কা মাহাতোই কাকে যেন—কোন্ ভোটবাবুকে ধরে এনে এতকিছু করিয়েছে।

সে লোক ভালো, কাটাকুটির যোগসাজসে তার কোনো রকম হাত ছিল না।

সকালের রোদ লেগে ঘরের চালের বাহারে টিনগুলো এখন ঝিলিক মারছে। রাইবু সেদিকেই তাকিয়ে।

গুড় গুড় দাগিন্ গেঁদা...

মাথায় কী যেন, কী যেন আচমকা দেগে দিল! আর বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না রাইবু। ঘাসভুঁইয়ে লেগে থাকা কাঁকর-জলের মতো এতক্ষণ যেন মায়ার ঘোরে পড়েছিল সে, জড়িয়ে ছিল সে। চিন্তিতও ছিল সে।

এবার তার চিন্তাটাও ঘর ছেড়ে ঘরের চাল ছেড়ে নিরঘিন্নে শাকপাতার টাঁড়-টিকর ছেড়ে চোখ-মুখ আঁকা কালোহাঁড়ির কাকতাড়ুয়াকে ছেড়ে আর কোথাও হেঁটে যাচ্ছে...

টুর টুর হেঁটে যাচ্ছে রাইবু। চারধারে পাত্‌লা ধবো জোছ্‌না—দিনমানেও সেরমা-আসমানে কত তারা, ইপিল ফুটতে দেখল সে। বিজ্‌কুড়ির মতো, বাগযুগ্‌নী পোকার মতো?

ধু-উ-স!

কোথায় কী! থমকে দাঁড়িয়ে, আরেকটা হাই তুলে ধনুকের মতো বেঁকে রাইবু আড়মোড়া ভাঙল। ঘরে দোক্তাপাতাও নেই যে শালপাতার চুটা বানিয়ে টানবে, হাতে ডলে মুখেও পুরবে বা।

শিশুবালা!

হুঁ-উ?

মনে ত লয় নেশার দব্য চাইবে লোকটা—

শাড়ির আঁচলা মুখে চাপল শিশুবালা।

একদম বাট-ভিখারীর হাবভাব—

তবু রাইবু কিছু বলছে না দেখে শিশুবালাই বলল, হঁ, কী বলছ?

ক'বছর হইল, বল-অ ত?

কি ক'বছর?

সম্বারি ঘর থিক্যে গেছে—?

তুমি আর উসব ভেবে মন খারাপ করঅ নাই ত! হামার মন বলছে, গুড়গুড়িয়ার সঙেই গেছে মুনু।

ন্নাই শিশুবালা, ন্নাই—গুড়গুড়ে হাজ্জতে।

বলেই খানিক থম মেরে থাকে সে। তাবপর বলে, ওরা সম্বারিকেও কী তব্বে—?

নিমেষে রাইবুর মুখের উপর প্রায় হাত চাপা দিয়ে বলে উঠল শিশুবালা, আহা, আজ সাতসক্কালে তুমার কী হইল বল-অ-দেখি?

কি-ই জানি, কুনোরকম বল-ভরসা পাচ্ছি নাই মনে—

লম্বা শ্বাস ছাড়ল রাইবু।

আদুরে আদুরে গলায় শিশুবালা বলল, গেল-রাইত্‌কে কী সম্বারিকে স্বপ্নাইঁছ? হঁ ঠিকেই ধরেছি, হঁ-অ? হাসি হাসি মুখে শিশুবালার জিজ্ঞাসা।

কিছুক্ষণ কেমন যেন ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে শিশুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রাইবু। তারপর উত্তর না দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল জোড়াশালতলা ধতলা ছাড়িয়ে একদম ঠাকুরবাঁধে।

ঠাকুরবাঁধ লোধাদের গোঁসাঘব।

রাগ হোক চাড় হোক মান হোক অভিমান হোক, কান্না পায় তো বুক খুলে কাঁদতে, হাসি পায় তো কাপড় ঢিলে করে হাসতে দোরখুলির লোধাপাড়ার জনমানুষ জঙ্গলে যায় আর নয়ত জোড়াশালতলা ধ-তলা পেরিয়ে এসে পড়ে ঠাকুরবাঁধে।

হড়বড়িয়ে জলে নেমে হাতমুখ ধুচ্ছে রাইবু। ধুচ্ছে, ধুচ্ছেই। আচমকা তার মনে আসে—

হিল হিলানি
গতর দুলানি
ঘর জ্বালানি
মন ভুলানি
লো, ঠাকুরবাঁধের পানি।

কবি নয়, কোবরাজও নয়—তবু হঠাৎ-হঠাৎই রাইবুর এত কথা মনে আসে। সময় সময় এমনও তো হয় বা হতে পারে, "কড়ি নাই ছোঁড়ার ঝুলিতে, ছোঁড়া বুলছে কুল্‌হিতে।"

কবি নয়, কবি কবি ভাব আর কি!

আসলে বর্ষা শেষের ঠাকুরবাঁধ, গহমবাঁধ, টেস্ট রিলিফের মাটি কাটা মাটি তোলার শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া 'গম'এর-বাঁধ এখন ডাবাকডুবুক জলে হিল্ হিল্ ছিল্ ছিল্ করছে!

আপনার মনে আঁজলায় জল তুলে হাত জোড় করে গড় করল কাকে যেন। জল খেল। আর খেতে খেতেই পষ্টাপষ্টি জলে তার ছবিটাকে ভেঙে যেতে দেখল। জলে সে ধীরেসুস্থে খুন হচ্ছিল, ভাঙচুর, খুন,—

গে মাই! আঁতকে উঠে রাইবু একদম ঠাকুরবাঁধে, ডাঙায় উঠে এসে বসল থম মেরে। সোমবারিও বসল।

সোমবারি!

হঁউ, বল-অ দাদা?

এ্যাদ্দিন ছিলি কুথা রে? সুখে ছিলি ত মুনু?

সুখেই ছিলম, শহর-বাজার দুখের জাগা না দাদা।

তা'লে?

কী-ই তা'লে?

হঁ-অ, তা'লে আইলি কেনে?

কেনে আইলম?—তুমার জন্যি, বুঢ়া বাপুর জন্যি মন পড়ছিল রে দাদা। পেট ভার হলে যের'ম আঁই-টাঁই করে।

দুচোখে অঝোরঝর জল, রাইবু তার জল ঝিল্ ঝিল্ আবছা দৃষ্টিতে ঠাকুরবাঁধের ওধারে কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল একদম স্পষ্ট।

জলে তার ছায়া-ছাঁয়রাও।

কে? সোমবারি না?

কে?

বড়ই বিভ্রমে পড়ে যাচ্ছে সে। চোখ মুছে ভালো করে দেখল—ধুউস্! কোথায় সম্বারি? হাম্‌দের মুনু? লাইবুকাদের ঠুঁটা ধ-গাছটাই বঠে!

জঙ্গলে রাতভিত, ধবো জোছ্‌নায়, শুধু কী রাতভিত, দিনমানেও দিনমানেও, শুধু কি ধবো জোছনায়, ভুসাকালির মতো আঁধারে অন্ধকারেও, কী কৃষ্ণপক্ষে কী শুক্লপক্ষে, কী অমাবস্যায় কী পূর্ণিমায় বেঁটে-বাঁটকুল মুড়ো ডগা সাদা সাদা ছাল-বাকল কতক বা চোকলা-ওঠা ধ-গাছ ভাদুগাছ কুচলাগাছ কেঁদ্‌গাছ সোনালগাছ জইড়্‌গাছকে দূর থেকে কাছ থেকে দেখলেও মনে হবে—মনে হবে কারোর ঘরের 'বহুছানা' ধবো শাড়ি পরে, আর নয়ত কালো কুচকুচে কাপড় পরে রুমরুম দাঁড়িয়ে!

জঙ্গলে রাতভিত ধবো জোছ্‌নায় কী আঁধারে অন্ধকারে ধবো শাড়িপরা, কালো কুচকুচে কাপড়-পরা মেয়েমানুষও মাঝে মাঝে গাছ হয়ে যায়, বিরিক্ষি হয়। চুলগুলো তার পাল্‌হাপতর। কেঁদ কী ধ', ভাদু কী সোনালগাছ ভেবে লোটা-হাতে ঘটি-হাতে মানুষটা যেই বসল থপ্ করে, বেগও এল, অমনি হাতের চুড়ি বাজল, ধ-ভাদু-সোনাল-জইড় ছলর বলর হাঁটতে লাগল।

হাঁটছে, হাঁটছে ছলরবলর।

ভাবো, কী দিগ্‌দারির কম্মটা একবার ভাবো!

একলা থাকলে এরকমই হয়।

রাইবুর মনে পড়ে মম্মথলোধার ঘুপচী থেকে ফিরে আসতে তিলকমাটি হুড়ির ধারে সেবার দেখে ফেলেছিল—সাদা থানপরা কে যেন বসে রুম্‌রুম্, কে যেন?

আর দেখেই তরাসে পিছুন পানে দৌড়। কী দৌড়, কী দৌড়!

পুকুর একটা, তায় আধাআধি জল, তায় শালুকশস্য ফুটেছিল। থম মেরে খানিক ভাবল রাইবু, কি ওটা? কী বা হতে পারে?

তারপর 'কে? কে?' বলতে বলতে দৌড়ে গিয়েছিল সেদিকেই সোজাসাপ্টা মরি-কী-বাঁচি?

না, কিছু না। ফণীমনসার কাঁটায় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে একটা ধুতিছেঁড়া!

ধরো, ধরো যদি সঞ্ঝাবেলা জঙ্গলে সাদাশাড়িপরা 'বহুছানা', ডব্‌কা একটা ম্যায়ামাড়স একলা তোমার ছামুতে, তুমি কী করবে?

কী-ই করতে পার-অ বুকে হাত দিয়ে বল-অ! তাই বল না, ধুকপুকিটা ছ্যাঁৎ করে লড়ে উঠবে নাই? শুধু কী লড়ে উঠবে—ই-ধার উ-ধার গড়াঞে ঢলে পড়বে নাই?

গুড়গুড়িয়া থাকলে বলত, নির্ঘাৎ বলত, ম্নাই তা কেনে হবে? উ-কে ধরে-বেঁধে বেহায় বসাতম আর দমে খাটাতম। খাট শালী, কত খাটবি! সেই বেহাঘরে বরকে যেমন মা বলে নাই—বেটা, কুথায় যাচ্ছিস? বর বলে, কামিন আনতে?

নেই যে, তা নয়। আছে, আছে। কালামুহী ঝাঁপড়ী গোমুহা বরহম্ চিড়কিনকে বউ করে ঘরে আনা, তার সঙ্গে ঘর-সংসার পাতা, এই লোধা জাইতেও আছে।

আছে, আছে।

জানতে চাও যদি তো যাও, যাও বড়সোলের গজ্‌নার কাছে, গজেন্দ্রনাথ ভক্তা।

ঠাকুরবাঁধে এখন কোথাও পাঁড়কা কপ্‌তি ডাকছে। একটা নয়, একসঙ্গে নয়, থেকে থেকে, তিন চারটা।

কু—কু—উ-ড়-ড়-ড়-ড়! কু-কু-উ-ড়-ড়-ড়!

সজাগ হল রাইবু, কান খাড়া রাখল। কুনদিকটায়, হঁ কুনদিকটায় শালার পাখ শালার পঙ্খী? রুখনীমারা মুঢ়াকাটি যেতে সরুবালি-চিকনবালি বাঁশতল্লির ওদিকটায়? নাকি মাঝুডুবকায়? আঁটারি-চুরচু-কুড়চির লাটাপাটায়? সিমোলগাছে—ঐ হিলছে মগডাল, তার তলে? নামোয়?

নাই, নাই। কপ্‌তির জাত খুব চালাক, এই আছে ত এই নাই। হুই ডাকছে এবার কুঁভারপাড়ার জটাকুঁভারের ডাহিমুঢ়ায়।

আচ্ছা ভালা, সেই পাখটা, যার কী রঙ কী বন্ন, আমি ত আমি, আজতক লোধাপাড়ার কেহ-ই দেখে নাই, উ কী দেখার জিনিস, লয় লয় কানে শুনার, তাও যার কানের মতন কান আছে—কীর'ম যেন ডাকে, টি-উ-ল টু-টু। টি-উল টু-টু!! উ-ল টু-টু টু-টু-উউউউ!!!

গেল কোথায়, উধাও হয়ে গেল নাকি ই-তল্লাট থেকে ই-জঙ্গল থেকে? নাই নাই, বনের জীব বনের লাটা-পাটায় আড়াল-আবডালে আছে কোথাও।

ফের কপ্‌তি ডাকছে, ঘুঘু, পাঁড়কা-পাঁড়কী। ফাঁস এড়ে কপ্‌তি ধরবার মনস্থ করল রাইবু।

ধরতে পাবলেই নগদা-নগদি, নুন-তেল, বুলুং-উলুং—

একসঙ্গে বহুৎ কপ্‌তি ঠাকুরবাঁধে—কোন্‌টা নামোয় কোন্‌টা উঁচায়, কোন্‌টা বা পাছুদিকে কোন্‌টা ছামুতে—বাঁশচোঙার ভিতর লদ্‌কা-লদ্‌কি কপ্‌তিগুলো যেন পরের পর ডেকে চলেছে, খৈ-খাল্লা!

কোত্থেকে দিক্‌বিদিক জুড়ে এসময় সেই পাখিটাও ডেকে উঠল, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! ডাকছে, ডাকছে।

অস্থিরমতি রাইবু 'ফাঁস' আনতে লদোপদো দৌড়ুল। দৌড়ুল ঘরের দিকে। আজ সে কপ্‌তিও ধরবে, অচেনা পাখটাকেও।

হুটমুট বাউলার তুল্য লোকটা বেরিয়ে গেল। শিশুবালা তখন আর করে কি, ছা-ছানাহীন বাঁজা মেয়েমানুষ, লোকটার চলনপথের দিকে হাঁ করে খানিক দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকল, দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর থপ্ করে বসে পড়ল আঙনায়, মাটিতে।

বসেই সে চুল খুলল। জট-লাগা, বনজঙ্গলের জব্‌রা কাঠি-খুঁচিভরা, মাটিয়াল-চিটিয়াল চুল। আরশি-কাঁকই কোথায় যে মুখ দেখে দেখে বেশটি করে আঁচড়াবে?

আঙুল চালিয়ে যতটা ঝরঝরে করা যায়, করে ফেলল শিশুবালা। মনে মনে ঠিক করল— বিলের ছুঁচ্‌মাটি দিয়ে দোরখুলির বুলানে একদিন আচ্ছা করে মাথা ঘষবে, গাও ধোবে।

বুলানে এখন জল খলবল করছে, সেই জলে পুঁটি-দাঁড়িকিনি-চাঁদখুড়ি-লুল্‌হি-ধানাহুলু মাছ। যার জমি তার মাছ, মাহাতো ম্যায়া-মরদরা যে যার জমির হিড় কেটে 'ফোপর' বানিয়ে পাটা-ঘুনি-ঘুগি বসিয়ে রেখেছে অষ্টপ্রহর, তারা বসিয়েই রাখে।

মাছের কথা হচ্ছে না, উঁ-হু, মাছের কথা হচ্ছে না, তারা বুলানের জলে আঁউলা-বাঁউলা চুন-চুরকা ধুতে দেয় লোধাদের—এই ঢের!

হাত মুচড়ে ফের চুল বেঁধে নিল সে। বুকে থুতনি গুঁজে বুক দেখল, আ-ঢাকা বুকে মাথা থেকে খসে-পড়া কটা ছেঁড়া চুল, চুলের টুঙ।

একে একে দু-আঙুলের চিমটে দিয়ে সব চুল তুলে ফেলে দিল। ডানহাতের চেটোর ডগা দিয়ে এখন ফাঁকা বুক ডলছে। বুকটা ফাঁকা, ফাঁকাই।

আচমকা এসময় কে যেন কোত্থেকে ঝোপঝাড় ফেড়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এগিয়ে আসছে। আসছে দোরখুলির লোধাবস্তির দিকে। তার আগে আগে আসছে একটা বাও-বাতাস।

শিশুবালা সে-বাতাস থেকেই টের পেয়ে যায়। তার বুক আর ফাঁকা থাকে না, ঝপ্ করে সে উঠে দাঁড়ায়, অম্মা গ!

রাইবু।

রাইবুকে ফিরতে দেখে খুশিই হল শিশুবালা। সোমবারি যাবার পর থেকে রাইবুর উপর শিশুবালার খুব নজর। কে জানে, মনের শোকতাপে লোকটা কখন কী করে বসে, খারাপ কিছু।

সকালের ঝাঁ ঝাঁ রোদ, ঝাঁ ঝাঁ রোদ মনেও, এক্ষুণি বউকে বুকের ভিতর হ্যাৎ করে টেনে নেবে কী রাইবু?

হঁ-অ, বাঁধগড়ার জলে হাতমুখ ধুয়া হইল? দাঁত বের করে হাসছে শিশুবালা।

রা নেই রাইবুর। ঘুপচীর ভিতর সুটসুট ঢুকে গেল সে। পাখিধরার ফাঁস-গোছাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসবে, আর—

রাব্বু, অ রাব্বু, বাউকো, বাপরে—এএএ!

পাশের ঘুপচী থেকে চিঁচি গলায় অনর্গল ডেকে চলেছে এই ঘরের এই গাঁয়ের এই তল্লাটের সবচেয়ে বুড়ো মাড়ষটা। রাইবুর সে বাপ বটে।

লোকটা এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে। সোমবারি নেই, বাপটা বেঁচে আছে। ভুবনা নেই, গুড়গুড়িয়া নেই, বাপটা বেঁচে আছে, শিশুবালা ফুলটুসিরাও মরে হেজে যাবে, তবু লোকটা বেঁচে থাকবে। হয়ত রাইবুও আর থাকবে না, লোকটা বেঁচে থাকবে।

থাকতেই হবে তাকে। সে যে সে-কাল এ-কাল তিনকাল। সত্য, তেরতা, দ্বাপর। তার থাকা দমে দরকার। সে না থাকলে লোধাশবরদের কে বলে দেবে—দুধিগদগাছের শিকড় কোথায় আছে? কোন্ বনে? জঙ্গলের কোনদিকে গেলে পাওয়া যাবে ধুদকুলের চের? আর সাদা দুর্বার ডগা? ধবো কাচলতার শিকড়? শ্বেতবেরালা? সাদা সাদা গোবরাপোকাই বা পাওয়া যেতে পারে কোথায়? লাল খাপড়ার শিকড়? খুদিকড়র ছাল? ভালুকগোধি?

বাপের উপর অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি রাইবুর।

প্রায় গড় করে সে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে বাপ?

সেই পিচুটি আর জলে ভাসাভাসি চোখ, মুতের কাঁথাকাপড়, বটকানি গন্ধ।

পষ্টই বলল, কুথাকে চল্লি?

কপ্‌তি ধস্তে, বাঁধগড়া।

তারপরেই চুপ, একদম চুপ। অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ ধরে কোনো রা-কাড়া নেই। গাঁদার-গুদুর নেই। যেন কথা ফুরিয়েছে, কথা হারিয়েছে, যেন আর কোনো কথা নেই।

বা,

কী কপ্‌তি, কোন্‌টা কয়ের, গুড়র কী, ডাহুকই বা কী, সীমফুচি, ক্যার্‌কেটা কোন্‌ জাতের—সব, সব এতদিনে হাণ্ডুল-মাণ্ডুল।

হয়ত বা,

মনের ভিতর বাছাবাছি বাছবিচার চলছে, এখনই এই তো একটু বাদেই একটা কিছু বলে উঠবে লোকটা, ধৈর্য ধরো, আর নয়ত আর কোনোদিনই কোনো কথাই বলবে না সে, কণ্ঠা তার পড়ে এল।

তবু—

কী তবু? তবু লোকটার উপর দমে ভক্তি রাইবুর। ঘুপচীর অন্ধকারে খানিক দাঁড়িয়ে, টুকচার অপেক্ষা করে, ঈশান-অগ্নি-নৈঋত-বায়ু চারিভিতেই ঘুরে ঘুরে সে গড় করল।

তারপর পাখি ধরার ফাঁস নিয়ে শিশুবালার পাশ দিয়েই ঝটিতে বেরিয়ে যাবে রাইবু, আর তার বাহুমূল খামচে ধরল শিশুবালা।

ফের কুথাকে চল্লে?

শিশুবালার হাত ছাড়িয়ে হন্‌ হন্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে একদম পিছু না ফিরে রাইবু জানান দেয়, ধান্দায়।

ধান্দায়, ধান্দায়।

লোধাজনমানুষদের কাছে এ-ধান্দা বড় ধন্দের! ধান্দায় বেরিয়ে কখনো সে ফিরে আসে দিনের দিন, বেলা না বুড়তেই। আড়বেলায়, ঝিরি ঝিরি বেলায়। কখনো ফেরে রাতভিত, সাতভায়া দধিভারিয়া তারাকে মাথায় করে। তিনঘড়ির জন চারঘড়ির জনকে ভাবুরগাছে গিরিসগাছে করম-কইমগাছে লটকে লটকে।

কখনো ফেরে একদম রাত কাবার করে, ভুলকা তারা-পোহাতারাকেও ডুবিয়ে দিয়ে। আর কখনো কখনো সে দিনে-রাতে ফেরেই না। ফেরে সেই দিনকতক হাজতবাস করে।

তাই ধান্দার কথা শুনলে ছাঁৎ করে নড়ে উঠবে না লোধাবউয়ের বুক, শিশুবালার অন্তর? মাটির ঢেলার ল্যাখেন বুকও তো ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে?

অতএব দাঁতে দাঁত চেপে দম না ফেলে উপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁটে কামড়ে থাকো দম্‌সম্‌ হয়ে, দাঁত গিজড়ে।

> কাঁদিলে কি হবেক রাণী ভাবিলে কি হবেক
> যখন জনম তখন লেখন লো রাণী
> এখন কেনে কান্দ-অ?

হাতের তৈজস দেখে শিশুবালা বুঝে নিয়েছিল—বড়ধান্দায় নয়, ছোটমটো ধান্দায় বেরুচ্ছে রাইবু। দেখে ভারি নিশ্চিন্ত হল শিশুবালা।

ফের ঠাকুরবাঁধে রাইবু। ধান্দায়। পাখ ধরতে, পাখ মারতে।

'পাখমারা আক্‌খুটি শবর' কী আর, সে তো লোধাশবর। সেই তাদের কথা সে শুনেছে তার বাপের মুখে।

বাউকোয় বলে, আক্‌খুট্টিদের বসবাস তমলুক মইষাদলের পিয়াদা দোরো-হেদিয়ায়। আর তোমার ঘাটাল-মাটালের ওদিকটায়।

কে জানে উসব দেশ-দেশান্তর কোথায়, কুনদিকে? উঁচালে না নামালে? রাইবুর দৌড় তো মথোর সঙ্গে বড়জোর কইলকাতা। ওই একবারই, জন্মের মতন। তাও কী করতে, না পাঁঠা খুঁজতে।

আপনার মনে হাসতে হাসতে রাইবু ফাঁস আড়ছে। ফাঁস আড়ছে বাঁধগোড়ার ওধারে, ডুবকার চারপাশে।

বাঁধের জল হিল্ হিল্ ঝিল্ ঝিল্ করতে করতে যেখানে শেষ, যেখান থেকে ডাহি-ডুগ্রোড়ের লাল চিটামাটির শুরু, চলতে গেলে পা ঢুকে যায় ভস ভস, কটা শাল-আসনের মুঢ়োগাছ, কেঁদবুদা, তার ওধারে মাঝুডুবকা, আঁটারি-চুরচুর লাটাপাটা।

শালার পাখ ওই লাটার ভিতরই ভদকাচ্ছে, কঁহরাচ্ছে তখন থেকে। একটা দয়, দু-দশটা। একসঙ্গে ডাহুক ডাকলে মনে হবে বুড়িয়া দিয়ে কেউ বা কারা কাঠ চটাচ্ছে। দূরে নারদা-নিঘুইয়ের জঙ্গলে, একটানা। জোর থেকে আস্তে আস্তে। কু-কু-উ-ড়-ড়, কপতি ছাড়া আর কী? আর অচেনা পাখ, টিউল-টু টু, আজ তোমার একদিন কী আমার একদিন! আজ তুমার বধিব পরাণ হে।

খাপে খাপে খাঁজে খাঁজে গোটানো ফাঁসগাছাটা ধীরে ধীরে ডুবকার চারধারে পেতে চলেছে রাইবু। পরতের পর পরত। ফুরোয় না আর ফুরোয় না। এতবড় ফাঁসগাছি লোধাপাড়ায় আর কারোরই নেই। তলে তলে বাপের আমল থেকে কবে যে এত বড় করে তুলেছে রাইবু!

ক্যারকেটা কী চটি-বনি ধরার আঠাকাঠি এ নয়। বাঁশের কুঁচিতে গদগদে আঠা জড়িয়ে, সে ভাবুর আঠা বীচ ফলের আঠাই হোক, বাঁশ-চঙ্গাতে ভরে রাখা। তাই তূণীরের মতো পিঠে বেঁধে ঘোরাঘুরি। ডুবকা-ডুংরির ধারে, প্রান্তরে, ঘাসভুঁইয়ে, বাঁশতল্লির বালির উপর আড়াআড়ি কাটাকুটি রেখের মতো রেখে দাও। দিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকো দূরে, মেহা-মাদাল বেগুনা-গাবগুবির আড়ালে। কাগা-বগা ডানার পালকে আঠায় জড়িয়ে ডেকে উঠবে, ক্যা-এ-র-র! ক্যা-এ-র-র!

আর কী পারে, যতই ঝাপটাবে ততই জড়াবে, দেহের ছাল-চামড়া উঠে আসবে না খুঁচিকাঠির আঠায় লেগে? আঠাকাঠি নিয়েই উড়ে যাবে? অত্তো নয়। ডানাই খুলবে না, আর খুললেও বড়জোর দু-দশ গজ। জড়িয়ে মড়িয়ে ধপ করে মাটিতেই পড়ে যাবে না? এভাবেই ক্যারকেটা, চটি চটা, শিকার করা।

কিন্তু কপ্‌তি ধরার ফাঁসগাছি—তার কারুকাজই আলাদা, কলকব্‌জাই ভিন্ন। ঘোড়ার কী গরুর লেজের তারের মতো মোটা চুলের তৈরি জব্বর ফাঁস।

কোনো এক জাড়ের মরশুমে জবর ঠাণ্ডার দিনে ভিখ্ মাগতে বেরিয়েছিল এক ফকিরবাবা, চামর হাতে, চামর দোলাতে দোলাতে। লোধাপাড়ায়ও এসেছিল। বাপ বলে, হামরাই দিন-ভিখারীর জাত, তো ফকিরবাবাকে ভিখ্ দিব-অ কুথাল্লে! নাহ্-অ বাবা এ হ্-অ বাবা! ভিখ্ দিই না দিই তুমার ঐ চামর থেকে একগোছা চুল দেও ফকিরবাবা, ফাঁস বানাব।

তো, সেই ফকিরবাবা আসলে ফকির ছিল না, ভেক ধরেছিল ফকিরের। লোকটা ছিল পুবের। আক্‌খুটি শবর। সুতাহাটার দোরো-হেদিয়ার। 'ব্রহ্মবীজ কালীধম্নি'র মন্ত্র তার জানা ছিল।

বাপকে চামর থেকে একগোছা চুল দিয়েও ছিল খুশি মনে। বাপ সেই উটের না গাধার মন্তর পড়া চুল দিয়ে বানিয়েছিল এই কুঁচি ফাঁস। বাঁশবাউশের কুঁচি বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে, গোল গোল দরজার মতো করে, সুতো দিয়ে বর্‌ফির মতো বেঁধে তার মধ্যে আলগা গিঁট দেয়া চুলের ফাঁস।

চরতে চরতে পোকা-মাকড় ঘাসের বীজ ঠোকরাতে ঠোকরাতে চঁচরা ফুলিয়ে পাঁড়কা-কপতি মাগ-পাখিকে ডাকতে ডাকতে বেভুলে গলা গলিয়ে পেরিয়ে যেতে চায় আড়া-ফাঁস, মরণদুয়ার। গলা দেওয়া মাত্রই চুলের ফাঁসে ঝুলে পড়ল। টুঙ করে যেন গলাটা মুচড়ে দিল কেউ। নিথর মুণ্ডুটা হেলে পড়ল।

মরা কপ্‌তিও বাবু-ভাইয়েরা, হাটুয়ারা, এক-আধসের চালের বিনিময়ে, কী নগদানগদি কিনেও।

নরম হাড়ের তুলতুলে মাংসের সোয়াদ কত! তব্বে, ই কী আর শিশুবালা-ফুলটুসির হাতের গুণ, বাবু ভাইয়েদের বউয়েরাই পারে। আর পারতে পারে মথোর বউ।

রাইবুর মনে পড়ল সেই তেজপাতা দেওয়া গাঢ় মসুরডালের কথা। ডাল কী আর, নির্ঘাত তুকগুণ করেছিল মথোর বউ, মাগীটা ঘুরণ-দাঁড়িতে বেঁধে কী ঘুরণটাই না ঘুরিয়েছিল রাইবুকে। ডাল-তেজপাতার গুনে উপর-টুলটুলি হয়ে একেবারে কইলকাতা!

কাঁড়-কাঁড়বাশ না, কুঁচি-ফাঁস না, আক্‌খুটি শবররা 'সাত নলা' চালিয়ে পাখি ধরে। পাখি ধরে বিক্রির জন্য না, নিজেরা খাবার জন্য। রাইবু ভাবে, আমাদের মতো ভোখখা-দুখলা কী আর। তাদের হাল-লাঙল আছে, জমি জিরেত আছে।

'আর সাতনলা?'

সাতনলার মাথায় থাকে সর্ষে তেলে ভাজা জইড়গাছ আর মনসাগাছের ক্ষীর দিয়ে তৈয়ের করা একরকম চিট-আঠা। ওই দিয়ে কী আর বড়পাখি ধরা যায়, ছুটুমুটু, ঐ তুমার পায়রা কপ্‌তি-গুয়েবনি আর কি। সেরা সেরা পাখি, সরাল শামখোল হাড়গিলে ধরতে হলে সাতনলার মাথায় বসাতে হয় বিষ মাখানো লোহার গজাল।

আক্‌কুট্টিরা উদ্‌বিড়াল-বাদুড়-চামচিকা-ভাম-খাটাস-কাছিম কী না খায়!

আর উন্দুর?

খায় না ফের। খায়, খায়।

সাপ খায় না, সাপ খেলায়। কামরূপ-কামিখ্যা আড়াই পাট ঝাড়ন ব্রহ্মবীজ কালীধন্নি, কতরকম মন্তর জানে তারা। আমাদের লোদ্ধা জাইতে উসব আর কে জানে? এক টুকচার টুকচার জানতে পারে বড়সোলের গজনা।

আক্‌কুট্টিরা আদড়া দুধ-খরিসের মাথায় সিঁন্দুর থেপে মা মনসার পূজা আরম্ভ করে। লদ্ধা জাইতে কে পারবে, উরম কারো হিম্মৎ আছে?

কেনে? দেখ্‌রির?

আরে ধুর, উ ত ঐ ঢ্যামনা সাপের ছাল ছাড়াএ্যে বড়জোর খাত্তে জানে। শুন, আক্‌খুট্টিরা সাপ খায় না, সাপকে পূজা করে। এক বড়া সাপেরই কটা জাত আছে জানিস? বল ত, বল।

চন্দ্রবড়া—

আর, আর? একটাই মোটে? তবে শুন, আককুট্টিদের কাছ থেকে আমার শুনা পঁচাশটা বড়াসাপের নাম—মোসুরা লুটল্যা পাথরা পাথরাজ কুরকুট্টা মেজুর পদ্ম ময়াল ঘড়ানাগ গোড়্যা খোদড়্যা দোমুহা কালা ধলা লাল লীল সাদা হলদা, কটা হইল?

হাতের কড় গুনতে গুনতে থেমে থাকে রাইবু। আর কি গুনবে, বিস্ময়ে সে হতবাক!

ই ত গেল বড়া, ইবার চিতির নাম শুন—বেনা কেঁচা ঢেমনা ওল শাঁক গাছ কালা সাদা—

থাম, থাম, বাপ! বাউকো! উসব নাম শুনলে গা আমার শির শির করে।

আক্‌খুট্টিদের ছুয়াছাউরাও দুধিয়া তেঁতলিয়া খরিস চন্দ্রবোড়াকে কোলে-কাঁখে নিয়ে এ-গাঁ থেকে সে-গাঁ টঙস টঙস ঘুরে বেড়ায়, খেল দেখায়, আর নাম শুনলেই তোদের গা শির-শিরায়? ভাব্, তোরাও শব্বর ওরাও শব্বর বঠে!

বাপের মুখ থেকে শুনতে শুনতে রাইবু মনস্থ করে ফেলে, সময় সুযোগ এলে একবার আকখুট্টিদের দেশে যাবে। লাগমতীদের দেশে। নামাল খাটার নাম করে।

পরিচয় করে আসবে তাদের বউড়ী ঝিউড়ীদের সঙ্গে। বলবে, হেই দ্যাখো আমরাও শব্বর তোমরাও শব্বর বঠ। তবু এ্যাদিন জান-পহেচান ছিল না। ইবার ত হৈল।

ঘরকে আস-অ, যা-হ। ঝরনের কালে আসো যদি ত সরুবালি বড়বালি কুড়কুড়িয়া ফুড়কি কাড়হান ছাতু আর পরবের কালে এলে পরব ছাতু খাওয়াব। আন্দা চালগুঁড়ির সঙ্গে উন্দুর মাংসের জুস, উন্দুর-পিঠাও খাওয়াব।

বাপ বলে, দুন্দুর। লোঙরার যাশু। একেকটার গতরে তেলচিটানি গন্ধ কী! তবে তিলককাটা বাবাজী। বাবুভায়াদের মত হরি ভজে। হরিবাসর আছে, সেখানে বাতাসা হরির লুট হয়।

রাইবুর 'ফাঁস আড়া' শেষ, ডুবকার চারধারে। এবার শুধু বসে থাকা হাঁ করে। ঘড়ির পর ঘড়ি। দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। কখন পাঁড়কা কখন কপ্‌তি কখন ডাহুক টি টি করে এক ঠ্যাঙ তুলে এক ঠ্যাঙ ফেলে ডুব্‌কার বাইরে আসে, আরেক ডুবকায় যেতে মন করে।

ডুবকায় ঢুকে হেই হেট হেট করে খেদিয়ে নিয়ে আসবে কী রাইবু? মুখে কুলকুলি মেরে, হাতে তালি বাজিয়ে? নাই নাই কব্‌ভি নাই, পাখ মেলে যদি পঙ্খী ফুড়ুর? কুঁচি-ফাঁসের বহর আর কতটা? এক বিঘৎ থেকে বড়জোর একমুঠ।

ঝোপের বাইরে হাঁটু মুড়ে, দু-হাঁটু জোড়ো করে, হাতের বেড় দিয়ে রাইবু উট-মুখো বসে আছে। বসে থেকে আকাশ দেখছে, মেঘপাতাল। আর 'কারিকুরি' পাখি খুঁজছে। কবে যে শেষতক দেখেছে মেঘপাতালের এ-কোণা থেকে ও-কোণা জুড়ে পাখিগুলো এক লাইন করে উড়ে চলেছে!

পাখি দেখা, কারিকুরি দেখা আর কতক্ষণ! রাইবু ফের লাফিয়ে উঠল। কেমন যেন অস্থির অস্থির। শালা গুড়গুড়িয়ারও এই স্বভাব ছিল। গুড়গুড়িয়ার ধাতটাই কী পেয়ে যাচ্ছে সে?

নয় নয় করে বেলাও প্রায় ধ-গাছের মাথায় উঠে এল। এমন সময় ডুব্‌কার ওদিক থেকে আড়াআড়ি কারা যেন এগিয়ে আসছে। গাঁদারগুদুর কথা শুনেই বুঝে ফেলেছিল রাইবু দোরখুলির লোধাবস্তির ইস্কুল পড়ুয়ারা চাঁদাবিলার ইস্কুলে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে দলটা স্পষ্ট হল। গুরভার বেটা সুকয়া, শরাবণের ছেলে টুরা, আর ভুবনার মেয়ে নুকু। নুকুই বড়, সে উঁচা ক্লাসে পড়ে। পিছু পিছু ভুবনার বউ ফুলটুসি আসছে মেয়েকে এগিয়ে দিতে।

মেয়েটা হস্টেলেই থাকে। ছুটিতে ঘরে এসেছিল। ইস্কুল খুললে এখন ইস্কুলে যাচ্ছে। বড়ো ভালো মেয়ে, ফুলটুসুয়ার মুখটা একেবারে কেটে বসানো। মেয়েটার উপর কেমন যেন সর্বক্ষণ মায়া পড়ে থাকে রাইবুর।

গুরভার বেটা সুরুয়া আর যাবে না, আর যাবে না ইস্কুলে। রাইবুর পাখি ধরার কুঁচি-ফাঁস

দেখেই তার হয়ে গেছে।

চড় লাগাব সুরুয়া, ইস্কুলে যা বলছি।

যাব নাই।

না যেয়ে কী করবি, হঁ?

তুমার সঙে কপ্‌তি ধরব, জেঠা।

তোকে কপ্‌তি ধরাচ্ছি, বড়পুত্রা।

বলেই রাইবু সুরুয়ার পিছু ধাওয়া করল। দৌড়ুচ্ছে রাইবু আর সুরুয়া কুড়চি-কুচ্‌লা-আঁটারি-চুরচুর ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে যাচ্ছে। খুঁজে খুঁজে নারি—

ভুবনার বউ তো হেসে বাঁচে না। দু-হাতে তালি মেরে বলছে, উহার পেন্টুলের পাকিটটা টুঁড়ো। যেখানে শর সেখানে শব্বর—উহার পাণ্টুলের পাকিটে বাঁটুল আছে, চিড়রা-ক্যাকসাস ঠাইঠুই শিকার করে, উ কেন্নে পড়ে মরতে ইস্কুলে যাব্বে?

মেয়েকে এগিয়ে দিয়ে এসে রাইবুর পাশটিতে থুপ হয়ে বসল ফুলটুসি। রাইবু সামান্য সরে বসল।

নুকুর বাপ বলত, আমাদের জাইতে উসব ফের হয় নাকি?

হয় হয় ফুলটুসুয়া। আমি বলছি নুকুর হবে।

'নুকুর মা' বলল না, 'ফুলটুসুয়া' বলল রাইবু!

হওয়া খুউব শক্ত, দমে কঠিন।

কেনে শক্ত কেনে, কেন্নে কঠিন?

হস্টেল থিক্যে ঘরে আইলে, ফের হস্টেলে যেতে না করে নাই নুকা, আমার মেয়্যা বলেই বলছি নাই, তাহলেও তব্বু—

কী তব্বু?

বড় জাইতের মেয়্যারা উআর উপর যা করে না!

কী করে?

হস্টেলে ভাত খেতে বসেছে, খাতে খাতে ভাত শেষ হৈল, ত রান্নার বামনাকে মেয়্যা বলল, আমাকে একটা ভাত—

অম্নি সবার কী হাসি কী হাসি! "একটা ভাত, একটা ভাত" বলে আর আর মেয়্যাদের, বাবু-ভায়াদের ঝিউড়ীদের খিল খিল হাসি কী! আর বামনাটাও তে-ঢেম্না, বেছে বেছে হাঁড়া থিক্যে, কাঁনা একটা ভাতই দিল! মেয়্যাকে বলি, বলবি ত একচাটু ভাত দে!

চাটু বলে নাই, হাতা। রাইবু শুধরে দিল।

আর হাসল। কথা শুনে রাইবুরও হাসি পেল।

তার ডান জাঙে জোরসে একটা থাপ্পড় মেরে ভুবনার বউ ফুলটুসি বলল, আরেকদিন কি হয়েছে, শুন্নো না—পড়তে পড়তে সান্তালদের একটা মেয়্যা ঘুমে আলুথালু, ভাত খাবার স্বপন দেখছে, ঘুমের ঘোরে বলে চলেছে, দাকা দে মাই! দাকা দে মাই!!

ভোক লেগেছিল নির্ঘাৎ। তো, সেই থিক্যে বাবু-ভায়াদের মেয়্যারা, হাটুয়া মেয়্যারা, তাকে দেখলেই এই বলে খেপায়, "দাকা দে মাই, দাকা দে মাই।"

রাইবুর ডান জঙ্ঘায় আরেকটা থাপ্পড় মেরে ফুলটুসি বলল, সান্তালরা ভাতকে 'দাকা' বলে নাই?

হঁ দাকা।

হাসিতে ঢলে পড়ে আরো আরো একটা থাপ্পড় মারতে যাবে ভুবনার বউ, হাতটা ধরে ফেলে, থামিয়ে দিয়ে রাইবু বলল, মেয়্যা পড় হচ্ছে নাই?



একটাই মাত্র কপ্‌তি ধরা পড়েছে। আর অচেনা পাখ আড়াল আবডাল থেকে দুয়েকবার টি-উ-ল টু-টু উ-ল টু-ট-উ-উ ডাকতে ডাকতে কোথায় কোনদিকে যে, একবার মনে হল এই ডুবকার ভিতর, পরক্ষণেই মনে হল নারদার জঙ্গলে, নারদা না তপোবনের জঙ্গলে, ঘোড়াটাপুর জঙ্গলে কী আরও দূর নিগুইয়ের জঙ্গলে চলে গেল, শবরো, ধরাছোঁয়ার বাইরে।

রাইবুকে উস্তনখুস্তন করে, রাইবুকে তাতিয়ে দিয়ে, তিতিবিরক্ত করে পাখিটা উড়ে গেল।

পড়ে থাকল একটাই পাঁড়কা, একটাই কপ্‌তি।

একে নিয়ে এখন কী করে রাইবু? ডানহাতের দু-আঙুলে মরা কপ্‌তির গলাটা মুচড়ে ধরে সে হাঁটতে থাকল।

বুকের কাছে পা দুটো জড়ো করে মরা পাখিটা দুলছে। একবার রাইবুর ডান-পায়ের দিকে, একবার পা থেকে দূরে, উল্টোদিকে।

মাঝে মাঝে ডানা দুটোও একটু খুলছে, ফের জুড়ে যাচ্ছে।

একটাই মাত্র কপ্‌তি। একে নিয়ে রাইবু এখন কোথায় যায়? ঘরের দিকেই যাবে কী? না, বাবু-ভাইয়েদের 'হাটুয়া' পাড়ায়?

দুদিকের কোনোদিকেই গেল না সে। সে গেল কুম্‌হারপাড়ায়, সয়ার বাড়ি। অনেকদিন সেদিকে রাইবুর পা পড়েনি।

কিন্তু, এই ভর দুপহর বেলায় কুটুমবাড়ি? কুটুম্বিতায়? যখন 'খাবা-দাবার' একটা ব্যাপার আছে। তার উপর সয়াসয়ানি কী না খাইয়ে ছাড়বে তাকে?

কুম্‌হারপাড়ার আর আর লোকেরা, আর আর কুম্‌হাররা কী রাইবুর সঙ্গে ব্রহ্মাকুমারের এই মাখামাখি কী আর ভালো চোখে দেখে?

দেখে না, দেখে না, দেখতেই পারে না।

অথচ রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়া-শরাবণরা তো কুমহারপাড়ায় হরদম রলা, গরুরগাড়ির ধুরি, চাকার আরা, লাঙলের ঈশ, দরজার চৌকাঠ যোগান দিয়ে গেছে। দেয় নি?

দিলে কী হবে, কথায় বলে না, 'তাঁতি কামার কুম্‌হার—এ তিন বড় ছিনার!'

না না, সব কুম্‌হার কী আর, সয়া-সয়ানির মতো কুম্‌হার এ তল্লাটে এ দেশজুড়ে আর কজন আছে?

কত খাতির! নিজের 'বহু'র মতো সয়ানি হাসি-ঠিসারা, রঙ্গরসিকতা পর্যন্ত করে।

হঁ, আমাদের লদ্ধা জাইতেরও দোষ আছে। দোষ কী নাই?

কুম্‌হারপাড়ার কাম্‌হারপাড়ার কুল্‌হিরাস্তায় 'জুন্না' রাইতে কী আন্ধার রাইতেও যেতে যেতে তোর হাত কী সুলসুলায়? সুল্ সুল্ করে?

করে, করে।

না হলে খলার ধারে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা গৃহস্থের লাঙলের লোহার ফলাটা, ফালটা, ঝপ্ করে খুলে নিয়ে আরেক জায়গায় ঝেপে দিস্ কেনে?

চালাক চতুর 'গিরিহা' এসব বুঝেসুঝেই ত লাঙলের ফলাটা আগে ভাগেই খুলে রাখে। লে, আর কত ঝাড়বি ঝাড়!

ব্রহ্মাকুমারের বাড়ি উপস্থিত হয়ে রাইবু বসল উঠোনে, খলায়, এই খরার মধ্যেও, যথেষ্ট দূরত্ব রেখে।

হাঁই হাঁই করে উঠল লবঙ্গ।

উ কী এই দুপহর বেলায় অত খরার মইদ্যে বসলে যে সয়া? ঘরকে আস-অ!

দালানে, ছায়ার মধ্যে তড়িঘড়ি দড়ির খাটিয়া পেতে লবঙ্গ কত ডাকল, আস-অ খাটকে আস-অ, বস-অ।

রাইবু এল না, রাইবু বসল না। ঐ দূরেই, রৌদ্রেই, হাঁটু মুড়ে বসল।

আর মরা কপ্‌তিটা সয়ানির হাত বরাবর ছুঁড়ে দিয়ে ধরতে বলল।

লবঙ্গ আঁক পাঁক করছে, নাই, নাই, অত পর পর ভাবলে কী আর চলে! আসো, ঘরের ভিতর আসো!

রাইবু মনে মনে বলল, আসতে নাই, ঘরের ভিতর আমাদের আসতে নাই সয়ানি। বাইরের জিনিস, বঁড়-বাদাড়ের জিনিস, বাইরে বাইরেই থাকা ভালো।

ব্রহ্মাকুমার বসে আছে 'চাকঘরে'। চকটবাড়ি মেরে চাক ঘুরোচ্ছে সে। জল-হাত দিয়ে মাটির ডেলা মুচড়ে মুচড়ে বুড়ো আঙুলের টিপনী গেঁথে 'ভেঁইচা' উলছে।

ভেঁইচা গড়া হয়ে গেলে সুতো দিয়ে ভেঁইচার গোড়া কেটে চাক থেকে ভেঁইচা তুলে ফেলছে।

চিকন চিকন ছড়ানো সরুবালির উপর সয়ানি সদ্য গড়া সে-ভেঁইচা সযত্নে রেখে দিচ্ছে।

এসময় ছাগল-মাগল, বিশেষত আনাড়ী খুকড়া আচমকা এদিকে এসে পড়লে দিগ্‌দারির কম্ম হবে, সব্বনাশ!

পায়ের নখে নরম তুলতুলে ভেঁইচার কানা ভাঙবে, আঁচড়াবে, উল্টে দেবে, একটা নয় একসঙ্গে দু-দশটা।

তাই লবঙ্গর কড়া নজর। ধারে কাছে পাখপাখালি নেই, তবু সয়ানির হাতদুটো মাঝে মাঝেই বেভুলে উঠছে নামছে।

চাকর-ঘর থেকে ব্রহ্মাকুমার বলল,

"হেরিয়া অতিথি যেবা হয় প্রফুল্লিত।
পুন্যশীলা সেই নারী শাস্ত্রেতে কথিত।।"

ব্রহ্মাকুমারই বলল, অতিথি দেখে যে নারী খুশি হয়, সে নারী অতিশয় ধার্মিক। তুমার সয়ানীকে, আমার ব্রহ্মাকুমারীকে টুকচার ধম্ম করতে দেও সয়া। আনলে যখন, কপ্‌তি মাংসের জুস্ আর চাট্টি ভাত খেয়েই যাও।

অনেক ডাকাডাকির পর রাইবু উঠে এল চাকঘরে, তাও কুণ্ঠিতভাবে। বসল চাক থেকে দূরে, হাঁটুমুড়ে, হাঁটুর উপর দুহাত রেখে।

রাইবু দেখছে, চাকঘরে যেন একটা সুখ-সুখ ঠাণ্ডা হাওয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ব্রহ্মাকুমার চাক থেকেই বলল, কীসব শুনছি সয়া?

কিসের কী?

ঐ তুমাদের "সতীসাবিত্রী" কথা।

সম্প্রতি কুম্‌হারপাড়ার এক কুম্‌হারছোকরা, সন্তোষ, লোধাপাড়ায় ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছে। লোধামাইয়া সাবিত্রীর সঙ্গে তার নাকি খুব আশনাই—তাকেই বউ করে ঘরে আনবে। এই নিয়ে সন্তোষের বাপের সঙ্গে সন্তোষের খুব ঝগড়া।

মাটিতে খাপরাখুচি দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে রাইবু বলল, হুঁ সাবিত্তিরি—

তার মনে পড়ল, সাবিত্রীর কথা। সেই আড়পাগলী মেয়েটা, গুড়খালোধার বহিন বটে সাবিত্রী।

জলা মারের দিনে, রাইবুর যখন খুব মনখারাপ, সব কটা চিংড়ামাছ সাবিত্রীর কোঁচড়ে উপুড় করে রাইবু ঢেলে দিলে সে বলেছিল, এত্ত দিলে, আমো-ও কিছু দিব-অ।

কী দিবি?

দি-অ।

রাইবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে সাবিত্রী বলেছিল, টুকচার রাত করে ধ'তলে আস-অ, দিব-অ—

তার গায়ের উপর তৎক্ষণাৎ একদলা কাঁদা ছুঁড়ে মারবে না রাইবু?

সে ত এক আড়-পাগলী। তার সঙ্গে সন্তোষকুম্হারের মাখামাখি? হুঁ খব্বর বঠে। লদ্ধাপাড়ায় ফিরেই জটাদিদির কাছে আগাপাশতলা সবকিছুই জানতে হবে।

মনে মনে ভাবল রাইবু, ভালো লয়, ব্যাপারটা ভালো লয়। সন্তুষ যদি বেহা করে ত একরকম মঙ্গল, না করে মেয়্যাটাকে যদি লষ্ট করে? যদি করে? হুঁ, পার পাবে নাই সন্তুষ। লোধারা তাকে ছাড়বে মনে করেছ? তবে কাটাকাটির পর থিক্যে লোধারা খানিক দুব্‌লা কমজোরী হয়ে আছে, এই যা।

হুঁ, ইসব খবর আমি ত রাখি নাই সয়া। তবে যেটুক জানি মেয়্যাটা পাগলী আছে। দমে আড়-পাগলী।

আড়পাগলী? গুড়খার বহিন? কুনটা? দেখেছি কী?

দেখেছ দেখেছ, ঐ তুমার সাফা সাফা, চইখের ভুরু দুটা উঁচা উঁচা। —শুনেই ব্রহ্মাকুমার জরপ করল,

"স্ত্রীলোকের ভুরু যদি অতি উচ্চ হয়।
সে বড়ই কুলক্ষণ জানিবে নিশ্চয়।।"

সয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাইবু আর যায় কোথায়? কত করে সয়াসয়ানি দুপহরের খাওয়া খেয়ে যেতে বলেছিল, রাইবু খায়নি! কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করেছিল তার।

নাছোড় সয়ানি গুড় মেখে একবাটি মুড়ি দিয়েছিল রাইবুকে। তাও খায়নি।

হয়ত খাবে খালধারে, কী ভুড়ভুড়ি ঝর্ণার ধরে বসে, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়।

আর নয়ত নিয়ে যাবে ঘরে। রাইবু তো জানেও না ওদিকে কী খাচ্ছে বউটা, বাপটা।

কুম্হারপাড়া থেকে বেরিয়ে রাইবু হেঁটে চলেছে, পশ্চিমে। সীতানালা খালপাড় বরাবর।

খালের দুধারে এখন হালি মেঘের তুল্য ধান-বোয়ালি। তায় হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে শিরশির।

খালপাড়ে কুম্হারপাড়ার বউড়ি-ঝিউড়িরা জড়ো হয়েছে সিনান করতে। বাস-সাবানের খোল উড়ছে দমকা হাওয়ায়।

শুধু কী খোল, বাস-সাবান, বাস-তেলের গন্ধও ভুর ভুর করছে, মহকাচ্ছে।

রাইবু খালপাড় বরাবর পশ্চিমে হাঁটছিল। তার কালো কুলো পা। শিরা-ওঠা হাত। নাঙ্গা নাঙ্গা। খালি যা টেনেটুনে পাছাটুকু ঢাকা লাল ডুরে গামছায়।

মেয়েদের ওদিক দিয়ে যেতেই লজ্জা রাইবুর। সে ঘুরে গেল নিচের দিকে।

নিচের দিকে খালের জলে কাড়া-পোঁড়া নামিয়ে খড়ের বেঠনা ঘষে ঘষে গা রগড়ে দিচ্ছে কাড়া-পঁড়ার বাগালরা, ভুজু-ডিবরা, আর কেউ কেউ।

জল খেতে খালে নামল রাইবু। পায়রা-চঁচরা জল, পায়রার ময়ূরকণ্ঠী গলার মতো চিকচিক করছে, মুখ দেখা যাচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে আঁজলা ভরে রাইবু জল খাচ্ছে।

হয়ত ছায়াটা, রাইবুর ছায়া, তখনও ঢেকে আছে জলের মোষ আর মোষবাগাল ভুজু-ডিবরাদের।

আর ভুজু বলে উঠল, কাটাকাটি আর ক ঘণ্টা চললে দেখতে হত নাই, লোধাবংশ একদম নির্বংশ হঞে যেত। লদীর জল , পাত্‌নার চেতলাখালের জল লালে লাল—

ধুর! খালজলে নদীজলে রক্তগঙ্গা কী আর বহেছিল, কেটে কেটে সব ত ফেলছিল পাত্‌নার তিলকমাটি হুড়ির ডুবকার ভিতর এক চুঁয়ায়। সে এক মরণ-চুঁয়া। ছা-ছানা বুড়া-হাবড়া মাগ-মরদ কেহই পার পায়নি। না, কেহই না।

ধাঁই করে মাথাটা ঘুরে গেল রাইবুর, জল খেতে খেতে। কী বলল, বলল কী ভুজু-ডিব্‌রা? পাতনার মরনচুঁয়া? তবে, ঐ চুঁয়ার ভিতরই কী সোমবারি আছে?

যেন এক্ষুনি গলা ছেড়ে ডেকে উঠবে রাইবু, সম্বারি-ই-ই-ই! তবে, তুই কী ওখানেই শুয়ে আছিস, বহিন?

লুকিয়ে-চুরিয়ে, একবার সার্কাস দেখেছিল রাইবু, সঙ্গে ছিল গুড়গুড়িয়া।

মিতিএ্রা গিরির মরণ-চুঁয়া। একটা লোহার গোল পিঞ্জরা। তার ভিতর ভটভটি নিয়ে মাথায় লোহার টুপি পরে মিতিএ্রা গিরি ঢুকল।

চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রথমে গড় করল। তারপর পিঞ্জরার গায়ে ভট্ ভট্ করে সে কী ভটভটি মোটর চালানো! আর সে মোটরের গোঁ গোঁ আওয়াজ কী!

উপর থেকে নিচে নামছে মিতিএ্রা, নিচ থেকে উপরে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি পড়ে গিয়ে মাথা তার ছিঁচে যাবে।

কিন্তু না, মোটরের চাকা যেন লটকে আছে লোহার খাঁচায়। চাকা উপরে, মিতিএ্রার মাথা নিচের দিকে। তবু পড়ছে না।

ধন্য ধন্য হে মিতিএ্রা! ধন্য তোমার মরণ-চুঁয়া!

কী হাততালি কী হাততালি!

সেই রকম পাতিনায় মরণচুঁয়ায় সম্বারি, —এখনও তুই কী রিঁ-রিঁ করে ঘুরে চলেছিস? ঘুরেই চলেছিস? বহিন আমার!

রাইবু দৌড়ুল, জোরে জোরে পা ফেলে দৌড়ুল, দৌড়ুল পাতিনার তিলকমাটি হুড়ির পানে, ডুংরির দিকে। কোথায়? লাটাপাটার ভিতর সে মরণচুঁয়া কোথায়!

ডুংরির ভিতর গরু চরছে। গরুর গলায় ঠরকা বাজছে। আর দিনমণির, বেলার ঠাকুরের আড়বেলার রোদ পালাপতরের ভিতর দিয়ে এসে পড়ে যেন ছাব্‌কা ছাব্‌কা রক্তের ছাপ ফেলেছে ডুবকার মাটিতে।

খুঁজে খুঁজে রাইবু ঠিকই বের করল সে-মরণচুঁয়া, অন্ধকূপ। কবেকার মরণাধার! এখন শুকনো পাতাপতরে ঢাকা। চারপাশের গাছ-পালার গা থেকে মাথা থেকে খসে-পড়া শুক্‌না পাল্‌হাপতর অহরহ উড়ে-ঘুরে পড়ছে চুঁয়ার ভিতর।

কবেকার সে-চুয়াঁ? কে খুঁড়িয়েছে? জল নেই, এখন শুধুই নোঙরাজবরা। খড়মড়ে পাতাপতর, কাঠি খুঁচিতে ভরা।

চুঁয়ার পাড়ে দু হাতের চেটোয় কপাল রেখে রাইবু থম মেরে বসল। তারপর কী মনে করে, গামছার আচলের খুঁট খুলে ভুজা মুড়ি মুঠো মুঠো ফেলতে লাগল চুঁয়ার ভিতর।

ফেলছে। শুকনো পাতাপতরের উপর মুড়িগুলো সুড় সুড় করে পড়ছে। যেন চুঁয়ার পাড় থেকে ঝুর ঝুর বালি ঝরছে। বালি কী আর, রাইবুর হাতমুঠ থেকে খসে পড়ছে গুড়মুড়ি—

খা বহিন, খা! হামার সয়ানির, তোর লবঙ্গ বন্ধদিদির দেয়া গুড়মুড়ি, খা!

চুঁয়ার চাতাল জুড়েও শুকনো পাতাপতর। তার ভিতর থেকে, তার উপর দিয়েও এবার ধীরে ধীরে আওয়াজ উঠছে, সর্ সর্ সর্ সর্! কোথাও বা পাতাগুলো ফুলে উঠছে, নড়ে উঠছে।

আংকুড়ারে বাংকুড়া

রাতে ক্যানে চলুস?

বেলা তো ডুবল। রাত আসছে, রাত আসছে। রাতচরা লতাপাতাও চলার জন্য তৈরি হচ্ছে। সর্ সর্ সর্ সর্!

তাদের জায়গা করে দিতে রাইবুও সাবধানে ঝোপঝাড় ফেড়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এল।



রাত নেমেছে জঙ্গলে। জঙ্গলমহালের সবচেয়ে উঁচু শাল-আসনের চুড়ায় যেটুকু মরা আলো লটকে ছিল, আভা ছড়াচ্ছিল, চিকচিকি কাগজের মতো, তাও নিভে গেছে কবেই। বন-জঙ্গলের পাতাল থেকে, গাছ গাছালির তল-দেশ থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে ক্রমশ উপর থেকে উপরের দিকে, আরো উপরে। তলায়, একেবারে তলায় পড়ে আছে যে-পথ, রাজপথ থেকে প্রজাদের, তস্য তস্য প্রজাদের পথ, ভালুকঝোড় লোধাঝোড় কুম্‌হারঝোড় কামহারঝোড় হাটুয়াঝোড় গরু-বাগাল কাড়া-বাগালদের ঝোড়, সব যেন ঝুপ অন্ধকারে এখন আবছা, অস্পষ্ট। উপর থেকে, আরো উপর থেকে মেঘপাতল থেকে চাঁদের তারাদের আলো প্রথমে শাল-আসনের মাথায় ঝরতে ঝরতে একেবারে নিচেয় এসে পড়লে তবে সে-পথ সে-ঝোড় হবে স্পষ্ট পরিষ্কার। যাকে বলে চোখ সয়ে যাওয়া, ধাতস্থ হওয়া, তখন যেমন খুশি হাঁটো, হাঁটো রে, মাথার সিঁথির মতো সিঁড়িপথ, সুঁড়িপথ কোনো পথেই আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এখন জঙ্গুলে নামাল পথ যেন তাপে-ভাপে ধোঁয়ায়-ধোঁয়াশায় ঠাণ্ডায়-ধান্দায় সব একাকার একাকার।

দোরখুলির লোধাবস্তির কুল্‌হিরাস্তায় একটা রাস্তা আছে বটে, সোজাসুজি, সে রাস্তা যেমন ছুঁয়েছে রাইবুলোধার ঘুপচি তেমন শরাবণ-গুরভা-গুড়কুঁদালোধার ঘরও তো ছুঁয়ে আছে। তাছাড়াও, এতদ সত্ত্বেও যে যার একটা নিজস্ব রাস্তা আছে, বাট আছে। সে বাট বক্র, কখনই সোজা নয়, সহজও নয়।

শরাবণলোধার ঘুপচি ঘরের পিছন থেকে যে-পথ বেরিয়ে কুলবুদা কেঁদ-বুদা বেনাবুদার টাঁড়-টিকর পেরিয়ে জঙ্গলে সেঁধিয়ে গেছে, সে-পথই কখন দু ভাঁজ হয়ে ডিগবাজি খেয়ে দোরখুলির মাহাতোদের জল-জমিনের বুলানে নেমে গেছে।

ভুবনার ঘরের পশ্চিমে একটা কয়েত বেলের গাছ, বেলতলা দিয়ে বেলতলার চারপাশ ঘুরে খিরিসতলার পাশ দিয়ে যে-রাস্তা আঁটরি-চুরচুর জঙ্গল ভেদ করে সুরথদের ত্রিলোচনদের বাঁশঝাড় পেরিয়ে বাঁকতে বাঁকতে দোরখুলির বঙ্কামাহাতোর মুদিখানার দোকান অব্দি পৌঁছে গেছে, সে-রাস্তা ফুলটুসিদের শর্টকাট।

আবার রাইবুলোধার পিছনের পথ অতটা বাঁকা-চোরা নয়, ভাঙাচোরা জোড়াশালতলা ধ'তলা পেরিয়ে ঠাকুরবাঁধ, ঠাকুরবাঁধ হয়ে মাঝুড়ুবকা, মাঝুড়ুবকার জঙ্গল পেরিয়ে কুম্‌হারপাড়া,

কুমহারপাড়ার চৌহদ্দি পেরিয়ে সীতানালার খালপাড়, খালপাড় বরাবর সোজা পশ্চিমে, পশ্চিম-পশ্চিম, পশ্চিমে তিলকমাটি ছুড়ি, ছুড়ির উপর পাতিনার ডুব্‌কা-ডুংরি, তার ভিতর দিয়ে, তার ভিতর দিয়ে মরণ-চুঁয়া, মরণ-চুঁয়ার চাতাল ছেড়ে রাইবু পথ ভাঙছে, পথ ভাঙছে—

এখন, এইরাতে, যে যার রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরছে। কেউ ফিরেছে, কেউ ফেরেনি। আবার কেউ কেউ ওই শর্টকাট দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ হয়ত বেরুবে।

জঙ্গলে; রাজপথে, তস্য তস্য প্রজাদের পথে ভালুক-ঝোড়ে লোধা-ঝোড়ে কাম্‌হার-কুম্‌হারঝোড়ে যখন ঝুপ অন্ধকার, আবছা-ঝাপ্‌সা, তখন লোধাবস্তির চোরাগুপ্তা রাস্তায় কী আর দিন-আলো? সেও তো আঁধার অন্ধকার।

ততোধিক অন্ধকার কালোকুলো মানুষ!

যাচ্ছে, বা আসছে, সংখ্যায় তিনজন, ঝুপ্ করে লেদা-বহ্ড়ার ডাল থেকে নেমে এল আরেকজন। একসঙ্গেই হাঁটছে, হাঁটছে। চারজন, চারজন। আচমকা মাঝের জন, দুজন, উধাও উধাও।

হাঁটার বিরাম নেই, কে গেল কে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। ঝপ্ করে ধানবিল থেকে কে লাফ দিল? মাছ না মাড়ষ? লুল্‌হি কুকুরটা ভুঁকছে!

নাই জানি, নাই জানি! যে যার রাস্তায় হাঁট, ঠিক থাক, ধর্মের রাস্তা, গায়ে আঁচড়টিও লাগবে নাই। বরঞ্চ দাঁতে কড়ে আঙুল কামড়ে বুকে থুতু ছিটা, ডরাস যদি ত!

শরাবণশবরের মেয়ে চাঁদবদনী একটা ভাঙা পাছিয়া নিয়ে সেই দুপহর থেকে গরুর গোঠের পিছন পিছন ঘুরছিল। এ-টাঁড় থেকে সে-টাঁড়ে। গরুর বাগালরা কী আর দেয় সহজে? গরুগুলোও কী আর, এত খাচ্ছে ঘাস পাতা—

কখন কোন্ গরুটা দাঁড়িয়ে পড়ে লেজ উঁচু করছে, করব-করব, চাঁদবদনীর কঠিন চোখ, ঝুড়ি হাতে অমনি দৌড়ুল, নাদির জন্য গরুর পাছায় ধরল ভাঙা পাছিয়া। আর ঐ করে, তবুও আধ-পাছিয়া। ভুগড়ার দেয়ালে থেপে থেপে ঘুঁটে বানাবে।

আধ-পাছিয়া গোবর নিয়ে এতক্ষণ সে বসেছিল গোঠটাঁড়ের মাঠের ধারে। তার মা গিয়েছিল হাটুয়াপাড়ায়, দুজনে এই আসছে। দোরখুলির মাহাতোদের বুলান থেকে ডিগবাজি খেয়ে দু'ভাঁজ হয়ে বেনাবুদা কেঁদবুদা কুলবুদার টাঁড়টিকর পেরিয়ে যে-রাস্তা, সে-রাস্তায় জঙ্গলে না সেঁধিয়ে তারা ঘরের পথ ধরেছে।

দাঁতনকাঠি, শালদাঁতন-রামদাঁতন, আর শালপাতা ছিঁড়তে জঙ্গলে গিয়েছিল ভুবনার বউ ফুলটুসি, আর আর লোধানীদের সঙ্গে, মেয়েকে ইস্কুলের সেই পথ দেখিয়ে, সেই দুপহরের আগে আগে। সঙ্গে শত্রুঘ্নশবরের বউ নিয়তিশবরও ছিল, যার সাফা ছেলে ফুলেশ্বর।

জঙ্গল থেকে লোধানীরা সোজা গিয়েছিল দোরখুলির মাহাতোপাড়ায়। দাঁতনকাঠি-শালপাতা গছাতে।

অত সহজে কী আর নেয়? হাতে-পায়ে ধরতে হয়, ঢঙের কথাবার্তা বলতে হয়। দু-চাট্টা পাতা কাঠিখুঁচি ফাউ দিতে হয়, ফাউ।

এক তব্বে যদি বাবুদের মন ভিজে, বিবি-বহুদের মন পাওয়া যায়।

ফুলটুসি, আর নিয়তিরা এই ফিরছে। ত্রিলোচন আর সুরথদের বাঁশঝাড় উঁচিয়ে, আঁটারি-চুরচুর ঝুঁজকো জঙ্গল পেরিয়ে, খিরিশতলা ছাড়িয়ে কয়েৎ বেলগাছের চারপাশে যেই পাক খাচ্ছে ফুলটুসি, অমনি তার ঘুপচী থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল ছোটমেয়ে মনকু, একদম ন্যাঙটাভুটুঙ। হ্যাৎ করে ঝাঁপুড়ু-ঝুপুড় কয়েতবেলের গাছ থেকেও একজন নামল, একদম ন্যাঙটাভুটুঙ।

তিনজনে হাঁটছে, আগে-পিছে দুজন মাঝে ফুলটুসি। কোত্থেকে একটা হ্যাল্-হ্যাল্ কুকুরও জুটে গেল। কুকুর, কালো ভুস ভুসে। এখন চারজনে হাঁটছে। চারজন, চারজন।

বউ ফিরুক আর নাই ফিরুক শতুরাশবরকে বেরুতেই হবে, ধান্দায়। আর তা এখনই।

শতুরাশবরের ভুগড়া-ঘরের পিছনে দুটি তালগাছ আছে, আর সে-দুটি গাছ শরাবণ-ভাদরে লোধাপাড়ায় যে কী মহার্ঘ হয়ে উঠে, তা লদ্ধা জন-মাড়ষ ছাড়া আর কে জানবে? আর কে বুঝবে?

শতুরা-শতুরার বউ ভুগড়ার পিছনে রাতভিত গাছ দুটোর দিকে হাঁ করে বসে থাকে। কখন পড়ে, কখন পড়ে। ঝিরি ঝিরি বাতাসে ফর ফর করে তালচটির বাসা দোলে, তায় বাঘযুগ্নী পোকা মিচিক-মিচিক আলো দেয়।

সাফা-ছুয়া ফুলেশ্বরকে 'ভাঙনী' বলতে বলতে কখন শতুরাশবর বউ নিয়তিকেও ধাঁধাঁ দিয়ে বসে—

উপোরনু পড়ল দুম্।
দুম্ বলে মোর পঁদ সুঙ॥

বল্ লদ্ধানী, লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা, কী বঠে কী বঠে?

গিল্ গিল্ করে হেসেই মরে, হেসেই মরে নিয়তি, তারপর দু'হাতে তালি বাজিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো বলে ওঠে, পাকা তাড় পাকা তাড়।

তা, সেই পাকা তালের মরসুমটা গত হয়েছে। আচমকা ঝড়ে তালচটিদের বাসাটাও ছিন্নছাতুর। খালি যা বাঘযুগনী পোকাদের কিছু হয়নি। তারা দ্বিগুন, তিনগুন আলো জ্বেলে গাছ দুটোর আশপাশে এখনও ঘুরে বেড়ায়।

জোড়াতালগাছের মাঝখান দিয়ে কালো কুচকুচে শতুরাশবর গলে গেল ভুচুঙ করে। বেগুনাঝাড় লালভেঁড়বার বাদাড় পেরিয়ে সে বুলানে নেমে যাচ্ছে।

বুলান থেকে উঠে আসছে নিয়তি, নাদনগাড়িয়ার মেয়ে। মাথায় আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাল, নয়ত ফপ্‌রা মুড়িই হবে।

একজন যাচ্ছে, একজন আসছে। দুজন, দু'জন।

মাঝরাস্তায় দেখা হতেই 'একজন' হয়ে গেল। একজন, একজন। শালপাতার চুটা টানছিল শতুরা, চুটাটা বেগুনাঝাড়ে ছুঁড়ে দিল।

শিশুবালা ঘর-বাহির করছে। ধান্দায় বেরিয়ে রাইবু এখনও আসে নি।

তিলকমাটি হুড়ির উপরিস্থিত ডুংরি, ডুংরির ভিতর মরণ-চুঁয়া, মরণচুঁয়া থেকে বেরিয়ে ফাঁকা টাঁড়-টিকর, ফিরতি পথে সীতানালা খালপাড় বরাবর পুবে আর পুবে, কুম্হারপাড়া, কুম্হারপাড়ার কুল্হিরাস্তা ভেঙে মাঝুডুবকা, মাঝুডুবকা থেকে ঠাকুরবাঁধের বাঁধগোড়া, জল, ছপ্ ছপ্ জল পেরিয়ে জোড়াধতলা শালতলা ছুঁয়ে পড়ে আছে যে পথ, সে-পথ এখন ফাঁকা, ফাঁকাই। রাইবু আসে নি।

গোবর-নিকানো গুড়কুঁদালোধার 'খলায়' খেজুরপাতার চাটাই পেতে দুজন শুয়েছিল। দুটি মেয়ে ভুটকী আর গুরুবারি। চারহাতি গামছায় যতটা শরীর ঢাকা যায়, ঢেকে।

পায়ের উপর পা মুড়ে গুরুবারি, তাও, তাও তার 'পোষ্টাপিস' দেখা যাচ্ছে। ঝিরি ঝিরি হাওয়া বইছে।

মুখের উপর অঝোরঝর আকাশ, ইঝল-বিঝল তারা। তাল্খুড়রুর জঙ্গলে চাঁদ কী উঠল? সাতভায়া, দধিভারিয়া? সব ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে—

সরগেই দুটি তারা ভাঁসে ভাঁসে যায়
ঢঙ্গী নামল জলে।
এক থালা গুলাজফুল ভাঁসে ভাঁসে যায়
ঢঙ্গী নামল জলে।
অগাধ দরিয়ার মইদ্যে ভাসিল জলে
ঢঙ্গী নামল জলে।
সিঙ্ মাছে বিঁধে দিল নাকের পাশে
তোর বল্ গো কিসে।।

শত্রুঘ্নলোধা গেল আর ভুগড়ার আগড় বন্ধ করে দিল নিয়তি। চরাচরে রাত বাড়ছে। কোথাও রাতচরা ডাকল, টি-ট্রিঙে টি-ট্রি-ঙে! রি-রি-য়াঁ পোকাও ডাকছে, ঝিঁ-রিঁ-ই-ই-ই রিঁ-রিঁ-ই-ই-ই-ই!

ফুলেশ্বর ঘুমোচ্ছে, তার বাপ শতুরাই খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেল। ঘুমে সে কাদা এখন। সারাদিন বিলে-বুলানে চ্যাঙ-গোড়ুই-লুল্হিমাছ-ধানাহুলুমাছ ধরে বেড়ায়। ধরতে কী আর পারে সে? ঐ ধরি ধরি, ছুঁই পানি, পানিতেই ডাবাক-ডুবুক—

লম্প জ্বলছে, টিনের 'ডিভা', আগুনের শিষের থেকে আগুনের ফুড়গুনিই বেশি। খালভরা বক্কা তেলে নির্ঘাত জল মেশায়, দোরখুলির বুলানের জল, হদহদির জল।

লোধাপাড়ার কুল্হিরাস্তায় কারা যেন হুড়ুম-দুড়ুম হেঁটে চলেছে। অ-জায়গায় পা ফেলছে, পা টলছে। বোতল বোতল ভাকু, জাম জাম পাঁচু গিলেছে মানুষগুলো। এখন, লোধাবস্তিতে রাতকানা জামাই শ্বশুরঘর খুঁজছে? খুঁজ রে পিসার শালা, মায়ের বহনাই, কত খুঁজবি, খুঁজ!

বাঁশের আগড়টায় বেশটি করে পাথরের শিল চাপা দিয়ে, সেই শিলের উপর দু'পা ঠেস মেরে, আলো নিভিয়ে নমথম শুয়ে পড়ল নিয়তি। নাদনগাড়িয়ায় সে এখন খলা-খামারেই তারা ভরা মেঘপাতালের নিচেয় শুয়ে থাকত।

ফুলেশ্বর নাক ডাকাচ্ছে, তার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভরে আছে সারা ঘর, তাছাড়া আর কেউ নেই। কোথেকে একটা বাঘ-যুগনী পোকা ঢুকে পড়ল। পোকাটা জ্বলছে নিভছে। তার জ্বলা-নেভা দেখতে দেখতেই নিয়তি ঘুমিয়ে পড়ল।

নিয়তি ঘুমিয়ে পড়েছে, মাঝরাতে দরজায় ঠক ঠক—

কে?

নিয়তি ঘুমের ঘোরেই শিল সরিয়ে ভুগড়ার আগড় খুলে ফের বিছানায় যেতে যেতে বলল, অ তুমি? এত জলদি ঘুরে আইলে যে?

হঁ।

কাজ-কাম হয়ে গেল?

হঁ।

ঘুম পাচ্ছিল নিয়তির, হাই তুলতে তুলতে সে ফের ঘুমিয়ে পড়ল। তাঁর পাশেই শুয়ে পড়ল শতুরাও।

উসুর ফুসুর করছে শতুরা, ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে নিয়তির মনে হল, শতুরা তার শরীরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে, সে মুনুর বাপ, এই ত হৈল সাঁঝবেলা!

ভোর রাতে ফের দরজায় ঠক ঠক—

কে?

আমি শতুরা।

নিয়তি ঘুমের ঘোরেই আগড় খুলে শতুরাকে দেখে চমকে উঠে ফের বিছানায় দৌড়ে গিয়ে দেখল, আগের শতুরা এই এক চাঁখর একটা ঝুরকার ভিতর দিয়ে রুম রুম বেরিয়ে যাচ্ছে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে নিয়তি ধরতে গেল, দেখল, তার সারা গা রোঁয়া রোঁয়া—

এতক্ষণে কুমহারপাড়া হয়ে মাঝুড়ুব্‌কা, মাঝুড়ুবকার জঙ্গল ভেদ করে ঠাকুরবাঁধ, বাঁধগোড়া হয়ে জোড়া ধ'তলা-শালতলার পথটা আর ফাঁকা নেই, রাইবু ফিরে আসছে।

আজ সারাদিন পথটা বেঁকেচুরে ভেঙে যাচ্ছিল। ভাঙছিল, আর ভাঙছিল। এক ঢোঁক সীতানালার পায়রা-চঁচরা জল, শুধু ঐ খেয়েই রাইবু এধার ওধার বাউলার তুল্য ঘুরে বেড়ালো।

একফাঁকে গাছের কোটরে রাখা চোরাই বন্দুকটার কাছেও গিয়েছিল। গাছের কোটরে বন্দুকটা আছে বটে, তবে ছর্‌রা নেই, ছিলও না।

ধুস্‌, যথাস্থানে বন্দুকটা রেখে দিয়েছিল রাইবু, একটার বিহনে আরেকটা অচল, কাজ নাই তোমার উর'ম অস্তরে!

তারপর বনে-বাদাড়ে ঘুরল, কী ঘোরা, আশ্রমে গেল, সাধুবাবা আজ আর নেই, নিগমা মন্দির খাঁ খাঁ টাঙ টাঙ, সীতাধুনির আগুন নিভে গেছে কবেই!

শুকনা পাতাপতর আর আবর্জনায় আশ্রম বুজে আছে, তার উপর দিয়ে হেঁটে রাইবু 'ভোগঘরে।'

চারিভিতে খোলা, দরজার পাল্লা দুটো হাঁসকল সুদ্ধ খুলে নিয়ে গেছে কেউ।

মহুলকাঠের চৌকাঠ, পাল্লাসমেত তিনশ' টাকার সোজা হিসাব—আহ্লাদে আপনার কাঁধে বয়ে বেচে দিয়েছে কেউ, রাইবু ধরে নিল।

খালধার থেকে শুশনিশাক এনে সোমবারি সাধুবাবাকে দিত, সাধুবাবা খাওয়াতো ক্ষীরিভোগ, রাইবুও কতদিন খেয়েছে।

উর'ম অত ভাল মানুষটাও জঙ্গল থিক্যে চলে গেল, কির'ম লাগে নাই? লাগেই ত।

আপনার মনে বলতে বলতে রাইবু জঙ্গলে বিলি কেটে কেটে ফের লোধাপাড়ার কাছাকাছি এলে একটা ঢাউশ চাঁদ রাইবুর সাথী হল।

তুমো হাঁট-অ। কোদালকাটা মেঘে গড়াও, পিছলে যাও দেখি।

চাঁদমণি খালি হাসে।

আমার বলে মন ভাল নাই, আর তুমি হাসছ?

চাঁদমণি দ্বিগুণ হেসে ওঠে।

বিরক্তিতে গা গুলোয় রাইবুর, আক্রোশে বলে, আজ তুমাকে বিঁধে লিব্ব-অ!

যেন চর্তুগুণ হেসে উঠছে চাঁদ।

রাইবু দৌড়ুল, চাঁদও দৌড়ুচ্ছে। চাঁদে-মানুষে শত্রুতা? খলখলে চাঁদের আলোয় রাইবু ডুবল।

ডুব গেলে উঠতেই চারধারে ধবো জোছনা, তার ঘুপচীর চালে ঢেউ খেলানো টিনের পাতগুলো ঝিলিক দিচ্ছে।

চোখ চেয়ে দেখল খানিক রাইবু, তারপর নিজের ঘরে চোরের মতো ঢুঁড়ে অস্তরপাতি নিয়ে উঠেও গেল টু'য়ে, ঘুপচীর মুধূর্ন্য-এ।

ধীরেসুস্থে টিনের পাল্লাগুলো খুলবে, তারপর হেঁটে গোঠটাঁড় মাঠ ভেঙে লবকেশরপুর গ্রামে যাবে। মনাসাউয়ের বাড়িতে ছটা টিনপাল্লার বরাত, দরদাম করাই আছে।



খুব মুষড়ে পড়েছিল আদিত্য। উপেনবাবুর কথামতো উপেনবাবুরই ঠিক করে দেওয়া লোককে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে, জঙ্গলের ভিতরে একেবারে লোধাপাড়ায় দুস্তরমতো একটা অভিযান চালিয়েছিল সে। কত শখ আধুনিকা 'সবরী বালী'দের একবারটি চোখের দেখা দেখবে, নেবে 'ইন্টারভিউ' আর সেইদিনই কী না সাঁওতালদের মেয়েটা 'রেপ্‌ড্' হয়ে গেল জঙ্গলে? আর তারপরেই তো কাটাকাটি খুনোখুনি—

জঙ্গল, জঙ্গল।

রীতিমতো ভয়ই পেয়েছিল আদিত্য, আর যাবে না আর ঢুকবে না জঙ্গলে, জঙলী মানুষদের ডেরায়, ঝাড়খণ্ডে।

ঝাড় অর্থাৎ বন, খণ্ড অর্থে ভূমি।

রাঢ় বা লাল ভূমিতে দণ্ডায়মান বিরাট বিরাট বৃক্ষ, গাছ। এখনও আছে, তবে সব মাথা-কাটা মাথা-ছাঁটা, নুড়ো, হেলে পড়া। তার মধ্যেও এককেটা, গ্র্যান্টসাহেবের বটগাছের মতো, দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থানের প্রাচীন বটগাছটার মতো।

আছে, আছে।

আর সে-সমস্ত গাছের কাছে আজও দাঁড়ালে, 'আরণ্যক'য়েই তো আছে—

"...সেই অপরাহ্নের ছায়ায় পাহাড়ের উপর সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্ব্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছনদিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্য্যায়ে পড়িয়া যায়।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মতো অনার্য্য-আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছে..ভারতের পরবর্ত্তী যা কিছু ইতিহাস-এই আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই— কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থি-কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্য্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্য্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না..."

ক'বছর জঙ্গলে না ঢুকে বইয়ের পাতাতেই অভিযান চালিয়েছে আদিত্য।

আর তাকে মাঝে মাঝেই উস্‌কে দিয়েছে উপেন কমপাউন্ডার।

'অসুর হুড়া'র নাম শুনেছ মাষ্টার?

না।

আছে অসুরহুড়া, এই সুবর্ণরেখার পাড়েই। 'অসুরগড়ে' যাও একদিন, সরেজমিনে দেখে আসবে।

কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝুলিয়ে বড়খাঁকড়ি হাইস্কুলের বাঙলার স্যার একদিন অসুরগড়েও ঘুরে এসেছে। এখন আর নেই কিছু, টাঁড়-টিকরে খালি যা বড় বড় ঢিবি।

বন-আসুরিয়া? বনকাটি?

তাও তো ঘোরা হল, দেখা হল।

তাড়কারাক্ষসীর হাড় দেখেছ? দেখেছ মাষ্টার?

না, এখনও দেখা হয়নি, আর জঙ্গলে এখন-এখনই যেতেও চাইনি, ডাক্তার।

তবে পাটনা যাও, হাজারিবাগ। অসুররাজ জরাসন্ধের বাড়িটা দেখে এসো।

খালি অসুর, অসুর—

হাঁ, এতকথা এইজন্যে যে, শবররাই সেই অসুর কী না।

রোগীকে মিক্সচার দিতে দিতে উপেন কম্পাউন্ডার কম্পাউন্ডারী ব্যস্ততায় এতকথা বলল যদি, আদিত্যস্যার স্কুল-হোস্টেলে ফিরে রাত জেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকল বইয়েব উপর।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছে, অঙ্গিরস গোত্রের অজীগর্ত তার পুত্র শুনঃশেপকে মাত্র তিনশ গাভীর বদলে বরুণদেবের বলিরূপে বিক্রি করে দেন। বিশ্বামিত্র সেই শুনঃশেপকে বলি থেকে উদ্ধার করেন এবং তাঁর শতপুত্রের আগে প্রথমপুত্র হিসাবে স্থান দেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রেব আসল পুত্ররা শুনঃশেপকে স্বীকারই করেননি। রাগী বিশ্বামিত্র তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রদের এই বলে অভিশাপ দেন যে, তাদের বংশধররা হবে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মুতিব, দস্যু ও 'অন্তবর্ণের'।

শবর-এর নিচেয় আন্ডারলাইন করে রাখল আদিত্য। ও, তাহলে এভাবেই শবর? তবে যে 'অসুর'—

অসুর, অসুর।

ঋক্‌বেদে আছে, বৈশ্বানরের উপাসকরা মাঝে মাঝে কালো মানুষদের বস্তিতে আগুন ধরাতেন, কালো চামড়ার মানুষগুলো বিনাযুদ্ধে ঘরদোর ছেড়ে পালিয়ে যেত, ইন্দ্র ঐসব 'অসুর'দের ধরে ধরে তাদের কালো চামড়া ছিঁড়ে ফেলতেন।

কালো চামড়ার মানুষ বলেই কী 'অসুর'?

হতে পারে, কত কী হতে পারে। 'অমর কোষ'-এ তো শবরদের 'ম্লেচ্ছ'ও বলা হয়েছে।

আর অথর্ববেদে আছে কালো চামড়ার দাসীদের কথা। তারা কুটনো কুটে, শিল-নোড়ায বাটনা বাটে, তাদের হাত থাকে সবসময় ভিজে সপ্ সপে, জল-হাত। আর গোবর থেপে থেপে তারা ঘুঁটেও দেয়।

অর্থববেদের আমলেও ঘুঁটে দেওয়া? খুব ইন্টারেস্টিং তো!

আদিত্যমাষ্টার পাতার পর পাতা উল্টে যায়। বড়খাঁকড়ি হাইইস্কুলের ছাত্রাবাসের ঘণ্টা পড়ে। রাত বাড়ে, বাড়তে থাকে।

উপেন কমপাউন্ডারের ডিস্‌পেনসারির আলো জ্বলতে থাকলে, খেয়েদেয়ে আদিত্য সেখানে যায়।

জোর আলোচনা হয়, তর্ক-বিতর্ক।

তারপরেও হাতে সময় থাকলে, আকাশে চাঁদের আলো থাকলে, বাতাসে ফুরফুরে হাওয়া থাকলে, চটিপায়ে ফটর ফটর আওয়াজ তুলে আদিত্য বেড়াতেও যায়।

কুসমী, গড়কাটা, ডুলুং, একটু দূরে সুবর্ণরেখা। যেন কোন্ প্রাগইতিহাসের সরস্বতী আর দৃষদ্বতী, যার তীরে তীরে আভীর, দরদ, তুখার, পহ্লু, কালতোয়ক, অপরান্ত, দ্রাবিড়, পুলিন্দ, শবরদের বাস, শূদ্রদের বাস। যেন কোন্ ব্রহ্মাবর্ত।

গড়কাটা, ডুলুং-এর দিকে যেতে হলে হাতিবান্দির ডোমপাড়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। এত রাতে কোনো ঘরে লম্পো-ডিভার শিষটুকুও নেই, কোনো ঘরে থাকলেও সেটুকু তৈলাভাবে নিভু নিভু।

জোছ্নারাতে উঠোনে ঝপ্ করে দাঁড়িয়ে উঠে কোনো ডোম্নী ডানহাত খোঁপার পিছনে রেখে, বাঁ হাতের চেটো ডানহাতের মুঠোয় ধরে, টান দিয়ে, মস্ত হাই তুলে আড় ভাঙছে। কাচের চুড়ির রিন্‌ঠিন্। এরা দুহাতে লালনীল এত কাচের চুড়ি পরে! এদের পুরুষগুলো কষ্‌টে লুঙ্গি আর মেয়েরা সোডায় কাচা সাফা শাড়ি পরে।

আদিত্যর মনে পড়ে—

"নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া"—

গ্রামের বাইরে বাইরেই এরা বাস করে আসছে সেই কোন্ নবপলীয় মধ্যপলীয় প্রত্নপলীয় যুগ থেকে! যাদের ছোঁয়া লাগলে ব্রাহ্মণদের কাঁসার থালাও হয়ে যেত অপবিত্র।

গ্রামে ঢুকতে হলে ডোম-ডোম্বীদের গ্রামের মাথায় দাঁড়িয়ে প্রথমে কাঠ পিটিয়ে বিকট আওয়াজ করতে হত, জানান দিতে হত, আমরা আসছি, আসছি। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচাতে লোকজন তড়িঘড়ি সতর্ক হয়ে যেত।

ছুটির দিনে, সকাল-বিকাল, আদিত্য ঝোলা কাঁধে ইস্কুলের আশপাশের গ্রামগুলোয়, ভূমিজ-পাড়ায় বাউরীপাড়ায়, কারোর ঘরের উঠোনে পাতা চাটাইয়ে দড়িরখাটিয়ায় বসে 'নোট' নেয়। তেষ্টা পেলে বড়জোর একগ্লাস জল চেয়ে খায়।

উঁচু ক্লাসের চেনা স্টুডেন্ট স্যারকে দেখতে পেলে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে লজ্জায় আড়াল-আবডালে, টাঁড়-কলমি কী বেগুনাঝাড়ের ছায়ায় ছায়ায় সুট্ করে সরে পড়ে।

কিছুদূর এগিয়ে, নির্ভয়ে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বলে, জানিস?

কী?

আদিত্যস্যার 'থিসিস্' লিখছে।

কী থিসিস্?

যা লিখলে 'ডক্টরেট' পাওয়া যায়। নামের আগে "ড ফুলস্টপ্" লিখতে পারবি। ড. আদিত্য সেনগুপ্ত। কম খাতির নাকি!

সত্যি সত্যিই আদিত্য ঠোঁটে কলম ঠেকিয়ে হয়ত সেসময় ভাবছে, নিয়ান-ডার্থাল, নিয়ানডার্থালের পরে ক্রো-ম্যাগন্, তারও আগে নরাকার এপ্, নরাকার এপ্ হল অস্ট্রোলোপিথেকাস, রামাপিথেকাস, শিবাপিথেকাস—

হাটবারে লোক মারফৎ রাইবুকে হাট থেকে ডেকে এনে উপেন কম্পাউন্ডার জিজ্ঞাসা করল, আজ কী এনেছিস?

ডিস্‌পেনসারিতে তখন আদিত্য বসা।

আগে একঘটি জল খাওয়াও ডাগতর। সিমেন্টের মেঝেয় রাইবু থেপে বসল।

কম্পাউন্ডারের শাড়িপরা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে একঘটি জল দিয়ে গেল।

ঢক ঢক করে জল খেতে খেতেই রাইবু বুঝে গিয়েছিল, ইবার রগড় হবে, তাই পাশে

বসা মাষ্টারবাবুকে বলল, একটা সিগ্‌রেট দে ত?

একগাল হেসে আদিত্য একটা সিগারেট দিল। উইল্‌স্।

নিজের 'মাচিস কাঠি'ও খরচ করল না রাইবু। বলল, দে ধরাঁয় দে।

আপনার মনে অন্তর্গত হয়ে ফুক ফুক করে সিগারেট টানছে সে, আজ যেন কেমন অন্যমনস্ক সে।

উপেন কম্পাউন্ডারের ফের তাগিদা, কই বললি না তো—আজ কী এনেছিস?

ডাগতরবাবু কী বনকুদড়ি-বনকাঁকড়ো ছাতু-মাতু, এসব কিছু চাইছে?

সঙ্কুচিত হয়ে রাইবু বলল, নাই, আজ কিছু মিলে নাই, খালি একভার চেলাকাঠ।

বেচে দিয়েছিস?

হুঁ, থাকলে কী তুম্‌হি লিতে ডাগতর?

আরে না না, তোকে এম্নি জিজ্ঞাসা করছি। শুন, আদিত্য কী জানতে চাইছে, জবাব দে।

না, আমি কী আর জানতে চাইব, বলেও আদিত্য বলল, তোমরা বিশ্বামিত্র মুনির ছেলের বংশধর, সেকথা কী জানো?

নাই জানি।

তোমরা কী 'অসুর'?

নাই জানি।

'পর্ণশবরী' বলে তোমাদের কোনো ঠাকুর আছে?

নাই জানি।

'ফুদিচন্দ্র' নামে তোমাদের কোনো রাজা ছিল?

রাজার কথায় একটু যেন নড়েচড়ে বসল রাইবু, তারপর যথারীতি বলল, নাই জানি।

'নন্দিনী' নামে মুনি বশিষ্ঠের একটা কামধেনু ছিল। সেই কামধেনুকে বিশ্বামিত্র মুনি হরণ কবে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বশিষ্ঠের আশীর্ব্বাদে কামধেনু নন্দিনী তখন নিজেকে বাঁচাতে তার যোনি থেকে যবন, মুখের লালা থেকে পুলিন্দ, আর গোবর থেকে শবরদের জন্ম দেন—

এ-গপ্পোটা কী জানো?

নাই জানি।

কী-ই তখন থেকে 'নাই জানি' 'নাই জানি' কবে চলেছিস? উপেন কম্পাউন্ডার ধমক দিয়ে বলল, আজ তোর মন পড়ে আছে কোন দিকে রাইবু?

হাঁ, তা মন একটু পড়ে আছে বৈকি হাটের দিকে, বাটের দিকে। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকেই সেদিকে তাকাচ্ছিল রাইবু।

হাঁড়ি-ভার নিয়ে হাটে এসেছে সন্তোষকুঁভার, বন-ডুব্‌কা টুঁড়ে টুঁড়ে হাটে এসেছে সাবিত্রীও। সাবিত্রী এখন সন্তোষকুঁভারের গামছাটা কাঁধে জড়িয়ে সন্তোষের গা ঘেঁষেই বসে আছে।

সন্তোষ হাঁড়ি বেচছে।

যেন দু'জনে মাগ-ভাতার, সেদিকে আরেকবার তাকিয়ে রাইবু আপনার মনে বলল, শাল্লা!

কী বলব? উসব কী আমি জানি ডাগতরবাবু, সে-এক জানতে পারে বড়সোলের গজনা।

গজনা কে? আদিত্যের জিজ্ঞসা।

বিব্রত হল রাইবু? তাই তো গজনা কে, তারপর শুধুমুদুই বলল, হামার মামাশ্বশুর বঠে।

তোমরা কী ক্ষত্রিয়?

প্রায় রেগে উঠল রাইবু, কী-ই তখন থিক্যে ক্ষত্তিয়-মত্তিয় করে চলেচিস? ক্ষত্তিয় কেনে হব, আমরা বেরাম্ভণের থিক্যেও বড়।

উপেন আদিত্য দুজনেই হেসে উঠল।

পুরাণ শাস্ত্রে, বিশেষ করে মৎস্য আর বায়ুপুরাণে তোমাদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। পুলিন্দ, চণ্ডাল, বাগুরিকদের সঙ্গে 'সিকিউরিটি ফোর্স' হিসাবে তোমাদেরও রাখা হত। কম কথা কী?

রাইবু কিছু বুঝল না, বলল, উসব শাস্তরের পেঁদ ছাড় বাবু, আমরা যা জানি ঠিকেই জানি, হাবিজাবি বলে আমাদের ভুলাস নাই।

বেশ, ব্রাহ্মণের থেকেও বড় যে, তোদের পৈতে কোথায়?

উপেন কম্পাউন্ডারের কথায় সহসা যেন পৈতে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রাইবু। খালি গায়ে পিঠে দুয়েকবার হাতও বুলালো।

বলল, ছিল, বেরাম্ভণের থিক্যেও বড় পৈতা ছিল। কিন্তু থাকলে কী হবে, বোকার জাইত্ ত, রাখতে পারল নাই, শিবঠাকুরের দেয়া হালের গরুটাকে সেগুনপাল্হায় কেটে খেয়ে ফেলল, আর সেই থিক্যে—

বাপ গেড়াশবরের মুখে শোনা নিজের জাতের গল্পটা ডাগতরবাবু আর মাষ্টারবাবুকে শুনিয়ে দিল রাইবু। দিতে পেরে তার মুখেও বেশ একটা সুখ সুখ ভাব।

শোনা কথা, পুরুলিয়ার খেড়িয়াশবরদের জন্ম নাকি ময়ূরীর ডিম থেকে, তোদের জন্ম কিসের ডিম থেকে রাইবু?

নাই জানি, ডাগতর।

বলেই উঠে পড়ল রাইবু।

আরে বোস্ বোস্, আরেকটা সিগারেট খা, দাও আদিত্য আরেকটা সিগারেট দাও।

সিগারেটের কতক খেল আর কতক কানে গুঁজে রেখে দিল রাইবু! পরব আসছে, বাঁদনা পরব, তখন না হয় জুত্ করে খাবে, থাক।

কথাটা উপেন কম্পাউন্ডারই পাড়ল।—জানিস তো বাবুলোক বড়খাঁকড়ি হাই-স্কুলের মাষ্টার। খুব বড় পণ্ডিত। তোদের বস্তিতে যেতে চায়, সরেজমিন দেখতে, একদিন নিয়ে যাস তো?

আগের একবাব যাওয়ার কথা ইচ্ছে করেই চেপে গেল উপেন।

রাইবু তো হো হো করে হেসে ওঠে। ছোটছেলে ত নয়, ল্যাংড়া পংড়াও নয়, লুল্হাও নয়, জঙ্গলে যেতে চায় ত যাক না কে মানা করছে?

রাইবু মুখে বলল, হঁ চলুক ন, দিনের মইদ্যে পুলিশ ত দশবার যাচ্ছে উ না হয় একবার যাবে। মনে মন বলল, আন্‌কা কাউকে নিয়ে গেলেই হল? কার মনে কী আছে—দেখতে হবে না? ভাবতে হবে না?

বড়খাঁকড়ির হাট, বসে শুক্রবার। এমনি সময়ের যা হাট, কোনো কিছু পরবের আগে সে-হাট আড়ে-দীর্ঘে বিশাল হয়ে যায়। ভিড় গিজ গিজ করে।

সামনেই আসছে বড়পূজা ও বাঁদনাপরব, আসছে দাঁশায় আসছে সহরায়। হাট আজ বাড়তে বাড়তে বট-অশ্বত্থের ছায়ায় ছায়ায় হাতিবান্দির ডোমপাড়া ছুঁয়ে ফেলেছে।

যা কিছু কেনাকাটা, গোলআলু, নলিতাআলু, তেলে ছাঁকা পিঠের জন্য গুড়-তেল, মাংসের গরমমশলা, তালপটকা, কালীপটকা, ছুঁচি হাউই, মোম, শাড়িবেলাউজ, চুল বাঁধবার ফিতে, মাথার কাঁটা, সেফটিপিন—নদীপারের মানুষ সব তো এখান থেকেই সংগ্রহ করে।

আব ক্ষেতের বাইগন, জারা-বরবটি, কাঁচাঝাল-মরিচ, কুমড়া-কাঁকুড়, পুঁইডগা, কাল্লাকুঁদরী, নদী-পারে যা যা হয়—সবই তো এখানে উপুড় করে ঢেলে দেয়।

সন্তোষকুমার হাঁড়িভার এনেছে, হাঁড়ি বেচছে। তার গায়ে প্রায় ঠেস মেরে, ঠিসারা করে, হাঁড়ি-বেচা দেখছে সাবিত্রী। আর মস্ত অর্জুনগাছটার তলায় থুপ্ করে বসে, একপা ছড়িয়ে

একটা ভাঁজ করে, পায়ের ভাঁজে হাতের কনুই রেখে তাদের দুজনকেই দেখছে রাইবু।

কুম্‌হাররা কী ঝড়িয়া কী বর্ষা কী শীত কী গ্রীষ্ম এক হাঁড়িভার নিয়েই হাটে আসে, কুম্‌হারদের সুবিধা কত!

আর আমাদের, এই লদ্ধাদের, যতেক অসুবিধা। সময়ের জিনিস সময়ে যেটুকু পাওয়া যায়। বর্ষায় এক রকম তো গ্রীষ্মে আরেক রকম! কখনো কেঁদ-কুসুম ভেলা-ভুড়রু কুল-পিয়াল কুঁদড়ি-কাঁকড়ো মহুল-কচড়া, কখনো ছাতু, পুটকা-শালপড়া-কুড়কুড়িয়া-কাড়হান সাফা-ভণ্ডা হলদা-ভণ্ডা, কুরকুট, আর কখনো ঢ্যামনা-গোধি উন্দুর-বান্দর কী কাঁ্যাকলাস, কপতি-ক্যারকেটা।

তাও কী মনের মতো পাওয়া যায়? পরিমাণ মতো? আজকাল কুম্‌হার-কাম্‌হার ভুঁইয়া-ভূমিজ মাহাতো-মাহালীরাও তো বন ঢুঁড়ছে, বন ঢুঁড়ছে।

এই দ্যাখো, সে ত একরকম ভালই। সাবিত্রী যে সন্তোষকুঁভারের সঙ্গে ঘর বাঁধছে সে ত ভাল কথা, উপযুক্ত কথাই বটে। যা হোক মেয়েটা দুবেলা দুমুঠো খেতে পরতে পাবে।

চোখের সামনে সয়া-সয়ানীকে দেখছে না রাইবু?

তবে কেন চোখ টাটায় তার? না, মাত্‌বর বলে কথা, জাতের মাইয়া বেজাতের ঘরে ঢুকবে—সে কী নিজ-হাতে তুলে দেওয়া যায়? যেখানে ভক্তার সঙ্গে ভক্তার, মল্লিকের সঙ্গে মল্লিকের, কোটালের সঙ্গে কোটালেরই বেহা দেয়া কঠিন?

ধাঁই করে রাইবু অর্জুনতলা ছেড়ে গড়ের ওদিকটায় বাঁশতল্লিতে উঠে গিয়ে বসল। আজ আর কেউ আসেনি, গুরভা-শরাবণরা, না হয় তাদের নিয়ে একসঙ্গেই বসত।

এতক্ষণ সন্তুষ-সাবিত্তিরিদের পিছু-পাশ থেকে দেখছিল রাইবু, এবাব আগু-পাশ থেকেই দেখবে, দেখবে দুজনার রগড় কিত্তিকাণ্ড, আর দেখে গিয়ে বলবে তাদের সমাজকে, বাপকে, জট্টাদিদিকে, সাবিত্তিরি দেখে যদি ত দেখুক না।

ঢঙ ঢঙ করে একটা মাটির হাঁড়ি, উঁহু একটা 'তেলাই', বাজিয়ে এক খদ্দের জানতে চাইল, কত দর?

সন্তোষ না, সাবিত্রীই বলল, এক ট্যাকা চাইর আনা।

বারো আনায় হবে?

সন্তোষের সঙ্গে ইঙ্গিতে কীসব কথা বলল সাবিত্রী, তারপর মাথা নেড়ে অভিজ্ঞেব মতো বলল, দুআনা কম দও, তাবলে আটআনা কম!

আটআনা? আটআনা কমের কথা বলল সাবিত্রী? বারো আনা থেকে একটাকা চারআনা যে আটআনা কম, জানল কী করে সাবিত্রী? এত হিসাব তার মাথায় এলো কী করে, একটা পাগলী, একটা আড়-পাগলীর মাথায়?

রাইবু হাসবে না কাঁদবে? রাইবু থ হয়ে গেল যখন দেখল দুআনা কমেই তেলাইটা কিনে নিয়ে যাচ্ছে বাবুলোকটা।

আরো অবাক হল সে, পয়সাটা সন্তোষকে না দিয়ে নিজের 'গাঁজিয়া'তেই ভরে নিল সাবিত্রী।

রাইবুর দুম্ করে মনে পড়ে গেল সোমবারিকে? এক্ষেত্রে সোমবারি থাকলে কী করত? কী কী করত? কী যে করত সোমবারি, অনেক ভেবেচিন্তে অনেকবার কাটাকাটি করেও ঠিক করতে না পেরে সন্তোষ-সাবিত্রীদের ছামু থেকে ঝট্ করে সরে দাঁড়াল রাইবু।

না, এখনও তাকে দেখতে পায়নি সাবিত্রী।

হাট থেকে ফেরার পথে একটা ঢাউস চাঁদ আকাশে ঝুলিয়ে দিলেই হত, চাঁদের আলোয়

সবকিছুই দেখা যেত ফটফটে পরিষ্কার। কষ্ট করে আর তাদের বর্ণনাও দিতে হত না।

কিন্তু চাঁদ কী সবসময় সব রাতে ওঠে? সব প্রহরে দেখা যায়? বিশেষ করে যখন দিঙ্ দিঙ্ করে এগিয়ে আসছে বড়পুজা আর বাঁদনা? বাঁদনা পরবের 'অমাবইস্যা রাতি'?

একটা ভুল হল, মাঝখানে একটা পূর্ণিমা আছে বটে, লক্ষ্মীপূর্ণিমা।

বড়খাঁকড়ির হাট সেরে হাতিবান্দী পেরোলেই গড়কাটা, গড়কাটা খালধারে সেই বাজেশিমূল, বাজেশিমূল পেরিয়ে গড়ানে নেমে গেলেই ডুলুং নদী।

ডুলুং, ডুলুং।

সবে আশ্বিনের শেষ, কী ডুলুং কী সুবর্ণরেখায় জলের তল এখনও কোমরের তলঅবধি নামেনি। তাই এখনও ডিঙির ব্যবস্থা, নৌকার বন্দোবস্ত। ছোটনদী ডুলুং-এ মনা বিশোই তো বড় নদীতে হংসী বধুক।

আর কটা দিন যাক। কার্তিক ফুরিয়ে পড়ুক অগ্রহায়ণ। তখন দু'নদীতেই জলের তল নেমে দাঁড়াবে কোমরের নিচে, হাটুর তলায়। দাঁড়-কলমি কী টাঁড়-কলমির ডাল পুঁতে পুঁতে দেখানো হবে পায়ে হেঁটে নদী পারাপারের নিশানা।

নিশানা বরাবর হাঁটলে ভাল, আর নয়ত জল উঠে দাঁড়াবে বুক অবধি গলা অবধি। ভস্‌কা বালিতে পা যাবে বসে।

আর তখন জোছনা না হয়ে অন্ধকার হয যদি তো সুবিধা কত! যত পারো শাড়িটা উপরে তোলো, লুঙ্গিটা গোটাও।

জলে নামলে, অত বড় নদী হেলায় পার হয়ে এলে, তবু তোমার শাড়ি ভিজল না, ধুতিও না, অন্ধকারে কেউ কিছু দেখতেও পেল না।

কিন্তু এখন, এই আশ্বিনের শেষাশেষি কী কার্তিকের শুরুতে ডিঙি করে ডুলুং পেরিয়ে খুদুপাড়ের চরে উঠলেই অন্ধকার অন্ধকার। তার উপর যত্রতত্র কাঁটাকুলের ঝোপ, আকন্দ, ফণিমনসার ঝাড়। ছায়াঘন অন্ধকার অন্ধকার।

হলেও এ-অন্ধকারে আর তেমন সুবিধা কই? চরের উপর দিয়ে একটাই পথ, এ-পথ পেরিয়ে নদীবালিতে নামলে অজস্র পথ। যত খুশি যার যেমন ইচ্ছা, হাঁটো হাঁটো।

জোছনা নেই, তো কী? রাতের বেলাতেও বালি চিকচিক্! সে বালিতে যেমনি পা পড়বে, তেমনি পথেরও শুরু হবে। প্রথম পা, প্রথম পথ। সে-পথের তুমিই আবিষ্কারক, তুমিই পথপ্রদর্শক, তুমিই পথিক।

তারপর সব রাস্তা তো এসে মিলবে একঘাটে, নদীঘাটে নদীঘাটে। মিলতেই হবে, মিলতেই হবে। নচেৎ হংসী নাউড়ীয়া তো একেক জনের জন্য একেকটা নৌকা নিয়ে অজস্র হংসী হয়ে একাধিক ঘাটে হাজির হবে না।

তোমার যা কিছু তখন তার ইচ্ছায়, তার খেয়ালখুশিতে। দাঁড় বাইতে বললে দাঁড় বাও, হাল ধরতে বললে হাল ধরো, বাঁশ-গজাল দাও গিঁথে জলের তলঅব্দি।

হাটে কী এসেছে শুধু রাইবু? সন্তোষ-সাবিত্রীরা? হাটুয়া, মাহাতো, ভুঞা-ভূমিজরা কী আর আসেনি? ফেরার পথে নদীবালিতে যে যার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বালিয়াড়ীর এধার ওধার চারধার দিয়ে লোক হাঁটছে। বালি ভাঙার মস্‌মস্ আওয়াজ, মস্‌মস্।

কেউ ভারশূন্য, কেউবা খালি ভারের শিকা-বাইঁকটায় বেঁধে নিয়েছে দুচার আঁটি কলমি শাক। কেউ কেউ কাঁধের গামছায় নলিতাআলু কী এক-আধসের ধোয়ামুগের ডালের পুঁটুলি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে পিঠের উপর, ঘাড়ের দুধারে।

নদীবালিতে লোধাদের চোখ জ্বলে! জ্বলন্ত চোখে রাইবু খুঁজে বেড়াচ্ছিল—সাবিত্রী-সন্তোষ কোন্ জোড়াটা?

তারা কী সামনে, না পিছনে?

খুদুপাড়ের চরে কুলবুদার আড়ালে রাইবুর চোখকে ফাঁকি দিতেই তারা ঝপ করে বসে গেল কী? ঐ তো দুজন বসল।

পশ্চিমে ছাতিনাগাছের ওদিকটায় হাত ধরাধরি করে দুজন হেঁটে গেল। মাগ-ভাতার? সন্তুষ-সাবিত্তিরি কী?

কারা গীত গাইছে এসময় বাঁদনার? কাড়া খুঁটার? নির্ঘাত নুয়াসাহীর ভুমিজরা আর নয়ত রুখনীমারার মাহাতোরা। খুব যে ফুর্তি!

অহিরে—
কিয়া বরণ তরি আট-অ অঙ্গ রে
কিয়া বরণ তরি চারি পাঅ রে।
আর, কিয়া বরণ তরি দুই-অ শিং-অ যে বাবু হো,
কিয়া বরণ দুই-অ চোখ-অ।।

মেঘ-অ বরণ কাড়া, তরি আট-অ অঙ্গ রে
ঘাম-অ বরণ কাড়া, তরি চারি পাঅ রে।
আর কালিয়া বরণ কাড়া, তরি দুই-অ শিং-অ যে বাবু হো,
কাজল বরণ দুই-অ চোখ-অ।।

মন দিয়ে শুনল রাইবু, তাদের না আছে গরু, না আছে কাড়া, তবু বালি থেকে প্রায় দেড় হাত লাফিয়ে উঠে কুলকুলি মারল সে।

অমনি বালিয়াড়ীর চরাচর জুড়ে কুলকুলির রব উঠল। কেউ কেউ মাদলে তাল ঠুকার ভঙ্গিও করল—খিটি ধো, ধো ধো, খিটি ধো!

গানের ঠেলায় একটুর জন্য সন্তোষ-সাবিত্রীদের হারিয়ে ফেলেছিল রাইবু। আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করল। সন্তোষ-সাবিত্রীরা কী বড়খাঁকড়ির হাটেই হোটেলেই রয়ে গেল?

দোরখুলির লোধাবস্তিতে কখন ফিরবে সাবিত্রী? ফিরবে তো? না ফিরলে গুড়খা কী লম্পো হাতে বের হবে সাবিত্রীকে খুঁজতে?

খুঁজে খুঁজে নারি, রাতে না ফিরে শেষরাতে ফিরলে সাবিত্রীর চুলের মুঠি ধরে গুড়খা কী কিল মারবে দমাদ্দম সাবিত্রীর পিঠে?

মার্‌রিস নাই, বাড়ি বয়ে রাইবু বলতে গেলে গুড়খা কী তাকে অমান্য করে বলে বসবে, আমাদের ঘরের ব্যাপারে নাক গলাতে আস্‌সিস নাই মাত্‌বর?

গুড়খা কি বলবে?

বলতেও পারে। ঘাড়ের উপর একটা আদড়া যুবড়া মেয়ের দায় তো কম নয়। আর সে-দায় থেকে উদ্ধার পেতে, দাদাকে মুক্তি দিতে, বহিন যদি একটা অন্য জাইতের ছেলেকেও পটায়—

নিশ্চিন্ত গুড়খা, গুড়খা কি অমান্য করবে রাইবুকে?

করতেই পারে, এই যে এতবড় লোধা কাটাকুটি হল, মাতব্বর হয়ে সে কী করল? কী করেছে, একটা কিছু প্রতিবাদ?

না, প্রতিবাদ কোথাও কিছু করেনি রাইবু, করলে হয়ত তাকেও হাজতে পুরত গুড়গুড়িয়ার মতো, আর আর লোধাদের মতো।

যাদের পুরেছে, তারা কী কোনো প্রতিবাদ করেছে? নাই, সের'ম তো কিছু শুনি নাই। তারা

মূল আসামী হিসাবেই হাজত খাটছে!

অন্যমনস্ক রাইবু হঠাৎ হকচকিয়ে দেখল, এই ঝিলমিল অন্ধকারে কে যেন ভস্ ভস্ বালিতে বালি ছিটিয়ে দৌড়ে আসছে। বুঝিবা বেগ আছে, জলঘাট বসবে।

তা বস্ ন-অ, দৌড়াচ্ছিস কেনে, ধারে কাছেই বস্, দেখছে বা কে?

উঁহু, বসছে না। দৌড়াচ্ছে, লে দৌড়া, কত দৌড়াবি!

রাইবু খানিক থমকে দাঁড়াল, এই রে লোকটা যে তার দিকেই দৌড়ে আসছে!

এ-অবস্থায় যা করে, আগেও করেছে, রাইবু দৌড়াল।

দৌড় দৌড় দৌড়!

কিন্তু কতদূর ও' দৌড়াবে? বড়জোর লৌকাঘাটা, একটাই তো ঘাট মোটে।

নদীঘাটে এসে লোকটা বাইবুকে ধরে ফেলল।

আন্ধাব রাইতেও কী করে চিনলে মাজন?

হাঁপাতে হাঁপাতে লব্‌কিশোরপুরের মনা মহাজন বলল, কই আর চিনলাম রাইবু? তোকে যে চিনবে সে আছে এখনও মায়ের পেটে।

খুশি হয়ে রাইবু বলল, বলছ?

শুধু, আমি কেন, দুনিয়াসুদ্ধ লোক বলবে।

কী মতলব বল-অ ত, মাজন?

আমার একটাই কথা, দুটো দিলি, আর চাট্টা কবে দিবি রাইবু?

দিব-অ।

দে ভাইটি জলদি, আখুশাল শুরু হচ্ছে, ছাউনিতে লাগবে। না হয় দাম একটু বেশিই দেব।

তা না হয় দিলে, কিন্তু আমার যে কটাদিন দেরি হবে।

প্রায় ধমকে উঠল মনা মহাজন, কেন? দেরি কেন?

বাপের দিকের চালটা খুলতে পারছি নাই। বিবেকে লাগছে।

অ, বিবেক? আমি বলি কী না কী হাতি-ঘড়া।



হঁ আমরা পাঁচজন তোর ঘরে আইলম, গুড়খা।

বাইরে দাঁড়িয়ে রাইবু-গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা গলা খাঁকার দিল।

ঘুপচীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গুড়খা, তার পিছন পিছন গুড়খার বউ ঢালো।

হঁ বস-অ।

খেজুরপাতার চাটাই পেতে দিল গুড়খা, কিন্তু গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণরা তার আগেই মাটিতে বসে পড়েছিল, চাটাইটা খালি থাকল।

মাটিতে বসলে তাদের হাত স্থির থাকে না, সুল সুল করে। কাঠিখুঁচি খাপরাকুচি, জোগাড় করতে হয় না, এমনিতেই হাতে এসে যায়, আর তাই দিয়ে এরা মাটি আঁচড়ায়।

কথা বলে কম, মাটিতে রেখ্ কেটে যায় বেশি।

রেখ্ কাটতে কাটতেই রাইবু শুরু করল, গুড়খা, চুটা-উটা খাওয়াবি, ন উঠে যাব, বল?

কথা বোধহয় এরকম করেই শুরু করতে হয়। চুটা তো গুড়খা খাওয়াত, শুধু একটুখানি বসে শালপাতা আর মোতিহারি দোক্তাপাতা আনতে ঘরের ভিতর ঢুকে যাবার অপেক্ষা। অপেক্ষা।

তাও করতে হল না গুড়খাকে, গুড়খার বউ ঢালোই এনে দিল সবকিছু, শুধু আনল না আগুন। আজ তাদের অরন্ধন, চুলহা জ্বালানোর তাগিদ নেই, আগুনটুকুর জোগাড় করুক মরদরা।

দোক্তাপাতা আর শালপাতার জোগান পেয়ে যে যার চুটা, সে তার বানিয়ে নিল। গুড়খা নিজেও একটা চুটা বানিয়ে ট্যাঁক থেকে 'মাচ্‌িস' বের করে ধরিয়ে নিল।

প্রায় প্রত্যেকের ট্যাঁকেই 'মাচিস' গোঁজা থাকে। তবে আগুনের জুমড়া হলে বেশ হত, দোক্তাপাতাটা সেঁকে নিয়ে বেশ মুচমুচে করা যেত।

তা হয়ত হল না, তবে কেউ জুমড়াও চাইল না, দোক্তা দিয়েছে পাতা দিয়েছে, এই ঢে-র!

কী সব শুনছি, গুড়খা?

বিড়ি মুখে চোখ বুজে রাইবু।

কিসের কী?

ততোধিক 'উধাস' গুড়খা।

যেন অবাক হয়েই চোখ খুলল রাইবু, যেন কিছুটা রাগেই।

ইশারায় রাইবু গুরভাকে বলতে বলল, গুরভা দুয়েকবার গলা-খাঁকার দিয়ে পরিষ্কার হয়ে বিস্তারিত বললও।

তভক্ষণে আঙ্‌নায় এসে দাঁড়িয়েছে গুড়খার বউ ঢালো। তার ছোটছেলেটি, যে কী না একেবারে ন্যাংটাভুটুঙ, মায়ের পায়ের পাতার উপর দুপায়ের গোড়ালি রেখে পিছনে হাতমোড়া দিয়ে জড়িয়ে আছে মাকে, মায়ের পা দুটোকে।

সে ভাবছে বাড়িতে আজ কিছু একটা হবে, খাসি-কাটা। এত লোক যখন, হবেই। হবেই।

খাসি-কাটা না হোক, মা তাকে বলেছে, বাপ-মায়ের সঙ্গে আজ সে উন্দুর ধরতে যাবে। বড় উন্দুর তার চাই না, ছোট ছোট লাল লাল, এখনও চোখ ফুটেনি—এমন উন্দুরই তার চাই, অন্তত তিনটা। আর তা পেলেই সে মুখে ফেলে গিলে খাবে টুপুস করে। কাঁচায়।

সাবিত্রী চুলে-মুখে বিস্তর কাদা মেখেছে, ছুঁচমাটি। বড়পূজা আর বাঁদনা পরব আসছে। একমাত্র দাদার ভুগড়া-দেয়ালটা সে পরবের আগেই ছুঁচমাটি দিয়ে লেপে কুম্‌হারদের মতোই লতাপাতা এঁকে ভরিয়ে তুলবে। কদমঝাড়, শালুকনাড়া। চাই কী চির্‌কাআলুর একটা লত্‌ সে এঁকে ফেলবে।

এ সবকিছু তাকে তো করতেই হবে।

ছুঁটমাটি আনতে সে কোথায় না গিয়েছিল! বুলানে, হদহদিতে। জলাজমিতে ধানগাছের গর্ভে এখন থোড় আসছে, ধানশিষ বেরোলো বলে। এখন ধানগাছের গোড়ায় ঝিরঝিরি জল। বহন্তি। ধানঝাড়ের গোড়ার মাটির রঙ হয়েছে লাল, পিঙ্‌লা। চাপ চাপ রক্তের মতো। লালমাটি সরালেই কিন্তু পরিষ্কার ছুঁচ্‌মাটি, কেঁচো-মাটি, সাদা। তুলে এনে জলে্‌ গুলে দেয়ালে লেপে দিলেই বেশ! ফিন ফুটবে!

ভাঙা হাঁড়িতে, ফাটা হাঁড়িতে ভরে মাথায় করে আনতে গিয়ে মাটিজল অজস্র ধারায় গড়িয়ে সাবিত্রীর চুল বেয়ে চোখ-মুখ রাঙিয়ে দিয়েছে। চেনাই দায়।

এতক্ষণ ছুঁচ্‌মাটি গুলে ভুগড়ার দেওয়ালে লেপে যাচ্ছিল, আর লোকগুলো এল। কী জন্য এল লোধাপাড়ার মাত্‌বররা—সে তো সে-ছাড়া আর কে বেশি জানবে?

গুড়খাকে কেন, মাতব্বররা তো তাকেই জিজ্ঞাসা করতে পারে। সাবিত্রী মরীয়া।

ছুঁচ দিচ্ছে, আর তার বাহুমূল নড়ছে, একটু বেশি বেশিই নাড়াচ্ছে নাকি সাবিত্রী?

মন খুশিতে ভরা, ভয়ে তো নয়ই। তার উপর মাথায় একটু ছিট আছে, একা একা থাকলেও মাঝে মাঝে সে ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসে, এখনও হাসছে।

গুড়খা বলল, হঁ ত কী করব?

কী করব মানে? শরাবণ তড়পে উঠল, আমাদের জাতের ম্যায়া বেজাতের ছ্যাইলাকে বেহা করবে? আর তুম্‌হি দুহাত এক করে দিবে? মলা, দেশে আচার-বিচার নাই নাকি?

ধীরে শরাবণ, ধীরে। রাইবু তাকে থামায়, অত্ত চেঁচ্চাস কেনে, গুড়খা কী আমাদের পর নাকি? গুড়খাই বলুক।

এসময় গুড়খার বউ ঢালো বলল, পর কেনে, সম্পক্কে তুমার বহনই হয় আমাদের অরা। হয় কী নাই হয়?

সকলে হো হো করে হেসে উঠল, রাইবুও যেন দুবার মাথা নাড়ল।

লোধামেয়েমানুষ কথায় দড়, আর থোত্‌নায় ঠোনা মারলেও একটি বই দুটি কথা বলবে না লোদ্ধাপুরুষমানুষ! গুড়খা এম্নিতেই কথা বলে কম, আজ আরো যেন বেশি করে মুখে সে কুলুপ এঁটেছে।

নিজের বেলা আঁটিশুঁটি পরের বেলা দাঁতকপাটি, এই এক ধারার কথা আছে নাই? কি কথার কি অর্থ না বুঝেই, পর-আপন কথা যখন উঠল, গুড়খার বউ ঢালো এখানে ওই কথাটাই ঝেড়ে দিল।

বলল, আমাদের ইদিকে এই না হয় পর্‌থম, ঝাড়গাঁর উদিকে পুরুল্যার উদিকে ত শুনি ইর'ম আকছার হচ্ছে। হঁ কী নাই?

বলেই সে এক ফাঁকে কাদামাটিমাখা সাবিত্রীর দিকে একপলক তাকিয়ে থাকল। মুখপুড়ী দাঁত বের করে হাসছে। হাঁস লো, তোর এখন হাঁসার সময়, হাঁস।

কদিন আগে খাঁকড়ির হাট থেকে বউদির জন্য এক ঠোঙা ঝুরিভাজা এনে দিয়েছিল সাবিত্রী, কুরথিভাজা গুঁদলিভাজা জনারভাজা পর্যন্ত সে খেয়েছে, ঝুরিভাজা এই প্রথম চেখে দেখেছিল ঢালো, ব্বাসরে সোয়াদ কী, অদ্ভুতো!

এখন সাবিত্রীর দিকে দুটো কথা না বললে ভাল দেখায় না, বেইমানী করা হয়, তাই কথার পিঠে অতগুলো কথা বলল গুড়খার বউ ঢালো।

বলেই সে হাসি হাসি মুখ করল।

তার হাসিমুখ সহ্য হল না রাইবুর। আজকাল সে দেখছে, ভুবনাও বলত, আমাদের বউড়ী-ঝিউড়ীরা বাবুদের, বাবুদের বউদের রকমসকম দেখে বাব্বু হতে চায়, বিব্বি হতে চায়—

গুড়খা! রাইবু প্রায় গর্জন করে উঠল, কোথায় কী হচ্ছে, আর কী হচ্ছে নাই—আমাদের শুনাতে তোর বহুকে বারণ করে দিস। আমাদের সব জানা আছে, শুন্না আছে।

একটু বাদে আপাত নরম সুরে বলল, কথা হচ্ছে দরখুলির লদ্ধাপাড়া লিয়ে, লদ্ধাপাড়ার সমাজ লিয়ে, আর তা হচ্ছে লদ্ধাপাড়ার দু-পাঁচ্চজন মুখিয়া-মাত্‌বরদের সঙে, তোর বহুকে জান-বুঝ্ করে কথাটা বলতে বলিস, গুড়খা।

হঁ, তাই ত, বটেই ত।

বলেই এমন চোখ কটমট করে তাকাল বউয়ের দিকে গুড়খা, বউ সুড়সুড় করে ঢুকে গেল ঘরের ভিতর। তার ছেলেটা এখন পাতা চাটাইয়ের উপর ডিগবাজি খাচ্ছে, একবার এই খেলো তো এদিক থেকে, আরেকবার খাওয়ার উদ্‌যোগ করছে ওদিক থেকে।

এক মাত্‌বর উঠে গিয়ে তার ল্যাঙটাভুটুঙ পাছায় একটা থাপ্পড় মারল রসিকতা করে, থাপ্পড় মেরে উপর-টুলটুলি পা-দুখানাকে ডিগবাজির ভঙ্গিতেই উল্টে দিল।

ডিগবাজি খাওয়ার অদ্ভুত পদ্ধতিতে গুড়খার বেটা খুব খুশি, খুব হাসছে। তার উপর যখন এই ঝামেলার মধ্যেও সুলুক বলল লোকটা,

গাছটা ঝাঁপুড়া

ফলটা লাড়ুয়া
এ যে নাই বলতে পারে
তার বাপ গুড়খা।

—কী বল্ ত?

উত্তর যে 'কুল', কুলফল, সেকথা বলতে না পারুক, সুলুকের মধ্যে তার বাপের নামও জড়িয়ে দিয়েছে লোকটা, গুড়খার বেটা তাতেই হেসে গড়িয়ে পড়বে না?

পরিবেশ কিছুটা হালকা হচ্ছে দেখেই গুড়খা বলতে চেষ্টা করল, তুমরা ভদ্‌র-পাঁজ্জনা আমার আঙ্নায় হাজির হয়েছ, বিড়ি-তামুক খাচ্ছ, কিন্তুক কী বলব—আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি নাই—

কাঁদুল-মাদুল হয়ে উঠল গুড়খা।

ভাব, অনেক ভাব, রাইবু বলল, সাবিত্তিরিকেও জিগাস কর, বুঝা, আর শুধু আমাদের দিকটাই দেখলে তর হবে নাই, কুম্‌হারদের কথাটাও ভাব, গুড়খা। "তাঁতি কামহার কুম্‌হার—এ তিন বড় ছিনার"। সম্ভষের বাপ ভৈরবকুম্‌হার কী সোজা লোক মনে করেছিস? সাবিত্তিরিকে তার বেটাবহু হিসাবে গলায় কাপড় দিয়ে অত সহজে চুমাবে?

ন্নাই ন।

আরেকদিন 'বড়াম থানে' বসা হবে, ঘর ঘর 'ডাকুযা' ডাকবে, এই বলে প্রায় হুমকি দিয়ে বাইবু চলে গেল, চলে গেল তার দলবল সঙ্গে নিয়ে।

রাইবু-গুরভা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা গেল আর ফাঁকা খলায় বসে গুড়খা তার জোড়া হাঁটুর উপর জোড়াহাত বেড় দিয়ে দুলতে লাগল।

দুলছে, দুলছে।

সমস্ত কিছুই চুপচাপ, গাছের পাতাটিও নড়ছে না। কুটোটাও নড়ছে না। ছঁচমাটি-লেপা সাবিত্রীর হাত লটকে আছে দেয়ালে, গুড়খার বউ ঢালো সেই যে ঢুকেছে ঘরের ভিতর আর বেরুচ্ছে না, ডিগবাজি খাওয়া খেল্ কী মনে করে থামিয়ে রেখেছে গুড়খার ছোটবেটাও।

আচমকা দৌড়ে গেল গুড়খা, চুলের মুঠি ধরে টেনে-হিচঁড়ে সাবিত্রীকে মাটিতে ফেড়ে ফেলল। যতক্ষণ সাবিত্রীর দেহ খাড়া ছিল, ততক্ষণ কিল পিঠের উপর দমাদ্দম! যেই পড়ল মাটিতে, অম্নি লাথি, একটার পর একটা—

বউ ঢালো এসে গুড়খার লাথিমারা পা-টা চেপে ধরল, কী করছ। মা-বাপ-হারা ম্যাইয়া!

ত কী কুলে কালি দিব্বে?

হঁ কুল আর কালি! ভাত দিবার মুর্‌রাদ নাই, কিল মারবার গস্‌সাঁই! আর তোকেও বলি মুখপুড়ী, এত যে পড়ে পড়ে মার খাস, কাঁদতে পারিস নাই? লুল্‌হা নাকি? চিল্লাবি, যত পারিস।

বলতে না বলতেই হুড়হুড় করে কেঁদে উঠল সাবিত্রী।

তাকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিল ঢালো, তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বলল, লে ধন, হয়েছে, আর কাঁদিস নাই। ঘর-দুয়ার দেখিস, হামরা কামে যাচ্ছি।

আগে আগে গুড়খা, পিছনে ঢালো, আর মাঝখানে 'ন্যাঙটা ভুটুঙ সাধের কুটুম'।

লোধাপাড়ার সদর রাস্তায় তারা গেল না, তারা গেল তাদেরই খিড়কি পথে। প্রত্যেকদিন

শুকনা ডাঙায় পা ফেলে ফেলে, ঝোপঝাড় কেটে, ঘাস মেরে, মাটি চেঁছে নিজেরাই যে-পথ-বানিয়েছে, সেই পথে।

সে-পথ তাদের নিজেদের পথ, ধান্দার আর কান্দার। এ-পথ দিয়েই তারা ধান্দায় যায়, ঘর থেকে বেরিয়ে এ-পথের মোড়ে বসেই তারা কাঁদে, রোদন করে।

একটু পরে সাবিত্রীও এসে বসবে ঐ লালভেঁড়রা গাছটার নিচে, একটু একটু লালভেঁড়রার ডগ্ ভাঙবে, সঙ্গে সঙ্গে দুধ ঝরে পড়ার মতো তার চোখ থেকেও টপাটপ জল ঝরে পড়বে।

অন্যসময়, শুধু ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমরাই কী আর বড়রাও, বড়রাও লাল কী সাদাভেরেন্ডার দুধ দুইবে, ভেরেণ্ডাপাতার দোনায় আর পাতার শিরা তুলে গোলাকার ফাঁস বানিয়ে সেই ফাঁস দুধে ডুবিয়ে একের পর এক ফুঁ দেবে। ফুৎকারে ফুর্তিতে ভেরেণ্ডার ক্ষীর ছোট-বড় অজস্র বুদ্বুদ হয়ে ঘোড়ার ডিম হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াবে। তাতে সূর্যের রঙ লেগে রামধনু উঠবে।

আর, একবেলা এই করতে করতে খিদে মরে যাবে, অথবা ফুর্তিতে পেট ভরে উঠবে, এই গেঁড়াকল উ-র-র্-র্ গিড়গিড় দাগিন গেঁদা, এক-লোধাজনমানুষ ছাড়া আর কে জানবে?

গুড়খার ছোটবেটা লালভেঁড়রার ক্ষীর দুইতে পিছিয়ে পড়েছিল, লোধানী দুম দুম পা ফেলে পিছিয়ে এসে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

চ, উন্দুরছানা খাবি ত গিড়িগিড়ি চ! ধাই গিড়িগিড়ি ধাই গিড়িগিড়ি! লোধানী ছেলেকে প্রায় ছুটিয়ে নিয়ে গেল।

তারা যাবে ইঁন্দুর ধরতে।

এখনও ক্ষেত থেকে ধান ওঠেনি! জলা-জমিতে ধানে থোড় এলেও ডাঙা-ডুঙোড় জমি-জিরেতের ধানটুকুর কতক পেকেছে কতক পাকেনি।

চাষী কী আর ধান থাকতে 'হিড়' ভাঙতে দেয়? না দিতে চায়?

কিন্তু লোধাদের মরণ, ইঁদুর ধরতে গেলে ইঁদুরের গর্ত খুঁজে পেতে হলে 'হিড়' বা জমির আল তো ভাঙতেই হয়, কাটতেই হয়।

হিড় কাটবার তৈজস, খন্তা-শাবল গুড়খা কাঁধে নিয়েছে, গুড়খাবউ নিয়েছে ঝুড়ি, মাটির কলসি, একগোছা খড়—সময়কালে কলসির মুখে গুঁজে দেবে।

গুড়খার বেটার হাতে একটা টুকরি, ইন্দুরের গর্তে যা ধান বেরোবে, ধানের টুঙ, তাই সে কুড়াবে। তার খুব ফুর্তি।

কুম্হারপাড়ার মাথায় যে ডাঙা-ডুঙোড় জমি, কার্তিকছোলা জামাইলাডু কী কালোজীরা ধানের চাষাবাদ, তার কতক কাটা হয়েছে, গুড়খা আর গুড়খাবউ ইন্দুর ধরবার আশায় এখন হাঁটা দিল সেদিকেই।

ধান্দায় বেরুবার মুখে তো রাইবু-গুরভা-শরাবণ-শতুরারা এল, আর সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। সেই থেকে মেজাজটা খিচঁড়ে আছে গুড়খার।

হাম্‌দের ব্যাপারে তদ্দের অত্ত কী? হঁ খাওয়াস ন পরাস? ল্যাওড়া, জানিস কী জানিস নাই, পের্‌মেতে মজলে মন কেবা হাড়ি কেবা ডম? কুম্হার ত উঁচা জাত।।

চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে গুড়খা দুম্ করে ঘুরে গেল বউয়ের দিকে। আঙুল তুলে বলল, ই শালীরও হাত খুব লম্বা হএছে। উজাড় করে সব দক্তাপাতা দিয়ে দিলি? তুঁই দিলি কেন্নে?

গুড়খার আচমকা ঘূর্ণনে দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল লোধানী, এসময় পিছিয়ে পড়তে হয়, পালাতে হয়, নচেৎ মরদের উগ্রচণ্ড রাগ কোথায় কখন চোখ-মুখ ভোঁতা করে ছাড়বে!

তা, হাত একটু লম্বা করেছিল বই কি লোধানী। ভেবেছিল চুটা-উটা খাওয়ালে মাত্‌বরদের

মন যদি একটু ভিজে। হলিয়ে-ঢলিয়ে দু-চাট্টা রসের কথাও বলেছিল সে, যদি মাত্‌বররা রসস্থ হয়ে ঢলে পড়ে।

ফের চুপচাপ হাঁটা, গুড়খাবউ ঢালো একটু দূরে দূরেই হাঁটছিল, তফাৎ রেখে রেখে। কী জানি মরদের মন কখন কী চায়!

ছেলেটা বারে বারেই পিছিয়ে পড়ছে, লতাপাতা ছিঁড়ছে। লোধানী এবার তার কাছে কাছে।

এ-গাছ সে-গাছের পাতা ধরে টানতে টানতে হঠাৎ ছেলেটা দৌড়ে এসে মায়ের কাছে আব্দার করছে, হাতের তিন আঙুল দেখিয়ে বলছে, তিনটা ত?

হঁ, তিনটা।

অন্যমনস্ক লোধানী 'তিনটা' বলে ফেলে মনে করল, কিসের কী? তিনটা?

তারপরই তার মনে পড়ল, উন্দুরের গর্ত থেকে যদি উন্দুরের ছানা বের হয়, তার অন্তত তিনটা তাকে দিতেই হবে—এই কড়ারেই তার ছোটবেটা আজ এসেছে 'উন্দুর শিকারে', বড়বেটা নীলু তো ইস্কুল-হোস্টেলে। খালি খাচ্ছে, আর পড়ছে। পড়ছে, আর খাচ্ছে।

বাঁশতলার চিকন সরুবালিতে গুড়খা বসল। একটু জিরিয়ে নেবে, চুটা-উটা খাবে।

লোধানীও বসল, তবে একটু দূরে।

আয় বহু কাছে আয়!

গুড়খা বলেছে কী বলেনি, লোধানী বাঘ-ঝাঁপানি দিয়ে কাছে এল। ছোটবেটা দূরে বাঁশ-খোল কুড়োচ্ছে।

জায়গাটা ঝোপঝাড়েব ভিতর হলেও বেশ সাফা সাফা। কুম্‌হারপাড়ার কুম্‌হাররা মাটিব সঙ্গে বালি মেশাতে চালুনি দিয়ে চেলে এখান থেকেই বালি নিয়ে যায়।

কুম্‌হারদের সুবিধা কত! নদীধাবে মাটিখানায় মাটি, বনধারে বালিখানায় বালি, আর কাঠমুঠ তো জঙ্গলে। জঙ্গলে আজকাল এই কাঠের ব্যাপারটাই একটু যা ভজ-অ-কট। কুম্‌হার পড়েছে যাঁতাকলে।

হঁ, সন্তুষকুম্‌হার লোক ভাল। জাত-ব্যবসা, তাছড়াও জমি-জিরাত আছে।

আছে ত কী?

জল কোন দিকে গড়াচ্ছে বুঝতে না পেবে লোধানী বলল, কী মানে?

চাষবাস লিয়ে আমি কী জল ধুয়ে খাব?

তুম্‌হি কেনে, অরা অরা, সন্তুষ-সাবিত্তিরিরা।

গুড়খা লোধানীকে এক হেঁচকায় নিজেব দিকে টেনে এনে ফিস্ ফিস্ করে বলল, ত সন্তুষ সাবিত্তিরিকে ইর'ম করে টেনে-হিঁচড়ে লিয়ে যাচ্ছে নাই কেন্নে?

লোধানী হাসতে হাসতে পেট খালি করে, দুহাতেব পাঁচ-পাঁচ দশ-আঙুল দিয়ে মুখ ঢেকে বলল, অ এই কথা, বহিন-জামাই আসুক ইবার, বলব একটা ঘড়া আনতে। তুমার বহিনকে ঘড়ায় চড়ায়—

তালাস করে সন্তোষকুমারদের হদহদির একটা ডাঙা-জমিনের 'হিড়'কে কেটে ফেলল গুড়খা।

ঠিক কাটল না, কাটতে অতদূর সাহস হল না. কে জানে ভৈরব এসে ভৈববমূর্তিতে দু-চাট্টা চড়-চাপড় না মেরে বসে!

প্রথমে গর্তের মুখটা সাফা করে ফেলল গুড়খা। গর্তেব গতিবিধি দেখেই সে বুঝেছে, আছে। আছে, আছে।

মাদী-মরদ তো আছেই, তাছাড়া গুচ্ছের ছানাপোনা। ইঁদুর-ধান, ধানটুঙ!

কলসির ভিতর রাখা কিছু ঘুঁটে আর তুষে আগুন ধরিয়ে নিল গুড়খা, ট্যাকের দেশলাই জ্বেলে! আগুনের লেলিহান শিষ তো নয়, ধোঁয়া। খালি ধোঁয়া, ধোঁয়া।

ভক্ ভক্ করে বেরিয়ে এসে এদিক-সেদিক এলোমেলো উড়ে যাচ্ছে। এ-অবস্থায় গর্তের মুখে ধরলে ধোঁয়া সোজাসুজি গর্তের ভিতর না গিয়ে আলের চারধারে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাতে কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না।

গুড়খা এবার সঙ্গে আনা একগোছা খড় ভাঁজ করে, মুড়ে, কলসির মুখে গুঁজে দিল। খড়ের গোড়াগুলি প্রায় একহাত কলসির মুখের বাইরে বেরিয়ে থাকল।

ধোঁয়া আর উর্ধ্বে অধঃ কোথাও যেতে পারল না, খড় বেয়ে ধুনিয়ে ধুনিয়ে খড়ের ডাঁটি বরাবর চলতে লাগল।

গুড়খা কলসির মুখ গর্তের মুখে চেপে ধরল। ডাঁটি বেয়ে বেয়ে চলন্ত ধোঁয়া এবার ইঁদুর গর্তের ভিতরে ঢুকে গাবিয়ে ছাড়বে না? মাতোয়াল হয়ে উঠবে না গর্তের প্রাণীসকল?

খন্তা হাতে জায়গা মতো দাঁড়িয়ে আছে গুড়খা, লোধানী তার ছোটবেটাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের জমিতে গেছে ধানের টুঙ কুড়োতে।

ধানের টুঙ কুড়োচ্ছে ছোটবেটা, আর লোধানী জল-ডোবার ধারে ধারে ব্যাঙ খুঁজছে।

ধানের টুঙ আর কোথায়! মাঠকুড়ানী, মাঠচরানী ছাগল-বাগালরা তো আগেভাগেই হামলে পড়ে নিয়ে গেছে! ধানের শিষ যেটুকু লহ লহ করছে পাশের পাকা ধানের জমিতে। সেখানে হাত দিতে নেই, ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে 'ভালতে'ও নেই।

ভাল্লে কী হয়, মা?

পাপ হয়, ধন।

পাপে কী হয়, মা?

হাত দুটোয় 'কুট' হয়, বাছা।

গুড়খার ছোটবেটা ঘাড় নিচু করে, আর কোনোদিকে না-তাকিয়ে খুলে পড়া ছিঁড়ে পড়া ধানের শিষ খুঁজছে। চাষীরা যা নেয় না, চাষীরা যা মাঠেই ফেলে রাখে।

ইঁদুর-গর্তের ভিতর থেকে ধোঁয়ায় একশা হয়ে ইঁদুর না বেরিয়ে সাপও বেরোতে পারে। তবে সাপ-ইঁদুর তো এক গাড়ায় থাকে না। ইঁদুরের ফেলে যাওয়া গর্তেই সাপ থাকে, সাপ তো আর নিজে গর্ত খোঁড়ে না।

দণ্ডবিষো বিষহরি, পরের ধনে পোদ্দারি। হাতের খন্তা কী মনে করে মাটিতে এবার সজোরে গিঁথে রাখল গুড়খা!

চারধারটা একবার দেখল। ভিতরটা ধোঁয়ায় গাবছে, 'গাবুক ভাল্লমত'। হেথা হোথা ধানকাটা চলছে, হা-ঘরেরা ধানের 'টুঙ' কুড়োচ্ছে ঝুঁকে পড়ে, বক উড়ছে, গুয়ে-বনি, চটি।

আর ঢালোলোধানী ব্যাঙ খুঁজছে, থপথপে ব্যাঙ। তার ছোটবেটা টুঙ কুড়োচ্ছে, ধানটুঙ।

খড় ভেদ করে কী-একটা নড়ে উঠতেই খন্তা তুলে তৈরি হয়ে গেল গুড়খা।

ধেড়ে-উন্দুর, ধোঁয়া গিলে গিলে নিস্তেজ, আধ-মরা। নড়তে চড়তে পারছে না, একহাত গিয়ে উল্টে পড়ছে। খন্তার বাঁট মেরে তাকে খতম করে ফেলল গুড়খা।

তারপর ডাক দিল, লে লম্বু, গে ঢা-ল্ল, আয় আয় জলদি আয়!

ইঁদুরটার লেজ ধরে হাতে তুলে দেখাচ্ছে, দ্যাক দ্যাক, কত বড়। জোড়েরটা এখনো ভিতরেই আছে।

ঢালোলোধানী হুমদুম এসে পড়ে জোড়েরটা খুঁজতে খন্তা দিয়ে গর্ত বরাবর খুঁড়ে চলেছে, খুঁড়ে চলেছে। তার কী উদ্যম! একটা আস্ত হিড় ক'মুহূর্তেই ফেড়ে ফেলল।

জোড়ের ইঁদুরটাও ধরা পড়ল, গর্তেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল।

মাদী-মরদ গেল, এবার তার ছানাপোনা। এখনও চোখ ফোটেনি, লাল লাল, দেহের তুলনায় মাথাটাই বড়—

লোধানী যে কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না! দুহাতের মুঠোয় দু'খাবলা তুলে, আবার ঝুরঝুর ফেলে দিল গর্তেই। খোলা-গর্তে সেগুলো গাদাগাদি করে ঝরে পড়ল। আবার তুলল, আবার ফেলল।

কথামতো তিনটে দিল ছোটবেটা লুলুকে, তিনটে ছানা নিয়ে লুলু দৌড়ল অনেকটা দূরে। তারপর বাপ-মায়ের দিকে পিঠ করে বসল উবু হয়ে।

লুকাঁয় লুঁকায় কেমন খাচ্ছে তুমার ছোটবেটা, হুই দ্যাখ-অ!

দেখতে অনুরোধ করে এমন ঠ্যালা দিল লোধানী গুড়খাকে যে, আরেকটু হলে গুড়খা পড়েই যত, পড়েই যেত।

গুড়খা পড়ল না, সে মেতে থাকল তার হাতের দুটো শিকার নিয়ে। দুহাতে দুটোর লেজ ধরে যেন নিক্তিতে ওজন করে দেখল—কোন্‌টা বেশি ভারী? মাদীটা, না মদ্দাটা?

এবার লোধানী বসল গুড়খার দিকে পিঠ করে।—লাল লাল চোখ-না-ফুটা উন্দুর-ছানা যে কী ভাল্ল খেতে!

কচমচ করে বেশ কয়েকটা চিবিয়ে খেল, হাড় নেই গোড় নাই খালি মাস আর মাস। কতক খেল আর কতক কোঁচড়ে তুলে রাখল।

ঘরতক পৌঁছাবেক কী নাই, আমার ত সন্দ হয়! মনে মনে এই বলে 'উন্দুর গাড়া'র ধান খুঁজতে এবার উঠে পড়ে লাগল গুড়খা।

এ যেন বত্রিশ ঘর চৌষট্টি কুঠরি, আঁতি পাঁতি খুঁজে ছোটবেটা লুলুর টুকরিটা উঁদুর-ধানে ভরিয়ে তুলল গুড়খা।

ফেরার পথে ফের সরুবালি চিকনবালির বাঁশতলা। যাবার সময় গুচ্ছের বাঁশখোল যোগাড় করেছিল গুড়খার ছোটবেটা। ট্যাঁকের 'মাচিস' জ্বেলে তাতেই আগুন ধরিয়ে দিল গুড়খা।

বাঁশখোলের আগুন, লহলহ করে জ্বলছে, ইঁদুর দুটোকে আগুনে এখন 'ধুড়সাবে' লোধা-লোধানী।

তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই, সব যেন আগে থেকেই ঠিক করা, উলুরি-ঝুলুরি বাঁশপাতার ভিতর দিয়ে ঝিরিঝিরি সাঁজতারা দেখা যাচ্ছে। গলায় কাপড় জড়িয়ে ঢালোলোধানী গড় করল।

তার দেখাদেখি ছেলেটাও।

আরো কিছু শুকনো বাঁশখোল বাঁশঝাটি যোগাড় করে আগুনে ফেলে দিল গুড়খা। আলোয় আলোময় হয়ে উঠল বাঁশতলা।

তিনজনে, আরামসে, ভাগ করে খেল উন্দুর-পোড়া। যেটুকু থাকল, সেটুকু রেখে দিল ঘরের জন্য, ঘরে তো আরেকজন।

চারজন, চারজন।

উ বেলা যা মার দিলে ম্যায়টাকে!

হঁ।

হাত-মুঠ করে গুড়খার পিঠে একটা ঠেলা মারল লোধানী, কী হঁ?

গুড়খা আবার বলল, হঁ।

বলেই হাঁটতে লাগল ঘরের দিকে, ছোটবেটা কাঁধের উপর। ঘরে তার মন পড়ে আছে।



হাটুয়া মহাজনরা, চাষীভুষীরা, এখন ক্ষেত-খামার থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই করে ধান তুলবে। সে-গাড়ি 'উলার' হবে, 'ডাবু' হবে। উলার হলে গাড়ির সামনের দিকে কেউ চড়ে বসবে, ডাবু হলে গাড়ির পিছনের দিকে গাড়ির 'বাতা' তুলে ধরবে অন্তত দুজন। গড়ানে চটানে গাড়ি ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে যেতে যেতে গাড়ির 'ধুরি' ভাঙবে, গাড়ির চাকার 'আরা' চটকাবে।

ধুরি ভাঙলে ধুরি চাই, আরা মচকালে আরা চাই। চাই তো চাই, চাহিদা আছে। কিন্তু যোগান কই?

জঙ্গলে কাঠই নেই, তো যোগান! কাঠ যাও বা জঙ্গলের গলি-ঘুঁজিতে আছে, জঙ্গলে ঢুকতে দিচ্ছে কে? গাড়বাবুরা ফরেস্টারবাবুরা অবিরত টহল দিচ্ছে। এই দেখা যাচ্ছে এদিকে তো, ওই দেখা যাচ্ছে ওদিকে। সকালে সুখজুড়িতে তো, বৈকালে নারদা-নিগুইয়ে। লুক-লুকানি খেলা হচ্ছে লোধাজনমানুষের সঙ্গে বন-মানুষদের, বীটবাবুদের।

জঙ্গলে ঢুকতে হচ্ছে লুকিয়ে-চুরিয়ে। ঢুকতে গিয়ে মেয়েরা যাও বা পার পেয়ে যাচ্ছে, ছেলেদের ঢুকতে দিচ্ছে না মোটেও।

হঁ, ঝাট্রি কুড়াব-অ আল্লু তাড়ব-অ, শত বললেও না। নরসিঙা আরোই কড়া হয়েছে, তার একধাপ আরো 'প্রমোশন' হয়েছে। সে এখন কথায় কথায় 'ইঞ্জিরি' ঝাড়ে।

না যখন বলেছি, না। আমার বেঁকা-আঙুল কিছুতেই সোজা হবে না—এই তোকে বলে দিচ্ছি রাইবু। যা, হট্ যা। গেট আউট! গেট আউট!!

তবু তো জঙ্গলে ঢুকতে হচ্ছে, ঢুকতে হয়।

'আড়া'র কথা আর ভাবে না রাইবু-গুরভা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা। ওসব তাদের জন্য নয়, ওসব ওই হাটুয়া মহাজনদের জন্য মাহাতো মহাতাবদের জন্য। যাহোক করে পটিয়ে-সটিয়ে ধারে-উধারে 'লিজ' নিলেও কী আর রাখতে পারবে তুমি? রাখতে তোমাকে দেবে? ক-ত রকম ফাঁদ-ফিক্কির! ফাঁদে পড়ে বগা কাঁদে।

কাঁদো রাইবু কাঁদো।

হুর হুর করে কাঁদতে আর রাজি নয় রাইবু। কাঁদিলে কি হবেক রাণী, ভাবিলে কি হবেক—

তার উপর সে এই কিছুদিন ধরে শুনে আসছে—সমস্ত জঙ্গলমহাল নাকি পরিমাপ হবে। আমীন আসবে তশীলদার আসবে, গোছা গোছা ঝিঁজরি হাতে নিয়ে, আঁটারি-চুরচু-কুড়চি-কইমের জঙ্গলে লোহার 'চেন' টানাটানি হবে।

হাটুয়াদের মাহাতোদের সাণ্ডালদের ভূমিজদের মুঢ়া-কাটাডাহি-জমির দখল উঠে যাবে, উৎখাত হবে, খাস হয়ে যাবে, লাট-কে-লাট ডাহি-ডিহি সরকারবাহাদুর ফের দখল নেবে। আকাশমণি, ইউকেলিপটাশ, কাজুবাদামের চারা লাগাবে। জঙ্গল ফের জঙ্গল হয়ে যাবে। জঙ্গলে আরো বেশি খেড়িয়া ছাড়বে, ল্যাকড়া ছাড়বে, বন-বরা হরিণ ছাড়বে। টি-উ-ল টু-টু পাখের মতন আরো কত শত অচেনা পাখ ছাড়বে, তিড়ুন, টিড়লিং।

ছাড়ার মালিক তুই, সে ত ছাড়বিই, কিন্তুক—

শোনা যাচ্ছে—জঙ্গল থেকে লোধাশবরদেরও উৎখাত হতে হবে। উৎখাত হয়ে তারা কোথায় বা যাবে? শুনছি ত বহুতদিন ধরে, এই হবে সেই হবে, লোধারা নতুন জঙ্গলে চারা লাগানোর কাজ পাবে।

পাক, সে পাক।

কিন্তু উৎখাত হয়ে, মনে ব্যথা লিয়ে সে যাবে জঙলে চারা লাগাতে? সে-চারা লুকাঁয় লুকাঁয় উপড়ে মুড় মুড় করে ছিঁড়ে ফেলবে নাই?

ফেলবই ত!

বাপ ত বলে, বাপের বাপের, বাপেরও বাপের, কত বাপের আমল থেকে যে আমরা আছি। জঙ্গলের এ-মুঢ়ায় নচেৎ ও-মুঢ়ায়। সত্য তের্‌তা দ্বাপর গেল, কেউ উৎখাত করল না। আর কলিতে এসে কী না আমাদের উৎখাত হতে হবে?

ধুর, হই ত আগে!

একটা মোটা করঞ্জগাছের গায়ে চার চারটা সাইজ করা 'ধুরিকাঠ' ঠেস দিয়ে গাছতলায় বসে বসে এতক্ষণ ভাবছিল রাইবু। একদলা থুতু ফেলে, দুকাঁধে দু দু চারটা ধ'কাঠের ধুরি নিয়ে দুলকি চালে এবার এগুচ্ছে।

সঙ্গে গুড়গুড়িয়া নেই, থাকলে ভাল হত। হত!

ধ কাঠের 'ধুরি' যাকে ঘিরে চাকাদুটো ঘুরবে আর ঘুরবে, তেলেকালিতে পাকে পাকে ঘুরতে ঘুরতে পাকাপোক্ত হবে, সে আর মন্দ কী! তবে শাল আর এখন পাচ্ছ কোথায়? পেলেও কাটতে বা কে দিচ্ছে? ধ তো ধ-ই সই।

ভারী কাঠ, তাছাড়াও কাঠ বইতে আজকাল কেমন যেন ভার ভার লাগে রাইবুর।

কিছুদূর এসে, খানিকটা জিরিয়ে, ফের কাঠ চারটা কাঁধ বদল করে নিল সে।

হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে ফের মনে হল, সঙ্গে গুড়গুড়িয়া থাকলে বেশ হত। দড়ি বাঁধা টায়ারের চটি পায়ে বেটাচ্ছেলে কী পিছু পিছু আসছে?

ছেলেটা ভাল ছিল, কী দোষে যে খালভরারা তাকে হাজতে পুরল! হাজতেই আছে কী? বঙ্কা ত বলে, হঁ হাজতেই আছে। আর কেউ বলে, কাটাকুটির সময় সম্বারিকে নিয়ে সে ভেগেছে।

ভাগুক, ভাগুক। মরদ বটে গুড়গুড়িয়া, তবু জানব বহিনটা আমার বেঁচে আছে, বেজাতের ঘরে নয়, স্বজাতের ঘরেই আছে।

ক'দিন গুরভার সঙ্গেও বেরিয়েছিল রাইবু। গুরভাও ভাল, তবে সে কী আর গুড়গুড়িয়া? গুড়গুড়িয়ার বলে বুদ্ধি কত! বিপাকে পড়লে কতরকম ফন্দি সে আঁটে। আঁটতে পারে!

এখন ভোর হচ্ছে, পাখপাখালি জাগছে। এর মধ্যেই জঙ্গলে ঢুকে, বারশি দিয়ে কেটে চেঁছে, সাইজ করতে হয়েছে কাঠ চারটাকে।

একহাতে আর কতটা করা যায়? থাকত যদি গুড়গুড়িয়া!

গুড়গুড়িয়া, গুড়গুড়িয়া।

গুড়গুড়িয়া না, বুলানের দিক থেকে উঠে আসছে দোরখুলির বঙ্কা মাহাতো।

থাম!

ধড়াস করে কাঠ চারটা মাটিতে ফেলল রাইবু।

হঁ, মা'জন?

শুন!

কী?

তোরা কি বাঁচতে চাস না মরতে?

কথা কোনদিকে ঘুরছে রাইবু ঠিক ধরতে পারছে না, না পেরে বলল, কেনে মা'জন?

কেনে মা'জন? ভেংচি কেটে বঙ্কা মাহাতো বলল, নাহলে কাটাকুটির পরেও তোদের হুঁশ হচ্ছে নাই?

কাটাকাটির কথা কেন তুলল বঙ্কা? রাইবুর বড় নরম জায়গায় ঘা দিচ্ছে লোকটা। না বুঝে সে চুপচাপ থাকল, মাথা হেঁট করে।

তবে কী ফের কিছু করে ফেলেছে লোধাজাতটা!

শুনেছিস কী, বাঘঝাঁপা সরো আর চাকুয়ার ওদিকে কাল লোধা-কাটাকুটি হয়েছে?

নাই শুনি।

এত জাত থাকতে তোদের নিয়ে এত কাটাকাটি হয় কেন রে?

নাই জানি।

নাই জানি, তুই ত ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানিস নাই!

হুঁ।

কী হুঁ?

কী করে বলি মা'জন, যা জানি নাই শুনি নাই, তবে এটুক বলতে পাারি লোধাজাতটা পাঁঠার জাত, না'লে আমাদেরই ধরে-বেঁধে—

হুঁ, তোরা প্যাঁঠাই বঠিস, বকা প্যাঁঠা!

কবুল করচি মাহাজন, কিন্তুক সাতসক্কালে কী মতলবে এত কথা শুনাচ্ছ?

শোনাচ্ছি কী আর সাধে রে—

দাঁতে কাঠি গুঁজছে বঙ্কা, খুব গম্ভীর।

অবশেষে বলল, অত মজবুত করে টিনের বাড়ি বানিয়ে দিল সরকারবাহাদুর, আর তুই কী না সে-টিন বেচে দিলি? কাকে বেচেছিস?

জান যাবে তবু কবুল করবে না রাইবু, নাম বলে বেইমানী করতে সে নারাজ।

হুঁ দিল্লম, পেটের দায়ে।

তোদের পেট এত বড় বড় যে ঘরের চালসুদ্ধ বেচতে হবে?

হেসে ফেলে রাইবু বলল, সব বিকি নাই মাহাজন, মোট্টে একজোড়া। আনন্দে চোখ তার চকচক করল।

বাকিগুলাও বেচবি, বেচবি। আজ না হয় কাল। অঞ্চল পরধান এম. এল. এ.—সব, সব তোদের উপর রেগে কাঁই। উপরেও খবর গেছে। দ্যাক, কদ্দুর কী হয়!

কাঁধের ধুরি কাঠগুলো আগেই মাটিতে ফেলে রেখেছিল রাইবু, এব্বার বঙ্কার পা ধরে নিজেও মাটিতে নম্‌থম্ শুয়ে পড়ল।

বলল, ধরে কী উপ্‌রে চালান করে দিবে, বাবু-উ?

দিতেও পারে।

তবে বাঁচা বাবু-উ, বাঁচ্‌চা!

পা আর ছাড়ছে না রাইবু।

ছাড়বি ত, আমার 'গিরগিত্তি' লাগছে, এই রাইবু! বঙ্কা গিল্ গিল্ করে হাসছে।

হাজতবাসকে রাইবুর খুব ভয়। যে যায় হাজতে তাকে খায় যমদূতে! মেরে হাড়গোড় ভেঙে দেবে না? আর তারপর বিহার না উড়িশায় কোথায় কোন মুলুকে যে হাপিস করে

দেবে, একটা পিঁপড়াও জানতে পারবে না! বড়সোলের পাঁড়ু গেছে, আগনু গেছে, নাদনগাড়িয়ার ঝরি গেছে—আজতক কেউই ফেরেনি। গুড়গুড়িয়াও কী ফিরবে?

নাই, নাই।

ইবারের মতন বাঁচাতে পারি রাইবু, তবে এক কড়ারে—

কী কড়ার মা'জন?

বল, ঘরের টিন আর কোনদিনও বেচবি নাই?

নাই নাই, আর কী বিকি, এই তুমার পা ছুঁয়ে বলছি, মাহাজন!

বেশ, তবে নির্ভাবনায় যা।

ধুরির কাঠগুলো আবার রাইবুর কাঁধে বঙ্কাই তুলে দিল। রাইবুও আবার দুল্‌কি চালে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল, ই-যাত্রায় রামবাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছে বঙ্কা।

দুম করে, এতদিন পরে, আবার সেই দৃশ্যটা মনে এল তার। সে দেখে ফেলল, বঙ্কা মাহাতো আর ফুলটুসুয়া,—ঘাসভুঁয়ে শুয়ে গড়াচ্ছে।

চড়াক করে রক্ত মাথায় উঠে গেল তার, অতিরিক্ত রাগে থম মেরে সে খালি রকম-সকম দেখছে, দেখতেই থাকল।

বঙ্কা দৌড়ুচ্ছে, আর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে রাইবুকে, কাছা খুলে গেছে, ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গেছে বঙ্কার, কথা কিছুতেই আর বেরুচ্ছে না।

তবু রাইবু শুনল, বঙ্কা বলছে, ও কিছু না, কিছু না রাইবু, লোধানীকে টুকচার 'জাঁকামাড়া' শিক্ষা দিচ্ছিলম, না'লে জঙ্গলে বাঘভালুকের সনে যুজবে কী ক'রে?

খানিক থম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে রাইবু দেখছে, ফুলটুসুয়া ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ভেগে যাচ্ছে, সে-ও দৌড়ুল তার চোরাই বন্দুকটা গাছের চোরাকোটর থেকে নিয়ে আসতে।

ইবারের মতন বাঁচাতে পারি বঙ্কা, তবে এক কড়ারে—

কী কড়ার রাইবু?

বল্, কুনো লদ্ধাম্যায়ার সঙে আর কুনোদিনও 'জাঁকামাড়া' করবি নাই?

নাই, নাই।

বড়োডাঙার কুবের মহাপাত্রর উঠোনে এক কাঁধের দুখানা ধুরি নামিয়ে, বাকি দুখানা আরেক কাঁধে রেখেই রাইবু বলল, আসছি মাহাজন।

বলেই ফের দুলকি চালে হাঁটা, সে যাবে এবার থুরিয়া, সেখানেও দুটো ধুরির অর্ডার আছে।

শেষভার নামিয়ে গামছায় কাঁধের ধুলাবালি, কাঠের চঁচ মুছতে মুছতে সুধাংশু কাপড়ীর কাছে আব্দার ধরল রাইবু, বস্তুত ভোক লাগছে মা'জন, চাট্টি মুড়হি দেও।

সূর্যের দিকে চেয়ে কাপড়ী বলল, কেতে বেল হেলা রে নিষাদের পো, যে তোর ভোক লাগেঠে?

হুঁ, ভকের আবার বেলা-অবেলা!

যাত্রাপালায় কাপড়ী 'রাজা' সাজে। রাজা-রাজড়ার ঢঙে ঘরের দিকে তাকিয়ে যেন সে বলল, দ দ দ, দান কর দয়া কর দমন কর। দিবাকরের মা, শুনোঠ? নিষাদের পো'কে চাট্টি মুড়ি দও।

রাইবু গামছা পেতে রেখে মনে মনে বলল, কী যে এরা ঠ-ঠ করে নিষাদ-মিষাদ বলে! ভাল বলে, না মন্দ বলে—বুঝতেও পারি না।

বুঝতেও পারি না, বুঝতেও পারি না।

কাপড়ীবউ এক মান মুড়ি এনে রাইবুর পাতা গামছায় ঢেলে দিলে রাইবু হুঁশিয়ার হয়ে বলল, ঝাল দও একটা মা-জনুনী।

লঙ্কাও দিল, দিয়ে কাপড়ীবউ হেসে জিজ্ঞাসা করল, বনে লঙ্কা হয় না? বন-লঙ্কা?

সহসা সব কেমন যেন হাগুল মাগুল হয়ে গেল রাইবুর। হুঁ, তাই ত, বনে কী লঙ্কা হয় না? বন-কুঁদরী বন-কাল্লা বন-কাঁকড়ো, বন-পুঁই যদি হয়, বন-লঙ্কা হবে না কেন?

হয় হয়, বন টুঁড়ে দেখতে হবে। কাপড়ীবউকে রাইবু বলল যে, সে খুঁজে দেখবে, আর পায় যদি তো খুব জলদি সে হাজির করবে।

কত লোক তো বনে-জঙ্গলে কত কী খুঁজে বেড়ায়! রোহিনীর চিনিবাস ষড়ংগী তো অষ্টপ্রহর বনে-জঙ্গলে বন-পালা টুঁড়ে বেড়াচ্ছে—কী ঝড় কী বৃষ্টি। কিসের জন্য? না, কী-একটা গাছের পাতা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আজ কমসে কম দশ বছর তো রাইবুরা, লোধারা, তাকে দেখে আসছে। মুখোমুখি দেখা হলে, জঙ্গলে হঠাৎ হঠাৎ, ঠোটে আঙুল দিয়ে প্রথমে সে চুপ করতে বলে। তারপর চুপচাপ তার কাছে হাজির হলে, ঠোটে সে-আঙুল আরো জোরে চেপে ধরে বলে, চু-উ-প।

খানিক চুপচাপ বসে থাকার পর, এ-ঝোপ সে-ঝোপ উঁকিঝুঁকি মারার পর, চিনিবাস ষড়ংগী নিজেই কাছে এসে যেচে কথা বলে।

ঠাকুর, কী অত খুঁজো? লাটায়-পাটায়?

পাতা।

কী পাতা?

তোকে বলব কেন?

গোল, না লম্বা?

তোকে বলব কেন?

অন্তত গুণাগুণটা ত বল-অ।

চিনিবাস ঠাকুরের চোখ-মুখ চকচক করে ওঠে। বলে, সে-পাতা একবার পাস যদি তো সারাজীবনের মতোন তরে যাবি রে, শাল্লা! যত পাতা তত টাকা, যত পাতা তত টাকা, যত পাতা তত টাকা....

পাগলাচণ্ডী ঠাকুর পাতা খুঁজতে ফের ঝোপ- ঝাড়ের ভিতর ঢুকে যায়।

রাইবুর কতবার মনে হয়েছে—সেও সেই পাতাটা খোঁজে, কিন্তু নাম না জেনে?—

নাম-না-জানা কত অচেনা পাল্‌হা-পতর দেখে জঙ্গলে শিউরে শিউরে উঠেছে রাইবু, ছিঁড়ে এনে তৎক্ষণাৎ ঠাকুরকে দেখিয়েছে।—দ্যাক ত এইটা সেই কী না?

ঠাকুর কেবলই মাথা নেড়েছে। তবে বল্ শালার পাগলঠাকুর, পাতাটার নাম বল। কতবার চেপেও ধরেছে রাইবু। চিনিবাস ষড়ংগীর সেই এক কথা, বলব কেন? সে আছে আমার মনে মনে, বললে তুই শালা যদি আগে পাস্?

রাইবু কতবার ভেবেছে—সব লোধাদেরই বলি, খেড়িয়া-শিকারের মতো একসঙ্গে সারা জঙ্গলমহাল ঝুড়ে ফ্যাল্, টুঁড়ে দ্যাক। কিন্তু জঙ্গলমহালের সব পাল্‌হা-পত্তরই তো লোধাদের চেনা, হয় এর জানা নয় ওর জানা, সব গাছই তো পরিচিত গাছ।

তিড়ুন পাখ, টিড়লিং ভুঁইয়া পাখ, গুলগুভুঁইয়া—এসব জ্ঞেয়াতি গুষ্টির গোত্রনাম হলেও আজকাল কী আর এসব পাখ এসব গাছ জঙ্গলে দেখা যায়?

তবে হ্যাঁ, 'টি-উ-ল টু-টু' করে ডাকে একটা নুতন পাখ ক'বছর ধরেই জঙ্গলে এসেছে বটে। সে বহুত ঢপের পাখ, চ্যাঙ্-ফুচকা!

কাপড়ীর বউয়ের কাছে মুড়ি-টুড়ি নিয়ে নদী-ধার দিয়ে ফিরছিল রাইবু।

এখানে নদী বহন্তি পশ্চিম থেকে পুবে আর রাইবু আসছিল পুব থেকে পশ্চিমে।

পাল জমিনের উপর দিয়ে গরুর গাড়ির লিক্ চলে গেছে এঁকে বেঁকে। সাইকেল টায়ারের চক্রাবক্রা দাগ, জীপগাড়ির চাকার দাগ। এই রে, নদী-ধার দিয়ে পুব বরাবর হাঁটলেই তো থানা, হাজত!

কী মনে করে রাইবু আন্‌সাটকা দৌড়ুল। দৌড়, দৌড়। পুব থেকে পশ্চিমে।

এতক্ষণ জল বইছিল পশ্চিম থেকে পুবে, দৌড়ুতে দৌড়ুতে রাইবুর মনে হল, নদীর জলও তার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ুচ্ছে, ছলাৎ ছলাৎ, পুব থেকে পশ্চিমে।

হেলে-পড়া পাকুড়গাছটার কাছে এসে থমকে সে থেমে গেল।

বসন্ত কামিল্লা।

এত কেন দৌড়াচ্ছিস, রাইবু? চুরি-টুরি করেছিস বোধহয়?

ন্না-ই।

তবে কী খেলছিস্?

হঁ।

চু-উউউ কিত্ কিত্?

হঁ।

একলা?

ন্না-ই, দোখলা।

আর কে?

কেনে—হুই যে।

বসন্ত কামিল্লা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—কই, কোথাও কেউ নেই ত!

ব্বাস রে! আন্ধা নাকি?

বসন্ত কামিল্লা আবার দেখল—নদী ছাড়া আর তো কিছু দেখা যাচ্ছে না?

হঁ, লদ্দী। লদ্দীর সঙেই—

হেসে অস্থির হয়ে উঠল কামিল্লা। বলে কী—এতক্ষণ নদীর সঙ্গে চু-কিত্ কিত্ খেলছিল রাইবু! পেটে এত বড় একটা খোঁদল—তবু এত ফুর্তি আসে কী করে?

ছ্যাঁচড়ামি ছাড়, কাজের ধান্দা দ্যাক।

কী কাজ? রাইবু খুব উদাস।

দলবল নিয়ে 'নামাল' যা। ধানকাটা শুরু হচ্ছে। এখানেও নিজে না করিস না করিস, বউড়ী-ঝিউড়ীদেরও তো কামিন খাটাতে পারিস?

ন্নাই, আমাদের জাইতে উসব নাই, কামিলা। একটা গীত আছে, শুন—

> সকাড়ে উঠি-পুটি কামিন ডাকিৎ গেনু
> কামিন ডাকা বড় খসামদি
> পাছে কামিন না আসৎ যদি—

বসন্ত কামিল্লা টিটকিরি মেরে বলল, অ-রে শালা! কামিন খাটতে যাওয়া তোদের জাতে নেই, আবার কামিন খাটাবার জমিদারী নিয়ে বেশ তো গীত ফেঁদেছিস!

রাইবুও হাসল।

বলল, হঁ, কামিন খাটতে যাবা এক ঝঁকমারি, কামিলা।

ঝঁকমারি কেন?

ধর্, তোর জমিনে ধান কাটতে গেল আমার বন্ধু। সারাদিন কোমর বেঁকা করে ধান কাটল। কাটাধান একদিন-দুদিন ত জমিতেই পড়ে থাকে, থাকল। রাইতের বেলা চোর এসে লিঞে গেল। কে লিল, কে লিল—ধর্ শালা লদ্ধা ব্যাটাকে, রাইবুকে। উহার বন্ধু-ই ত আজ ধান কাটতে এসেছিল!

ভাব্, কুথা থিক্যে কী। তারপর তর্হাই আমাকে ধরে-বেঁধে হাজতে দিবি। ম্লাই, উসব পেঁদ ছাড়। একটা সিগ্রেট খাবা। উদিকে খুব ত খসা-চনার কারবার করছিস!

তা, তিল-কুরথির কারবার বসন্ত কামিল্লার বেশ ভালই চলছে। 'পাকিট' থেকে একটা সিগারেট বের করে রাইবুকে নিজহাতে ধরিয়ে দিল বসন্ত।

রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়াদের তাকে হাতে রাখতে হয়। রাতভিত সে দোরখুলি-রুখনীমারা-নারদার গ্রামে যাচ্ছে দাদন দিতে, ফসল উঠবার কালে খসা-কুরথি-জনার সংগ্রহ করতে।

তাদের তোয়াজে না রাখলে চলে!

বসন্তর সিগারেট খেয়ে, বড়োডাঙায় দুটি ধুরিকাঠের দাম আদায় করে, ফুর্তিতে রাইবু দোরখুলির লোধাপাড়ায় ফিরছে, আর কুম্হারদের 'মাটিখানা' থেকে কাক-কুয়ার ছানার মতো একটা মুখ ঘাড় লম্বা করে ডাকছে, এই যে রাইবুদাদা! ও রাইবুদাদা!

'দাদা' বলল? রাইবুকে? অন্যমনস্ক ছিল রাইবু, হুঁশ ফিরলে তার মনে হল—এই প্রথম, পর্থম, কুনো বাবুলোক তাকে 'দাদা' বলল। দাদ্দা—

কে বলল?

না, সন্তুষ। সন্তুষকুম্হার।

নিজের মনে খুব একচোট হেসে নিল রাইবু। তারপর সাব্যস্ত করল। ধুর! সন্তোষ কী আর কুম্হার আছে? সে-ও ত এক লদ্ধা ম্যায়াকে বেহা করে লদ্ধা হতে চলেছে।

সে তো রাইবুকে 'রাইবুদাদা'-ই বলবে। বলবে না?

জরপ করে রাইবুও বলল, কী সন্তুষলদ্ধা?

বলল কী?

সন্তোষ যেন খুব খুশি। তাহলে, রাইবুও ব্যাপারটা জানে? তাহলে, রাইবুও ব্যাপারটা মেনে নিচ্ছে?

লও, দোক্তা-বনা, খাও। সন্তোষ খুব খাতির করছে রাইবুকে।

'দোক্তা-বনা', অর্থাৎ মতিহারী দোক্তাপাতা চুনে মিশিয়ে বানানো, খেয়ে রাইবু মাটিখানার ভিতরটা একবার উঁকি মেরে দেখল।

আরেক 'চুঁয়া'। চুঁয়া, চুঁয়া। অন্ধকূপ।

কিন্তু কী শীতল কী শীতল! যেন বসুমতা কোল পেতে বসে আছেন। কুমহাররা মায়ের কোলে বসে মাটি তাড়ছে।

খুরপির খোপ খোপ চটা-ওঠা দাগ চুঁয়ার দেয়ালে। আঁটিয়াল মাটি। মাটিতে গু-চাট্টা গেঁড়িভাঙা।

রাইবু তো আর জানে না, এই গেঁড়ি-ভাঙাই শামুকের জীবাশ্ম। যুগ যুগ ধরে তা সঞ্চিত আছে মাটির গর্ভে।

তবে সে দেখেছে, বাড়িতে মাটি পৌছুলেই কুম্হার বউড়ী-ঝিউড়ীরা চারধারে বসে মাটির ঢেলা ভেঙে ভেঙে এই গেঁড়িভাঙা, সাদা সাদা পাথরকুচি চুলে উকুন বাছার মতো বেছে ফেলে দিচ্ছে।

কুম্‌হারদের মাটিখানা রাইবুর খুব ভাল লাগল। আর, ভাল লাগল আজ সন্তোষ কুম্‌হারের মুখে 'রাইবুদাদা' ডাক।



উঠ মুনু, উঠ!

ফুলটুসিলোধানী বড় খাতির করে মেয়েকে ডাকছে। একডাকে মেয়ে উঠছে না দেখেও দু'বার ডাকছে না। ঘুমোক, আরেকটু ঘুমোক।

আর পাঁচটা লোধাম্যাইয়ার মতন তো নয় নুকু, যে রাত থাকতে উঠে ঝড়াপাছিয়া নিয়ে গরুর নাদি, ধানের টুঙ কুড়োতে বেরিয়ে পড়বে বাসিমুখে। আর নয়ত জঙ্গলে যাবে পাতা ছিঁড়তে, ঝাঁটি কুড়োতে। খালধারে যাবে পচা শামুক কুড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে কলিচুন বানাতে।

যা গেছে গেছে, আর নয়। কলম-ধরা হাত আর যাবে না কাঁকড়া কী খঙ্গা খুঁজতে। কব্‌ভি নেহি।

উঠ মুনু, উঠ!

ঘুপচীর বাইরে বেরিয়ে খলায় দাঁড়িয়ে যেন এমনি বলতে হয়, লোধানী বলল। যেন মনে মনেই বলল। বেলার দিকে তাকিয়ে শাড়ির আঁচলায় মুখ মুছল। কোমরের শাড়ি খুলে আবার পরল।

সে আর কতক্ষণ! আবার ধীরে ধীরে ঘুপচীর ভিতর ঢুকে মোলয়েম স্বরে ডাকল, উঠ মুনু, উঠ!

অথচ ফুলটুসিলোধানী বড় খরখরি।

হোস্টেল থেকে পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছে নুকু, ওরফে কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিক। গতকাল সন্ধ্যায় এসেছে, ইস্কুলের 'ফাংসন' শেষ হল তবে না ছুটি! তাছাড়াও সে-ফাংসনে অংশ নিয়েছিল নুকু, স্বরচিত কবিতাপাঠ।

ঘুম ভাঙার পরেও তার বেশ ক'সেকেণ্ড লাগল কোথায় ঘুমিয়ে আছে মনে করতে। হোস্টেলের ঘরে, না তাদের দোরখুলির বস্তিতে?

চোখ সয়ে গেলে সে বুঝল, চিরপরিচিত লোধাবস্তির ঘুপচীঘরেই সে শুয়ে আছে, আর তার মায়ের ডাকেই ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে।

আগে আগে রাত থাকতে থাকতেই বন-খুকড়ার ডাকে তার ঘুম ভাঙত। শীতকালে জাড়ে-ঠাণ্ডায় বুলানের আশপাশে শিয়াল ডাকত। একসঙ্গে দু-চার গণ্ডা। হু-উউউউ! ঘুপচীর চালের ফোকর দিয়ে জ্বলজ্বল করত পোহাতারা, রাতপুহানী তারা। ভুগড়ার পাশ দিয়ে কুল্‌হি-রাস্তায় হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে দঙ্গল-কে-দঙ্গল লোধামেয়েমানুষরা জঙ্গলে যেত কাঠ কাটতে, ঝাঁটি কুড়োতে। পাতা ছিঁড়তে, আলু তাড়তে। কেউ না কেউ এসে ফিস্‌ফিস্ করে তার মাকেও নিয়ে যেত ডেকে। কখন-বা তার মা-ই আগে ভাগে বেরিয়ে যেত, আর কারুর ভুগড়ার গা ঘেঁষে যেতে যেতে হাঁক দিত, জোরে নয় জোরে নয়, ধীরে। খুব আস্তে। ধান্দায় বেরিয়ে লোধাপুরুষমানুষরা শেষরাতে ফিরে গোধুতের মতো ঘুমোচ্ছে, তাদের ঘুম না ভাঙে!

টিনের চাল-ওয়ালা ঘুপচী ঘরের ছোট ঝুরকায় চোখ মেলে লক্ষ্মী প্রথমেই দেখল একটা মরা ডাল, তাকে বেড় দিয়ে বেড় দিয়ে এগোচ্ছে একটা লতা, ঘি-কুমারী না দুধিয়া?

ঘি-কুমারী লতা হলে এই মরশুমে কাঁটা কাঁটা সবুজ ছালে মোড়া শুটি ধরবে, সেই শুটি পেকে হঠাৎ হঠাৎ ফেটে পড়বে, আর হাওয়ায় উ... ভাবে ঘি-কুমারীর তুলো, পেঁজা পেঁজা।

ইস্কুল হোস্টেলে ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে লক্ষ্মী প্রথমেই দেখতে পেত ঝাঁপুড় ঝুপুড় একটা বকুলগাছ, আর সেই গাছটার ডাল ধরে টানাটানির ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। আর কিছুই নয়, হোস্টেলের রাঁধুনী দাঁতন করবার জন্য বকুলের ডাল ভাঙছে। আর মানুষটা উচ্চতায় খানিকটা খাটো কী না, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তাই একশা করছে।

লক্ষ্মী মুখ টিপে হাসত, খুব।

এখানে সে কার মুখ দেখে উঠল? কার মুখ? মা'র মা'র, আর ঘুমন্ত ছোটবোন মুনকুর।

একটু যেন রোগা রোগা লাগছে, মলিন-উধাস লাগছে তার মাকে! অথচ লোধাপাড়ায় তার মা-ই তো সবচেয়ে সুন্দর, ঢলঢলেমুখী। সোমবারিবিটিও কম সুন্দর ছিল না, তবু, তবু মা'র চেয়ে কমা।

উঠ মুনু, উঠ!

মায়ের ডাকের পরেও 'করট্' ঘুরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল লক্ষ্মী। তার চোখের সামনে আবার এল সেই মরা ডাল, সবুজ ঘি-কুমারী লতা। যেন শুখা ডালের সঙ্গে লতাটা জড়াজড়ি করছে। জড়াজড়ি করছে।

মনে পড়ল নিজের লেখা কবিতার কথা, "কহে দে রানী কহে দে মুনু, বন আমাদের মা বঠে", কাল ফাংসানে 'বন-মা' কবিতা শুনিয়ে খুব বাহবা পেয়েছিল সে, দাদা-দিদিমণিরা প্রশংসা করে বলছিল, লোধাশবরদের মুখ উজ্জ্বল করবে মেয়েটা।

সে কী তবে কবি হবে? দোরখুলির লোধাবস্তি থেকে কবি? দুদ্দুর! সামনে মাধ্যমিক আগে ত মাধ্যমিকটা পাশ করি। খুব লজ্জা পেয়েছিল লক্ষ্মী, তবু কবিতাটা টেপ-ফ্রকের বুকের খাঁজে গুঁজে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

হাত চেপে-চুপে দেখল, কবিতাটা এখনও আছে, বুকের খাঁজেই আছে। কাউকে শোনাবে কী? কবিতার মর্ম কে আর বুঝবে, কেউ তো আর লেখাপড়া করেনি! তবু, তবু তার মনে হল রাইবুকাকাকে কবিতাটা একবার শোনায়। লেখাপড়া না করুক, লোকটার বোধবুদ্ধি আছে, হয়ত মর্ম বুঝবে, বেদন বুঝতে পারবে। সহজ তো! কঠিন কঠিন বাঙলা কী আর, খাএ্রেছি-দাএ্রেছি,—এরকম ভাষাতেই তো লেখা।

উঠ মুনু, উঠ!

ফের ডাকছে ফুলটুসিলোধানী।

এবার নুকু বলল, আর টুকচার নিঁদ যাই না, মা?

হঁ, নিঁদা বিটি!

ঘুমোচ্ছে কী আর নুকু, সে তো পড়ে পড়ে ভাবছে তার কবিতার কথা, পদ্য রচনার কথা। তার মা তাকে ঘন ঘন ডাকছে, হয়তো কিছু সুখাদ্য,বন-কাল্লা কী কুঁদড়ি, ব্যাঙ কী উন্দুরপিঠা, হয়ত এই ভোরবেলায় বুলানে হাঁতড়ে হাঁতড়ে ধরে এনেছে লুবুকাঁকড়া—সেইসব খাওয়াবে।

ইস্কুল হোস্টেলে ডাল, ট্যাড়শের ঘণ্ট, বৈতালের ঘেঁট, লাউয়ের চুপ্পি, চপের ডালনা, মাঝে মাঝে রুইমাছ, তুড়-গেঁতি-ধানাহুলুমাছ খেয়েও নুকুর মন পড়ে থাকে বই কি গোধি, চিঁড়রা, ঢ্যামনাসাপের মাংসে। কাল্লাকাঁকড়ো ভাজায়, চেঁকাশাক-বনপুঁই পাতার ঝোলে, সীতানালা খালধারের শুশনি শাক-পোড়ায়। কেঁদ-ভুড়রু-ভেলা কচড়া-কুসুম তো 'অম্রুতো'!

তড়াক করে উঠে পড়ল লক্ষ্মী, মুনকুকেও ডেকে তুলল। পরনের ইজেরটা টেনেটুনে ঠিক করল। তাকে দেখতে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা, ছোট ছোট ভাইদের কোলে-কাঁখে করে এসে দাঁড়িয়েছে তাদেরই ঘুপচীর আঙ্গিনায়। আগুড় ধরে বুড়িরা গজল্লা করছে, নুকু শুনতে পাচ্ছে, অ দিদি, ম্যাইয়াটার নাম রাখ, সোরোসতী। কেউ বলছে, নোক্ষী-সোরোসতী একসঙেই রাখ্ এ-দিদ্দি।

নুকুর মা ফুলটুসিলোধানী তাদের সবাইকে বলছে, তুমরাই রাখো গ দিদি, সব ত তুমাদের আর্শীবাদে।

বলেই আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে বসল। ভুবনের জন্য, নিজের ভাগ্যের জন্য, দুর্ভাগা এই দুই মেয়ের জন্য।

আর থাকতে না পেরে দৌড়ে বেরিয়ে এল নুকু।—তুমি থামবে মা? কী শুরু করেছ এই সাতসকালে?

বলতেই চুপ, হাসছে।—নাই মা, কাঁদব কেনে? এই ত হাসছি।

বুড়ীরাও হেসে উঠল, হাসতে হাসতে নুকুও গাল টিপে আদর করতে লাগল সেইসব ন্যাঙটাভুটুঙদের, যারা তাদের ঘুপচীর আঙ্‌নায় ঘোরাঘুরি করছে, যারা তাকে দেখতেই এতক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারছে।

তাদের কেউ কেউ নুকুর চেনা, কেউবা অচেনা। হয়ত নাদনগাড়িয়া কী নাকবিন্ধি থেকে দোরখুলি এসেছে কুটুম্বিতায়।

ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমদের সরিয়ে নুকু তড়িঘড়ি এসে দাঁড়াল পিছন-আঙিনায়, যেখানে পা-ধোয়ার হাত-ধোয়ার জলের কলসি।

এ-বছর বর্ষায়, 'অরণ্য সপ্তাহে', স্কুল থেকে একটা 'কাগজফুল-' এর গাছ পেয়েছিল সে, স্কুলের লোকেরা নাম বলেছিল 'বোগেনভিলিয়া'। বাড়ি এনে নিজেদের উঠোনে তাই লাগিয়ে দিয়েছিল নুকু। এই কদিনে শিকড় ধরে বেশ চিকনচাকন হয়ে উঠেছে গাছটা।

গাছটা আরো বড় হবে, ঝাড় হবে, সুন্দর সুন্দর ফুল দেখে ঝাড়ের ডাল কেটে আর কেউ লাগাবে নিজেদের আঙ্‌নায় সমগ্র লোধাপাড়ায়। কেউ হয়ত আরেকটু এগিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যেও পুঁতে আসবে একটি কী দুটি ডাল। আর তাতেই 'কাগজফুলে' 'কাগজফুলে' ছয়লাপ হয়ে যাবে তপোবন-নারদা-নিগুই-সুখজুড়ি-ঘোড়াটাপুর জঙ্গল।

তখন হয়ত নুকু এখানে থাকবে না, তার কীর্তি থেকে যাবে। না থেকে নুকু আর যাবেই বা কোথায়?

নুকু থাক বা না থাক, সে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে পড়ে ফেলবে লবটুলিয়ার জঙ্গলে সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে আরেকটা লোক, নাম সত্যচরণ, বোগেনভিলিয়া লতা লাগাবার ইচ্ছা পোষণ করেছিল মাত্র কিন্তু লাগায়নি। এই এতদিন পরে দোরখুলির জঙ্গলে সে-কাজটাও করে গেল কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিক।

নিম-দাঁতনে দাঁত মাজবে নুকু, নিমডাল নিমগাছ খুঁজছে সে। জঙ্গলের ভিতর নিমগাছ নেই, একটা আছে সেই বুলানের ধারে, লোকালয়ে।

ঘরেই মজুত আছে শালদাঁতন, রামদাঁতন। আঁদাড়ে কাঁদাড়ে লাল ভেঁড়রা সাদা ভেঁড়রার গাছ। তবু মেয়ে নিমদাঁতন খুঁজবে, বুঝতে পেরে আগে ভাগেই নিমডাল ভেঙে ঘরে মজুত রেখেছিল ফুলটুসি।

বলল, এই লে মুনু, আমি ত জানতম, তুঁই টুঁড়বি।

নিমদাঁতন হাতে নিয়ে ফুর্তিতে নুকু চলল দোরখুলির 'বুলানে'। দোরখুলির বঙ্কা তার 'ধরম বাপ'। 'ধরম বাপ' পাতিয়েছে সেই কবে! বঙ্কা মাহাতোর মেয়ে রঞ্জু আর সে এক বয়সী। মাঝে মাঝে মায়ের হাত দিয়ে ধরমমেয়ের জন্য এক-দু'দিস্তা কাগজ পাঠাত 'ধরমবাপ' বঙ্কা।

কাগজের কথা মনে আসতেই বুকের খাঁজে গোঁজা কাগজটা টেনে বের করল নুকু। একটা কবিতা, স্বরচিত।

মনে মনে পড়ল একাধিকবার। আচ্ছা ভবিষ্যতে সে কী কবি হয়ে যাবে? নজরুলের মতো, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের মতো? কুমুদরঞ্জন মল্লিকও তো তার মতোই মল্লিক!

শিউরে কেঁপে কেঁপে উঠছে নুকু। উত্তেজনায় সে কী পাগলী হয়ে যাবে? আড়-পাগলী? একটা ঠুঁটো আসনগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কবিতাটা ঈষৎ জোরে জোরেই পড়ল নুকু—

বন-মা

কুমারী লক্ষ্মীরানী মল্লিক

দরখুলির জঙ্গলে　　　　কপ্‌তি-গুঁড়ুর পাখ ডাকে
　　চল্ রাণী চল্ মুনু পা ফেলাএ্যে একসঙে,
কেন্দ্‌-ভুড়রু পেকে আছে　　　　কুঁদরী-কাঁকড়ো ধরে আছে
　　তুল্ রাণী তুল্ মুনু যত ইচ্ছা হাত ভরে।
ভখ্‌লাতে আলু-তুগু　　　　যদি ধরে নরসিঙ্গ
　　বল্ রাণী বল্ মুনু একসঙে চেঁচাএ্যে—
বনে জনম বনে মরণ　　　　বন লোধাদের হকের ধন
　　কহে দে রাণী কহে দে মুনু,বন আমাদের মা বঠে।।

শ্রোতা কোথায়? নিস্তরঙ্গ বুলানের ধানবিলে মাঝে মাঝে খলবলে জল, জলের শব্দ, জলে ঘাই মেরে বড়জোর চ্যাঙ-গড়ুই-মাগুর-সিঙিমাছের লাফিযে লাফিয়ে ওঠা। আর এক, কবিতা শুনে ঝপ্ করে উঠে দাঁড়াতে পারে হেথা হোথা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে 'জলঘাট-বসা' নারী-পুরুষ।

না, তারা কেউ উঠল না।

বুলান থেকে মুখ ধুয়ে ফিরলে নুকুর মা মেয়ের জন্য হাঁড়ি টুঁড়ে বের কবল মেহা, পাকা মাদাল ফল। হাঁড়িতে খড় গুঁজে, তাতে থাক থাক কবে সাজিয়ে রেখেছিল ঘর-ছাড়া ডাঁটো আতা। তখনও পাকেনি। হাঁড়িতে খড়েব ওমে এই কদিনে পেকে গেল!

আতা দেখে মহাখুশি লক্ষ্মী। ও, এইজন্য তার মা তবে তাকে ঘন ঘন ডাকছিল, উঠ মুনু, উঠ!

উঁচু পিঁড়ায় বসে দুজনে, দুইবোনে, পা ঝুলিযে ঝুলিয়ে খেল, ঝক ঝকে দাঁতের মতো একেকটা কোয়া! বেশি খেতে নেই, খেলেই রসের জ্বব।

খাওয়া তো হল, এখন কী করবে নুকু? পড়বে? আচ্ছা, সে না হয় পড়া যাবে। কিন্তু রাইবুকাকাকে কবিতাটা সে শোনাবেই শোনাবে। বুঝুক, না বুঝুক।

পিতার নাম ভুবনচন্দ্র মল্লিক, লিখতে গিয়ে নুকু কতদিন ভেবেছে—লিখবে কী শ্রীরাইবু মল্লিক? রাইবুকাকা তার বাবার মতো। লোধাপাড়ার মাতব্বব সে। তার আগে মাতব্বর ছিল রাইবুশবরের বাবা গেঁড়াশবর।

রাইবুকাকাকে কী এখন ঘবেই পাওয়া যাবে, মা?

নাই জানি রে, মা, বলেই ফুলটুসিলোধানী বলল, কাজের মানুষ ত, ঘরে কী থাকে!

তার উপর 'গরু-খুঁটা'ব দিন আসছে। লোধামরদদের এখন খুব কাজ। গরু-জাগরণের আগে গরুকে 'মূল' দেয়ার তাগিদ আসছে।

এসময় লোধাজনমানুষ কী আর মাকড়ার মতো ঘরে থাকে? এই-কন্দ সেই-কন্দের ধান্দায় বন-জঙ্গল টুঁড়ে ফেলবে না? পাঁচবকম কন্দ গুঁড়ো করে, মিশিয়ে, যোগান দিতে হবে হাটুয়াদের

গ্রামে, লব্‌কেশরপুর-বিরিবাড়িয়া-বড়োডাঙায়। মাহাতোদের গ্রামে, কুম্‌হার-কাম্‌হারদের গ্রামে। কন্দমূল খেয়ে 'গরু-খুঁটা'র আগে গরুগুলো তেজা, বলীয়ান হয়ে উঠবে না?

লোধানী বলল, দ্যাক্ যেঞে, তুঁই এসেছিস শুনে আবার ঘরেও থাকতে পারে লোকটা। সর্বক্ষণ ত 'নুকু' 'নুকু' করে।

নুকুর এত খাতির? তাও আবার রাইবু মাতব্বরের কাছে? হিসাব কষে নুকু মনে মনে এর কারণ একটা খুঁজেও বের করল। কী সে কারণ, না নুকু লোধামেয়ে হয়েও এতদূর পড়েছে, আরো পড়বে। তাই, তাই।

লক্ষ্মী প্রায় ছুটে চলল, দৌড়ুল। দৌড়, দৌড়।

রাইবু ঘরে নাই, শিশুবালা নুকুকে ঘুপচীর ভিতর টেনে আনল। আয় মুনু, আয়!

বন্ধ্যানারীর সন্তান বাৎসল্য যেন উপ্‌ছে উঠতে চায়, কিন্তু কী এক অজানিত কারণে লাগাম টেনে ধরে। একটু একটু করে সে দড়ি ছাড়ে। এ কার মেয়ে? কার?

মুখ-চোখে হাত বুলিয়ে আন্দাজ পেতে চায় শিশুবালা। তারপর ভাবে, ধুত্ কী সব অমুক-ঢেঁক-ফাল্‌না-তুস্‌কা ভাবছি, অথচ কোথায় কী!

ভাবনাটাকে চাপা দেওয়ার জন্য নিজেই টেনে আনল গুড়খালোধার বহিন সাবিত্রীর প্রসঙ্গ। বলল, সাবির সঙে কুমহারদের একটা ছঁড়ার খুউব ভাব হয়েছে, মুনু শুনেছিস কি?

হুঁ-উ কাকী, সে ত জানি। সাবিত্রীবিটির লাভারের নাম সন্তোষ।

কী বললি. কিসের নাম? বুঝতে না পেরে শিশুবালা নুকু ওরফে লক্ষ্মীব মুখের দিকে হাঁ করে তাকায়।

নুকু হাসে, কাকী শিশুবালা 'লাভারের' মানে কী বুঝবে? লোধাপাড়ার আর কেউ কী বুঝবে? কেউই না, কেউই না। তারা তো বেহা বা সাঙা করেছে বাপ-মায়ের কথায়। হয়ত ছামড়াতলায় বরের সঙ্গে সেই প্রথম দেখা। পছন্দমত 'লাভম্যারেজের' তাবা কী বুঝবে? 'লাভ করেছি' বললে তারা বড়জোর বুঝবে ক্ষতি নয়, লাভ করেছি, হিঃ হিঃ—

নুকু বলল, না বলছিলাম কি গুড়খাপিসা বিযেটা দিয়ে দিলেই পারে।

তাবলে বেজাতের সঙে?

তাতে কী, বলেও নুকুব হুঁশ হল—তারা লোধা, তাবা জঙলীমানুষ, জঙ্গলে থাকে। তাদের সঙ্গে কোনো উঁচুজাতির ভাব হলে, বিয়ে-সাদি হলে, সে-বিয়ে কী টিকবে? দুদিন পরে ঘৃণায় দুদ্দুর করে তাড়িয়ে দেবে না? দিতে পারে। এমন কী লোধাপাড়ায় এসে হুজ্জোতিও করতে পারে। কাটাকাটি, মারধর। বলতেও পারে, এই শালা লোধারাই আমাদেব ছেলেটাকে ভুলাঁব ভালাঁয় তাদের ম্যায়াটাকে গছ্যাঁয় দিয়েছে।

না সাবিবিটি, না।

নুকু শিশুবালার ঘর থেকে বেরিয়ে সাবিত্রীদের ঘুপচীতে গেল। আজ সাবাদিন কী নুকু এই করে বেড়াবে? বুকের খাঁজে কবিতা লেখা খাতার ছেঁড়াপাতা গুঁজে শ্রোতাব সন্ধানে সারা লোধাপাড়া চষে বেড়াবে? আর লোধাপাড়ার লোধাজনমানুষদের যাবতীয় দুঃখ তাকেই শুনতে হবে?

কতটুকু মেয়ে! এখনও শোনার তার কানই হয়নি, তারচেয়ে সে পড়ুক কবিতা—

কেঁদ্ ভুড়রু পেকে আছে কুঁদরী-কাঁকড়ো ধবে আছে
তুল্ রাণী তুল্ মুনু যত ইচ্ছা হাত ভরে—

কেঁদ্-ভুড়রু কুঁদরী-কাঁকড়ো নয়, বনের বড় বড় ওলগাছ কেটে এনে, রোদে শুকিয়ে পরতের পর পরত জড়িয়ে তায় দড়ি বেঁধে ওলডাঁটার বল তৈরি করা। স্পঞ্জের মতো নরম সে-বল।

সেই বল নিয়ে নিজেদের ঘুপচীর আঙনায় একা একাই খেলছিল গুড়খার বড়বেটা নীলু। সেও হোস্টেল থেকে এসেছে। তবে সে নিচু ক্লাসে, ক্লাস এইট। আর নুকুর তো টেন!

একদম ভাল লাগে না, একদম না। তার চেয়ে ওল-ডাঁটার বল নিয়ে মাহাতোদের ছেলের সঙ্গে কুম্‌হারদের ছেলের সঙ্গে গরুবাগাল ছাগলবাগালদের সঙ্গে 'টুর্নামেন্ট খেলা' সে বরঞ্চ ভাল। তাই হোস্টেল থেকে ফিরে পুরাতন ওল-ডাঁটার বলে দমাদ্দম লাথি মেরে চলেছে নীলু। নীলেশ্বর।

একটা বল ধেয়ে আসছিল সোজা নুকুর দিকে, আরেকটু হলেই নুকুর সাদা জামাটায় লাগত। অত সুন্দর ফ্রক, ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকে দিল সাবিত্রী।

বলল, থাম বরা, ইকে দ্যাক আর নিজেকে দ্যাক। রাদ্দিন খেলা আর খেলা, গুটুল লিয়ে চিড়্‌রা মারা।

সত্যি সত্যি পকেটে গুলতি নিয়ে কাঠবিড়ালী শিকারে বেরিয়ে পড়ল নীলু, আর যাবে না সে বোর্ডিং-এ। হরগিজ্ না।

নুকুকে নিয়ে সাবিত্রী বসল গিয়ে ঘুপচীর পাছু ধারে, খিরিশগাছের তলায।

কথা বলবে কী, তাব আগেই সুরুক সুরুক করে কিছুক্ষণ কাঁদল। তার বউদিদি ঢালোও এসে মাঝে মাঝে দেখে গেল।—কাঁদনার কী হৈল রাণী? থাম্, থাম্ বলচি।

নুকুকে হাতের কাছে পেয়ে যেন একটু আশাব আলো দেখল সাবিত্রী। তাব যেন মনে হল, এই-ই পারে, তাদের দুজনকে এক করে দিতে, দুটি হাতকে জোড়া লাগাতে।

কিন্তু নুকু তো খুবই ছোট, বযসে তাব প্রায় অর্দ্ধেক, তার কথা কী বড়রা শুনবে? রাইবু কী মানবে?

এত বয়স হয়ে গেল, তাব এখনও 'বেহাঘর' হল না, আর কী হবে? তার বেহা নিয়ে কেউ তো মাথা ঘামায় না। না, কেহ-ই না।

এতদিনে যাও বা সে একটা জোটালো, নিজে নিজেই, তাকে নিয়েও তো কত অশান্তি! কত ফ্যাকড়াই না বের করে ফেলেছে খালভরা মাতব্বররা।

হেঁ নুকু, তোকে বলি, হামার বেদন কেহ-ই বুঝল নাই ধন, এক তুঁই ছাড়া।

আমি ছাড়া? নুকু যেন আনন্দে অভিভূত, তাহলে সাবিত্রীবিটিব কাছেও তার খাতিব? তাব মনের ব্যথা আর কেউ বুঝল না, তার দাদা বউদিদিও না, বুঝতে পারল কেবল সে-ই?

খড় মড় করে বুকের খাঁজ থেকে অতঃপব সে টেনে আনল "বন-মা"। এছাড়া যে তাব আরো অনেক গুণ আছে, সেটুকু দেখাতে নুকু গড়গড় কবে পড়তে লাগল—'

দরখুলির জঙলে কপতি গুঁড়ুব পাখী ডাকে
চল্ রাণী চল্ মুনু পা ফেলাএ্যে একসঙে—

"ও ললিতা আয় গো হেথা পাত গো ফুলের বিছানা" টুসু-গীতেব মতো, "টিলা টিলানি টিলায় গুঁড়ুর ঘুরে, পালক নাই চুলক নাই রাণী গুড়গুড়াএ্যে বুলে" বেহা গীতেব মতো একটা কিছু লিখে ফেলেছে নুকু, কিন্তু লেখাপড়া-না-জানা সে তার অত কী বুঝবে? তাকে অত শোনাচ্ছেই বা কেন নুকু? তবে কথাগুলো তো পবিষ্কাব, লোধারা যেমন বাতদিন বলে। এত লেখা-পড়া কবল, আর কবে, আর কবে নুকুটা হাট্টুযাদেব মতো বাবুভাইদের মতো লিখতে পারবে?

তবু হাসি হাসি মুখ করে সাবিত্রী বলল, হঁ মুনু, কাগজে নরসিঙা গাড়ের নামটা লিখে দেয়াতে একটা কাজের কাজ হয়েছে—কী যেন কী, ভখ্‌লাতে আলু-তুঙা যদি ধরে নরসিঙা?—নাই মিনা, নাই—আজতক আলু তাড়তে নরসিঙা ধরে নাই, হঁ।

যদি ধরে? নুকু জোর দিয়ে বলল, যদি ধরে? একসঙে চেঁচাএে বলতে হবে, এসময় নুকু আরো জোরে জোরে বলল, "বনে জনম বনে মরণ বন লোধাদের হকের ধন—"

তারপর তারা দুজনে আরোও জোরে জোরে হাসল, হাসতে থাকল, তাদের অত হাসি শুনে দৌড়ে এসে ঢালোলোধানীও কিছু না বুঝে হাসল।

ঢালো চলে গেলে নুকু সাবিত্রীর কানে কানে বলল, সন্তোষপিসাকে কাগজে এম্নি একটা 'লাভ-লেটার' লিখে দিব-অ।

কী সেটা?

চি-ট্-ঠি।

কিছু না বুঝে হাঁ-হয়ে থাকল সাবিত্রী।

হোস্টেলে এ-বই সে-বই থেকে, এর-খাতা তার-খাতা থেকে টুকে রাখা "কোটেশানের" একটা এখানে মুখস্থ ঝেড়ে দিল নুকু—

মাটিতে ফুটে কি ফুল বিনা বরিষণে।
চিঠিতে মিটে কি আশ বিনা দরশনে।।



কুরথিকলাই কাটা চলছে।

দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করছে গোব্‌রাসাঁওতাল। মাথায় সেই ছেঁড়াধুতির পাগড়ি, গায়ে হেথা-হোথা ছেঁড়া ঝিল্‌ঝিল্ গেঞ্জি। কাঁধে একটা বাঁটভাঙা ছাতা।

এবছর সহরায়-বাঁদনার আগে আগেই কুরথিকলাইয়ের ক্ষেতে পাক ধরল। না কাটলে কুরথির দানা ক্ষেতেই ঝরে পড়ত খোসা ফেটে। অর্দ্ধেক নষ্ট হত।

কুরথি কাটছে ঘরের দু'জন, তার বউ আর তার বেটার বউ। আর সব বাইরের লোক। বাইরের মানে আশপাশের গাঁ-গঞ্জের কামিনরা। তাও বড়রা কী আর, ছোট ছোট ছাগল-বাগালরা।

কেউ কেউ তাদের ছাগলও ছেড়ে রেখেছে পাশের ন্যাড়ামাঠে। কাটা গাছের কাণ্ডে গজিয়ে-ওঠা পাল্‌হা-পতর চিবোচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মন গেল তো মুখ তুলে চরাণীর খোঁজে ম্যা-ম্যা করে দুয়েকবার ডেকেও উঠছে।

সব মেয়েরাই। দা দিয়ে গোড়া কেটে কম্বল গোটানোর মতো পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে একেক জায়গায় জড়ো করছে, কুরথিকলাইয়ের লাট।

কড়াইশুঁটির চেয়েও ছোট ছোট শুঁটি, কড়াইশুঁটির বীজের মতো অত বড় বড়ও নয় দানাগুলো। কাঁচায় ভেঙে খেলে তো বেশ গাদর গাদর। গালের কষ বেয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ে। পাকায় খেলে তেমন কিন্তু সোয়াদ নেই।

আজ বেশ মউজেই আছে গোব্‌রাসাঁওতাল। কুরথি-ডাহির এক কোণে মহুলগাছের তলায় ওই দেখা যায় ভুসভুসে কালো হাঁড়ি একটা, হাঁড়ির মাথায় ঝকঝকে একটা জামবাটি। তার

চারধারে মিশমিশে কালো একটা ঢেপচুপাখিও উড়ছে-ঘুরছে। গোব্‌রার মনে হল, শালার পাখটাও হাঁড়িয়ার বাস্‌ পেয়েছে।

কালো হাঁড়িতে পচাই অর্থাৎ হাঁড়িয়া রাখা আছে। গোব্‌রাও ঘুরছে ফিরছে, আর মাঝে মাঝেই মন্ডলতলায় হাজির হয়ে জামবাটিতে ঢেলে দু-চার ঢোঁক মেরে দিচ্ছে।

পাঁচু বা পচাই পেটে ঢুকবার পর গোব্‌রা মউজে নিজের বেঁকানো গোঁফজোড়াটায় হাতের চেটো বুলিয়ে নিচ্ছে, আর মুচকি মুচকি হাসছে।—বুড়ি আর বেটার বহু কী তাকে দেখছে না? আড়ে আড়ে নিশ্চয় দেখছে।

কী ভাল্‌ছ ভ্যাল্‌ ভ্যাল্‌, যার সর্ষা তার তেল। কুরথি কাটতে কাটতে সাঁওতালবুড়ি আর তার বেটার বউ বুড়োকে আড়চোখে দেখছে ঠিক, আর মুচকি মুচকি হাসছেও। তবে তাদের তো বলবার কিছু নেই। তবে তাদেরও টাক্‌রা শুকোচ্ছে, খালি জল-শঁশ পাচ্ছে!

গতকাল গোব্‌রা গিয়েছিল ডাঙাসাহির পিতাম হাঁসদার বাড়ি। পিতাম, বেশ চাষীবাসী লোক। তার বাড়িতেই এসেছে 'কানফুঁকা গুরুবাবা', পুরহুৎ। প্রতিবছরই সে একবার করে আসে, এই ধান-কাটার সময়।

জলকলস-কলমকাঠি-গেঁতোই যখন জলের তলায়, নুনিয়া-জামাইলাড়ু কী কার্তিকছোলা বড়জোর খামারে উঠেছে, সন্ধ্যায় বুড়বুড়ি ঝর্ণার জল থেকে জলধোঁয়া ধুনিয়ে ধুনিয়ে যখন পিতাম হাঁসদার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখনই আসে হরিবোল বাবা।

হরিবোল, হরিবোল!

কানফুঁকা হরিবোল বাবাকে বড় ভালো লাগে গোব্‌রাসাঁওতালের। গুরুবাবা এলে, সে ঠিক করে ফেলে—দীক্ষা নেবেই, এবছর তো নেবেই! এই মনোভাব নিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় সে গিয়েছিল হাঁসদার বাড়ি।

শাড়ি ধুতিতে হাঁটু, পায়ের পাতা ঢেকে দীক্ষা নিচ্ছিল অনেকেই। বিশেষত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল। যেন হিড়িক পড়ে গেছে! তাদের কানে কানে ফুঁ দিয়ে বীজমন্ত্র ঢেলে দিচ্ছে।

তাদেরই একজনকে ঠারে-ঠুরে কাছে ডেকে গোব্‌রা জিজ্ঞাসা করল, তুমার কানে কানে কানফুঁকাবাবা কী বলল, গে মাই?

সে বলল, বলতে মানা আছে, বুঢ়হা।

শুনে বড় বিমর্ষ হয়ে হাঁটুতে হাতবেড় দিয়ে দুলছিল গোব্‌রা। দীক্ষা নিলে মদ-হাঁড়িয়া - মাংস জন্মের মতো ছাড়তে হবে। তা কি ছাড়া যোয়? সে তো হাউসী, মদ-হাঁড়িয়া না খেলে হাউস করবে কী করে?

এই তো ক'দিন বাদে সহরায়, ক'দিন বাদে বাঁধ্‌না। বাঁধ্‌নায় সে গরু খুঁটাবে কাড়া খুঁটাবে। গরু খেলাবে কাড়া খেলাবে কত, ক-ত্ত হাউস করবে। এখন হাঁড়িয়ার জাম-বাটি ঠোঁটের কাছে ধরে কানফুঁকা গুরুবাবাকে মনে মনে স্মরণ করল গোব্‌রা!—মাই বাবা, এ হে বাবা, ক্ষেমা করে দিস্‌ এ বাবা! ই বছরটা যাক, যেতে দে, আসছে বছর, হঁ আসছে বছর কানে ফুঁ লিবই লিব-অ।

মুচকি মুচকি হাসছিল গোব্‌রা।

কুরথি কাটতে বসেছিল ভুঁইয়াদের চারু, কিরণ, বাগালদের কুসুম আর কুম্‌হারদের নাথনী।

ধানকাটার মতো ঝুঁকে ঝুঁকে কোমর বেঁকিয়ে তো আর কুরথি কাটা যায় না, কুরথি কাটতে হয় বসে বসেই। কত বড় আর গাছ? এই হাঁটু সমান। তাও গাছ কী আর, লতা। কুরথি লতা।

গোব্‌রার বউবুড়ি বেশিক্ষণ বসে বসে কুরথি কাটতে পারছিল না, সেও মহুলগাছের তলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল। গোবরাও তখন নানান ছুতোয় তার কাছে জুটে যাচ্ছিল।

চারু কিরণদের তো আর দাঁড়াবার, দু-দণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার অবসর নেই। তারা নিজেদের ভিতর গল্পগুজব করতে করতেই কুরথি কাটছিল। তারা গোব্‌রার বউবুড়ির সঙ্গে, তার বেটা-বউয়ের সঙ্গে তেমন কথাও বলছিল না। সাঁওতালবুড়িই বরং যেচে যেচে তাদের সঙ্গে কথা বলছিল।

কী আর কথা, ব্যাঙের মাথা। চারু-কিরণ-কুসুম-নাথ্‌নীরা মাঝে মাঝে কোমর সোজা করে, উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের ছাগল দেখছিল। আর মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে আওয়াজ দিচ্ছিল, এড়্রে—এএএ...!

ছাগলগুলোও তেমনি। চরতে চরতে একটা-দুটো ঘাড় উঁচু করে সাড়াও দিচ্ছিল, ম্যা-এ-এএএ.. !

ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে একটু রগড় করতে মন গেল গোব্‌রাব। বলল,

ং ঃ্ মেনাঃ তায়া পটা দ বাং
মচা মেনাঃ তাযা ডাটা দ বাং—

বল্ ত কি, এই ছুঁড়িরা? বলেই সে হাসছিল, আব তার বাঁকা-গোঁফে তা দিচ্ছিল।

মেয়েদের মধ্যে কিরণ খুব সুন্দরী, আর বড় হলবলি। সে বলল, আঃ লাঃ ঠারে ঠারে কী বলছিস্ কী করে বুঝব? আমার ত মনে লয, লাচতে বলছিস্।

কথা শুনেই গোব্‌রাবুড়ি, তালপাতার ঝঙ-মাথায় তার বেটার বউ—দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

মজা পেয়ে গেল গোব্‌রাসাঁওতাল। বলল, তাই লাচ্, লাচ্ ন দেখি ছুঁড়ি।

কুসুম, নাথ্‌নী—দুজনেই পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করে বলল, আজ সান্তালবুঢ়্‌হা খুব মজায় আছে, সহরায় আসছে ত!

হঁ সহরায়, তা 'গরু-খুঁটা-লাচ'ই লাচ্।

চারু-কিরণ-কুসুম-নাথ্‌নীরা কি আর নাচতে পারে না? না, জানে না? সব পারে, সব জানে। কিন্তু সাঁওতালবুড়ো তো আর সত্যি সত্যি নাচতে বলছে না।

কাজ ছেড়ে নাচ লাগালে কুরথি কাটবে কে? মজুরি দিয়ে কুরথি কাটাচ্ছে, কুরথি না কাটিয়ে নাচ দেখবে? অত্ত বোকা কী আর গব্‌রাসাঁওতাল? ববঞ্চ খুব বদরাগী।

কুরথি কাটতে কাটতেই কিরণ বলল, ঠারে কী বললি, আগে বল্—তবে ত লাচব।

গোব্‌রার বউবুড়ি-ই ভেঙে বলে দিল মানেটা, সে-একটা হেঁযালি—

পেট আছে আঁতি-দড়া নাই
মুখ আছে দাঁত-ঝড়া নাই—

ইবার বল্, কী?

'আঁতি-দড়া'? তার মানে নাড়িভুঁড়ি। মাথার উপর খাড়া রোদ, মহুলগাছের ছায়াও এখন অনেকটা দূরে। রগুড়ে বুড়োর এখন হেঁয়ালির বাই উঠল?

হেঁয়ালির উত্তর দিতে কুসুম কিন্তু খুব দড়। সে খাড়া হয়ে বলল, আমি বলব?

গোব্‌রাসাঁওতালের পছন্দ কিরণকে। সে হাত দেখিয়ে বলল, না, উহে-ই বলুক।

অরে বুঢ়্হা!

কিরণের কিন্তু সবকিছুই গুলিয়ে যাচ্ছিল। পেট থাকলে নাড়িভুঁড়ি তো থাকবেই, মুখ থাকলে দাঁত থাকবে না? নাড়িভুঁড়ি নাই—দাঁতের ঝড়াও নাই—কী জিনিস রে বাবা?

বেলা চড়্ চড়্ করে বেড়ে যাচ্ছিল। কুরথির ভুসি লাগছিল দেহে ও মনে।

বেলার দিকে তাকিয়ে কাস্তের ডগা দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল কিরণ।

ধান কাটাতে, কুরথিকলাই বিরিকলাই কাটাতে, কী ধানরোয়া 'তলা' তোলার কাজে, যে কোনো কাজে, কাজটা ভালভাবে তুলতে গেলে কামিনদের সঙ্গে মিশতে হয়। হাসিঠাট্টা ঠিসারা-মস্‌করা তো করতেই হয়।

গোব্‌রাসাঁওতালের জোত্-জমিন খুব অল্প নয়, বড় দরের চাষী সে। তল্লাটে তার খুব কদর। তার উপর সে খুব 'হাউসী'।

হেঁয়ালির গোলকধাঁধায় যখন সবকিছুই গুলিয়ে যাচ্ছে কিরণের, তখন নাছোড় বুড়ো তাকেই 'ভাঙানিটা' ভেঙে দিতে ঘন ঘন চাপ দিচ্ছে? কুসুম হেঁয়ালির উত্তরটা আর যখন পেটে রাখতে পারছে না, সে দম্‌সম্ করছে, তখনই দোরখুলির মাহাতোপাড়ার ওদিক থেকে মেয়ে নুকুকে সঙ্গে নিয়ে ভুবনালোধার বউ ফুলটুসি লোধাপাড়ায় ফিরছে। ফিরছে।

সুখজুড়ির গোব্‌রাসাঁওতালের কুরথিডাহির পাশ দিয়েই আতা-যাতের রাস্তা। মেয়েকে তার 'ধরমবাপ' বঙ্কা মাহাতোর কাছে নিয়ে গিয়েছিল ফুলটুসি। বঙ্কা দেখতে চেয়েছিল তার 'ধরম মেয়ে'কে। বঙ্কার মেয়ের সঙ্গে নুকু তো ফুল পাতিয়েছে! সেই থেকে আত্মীয় কুটুম্বিতা।

কিন্তু ওই বড়জোর মেয়েরা-মেয়েরাই। মেয়েরা যাও বা একটু-আধটু মেশে, হববখত্ গাঁ-গঞ্জে যায়, লোধাছেলেরা পুরুষরা তো শতহাত দূর দিয়েই হাঁটে। কে জানে কার মনে কী আছে!

আপনার মনে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছিল লোধানী। খুউব খাতির কবেছে বঙ্কা। দু'মান মুড়িও দিয়েছে, সঙ্গে তিনঝুঁটি মকাই।

হেলতে দুলতে আপনার মনে ফিরছিল লোধানী। আচমকা, দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছে—গোব্‌রাসান্তালের কুরথি-ডাহি থেকে খুব হাসির রোল উঠছে। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ কবে উঠবে না ফুলটুসির?

যাদের আছে অতবড় কুরথিখেতি, আশধানের বিল, হেঁতু-বিল, যখন তখন দুম্‌পট্‌কা হাসির রোল তো তারা তুলবে, তুলতেই পারে। সঙ্কুচিত হয়ে ফুলটুসি দেখল—তার আর তার মেয়ের ছায়া-ছাঁয়রা এতক্ষণে কুরথিকাটনীদের ছুঁয়ে ফেলল। ছুঁয়ে ফেলল গোব্‌রাকেও।

ঘুরে দাঁড়িয়ে লোধানীকে দেখে গোব্‌রা বলল, ভুব্‌নাব পবিবাব, হঁ, তুহেঁ-ই বল্ ত—

পেট আছে নাড়িভুঁড়ি নাই
মুখ আছে দাঁত নাই—

কী জিনিস?

হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল ফুলটুসি। চোর বলছে নাই ত? কুরথি চুরি করার খোঁটা দিচ্ছে নাই ত?

মেয়ের হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে সে একটু চাঁড়ে চাঁড়ে পা চালাল।

ব্বাসরে! লদ্ধানীর খুব যে তাড়া? একটু যেন ঠেস মেরে কথাটা বলল গোব্‌রা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোধানী। মাথার ঘোমটা টেনেটুনে দাঁতে কামড়ে বলল, হঁ কী বলচ? এত্‌খন খেয়াল করি নাই।

হঁ, খেয়াল—ভুবনার পরিবার, একটা ভাঙানী বলছিলম।

বলেই গোব্‌রাসাঁওতাল হেঁয়ালিটা ফের আওড়াল। আর তাই শুনে নুকু ওরফে লক্ষ্মীর চটপট উত্তর, কলসি।

কুসুমও বলল, হঁ কলসি।

এত খুশি হল গোব্‌রাসাঁওতাল যে দুহাতের বেড়ে যতটা কাটা-কুরথির গাদা উঠানো যায় উঠিয়ে লোধানীর হাতে দিয়ে বলল, লিয়ে যা, ম্যায়াটাকে ঝেড়েঝুড়ে ভাজা করে খাওয়াবি।

হতভম্ব লোধানী উত্তেজনায় থর্ থর্ করে কাঁপছিল। কৃতজ্ঞতায় সে একবার তাকাল গোব্‌রার দিকে, আরেকবার তার বউ, বেটাবউয়ের দিকে।

কুরথিগাদায় মাথা ঢেকে, কিছুটা এগিয়ে এসে, হেসে ফুলটুসি মেয়েকে বলল, হাঁড়িয়া গিলেছে বুঢ়্হা, মাথার ঠিক নাই।

মাথার ঠিক নাই, মাথার ঠিক নাই—মা কেন বলল? মাথা ঠিক না থাকলে কেউ কখনও হেঁয়ালির উত্তর শুনে এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে? একগাদা হকের কুরথি পুরস্কার স্বরূপ দান করে দেয়?

লক্ষ্মীর মনে হল, এই-ই ঠিক লোক। একেই কবিতা শুনিয়ে পাওয়া যাবে যথার্থ আনন্দ। 'বন-মা' কবিতাটা কী একবার গোব্‌রাসাঁওতালকে শুনিয়ে দেবে সে?

"কহে দে রাণী কহে দে মুনু বন আমাদের মা বঠে", 'বন-মা' কবিতাটা তো লোধাদের নিয়ে, সাঁওতালদের নিয়ে নয়। সাঁওতালবুড়ো খুশি না হয়ে রেগে যেতেও পারে। টাঙ্গি মুচড়াঞে বলতেও ত পারে, কী বললি বিটি, বন লোধাদের মা বঠে, আর সান্তালদের মা লহে?

ভেবে-চিন্তে স্বরচিত কবিতাপাঠ থেকে নিরস্ত হল নুকু।

একটু পিছিয়ে পড়েছিল সে, লোধানী বহ্‌ড়াগাছের ওধার থেকে হাঁক ছাড়ল, আয় মুনু, জলদি পা চালাঞে আয়! লইতন কুরথি ভাজেঁ দিব-অ মুড়হির সঙে কুড়ুর-মুড়ুর খায়েঁ লিব্বি, আয়!

কে জানে, লইতন অর্থাৎ নতুন কুরথিভাজার সোঁদা গন্ধে গন্ধে উদাস কী না, কবি কুমারী লক্ষ্মী মল্লিক তো লোধাপাড়ায় নিজেদের ঘুপচীর দিকে ত্বরিতে পা চালাল।

এই কদিনে লোধাপাড়ার প্রকৃতিতে একদিকে যেমন কবিতার আঁচ লেগেছে, আরেকদিকে অমনি খরায় মাঠঘাট কাঁপার মতো একটা কিছু ষড়যন্ত্রে গোটা পাড়াটাই ঠির্ ঠির্ করে কাঁপছে।

কবিতার ছোঁয়ায় লোধাপাড়া আর সে-লোধাপাড়া নেই। লোধাপাড়ায় বিস্তর লোক জুটেছে, লোধাপাড়ার কাঁচা ঘরগুলি হয়ে গেছে পাকার।

লোধাপাড়ার কুল্‌হিরাস্তার ধুলি কে যেন ট্রাক বোঝাই করে কোথায় নিয়ে গিয়েছে, তার জায়গায় ঢেলে দিয়েছে পিচ্।

ব্যারেল ব্যারেল পিচ্ রাস্তায় ফেলে বড় বড় উনুনে আগুন জ্বেলে সে-পিচ গরম হচ্ছে। গরম পিচের সঙ্গে স্টোন-চিপস্ মিশিয়ে রাস্তায় ঢালা হচ্ছে। তার উপর চলছে রোলার, রোলারের গাড়িটায় কতক লোধাবাচ্চা উঠে গিয়ে খুব মজা করছে।

রাস্তা শক্তপোক্ত না হলে, বাঁধানো না হলে, গাড়ি ঘোড়া চলবে কী করে?

লোধাপাড়াব লোধাজনমানুষদের জন্য পাকাবাড়ি ছাড়াও আরো বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানটায় স্কুল বসবে। জুনিয়ার হাই, হাই, হায়ারসেকেণ্ডারী। এমন কী একটা-দুটো কলেজও খোলা হবে।

ডাক্তারখানা বসবে, হাসপাতাল হবে, হেল্‌থ্-সেন্টার তো থাকবেই। এ-মোড়ে সে-মোড়ে ওষুধের দোকানও গিজগিজ করবে।

চালের গুদাম হবে, হবে কাপড়ের গুদাম। ব্যাপারীরা সে-চালের গুদাম থেকে বস্তা বস্তা চাল বের করে বেচতে বসবে। কাপড়ের গুদাম থেকে গাঁটরি গাঁটরি কাপড় বের করে হেঁকে হেঁকে কাপড় বেচবে।

কতকগুলি পুষ্করিণী কাটা হয়েছে, 'লিজ' নিয়ে জেলেরা সেখানে মাছ ছেড়েছে, হপ্তায় হপ্তায় জাল ফেলে সে-মাছ হাঁড়া ভরতি করে মাছের বাজারে বেচতে বসেছে।

পানীয় জলের টিউব-ওয়েল বসেছে। লোধা মহিলারা সেখানে জড়ো হয়ে কল টিপে জল নিচ্ছে। জল নিতে নিতে ঘরের বরের যাবতীয় গল্প উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে।

মোড়ে মোড়ে পার্ক হয়েছে, পার্কে কতরকম গাছ, ফুল ও ফলের। সে-গাছের ছায়ায় ছায়ায় পাতা রয়েছে হরেকরকম বাহারী বেঞ্চ। সে-বেঞ্চগুলোয় জোড়ায় জোড়ায় লোধা মেয়ে-পুরুষরাই বসে আছে।

নিজের ঘরের 'আঙ্‌নায়' একদা নুকু যে কাগজফুল অর্থাৎ বোগেনভিলিয়ার ডাল পুঁতেছিল, গোড়া ধরে গিয়ে আজ তা লোধাপাড়ার ঘরে ঘরে, প্রতিটি ঘরের দোরগোড়ায়, গোলাকার কেয়ারি হয়ে ঝুলে আছে।

মাটির টবে ছিট্‌ ছিট্‌ পাতাবাহার, পাম-পিট্‌না সিজ্‌-ফনিমনসার ঝাড় এতদিন যা লাটায়-পাটায় বড় অবহেলায় পড়েছিল, আজ তা লোধাদের ঘরে ঘরে, টবে টবে ক্যাক্‌টাস্‌!

লীলাম্বর বাঘাম্বর লুল্‌হি ভুল্‌হিরা যেন কোথায় চলে গেছে! তাদের জায়গায় এসেছে ডালকুত্তা। ল্যাজকাটা বিলায়েতী কুকুর। 'লোধাপাড়া স্টেডিয়াম' 'লোধাপাড়া স্টেডিয়াম' হাঁকতে হাঁকতে যে-বাসটা এইমাত্র গেল, দৌড়ুতে দৌড়ুতে লোধাপাড়ার জটাদিদি সে-বাসটার হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে গেল। কোথায় আর যাবে—টিকিট কেটে স্টেডিয়ামে ঢুকে বড়জোর ফুটবল খেলা দেখবে। আজ বড় ম্যাচ আছে হয়ত।

আরেকদিকে, রাইবুলোধার ঘুপচীর চালের দুটো টিন কবে থেকে কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে! রাইবুর তো গেছে দুটি, আর আর লোধাদের গেছে তিনটে-চারটে।

থেকে থেকে একটা-দুটো করে এখনও খসে যাচ্ছে। টিনের জায়গায় কারোর চালে উঠেছে খড়নাড়া, যা চাষীরা ধানের ডগা কেটে ক্ষেতেই ফেলে রাখে। কারোর উঠেছে ঘাস, বড় বড় পাতা আর নয়ত পড়াশঝাঁটি।

লোধাদের ঘুপচীর সামনের দিকে, পিছনের দিকে, যে-দুয়েকটা বড় বড় গাছ ছিল, রাতের অন্ধকারে কে যে কখন ঝেপে দিল!

ছাগল ছিল, মুরগী, বন-মুরগী নয় দেশি—তার কতক মরল রোগে, আর কতক কেটেই খেয়ে নিল।

কী যেন একটা 'ষড়' চলছে কোথাও। না হলে থেকে থেকে আঁটারি-চুরচুর ডগ্‌গুলি নড়ছে কেন? এই কাছের একটা গাছের ডালে ঝড়্‌ ঝড়্‌ আওয়াজ হল তো, দূরের করঞ্জগাছটার মাথা কে যেন ঝাঁকিয়ে দিল। কে? কে?

সাঁওতালদের বোনা কদো-গুঁদলিখেতির গুঁদলিগাছগুলোর মাথা এই একটু আগেও স্থির ছিল, কোত্থেকে একটা কু-হাওয়া এসে মাথাগুলো দুলিয়ে গেল। দুলিয়ে গেল।

কে যেন বহ্‌ড়াগাছটা থেকে ঝপাঙ্‌ করে লাফ দিল। আর কে যেন লদোপদো দৌড়ুচ্ছে, দুপায়ে বালি ছিটিয়ে। খসাবিলের, তিলবিলের পাকা গাছগুলোর যে কোনো একটায় কেউ একটু হাত ছোঁয়ালে সারা খেতির গাছগুলো একসঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠছে। তা কেন? তা কেন?

জঙ্গলে সাঁওতাল-বিরহোড়দেরও খেতি-খামার আছে। জনার ক্ষেত, তিলতিসির ক্ষেত, কদো-গুঁদলির বিল, আশধানের ডাহি, কুরথিকলাইয়ের মাঠ। কে জানে হাড়ামরা ঠিকঠাক নিয়ম মেনে বোঙাপূজা দেয় কি না দেখ। কুদ্রাকুদ্রি বোঙা, যে কী না আলো-আঁধারিতে কালো কুকুরের বেশে ঘুরে বেড়ায়, তাকে তো হামেশাই হেথা-সেথা দেখা যাচ্ছে।

কী যেন একটা 'ষড়' চলছে কোথাও। রাইবুর আঙুনায় রোজ দুবেলা মিটিং বসছে। কাঠিখুঁচি খাপরাকুচির আঁচড়ে গোবরলেপা রাইবুর উঠোন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

আর সন্দেহ করা হচ্ছে, কে যেন লোধাপাড়ায় রোজ রাতের দিকে আসছে, আবার রাত থাকতেই চলে যাচ্ছে।

কে আবার—সন্তুষ কুম্‌হার, সন্তুষ কুম্‌হার।

আর, ইসব গুড়খার মদতেই হচ্ছে। না হলে এ-ত্ত সাহস!

বাপ গেড়াশবরের সঙ্গেও রাইবুর এই নিয়ে কথা হয়েছে। চিঁ চিঁ করে বাপ যা বলেছে তার অর্থ হল—লোধাদের মেয়ে লোধাদেব ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না। বেজাতের লোককে বেহা করে যদি তো, বেজাতেব লোকটা লোধাপাড়াতেই আসুক। আসুক, থাকুক, লোধা হয়ে যাক।

খিঁচাখিঁচি বা টানাটানি বেহা, জোরজবরদস্তি বেহা, ধুকু বেহা বা পালাঁই যাওয়া বেহা—সে সব তো আমাদের সমাজে নাই রান্ধু, এককালে ছিল, তাও ছিল কী ছিল নাই,—সে বলতে পারে একমাত্র বড়সোলের গজনা।

গজনা, গজনা।

কিন্তু রাইবুর যে থেকে থেকেই মনে পড়ছে—কুম্‌হারদের চাক-ঘরের শীতলতা, কুমহারদেব মাটিখানার শীতলতা। শীতল, শীতল। কী ঠাণ্ডা, কী ঠাণ্ডা। চাকঘরে মাটিখানায় ঢুকলেই যেন জুড়িয়ে যায় প্রাণ। সেসব ছেড়ে, জাত-ব্যবসা ছেড়ে সন্তোষকুমহার কী করতে পড়ে মবতে এখানে আসবে? এই লোধাপাড়ায়?

এখানে তার চাক কই, চকটবাড়ি কই, মাটিখানা নেই, বাঁশতল্লির সুরুবালি চিকনবালি কই? এখানে কাঠ হয়ত আছে, কিন্তু ভেঁইচায় ন্যাতা বুলাবার জলের কাঠুয়া কই?

নেই, নেই।

তাবলে এখানে রোজ রোজ আসতে দেয়াটাও ত অন্যায়!

কী করবে? অন্য জাইতের সঙে হুজ্জতি করবে? করলেও কী আর পার পাবে? কাটাকাটিব কথা মনে নাই?

তার চে' এই ভাল, হাম্‌দেব মামা হাম্‌বাই খতম করে দি, আস-অ!

খুন, খুন।

দুহাত তুলে মানা করল রাইবু, অতধুব ভাবিস নাই, তার চে' এক কাম কর—

সাব্যস্ত হয় খুনোখুনি নয়, লোধারা খুব ঠাণ্ডা, তাদের দেহে বইছে সাপের চেয়েও ঠাণ্ডা রক্ত, সে রক্তে অত সহজে জোয়ার-ভাঁটা কী আসে? আসে না। স্থির হয় আজ রাতে সন্তোষ কুম্‌হাব লোধাপাড়ায় গুড়খার ঘরে ঢুকে যদি তো চিহড়লতা দিয়ে তাকে পাঁজুন বেঁধে রাখবে।

আর ঘরে না ঢুকে, বনে-জঙ্গলে বা আর কোথাও সাবিত্রীর সঙ্গে মিলে যদি তো দু-জনকেই দুটো গাছে হাতি-বাঁধা লতা দিয়ে বেঁধে রাখবে। আগে ত বাঁধ, তারপর বিচার—

চিহড় লতা মোটা লতা, হাতি বাঁধা লতা তার চেয়েও মোটা লতা।

মায়ের সঙ্গে কুরথির গাদা নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ঠারে-ঠুরে নুকু এই কথা শুনে এসেছে যে, একজনকে বাঁধে যদি তো চিহড়লতায় বাঁধবে আর দুজনকে বাঁধে যদি তো হাতি-বাঁধা লতায় বাঁধবে।

দুটোই শক্ত লতা, হাতি পারে না, তো সন্তোষকুম্‌হাব সাবিত্রীবিটির সাধ্য কী ছিঁড়ে ফেলবে!

খবরটা শোনার পর থেকেই নুকু ভারি দুশ্চিন্তায় আছে। সাবিত্রীবিটিকে কী করে খবরটা দেওয়া যায়? সাবিত্রীবিটি কী জানে, আর জানে যদি তো সন্তোষকুম্হারও কী এতক্ষণে জেনে গেছে? তার মাকে কিছু একটা করতে বলবে কী নুকু? মা যে কোন্ দলে—সে কী জানে? আর মাকে বললেও মা কী রাইবুকাকার মুখের উপর কথা বলবে? হয়ত মুখ ঝাম্টা দিয়ে মেয়েকেই বকবে, জাতের কথায় থাকতে নেই। কোথায় কী হবে বলা তো যায় না। যা করবার মাতব্বররাই করবে, চ্যাঙ-ফচ্কার কাজ কী?

না, চ্যাঙ্-ফচ্কাদের কাজ নয়। চ্যাঙ্-ফচ্কারা, ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমরা বড়জোর খাবে-দাবে, খেলবে-খুলবে, লেখাপড়া থাকলে লেখা-পড়া করবে, না থাকলে বাঁটুল-গুটুল নিয়ে চিঁড়্রা মারবে ক্যাঁক্লাস মারবে, কপ্তি-গুঁড়ুর-ক্যারকেটা ধরবে। বড়দের কথায় থাকবার অত দরকার কী?

নুকুও থাকল না, লোধাপাড়ায় খরো খরো করে সন্ধ্যা নামলে সে বোর্ডিংয়ের লণ্ঠনটা জ্বেলে চাটাই পেতে পড়তে বসল। তার বোন মুনকু তার গা ঘেঁষে দিদির বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভাবল—তাদের ঘরেই যত আলো কেরাসিনের, আর সব ত জুমড়া জ্বেলে ধোঁয়া গিলছে।

'বসে ডালে পোঁদটা জ্বলে'—দিদি কী বল্ ত? নিজেই বলল, বাঘযুগ্নি বাঘ-যুগ্নি। বাঘ-যুগ্নি অর্থাৎ জোনাকিপোকা।

হয়ত ঘরেই ঢুকে এদিক-সেদিক উড়ছিল, টিপা-লাইটের মতো আলো জ্বালছিল।

নুকুর সেদিকে মন নেই, তার কান পড়েছিল দূরে, গুড়খা-সাবিত্রীদের ঘরে, আরো দূরে দোরখুলির জঙ্গলে, যেখানে চিহড়লতা হাতি-বাঁধা লতা ধরে টানাটানির সর্ সর্ আওয়াজ উঠবে। উঠবে, উঠবে সে আরেকটু বাদেই।

সোরগোল একটা উঠল বটে। তবে দূরে নয়, কাছেই। শত্রুঘ্নলোধা ভর সন্ধ্যেবেলায় ভাকু অর্থাৎ মহুয়ার মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বউকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে, চ্যালাকাঠের বাড়ি মেরে বউকে ঠ্যাঙাচ্ছে। সব কী আর বউয়ের গায়ে লাগছে, চ্যালাকাঠের বাড়ি কতক তো পড়ছে ভুঁইয়ে, মাটিতে। তাই এত ফটাফট আওয়াজ।

ফুলটুসি নিজের আঙ্নায় দাঁড়িয়ে নাক খুঁটতে খুঁটতে মনে মনে বলল, এই হাম্দের সমাজ, শব্বর সমাজ, ইখেনে ম্যায়া মানুষ করা যায়? তারপরই হুমদুম বেরিয়ে গেল শত্রুঘ্নর ঘরের দিকে।

কীর'ম বহু তুঁই? আঙ্নায় লটরপটর শত্রুঘ্নর দিকে একবার, একবার শত্রুঘ্নর বউ নিয়তির দিকে চেয়ে ফুলটুসি বলল, মরদকে লিয়ে ঘরে ঢুকছিস নাই কেনে? ঢুকাঞে আগুড় দিয়ে দে। আগে ত শান্ত কর।

কী করে করি দিদি? মরদ এত্ত খাঞেছে যে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছে নাই।

কোড়ে বসাঞে ঘরে ঢুকা।

ফুলটুসির কথামতো মাতাল মরদের মার খেয়েও কোলে করে ঘরে নিয়ে গেল শত্রুঘ্নর বউ নিয়তি। তারপর, এই ভর সন্ধ্যেবেলা দোরে আগুড় দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বন্ধ আগুড়ের ওপাশে তর্জন-গর্জন এখনও থেকে থেকে উঠছে বটে, তবে খুব আপ্লুত স্বরে, হিসহিস করে।

কেমন যেন ঝিমিয়ে আসছে সব কিছুই। ফিরতে ফিরতে শতুরার ঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফুলটুসিলোধানী একবারটি ফিক করে হাসল।

শতুরার বহু নিয়তি কী এখনও মরদটার গায়ে হাত বুলাঞে দেখছে—রোঁয়া রোঁয়া কী নাই-রোঁয়া?



ব্রহ্মাকুমার মাটিখানায় এসেই সন্তোষের পিছনে লাগল। সন্তোষকে কাছে ডাকল, সন্তোষ!

সন্তোষ কাছে এসে বলল, হঁ, ব্রহ্মাদাদা!

তাহলে শেষতক কী ঠিক করলি?

কী প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা বুঝেও না-বুঝার ভান করল সন্তোষ, কিসের কী?

কিসের কী আবার, একটাই ত ব্যাপার—সাবিত্রী।

হঁ সাবিত্রী, মাটিখানার মুখটায় বসে শুকনো মাটির ঢেলা এ-হাত ও-হাত করতে করতে সন্তোষ বলল, সাবিত্রীর ব্যাপারে কী জানতে চাইছ, ব্রহ্মাদাদা?

জানতে চাইছি যে, যেন একটু টিটকারি দিল ব্রহ্মা, ইস্তিরি হিসাবে তাহলে সাবিত্তিরিকেই পছন্দ করলি?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সন্তোষ, তারপর হাতের ঢেলাটা দূরের কিরকিচ্ কাঁটার বনে ছুঁড়ে ফেলে বলল, কতবার বলব, কত লোককে বলব—হঁ হঁ সাবিত্রী আমার বহু বটে, সাবিত্রীকে ছাড়া এ জীবনে বাঁচব নাই।

সোজাসাপ্টা কথা। সন্তোষ যেমন কর্মঠ তার মনটাও তেমন বলিষ্ঠ। সে যেমন গাধার মতো খাটতে পারে, সে মাঝে মাঝে গাধার মতো দু-চাট্টা কথাও বলে ফেলে। অন্তত তার গাঁয়ের তার জাতের লোকেরা তাই মনে করে।

মাটিখানায় মাটি নিতে তার গাঁয়ের তার জাতের আর আর লোকও তো এসেছে। কথা শুনে প্রথমে তারা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর কেউ কেউ রাগ করল, কেউ কেউ মৃদু বকুনি দিয়ে বলল, থাম্ ম্যাড়া, এখনও বেহা-ই হল না, ত বহু।

কেউ বলল, লোধারাও দিচ্ছে আর কুম্হাররাও মেনে নিচ্ছে। কোথাকার জল কতদূর গড়ায়—দ্যাখো আগে!

তাও ত বটে। তাও ত বটে।

আচ্ছা সন্তোষ, তোর বাপ আমাদের ভৈরবজেঠা মানছে ত?

একথায় সন্তোষ কোনো জবাব না দিয়ে ফের দু'হাতে শুকনো মাটি নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

যদি ধর্ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়?

দিলে দিবেক। এখনও খেটেখুটে খাচ্ছি, তখনও খাব।

এ আড়বুঝকে এখন বুঝায় কে? এ ত সব বুঝেই বসে আছে, পারুল বিটি!

সম্পর্কে পারুল সন্তোষের পিসি হয়, আপনার পিসি। কিন্তু সে তার স্বামী-সন্তান নিয়ে আলাদা থাকে, তবে এই গ্রামেই। তাকে নিয়েও কেউ কেউ পড়ল।

বলল, কিগো পারুলবিটি! কিগো চৈতনের মা! পুত্রার 'বেহাঘর' হলে তুমি কী বরের মা হবে? সন্তুষের আপনার মা ত মরে হেজে গেছে কবে!

পারুল একটু হেব্লী, কথা শুনে হাসল কী হাসল না—বুঝা গেল না।

তবে তার মুখ থেকে কথা বের করার জন্য, এসময় সন্তোষকে ছেড়ে তার পিছনেও উঠে পড়ে লাগল কেউ কেউ।

আজ বাদ কাল 'বাঁধনা'। বড় পরব। কাল থেকে আর কোনো কাজ কাম হবে না।

গরু-মোষগুলো তো পাঁচদিন আগে থেকেই ছুটি পেয়েছে। তারা এখন বসে বসে ঘাস খাচ্ছে, শ্যামাঘাস বাঁশপতরি ঘাস, হিড়ের ঘাস। আর খাচ্ছে বন থেকে লোধাদের এনে দেওয়া 'মূল'। প্রতিদিন রাতে তাদের শিংয়ে পড়ছে তেল-সিঁদুর।

শুধু মানুষদের এখনও ছুটি হয়নি, কুম্‌হারদের মাটির কাজ এখনও সারা হয়নি। আজ পর্যন্ত যেটুকু পারবে করবে, কাল থেকে আবার তারাও হাত তুলে বসে থাকবে।

বাঁধনা পরব তো এখন তিনদিন ধরে চলবে। কাল অমাবস্যা, পরশু প্রতিপদ, তারপরের দিন দ্বিতীয়া। কাল যদি গরু-জাগরণ, পরশু গোহাল-পূজা-গইরাপূজা, তরশু বুঢ়ীবাঁধনা, গরু-খুঁটা।

কাজের মাটি আজ পর্যন্ত তুলে না রাখলে পরব শেষ হলেও তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে! তাই, আজ কুম্‌হারদের যত ভিড় মাটিখানায়!

কেউ কেউ ঢুকে বসে আছে মাটিখানার ভিতর, খুরপি দিয়ে খুপ্ খুপ্ করে মাটি খুঁড়ছে। সে-মাটি ঝুড়ি ভরে হাতে করে উপরে তুলে দিচ্ছে আর কেউ। মাটিখানার হাঁ-মুখে লোক তো বসেই আছে। কার মাটি কী মাটি দেখাদেখি নেই— ঝুড়ি ধরে ঝুড়িতে ভরে দিলেই হল। যার ঝুড়ি ভরতি হয়ে গেল, সে মাথায় তুলে শিকা-বাঁহুকে করে গুটি গুটি হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। আর যারা মাটিখানার হাঁ-মুখে তখনও বসে আছে হয় তাদের ঝুড়ি ভরতি হয়নি, নয় তারা বিড়ি খাচ্ছে, দোক্তা খাচ্ছে, এর-তার পিছুনে লাগছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেই তো খেঁচাখেঁচি, কাজ আর কাজ—

ব্রহ্মাকুমারের আজ তেমন কাজ নেই, তবে ব্রহ্মাকুমারীর সঙ্গে তার তেমন খেঁচাখেঁচি নেই।

দুঃশাসনের মেয়ে মালতী এসময় সন্তোষকে বলল, আমাদের জাইতে কী মেয়ের অভাব? লোধামাইয়াকে শুধু শুধু বেহা করতে যাবি কেনে, সন্তুষ?

আর কেনে, সেই বলে নাই— 'পের্‌মেতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম।'

ব্রহ্মা বলল, তা নয় তা নয়, এসব হল ভবিতব্য। পুরাণেই আছে— কলিযুগে এরকম অসবর্ণ বিবাহ আকছার ঘটবে।

বলেই সে শুরু করল, 'মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবান্! কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তার পূর্বক কীর্ত্তন করুন, যে কলিকালে চতুষ্পদ ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইবে। পরাশর কহিলেন— কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে না। সমস্ত বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে।' কী বুঝলে?

কেউ কিছু বুঝল না—কে মৈত্রেয় কে পরাশর? তবে তারা বুঝল, যুগটা কলিযুগ, ঘোরকলি। আর পুরাণ-শাস্ত্রে ব্রহ্মাকুমারের 'গেয়ান' ব্রহ্মার মতোই।

সন্তোষ তো আর যুগের বাহির নহে, যুগের ধর্ম তো তাকে মানতেই হবে।

সন্তোষ ভাবল, ব্রহ্মাকুমার তবে বুঝি তারই দলে। সে উঠে এসে ব্রহ্মাকুমারের গা ঘেঁষে বসল। বিড়ি বের করে ব্রহ্মাকে দিল।

ব্রহ্মা বলল, কিন্তুক আসল কথা হল, বনের আন্‌পড় লোধারা এটাকে কী চোখে দেখবে? তারা মেনে নেবে ত?

মানবে নাই? কে একজন মেয়ে মুখ-ঝামটা দিয়ে এসময় বলে উঠল, খায় ত সাপ-ব্যাঙ উন্দুর-বান্দর! দুবেলা দুমুঠো পেটভরে খেতে-পরতে পাবে, এই-ই ঢের। তার উপর জাইতের বিচার!

হঁ, মালতী বলল, বন্তার সঙে ত লোধাপাড়ার বেড়েই কুটুম্বিতা, রাইবুলোধা ওর ত সয়াও বটে, ঘটকালিটা উহে-ই করুক না।

ব্রহ্মাকুমার হাসল।

বলল, রাইবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা আছে বলে কী সব লোধারাই আমার কুটুম? অত সস্তা মনে করেছ? তার উপর কী নাম, গুড়খা না কার বহিন যেন সাবিত্রী—কার রে সন্তোষ?

সন্তোষ নাম বলে দিল। হ্যাঁ গুড়খালোধার বোন সাবিত্রী।

মাটি-ভার নিয়ে চলে যেতে যেতে ব্রহ্মাকুমার অবশ্য বলে গেল, ব্যাপারটা সে চেষ্টা করে দেখবে, এই পর্যন্ত।

ব্রহ্মাও গেল, বাকিরা সন্তোষকে চেপে ধরল, যতই খাওয়াস্ বিঁড়ি, বম্ভা কী আর অতসহজে তোকে বর দেবে? বিন্দুমাত্র চেষ্টা করবে? লোধাপাড়ায় তার খাতির কত! সেখানে আর কেউ খাতির পাক, ব্রহ্মা মরে গেলেও চাইবে না, দেখিস্।

তোকেও বলি সন্তুষ, কী দেখে মজ্‌লি? ইস্ গায়ে কী গন্ধ! শু'বি কী করে একসঙে?

কী করে ভাব হইল বল্ ত? বনে কাঠ কাটতে যেঞে, না হাটে হাঁড়ি বিকতে বসে? তোর কানে কানে ছুঁড়ি যে কী ঝুমর শুনাইল সন্তুব রে—

"বলি সোজা কথা ঢাকায় না ছলে,
লুকায় কী চাঁদ হাতের আড় দিলে?"

এসব প্রসঙ্গ ভাল লাগছিল না সন্তোষের, লজ্জায় মাটিখানা থেকে সে পালাতে চায়, আবার পালাতেও চায় না।

মাটিখানা হল কুম্‌হারদের আড্ডাখানা। আড্ডায় বসে কত কথাই তো ওঠে! কেউ একজন কুম্‌হার সমাজের কথাও বলল, মাত্‌বরদের কথাও তুলল।

তুলতেই আরেকজন বলল, মাত্‌বরদের কোমর এখন সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। পঞ্চায়েৎ এসেছে না? বিচার করতে হলে এখন বিচার করবে অঞ্চলপ্রধান।

তা-ই!

কেউ যেন সন্দেহ প্রকাশ করল। অঞ্চল প্রধান বিচার করবে অঞ্চলের উন্নতি-অবনতির। আর সমাজপতিরা বিচার করবে জাতের, সমাজের। এরকম একটা মুখরোচক ঘটনা পেলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে না?

কথা উঠল, আচ্ছা কুম্‌হারপাড়ায় এখন মাতব্বর আছে কে কে? গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত গোটা পাঁচেক নাম তো উঠলই।

রাজারাম, পঞ্চানন, সুরথ, দশরথ আর অমূল্য।

কেউ একজন যোগ করল, আর গুহীরামকে বাদ দিচ্ছ যে বড়? এই সমগ্র মাটিখানার যে-মালিক, যে-মাটিখানা কুম্‌হারদের ভাণ্ডারখানা, তার অধিপতিকে বাদ দিয়ে সমাজের বিচার ডাকছ? শিববিহীন দক্ষযজ্ঞ?

হাঁ হাঁ, তাও ত বটে।

অধৈর্য সন্তোষ তড়পে উঠে বলল, বিচার করে তারা বড়জোর কী করবে? জরিমানা তো? সে-জরিমানার টাকা না-হয় দিয়ে দিব।

আর?

আর কি?

গাবুর গুবুর খেতে চাইলে?

খাওয়াব।

এসময় তার জাঙে জোর একটা থাপ্পড় মেরে বন্ধুস্থানীয় কেউ একজন বলল, তব্বু আমার লদ্ধানীকে চাই, ইরি-ইইই মাকড়া! শখ কত!

হাসিতে ফেটে পড়ল মাটিখানা। এ-তল্লাটে বনের লোধামেয়েকে বিয়ে করার নজির তো আর নেই। নেই, নেই।

আস্পর্দ্ধা আছে সন্তোষের, সাহস বটে সন্তোষের, সন্তোষ মরদ বটে। সন্তোষ, সন্তোষ।

ডাকপিওন যাচ্ছে পাশের রাস্তা দিয়ে, হাতে চিঠির বাণ্ডিল। আড্ডাবাজদের ভিতর থেকে কেউ বলল, চিঠি আছে?

কার হে?

কার আবার, সম্ভষের?

ডাকপিওনও ব্যাপারটা জানে, সে গ্রামেরই ছেলে তো। রগড় করে সে-ও বলল, কোত্থেকে আসবে? লোধাপাড়া থেকে তো?

হঁ, হঁ।

শুধু শুধু বাণ্ডিল ঘেঁটে ডাকপিওন জানিয়ে দিল, ন্না, আজ আসেনি। হয়ত আসবে কাল।

মাটি-ভার নিয়ে সন্তোষ উঠে পড়ল, না, এ অসহ্য! কিন্তু যেতে যেতে ঝিরিঝিরি বাতাসের মতো তার মনে ভেসে এল, একটা চিঠি লিখলেও তো হয়? বহুতদিন দেখা হচ্ছে না সাবিত্রীর সঙ্গে। এদিক থেকে বাধা, ওদিক থেকে বাধা। মাঝখান থেকে একটা চিঠি উড়ে যায় যদি তো যাক না?

কথাটা নিজেই ভাবল, আবার মনে মনে নিজেই হাসল। চিঠি লিখলেও সে-চিঠি পড়বে কী করে সাবিত্রী? লেখাপড়া তো দূরঅস্ত্, সোজা-উল্টাই জানে না, কোন্‌দিক দিয়ে বই ধরতে হয়, তাই-ই হয়ত জানে না।

নিজে না জানুক, কাউকে ধরে হয়ত পড়াবে। দোরখুলি লোধাপাড়ার একজন তো বেড়ে উঠছে ডগ্ ডগ্ করে—সে ভুবনার মেয়ে। নাকি এবছর কী একটা পাসও দেবে সে।

আচ্ছা, খামের উপর কী লিখবে সে? লিখবে কি—সাবিত্রী মল্লিক C/o গুড়খা মল্লিক, মল্লিক-ই তো? না লোধা?

ভাবতে ভাবতে বাড়ি যখন পৌঁছাল সন্তোষ, মাটির ভার যখন নিকানো খলায় রাখল থপ্ করে, আড়চোখে সে দেখল বাপ ভৈরবকুমার দোরখুলি লোধাপাড়ার এক লোধানীর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে।

সন্তোষ আসামাত্র সে-গল্প যেন থেমে গেল হুট্ করে। দোক্তা-পাতা কী বিড়ি খুঁজবার অছিলায় ভৈরবকুমার গলা-খাঁকার দিয়ে উঠেও গেল লোধানীর কাছ থেকে, একটু যেন সঙ্কুচিত।

ধরতে পেরে সন্তোষ মনে মনে হাসল। লোধানীর অত লাজলজ্জা ডরভয় নেই, সে পরিষ্কার সন্তোষের মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেলল। এই রে, লোধানী আবার ভৈরবকুমারের সামনেই "এই যে জামাই" বলে ডেকে উঠবে না তো?

রীতিমত ভয় ধরে গেল সন্তোষের, যতসব উট্‌কো-ঝঞ্ঝাট। সে লোধানীর চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করল, আবার মনে মনে খুশিও হল। উঠে যাচ্ছ কেন, বসো না, গল্প কর, এই তো আমি—তোমাদের দেখছি না।

খামারে ধান উঠেছে। কতক গাদা মারা হয়েছে, আর কতক এখনও পড়ে আছে খলার একধারে। তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল ভৈরবকুমার।

লোধানী যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, যেমন যায়, বিশেষত এই দু-পহর বেলায়। ছেলে ঘরে নেই, গেছে মাটিখানায়, এই ফাঁকে লোধানীকে রাস্তা থেকে ডেকে আনল ভৈরব।

সন্তোষের দিকে তাকিয়ে থেকে লোধানী ফিক ফিক করে হাসছে, আর সন্তোষের নীরব নিষেধাজ্ঞার প্রত্যুত্তরে যেন মনে মনে 'বাঁধনা'র গান গেয়ে জানাচ্ছে—

হামরা যে যাতেছিলি, কুল্‌হি ন কুল্‌হি যে বাবু হো—
তোরো গিরিহায় ডাকিঞে ঘুরাল।

আমার কী দোষ, জামাই, আমরা তো শালপাতা আর দাঁতনকাঠি নিয়ে কুল্‌হিরাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম, তোর 'গিরিহা' তোর বাপ আমাকে ডেকে বাড়িতে নিয়ে এল। যেচে তো আসি নাই, রাগ করিস নাই, জামাই, চলে যাচ্ছি—

লোধানী তবু উঠে যাবার গা করছে না। ভৈরবকুম্‌হার আর তার ছেলের মতিগতি ধরতে পেরে আরোই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকছে। এটা চাই ওটা চাই—করে যাচ্ছে।

সন্তোষের বাপ ভৈরবকুমার যেন এখন তাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে!

নিকানো খলায় মাটি ঢেলে, পায়ের এড়ী দিয়ে, কখনো বা হাত দিয়ে ঢেলা ভেঙে ভেঙে, গেঁড়ি-গুগলির খোল চুনাপাথর বেছে রোদে-খরায় মেলে দিচ্ছে সন্তোষ। তার গা বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে দরদর!

ছাঁচতলায় ছাঁয়রায় বসে লোধানী ভাবছে, এ-কাজ আর ক'দিনবাদে গুড়খার বহিন সাবিত্রী করবে। যে-হাতে খন্তায় এতদিন আলু-তুঙা 'ভোকলাঁইছে', সে-হাতে মাটি শুকোতে দেবে, ঢেলা ভাঙবে, মাটি উল্টাবে পাল্টাবে! চাকঘরে শুকনো মাটি গাদা করবে। গাদার চারধারে বাঁশতল্লির চিকনবালি দিয়ে জল ঢেলে 'বতর' করবে, আরো ভালো বতরের জন্য মাটির উপর ভেজা বস্তা চাপা দিয়ে বস্তার উপর ঝারির মতো জল ঢালবে। এ পর্যন্ত সাবিত্রীর কাজ। তারপর তো মাটি-সানা, ডেলা করা, ডেলা চাকে বসিয়ে হাঁড়ি-উলা—সেসব ত জামাইয়ের কাজ, সন্তোষের কাজ।

লোধা-লোধানীরা কুম্‌হারপাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে কখনো আড়চোখে কখনো খরোচোখে এসব দেখতে দেখতে এতদিনে সবকিছুই ঝাড়া মুখস্থ করে ফেলেছে।

ভক্ লাগছে সন্তুষের বাপ, চাট্টি ভুজা দে!

ভুজা-মুড়ি চাইবার ছলে আজ লোধানী ভৈরবকুমারকে 'সন্তুষের বাপ' বলল, আগে আগে বলত 'বাবু' আর নয়ত 'মাহাজন'।

মনে মনে লোধানী বলল, দুদিন পরে ত 'বেহাই' বলব, সন্তুষের বাপও আমাকে বলবে 'বেহান'।

ভুজা-মুড়ি নয়, পিঠা-ই চাইত, ছাঁকা-পিঠা। কিন্তু সে তো হবে কাল। কাল, কাল। কালীপূজার দিনে, 'আমাবইসা'র রাতে।

ভৈরব চটে উঠল, উঠ্ ত লোধানী, এই দুপহর বেলায় কাজকাম ঢের—-দিগ্‌দারি করিস নাই!

বলল বটে, কিন্তু মুড়ি আনতে সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর। মাটি মেলতে মেলতে সন্তোষ যেন ভারি সন্তুষ্ট হল—লোধানীর প্রতি, বাপের প্রতিও।

মুড়ি নিয়ে লোধানী উঠে গেলে, বাপ ভৈরবকুমার কিন্তু ছেলেকে হুমকি দিয়ে বলল, তুই যেন লোধাপাড়ার উদিকে আর যাস্ নাই মাকড়া, কীসব শুনচি!

বাপের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সন্তোষ—বাপের কানে কী ফুসমন্তর দিয়ে গেল লোধানী?

বাপ সহজে ভাঙছে না। ধানের আঁটিগুলো বিঁড়া-গাদায় তুলছে। ঘুরছে ফিরছে, এটা-ওটা করছে। অবশেষে গজরাতে গজরাতে বলল, 'বরহই দড়া' আর কোথাল্লে পাবে, লোধা ত, বনের জন্তু—তাই জোগাড় করেছে বনের চিহড়লতা, হাতিবাঁধা লতা।

বরহই দড়ি? চিহড় লতা? হাতিবাঁধা লতা? এতসব দড়াদড়ি-লতালতির কথা উঠছে কেন? তবে কী কোনোকিছু বাঁধাছাদাঁর কথা হচ্ছে? 'বাঁধন দড়ি ছাঁদন দড়ি'? সে তো হবে কাল, গোঠটাড়ে, 'গোঠ-পূজা'য়। বনেজঙ্গলে সময়ে-অসময়ে কুড়চিকাঠের 'ঠরকা' গামার কাঠের 'ঠরকা' গলায় গরুমোষ চরতে চরতে ভুলে-বেভুলে চিহড়লতায় হাতিবাঁধা লতায় জড়াজড়ি করে থাকা গাছের ফাঁকে-ফোঁকরে যাতে না বাঁধা পড়ে, শিং না ঢুকে যায়, জড়িয়ে-মড়িয়ে বাঁধাছাঁদা না হয়—তার জন্যই তো 'গোঠ-পূজা', আর 'বাঁধন দড়ি ছাঁদন দড়ি।'

কিন্তু 'বরহই দড়ি'? সে তো পাটের দড়ি, শনের দড়ি। ইঁদারায় জল তুলতে লাগে। তার কথা কী করে আসে? আর সে-দড়ি পেলে লোধারাই বা কী করত? কাকে বাঁধত?

হুঙ্কার দিয়ে উঠল ভৈরব, বাঁধুক ত! লোধাদের চিহড়লতা হাঁতিবাঁধা লতার জোর কত দেখি! একবার কাটাকাটি হয়েছে, না হয় আরেকবার রক্তগঙ্গা বহে যাবে সীতানালায়, বড় নদীতে!

সন্তোষ ভেবে পায় না, এর মধ্যে কাটাকাটি খুনোখুনির কথা আসে কী করে? কী বলে গেল লোধনী যে বাপের অত রাগ, বাপ অত তড়পাচ্ছে:

জাতে ত লোধা বঠিস, তোদের ঘর থিকে আমাদের ঘরে আমাদের জল-চলে মেয়্যাকে বরণ করে নিয়ে আসব—ই ত তোদের গৈরবের কথা, তোদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য বে। তা নয়, লোধাপাড়ায় ঢুকলে ছেলাকে চিহড়লতা-হাতিবাঁধা লতা দিয়ে বেঁধে রাখবি, হুমকি দিচ্ছিস? গোঁড়াশবর কী মরে গেছে? পাড়ার মুঢ়া হয়ে কী করছে?

অ, এই কথা? সন্তোষ তো তাজ্জব! কোত্থেকে হয়ে গেল কী, বাপের এই মতিগতি! লোধানী কী তুক্‌গুন করে গেল বাপকে? অমন যে বাপ, নামেও ভৈরব কামেও ভৈরব, সে কী না গলে জল হয়ে গেল?

খলা ছেড়ে মাটি ছেড়ে সন্তোষ যে এখন কোথায় যাবে কী করবে—কিছুই ঠিক করতে পারছে না। একবার ভাবল—বাপের সঙ্গে বসে এই নিয়ে দুটো কথা বলে, আরেকবার ভাবল—বাপ যদি মাকড়াছেলের অতি উৎসাহ দেখে রেগে গিয়ে ফের আগের মতো হয়ে যায়? রাগের মাথায় চড়-চাপড় দিয়ে বসে?

তার চেয়ে থাক। তেলের শিশি হাতে ঝুলিয়ে মাটিমাখা দেহে তড়িঘড়ি সিনানে বেরিয়ে পড়ল সন্তোষ। সিনান বেলা, ঘর থেকে বেরুতেই আরো দু-চারজন সঙ্গী জুটে গেল তার।

তারা দেখেছে এক লোধানীর সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিল তার বাপ। তাদের বাড়ি থেকে লোধানীকে এই মাত্র তারা বেরুতেও দেখেছে। লোধানী তো বেশ হাসতে হাসতে হেলতে-দুলতে গেল।

তারা গ্রামের কুলহিরাস্তাটুক্ কোন মতে পার হতে দিল সন্তোষকে। কিন্তু ফাঁকা ইস্কুলটাঁড়ে এসে তাকে চেপে ধরল।

দেখলাম তোদের ঘর থেকে তোর শাউড়ী বেরুল। এতক্ষণ বেহাইয়ের সঙ্গে বেহানের আলাপ হচ্ছিল বুঝি?

হঁ, শাউড়ী না আর কিছু। এটা-ওটা ঠাট্টা তিসাবাবে নাস্তানাবুদ করে মারল। একজন তো সন্তোষের কনুইয়ের খাঁজে কনুই গুঁজে সিনানের গামছাটা সামনের দিকে নাড়তে নাড়তে গাইতে লাগল—

বড়খাঁকড়ির হাট যাতে বেহানে ধরল হাতে
বেহান, ছাড়্-অ হাত, ঝুড়িঝাঁটি বিকেই সাঁঝের ভাত
বিলে ঝাড়ে কাম নাই, নামাল খাটতে পুরাল যাই
বেহান, ছাড়্-অ

বাবুই ঘাসের চাষ করি,   দড়ি বুনলে মিলে কড়ি
মাহাজনে বলে ছুট-অ জাত—
বেহান, ছাড়-অ

যখন-তখন গান কী আর আসে? অন্যসময় ভুখা নয় ভরা-পেটেও কিল মারলে এক লাইন কথা আসবে না, কথা এলেও সুর আসবে না, কিন্তু কাল তো পরব, মহাবাঁধনা, এখন হুলুক-ভুলুক গান তো আসবেই। গান আসছে কদিন আগে থেকেই, হেথাহোথা ভূমিজপাড়া-কুম্‌হারপাড়া-কাম্‌হারপাড়া-মাহাতোপাড়ায় লোকে গান গাইছে, গাইছে কী আর, আসল পরবে গাইতে হবে বলে গানটা ছলেবলে কৌশলে গেয়ে ফেলে ঝালিয়ে নিচ্ছে।

ক'দিন আগে থেকে গান আসছে, আর আজ থেকে আসছে কুটুমরা, মেয়েজামাইরা, সঙ্গে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীরা। জামাই-বাঁধনা যে।

সাদা সাদা জামাকাপড় পরে কেউ আসছে আলের উপর দিয়ে, কেউ আসছে খালপাড় দিয়ে, কেউ এল মুগ-চনার ক্ষেতের পাশ দিয়ে, আর কেউ চলে এল পাতা-ঝজ্ঝাড় আখবিলের ধার ঘেঁষে। কেউ কেউ এসে পড়েছে, কেউ কেউ এখনও পিছিয়ে পড়ে আছে নদীবালিতে।

কেউ আসছে কুমহারপাড়ায়, কেউ আসছে নুয়াসাহির ভূমিজপাড়ায়। কেউ যাচ্ছে আরেকটু দূরে দোরখুলি-মুঢ়াকাটি-রখনীমারায়। নারদা-নিগুই-পুখুরিয়ার ওদিক থেকেও আতা-যাতের বিরাম নেই। বিরাম নেই, বিরাম নেই।

বন্ধুদের রঙ্গ-রসিকতায় লজ্জা পেলেও ভালোই লাগছিল সন্তোষের। এমন করে তারা আর তো কাউকে, এমন আর কারোর হাতের খাঁজে হাত ঢুকিয়ে তারা তো—

খালধারে পৌঁছে সন্তোষের এক সঙ্গী প্রেমচাঁদ বলল, ঐ দ্যাক সন্তোষ—এতক্ষণ তোদের ঘরে শাউড়ী ছিল, এবার আসছে বড়কুটুম, তোর শালা রে।

সত্যি সত্যি সন্তোষ হকচকিয়ে উঠে প্রথমটায় এদিক সেদিক দেখছিল। খালপাড় দিয়ে, কিয়াঝরিয়া-বিরিবাড়িয়ার গড়ান দিয়ে, মাথায় গাঁটরি নিয়ে সাফা জামাকাপড় পরে দু-চারজন আত্মীয় কুটুম্ব তো আসছিলই।

তাদের মধ্যে সন্তোষদের কেউ কী হতে পারে না? সন্তোষের পিসি না হয় এ-গাঁয়েই থাকে, মা মরে গেছে বলে কী মামাবাড়ি থেকেও কাউকে আসতে নেই? তার বড়কুটুম এখন কোথায়, তার না হোক বাপের বড়কুটুমরাও তো 'বাঁধনায়' আসতে পারে?

বছর বারো-তের'র একটা লোধাছেলে কোমরে নামমাত্র একটা কৌপীন জড়িয়ে হাতে 'গুজিয়া' নিয়ে খালধার বরাবর আসছিল, আসলে সে খাল ধারে ধারে কাঁকড়া খুঁজছিল। সঙ্গী প্রেমচাঁদ ইঙ্গিত করল তাকেই।

খালধারে জলো-জমিনের আলধারে, গর্তের মুখে যেখানে জল নেই, শুধুই থকথকে কাদা আর সে-কাদার উপর যদি ছাপ থাকে কাঁকড়ার ট্যারাবেঁকা পায়ের, তবে 'গুজিয়া' মারতে হবে ঠিক গর্তে নয়, গর্তের পাশেই। গুজিয়ার চাপে পড়ে কাঠকম্ বা কাঁকড়া বুজে আসা নিজের গর্ত ছেড়ে উপরে উঠে আসবে। আর উঠলেই 'গুজিয়া' চেপে ধরে করাতমুখী বড় বড় দাঁড়া দুটো পটপট করে ভেঙে দাও!

সেভাবেই সন্তোষদের একেবারে গায়ের কাছে মস্ত একটা কাঁকড়া ধরল ছেলেটা। গজ মারতেই ভুড়ভুড় করে বেরিয়ে এল কাঁকড়াটা। ডিমাল কাঁকড়া।

গুজিয়া চেপে প্রথমে দাঁড়া ভাঙল। তারপর যেন বোতাম টিপে কাঁকড়ার পেট খুলে অজস্র হলুদ ডিম মুখে পুরে কচমচ করে খেতে লাগল।

সন্তোষ, প্রেমচাঁদরা, সাঁওতালদের ছেলে কঁদা—কেউই কিছু মনে করল না। কারণ তারাও খায়, খেতে তো আর খারাপ লাগে না। কাঁকড়ার কাঁধের উপর চোখদুটো তখনও নড়ে যাচ্ছে, একবার ওদিক একবার এদিক।

তাই দেখে প্রেমচাঁদ জিজ্ঞাসা করল, এই লোধাছানা, বল্ ত, কেনে কাঁকড়ার কাঁধে চোখ?

নাই জানি।

তুই জানিস, কঁদা?

সাঁওতালদের ছেলে কঁদা হাসল। যার অর্থ দুটোই হতে পার—জানি, অথবা জানিনা।

প্রেমচাঁদ বলল, শুন!

বলেই সে শুরু করল। সৃষ্টির আদিতে ছিল শুধু জল আর জল, আর ছিলেন এক বোঙা, সিং বোঙা। তিনিই ঈশ্বর। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করলেন কেঁচো, কাছিম, মাগুরমাছ আর কাঠকম্।

কাঠকম্ কী জানিস ত ?

কঁদা বলল, হঁ জানব নাই? ক্যাকড়া।

হঁউ, কাঁকড়া বঠে।

তো সিং বোঙা মনস্থ করলেন জল তো হল এবার থল। পৃথিবী গড়বেন। মাটি চাই, মাটি চাই। মাটি তো আছে জলের তলায়!

গা ধুতে ধুতে সিং বোঙার শরীর থেকে যে-পরিমাণ ময়লা দিন দিন ঝরে পড়ছে, তাই জমে জমে এতদিনে মাটি হয়েছে। মাটি তো আছে, কিন্তু তুলে আনবে কে?

ডাক কাঠকম্‌কে।

কাঠকম্, কাঠকম্! জল থেকে মাটি তুলতে পারবি, অনেক মাটি?

হঁ, পারব বোঙাঠাকুর।

তারপর থেকে মাটি তুলতে লেগে গেল কাঠকম্। কিন্তু কাঁকড়া কী আর পারে? ঐ ত কটা দাঁড়া তার। দাঁড়ায় যতই তুলে, ততই মাটি জলে ধুয়ে ফের তলায় চলে যায়।

কই কাঠকম, মাটি কই? মাটি?

কাঁকড়াকে জিজ্ঞাসা করেন সিংবোঙা। একবার নয়, তিনবার। তিনবারই ঘাড় নিচু করে, একটাও কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কাঠকম্। দাঁড়িয়েই থাকে।

তাই দেখে রেগে সিংবোঙা বললেন, ঘাড় নিচু কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে অছিস, তবে তোর কাঁধেই চোখ হোক।

সেই থেকে জানবি কাঁকড়ার কাঁধে চোখ। প্রেমচাঁদ থামল।

শুনে-টুনে কঁদা হেসে বলল, তুঁই বলে দিলি ঝট্ করে, না'লে আমিই বলতম, হঁ।



দোরখুলির বঙ্কা মাহাতোর দোকানে খুব বিক্রি হচ্ছে তালপট্‌কা আর বিড়িপট্‌কা।

মোমবাতিও। তবে এদিকে ঘিয়ের প্রদীপ, তেলের প্রদীপ দেওয়ারই চল বেশি! তেল-ঘিয়ের তো অভাব নেই। আর কতরকম তেল—কচড়া, কুসুম, জাড়া, সরিষা, খসা-তিল, তিসি। আর ঘি? যত না খায় তার চেয়ে পুজোয় দেয়, ওষুধ করে বেশি।

তারাবাতি, ছুঁচি, হাউই, ফুলঝুরি, ব্যাঙবাজি, ছুঁচোবাজি, চরকি—কী না এনেছে বঙ্কা! ডালডাও!

দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে একটা লোধাছানা বলল, আধসের গুড় দেও দুকানী!

লিবি কিসে? বাটি এনেছিস?

বাটিটায় 'চাঙু'র মতো দু'-আঙুল ঠুকে কুড়কুড় বাজিয়ে ছেলেটা বলল, হঁ-অ। আহ্লাদে তার মুখ থেকে লালা ঝরছে।

গুড় বিক্রি হচ্ছিল ফাঁকা খলায়, খামারে। দোকান ঘরে নয়। ঘরের ভিতর এদিক-ওদিক গুড় ছিটকে পড়ে থাকলে পিঁপড়ে এসে জুটবে। কালো কালো পিঁপড়ে। তখন দোকান ঘরে পা ঝুলিয়ে বসা-ই দায় হবে।

তার চেয়ে খলা-খামারেই ভাল। একটা নতুন গুড়-কুঁদা গোবর নিকানো 'খলা-য় বসিয়ে দিয়েছে বঙ্কা। তারজন্য আলাদা দাঁড়ি, আলাদা মাপুই। বঙ্কার ভাই হাড়িরাম কুঁদার ভিতর চাটু ডুবিয়ে গুড় তুলছে।

'বাঁধনা' তো গুড়-পিঠারই পরব। ছাঁকা-পিঠারই পরব। পরব, পরব। আতপ চালের গুঁড়িতে গরম জল আর গুড় মিশিয়ে লেচি বানিয়ে গরম তেলে কী ডালডায় ফেলা, তারপর ব্যাঙের মতো ফুলে উঠলে কাঠিতে গুঁজে ছেঁকে তোলা। আর দুধে ফেললেই 'দুধ-পোয়া।'

গরম গরম গুড় কিনতে কিনতেই যেন ছাঁকা-পিঠার স্বপ্ন দেখছে। সে কী ছাঁকা-পিঠার জন্যই এসেছে গুড় কিনতে?

হঁ-অ, তা লয় ত আব্বার কী?

বছরকার পরব, ধার-উধার যে করেই হোক ছানাপোনাদের জন্য ছাঁকা-পিঠা চাই-ই চাই।

বাবু-ভাইয়েরা, হাটুয়ারা, কাম্‌হার-কুঁভাররা মাঝে মধ্যে করে 'দুধপোয়া'। মাঝে মাঝে চাল গুঁড়ির সঙ্গে গুড়ের বদলে মাংসের মশলা মিশিয়ে 'মশলা-পিঠা'। আর চালগুঁড়ির সঙ্গে উন্দুরের মাংস মিশিয়ে লোধারা করে 'উন্দুর-পিঠা'।

দেও দুকানী, জলদি গুড় দেও।

ঐ একবার বলেছিল দোকানী, লিবি কিসে? বাটি এনেছিস? তারপর ভুলেই গিয়েছিল লোধা ছানাকে। পরবের দিন, দোকানে রাজ্যের ভিড়। কেউ চাইছে মালা-ঘুন্‌সি, কেউ চাইছে সিঁদুর প্যাকেট।

লোধাছানার কথায় হুঁশ হল বঙ্কার, হেসে বলল, পিঠা ত হবে উবেলা, লোধার বেটা লোধা, তোর এত তাড়া কিসের? কার ছানা তুই?

লোধাশবরদের ছেলের গুড় কেনার সঙ্গে বাপের নামের কী সম্পর্ক বুঝল না, তবু একহাতে মাথার চুল জোরসে চুলকে নিয়ে বাপের নাম বলল একটুও না হেসে।

বঙ্কা ফের হেসেই বলল, হবে হয়ত, কে যে কার ছানা এত দেখি তবু গুলিয়ে ফেলি, তোদের সবকটাকেই ত এক দেখতে!

কী বলল দোকানী—সবক'টাকেই ত এক দেখতে? তা কী করে হয়—গুড়খার ছেলে নীলু, শতুরার ছেলে ফুলেশ্বর, শরাবণের ছেলে টুরা, লছুর বেটা বড়কই, গুরভার বেটা হাড়িয়া-সুরুয়া-নাকফুড়রি সব, স—ব এক দেখতে? বড়কইয়ের কান দুটো খেড়িয়ার মতো লম্বা লম্বা, টুরার চুলগুলি পাঁড়রা পাঁড়রা, হাড়িয়ার পেটটা নাদা হাত-পা সরু, আর আমার চোখ ত বেশ বড় বড়, চুল কুচকুচে কালো, শতুরার বেটা ফুলেশ্বর ত বহুত সাফা, অবিকল পৈতাঅলা বাম্‌নার মতো, এত সব ফাঁক-ফারাক থাকতেও দোকানী আমাদের সবকটাকেই এক দেখল?

এই হাড়িরাম, চামটুর বেটাকে আধসের গুড় দে ত, যা লোধাছনা খলায় যা।

খলায় তার মানে উঠোনে যেতেই বঙ্কার ভাই হাড়িরাম বলল, এই লধাছনা, তোর নুনু আছে?

হ্যাৎ—কী অসভ্য অসভ্য কথা! গুড় মাপছো মাপো, তার সঙ্গে ইয়ের—হেঁ, ইয়ের কী সম্পর্ক।

কিছু নেই, কিছু নেই। তবু হাড়িরাম গুড়ের চাটু কলসির ভিতর ডুবিয়ে গুড় তুলে বাটিতে ঢেলে দাঁড়িপাল্লায় মাপতে মাপতে কত কথাই তো বলল।

একটা কথারও জবাব দিল না চামটুর বেটা ভকা। সে বরঞ্চ যেখানে হাসবার কথা সেখানে থাকল চুপ-গম্ভীর, যেখানে হাসবার কথাই নয় সেখানে হেসে ফেলল।

আসলে তার মন ততক্ষণে চলে গিয়েছিল তালপটকায়, নতুন নতুন জামা-পেন্টুলে, ঝিঁজরা আর বারোবনিয়া ষাঁড়া-খুকড়ায়।

গোছা গোছা তালপট্‌কা মাহাতো ছেলেদের হাতে হাতে ঘুরছিল। এ বলে আমারটা দ্যাক্‌, ও বলে আমারটা দ্যাক্‌।

দুজনেরটাই দেখছিল ভকা। বেশ দেখতে পট্‌কাগুলো, তালপাতার ঘড়ি-ঘড়ি দেখতে। তালপাতার ঘড়ি বানিয়ে কব্জিতে পরে বনে-জঙ্গলে টাঁড়-টিকরে কত যে ঘুরে-বেড়িয়েছে সে! কখনো দলে ভিড়ে, কখনো একা একা। কাঁচা তালপাতা হাতে হাতেই শুকিয়ে গেছে, তাও খোলে নি।

তবে তালপাতার ঘড়ি চৌকো, এ যেন তিন কোনা। তলার দিকের কোণে একটা সল্‌তে জড়ানো। সল্‌তেয় আগুন ধরিয়ে দেগে দিলেই হল। কতক তো না-সল্‌তে না-আগুন, মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেই ব্যাস! ডুম ডুম ডুড্ডুম! চিড়বিড় করে কতক বিড়ি-পটকা তো এর মধ্যেই এদিক-সেদিক ফাটতে লেগেছে।

ভকা ভাবল, এখন ত এই, সারাদিনে আরো কত ফুটাবে! তার উপর ত পড়ে আছে সারা রাত!

বঙ্কা মাহাতোর খলায় হাজির হয়েছে বুড়োরা, মুরুব্বিরা। নাতি-নাতনীদের নিয়ে। ছেলের জন্য মেয়ের জন্য নাতি-নাত্‌নীর জন্য নতুন নতুন জামা-পেণ্টুল কিনে এনেছে, তাই মেলে ধরে দেখাচ্ছে। 'বুতাম-দেয়া' 'দড়ি-দেয়া' হাফ-পেণ্টুল। কোন্‌ বুড়ো বা আরেক বুড়োর নাত্‌নীর হাত থেকে নতুন জামাটা ছিনিয়ে নিয়ে আধো স্বরে বলছে, ই-টা আমার ত? লিয়ে লিই? যার নাতনী সেই বুড়ো নিজের নাত্‌নীরই গাল টিপে আদর করে জবাব দিচ্ছে, হঁ লে'ন। জামাই ত বউয়ের জামা কাপড় নিতেই পারে, পরতেই পারে।

খলা-ধারে, বেগুনবনে, ঢ্যাঁড়শের খেতিতে, আলতি কচুর জঙ্গলে লালঝুঁটি অলা ষাঁড়া-খুকড়া চরছে, ঝিঁজরা, বারোবনিয়া। সবুজ-হলুদে মেশামেশি, তার উপর ছিট্‌ছিট্‌ দাগ, ঝিঁজরা। আর বারোবনিয়া বারো বর্ণের।

একজন হাত দুটো পেছনে মুড়ে মোরগগুলোকে দেখতে দেখতেই আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করছে, আজ তোর বেটা কোন্‌টা মারবেক গো?

পরব, পরব। পরব এসেছে খুকড়া তো মারতেই হবে। বাপের চেয়ে ছেলেটাই দড়। সে-ই হাত দেখিয়ে বলল, ঐটা ঐটা।

অজান্তে চামটুলোধার বেটা ভকাও যেন হাত তুলেছিল, আর বিড় বিড় করে বলছিল, ঐ-টা ঐ-টা। নধরদেহী একটা ঝিঁজরা খুকড়ার দিকেই সে আঙুল তুলেছিল। মাহাতোছানার মনের সঙ্গে মিল্‌মিশ হয়ে গিয়েছিল লোধাছনার মন।

ঝট্‌কা মেরে আঙুল সরিয়ে নিয়েছিল ভকা। আর কিছুক্ষণ থাকলে আরও কত কী হবে— এই ভেবে গুড় নিয়ে ঝটিতি বেরিয়েও গেল সে।

'লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়', দোরখুলির বুলানের ধানঝোপের আড়ালে এসে ভকার মনে হল—খেয়ে সে দেখবে কী একটু গুড়?

না, আঙুল দিলেই তো গুড়টা এঁটো হয়ে যাবে। পিঠা তো হবেই, তার আগে হয়ত পূজায় লাগবে এ-গুড়। গুড়, গুড়। গুড় খেতে তো ভালই। ট্যানা-নম্বরী আখুর রস খেতে তো আরো ভালো।

লোভ সম্বরণ করল সে, না সে খাবে না। কিন্তু দুপা এগোতে না এগোতেই তার মনে হল—আচ্ছা, একবারে আঙুল দিয়ে যতটা তোলা যায়, তুলে ফেলে সেটুকু তো খাওয়া যায়, তাতে তো আর এঁটো হয় না। একবার খাওয়ার পরে এঁটো আঙুল ফের গুড়ে ডোবালে তবে তো সে-গুড় এঁটো হয়ে যায়।

যুক্তিটা খাড়া করে মনে খুব আনন্দ হল ভকার। তাহলে তো খাওয়া যায়, খাওয়া যেতেই পারে, ভাবতে ভাবতে চকিতে গুড়ের ভিতর যতটা আঙুল ডোবানো যায়, ডান হাতের তর্জনী ঠিক ততটাই ডুবিয়ে এক গসা গুড় তুলে ফেলে মুখে পুরল ভকা।

আহ্ কী অম্রুতো!

এমন সময়ই পাখিটা ডেকে উঠল, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! কোথায় ডাকল? ঐ দূরে আসনগাছটার চূড়ায়, না তার বহড়াগাছটার গোড়ায়! এখনও ডাকছে, উ-ল টুটু ল-টু-টু টু-টু-উউউ! কঁহরাচ্ছে কুসুমগাছটায়? ভদ্‌কাচ্ছে?

নাই পাখি, নাই! একটু দৌড়ে, ফের থেমে, আঙুলটা মুখে পুরে চেটে চুটে পরিষ্কার করে, তারপরেও পরনের পেন্টুলটাতে ঘষে ঘষে গুড়ের চিহ্ন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল ভকা।

লোধাবস্তির ঘুপচীতে পৌঁছুলে বাপ চামটু প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এতখন ধরে কী করছিলি রে হত্‌ভাগা? 'দেহেরি' চলে গেলে কার কাছে আর পূজাট্টা দিব-অ? দে দে, গুড়টা জলদি দে। আঁইঠা করিস নাই ত ভকা?

নাই বাপ, পূজার জিনিস, হামি অত বকা আছি?

বলেই পায়ের উপর পা ভাঁজ করে ভকা হাসল। গুড়ে আঙুল ডোবালে ফের চারধাবের গুড় এসে আঙুল-গোঁজা-ফোপরটা বুজিয়ে দেয়, কেনো চিহ্ন থাকে না, সে ঝোলাগুড় হোক আর বালিগুড় হোক।

দ্যাক বাপ, বলেই চামটু তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল, হাতে নৈবেদ্য। কী আর বড়জোব— একবাটি গুড়, তাও কিছুটা বড়ামথানে দিয়ে বাকিটা ঘরে আনবে, দু-চারটা চিনির মিষ্টি, পাকারম্ভা আর ধুনা। বনে-জঙ্গলে তো ধুনার অভাব নেই।

আগে আগে চামটু, পিছনে ভকা। আর যা হোক তার মনে মনে একটা কাটাকুটি তো চলছে, আঁইঠা কী আঁইঠা লয়? আঁইঠা কী আঁইঠা লয়?

ধুস্ কী করে হয়? না হয় খেয়েছি আগে, ঠাকুরেরও আগে। তাবলে আঁইঠা হয় কী করে? আজ না হয় পূজার দিন, কালীঠাকুরের খাওয়ার দিন, কাল তো আমরা ভাত-মুড়হি খেয়েছি। একদিক দিয়ে ধরলে সে-ও তো ঠাকুরের আগে খাওয়া। ভাত-মুড়হি না হোক, আজ ঠাকুর মিঠাই খাবে, গুড় খাবে, কালো মুরগার রক্ত খাবে, আমি না হয় তার গুড় একটুক খেয়েছি, তার আগে আগেই খেয়েছি, তা বলে আমার আঁইঠা কী ঠাকুর খাচ্ছে?

আচ্ছা, বেশ। তাই যদি হয়, আঁইঠা গুড়টা ঠাকুর না খায় না খাক, আরো তো আছে। চিনির মিষ্টি, মুখে দিলেই যা গুলিয়ে যায়, পাকাকলা, বাতাসা—

ভাবতে না ভাবতেই ভকার চোখের সামনে যেন বিন্ বিন্ করে হাজির হল বাঘুৎ-কুদ্রাকুদ্রি-ছাঁদনদড়ি বাঁধনদড়ি-কালহামুহী-চিড়কিন্। ভকা ভক্ ভক্ করে উগার তুলল, হড় হড়ে বমি।

কী আর খেয়েছিল সকালে, খালি পেটে বড় জোর জল, জল আর জল, তাতে গুড় পড়তেই পেটটা গুড় গুড় করে গুলিয়ে উঠল। বমি করছে ভকা।

তার বাপ চামটু ঘোরতর অসন্তুষ্ট হয়ে পিছন ঘুরে বলল, ঘরকে যা, কুড়চিগাছের ছাল বেটে টুকচার খা।

ঘরে যাওয়া না-যাওয়া সে তো পরের কথা, বমি করতে পেরে ভকার এসময় এত ভাল লাগল যে চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, শুধ-বুদ হয়ে গেল যা, যা ঠাকুর যা।

কিসের শুধু-বুদ এই ভকা এই ম্যাড়া?

বাপ যত জানতে চায় ভকা ততই স্বস্তির হাসি হেসে বলে, ও তুমি বুঝবে নাই—আর থাকলে ত বমি হবে, আর থাকলে ত! বমি আর হবে নাই। নাই ন।

গেঁড়াশবরের এখন-তখন অবস্থা। রাইবু বড় চিন্তায় আছে, এতদিনে না একটা 'পুন্না গাছ' ভেঙে পড়ে সত্যি সত্যি! পুরাতন গাছ এ তল্লাটে আর কোথায়? এক আছে সেই বড়সোলে—গজ্নালোধা। গজ্নালোধা।

বড় চিন্তায় বড় দুর্ভাবনায় থেকেও রাইবু দেহুরি ডেকে বড়ামথানে পূজা দিচ্ছে। মা কালীর পূজা।

বাঁধনায় অনেক ধার-দেনা করেও সে দুটো শাড়ি কিনেছে। একটা তার বউ শিশুবালার জন্য, আরেকটি ভুবনার মেয়ে নুকুর জন্য।

সোমবারি নেই, নুকু তো আছে। নুকু, নুকু। সেই এখন বড়ামথান ধুয়ে-পুঁছে সাফা করে দেয়। তার উপর রাইবুর একটা আলাদা মায়া আছে।

পূজা প্রায় শেষের মাথায়, এ তো আর আড়-বেলা বা সাঁঝ-বেলার পূজা নয়। পূজা সারতে হয় সকাল সকাল। তার উপর বাইবুলোধার বাপের এখন-তখন অবস্থা।

জোড়া শালগাছ মহুলগাছের তলায় বড়ামথানে রক্তরাঙা সিন্দুর-লেপা মাটির হাতি ঘোড়া। ব্রহ্মাকুমারের নিজহাতে গড়া বৃহৎ ঐরাবত। হাতি-শুঁড়ে হাতি-শুঁড়ে জায়গাটা ছয়লাপ।

তার একধারেই কালীতলা। ধূপ-ধূনায় এখন ম ম করছে। একজন তো দঁড়ের পাশে বসে দঁড়ের আগুনে হরদম ধুনা ছুঁড়ছে। লোধাপাড়ায় ধুনার তো আর অভাব নেই। 'মান্‌সিক' দিতে যেই আসে সেই তো সঙ্গে নিয়ে আসে মুঠো মুঠো ধুনা। 'মান্‌সিক' আর কী, যার যা ঘরে আছে, সে তাই তাই নিয়ে আসে। খুকড়া-ষাঁড়া থাকলে খুকড়া-ষাঁড়া, দুধ থাকলে দুধ, গুড় থাকলে গুড়, বৈতাল-কাঁখুয়ার থাকলে বৈতাল-কাঁখুয়ারও নিয়ে আসে। বনের কুঁদরী-কাঁকড়ো ঘরে থাকলে তাই হয়ত ঠাকুরথানে বাড়িয়ে ধরে। দেহুরি মন্ত্র পড়ে তা-ই তা-ই হয়ত বলি দিয়ে দেয়। পূজাচার আর কী, সেই তো কটা তুলসিপাতা, তায় তেল-সিন্দুর, আতপচাল পাকারম্ভার দলিত মিশ্রণ ভাগা করে রাখা, তার উপর বলির ছিটে ছিটে রক্ত। ডান হাতের চার আঙুল জড়ো করে সেই নৈবেদ্যরই কিছুটা নিয়ে, বাঁ হাতের চার আঙুলে ডান হাতের কনুই ছুঁয়ে থেকে সেই অবস্থায় মাথার চারধারে হাত ঘুরিয়ে মা কালীর নামে ছুঁড়ে দেওয়া আজ যা অধিকন্তু।

অধিকন্তু, অধিকন্তু।

দেহুরি একে একে তাই করছিল আর বসে থেকে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছিল রাইবু। এরপরেও তাকে যেতে হবে যুগনীর পূজা দিতে। সে তো পাড়া ছেড়ে আড়ায়, দূরে, যেখানে

তিনটি রাস্তা তিনদিক থেকে এসে মিশেছে এক সাথে, মিশেছে কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, তারপরেও তিনটি রাস্তা চলে গিয়েছে তিনদিকে যে যার মতো। সেই তে-মোহানীতে—

হাঁপাতে হাঁপাতে চামটু এল, তার দেরি দেখে চটে উঠল রাইবু। বলল, একটুক চাঁড় চাঁড় আসবি ত চামটু?

আর চাঁড় চাঁড়, এই আমাদের ভকা, বলেই পিছুন পিছুন আসা ছেলেটাকে খুঁজছিল চামটু। পূজা তার মাথায় উঠেছে, ছেলেটা বমি করছে।

খুঁজে পেতে চামটু দেখল, না, ছেলেটা এখন বেশ ফুর্তিতেই আছে ঠাকুরথানে লোধাপাড়ার আর আর রুন্ডু-উরুন্ডু দের দলে ভিড়ে।

দলে ভিড়ে ভকা সত্যি সত্যি ফুর্তিতেই আছে, সে আরোই ফুর্তিতে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল—দেখছে সব এক কী না। ঐ তো গুরভার বেটা সুরুয়া, হাড়িয়া, লছুর বেটা বড়কই, শরাবণের ছেলে টুরা, শতুরার বেটা ফুলেশ্বর। বড়কইয়ের খেড়িয়া-কানদুটো যেন আরেকটু খাড়া হয়েছে, টুরার চুলগুলি আরো বেশি পাঁড়রা হয়েছে, হাত-পা সরু, পেটটা আরোই বড় হয়েছে হাড়িয়ার। এতদ্ ভিন্নতা সত্ত্বেও, আর কী আশ্চর্য, সবাইকে দেখতে লাগছে এক! এক, এক। তবে কী দোকানী ঠিকই বলল? লছুর বেটা বড়কই পিছুন ঘুরে কী একটা করছিল, চকিতে ভকার মনে হয়েছিল সে হাড়িয়া। শরাবণের ছেলে টুরাকেও সে গুলিয়ে ফেলেছিল, মনে হয়েছিল সে শতুরার বেটা ফুলেশ্বর। তবে কী বঙ্কার কথাই ফলে যাচ্ছে—কে যে কার ছানা এত দেখি তবু গুলিয়ে ফেলি, তোদের সবকটাকেই ত এক দেখতে’ এক, এক?

হঁ, এক। ভিন্নৎ দ্যাবতার ভিন্নৎ পূজাবিধি হলেও আচারে-উপাচারে সব ত এক। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-পিঠ ও-পিঠ করে লোধাশবরবা তা-ই পালন করে!

রাইবু ভাবল, তাছড়া লোধাপাড়ায় লোধাদের আর কী-ই বা আছে!

এতবড় বাঁধনায় তাদের গরুমোষ আছে যে, গরুর শিং-এ কাড়ার শিং-এ চর্পচপ করে তেল-সিঁদুর মাখাবে, গরু চুমাবে, গরু জাগাবে, গরু খুঁটাবে? চাষবাসের এক-আধলা জমিই নাই তার গরু-কাড়া! চাষবাসের জমিই নাই তার আবার ধানগাছ, কাঁচাধানের মৌড়, টিকলী-সিঁথলী! গরুর কপালে মৌড় বেঁধে গরুপূজা, গোহালপূজা!

রাইবুর ফের একবার মনে পড়ল, কী বোকার জাত এই লোধাজাতটা! হাল-লাঙল করতে দিল বলদটাকে, আর তাকে কী না সেগুনপাতায় ফালা ফালা করে কেটে তোবা খেয়ে ফেললি? খেয়েছিলি যেমন এখন বনে-জঙ্গলে আঁউলা-বাঁউলা টুংগে মর, কত টুন্ডবি!

পূজার আগে রাইবু গা ধুতে গিয়েছিল দোরখুলির বুলানে। ঝিরিঝিরি বাতাস দিচ্ছিল উপরে, আর নিচে বুলানের খলবলে জল। ধানগাছের ধাবালো ধাবালো পাতাগুলো নড়ছিল, নাচছিল। নাচছিল, নড়ছিল।

গা ধুতে ধুতে রাইবুর মনে হচ্ছিল, হঁ, হচ্ছিলই ত— টুকচাববাদে মাহাতোরা আসবে, কুমহাররা আসবে, সাঁওতালরা আসবে, এমন কী ভুঁয়া-ভূমিজরাও আসবে, যে যার ধানক্ষেতে নেমে যাবে হড়বড়িয়ে, তার আগে সিনান করবে, ধুতির কাছা মারবে, গামছার কাছা মারবে। ভিজা ধুতিগামছায় লোমচুল খাড়া হয়ে যাওয়া শরীরে দা দিয়ে কাঁচাপাকা ধানের শীষ কেটে কেটে বেছে বেছে জোগাড় করবে। ঠিক ধানের টুও নয়, অনেকটা ডাঁটিসুদ্ধ ধানের শীষ। টান দিলেই যেন ধানগাছের গর্ভ থেকে উঠে আসবে স্নিক্ করে।

দু'ধারে ধানক্ষেতের মাঝে বুলানের জলে গা ধুতে ধুতে রাইবুর হাত নিস্‌পিস করছিল, হঁ হঁ করছিলই ত—তুলিই না একগোছা ধানশীষ, ধানছড়া? কেমন বাতাসে ঝন্‌ঝন্ করে বাজছে ধানে ধানে ঘষা লেগে!

হাত বাড়িয়েও দিয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই হাত সে গুটিয়ে নেয়—না থাক, পরের দব্য নিয়ে পূজা করলে সে-পূজা শুদ্ধ হয় না।

মনে অনেক দুঃখ নিয়ে ঘুপচীতে ফিরে এসেছিল সে। ঘরেও আজ তার সুখ নেই। ক'দিন ধরেই বাপের শরীরটা খুব কাহিল যাচ্ছে। খুঁজে খুঁজে সাদা গোবরাপোকা জোগাড় করেছিল রাইবু, অনেক ধরে-করে চিনিবাস মাহাজনের কাছ থেকে পোয়াটাক ঘি। ঘিয়ে ভেজে, তায় তিনফোঁটা পিঁপার ক্ষীর মেশানো গোবরাপোকার জ্যুস খাইয়েও কাজের কাজ কিস্‌সু হল না।

বাপ এখন পলকে পলকে রাইবুকে খুঁজছে।—রাব্বু, অ রাব্বু! রাইবুও 'বাবা গে' 'বাউকো' বলতে অজ্ঞান, ঘড়িক-ঘড়ি দৌড়ে যাচ্ছে। মুখে ঠোনা ঠোনা জল দিচ্ছে।

এই অসুস্থ শরীরে কণ্ঠা পড়ে যাবার মুহূর্তেও রাইবুকে বুঝিয়েছে গেঁড়াশবর—কুঁভারদের সঙে বিবাদে যাস্ নাই। আমাদের সমাজের মেয়্যা অন্য কুনো সমাজের লোককে বেহা করলে সে-বেহাতে আজতক আমাদের সমাজ কুনোরকম বাধা দেয় নাই, অন্তত আমি ত শুনি নাই, এক শুনলেও শুনতে পারে বড়সোলের গজ্না।

কিন্তু রাইবু, কে জানে কেন, মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। তার খালি মনে হচ্ছে—সোমবারি গেছে, সাবিত্তিরিও কী চলে যাবে আমাদের সমাজ ছেড়ে দোরখুলির লোধাবস্তি ছেড়ে? তা বলে লোধাপাড়ার কোনো মেয়্যা কী শ্বশুরঘর করতে দূরে কোথাও যায়নি?

হেঁ গেছে বড়সোলে-নাদনগাড়িয়ায়-সিংধুয়ে, গেছে নাকবিন্ধি-পেটবিন্ধিতে, কেউ কেউ গেছে আরো দূরের ঝাড়গাঁ-ভালুকঘরিয়ায়, দুব্‌রাজপুরে।

তাদের কেউ কেউ বাঁদনায় বাপের বাড়ি এসেছেও। কিন্তু দোরখুলির লোধাদের মতো তাদেরও না আছে গরু, না আছে গরুর গোহাল। কোন্ গোহালেই বা পূজা করবে গরুর? না আছে ধানক্ষেত, ধানের ছড়া। ধান-শীষের পাটি-মৌড় সিঁথলী-মৌড়ই বা তারা তৈরি করবে কোত্থেকে? তারা বড়জোর ঘরে বসে পাড়ায় বসে রাত জেগে শুনবে পাশের গ্রাম তার পাশের গ্রামে কুলকুলি মেরে অহীরা গান গেয়ে ধামসা-মাদল বাজিয়ে নাচন-কুদন করে সরারাত ধরে 'ঢ্যাঙুআনরা' গুরু জাগাচ্ছে। গরুর 'গিরিহা' গরু-বাগালদের 'গিরিহা' তাদের জন্য গণ্ডা-গণ্ডা 'ছাঁকাপিঠা' আর বোতল বোতল মদ-হাঁড়িয়া 'ঢ্যাঙুআন-বিদায়' হিসাবে ভেট দিচ্ছে। আর ঢ্যাঙুআনরা আর কাম্‌হার-কুঁভাররা ভুঁয়া-ভূমিজরা সাঁওতালরা গণ্ডাগণ্ডা পিঠা খাচ্ছে আর খাচ্ছে মদ-হাঁড়িয়া। জঙ্গলের ভিতরে ঘুপচী ঘরে হাঁটুমুড়ে বসে থেকে তারা বড়জোর জঙ্গলের বাইরের হল্লা শুনবে। তারপর, তার পরের পরের দিন আ-দেখলার মতো 'গরুখুঁটা' 'কাড়াখুঁটা' দেখতে যাবে গোঠটাড়ের মাঠে, ডাঙাসাহির ডাঙায়, নুয়াসাহীর বড়তলায়। দেখবে তাও দূর থেকে, দাঁড়িয়ে-বসে-দু'গালে হাত দিয়ে।

তবু তো তারা দেখা-শেষে ফিরে আসবে ঘরে, পরব শেষে যে যার শ্বশুরঘরে যাবে চলে, আবার আসবে পরের বছর পরবে। কিন্তু সমাজ ছেড়ে লোধাপাড়া ছেড়ে একেবারে জন্মের মতো যাওয়া? যেমন গিয়েছে সোমবারি, যেমন যাবে সাবিত্রী? নাই নাই, 'কুম্‌হারদের সঙে কুনোরূপ বিবাদে যাস নাই, হিতে বিপরীত হবে', বলা সত্ত্বেও বাপের কথা যেন মন থেকে মানতে পারছে না রাইবু।

পূজাপাট মিটে গেলে ভুবনার বউ ফুলটুসিলোধানী সবার সাক্ষাতে রাইবুকে হাতে ধরে টানল, আস-অ টুকচার ঘরকে আস-অ।

গায়ের কাপড়-চুপড়ের ঠিক নেই, লোধানী আজ একটুকু নেশা করছে। নাই, বাপের এখন-তখন অবস্থা। আমার বলে মরবার সময় নাই। গোঁয়ার রাইবু গোঁ ধরে বসে থাকে।

ফোঁস করে ওঠে লোধানী, বলে, ম'ল্লা, বচ্ছরকার পরব আর আমি হাতে ধরে ডাকছি, তাও তুমি, তাও-তাও-তাও—

কথা শেষ করতে পারে না লোধানী, জিভ তার জড়িয়ে যায়। মায়ের অমনধারা ব্যবহার দেখে মেয়ে নুকুও হেসে ফেলে। রাইবুকে ঠেলা মেরে মায়ের দিকে সরিয়ে দেয়, বলে, যাও না কাকা, যাও।

রীতিমত টানাটানি করছিল ফুলটুসি। শিশুবালাও হেসে বলল, যাও ন, দিদ্দি কিছো খাওয়াবেক বোধায়।

শিশুবালাও যাবার অনুমতি দিল? শিশুবালাও? রাইবু তো থ, হতভম্ব।

আজ লোধাপাড়ায় শত অভাবের মধ্যেও কেউ কাজে যায়নি, আজ তাদেরও তো পরব। পরব বলে পরব, মহাপরব। এর-তার ঘরের ছামুতে খলায় ভিড় করেছিল। সেই তারাও ব্যাপার দেখে অবাক-আশ্চর্য।

একেবারে মাতাল হয়ে গেছে শত্রুঘ্নলোধা। হাঁড়িয়া গিলেছে, মদ গিলেছে দমে। আর লোধাপাড়ার কুল্‌হিরাস্তায় বেরিয়েছে বাঁদনা মানতে। কেউ তাকে মানুক ছাই না মানুক সে বাঁদনা মানবেই মানবে।

কুল্‌হির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে গরু জাগাচ্ছে, গরু চুমাচ্ছে আবার নিজে নিজেই নকল গরুর সামনে দাঁড়িয়ে গরু খুঁটাচ্ছে, দিড়িদাঙ খেটেতাঙ দিড়িদাঙ, কুলকুলি মারছে দু-ঠোঁটে হাত ঠুকেঠুকে, আব্বা-আব্বা—

একটা গানও ধরেছে—

> অহীরে—
> দরখুলির জঙলে কপ্‌তি-গুঁড়ুর পাখ ডাকে
> চল্ রাণী চল্ মুনু পা ফেলাঞে একসঙে...

চমকে উঠল নুকু, কবে যে তলে তলে শতুরাকাকা শুনে শুনে কবিতাটা মুখস্থ করে ফেলেছে, তার উপর সুর দিয়ে এখন গীতের মতো করে গাইছে! দৌড়ে গেল সে, দৌড়ুল এই জন্য যে ভুল হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সে ভুলটা ধরিয়ে দেবে, তাতে শতুরাকাকার গাইতেও সুবিধা হবে।

নুকু গেল, তার দেখাদেখি গেল প্রায় সকলেই। এতক্ষণে যাহোক একটা মজার 'কল' পেয়ে গেছে তারা। পিছনে পড়ে থাকল শুধু দুজন—রাইবু আর ফুলটুসি।

কিছুক্ষণ থাকুক, থাকুক তারা একা একাই, একাএকা দুজনের কত কথাই তো বলার আছে।



'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'—

কিশলয় বইয়ের কবিতায় 'ধান্য' মানে খুঁজতে খুঁজতে চাষীর বেটা মাথার চুল ছিঁড়ে ফলে। ধান্য—সে আবার কী?

শেষতক 'ছাত্রবন্ধু' ঘেঁটে কথাটার মানে বের করে হাসে। ধান্য মানে ধান। হি হি—

তা, ধান্য না বলে ধান বললেই হয়। ধান তো জলের মতো সোজা। ধ-য়ে আকার দন্ত্য-ন।

ধান, ধান, ধান।

'ধান' বললে এ-দিগরের চাষীর চাষী শরৎ দঁড়পাটের ছেলে ভরত দঁড়পাট যেমন

অতিসহজেই চিনে ফেলে, জাতিতে রাজু অনন্ত দত্তের ছেলে পশুপতি দত্তও এককথায় বুঝে নেয়, মুনিয়া বারিক-ভটাডোম-ঝাড়েশ্বর সিং-রাবণ টুডু-মাধব পানী-ভিকা বাগাল-রাইবু-গুরভা-শরাবণ-শত্রুঘ্ন লোধাদের, যাদের ছিঁটেফোঁটাও চাষের জমি নেই, তাদের ছেলেরাও ধান কী, ধানের বৈশিষ্ট্য কী, ধান কত প্রকার, কী কী-সব গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে পারে।

এ-তল্লাটের কুমোররা যেমন একেকজন মাটির দক্ষ কারিগর, তেমনি প্রায় সকলেই সম্পন্ন চাষী। এদের ছেলেরা ধানকে তো চেনে নিজের নখ-চুলের চেয়েও বেশি করে। কিন্তু ধান্য? উঁহু।

ধান, ধান, ধান!

চারদিকেই এখন হলদে সবুজের ছড়াছড়ি, কাঁচা-পাকা ধান। কুম্হারপাড়ায়ও তো পরব লেগেছে। সোরগোল উঠেছে—ছঁচ দেয়ার, গোবর লেপার, সকাল সকাল স্নান করার। সর্বোপরি স্নান করতে গিয়ে ধানের শীষ তুলে আনার।

স্নান করতে কেউ গেছে দক্ষিণসোলেব সোঁতায়, কেউ গেছে পাড়িয়ার বিলধারে সীতানালা খালে, আর কেউ নদীতে। চারধারে, চারধারে।

স্নান সেরে অদা-কাপড়ে কাঁচাপাকা ধানের শীষ ছিঁড়বে। আর তাই দিয়ে গরুর মৌড় হবে, কপালের সিঁথলী হবে। পাটিমৌড়, টিকলীমৌড়।

কেউ কেউ স্নান সেরে এর মধ্যেই ধানক্ষেতে নেমে পড়েছে, আর তাই ধানগাছগুলো নড়ছে। যেখানেই নড়ছে সেখানেই একেকটা কালো ভুসভুসে মাথা। ধান যেখানে অনেক বেড়েছে, সেখানে মাথা ডুবে যাচ্ছে। আর যেখানে ধানের বাড় একটু কমার দিকে, সেখানে চাগাড় দিয়ে উঠছে কালো ভুসভুসে মাথা।

এই একটা মাথা উঠল যদি ভুতাচেঙ্গা ধানের ক্ষেতে, তো একটা ভুসভুসে মাথা ডুবে গেল ঐ সাফা-নুনিয়ার বিলে। তালমাড় ধানের ক্ষেতে ধানগাছগুলি বড় বেশি নড়ল যদি তো পাকোই ধানের নড়া-ধানগাছগুলি থেমে গেল মুহূর্তে। পানিকলস ধানের বিলে হড়বড় করে কে নেমে গেল, কে—মাছ না মানুষ? কুমরকানাই ধানক্ষেতের দু-গজ বেড় দিয়ে ধানের শীষ কেটে নিয়ে গেল কে?

সন্তোষকুম্হারদের আর কেইবা ধানের শীয সংগ্রহ করে আনে—এক সে ছাড়া। আর আর বাড়ির ছোট তরফই সাধারণত এসব কাজ করে দেয়, সন্তোষকুম্হারদের বাড়িতে ছোট বলতেও সে, বড় বলতেও সে, তাকেই একহাতে সবকিছু করতে হচ্ছে। পাটিমৌড়, টিকলীমৌড় বানাবার জন্য ধানের শীষ তুলতে সে বেরুল একটু দেরিতেই।

রাস্তায় ভণ্ডীর ভাই শ্রীমন্তর সঙ্গে দেখা। এই সবে ক্ষেত থেকে ধান তুলে সে ফিরছে।

এত দেবি করলি যে সন্তুষ?

আর দেরি—একহাতে কদ্দিক সামলাব শ্রীমন্ত!

মুখ দিয়ে আপশোবের চু-চু শব্দ করল শ্রীমন্ত। বলল, হঁ, একটা বহুছানার খুব দরকার।

ঘোরের মাথায় সন্তোষ প্রথমে বলে ফেলেছিল, দরকার বলে দরকার,—পরক্ষণেই বলা ঠিক হয়নি ভেবে নিজেকে সংযত করে বলল, না না, বহুছানার কী দরকার, বাপ আর একটু উদযোগ দেখালেই হত।

হো হো করে হাসল শ্রীমন্ত, মনে মনে অবশ্য বলল, ম্যাড়া, বাপ আর কত উদ্‌যোগ দেখাবে? একটা লোধাছুড়িঁকে তোর জন্য বউ করে এনে দিচ্ছে ঘরে, তাও বলিস বাপের উদ্‌যোগ নাই?

মুখে বলল, আজ গরু-জাগাতে 'ঢ্যাঙুআনে' আসছিস ত সন্তুষ?

বচ্ছরকার 'হাউস', কতরকম ফন্দি-ফিকির ফাঁক-ফোকরের রাত, তেলবাতি-মোমবাতি-তারাবাতির রাত, হাতির ল্যাখেন বড় 'অমাবইসা রাত', আর সন্তোষ কী না ঘরে বসে পিঠা খেয়ে পেট তাবুড়-তুবড় করে দড়ির খটিয়ায় শুয়ে ভোর করে দেবে রাত? তাও কখনও হয়?

বিপুল উৎসাহে সে বলল, হুঁ হুঁ আসবই ত।

আয় আয় সন্তুষ, মহন রানারও আর জ্বরজ্বালা নাই, মাদল কটাও সারাই হয়ে গেছে, এ-বছ্বর 'ঢ্যাঙুআন'ও খুব জমে যাবে।

সে তো জমবেই, তাবলে মহনের আর বেশি হাঁড়িয়া-খাওয়া উচিৎ লয়।

মূল-গায়েনের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি কড়া নজর তো দিতেই হবে আর আর গায়কদের, দোয়ারকীদের। আর গান না হলে ঢ্যাঙুআন? "অহীরে, হাম্‌রা ত যাতেছিলি কুল্‌হি-ন-কুল্‌হি যে বাবুহো, তোরো গিরিহায় ডাকিঞে ঘুরাইল-অ"—এসব গান মহন ছাড়া আর কে-ই বা গাইবে? মুখের উপর দুই ঠোঁটের উপর হাতের তালু থেপে থেপে আর কে-ই বা অত 'কুল্‌কুলি' মারবে?

হুঁ ঠিক কথা! তারা মহন কামারকে, তাদের মূল গায়েনকে আরো সাবধানে রাখবে। এই বন্দোবস্ত করে দুজন দু'দিকে চলল। শ্রীমন্ত গেল ঘরেব দিকে আব সন্তোষ গেল তাদের দখিনসোলের বিলের দিকে।

দখিনসোলের বিল থেকে কার্তিকছোলা জামাইলাড়ু উঠে গেলেও হেঁতুবিলের জলকলস কলমকাঠি তো এখনও আছে। আর বেছে বেছে সন্তোষ দখিনসোলের সেই হেঁতুবিলকেই পছন্দ করল তার একটাই কারণ, একটাই—লোধাপাড়া এখান থেকে খুব দূরেও নয়, এক হাঁকের ভিতর। সাবিত্রী কী আসবে? কত লোধামেয়েমানুষই তো ধানকাটা ন্যাড়াবিলে টঙস টঙস করে ধানের শীষ ধানের টুঙ খুঁজে বেড়ায়! ইঁদুর আর ইঁদুর-ধানের লোভে জমির আস্ত হিড় কেটে ফালা ফালা করে দেয়! সাবিত্রী কী বস্তা-শাবল কাঁধে 'উন্দুর' মাবতেও আসতে পারে না?

আচ্ছা, বেশ। পরবের দিন ধানের টুঙ কুড়োতে না আসুক, ব্যাঙ-উন্দুর না মারে না মারুক, নিজেদেব খলা-পিঁড়া নিকোতে গোবর-নাদিরও তো দরকার হয়, তাই কুড়োতে ছলে-বলে-কৌশলে আসুক না গোঠটাঁড়ের মাঠে সাবিত্রী?

গরুগুলি আর এখন গোহালে নেই, 'গিরিহাদের' মুনিষরা বাগালরা গরুগুলিকে জড়ো করেছে গোঠটাঁড়ের মাঠে। গরুদের আজ কোনো কাজ নেই, অবসর, অবসর। কাজে 'বেগেড় বাঁই' করলে আজ কেউ তাদের গায়ে 'পইনা'র বাড়ি মারবে না। না চললে ল্যাজে মোচড় দিয়ে ঠেলা মেরে জিভে ট-ট শব্দ করে কেউ বলবে না, অ বে চ ন চ! এদিক সেদিক অন্‌তাবড়া দৌড়ুলে ল্যাজ টেনে ধরে থামাতে আজ আর কেউ চেঁচিয়ে বলে উঠবে না, অ বে হিঁ-ইইই ন হ! ছুটি, ছুটি। ছুটির মেজাজে আজ তারা গোঠটাঁড়েব মাঠে বসে জাবর কাটছে। আর ঘড়িক-ঘড়ি গোবরের নাদি ফেলছে। লোধাদের আর গরু কোথায়? খলা-পিঁড়া নিকোবার জন্য গোবরের নাদি পেতে হলে সেই তো আসতে হবে গোঠটাঁড়ের মাঠে।

সন্তোষ গরুর গোঠটাকে ভালভাবে জরিপ করে দেখল—শ শ গরুর শ শ পায়ের জঙ্গলে নিজেকে কোথাও আড়াল করে গোবরের নাদি কুড়োচ্ছে কী সাবিত্রী?

সাবিত্রী, সাবিত্রী। কোথায় সাবিত্রী, দুয়েকটা লম্বা-ঘাড় সাদা সাদা বক গরুদের গায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছে। আর সুযোগ এলে লম্বা ঠোঁট গরুর গায়ে খপ করে গুঁজে গরুর গা থেকে খুঁটে খাচ্ছে 'কেতর'। দুয়েকটা ঢেপচুপাখি টাঙ্গির মতো বেঁকানো ল্যাজ দোলাতে

দোলাতে এসে ইয়ারকি মেরে বসছে গরুগুলির পিঠে, গরুগুলির 'শিরে'। আর বসামাত্রই শিহরণ খেলে যাচ্ছে গরুগুলির সারা শরীরে। শিংয়ে-কপালে এই কদিন এত তেল সিঁদুর মাখিয়েছে কুম্‌হারপাড়ার বউড়ীরা যে, চব্‌চবে তেলে সূর্যের আলো পড়ে এখন চিকচিক করছে।

চিক্ চিক্ চিক্ চিক্।

কবে যে সাবিত্রী নিজ হাতে এমন তেলে চুবিয়ে দেবে সন্তোষদের, ভৈরব কুম্‌হারদের গরুর শিংগুলোকে!

হরিহর!

হুঁউ।

কী করছ, হরিহর?

হরিহরের জমিজমা নেই। গোঠটাঁড়ের মাঠের ধারে বাড়ি, হরিহরের না আছে ধানক্ষেত, না আছে ধানগাছ। গরুও নেই, মৌড়ও নেই। সে বসে বসে 'পোস্তঢুলির' রস ছাঁকছে আর খাচ্ছে। ছাঁকছে আর খাচ্ছে।

সন্তোষের কথার জবাবে হরিহরকুম্‌হার বলল, কী আর করি সন্তুষ, আমার না আছে ধান না আছে ধন—আমি ত এক লধা।

তিড়বিড় করে জ্বলে উঠল সন্তোষ, তো কী? ধন-ধান না থাকুক লোধারা কী মানুষ লহে?

হঁ, মানুষ ত বঠে, সন্তোষকে খোঁচা দিতেই আরো যেন প্রসঙ্গটা তুলল হরিহরকুম্‌হার।-হঁ হাতও আছে পা-ও আছে, তবু যেন লধাদের কী নাই, কী নাই।

কী নাই?

সেটাই ত কথা, সন্তুষভায়া। সকাল থেকে ভাবছি লধাদের কী নাই? ভাবছি আর দিশা পাচ্ছি নাই, ভাবছি আর দিশা পাচ্ছি নাই।

বসে বসে পোস্তঢুলি খাও আর ভাব-অ, তোমার আর কোনো কাজ নাই ত! বলতে বলতে সন্তোষ এগিয়ে চলল দখিনসোলের বিলের দিকে। তার যাওয়া দেখে হরিহর হাসল।

কী যেন, কী যেন, হাসি হাসি, হরিহর উদ্বাহু হল, হাসি হাসি পরব ফাঁসি—লধা মাইয়ার অঁটাদড়ি, হবে সন্তুষের গলার দড়ি।

বলল, লোধামেয়ের কোমরের ঘুনসিদড়ি এবার সন্তোষের গলায় উঠবে, গলার হার হবে, হরিহর নিজে নিজেই বলল আর হাসল।

স্নান সেরে ধানের শীষ ছিঁড়ে ঘরে ফিরে সন্তোষ দেখল, তার পিসি এসেছে, এ-গাঁয়েই থাকে পিসি, এখন বাপের সঙ্গে গল্প করছে।

এত থাকতে শেষমেষ লধা মাইয়া?

হঁ, লোধারা কী মানুষ লহে?

মানুষ লহে কে-বা বলছে, হঁ মানুষ ত বঠে, হাত-ও আছে পা-ও আছে।

তবে কী নাই?

কী যেন নাই, কী যেন—ধুরো, পেটে আসছে ত মুখে আসছে নাই।

নাই আসছে ত, বলিস নাই, চুপ মার পারুল।

সন্তোষের পারুলবিটি চুপ মেরে বসে থাকল। তার কথার এ-সংসারে কী-ই বা মূল্য আছে!

আর এ-সময়ই, কথা শোনা-না-শোনার মাঝখানে হাতে ধানশীষের গোছ নিয়ে ঘরে ঢুকল সন্তোষ। সঙ্গে সঙ্গেই তার পারুলবিটি উঠে গিয়ে নতুন কুলো এনে সন্তোষের সামনে ধরল।

কুলোয় ধানশীষ আছড়ে রেখে সন্তোষ চুপিচুপি তার পিসিকে জিজ্ঞাসা করল, ভৈরব কুম্‌হার কী বলছে, পারুলবিটি?

কী-ই আর বলবে, লধা-বহু আনার জন্য তোকে দুষছে খুব। মনটা উহার হু হু করছে রে সন্তুষ!

এ-কথার কী-ই বা উত্তর দেবে সন্তোষ? অথচ সে তো আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছুই শুনেছে। বাপ বলছে, হঁ লোধারা কী মানুষ লহে? তবে কী পারুলবিটি আমার মন বুঝতে এ-কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছে? ক্ষণেক-ক্ষণ পাল্টি খেয়ে যাচ্ছে না ত লোকটা? শেষতক বেঁকে বসবে না ত ভৈরবকুম্‌হার?

সন্তোষ মিঙমিঙে গলায় বলল, লোধাবহু ত বেহা করে এখনও আনি নাই, পারুলবিটি।

বলেই সে মৌড় গাঁথতে বসল শুদ্ধ হয়ে।

মেয়েরা চুলের বিনুনী যেরকম করে বাঁধে, কতক মৌড় বাঁধল সেরকম, টিকলীমৌড়। আর কতক পাটিমৌড়। যে-রকম করে মাছ ধরবার ঘুনি, ঘুগি কী পাটা বোনে, বাঁশের খুঁচিতে পাটের দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে। তেমনি ধানগাছের ডগা জড়িয়ে জড়িয়ে পাটিমৌড় গাঁথছে সন্তোষ। তার হাতের ফেরে ধানশীষের ঘেরে আঁকা হয়ে যাচ্ছে চৌকার ভিতরে চৌকা, তার ভিতরে আবার চৌকা, সরু চৌকা আরো সরু চৌকা, তার ভিতরে আরো আরো সরু চৌকা...

অকস্মাৎ একটা ছায়া এসে দাঁড়াল দরজায় ঝট্‌ করে। ছায়াটা এক মুখ হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করল, মোড় গাঁথা হৈল কারিগরের?

কারিগর, কারিগর। সন্তোষকুম্‌হার যেন চোখের সামনে দেখল—আকাশ জুড়ে 'কারিকুরি' পাখি চলেছে একসঙ্গে এক লাইনে, অজস্র আর কালো কালো। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। কালো কালো চক্রা-বক্রা এমন একটা ঝিঁজরা শাড়ি পরেছে সাবিত্রী, থুড়ি কুন্তলা বউদিদি যে চোখ-মুখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

হাতের কাজ ফেলে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সন্তোষ বলল, ব্বাস রে! কারিগরের কী কারিকুরি!

কুথায়?

বলেই গরবে নিজেরই শাড়ি ঢাকা শরীর দেখল কুন্তলা, সন্তোষের জেঠতুতো দাদার বউ।

সন্তোষ বলল, কী শাড়ি পরেছ বউদিদি?

ধ্যাৎ, এর চেয়েও ভালো শাড়ি আজ তুমি ত দিবে দেওর?

হাঁ, তা একটা শাড়ি তার কুন্তলাবউদিদিকে আজ দেবে সন্তোষ। ফিবছরই দেয়। গরুর শিংয়ে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে ধানের মৌড় পরিয়ে গরু চুমালে একটা নতুন শাড়ি তো দিতেই হয়। সেই শাড়ি পরেই তো গরু চুমায়। ঘরে বউ না থাকলে অন্যের বউকে দিয়েই তো গরু চুমায়। ঝিউড়ী নয়, কেবল মাত্র বিহালবউড়ীরাই গরু চুমাতে পারে।

পারুলপিসি কুন্তলা আসামাত্র উঠে গিয়েছিল ফের তার দাদার কাছে। দাদা ভৈরব-কুম্‌হারকে ঘ্যানর ঘ্যানর করে সে বলে যাচ্ছিল, এতবড় ঘরে একটা বহুছানা না হলে চলে?

প্রশ্ন করছিল নিজে, উত্তরও দিচ্ছিল সে নিজে। না, চলে না।

ভৈরব যেমনকার তেমন, নির্বিকার। নির্বিকার, নির্বিকার।

পরের বহুকে দিয়ে ঘরের কাজ করা—এ যেন তোর ছাগল দিয়ে পত্‌লি মাড়া। গরুর বিহনে ছাগল কী ধান ঝাড়াই-মাড়াই করতে পারে? না, পারে না।

ভৈরবকুম্‌হার জোড়া হাঁটুতে দুহাত বেড় দিয়ে সামনে-পিছনে দুলছিল। তাছাড়া তার কোনো ভাবান্তর নেই।

এতবড় পরব, ঘরে পিঠাপুলি না হলে চলে? না, চলে না। পরবের দিনে পিঠা কামড়াতে কামড়াতে শিশু নারায়ণ ন্যাংটাভুটুঙ নাড়ুগোপাল এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করবে—তাছাড়া কী পরব মানায়? না, মানায় না।

ও ঘরে কুন্তলা-সন্তোষ যতই হাসাহাসি করছিল, গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর, ততই দাদার কান ঝালাপালা করে তুলছিল পারুল।

নামেও ভৈরব কামেও ভৈরব, এককান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে ভুলে যায়—কোনো কথা কী তার মরমে সেঁধায়? না, সেঁধায় না।

অগত্যা ভৈরবকুম্হারকে বলতেই হল, তুই থামবি পারু? বলামাত্রই থেমে গেল পারুল। একেবারে চুপ। তার মনেও থাকল না—এতক্ষণ বিড়বিড় করে কী সব বকে মরছিল সে।

ঢেঁকিতে পাড় পড়ল আর সে উঠে গেল।

এখনও দু-পহর বেলা, বেলা তেমন আড় হয়নি। ঢেঁকিতে শব্দ উঠল—হুঁকুর দুম্ হুঁকুর দুম্!

গুঁড়ি-কুটা হচ্ছে। পিঠার 'অদা-চাল' বা আতপ চাল ভিজিয়ে 'বতর' করে রাখা আছে। এবার ঢেঁকিতে ফেলে কুটে নিলেই হল।

সব ঘরে তো আর ঢেঁকি নেই, আছে মোটামুটি বড়লোকদেরই ঘরে। যার ঘরে ঢেঁকি আছে সেখানেই ভিড় বাড়ছে! ভিড় ভিড়, লাইন লাইন।

সন্তোষের পারুলবিটির এই এক কাজ—যেখানেই গুঁড়ি-কুটা, ধান-কুটা, সেখানেই সে থ্যাবড়ে বসে পড়বে। বসে পড়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দেবে ঢেঁকি-গাড়ায়।

হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার লো পারুলবিটি, চাঁড় চাঁড় হাত তুল, না'লে তোর হাত কেঁচাবে!

ঢেঁকির পাছায় পা পড়ছে, ঢেঁকির মাথা-মুষল ঢুকছে ঢেঁকির গর্তে, সবই তালে তালে। মুষলের স্বামী, বেড় দেওয়া লোহার পাত, ঘা খেয়ে খেয়ে ধারালো হয়ে আছে। একটা হাত বিদ্যুদ্বেগে গর্তে ঢুকিয়ে, স্বামীসহ ঢেঁকির মুষল উপরে উঠলে, ফাঁকতালে, ফের স্বামীসহ মুষল গর্তে পড়বার আগেই, যথা সময়ে, হাত তুলে নেওয়া। একটু অসাবধান—অন্যমনস্ক হলেই ডান হাতের তালুর উপরের দিকটা কেঁচে গিয়ে ঘটে যাবে রক্তারক্তি কাণ্ড।

পারুলবিটি মুচকি হেসে হাত ঢুকিয়ে কুটা-চাল উস্কে দিয়ে ফের হাত তুলে আনছে, ফের চাঁড় চাঁড় হাত ঢোকাচ্ছে গর্তে। এ-কাজে সে এত দড় যে গুঁড়ি-কুটনীদের ধান-ভান্‌নীদের পারুলপিসিকে চাই-ই-চাই।

যার ঢেঁকি, সে তো নিজের গুঁড়ি আগে কুটবে। ভৈরবকুম্হার সন্তোষকুম্হারদের আগে আগে গুঁড়ি কুটবে কে? তারা দান ছেড়ে দিল। আচ্ছা, যাদের তাড়া আছে তারাই কুটুক আগে। তারপর না হয় সবার শেষে, রাত হয়ত একটু হবে, হোক না, আজ তো সারারাতই জাগতে হবে।

কেউ বলল, আমি আবার অত রাত জাগতে পারি নাই, রাত জাগলে আমার মাথা ধরে। সেই বাপ-ঘরের অভ্যাসটা এখনো আছে কী না!

সাঁঝ হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়া? কিন্তুক সে-যুগ কী আর আছে লো মীনা? সে-একটা যুগ ছিল, ছিল। ছিল, ছিল।

এসময় কুন্তলা ঝপ্ করে একঝুড়ি গোবর ফেলল সন্তোষদের খলায়. নিজেদের খলায় গোবর লেপে সে এসেছে সন্তোষদের খলায়। জল ঢেলে পায়ে ঘেঁটে ঝাঁটা বুলিয়ে সে এবার উঠোনময় লেপে দেবে গোবর। গোবর একটু শুকিয়ে গেলেই তো তার উপর আঁকা হবে আলপনা।

ঢেঁকিশাল থেকে রব উঠল, ঐ দ্যাক, ছাঁচ গুলছে কুন্তলা! চাঁড় চাঁড় কর।

ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল আরো জোরে। কেউ কেউ ছাঁচ-তলে এসে উঁকি মেরে দেখল—হাঁ, বেলা সত্যিই পড়ে আসছে।

কেউ কেউ কুন্তলাকে ঠেস মেরে গান ধরল—

আঁধার ঘরে ছুঁচ্ গুলেছি
ভাসুর বলে জানি না,
অ ভাসুর তর পায়ে পড়ি গো
পাড়াতে গোল্ কইরো না।

আর কেউ রং দিয়ে বলল—

ছি ছি লাজে মরি,
হামরা হলে লিথাম লো গলায় দড়ি
ছি ছি লাজে মরি—

আর কেউ আরো চাপা স্বরে বলল, ভাসুর লয় ভাসুর লয়, বল্ দেওর—আঁধার ঘরে ছুঁচ্ গুলেছি দেওর বলে জানি না...। রং-উলীরা ফের ফোড়ন দিয়ে বলল, ছি ছি লাজে মরি, হামরা হলে লিথাম লো গলায় দড়ি, ছি ছি!

কেউ কেউ অবশ্য বলল, টুসুর গীত এই বাঁদ্না পরবে কেনে লো ছুঁড়িরা? গাইতে নাই, গাইতে নাই।

যাকে উপলক্ষ্য করে অসময়ের এই গান-গাওয়া, সে কিন্তু কিছু শুনল না কিছু বুঝল না। হড় হড় করে জল ঢেলে সারা শরীর হলিয়ে-ঢলিয়ে সে গোবর গুলছে। তার তো এখনও কত কাজ বাকি, এক হাতে দু-দুটো বাড়ির কাজ—কম কথা!

ভেঁড়ির গাছ কেটে থেঁতো করতে হবে, চাল-গুঁড়ির সঙ্গে সে-রস মেশাতে হবে, তবেই না হবে হড়হড়ে। হড়হড়ে চাল-গুঁড়ি পাঁচ-আঙুলে ডুবিয়ে গোবর-নিকানো খলায় আলপনা আঁকতে খুব সুসার হবে।

গোবর-নিকানো খলায় চাল-গুঁড়ির আলপনা আঁকা হয়ে গেলে এসময় কোত্থেকে যে-একটা হিমেল হাওয়া, কাল্হা বাসাত্ আসবে—সারা শরীলমন জুড়াএে যাবে, আমাব ত বয়, কুন্তলাবউ ভাবে।

সব বাড়িতেই আলপনা আঁকা হবে, খলায়-খামারে, তুলসী চউরায়, গোহালঘরের দুয়ারে। সবাই কী আর সমান আঁকতে পারে? সব চেয়ে ভালো আঁকবে তো ব্রহ্মাকুমারের বউ লবঙ্গ, সেই সবার সেরা হবে।

এই নিয়ে ব্রহ্মার কম গর্ব! নিজে সে যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, খুব পণ্ডিত। তার বউও তেমন শিল্পী। 'বেহা ঘরে' অর্থাৎ বিয়ে বাড়িতে 'কহবর' লিখতে তো তারই ডাক পড়ে। কহবর-আঁকা নয়, কহবর-লেখা। কাজললতা, কাঁকই-আরশি সিঁদুর-কৌটা, পালকি-সওয়ারী, লতা-পাতা—বাসরঘরের দেয়ালে যে কী সুন্দর লিখে দেবে লবঙ্গ! হাঁ হয়ে যাবে তোমার মুখ-চোখ!

কুন্তলা কী আর অত ভালো আঁকতে পারে? তবু তো চেষ্টা করে, চেষ্টা করবে ভেঁড়ির রসে চাল-গুঁড়ি মিশিয়ে চৌকা চৌকা ঘরের ভিতর চৌকা চৌকা ঘর আঁকতে। ঘরের চার মুঢ়ায় চারটা কলাগাছ আঁকবে। লতাপাতা আঁকবে। দু'ধারে ধারে ঘর, মাঝখানে আঁকবে কুল্হিরাস্তা। এক রৈখিক তো নয়, রেখার কাছে রেখা, তার পাশেও রেখা, অনেক রেখা।

সন্তোষদের নাচ-দুয়ার থেকে গোহালঘরের দুয়ার পর্যন্ত আলপনা এঁকে ভরিয়ে দিল কুন্তলা। আঁকতে আঁকতেই লক্ষ্য রাখছিল—আতাযাতের রাস্তা, কেউ পা দিয়ে না মাড়িয়ে দেয়! বিশেষত ছোটরা, ছাগল-মাগল, হাঁসমুরগীরা। আর বারবার তাগিদা দিচ্ছিল সন্তোষকে,

যাও দেওর, দৌড়াও গোঠটাঁড়ে গরুগোঠে। বাগালদের এখনও সামলে সুমলে রাখতে বল গরুগুলাকে, এই তো হয়ে এল! আঁকার মাঝখানে গরুগুলা এসে পড়লে সে বড় অনত্থ হবে, ছিন্‌ছাতুর কাণ্ড হবে।

কুন্তলাবউদিদির আঁকা ছেড়ে একদণ্ডও যেতে মন করে না সন্তোষকুম্‌হারের। আঙুলের ডগা থেকে চাল-গুঁড়ির জল যেখানে পড়ল পড়ল, যেখানে পড়ল না পড়ল না, কিংবা ছাড়া ছাড়া ফোঁটা ফোঁটা পড়ল, সেখানেও আঁকা হয়ে গেল নিপুণ আলপনা।

না, না, সন্তোষ বলল, গরুগোঠ এখন আসবে কী, এখন ত গোঠটাঁড়ে গোঠ-পূজা। বাঘুৎ-পূজা, তারপরেও আছে তোমার ছাঁদনদড়ি-বাঁধনদড়ি, গরু আসতে এখনও ঢের দেরি বউদি।

তবু ঠেলে-ঠুলে সন্তোষকে গোঠটাঁড়ে পাঠিয়ে দিল কুন্তলা। তারপর আঁকা শেষে, গোহালে তুলে রাখা ঘাসের 'মড়' খুলে অঙ্কিত চৌকা চৌকা ঘরের মাঝখানে, অঙ্কিত কুল্‌হি- রাস্তার জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে দিল কাঁচা সবুজ ঘাস। আলপনার খাঁজে খাঁজে সিঁদুরের টিপ। গুঁড়ির প্রদীপ। একেক দলা গুঁড়ির লেচি, তায় চেপ্টা করে তেল-সল্‌তে।

নাচ-দুয়ারে রাখা গুঁড়ির প্রদীপ দুটিই সবচেয়ে বড়।

নিজের ছেলে পরিমলকে সন্তোষদের নাচ-দুয়ারে বসিয়ে রেখে কুন্তলা বলল, দেখিস পরি, চুরি না যায়! চুর্‌ণী ছুলিউলীরা আইল বলে!

নাচ-দুয়ারের গুঁড়ির প্রদীপ চুরি করতে মুখে ছুলি পিঠে ছুলি যুবতী মেয়েরা এল অনেক পরে। দেওর সন্তোষকুম্‌হারের দেওয়া নতুন শাড়ি পরে নাচ-দুয়ার থেকে গোহালের দুয়ার পর্যন্ত নিজহাতে আঁকা আলপনার উপর জায়গায় জায়গায় রাখা গুঁড়ির প্রদীপগুলো একে একে জ্বেলে দিয়ে গেল কুন্তলা। নাচ-দুয়ারের প্রদীপ দুটিই বেশি জ্বলছিল। গরুগুলি এল, হড়বড়িয়ে গোহালে যেতে যেতে ফেলে রাখা ঘাস খেল গোগ্রাসে, পায়ের খুরে নিভিয়ে দিয়ে গেল কতক জ্বলন্ত প্রদীপ।

গরু তো! কোনমতে চাপাচুপি দিয়ে নাচ-দুয়ারের প্রদীপ দুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল পরিমল। প্রদীপ দুটির শিখা জ্বলছিল ইনিয়ে বিনিয়ে।

আচমকা কোত্থেকে যে এল চুর্‌ণীমেয়ের দল! পাহারাদার পরিমলকে পুরোপুরি ধোঁকা দিয়ে এক ঝটকায় তুলে নিয়ে গেল দু-দুটো গুঁড়ি-প্রদীপ! পরিমল তাদের চেনে, সব তার চেনা বই কী! ঐ ত মথুরবুড়ার মেয়ে তরু, লইতনের দিদি গুরুবারী, গগনের দিদি চাঁপী, চাঁড়রাবুড়ার মেয়ে সরুপুঁটি। চুরি করেও সব কেমন হাসতে হাসতে গেল!

একদৌড়ে পরিমল এসে তার মাকে বলে দিল সবকিছুই। ছাঁকা-পিঠা আর গরুচুমানোর জোগাড় করতে শশব্যস্ত তার মা হেসে বলল, চুরণীরা চুরি ত করবেই, গায়ে যে তাদের ছুলি, সাদা সাদা দাগ পরি, গুঁড়ির প্রদীপ চুরি করে গায়ে না মাখলে সে-দাগ কী সহজে যাবে মনে করেছিস?

সামান্য গুঁড়ির প্রদীপ গায়ে মাখলে তরুর, লইতনের দিদি গুরুবারীর, গগনের দিদি চাঁপীর, সরুপুঁটির মুখের-পিঠের সাদা সাদা দাগ যদি ভালো হয়ে যায়, তবে শুধু শুধু চুরি করতে মানা কেন, কেনই বা চোর ধরতে পাহারাদারির ব্যবস্থা—পরিমল ভেবে পায় না।

সে বিমর্ষ, চিন্তিত হয়ে থাকলে তার মা কুন্তলা তার হাতে গুঁজে দিল দু-দুটো 'ছাঁকা-পিঠা'। পরিমল ছাঁকা-পিঠা ছিঁড়ে খেতে খেতে বাইরে গেল, খাওয়া শেষ করে আবার আসবে ভিতরে, আবার খাবে, ছা-ছানাদের জন্যই তো পিঠা গড়া।

খুড়শ্বশুর ভৈরবকুম্‌হার ও দেওর সন্তোষকুমহারের জন্যও দু-থালা ফুলকো পিঠা নিজে

গিয়ে ওবাড়িতে দিয়ে এল কুন্তলা। সন্তোষের চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলেও এল, কী গো দেওর, নিজে খাবে? না, খাওয়াঁই দিব-অ?

সেবার চোখ ছোট করে সন্তোষ শুধু হেসেছিল।

তারপর কুন্তলা স্বামী-শ্বশুর শাশুড়ী ছা-ছানাদের খাইয়ে, নিজে খেয়ে সন্তোষের দেওয়া লালপাড় সাদা খোলের শাড়ি পরে রীতিমতো রূপবতী সেজে বের হল 'গরু চুমাতে' গোহালঘরে। সঙ্গে ঢুকল সন্তোষ।

গরুর শিংয়ে তেল-সিঁদুর মাখাবে সে। অবলা মেয়েমানুষ গরুর শিং ধরলে পাছে গরু তাকে টুঁসিয়ে দেয়। "নদী নারী শৃঙ্গধারী—এ তিনকে না বিশ্বাস করি।"

গরুর শিং-য়ে তেল-সিঁদুর মাখাচ্ছে সন্তোষ, আর মস্‌করা করে সন্তোষের কপালে তেল-সিঁদুর লেপে দিচ্ছে কুন্তলা। সম্পর্কে দেওর, বউদি তো ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবেই।

নতুন কুলোয় রাখা ধান-দূর্বা লম্বা জিভ বের করে গরুগুলো গসা গসা খাচ্ছিল। ধানের মৌড় পরিয়ে দিলেও সে-মৌড়ের ধান নাকের ফুটোর উপর দিয়ে লম্বা জিভ লেলিয়ে টেনে এনে খাবার চেষ্টা করবে গরুগুলো।

কুন্তলাবউদিকে দেখাল অপূর্ব যখন সে ভেলাপাতার দঁড়ে ধুনার আগুন জ্বেলে গরুগুলোকে চুমাচ্ছিল। গরুর মাথায় ঘুরিয়ে সে-আগুন শাড়ি গুটিয়ে তার তলা দিয়ে তিন-তিনবার এ-হাত ও-হাত করছিল বউদি।

মনে মনে সন্তোষ ভাবল, বউ হয়ে সাবিত্রী ঘরে এলে সে-ও কী এত নিপুণভাবে দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে ভেলাপাতার দঁড়ে ধুনার আগুন গলাবে? আর কবে আসবে সাবিত্রী? আর কবে? কবে?

কুন্তলা 'গরু-চুমানো' শেষে হাতের তৈজস সন্তোষকে ধরতে দিয়ে দেওরের গালে ফের ঠোনা মারলে সন্তোষ এবার হাসল না, "ধর রে লক্ষণ"—এর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কুন্তলাকে সাবিত্রী ভেবে জড়িয়ে ধরল।



বড়ামথানে পূজা শেষে পূজার প্রসাদ আগে ছোট ছোট ছা-ছানাদের, পরে বড়দের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নিজে খেয়ে দুপুর দুপুর নুকু ওরফে লক্ষ্মী গিয়েছিল দোরখুলির মাহাতোপাড়ায়, তার ধরমবাপ বঙ্কা মাহাতোর ঘরে।

বঙ্কার বউ-ই ডেকে পাঠিয়েছিল। গরু নেই বাছুর নেই, লোধাপাড়ার শুকনা ডাঙায় কী করবে মেয়েটা, একা একা?

বঙ্কা মাহাতোর ঘরে দুপুরবেলা ভালমন্দ খেয়ে 'ফুল'-এর সঙ্গে খেলছিল নুকু। লুডু খেলছিল।

লুডুপালি তাদের নেই, তারা তো আর বনে-জঙ্গলে লুডু খেলে না। খেলে বাঘঝাঁপা, বাঘবন্দী আর খেলে নুড়ি, একম-দুকম। সে-সব খেলায় নুকু একেবারে চোস্ত্। মাটিতে খাপরাকুচি কী আঙরা দিয়ে ছক কেটে বাঘঝাঁপা খেলতে খেলতে দিন-কাবার করে দিয়েছে কত!

আজ খেলল লুডু। ছক্কা ছক্কা, পুট পুট। এক পালিরই উল্টো পিঠে সাপ লুডু, সাপ সাপ। সাপলুডুও কিছুক্ষণ খেলল। তারপর তো খাওয়া-দাওয়া।

খেতে বসে নুকুর স্বভাবতই মনে পড়ল মায়ের কথা, ছোটবোন মুনকুর কথা। মা না হয় হাঁড়িয়া গিলে বিশ্বসংসার খিদা-তেষ্টা ভুলেই আছে। কিন্তু মুনকু? তার তো অহঃরহ-ই মনে পড়বে, সে ইচ্ছে করেই মনে করবে—দিদি তার ধরমবাপের বাড়িতে না জানি কী ভালমন্দ খাচ্ছে। খাসির মাংস তো খাচ্ছেই। দৌড়ে দৌড়ে আসছে দোরখুলির দিকে কতকটা রাস্তা। গন্ধ শুঁকতে বড় করে শ্বাস নেবে, ফের দৌড়ুতে দৌড়ুতেই ফিরে যাবে লোধাপাড়া। 'রক্ত-ভাজা' খেতে কী ভালোই না বাসে মুনকু!

হ্যাঁ, খাসি-কাটা হয়েছিল মাহাতোপাড়ায়। এখন তিনদিনই খাসি কাটা হবে। খাসি কাটা তো নয়, খাসি মারা। ভাগায় ভাগায় লোকজন মাংস কিনবে। ভাগা-মাংসের ব্যবসায়ে লাভও নেই লোকসানও নেই।

পরব আসছে, তো কোথায় কার ঘরে চ্যাঙচ্যাঙে খাসি আছে তার খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে হাউসী লোকেরা। সাইকেলে উঠে হুটমুট চলে যাচ্ছে, দরদাম করছে, একদিনে হল না দু-দিনে হল না, তিনদিনের দিন দরে-দামে পোট হলে সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাসি বেঁধে পরবের দু'দিন আগেই হাসতে হাসতে গ্রামে ফিরবে।

এই দু'দিন উঠোনে দড়ি দিয়ে খাসিটাকে বেঁধে রাখবে। বটপাতা, আম-পাতা খেতে দেবে। ভাত-মুড়িও খাওয়াবে। পরবের দিনটায় খাসিটাকে মারা হবে। মাথায় ভারি কিছু ঠুকে থোতনা দুটো চেপে ধরে ঘাড়টা মুচড়ে দিলেই ব্যাস্!

ছাল ছাড়ানোর সময় হাতের খাসি-কাটা ছুরি দিয়ে গলার কাছটায় এক পোঁচ দিলেই ছির্‌রর্ করে রক্তধারা। সে-রক্ত বাটিতে বা গামলায় ধরে রাখা তারপর তো নুন দিয়ে ভাজা। কী ভালো খেতে! আর ভালো 'কানপোড়া'। খাসির কানদুটো কেটে আগুনে ধুড়সে নিলেই হল। মুচমুচে খেতে।

নুকুর মনে পড়ল মুনকু 'কানপোড়ো' খেতেও কী ভালো না বাসে! সেই সে-বার, বড়ামথানে বলি দেওয়া হয়েছিল বড় পাঁঠা, ঠাকুরেব ভোগেব পাঁঠাটারও কান খেতে মুনকুর সে কী পীড়াপিড়ি! রক্ত? সে তো খেয়েছিল বড়ামথানের হাতি-ঘোড়া। রক্ত মুনকু পায়নি, তবে শেষমেষ কান একটা জুটেছিল তার ভাগ্যে। সে-ও তো রাইবুকাকার কাছে মায়ের আব্দারে।

আব্দার ধরলে ধরমবাপও কী আব মাকে-মুনকুকে খেতে ডাকত না? ডাকতই।

ডাকতই ডাকত। অগাধ চাষবাসের মালিক তো বঙ্কা মাহাতো। তার উপর অতবড় চালু দোকান! একটা ধান-কুটা মেসিনও বসিয়েছে মাস কতক আগে, সেই থেকে ধান কুটে চলেছে ভট্‌ভট্ ভট্‌ভট্। ধান কুটাতে দূরদূরান্ত থেকে কত লোক আসছে!

আর আজ? পরবের দিন খলায় গুড়ের কলসি বসিয়ে কত গুড়ই যে আজ বেচল! কেউ কিনে নিয়ে গেছে একসের, কেউ আধসের। একপোযা আধপোয়াও কী নেই? আছে, আছে। দু সের পাঁচ সেরও নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। খলায় এই, দোকানের ভিতরে তো সবসময় গন্ধেশ্বরী ঠাকুরের গন্ধ। দোকানের বাইরে বঙ্কা মাহাতোর ঘরের সদরে হরদম লোক বসে বসে বিড়ি-তামুক খাচ্ছে।

লোধাদের সঙ্গে বঙ্কা মাহাতোর এত মাখামাখি তল্লাটের সবাই কী আর ভালো চোখে দেখে? কে জানে কার মনে কী আছে! কিন্তু সামনাসামনি কেউ কিছু বলতে পারে না, বরঞ্চ বঙ্কাই যাকে-তাকে যখন-তখন যা-তা বলে দেয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হল খেলা। নেশায় পেয়েছে রঞ্জুকে, রঞ্জু না থামলে খেলাও থামবে না, চলবে অনন্তকাল। নুকুর নিজে থেকে থামবার তো উপায় নেই।

খেলতে খেলতেই নুকু শুনতে পাচ্ছে হৈ হল্লা—বুঝতে পারছে দোরখুলির মাহাতোপাড়ার ঘরে ঘরে খলা-খামারে গোবরে ছলাৎ ছলাৎ জল ঢেলে গোবর-ছঁচ্ দেওয়া শুরু হয়েছে।

মেয়েরা হাসাহাসি ঠাট্টা-মস্করা করছে, হয়ত এ ওকে গোবরে ঠেলে দিয়ে মজা মারছে, গোবর ছিটকাচ্ছে, চোখে-মুখে-মাথার চুলে গোবর লেগে যাচ্ছে থুলথুল, লুডুর দান দিতে দিতে নুকুর মনে হল, দোরখুলির মাহাতো মেয়্যারা এসময় আরো কত কী যে করছে!

লোধাপাড়ার খলায় আঙ্নায়ও গোবর-ছঁচ্ দেওয়া হয়। তবে সেখানে এত হৈ হল্লা এত হাসি-মস্করাই বা কোথায়? একটা কুম্বা থেকে আরেকটা কুম্বা'র দূরত্বই তো বহুৎ! কারোর ভুগড়া-ঘর এ-ডুংরিতে তো আর কারোর কুঁড়িয়া ঐ-ডুংরিতে। মাঝে কতই লাটাপাটা! হাসি-মস্করা করতে করতে এর ওর গায়ে ঢলে পড়বে যে তার সুযোগই বা কোথায়!

এত খলা-খামার কী সেখানে আছে? আর এত বড় বড় বিঁড়া-গাদা, এককেটা হাতির পারা? আর সে বিঁড়াগাদার-খড়গাদার ছাঁচতলে সে কী ছায়া-ছাঁয়রা। চারধারের খরায় ফেটে যাচ্ছে তালু, কিন্তু বিঁড়াগাদার ছায়ায় দড়ির খাটিয়া পেতে বসে থাকলেও কোত্থেকে যে এত ঘুম জড়িয়ে আসে দু চোখে! ঢুলে পড়ছিল নুকু।

রঞ্জু বিড়বিড় করে উঠল, পুট, পুট, পুট!

একটা পুট পড়লেই তার একটা গুটি পেকে যায়। পুট, পুট, পুট!

ডাব্বা উল্টানো মাত্রই একটা পুট পড়ল। আর পুট পড়া মাত্রই রঞ্জু দু'হাতে তালি মেরে কোমরের ইজেরটা আরেকটু টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠল—পেকেছে, পেকেছে, একটা হলুদ পে-কে-ছে পেকেছে!

খুব ভয় করল নুকুর—পাছে সে নিজে জিতে যায়! সে জিতলে 'ফুল' যদি রেগে ওঠে? অতএব হারতে হবে তাকে, হারতেই হবে। হার, হার, হার। আর 'তিন' উঠলেই একটা গুটি কেটে দেবে 'ফুল'।

ডাব্বা ঘুরিয়ে রঞ্জু বিড়বিড় করছে, তিন, তিন, তিন! নুকুও মনে-মন বলছিল, তিন, তিন, তিন! তিনই উঠল রঞ্জুর। একটা গুটি কেঁচে গিয়ে ফের ঘরেই ফিবে এল নুকুর।

বঙ্কা মাহাতোর পরিবার, নুকুর ধরম-মা, দুয়েকবার ঘরে ঢুকে বলেছিল, কীই তর্‌হা তখন থিকে পুট্ পুট্ হুল্লা-পাঞ্জা করে চলেছিস, বাইরে ঘুরে-বুলে দ্যাক্ একটুক। বলামাত্রই উঠে দাঁড়িয়েছিল নুকু, কে জানে ধরম-মা হযত এই কথা বলে তাকেই ঘবের বাইবে যেতে বলছে! যেতে পা-ও বাড়িয়েছিল নুকু, রঞ্জু তাকে ফের হাত ধরে বসিয়ে দিল, আবেক পিট, আরেক পিট!

অলস মধ্যাহ্নে অপরাহ্ণে হরিবাসরে খলা-খামারে ক্লাবঘরেও চিৎকার উঠছিল, আরেক পিট, আরেক পিট!

তাস খেলা চলছিল। যে কোনো পরবের কর্মহীন অবসবে এ তল্লাটের অবসর-বিনোদনের বড় উপায় তো তাস খেলা। ব্রে, ব্রিজ, টোয়েন্টি নাইন—আব নয় শুধুই রঙ-মেলানো।

খেলতে বসেছে বেশি হয়ত গ্রামে-আসা জামাইরা। তারাই তো আসনকাঠের ক্ষারে কাচা সোডায় কাচা লাইফ্লের মতো ধবো গেঞ্জি পবেছে, নতুন জামা পবেছে।

নুকু মনে-মন ভাবল, এত জামাই-বহনই লোধাপাড়ায় আর কোথায়? বাঁদনায় এসেছে বড়জোর একজন কী দু'জন। জটাদিদির জামাই খড়ুশবরকে যা আসতে দেখেছে নুকু, তার আবার অত সাফা জামাকাপড় কোথায়?

জটাদিদির শরীর একদম ভাল নেই, তাই পরবে কী আর, মাকেই দেখতে এসেছে মেয়ে-জামাই। জটাদিদিকে রাইবুকাকাও খুব মান্যি করে, বলতে কী একেবারে মায়ের মতো।

'ফুল' রঞ্জুকে কী নিজের লেখা কবিতাটা শুনিয়েছে নুকু? না, বুকের খাঁজে এখনও গোঁজা আছে, অসাবধানে হাত পড়লে খড়খড় আওয়াজ উঠছে।

রঞ্জু খেলা-পাগল, আর কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তাকে কবিতা শোনালেও সে বড়জোর বলত, বাঃ ভালো ভালো! কিন্তু নুকুর কেবলই মনে হচ্ছিল—লেখাটা যেন বড় বেশি 'লোধা' 'লোধা'। শুনে-টুনে ফুল আবার বলবে না তো 'লোধা-লোধা' গন্ধ উঠছে?

সবার অজান্তে কাগজটা বুকের খাঁজ থেকে টেনে বের করে একবার নাকে শুঁকে দেখলও নুকু। না, কাগজটা এতক্ষণ বুকের খাঁজে গুঁজে রাখায় কেমন যেন গুমে যাচ্ছে, গুমো গন্ধ।

ঝট্ করে বেরিয়ে পড়ল নুকু, বেলাও পড়ে আসছে। আসবার সময় তার ধরমবাপ বঙ্কা তার হাতেই গুঁজে দিয়েছিল দু-প্যাকেট মোমবাতি। ছেলে হলে দিত তাল-ফট্‌কা বিড়িফটকা, মেয়ে বলেই দিল মোমবাতি।

কী খুশি যে হয়ে গেল নুকু! তার হাতেই কী না বাবু-ভায়াদের মতো দু-দু প্যাকেট মোমবাতি? মুহূর্তে গোটা 'অমাবইসা রাত'টাই উঠে আসবে না নুকুর দু হাতের মুঠোয়?

বঙ্কা মাহাতোর ঘর ছেড়ে সে প্রায় দৌড়ুল, দৌড়ুল লোধাপাড়ার দিকে। লোধাপাড়ায় কে কবে মোমবাতি জ্বালিয়েছে? কবে, সে কোন্‌দিন আঁটারি-চুরচুর ঝোপের তলায়, খিরিসতলায়, করঞ্জ-কইম গাছের নিচে, কেঁদলাটায় কুলবুদায়, শাল-আসনের গাছের তলে ঝুপুঝুপু করে জ্বলেছিল মোমবাতি?

জ্বলে নাই, জ্বলে নাই!

আজ নুকু জ্বেলে দেবে, আলোয় আলোময় করে ছাড়বে সমগ্র লোধাপাড়া। এতদিন বড়জোর অমাবস্যার অঝোরঝর অন্ধকারে, ঝাঁপুড়-ঝুঁপুড় হাড়-জোড়া বাজ-বরণগাছের লতায় পাতায় জ্বলেছিল ঝুপুক ঝুপুক করে বাঘ-যুগ্‌নী পোকা, আর কুঁড়িয়ার ভিতর-ঘরে কেরাসিনের ডিবা-ডিব্‌রি যেটুকু বা জ্বলেছিল তার আলো ত ভুগড়ার ছিটে-বেড়া ভেদ করে বাইরে আসেনি, আসতেই পারেনি। খাল-মুহে খালধারে ডাঙা-ডুঙোড়ে রাত-ভিত আর যা জ্বলে উঠেছিল চিড়িক-চিড়িক করে হঠাৎ হঠাৎ, তার আলো তো লোধাপাড়া পর্যন্ত আসেনি, ভূতের আলো ঐ দূরেই নিভিয়ে দিয়েছে ভূতে।

আজ জ্বালার মতো আলো জ্বালবে নুকু। একেক প্যাকেটে ৩২টা, দু প্যাকটে ৩২×২=৬৪টা। এক হাত অন্তর বসালেও তো চৌযট্টি হাত! কম কী? তবে এক হাত কেন, পাঁচ হাত ছাড়া-ছাড়াই বসাবে নুকু।

রীতিমত অস্থির অস্থির নুকু দৌড়ুতে দৌড়ুতে মনে মনেই ঠিক করল, কোথায় কোথায় কত দূরে দূরে বসাবে একেকটা মোমবাতি। এখন গিয়ে মোমবাতিগুলো ঠিক ঠিক জায়গায় পুঁতে রাখবে, জ্বালাবে না, মোমবাতি জ্বলবে সে তো রাতে!

রাতে যখন ভুসভুসে অন্ধকার নামবে লোধাপাড়ায়, অমাবস্যার অন্ধকার, যখন বড়জোর ঝোপে ঝাড়ে বাগযুগ্‌নীপোকা পাছায় জ্বলন্ত 'টিপালাইট' গুঁজে ঘুরে বেড়াবে এদিক-সেদিক, যখন দূরে কুম্‌হারপাড় কাম্‌হারপাড়া কী মাহাতোপাড়া ভূমিজপাড়ায় প্রতিঘরের নাচ-দুয়ারে জ্বলবে গুঁড়ির প্রদীপ, আর সেগুঁড়ির প্রদীপ চুরি করবার ধান্দায় ঘাপটি মেরে বসে থাকবে পিঠে ছুলি মুখে ছুলি যুবতী মেয়েরা, কিশোরীরা, তখন, ঠিক তখনই লোধাপাড়ায় শাল-আসন গাছের গোড়ায় করঞ্জ-কইম গাছের তলায় অথৈ অন্ধকারে একের পর এক মোমবাতি জ্বেলে যাবে নুকু। ঝিরি ঝিরি হাওয়া যতই বহে যাক, হিমগুঁড়ি মাখা বাতাস এসে যতই

করুক বাদ-প্রতিবাদ, ঝোপের আড়ালে সে-হাওয়া-বাতাসের বিপরীতে নুকু এমন বুদ্ধি করে জ্বেলে দেবে মোমবাতি যে, সে-বাতি অর্নিবাণ জ্বলতে থাকবে।

সে-আলোর কারিকুরি দেখতে লোক জুটে যাবে না লোধাপাড়ায়?

এগো নুকু, নুকু, এ-ই-ই-ই! দৌড়ুতে দৌড়ুতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নুকু, সাবিবিটি ডাকছে!

শুধু ডাকছে না সাবিত্রী, যেন আকুল আর্তনাদ করছে। আবার কী হল, চেঁচিয়ে নুকুও উত্তর দিল, যাচ্ছি বিট্টি, যাচ্ছি!

ঘুপচী থেকে কিছুটা এগিয়ে এসেছিল সাবিত্রী, লাটা-পাটার ভিতর। নুকু এলে তাকে হাতে ধরে নিয়ে চলল ঘুপচীর পিছন দিকে, ঐ দিকটা সাবিত্রীর বড় প্রিয়। ঐখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কেটে যায়।

কখনও কোনোদিন রাত থাকতে এসে বিরলে ঐখানটায় বসে কেঁদে ভোর করে দিয়েছে সাবিত্রী, কখনও এমনি শুধু শুধুই কুল্‌কুলিয়ে হাসতে হাসতে দেখেছে ঝিলিমিলি সূর্যাস্ত। ঐ দিক দিয়েই তো এসে লাটা-পাটার ভিতর একাধিকবার চুপিসারে বসে থেকেছে সন্তোষ! কেঁদ্-বুদায় কুড়চি-বুদায় জড়াজড়ি করে ঢেপচুপাখ, ক্যারকেটাপাখ গড়াগড়ি খাচ্ছে—সে তো কত দেখেছে সাবিত্রী! দেখেছে আর দু হাতে তালি মেরে হেসে উঠেছে।

নুকু ঘুপচীর পিছনটায় এসে দেখল সাবিত্রীবিটি ঘরের সামনের দিকের দেয়ালে ছুঁচ দিয়ে যত না ছবি এঁকেছে, তার চেয়ে পিছনের দেয়ালটায় নক্সা করেছে বেশি। গোল গোল ফুল, গোলের উপর গোল, গোলের ভিতর ঢুকে তৈরি করেছে আরেকটি গোল। গোল-ফুল। কোথাও সে-ফুলের রং তিলকমাটির 'হল্‌দা' কোথাও বা আঙরা-কালো, আর কোথাও পুঁই মেচড়ির লাল, গিরিমাটি, সীমপাতার সবুজ—

না, নুকুর নিশ্চিত মনে হল, সাবিত্রীবিটি এ-ছবি এঁকেছে গোব্‌রাসাঁওতালের দেয়ালের ছবি দেখে তো নয়, তার চোখ চলে গিয়েছে আরেকটু দূরে কুম্‌হারপাড়ায়। কুম্‌হারদের দেয়ালে আঁকা ছবির মতো অবিকল এঁকেছে সাবিত্রীবিটি।

কুম্‌হার, কুম্‌হার। এত থাকতে কেন যে কুম্‌হারদের প্রতি টান সাবিত্রীপিসির—নুকু ভেবে পায় না। এখনও 'বেহা'ই হল না, তবু সব কিছুতেই কুম্‌হার-কুমহার ছাপ। শ্বশুরঘরে সে-ছাড়া আর কে আঁকবে, শাশুড়ী তো মরে গেছে কবেই—এখন থেকে তাই কী হাত পাকাচ্ছে সাবিত্রীবিটি?

নুকুকে একান্তে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল সাবিত্রী।

অ বিটি নাই কাঁদ-অ গ, নুকু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, পরবের দিন বলে কথা।

সাবিত্রী আরো জোরে ফুঁপিয়ে উঠেও নিজের ঠোঁট সজোরে কামড়ে ধরল। বলল, আজ উহার আস্‌সার কথা।

কার বিটি, কার?

তোর পিসার।

প্রায় হেসে উঠেছিল নুকু, জোর সামলে নিয়ে বলল, পরবের দিন, শ্বাশু-ঘরে জামাই ত আসবেই বিটি। তো কী?

অরা যদি ধরে চিহড়-লতে বেন্ধে উকে মার-ধর করে? হেঁ করে যদি?

একটুর জন্য হলেও থম মেরে গিয়েছিল নুকু। তারপরেই হল্‌বলিয়ে বলে উঠল, কে বাঁধবে? রাইবুকাকা ত? দ্যাখো গিয়ে সে এতক্ষণ আমাদের ঘরে ভাকু আর পাঁচু গিলে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর নয়ত নম্‌থম্ শুয়ে পড়েছে।

বলেই হাসতে হাসতে কী যেন ইঙ্গিত করে নুকু চলে গেল।

ধক্ করে উঠল সাবিত্রীর বুক। রাইবু, রাইবু। ঐ রাইবুই তো একদিন তার আঁচলে উপুড় করে ঢেলে দিয়েছিল সব মাছ, সোল-গড়ুই-চিঙড়া। মন তো খুব ভালো রাইবুর।

আরেকটা কথা মনে পড়তেই এত দুঃখেও হাসি পেল সাবিত্রীর। হেঁ, কী যেন বলে ফেলেছিল সে রাইবুকে, কী যেন—এত্ত দিলে, আমো-ও কিছু দিব-অ। হঁ, কী দিবি? টুকচার রাত করে ধ'তলে আস-অ, দি-ব-অ—

রাইবু এক দলা কাদা ছুঁড়ে মারবে না তার মুখে? মুখে আঁচল চেপে ধরে সাবিত্রী এখন হাসছে। হঁ, তখন বলে কত ছোট ছিলাম, কত ছোট! সেই রাইবু এমন পাল্টে গেল কী করে?

নুকু, নুকু। নুকু তো একরকম রাইবুরই ছানা। নুকুকে বাঁদনায় শাড়ি কিনে দিয়েছে রাইবু। ভুবনার বউ ফুলটুসির সঙ্গে তার যে চোরাগুপ্তা ভাব—আশ্‌নাই আছে—তা কী আর লোধাপাড়ার লোকেরা জানে না? সব জেনে-শুনেও তারা চুপ মেরে আছে কী জন্যে?

না, ঐ যে মাতব্বর, মাতব্বর বলে কথা। রাইবু মাত্‌বরের মুখের উপর কথা বলবে কে?

কথা বলতে পারে একজন, একজনই, সে নুকু। সাবিত্রী ভাবল, নুকু কী তার হয়ে রাইবুকে কিছু বলেছে? বলে নি, বলে নি। বললে নুকুর কথা কী ফেলতে পারত রাইবু?

নাই, পারত নাই।

নুকু মোমবাতি হাতে দৌড়ুতে দৌড়ুতে নিজেদের ঝুপড়িতে এসে দেখল—রাইবুকাকা তখনও তাদের ঘরে। সেই থেকেই আছে? না, নিজেদের ঘরে গিয়ে আবার এসেছে রাইবুকাকা? মা-ই হাতে ধরে টেনে এনেছে তাকে? নাকি স্ব-ইচ্ছায়?

মা তো এখনও কাকার হাত ধরে টানাটানি করছে। সেই থেকেই টানাটানি করছে মা, আর রাইবুকাকা ছিটকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে সেই থেকেই? নাকি, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আরেক প্রস্থ খাওয়া-খাওয়ি শুরু হবে এই, আর তাই ফের আরেকদফা হাতে ধরে টানাটানি?

মায়ের সে-বেলার চেয়ে এ-বেলার দুর্দশা দেখে হাসি পেল নুকুর! চোখ দুটি হয়ে গিয়েছে সুরগুঁজা ফুলের মতো লাল, সামনে দাঁড়ালেও মা কী আর চিনতে পারবে তাকে? চিনতে না পেরে ঢলঢলে ডান হাতের কব্‌জি উল্টে তাড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গি করবে? বলবে, কে তুই চিনি নাই—যা!

এই মা, মা গ'! মায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে নুকু ডাকল।

হঁ মুনু হঁ, ধরমবাপ-ঘরে খাবাদাবা ঠিকঠাক হয়েছ ত?

হঁ, হাতের দু-প্যাকেট মোমবাতি দেখিয়ে নুকু বলল, ই দুটোও দিল-অ।

কী জিনিস মুনু, কী? মুখ-চোখ চক চক করে উঠল ফুলটুসির।

রাইবুই বলল, মম্।

বলেই নুকুকে নির্দেশ দিল রাইবু, দু-চাট্টা বড়ামথানেও জ্বেলে দিস নুকুমা।

হাঁ, লোধাপাড়ার আর কোথাও না জ্বলুক বড়ামথানের শাল-আসনতলায় মাঝে-মধ্যেই ঝিরিঝিরি শিখায় জ্বলে উঠেছে প্রদীপ। সেখানে প্রদীপ তো জ্বালাতেই হয়, বড়ামথানে প্রদীপ না জ্বললে, জ্বলা-প্রদীপ অকারণে নিভে গেলে সমস্ত লোধাজাতেরই তো বিপদ!

নুকু বলল, দু-চাট্টা কী, রাইবুকাকা, বড়ামথানে পাঁচ-পাঁচটা আমার ধরা আছে।

এবার চোখ-মুখ চক চক করে উঠল রাইবুর।—এই না হৈলে মেয়্যা? মনে মনে বলল, দ্যাখ-অ ফুলটুসুয়া দ্যাখ-অ, কী মেয়্যা পড়কাঁইছ-অ!

আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত ফুলটুসিও ফের জোরাজুরি শুরু করল রাইবুকে। তার হাতের ভাঁজে হাত গলিয়ে ফের টান দিল।

হাত ছাড়িয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল রাইবু, উঠতে উঠতেই বলল, মেয়্যার সামনেই? মেয়্যা বড় হচ্ছে নাই?

বলতে বলতে বাউলার তুল্য চলে গেল রাইবু, যেমন যেত ভুবন।

ভ্যাবাচকা খেয়ে খানিক থম মেরে নুকু বলল, কিসের কী-ই মা?

ফুলটুসিলোধানী মেয়েকে বুঝিয়ে বলল, তোর কাকাকে আর টুকচার হাঁড়িয়া খেতে জিদ্দাজিদ্দি কচ্ছিলম, ত শুনলি ত বলল, মেয়্যার সামনে খাব্ব নাই, মেয়্যা বড় হচ্ছে নাই?

ঠোঁট উল্টে মেয়েও বলল, একলাই খাও, তোমার পেট এখনও ভরে নাই।

লালচোখ আরো লাল আরো ছোট করে মেয়ের মা বলল খাব্বহ ত, বছরকাল [illegible] পেট ভরে খাব্ব নাই? খাব্ব লাচব গীতও করব।

বলেই দু-হাতে তালি মেরে, দাঁড়াতে পারছে না তবুও টলতে টলতে ফুলটুসি গাইতে লাগল

জামাই ছ্যেলায় খাঞে গেল শুকা ভাত
বাজারে বিঁকাইছে লুল্‌হা মাছ—

মোমবাতি আর 'মাচিস্' নিয়ে ছোটবোন মুনকুকে হাঁক পেড়ে বেরিয়ে গেল নুকু। বেলা ডুববার আগেই মোমবাতিগুলোকে জায়গামতো পুঁততে হবে।

দেখতে দেখতে নুকুর সঙ্গী জুটে গেল মেলা। ছোটবোন মুনকু তো এলই, সেই সঙ্গে এল লোধাপাড়ার ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুমরা। পরবের দিন বলে আজ তাদের কারোর জুটেছে দড়িঅলা লাল পেন্টুল! তারা ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে মুখে সুতো-গোঁজা সাদা সাদা কাঠিগুলোকে দেখছে। মুনকু যাও বা সেগুলোকে ছুঁতে পারছে, আর সব তো দাঁড়িয়ে আছে হাত দুটো পিছন দিকে করে। যাদের হাত সামনের দিকে তারা বড়জোর নতুন পেন্টুলের ঝুলন্ত দড়িটাকে মুখে পুরে চুষছে, আর যাদের পেন্টুলও নেই, তারা তাদের নুনুটাকেই টেনে-টুনে বড় করছে।

মাচিস দিয়ে মোমবাতি জ্বেলে ফোঁটা ফোঁটা মোম ফেলে গোড়াটা এখন মাটিতে গাছের শিকড়ে কোথাও বা গাছের কোটরে ধরিয়ে রাখছে নুকু। মোমবাতি জ্বালবে সে তো রাতে। রাতে যখন আলকাতরার মতো অন্ধকার নামবে, অমাবস্যার গাঢ় অঝোরঝর অন্ধকার, বড়জোর ভুচুঙ ভুচুঙ করে কতক বাঘযুগ্‌নী পোকা পাছায় টিপালাইট জ্বেলে ঘুরে বেড়াবে এদিক সেদিক—

রাত নামলে প্রথম মোম জ্বলে উঠল বড়ামথানে, বড়ামথানের হাতি-ঘোড়াগুলো পাঁচ-পাঁচটা মোমের আলোয় চক চকে হয়ে উঠল, আরো চক চকে হয়ে উঠল তাদের মাথার কপালের শুঁড়ের তেল-সিন্দুর।

বড়ামথানের পাঁচ-পাঁচটা জ্বলন্ত মোমবাতিকে লোধাপাড়ার জনমানুষ নমো ত করলই, সেই সঙ্গে নুকু যেখানে যেখানে পরের তার পরের মোম বাতিগুলোকে জ্বালাতে লাগল সেখানে সেখানে হাজির হয়ে তারা ঘাড় নীচু করে নমো করল। প্রণাম করতে করতে বিড় বিড় করে কত কী বললও!

ঘুপচী ছেড়ে ঝুপড়ি ছেড়ে একে একে দেখতে এল সবাই, এল না কেবল সাবিত্রী। সে তখন তাদের ঝুপড়ির পিছন দিকে তারই প্রিয় স্থানটিতে বসে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল লাটা-পাটায়। ঐদিক দিয়েই তো আসবে সন্তোষ।

সন্তোষ এখনও আসছে না, টিপিক-টিপিক করে কতক আলো-জ্বলা জোনাকি খালি পথ ভাঙছে, পথ ভাঙছে। বসে থেকে হতাশ সাবিত্রী বাঘযুগ্‌নীপোকা তো বাঘঘুগ্‌নীপোকাই

শুনতে শুরু করল। ঐ গেল ওদিকে—একটা। এই এল এদিকে—দুটা। শতুরালোধার ঝুপড়ির দিকে ঝুপুক ঝুপুক করে চলে যাচ্ছে ঐ যে ঐ—তিনটা....

অবশেষে একটা একটা করে মোমবাতিও নিভতে শুরু করল। ঐ নিভল একটা বড়ামথানের, ঐ আরেকটা নিভল মহুলগাছের কোটরে, আঁটরি-চুরচুর ঝোপের তলায় দুটোই নিভল এক সঙ্গে। ঘুপচীর পিঁড়ায় দেওয়া বাতিগুলো যা নিভতে একটু দেরি হল, ঐ বাতিগুলোই নুকু জ্বেলেছিল সবার শেষে।

দূরে অদূরে মাহাতোপাড়ায় কুম্হারপাড়ায় কাম্হারপাড়ায় ভুঁইয়া-ভূমিজপাড়ায় ছাঁকা-পিঠা খাওয়া শেষ করে 'ঢ্যাঙুয়ানে'র দল জড়ো হচ্ছে 'গরু জাগাতে'। খেয়ে-দেয়ে নুকু-মুনকু শুতে যাবার আগে শুনল, এর মধ্যেই ঢ্যাঙুয়ানরা মাদল থাপড়াচ্ছে, ধিতাং-নাতিং-তিনা—

দু-বোনই ঠিক করল, আজ আর তারা ঘুমোবে না, জেগে থেকেই শুনবে—ঢ্যাঙুআনরা কী কী গান গাইছে, দুয়েকটা তো তাদের মুখস্থ—"অহীরে—সবু পরব ভালা ঘুরিফিরি আওয়ে যে বাবু হো, মানুষ মরলে নাহি আওয়ে" কিংবা 'সবু দিন ত মাগে ভালা ভাট-অ ভিখারী যে বাবু হো আজি ত মাগে ঢ্যাঙুআন।"

আর গীতগুলোও তেমন, চারধার থেকে ঘুরে-ফিরে হাওয়া-বাতাসে উড়ে এসে জঙ্গলে ঢুকে, আর ঢুকবি তো ঢুক একেবারে লোধামেয়েদের কানেই এসে ঢুকে যায়। তারা গুণতে থাকে, এই একটা হল, এই-ই দুটো। এই কুলকুলি উঠল একটা, এই দুটা। এই বাজি ফাটল একটা, চিড়বিড় করে বিড়িপট্‌কা তো ফাটল অজস্র, অজস্র।

গীত শুনুক গীত শুনুক ছোটবোন মুনকু, জেগে থেকে কান খাড়া করে রাখবে নুকু—কখন, কখন সোরগোল উঠবে লোধাপাড়ায়, চিহড়লতায় বাঁধা-ছাঁদা হবে সন্তোষকুম্হারকে, সেই সঙ্গে সাবিত্রীপিসিকেও কী এক-লতায় জড়িয়ে বাঁধবে লোধাপাড়ার রাগী মাত্‌বররা?

দিদ্দি! এই দিদ্দি!

কী মুনকু?

নিঁদ্ আসছে।

ত নিদ্দা!

নাই, তুঁই কহিনী বল্।

ঢ্যাঙুআনদের গীতও শুনবি, ফের কহিনীও শুনবি?

হঁ শুনব।

ভালোই হল নুকুর, ঘুম তো পাচ্ছিল তারও। এমনি আর কতক্ষণ জেগে বসে থাকা যায়! 'কহিনী' বললে, ঢুলুঢুলু ভাবটা তারও তো কেটে যায়। কিন্তু কী কহিনী সে বলবে? বইয়ে পড়া গল্প বলবে মুনকুকে, না তার শোনা গল্প?

শোনাগল্পই শুরু করল নুকু। গল্প না সত্যি।

সীতানালা খাল-মুহে কুনোদিন গিয়েছিস মুনকু?

মুনকু বলল, নাই।

নুকু বলল, গেলে দেখতে পেতিস ঐখেনে একটা ডুমুরগাছ আছে।

ত কী?

না, কিছু না। বলেই নুকু বোন মুনকুকে বলল, কঁড়ি আঙুল দাঁতে কামড়ে বুকে থুতু দে।

মুনকু কঁড়ে আঙুল কামড়ে থুতু দিল বুকে, ততক্ষণে যা বুঝার বুঝে গিয়েছে সে, দিদি কহিনী বলবে ভূতের।

দিদির আরেকটু গা ঘেঁষে শু'লো মুনকু। এখনও শোনেনি, তবু তার গায়ের রোঁয়া এখনই খাড়া হচ্ছে।

নুকু বলল, নাকবিন্ধির গকুললোধা মাছ ধরতে যেত রাত-ভিত খাল-মুহে ডুমুরতলায়। যেত তো যেত। মাছ পড়ত চুনোচানা, চিংড়াভুষা। শুনছিস?

হুঁ-উ।

হুঁ না দিলে কহিনী তো জমে না, মুনকু ভয়ে ভয়েই 'হুঁ' দিল।

ত একদিন খুব মাছ পড়ল, খুউব। গকুললোধার ত সুখ আর ধরে না। মনের আনন্দে ঘরে যাচ্ছে। যাচ্ছে ত যাচ্ছে। শুনছিস মুনকু?

হুঁ-উ।

হঠাৎ চিড়িক করে একটা আলো জ্বলে উঠল গকুলার ডানদিকে, তারপর ডানদিক ছেড়ে আলো জ্বলে উঠল বাঁ দিকে। ডাইনে-বাঁয়ে দু'দিকেই, একবার এদিকে তো একবার ওদিকে, চিড়িক চিড়িক করে জ্বলতে লাগল। আর চিঁচি করে বলতে লাগল, মাঁছ দেঁ গঁকুল, মাঁছ দেঁ!

গকুলের 'বহু' নাই, চিড়কিন্নভূত পিছু লেগেছে। মুনকু শুনছিস?

হুঁ-উ দিদ্দি। ঘুম কোথায় চলে গিয়েছে, দিদিকে জাপটে ধরে আছে মুনকু।

ত গকুলও তুক-গুণ জানে, ছাড়বার পাত্র লয়। চিড়কিন যত্ত বলে, মাঁছ দেঁ গঁকুল, মাঁছ দেঁ। গকুলও তত্ত বলে, ঘরকে আয়, মাছ দিব-অ, হঁ দিব-অ।

কুম্হারপাড়ার ওদিক থেকে ঢ্যাঙুআনরা এসময় খুব কুল্‌কুলি দিচ্ছে, গরু-জাগানিয়া গীতেরও থেকে থেকে খুব ঝাঁপান উঠছে। একটুর জন্য থামল নুকু, কান খাড়া করে শুনল, এসময় লোধাপাড়ায় এরকম কোনো শব্দ উঠছে কী? হৈ হট্টগোল?

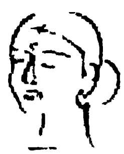
না, সবই ত সুন্‌সান্‌, কে যেন জল ঢেলে দিয়েছে রাতটায়। একটা দুটো কুকুরের ঘেউ ঘেউ, বুড়োলোকের খক্‌খকে কাসি।

—তা বাদে শুন, পিছু পিছু 'মাঁছ দেঁ মাঁছ দে' বলতে বলতে চিড়কিন যেই এসেছে গকুলদের আঙনায়, অমনি গকুল মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে দিল চিড়কিনের মাথায়। দেয়ামাত্রই চিড়কিন ত হয়ে গেল অপরূপ সুন্দরী! কুনো সুন্দরী যুব্‌ড়া মরেই চিড়কিন হয়েছিল, শুনছিস মুনকু?

হুঁ।

সেই চিড়কিন্‌ এখনও গকুলার বহু হয়ে নাকবিন্ধায় আছে। গেলেই দেখতে পাবি।

শোনামাত্রই মুনকু ভয়ে ভয়ে তার দিদির গায়ে হাত বুলিয়ে দেখছে, খুব ঠাণ্ডা? রোঁয়া রোঁয়া কী? তার দিদিই ত, না আর কেউ?



নতুন শাড়ি-পরা কুন্তলাবউদিদিকে গরু চুমাতে দেখে সন্তোষের আজ কী যে হয়ে গেল, সাবিত্রী ভেবে কুন্তলাকেই জড়িয়ে ধরল?

জড়িয়ে ধরল ধরল, তাও গোহালঘরে, অবলা গরুগুলোর সামনে, গোময় গোমুতের মাঝখানে?

হুঁ, হুঁ, কুন্তলাকে বেশটি করে জড়িয়ে ধরা-ই তার উচিত শাস্তি। যখন তখন তার গালে যে অমনধারা ঠোনা মারছিল, গালে কপালে লেপ্টে দিচ্ছিল ধ্যাবড়া তেল-সিঁদুর? তারবেলা? আমার বুঝি গিরগিতি লাগে না? শিরশির করে না শরীর?

গোহালঘরে গুঁড়ির প্রদীপ তখনও নেভেনি, তার উপর জ্বলছিল ঘিয়ের প্রদীপ, ভেলাপাতার দঁড়ে ধূপধুনার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। তার মধ্যেই মাকড়ার মতো কুন্তলাকে জড়িয়ে ধরেছিল সন্তোষ। আহা কেউ যদি দেখে ফেলত?

হ্যাঁ, তা বচ্ছরকার পরব, কত লোকই তো এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে, ওদিক থেকে এদিকে আসছে। এ-পিঁড়া থেকে গেল ও-পিঁড়া। ও খলা-খামার থেকে ঝপ্ করে দৌড়ে এল এ খলা-খামারে। যাতায়াতের রাস্তায় কেউ যদি দেখে ফেলত? দেখে ফেলতে আর কতক্ষণ?

কিন্তু সন্তোষকুম্‌হারের বাড়িতে লোকজন আর কোথায়! থাকার মধ্যে সে ছুড়া তো ঐ একজন—বাপ ভৈরবকুম্‌হার। তাও সে বাড়ি থাকে আর কতক্ষণ। থাকলেও পোস্তখোলের নেশায় তো বুঁদ হয়ে ঢুলতে থাকে। সুস্থ থাকলে এর-তার বাড়ি টুঁ মেরে বেড়ায়, বন্ধু-বান্ধব সমবয়সীদের সঙ্গে বসে থাকে, গ্রামের হরিমন্দিরে।

সাঁঝ-উঁঝ সন্তোষই কী আর বাড়িতে থাকে, সেও তো ঘুরে বেড়ায় এর বাড়ি তার বাড়ি। উদমা, দড়ি-ছাড়া গরুর মতো। কিন্তু বাপ বাইরে গেলেও গলা-খাঁকার দিয়ে হুটমুট এসে পড়ে।

তখন যদি এসে পড়ত?

আজ বাপ ভৈরবকুম্‌হার গিয়েছিল সাঁওতালপাড়ার ওদিকটায়, ধান্দায়। মহুয়ার মদের খোঁজে। বোতল কতক যদি পাওয়া যায়, এক-আধ বোতল গলায় ঢেলে বাকিটা নিয়ে আসত 'ঢ্যাঙুআন'দের জন্য। গণ্ডাকতক ছাঁকা-পিঠা আর দু-দশ বোতল মহুলের মদ তো দিতেই হবে ঢ্যাঙুআনদের।

ধান্দায় বেরিয়ে ভৈরবকুম্‌হার তখনও ফেরেনি, রাত একটু হয়েছিল বই কি, তাবলে কেউ তো আর ঘুমিয়ে পড়েনি। পরবের জাগর-উজাগর রাত, ঘোর অমাবস্যার রাত। অত সকাল সকাল ঘুমোবেই বা কেন? বুদ্ধি করে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়েছিল কুন্তলাই। নাকি জাপ্টাজাপ্টিতে নিভেই গিয়েছিল প্রদীপটা?

আলো তো নিভে গেল। আদড়া খরিসের মতো কুন্তলাকে সপাটে জড়িয়ে আছে সন্তোষ। ঐ জড়িয়েই ধরেছিল। তারপর কী ভেবে ঝটিতে হাত আলগা করে দিল সে।

গোহালঘর থেকে কে আগে বেরিয়ে এল—সে না কুন্তলা—সন্তোষ এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। একবার মনে হল—হাতের বাঁধন আলগা করে সেই বোধহয় প্রথম হড়বড়িয়ে গোহালঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বাইরে এসেই তার মনে হয়েছিল—কুন্তলাবউদিদি বুঝি তখনও দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে, হাতের চুড়ি-শাঁখাও বাজাচ্ছে না। আরেকবার মনে হল—হাতের বাঁধন ঢিলা করতেই কুন্তলাবউদিদি নিজেই ঘাড় নীচু করে গোহালঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল সে-ই।

যে-ই দাঁড়িয়ে থাকুক আর যেই বেরিয়ে আসুক, যে দাঁড়িয়েছিল সে-ই ভেবেছিল—অন্যজন ফিরে আসবে, আসবেই। কিন্তু সন্তোষকুম্‌হারের মনে পড়ল—সে নিজে তো আর ফিরে যায়নি, কুন্তলাবউদিদিও আসেনি।

হঠাৎ, দৈবাৎ কী হয়েছিল তার? সন্তোষের মনে হয়েছিল—কুন্তলা নয়, গরু চুমাচ্ছে সাবিত্রী। নতুন শাড়ি-সায়া-ব্লাউজে শরীর ঢাকলে সাবিত্রীকে তো কুন্তলার মতোই দেখাবে। লোধাদের তুলনায় সাবিত্রী খুব ফর্সা, তবে কুন্তলাবউদিদি আরো ফর্সা।

যতই যাই ঘটুক, রাতটা যেমন তেমন, কাল সকাল হলেই তো কুন্তলাবউদিদির সঙ্গে আবার দেখা হবে। দেখা হলে সে কী করবে? কী-ই বলবে? ঘাড় নীচু করে চুপচাপ থাকবে, নাকি বলবে—এই দ্যাখো বউদিদি, বিশ্বাস কর-অ বউদিদি, আমি ভেবেছিলাম সাবিত্রী। সাবিত্রী, সাবিত্রী। আমার ধ্যান-জ্ঞান যে এখন সাবিত্রী বললে কী বিশ্বাস করবে বউদিদি?

বিশ্বাস করুক ছাই না-করুক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বউদিদি বলুক দেখি—সে যখন-তখন গালে-কপালে সিঁদুর ঘষছিল, ঠোনা মারছিল, চোখে চোখে তাকাচ্ছিল, হাসছিল, গায়ের কাপড় ঢিলা করে দিচ্ছিল—সে কী এম্নি এম্নি?

হয়ত সে বলবে, দেওর ত, দেওরের সঙ্গে বউদিদিরা ওর'ম ঠাট্টা-ঠিসারা ত করেই থাকে। তুমি কর নাই? কত-অ করেছ, মনেতে ভেবে দেখ!

আর কী-ই ভাববে, ভেবে ভেবে থল-কুল পাচ্ছে না সন্তোষ। কী থেকে কী যে হয়ে গেল

ঘরের ভিতর গুম হয়ে কিছুক্ষণ সে বসেছিল, একবার মাঝু-ঘরে একবার রাঁধাশালে। অস্থির, অস্থির।

এখনও মুঢ়াকাঠ অর্থাৎ গাছের গোড়া জ্বেলে দিতে হবে আঙনায়। ঘিয়ের প্রদীপ ফের জ্বালাতে হবে গোহালে, জাপ্টাজাপ্টিতে যা নিভে গিয়েছে, একটু আগে। এতদিন কুন্তলাবউদিদিই এ-ঘর ও-ঘর ছোটাছুটি করে এতসব জোগাড়যন্ত্র করে দিত। আর কী সে করবে, না করতে তার মন যাবে? রিপুর তাড়নায় কী যে করে বসল সন্তোষ!

ওদিকে এখনই ডাকতে আসবে ভগা, আসবে অমিয়, সোলপারের নাদু, ভূমিজপাড়ার প্রফুল্ল, মুনিয়া বারিকের বেটা—'ঢ্যাঙুআনের' দল।

গরু-জাগাতে সবাই জড়ো হবে ওস্তাদের ওস্তাদ মোহনকামারের ঘরে, সেখান থেকেই বের হবে গরু-জাগানীয়া ঢ্যাঙুআনের দল। ধিং তাং ধাতিং তাং, মাদল বাজাতে বাজাতে।

উঠল সন্তোষ, জঙ্গল থেকে শাল-মূঢ়া আসন-মূঢ়া আগেই জোগাড় করে রেখেছিল সে খলায়। তাই সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল সন্তোষ। এ-আগুন এখন সারারাত ধিকি ধিকি করে জ্বলবে।

রাত যত গভীর হবে, হিম-কাঁকর পড়বে, একটু-বা শীত শীত, হাতের চেটো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসবে, ট্যাঙুআনরা এ-আগুনে হাত-পা সেঁকে নেবে, চুটা ধরাবে, 'গিরিহা'র দেওয়া বিড়ি-সিগারেট ধরাবে।

বিড়ির বাণ্ডিল দশকাঠা, মজুত রেখেছে সন্তোষও। সে তো আর ছোটগিরিহা নয়, রীতিমত বড়-গিরিহা। এক-দুকাঠা বিড়িতে কী আর ছাড়বে তাকে ঢ্যাঙুআনরা, চাই তো চাই কম করেও কাঠা দশ।

ঢ্যাঙুআনরা এখনও আসেনি, কিন্তু সন্তোষকে অবাক-আশ্চর্য করে দিয়ে এল কুন্তলা। খলায় সন্তোষ যেখানে আগুন জ্বালাচ্ছিল, তারপাশ দিয়ে জল-ধোয়া-পায়ে জল-ছাপ ফেলে হেঁটে গেল ছপ্ ছপ্ করে। সন্তোষ স্পষ্ট দেখল—পায়ে আলতা পরেছে কুন্তলাবউদিদি।

সোজা ঢুকে গেল মাঝু-ঘরে। ঘরের ভিতর হেরিকেন তো জ্বলছিলই। বাইরে দাঁড়িয়ে সন্তোষ বুঝতে পারছে, কুলুঙ্গি থেকে ঘিয়ের বোতল নিল কুন্তলাবউদিদি, ফের ঘি ঢালল প্রদীপে। কুন্তলা সবকিছুই করছে খুব ধীরে সুস্থে।

খলায় দাঁড়িয়ে সন্তোষ ভাবল—এসময় হুটমুট ঢুকে যাবে কী সে ঘরের ভিতর? বলা নেই কওয়া নেই ফের জড়িয়ে ধরবে কী কুন্তলাকে? এবার ধরলে আর কী ছাড়া পাবে কুন্তলা?

রট্ রট্ করে শিরদাঁড়ায় আওয়াজ উঠল, কী যেন ভেঙে গেল, কী যেন! না, তার সাহস হল না। সে খলায় দাঁড়িয়ে মুঢ়াকাঠের আগুনেই খোঁচা মারতে লাগল। চাট্টি আঙরার ফুড়গুনি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

প্রদীপে ঘি ঢেলে কুন্তলা গেল গোহালঘরে। ঝুঁকে বসে পরিপাটি হয়ে প্রদীপ জ্বালাল। প্রদীপের পাশে রেখে দিল একটা কাঠিখুঁচি। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলবে সারারাত। সারারাত, সারারাত। ঢ্যাঙুয়ানের দলে যাবে সন্তোষ, পোস্তঢুলি কী মহুলের মদ খেয়ে খুড়শ্বশুর ভৈরব তো বসে বসেই ঢুলবে। প্রদীপ উস্‌কে দিতে ঘড়িক-ঘড়ি সেই তো আসতে হবে কুন্তলাকে!

গোহালঘরে ফের ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে, একটাও কথা না বলে, সন্তোষের পাশ দিয়েই ফের নিজেদের ঘরে হেঁটে গেল কুন্তলা।

কুন্তলা গেল আর সন্তোষ আরোই মুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তার যেন আর হাড়গোড় নেই, সে-আর উঠতে পারে না, উঠে দাঁড়াতে পারে না।

ভগা এসে হাত ধরে টেনে তুলল সন্তোষকে। উঠ্ সন্তুষ, উঠ্! ফিসফিস করে বলল, বাপ-বেটায় ক বোতল টেনেছিস?

সন্তোষ মাতালের মতো উত্তর দিল, ন্নাই ন, হঁ।

সে না-ও বলল, আবার হাঁ-ও।

বাপ ভৈরবকুমার এসে পড়েছিল ঘরে, ছেলেকে ঢ্যাঙুআনের দলে যেতে দেখে বলল, টাঁড়-টিকরে কাঁকর পড়বে বেটা, মাফ্‌লারটা মাথায় বাঁধ।

সন্তোষ বাপের কথামতোই মাফ্‌লারটা মাথায় বাঁধল। তারপর ভগার সঙ্গে চলে গেল ঢ্যাঙুআনে গরু জাগাতে।

আপাতত তারা যাবে মোহনকামারের বাড়ি, সেখানে জড়ো হবে সবাই। নুয়াসাহির ভূমিজপাড়া থেকে আসবে প্রফুল্ল, মুনিয়ার বেটা ভদ্রেশ্বর, ভুঁইয়াপাড়া থেকে আসবে নাথু, পূর্ণ। বাগালদের শম্ভু, কুম্‌হারপাড়া থেকে তো আসবে ঘর ঘর। আসর ধুলামাদুল জমে যাবে না?

এত দেরি করলি যে সন্তোষ? বলল মোহনকামার।

আর সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, তারপর জায়গামত বসে পড়ে সন্তোষ বলল, একলা মানুষ, ঘরের কাজকাম গুছাতেই রাত হৈল।

তো দোখলা হতে আর কত দেরি, সন্তুষ? সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

সন্তোষ ভাবল—এখানেও সাবিত্রীকথা? সাবিত্রী, সাবিত্রী। আচ্ছা, সাবিত্রীকেও তো বাপের অজান্তে লুকিয়ে সায়া-সেমিজ-শাড়ি কিনে দিয়েছে সে। তাই পরে হাঁটলে-হঁটলে তো খড়খড়ে মড়মড়ে আওয়াজ উঠবে। উঠবে না? অবিকল কুন্তলার মতো? কুন্তলা, কুন্তলা।

আজ কী যে হচ্ছে সন্তোষের। একবার সাবিত্রী তো একবার কুন্তলা। শিকার হাতে-নাতে ধরেও খেতে না পারার আক্রোশে মনে মনে যেন বাঘের মতো গজ্‌রাচ্ছে সে।

মোহন রাণা দুহাত উপরের দিকে তুলে এবার 'ঢ্যাঙুআনযাত্রা' শুরু করল। ধামসা-মাদল কাঁধে গোটা দলটাই চলতে লাগল। বাগালঘরের শম্ভুর মাথায় একটা ঝুড়ি, ভিতরে পাতা লাল ডুরে গামছা একটা।

ঘর ঘর 'মাগনে' পিঠাপুলি যা উঠবে—সব ঐ ঝুড়ির ভিতর রাখা হবে।

মদ-হাঁড়িয়াব বোতল তো যেখানকার জিনিস সেখানেই ফাঁকা।

দলটা প্রথমে উঠল গিয়ে মাস্টারবাবুর বাড়ি। এবছরের 'গোঠপূজা'য় ডিম ভেঙেছিল যে 'শিবগরু'টা, তা ঐ মাস্টারবাবুর হালের বাঁয়াটা। প্রথমে তার বাড়ি যাওয়াই নিয়ম, সেখান থেকেই ঢ্যাঙুআনের দল মুখপাত করবে গরু-জাগানোর। রীতিমত অবস্থাপন্ন গৃহস্থ।

গোহাল ভরতি গরুগুলোর সামনে কখনো হাত নেড়ে, কখনো বা গামছা নেড়ে গরু জাগাতে শুরু করল মোহন,

জাগো মা লক্ষ্মীনি জাগো মা ভগবতী
জাগো ত আমাবইসা রাতি—

গরুগুলোও তেমন, গানের সুরে সুরে শিং নাড়ছে, কান ঝাপটাচ্ছে, মাথা নাড়ছে, যেই মাথা নাড়ছে অমনি কাঁচা-পাকা ধানের মৌড়ও সর্‌সর্ ঝর্ ঝর্ করে নড়ে উঠছে।

মাষ্টারবাবুর বাপ ঢ্যাঙুআনদের দলে ভিড়ে একটু-আধটু মদ-হাঁড়িয়া খাওয়ার ফন্দিফিকির করছে। কিন্তু মাষ্টার-ছেলের কড়া নির্দেশ—পরব হোক আর যাই হোক ওসব ছাইপাঁশ গেলা একদম চলবে না।

সে বলেছে বলেছে, আমি তো আর মাষ্টারের ছাত্র নই, তোরা আমাকে দে একটুন, দু ঢোঁক—এই পরফুল্ল, এই মহন!

মদ-হাঁড়িয়া খাওয়ার জন্য মাষ্টারের বাপের অমনধারা বাই দেখে ছটপটানি দেখে ঢ্যাঙুআনের দলের কমবয়সী কিশোররা খুব মজা পাচ্ছে, এমন মজা না থাকলেও অমাবস্যার রাত জাগর-উজাগরের রাত জমবে কী করে?

তাদের কেউ কেউ খামারে জ্বেলে রাখা মুঢ়াকাঠের আগুনের কাছে বসে হাত-পা সেঁকে নিচ্ছে, বিড়ি ধরাচ্ছে। আর কেউ ঢুকে যাচ্ছে সোজা ঘরের ভিতর সমবয়সীদের ঘুম থেকে তুলে আনতে।

মানা নেই, মানা নেই। আজ ঘরের ভিতর ঢুকে যেতে তো মানা নেই।

মাষ্টারবাবু, মাষ্টারবিবি—দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছে ঢ্যাঙুআনদের মাঝখানে। তাদের নিয়ে ঢ্যাঙুআনরা মজা করছে, আর তারাও হাসছে। এই যদি মোহন গোহালের গরুগুলোকে সম্বোধন করে গাইল—

কনে হি আছে ভালা গরু তোর বাপ গো
কনে হি আছে তোর ভাই।
আর, কনে হি আছে ভালা বাঁধনারি পরব গো
পরব করে আনাগোনা।।

তো প্রফুল্ল গানের লাইন ঘুরিয়ে দিল মাষ্টারবাবুর বউয়ের দিকে—

কনে হি দেয় ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গো
কনে হি দেয় ধেনু গাই।

গান শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মাষ্টারবাবুর বউ খুব হাসছে। তার হাসি দেখেই ঢ্যাঙুআনরা হিসাব করছে, ঢ্যাঙুআন-বিদায়ে মাষ্টারবাবুর কাছ থেকে কত কী আদায় করা যায়। গোঠ-পূজায় ডিম ভেঙে দিয়ে মাষ্টারবাবুর গরু 'শির-গরু' উপাধি পেয়েছে, একটু বেশি মালকড়ি তো ছাড়তেই হবে মাষ্টারকে।

ছাড়লও সে। ঢ্যাঙুআনরা খুশি হয়ে গলায় মদ ঢেলে ছাঁকা-পিঠা কামড়াতে কামড়াতে চলে গেল আরেক ঘরে। আরেক ঘর থেকে আরেক ঘরে।

গোল বাধল সুরুয়ার ঘরে এসে। সে বড়জোর দিতে পারবে একবোতল মদ আর গণ্ডাকতক পিঠা। কিন্তু ঢ্যাঙুআনরাও নাছোড়—কমসে কম দু বোতল মদ আর আটগণ্ডা পিঠা না হলে সুরুয়ার গরু তারা জাগাবে না। হরগিজ্ না।

মল্লা, বচ্ছরকার দিন মা ভগবতীদের জাগানোর রাত, আর তর্হা হামার গরুকে না জাগিয়েই চলে যাবি? যা ত দেখি! কতদূর আস্পদ্ধা!

সুরুয়াও নাচ-দুয়ার আগলে থাকল। মাদলের ডাঁয়াবাঁয়া থেকে হাত গুটিয়ে রেখেছে ঢ্যাঙুআনের দল। নারাজ হয়ে খলায়-খামারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে তারা।

অবশেষে সুরুয়ার বউয়ের মধ্যস্থতায় মিটে গেল গণ্ডগোল। আবার মাদল বাজল, কুলকুলি উঠল, গানের মোচ্ছব শুরু হয়ে গেল সুরুয়ার গোহালঘরে। এদিকে "অহীরে" তো ওদিকে "অহীরে"। মাঝখানে পড়ে গরুগুলো ভড়কে গেল, দড়িতে বাঁধা না থাকলে কী যে হত বলা না যায়!

হল্লা হচ্ছে ঢ্যাঙুআনদের মধ্যেও, এরকম মাঝে মাঝেই হয়। থেকে থেকে ঢ্যাঙুআনরা নিজেদের গুনতি করে দেখে—কে আছে আর কে কোথায় গেল? দুয়েকজন এদিক-ওদিক দলছুট হয়ে হারিয়েও তো যায়।

যায়, যায়। অন্ধকারের ভিতর থেকে কোথাও হয়ত চুড়ি বাজল। চুড়ির শব্দ যে-শোনার সেই ঠিক শুনল। তারপর সুযোগবুঝে কখন যে দলছুট হয়ে হারিয়ে গেল। গেল গেল, প্রথম কিছুক্ষণ কিছুতেই ধরা গেল না তাকে, ধরা যখন পড়ল তখন কেউ কেউ বলল, তাহলে অমুকদের ওখান থেকেই কেটেছে। প্রতিবাদ করল আরেকজন, না তারপরেও তাকে দেখেছি, দেখেছি সে অমুকদের ঘরেও ছিল। আরেকজনও, তাকে সায় দিয়ে বলল, হঁ, ই বাববা, গীতও ত সে গাইছিল। এর মধ্যেই উধাও হয়ে গেল কোথায়?

খোঁজ, খোঁজ!

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ঢ্যাঙুআনের দল আবার চলতে লাগল যে যার মতো, হয়ত ভুলেই গেল তাকে। এই রকম তো হয়, প্রত্যেক বছরই হয়।

যে দল ছেড়েছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে, আচমকা সে আবার এসে জুটল হয়ত অমুকের ঘরে। তখন তাকে নিয়েই পড়ল ঢ্যাঙুআনের দল। তখন তাকে নিয়েই চলল ঠাট্টা-ঠিসারা।

একটার পর একটা প্রশ্নবাণে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে না ঢ্যাঙুআনের দল? অতক্ষণ সে কোথায় ছিল? ঘরে ছিল? না মাঠে? ঘরেই থাক আর মাঠেই থাক, তার পরনের কাপড় কী অশুচি হয়েছে? হয় যদি তো সে বাদ, ইয়ার্কি মেরে কেউ হয়ত দল থেকে বেরিয়েও যেতে বলল তাকে।

এতক্ষণে সে মুখ খুলল, বলল, আচানক পেটটা দুখাঁই উঠল ব, তাই গেছিলিম একটুন জলের দিকে। আসলে ছাঁকা-পিঠার গুঁড়ি কাঁচাই ছিল, ঠিকঠাক সিদ্ধই হয়নি। কী বুঝলে?

তাই বটে কি না? যা বুঝার বুঝে নিয়েছে সে, আর বলতে হবে না।

সন্তোষদের ঘরে ঢ্যাঙুআনরা ঢুকলে সন্তোষ থাকল সবার পশ্চাতে। পশ্চাতে থাকলেও কী হবে—ধেনুয়ানরা ইচ্ছে করেই বারে বারে ডেকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলছিল তাকে। "কাই গেলি রে সন্তুষ। ইদিকে আয়, শুন্ না। দ্যাক্ তোর বাপ ক গণ্ডা পিঠা আর ক'বোতল ভাকু দিচ্ছে।

আরে, সবুদিন ত মাগে ভালা ভাট-ভিখারী যে বাবু হো
আজি তরে মাগে ঢ্যাঙুআন—

কুল্‌কুলির উপর কুল্‌কুলি, ভৈরবকুম্‌হারকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল ঢ্যাঙুআনরা। কেউ কেউ বলল, আর দুদিন বাদে বেটার বেহা দিচ্ছ, দু-চার বোতলে কি হবে? কম-সে কম দশ বোতল ত দও।

কে একজন চ্যাঙফট্‌কা এসময় বলে উঠল, লদ্ধামেয়্যার সঙে বেহা দিচ্ছ, আর জরিমানাও দিবে না? জরিমানা—

"কে বলল কথাটা, কে বলল" বলতে বলতে ঢ্যাঙুআনের দলের লোকেরাই তেড়ে গেল তাকে, লদ্ধামেয়্যা কী মানুষের বার? তার কী আর আর মেয়্যামানুষের মতন হঁয়ে, ধুত্ কী বলতে কী বলে ফেলছিল, সংশোধন করে নিয়ে বলল, দুটা হাত দুটা পা নাই?

আছে, আছে।

গাঁজা এনে রেখেছিল ভৈরবকুম্‌হার, সস্নেহে গাঁজা-কল্‌কে এগিয়ে দেওয়ায় ঢ্যাঙুআনরা তো মহাখুশি। তারা কী যে করবে এবার ভৈরবকে নিয়ে, বোধহয় কোলে তুলে নাচবে।

ভৈরবকুম্‌হারের সঙ্গে তাদের তো জমে গেল ভারি!

ঝপ্ করে কোত্থেকে কুন্তলাবউদিদি এসে এসময় গোহালঘরের প্রদীপটা উস্‌কে দিয়ে গেল। কোত্থেকে সে এল, সে কী এখনও ঘুমায়নি? তার দেওয়া শাড়িটাই এখনও জড়িয়ে আছে কুন্তলা!

সন্তোষ ভাবল—তবে কী অনুতাপে মনস্তাপে ঘুমোতে পারছে না কুন্তলা? উঁহু, সে তো কিছু করেনি। অপরাধ যেটুকু করেছে—সে তো সে নিজে! সন্তোষ, সন্তোষ।

আচ্ছা, কুন্তলাবউদিদি কী দাদাকে সব কিছু বলে দেবে? বললেও কি বলবে? বলবে কী যে, তোমার ভাই সন্তোষ গোহালঘরে আমাকে—। আমাকে কী? না জাপটে ধরেছিল' এই।

ধুস্ তাও কী কখনও বলতে পারে? বিশেষ করে কুন্তলা যেরকম মেয়েমানুষ। বললেও দাদা কী বিশ্বাস করবে? উল্টে দাদাই তাকে টিপিয়ে দেবে না? বলবে, একলা সন্তোষই তোমাকে জাপটে ধরল? আর তুমি একটা কিছু কর নাই? তুমি তো তার আশপাশেই নতুন শাড়ি পরে ছলরবলর হেঁটে বেড়াচ্ছিলে?

বঠে কী না? ঘিয়ে আগুন দিলে ঘি ত জ্বলবেই। বঠে কী না?

সন্তোষকুম্‌হার, নিতাইকুম্‌হারদের ঘর থেকে ধেনুয়ানরা যেই বেরুল, অমনি এক দৌড়ে রাস্তার ধারে নাচ-দুয়ারে গিয়ে একটা মুড়োঝাঁটা একটা ভাঙাকুলো পড়াশ-ঝাঁটির বেড়ায় টাঙিয়ে রেখে এল কুন্তলা। রাখতে হয়। গরু-জাগানো শেষে ফিরতি-পথে ধেনুয়ানরাই তো ঐ নিয়ে আগুন জ্বালাবে। ছাড়ান-নিম্‌ছা করবে।

ঢ্যাঙুআনদের গমনপথের দিকে খানিক নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল কুন্তলা, হাতের চুড়ি বাজাল—একটা মুখ যদি একবার ঘাড় ঘুরিয়েও দেখে।

দেখল না। ঢ্যাঙুআনের দল অদৃশ্য হয়ে গেলে কুন্তলাই পিঠের উপর ঘাড়-মাথা হেলিয়ে তারা-ভরা আকাশ দেখল। তারা গুনে গুনে চিনতে চেষ্টা করল—কোন্‌টা দধিভারিয়া, কোনটা সাতভায়া, কোন্‌টা-বা কালপুরুষ, পোহাতারা উঠতে তো এখনও ঢের দেরি!

হ্যাল্ হ্যাল্ করে একটা কুকুর পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতেই চমকে উঠে কী ভেবে ঘরের ভিতর ঢুকে এল কুন্তলা। দেওর সন্তোষ তাকে শুধু জড়িয়ে ধরেছিল, আর তো কিছু করেনি। তবু বাবু তো ঘাড় হেঁট করেই আছে।

ধেনুয়ানদের সঙ্গে যখন ঘাড় হেঁট করে ঘুরছিল, কুন্তলার মনে হচ্ছিল—মনে হচ্ছে, দৌড়ে গিয়ে বাবুর থুতনি ধরে ঘাড়টা উঁচা করে দিই! হেঁ দিই—

অহীরে কপিলাকা পুতা ভালা
শিশুবালক গো—

মাঝে মাঝে এ-পাড়ার ঢ্যাঙুআনদের সঙ্গে ও-পাড়ার, বিশেষত মাহাতোপাড়ার ঢ্যাঙুআনদের জোর কম্‌পিটিশান্ চলছে। কে কত জোরে কুলকুলি মারল, কতবার কুলকুলি মারল, একসঙ্গে কার দলে কতগুলো মাদল বাজছে, গানই বা গাইল কোন্ দল কতগুলো, তার মধ্যে অহীরা গান-ই গাইল কতরকম—এই নিয়ে জোর কম্‌পিটিশান।

কম্‌পিটিশান, কম্‌পিটিশান।

কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে যুবতী মেয়েরা, চোখ রগড়াতে রগড়াতে আড়চোখে দেখছে—ঢ্যাঙুআনের দলে সে আছে কী না। সে ত সে-ই। দেখি ত দেখি—মাতাল হলে তাকে দেখতে লাগে কেমন, তার অঙ্গভঙ্গি হাবভাব?

হাঁটতে গিয়ে ঘন ঘন টলে পড়ছে দেখে সে তো বাপ-কাকাদের মা-কাকীদের সামনেই মুখের আঁচল সরিয়ে হো হো করে হেসে মরে। হাসির গমকে গা থেকে কখন শাড়ি সরে গেছে—খেয়াল নেই।

মাতাল কী আর, মাতালের ভঙ্গি করছিল যুবকটি। সুযোগ বুঝে আড়চোখে একবার কেন, বার বার দেখে নিচ্ছে মনের 'ইয়ে'কে। ভুসা-পড়া হেরিকেনের আলোয়, গোহালঘরের ছামুতে রাখা ঘিয়ের প্রদীপের শিখায় তার দেহের রং তো মনে হচ্ছে কাঁচা সোনা।

কাঁচা সোনা, কাঁচা সোনা।

এই একটা হাই তুলল, হাই তোলার ভঙ্গিটাও যেন সোনার। সোনার ঝিলিক উঠল, তবে কী নাকে সোনার নাক-ফুল পরে আছে সে?

ঢ্যাঙুআনের দল ঢুকল এবার গুরাসাঁওতালের ঘরে। গুরাবুড়ো ঘুমোয়নি, জেগেই বসেছিল। 'জাগোয়া'র রাত ঘুমোবে কী!

তার গোহালঘরেও মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। ঢ্যাঙুআনরা ঢোকামাত্রই গোহালের গরুগুলো আর খোঁয়াড়ের ঘুসুরগুলো হড়বড় করে উঠল, ঘোঁত্ ঘোঁত্ করতে লাগল।

গুরার বউ লুসকী 'সহরায় পরবে'র 'চুরচ-চাউলে' আর হাঁড়িয়া গিলে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। তার মেয়ে খেক্‌রেমাই কিন্তু জেগে। দৌড়ে এসে গোহালের বাতিটা উস্‌কে দিল।

ঢ্যাঙুআনরা বলল, খেক্‌রেমাঈ, ঢ্যাঙুআন এস্‌চে, ঘুসুর কাট।

খেজুরপাতার চাটাই পেতে দিতে দিতে খেকরেমাই বলল, হঁ কাটব।

হাঁড়িয়া আন।

হঁ আনব, বলেও দাঁড়িয়ে থাকল, একমুখ হেসে বলল, আগে বস্ ন, গরু ত জাগা।

ধিং তাং ধিতাং তাং, নেচে-কুঁদে গরু জাগাতে শুরু করল ঢ্যাঙুআনরা। ধৈর্য ধরে এতক্ষণ না-ঘুমিয়ে বসেছিল গুরাবুড়ো, কখন ঢ্যাঙুআনরা আসবে আবার টুকচার খাওয়া হবে, এখন অধৈর্য হয়ে ঢ্যাঙুআনদেরই দলে ভিড়ে খেজুরপাতার চাটাইয়ে বসে মাটিতে থাপ্পড় মারতে মারতে বলতে লাগল, আন বিটি চাঁড় চাঁড় আন।

এসময় সন্তোষ গেল কোথায়? খোঁজ খোঁজ! ঢ্যাঙুআনদের কেউ একজন ইয়ার্কি মেরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, অ রে সন্তুষ রে!

চেঁচাও না ত, আমি জানি ও-মাকড়া গেছে ঢোলগোবিন্দের বাগানে আলতি-ঝিঙা-বাইগন তুলে আনতে।

একজন আরেকজনের কানে ফিসফিস করে বলল, ঝিঙা-বাইগন বাজে কথা, আমি জানি সে গেছে এক মাগের কাছে। চারধার দেখে শুনে সে ফের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আরো আস্তে আস্তে করে বলল, কুন্তলা কুন্তলা, সে গেছে কুন্তলার কাছে।

জোরে বলল না, তার কারণ কুন্তলার বর নিতাই তো ঢ্যাঙুআনদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

ধুর, কেউ একজন আরো জোর দিয়ে বলল, ও কী আর এ-পাড়ায় আছে? দ্যাখ্ গে যা, সে এতক্ষণে লোধাপাড়ায় গুড়খার ঘুপচীতে সাবিত্রীর বাহুবন্ধনে।

বাহুবন্ধন, বাহুবন্ধন।

বক্তার কথার বাঁধুনিতে আর সবাই হো হো করে হেসে উঠল, হেসে ওঠারই কথা। ঢ্যাঙুআনদের ধাঙড়ামি ধ্যাষ্টামির ভিতর এত সুন্দর কথা তো ক্বচিৎ কদাচিৎ শোনা যায়।

শুনল, কিছুক্ষণ মনে রাখল, তারপর ভুলে গেল। সন্তোষ-প্রসঙ্গ ধামা চাপা পড়ে থাকল।

গরু-জাগানো হচ্ছিল পিথো মুর্মুদের ঘরে। হাঁড়িয়া খাওয়ার অত জামবাটি-গামবাটি আর কোথায়, ধেঙুয়ানরা শালপাতার 'দোনা' ধরে বসে আছে, পরিবেশক দোনায় দোনায় ঢেলে দিচ্ছে হাঁড়িয়া, ঢ্যাঙুআনরা চোঁ-চোঁ করে কতক খাচ্ছে, আর কতক মুখের কষ বেয়ে পড়ে যাচ্ছে ভুঁয়ে।

পিথোর মা সুঁদরীবুড়ি হাতে ধরে ঢ্যাঙুআনদের বলছে, খা ধন, ভাল করেঁ খা! ছড়াস্ নাই ফেলাস্ নাই!

ঢ্যাঙুআনরা খাবে কী, জঙ্গল ভেদ করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে এক কালোকুলো মানুষ তো হাঁপাতে হাঁপাতে বলে গেল, সন্তোষকুম্হারকে লদ্ধারা চিহড় লস্তে বেন্ধে রেখেছে, তর্হা ছাড়া যা!

বলেই দৌড়ুতে দৌড়ুতে ফের জঙ্গলে ঢুকে গেল সে।

কে? কে বলে গেল? উঁহু প্রশ্ন তা নয়, এখন প্রশ্ন হল কী কী বলে গেল আর তার জন্য কী কী করতে হবে?

খবরটা শোনামাত্র থেমে গিয়েছিল সবকিছুই, ঢ্যাঙুআনরা এর-ওর মুখের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। গলার মাদল-ধামসা গলা থেকে খুলে নামিয়ে রেখেছিল এক পাশে। হাঁড়িয়া খাওয়াও বন্ধ।

ক্লান্তিতে, রাত্রির গভীরতায়, গানের পুনরাবৃত্তিতে কেউ কেউ এর মধ্যেই হাই তুলছিল, দু'চোখে ঘুমও জড়িয়ে আসছিল—কোথায় যে উড়ে গেল ঘুম!

এতদূর আস্পর্দ্ধা—কী না কুম্হারদের ছেলেকে আটকে রাখে!

খবর গেল ভৈরবকুম্হারের কাছে, আর আর মাতব্বরদের কাছে। এখন সমগ্র কুম্হারপাড়া একজোট হয় যদি তো ঐ ক'টা লোধা ফুৎকারে উড়ে যায়!

একবার লোধা কাটাকাটি হঞেছিল, না হয় আরেকবার হবে। লে বে, যার যেমন অস্তরপাতি আছে, সঙে লিয়ে তৈরি হঞে যা। কার কাছে কত টিপালাইট আছে আন আন, একসঙ্গে জড়ো কর, চল্ তাড়াতাড়ি, আর লেট করলে বিপদ হতে পারে।

রামজয় শব্দ করি ডাকিছে বানর।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর।।

ব্রহ্মাকুমার এরকম 'সাজ সাজ' রব শুনে বিড়বিড় করল। সে ভয়ই পেল। তার মনে হল, আবার লোধাদের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আহারে, যদি এসময় সে একছুটে দৌড়ে যেতে পারত লোধাপাড়ায়! সয়াকে সাবধান করে দিলেই হত!

বউ লবঙ্গ ছটফট করছিল, ঘর-বাহির করছিল। বিপদের কথা—কোত্থেকে কী হয় বলা ত যায় না! তার উপর তাদের সঙ্গে লোধাদের অত মাখামাখি কুম্হারপাড়ার আর আর লোকজন ত ভাল চোখে দেখেও না। এই উগ্রচণ্ড দলটার সামনে বাহির হয়ে এখন লোধাদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলাও ত মুস্কিল। কী বুঝতে কী বুঝবে!

কী হবে গো? ভাঙা খোঁপা, ঘুম-ভাঙা চোখ, আলু-থালু বেশে লবঙ্গ।

ব্রহ্মাকুমার দু'হাত তুলে বিড়বিড় করে, বিড়বিড় করে—

এরূপ তুমুল সমরে ব্যাকুল
কান্দে কপি জাম্বুবান।
ম'লরে ম'লরে গেলরে গেলরে
আর না রহিল প্রাণ।।

লবঙ্গ ব্রহ্মাকুমারকে দুহাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, কী বিড় বিড় করছ তখন থেকে—জাম্বুবান, জাম্বুবান! একটা কিছু কর-অ, সয়া-সয়ানিকে অন্তত খপর দাও।

কাটা বৃক্ষের মতো লবঙ্গের গায়ে পড়ে লবঙ্গকে জড়িয়ে ধরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মাকুম্হার আর্তনাদ করে উঠল হঁ, যাই।

'যাই' বলে ব্রহ্মা দু-পা এগিয়েও পিছিয়ে এল।

ন্না, এখন যাওয়া ঠিক হবে না, চারধারে টিপা-লাইটের ঝল্‌কানি—সে আলোয় কে কখন দেখে ফেলবে!

হতোদ্যম ব্রহ্মাকুম্‌হার ধপাস্ করে বসে পড়ল। তাঁর গা ঘেঁষে লবঙ্গও বসে থাকল।

একে অমাবস্যার রাত, জাগোয়া-রাত, জেগেই বসে বা শুয়েছিল প্রায় সবাই, যে ক'জন একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিল হৈ-রৈ শুনে তারাও তড়াক করে উঠে পড়ল। খেল্ তাহলে জমেছে! —গিড় গিড় দাগিন গেঁদা—

দু-সেল তিন-সেল এমন কী পাঁচ-সেল ব্যাটারীর টর্চও বের হল। আড়াআড়ি কাটাকাটি করে ফোকাস ফেলতে লাগল লোকজন।

জোর একটা কুলকুলি উঠল, এমন কুলকুলি কুম্‌হারপাড়ায় স্মরণকালে কেউ কখনও শুনেনি। কুম্‌হারপাড়া, আশপাশের ভুঁইয়া-ভূমিজ-কাম্‌হারপাড়া-মাহাতোপাড়াও চড় চড় করে নড়ে উঠল।

তার মানে ঢ্যাঙুআনদের দল, ষণ্ডাগণ্ডা কুম্‌হার ছোঁড়ারা, সন্তোষকুম্‌হারের বন্ধু-বান্ধবরা যে যার অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেরুল, আরও বেরুচ্ছে পিল পিল করে।

এ-মাঠ ও-মাঠ এ-টাঁড় সে-টাঁড় বাঁশঝাড় মহুলগাছের ডগ শালগাছের ডগ আঁটারিলাটা কুলবুদা কুড়চিবুদা টর্চের আলোয় মাঝে মাঝেই ঝলসে উঠছে।

পাখ-পাখালি ঘুমোচ্ছিল চোখ বুঝে, খোলা চোখের মণির উপর চামড়ার পলেস্তারা টেনে দিয়ে, সে-বোজাচোখ টর্চের আলোয় আর খুলতে পারছে না।

ঝিম মেরে বসেছিল, আলো যেই নিভেছে, বিকট আওয়াজ করে এদিক-সেদিক ভদ্‌কাতে লাগল।

শুধু কী একটা গাছের পাখি, অজস্র গাছের পাখ-পাখালি অসময়ে আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একসঙ্গে এদিক-সেদিক উড়তে লাগল। ডানা ঝাপটাতে লাগল।

টর্চের আলো শুধু কি, জঙ্গলে ঢুকে গোটা দলটাই ঝোপে-ঝাড়ে লাটায়-পাটায় হাতের অস্ত্র মেরে এ-ঝোপের ডাল সে-ঝোপের পাল্‌হা কাটতে লাগল।

কাটতে লাগল, আর কাটতে লাগল।

বেশি দূর যেতে হল না ঢ্যাঙুআনদের, মাঝুড়ুবকার ভিতর যেখানে সরুবালি আর চিকনবালির বাঁশতলা সেখানেই দেখা, সন্তোষের। নির্বিঘ্নে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে সে আসছিল, মনে মনে যেন-বা গীতও গাইছিল—

> জুঁহি, চামেলি, বেলি
> কী সোন্দর সাজ সাজওলি।
> আঁখিলোরে মোর সাজিয়া ভিঞ্জি গেল্
> সজনীরে বঁধুয়া বড়ি দাগা দেল্।।

সন্তোষকুম্‌হার যে আজ রাতে আসবেই আসবে—লোধাপাড়ার মাত্‌ব্বররা প্রায় নিশ্চিত ছিল। তাই গুড়খালোধার ঝুপড়ির আশপাশে তারা ঘাপটি মেরে বসেছিল। মাকড়া সন্তোষ যেই মাত্র লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে এসে গুরভার ভুগড়ার পিছনে দাঁড়াল, অম্নি তাকে জাপটে ধরে ফেলল লোধা-মাত্‌ব্বর আর জোয়ানরা।

আর ধরামাত্রই সন্তোষকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল চিহড়লতায়। নিরুপায় সন্তোষ বাঁধা-ছাঁদা অবস্থায় বড়জোর ছটফট করছিল, এই যা।

কিন্তু লোধারা যেই শুনল বিরাট কুলকুলি, হৈ-হট্টগোল, টিপা-লাইটের এদিক সেদিক ফোকাস, কেউ না কেউ খবর দিয়ে ফেলেছে কুম্‌হারদের, আর নিরীহ কুম্‌হাররাও খেপে গিয়েছে, খেপে গিয়ে বন-বাদাড় ভেদ করে অনেক দূর এসে পড়েছে, তখন সন্তোষের বাঁধন খুলে দিয়েই যে পারল যেদিকে দৌড়ুল। আর জঙ্গলের ভিতর লুকোবার অগম্য স্থান তো লোধাজনমানুষদের মুখস্থ। পালিয়ে গেল তারা।

বাঁধন খোলা অবস্থায় সন্তোষ হাত-পা ঝেড়ে নিল, চিহড়লতার সাদা সাদা 'চঁচ্' মুছে ফেলল গা থেকে। ভাবল—এসেছি যখন সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করেই যাই। লোধাজনমানুষরা তো আর ঘরে নাই।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবল—না, কুম্‌হারপাড়ার লোকজন এসে পড়বে। আর এসে পড়লেই বেধে যাবে অনর্থ। তারচেয়ে এগিয়েই যাই। যেতে যেতেই দেখা হয়ে যাবে আগুয়ান কুম্‌হারদের সঙ্গে।

দেখা হলে কী বলবে? বলবে কী তাদের যে, লোধাপাড়ার লোকেরা তাকে বেঁধে রেখেছিল বটে, তবে স্বেচ্ছায় ছেড়েও দিয়েছে। বললেও একথা কুম্‌হারপাড়ার লোকেরা কী অত সহজে বিশ্বাস করবে? লোধাপাড়াকে তারা কী আর অত সহজে ছেড়ে দেবে? লোধাপাড়ায় উপস্থিত হয়ে পুরুষদের না পেয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার করবে না? হয়ত সাবিত্রীর উপরও ঝাঁপিয়ে পড়বে। হয়ত লোধা ঝুপড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেবে। শুধু শুধু পুড়ে মরবে নিরীহ গোবেচারী লোধারা?

তাই সে মনস্থ করল, বলবে, যা হোক একটা কিছু বানিয়ে বলে দেবে সে, তবু মরে গেলেও সে বলবে না—লোধাপাড়ার মাতব্বররা তাকে সত্যি সত্যি বেঁধে রেখেছিল চিহড়লতায়।

আরো ভাল করে হাত-পায়ের কোমরের লতার বাকলের টুকরো-টাকরা সাদা সাদা দাগ মুছে ফেলল। তারপরই তো দু'হাত দোলাতে দোলাতে—

সরুবালি চিকনবালির বাঁশতলাতেই দেখা। তাকে প্রায় ঘিরে ধরল কুম্‌হারপাড়ার লোকজন আর ঢ্যাঙুআনরা।

সন্তোষের জেঠতুতো দাদা কুন্তলার স্বামী নিতাই তো সর্বাগ্রে সন্তোষের চুলের ঝুঁটি ধরে এক কিল মারল তার ঘাড়ে।

বলল, লোধাপাড়ায় যাবি যে, আগে থেকে আমাদের বলবি ত?

ঢ্যাঙুআনরাও হাঁ হাঁ করে উঠল, হঁ হঁ, বলবি ত।

একের পর এক প্রশ্ন, কোথায় বেঁধে রেখেছিল? কোন্ গাছে? কী দিয়ে বেঁধে রেখেছিল? সত্যি সত্যি চিহড়লতায়?

তার হাত ধরে টানাটানি করল ঢ্যাঙুআনরা, চ চ আমাদের দেখাবি চ।

মারধোর করেচে?

কোথায়? কী দিয়ে?

এতক্ষণে সন্তোষ থিতু হয়ে মুখ খুলল, ন্নাই ন, মারবেক কেনে?

মারবেক কেনে মানে?

সন্তোষ হেসে বলল, আমাকে বাঁধেও নাই ছাঁদেও নাই, মারধোর ত অনেক দূরের কথা।

তবে যে গুড়খালোধা স্বয়ং গিয়ে বলে এল, তোকে চিহড়লতায় বেঁধে রেখেছে?

সন্তোষ এতটা হিসাব করে নি, কখন গুড়খা গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে। তাহলে এত ভালও বাসে তাকে গুড়খা?

খুব ধীরে, ঘাড় নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙুলে চিকন চিকন বালি আঁচড়াতে আঁচড়াতে সন্তোষ বলল, ম্নাই, আমাকে বাঁধলে আমি জানব নাই, গুড়খা জানবে?

হঁ জানতেও তো পারে, কেউ একজন ঠাট্টা করে বলল, কেনে না উ যে তোর শাল্‌হা, বড়কুটুম।

জল জল, সন্তোষ যেন এত উৎসাহে এতসব অস্ত্রপাতিতে এতবড় কুলকুলিতে জল ঢেলে দিল, জল। সব যেন জুড়িয়ে হিম হয়ে এল।

ব্যর্থতায় হতাশায় কেউ কেউ ঝোপে ঝাড়ে অস্ত্রের কোপ মারতে লাগল, এম্নি এম্নি শুধু শুধুই। আসার সময় কোপ মারছিল অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করতে, এখন যেন কোপ মারছে অস্ত্রগুলো কতটা ভোঁতা, তাই দেখতে।

গ্রামে ফিরে আবার তাদের গরু জাগাতে হবে, ক'ঘর এখনো বাকি আছে! বেলা উঠবার আগেই সেরে ফেলতে হবে সে সব।

তারা যেন অহীরা গানের সুর হারিয়ে ফেলেছিল, আবার জোড়া লাগাবে। নেশা তাদের কেটে গিয়েছিল, আবার নতুন করে গলায় ঢালবে চুয়ানো মদ।

এই মাকড়া সন্তুষটা মাঝেমইধ্যে এমন কিত্তি করে না! দে এখন জরিমানা দে।



হিজুঃ মে! হিজুঃ মে!

কাঁধে খড়ের হনুমান সামাই সরেণ মেয়ে ফুড়গুণিকে ডাক দিল। মেয়ে ফুড়গুণি বগলে একটা ঝুড়ি নিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে গেল।

বাপের পায়ের কাছে পা রেখেই সে একগাল হাসল।

সামাই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—বউ হাসি ছেলে-কোলে নাচ-দুযারে কুলগাছটাব তলায দাঁড়িয়ে আছে। সামাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সেও হাসল।

সাঁওতাল হলেও সামাইয়ের গায়ের রঙ ফর্সা। শুধু কী সামাই, তার বউ হাসিও ফর্সা। মেয়ে ফুড়গুণির গায়ের রং-ই শুধু সাফা নয়, চুলগুলিও পাঁড়রা পাঁড়রা, পিঙ্গল বর্ণের।

একে ফর্সা, তার উপর সামাই মুখে মেখেছে ছাই। সে বহুরূপী সেজেছে, কপালে বেঁধেছে ছেঁড়া শাড়ি-পাড়ের ফেট্টি। তাতে ঝাঁপুড়-ঝুপুড় অবাধ্য বাবরি চুলগুলি বাঁধা পড়েছে।

সে 'সহরায়ের মাগনে' বেরুচ্ছে মেয়ে ফুড়গুণি আর খড়ের বাঁদবীকে সঙ্গে নিয়ে।

সারারাত গরু জাগিয়ে, সন্তোষকুম্‌হারকে উদ্ধার করে কুম্‌হারপাড়ার ঢ্যাঙুআনরা এখন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

কেউ হরিমন্দিরের খোলা চাতালেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে শীতলাতলায় 'গ্রাম-ফাণ্ডের' শতরঞ্চি পেতে। আর কেউ ঘুমোচ্ছে ফাঁকা ইস্কুলঘরের কাঠবেঞ্চিতে। নিজেদের ঘরে খালি দড়ির খাটিয়া পেতেও শুয়ে আছে অনেকেই।

এত ঘুম এখন তাদের গড়িয়ে দিলেও সে-ঘুম ভাঙছে না, বড়জোর এ-পাশ ও-পাশ করলে দড়ির দাগ ফুটে উঠছে সর্বাঙ্গে।

ঢ্যাঙুআনরা যখন ঘুমে বেহুঁশ, তখন সাঁওতালপাড়া থেকে মাগনে বেরুচ্ছে সামাই। সে-ও তো 'জাগোয়া'। আধো-ঘুমে অধিকতর নেশায় তার চোখ দুটিও তো গ্রীষ্মের কুসুমফলের ভিতরের মতো লাল।

সবাই কী আর, সামাই সরেণ কী দাঁসাই কী সহরায় সব পরবেই মাগনে বেরোয়। খুব দূরে সে যায় না, সে যাবে একে একে কুম্‌হারপাড়ায়, কাম্‌হারপাড়ায়, বড়জোর মাহাতোপাড়ায়। ভূমিজপাড়ার ওদিকে সে যাবে না—সেখানে যেতে হলে তাকে যেতে হবে সেই কোন্ নুয়াসাহি-ডাঙাসাহি-ভালিয়াঘাটী।

ছোটমেয়ে ফুড়গুণি অতদূর কী হাঁটতে পারবে? এই তো একটা ঝুড়ি মোটে—কুম্‌হারপাড়া কাম্‌হারপাড়া মাহাতোপাড়াতেই সে-ঝুড়ি ভরতি হয়েও বেশি হয়ে যাবে। তখন ভারী-ঝুড়ি, খড়ের বান্দর আর ফুড়গুণিকে নিয়ে হাঁটাই দায় হবে।

তার উপর কাল গেছে 'জাগোয়া', আজ ওবেলা সে একটু ঘুমোবে। না-ঘুমোলে আগামীকাল আবার বাঁদনা, গরু-খুঁটা পৈড়ান-ওঠা।

গরু তো খুঁটাবে খেলাবে গোব্‌রা, গরু-খুঁটাতে সামাই সরেণের ডাক না পড়লেও ডাক পড়বে পৈড়ান ওঠাতে। পৈড়ান ওঠাতে তাগদের মতো তাগদ চাই, তার মতো গায়ের জোর এ-তল্লাটে আর কার বা আছে?

কাঁধে কাপড়-ছেঁড়া পাতা ঝুড়ি, একহাতে ঘুঙুর-বাঁধা খড়ের হনুমান আর লাঠি। কখনো পিছনে কখনো সামনে তার মেয়ে ফুড়গুণি—সামাই সরেণ 'মাগনে' হেঁটে চলেছে।

পিছন পিছন তার পোষা কুকুরটিও এসেছিল কিছুদূর, বেপাড়ায় সে ঢুকবে না—এই ভেবে সে সরে পড়েছে কখন, হয়ত ঘরে ফিরে সে এতক্ষণ কুলতলায় কুন্ডলী পাকিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়েছে।

কুমহারপাড়ায় ঢোকামাত্র, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল হৈ হৈ করে উঠল—বাঁদরঅলা এস্‌চে বাঁদরঅলা এস্‌চে!

বলতে বলতেই কেউ কেউ সামাইসাঁওতালের খড়ের বাঁদরটাকে খোঁচা মারবার চেষ্টা করল, এমনিতে হাত না পৌঁছুলে একটু লাফিয়ে উঠে খোঁচা মারতে লাগল।

লাঠি ঘুরিয়ে তাদের তাড়া করল সামাই, নিকালো হিয়াঁসে, নিকালো! ঐ লাঠিটাই ঘুরালো, তার কাছ থেকে কেউ তেমন নড়লও না। চলুক তারা সঙ্গে সঙ্গে, না হলে জমবে কেন?

বেড়ে বানিয়েছে খড়ের হনুমানটা সামাই! তার গলায় আবার বেঁধে দিয়েছে ঘুঙুর। কাপড় কেটে কেটে তৈরি করে দিয়েছে একটা জামাও।

খলায় খামারে বুড়োবা বসে বসে গল্প করছিল। তারা ঠিক সকাল-সকালই উঠেছে। উঠবে না কেন, তারা তো আর রাত জাগেনি, রাত জেগে গরুও জাগায়নি। বড়জোর ঢ্যাঙুআনরা যখন এসেছে তখন বিছানা ছেড়ে কাশতে কাশতে উঠে গিয়েছে, ঢ্যাঙুআনরা গেলে ফের বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে।

এখন তারা হরিমন্দিরে শীতলাতলায় খলা-খামারে বসে বসে চর্চা কবে চলেছে কালকের কথা, কাল রাতের কথা। কাল লোধারা সত্যিসত্যিই সন্তোষকে চিহড়লতা দ্বাবা বেঁধেছিল?

বেঁধেছিল মানে? বেঁধেওছে, মেরেওছে।

তবে যে সন্তোষ—

কী?

কবুল করেনি।

লোধামাইয়াই কবুল করতে না করেছিল, লোধামাইয়াই শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছিল।

এখন ভৈরব কী করে—সেইটে দেখার।

কী আর করবে, ঘরে এনে বহু চুমাবে। সবাই কম-বেশি হেসে উঠল। আর এসময়ই গ্রামে ঢুকল সামাই।

ঐ সামাই 'সহরায়ে'র ছো নিয়ে আসছে! বুড়োদের চোখ মুহূর্তে ঘুরে গেল সামাইয়ের খড়ের বাঁদরটার দিকে।

উঁ-হু, বুড়োদের চোখ পড়ল সামাইসাঁওতালের মেয়ে ফুড়গুণির উপর। ঠিসারা করে কেউ বললও, সামাই উকে একবার লাচা, তোর বিটিকে। কেমন লাচে—আমরা দেখি।

অন্তত সেরেঙ দু-একটা ত শুনাক।

লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে সমাইয়ের বিটিটা। সে আবার নাচবে কী! সে আবার সেরেঙ শোনাবে কী!

লাচ বাঁদরী, লাচ, বলে সরেণই খড়ের বাঁদরীটাকে নিয়ে 'টাঁড়সহরায়' শুরু করল রাজারামকুম্হারের খলায়। রাজারাম— সেও তো একজন কুম্হার মাতব্বর! গণ্যমান্য লোক।

মিঙ্ মিঙ্ করে সামাই কিছুক্ষণ নিজের ভিতর সুর ভেঁজে নিল, তারপর জোরে জোরেই গাইল—

উখিন দিন দ সহরায় দ
টাঁড়ি রেয়েম তাহেকান
তিনি রত সহরায় দ
তালা অড়াঃ ভিত আড়েরে।

একটু একটু গাইছে, থেকে থেকে গাইছে—কুম্হারপাড়ার লোকজন গানের অর্থ তো বুঝবে কচু, সত্যি সত্যি গান কি তারা শুনতে চায়? ঐ গানের নামে তারা 'হুরি ' করতে চায়, রঙ্গ-তামাশা করতে চায়।

সামাই সার বুঝেছে। গান যত না গাইছে, ঐ খড়ের বাঁদরীটাকেই নাচাচ্ছে বেশি।

'লঙ্কা ডিঙা দেখি বাঁদরী, সোনার লঙ্কা পার হঞে যা!'

বলেই লাঠিটা উঁচু করে ধরে থাকে সামাই আর হাতের কায়দায় খড়ের বাঁদরীটাকে লঙ্কা পারাপার করে দেয়।

সামাইয়ের খেলা দেখে তো রাজারামকুম্হারের ঘরের মেয়েরা হেসে মরে। হাসতে হাসতে এ-ওর পিঠে উচ্ছ্বাসের কিল মেরে যায়।

রঙ্গ-রসিকতা সামাইও কম করে না। সে তো সে করবেই। সকলেই তো তার চেনা! পরবের ক'টা দিন বাদ দিলে বাকি দিনগুলোয় সে তো এখানেই পড়ে থাকে, এই কুম্হারপাড়ায়। এর ঘরে না হয় তার ঘরে।

সে মুনিষ-কামিন্নার কাজ করে। যেমন স্বাস্থ্য তেমন সে খাটতেও পারে। কারোর বাড়ির পেঁয়াজ বিলে তেঁড়ায় ভরে আজ জল দিচ্ছে তো কাল অন্য কারোর বাইগনবাড়িতে কোদালে মাটি কুপিয়ে বেগুনগাছের গোড়ায় মাটি ঢালছে। কখনও বা হটমুট চলে যাচ্ছে পাকুড়তলার জমিনে, হদ্‌বদ্ করে ধানগাছের গোড়ার আগাছা নিড়িয়ে দিচ্ছে দু'হাতে। কখনো কখনো দু'হাতে চারগণ্ডা চারগণ্ডা মোট আটগণ্ডা ধানের চারা একলাই নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ধানরোয়া চলছে, সেখানে।

কাল রাতে যা পিঠে হয়েছিল তার কতক রেখে দিতে হয় সামাইয়ের জন্য, রেখে দিতেই হয়। গামছা-পাতা ঝুড়িতে গণ্ডা গণ্ডা পিঠে পড়ছে, বাসি ছাঁকা-পিঠা।

কেউ কেউ পাঁড়রাচুলো সামাইয়ের বেটিকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে গিয়ে আলাদা করে পিঠে দিচ্ছে। দুধ-পোয়া কী মসলা-পিঠা। তার একটা কী দুটো ঘুরে ঘুরে খাচ্ছে তো খাচ্ছে ফুড়গুণি, বাকিগুলো সেই ঝুড়িতে এনে রেখে দিচ্ছে। আগে বেশি জমুক তো।

জমুক, জমুক।

মাঠে ঘাটেই তো 'সহরায়' ছিল, টাঁড়ে-টিকরে, কাঁচা-পাকা ধানগাছের সঙ্গে অলায়-গলায় ভাব করে। এতদিনে সে-'সহরায়', হাতির লাখান 'সহরায়' ঘরে-দোরে এসে পড়েছে।

ঘরের মানুষ তাকে নিয়ে একটু ফুর্তি-ফার্তা তো করবেই। পিঠা-পুলি তো খাবেই। কুম্হারপাড়ায় যেমন খাসি-ছাগল কাটা হবে, মাহাতোপাড়ায় কাটা হবে পাঁঠি-ছাগল। সাঁওতালপাড়ায়ও তো মারা হবে 'ঘুসুর'।

বাসি ছাঁকা-পিঠা খেয়ে যদি এখন পেট ভরায় ফুড়গুণি, তবে ঘরে ফিরে চর্বিঅলা হলুদ হলুদ শূওরের মাংস খাবে কী করে?

ঠারে-ঠুরে চুপি চুপি ফুড়গুণিকে নিষেধ করে দিল সামাই, অত পিঠা খাস্নি বিটি, তোর পেট দুখাবে।

রাজারামবুড়ো চেপে ধরল সামাইকে। বলল, ঠারে-ঠুরে বিটিকে কী অত বল্ছিস সামাই? মনে করছিস 'ঠার' আমরা বুঝি নাই? বলেই সে শুরু করল—

বরুরেণ ভটকু কুলার
টাঁস জোম বাগিয়াতে হাসায় জোমায়?
আপে তোহরে আদিবাসী হোড়
দাকা জোম বাগিয়াতে
হাঁড়িয়া পৌরাতে পে আতুচলা।

একটানা এতক্ষণ বলে হাঁপাচ্ছিল রাজারাম, আবার হাসছিলও। হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে সামাইয়ের মেয়ে ফুড়গ্ণির থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল, কী বুঝলি সান্তালদিদি?

ফুড়গুণি কিছু বুঝে নি, তার বাপ যেটুকু বুঝার বুঝেছিল। রাজারামকুম্হার কারোর মুখ থেকে শুনে 'ঠারটা' মুখস্থ রেখেছে। মানেটাও সে জানে বই কি।

গম্ভীর হয়ে সামাই বলল, হঁ লেশা, লেশা-ই ত আমাদের খেঞে ফেলল মাত্বর। ভাত নাই খেঞে হরদম লেশা করচি, জাম জাম হাঁড়িয়া গিলছি। আমরা ডুবব নাই ত কে ডুববে? কিন্তুক মাত্বর, ই তুঁই কুথাল্লে শিখলি? ই ত ইদিককার ঠার লহে।

রাজারাম বলল, শিখেছি। সে যেখান থেকেই শিখি না কেন, কথাটা কত বড় কথা, ভাব! "বনের খেড়িয়া ঘাস না খেয়ে মাটি খাচ্ছিস? আদিবাসী হোড়, ভাত ছেড়ে হাঁড়িয়া গিলছিস আর ডুবে যাচ্ছিস।"

রাজারামকুম্হারের ঘরের লোকেরা অবাক মানছে, হ্যাঁ, তাই তো এসব 'ঠার-ঠোর' লোকটা শিখল কোথা থেকে? তারপর তারা নিজেরাই বিচার বিবেচনা করে দেখল—পার্টির মিটিংয়ে লোকটা হিল্লি-দিল্লি কাঁহা কাঁহা মুলুকে না যায়! যে-ঠার সামান্য সামাই জানে, সে-ঠার সে তো শিখতেই পারে। শিখেছে।

হঁহঁ, বাঁদর নিয়ে উঠে যেতে যেতে সামাই বলল, কথাটা বড়িয়া বঠে, বেড়ে বলেছিস মাত্বর।

আরো শুনবি? খড়ের বাঁদর নিয়ে সামাই চলে যাচ্ছে, পিছন পিছন ঝুড়িবগলে তার মেয়ে ফুড়গুণি, তারও পিছনে রাজারামবুড়ো তোতাপাখির মতো আউড়ে চলেছে—'হাড়াৎ হাড়াৎ নিম্ হাড়াৎ, হাড়াৎ হাড়াৎ হিরম্ হাড়াৎ—"

খুব রেগে আছে ভৈরবকুম্‌হার। ছেলের উপর, লোধাদের উপর। একমাত্র ছেলে তার, এতবড় সম্পত্তি সে ছাড়া আর কে ভোগ করবে? তার আর কে আছে?

অথচ সে কী না এতদূর উচ্ছৃঙ্খলমতি? সামান্য একটা লোধামেয়ে, লোধা—যাদের না আছে চাল-চুলো, সভ্যতা-ভব্যতা, এখনও ইন্দুর-বান্দর ঢ্যামনাসাপ-গোসাপ কাঁচাই খেয়ে ফেলে, তাদের মেয়ের প্রতি তার ছেলেব এতদূর মোহ কেন? তবে কী তুকগুণ জানে লোধারা, বিশেষত ঐ মেয়েটা, কোনপ্রকার তুকতাক করে দিয়েছে? বশীকরণ, বশীভূত করেছে?

সকালে ওঠা-ইস্তক ভৈরবকুম্‌হার চিন্তায় চিন্তায় মাথার চুল ছিঁড়ছে। ওদিকে মাকড়াটা গোধুতের মতো এখনও ঘুমোচ্ছে। গুণিনকে দিয়ে একবার 'ছাড়ান-নিমন্থ' করিয়ে নেবে, ভৈরবকুম্‌হার ভেবে রাখল।

এর মধ্যে দু-দুবার কুন্তলা ঘরে এসে ফিরে গেছে, সন্তোষের ঘুম ভাঙেনি। এমন কী তার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়েছে কুন্তলা, তবু বাবুর ঘুম ভাঙেনি। ঘুম ভাঙবে কী করে? সারারাত তো না-ঘুমিযে বাবুর মনমধ্যে ঐ এক চিন্তা—সাবিত্রী, সাবিত্রী।

কাল রাতের ঘটনাটা স্মরণে এনে শিউরে উঠেছিল বই কি কুন্তলা। কত কী হতে পাবত! বলছে তো চিহড়লতায় বাঁধেনি—যদি বাঁধত? বলছে তো মারেনি—যদি মারত? দূব থেকে তাক করে যদি 'বিষমাখা' কাঁড় ছুঁড়ত? লোধাবা তো ঐরকমই করে বলে শুনেছি।

কপালে হাত ছোঁয়াতে হাত প্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল কুন্তলা, কী ভেবে হাত গুটিয়ে নিল সে। যদি জেগে ওঠে সন্তোষ? তার সঙ্গে তাব কাল রাতেব ঘটনাটাও আবেকবার স্মরণে নিয়ে এল কুন্তলা। কত কী হতে পারত। কত কী।

সন্তোষ এখনও জাগছে না, মাঝে মধ্যেই খুড়শ্বশুর ভৈরবকুম্‌হার হাঁক পাড়ছে। হাঁক তো পাড়বেই, আজ দেওর সন্তোষের কত কাজ!

হাল-জোআলগুলো ধুতে হবে, গোহাল-পূজার জোগাড়যন্ত্র করতে হবে, মৌড় বানাবাব জন্য আজও তো কাঁচা-পাকা ধানশীষ আনতে হবে। ওবেলা ফের গুঁড়ি-কুটা, আলপনা-আঁকা, গরু-চুমানো, জাগর-জ্বালা—সবই তো করতে হবে। নিজহাতেই করতে হবে সন্তোষকে, কুন্তলাকে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ছটফট কবছিল কুন্তলা—গায়ে 'ধাকাল' দিয়ে সে কী ডেকে তুলবে সন্তোষকে?

ভাবছে, ভাবছে।

ভাবতে ভাবতেই সে ঘর-বাহির করছে। একবার ভিতরে গেল তো একবার বাইরে। আর এসময়ই 'মাগনে' ঢুকল সামাই সরেণ।

সামাইয়ের গলা পেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল কুন্তলা। তাকে দেখেই গান জুড়ে দিল সামাইও—

> লদীয়াকা ধারে ধারে বিরি বুনল যে বাবু হো
> বিরিক্ষেতে হনু চবি গেল।
> আর, মারব রে হনু তোকে জীয়া তোর বধিব
> তোরো ছালে বরদা খেলাব।।

ঘুঙুর-বাঁধা খড়ের বাঁদরীটাকে এ-ধার ও-ধার ডিগবাজি খাওয়াচ্ছে সামাই। লাচ্‌ বাঁদরী লাচ্‌, লাচ মেয়্যা লাচ্‌ লাচ্‌।

খড়ের বাঁদবী নাচছেও তেমন, এই ডিগ্‌বাজি খেল এদিকে তো ঐ ডিগ্‌বাজি খেল ওদিকে। তাব উপর সামাইয়ের ঘন ঘন মাটিতে লাঠিপেটা। বাঁদরীর না নেচে উপায় কী?

উলুর-ঝুলুর চুলে বাপের পাশেই বসে আছে ফুড়গুণি। কখনো বাপের চুলের ঝুঁটি ধরে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ফের বসছে।

বুড়োদের আর যেন কোনো কাজ নেই, সামাইয়ের বেটিকে দেখলেই আব্দার ধরছে, বিটিটাকে একবার লাচা সামাই, কেমন লাচে দেখি। দিড়ি দাং খেটেতাং দিড়ি দাং! মুখে শুধু মাদল-ধামসার বোলই নয়, কুলকুলিও মারল ভৈরবকুম্‌হার।

অহীরা গীত শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সন্তোষের, বাপের মুখের কুল্‌কুলি শুনে সে প্রায় দৌড়ে এল খলায়। তাহলে বাপ বেশ মউজেই আছে, রাগে নাই?

রাগে নাই, রাগে নাই।

সন্তোষকে দেখে ঝপ্ করে সামাই বলল, কাল রাতে গেলে গেলে, সঙে করে বহুছানাটাকেও আনলে কাজের কাজ হইত। তা লয়—

সাবিত্রীর কথা ওঠায় দ্রুত সরে পড়েছিল কুন্তলা, এখন ভৈরবকুম্‌হারও গেল। সন্তোষ একা।

সামাই সরেণ ফিস ফিস করে বলল, বল-অ যদি ত আমরা যেঞে ধরে বেঁধে লিঞে আসি?

সন্তোষ মানা করল। মনে মনে বলল, কুম্‌হারদের বউকে সাঁওতালরা ধরে-বেঁধে নিয়ে আসবে কী করে? মুখে বলল, যার ইচ্ছা হবে আপ্‌সেই আসবে, ধরে বেঁধে কী আনা যায়? বঠে কী না?

হুঁ তা ত বঠেই, তা ত বঠেই।

সমর্থন তো করবেই সামাই, আশাতীত 'সিধা' পেয়েছে সে ভৈরবকুম্‌হার নিতাইকুম্‌হারদের ঘর থেকে। ছাঁকা-পিঠা, চাল, বাইগন, বৈতালখাড়া হাত ভরে দিয়েছে কুন্তলা। কোনোরকম কুণ্ঠা রাখেনি।

এক কাঁধে সিধার ঝুড়ি, আরেক কাঁধে খড়ের বাঁদর, পিছনে মেয়ে ফুড়গুণি—টলমল হেঁটে চলেছে সামাই সরেণ। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায়।

ঘরে ঘরে গোহাল-পূজা শুরু হয়েছে। বাতাসে উড়ছে ঘিয়ে ভাজা পিঠের গন্ধ, মালপোআ দুধপোআ। 'গরয়া' খুঁটা গাড়া হচ্ছে খুব হল্লা করে, গরয়া-পূজাও এই শুরু হল বলে!

শালুকনাড়ার মালা গাঁধা হচ্ছে, কাঁচা-পাকা ধানের মৌড় গাঁথা হচ্ছে। বাগালছোঁড়ার মাথায় হুড় হুড় করে কচড়ার তেল ঢেলে দিচ্ছে ঘরের বউড়িঝিউড়ী-রা। মাথা বেয়ে গাল বেয়ে বুক বেয়ে পেট বেয়ে সে-তেল মাটিতে গড়িয়ে পড়লে আরেক কিস্তি হাসির হল্লা উঠছে।

চোখ বুজ্ বে, না'লে চোখ তোর জ্বালা করবে। মুখ বুজ্ বে, না'লে কচড়া তেল মুখে ঢুকে তিতা লাগবে।

হড় হড় করে তেল ঢালছেও তারা, আবার আদর করে চোখ বুজতে মুখ বুজতে বলছেও তারা।

কাণ্ড দেখে সামাইয়ের মেয়ে ফুড়গুণির গলা শুকিয়ে আসছে। শুকনা গলায় সে বলল, এহে বাবা, এত তেল ঢালছে কেনে?

তেলানি হঞেছে।

তেলানি কী বাবা?

বুঝলি নাই মাঈ, তেল বেশি হঞেছে।

হুঁ।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে ফুড়গুণি, বাপের পায়ে পায়ে সে হাঁটে। দুম্ করে বলে বসে, এহে বাবা, এত থাকতে গরুর শিংয়ে কেন তেল?

বুঝলি নাই মাঈ, লোককে টুঁসিয়াতে সুবিধা হবে বলে।

হঁ-অ।

খড়ের বাঁদর এ-কাঁধ ও-কাঁধ করে নেয় সামাই। সিধার ঝুড়িটা মাথায় নিতে চায় ফুড়গুণি। ভারী বলে তাকে দিতে চায় না সামাই। খড়ের বাঁদর হাল্‌কা আর কুট কুটে বলে বাপ দিতে চাইলেও নিতে চায় না ফুড়গুণি।

একটুক্ষণ থেমে থেকে সে আবার বলে, গরুকে ধানের মোড় শালুক্নাড়ার মালা পরায় কেনে? এহে বাবা, গরুকেও মালা?

হাঁটতে হাঁটতেই সামাই বলে হঁ, বুঝলি নাই মাঈ, ধানের মোড় শালুক নাড়ার মালা গরু খাতে খুব ভালবাসে। কির'ম জিভ উল্টায় উল্টায় খায়—দেখিস নাই?

হঁ-অঅ। ফুড়গুণি দেখেছে।

সামাইয়ের গরু নেই, গোহাল নেই, গোহাল-পূজাও নেই, গরু নিয়ে মেয়েকে মনগড়া কতগুলো কথা বলল, রাগে ও দুঃখে।

মেয়ে অতঃপর জিজ্ঞাসা করল, গরু খুঁটায় কেনে? মানুষ খুঁটায় না কেনে, এহে বাবা?

বুঝলি নাই মাঈ, গরুর ত চারটা পা, মানুষের ত মোটে দুটা। চার পায়ে বেড়ে নাচতে পারে, খেলতে পারে—তাই খেলায়।

হঁ।

পিছন পিছন আসছিল সুখজুড়ির গোব্‌রাসাঁওতাল, 'গরু-খুঁটা-বুড়া'। সামাই, সামাইয়ের মেয়ে কেউই টের পায়নি। বাপ-বেটির কথা শুনতে শুনতে হেসে গোব্‌রা বলল, বিটির কাছে কী পেঁদ ঝাড়ছিস সামাই?

চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সামাই, সামাইয়ের মেয়ে। পেঁদ অর্থাৎ মিছে কথা, গুল-গল্প। হ্যাঁ হ্যাঁ, এতক্ষণ মিছে কথাই মেয়েকে শোনাচ্ছিল সামাই।

কথায় বলে না, পড়শী নাই যথা টঁপ ছাড়বি তথা—কিন্তু এ যে পড়শী বলে পড়শী, স্বয়ং 'গরু-খুঁটা-বুড়া'! মরা গরুর 'চাম' নিয়ে গোব্‌রা যে ফি-বছর গোঠ-টাঁড়ে গরু খেলিয়ে বেড়ায়! 'সহরায়'-এর সব বৃত্তান্তই তো তার জানা।

গোব্‌রা ফুড়গুণির থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল, নাই লাত্‌নী, আসল কথা শুন্।

বলেই সে ফুড়গুণির সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা শুরু করল, হঁ আসল কথা বলব তবে এক শত্তে।

কী? ঠোঁট বিদুর করল ফুড়গুণি। হাসবে, না কাঁদবে?

হামার বহুটা বুঢ়হি হঞে গেছে, তুই ছঁড়ি হামাকে বিহা কর। হামি তোকে ছুটকি রাখব। কিরিঞ জাওয়ায় বাপ্‌লা—না হয় ঘর-জামাই থাকব।

ফুড়গুণির বাপ সামাইকে বলল, কী সামাই ঘর-জামাই রাখবি ত?

বাঁকা মোচ দুহাতে মোচড়াতে লাগল গোব্‌রাসাঁওতাল। ফুড়গুণি-সামাই, বাপ-বিটি দুজনেই হেসে উঠল।

তারপর 'বাপ্র' বলে খলখলিয়ে হাসতে হাসতে এদিক-সেদিক দৌড়তে লাগল ফুড়গুণি।

তবে তঁ ইতুৎ সিঁদুর বাপলা—সিঁদুর ঘষবই ঘষব, লিবই লিবই লিবই। ফুড়গুণির পিছন পিছন দৌড়তে লাগল গোব্‌রাও।

খেলা, খেলা, সে আর কতক্ষণ। ফুড়গুণিকে ধরেই কাঁধে তুলে ফেলল গোব্‌রা। ঘরকে চল্, আ-নেক 'সিধা' দিব-অ।

কাঁধে তুলে ফুড়গুণিকে মহাদেব, গরু আর মানুষদের গল্পটাও শুনিয়ে দিল সে।

শুন্ ন—ঠাকুরজীউ মহাদেব ত গরুকে পাঠাল, যাহ্ গরু, মর্ত্তে যেঞে মানুষকে চাষাবাদে

সাহায্য কর। সেই থিকে গরু ত ঘাড় গুঁজে লাঙল টানে, মহী টানে, গাড়িতে জুতে মানুষ তাকে যথা ইচ্ছা তথায় লিঞে যায়।

যায় ত যায়। কী লাত্নী, শুনছিস ত?

কাঁধের উপর থেকে ফুড়গুণি উত্তর দেয়, হুঁ। কাড়ার মতন লোকটার কাঁধে চড়ে ফুড়গুণিও যাচ্ছে! যাচ্ছে ত যাচ্ছেই। পিছন পিছন আসছে খড়-কুটার বাঁদর-কাঁধে তার বাপ সামাই সরেণ।

ফুড়গুণির ভয়ও হয়—এত চাঁড় চাঁড় যাচ্ছে লোকটা, ঘরে পৌঁছে তাকে সত্যি সত্যি বিয়ে না করে বসে!

ভয়াতুর দৃষ্টিতে সে তার বাপের দিকে চেয়ে থাকে। চোখাচোখি হলেই বাপ যেন সস্নেহে বলে, নাই বিটি, উ তোকে ভুলাচ্ছে। ভালো লোক। চ ন চ, আ-নেক সিধা দিবে। চাই কী ঘুসুর মাংসও। জানবি নেশাব তাড়সেই লোকটা চাঁড় চাঁড় হাঁটছে।

মদ-হাঁড়িয়ার গুণেই গোব্‌রা নিজের বাড়ির দিকে দ্রুতই হেঁটে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতেই বল্সছে, ধের মাইরি, টুকচার ভুল হঞে গেল, আগে-পিছে বলা হৈল। এর আগেও একটুক কথা আছে, লাত্নী।

কী?

শিবঠাকুর গরুকে বলল, মর্ত্যে যা, যেঞে পরচার কর, মানুষকে বল, খাবি এক বেলা শিব জপবি তিন বেলা। বলতে যেঞে গরু ত গুলাঁয় ফেলল। বলল, খা তিন বেলা, শিব বল একবেলা।

বলেই হাসছে গোব্‌রা, গরুর বুদ্ধি ত লাত্নী। লাত্নী বলতে গিয়ে ভুলে ছুটকী বলে ফেলেছিল গোব্‌রা। তাজন্যও হাসছে।

ঠাকুরজীউ মহাদেব ত রেগে কাঁই। এখন মানুষকে তিনবেলা খাবার জুগাবে কে? যা গরু, মর্ত্যে যেঞে মানুষকে চাষাবাদে সাহায্য কর। সেই থিকে—

হেঁ সেই থিকে গরু ত খেটে মরছে। লাঙল টানতে গাড়ি টানতে টানতেই তার কাঁধে কড়া পড়ল, খেতে না পেয়ে শরীল হাড়পু হৈল, পইনার বাড়ি খেঞে পাছায় দাগা ধরল।

মহাদেব হে, মানুষ বড় কু-জাত, খাটায়, খেতে দেয় নাই। গরু বলল। ত মহাদেব বলল, আচ্ছা দেখা যাবে কার্তিকমাসের আমাবইসায়, চুপচুপু যাব।

চুপু চুপু, চুপচুপু। কই সরেণ, তোর বাঁদরীটাকে ইবার একটু লাচা। লাচ বাঁদবী, লাচ! খিটি ধো-ধো খিটি ধো। মুখে হাত থেপে থেপে কুলকুলি মারল গোবরা, নাচলও।

সুখজুড়ির বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা। কাঁধ থেকে নামবার জন্য ঝটফট করছিল ফুড়গুণি। গোব্‌রাবুড়োর বুকে পিঠে পায়ের 'এড়ি' ঠুকছিল।

ইশারায় তাকে মানা করে দিল সামাই। তীরে এসে তরী না ডোবে! সম্পন্ন চাষী গোবরাবুড়োর মতো লোক তার মতো লোকের মেয়েকে যখন কাঁধে তুলেছে, তাতেই ধন্য হয়ে যাবার কথা সামাইয়ের, সামাইয়ের মেয়ের। তা নয় ছটফটাচ্ছে ছুঁড়ি? ছটফটাচ্ছে?

পিছন থেকে ডান হাতের তর্জনী নেড়ে সামাই নিষেধ করে দিল, থাম বিটি, থাম।

নেশার ঘোরে আছে গোব্‌রা। অতকিছু বুঝল না। অসমাপ্ত কাহিনীটাকে সে টেনে-টুনে নিয়ে চলল। শুরু যখন করেছে সে সমাপ্ত করবার দায় তো তারই।

তার পিছ্‌কে ছুটকী শুন, মানুষ ত আর গরু লয়, ঠিক জানতে পারল—ঠাকুরজীউ মহাদেব, দেব দেব মহাদেব, কার্তিকমাসের আমাবইসায় মর্ত্যে আসছেন গরুদের দুর্দশা দেখতে।

তার আগেই মানুষ গরুর গা ধুয়ালো, শিংয়ে তেল-সিন্দুর মাখাঞে চকচক করল। ধানশীষের মোড় পরাল, টিকলীমোড়। সিঁথলী মোড়। গলায় দিল গেঁদাফুল শালুকনাড়ার ফুল। সারা শরীলে গোল গোল নানা রংয়ের ছাপছোপ দিল।

আরো কত কী যে করল, লাত্নী! হল্দি জলে পা ধুয়াইল, চুমাইল, জাগাইল, খুঁটাইল।

দেখে শুনে মহাদেব গরুকেই দোষ দিল, আর মানুষকে? মানুষকে দিল-অ ধেনু-গাই-অ—

আর, জাগেকা প্রতিফল দিবে গো মহাদেবে
পাঁচ-অ পুতায় দশ-অ ধেনু গাই-অ।

ঘরে এনে ফুড়গুণিকে, সামাইকে, ঝুড়ি ভরে 'সিধা' তো দিলই, ঘুসুর মাংসের পিঠাও খাওয়াল বাপ-বিটিকে।

আর বারেবারেই বায়না ধরল, ফুড়গুণিকে সে ছুট্‌কী রাখবে। গোব্‌রাবুড়িকে চোখ টিপে দিয়ে সে বলল, হঁ বুঢ়হি রাজি হঞে যা।

হাঁড়িয়া খেয়ে সাঁওতালবুড়িও চোখে ইকির-মিকির দেখছিল, হাসতে হাসতে বলল, হঁ দিদি, মত্ দিঞে দে! আজ থিকে আয় হামরা সতীন হই।

ভয়ে-ত্রাসে বাপের পিছনে মুখ লুকোচ্ছিল ফুড়গুণি, তার বাপ সামাই বলল, যা বিটি, যা। সতেই কী আর, মিছামিছি।

গোব্‌রা কাল রাতেই টের পেয়েছিল হৈ হল্লার। জানতেও পেরেছিল কুম্‌হাররা কাঁড়-কাঁড়বাঁশ টাঙ্গি-তাব্‌লা নিয়ে জঙ্গলে ঢুকছে।

নাকি কুম্‌হারদের একটা জোয়ানকে লোধারা আটকে রেখেছে। আটকে রাখা বলে আটকে রাখা, চিহড়লতা দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে।

মাঝে মাঝে কী যে মতিচ্ছন্ন হয় লোধাদের! সুখে থাকতে থাকতে ভূতে কিলোয়। আর কেউ নয়, হড়বড়ে ঐ রাইবুটাই—ঐ এখন নতুন মাত্‌বর হয়েছে। রাইবুর বাপ গেঁড়াশবর ছিল অন্য ধাতের। সবদিক বিচারবিবেচনা করে চলত।

নিরীহ কুম্‌হারদের সঙ্গে কী বলে লাগতে গেলি? এখন ঠ্যালা সামলা, রাইবু।

সামাইকে আড়ালে ডেকে কুম্‌হারপাড়ার ভিতরের কথা একে একে জেনে নিল গোব্‌রাসাঁওতাল। যারা নিষ্কর্মা, এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে মাগনে বেরোয়, খেল্ দেখাতে বেরোয়, ছো দেখাতে বেরোয়, তারাই তো হাঁড়ির ভিতরের খবর জানতে পারে, জানাতে পারে।

সামাই জানিয়ে গেল, কোথাকার জল কতদূর গড়ায়, এখন সেইটা দেখার। কুম্‌হাররা কী সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে করেছ?

সুখজুড়ির গোব্‌রাসাঁওতালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোরখুলির মাহাতোপাড়ার দিকে যাবে সামাই, লোধাপাড়া থেকে পিল্‌পিল্ করে দৌড়ে এল ন্যাঙটাভুটুণ্ড সাধের কুটুম লোধাবাচ্চারা, তাদের পিছন পিছন লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীরা।

তারা ঐ কিছুদূর এল বটে, তারপর থমকে থেমে থাকল।

তাদের পাড়ায় তো আর সামাই সরেণ খড়ের বাঁদর নিয়ে সহরায়ের মাগনে যাবে না। তাদের দেখে ঐ বড়জোর খড়ের বাঁদরের গলার ঘুঙুরটা একটু জোরে জোরে বাজাতে লাগল।



কণ্ঠা পড়ে যাচ্ছে গেঁড়াশবরের। এখন হিক্কা ছাড়া আর কোনোরকম শব্দই উঠছে না তার গলা থেকে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রাইবু কত করে ডেকেছিল, কত কী বলেছিল—ঐ হিক্কার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যায়নি।

কণ্ঠা পড়ে যাচ্ছে, কণ্ঠা পড়ে যাচ্ছে।

চারদিকে খবরটাও রটে যাচ্ছে, রটে গেল—এবার বুঝি রাইবুর বাপটা, এ-তল্লাটের সবচেয়ে বুড়োমানুষটা চলে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে।

খবর চলে গেছে মাহাতোপাড়ায়, কুম্‌হারপাড়ায়ও।

'জাগোয়া'র রাতে ভৈরবকুম্‌হারের ছেলে সন্তোষকে নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। রাইবুর বাপের মর-মর অবস্থাও সেই ঘটনাকে এখন চাপা দিতে পারছে না।

চাপা দেবেই বা কী করে? এই তো গতকাল বাদ পরশু রাতে ঘটনাটা ঘটে গেছে। সেই রাত থেকেই তো লোধাপাড়ার পুরুষরা সব ঘরছাড়াই ছিল।

এই এল।

রাইবুর বউ শিশুবালাই বাকি রাতটুকু, তারপরের দিন সারা সকাল সারা 'দু-পহর' শ্বশুরের মুখে একটু একটু করে, 'টুকু টুকু' করে জলই দিয়ে গেছে। শক্ত কিছু খাবার তো গলা দিয়ে নামছে না।

ঘর-বাহির করছিল শিশুবালা, রাইবুর 'বহু'। আর মাঝে মাঝে সামনের কুচলাগাছে উঁকি মেরে দেখছিল—কোনো অলম্ভুস কাক এসে বসে আছে কী না।

দাঁড়কাক, দাঁড়কাক।

না, কোনো কাকপক্ষী নেই। শুধু 'বাড়িতে' অর্থাৎ একচিলতে সেই বাগানটায় সেই ভুসো মাখা চোখ-মুখ আঁকা কালো হাঁড়িটা ট্যাঙ-ট্যাঙ্ করে খুঁটায় ঝুলছে।

কী মনে করে শিশুবালা একটা ঢিল তুলে সেই কালো হাঁড়িটাকেই টিপ করল।

লাগল না। মুখে সে বলল, খালভরা!

কাকে সে খালভরা বলল বুঝা গেল না।

জটাবুড়ি এসেছিল। সেও তো বিছানায় পড়ে আছে। তবু ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে কোনোমতে এসেছিল। তার উপর তার ঘরে আবার কুটুম এসেছে। মেয়ে-জামাই।

তাকেই কে দেখে! সে আবার দেখতে এসেছে। এসেই কতকগুলো জড়ি-বটি শিকড়-বাকড়ের নাম বাতলে গেল। মরণকালে এসব ওষুধ এখন আনবে কে, আনাবেই বা কে, তৈয়ার করবে কে?

রাইবু তো লুকিয়ে আছে জঙ্গলে!

এতদিন শ্বশুর গেঁড়াশবর নিজ-মুখে যা যা ওষুধ বাতলে দিত, তাই তাই খুঁজে পেতে এনে দিত রাইবু।

এখন ধুদ্‌কুলের শিকড়, শেওয়াকুলের শিকড়, হেন্-তেন্ এনে দেবে কে? শিশুবালা জঙ্গলে গেলে বন-টুঁড়ে সে-ই আনতে পারত। কিন্তু অসুস্থ লোকটাকে ছেড়ে সে বনেই বা যাবে কী করে?

পরবের দিন বলে কথা, বচ্ছরকার পরব, কোথায় একটুক ভালো-মন্দ খাওয়া হবে, তা নয় ঘরে এই বিপত্তি, তার উপর বাইরের উৎপাত। সাবিত্তিরি, সাবিত্তিরি। ওকে নিয়ে 'অমাবইসা'র দিনটাতেই কী যে ঘটে গেল!

এসেছিল, সাবিত্তিরির নাঙটা, দুদ্দুর করে খেদাঁই দিলেই হত। তাকে ফের গাছের লতা দিয়ে বেঁধে রাখা কেন?

কিন্তু রাইবুর মুখের উপর কথা বলবে শিশুবালা? অত্তই সোজা! কোনোদিন বলে মুখ খুলে একটা কিছুই চাইতে পারল না। তার আবার—

রাত তো ভালয় ভালয় কেটে গেছে কখন, সকালটাও গেল, দু-পহরও যাচ্ছে। এখনও তো আসতে পারে? কুম্‌হারপাড়া মাহাতোপাড়া—এখন তো সব মেতে আছে গহাল-পূজায়, গরয়া-পূজায়। যে যার গোহাল-পূজা ছেড়ে কাঁড়-কাঁড়বাশ টাঙ্গি-বল্লম হাতে নিয়ে লোধাদের এখন মারতে আসবে?

ডরপেল্‌কু লদ্ধারা তাই সেঁধাই আছে জঙলে? সেই কথায় বলে না, "কুল্‌হিমুড়ায় কুল্‌হিমুড়ায় লাচ লাগেঁছে। বড়বহু ডরপেল্‌কু চুল্‌হায় হাগেঁছে।।" গেল ত লদ্ধাদের পরবের দিনটাই মাটি হয়ে ?

শিশুবালা ঘর-বাহির করতে করতেই শুনছে, ছানাপোনারা চেঁচামেচি করছে, বুড়াবুড়িরা যে কজন আছে খক খক করে কাশছে। দু-একটা পোষা খুক্‌ড়া, কুকুর, হ্যাল্‌ হ্যাল্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এসময় একটা ভুসভুসে কালো কুকুর কোত্থেকে আচমকা এসে পড়ায় মারমুখী হয়ে উঠল শিশুবালা।

হাড্ডি বে, হাড্ডি বে! বলতে বলতে দুদ্দুর করে তেড়ে গেল সে।

কুকুরের পিছন পিছন কিছুদূর তেড়ে গিয়ে তার মনে হল, কুকুরই ত? কুকুর না কুদ্রাকুদ্রি ভূত? যমদূত? তার শ্বশুর গেঁড়াশবরকে নিতে এসেছে?

শিশুবালার মনে এল 'পাটকার'দের কথা। মরার খবর পেলে তারপর তারা আসে, আসতেই হয় তাদের। মরার ঘরে এসে মেলে ধরে পট, একের পর এক। আর সে-সমস্ত পটে কত কী আঁকাজোকা! গয়াসুরের ছবি, গরুর লেজ ধরে বৈতরণী নদী পারাপারের ছবি, যমপুরীর ছবি।

ধুস্‌, এসব কী ভাবছে শিশুবালা? লোকটা এখনও ঘরে শুয়ে কাতরাচ্ছে, মরমর, এখনও মরেনি, আর সে কী না মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছে কালো অলম্ভুস কাক, দাঁড়কাক, কালো কুকুর কুদ্রাকুদ্রি, পাটকার!

মনটাকে দুম করে ঘুরিয়ে দিতে চাইল শিশুবালা। আচ্ছা ভালা, সাবিত্তিরি এখন কী কচ্ছে? রাইবুদের সঙে গুড়খাও কী লুকাঁয় আছে লাটায়-পাটায়? খরখরি গুড়খার বহু ঢালো ঢঙীটাই বা কী কচ্ছে? এত্তগুলা লদ্ধা জড়মাড়ষকে জঙলে গাপ্‌ করে দিয়ে তারা কী এখন কচ্চে?

উঁকি মেরে দেখতে ইচ্ছা হল শিশুবালার। কিন্তু কুলবুদা কেঁদ্‌বুদা বেনাঝাড় কয়েত বেলগাছ খিরিসগাছ শালগাছ ধ' গাছে জড়িয়ে-মড়িয়ে জায়গাটা এমন জট-জটিল যে এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

এড়ি উঁচিয়েও দেখা গেল না। দেখবে কী, ঘুরে ফিরে সেই তো মনমধ্যে অলম্ভুস কালো কাক, কালো কুকুর, কুদ্রাকুদ্রি, আর পাটকার।

কাল তো প্রায় সারাদিন লোকটা ছিল ফুলটুসির ঘরে, কাল রাত থেকেই তো জঙ্গলে। পরবের দিন দুটোই তার সঙ্গে থাকাও হল না, দুটো ভালোমন্দ খাওয়াও হল না।

শিশুবালা ভাবে, কী আর সে নিজে খেত বড়জোর। ঢলানি ফুলটুসিটা তো ঢকঢক করে হাঁড়িয়া গিলে ঢলঢল করছে, কখন এর গায়ে পড়ছে কখন ওর গায়ে পড়ছে। শিশুবালা তো সেসব 'দব্য' ছুঁয়েও দেখে না।

এদিক দিয়ে সমগ্র লোধাপাড়ায় সে প্রায় একা, স্বতন্ত্র। রাইবুই ত বলে বাবু-ভায়াদের বহুদের মতন তারমধ্যেও আ-নেক গুণ ছিল। কিন্তু থাকলে কী হবে, ঐ যে আঁটকুড়ি, ছা-ছানা নাই যে মেয়্যামানুষের তার আবার গুণের বিচার কী!

বুকটা মুচড়ে উঠল শিশুবালার। "আঁটকুড়ার আঠার মণ, বাঁজার যোল মণ।" আঁটকুড়ি, আঁটকুড়ি।

কাক্কী! নুকু ওরফে লক্ষ্মীরাণী।

হকচকিয়ে উঠল শিশুবালা। আয় মুনু আয়!

বুঢ়হাদ্দাদু কির'ন আছে কাক্কী?

ঐ একর'ম। আর খাচ্ছেও নাই, কথা ত নাই।

নুকু ঘুপচীর ভিতর ঢুকে গেল। গুড়ুপুট্‌লুর হয়ে পড়ে আছে গেঁড়াশবর। ঘরময় অসুখ অসুখ গন্ধ। হিক্কা তোলার আওয়াজ। ঘরের ভিতর বেশিক্ষণ থাকা যায় না, চোখেও দেখা যায় না।

তবু, তার মধ্যেই নুকু বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। যেমন করে ইস্কুলে নীরবতা পালনের সময় দাঁড়ায়।

পিছন পিছন এসেছিল শিশুবালা। সে ফিস ফিস করে বলল, পাকা ফল ত, টুঙ করে কখন খসে পড়বে! কথায় বলে নাই, "বুড়া লোক আর লদীধারের গাছ।"

ফ্রকের তলাটা ঝট্ করে মুখে তুলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল নুকু।

দুজনের কেউই কিছুক্ষণ কথা বলল না।

শিশুবালা বলল, গেছিলি?

কোথায় কাক্কী?

সাব্বিদের ঘরে?

হঁ, এই ত আসছি।

কী দেখলি? গুড়খা আছ্‌ছে? ন, সে-ও গেছ্‌ছে জঙলে?

কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করে নুকু বলল, মনে ত হয়-নাই। সাবিত্রী বিটিই ত ফরফরাঁয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসছে।

খালভরি! গাল পেড়ে উঠল শিশুবালা, এতগুলা লোককে বিপদের মুখ্‌খে ঠেলে দিয়ে এখন ত সে হাসবেই। হঁ, হাসবে নাই?

রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে বলল, আসুক লোকগুলা জঙ্গল থিক্যে, তারপর তোদের হব্বেক।

শিউরে উঠল নুকু। —তারপর কী হবে, কী হবে কাক্কী, মারামারি নয় ত?

দ্যাক ন, কী হয়।

আমি কিন্তু জানতাম কাক্কী।

কী?

কাল যে সন্তোষকুম্‌হার রাত করে আসবে।

শিশুবালা বলল, ঐ ঢঙ্গীই তোকে বলেছিল বোধায়?

হঁ।

আচ্ছা নুকু, ঐ বেধুয়া কুম্‌হারটাকে যখন চিহড়লতে বাঁধল, শুধু বেন্ধেই রেখেছিল, মারে নাই ধরে নাই, তখন কুম্‌হারপাড়ায় কে খপ্পরটা দিল? কে? জানল কী করে কুম্‌হাররা?

হঁ, তাইত।

চিন্তায় পড়ে গেল নুকু।

চিন্তা-টিন্তার ধারে-কাছে গেল না শিশুবালা। বলল, আমার ত মনে হয় ঐ সাব্বিই—সাব্বিই খপ্পরটা দিয়েছে।

নাই কাকী, অতরাতে সাবিবিটি যাবে কুম্‌হারপাড়ায় একলা একলা?

হঁ হঁ, যাব্বে। এম্নিতেই তল্লাট ঘুরে বেড়াচ্ছে একলা একলা, এলতলা-বেলতলা, রাত নাই দিন নাই যখন-তখন। আর নিজের নাঙ্ ফান্দে পড়েছে, বগা ফান্দে পড়েছে, তখন খপ্পর দিতে রাত-ভিত, তার আবার ধুরে-কাছে। জানলি মুনু, ঐ ঢঙ্গীই গেছিল বলতে। পাণনাথের পাণ বাঁচাতে।

মাথা নেড়ে নুকু বলল, হতে পারে।

ফের চুপচাপ কিছুক্ষণ।

কুল্‌হি দিয়ে আসতে আসতে দেখলি কী, জঙ্গল থিক্যে কেউ কী ফিরে এসেছে?

নাই দেখি, মনে ত হয়—এখনও কেউ ফেরে নাই।

গেঁড়াশবরের হিক্কার আওয়াজটা এসময় খট্ করে কানে লাগল। দৌড়ে গেল শিশুবালা। তার পিছ্ন পিছ্ন নুকু।

না, এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এখনও শ্বাস আছে। আঙুলে করে টপা টপা জল দেওয়ার চেষ্টা করল শিশুবালা। সে-জল ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কেঁদে ফেলেছিল নুকু। কাঁদুল-মাদুল শিশুবালা বলল, মুনু, এখন আমি কী-ই যে করি, কুথাকে যে যাই, কুথা থিক্যে যে তোর কাকাকে ডেকে আনি!

আনচান করছে শিশুবালা।

তবু তার মধ্যেই বনে যাবার সংকল্প করল সে। বনেই যাবে। বন ঢুঁড়ে সে রাইবুকে ডেনে আনবে। যার গয়না তাকে সাজে।

হ্যাঁ, বনে সে এখন যেতেই পারে, যদি নুকু তাদের ঘরে থাকে। নুকু, নুকু। ঐ টুকু তো মেয়ে, একদম কাঁচা ফল। সে পাকাফলটার কাছে থেকেই বা কী করবে? মুখে জল দিতে গেলেও তো তার হাত কাঁপবে।

তাছাড়া মরার সময়, মৃত্যুকালে, লোকটা ঘরের লোকের কাছ থেকে একফোঁটা জলও পাবে না? নিজের বেটার কাছ থেকে একমাত্র পুত্রের হাত থেকে এতটুকু জলও পাবে না? এম্নি এম্নি টাক্‌রা শুকিয়ে মরে যাবে?

সাত-পাঁচ ভেবে শিশুবালা ঘর থেকে নড়ল না।

নুকুকেই বলল, দ্যাক্ ত মা, তোর কাকা আসছে কী নাই।

একটু-ঘুরে ফিরে এসে নুকু বলল, কই কাকী, কাউকেই ত দেখছি নাই।

একটু পরেই।

আচ্ছা, দ্যাক ত রে মা, কুচলাগাছে একটা ডাঁড়কাক বসে আছে?

নুকু বাইরে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে এসে বলল, কই কাকী, দাঁড়কাক কেনে এম্নি কোনো পাতিকাকও ত বসে নাই।

বসে নাই? তবে যে ডাক শুনলম!

ও তোমার মনের ভ্রম কাকী। আর ডাকলেই বা কী হত? বনের পাখি বনে-জঙ্গলে ডাকবে নাই?

শিশুবালা হৈ চৈ করে বলল, নাই মা, ডাঁড়কাক ডাকা খারাপ। ডাঁড়কাক ডাকলে মনে জানবি—একটা কিছু খারাপ খপ্পর আসছে।

ধুর, ওসব কুসংস্কার!

কী কার মুনু, কী-ই কার বললি?

লজ্জায় কথা ঘুরিয়ে নিল নুকু, কুসংস্কার অতবড় কঠিন কথা কী শিশুকাকী বুঝতে পারবে? ছোট করে বলল, ভুল কথা।

নাই নুকু, নাই। তোকে বলি, পেটে দু'দাগ কালির জল যেত্তে নাই যেত্তে ধরাকে সরা জ্ঞান করিস নাই। শাস্তরের কথা উসব কখনও ভুল হয়?

ঘাবড়ে গিয়েছিল নুকু, হ্যাঁ তাই তো, তার তো অল্পই বিদ্যা। এই নিয়ে অহঙ্কার চলে না। শাস্ত্রের কত কী এখনও তার অজানা, পুঁথিপত্রের পুরাণ শাস্ত্রের কোথায় কোন্ পাতায় কোন্ গলি-ঘুঁজিতে চাপা পড়ে আছে কত কী অমূল্য কথা, তার কতটুকুই বা সে জানে, তার তো কত কিছুই এখনও অনাবিষ্কৃত। বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরা এখনও সেটুকু জানতে পারল না, আর সে তো নুকু!

কিছুক্ষণ বাদে সে মানে মানে সরে পড়ল।

যেতে যেতে তার মনে হল, এই তো কিছুদিন আগেও একটা পাখি নিয়ে, পাখির ডাক নিয়ে কী হৈ-চৈ, কী হৈ-চৈ লোধাপাড়ায়! কী র'ম যেন পাখিটা ডাকত—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! উ-ল-টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ! ডাক শুনে লোধাপাড়ার তাবড় তাবড় মানুষরা দুহাত জড়ো করে নমো করত। কই, এখন তো সে-ডাক আর শুনি না?

ভাবতে না ভাবতেই দূরের মাঝুড়ুব্‌কায় আঁটারি-চুরচু করঞ্জ-কইমের লহ লহ ডগা কাঁপিয়ে পাখিটা ডেকে উঠল, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! উ-ল-টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ!

নুকু দৌড়ুতে লাগল। দৌড়, দৌড়। দু হাত জোড় করে বুকে ঠেকিয়ে নুকুও কী নমো করল?

ঠিক বোঝা গেল না, কারণ এসময়ই আরেকটা হৈ-হৈ রব উঠল লোধাপাড়ার ওদিকটায়, দোরখুলির বুলানের দিকে। ন্যাঙটা-ভুটঙ সাধের কুটুমরা, ধাঙড়ী ধাঙড়ী মেয়েরা, বউড়ীরা, বুড়িরা দৌড়ে দৌড়ে দোরখুলির বুলানের দিকে গেল।

গেল তো গেল।

অ রে কী দেখতে যাচ্ছিস, কী-ই?

দৌড়াতে দৌড়াতে কেউ বলল, বলব কেনে? কেউ বলল, এখনও জানি নাই, জানতে যাচ্ছি। কেউ বলল, আগে দেখে আসি, পরে বলব।

ফিরে এসে তার জবাবে সে বলল, সান্তালপাড়ার একজন খড়কুটার বান্দর লিয়ে খেলাতে যাচ্চে। খড়ের বান্দরটার গলায় আবার একটা ঘুঙুর বান্ধা—হি হি!

পরক্ষণেই সে হতাশ হয়ে বলল, আমাদের পাড়ায় সে ঢুকল নাই!

লোধাপাড়ায় সে ঢুকবে না—সে তো জানা কথা। 'সহরায় পরবে'র মাগনে বেরিয়েছে সে, ছো নিয়ে। ছো দেখিয়ে লোধাপাড়ায় কার ঘর থেকে সে 'মাগনা' কী পাবে?

মেঙে খাবার অবস্থা যাদের, তারা আবার কেউ মাগনে এলে হাতে তুলে কী দেবে? তার উপর লোধারা তাদের ঘরের 'সিধা' হাতে তুলে দিলেও সাঁওতালরা সে-সিধা হাতে করে নেবে কী?

নেবে না, নেবে না।

বামনারাও তো গামা-পূর্ণিমায় হাত ভরে, কনুইয়ের খাঁজে ঝুলিয়ে, চটের থলি করে গাদা গাদা পৈতা দেখাতে দেখাতে ঐ রাস্তা দিয়েই যায়, লোধাপাড়ায় তারাও তো ঢোকে না। পয়সা দিয়ে লোধাপাড়ায় আবার পৈতা কিনবে কে?

তাছাড়া পৈতা মাগনা দিলেও সে-পৈতা লোধারা গলায় ঝোলাবে কী? ঝোলাবে না, ঝোলাবে না। কারণ বামনার চেয়েও লোধারা যে বড়, বামনারা তো সম্পর্কে তাদের জামাই, জামাই।

শিশুবালার মনে এল অন্য কথা, কুম্হারপাড়ার লাগোয়া সাঁওতালপাড়ার কেউ যদি খড়ের বাঁদর নিয়ে এদিক দিয়ে মাহাতোপাড়ায় যায়, তবে তাকে ডেকে অন্তত বিড়ি-তামুক খাওয়াতে হবে। বিড়ি-তামুক খেতে দিয়ে কুম্হারপাড়ার মনের কথাটা জেনে নিলেই হয়।

ঘরে একলা রোগীকে ফেলে কিছুদূর দৌড়েও গেল শিশুবালা।

গতকাল রাতে কুম্হারঘরের ছোঁড়াকে লোধারা লতায় পাতায় বেঁধে রেখেছিল। ছেড়েও দিয়েছিল বটে, তবে বেঁধে তো রেখেছিল। তার প্রতিশোধ নিতে আজ তারা কী কী করছে? কাল রাতেই তো হরি করতে করতে একবার ঢুকে পড়েছিল জঙ্গলে। প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরেও গিয়েছিল, হয়ত পরবের দিনটায় হুজ্জুতি করতে চায়নি বলে।

পরবের এই দুদিন কেটে গেলে তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না—তাই বা কে বলেছে?

উঠবেই উঠবে।

কিন্তু কিছুদূর গিয়ে কী ভেবে ফিরেও এল শিশুবালা। আর এই করে সে দুপুর কাটিয়ে বিকেল করে দিল ঘরের নাচ-দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

দূরের দূরের গ্রামে, কাছে পিঠের গ্রামে, মাঝে মাঝে দুয়েকটা পটকা ফাটছিল। জঙ্গলেও দু-চারজন মানুষ যখন-তখন কথা বলে উঠছিল। তারা কারা? কারা?

দুয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল থেকে থেকে। কোনো নতুন অচেনা লোক কী বুলানের ধারে দোরখুলির রাস্তা দিয়ে আসছে যাচ্ছে?

দৌড়ে দৌড়ে ঘরের বাইরে রাস্তায় এসে ঘনঘন দাঁড়াচ্ছিল শিশুবালা। কপালে হাত ঠেকিয়ে অনেকদূরের রাস্তায় চোখ রাখছিল।

না, কেউ তো নয়।

আড়বেলার দিকে কুম্হারদের কাম্হারদের মাহাতোদের ভূমিজদের ঘরে ঘরে খলায়-খামারে তুলসি-চৌরায় গোবর লেপে দিয়ে আবার যখন আঁকা হচ্ছে গুঁড়ির আলপনা, জ্বালানো হচ্ছে গুঁড়ির প্রদীপ, ঘিয়ের প্রদীপ, গরুগুলো একে একে আঁকা-আলপনার খাঁজে খাঁজে রাখা ঘাসে মুখ দিতে দিতে ঘরে ঢুকছে, গোহালঘরে, বাগালছেলেরা 'অ বে হিঁ-ন হ' বলে বলে গরু খেঁড়াচ্ছে, ধুলোয় ধোঁয়ায় যখন গেবে যাচ্ছে গাঁ-গেরামের কুলহিরাস্তা, তখন, চতুর্দিক দেখেশুনে, গেল-রাত-আজকের সকাল-দুপুর-বিকেলেও কিছুই হয়নি দেখে একে একে লোধাপুরুষরাও ঘরে ফিরছে। ঝুপ ঝুপ করে গাছ থেকে লাফ দিতে দিতে লাটা-পাটা থেকে ভুসভুস করে বেরোচ্ছে।

সারাদিন তারা বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে কী যে খেল! এখন তো গ্রীষ্মও নয়, ঝড়িয়া-বর্ষাও নয়, কেঁদ-ভুড়রু-ভেলা-বাদভেলার পেকে-ওঠার মরসুমও নয় যে পেড়ে খেয়ে নেবে।

তবে খুঁজলে-টুঁড়লে এখনও কী দু-চাট্টা ফলমূল পাওয়া যাবে না? সেই হয়ত খেয়ে নিয়েছে। ঘরে ফিরে এখন যে যার বউয়ের উপর তড়পাচ্ছে।

কেউ গাবুরগুবুর আগে তো খেয়ে নিচ্ছে, তারপর না হয় গড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেবে। ঘুমোবে। সারারাত 'জাগত' গেছে, সারাদিন বসে থেকে হাতে পায়ে ঝিম্ ধরেছে, কিন্তু ঘুম কোথায়? ঘুম তো আসেনি। যেই ঘরে ঢুকল, পেটে একটা কিছু পড়ল, অমনি ঘুম জড়িয়ে এল দুচোখে।

শুধু একা ঘুমোলে তো হয় না, পাশে নিয়ে জড়িয়ে ধরতে চায় বউকেও। কিন্তু বউয়ের বলে এখন কী ঘুমোবার সময়? তার এখন কত-অ কাজ! ছুতো করে সে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এটা-ওটা আনবার ছল করে এদিক-সেদিক চলে যায়। ধরা আর কিছুতেই দেয় না।

কেউ কেউ গায়ের জোর খাটায়, তড়পায়। একলা ঘর হলে টেনে-টুনে বিছানায় নিয়ে আসে। বউও তেমন, হাসতে হাসতে ঢলতে ঢলতে এসে বিছানায় পড়ে নিথর হয়ে যায়।

রাইবুর দুচোখে ঘুম নেই, চোখদুটো যেন জ্বলছে। সে প্রথমে ঘরে এসেই তার অসুস্থ বাপকে জড়িয়ে ধরল। 'বাপ বাপ' বলে ডাকল। এখনও শ্বাস আছে। তবে কোনো সাড়া নেই, কণ্ঠা পড়ে যাচ্ছে।

কণ্ঠা পড়ে যাচ্ছে, কণ্ঠা পড়ে যাচ্ছে।

রাইবু এখন কী করবে—ভেবে পাচ্ছে না।

বউ শিশুবালা জড়িয়ে ধরে আছে রাইবুকে, রাইবু জড়িয়ে ধরে আছে তার বাপ গেঁড়াশবরকে।

এইভাবে কিছুক্ষণ তারা জড়িয়ে পড়ে থাকল। গেঁড়াশবরের মধ্য দিয়ে একটা জন্ম শেষ হতে চলল, আরেকটা জন্ম থেকে গেল রাইবুকে জড়িয়ে। দুটো জন্ম বড়জোর দু-পুরুষ। কিন্তু তারপর?

তারপর?

রাইবুকে জড়িয়ে ধরে শিশুবালা ভাবছে, ফুল ছাড়া লতের আর কী দাম! দাম নেই তো সেই লতের জন্মই বৃথা।

রাইবুকে সে কিছু দিতে পারেনি। কিন্তু রাইবু তাই বলে তাকে কী কোনোদিন অনাদর করেছে? সে এক-আধদিন। কার সংসারেই না অমন এক-আধদিন দুর্ঘট ঘটে!

সোমবারিটা ছিল। ছেলের ঘরে না হোক, থাকলে মেয়ের ঘরেও তো মেয়ে কিংবা ছেলে হতে পারত। হতে পারত, হতে পারত। একটা বংশের লতা চলত, চলতই, থামত না।

কিন্তু সে-ও যে কোথায় গেল? কোথায় হারিয়ে গেল? রাইবু ঝরে গেলে গেঁড়াশবরের বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না।

রাইবুকে কতদিন বলেছে শিশুবালা, আরেকটা 'বেহা' করতে। রাইবু রাজি হয়নি। বলেছে লোধাপাড়ায় এত ছা-ছানা আছে, তাদের দ্যাখো। তাদেরকে নিজের ছানাপোনা বলে ভাবো। নুকু আছে, তাকে দ্যাখো। লোধাদের সে মুখ রাখবে। রাখবেই রাখবে।

বাপের ঘর থেকে বেরুলে রাইবুকে খেতে ডাকল শিশুবালা।

রাইবু বলল, ডাঁড়াও, টুকচার আসি।

ধ্বক করে উঠল শিশুবালার বুক! এই তো সারারাত সারাদিন ছিল জঙ্গলে জঙ্গলে। আবার 'টুকচার আসি' বলে কোথায় যাচ্ছে রাইবু? মারামারি করতে কী? গুড়খার সঙ্গে?

শিশুবালাও পিছু পিছু চলল।

থমকে থেমে এমন চোখ করে তাকাল রাইবু যে, শিশুবালার হয়ে গেল। সে মাথা হেঁট করে ঘরের দিকে ফিরে এল। এই হাঁ হাঁ মরদকে এখন থামাবে কে?

কে জানে কী করে বসে! লোকে তো বলে তার একটা চোরাই বন্দুক আছে। কিন্তু শিশুবালা কোনোদিন চোখের দেখাও দেখেনি. রাইবু তাকে দেখায় নি।

সেই বন্দুক আনতেই রাইবু চলল কি? বন্দুক এনে গুড়খাকে গুলি করে দেবে রাইবু? একটা খুনোখুনির কাণ্ড ঘটে যাবে? কাঁদুল-মাদুল হয়ে ফের ঘরের বাইরে চলে গেল শিশুবালা।

সে রাইবুর কাছে গেল না, গেল ফুলটুসির কাছে।

দিদ্দি, বাঁচাও!

কী হয়েছে বহিন, কী?

সব শুনে হামলে পড়ল ফুলটুসি। যা করা উচিৎ তার থেকেও বেশি করল। সারা বুক ডলে দিল, পিঠ ডলে দিল।

বলল, কান্দিস নাই বহিন, কান্দিস নাই। হামি দেখছি।

বলেই সযত্নে তাকে ঠেলে সরিয়ে রাইবুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল ফুলটুসি।

নুকু, অতটুকু মেয়ে, অবাক হয়ে বড়দের কাণ্ড দেখছিল। সে তো ছোট, তার বাদ-প্রতিবাদ তো এখানে ভেসে যাবে খড়কুটোর মতোই।

পথ আগলে রাইবুকে আঁকড়ে ধরল ফুলটুসি।

ছাড়-অ।

নাই, ছাড়ব নাই। দুহাতে সামনা-সামনি রাইবুকে জড়িয়ে ধরে আছে ফুলটুসি। কতদিন এমনি করে জড়াতে চেয়েও জড়িয়ে ধরতে পারেনি ফুলটুসি। আজ কী করে যে কাঁকড়ার মতো জড়িয়ে ধরল সে রাইবুকে।

না, সে ছাড়বে না।

রাইবু বলল, আচ্ছা মুস্কিল ত, যাচ্ছি কামে, ছাড়-অ।

কী কামে?

রাইবু বুঝে গেছে শিশুবালাই তাকে পাঠিয়েছে, তাই ফুলটুসি অত জোর পেয়েছে, অত জোরে জড়িয়ে ধরেছে।

আচ্ছা ভালা দেখি ন—সেদিন কুম্‌হারপাড়ায় আমাদের মধ্যে কে যেঞে খপ্পরটা দিল?

সে পরে দেখলেও হবে, আগে ত ঘরকে চল-অ। খাবাদাবা কর-অ! রাদ্দিন খাবাদাবা নাই।

তাই তো খাওয়া হয়নি রাইবুর! না খেয়ে অর্দ্ধেকটা রাত সারাটা দিন কেটে গেছে!

কিছুটা নরম হয়ে সে বলল, যাচ্ছি, ছাড়-অ!

নাই, আগে ত চল-অ।

হেসে উঠল রাইবু, কী মুস্কিল! তর্‌হা কী আমাকে এইর'ম আঁকড়ে ধরে লিঞে যাবে? লোকে দেখলে কী বলবে?

যা বলে বলুক।

রাইবু দেখল ভুবনবউ মরীয়া, আজ সে তাকে কিছুতেই ছাড়বে না। জোর পেয়েছে, শিশুবালার জোর। ফুলটুসির সঙ্গে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কিছুটা বাড়ির দিকে ফিরেও এল সে। তখন তাকে ছেড়ে দিল ফুলটুসি।

যেন উপদেশ দিয়ে বলল, অত মাথা গরম করলে চলে? যার হুজ্জত সে পোহাক। আমাদের অত্ত কী?

চুপচাপ শুনল রাইবু, মান্য করল ফুলটুসিকে। তারপর বলল, আচ্ছা বেশ, তর্‌হা যাও, আমি একটু শরাবণ-শতুরাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে আসি।

এখন লয়, পরে পরে। দাবড়ে উঠল ফুলটুসি।

শিশুবালার ওজর-আপত্তি এড়াতে পারলেও ফুলটুসিকে যেন এড়াতে পারছে না রাইবু। লোধাদের মধ্যে আর কেউ কী তাকে অমন করে আটকাতে পারবে?

হ্যাঁ, পারত আরেকজন—সে সোমবারি। সোমবারি, সোমবারি।

তার কথা থাক, ভুবনবউ কোত্থেকে এত শিখল, এমন মধুর কথা বলবার মন পেল সে কোত্থেকে?

তার মেয়েটাও হয়েছে তেমন, তেমনি ব্যবহার, গুড়ের মতন মিঠামিঠা কথা। মেয়েটা বড় হলে তাকেও অমান্য করতে পারবে না রাইবু।

কেমন রাজা-রাজা ভাবটা এসে যাচ্ছে এখন রাইবুর ভিতর। শব্বররাজা। হাতির পিঠে চড়ে হলতে-ঢলতে যাচ্ছে—হুই দ্যাক্ শব্বররাজা! নমো কর, নমো কর!

দুধারের লোধাজনমানুষ নমো করছে, কপালে জোড়-হাত ঠেকিয়ে। রাইবু যেন হাত তুলে বিড়বিড় করে কী সব বলছে—কী বলছিলম মনে নাই ন, হুঁ।

ফুলটুসির আগে আগেই ঘরে ফিরে এল রাইবু। শিশুবালা খাবার নিয়েই বসেছিল, রাইবু খেতে বসল।

চেঁচামেচিটা উঠল রাইবুর ঘরের দিক থেকে নয়, শরাবণ-শতুরা-গুড়কুঁদা-গুড়খার ঘরের ওদিক থেকেই।

গুড়খা-ই চিৎকার করছিল বেশি।

কুন্ শালা বলে রে আমি খপ্পর দিয়েছি? আর যদি দিয়েই থাকি ত বেশ করেছি, ভাল করেচি, মাত্‌বরি? একটা কিছু করে দেয়ার মুরাদ নাই, তার আবার মাত্‌বরি!

শরাবণ-শতুরারা বলাবলি করছিল, পরবের দিনদুটায়, কুটুমবাটুম এসেছে লোকের ঘরে, এসময় হুরি করে পরবটা মাটি করা কী ভালো?

নাই, নাই। ভালো বা কে বলছে? কেউ ত বলছে নাই।

তবে এত্ত হুরিজুরি কেন্নে? যা ঘরে যেঞে ঘুমা।

লোধাপাড়া ঘুমিয়ে পড়ল। ধুস, অত সহজে ঘুম কী আসে? ঐ বড়জোর যারা জেগেছিল, তারা শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ে না ঘুমিয়ে ভাবল, হ্যাঁ তাই তো। ঘরে দূরদেশ থেকে লোকজন এসেছে, কুটুমবাটুম এসেছে। তারা তো পরব দেখতেই এসেছে। তাদের এসময় গণ্ডগোলে জড়ালে কী ভাববে?

তাই তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে আবার একটা সোরগোল উঠল। উঁ-হু, তাহলে এতরাত অবধি অনেকেই ঘুমোয়নি। ভাগে ভাগে জেগে বসে আছে। এখানে-ওখানে তারা শলা-পরামর্শ করছে। কাল কী হবে?

অতবড় গরু-খুঁটা পরব গোঠটাড়ে। গরু-খুঁটা, কাড়া-খুঁটা। কত দূরদূর থেকে গরু নিয়ে কাড়া নিয়ে আসবে লোকজন। পরবের পরব সেরা পরব তো বাঁদনার গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা।

সাঁওতালনাচ হবে, পাঁতানাচ হবে, গরু-পঁড়ার নাচ হবে, পৈড়ান-ওঠানোর মতো মজাদার খেল্ হবে, আরো কত হুরি হবে, হুরি বলতে হুরি—আর সেসব দেখতে লোধাপাড়ার মেয়েরা, দূরদেশ থেকে আসা কুটুম-বাটুমরা, গোঠটাড়ের মাঠে যাবে না?

যাক, যাক। বচ্ছকার দিন, মানা কর-অ নাই।

আর যদি কিছু ঘটে?

কী-ই ঘটবে?

যদি ধর-অ, কাউকে আটকে রাখে?

কাকে আটকাবে? আমরা পুরুষরা ত যাচ্ছি নাই, যাচ্ছে মেয়্যারা।

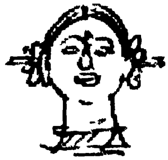
যদি মেয়্যাদেরই আটকায়?

হুঁ, অত্ত সস্তা?

যদি ধর-অ, সাবিত্তিরিকেই আটকায়?

আটকাক। স্ব-ইচ্ছায় কেউ যদি যেত্তে চায় ত যাক। তুঁই অত্ত মাথা ঘাম্‌মাস নাই রাইবু।

ন্নাই, আর ঘামাব নাই। জানব সম্বারি গেছে, সাবিত্তিরিও যাক।



গোঠটাঁড়ে মাইক বাজছে।

মাইকে ঘন ঘন ঘোষণা করা হচ্ছে 'গরু-খুঁটা' 'কাড়া-খুঁটা'র কথা।

সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে এক বিরাট ফুটবল প্রতিযোগিতার কথাও।

বাঁদনা পরবের আজকেই তো মহারণ।

গোঁঠটাঁড়ে, এতদিন যেখানে গরুগুলো গোচারণে যাবার আগে বসে বসে জাবর কাটত, গোবরের নাদি ফেলত, গোচারণ থেকে ঘরে ফেরার আগে 'গিন্‌তি' হত, আজ সেখানে তারা খেলবে, খেলতে খেলতে ধুলো ওড়াবে।

গোঠটাঁড়ের ধারেই ফুটবল খেলার মাঠটার 'আউটলাইনে' আজ লাল-নীল হলদে-সবুজ কাগজের ফুলঝুরি, বাবুইদড়িতে লটকে পত্‌পত্‌ করে ঝুলছে।

লোকজন এরমধ্যেই জমতে শুরু করেছে।

বিরাট ফুলবল ম্যাচটি যে হবে তা কিন্তু একদিনের। একদিনেরও নয়, মাত্র নব্বই মিনিটের। প্রতিযোগী দু'দলের নাম—কুমোরপাড়া 'শক্তিসংঘ' বনাম মাহাতোপাড়া 'অগ্রগামী'।

এককথায় গোটা কুম্‌হারপাড়া ভার্সেস মাহাতোপাড়া।

যে-দল জিতবে শীল্ড হিসাবে সে পাবে দু-দুটো খাসি আর যে-দল হারবে কাপ হিসাবে তারা পাবে একটা ভেড়া।

ঐ খাসি আর ভেড়ার লোভে সমগ্র কুম্‌হারপাড়া মাহাতোপাড়া ঝেঁটিয়ে মাঠে আসবে না?

সাঁওতালপাড়ার লোকজনও এসে পড়েছে। সেজেগুজে নাচবার জন্য কোত্থেকে যে আসছে এত সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষের দল! এত ধাম্‌সা-মাদল! সুখজুড়ি-টটাসাহি-ভালিয়াঘাটী—কাছের কাছের গ্রাম থেকে সাঁওতাল জনমানুষ তো আসছেই, আরো দূর দূর গ্রাম থেকেও কুটুম্বিতায় গোঠটাঁড়ে সকাল সকাল এসে পড়েছে।

তারা মাঠের একধারে বসে এখন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, নাচ-গান এখনও শুরু হয়নি।

গোঠটাঁড়ে এখনও একটা গরু কী একটাও কাড়া-পঁড়া আসেনি। এখনই আসবে কী? যারা আসবে তারা তো এখন 'সাজঘরে' সাজ দিচ্ছে, যেমন করে যাত্রাদলের 'সাজঘরে' রামেশ্বর কী প্রফুল্লছোঁড়া মুখে-বুকে পাউডার ঘষে বৃন্দা কী রাধা সাজে।

কুম্‌হারপাড়ার ভৈরবকুম্‌হারের একটা গরু আজ খেলবে। সকাল থেকে তাই তার পিছনে লেগে আছে সন্তোষ। বিরিডালের ভুসি কুরথিডালের ভুসি 'তাড়ে' গুলে খাওয়াচ্ছে তো খাওয়াচ্ছে।

তার উপর ভোর ভোর গিয়ে জলার ধার থেকে কেটে এনেছে শ্যামাঘাস, বাঁশপাতৃরি

ঘাস! গরুটার মুখের সামনে তারও ক 'মড়' খুলে দিয়েছে।

এত খাবার একসঙ্গে? গরুটা তো হামলে পড়ে খাচ্ছে। ভৈরবকুম্হারদের বাগালছোঁড়াটা তারমধ্যেই গরুটার লেজ মুচড়ে মুচড়ে ঘন ঘন দেখছে—'রাগ' বাড়ছে কেমন? রাগ না থাকলে, রাগ আরো না বাড়লে গরুটা ভালো খেলবে কী করে?

লেজ-মোচড়ানোর ফলে গরুটা খেতে খেতেই লাফিয়ে উঠে পিছনের দু'পায়ের কারসাজি দেখাচ্ছিল বটে, আর তাতেই খুশি হয়ে বাগালছোঁড়া গরুটার পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছিল, অ-বে-হিঁ-ই-ই-ন-হ! অ-বে-হিঁ-ই-ই-ন-হ!!

সন্তোষের পারুলবিটির ছেলে নিবারণও গরুর 'সাজঘরে' এসে জুটেছে। এটা তো তারই মামাঘর, পরবের দিনটায় 'হাউস' করতে সে তো আসবেই আসবে।

গুচ্ছের গাঁদাফুল আর নাড়াসমেত শালুকফুল সে তুলে এনেছে। তাই দিয়ে সে মালা গাঁথছে, মালা গাঁথছে আর মুচকি হাসি হেসে বিড়বিড় করছে, "লধা লিল কুড়ারটা, লধানী লিল ঝড়া..."

ঐ একই লাইন বারবার 'রিপিট' করে যাচ্ছিল নিবারণ, আসলে সে তার মামাতো দাদা সন্তোষের কানে কথাটা তুলতে চায়, তুলে 'লধা-লধানীর' প্রসঙ্গ আছে বলেই একটু মজা করতে চায়।

কিন্তু সন্তোষ মজে আছে অন্য কাজে। মাটির ভাঁড়ে নানারকম রং গুলেছে—কোনটা গেরুমাটির, কোনটা আলতা-ঢালা। মাটির উনুনে ফুঁ-দেওয়ার 'ফুঁক-নলি' রংয়ের ভাঁড়ে চুবিয়ে সে-নল গরুর গায়ে চেপে ধরছে সন্তোষ, আর ধীরে ধীরে গোল গোল ছাপে গরুর সারা গা ভরে যাচ্ছে।

একে সাদা গরু, তার উপর সারা দেহে নানা রংয়ের গোল ছাপ—গরুটার বাহার খুলে যাবে না রূপের? আর সে রূপের ভিতর মজে আছে তো সন্তোষ, নিবারণের বিড়বিড় করে বলা কথা তার কানে এখন ঢুকবে কেন?

কথাগুলো সন্তোষের কানে না ঢুকলেও, আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা কুন্তলার কানের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতর গিয়ে আছড়ে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ সে সামনে হাজির হয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কী বলছ গুনগুন করে? জোরে বল-অ, আমরা পাঁজ্জনাও শুনি, হঁ।

নিবারণ এবার সরব হয়ে জোরে জোরে গাইতে লাগল, "লদ্ধা লিল্হ কুড়হারটা, লদ্ধানী লিল্হ ঝড়া..."

দুহাতে একবার মাত্র তালি ঠুকে কুন্তলা বলল, তারপর? তারপর? লদ্ধা-লদ্ধানী কী ঝড়া-কুড়ার লিঞে আলু তাড়তে গেল, ন মাটিখানায় মাটি খুঁড়তে?

নিবারণ বলল, তুমি যেমন বউদিদি, কুড়ার দিয়ে কি মাটি কাটা যায়?

যায় যায় লিবারণ দেওর, লদ্ধা-লদ্ধানীর কেরামতি থাকলে কুড়ার কেনে, হাত দিয়েও মাটি কাটা যায়। এখন হাম্দের লধা উদের লধানীর হাতে ঝড়া-কুড়ার ধরাঁয় দিলেই হয়।

তাই দেও, বউদিদি, তাই দেও। আজ গোঠটাড়ে, গরু-খুঁটা দেখতে এলে লধানীকে আটকাও। চিহড়লতা না পাও গরু-খুঁটা বরহই দড়া দিয়েও ত বাঁধতে পার?

হাসতে হাসতে কুন্তলা বলল, দড়িদড়া নাই লাগবে দেওর, লোধানীকে প্রেমডোরেই বেন্ধে রাখব।

কীর্তনে ঝাঁপান দেওয়ার ভঙ্গিতে নিবারণ এবার গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল,

আর ছাড়ব নাগো, প্রেমডোরে এবার বেঁধে রাখিব
কালা এলে আর ছাড়ব না গো...

ধ্যা-ত্তে-রিকা! কী যে হয়ে গেল সন্তোষের! ফুঁক-নলির যে দিকটা রংয়ের গাড়ুতে চোবালো, সেইদিকটা গরুর গতরে না মেরে মারল কী না উল্টো দিকটা? ছাপ তো পড়লই না, উল্টে উপরদিককার রং গড়িয়ে এসে হাতে লাগল। হাতের চেটো মুহূর্তে গেবে উঠল।

কুন্তলাবউদিদি এসেই আগাপাশতলা গুলিয়ে দিল সন্তোষের, তার উপর তুলল লধা-লধানী তারমানে সাবিত্রীর প্রসঙ্গ। দু'য়ে দু'য়ে চার হতে আর বাকি কী?

তার উপর সে এমন ভাব করে হাসল, এমন ভঙ্গি করে দাঁড়াল যে, সন্তোষের কোথায় যেন কী যেন রটরট করে ভেঙে গেল!

আর এসময়ই এল ভৈরব। সে গরুর সাজ দেখতে এল, আর মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে সরে পড়ল কুন্তলা। সন্তোষ বেঁচে গেল।

সন্তোষ বেঁচে গেল, সন্তোষ বেঁচে গেল।

ভৈরবকুম্হারের মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে যেন হাসছে। পারুলের ছেলে নিবারণ চুপি চুপি বলল, দ্যাক্ সন্তুষদা, মামা গরুর সাজ দেখে খুব খুশি মনে হয়, গোঁফের আড়ালে যের'ম হাসছে।

সন্তোষ বলল, হঁ হতেও পারে আবাব না-ও হতে পারে।

তার মানে?

মানেটা খুব সহজ নিবারণ, ভৈরবকুম্হার এখন পোস্তঢুলির নেশায় বিভোর, হাসছে না ভ্যাংচাচ্ছে একটুকুও বুঝতে পারবি নাই।

আব কুন্তলাবউদিদি?

ধড়াস্ করে উঠল সন্তোষের বুক—তবে কী এর মধ্যেই গাঁময় রটিয়ে বেড়িয়েছে কুন্তলা? যে, গরু চুমাতে গোহালে ঢুকলে সন্তোষ তাকে আঁকড়ে ধরেছিল জোর করে?

ফুঁক-নলিতে গরুর গা ছোপাতে ছোপাতে হাসন্ত নিবারণকে সন্তোষ বলল, হঁ, কুন্তলাবউদিদি আবার কি?

অত যে হাসছে, আর বলছে কী না—প্রেমডোরেই বেন্ধে রাখব—সত্যি সত্যি বলছে না, ঐ তোর ভ্যাংচাচ্ছে?

ভ্যাংচাক আর যাই করুক, কুন্তলাবউদিদিকে কে মানছে নিবারণ!

বলেই সে অবশ্য এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—ধারে কাছে কোথাও কুন্তলাবউদিদি আছে কী না। শুনলে সে কষ্ট পাবে। মুখে যতই বলুক 'কে মানছে', মনে মনে সন্তোষ তো জানে—সে কতটা মান্য করে কুন্তলাকে।

কালো ঝিলিমিলি শাড়ি পরে ঘরে ঢুকলে সন্তোষ দেখে—আকাশ জুড়ে অজস্র 'কারিকুরি পাখি' চলেছে একসঙ্গে একলাইন ধরে। লালপাড় সাদা খোলের শাড়ি পরে গরু চুমাতে এসে ভেলাপাতার দঁড়ে ধুনার আগুন জ্বেলে সে-আগুন শাড়ি গুটিয়ে পায়ের তলা দিয়ে গলালে সে তো হয়ে পড়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

আরো কত কী যে হয় সন্তোষের নিবারণ জানে না, কুন্তলাবউদিদিই কী জানে? জানে না, জানে না।

ঝপ্ করে প্রসঙ্গ বদলে সন্তোষ বলল, হৈল তোর মালা গাঁথা, নিবারণ? হয় যদি তো দে, আর, আর চাঁড় চাঁড় চল্ গোঠটাঁড়ে, উদিকে যে—

হেসে উঠে নিবারণ বলল, হঁ, উদিকে এতক্ষণ হয়ত লোধানী এসে পথ চেয়ে বসে আছে।

ধুর বোকা, লোধানী আসবে কী করে? তাকে যে মাত্‌বর রাইবু হাতে-পায়ে দড়ি দিয়ে বেন্ধে রেখেছে।

সন্তোষ বলল বটে, তবে চিন্তায় সে আকুল হয়ে পড়ল—যদি সত্যি সত্যি হাতে-পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে সাবিত্রীকে? ঘরের বাহির হতে না দেয়? তবে গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা দেখতে গোঠটাঁড়ে আসবে কী করে সাবিত্রী?

বচ্ছরকার পরব, লোধানীরা তো আসবেই, পাছু পাছু লোধারাও এমন কী রাইবুলোধাও না এসে পড়ে, তুই দেখিস সন্তুষদা।

সন্তোষকুম্হার সেই আশায় আশায় গরুটাকে দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে, তার পিছুন-পিছুন নিবারণ। সে মাঝে মাঝেই লেজ মুচড়ে গরুটাকে 'কাঠুয়াচ্ছে'।

গলায় গাঁদাফুলের শালুকফুলের মালা, ঘাঘরঝাল, কপালে কাঁচা-পাকা ধানের মৌড়, সারা গায়ে লাল-নীল-হলদে-সবুজের ছাপছোপ। ঠিক যেন এক 'বাসোয়াবলদ' যার পিঠের শিব থেকে বেরিয়েছে জটা, আর সে-জটা ছোট্ট একটি কাঁথায় ঢাকা।

'বাসোয়া বলদের' মালিক রাস্তা দিয়ে বলদটাকে নিয়ে চলেছে, আর রাস্তার দুধারের ঘরের মালিক, মালিকের ছা-ছানা, ঝিউড়ী-বউড়ীরা দৌড়ে দৌড়ে আসছে হাত-মুঠোয় পয়সা নিয়ে, পয়সা নিচ্ছে আর মাত্র একবার করে ছোট্ট কাঁথা সরিয়ে বাসোয়া-বলদের শিবের জটা দেখাচ্ছে গরুওয়ালা।

'বাসোয়া-বলদ' ছাড়া আর কোন্ গরু কবে এমন সাজ দিয়েছে এক বাঁদনা-পরব বাদে?

শুধু কী সন্তোষের গরুই গোঠ-টাঁড়ে আসছে? এ-পার ও-পার, সোল-পার, এ-পাড়া সে-পাড়া সব পাড়া থেকেই একের পর এক গরু আসছে, আসছে তো আসছেই।

মাঝে মাঝে কোথাও না কোথাও গরু-খেলোয়াড় বা ঢ্যাঙুআনদের মাদল বাজছে। সেই মাদলের আওয়াজ শুনে ভিড়কে উঠছে চলমান কোনো কোনো খেলুড়ে-গরু।

কোনো কোনো গরু আবার নির্বিকার, কোনোকিছুতেই তাদের হিন্দোল নেই। কোনো কোনো গরু তার কালো লম্বা জিভ কপালের দিকে যতদূর পারে ঠেলে দিয়ে মৌড়ের ধানগুলি খাবার বৃথা চেষ্টা করে চলেছে!

শুধু কী ছেলেরাই পুরুষরাই আসছে গোঠটাঁড়ের মাঠে গরু নিয়ে, গরুর পিছুনে পিছুনে? সার বেঁধে আসছে মেয়ের দলও। বুড়ো-বুড়ির দল, নাতি-নাতনী কোলে-কাঁখে করে, ঘাড়ে-মাথায় চাপিয়ে, হাতে ধরে হাঁটিয়ে-হুঁটিয়ে। গোঠটাঁড়ের মাঠে এসে কোলের-কাঁখের ঘাড়ের মাথারটাকে নামিয়ে রাখে। নিজেও সে বসে পড়ে, নচেৎ টাঁড়টা ঘুরে ঘুরে দেখে পোঁতা খুঁটিগুলো হাতে ঠেলে-ঠুলে পরখ করে দেখে—কতদূর শক্তপোক্ত।

গোঠটাঁড়ের মাঠে আজ যার যার গরু খেলবে তার তার খুঁটি পোঁতা হয়ে গিয়েছে দুদিন আগে থেকেই। বেশ শক্তপোক্ত খুঁটি, মাটিতেও পোঁতা হয়েছে প্রায় আধ-মানুষ গর্ত করে।

খুঁটি শক্ত না হলে খেলতে গিয়ে সে-খুঁটি গরুই যদি মচ্‌কে ভেঙে ফেলে, খুঁটি বেশি গর্ত করে পোঁতা না হলে খেলতে গিয়ে সে-খুঁটি গরুই যদি উপড়ে ফেলে দেয় তবে তো অনর্থের একশেষ!

ছাড়া পেয়ে 'বীর' গরু ভিড়ের ভিতর কাকে কখন যে 'টুঁসিয়াবে', কখন কাকে যে চেপ্টে দেবে—তার জন্য জরিমানা দিতে হবে গরুর মালিককে।

জরিমানা দিতে হবে খুঁটি ভাঙলে খুঁটি উপড়ালে, জরিমানা দিতে হবে খেলতে আনা গরু না খেললেও। এত ঢাকঢোল ধামসা-মাদল বাজাল ঢ্যাঙুআনরা, এতক্ষণ ধরে 'অহীরা' গাইল ঢ্যাঙুআনরা, মরা গরুর চামড়া নিয়ে গোব্‌রাসাঁওতাল এত যে নাচন-কুদন করল, গরুটার প্রায় শিংয়ের উপরই লাফাল-ঝাঁপাল, তবু গরু সেই যে গোঠটাঁড়ে এসে খুঁটির চারধারে ছড়ানো ঘাস খেতে শুরু করেছিল, তাই খেতে লাগল, একবারের জন্যও ঘাড় তুলল না—এমন গরুর বাবদ জরিমানা তো দিতেই হবে গরু-মালিককে।

আর সেই জরিমানার টাকায় ঢ্যাঙুআনরা খাবে মদ। অনেক খেয়েও তেষ্টা তাদের মেটেনি, খেতে খেতে তেষ্টা তাদের আরোই বেড়ে যায়।

বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে।

গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা দেখতে গোঠটাড়ে কুম্হারপাড়ার অনেকেই এসে পড়েছে। আসেনি কেবল একদল ছেলে-ছোকরা আর মাতব্বররা।

মাতব্বররাও আসবে। তবে তারা আসবে খেলা জমবার পর। এখনও তারা হরিমন্দিরে শীতলাতলায় জড়ো হয়ে 'শলা' করছে। গ্রাম চালাতে গেলে সমাজ চালাতে গেলে তিনমাথা এক করে তিনঠ্যাঙ জড়ো করে তাদের কত কী ভাবতে হয়, ভাবনাচিন্তা করে কত কী করতে হয়, আদেখলার মতো আগেভাগে গোঠটাড়ের মাঠে এলে তাদের কী চলে?

আর যারা পড়ে থাকল তাদেব বলে এখন কত কাজ! ছেলে-ছোকরার দল মেতে আছে 'পৈড়ান গাড়ায়'।

যে যার ঘরের সামনে শাবল দিয়ে বড় বড় গর্ত খুঁড়ছে, একমানুষ দু-মানুষ। আর সেই গর্তে নানান কায়দা করে পুঁতে দিচ্ছে 'পৈড়ান'।

লম্বা লম্বা বেনাঘাস মেয়েদের চুলের বিনুনীর মতো পাকিয়ে পাকিয়ে সে পৈড়ান তৈরি। চালাক ছেলেরা অতি চালাক ছোকরারা পাকিয়ে পাকিয়ে পৈড়ান তৈরি করেছে দশ-বিশ হাত। তারপর ইঁদুরের মতো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পৈড়ানের গোড়া বেঁধে দিয়েছে নিকটবর্তী কোনো শক্তপোক্ত গাছের শিকড়ে।

গরু-খেলানো শেষে ঢ্যাঙুআনের দল এসে পৈড়ান তুলবে। তুলুক না, কত-অ মুরাদ! চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে রাখে কুম্হারপাড়ার ছেলে-ছোকরারা। তারা তো নিশ্চিন্ত 'পৈড়ান' তুলতে গেলে এখন অতবড় গাছটাকেও যে তুলতে হয়!

ঢ্যাঙুআনরা পারবে অথবা পারবে না। বিশেষত ঢ্যাঙুআনের দলে সামাই রয়েছে, সামাই সবেণ। পৈড়ান তুলতে না পারে যদি তো ঢ্যাঙুআনরাই জরিমানা দেবে। আর অবলীলায় 'পৈড়ান' উঠে গেলে জরিমানা দিতে হবে গৃহস্থকে।

তাই ছেলে-ছোকরাদের এত কায়দাকানুন, এর শিকড়ে তার শিকড়ে পৈড়ানের টিকি বাঁধা। বাঁধাছাঁদা হয়ে গেলে মাটি চাপা দিয়ে তারাও আসবে গোঠটাড়ে।

ঢ্যাঙুআনরাও এখনও আসেনি, তারা আসবে সেই মোহনকামারের ঘর থেকে, সেখানেই তারা জড়ো হচ্ছে, ধিং ধাং করে মাদলে দু-চাট্টা চাঁটির আওয়াজ মাঝেমাঝে সেখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

আসবে তারা আসবে, গোঠটাড়ের মাঠে আগে তো সব গরু-কাড়া আসুক।

মাঠে পোঁড়া-কাড়া নিয়ে আসাও খুব ঝঞ্ঝাটের। এক-দুজনের কর্ম কী, কমসে কম চার-পাঁচজনে একটা কাড়াকে ধরে-বেঁধে নিয়ে আসছে।

সহজে কী আসতে চায়? গলায় ফুলের মালা, কপালে ধানের কী একটা, পাটামৌড় না সিঁথ্‌লীমৌড়, তার উপর গায়েও ছাপছোপ, জবরজঙ জবরজঙ—

কাড়ার সাজ হয়েছে খুব ভাল। তবে তার গায়ে নানা রংয়ের গোল গোল ছাপ্পাগুলি খুব ভালমতো খোলেনি। কাড়া-পোঁড়ার গায়ের রং তো কালো। কালোর উপর নানা রংয়ের বাহার আর কী খুলবে? কালো রংয়ের সঙ্গে মিলমিশ হয়ে সব একাকার, একাকার।

অনিল-সুনীলদের পোঁড়া-কাড়াই সবচেয়ে ভাল খেলে। সবচেয়ে বেশি রাগী। ফি-বছর তারা জিতে যায়, তাদের পোঁড়া-কাড়াই ফার্স্ট হয়।

ঐ ঐ বুঝি এল অনিল-সুনীলদের কাড়া? গোঠটাড়ের হাউসীরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

উঁ-হু, অনিল-সুনীলদের কাড়া তো এ-নয়। তাদের কাড়ার সঙ্গে অনিল-সুনীল তো আসবেই, সেই সঙ্গে আসবে হীরালাল, বিপ্রপদ আর কটি।

তাদের পোঁড়া কী আর গ্রামের কুল্‌হিরাস্তা দিয়ে আসবে? আর আর গো-বেচারী গরুদের মতো, ছ্যারানি-নাদি ফেলতে ফেলতে? সে তো আসবে গ্রাম ছেড়ে গ্রামের বাইরের রাস্তা দিয়ে।

উঁহু, রাস্তা দিয়ে কী আর, অরাস্তায় অরাস্তায়, অ-বাটে। এই দেখা গেল যদি গ্রামের পুবদিকে, অনিল দড়ি ধরে আগে আগে দৌড়াচ্ছে তো সুনীল পিছু পিছু, কটি-হীরালালরা ধারে ধারে।

পরক্ষণেই তাকে দেখা গেল গ্রামের পশ্চিমে, পাড়া ছেড়ে আড়ায়। আগে আগে দৌড়াচ্ছে কাড়া অঁ-ই অঁ-ই করে, পিছু পিছু অনিল-সুনীল-কটি-হীরালালরা। তারা কব্জা করার চেষ্টা করছে, পোঁড়াটাকে গোঠটাঁড়ের মাঠের দিকে নিয়ে আসার মতলব করছে।

সহজে আসতে কী চায়? রাগী না?

খুব রাগী।

এরমধ্যেই ভুজু-ডিব্‌রা, রাবণটুডু, ঝাঁপুড়া সাঁওতাল তাদের দলবল নিয়ে গোঠটাঁড়ের মাঠে এসে গিয়েছে। ফি-বছর গোঠটাঁড়ের মাঠেই তারা 'সহরায়' মানে। 'লাগড়ে' 'দং' 'রিংজা মাতওয়ার' যাবতীয় সেরেঙ তারা এখানেই গেয়ে যায়।

যে যার দলের ছেলেরা মেয়েরা আলাদা আলাদা করে বসে আছে। একটু বাদেই তো ধামসা মাদল নাগরা বেজে উঠবে, তারপর তারা তো রাতভর নাচবে, রাতভর গাইবে।

ধামসা-নাগরার বোল উঠবে, লিবই লিবই লিবই, লিবই লিবই লিবই—

যে শোনে সে-ই মজা করে বলে, কাকে লিবি ব সুনা, কাকে লিবি ব কাঁদ্‌রা?

সঙ্গে সিঁদুর-পোঁটলা নিয়ে এসেছে কেউ কেউ। তারা মনস্থ করেছে—নাচগানের ফাঁকতালে মনের মানুষের সিঁথি রাঙিয়ে দেবে সিঁদুরে।

অবশ্য মনের মানুষ রাজি থাকে যদি তো, তবে। নচেৎ জোর করে সিঁদুর পরালে হাঙ্গামা হতে পারে, হতে পারে মারপিট।

মেয়েরা কেউ কেউ বিমর্ষ বসে আছে, গালে হাত দিয়ে, বিরস-বদন।

গালে হাত দিঞে কী অত ভাব-অ, মিনা?

হঁ, ভাবছি মদ-হাঁড়িয়া গিলে হাড়ামরা ত আজ টঙ হঞে আছে, কী কত্তে কী করেঁ বসে, কার মনে কী আছে! চিন্তিত চিন্তিত।

কেউ কেউ তো খালি হাসে। আমা অঢ়া অকারে? না, হাসে। আমা উতুম চেদ্? না, হাসে। হাসি, আর হাসি।

গড়ম, কেনে অত হাস-অ?

হঁ, হাতির ল্যাখেন সহরায় পরব আর হামি টুক্‌চার হাসবও নাই, গড়ম? একশৎবার হাসব, যত্‌খন পারি হাসব।

নেশায় চুর হয়ে ফিক্ করে সে হয়ত আবার হেসে দিল।

কেউ গালে হাত দিয়ে, কেউ কেউ বসে দু'হাঁটুতে হাত ঝুলিয়ে, কার বা বিরসবদন, কারোর কেবলই হাসি-মুখ।

সাঁওতাল যুবতীরা নাচের অপেক্ষায় যে যার দলে ভিড়ে বসে আছে। ফুলসমেত কতক ডাল ভেঙে এনেছে তারা, ফুলডাল হাতে করে তারা একটু বাদেই নাচতে উঠবে।

পুরুষরা কেউ কেউ মাথায় ফেট্টি বেঁধে মাথার পিছন দিকে গুঁজে রেখেছে ময়ূরের পালক। ঘুরলে-ফিরলে সে-পালক হিল্ হিল্ করে নড়ছে।

এ-দলের সর্দার ঝাঁপুড়াসাঁওতাল কি রাবণ টুডু ট্যাঁক থেকে 'চুনগুটুল' বের করে ও-দলের সর্দার ভুজুকে কি ডিব্‌রাকে দিল। ভুজু কি ডিব্‌রা ট্যাঁক থেকে বের করল দোক্তা।

এর চুন ওর দোক্তা—'দোক্তাবনা' হয়ে গেলে ঝাঁপুড়া-রাবণ ভুজু-ডিব্‌রা সবাই মিলে ভাগ করে খেল।

এখন তো মিল্‌মিশ, নাচ শুরু হয়ে গেলে যে-যার সে তার। তখন দেখা যাবে কার ধামসা কি বলে—দিবই দিবই দিবই, না লিবই লিবই লিবই।

এর মধ্যেই কেউ কেউ অযথা শূন্যে লাফ দিয়ে 'কুলকুলি' মেরে উঠল, তার পর যেমনকার তেমন যে-কে-সেই। কেন যে সে লাফিয়ে উঠল, আর কেন যে কুলকুলি মারল—সে-কারণ কেউ খুঁজতে গেল না, তারা তো জানে পরব এলে এরকম লাফাতে হয়, কুল্‌কুলি মারতে হয় খুব জোর 'হুরি' করে।

গোঠটাঁড়ের মাঠে সুখজুড়ির গোবরাসাঁওতাল হাজির, হাতে মরা গরুর সেই ছাল-চামড়া। কবেকার একটা বাসি চামড়া, ছালটা সে সারাবছর তুলেই রাখে, বের করে আনে শুধু এই আজকের দিনটায়।

তাকে দেখামাত্র বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা মেয়েরা তার দিকেই ছুটে চলল, ঘিরে ধরল তাকেই। ছোট ছোট হাত-পা নেড়ে তারা বায়না জুড়ল, এ হে বুঢ়্‌হা, ডিগবাজি খা, ধুলায় ঘন্টা ন ঘন্টা!

মরা গরুর শুকনা খড়খড়ে ছাল নিয়ে 'গরু-খুঁটা' গরুর শিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে গোব্‌রা, ধুলায় গড়াগড়ি খাবে, যত ঝাঁপাবে যতই ধুলায় গড়াগড়ি খাবে, ততই ছানাপোনারা ছোট ছোট হাতে তালি বাজাবে, হাসবে—হাসির হল্লায় হাল্লাট হয়ে যাবে না গোঠটাঁড়ের মাঠ?

পরণে খেটো কোরা সাঁওতালী ধূতি, সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, গোব্‌রা হাত তুলে বলল, সবুর সবুর। অখন কী, খেলাই শুরু হৈল নাই ত শুকনা ডাঙায় ডিগবাজি?

শিশুবালকরা বলল, না না, এখনই হোক। শুধুশুধুই হোক। শুকনো ডাঙায় শুধুশুধুই গোব্‌রা গড়াগড়ি যাবে ডিগবাজি খাবে—তবেই না মজা।

ধামসা বেজে উঠল ভুজু-ডিব্‌রা, রাবণটুডু কী ঝাঁপড়া সাঁওতালের দলে।

সেদিকে একবার চোখ ফেলেই গোব্‌রা হেঁয়ালি দিল, তার আগে বল্ ত কী, বল দেখি—

উলুক বুড়ি মুলুক যায়
বিনা দোষেই মার খায়।

কী জিনিস?

চুপ্‌সানো বেলুনের মতো মুখ হয়ে গেল ছা-ছানাদের। বুঢ়হার যত্ত বেশী বেশি। এসেছে গরু খেলাতে, গরু খেলা! তা নয়, কথায় কথায় হেঁয়ালি বলা।

একটা ছেলে ভিড় ঠেলে এসে খচাঙ করে তো বলে দিল, ধামসা, ধামসা বটে ন?

হাঁ হাঁ ধামসা, ধামসাই বটে। দুহাতের লাঠি দিয়ে বিনাদোষে তাকেই তো দমাদ্দম মেরে যাচ্ছে। আর না মারলে সে-ই বা বাজবে কেন?

এসময় মাদলও বেজে উঠল ঢ্যাঙুআনের দলে। সঙ্গে সঙ্গে গোব্‌রাও আরেকটা হেঁয়ালি পেয়ে গেল। বলল, "মামার ছাগল্ ছুঁলেই মেমায়"—বল ত কী?

কী-ই আবার মাদল, মাদল। মাদলে হাত রাখলেই তো ছাগলের মতন ম্যা-ম্যা করে ডাকে, মেমায়।

হেঁয়ালি-যুদ্ধে বাচ্চাদের কাছে হেরে গিয়েও পরিতৃপ্ত গোব্‌রা মনের সুখে গোঠটাঁড়ের মাঠে ধুলোয় ধুলোট হয়ে ক'টা ডিগবাজি খেয়ে নিল, আর তাতেই হাসির হল্লা পড়ে গেল মাঠময়।

বড়রাও হাসল, ছোটরাও। উপস্থিত বউড়ী-ঝিউড়ীরাও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে নিল।

কুম্‌হারপাড়ার কাম্‌হারপাড়ার ভুঁইয়াপাড়ার ঝি-বউয়েরা, চারু-কিরণ তরু-বিঝলরাও সকাল সকাল গোঠটাঁড়ের মাঠে এসে জড়ো হয়েছে।

তারা এসেছে উত্তর থেকে, বসেছেও মাঠের উত্তর দিকে। উত্তরে বসে, দাঁড়িয়ে তারা চেয়ে আছে দক্ষিণে। দক্ষিণে গোঠটাঁড়ের মাঠেই তো 'গরু খুঁটা' পরব শুরু হবে।

গরু-খুঁটা, গরু-খুঁটা। গরু-খুঁটা কী আর, তারা চেয়ে আছে আরো দক্ষিণে, বিশেষত কুম্‌হারপাড়ার বউড়ীরা ঝিউড়ীরা, মাতব্বরদের বউরাণীরা।

গোঠটাঁড়ের মাঠের দক্ষিণে যেখানে দক্ষিণের বন এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গোঠটাঁড়ে, সেখানেই তো এসে সার সার বসে থাকে লোধারা, লোধাদের বউড়ী-ঝিউড়ীরা। এ বছর তারা কী এসেছে?

না, এখনও আসেনি। হয়ত আসবে, হয়ত আসবে না।

কুম্‌হারপাড়ার ঝি-বউদের কৌতূহল বেশি। তারা থেকে থেকে পায়ের 'এড়িঁ' উঁচু করে চোখের সামনে কপালে হাত রেখে দেখছে, দেখছে গোঠটাঁড়ের মাঠের ভিড় ভেদ করে, গোব্‌রাসাঁওতাল আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের ঘেরাটোপও টপকে।

না, এবছর তারা বুঝি আর আসবে না।

আসবে, আসবে, বছরকার পরব, না এসে কী 'চারা' আছে?

'চারা' নাই, 'চারা' নাই।

গোঠটাঁড়ে না এসে 'গরু-খুঁটা' দেখতে তারা আর কোথায় বা যেতে পারে? নুয়াসাহীর বটতলায়?

কিন্তু সেখানে যেতে হলে তো কুম্‌হারপাড়ার মাথায় দক্ষিণসোলের উপর দিয়েই যেতে হয়। সে পথ দিয়ে লোধারা ভূমিজপাড়ার বটতলায় গরু-খুঁটা দেখতে যাচ্ছে, আর এখান থেকে উঁকি মেরেও তা দেখা যাবে না—তা তো নয়।

পষ্টাপষ্টি দেখা যাবে, এমন কী কার বউ—তাও 'চিহ্নিত' করে বলে দেওয়া যায়। আসলে তারা এখনও ঘরেই আছে, ঘর থেকে বেরোয়নি।

বেরুবার ঢের সময় এখনও আছে। ঢ্যাঙুআনরাই এখনও গরুখুঁটাতে গোঠটাঁড়ে এল না, তো লোধাদের কথা কী! কাপড়ে গিঁট দিয়ে বলতে পারি—তারা আসবে, আসবে—ঐ ঐ কুচলার ডাল নড়ল বুঝি, আঁটারি-চুরচুর 'ডগ' হিলল—তারা আসছে, আসছে—



শুরু হয়ে গেছে ফুটবল খেলা।

সে তো চ্যাঙ্‌না-ম্যাঙ্‌নাদের খেলা। বাড়ির বউড়ী-ঝিউড়ীরা গোঠটাঁড়ের মাঠে এসেও তার ধারে কাছে যাবে না।

দুটি খাসি, একটা ভেড়া বাঁধা আছে মাঠের একধারে। যারা জিতবে তারা খাসিদুটি সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাবে, যারা হারবে তারাও নিয়ে যাবে ভেড়াটি। হারলেও লাভ, জিতলেও লাভ।

মাঝে মাঝে ফুর্‌র্‌র্ ফুর্‌র্‌র্ করে সেখান থেকেই রেফারির বাঁশি বাজছে। হল্লা যা হ'বার তা তো হচ্ছেই।

দৌড়াতে দৌড়াতে 'গরু-খুঁটার' মাঠ ছেড়ে কেউ কেউ বলখেলার মাঠে যাচ্ছে, অবশ্যই পুরুষরা। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে গোল-টোল হচ্ছে না দেখে ফের ফিরে আসছে গোঠটাঁড়ের মাঠে।

গোঠটাঁড়ের মাঠেও গোল এখনও হয়নি, ঢ্যাঙুআনরাই আসেনি, তো গোল করবে কে? শুকনো ডাঙায় গোব্‌রাসাঁওতালের কটা ডিগ্‌বাজি খাওয়া দেখে তারা আবার ফিরে যাচ্ছে বলখেলার মাঠে। এই কিছুক্ষণ তারা মাকুর মতোই যাবে-আসবে।

মাঝুডুব্‌কার জঙ্গল ভেদ করে এসময় একটি ছেলে পাঁইপাঁই করে দৌড়ে এল গোঠটাঁড়ের মাঠে, গোঠটাঁড়ের মাঠেও সে থামল না, সে থামল গিয়ে একেবারে বলখেলার মাঠে।

সে লোধাছানা। গুড়খালোধার বেটা নীলু, নীলেশ্বর। সে ফুটবলখেলার খুব 'হাউসী' কী না। ওলডাঁটার বলে 'শট্‌' মারতে মারতে পা দুটোয় তার কড়া পড়েছে।

বলখেলার মাঠে পৌঁছেই বল যেদিকে সে দৌড়াতে লাগল সেদিকেই। বল নিয়ে খেলোয়াড়রা দৌড়ালে সেও দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে গিয়ে এর-তার গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে।

ধাক্কা লাগলেও বলখেলায় বলার কিছু নেই। বল খেলায়, খেলা দেখতে আসায় এরকম ছোটখাটো ধাক্কাধাক্কি তো হতেই পারে। টাউনের দিকে, কলকাতায়, বড় বড় মাঠে আরও কত বড় ধাক্কাধাক্কি হয়।

মাঠের দুইদিকে দুইদলের সাপোটাররাই চেঁচাচ্ছে। গুড়খার বেটা নীলেশ্বর কুম্‌হার-পাড়ারই সাপোর্টার।

কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা যারা এতক্ষণ দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে হাঁ করে তাকিয়েছিল, দেখছিল চুরচু-আঁটারি-কুড়চির 'ডগ' নড়ে কী 'নাই নড়ে', তাদের চোখে ধুলো দিয়ে গোঠটাঁড়ের মাঠে এসে গেল নীলেশ্বর। কাপড়ের আঁচলায় গিঁট বেঁধে হলপ করে যে বলেছিল, লোধারা আসবেই আসবে, অন্তত সে-ও জানল না তার কথা হাতে-নাতে প্রমাণ করতেই যেন মাঝুডুব্‌কা জঙ্গলের বনবাদাড় ফেড়ে লোধাপাড়া থেকে একদৌড়ে গোঠটাঁড়ের মাঠে এসে গেল নীলেশ্বর।

নীলু এল, মাদলে চাঁটি মারতে মারতে ঢ্যাঙুআনরাও এগিয়ে আসছে। এসময় একটা সোরগোল উঠল—ঐ ঐ আসছে ধেঙ্গুআনরা! গোঠটাঁড়ের মাঠের দর্শকরাই আঙুল তুলে তুলে দেখাল—ঐ ঐ মহন রানা, তার পিছনে পরফুল্ল, মুনিয়ার বেটা ভদ্রা। কে নেই কে নেই, সংখ্যায় ঢ্যাঙুআনের দল যেন আর আর বছরকেও ছাড়িয়ে গেল, ছাপিয়ে গেল।

গেল বছরের চাইতে এ বছরের মাদলওয়ালার সংখ্যাই কত!

গুরাসাঁওতালের আমতলা ছাড়িয়ে ঢ্যাঙুআনের দল ছিনাথ বুড়োর মরা হাজা কুরথিখেতিতে পা রাখতে না রাখতেই ধুলোয় ধুলোয় ধুসরিত হয়ে উঠল গোটা দলটাই।

এত কুলকুলি এত লম্ফঝম্ফ এত ডিগবাজি খাওয়া, ধুলো তো উড়বেই। সুখজুড়ির গোব্‌রাসাঁওতাল এতক্ষণ শুধু-মাঠেই ডিগবাজি খেয়ে ধুলো ওড়াচ্ছিল, ছোটছোট ছা-ছানাদের হাসির খোরাক যোগাচ্ছিল, ঢ্যাঙুআনদের দেখামাত্র গরুর চামড়া নিয়ে সেও দৌড়ে গেল।

এদিকে শুরু হয়ে গেছে সাঁওতাল নাচ। চার-চারটা দল চার জায়গায় জড়ো হয়ে 'পাঁতা' নাচছে। আর তাদেরকে ঘিরে ধরে আছে দর্শকরা। নাগরা বাজছে, বিনা দোষে ধামসাও পরের পর লাঠির বাড়ি খাচ্ছে। মাদলও মামার ছাগলের মতো হাতের চড় খেয়ে 'মেমাচ্ছে'। মেমাচ্ছে তো মেমাচ্ছে।

লাগড়ে, দং—আজ আর কোনো প্রকার সেরেঙই গোব্‌রাসাঁওতালকে সাঁওতালনাচের দলের দিকে টানতে পারছে না।

আজ সে তাদের লোক নয়, উঁহু, আজ তাদের সঙ্গে তার কোনো আত্মীয়তাও নেই। আজ সে পুরোপুরি ঢ্যাঙুআনদের।

আজ সে একজন ঢ্যাঙুআনের মতো ঢ্যাঙুআন। গরুর চামড়া নিয়ে গরু খেলানোর আসল 'পার্ট'টা তো তারই।

অন্তত আজকের দিনটায় সে গোব্‌রাসাঁওতাল নয়, আজ সে গোব্‌রাকুম্‌হার কী গোব্‌রা-কাম্‌হার।

'তা না-না-না' করে মূলগায়েন মোহন রানা গোটা দলটার সামনে, গোঠটাঁড়ের দিকে আগুয়ান ঢ্যাঙুআনদের দিকেই মুখ করে গাইছিল, নাচতে নাচতে। আর মাঝে মাঝে মুখে কুল্‌কুলি মেরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল।

একদৌড়ে গোবরাসাঁওতাল ঢ্যাঙুআনের দলটাকে ধরে ফেলল। তারপর মোহনেরও আগে আগে 'গরু-চাম' দুহাতে শূন্যে তুলে দোলাতে দোলাতে নাচতে নাচতে গোঠটাঁড়ের মাঠের দিকেই এগিয়ে এল।

এতক্ষণ দলের যে-পতাকা মোহন রানার হাতে ছিল, সে-পতাকা যেন এবার হাত বাড়িয়ে ধরে নিল গোব্‌রা।

বলখেলার মাঠে একটা গোল হল। কুম্‌হারপাড়ার 'শক্তি সংঘ' মাহাতোপাড়ার 'অগ্রগামী'কে গোলটা দিল।

গোল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুম্‌হারপাড়ার 'সাপোটার'রা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। কেউ কেউ তো মাঠের ভিতর ঢুকে পড়ে মাঠময় দৌড়াতে লাগল।

যারা এর মধ্যেই গোঠটাঁড়ে এসে পড়েছিল তারা তো আনন্দ করলই, যারা তখনও আসেনি গোল হয়েছে শুনে তারাও লাফাতে লাফাতে এসে পড়ল।

গোল হওয়ার পরে গুড়খালোধার বেটা নীলু যে কী করবে প্রথমটায় ভেবে পাচ্ছিল না। থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল একদণ্ড। আশপাশের দর্শকরা তাই দেখে ধরে নিয়েছিল সে বুঝি মাহাতোপাড়ারই সাপোটার। দোরখুলির লোধাপাড়া মাহাতোপাড়া তো পিঠোপিঠি, ভাই-বেরাদর।

কিন্তু না, ভুল তাদের ভাঙল। কুম্‌হারপাড়ার 'শক্তি সংঘের' সেন্টার ফরোয়াডের নাম সত্যচরণ, গোলটা সেই দিয়েছিল। হুঁশ ভেঙে যেতেই আচমকা নীলেশ্বর মাঠের ভিতর ঢুকে পড়ে অতবড় সত্যচরণকে দুহাতে চাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল। পারল না যখন চটজলদি সত্যর দুপায়ে দুহাত ছুঁইয়ে পায়ের ধুলো তুলে মাথায় নিল।

অতটুকু ছেলে যখন অতবড় সত্যচরণকে চাগিয়ে তোলার চেষ্টায় মত্ত ছিল, তখন মাঠময় কুম্‌হারপাড়ার সাপোটাররা এমন কী মাহাতোপাড়ার সাপোটাররাও হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না?

কার ছানা ব, কার ছানা?

কারোর ছানা লয়, এক লোধাছানা।

লোধাছানা? লোধারা আজ তবে এসেছে?

উত্তরে যারা ছিল তারা তো দক্ষিণে চোখ তুলে তাকাল, বলখেলার মাঠের দক্ষিণে যারা ছিল তারাও ঘাড় ঘুরিয়ে গোঠটাঁড়ের দক্ষিণটা একবার দেখে নিল।

সন্ধ্যার আকাশে, মেঘপাতালে, সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকালে প্রথমে একটি-দুটি তারা চোখে পড়ে, মনে হয় দুটি-একটির বেশি তারা এখনও ফোটেই নি। চোখ স'য়ে গেল কিন্তু দেখা যাবে—একটি-দুটি তারা তো নয়, তারা ফুটেছে অজস্র অগুন্তি অঝোরঝর।

তেমনি গোঠটাড়ের দক্ষিণধারে প্রথম প্রথম একটি-দুটি লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীকে বসে থাকতে দেখা গেলেও, ধীরে ধীরে প্রায় গোটা লোধাপাড়ার ছা-ছানা বউড়ী-ঝিউড়ীরাই এসে জড়ো হল সেখানে।

এসেছে সাবিত্রীও। সন্তোষকুম্‌হারের দেওয়া নতুন শাড়ি-সায়াটাই পরে এসেছে সে। লোধাপাড়ার সঙ্গে কুম্‌হারপাড়ার যে-একটা বড়রকম সংঘর্ষ হতে চলেছে, তার ছাপ নেই তার চোখেমুখে।

তার যেন ডর-ভয় নেই, মুচকি মুচকি হাসছে সে।

আড়-পাগলী আর কাকে বলে? আড়-পাগলী, আড়-পাগলী।

কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা কানাকানি শুনতে পেল—সাবিত্রী এসেছে লো সাবিত্রী!

অমনি তাদের কৌতূহল বেড়ে গেল দ্বিগুন তিনগুণ। তারা উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

এমনিতে কতদিন কতবার এসেছে, কখনো আঁউলা-বাঁউলা নিয়ে, খামআলু পানআলু, চুরচু-আলু নিয়ে, বালিছাতু-কুড়কুড়িয়া-কাড়হান-পরবছাতু নিয়ে, কেঁদ-ভেলা-ভুড়রু-কুরকুট-পটম নিয়ে।

এসে বসেছে ঐ ছাঁচতলে, খড়ি-মড়ি-ওঠা শরীর, সাফা না কালো—কে অত চোখ তুলে দেখেছে! নির্নিমেষে সেই হয়ত চেয়ে বসেছিল কুম্‌হারঘরের একেবারে ভিতরের ঘরের দিকে।

তারপর চাল কি পয়সা পেয়েছে, আঁচলা পেতে সেই নিয়ে গুটিগুটি হাঁটা দিয়েছে লোধাপাড়ার দিকে। কার নাম পিঁদাড়ি কে গুরুবারি না সোমবারি, কে ফুলটুসি না সাবিত্রী—কে অত জিজ্ঞাসা করে দেখে? সব কটাকেই তো দেখতে একরকম, লোধা লোধা।

কোনটা লো কোনটা? কী নাম বললি? সাবিত্তিরি? লোধাদের আবার অত সুন্দর নাম? তাদের নাম ত শুনি গাঁজাড়ি পিঁদাড়ি, যত্তসব বন-বাদাড়ি নাম!

নামের মিল দেখে কেউ বলল, সাবিত্তিরি-সত্যবান, বনে কাঠ কাটতে যেয়েই ত সত্যবান মরেছিল। তবে সাবিত্তিরি কী লোধা ছিল?

নাই জানি, সে জানতে পারে এক তোমার বেম্ভাকুম্‌হার আর তার বউ লবঙ্গলতা, আমি ত নাই জানি ধন।

ব্রহ্মাকুম্‌হারের নামে কিছুক্ষণ হাসাহাসিও হল। কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীদের অনেকেই তখনও সাবিত্রীকে চিনতে পারেনি। 'এড়ি' উঁচু করে কেউ কেউ উঁকিঝুঁকি মারছিলই।

ঐ যে লোধাবুঢ়হিটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে—ঐ কী সাবিত্রী?

হঁ, ঐ হল সাবিত্রী আর ঐ যে গরু খুঁটাচ্ছে ঐ হল সত্যবান। সন্তোষ আর সত্যবান—স, স—তো একেই কথা, একেই নাম।

কিন্তু লোধারা ত কালোকুগুড়ি, সাবিত্তিরি ত ফর্সা লো, খুব ফর্সা। তার উপর লহ লহ বনকুঁদরীর মত ন বনসুঁদরী। লোধাদের আপন মেয়্যা নাকি পালিতা কইন্যা?

কী-ই জানি বাপু, লোধাদের ত গুণের ঘাট নাই। কার মেয়্যা অপহরণ কর‍্যে কোথাল্যে লিঞে এস্‌ছে!

তোমার স্মরণে আছে কী বড়পুঁটির মা, সেই যে সেই কাগমারা আক্‌কুটি শবররা গেরামে গেরামে ভিক্ষা করতে আসত—

কথা ছিনিয়ে নিয়ে বড়পুঁটির মা বলল, স্মরণে নাই আবার! দেখলেই ডর লাগত, গলায় কতর'ম হাড়ের মালা তাবিজ-তুবিজ, দেখামাত্রই ছা-ছানা আগলাঁই রাখতম।

আর কীর'ম গাডু-মাডু করে গীত গাইত লোকগুলো—হারে...হারে... হারে...ব্রহ্মা গাডু...ত, ওরাও শবর লোধারাও শবর, একজাত। ওরা বলে গাডু আর এরা না হয় বলে গাড্ডু।

যে বলেছিল সন্তোষ-সত্যবান স-স এক কথা এক নাম, সেই কুম্হারবুঢ়িহি-ই বলল গাডু আর গাড্ডু র কথা। বলল যত, তার থেকে হাসল বেশি। হাসালও বেশি।

কুন্তলার কৌতূহল আর কিছুতেই মিটছে না। সে যেন গোঠটাঁড়ের মাঠে এসেছে গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা দেখতে নয়, দেখতে এসেছে সাবিত্রীকে। বন-সুন্দরীকে। যার রূপের মোহে পড়ে তার দেওর অন্নজল ত্যাগ করেছে।

কুম্হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা বসে আছে গোঠটাঁড়ের মাঠের এধারে, আর লোধাপাড়ার বউড়ীরা বসে আছে মাঠের ওধারে। কুন্তলার মনে হল, এগো যাই, সাবিত্রীর কাছে কুদি মেরে একদৌড়ে। আরেকটু কাছ থেকে দেখি আরেকটু! নড়া ধরে যাত্রাপালায় শোনা সেই 'ডায়লগ'টা দিই—

মরি মরি ভুবন ভুলানো রূপ
তুলো মুখ মুছো আঁখিজল
লো মানিনী হেসে কথা কও।

হাসছে। আড়-পাগলী, সে তো এম্নি এম্নি যখন-তখন হাসে।

কুন্তলা রাগ করে মনে মনে বলল, ঢলানী, অত যে হাসি? অত যে ঢঙ? কিসের লো, কিসের? লদ্ধা মেয়্যা হয়ে কুম্হার মরদ চাস? বামন হয়ে চাঁদে হাত?

রাগে হাত নিস্‌পিস্ করছে কুন্তলার। কিন্তু ঘরের বউ, কুম্হারঘরের বউড়ী হয়ে সে মাঠময় জাত-বেজাতের আত্মীয়-কুটুম্বের সামনে কুদি মেরে দৌড়ুবে কী, 'এড়ি'র উপর কাপড় তুললেই শাউড়ী সাতকথা শুনিয়ে দেবে না?

সাত-পাঁচ ভেবে নিরস্ত হল কুন্তলা। কিন্তু চোখ তার পড়ে থাকল গোঠটাঁড়ের ওধারে, মাঝুডুব্‌কা জঙ্গল-সীমানায়।

এদিকে গোঠটাঁড়ে গরুখেলানো শুরু হয়েছে। প্রথম গরুটাই রাজারামের।

এম্নিতেই মাদলের আওয়াজ শুনেই রাজারামকুম্হারের গরুটা মাথার কাঁচা-পাকা ধানের 'মৌড়' ঝড় ঝড় করে নাচাতে লাগল, কাঁপাতে লাগল। ছর্‌কে-ফর্‌কে গরুটা খুঁটার চারধারে ঘুরতে লাগল।

মোহনকাম্হার তখনও গান ধরেনি। শুধুই বাজনা, আর তাতেই এই। তখনও মরা গরুর চামড়া নিয়ে গোব্‌রা সাঁওতাল রাজারামের গরুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি।

কন যে দেয় ভালা পানি বল্
পিঁড়া যে বাবু হো –
কনে যে দেয়-অ অন্ন জল?

গাইতে গাইতে মোহন এই প্রশ্ন রাখল, খুঁটায় বাঁধা গরুটার চারধারে ঘুরে ঘুরে, আঙুল উঁচিয়ে নালিশ করে করে।

ঢ্যাঙ্গুআনদের মধ্য থেকেই আরেকজন আচমকা বেরিয়ে এল, সে সুরথ, সে-ই গরুর হয়ে উত্তর দিল—

বহিনে যে দেয় ভালা পানি বল্
পিঁড়া যে বাবু হো—
আর মায়ে ত দেয়-অ অন্ন জল।

দিড়ি দাং খেটে তাং দিড়ি দাং! দিড়ি দাং খেটে তাং দিড়ি দাং!!

বাজনা বেজে উঠল। অমনি 'গরু-চাম' নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোব্‌রাসাঁওতাল।

গলার 'ঘাঘরঝাল' বাজিয়ে গরুটা 'মরা চামে'র উপর একের পর এক টুঁসোতে লাগল। কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে সে-আক্রমণ রুখে দিচ্ছিল গোব্‌রা।

কখনো কখনো গরুটার গায়ের উপরও লুটিয়ে পড়ছিল সে, আর গরুটা ঘন ঘন্ গা থেকে ঝেড়ে ফেলছিল তাকে। তখন মজা করতে স্রেফ মজা করতেই এক পাকের জায়গায় তিনপাক ডিগবাজি খেয়ে নিচ্ছিল গোব্‌রা।

তাই দেখে ছোটরা মজা তো পাচ্ছিলই, বড়রাও মুহুর্মুহু হাততালি দিচ্ছিল, কুলকুলি মারছিল মুখে। আরো ছোটরা 'দেখতে পাচ্ছি নাই, দেখতে পাচ্ছি নাই' বলে বাপ-কাকাদের মাথার উপর চড়ে বসছিল।

আর আনন্দ করছিল গোঠটাঁড়ের মাঠের এধারে রাজারামকুম্‌হারের ঘরের লোকজন, বউড়ীরা ঝিউড়ীরা। তাদের গরুটা তো ভালোই খেলছে, আনন্দ তো তারা করবেই।

'তা-না-না-না' করে গানের সুর বদলে গানের লহর বদলে ঢ্যাঙুআনদের দল এক গরুকে ছেড়ে আরেক গরুর কাছে নাচতে নাচতে লাফাতে লাফাতে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিল।

ফাঁকতালে, দুই গরু খেলানোর মাঝখানে একটু যেন দম নেওয়া, থকে গিয়ে একটু বিরাম, জিরিয়ে নেওয়া।

এইরকম একটা ফাঁকতালে কুন্তলা না পারুক, কুদি মেরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গোঠটাঁড়ের মাঠের উপর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে মাঠের এধারে কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী ঝিউড়ীদের একদম মাঝখানে এসে পড়ল সাবিত্রী।

কোথাও শান্ত নিরীহ একটা 'পখুরে' একটা ঢিলই পড়ল যেন। নাকি হাতের ইশারায় একবার মাত্র হাতছানি দিয়ে সাবিত্রীকে ডেকেছিল কুন্তলা।

নাকি দুটো কথা সামনাসামনি বলতে না পেরে তার মন আনচান করছিল।

সাবিত্রী এলে তাকে প্রথমে টিপেটুপে দেখল কুন্তলা। গ্রামে-ঘরে লোধারা লোধানীরা কেঁদ-ভুড়রু-ভেলা বনের ইস্তক পাকা ফল বেচতে এলে কুম্‌হারপাড়ার কাম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা যেমন করে আঙুলে টিপে-টুপে দেখে—পেকেছে কী পাকেনি।

পাকা বেলের মতো শক্ত যেন সাবিত্রীর গা-হাত পা। শক্ত তো হবেই—বনে-জঙ্গলে শাবল-খন্তায় কত যে আলু তেড়েছে, তুঙ্গা তুলেছে! কত যে ধানজমির আস্ত 'হিড়' কোদালে-খুরপিতে ফালা ফালা করে ছেড়েছে উন্দুর আর উন্দুর-ধানের লোভে লোভে! জলামারের দিনে কত যে দাড়ুয়াচিংড়ি-তুড়-গেঁতায় ঠায় জলে দাঁড়িয়ে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কোঁচড় ভরে ফেলেছে! দিতে চাইলেও না নিয়ে কতলোক যে তার মুখে-চোখে ছুঁড়ে মেরেছে কাদা!

কাদায়-মাটিতে-জলে সে-শরীর পড়ে পড়ে শক্ত তো হবেই।

খুব ত পরশুদিন আমার দেওরকে একলা পেয়ে গাছের সঙ্গে চিহড়লতায় বেন্ধে রেখেছিলে, এবার যদি আমরা তোমাকে আটকে বরহই দড়া দিয়ে বেন্ধে রাখি। তার বেলা?

কেঁদে ফেলল সাবিত্রী, তার চোখদুটি ঝাপসা হয়ে উঠল জলে। বলল, আমাদের কুনো দোষ নাই গ', বেন্ধে যারা রেখেছিল তারা অন্যলোক।

অন্যলোক!

হঁ, অন্যলোক।

তারমানে লোধাপাড়ার কেউ লহে?

লোধাপাড়ারই লোক বঠে, তবে উদের দলে আমার দাদা নাই আছে।

কুন্তলাও কম যায় না, যা বুঝার বুঝে ফেলেছে। সে পরিপাটি করে সাবিত্রীর চোখের জল মুছিয়ে দিল।

বলল, হেঁ ভাই, আমরা যদি সত্যি তোমাকে আটকে রাখি, থাকবে ত তুমি?

সাবিত্রী মুখে বলল, তার আমি কী জানি। কিন্তু মনে ভাবল, সত্যি সত্যি এরা আবার আটকে রাখবে না তো আমাকে? যদি রাখে? যদি রাখে?

তারপর ভাবল, সত্যি সত্যি কী আর, ঠাট্টা। ঠাট্টাই।

সব ভুলে আবার গরু-খেলা কাড়া-খেলা দেখতে লাগল সে। নাই নাই করে বিভোর হয়ে গেল কুন্তলাও।

তার উপর সন্তোষকুম্‌হারদের গরুটার সামনে যখন ঢ্যাঙুআনের দল হাজির হল, তখন সাবিত্রী আর সব ভুলে মুখে কুল্‌কুলি পর্যন্ত মেরে বসল।

কুম্‌হার বউড়ী-ঝিউড়ীদের এপাশ থেকে এই প্রথম, মেয়েদের মধ্যে কেউ একজন কুলকুলি মারল।

কুলকুলি শুনে মেয়েরা তো মেয়েরা, পুরুষরা, এমন কী ঢ্যাঙুআনরা পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

সাবিত্রী, সাবিত্রী। এমন কুলকুলি তো মারতে পারে সে-ই। সে ছাড়া আবার কে, মনে মনে সন্তোষ প্রচণ্ড খুশি হয়ে মন দিল গরু-খুঁটায়।

সন্তোষ তো ঢ্যাঙুআনদেরই একজন, তার গরু খেলাতে সব ঢ্যাঙুআনরা যে উৎসাহী হবে—এ আর নতুন কথা কী। তার উপর লোধাদেরই একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। বাহারে সন্তোষ!

শুধু কী ভাব-ভালবাসা, নানান ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে লোধাপাড়ার মধ্যে গিয়েও মেয়েটাকে প্রেম নিবেদন করে এসেছে সে।

ধরে ফেলে লোধাপাড়ার মাতব্বররা তাকে চিহড়লতা দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, তাতেও সে দমেনি। বলতে কী একপ্রকার লতা ছিঁড়েই সে বেরিয়ে এসেছে।

যে-লোধাদের লোকে অচ্যুৎ মনে করে, যাদের ধারে-কাছেও ঘেঁষে না কেউ, সেই লোধাদেরই একটা মেয়েকে এক সম্পন্ন চাষী-কুম্‌হারের ছেলে বিয়ে করতে চলেছে—এটা একটা খবরের মতো খবর, কিংবদন্তী প্রেম।

খুশিতে আহ্লাদে সন্তোষ নিজেই গান ধরল—

এতদিন ত চরাঁই ভালা বনে-জঙ্গলে যে বাবু হো
আজি তোরো দেখিব মর্দানী।

মাত্র দুটো লাইন গেয়েছে সন্তোষ, মূল গায়েন মোহন রানা দৌড়ে এসে সন্তোষের পিঠ থাপড়ে দিয়ে বলল, ভালা অহীরে—

কুলকুলি মারল। হাত নেড়ে গামছা নেড়ে গরুটাকেই প্রতিপক্ষ করে মোহনই বাকিটা গেয়ে দিল—

আজিকার রণে ভালা জিতি যদি যাও গো
তোরো পায়ে নূপুর ছাহাবো।।

গরুটা খেলল বেশ। কুলকুলি, হাততালিও পড়ল খুব। কুন্তলা এতক্ষণ সবকিছুই ভুলে গিয়েছিল। অন্যমনস্ক, অন্যমনস্ক। হুঁশ ফিরলে সে দেখল—তারই খুড়শ্বশুর ভৈরবকুমার, তারই দেওর সন্তোষকুম্‌হারদের একটা গরু এত ভাল খেলল, এত ভাল!

এতক্ষণে সেও সাবিত্রীর দেখাদেখি জোর একটা কুলকুলি মারল। কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীদের মধ্যে থেকে এই দ্বিতীয়। কুন্তলাও কম কী?

কিন্তু কুলকুলি মেরেই সে ভিড়ের ভিতর লুকিয়ে পড়ল। আড়ালে সরে এসে সে দেখল—সাবিত্রী একটা ঝিলিমিলি শাড়ি পরেছে, আর এই শাড়িটা নির্ঘাত তার দেওর সন্তোষেরই দেওয়া।

শাড়িসমেত সাবিত্রীকে খামচে ধরে কুন্তলা ডাকল, এ্যাই শুন-অ।

এধারে লোধাপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা ভেবে ভেবে অস্থির—সাবিত্রী যে ওধারে হুট বলতে চলে গেল আর কী আসবে সে? আর কী ফিরে আসবে সে লোধাপাড়ায়?

মাতব্বররা যে আশঙ্কা করেছিল—যদি সাবিত্রীকে কুম্‌হাররা আটকে রাখে, যদি রাখে? তবে সেই আশঙ্কাই কী সত্যি হল?

ভয়ে তাদের বুক দুরু দুরু করে উঠল। সেই যে ওদিকে কুম্‌হারঘরের ঝিউড়ী-বহুড়ীদের সঙ্গে মিলতে গেছে সাবিত্রী, এখনও ফিরল না? এখনও না?

তবে আর কী ফিরবে না সাবিত্রী? গেল যে একেবারেই গেল, অগস্ত্যযাত্রা?

কুম্‌হারবউড়ীদের সঙ্গে তোর কী অত কথা, বিশেষ করে তোকে নিয়েই যখন এত জলঘোলা?

লোধাপাড়ায় ফিরে তারা এখন কী বলবে রাইবুকে? পাড়ার মাতব্বরদের রাগে দাঁত তাদের সব্ সব্ করছে—যৌবন জ্বালায় ছুঁড়ি জাত-বেজাতও দেখলি নাই?

'গরু-খুঁটা' দেখতে দেখতে বয়স্ক যারা তারা কমবয়সীদের বলল, যা ন একবার উদিকটায় দেখে আয়।

কে যাবে? কে যাবে? যে যাবে হাতে পেয়ে তাকেই যদি আটকে রাখে? আ-হা, আটকে রাখতেও তো পারে?

অবশেষে নুকু ওরফে লক্ষ্মী মল্লিকই রাজি হল।

কিন্তু নুকুকে ছেড়ে দিতে আবার রাজি হল না বয়স্করা। তারা বলল, নাই তুঁই যাবি নাই নুকু, খপ্পরদার।

কেন্নে?

কেনে কী, আমরা যখন বলছি, তুই যাবি নাই। অন্য কেউ যাক। কতই ত লোধাপাড়ার ছা-ছানারা গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা দেখতে এসেছে।

নুকু জেদ ধরল, সে যাবে, যাবেই।

বয়স্করা তাকে বুঝিয়ে বলল, তুঁই গেলে, আর তোকে কুম্‌হাররা আটকাঁই রাখলে আমাদের আনেক ক্ষতি, সমস্ত লোধাজাইতেরই ক্ষতি।

নিজের দাম বুঝতে পেরে খুবই ভাল লাগছে নুকুর, তাহলে লোধাপাড়ার লোকজন তার সম্পর্কে এতকিছু ভাবেও? তাহলে তার এত গুরুত্ব?

সে বলল, তাহলে তোমারা কেউ যাও, বড়রা।

নুকুর কথায় লোধাবুড়ি-বউড়ীরা এর ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে যেন বলল, আমাদের মধ্যে আর কে যাবে? এই ত আমাদের শরীরের অবস্থা!

কেউ কোনো কথাও বলল না, গেলও না।

সাবিত্রীকে খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দিয়ে তারা বরঞ্চ গরু-খেলা—কাড়া-খেলা দেখতেই মন দিল বেশি। এখনও গরু খেলাতে কাড়া খেলাতে অনেকগুলো গরু-কাড়াই বাকি।

আড়বেলা আরেকটু আড় হয়েছে। কদমডাঙা ডাঙাসাহির ওদিকটায় সূর্য এখন মস্তবড় সিঁদুরের টিপ, এই ডুবল বলে!

শেষ সূর্যের আলো এসে পড়েছে গোঠটাঁড়ে, গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা দেখতে আসা লোকগুলোর গায়ে-মাথায়।

লোধাপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীদের রুখোচুল রুখো সিঁথিও রাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সে-আলো।

বয়স্কদের কেউ কেউ হাঁটুমুড়ে বসে রাঙা আলোয় রঞ্জিত সে-চুলের ভিতর থেকে আন্দাজে পাকাচুল বেছে তুলে ফেলছে, আর যেন হাঁটুতে একহাত বেড় দিয়ে দুলছে। দুলছে, দুলছে।

তার চোখ পড়ে আছে গরু-খুঁটার দিকে, কিন্তু মন পড়ে আছে কোনদিকে কে জানে? কে জানে?

আচমকা একটা ন-দশ বছরের মেয়ে লোধাপাড়ার দলটার ভিতর থেকে বেরিয়ে পাঁই পাঁই করে দৌড়ে গেল কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীদের দলটার দিকে।

কে গেল রে? কে গেল রে?

বয়স্করা অস্থির হয়ে বলাবলি করছে, এর-ওর গায়ে ঠেলা মেরে জানতে চাইছে। ছুটন্ত মেয়েটার অতদূর পর্যন্ত তাদের চোখের দৃষ্টি তো পষ্টাপষ্টি যাচ্ছে না। তার উপর সব লোধামেয়েকেই তো দেখতে লাগে একরকম, একরকম।

শরাবণশবরের মেয়ে চাঁদবদনী তখনও দৌড়ুচ্ছে। —ঐ ঐ কুম্‌হাবপাড়ার দলটার ভিতর সে এখন মিশে গেল।

শুধু গোঠটাঁড়ের মাঠ কেন, কুম্‌হারপাড়া কাম্‌হারপাড়ার আগাপাশতলা সব—সব তো তার মুখস্থ!

গরুর নাদি কুড়োতে ঠেকা-পাছিয়া হাতে করে সে এদিকটায় কত—কতবার যে এসেছে!

কেউ তাকে না করেনি, সে তাব ইচ্ছামত গোবব কুড়িয়েছে। ধানেব টুঙ, ইঁদুরধান, ভাঙাহাঁড়ির খাপরা।

আরো দূর কুম্‌হারপাড়া কাম্‌হারপাড়া ছাড়িয়ে নদীধারে খালধারে গেঁড়ি-গুগলি-শামুক কুড়িয়েছে। শামুক কুড়িয়ে ঘুঁটে জ্বালিয়ে কলিচুন বানিয়েছে সে।

কেউ—কেউ তাকে মানা করেনি। সেই চাঁদবদ্‌নী কুম্‌হারপাড়ার দলটার ভিতর ঢুকে মুহূর্তে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল!

অনেকক্ষণ সে আসছে না। ওদিক থেকেই, গুরাসাঁওতালের আমগাছের আড়াল থেকেই বেরিয়ে আসছে জুতো-জামাপরা কুম্‌হারপাড়ার জনাকতক মাতব্বর।

পান খেতে খেতে, জুতোয় মস্‌মস্ আওয়াজ তুলতে তুলতে নিজেদের ভিতর কত কী বলতে বলতে তারা আসছে।

আসতে আসতে ঘাড় ঘুরিয়ে কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীদের দিকে একবার যেন দেখল তারা। হাসল, আর কী যেন বলল!

কী যেন, কী যেন?

লোধাপাড়ার গোটা দলটাকেই সহসা আতঙ্ক গ্রাস করল।

কই, চাঁদ ত ফিরছে নাই? এখনও ফিরল নাই? চাঁদও কী ডুবল? তাকেও কী আটকে রাখল কুম্‌হাররা?

বয়স্করা ফিস ফিস করল, রাইবু-গুরভাদের জলদি খপ্পর দেয়া দরকার।

দরকার মনে করেও তারা উঠবার গা করল না, ঝিম্ মেরে বসে থাকল। গোঠটাঁড়ে এখন গান উঠেছে—

সবু পরব ত আসে ভালা ঘুরি-ন-ঘুরি যে বাবুহো
মানুষ ম-রলে নাহি আওয়ে।
বনকেরি কাঠপাত-অ গায়েকেরি আগুন-অ
খসি খসি প-ড়ত অঙ্গার।।

গোঠ-টাঁড়ের দক্ষিণপ্রান্তে মাঝুডুব্‌কা জঙ্গলের উপান্তে বসে থাকা লোধাপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীদের মধ্যে গান শুনে এসময় একবুড়ি আরেক বুড়িকে বলল, সত্যেই দিদি—

আংটি-ভাঙা পিতল-ভাঙা স-বই জুড়া যায়
মানুষ মরিলে দিদি নাই গ' জুড়া যায়।

যে-বুড়ি শুনল সে-বুড়ি শুনতে শুনতে এত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল যে সে জিজ্ঞাসা করতেও ভুলে গেল—কেন্নে, ই-কথা কেনে বল্লে দিদি?

সাঁওতাল-নাচের দলেও একটা বিভ্রাট ঘটে গিয়েছে এর মধ্যেই। এরকম একটা-আধটা অঘটন তো ফি-বছরই ঘটে। না ঘটলে আর শুধু শুধু 'সহরায়' কী, 'বাঁদনা' কী।

খড়দাসাঁওতালের বেটা অকয় বাল্‌কাসাঁওতালের মেয়ে সুঁদ্‌রীকে সিঁদুর দিয়েছে। দুজনের ভিতর অনেকদিন ধরেই ভাব-ভালবাসা ছিল। আজ ইতুৎ-সিঁন্দুর-বাপলা হয়ে গেল। এই নিয়ে তেমন কিছু কথাও উঠল না।

একটা কথা, খর বৈশাখে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে যখন জঙ্গল টুঁড়ে ধামসা-মাদল-নাগরা-রেগড়া-টামাকে শিকারের সেন্দরা সেরেঙ কী কুঁড়িয়ো সেরেঙের সুর বাজে, তখন আধা-রাতে শুনতে শুনতে মনে হবে যেন বাজনা একটানা বলে চলেছে, টিলিঙ-ডুবুল্‌-ডুবুল্‌, টিলিঙ-ডুবুল্‌ ডুবুল্‌, টিলিং-ডুবুল্‌ ডুবুল্‌—

আর সহরায় পরবের দিনে গোঠটাঁড়ে ধামসা-মাদল-নাগবায় কিন্তু অন্য বোল্‌বোলা, লিবই লিবই লিবই—

লিবই লিবই লিবই, লিবই লিবই লিবই!

হঁ হঁ, কী লিবি? কাকে লিবি?

না, লিবই লিবই লিবই, লিবই লিবই লিবই, লিবই লিবই লিবই।

হাঁ, এ তো নেওয়ারই উৎসব। নিশ্চয় নেব, নির্ঘাত নেব!

হয়ত মনে মনেই ঠিক করে রেখেছিল অকয়—এই সহরায়েই গোঠটাঁড়ে সে সুঁদরীকে নেবে। আর তাই কোমরের খাঁজে গুঁজে রেখেছিল সিঁদুর পোঁটলা।

লিবই লিবই লিবই, একটানা শুনতে শুনতে অকয় হয়ত খেপে উঠেছিল, আর সুঁদরীও নাচতে নাচতে হয়ে পড়েছিল অন্যমনস্ক, আনমনা আনমনা।

এই ফাঁকে সুঁদরীর সিঁথিতে সিঁদুর লেপে দিয়েছে অকয়। সিঁদুর লেপেছে মানে? পুরো একপাতা সিঁদুরই সুঁদরীর মাথায় ঢেলে দিয়েছে অকয়। মাথার চুল বেয়ে সিঁদুরের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে ঝর্‌ ঝর্‌।

একটু-আধটু সিঁদুর দিলে সে-সিঁদুর লাগবে কী লাগবে না তার নেই ঠিক, একটু-আধটু সিঁদুর ছোঁয়ালে সে-সিঁদুর দেখা যাবে কী যাবে না তার নেই ঠিক, তাই জন্মের মতো সুঁদরীর মাথায় সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে অকয়।

অকয় সিঁদুর দিয়েছে সুঁদরীকে, মুহূর্তে এ-খবর রটে গেল গোটা গোঠটাঁড়ে। কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা ভেঙে পড়ল সাঁওতাল-নাচের ওখানে।

দেখি, দেখি—সিঁদুর পেয়ে সুঁদরীর মুখ দেখতে কেমন হয়েছে? 'বহু' 'বহু' ত?

ওলো সুঁদরীটা কে? কার মেয়্যা?

দৌড়ুতে দৌড়ুতে এ-ওকে জিজ্ঞাসা করে।

আগের জন জানিয়ে যায় পিছনের জনকে, বাল্‌কার, বাল্‌কার বিটি সুন্দরী গো, যে কেদারদের গোহাল ফেলাত।

বলেই সে আগে আগে দৌড়ুল গুন গুন করতে করতে, আর হাসতে হাসতে—

অ মিনা নাই কাঁদ গ
ঘরে দুয়ারে কত জব্‌রা
গোহাল ফেলাতেই হৈল বেলা।

গোহাল-কুড়ানী সুঁদরীর সিঁথিতেও সিঁদুর উঠল! পিছের জন দাবড়ে উঠে বলল, আর আমাদের ম্যাড়াটা কী করছে?

কে ম্যাড়া?

সন্তুষ গ', সন্তুষ।

হঁ তাই ত, লোধামেয়্যাটাও ত গোঠটাঁড়ে আজ ইদিকেই ঘুরঘুর করছে। আঁকড়ে ধরে দেন ললাটে সিঁদুর ঘষে। আর কদ্দিন উলুক-ভুলুক খেলবি?

দৌড়ুতে দৌড়ুতে তারা ভাবছে, এই হল 'ইতুৎ সিন্দুর বাপ্‌লা'। এরকম একটা-দুটা না হলে বাঁদনা পরব, গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা পরব যে বিফলে যায়!

অকয় যখন একবার সুঁদরীর ললাটে সিঁদুর দিয়েছে, তখন সুঁদরী অকয়েরই। আর তো কেউ সুঁদরীর সিঁথিতে সিঁদুর ঘষতে পারবে না। এক 'ছাড়ুই' না হলে।

'ছাড়ুই'য়ের বিয়েতে তো সিঁদুরও লাগে না।

অকয় সিঁদুর দিয়েছে ভাল করেছে। এখন অকয় সুঁদরীর মা-বাপকে কত টাকা পণ দেয়— সেইটে দেখার।

'পনে'র টাকা গাঁজিয়ায় ভরে এনেছে কী অকয়?

অকয় অকয় করছিস, বললি নাই ত অকয় কার বেটা?

ই বাবা জানো নাই? খড়দার গো খড়দার।

বলখেলার মাঠে মাহাতোপাড়াও এক গোল দিয়েছে। তার মানে 'ড্র' চলছে। ড্র হলেই ভেড়া-খাসি ভাগাভাগি।

খেলার ফলাফলে গুড়খালোধার বেটা নীলুর মুখ শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে। সে তবু আশায় আশায় আছে—কখন সত্যচরণ আরেকটা গোল দেয়।

ওল ডাঁটার বলে লাথি মারবার ভঙ্গিতে এক পাক চকিতে ঘুরে নিল নীলু। কুম্‌হারপাড়ার 'শক্তিসংঘ' যদি তাকে একবার খেলায় নামাত। 'বরো' হিসাবেও নামিয়ে একবার দেখুক না!

ওদিকে গোলশোধের পরে মাহাতোরাও খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তাদের দলের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় বুদ্ধেশ্বর। সে মাঠময় ছোটাছুটি করে গোলটা শোধ করে দিয়েছে।

নীলু ভাবল—পা মচকে যদি বুদ্ধটা বসে পড়ে। মাঠ ছেড়ে মাঠের বাইরে এসে অন্তত কিছুক্ষণও যদি বসে থাকে!

ভাবতে না ভাবতে, ঘাড় ঘুরিয়েছে কী ঘুরোয়নি, আরেকটা গোল নিমেষে দিয়ে বসল কুম্‌হারপাড়া। সেই সত্যচরণ।

তারপর যে হুরি হল গোটা গোঠ-টাঁড় জুড়ে, এমন হুরিটা আশপাশের লোক তাদের জন্মকালেও শোনেনি। কুম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা পর্যন্ত 'গোল গোল' বলে চেঁচিয়ে উঠল। যুবতী মেয়েরা, স্কুলে-পড়া মেয়েরা কালে-ভদ্রে ভাই-দাদাদের সঙ্গে ক্বচিৎ খেলার মাঠে আসত।

আজ যেন বাঁধভাঙা স্রোতের মতো খেলার মাঠে হাজির হল মা-কাকীরাও, নানীরাও।

রইল পড়ে ইতুৎ সিন্দুর বাপ্‌লা, অকয়-সুঁদরী, গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা। সন্তোষ-সাবিত্রী উপাখ্যানও এতক্ষণে যেন জলো হয়ে গিয়েছে কুম্‌হারপাড়ায়!

গরুখেলার মাঠ ছেড়ে বলখেলার মাঠ এখন লোকে লোকারণ্য। কুম্‌হারপাড়ার মাতব্বররাও এসে পড়েছে।

দুটো খাসি ছাগল আর একটা ভেড়া একপাশে বাঁধা। তারাই যা একটু নির্বিকার। মুখের সামনে বটপাতা, আমপাতা। মন দিয়ে তারা আমপাতা বটপাতা চিবোচ্ছে।

মাঝে মধ্যে অবশ্য এক-দুবার খেলার মাঠের দিকেও তাকাচ্ছে। কুম্‌হারপাড়ার মাতব্বররা এসে যখন তাদের 'সিনা' টিপে ধরল তখনও তারা পাতা ছেড়ে উঠল না।

মামার ছাগল ছুঁলেই মেমায়, তারা ম্যা ম্যা-ও করছে না।

কন-অ ঠিনে রে কাড়া, তোরি জনম রে
কন-অ ঠিনে লিলি গৃহবাস?
আর, কন-অ ঠিনে রে কাড়া মাল-অ খুঁটায় জুড়য়ে
খেলি খেলি আও ত মাতুয়াল।

উঁ-হু, কাড়া-খুঁটা ও আর জমছে না। বলখেলার কাছে কেমন যেন আজ ম্লান হয়ে গিয়েছে কাড়া-পোঁড়ার খেলা। বুনো মোষের মতো দেহের কাড়াটা, বড়জোর খুঁটার এ-পাশ ও-পাশ করে চলেছে।

'গরু-চাম' হাতে গোব্‌রাসাঁওতালও ফেল। এবছর অনিল-সুনীলদের কাড়ার আর বুঝি ফার্স্ট হওয়া হল না।

আবার এসময়ই একটা গরু খুঁটি উপড়ে, আর একটা গরু দড়ি ছিঁড়ে ফেলল।

খুঁটি উপড়ালে দড়ি ছিঁড়ে ফেললে আর আর বছর এতক্ষণে হুলুস-থুলুস ব্যাপার হয়ে যেত গোঠটাড়ে।

এবছর তেমনটা ঘটল না। গরু-খুঁটার মাঠে লোক কোথায় যে খুঁটি উপড়ে দড়ি ছিঁড়ে ছুটন্ত গরু সামনে যাকে পাবে তাকেই টুঁসোবে আর নয়ত চারপায়ের ক্ষুরে দলে যাবে ছা-ছানাকে?

চারধারে এতক্ষণে রব উঠত না "সামাল সামাল" "অ বে হিঁ-ই-ই-ই ন হ"? এবছর খালি তো গোঠটাড়ের দক্ষিণধারে যারা বসেছিল, তারাই ছর্‌কে-ফর্‌কে উঠে গেল।

কেউ দৌড়ুল, কেউ লাটায় ঢুকল, কেউ কেউ সবচেয়ে নিরাপদ ভেবে দৌড়ে গেল বলখেলার মাঠের দিকে।

গরু দুটো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াচ্ছে। কপালে অস্বস্তির চিহ্ন হয়ে ঝুলছে কাঁচাপাকা ধানের মৌড়। গলার মালা ছিঁড়ে ফদরফাঁই।

ততোধিক অস্বস্তিতে পড়ে গরুর পিছন পিছন দৌড়াচ্ছে গরু-মালিক, একজন কী আর— কম করেও চার-পাঁচজন। অস্বস্তির কারণ—জরিমানা তো তাদের দিতেই হবে, তার উপর এই দিগ্‌দারী!

ত্যাঁদোড় গরুটা কী আর কাঁটাখোঁচা বেছে বেছে দৌড়াচ্ছে? সে তো অ-জায়গায় কু-জায়গায় হড়বড় ঢুকে যাচ্ছে। তার পিছন-পিছন ঢুকতে হচ্ছে গরু-মালিককেও।

দড়ি ছিঁড়ে ফেলা গরুটাকে নিয়ে আরেক কিস্তি। ঢ্যাঙুআনের দল তখনও গরুর ধারে কাছেই আসে নি। ডর-পেলকু গরু তাতেই দড়ি ছিঁড়ে ফেলল।

ঢ্যাঙুআনরা যার পর নেই খিস্তি করে গেল গরু-মালিককে। —বরহই দড়িটা পচে

গিয়েছিল, পচা দড়ি দিয়ে কী গরু খুঁটানো যায়? অত শখ যদি নতুন বরহই কিনবে তো?

কিনতে হবে না, আছে আছে। ঘরে গিয়ে ফের নতুন দড়িতে বেঁধেছেঁদে গরুটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আনতে হবে মাঠে।

গরু খেলাতে হবেই হবে। বছরকার পরব, ছেড়ে দিলে চলে? বড়রা ছাড়লেও ছোটরা ছাড়বে কেন? তারাই তো বড় 'হাউসী'। তারাই তো চোখ বড় বড় করে দেখবে—তাদের গরুটা এবছর কেমন খেলল!

আর একেবারে খেললই যদি না—

"মানুষ মরলে নাহি আসে" আর "মানুষ মরিলে দিদি নাই গ' জুড়া যায়"—একেই কথা, একেই কথা।

জিভে চুক্ চুক্ করে উঠল বয়স্ক লোধানীরা। —আহা রে!

হেঁ, তাই ত, কত বড় কথা—সবু পরব ত আসে ভালা ঘুরি ন ঘুরি যে বাবু হো—মানুষ ম-রলে নাহি আসে।

হেঁ হেঁ তাই ত। গড়ামের পরে আসে বড়াম, বড়াম পার হৈলেই জীতুয়া, জিতাষ্টমী পার করে দাঁশাই, দাঁশাইয়ের পর ত বাঁদনা, বাঁদনা শেষ হৈলেই মকর, মকরের পরে পরেই আঘন, আঘনের পর আবার গড়াম আবার বড়াম-ঘুরি ঘুরি—

কিন্তুক মানুষ মরে গেলে আর কী ঘুরে আসে? নাই আসে ধন, নাই আসে।

চোখে জল এসে গেল তাদের। কিছুক্ষণ ঐ নিয়ে, ঐ গরু-খুঁটানোর গান নিয়েই মজে থাকল তারা।

চাঁদবদ্‌নী যে দৌড়ুতে দৌড়ুতে গিয়ে কুম্‌হারপাড়ার মেয়েদের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কথা কিছুক্ষণ ভুলেই বসে থাকল তারা।

আবার যখন তাদের মনে পড়ল তখন চাঁদবদনী ফিরে এসে চুপটি করে গরুর খেল্ দেখছে।

কই লো, কই? হেই চাঁদবদনী, কী দেখলি ক'।

চাঁদবদনী ঘাড় নেড়ে জানাল, সে তাকে দেখতেই পায়নি। ঐ ঘাড়ই নাড়ল শুধু, সে কথা বলল না।

বয়স্ক একজন তড়পে উঠল, ঘাড় হিলাচ্ছিস যে বড়, গঙ্গা না কী?

চাঁদবদ্‌নী না না করে বলল, কী বলব, যাদের 'বহু' তারা তাদের ঘরে লিয়ে গেছে চুমাতে, আমি ত দেখতে পাই নাই।

চাঁদবদনী এম্নিতেই পাকা, সে আবার একটু পাকামি করে বলে দিল 'যাদের বহু'।

বয়স্ক একজন হেসে বলল, থাম্ পাকা, এখনও বেহাই হৈল নাই, ত 'বহু', তার আবার 'চুমাতে'! তুঁই কী ওদের ঘরতক গিয়েছিলি?

বস্তুত চাঁদবদনী কুম্‌হারপাড়ার কুলহিতে ঢুকেছিল বটে, তবে তাদের ঘরঅব্দি যায় নি।

যাবে কী, কুম্‌হারপাড়ার কুল্‌হিরাস্তায় ঢুকে যা দেখল, তাতেই তার মন ভরে গেল। সে থমকে থেমে থাকল। সে লোধাপাড়ায় বউড়ী-ঝিউড়ীদের চর হয়ে দেখতে এসেছিল সাবিত্রীকে—সে-কথা ভুলেই গেল কখন।

এসে দেখল—কুম্‌হারপাড়ার প্রায় প্রতিটা ঘরের নাচদুয়ারেই 'পৈড়ান গাড়া' হয়েছে। আর সে পৈড়ানের রূপ কী বাহার কী!

বেনী পাকিয়ে পাকিয়ে এই এত মোটা মোটা পৈড়ান! মনে মনে দুহাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী জড়ো করে একেকটা পৈড়ানের আকার কল্পনা করে নিল চাঁদবদনী।

পৈড়ানের খাঁজে খাঁজে গোঁজা এই এত বড় বড় গেঁদাফুল। মনে মনে দুহাতের চেটোর গোড়ালি জুড়ে আঙুলগুলোকে ছড়িয়ে-বেঁকিয়ে একেকটা ফুলের সাইজ অনুমান করল চাঁদবদনী।

আর সে-গেঁদার রং কী। হলদুগেঁদা লালগেঁদা রক্তগেঁদা। শুধু কী গেঁদা, করবলি, গুলাজফুলও গুঁজে রেখেছে খাঁজে খাঁজে।

লত-পতে পৈড়ান এম্নি দাঁড় করিয়ে রাখলে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে, তাই লাঠি পুঁতে ঠেকনো দিয়েছে। ঠেকনোর মাথায় পৈড়ানের টিকিতে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে টিক্‌লি কাগজ।

পড়ুয়া ছেলেরা কে জানে হয়ত নাম-ধামও লিখে রেখেছে। গঙ্গাধরকুম্‌হার পরমেশ্বরকুম্‌হার—দুটো নাম তো চাঁদবদনীর জানা।

ঢ্যাঙুআনের দল গোঠটাড়ের মাঠ থেকে গরু খেলিয়ে ফিরলে সে-পৈড়ান মাটি থেকে চড় চড় করে ওঠাবে ঢ্যাঙুআনের দলই। আর তখন উল্লাসে হাততালিতে কুলকুলিতে চারদিক ফেটে পড়বে না?

পৈড়ানের ধারে-কাছে দু-চারজন ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছিল, আসলে তারা পাহারাই দিচ্ছিল।

ভয়, ভয়ই কবল চাঁদবদনীর। প্রায় সুন্‌সান্‌ কল্‌হিরাস্তা, ঐ তো দু-চারজন ছেলে-ছোকরা যা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সবাই তো গোঠটাড়ে গরু খেলায় কী বল খেলায় মত্ত।

দেখতে পেয়ে তাকে চোর-চুরনী ভেবে বসবে না তো কুম্‌হাররা? চোর-চুরনী ভেবে তাকে আবার ধরে-বেঁধে না রাখে, মারধোর না করে!

প্রাণভয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আবার ফিরে এসেছে গোঠটাড়ে। কেউ তাকে পাঠায়নি, তবে তাকে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত 'জিগাস' করা কেন? কেন?

সে সন্তোষকুম্‌হারদের ঘর.অব্দি গিয়েছিল কী না—এ প্রশ্নের উত্তরে তাই একটা কথাও বলল না চাঁদবদনী। সে এবার খুব বড় করে মাথা নাড়ল।

না না না।

হতাশ হয়ে পড়ল লোধাপাড়ার বয়স্ক লোধানীরা। না না না—আর তারাই বা কী করবে. স্ব-ইচ্ছায় কেউ গেলে তারা তাকে আটকাবেই বা কোন্‌ হাত দিয়ে? তাদের চোখের সামনে দুহাতে শাড়ির ঘের প্রায় হাঁটুর উপর তুলে কুদি মেরে দৌড়ে এই গোঠটাড়ের উপর দিয়েই তো সে গেল।

যাক।

যে যায় একলা তাকে খায় ল্যাকড়া।একলা একলাই গেল যে সাবিত্রী, তাকে ল্যাকড়া-ই খাক।

খাক।

এতক্ষণে সাঁওতাল নাচের ওদিকটায় আরেকটা অঘটনও ঘটে যাচ্ছিল। একটুর জন্য ঘটল না।

কুস্‌মী নামের সাঁওতাল মেয়েটাকে জোর করে সিঁদুর পরাতে গিয়েছিল ছোটরাই নামের এক সাঁওতাল ছোকরা।

কী কুস্‌মী কী ছোটরাই—কেউই এ-তল্লাটের মেয়ে বা ছেলে নয়। তারা এসেছিল দূরদূর গাঁ থেকে, এ তল্লাটের সাঁওতাল আত্মীয়-কুটুম্বদের ডাকে হয়ত।

এমন তো হয়-ই, শারজম ঢারওয়া দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে সেই কোন্‌ কেওনঝর-বারিপদা-মুরুডা থেকে। ঢালাও 'মারাক' বা ময়ূরের পালক বয়ে এনেছে তারা-ই।

ছোটরাই ঝাঁকড়া চুলওয়ালা তাগড়াই যুবক, সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারে ও। হয়ত 'অকাতে

বাং চালা কানা' করে ঠিলিং-বাঁশিতে একটা জব্বর সুরও চড়িয়েছিল সে, কিন্তু লেপুর-ঝুনকী পায়ে পরা কুসমী তাকে নিল না। তার মাথা পর্যন্ত তোলা সিঁদুর-পোঁটলা ধরা-হাত কুসমী রুখে দিল।

ছোটরাই তাতেই বুঝে গিয়েছিল এ-হাত যে-সে হাত নয়। তার হাতের মুঠো থেকে পোঁটলা-সিঁদুর কেড়ে নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল কুসমী।

এতটা আবার বাড়াবাড়ি কুসমীর। গোঠটাঁড়ের একে নরম ধুলো, নাচানাচিতে সে-ধুলো আরোই তুলতুলে, তুলতুলে ধুলোর উপর ঝুরি ঝুরি সিঁদুর গুঁড়ো, যেন সাক্ষাৎ লহু, চাগড়া চাগড়া —ছোটরাই ঝট্ করে বাঁহাত দিয়ে খাম্‌চে ধরেছিল কুসমীর ডান হাত। আজ মুচড়েই ভেঙে ফেলবে।

মারামারি বাধবার উপক্রম দেখে রাবণ টুডু দৌড়ে এসে ছাড়িয়ে দিয়েছিল দুজনকে। এ বাবু, মেয়্যা যখন রাজি লয় তখন কাঁহাতক জোরজবরদস্তি!

অর আদের বাপ্‌লা? উঁহু উঁহু। বাঙখান!

সেই থেকে দল ছেড়ে অদূরে কষাফলতলায় বসে আছে ছোটরাই। সে এখন কী করবে? কুসমীর আশা কী সে 'জিওয়েৎ জনম লাগিৎ' সারাটা জীবন এ-জন্মের মতো ছেড়ে দেবে?

কী বিবাগী হয়ে যাবে সে?

কিছুদূর বাউলার তুল্য হেঁটে গিয়ে সে এখন বসে আছে ঐ তো কষাফলতলায়। সন্ধ্যা নামুক, রাত হোক, হিম-কাঁকর পড়ুক। কুস্‌মীর ভিতরটাও ঠাণ্ডা হোক রুগড়ী পাথরের মতো।

ছোটরাইয়ের আশা—তার ধারে-কাছে, হতে পারেও একদম তার গায়ের কাছে সে তখন লেপুর-ঝুনকীর আওয়াজ শুনতে পাবেই পাবে।

ফুটবল খেলা শেষ।

মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে কুম্‌হারপাড়ার 'শক্তিসংঘ' আজকের খেলায় জয়ী হয়েছে।

সারা মাঠ জুড়ে কুম্‌হারপাড়ার 'শক্তিসংঘের' খেলোয়াড়রা ক্লাবের পতাকা নিয়ে ছুটোছুটি করছে। মাহাতোপাড়ার 'অগ্রগামী' দলের খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে পুরোপুরি শুয়ে পড়েছে।

তাদের মুখে আর কোনো রা নেই।

এখনই পুরস্কার বিতরণী সভা বসবে।

দুটো খাসিই জিতে নিয়েছে কুম্‌হারপাড়ার খেলোয়াড়রা। তার মানে দুটো খাসিই আজ রাত্রে কাটা হবে। মাহাতোপাড়ার খেলোয়াড়রাও মাঠে শুয়ে শুয়ে শুধু ঘাস ছিঁড়বে না। তারাও ভেড়া কাটবে। তবে দুটো নয়, একটা ভেড়া।

আর গুড়খার বেটা নীলু, নীলেশ্বর যে কী করবে—সে যাবে কোন্ পাড়ায়? কুম্‌হারপাড়ায় না মাহাতোপাড়ায়?

কাঁড়াল-কোঁড়ল মুরগী বাচ্চার মতো সে মাঠেই গোঠটাঁড়েই ঘোরাঘুরি করছিল।

দেখতে পেয়ে বয়স্ক লোধানীরা ডাকল, আয় নীলু, ঘরকে চ!

নীলু কোনো উত্তর দিল না। পায়ে ওলর্ডাটার বল মারার ভঙ্গি করেই যাচ্ছিল। করেই যাচ্ছিল।

লোধানীরা ভাবল—তাদের ডাক বুঝি নীলুর কানে যায়নি। তাই তারা একসঙ্গে অনেকেই হাত নেড়ে হাঁক পেড়ে স্বজন-বিয়োগের আশঙ্কায় ঘন ঘন ডাকতে লাগল।

ডাক শুনে রীতিমত বিরক্ত নীলু বলল, আমি এখন যাব নাই, কুম্‌হারপাড়ায় 'পৈড়ান-উঠা' দেখব।

কিন্তু রাত হয়ে যাবেক যে ধন, একলা যাবি কার সঙে?

কেনে আমার সাবিবিটি ত আছে।

সাবিবিটি? সাবিবিটি?

এর-তার মুখের দিকে বুড়ি লোধানীরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর বলল, সে ত চলেই গেছে নীলু।

কুথায়? কখন?

উ ত উহার ঘর চলে গেছে বাপ।

উহার ঘর? কোথায়—লোধাপাড়ায়?

নাই ধন, বলেই বয়স্ক লোধানীরা আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, নাবালক শিশুকে একথা বলা কী ঠিক হবে?

তারপর তারা ঘুরিয়ে বলল, সেই বলে নাই—

কুঁখির ভিখাড়ি দুয়াড়ে ডাঁড়ালে
ভিখ দিলে ভিখ লয় নাই, কড়র ঝিকে খুঁজয়
কড়ক ঝিক দিম নাই কড় হেবেক্ শুধা
গাছের বাইগন দিয়ে দিড়ে গাছ হেবেক্ শুধা?

তবু ত কড়র ঝিকে কড়র বাছ্যকে পরের হাতে পরের ঘরে দিতে হয়। মেয়্যাদের জীবনভর বাপঘরে থাকতে নাই ধন।

কীসব হেঁয়ালি কবছে এরা—নীলু ঠিক বুঝতে পারে না। সে মাথা নিচু করে একটা নুড়িপাথরকে বল বানিয়ে এ-পা ও-পা করতে লাগল। করতে করতে বয়স্ক লোধানীদের কাছ থেকে দূরেই সরে গেল সে।

বয়স্ক লোধানীরা অতঃপর হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবল—বুঝে কী আর নাই, স-ব বুঝে। নতুন পিসার ঘর যাবে নীলু, লোধাপাড়া আজ সে যাবে নাই।

আর মাত্র দুটো গরু খেলাতে বাকি। ঐ দুটো গরু খেলানো শেষ হয়ে গেলে ঢ্যাঙুআনের দল গোঠ-টাঁড় ছেড়ে গ্রামের ভিতর ঢুকে যাবে, ঢুকে যাবে পৈড়ান ওঠাতে। গোব্‌রাসাঁওতালের 'গরু-চাম'-এর খেলা শেষ, এবার সামাইসাঁওতালের খেলা শুরু হবে।

ঐ তো সামাই ঢ্যাঙুআনের দলের বাইরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

ঢ্যাঙুআনরা চলে যাবে, তারপরেও গোঠটাঁড়ের মাঠে সাঁওতাল নাচ চলতে থাকবে।

কুম্‌হারপাড়ার 'গ্রাম-ফান্ড' থেকে আলোর ব্যবস্থা করা হবে, হ্যাজাক লাইট।

দু-তিনটা হ্যাজাক-লাইট জ্বেলে দেওয়া হবে। গোঠ-টাঁড়ে নাচুক তারা সাব্লারাত্তির। লাগুক তেল, ম্যাণ্টেল—সে তো দেবে কুম্‌হারপাড়ার 'গ্রাম-ফান্ড'।

তারপরেও আরো কতক্ষণ, আরো কত রাত্তির যে কষাফলতলায় লেপুর-ঝুনকীর আওয়াজ শুনতে বসে থাকবে ছোটরাই!

গোঠটাঁড়ের মাঠের দক্ষিণদিক বরাবর একজায়গায় এখনও সার সার বসে আছে লোধাপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা, বয়স্ক লোধানীরা।

তাদের মধ্যে একজন নেই। একজন নেই, একজন নেই।

আসার সময় সংখ্যায় তারা যতজন এসেছিল, তার থেকে একজন এখনও কম আছে। একজন, একজন।

এখনও তাদের আশা—বেলা তো এখনও ডোবেনি, সাবিত্রী আসতে পারে। আসবেই আসবে সাবিত্রী।

এই ফাঁকে কুম্‌হারদের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখতে গেছে সে।

কুম্‌হারপাড়া সাবিত্রী যে দেখেনি, তা তো নয়। কতবার দেখেছে।

তবু, পরবের দিন বলে কথা। পরবের দিনে চেনা গ্রামও অচেনা হয়ে যায়, চেনা মানুষকেও কেমন অচেনা লাগে।

আশায় আশায় তারা বসে আছে, বসে আছে কুম্‌হারপাড়ার কুল্‌হিরাস্তার দিকে মুখ করে। এলে ঐদিক দিয়েই তো আসবে সাবিত্রী।

কুম্‌হারপাড়ার সব বউড়ী-ঝিউড়ীরাই যে গোঠটাঁড়ের মাঠ ছেড়ে চলে গেছে, তা তো নয়। এখনও অনেকেই বসে আছে।

গরু-খুঁটাও তো এখনও শেষ হয়নি। শেষ দুটো গরু তো এখনও বাকি! আর, ঢ্যাঙুআনরাও ঐ দুটো গরুকে খেলাবে খুব মন দিয়ে।

কারণ, তারা তো জানে ঐ দুটো হলেই শেষ, এ-বচ্ছরকার মতো শেষ। শেষ, শেষ।

আবার শুরু হবে আগামী বছর, আজ থেকে ঠিক এক বছর বাদ। তাই যত খুশি যতটা পারে মন দিয়ে ঐ দুটি গরু খেলানো যায়, তাই খেলাচ্ছে ঢ্যাঙুআনরা।

গরু খেলানো যতই শেষ হয়ে আসছে, ততই গোব্‌রাসাঁওতালের মাটিতে গড়াগড়ি, ডিগবাজি খাওয়াও বেড়ে যাচ্ছে। আগে আগে যেখানে ডিগবাজি খেত একটা, এখন সেখানে ডিগবাজি খাচ্ছে তিনটা। তিনগুণ, তিনগুণ।

কুম্‌হারপাড়ার ফুটবল খেলোয়াড়রা নিজেদের খেলায় বিজয়ী হয়ে এবার বলখেলার মাঠ ছেড়ে গোঠটাঁড়ের মাঠে এল গরুদের খেলা দেখবে বলে। যেটুকু দেখা যায় খেলা শেষের খেলায়।

তাদের পিছু পিছু এল নীলু।

নীলু যে আজ কী করবে, তাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বয়স্ক লোধানীরা।

কাছাকাছি এলে হাতের ইশারায় আরো কাছে আসবার জন্য সমানে অনুরোধ করে যাচ্ছে তারা। আবো কাছে এলে হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ে নীলুকে আঁকড়ে ধরে কোঁচড়ে পুরে ফেলবে তারা।

কিন্তু নীলেশ্বর আজ যেন মরীরা। মরীয়া, মরীয়া।

কতবার কুম্‌হারপাড়ার খেলোয়াড়রা, চাম-বলের খেলোয়াড়রা লোধাপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীদের পাশ দিয়েই গেল, কিন্তু নীলু তাদের পিছু পিছু এসেও থেকে গেল দূরে। দুটো আপদ-বিপদের কথা যে কানে কানে নচেৎ ফিস্ ফিস্ করে বলে দেবে বয়স্করা—তার কোনো উপায়ই রাখল না নীলু।

অবশেষে বেলা পড়ে এল, কদমডাঙার ওদিকে লাল রুগড়িভরা টাঁড়-টিকরে লাল আভা ছড়িয়ে সূর্য ডুবে গেল।

যে-দুটো গরু খেলাতে বাকি ছিল, অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে খেলিয়ে বেলাটাকে ডুবিয়ে দিল ঢ্যাঙুআনের দল।

এসেছিল তারা গ্রাম থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে, এবার তারা মাঠ থেকে যাবে উত্তরে, উত্তরে, গ্রামের দিকে।

গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা পরবের গরু খেলানো কাড়া খেলানোর 'পাট' চুকে বুকে গেল। এবার শুধু পড়ে থাকল পৈড়ান তোলার কাজ।

গোবরাসাঁওতাল খেলা শেষে তার গরু-চামটার দিকে একবার চোখ তুলে দেখল। এ-বছ্ছরকার মতো শেষ, ঘরে ফিরেই মাচায় তুলে রাখবে, আবার টেনে বের করবে আগামী বছ্ছর।

চামড়াটা জব্বর, এত এত যে গরু-কাড়ার শিংয়ের উপর চামড়াটা থেপে দিয়েছে, তবু কোথাও এতটুকুও চিড় ধরে নি, ছিঁড়ে যায়নি। ঘষা একটু আধটু লেগেছে বটে, তবে তুলনায় তেমন কিছু নয়।

আর গোব্রার শরীরেও গোঠটাঁড়ের ধুলোবালি লেগেছে যথেষ্ট, তবে শরীরের কোথাও গরুর শিং তো ঢুকে যায়নি।

নিজের শরীরটার দিকেও একবার চেয়ে দেখল গোব্রা। এত এতবার রাগে উগ্রচণ্ড গরু কাড়ার শিংয়ের উপর সশরীরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে, তবু কোনো গরু কাড়াই তো তাকে এতটুকু জখম করেনি!

সেই গোব্রার খেলাও শেষ। এবার এসেছে সামাই, ঐ তো। এতক্ষণ সে বাইরে বাইরে ছিল, এবার সে ঢ্যাঙুআনের দলেই ঢুকে পড়েছে। গতকাল পর্যন্ত সে আড়ায় পাড়ায় খড়ের 'বান্দর' খেলিয়েছে, আজ সে তুলবে নানা রকম কলকাঠি করা বেনাঘাসের পৈড়ান।

'তা-না না-না' করে ঢ্যাঙুআনরা ফিরতে লাগল, এবার তো ফেরার পালা। তাদের আগে-পিছে সেই চ্যাঙনা-ম্যাঙনা ছেলেমেয়ের দল।

কুম্‌হারপাড়া কাম্‌হারপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা যারা এতক্ষণ গোঠটাঁড়ের মাঠে নিজেদের আসন অটুট রেখেছিল, এবার তারাও ফিরতে লাগল।

ফিরতি-পথে তারা মনে মনে বলল, গরু-খুঁটা পরব যেন বড় তাড়াতাড়ি বড় সত্বর ফুরিয়ে গেল। একদিনের জায়গায় দুদিন ধরে গরু খুঁটালে কাড়া খুঁটালে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ঢ্যাঙুআনদের?

বলখেলার মাঠে খেলা তো শেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই। হেরো খেলোয়াড়রা যা বসেছিল, শুয়েছিল মাঠের এখানে ওখানে। এবার তারাও ধীরে ধীরে উঠে পড়ল।

পুরস্কার বিতরণের পর্বটাও শেষ। খাসি-ভেড়া নিয়ে যে যার সে তার চলতে লাগল। দুটি খাসি গেল কুম্‌হারপাড়ায়, একটা ভেড়া গেল মাহাতোপাড়ায়।

সব দেখে শুনে, সব নয় সব নয় শুধুমাত্র পৈড়ান-ওঠাটুকু অদেখা রেখেই, দিশাহীন নিরুপায় নীলেশ্বরও লোধাপাড়ার দলটার পিছু পিছু নিজেদের ঘরের পথ ধরল।

বয়স্ক লোধানীরা এখন তাকে আর তেমন আমল দিচ্ছে না। আসছে যখন, তখন তাকে নিয়ে আর তাদের ভাবনা কী?

ভাবনা তাকে নিয়েই, যে আসছে না। সেই সাবিত্রী।

তাহলে সত্যি সত্যি সাবিত্রী থেকে গেল? স্ব-ইচ্ছায় থাকল, না তাকে তাঁরা জোর করে আটকে রাখল? ঠিক জানা গেল না।

জানা গেল না, জানা গেল না।

তবু এটুকু জানা গেল, বয়স্ক লোধানীরা এটুকু বুঝল—যে গেল সে বরাবরের জন্যই গেল। রাত কাবার করে ফিরে এলে লোধা-জনমানুষ আর কী তাকে বরণ করে ঘরে তুলবে?

হরগিজ্ না।

ঘরের বার হয়ে যে গেল সে তো বার-ফটকা, বাইরের জিনিস।

মনটা তাদের বড় খারাপ হয়ে গেল। এতদিন যাকে তারা পালল-পুলল, হাতে-নাতে বড় করে তুলল, হাতে নাই করুক চোখের সামনে বড় হতে দেখল—সে কী না আজ তাদের ছেড়ে তাদের সমাজ ছেড়ে চলে গেল?

গেল গেল, চিরতরে ভিনু লোকের ঘরে ভিনু জাইতের ঘরে? মনে ত লাগবেকেই ধন। সাবিত্তিরির মনেও কী আর একটুর জন্য হৈলেও ইসব কথা আসছে নাই?

নাই দিদি, নাই। সাব্বি ত যাবার তরে পা বাড়াঞেই ছিল। হাত ধরে টানলেও যাইত, না টানলেও যাইত। সেই বলে নাই—

লাল শালুকের ফুল ফুটে আধা রাইতে
যার সঙে যার গুপন পিরীত
মরিলে কী ছুটে বন্ধু
মরিলে কী ছুটে?

গোঠ-টাঁড়ের মাঠে সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের এখনও ছুটি হয়নি। তারা এখনও নেচে চলেছে, হয়ত সারারাত ধরে নাচবে। সারারাত ধরে বাজবে, লিব্বই লিব্বই লিব্বই লিব্বই লিব্বই লিব্বই!

আধারাতে শালুকের ফুল ফুটে 'আলা' হয়ে যাবে। এ-পর্যন্ত সিঁদুর লেপালেপির 'কেস' ঘটেছে দুটো।

উঁহু, দুটো নয়, একটা।

আরেকটা তো সিঁদুর ঘষতে গিয়েও ঘষতে পারেনি। কষাফলতলায় এখনও বসে আছে ছোটরাই। লেপুর-ঝুনকী শোনবার অপেক্ষায়।

ভূরখা ইপিল উঠবার আগেই সে কী শুনতে পাবে?



ভোর ভোর বসন্ত কামিল্লা হেঁটে চলেছে হন্‌হন্ করে। গোঠটাঁড়ের মাঠের উপর দিয়ে, মাঝুডুবকা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ঠাকুরবাঁধের পাশ দিয়ে, জোড়া শালতলা ধ'তলাকে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে রেখে।

ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে কে জানে এদের পরব শেষ হয়েছে তো? দুদিনের পরবকে টানতে টানতে চারদিন, চারদিনের পরেও তার জের রেখে দেয়।

শেষ হয়েও শেষ হয় না। ফুরোয় না, ফুরোয় না।

খালি জল আর জল, হ্যাঁ জলই তো, মদ-হাঁড়িয়া জলছাড়া বা কী? তাই খেয়ে এ ক'দিন কাটিয়ে দিয়েছে। খিদেও পায় না লোকগুলোর? দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতেও এদের মন করে না?

করে না, করে না।

না, হলে চুরি-ছ্যাঁচড়ামি ছেড়ে কাজের ধান্দা করতে বললে, চোখ কপালে তুলে বলে কী না, কী কাজ? 'নামাল' খাটতে যা, বউড়ী-ঝিউড়ীদের কামিন খাটা—ইচ্ছা থাকলে কাজের আবার অভাব?

না রাইবুলোধার উত্তর, আমাদের জাতে ওসব নেই। জাতে নয় জাতে নয়, বল্ তোদের ধাতেই নেই। স্বভাবে নেই, কিন্তু বেশ তো গীত ফেঁদেছিস! আহা কী যেন কী যেন—"কামিন ডাকা বড় খোসামদি, কামিন না আসিত যদি?"

সেই কামিন-ডাকা খোসামোদির কাজটাই এই ভোর ভোর করতে চলেছে বসন্ত।

বসন্ত কামিল্লার রাজ্যপাট তো এতদ্-অঞ্চলেই। খসা-তিলের সময় খসা-তিল, মহুলের সময় মহুল, বিরি-কুরথির সময় বিরি-কুরথি আর আখের মরশুমে আখ-গুড় জলের দরে কিনে চালান করে দেয় বেলদা-খাকুড়দা-খড়গপুরে।

এখন এই ধানকাটার সময়ে 'নামাল' না হোক কন্ট্রাক্টে কুলি-কামিন সে যদি আশপাশের গাঁ-গঞ্জের চাষীদেরও যোগান দিতে পারে, তবুও লাভ। লাভ মানে? নগদা-নগদি পয়সাও ঢালতে হচ্ছে না, আবার ফোকটে নগদ কিছু পয়সাও এসে যাচ্ছে।

বসন্ত কামিল্লা খর খর করে হাঁটছে, খর খর—পরবের আগে রাইবু তো রাজিই হল না, আজ দেখি। শেষবারের মতো দেখি। খিদার চাপ থাকলে বাপ বলতে আর কতক্ষণ!

গোঠটাঁড়ের মাঠের উপর দিয়ে আসার সময়ে কামিল্লা দেখেছে, বাসিফুলের মাঠ। বাসি গাঁদা আর বাসি শালুক। ছেঁড়া পাপড়ি আর ছেঁড়া মৌড়ের ছড়াছড়ি।

ত্রাসে-আক্রোশে নেচে-কুঁদে অবলা জীবগুলো গলার মালা কপালের মৌড় ছিঁড়ে ফেলেছে। পায়ের খুরে মাটি আঁচড়েছে। বেগতিক দেখে নাদি ফেলেছে গাদাগাদা। গাদা গাদা।

বসন্ত কামিল্লা আরেকটু হলেই বেভুলে নাদিতে পা দিয়ে ফেলত, একটুর জন্য বেঁচে গেল। বেঁচে গেল, বেঁচে গেল।

আসলে সে তখন ভাবছিল লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীদের শরীর-স্বাস্থ্যের কথা। বনে-জঙ্গলে শাবল-খন্তায় আলু-তুণ্ড খুঁড়ে বেড়ায় বলে হিল্লোলে হিল্লোলে তাদের শরীর হয়েছে ডলমলে। ডল-মলে শরীরে তারা খাটতেও পারে।

আসলে কামিল্লা মনে মনে হিসাব কষছিল লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীদের কামিন খাটিয়ে কতটা সুখ, কতটা লাভ। একবার, অন্তত একবার সে যদি রাজি করাতে পারে রাইবুকে—

আর এসময়ই বে-খেয়ালে বসন্ত পা দিতে গিয়েছিল গোময়ে। সামান্য লাফিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে মনে মনে সে বিরক্তিতে বলে উঠল, অবলা জীবগুলোকে হাগিয়ে-মুতিয়ে কী লাভ? কতটা সুখ? কী যে তোদের পরব! কুমোর-কামার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-মাহাতোরা তো 'বাঁদনা' বলতে অজ্ঞান!

গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটা হাটুয়াদের নেই, কামিল্লাদেরও নেই। তাদের আছে বড়জোর 'পঁড়ুয়াষ্টমী', 'ভাইফোঁটা'।

বল খেলার মাঠের উপর দিয়ে আসার সময়ে কামিল্লা আরো দেখেছে, লাল নীল রঙীন কাগজের অজস্র পতাকা, ফুল—সারারাতের শিশির জলে এখন ভিজে সপ্‌সপে। মাঠের উপর দিয়ে চলতে গেলেই তলপায়ে আঠার মতো জড়িয়ে যায়।

দু-চাট্টা ফ্যাত্‌ফ্যাতে কাগজ পায়ের তলায় আটকে যেতেই বসন্ত পা ঝেড়ে মনে মনেই বলল, এই হয়েছে আরেক সর্বনেশে খেলা! কী রোদ কী বৃষ্টি জব্‌জবে ঘামে কাদায় ভূত হয়ে কী বড়রা কী ছোটরা চামড়ার বলে হরদম লাথি মারছে। লাথি মারছে, লাথি মারছে।

কাপ-শিল্ড তো আর নেই, তাদের জায়গায় ছাগল, খাসি আর ভেড়া। ঐ লোভেই লোভেই এত!

কদমডাঙার কষাফলতলার ওদিক দিয়ে বসন্ত কামিল্লা আসেনি। এলে আরেকটা জিনিস সে অবশ্যই দেখতে পেত—ঝাঁকড়া কষাফলগাছটার তলায় অজস্র ময়ূরের পালক কে যেন সারারাত ধরে ছিন্‌-ছাতুর করে ছিঁড়ে রেখেছে।

কে আর—ছোটরাই, ছোটরাই।

কষাফলতলায় বসে সে সারাক্ষণ চোখ রেখেছিল গোঠটাঁড়ের মাঠে। ক্রমে বেলা আড় হয়ে ডুবেও গেল। অন্ধকার নামল রাত বাড়ল। ছোটরাই কান খাড়া করে থাকল—কুস্‌মীর পায়ের লেপুর-ঝুন্‌কী শোনবার অপেক্ষায়।

লেপুর-ঝুনকী বাজিয়ে কুস্‌মী আর আসেনি। হতাশায়-নিরাশায় ছোটরাই সঙ্গে আনা নাচের ময়ূর-পালকটাই সারারাত ধরে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে রেখেছে। ভূর্‌খা-ইপিল ভোরের শুকতারা ওঠার আগেই ছেঁড়াপালক দু-পায়ে দলে সে চলে গিয়েছে যেদিকে দুচোখ যায়।

যাবার সময় হয়ত সে বলে গিয়েছে গোঠটাঁড়ের মাঠকে, কদমডাঙার টাঁড়-টিকরকে, নিদেনপক্ষে ঝাঁপুড়-ঝুপুড় কষাফলগাছটাকেই, জোহার জোহার, ইসালে ত হৈল নাই, টাঁড়-বিরিক্ষি! হামি শুখা মুখে চলে যাচ্ছি, সামনের সনে সামনের সহরায়ে ফের দেখা হবেক, হঁ।

কষাফলতলার ওদিক দিয়ে এলেও বসন্ত কামিল্লা কী আর এতকথা শুনতে পেত? সে তো তখন মনে মনে হিসাব কষছিল, কত ধানে কত চাল? একেকজন লোধানীকে কামিন খাটিয়ে দিয়ে-থুয়েও তার কত থাকল? টাকায় টাকায় ধূল পরিমাণ—

কে কুসমী কে ছোটরাই, কী তাদের বৃত্তান্ত—তার তো জানা নেই, জানা নেই। আর জানা থাকলেও তার মন তো তখন পড়ে আছে রাইবু-গুরভা-শরাবণ-শত্রুঘ্নে।

আর আর লোধারা লোধানীরা রাইবুকে তাদের মাতব্বর মানে, তল্লাটের লোধাবস্তিগুলো রাইবুকে ভয় পায়, তার কথায় উঠে বসে। যদি এই কর্তালি রাইবুর একবার ভাঙতে পারে কামিল্লা, তবে সমস্ত লোধাপাড়াই এসে যাবে তার কব্জায় তার করতলে।

উৎসাহিত বসন্ত বসন্তের সমারোহ নিয়েই দোরখুলির লোধাপাড়ায় ঢুকল। যদিও এখন না-শীত না-বসন্ত, হেমন্ত হেমন্ত, কাঁঠালপাতা বটপাতায় হলদে ছোপ ধরতে শুরু করেছে। ভোর ভোর কুলবুদা কেঁদবুদায় মাঠে ঘাটে বিরিবাইগনের ঝাড়ে মাকড়শা মুখের লালা ঝরিয়ে জাল বুনে রাখছে ঝিল্‌ঝিল্।

লোধাপাড়া তো আর কুম্‌হারপাড়া সদ্‌গোপপাড়া রাজুপাড়ার মতো ঘনসন্নিবদ্ধ নয়। একটা ঘর এখানে তো আরেকটা ঘর ঐ যে ঐ লাটা-পাটার ওধারে, একটেরে। বিচ্ছিন্ন। এই তাল-মূঢ়া এ-ঘরের চৌহদ্দি তো ঐ বন-খেজুর ও-ঘরের সীমা-সীমানা।

বসন্ত কামিল্লার তাতে অসুবিধা বই সুবিধাই হয়েছে। সে গুরভার ঘরে ঢুকল, আর রাইবু তাকে দেখতে পেল না। তাছাড়া খাটো গলায় গুরভার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করল, আর রাইবু তার বিন্দুবিসর্গও টের পেল না। আলাদা তো তারা হয়েই আছে, দুহাত দুদিকে ঠেলে আর তাদের আলাদা করতে হবে না কামিল্লাকে।

বসন্ত কামিল্লা 'মার দিয়া কেল্লা' এই ভঙ্গিতে তেল-চিটে ফুলশার্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরা পয়সা বাজাতে বাজাতে লোধাপাড়ায় ঢুকছে।

বসন্ত কামিল্লার ঘর আশপাশের গ্রামে নয়। তার গ্রাম সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে, কাঠুয়াপালে।

নদীর ওপারে কাঠুয়াপালে বসন্তর বাড়ি হলে কী হয়, তার সমস্ত রকম কাজ-কারবার তো এপাশে, নদীর এধারে।

এমনিতে তার জাত-ব্যবসা গহনা তৈরি করা। সোনার নয় সোনার নয়, বেশির ভাগই রূপার। এ তল্লাটে সোনার গহনা কিনবে—সে আর ক'জন আছে? তবু আছে, আছে। কতক মাহাতোপাড়ায়, সদ্‌গোপপাড়ায়, কুম্‌হারপাড়ায়। এ তো গেল তার চিরকেলে জাত-ব্যবসা। তাছাড়া তার আছে মরশুমী কাজ, দেওয়া-নেওয়া। হালে ধরেছে—কুলি-কামিনদের জোগানদারির কাজ-কাম।

গহনা-গড়া, এটা-সেটা কেনাকাটার সুবাদে এ-তল্লাটে প্রায় সবঘরেই সব গ্রামেই তার অবাধ যাতায়াত। কেউ তাকে মানা করে না। এমন কী বউড়ী-ঝিউড়ীরাও না।

তাকে দেখে লজ্জা পায় না, মাথায় বুকে কাপড় টানে না, আঙটি-আঙট পরতে হলে হাতের আঙুল পায়ের আঙুল অবলীলায় বসন্তের হেপাজতে ছেড়ে দেয়। এই ফাঁকে এই সুযোগে বসন্তও যতটা পারে দেখে নেয়।

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সঙ্গেই তার ভাব-ভালবাসা বেশি।

আজ সে দেখল লোধাপাড়া সুনসান। হল কী? সব গেল কোথায়? গেল-রাতের কথা বসন্ত তো আর জানে না, শোনেও নি। সে তো এই আসছে ঘুম থেকে উঠে নদী পেরিয়ে। সকাল সকাল কামিন ধরতে। রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখাও হয়নি তার।

ক'টা কুকুর, ঢ্যাপচুপাখি আর কতক কাক-কুয়া যা দেখল হেথাহোথা উড়ে যেতে। কী হল? ঘর-দোর ছেড়ে সব গেল কোথায়?

বসন্ত ভাবল, কে জানে কোথায় চলে গিয়েছে তারা। জাতিটা তো জন্ম যাযাবর। উথলু-উথলু, উঠল বাই তো কটক যাই।

না, লোধাপাড়া লোধাপাড়াতেই আছে। চোখ সয়ে গেলে বসন্ত দেখল, ঐ তো ঐ এক-আধটা কালোকুলো ন্যাঙটা-ভুটুঙ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছে। কালোকুলো কেঁদ-বুদার সঙ্গে তারা যেন মিশে আছে। না-নড়লে না-চড়লে বুঝবার উপায় নেই যে তারা আছে। আছে, আছে।

পরবের পরের দিন, বড়রা সব বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছে। যে ক'জন ন্যাঙটা-ভুটুঙ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছিল, তারা তেমন আমল দিল না বসন্ত কামিল্লাকে। বসন্তকে আমল দেবে কী—সে তো তাদের ঘরের লোক। এ পাড়ায় কতবার এসেছে। এসেছে মানে? ঘরের ভিতর একদম ভিতর-ঘরেও ঢুকে গিয়েছে।

অচেনা অদ্ভুত লোক দেখলে তারা অবশ্য এতক্ষণে ছুটে পালাত। ছুটে পালাত 'অঁড়গা-ধরা' ভেবে। 'অঁড়গা-ধরা'—তার মানে ছেলে-ধরা। ঐ সেই কথায় আছে না—

ছ্যাইলা লুকা, ছ্যাইলার মাগো
ছ্যাইলা লুকা—
আসছে দুটা অঁড়গা-ধরা।
লই গো আমরা অঁড়্গা-ধরা
বিষ্টুপুরের পাখ-মারা।

অঁড়গা-ধরা তো নয়, বিষ্টুপুরের পাখ-মারাদের মতোও দেখতে নয় বসন্ত কামিল্লাকে। ধুতি-জামা-পরা হাটুয়া বাবুভাই সে। গায়ে এন্ডির চাদর, পায়ে জুতো। জুতো-পায়ে মস্মস্ আওয়াজ তুলে সে হেঁটে যাচ্ছে।

তার পাশ দিয়েই একটা ন্যাঙটা-ভুটুঙ অতিরিক্ত ব্যস্ততায় পা চালিয়ে চলে যাচ্ছে। তাকে আটকে ধরল বসন্ত। বলল, এই তুই কার ছুয়া?

ছেলেটি শুনল কী শুনল না, ভাবল, তাকে বুঝি লেবেঞ্চুস দেবে লোকটা গোল গোল, লেবেঞ্চুস, চিড়রার গায়ের মতো ডোরা কাটা ডোরা কাটা।

সাধারণত অঁড়গা-ধরারাই লেবেঞ্চুস দিয়ে ছেলে ভুলায়। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলে ধরে। এ-লোকটা তো আর অঁড়গা-ধরা নয়। তাই সে দাঁড়িয়ে পড়ে অকুতোভয়ে হাত পাতল।

দে।

কী?

এই যে ডাকলি?

ডাকলেই বুঝি একটা কিছু দিতে হবে? ঘুষ? বলেই কামিল্লা হাসল।

রাখ তোর দাঁত-বের-করা হাসি! ছেলেটা লাটসাহেবের মতো ভঙ্গিতে নিজের নুনু নিজ-হাতে টানতে টানতে, মোচড়াতে মোচড়াতে চলে যাবার উদ্যোগ করল।

বসন্ত কামিল্লা তাকে ফের ডাকল, শোন!

কী?

এবার কামিল্লা পকেট থেকে সত্যিসত্যি একটা কিছু বের করে তার হাতে দিল।

দিয়ে ফের জিজ্ঞাসা করল, তুই কার ছুয়া?

ছেলেটা খুশি হয়ে বলল, লগ্‌নার।

লগ্‌নার অর্থাৎ নগেনের ছেলে সে। কে নগেন অত মনে করতে পারল না বসন্ত। বলল, আর তোর মা?

জুরু।

বলেই কামিল্লার দেওয়া জিনিষটা মুখেপুরে চিবোতে চিবোতে ছেলেটা আগের চেয়েও অধিকতর দ্রুততায় নিজের কাজে চলে গেল।

বসন্ত কামিল্লা লোধাপাড়ার কুল্‌হিরাস্তায় আরেকটু এগিয়ে দেখল, একলোধানী ঘরের উঠোনেই মাটির উঁচু পিঁড়ায় বনখেজুরের পাতায় বোনা চাটাই পেতে ঘুমোচ্ছে, হাঁ করে। গায়ে বসন-ভূষণের কোনো আব্রু নেই। দু-চাট্টা মাছিও নির্লজ্জের মতো ঘোরাঘুরি করছে হাঁ মুখের চারধারে।

কী ঘুমরে বাবা! বসন্তর মনে হল, কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা মেরে ডাকলেও লোধানী বুঝি কিছু মনে করবে না। এরা কিছু মনে করে না। তাই করবে কী বসন্ত?

না, কেন জানি আজ তার ভয়-ই করল। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা মেরে ডাকলে কে কোথায় দেখে ফেলে রাগ করবে, হয়ত একটা তুলকালাম কাণ্ডই ঘটে যাবে শেষমেষ।

হাত গুটিয়ে রাখল বসন্ত। অথচ হাতে চূর পায়ে আঙুট পরাতে এদের গায়ে কতবার যে হাত রেখেছে সে!

আজ, এখন, খলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলা-খাঁকার দিয়ে কামিল্লা ডাকল, শুনছ কী লোধানী?

দু'তিনবার ডাকাডাকির পর লোধানী পাশ ফিরল। ঘুমের আঠা-জড়ানো চোখে বারেক দেখলও বসন্তকে। তারপর আবার করট ঘুরে শুয়ে পড়ল। এবার লোধানীর পিঠ থাকল বসন্তর দিকে। খোলা পিঠ।

নিরুপায় বসন্ত কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এ-ঘর ছেড়ে আরেক ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

তার সঙ্গে কী শীত কী গ্রীষ্ম একটা ছাতা থাকে। ছাতাটা বেঁকানো বাঁটে কাঁধ আঁকড়ে ঝুলতে থাকে। ঝুলতে থাকে, ঝুলতে থাকে।

কখনো কখনো সে-ছাতা কাঁধ থেকে হাতে নিয়ে বসন্ত চলন-রাস্তায় ছাতার পিছন দিকের শিকটা গিঁথে দিচ্ছে। ইচ্ছা করে কী আর, হাতে ধরলে এম্নিতেই ছাতার ছুঁচোল শিকটা মাটিতে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

আর তাতে একটা 'রেখ্' আঁকা হয়ে যাচ্ছে কুল্‌হি বরাবর চলন-রাস্তায়।

এই করতে করতে বসন্ত কমিল্লা আরেক ঘরে এসে পড়ল। এখানেও কেউ জাগত্ নেই। খলায় মাগ-মরদ দুজনেই পাশাপাশি শুয়ে আছে। শতুরা, শতুরার বউ।

শত্রুঘ্ন, অ শত্রুঘ্ন! কামিল্লা ডাকছে।

এক ডাকেই উঠে পড়ল শত্রুঘ্নশবর। শত্রুঘ্ন উঠল বটে, তার বউ নিয়তি কিন্তু পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। একটা জলজ্যান্ত হাটুয়ালোক এল ঘরে, বাবু-ভাই, আর লোধানী কী না আলুথালু শুয়ে থাকল?

হ্যাঁ, শুয়েই থাকবে। কার জন্য সে বুকে কাপড় টানবে-টুনবে? কার জন্যই বা মাথায় ঘোমটা দেবে? আরে ও ত কামিল্লা নৈস্যা। পায়ে হাত দিয়ে আঙট পরায়! দুদ্দুর! তাকে আবার লজ্জা কী!

শতুরা উঠেই চুটা-উটা বিড়ি-পাতার জোগাড় দেখছিল, 'পাকিট' থেকে বিড়ি বের করে ওকে দিল বসন্ত। ধরিয়েও দিল। তারপর দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ হাপুস-হাপুস বিড়ি টানল।

যে-চাটায়ে শুয়েছিল শতুরা, শতুরার বউ, সেই চাটাইয়ে বসেই বিড়ি টানছিল বসন্ত। বসন্তের মুখের দিকে আড়-চোখে দেখছিল শতুরাশবর। কামিল্লার মুখে মায়ের দয়ার দাগ!

কামিল্লার মুখে বসন্তের দাগের জন্যই তার নাম হয়েছে বসন্ত, নাকি তার নাম সত্যি সত্যিই বসন্ত—এ তল্লাটের মানুষ তা জানে না। জানে না, জানে না।

তাদের জানার আগ্রহও নেই। নামে কী এসে যায়? কামেই চেনা যায় মানুষকে। নাম পাল্টাপাল্টি করলে এই আমি শতুরাশবর কী বসন্ত কামিল্লা হয়ে যাব? না, বসন্ত আমার নাম নিয়ে শতুরাশবর হতে পারবে?

বসন্ত, বসন্ত।

শত্রুঘ্ন বলল, সাত সকালে কী মনে করে কামিল্লা?

আর আর বাবু-ভাইদের 'মহাজন' 'মহাজন' বলে সম্বোধন করলেও বসন্ত কামিল্লাকে তারা বসন্তও বলে না, বলে 'কামিল্লা'।

চোখ ছোট করে তদ্‌গত হয়ে বসন্ত বলল, কাল তোদের পরব গেছে, মদ হাঁড়িয়া টেনেছিস খুব, অনেক বেলা অব্দি এখন তোদের ঘুমালেও চলে। আর আমার? জানিস তো, খেটে খেতে হয়। অত 'পরব' 'পরব' করলে চলে? চলে না! পেটের ধান্দায় এসেছি ভাই।

বিড়ি টানতে টানতে শতুরা বলল, হঁ পেটের ধান্দা ত একর'ম সবু লোকেরই আছে, কামিল্লা।

উঁ-হুঁ, তোদের আবার পেটের ধান্দা? এই তো এত বেলা অব্দি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলি! তোর বউ তো এখনও ঘুমোচ্ছে।

বলবার ছলে বসন্ত আরেকবার সোজাসাপ্টা দেখে নিল শতুরার বউকে। তাকে কেউ দেখছে ভেবে শতুরার বউও যেন একটু নড়ল।

শতুরা বলল, নাই কামিল্লা, কাল রাতকে একটুকু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের ইদ্দিকে, আসবার পথে কিছু শুন্নো নাই?

না তো, কী আবার ঘটল?

আমাদের একটা ঝিউড়ীকে কুঁভাররা আটক করেছে।

আটক করেছে? জোর করে?

হঁ, কী বলব—'জোর করেই' বলতে পারি আবার 'জোর না করেই' বলতে পারি।

তার মানে? উদ্‌ব্যস্ত হয়ে পড়ল কামিল্লা, কী যে তোরা হেঁয়ালি করে বলিস!

হঁ, হিঁয়ালির মতন লাগছে এখন। কিন্তু হিঁয়ালিরও বাড়া বঠে, কামিল্লা।

কী রকম, কী রকম?

আটকাইছে—আমাদের ঝিউড়ীটার সঙে ওদের একটা ছোঁড়ার বেহা দিবে বলে।

'বেহাঘর বেহাঘর' বলে হেসে উঠল বসন্ত। বলল, এ তো আনন্দের খবর রে। কোথায় ফূর্তি করবি, তা নয়, দুশ্চিন্তায় শুয়ে পড়েছিস? এখনও ঘুমোচ্ছিস? ওঠ, ওঠ, লোধানী!

হাসতে হাসতে বসন্ত হাত দিয়ে ধাকালও দিয়ে বসল ঘুমন্ত শতুরার বউকে। শতুরা দেখেও দেখল না, খালি চোখ পিট্ পিট্ করল।

তারপর নিজেও ঠেলা মারল লোধানীকে। উঠ্ বহু, উঠ্!

নাদনগাড়িয়ার বিটিছ্বনা উঠে পড়ল। তাদের সাফা ছেলে ফুলেশ্বর কখন উঠে গিয়ে কোথায় কোথায় যে চিঁড়রা-চটি-বনি শিকার করে বেড়াচ্ছে!

শতুরার বউ উঠেই দেখল, কামিল্লা। একবার দেখল কামিল্লার মুখ, আরেকবার দেখল তার ডান পায়ের মাঝের আঙুলটাকে। পানপাতার মতো একটা রূপার 'আঙট' পরে আছে সে।

আঙটটা দেখছে, কামিল্লার মুখটা দেখছে।

আঙট-টা বসন্ত কামিল্লাই গড়ে দিয়েছে। কটা পয়সা আর দিতে পেরেছে তাকে লোধানী!

বসন্ত কামিল্লাও এতক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছিল, তালাস করছিল—তার দেওয়া আঙটটা লোধানী কোথায় রেখেছে। পায়ে, না ঘরে?

আঙটটা দুহাতে চেপে ধরে আড়াল করে নিয়তি বসন্ত কামিল্লাকে বলল, আজ তুমার মুখ দেখে উঠলম কামিল্লা, দিনটা যেন ভাল যায়!

বসন্ত কামিল্লা মনে মনে উশখুশ করে উঠল, এই রে! লোধানীর আজ যদি কোনো কারণে দিনটা খারাপ যায়, তবে চিরতরে তাকে অপয়া মনে করবে। আর কোনোদিন মুখ তুলেও মুখের দিকে চাইবে না।

হেসে জরপ করে বসন্ত বলল, না, দিন খারাপ যাবে কেন লোধানী? 'বেহা-ঘর' লেগে গেছে পাড়ায়, ওঠো, আমোদ কর।

শুয়ে শুয়ে শুনছিল, শতুরা বসন্তকে কালকের সন্তোষ-সাবিত্রীর ঘটনাটা বলছিল। লোধানী বলল, হঁ গেঁড়াকলের বেহাঘর বঠে। তুম্হি কুম্হারপাড়া দিয়ে আস-অ নাই? মুখপুড়ী সাবিত্তিরিকে দেখ-অ নাই?

না, না। বসন্ত দেখবে কী করে? সে তো এসেছে নদী পেরিয়ে দেউলবাড়-কিয়াঝরিয়ার ওদিক দিয়ে! কুমোরপাড়ার ভিতর দিয়ে তো সে আসেনি।

এখন মনে হল তার, এলেই ভাল হত। সে ঠিক করল, যাবার সময় সে কুমোরপাড়ার ভিতর দিয়েই যাবে। যাবেই যাবে। দুদণ্ড বসে থেকে সে আগাপাশতলা শুনেই যাবে। চাই কী চোখের দেখা একবারটি দেখেও যাবে কুমোরঘরের লোধাবউটিকে। এখন যেমন যাত্রাপালায় আকছার হচ্ছে—মুচিমায়ের শুচি ছেলে, মা জানে না ছেলে কার, শাশুড়ী চোর বৌমা বিচারক, ঘর ভাঙছে ছোটবউ—যতসব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম। তেম্নি এ-নামও দিব্যি চলে যায়—কুমোরদের বর লোধাদের কনে।

কার সঙ্গে কার? বসন্ত জানতে চায়, কুঁভারদের কোন্ ছুয়ার সাঙে লোধাদের কোন্ মাইয়ার বেহাঘর?

ভৈরবকুম্হারের বেটা সন্তোষের সঙে গুড়খার বহিন সাবিত্তিরির।

সন্তোষ? আ-হা হা-রে, ভৈরবের একমাত্র ছুয়া?

হঁ হঁ, সন্তুষ বঠে ন। উঠে দাঁড়িয়ে নিয়তি ঢিলেঢালা শাড়িটা গুছিয়ে পরল।

মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল বসন্ত। তবে তো যেতেই হয়, অবস্থাপন্ন চাষীঘরের ছেলে সন্তোষ। ভৈরবকুঁভার নির্ঘাত সোনা-রূপার গহনা গড়াবে। বানীবাবদ আজই কিছু অ্যাডভান্স নিয়ে যাবে বসন্ত।

কিন্তু কামিল্লা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না—লোধাদের এতে আপত্তি কিসের? বেশ তো দু-বেলা দু-মুঠো খেতে-পরতে পাবে!

অ শতুরা, অ লোধানী, ভালোই ত 'বেহাঘর'—তা তোদের আপত্তি কিসের?

আপত্তি নাই হবে কামিল্লা? তুমার জাইতের মেয়্যা ধরে ভিনু জাইতের লোক টানাটানি করলে তুমরা আব্দার-আপত্তি নাই করবে? হঁ, নাই করবে?

অ, জাত-বেজাত। বলেই একবার শত্রুঘ্ন, একবার শত্রুঘ্নর বউয়ের দিকে চোখ তুলে দেখল বসন্ত। কী বলবে সে? এসময় কী বললে এরা খুশি হবে?

ভেবে-চিন্তে বসন্ত বলল, কেনে, কুঁভার-ঘরে সন্তোষের যুগ্যি ঝি-অ নাই?

থাকবে নাই কেনে, আছে। অ-নেক আছে। কিন্তু দু-জনার ভিতর ঐ যে টুকচার—

কী টুকচার?

আলতো হাতে বসন্তকে ঠেলা মেরে লোধানী বলল, ভাব গ' ভাব, ভাব-ভালবাসা।

ভাব-ভালবাসা যখন, কামিল্লা হেসে উঠে বলল, তখন কথা তো স্বতন্ত্র। মিঞা-বিবি রাজি তো, সেই বলে না, ক্যায়া করে গা পাঁজী? আর তোরা আপত্তি করিস নে, শত্রুঘ্ন।

বসন্তকে নিজের পরিবার ঠেলা মারছে দেখে চোখ-পিটপিট শুরু করেছিল শতুরা, সে কিছু বললও না। কাপড় ঝেড়েঝুড়ে নিয়তি-ই বলল, নাই আমাদের কুনো আপত্তি ত নাই, যত আপত্তি ঐ রাইবু মাত্‌বরের।

রাইবু, রাইবু।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাইবুকে আর আর লোধারা মান্য করে, রাইবু যা বলবে তাই-ই হবে। রাইবু ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়েই চলবে লোধারা। আগুনে ঝাঁপ দিতে বললে আগুনেই ঝাঁপ দেবে—

রাইবু, রাইবু।

রাইবুর কূট-কৌশলে নিষেধাজ্ঞায় লোধাপাড়ায় এমন হাত-দড় এমন সহজলভ্য কামিন থাকতেও বসন্ত চাষের কাজে 'নামাল' খাটাতে তাদের নিয়ে যেতে পারছে না—আ-হা-হা রে উ-হু-হু-রে—

বসন্ত কামিল্লা খুব নিচু স্বরে বলল, একটা কথা বলি—রাইবু কী তোদের খাওয়াচ্ছে না পরাচ্ছে যে, তোরা অত রাইবু-রাইবু করিস? খাটছিস নিজ-হাতে হাঁটছিস নিজ-পায়ে, তোরা কী নাবালক যে রাইবু না ধরলে টলমল করে খানা-খন্দে পড়ে যাবি?

বলেই লোধা-লোধানীর মুখের দিকে চেয়ে ভাবান্তর লক্ষ্য করল কামিল্লা। না, কিছুই বুঝতে পারল না। শত্রুঘ্নশবর সেই এক রকম চোখ পিট পিট করে চলেছে, নিয়তিলোধানী যা তফাতে সরে গেল।

খলায় এখন হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে।

শতুরার বউ হেঁটে-চলে বেড়ালে বসন্ত লক্ষ্য করল—তার হাতে-গড়া আঙটটা এখনও লোধানীর পায়েই আছে। ঈষৎ সাদা লোধানীর পায়ে আঙটটা চকচক করছে।

পিঁড়ায় বসে বসন্ত দেখতে পেয়ে খুশিই হল। লোধারা তো আর গয়না-গাঁটি গড়াতে পারে না। তবু মন ভালো থাকলে, পাতলা ফিনফিনে ধাতুর, রূপার, একটা-আধটা আঙট-আঙুটি কানফুল-নাকফুল এম্নি এম্নিই দিয়ে যায় বসন্ত।

নগদ পয়সা তো আর দিতে পারে না তারা, ঐ বনের ফল-পাকুড়টা কখনো-সখনো পাড়ায় এলে হাতে তুলে দেয় লোধা-লোধানীরা।

বসন্তর তাতেই সয়, তার উপর লোধানীদের সঙ্গে ঠাট্টা-ঠিসারা, দু-চাট্টা হলিয়ে-ঢলিয়ে কথা-বলা, তাই বা কম কী—ঐ ঢের ঐ ঢের। যত গন্ধই উঠুক গা থেকে, যত তেলচিটে

বস্ত্রই গায়ে থাক, বেদিয়া-যাযাবরী লোধানীদের দেহের চোরা-টান বাবু-ভায়াদের মন কাড়ে, হড়হাড়ামদের না কাড়ুক।

ধান্দায় এসেছিস বললি যে, কী ধান্দা? এতক্ষণে মনে করিয়ে দিল শতুরা।

বসন্ত বলল, আর কী, ধান-কাটার মরশুম শুরু হল—এবার বউ-ঝিউড়ীদের কামিন খাটতে পাঠা।

রহ, রাইবুকে জিগাস করি।

হাত গুটিয়ে হাঁটুর উপর বেড় দিয়ে বসে থাকল শতুরা, শত্রুঘ্নলোধা।

ফের রাইবু? রাইবুর চেয়ে তুই বা কম কী শতুরা?

কম-বেশির কথা হচ্ছে নাই কামিল্লা, হাজার হক মাত্‌বর বলে কথা! উহার বাপ ছিল মাত্‌বর, এখন উ আমাদের মাথা, মাত্‌বর। বাপটা আর বাঁচবে নাই, এখন-তখন অবস্থা—

কামিল্লা ঝন্ ঝন্ করে পকেটের পয়সা বাজিয়ে চলে যাচ্ছিল রাগ দেখিয়ে। দৌড়ে গিয়ে শতুরা বলল, এক কাম কর কামিল্লা—

কী?

গুরুভাকে ধর। গুরভা মত দিলে রাইবু আর না করবে নাই, কামিল্লা।

আচ্ছা, তাই।

তাই, তাই।

রাইবুর বদলে না হয় গুরুভাকেই ধরবে বসন্ত। কিন্তু লোধাদের মতিগতি কী—কুঁভারদের সঙ্গে কী এবার লড়াইয়ে নামবে তারা? তাদের মেয়েকে আটকেছে, এবার কুঁভারদের মেয়েকেও কী আটকাবে লোধারা?

দাঁড়িয়ে পড়ে বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, তোরা এবার কী করবি?

কিসের কী? উট-মুখো হয়ে জানতে চাইছে শত্রুঘ্ন।

এই যে তোদের মেয়েকে আটকাল, এবার তোরাও কী কুঁভার মেয়েদের আটকাবি? না, বেহা-ঘরের বউ-ভাত খেতে যাবি ল্যাঙ ল্যাঙ করে?

দেখি কী হয়, রাইবুকে জিগাস করি।

ফের রাইবু? রাইবু, রাইবু।

না, শতুরাশবর কোনো কিছুই ভাঙল না। অগত্যা গুরুভার ঘুপচীর দিকেই এগিয়ে গেল বসন্ত।

আজকের দিনটায় আসা বুঝি বিফলে যাচ্ছে! লোকগুলোর চোখ-মুখ থেকে এখনও পরবই কাটেনি, তো কথা কী! এখনও সব পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

মাঝরাত, মাঝরাত। যেদিকে তাকিয়ে দেখে বসন্ত, সব যেন সুনসান, সুনসান। ঐ একটা-দুটো ন্যাঙটা-ভুটুঙ যা 'জলঘাট' বসেছে সেথা সেথা।

তার আশপাশে কাক উড়ছে, ফিঙে উড়ছে একটা কুকুর বসে আছে হ্যাল্ হ্যাল্ জিভ বের করে, অপেক্ষায় অপেক্ষায়। কখন লোধাখনাটা উঠে যাবে আর সে গিয়ে গরম গুয়ে মুখ দেবে।

'হাড়ি' 'হাড়ি বে' বলে এক-আধবার নাঙা-হাত তুলেছে ছেলেটা, ঐ হাততোলা-ই সার, গতজন্মের কুকুর বসে বসে হাই তুলছে এজন্মের। কিছুতেই আর উঠছে না।

গুরভার ঘুপচীতে হাজির হয়ে বসন্ত দেখল, অবস্থা একরূপ। যে যেখানে পেরেছে শরীরটাকে কোনমতে এলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এই গুরভা, আসল-পরব শেষ করে আজ কী তোদের ঘুম-পরব? এখনও ঘুমোচ্ছিস যে বড়, এই গুরভা?

তার বউ একটু নড়ে উঠল, কিন্তু চোখ না খুলে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

গুরভা চোখ খুলেছিল বটে, একবার দেখে নিয়ে ফের বুজতে গিয়েছিল চোখ, কী ভেবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

আরে, কামিল্লা যে, এত সকালে কী মনে করে?

গুরভা, এই তোদের সকাল? বেলা দেখেছিস—কতটা উঠল?

চোখ পিটপিট করে বেলার দিকে একবার দেখে নিয়ে চোখ কচলে গুরভা বলল, হঁ তাই'ত।

আর বিড়ি নয়, এবার সিগারেট ধরাল বসন্ত। গুরভাকেও একটা দিল। তারপর দুজনে চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানল। অনেক ধোঁয়া উড়ালো।

টানতে টানতে ধোঁয়া দিয়ে রিং বানাল। বসন্তও, গুরভাও।

চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে বসন্ত বলল, এবার বউড়ী-ঝিউড়ীদের দে, কামিন খাটাই।

হাঁ হাঁ, ধানকাটার মরশুম ধাঁই ধাঁই করে এসে পড়েছে। চাষাভুষাদের বাবু-ভায়াদের বিঘা-কে-বিঘা ধানজমি পাকা ধানে ভরে আছে। এবার ধান কেটে কেটে খলায়-খামারে তুলতে হবে। তারজন্য কামিন চাই, একটা-আধটা নয়, একগাদা। এত কামিন এ-তল্লাটে আর কোথায়? লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীরা এতদিন এ-কাজ করেনি, কেউ তাদের এ-কাজে নামায় নি, নামাতে সাহস পায়নি। নামালে, আর ধানচুরি হলে লোধাদের বদনাম। বদনাম, বদনাম। রাগে-দুঃখে লোধারা আর ও-পথ মাড়ায়নি। এবার বোধকরি জিম্মা নিয়েছে বসন্ত। তার জিম্মাদারিতেই ধানকাটা হবে। ধানাকাটা বাবদ যত মজুরি আসবে, তার কতক পাবে বসন্ত আর কতক পাবে ধানকাটনীরা। চুরি-চামারি যা-ই হোক, তার জিম্মা থাকবে তো বসন্ত। বসন্ত, বসন্ত।

এত যখন সুবিধা-সুযোগ তখন বউড়ী-ঝিউড়ীদের আর কামিন না খাটানোর কী আছে? মত দিলেই পারে রাইবু। কিন্তু রাইবু বেঁকে বসেছে। ঘরের বউড়ী-ঝিউড়ীরা না খেয়ে মরবে, খিদা পেলে বনের ফল-পাকুড় খাবে, তথাপি উ-কাজে যাবে নাই, নাই ন। চুরি না করেও চোর-বদনাম—

রাইবু ত বলেইছে কামিল্লা, উ-সব কাজে বদনামের ভাগীদার হতে আমাদের মেয়্যারা নাই। নাই, ন।

নেই মানে? না খেয়ে মরবি, তবু খাটতে যাবি না? খালি রাইবু, রাইবু! রাইবু তোদের খাওয়ায় না পরায়?

নাই খাওয়াক নাই পরাক, এক সমাজে থাকতে গেলে সমাজপতিকে ত মানতে হয়, কামিল্লা। রাইবু আমাদের সমাজপতি, উহার কথায় আমরা উঠি বসি। এরপরেও আর কী তুই বলতে চাস?

বসন্ত তো অবাক, হতবাক। এরপরে সে আর কীই বা বলবে?

আমার একটুন কথা আছে, কামিল্লা—

গুরভার বউ উঠে পড়েছিল। মনে মনে সে ভাবছিল, রাইবু-গুরভা যদি রাজি হয়ে যায় তো বেশ হয়। তবে বেশ হলিয়ে-ঢলিয়ে বাবু-ভায়াদের খেতিতে নেমে ধান-কাটা যায়। সেই বসিয়ামবেলা থেকে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ধানগাছের গোড়ায় গোড়ায় দা চালিয়ে ধানকাটা। ধানকাটা, ধানকাটা। ধানের সুঙ বিঁধছে গায়ে, গা কুটকুট করছে—তো দাও দায়ের ডগা দিয়ে পিঠ চুলকে। 'গিরিহা'র লোক 'বাসিয়াম' নিয়ে এলে, ফের বাসিয়াম খাওয়ার ছুটি। আশ-পাশের জলে, সে খালের জল হোক বাঁধের জল হোক বুড়বুড়ি ঝর্ণার জল হোক, সে জলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে মুড়হি নিয়ে বস-অ, জলেভিজা বতর করা সোঁদা সোঁদা মুড়হি খাও, চিবাও। ধানকাটা শেষে গিরিহার বাড়ি গিয়ে মজুরি নাও নগদা-নগদি। আর তারপর, তারপর কাছে-পিঠের দোকানে বুলুং-উলুং সওদা করে ঘরকে আস-অ। ঘরে এসে যত পার সুখভোগ কর! সুখ, সুখ। কেন যে মরদরা মাত্‌বররা না না করছে? না, চুরি-চামারি হলে চোর-অপবাদ দেবে বলে? সে তো এম্নিতেও দিচ্ছে তেন্নিতেও দিচ্ছে, চুরি করলেও দিচ্ছে না করলেও দিচ্ছে—

গুরভার বউ বলল, কেন্নে নাই বলছ? ভাল্লই ত, খাটব খাব্ব!

হেসে গুরভা বলল, মেয়্যামাড়ষ—সে-এক গেঁড়াকল—উ তোরা বুঝবি নাই।

অভিমান করে লোধানী বলল, আর বুঝতেও চাই না, হঁ।

কামিল্লাকে কাছে পেয়ে লোধানী বলল, যে যাই বলুক, কামিল্লা, ইবার আমাকে একটা আঙ্গুট দে। কী গ' কামিল্লাকে বলে দেও ন।

গুরভা চোখ পিটপিট করে খালি হাসে, ধোঁয়া ছাড়ে।

বসন্ত বলল, বউ যখন বলছে, শুধু আঙ্গুট কেন, চুর-বালাও হয়ে যাবে। কামিন খাটতে পাঠা গুরভা, চ লোধানী কামিন খাটতে চ।

খলা ছেড়ে ঘুপচীর পিছনবাগে যেতে যেতে গুরভার বউ বলল, কেহ যাক না যাক, আমি কিন্তুক যাব্ব, কামিল্লা। বল্ ত কুথাকে, কার ধান কাটতে হবে?

এমনি বলল, সে কী আর সত্যি সত্যি বলল? এটা গুরভাও জানে, বসন্ত কামিল্লাও জানে।

রাইবুকে পটা!

বসন্তকে শেষ কথা বলে দিল গুরভা। যেন বা ফুস্-মন্তর।

বসন্তও পা চালাল রাইবুর ঘরের দিকে।

তাকে মানা করে দিল গুরভা, নাই এখনই যাস নাই, রাইবুর বাপের এখন-তখন অবস্থা, মনের অবস্থাও ভাল নাই। তার উপর শুনেছিস নিশ্চয়, আমাদের জাইতের একটা মেয়্যাকে কুম্‌হাররা কাল রাত থিক্যে—

সে তো শুনেছে বসন্ত, কিন্তু বসন্ত এখন কী করবে? সে কী যাবে, না ফিরে যাবে?

ফিরেই যাবে যদি, তবে শুধু শুধু এল কেন? দুঁদে ব্যবসায়ী হয়েও সে আন্‌পড় লোধাদের কাছে হেরে যাবে? কোনো চালচালিয়াতি জারি-জুরি তার আর খাটবে না?

বসন্ত মরীয়া। সে জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা আরো জোরে জোরে বাজাতে বাজাতে রাইবুর ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

অসময়ে ঝড় উঠল কী নৈর্ঋত্ কী বায়ু কোণে? আঁটারি-চুরচুর ডগ্ এত হিল্‌ছে কেন? করঞ্জ-কইমের গাছের ডাল কী ভেঙে পড়ল?

'বীর' ভর করলে ঐরকম হয়। বাও নেই বাতাস নেই, হঠাৎ হঠাৎ গাছের ডাল মট্ করে ভেঙে পড়ল। কে ভাঙল? কে? কে?

লোক নেই জন নেই, তবে 'বীরেই' ভেঙে দিয়ে গেল গাছের ডাল? গাছপালা?

নৈর্ঋতও নয় বায়ুও নয়, সমগ্র লোধাপাড়া জুড়ে যেন একটা সোরগোল উঠল। রাইবুর ঘরের দিক থেকেই সোরগোলটা উঠে আসছে। কান্নার কী? তবে কী রাইবুর বাপ-বাউকো শেষ-ঘুমে ঢলে পড়ল?

উঁ-হু, কান্নার তো নয়, উত্তেজনার।

উত্তেজনার, উত্তেজনার।

উত্তেজিত রাইবু ছুটে আসছে। অমন ধারা দৌড়ুচ্ছে কেন রাইবু? তার পিছন-পিছন কেনই বা দৌড়ে আসছে লোধাজনমানুষ?

তারা থামাতে চাইছে রাইবুকে, রাইবু থামছে না। হঠাৎ হঠাৎ অমন অদম্য হয়ে উঠল কেন নিরীহ শান্তশিষ্ট রাইবু? অমন উগ্রচণ্ড? এই সেদিনও যে নদীবালিতে জ্যোৎস্নায় ফূর্তিতে 'গরু-খুঁটা'র গান শুনে প্রায় দেড়হাত লাফিয়ে উঠে কুল্‌কুলি মেরেছিল? উঃ কী বড় কুল্‌কুলি!

কুথায়? কুথায় শালার কামিল্লা? লোধাজাইতের মেয়্যা ভাগাতে এস্‌ছে? কামিন খুঁজতে শালার কামিল্লা লোদ্ধাপাড়ায়?

গুরভার কানে কথাটা আসতেই বসন্তকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। বলল, তোকে লিয়েই হুজ্জুতি এই সাতসকালে, যা পালা। পালা, পালা!

বিপদ বুঝে দৌড়াতে শুরু করল কামিল্লা।

রাইবুর কানে কে যেন লাগিয়ে দিয়েছে, বসন্তকামিল্লা ধানকাটার কামিন খুঁজতে লোধাপাড়ায় এসেছে। ভুজং ভাজাং দিয়ে একে তাকে ফুঁসলাতেও শুরু করেছে।

এই শুনেই দারুণ দা-রু-ণ রেগে গিয়েছে রাইবু। কাল রাতেই সদ্য সদ্য একজন মেয়্যাকে হারিয়েছে লোধাপাড়ার জনমানুষ! আজ আবার কামিল্লা কামিনের নাম করে মেয়্যা খুঁজছে। তাই, তাই রেগে গিয়েছে রাইবু।

বসন্ত কামিল্লা পড়ি-কি-মরি দৌড়ুচ্ছে। লাটায়-পাটায় অজায়গা-কুজায়গায় পা ফেলে ফেলে। তার পিছন পিছন দৌড়ুচ্ছে রাইবু। অপটুত্ব আর পটুত্বের মাঝখানের দূরত্ব ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। ছোট হচ্ছে।

কামিল্লাকে পগার পার করে দিয়ে রাইবু দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পিছনে প্রায় সমগ্র লোধাপাড়া।

রাইবুকে থামতে দেখে বসন্তকামিল্লা একেবারে না থেমে, দৌড়ুতে দৌড়ুতেই এক-আধবার ঘাড় ঘুড়িয়ে বলতে লাগল, কাজটা কিন্তু ভাল করলি না রাইবু। সেই তো কাঠ-কুটো নিয়ে তোকে আসতে হবে নদীপারে। তখন? তারবেলা? একমাঘে শীত যায় না, রাইবু!

যা-জ্‌-যা!

বলে ফের তাড়া করার ভঙ্গি করল রাইবু।

অনেকদূর এসে, হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে বসন্ত কামিল্লা ভাবতে লাগল, লোধাজাতটা 'কামিন ডাকা বড় খোসামদি' সেই গানের এই কথাটকে এমন সত্য করে তুলবে, কে জানত।

সত্যিই, কামিন ডাকতে এসে এত খোসামদি করতে হবে, বসন্ত কামিল্লা হাড়ে হাড়ে বুঝল।



বসন্ত কামিল্লা অদৃশ্য হয়ে গেলে হাতের চেলাকাঠটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল রাইবু। তারপর পেট খুলে হাসল।

মনে মনে বলল, শালা কামিল্লার বেটা কামিল্লা, মেয়্যা পটাতে লোধাপাড়ায়? খালভরা নির্বংশা!

বলেও রাইবুর ফের মনে হল, উগ্রচণ্ড রাগের মাথায় কাজটা তো করে ফেললাম। কিন্তু কাজটা কী ভাল হল? তবু তো কামিল্লা বিপদে-আপদে সাহায্য করে। বিড়িটা সিগারেটটা খাওয়ায়, তাকে খেপে গিয়ে মারতে যাওয়াটা কী শোভা পায়?

সত্যিই তো, একা একা নদীপারে কাঠভার নিয়ে গেলে একা পেয়ে যদি কামিল্লা মারধোর করে? লোকজন লেলিয়ে দেয়?

দিক না, মারুক না, ধরুক না—বসন্ত কামিল্লার চাষঘর তো পড়ে আছে এদিকে! জঙ্গলের এপাশে, ভিতরে, মাহাতোপাড়ায় সাঁওতালপাড়ায়, দোরখুলি-নারদা-নিগুইয়ে।

এপথ দিয়েই তো তাকে চলতে হবে। চলতে হবে, চলতে হবে।

বসন্ত কামিল্লাকে পগারপার করে দিয়ে রাইবু যখন ফের লোধাপাড়ায় ঢুকছে, তখন লোধা-লোধানীরা যারা এতক্ষণ রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ পিছনে পিছনে অনেকটা এগিয়ে এসে তার দূরন্ত গমন-পথের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়েছিল, তারা আবার ঘাড় নত করে সুড়সুড় যে যার ঘুপচীতে ঢুকে যাচ্ছে।

রাইবুর অনেক, অনেকদিন পরে আরেকবার মনে হল, সে রাজার মতো টুরটুর হেঁটে যাচ্ছে, হেঁটে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শতেক লোধা-লোধানী তাকে নমো করছে। বলছে, হুই দেখ রাজা যাচ্ছে, শবররাজা! জঙ্গলমহালের রাজা। নমো কর, নমো কর!

এই রে, শিয়াল! লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে দৌড়ুচ্ছে। হতচকিত রাইবুর হুঁশ হল, তারপরই ভাবতে বসল, কুনদিক থেকে কুনদিকে গেল শালার শিয়াল? ডান দিক থেকে বাঁদিকে, বাঁদিক থেকে ডানদিকে? বামশিয়ালী, না ডানশিয়ালী?

ডান-বাম গুলিয়ে ফেলল রাইবু। তারপর কী মনে করে দু-পা পিছিয়েও গেল সে। শিয়ালটা বাঁ হাত ছেড়ে ডান হাতে যাচ্ছে। ডানহাতী। অশুভ, অশুভ।

দু-পা পিছিয়ে পড়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করবে কী রাইবু? পুনর্যাত্রা? এ-ভাবেই কী দোষ কাটাবে সে? বাপের একটা কিছু হয়ে যায় যদি?

রাইবু ভাবতে না ভাবতেই একটা অলম্বুস দাঁড়কাক তার কানের পাশ দিয়েই উড়ে গেল সাঁক্ করে। ডাকতে ডাকতে গেল তার সেই হাঁড়ি-ভাঙা ডাক।

শিয়াল, তারপরেই দাঁড়কাক। এতক্ষণে, তবে কী বাপ-বাউকোর ধুলাখেলা শেষ হল? কদিনের জন্য খেলতে এসেছিল, খেলতে বসেছিল ধুলায়, খেলা শেষ করে দু'পায়ে ধুলা ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

দাঁড়কাকের পিছন পিছন কতকগুলো এম্নি কাক, পাতিকাকও উড়ে যাচ্ছে। শুধুশুধু উড়ে যাচ্ছে কী আর, দাঁড়কাকটাকে তারা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। পিছনে একটা চ্যাপচু পাখিও।

রাইবুর মনে হল সে নিজেও দৌড়ে যাক অলক্ষুস কাকটার পিছন পিছন। বসন্ত কামিল্লার মতো পারপার করে দিয়ে আসুক অলক্ষুণে অলক্ষুস কাকটাকে।

কিন্তু না, তড়িঘড়ি সে লোধাপাড়ায় ঢুকল। আর ঢুকেই দেখল, এতক্ষণ যারা তাকে বলছিল, ছা-ছানাদের হাতের আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল—হুই দ্যাক রাজা, শব্বররাজা—তারাই এখন পিঠ ঘুরিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে যে যার ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে।

মেয়্যামানুষ এরকম করল করল, তবু না হয় তার একটা মানে ছিল, কিন্তু লোধাপুরুষরাও মেয়্যাদের মতো ঘরের দিকে পিছু হটছে! দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা বলছে না !

তবে কী তারা সবাই একদলে? তাদের মত লোধাবউড়ী-ঝিউড়ীরা যাক তবে পরের জমিতে কামিন খাটতে? মরশুমে মরশুমে দল বেঁধে যাক তবে 'নামাল' খাটতে?

রাইবু সে-ই শুধু একা খামোকা বলে চলেছে, না লোধামাইয়ারা কামিন খাটতে নামাল খাটতে পরের জমিতে পরদেশে যাবে না?

শতুরা! এই শতুরা! রাইবু ডাকছে।

শতুরা যেন শুনেও শুনল না, দাঁড়াল পর্যন্ত না, সুট্ সুট্ ঢুকে গেল ভুগড়ার ভিতর। শতুরাও কী ছেড়ে যাচ্ছে রাইবুকে? গুড়খা গেছে গেছে, শতুরাও? এই শত্রুঘ্ন! শত্রুঘ্ন!

রাইবু যেন মনে মনেই ডাকল, মনে মনেই, কোনো উত্তর পেল না।

রাইবুর বড় ইচ্ছা হল, একবার গুড়খাকে ডেকে দেখে। তার ঘুপচীর দিকে এগিয়েও গিয়েছিল সে। কী মনে করে আবার পিছিয়েও এল।

না, তার বহিন বেজাতের ঘরে যাক, গুড়খা তো চেয়েছিল। তার ইচ্ছাই তো পূরণ হল। এবার স্ব-ইচ্ছায় গুড়খা একা হয়ে যাবে, না বিচার-বিবেচনা করে তারাই তাকে একঘরে করে দেবে—সেইটে দেখার, সেইটেই বাকি এখনও।

গুড়খা, গুড়খার বউ কী ঘুম থেকে উঠেছে? না, বোধায় না। কামিল্লা তাড়ানোর এত হুরিতেও তাদের ঘুম ভাঙেনি? নাকি চোখ টিপে আছে তারা—না, রাইবুর বীরত্ব তারা দেখবে না?

আরে তা নয়, তা নয়—দ্যাখো গিয়ে চিন্তায় তাদের সারারাত ঘুম হয়নি। দুচোখের পাতা এক করেনি। হয়ত সারারাত ধরে ভাবছিল, সাবিত্রীকে তো আটকে দিল কুম্হাররা। এবার লোধারা কী করবে? লোধারা কী কাঁড়-কাঁড়বাঁশ বিষমাখা টাঙ্গি-বল্লম তাব্‌লা-বড়তাব্‌লা নিয়ে কুম্হারপাড়া আক্রমণ করবে? চোরা-গুপ্তা আক্রমণের আশঙ্কায় গুড়খা, ঢালো না-ঘুমিয়ে সিঁটিয়ে পড়ে থেকে রজনী ভোর করে দিয়েছে।

রাইবু এখন ভাবে, যদি তাই, তাই-ই হত, সাবিকে ছাড়িয়ে আনতে কুম্হারপাড়ায় কাল রাতেই ঢুকে পড়ত লোধারা? তবে লোধারা কী আর বেঁচে ফিরত? একে তো বাঁদনা পরব, তখনও শেষ হয়েও হয়নি, কুটুম-বাটুমে কুম্হারপাড়া গিজ্‌গিজ্ করছে। কত লোক, কতপ্রকার অস্তরপাতি। ভরতি, ভরতি। ছুঁচও গলবে না, সেখানে ফাল হয়ে লোধারা ঢুকে পড়লে আরেকবার লোধা-কাটাকাটি লোধা-নিধন হত। হতই হত।

সুতরাং, তার পিছুকে, বিবাদে না গিয়ে ভালোই করেছে লোধারা। রাইবু ভাবে, কুম্হারদের মারতে হয় যদি তো ভাতেই মারবে। জঙ্গল, জঙ্গল। জঙ্গলের কাঠ না হলে তো কুম্হারদের হাঁড়ি পুড়বে না। হাঁড়িও চাপবে না।

"কাঁচায় তুলতুল পাকলে সিঁদুর, কাঁচায় তুলতুল পাকলে সিঁদুর"—যেন হাত-মুঠোয় কুম্হারদের পেয়ে গেছে রাইবু, তেমনিভাবে একটা ঝুনঝুনিগাছের ডগা মুচড়ে ধরে ঝুনঝুনি গাছটাকেই হেঁয়ালি দিল, বল ত কী?

আরেকটু এগিয়ে আরেকটা গাছের ডগা মুচড়ে ধরে নিজেই হেঁয়ালিটা ভেঙে দিল রাইবু, বলতে পারলি নাই ত? হাঁড়ি রে, হাঁড়ি।

হুঁ, বাপ কেমুন আছে, রাইবু? সামনে এসে দাঁড়াল গুরভা।

ঘোর থেকে জেগে উঠে রাইবু জোরে জোরে মাথা নাড়ল। তারমানে—ভালো নাই, ভালো নাই।

রাইবুর পিছু পিছু রাইবুর ঘরের দিকে যাচ্ছে গুরভাও। বলব না বলব না করেও গুরভা শেষতক বলে ফেলল, কাজটা কী ভাল্ল করলে মাত্‌বর?

কুন কাজটা?

এই যে কামিল্লাকে খেঁদ্দাই দিলে হুঁ? হাসবার চেষ্টা করল গুরভা।

প্রায় গর্জন করে উঠল রাইবু, তবে কী করব? আদ্দর করে ঘরে তুলব আর নিজের মাগকে গস্তাঁই দিব্ব-অ?

ভয়ে ভয়ে গুরভা বলল, নাই নাই, আমি কী তাই বলচি?

বলা, নাই বলা ঐ এক্কেই কথা—ঘরের বহুকে পরের জমিনে কামিন খাটতে দেয়া আর পরের সঙে শুত্তে দেয়া ঐ এক্কেই কথা, গুরভা।

গুরভা চুপচাপ। চুপচাপ, চুপচাপ।

খানিক পরে দম নিয়ে সে বলল, কিন্তুক ইভাবে নাই খেয়ে, পরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত-খাবা, আর কদ্দিন চলবে, মাত্‌বর?

গুড়খা, শতুরার মতন গুরভাও? হেঁ গুরভাও?

কিছুটা নরম হয়ে রাইবু বলল, যদ্দিন চলে চলুক, গুরভা। সমাজটাকে ত আর উড়াঁই দিতে পারি নাই, বল্‌?

গুরভা মনে মনে বলল, জঙ্গল জঙ্গল, জঙ্গলের ভিতর আবার সমাজ কী? জঙ্গলী পশুদের পারা আমাদের জীবন, শিকার মিললে আহার, নচেৎ উপাস। এই যে সাবিত্তিরি পেটের জ্বালায় অন্য জাইতের ছ্যাইলাকে ধরল, ধরে কেটে পড়ল, তুমি তার কী কচুটা করলে? করতে পারলে কিছু?

গুরভা মুখে বলল, কামিল্লাকে বুঝাই বললেই হত, তাবলে মারধোর?

কদ্দিন ধরে বুঝাচ্ছি গুরভা, কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর সেই এককথা কামিল্লার একশত্‌বার। কাঁহাতক আর চোখ বুজে থাকা যায়! আজ তাই খেদ্দাই দিলম। দেক্‌খিস উ আর এই মত্‌লবে কুনোদিন আসবে নাই।

গুরভা মনে-মনে বিড়বিড় করল, উ আর আসবে নাই, ঠিক কথা। ঠিক্কেই কথা। কিন্তুক ইবার আমাদেরকেই যেতে হবে কামিল্লার কাছে, কমিল্লার পায়ে ধরতে। খাটা কামিল্লা, আমাদের কামিন খাটা! এই তোমাকে বলে রাখলম মাত্‌বর।

কিন্তু অতকথা জোরে বলবার সাহস হল না গুরভার। সে শুধু নীরবেই রাইবুর সঙ্গে তার ঘুপচীর দিকে চলতে লাগল।

এত নীরবে যে চলতে চলতে রাইবুও একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল, গুরভা আছে তো, না নেই? গুড়খা-শতুরার মতো সে-ও কী সরে পড়ল সুড় সুড়?

বেশিদূর যেতে হল না, দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে শিশুবালা বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, জলদি চল-অ গ, বাউকো কেমুন আঁক পাঁক করছে!

আঁক-পাঁক করছে? ধুলা-খেলা ছেড়ে যথা থেকে এসেছে তথায় এখনও যায়নি? তাহলে এখনও শ্বাস আছে? এখনও আশ আছে?

রাইবু-গুরভা দুজনেই দৌড়ুল।

দৌড়ুতে দৌড়ুতেও রাইবু এধার-ওধার চেয়ে চেয়ে দেখল, তার যাবার সময় হয়েছে কী? গাছের পাতা-পতর কী নড়ছে, না থেমে আছে? বড়ামথানের শাল-মহুলের ডগাগুলি কী নড়ছে, না থির?

না না, ঐ তো ঐ—শাল-মহুলের পাতাগুলি হিলহিল করে নড়ছে। ডগাগুলি কাঁপছে। থেমে নেই, থেমে নেই।

আমি বলছি এখনও যাবার সময় হয় নাই। লোধানী আস্তে চল্। গুরভা, হড়বড় অত্ত করিস নাই, সম্‌ঝে হাঁট। সময় আছে, এখনও সময় আছে।

হাঁটার গতি কমিয়ে দিল রাইবু। বাপ্, বাউকো, ডাঁড়া একটুন, একটোক জল দিই গলায়। তুঁই এত্ত দিয়ে গেলি, বন-জঙ্গল-রাজ্যপাট, আর আমি একটুন পানিও দিতে পারব নাই যাবার কালে? বাউকো, ডাঁড়া। যাস্ নাই—

এসেছ একা
কেবলমাত্র পথে দেখা
কায়াপ্রাণকে মিছা কর আশা
মন গো কখন ছাড়িঞে যাবেক বাসা।
মন রে কখন ছাড়িঞে যাবেক বাসা...

ঘুপচীর নাচ-দুয়ারে দাঁড়িয়ে জটাবুড়ি। খরায় বেলা দেখার মতো কপালে হাত রেখে দেখছে—রাইবু আসছে কী আসছে না।

দেখতে পেয়ে কিছুটা এগিয়ে এসে বলল, ছেলের হাতের জল না খেয়ে খুড়া যাবে নাই, আয় ধন, এক টপা জল দে!

ঘরে পৌঁছে রাইবু আঙুলে করে এক টোপা জল দিয়েছে কী গেঁড়াশবর ছেলের কোলেই মাথা রেখে ঢলে পড়ল চিরঘুমে। 'বাপ-বাউকো' বলে হাজার ডাকলেও আর সে সাড়া দেবে না। রাইবু শিশুবালা বিরাট 'হুরি' করে কেঁদে উঠল।

মরা বাপের উপর আছাড়ি-পাছাড়ি কাঁদছে রাইবু। আর বারে বারে বলছে, বাপ গো, বিপদে-আপদে আর কে লোধাদের দেখবে? তুঁই গেলি আর আমরাও অনাথ হঞে গেলম গো!

শিশুবালাও শ্বশুরের পা ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে কত কী যে বলে যাচ্ছে। বলে বলে রোদন করছে, রোদন করতে করতে বলছে। তাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে ফুলটুসি। সেও কেঁদে ভাসাচ্ছে, আর বলছে, কাঁদ ধন যত্ত পারিস কাঁদ, কাঁদিলে—

রাইবুর খলায় এখন লোক জুটে গিয়েছে মেলা। তাদের কতক খলাতেই বসে থাকল, আর কতক ঘরে ঢুকল। খলায় যারা থাকল তারাই কথা বলছিল বেশি, চোখ মুছছিল কম।

ভিতর-ঘর থেকে চোখ মুছতে মুছতে এসময় জটাবুড়ি বাইরে এসে বাইরের খলায় লোক-মাঝারে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল,

মরিলে হয় গো মড়া
আর, বার করিলে দেয় গো ছড়া,
ও যে শূন্যঘরে কিসের রোদন হচ্ছে গো?

কেন্দে কী হবে ধন, মানুষ মরলে হাজারবার একশত্‌বার কোটি কোটি বার কেন্দেও কিছু হবেনাই, যে যায় সে আর ফিরে আসে নাই। সেই বলে নাই, "আঙটি-ভাঙা পিতল-ভাঙা সবই জুড়া যায়, মানুষ মরলে দিদি নাই গ' জুড়া যায়?"

এই বুড়িই গোঠটাড়ের মাঠে গরু-খুঁটা কাড়া-খুঁটার দিনে সাবিত্রী আর ফিরছে না দেখে, তার

উপর গরু-খেলানী গান "সবু পরব ত আসে ভালা ঘুরি-ন-ঘুরি যে বাবুহো, মানুষ মরলে নাহি আওয়ে" ড্যাঙুআনরা গাইছে দেখে বলে ফেলেছিল এই কথা, সেদিন সমবয়স্কা আরেক লোধানী তার কোনো প্রাসঙ্গিকতা মাথামুন্ডু বুঝতে না পারলেও, আজ বুঝে গেল মরমে মরমে।

ভিতরে মড়া আগলে শিশুবালা আছাড়ি-পাছাড়ি কাঁদছে শুনে বাহির থেকে বুড়ি যখন ঐ কথা বলল, তখন সমবয়স্কা লোধানী তার হাত জড়িয়ে ধরে তাকে সমর্থন করে বলল, হঁ হঁ সত্তেই দিদি।

মনে মনে কি বলল, সেদিন বুঝি নাই গ' দিদি তুমার কথার অথ, আজ বুঝলম, হঁ হঁ ইহার থিক্যে সত্য কথা আর কী আছে? গেঁড়ালোধার দেহে পান-দান কেউ করুক ত দেখি?

বুড়ি তো ঘন ঘন মাথা নড়ছে। মাথা নাড়ছে, মাথা নাড়ছে।

কেউ মরলে, কারোর বেহা-ঘর হলে, সন্তানাদি জন্মালে এই বয়স্কা লোধা বয়স্কা লোধানীরা সময়কালে হাজির হয়ে, খলায়-খামারে বসে থেকে যেন টিপে টিপে বের করে একটার পর একটা নিয়মকানুন আচার-বিচার ক্রিয়া-পদ্ধতি।

জটাবুড়ি বাইরে এলে তাকে আরেকবুড়ি স্মরণ করিয়ে দিল, জট্টা, মড়ার মাথা-সিথানে লোহার কুনো দব্য রাখা আছে কী?

নাই নাই, সে ত দেখি নাই গ' লুল্হার মা!

ব্যস্তসমস্ত হয়ে জটালোধানী ফের ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

লুল্হার মা আরেক লোধানীর গা টিপে দিয়ে বলল, দেখলি ত মনো, জট্টাও জানে নাই। দা হোক কাতান হোক কুড়াল হোক লোহাভাঙা হোক—একটা কিছু মড়ার শিয়রে রাখতে হয়—

আর নাই যদি রাখি?

চোখ বড় বড় করে লুল্হার মা গলা খাটো করে বলল, বলা ত যায় না, কখন কি ঢুকে পড়ে।

কী ঢুকবে গ', কী?

থাম্ মুখপুড়ী, ইসময় উদের নাম লিত্তে নাই। হরির নাম কর, হরি হরি বল!

ফিস্ ফিস্ করে খলায় যারা জুটেছিল তারা সবাই হরির নাম করল। জটাবুড়ি বাইরে এসে বলল, নাই লুল্হার মা, আমাদের ভুবনার বহু মনে করে একটা লোহার খাড়ুভাঙা সঙে দিয়েছে।

ফুলটুস্সি ত দিবেকেই, ভুব্নার বেলায় দেখেছে যে!

ভুবনলোধার বেলায় দেখল কী করে ফুলটুসি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুলটুসি দেখেছে বই কি—তার চোখের সামনেই ত হড়-গিদ্রারা ভুব্নাকে কেটে ফেলল।

লুল্হার মা বিড়বিড় করে বলল, জট্টা, মড়া যারা নিয়ে যাবে শ্মশানে তাদের আঁটা-দড়িতেও একেক টুকরা লোহাভাঙা জালকাঠি ভাঙা বেন্ধে দিস্।

সে আর বলতে, লুল্হার মা? জটাবুড়ি অসুস্থ মুখেও হেসে বলল, যে যার বহুরাই তাদের ঘৈতার গলায়, আঁটা-দড়িতে লোহার চাবি-খাড়ি ঝুলাঁয় দিবে। তোকে আমাকে বলতেও হবে নাই।

বলতে হবে না, বলতে হবে না।

ঈষৎ কম বয়সী একজন গলা তুলে বলল, হেঁ গ, দাহ হবে, ন তুপে দিবে?

তাকে প্রায় মারতে গেল জটাবুড়ি। মুখ-ঝাম্টা দিয়ে বলল, কেন্নে, গেঁড়াকাকার কী কুনো খারাপ রোগ ছিল? ব্যাধি-উধি নাই, টাটকা মানুষ। অমন বুড়াকালে টুকটাক বাতটাত কার না হয়? নাবালক শিশুও ত সে লহে, তবে তাকে কেন্নে তুপ্তে হবে? তুপ্তে হয় কাকে—পেটে বাচ্চা লিয়ে যে-পুয়াতি মরে, মরে অমুক হয়, ট্যাঁক হয়,—সেই তাকে তুপ্তে হয়।

লুল্হার মা বলল, মরলে আর তুপে পুরল্যার খেড়্যারা। আমরা লদ্ধা বঠিন, আমাদের

উসব করতে নাই। এখন যা ত, মেলা হরি করিস নাই, ধনরা। আমাদের ভাবতে দে।

হাতছানি দিয়ে জটাবুড়িকে কাছে ডাকল লুল্হার মা, চুপিচুপি বলল, এই জট্টা, শুন্—

কী গ'?

কুনোপকার দোষ লাগে নাই ত?

দোষ?

শোনামাত্রই অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা কৌতূহলী হয়ে পড়ল। জীবন্ত লোকের দোষগুণ থাকে, মরে গেলে আবার কিসের দোষ?

মরেও সুখ নাই, শান্তি নাই গ' দিদি?

নাই নাই, হাম্দের বাঁচেও সুখ নাই, মর্রেও সুখ নাই।

লুল্হার মা বলল, হঁ দোষ, মরে গেলে দোষ ত থাকবেই। কিভাবে মরল তার উপর দোষ পড়বে নাই? পুষ্করা, একপাদ, ত্রিপাদ—

কী রকম, কী রকম?

বুকের উপর হাত রেখে মরলে একরকম, পেটের উপর হাত রেখে মরলে আরেকরকম দোষ। কাৎ হয়ে শুয়ে মরলে একরকম, আবার চিৎ হয়ে শুয়ে মরলে আরেকরকম।

জটাবুড়ি বলল, আমি ত দেখলম গেঁড়াকাকার বুকের উপর হাত। এখন 'দেহুরি' আসুক, দেখুক—কী দোষ, বার করুক। আমরা উসবের কী জানি লুল্হার মা?

কিছু জানি না—একথা মানতে হরগিজ রাজি নয় লুল্হার মা। সে বিড়বিড় করে অনেক জানা কথাই বকে গেল, ঝালিয়ে নিল। কেউ শুনল, কেউ শুনল না। না শুনুক, এমন বলবার প্রশস্ত ক্ষেত্র লুল্হার মা আর পাবে কোথায়? কে জানে, আবার পাবে কবে?

ঘুপচীর ভিতর থেকে এসময় বেরিয়ে এল গুরভা। লোধাপাড়ায় এখন রাইবুর পরে পরেই গুরভা।

ঘরের বাইরে এসেই গামছার খুঁট দিয়ে সে চোখ মুছল। তার দেখাদেখি বাইরে খলায় জটলা করে বসে থাকা বয়স্ক লোধানীদের অনেকেই যে যার ছেঁড়া-ফাটা শাড়ির খুঁট দিয়ে নিজের নিজের চোখ মুছল।

তারপর গুরভাকে খলার একান্তে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জটাবুড়ি উঠে গিয়ে হাত-পা নেড়ে নেড়ে বলল কাঁদিলে কী হবেক রাজা, যে যাবার সে ত চলেই গেছে, এখন তারপরের কামটুকু ত করতে হবে?

হঁ হঁ, তা ত বটেই, তা ত বটেই।

হেসে জটাদিদি বলল, ই বছর পরবটা ভালেই কাটল, কী বলিস ধন? কুম্হারছোঁড়াকে বাঁধাছাঁদা, সাবি সাবি করে কালকের এক অশান্তি, কামিল্লা-খেদা, আজ আবার লোধাদের মাথা চলে গেল—

কত্ত বড় যে গুণের মানুষ ছিল গেঁড়াকাকা! ই তল্লাটের কুম্হার-কাম্হার-মাহাতো-মাহালীরা সব্বাই এক ধারসে মান্য করত!

জটাবুড়ি যে গেড়াশবরের গুণের কথা বলতে সূচনা করে দিল, সেই কথার খেই ধরে রাইবুলোধার উঠোনে বসা উপস্থিত লোকজন একে একে আরো অনেক কথাই বলতে লাগল।

কার কি অসুখ-বিসুখে কী কী ওষুধ দিয়ে কাকে কাকে ভালো করে তুলেছিল, বিপদ-আপদে কাকে কী সাহায্য করেছিল—তারই আলোচনা হল বিস্তর।

নাই গ দিদি, অমন মানুষ কুটিতে গুটি হয়। আজ ছাতি চাপড়াএে বলব, হঁ বলবই—লদ্ধাদের মাথার মণি চলে গেল—

নাই, আরেকজনা আছে।

কার, কার কথা বলছ গ'?

গজনা, বড়সোলের গজনা।

হঁ গজনা, ঐ নামই শুনি, হাওয়া-বাসাতে শুনি, কভু ত চোখে দেখি নাই। গেঁড়াশব্বর আমাদের চোখের দ্যাখ্তা।

ভিতর-বাহির, সবাই আরেকবার জোরে জোরে 'হুরি' করে কেঁদে উঠল।

ঈশান কোণের দিকে মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা গুরভার পিঠে হাত রেখে জটাবুড়ি চুপিচুপি বলল, ডাড়াঁই থাকলে কী হবে ধন—যা গাছ কাট্।

গাছ তো কাটতেই হবে। মনে মনে গাছ কাটার কথাই তো ভাবছিল গুরভা। এ তো আর তুপে দেওয়ার মড়া নয়। মাটির নিচে তুপে দেওয়া হয় এক কুট হয়ে মরলে, মায়ের দয়া হয়ে মরলে—

গুরভা দাহ করার গাছ পাবে কোথায়? কারোর বন্দোবস্ত করা ডাহির গাছ কাটলে ডাহি-মালিক হৈ হৈ করে তেড়ে আসবে। আবার ফরেস্টের খাসজমির গাছ কাটলেও ফরেস্টারবাবু গাড়বাবুরা ছাড়বে কেন?

অথচ মাতব্বরের বাপ রাজা মাতব্বরকে তো আড়ম্বর করে পোড়াতেই হয়। না হলে রাইবু মাতব্বরের, তাবৎ লোধাদের মান-সম্মান থাকবে কী করে?

গুরভা চোখ পিট্ পিট্ করে মনে করবার চেষ্টা করল, কাটার মতো গাছ আর কোথায়?

জটাবুড়ি গুরভার মনের ভাব আঁচ করে বলল, ঠাকুরবাঁধের লাইবুকাদের ঠুঁটা ধ' গাছটাই কাট্!

ঠাকুরবাঁধের ঠুঁটা ধ'গাছ? ধ'গাছ, ধ'গাছ।

জঙ্গলে রাতভিত, ধবো জোছ্নায়, ভুসাকালির মতো আঁধারে অন্ধকারেও, কৃষ্ণপক্ষে কী শুক্ল পক্ষে, কী অমাবস্যায় কী পূর্ণিমায় বেঁটে-বাঁটকুল মুড়োডগা সাদা সাদা ছাল-বাকল কতক-বা চোকলা-ওঠা ধ'গাছ...

যে-গাছ ছলর-বলর হেঁটে বেড়ায়, যে গাছ ধবো শাড়ি পরে সোমবারি সেজে রাইবুর কাছে আসে, পাশটিতে বসে, কথার পিঠে কত কথাই গড়গড় করে বলে যায়, মজলিশে-মিটিংয়ে বড়ামথানে-গরামথানে রাইবু সে-কথা বলতে শুরু করে বলতেই থাকে, তার সেকথা ফুরোয় না আর ফুরোয় না, সেই ধ'গাছটাকেই আজ কেটে ফেলবে গুরভা। কেটে রাইবুর বাপের সোমবারির বাপের সঙ্গে মিশিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। এই করে একটা 'পর্বে'র, স্মৃতি-বিস্মৃতি বাস্তব-অবাস্তব ঐতিহ্য-অনৈতিহ্যের রৌদ্রছায়ায় লালিত একটা যুগের অবসান ঘটবে।

ধারালো একটা 'কুঢ়ার' নিয়ে হুড়ুম-দুড়ুম বেরিয়ে গেল গুরভা।

নুকুর ছুটি শেষ। নুকু আজ চলে যাবে।

হঠাৎ রাইবুকাকার বাপ মারা যাওয়ায় সে কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না। থাকবে না যাবে?

সে অবশ্য থাকার পক্ষে। কিন্তু তার মা তাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে বলেছে। কারণ তার পড়ার ক্ষতি হবে।

থেকে গেলে রাইবুকাকাও রাগ করবে। অতএব সে ঠিক করেছে, সে চলেই যাবে।

পোশাক-আশাক পরে ছোটবোন মুনকুর কাঁধের উপর হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে রাইবুকাকাদের খলায়।

মনে মনে ভাবছে, আচ্ছা, সাবিবিটি কী এতক্ষণে জানতে পেরেছে যে, গেড়াশবর আর নেই? কে আর তাকে খবর দিচ্ছে!

খবর দিলে, খবর পেলেও সে কী আর আসবে? আসতে চাইলেও তাকে কী আর আসতে দেবে কুম্হাররা?

হয়ত এতক্ষণে নিয়মমাফিক বিবাহ হয়ে গেছে সাবিবিটির। কিন্তু এখন তো কার্তিকমাস,

আশ্বিন শেষ হয়ে কার্তিক পড়েছে। কার্তিক মাসে কী 'বেহা-ঘর' হয়?

হয় না, হয় না।

নুকুর মনে হল, সাবিবিটিকে ঐ আটকেই রেখেছে কুম্‌হাররা। কিন্তু ধরে-বেঁধে বিয়ে দিতে এখনও পারে নি।

সাবিত্রী না আসুক, গুড়খা আর গুড়খার বউ ঢালো তো এসেছিল। তাদের সঙ্গে কেউ একটাও কথা বলেনি।

যেতে যেতে গুড়খা অবশ্য শুনিয়ে গিয়েছে, কেউ একটা কথা না বলে না বলুক, বয়েই গেল তার। তাকে কেউ খাওয়ায়, না পরায়?

মনে মনে সে জেদ ধরেই গেছে, বসন্ত কামিল্লা আবার যদি কামিন ডাকতে লোধাপাড়ায় আসে, তবে সে তার বউকে কামিন খাটাতে পাঠাবেই পাঠাবে। তবু তো বউটা দুবেলা দুমুঠো খেতে পরতে পাবে।

শুধু কী নুকু, খলায় যারা বসেছিল বয়স্কা লোধানীরা, গতকালই তাদের হাত গলে সাবিত্রী একরকম জলে পড়ে গেল, অনেক হাঁপাহাঁপি করেও যারা তাকে জল থেকে তুলতে পারেনি, সেই তারাও বলাবলি করছিল, খরবটা দেয়া উচিত। তা না দিলে খারাপ দেখায়।

কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করে এখন খবরটা-দিতে যাবে কে? খবর দিতে গেলে রাইবু মাত্‌বর আবার রেগে কাঁই হয়ে যাবে না তো? সকালবেলা কামিল্লাকে নিয়ে যেরূপ অশান্তি করল, সে-রূপ অশান্তি করে ঘোঁট পাকাবে না তো আবার?

বিশেষত, অনেকেই যেখানে কামিল্লার উপর অমন দুর্ব্যবহার, অমন করে তাকে পাড়া থেকে খেদিয়ে দেওয়া—মন থেকে মেনে নিতে পারছে না?

একবার বলেই দ্যাখো ন দিদি। একজন সুপরামর্শ দিল।

কিন্তু সে-ও তো এক সমস্যা। রাইবু যেখানে বাপের মড়া আগলে আছড়ি-পাছড়ি কাঁদছে, সেখানে উপস্থিত হয়ে কে তার কানে কানে গিয়ে বলবে অসতী-সাবিত্তিরির কথা? সাবিত্তিরি সতী হলেও না হয় কথা ছিল।

'অসতী-সাবিত্তিরি' কথাটা কেউ একজন ঠাট্টা-ঠিসারা করেই বলেছিল। সেই কথার খেই ধরে আরেকজন বলল, উর'ম করে বলিস নাই ধন, হাম্‌দের সাবিত্তিরি 'বারো-ভাতারি' অসতী হৈল কবে? এক সন্তুষ ছাড়া, একটা বই দুটা ত নাই?

নাই, নাই—এই দ্যাক, কথার লত্ কুন্ দিকে ফ্যাঁকড়া মেলছে! হচ্ছিল রাইবুর বাপ-মরার খপ্পর দেয়া লিয়ে, তার বদলে কথা ঘুরল সাবিত্তিরির নাঙের পিছুকে?

ছাড়-অ ত দিদ্দি, কাল হোক পরশু হোক উ-মুখপুড়ী খপ্পর পাবেই পাবে। ধুরে-বেহা যাদের তাদের বাপ-ঘরে একটা কিছু হৈলে আজ হোক কাল হোক খপ্পর ত তারা পায়েই?

হঁ হঁ পায়, আর যে-কুলের বহুড়ীই হোক না কেনে, সে কাম্‌হারই হোক কুম্‌হারই হোক, বাপঘরের জ্ঞেয়াতিগুষ্টির খপ্পর শুনলে মন ত উতলা হবেই লো। আমাদের সাবিত্তিরিরও হবে।

অতএব, তারা এই মুহূর্তে সাবিত্রীকে খবর দেওয়া ছেড়ে অন্য আরো অনেক কাজেই মেতে উঠল।

লুল্‌হার মা। জটাবুড়ি ডেকে বলল, টুন্ডলে ছাঁকা-পিঠার গুড় টুকচার এর-ঘরে তার-ঘরে পাব, কিন্তুক ছোলা-মুগ?

ছোলা-মুগ? লুল্‌হার মা অনেক চেষ্টা করে মনে করে বলল, হঁ হঁ, ছোলা-মুগ। সে তো লাগবে শ্মশানে মড়া পুড়াঞে ঘরে এসে দাঁতে কুটতে। এখন কেন?

না না, এখনকার কথা কে বা বলছে? তখনই, তখনই।

জটা বলল, জোগাড়-যন্ত্র করে কুঁড়ায়-কাড়াঁয় রাখতে হবে ত লুল্হার মা?

হঁ, লুল্হার মা লোধানী বাঁ হাতে মাথার পাকাচুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, নাই পাস যদি ত এক মুঠ চাউড় আর দানাকতক কুথি দ্যাক, জট্টা।

খুঁজলে চাউল একমুঠ কেন, এক হাঁড়িও পাওয়া যাবে, খুঁজে দেখলে নতুন কুরথিকলাইও পাওয়া যাবে ঘরে ঘরে। কিন্তু জটাবুড়ি গেঁড়াশবরের মৃত্যুতে শবদাহকারীদের ছোলা-মুগই দাঁতে কুটাবে মনস্থ করল।

এই বুধনি, তদের ঘরে ছলা-মুগ আছে?

ছোলা-মুগ, ছোলা-মুগ্। ছোলা-মুগ খুঁজে দেখলে তাদের ঘরে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বুধনি রেগেছিল লুল্হার মায়ের উপর, জটাবুড়ির উপর। একটু আগে লুল্হার মা-ই তো বলেছিল, এখন তোরা যা ত মেলা হুরি করিস নাই? এখন তবে তাদের ফের ডেকে ডেকে সাধা কেন?

বুধনি মুখের উপর বলে দিল, নাই।

অগত্যা জটা কিছুক্ষণ 'ফুলটুসি' 'ফুলটুসি' বলে ধীরে ধীরে হাঁক দিল। ফুলটুসি তো ঘরের ভিতর আঁকড়ে ধরে বসে আছে শিশুবালাকে, নড়বার তার উপায় নেই।

বিড়বিড় করে জটা বলল, ফুলটুসুয়া যেতে পারলে বলতম, দৌড়াঁই যা ত একবারটি বঙ্কার ঘরে, দুকানে—ছলা-মুগের ছড়াছড়ি, কত্ত লিব্বি?

আর এসময়ই দোরখুলির বঙ্কামাহাতো এল। গায়ে ফতুয়া পরনে লুঙ্গি। ময়ূরকণ্ঠী লুঙ্গির ঘের লুটাচ্ছে পায়ের 'এড়ি'তে। চটি পায়ে, ফটর ফটর আওয়াজ করতে করতে সে এল। জটাবুড়িই তাকে পথ দেখিয়ে রাইবুর ঘুপচীর ভিতর নিয়ে এল। ছোলা-মুগের কথা এত লোকের মাঝখানে এতকথার মাঝখানে বলতে সে ভুলেই গেল।

ভুলে গেল, ভুলে গেল।

বঙ্কামাহাতো ঘুপচীর ভিতরে ঢুকল, আর ঘুপচীর ভিতরে-বাহিরে কান্নার রোল উঠল। রোল নয় রোল নয়, 'হুরি'। 'হুরি' বলতে উচ্চস্বরে কলরব। মরার কালে আত্মীয়-কুটুম্ব কেউ এলে, ভদ্রস্থ পাঁজ্জনা এলে এরকমই 'হুরি' করতে হয়। সে মরার দিনেই হোক, মরার দশদিন বাদেই হোক।

গেঁড়াশবরের মৃত্যুর খবর পেয়েই বঙ্কা এসেছে দেখতে। রাইবু, রাইবুর বউকে সান্ত্বনা দিতে। সুখে-দুঃখে এদের সঙ্গেই তো সে আছে। কিছু টাকাও সে দিতে গিয়েছিল রাইবুকে, টাকাটা রাখ্, ইসময় কাজে লাগবে। রাখ্ ন, রাইবু!

এত মন-খারাপ যে সে-টাকাও ফিরিয়ে দিয়েছে রাইবু, নাই নাই মাহাজন—

বাকিটুকু মনে মনে বলেছে, বাপের ঘাট-কামানোর কাজ-কাম করি যদি ত মহাজনের টাকায় নয়, করব নিজের টাকায়, নিজের রোজগারের টাকায়।

রাইবু টাকাটা নিল না দেখে বঙ্কা এবার টাকা ধরল শিশুবালার কাছে। শিশুবালাও টাকা তো নিল না, উল্টে আরেকটু জোরেই কেঁদে উঠল।

না রাইবু, না শিশুবালা—কেউই যখন ভাঙল না, তখন ফুলটুসি বঙ্কার হাত থেকে টাকা কটা খপ্ করে আঁচলস্থ করে বঙ্কার সঙ্গে ঘর ছেড়ে নিজের ঘুপচীর দিকে গেল।

যেতে যেতে খলায় আর আর লোধানীদের যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, দ্যাখো ন, তুমার মেয়্যাটার ইস্কুলে যাবা হৈল নাই।

কেনে? কেনে হৈল নাই? শুনে বঙ্কা খেপে উঠল, পড়াশুনায় ঢিলা দিলে কী চলে?

আমিও ত তাই বলি, যে যাবার সে ত গেছেই, শত কাঁদলে আর কী ফিরবে? যাহ্ বুড়ি, ইস্কুলে যা!

বঙ্কা মাহাতোর সঙ্গে ফুলটুসিকে ঘুপচীর দিকে যেতে দেখে খলায় বসা আর আর লোধানীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল ফিস ফিস করে, হায় গ দিদি, কাহার বা সব্বনাশ, আর কাহার বা পউষ মাস।

হুঁ, তাই ত, তাই ত।

ইদিকে রাইবুর বাপ মরেছে, উদিকে ভুবনার বহু রাঁড়ী 'নাঙ' লিয়ে ঘরে ঢুকছে—দেখলে ত? এখন তুমরাই বল-অ, কে সতী—সাবিত্তিরি ন ফুলটুসি?

বলেই সে হাসল, তার কথা-ই তো ফলে গেল। একটু আগে সেই তো বলেছিল, সাবিত্রী অসতী কেন হবে—তার তো একটা বই দুটো নাই। সন্তোষ সন্তোষ।

ঘুপচীর ভিতর খেজুরপাতার চাটাইয়ে গেঁড়াশবর কাপড়ে ঢাকা। কিন্তু এভাবে তো আর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাবে না, খাটিয়া চাই। দড়ির খাটিয়াও আনা হল।

বাধ সাধছে রাইবু, বেঁকে বসেছে সে। নাবালকের মতো বাপকে আঁকড়ে আছে, কিছুতেই ছাড়ছে না। খাটে তুলতেও সে দেবে না। তার মতে খাটে তুললেই তো শ্মশান-যাত্রা শুরু হল। বসুমতার সঙ্গে সব সম্পর্কই শেষ হয়ে গেল।

মাতব্বর রাইবু, যে কী না বন্দুক চালাতেও জানে, তার মধ্যে এত ছেলেমানুষি এল কী করে? রাইবুর মা মরেছে আগেই, বাপও মরে গেল, না হয় সে বাপ-মা-হারা হল, তা বলে অনাথ কী আর? সেই তো এখন দোরখুলির লোধাপাড়ার লোধাদের মাথা। মা-বাপ-হারা অভাগা সে হতে পারে, অনাথ নয় অনাথ নয়।

বয়স্করা তাকে বুঝাচ্ছে, অত অবুঝ আড়বুঝ হৈলে কী চলে রাইবু? শত হলেও উ দেহ আর দেহ লহে, তোর বাপ লহে, মড়া। মড়া মড়া। সেই বলে নাই, "মরিলে হয় গো মড়া, আর বার করিলে দেয় গো ছড়া"—

মড়া বার করে লিলেই তোর ঘরের লোক গোবর জলের ছড়া দিবে। এখন ছাড়, উহার সৎকার করতে হবে। এই শরাবণ, যা ত 'দেহুরি'কে ডাক, সে দেখে বলুক—কী দোষ পাইল। একপাদ, না তিনপাদ? পুষ্করা কী?

পুষ্করা, পুষ্করা। ঘরের ভিতর পুষ্করার নাম হচ্ছে শুনে বাইরে খলায় বসা বয়স্কা লোধানীরা, বিশেষত লুল্হার মা, আঁতকে উঠে বলল, ভয়ানক দোষ গ' দিদিরা। পুষ্করা পড়লে আর দেখতে নাই। ঠিকঠাক ছাড়ান-কাটান না করলে—

কী হয় দিদি? কী হয়?

না'লে তর মাহা-বিপদ। এক এক করে ঘরের অবলা পশু পাখ-পাখালি এমন কী মানুষ পর্যন্ত নিধন হয়, ধন!

পুষ্করা নয়, পুষ্করা নয়। দেহুরি এসে দেখে-শুনে গুণে-ছকে বলল, দোষ ত্রিপাদ। বুকের উপর যখন হাত রেখে মরেছে। তবে আগে ত দাহ হোক, তা বাদে ছাড়ান, নিমছা!

দেহুরির অনুমতি নিয়ে চাটাইসহ গেঁড়াশবরের দেহ খাটিয়ায় তোলা হল। বয়স্ক একজন রাইবুকে আঁকড়ে ধরে রাখল। দৌড়ে এসে ফুলটুসি জাপটে ধরল শিশুবালাকে।

দুজনে হাতের ঝটকায় নিজেদের ছাড়াতে চেষ্টা করলে দুজন ধারকই দুজনকে বেশাটি করে ধমক দিয়ে বলে উঠছে, নাই মাই, বাড়াবাড়ি কর্‌রিস নাই, থাম, কাজটা আগে ভালয় ভালয় হত্তে দে।

নির্বিঘ্নে চারজন শরাবণ-গুড়কুঁদা-চামটু আর শত্রুঘ্ন মড়ার খাটিয়া কাঁধে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে 'হরিবোল' দেওয়া হল তিনবার। শতুরাশবর এসেছে, এসময় না এলেও খারাপ দেখায়, তাই।

খলায় উপস্থিত লোধানীরা 'হরিবোল' ছাপিয়েও এবার 'হরি' করল। কান্নার হরি। যে যত-

জোরে পারল কাঁদল। এসময় কাঁদতে হয়, আর এরা যেন কাঁদতেই আসে।

একজন বয়স্ক লোধা রুদালীদের মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের চুপ করতে বলল। তারা চুপ তো করলই না, বরঞ্চ আরো জোরে জোরে হুরি-কান্না কাঁদতে লাগল। এসময় কাউকে মাথার উপর এরকম করেই হাত নাড়াতে হয়, আর না থেমে এরকম করেই রুদালীদের হুরি-কান্না কাঁদতে হয়।

হাতও নড়ছিল, না-থামা কান্নাও দমকে দমকে বেড়ে যাচ্ছিল।

এর মধ্যেই শ্মশানযাত্রীরা যাত্রা শুরু করল।

বেলা মাথার উপর উঠে হেলে পড়েছে। ফুলটুসি গোবর-জলের খাপরা জোগাড় করেই রেখেছিল। শ্মশানযাত্রীর দল যেই খলা-আঙ্না ছাড়ল, অমনি সে-জল, খলা-আঙ্নায় ছড়ক্ ছড়ক্ করে ছড়িয়ে দিল সে।

তারপর একজোট হয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকল, দাঁড়িয়ে থাকল, একটা মরা-মানুষকে কাঁধে করে যে-কজন জীবন্ত ভুখ্লা-দুখ্লা মানুষ চলে যাচ্ছে, তাদের গমন-পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

কাঁধ দিয়েছে চারজন। শরাবণ-শতুরা-চামটু আর গুড়কুঁদা। চারজন, চারজন।

তাদের পিছু পিছু চলেছে রাইবু, হাতে খড়ের ধূমন্ত 'ব্যাঠনা'। বাপের মুখে ঐ দিয়েই সে আগুন দেবে।

কী করে যে বাপের মুখে জ্বলন্ত নুড়ো গুঁজে দেবে সে, তাই ভাবছে! এখনই তার হাত কাঁপছে থর্ থর্ করে। হাত কাঁপছে! তাকে সাহস জোগাতে সঙ্গে চলেছে আরো দু-চারজন বয়স্কলোধা মানুষ।

ওদিকে এতক্ষণে ঠাকুরবাঁধের ধ'গাছটাকে ফেড়ে ফেলেছে গুরভা, ফেড়ে ফেলে ফালা ফালা করে চিরে চলেছে। কাঠ চ্যালা করবার একটানা আওয়াজ!

সে আওয়াজে ঝড় ঝড় করে কী যেন খসে পড়ছে, কী যেন! এতদিনকার চটে ওঠা চোক্লা, সাদা সাদা বাকল, যা কী না ভ্রমে-বিভ্রমে রাতভিত ধবো জোছ্নায় কী ভুস্ভুসে অন্ধকারে রাইবুর কাছে হয়ে উঠত সোমবাড়ির শাড়ি?

খসে পড়ছে, খসে পড়ছে।

ঐ তো অতদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে শ্মশানযাত্রীর দল, দোরখুলির তেমোহানীতে, তে-মাথায়।

তিনটি রাস্তা গিয়েছে তিনদিকে। একটা গিয়েছে দোরখুলির মাহাতোপাড়ায়, একটা গিয়েছে মাঝুডুব্কার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঠাকুরবাঁধের পাশ দিয়ে কুম্হারপাড়ার ওদিকে, আরেকটা তো ফিরে এসেছে খোদ-লোধাপাড়ায়।

তে-মোহানী, তে-মোহানী।

শ্মশানযাত্রীর দল ওখানে ঐ তে-মাথায় কী একবার থামবে? একটুর জন্য হলেও মড়া নামাবে? তারপর তিনপাক ঘুরে হরিবোল দেবে তিনবার?

ওখানে কী ঘটে ঐটুকু দেখতে এখানে লোধানীরা উৎসুক হয়ে গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

গাছটা কেটে ফেলল গুরভা। ধ'গাছটা।

ঠাকুরবাঁধের বাঁধগোড়ায় জল ছাড়িয়ে ঠুঁটো ধ'গাছটা একা একাই দাঁড়িয়ে থাকত। একা একাই।

বর্ষাকালে বাঁধ যখন কানায় কানায় ভরে উঠত, তখন বাঁধের জল প্রায় ধ'গাছটার গোড়া অবধি চলে আসত। আবার শুকনোর দিনগুলোয় জল সরে যেত অনেকটা দূরে। জল-চলের সময় গাছটার ছায়া-ছাঁয়রা পড়ত জলে। জল কাঁপলে গাছটার ছায়াও কাঁপত হিল্হিল্ করে।

আবারও বলতে হয়, জঙ্গলে রাতভিত, ধবো জোছ্নায়, ফাহা ফাহা চাঁদের আলোয়, শুধু কী রাতভিত, দিনমানেও দিনমানেও, শুধু কী ফাহা ফাহা জোছ্নায়, ভুসাকালির মতো আঝোরঝর অন্ধকারেও অন্ধকারেও, কী কৃষ্ণপক্ষে কী শুক্লপক্ষে, কী অমাবস্যা কী পূর্ণিমায় খর্বকায় মুড়ো-ডগা সাদা সাদা ছাল-বাকলওয়ালা কতক-বা চোকলা-ওঠা ধ'গাছটাকে মনে হত, মনে হত...

মনে হত জলের ধারে 'জল-ঘাট' বসেছে সাফা-শাড়ি-পরা কোনো 'বিটিছানা', কারোর 'পরিবার'। এতক্ষণ বসেছিল, যেই দেখল আরেকজন কেউ আসছে, 'বেটাছানা' 'বেটাছানা', অমনি লোক দেখে ঝপ্ করে উঠে দাঁড়াল। বাঁধের নিচ্ থেকে হুমদুম্ বাঁধের উপর উঠে আসতে আসতে আর 'তুমোও' দেখলে, হ্যাঁ তাই তো, জলের ধারে বসেছিল, এই উঠে দাঁড়াল রুম্রুম্! স্পষ্ট শুনলে, হাতের চুর-বালা বাজাচ্ছে! চুড়ি-রুলি!

তো, সেই ভ্রমের বিভ্রমের গাছটাকেই আজ কেটে ফেলল গুরভা। ধ'গাছটাকে।

তলে তলে কতদূর যে শিকড় চলে গিয়েছিল গাছটার! দোরখুলির লোধাপাড়ায়—কুলবুদা বেনাবুদার টাঁড়-টিকর পেরিয়ে, কয়েত্বেলতলা খিরিসতলা ছাড়িয়ে, আঁটারি-চুরচুর লাটা-পাটা ভেদ করে, শরাবণ-শতুরা-গুড়খা-গুড়কুঁদা-চামটু-রাইবুর ভুগড়া-ঘর পর্যন্ত? নাকি তার পরেও সুরথ-ত্রিলোচনদের বাঁশঝাড় পেরিয়ে বুলান-হদ্হদির ধানক্ষেতের তলে তলে উঠে গিয়েছে দোরখুলির মাহাতোপাড়ায়? সুখজুড়ি-রুখনীমারা-মুঢ়াকাটি-আসনবনি-ধ'বিনি-কুড়চিবনি, ভালিয়াঘাটী-টটাসাহির সাঁওতাল-ভূমিজদের গ্রাম ইস্তক? নাকি তারপরেও, তারপরেও শিকড় চলেছে, শিকড় চলেছে, শিকড় চলেছে কী মাঝুড়ুব্কার জঙ্গল ভেদ করে সরুবালি চিকনবালির বাঁশতল্লা পেরিয়ে কুম্হারপাড়া কাম্হারপাড়ার কুল্হি-মুঢ়ার জোড়া মাকড়া-পাথরের তলে—তলে তলে—

এককালে গাছটা ছিল কুঁভার লাইবুকাদের। লাইবুকাদের ছিল, সে ছিল বাঁধ গড়ে ওঠার আগে। আগে, আগে।

বাঁধ করতে জমির দখল নিল সরকার। তখন সেই গাছ সেই মাটিও আর লাইবুকাদের থাকল না, হয়ে গেল সরকারের, সরকারবাহাদুরের। শুধু নামটা থেকে গেল লাইবুকাদের। 'লাইবুকাদের ঠুঁটা ধ'গাছ।'

জঙ্গলের বাইরের, আর কারোর ভিতরের গাছ নয় বলে, সরকারবাহাদুরের গাছ বলেই গুরভা কেটে ফেলল, কাটতে সাহস পেল। আর সে-সাহস জোগাল তার জটাদিদি। বুড়া মাতব্বরের দাহকার্যে এছাড়া এমন বেওয়ারিশ গাছ সারা জঙ্গল ঢুঁড়ে সে আর পাবে কোথায়?

মাঝুড়ুব্কার একধারে ঝুঁজকো জঙ্গলের ভিতর লোধাদের শ্মশান। শ্মশানে বাপের দাহ করতে এসে রাইবু এই প্রথম দেখল, গুরভা ঠাকুরবাঁধের ধ'গাছটাকেই কেটে ফেলেছে! আর দেখেই সে আঁতকে উঠল।

এ তুই কী করলি গুরভা? কার যোগ-সাজসেই বা তুই ধ'গাছটাকে কেটে ফেললি? মনে মনে রাইবু রেগে গেলেও মুখে কিছু বলল না। তার না বাপ মরেছে? সে না এসেছে তার বাপ গেঁড়াশবরকে শ্মশানে দাহ করতে? একটু বাদেই সে তো তার বাপের মুখে গুঁজে দেবে আগুন?

এসময় কথা বলতে নেই, রাগ-চাড়ও করতে নেই, শুধু কাঁদতে হয়। না কাঁদলে বাপের সদ্গতি হবে না। রাইবু কাঁদল, হুরি-কান্না নয়। চুপি চুপি। চুপি চুপি সে কাঁদল বাপের জন্য, গাছটার জন্যও।

তবু [illegible] ছিল। ছিল, ছিল। সময়ে-অসময়ে, রাগ হোক চাড় হোক, মান হোক, অভিমান হোক, কান্না পায় তো বুক খুলে কাঁদতে, হাসি পায় তো পেটের কাপড় ঢিলে করে হাসতে ঠাকুরবাঁধে এলে গাছটা সোমবারি হয়ে রাইবুর কাছে আসত।

কাছে আসত, বসত, কত কথাই বলে যেত গড় গড় করে। রাইবুও বলত। বলতে শুরু করে আর থামত না। মনের কথা, মহাজনের কথা। বনের কথা, বনভুঁয়ের কথা।

খেই হারিয়ে মাঝে মাঝেই ভাবত, কে বলল আগে? সে, না সোমবারি? আমি যখন এই বললম, তেখন সম্বারি কথার পিঠে কী বলল? হেঁ, কী বলল? ভুলে যায় রাইবু, ভুলে যায়।

সেই, সেই গাছটাকেই কী না কেটে ফেলল গুরভা? উদ্‌বক্কা গুরভা? বোকা গুরভা?

লোধা তো বোকার জাতই। না হলে চাষ করতে দিল যে গরুটা, তাকেই কী না কেটে ফালা ফালা করে সেগুন পাল্‌হায় রেখে খেয়ে ফেললি? সেগুন পাল্‌হার ডগ্ ভাঙলে এখনও রক্তের পারা রস গড়ায়, জানিস কী?

জানিস কী বোকা গুরভা, আমরা বিশ্বামিত্র মুনির ছেলের ছেলে বঠিন? বংশধর?

জানিস কী আমরা অসুর?

'পন্নশব্‌রী' বলে আমাদের এক দ্যাব্‌তা আছে, জানিস কী?

ফুদিচন্দ্র বলে একজন রাজাও ছিল, নাম শুনেছিস? শুন্নিস নাই ত, শুন্নে রাখ।

কামধেনুর গোবর থেকে আমাদের জন্ম, জানিস কী গুরভা?

জানিস কী, আমরা ক্ষত্রিয়?

জানিস নাই, জানিস নাই। কতকিছু তোরা জানিস নাই। বাপ বলত, মানুষের থিক্যে গাছ অনেক বড়। একেকটা গাছ আছে যার তলে, ছামুতে যেয়ে দাঁড়া, দেখবি তোকে কত্ত ছোট লাগছে। সেইরূপ একটা গাছকে, মানুষ-গাছকে তুই কী না কেটে ফেললি গুরভা?

মনে মনে গুরভাকে অজস্র গালাগাল দিয়ে বাঁধগোড়ার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাইবু।

আগে আগে সেদিকে তাকালেই দেখতে পেত—সে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে। লাইবুকাদের ধ'গাছটা।

এখন সেখানে শূন্য, ভোঁ-ভোঁ। প্রায় গোড়া থেকেই গাছটাকে কেটে ফেলেছে গুরভা। দাঁড়িয়ে থাকলে, এতক্ষণে জলে তার ছায়া পড়ত, তার ঝিলিমিলি শাড়ি জলের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠত। জগৎ সংসারে এত গাছ থাকতে আন্‌খা সেই গাছটাকেই তুই কী না কেটে ফেললি গুরভা?

সদ্য কাটার দাগটুকু জ্বল জ্বল করছে। তার উপর বেলাও পড়ে আসছে। শেষ বৈকালের ঝিলিমিলি রোদ এসে পড়েছে গাছটার কাটা অংশে। কখনো কাটা-অংশ থেকে আলো পিছলে সরে যাচ্ছে।

রাইবুর মনে হল, কে যেন নাচানাচি করছে কাটা ধ'গাছের অবশিষ্ট গুঁড়িটার চারধারে। ঘোরাঘুরি করছে। যেতে চাইছে না। কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাইছে না। সোমবারি কী?

সোমবারি, সোমবারি।

তাও তো বহিনটা ছিল। ছিল, ছিল। না হয় গাছ হয়ে, পাল্‌হাপতর হয়ে। আর গুরভা, তুঁই তাকে কেটে দিলি?

না, গুরভার আর দোষ কী! সে তো আর জানে না যে, ঐ গাছটাই, ঐ ধ'গাছটাই সময় সময় সোমবারি হয়ে আমার অন্তরে দেখা দিত? হুঁ হুঁ, জানে বই কি। কতদিন মজলিশে-মিটিঙে গড়ামথানে-বড়ামথানে কতবার বলেছি, বলতে বলতে কতবার কেন্দেছি, কান্দতে কান্দতে মজলিশের মিটিঙের মুখে মুতে দিঞে উঠে এসেছি। এত্ত করেছি, আর গুরভা-গুড়কুঁদা-গুড়খা-শরাবণরা তার বিন্দুবিসর্গ জানে না, এমন তো নয়। তবে কী জেনেশুনেই গুরভা গাছটাকে চটালো? যাই করুক, কুড়ালের প্রথম চোটটা কিন্তুক পড়ল আমার ছাতিতে, ঠিক এইখানে—

হাতে হাতে করে, হাতদুটো বেড় দিয়ে বুকের কাছে ধরে মড়ার কাছে এখন কাঠ বয়ে আনছে গুরভা। তার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে বাকিরাও।

এখনও কিছু কাঠ চেলা করতে বাকি। শতুরা বলল, ভারি দেখে একটা গোটা কাঠ রেখে দিস গুরভা। সব কাঠ চেলা কর্‌রিস নাই।

কেন্নে, গোটা-কাঠ আবার তোর কী কাজে লাগবে?

ক্যাস্ রে ভুলে গেলি? মড়ার গলায় ভারিকাঠ 'জাঁকা' দিতে হবে নাই?

হঁ হঁ, তাই ত।

ভারি কাঠ 'জাঁকা' অর্থাৎ চাপা না দিলে আগুন লাগা মাত্র পা-দুটোর শিরার টানে মড়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে না? কাঠ-ফাঠ ঠেলে হয়ত চিতার বাইরে এসে সামনে যাকে পাবে তাকেই জড়িয়ে ধরবে।

মনে করে হাসতে হাসতে একটা ভারি চেলা কাঠ আর না চেলা করে রেখে দিল গুরভা। একটাই ত গুঁড়ি, আবার আস্ত গোটা কাঠ সে পাবে কোথায়? ঐ চেলা কাঠের একটা, বড় চেলাকাঠই রেখে দিল সে। তাতেই হবে। এক্কেকটা তো কম ভারি নয়।

এসব টুকরো-টাকরা আলোচনা রাইবুর কানে এলে তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। সে বিরসবদনে বসে আছে। বসে আছে, বসে আছে।

বয়স্করা তার আশপাশে ঘুরঘুর করছে। এটা ওটা বলছে। হয়ত গল্প করছে ঝড়িয়া-বর্ষার, শীত-গ্রীষ্মের। হয়ত গল্প করছে হাটের, নদীপারের, হাটুয়াদের। হয়ত ঘুরে-ফিরে আসছে জঙ্গলের গাড়িবাবুদের কথা, বীটবাবুদের কথা। বিশেষ করে নরসিঙার নৃসিংহ-অবতারের কথা।

মোটকথা ছলে-বলে তারা রাইবুকে হাসাবেই হাসাবে। রাইবু কিন্তু একটুও হাসছে না। সে ভাবছে—

আরেকটু বাদেই চিতা সাজানো হয়ে গেলে বাপকে চিতায় তোলা হবে, উত্তর দিকে মাথা করে চিতায় শোয়ানো হবে। তারপরই তার ডাক পড়বে, ডাক পড়বে বাপের মুখে জ্বলন্ত নুড়ো গুঁজে দিতে।

এতদিন যে হাতে বাপের মুখে অন্নজল দিয়েছে সে, এই ত কিছুক্ষণ আগেও শেষ মুহূর্তে আঙুলে করে টোপা টোপা জল দিল বাপের গলায় যে-হাতে, সেই হাতেই বাপের মুখে আগুন গুঁজে দেবে সে কী করে?'

হাত তার কাঁপবে না? এই তো এখনই তার হাত কাঁপছে থখর করে। দাহ না করে 'তুপে' দিলে এসব করতে হত না। পুরুল্যার খেড়্যারা নাকি দাহ না করে তুপে দেয়, তুপে দেয়।

তুপে দেওয়ার সময় আগুন না দিলেও ছেলের হাতে ঘরের মাটি, তুলসী চউরার মাটি তো তাকে খেতে হয়! মাটি দেয়, কাঁটার লাটা দেয়। আর দেয় মরা লোকটা যা কিছু ভালবাসত—পান, দোক্তা, চুন—

রাইবুও মনে করে একে একে এনেছে। বাপ দোক্তা-বনা খেত খুব, চুনে মিশিয়ে দোক্তা বানিয়ে এনেছে রাইবু। এমন কী সঙ্গে এনেছে চুন-সুদ্ধ তসর-ঠয়ার চুন-গুটুলটাও।

মাঝে মাঝে বড়খাঁকড়ির হাটে গেলে বাপের জন্য সে এনে দিত পান। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করতে বড় ভালবাসত বাপ গেঁড়াশবর। হঠাৎ বলতে পান আর কোথায় পাবে রাইবু? পান পাতার বদলে সে এনেছে খাম-আলুর পাতা। প্রায় একই রকম দেখতে। পানপাতার নাম করে খাম-আলুর পাতাই উৎসর্গ করবে সে।

আর ভালবাসত কুঁচি-ফাঁস এড়ে কপ্তি-গুঁড়ুর পাখ ধরতে। তাই বলে গোটা কুঁচি-ফাঁসটা তো আর আগুনে ছুঁড়ে দিতে পারে না রাইবু? দেওয়ার জন্য সে খুলে এনেছে কুঁচি-ফাঁসের একটা 'পাটা', সেই কুঁচির গোলদরজা, সুতোর বরফি, আক্‌খুটি শবরের দেওয়া ঘোড়ার কী গাধার চুলের একঝাল ফাঁস।

আর যা ভালবাসত তা দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। খাসি-মাংস, কপ্তি-গুঁড়ুর পাখির মাংস—যা খেলে মুখের অরুচি মুহূর্তে কেটে যেত গেঁড়াশবরের।

কপ্তি-গুঁড়ুর পাখ-পাখালির মাংসের কথা মনে করতে না করতেই মাঝুড়ুবকার জঙ্গল থেকে পাঁড়কা-কপ্তি ডেকে উঠল। একটা নয়, একসঙ্গে দুটো। বেলা পড়ে আসছে, তাই

বাসায় ফিরবার আগে শেষ-ডাক ডেকে নিচ্ছে—

কু-কু-উ-ড়-ড়-ড়-ড়! কু-কু-উ-ড়-ড়-ড়-ড়!

পাঁড়কা-কপ্‌তি ডাকল, অথচ ফাঁস এড়ে কপ্‌তি ধরবার উপায় নেই রাইবুর। ইচ্ছাটাও নেই।

ধরলেও মরা কপ্‌তি নিয়ে এখন সে কী করবে? একটা না হয় ছুঁড়ে দেবে চিতায়। আরেকটা? আরেকটা, আরেকটা?

মনে পড়ল, তার ডান পায়ের দিকে, বুকের কাছে পা দুটো জড়ো করে মরা কপ্‌তিটা ঝুলছে, মাঝে মাঝে ডানাদুটো খুলছে, ফের জুড়ে যাচ্ছে—

দুম্ করে এও মনে পড়ে যাবে না রাইবুর? বাপ মারা গেলে মরা বাপকে কত লোকই তো দেখতে এল, এমন কী বন্ধা মাহাতোও এসে দেখে গেল—কিন্তু কুম্‌হারপাড়া থেকে তার সয়া-সয়ানীরা কেউ তো এল না? কেউ তো না?

তবে কী কুম্‌হার মাত্‌বররা সয়া-সয়ানীকেও আটকে রেখেছে? ইচ্ছা থাকলেও তারা আসতে পারছে না?

কপাল চাপড়ে উঠে পড়ল রাইবু। উঠে শ্মশান ছেড়ে জঙ্গলের দিকে একটু দৌড়েও গেল সে।

বয়স্ক লোধারা হাঁই হাঁই করে উঠল। পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে রাইবুকে হাতে ধরে বলল, উঠতে নাই রাইবু, ই সময় উঠতে নাই, ঘুরে বুলতে নাই। একজাগায় বসে থাক, বসে যে থাকতে হয় বাপধন!

ভালো ছেলের মতো রাইবু ফের বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। শূন্য শূন্য। "সব উড়ি গেলা, আউ কিছ্বে নাই।" কোনো কিছুই ভাল লাগছে না। আবার যেন সব কিছুই ভাল লেগে যাচ্ছে তার। এই যে আড়বেলা, মিঠা রোদ, শীত নেই তবু একটু জাড়-জাড়—কেমন যেন মায়ের মতন জড়িয়ে ধরে আছে তাকে!

মা মরেছে তার কবে! বাপটাও মরে গেল! সোমবারিও একরকম মৃত। এখন শুধু সে আর শিশুবালা। শিশুবালাও তো মরাফুল! মরা ফুলে কী আর ফল ধরে?

তবু এক উদগ্র কামনায় শিশুবালাকে এখনই এই শ্মশানেই একবার কাছে পেতে চাইল রাইবু। কিন্তু শ্মশানে লোধামেয়্যাদের আসতে নাই, আসতে নাই।

লোধামেয়্যা, লোধামেয়্যা।

সকাল বেলার ঘটনাটা আরেকবার মনে এল রাইবুর। কামিল্লাকে ওভাবে চ্যালাকাঠ নিয়ে খেদিয়ে দেওয়াটা বুঝি ঠিক হয় নি। ঠিক হয়নি কী আবার? —দিতে দিতে সব ত দিয়ে বসে আছি আমরা হাত গুটাঞে।

গেল রাইতে গোঠটাড়ের গরু-খুঁটা পরব-টাঁড় থেকে আমাদের মেয়্যাটা লোপাট হয়ে গেল, চুরি হয়ে গেল। গেল, গেল। তাবলে আমরা কী হাত গুটাঞে বসে থাকব?

নাই, নাই। কুম্‌হারদের ঘর থেকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসব সাবিত্রীকে। কিন্তু কাজটা কী অত সহজে হবে? স্ব-ইচ্ছায় আসতে চাইলে একরকম, স্ব-ইচ্ছায় না এলে তাকে জোর করে আনব কী করে আমরা?

হঁ, কী করে আনব?

এ্যায় রাইবু, রাইবু! কী অত্ত ভাবছিস? বয়স্ক লোধারা রাইবুকে হাঁক-ডাক করছে।

রাইবু থতমত খেয়ে তাকিয়ে আছে ভ্যাল্ ভ্যাল্।

তার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বয়স্ক একজন বলল, অত্ত মন খারাপ করলে চলে নাই রাইবু, শক্ত হ, মনে জোর আন্। তোর মাথার উপর বলে এখন কত দায়-দায়িত্ব। লে, উট!

উঠে দাঁড়াল রাইবু।

যা, ইবার বাপের মুহে আগুন দে!

রাইবু ঘন ঘন মাথা নেড়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। পিছিয়ে গেল, পিছিয়ে গেল।

আবার তাকে ধরে আনল বয়স্করা। বলল, তুঁই মুহে আগুন নাই দিলে গেঁড়াদাদার উদ্ধার নাই হবে। অবুঝ হোস নাই রাইবু!

রাইবুও বুঝল, বুঝে সজোরে কেঁদে উঠল। তারপর জ্বলন্ত খড়ের 'ব্যাঠনা' বাপের মুখে হুড়মুড় করে গুঁজে দিল।

কাঁচাকাঠ আর শুকনা কাঠে ঝাঁটি-পাল্‌হায় মেশামেশি চিতা জ্বলে উঠল দাউ দাউ।

বাপের মুখে নুড়ো গুঁজে দিয়ে চুন-গুটুল দোক্তা-বনা খামআলুর পাতা চিতায় ফেলে দিয়ে সেই যে উল্টো দিকে নিজের মুখ করল রাইবু, আর সে মুখ এদিকে ঘুরালো না? আর তাকে এদিকে দেখতে নেই। ঠাকুরবাঁধ, ধ'গাছের অবশিষ্ট গুঁড়িটা তার এবার মুখোমুখি থাকল। মুখোমুখি।

ধ'গাছটা কেটে চিতায় তুলে দিয়ে গুরভা নির্বিকার। সে এখন ক্লান্তিতে শরাবণ-শতুরা-গুড়কুঁদাদের সঙ্গে দলে ভিড়ে শালপাতার চুটা টানছে। শ্মশানবন্ধুদের শালপাতা, দোক্তাপাতার যোগান দিতে হয়েছে রাইবুকেই।

দড়ির খাটিয়াটা এখন মাটিতে উল্টে রাখা আছে। এ সময় উল্টো করেই রাখতে হয়। এতক্ষণ খাটিয়াটা ছিল সোজা, একটা মৃতলোক সেখানে শুয়েছিল। এখন মৃতলোকটাও আর নেই, সে তো শুয়ে আছে চিতায়! খাটিয়াটা শূন্য। শূন্য, শূন্য।

কে একজন পায়ের এক ধাক্কায় খাটিয়াটা উল্টে দিল।

শবদাহ শেষ করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সন্ধ্যে কী রাতও নামল। কাঁচা কাঠ সহজে জ্বলতে চায় না, রসিয়ে রসিয়ে জ্বলে। রসে-আগুনে পুড়তে পুড়তে চিতা ঘিরে আওয়াজ উঠছিল, শোঁ-এ-এ-এ-এ! শোঁ-এ-এ-এ-এ!

আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে রি-রিঁয়া পোকাও ডাকছিল, রিঁ-ই-ই-ই-ই! রিঁ-ই-ই-ই-ই! এ-শব্দ সে-শব্দ মিলেমিশে একাকার, একাকার।

একাকার হয়ে রাত-নামার 'খপ্পর' হচ্ছিল। লাটায়-পাটায় পেঁচা ভদ্‌কাচ্ছিল। ডানা ঝাপ্টাচ্ছিল বাদুড়। ক্যারকেটা হঠাৎ হঠাৎ-কে-এ-র্-র্-র্ করে ডেকে উঠছিল—কে জানে তাকে ঢ্যাম্‌না সাপে ধরল কী না।

দুচাট্টা ভুঁড়া-শিয়াল এপাশ ওপাশ করতেই শরাবণ অস্থির হয়ে বলল, শুভ নাই, কেমুন অশুভ-অশুভ লাগছে, গুরভা।

চুটা টানতে টানতে গুরভা চোখ বুজে নির্বিকার বলল, কেন্নে? ভুঁড়া-শিয়াল দেখলি বলে? নাই, উ খালভরার শিয়াল যাচ্ছে কাঁকড়া ধত্তে শাঁপগড়ায়।

এসময় শতুরা বলল, গুড়খার বাপের মিত্যুকালে একটা ল্যাক্‌ড়াও ঘুর ঘুর করছিল, তোর মনে নাই গুরভা?

গুরভা মাথা নেড়ে জানাল, সবই তার মনে আছে। মনে মনে সে বলল, জন্তুজানোয়ার পাখ-পাখালি সাপখোপ সঞ্ঝাবেলায় রাতভিত চরতে বেরোয়, চরে খেতে যায়—তার আবার শুভ-অশুভ কী?

মনে মনে বলল, জোরে জোরে বললে তা শুনে খুব খুশি হয়ে উঠত রাইবু, কেননা তার বাপের মতো মানুষের মৃত্যুকেও লোকে অশুভ বলায় রীতিমত চটে যাচ্ছিল সে।

বয়স্ক একজন মাঝে মাঝে 'খেঁচনি-বাড়ি' মেরে চিতার আগুন উস্‌কে দিচ্ছিল। হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত সে-আলোয় স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল—এইটা গুরভা, ঐটা শরাবণ, এই হল গুড়কুঁদা ঐ চামটু। আলো নিভে গেলেই সব তো একাকার। লোধা, লোধা।

চিতা নিভে গেলে উল্টানো দড়ির খাটিয়াটা একটা কুচলাগাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে শ্মশানবন্ধুরা সব একে একে ডিঙোলো! লাফিয়ে পার হল।

খাটিয়াটা পার হবার প্রাক্কালে কে কতদূর লাফাতে পারে তারই যেন আরেকবার পরীক্ষা হয়ে গেল। বিশেষত যুবকরা, চ্যাঙড়ারা। রাইবু আর বয়স্করা খাটিয়া পারাপার করল অতি সাবধানে, নিয়ম মেনে।

কাঁটা পড়ে গেল মৃতের পথে। আর সে আসতে পারবে না লোকালয়ে, নিজেদের লোকের কাছেও। রাইবু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে শেষ-দেখা দেখতে চাইল। কিন্তু পারল না। আর তো পিছন ফিরে তাকাতে নেই, দেখতে নেই। শেষ-দেখা তো হয়ে গিয়েছে শেষ!

তিনবার 'হরিবোল' উঠল, আর হুর্ হুর্ করে কেঁদে উঠল রাইবু।

তারপর তারা ডুব্ গালল ঠাকুরবাঁধের জলে। ঠাকুরবাঁধের হিল্‌হিল ছিল্ ছিল্ জল লোধাদের গা-ধোয়ায় ঘুলিয়ে উঠল।

এম্নিতে তারা জলে নামতে চায় না বড় একটা। শ্মশানে এসে দেহ অপবিত্র হয়ে গিয়েছে তাই জলে ধুয়ে ঘষে ঘষে শরীর সাফা করল তারা। তারপর অদা-কাপড়েই চলল লোধাবস্তিতে, রাইবুর ঘরের দিকে।

তিনডুব দিয়েই তিনবারই রাইবু খুঁজেছিল ধ'গাছটাকে, দেখা মিলল না, বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ'গাছটাও মরল। মরল সোমবারিও।

রাইবু মনে মনে ধ'গাছ খুঁজলেও বয়স্কলোধারা বাস্তবিকই খুঁজছিল জইড় আর বড়্গাছ। অশ্বত্থ আর বটগাছ।

লোধারা গাছপাল্‌হা খুঁজবে কেন—তাদের জঙ্গলের ডুব্‌কা-ডুঙরিব সব গাছই তো মুখস্থ! না, তারা খুঁজবে কেন? তারা ভাবছিল, বিচার-বিবেচনা করে দেখছিল—কোন্‌দিক দিয়ে গেলে বট-অশ্বত্থের দেখা মিলবে আবার ঘরে ফেরার রাস্তাও হবে 'শর্ট-কার্ট'। রাত তো কম হল না!

রাত বাড়ছে, রাত বাড়ছে।

জইড়গাছের সন্ধানে তারা ঢুকল মাঝুডুব্‌কার জঙ্গলে। আঁটারি-চুরচুর লাটা-পাটা ভেদ করে অশ্বত্থগাছ মাথা উঁচু করে উঠে গিয়েছে সোজা। যেহেতু অশ্বত্থগাছ দ্যাব্‌তা গাছ, তার গোড়া লাটা-পাটা চেঁছে করা হয়েছে সাফ সুতোরো। জড়িয়ে ধরতে কোনোই অসুবিধা নেই।

শ্মশানযাত্রীরা একে একে জড়িয়ে ধরল অশ্বত্থগাছকে, সবার আগে রাইবু। রাতের গাছ, রাত-চরাদের গাছ, ঝুরুঝুরু ল্যাজওয়ালা পাতা কাঁপিয়ে রাইবুকে যেন আশীর্বাদ করল। কী একটা, হয়ত ঘুমন্ত পাখিদের পায়ের নখ লেগে এতটুকু একটা কাঠি-খুঁচি তো পড়ল রাইবুর মাথায়!

বয়স্ক একজন বলল, জইড়গাছ ত হৈল, আর বড়্গাছ না হৈলেও চলে! কী বলিস্ রাইবু?

না না, রাইবু তা মানবে কেন? বাপের কাজে সে কোনোরকম 'ত্রুটি' রাখবে না। ত্রুটি রাখবে না, ত্রুটি রাখবে না।

বড়্গাছের কাছে গেলে যেতে হবে অনেকটা ঘুরপথ! মাঝুডুব্‌কা ছাড়িয়ে নারদা-নিগুইয়ের লাল-মোরাম-ফেলা রাস্তার কাছাকাছি।

ভিজা কাপড়ে জাড়ে ঠিবঠির করে কাঁপতে কাঁপতে শ্মশানযাত্রীরা চলল বটগাছের কাছে।

বন-জঙ্গলের পাতাল থেকে, গাছ-গাছালির তলদেশ থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে ক্রমশঃ উপর থেকে আরো উপরের দিকে, আরো উপরে। তলায় একেবারে তলায় পড়ে আছে যে-পথ, রাজপথ থেকে প্রজাদের, তস্য তস্য প্রজাদের পথ, ভালুকঝোড়-লোধাঝোড় কুম্‌হারঝোড়-কাম্‌হারঝোড়-হাটুয়াঝোড়-গরুবাগাল-কাড়াবাগালদের ঝোড়, সব যেন ঝুপ্-অন্ধকারে এখন আবছা, অস্পষ্ট। উপর থেকে, আরো উপর থেকে, মেঘ-পাতাল থেকে

চাঁদের তারাদের আলো প্রথমে শাল-আসনের মাথায় ঝরতে ঝরতে একেবারে নিচেয় এসে পড়লে তবে সে-পথ সে-ঝোড় হবে স্পষ্ট, পরিষ্কার।

পরিষ্কার বনপথে মড়াপোড়া শবদাহের দল এসে জুটল সেই বটগাছের কাছে। এও যেন সেই গ্র্যান্টসাহেবের বটগাছের মতো, দোবরুপান্নার পূর্ব-পুরুষদের সমাধিস্থানের প্রাচীন বটগাছটার মতো। আকারে-প্রকারে এক। এক, এক।

অত বিরাট বটগাছের গোড়া জড়াবে কী, হাত মেলে ধরে দুহাত দুদিকে প্রসারিত করে বুক ঠেকিয়ে রাইবু একটু যেন বেশিই সময় পড়ে থাকল।

বয়স্কজন সাবধান করে দিয়ে বলল, দেক্‌খিস গুরভা-গুড়বুঁদারা, রাতভিত গাছের গোড়ায় লতা-পাতা!

লোধাপাড়ায় রাইবুর ঘুপচীতে পৌঁছে আর আচার তারা মানবে কী, চোখের সামনে যেন ভূত দেখল! গুড়গুড়িয়া।

গুড়গুড়িয়া, গুড়গুড়িয়া।

এখনও কত কী আচার বাকি আছে! রাইবুর বাপ যে ঘরে মরেছে, সে-ঘরে গিয়ে শ্মশানযাত্রীরা তাদের অদা-কাপড় 'চিপে' জল নিঙড়াবে। টপাটপা জল পড়বে মাটিতে, আর সে-জলে তারা পায়ের তল্ ভিজিয়ে ফেলবে। ঘরময় জলপায়ের ছাপ পড়বে ছপ্ ছপ্।

দেখবে থালায় রাখা সোনার টুকরা রূপার টুকরা! লোধাবস্তিতে সোনা রূপা কই? অভাবে লোহা-পিতলই দর্শন করবে তারা। তারপর ভেলাফল আর ভেলাপাতার আগুনের সেঁক লাগাবে একে একে অষ্টঅঙ্গে, সর্বাঙ্গে।

সবশেষে দাঁতে কাটবে নিমপাতা, টুকু টুকু খাবে ছোলামুগ আর গুড়। কিন্তু সব তো পড়ে থাকল! এ-ব্যাটাছেলে কোত্থেকে এল? এল যদি সোমবারিকে সঙ্গে আনল না কেন?

রাইবু-শিশুবালা তার সঙ্গে একটাও কথা বলল না। গুড়গুড়িয়াই পরের পর বলে গেল, এই ধর্মতঃ বলছি, বড়ামথানের হাতি-ঘোড়া ছুঁয়ে বলতে বল-অ যদি ত তাও বলব—সম্বারিকে দেখি নাই, হামি ত জিহলখানা থিক্যে ছাড়া পেয়ে আসছি। এই দ্যাখ-অ কাগজ-পত্তর!

তবু রাইবু-শিশুবালার মন গলল না। কাগজ-পত্তর দেখে তারা কী বুঝবে? পড়তে জানে নাই, লিখতেও জানে নাই। লেখাপড়া যেটুকু জানত সে তো নুকু—সে-ও গেছে ইস্কুলে!

ওস্তাদের কাছে পাত্তা না পেয়ে গুড়গুড়িয়া জুটল গিয়ে গুরভা-শরাবণ-শতুরাদের কাছে। তারা তাকে অন্তর দিয়েই গ্রহণ করল। আয়, আয় গুড়গুড়িয়া!

ধ্যাবড়া টায়ারের চটি নেই পায়ে, তার বদলে সাফা ফিতা-বাঁধা চটি। ছেঁড়া-ফাটা খাকী হাফ-পেন্টুলের বদলে ডোরাকাটা ফুল-জামা, ফুল-পাজামা। আরেকটু মোটা হয়েছে যেন গুড়গুড়িয়া।

গড়গড় করে 'জিহলখানা'র কত কী গল্প বলে গেল সে! গুরভা-শরাবণরাও বলল। বলল, সন্তোষকুম্‌হারকে চিহড়লতায় বেঁধে রাখবার কথা। বলল, তার বদলে গুড়খার বহিন সাবিত্রীকে কুম্‌হাররা এখনও আটকে রেখেছে, তার কথাও।

শুনে-টুনে গুড়গুড়িয়া মুখে চু-চু করতে করতে বলল, আহা রে! যেন তুমার অশোকবনে সীতা!

তুঁই থাকলে কী করতিস? শরাবণ-শতুরারা মজা করতে গুড়গুড়িয়াকে বলল।

গুড়গুড়িয়া পিছনে হাতদুটো রেখে জেলখানার সার্জেন্টের মতো মার্চ করতে করতে বলল, কেন্নে, হামাব সঙে বেহায় বসাতম আর দম্মে খাটাতম, খাট্ শালী কত খাটবি! বেড়ে তোর বাড় হয়েছে, নাই?

কখন রাইবু চুপিসারে এসে গুড়গুড়িয়ার কথা শুনছিল, এখন সবার সামনে হাজির হয়ে বলল, তুই থাম্ বে গুড়গুড়ে!

তৃতীয় পর্ব



কাজুবাদামের গাছগুলোয় ফুল এসেছে ভরভরন্ত।

ছোট ছোট আমবকুলের মতো ফুল সব। থোকা, থোকা, গুচ্ছ গুচ্ছ। সাদাও নয়, আবার হলদেও নয়। মাঝামাঝি, রং যেন-বা মন্দের ভাল। তায় আবার কী গন্ধ!

কী গন্ধ, কী গন্ধ!

যেন তোমার সমগ্র ডুবকা-ডুংরি 'মহকাচ্ছে'। ভুরভুর করছে। সেদিকেই মুখ করে লম্বা শ্বাস ছাড়ল রাইবু। ফুল দেখল, ফুল দেখছে রাইবু। আর তারপর এক ঝট্‌কায় মন খারাপ হয়ে গেল তার।

অথচ ফুল, ফুলের 'বাস', রং-ঢঙ—এমনি কত সব জিনিস যা দেখামাত্রই মন ভাল হয়ে যায়, মনে সুখ-সুখ লাগে। কিন্তু কী আর করার—ফুল দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল তার।

বনে-জঙ্গলে কতই তো গাছপালা, তার কতরকম ফুল। কখন সাদা সাদা কুড়চি ফুটে আলো হয়ে যাচ্ছে লাটাপাটা, আর রাতভর কত মণ 'কাঁকরজল' যে ঝরে পড়ছে তাদের উপর! আঁটারির 'ডগে' কবে যে আখফুল-কাশফুলের মতো এক বিচিত্র ফুল এল! ভোর ভোর কুয়াশার জাল ছিঁড়ে পড়ে আঁটারিলাটায় কুড়মুড় আটকে গেল। তাই বা কে দেখছে!

রদোবদো করে এত ঝুনঝুনিফুলই বা ফুটল কবে? হলদে হলদে? দুধিয়ালতা, গুঁদলি, সুরগুঁজা, তিল—ফুলে ফুলে ছয়লাপ। পায়ের তলায় ছোট ছোট সাদা সাদা ঘইশ বা দ্রোণফুল! এর মধ্যেই ফুল ঝরে গিয়ে ঝুমকালতায় এত ঝুমকা, কানপাশাই বা ধরল কবে থেকে? ধাত্‌কি, কেয়া, কদম্ব ফুটলই বা কবে আর ঝরলই বা কবে? সময় হলে বন-ঝিঙা, বন-কাঁকড়ো, বন-কুঁদরির 'লতে' ফুল তো আসবেই, ফল তো ধরবেই। এ সব তো জানা কথা।

পিয়াল-ভুড়রু-ভেলা-বাদভেলার গাছে ফুল এসে ঝরে যায়। শালতলা দিয়ে যাবার সময় শালফুল ঝরে মাথায় পড়ে। ঝাপট মেরে লোধাজনমানুষ শালফুলটা হাতের মুঠোয় নেয়। তারপর ঝটপট পাপড়ি ছিঁড়ে ভিতরের গোলাকার সবুজ শাঁসটুকু কচমচ চিবিয়ে রসটুকু নিঙড়ে থু-থু করে ছিবড়েটুকু ফেলে দেয়। গলা ভেজায়। ঐ বড়জোর, ঐ।

কবে কাক-চিলের গুয়ে ভরা কসুমগাছের পাতা ঝরে গিয়ে নতুন নতুন পাতা গজাল। আর কবেই বা নতুন চিরোল চিরোল পাতা আর লাল লাল কুসুমফুল সব একাকার হয়ে গেল— ধান্দায় বেরিয়ে লোধাজনমানুষ চেয়েও দেখে না। কচড়ায় খোঁচ এসেছে। খোঁচে খোঁচে টুকুটুকু কুঁড়ি। কুঁড়ি ফাটিয়ে মুক্তার মতো ফুল, মহুলফুল। ঝরবে যখন গাছতলা হয়ে যাবে ধবোয় ধবো।

লোধারা ভাবে, এ আর এমন কী। এ তো তাদের জন্ম থেকে দেখা। এক জিনিস দেখতে দেখতে, বলতে কী, চোখে পড়ে গেছে কড়া। এক জিনিষ আর কতবার দেখবে! এ জঙ্গলে জঙ্গলের জীব তারাও যেমন আছে, গাছপালাও আছে। আর গাছ থাকলে ফুল তো হবেই, ফুল ঝরে গেলে ফল।

দৈবাৎ জঙ্গলের কোনো কিনারে, একান্তে, কোনো চেনা গাছে মরা-ঝরা দুটো-চারটা চেনা ফুল ফুটল, আর ফুলের 'বাসে' ডুব্‌কা-ডুংরি 'মহকে' উঠল, আর তাই দেখতে ধান্দা ছেড়ে "আহা" "উ-হু" করতে লোধারা দৌড়ুল—বলতে কী এমনটা কদাপি হয় না। হতে নেই, লোধাদের হতে নেই।

তবু রাইবু কাজুবাদামের ফুল দেখে হাঁ হয়ে গেল আজ।

হঁ, আমার মন না মতিভরম? ন্নাই জানি, ন্নাই জানি।

আপনার মনে বলে হাতের বুড়িয়াটা বাগিয়ে ধরে গাছটায় খুব জোর একটা চটা মারল রাইবু। কে জানে কেন।

কাণ্ডটা একেবারে কেটে বেরিয়ে গেল না। ঐ বড়জোর একটা কোপ লাগল মাত্র। তার মানে এরমধ্যেই গুঁড়ি বেশ মোটা আর শক্ত হয়েছে। তারমানে নতুন মাটিতে অনেকদূর শিকড় গেড়েছে গাছগুলো। তারমানে মাটি কামড়ে পড়ে আছে গাছগুলো। আর থাকবেও।

বুড়িয়ার আঘাতে কতক ফুল ঝরে পড়ল গাছটার গোড়ায়। ছোট ছোট, ঠিক সাদাও নয় আবার হলদেও নয়। সেই ময়লা, ফিকা ফিকা।

কোত্থেকে দৌড়ে এসে গাছটার একটা পাতাও টেনে ছিঁড়ল গুড়গুড়িয়া।

বলল, পঁড়শপাল্‌হার পারা পাল্‌হা, ন্নাই?

'পঁড়শ' তার মানে কাঁঠাল। রাইবুও একটা পাতা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে বলল, হঁ-অ, পঁড়শ-পাল্‌হা আর টুকচার বড় বড় রে, গুড়গুড়ে।

ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া টায়ারের চটির জায়গায় পায়ে উঠেছিল সাফা সাফা ফিতা-বাঁধা চটি। হাঁটলেই পায়ে আওয়াজ দিত ফট্‌ ফট্‌। সেই ফিতা-বাঁধা চটিজোড়াটা আর নেই। সুখ গিয়েছে। তার জায়গায় কদিন কলাগাছের বাকল সাইজ করে কেটে দড়ি বেঁধেই চালাচ্ছিল। কাঁটায়-লাটায় একটা কিছু পায়ে না দিলেও চলে না। আজ, বছর দুয়েক হল, কার ঘরের আস্তাকুঁড় কী গোবরগাদা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটা চপ্পল আরেকটা ছেঁড়া-ফাটা গামবুট কখনো দুধিয়ালতার কখনো বাবুইঘাসের দড়ি বেঁধে বেশ তো চালিয়ে আসছে।

এক পায়ে চপ্পল আরেক পায়ে গামবুট। গুড়গুড়িয়া। রাইবুর দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও হাতের বুড়িয়াটা বাগিয়ে ধরে আরেকটা গাছের গোড়ায় গায়ের জোরেই কোপ মারল।

কাঠের জন্য নয় নিশ্চয়, তবে কী এমনি এমনি?

এ জঙ্গলে নতুন।

বাদ-বাকি সব সেই তো পুরাতন শাল-পিয়াশাল ধ-আসন বহড়া-অর্জুন কচড়া-কইম কুসম-করম ডকা-ভাদু জারুল-শিরিষ পিপল-কষাফল। সব বড় বড় গাছ। তার তলায় তলায় আঁটারি-চুরচু পড়াশ-কুড়চি পিয়াল-বৈঁচি কেঁদু-ভুড়ক ভেলা-বাদভেলা। যতসব ছোট ছোট গাছ। ঝাঁটিবন-লাটাপাটা-ডুবকাডুংরি।

এদেরও বাইরে, জঙ্গলের ধারে ধারে, একদা জমা এখন খাস ডাহি-ডুঙোড়ের মাথায় মাথায় সাজানো বাগান জঙ্গলবাবুদের, সরকারবাহাদুরের। সোনাঝুরি বা আকাশমণির পটাশ বা ইউকেলিপটাশের, কাঠবাদাম বা কাজুবাদামের।

রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা বড়খাঁকড়ির হাটে যেতে-আসতে রাস্তার দুধারে এতদিন দেখে এসেছে হাটুয়ারা নদীধারে পালজমিনে বাদাম বুনেছে। হাঁটুসমান সে-সব গাছ। গাছ কী আর, গাছের 'লত্‌'। বিরি-কুরথি কদো-গুঁদলির চেয়েও ছোট ছোট। আর তার ফল তো হয় মাটির তলে, পাতালে।

রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা কতদিন দূর থেকে দেখেছে রাতে ক্ষেত পাহারা দিতে আসা মুনিষ মাহিন্দররা ফলসুদ্ধ বাদামগাছ উপড়ে আগুনের ধুনি জ্বেলে তাতে বাদামসুদ্ধ গাছটা পুড়িয়ে উশুম উশুম ভাজাবাদাম কুড়ুর-মুড়ুর খাচ্ছে। আলোর ঝলকানিতে চিবানো বাদামসহ তাদের হাঁ-মুখটা দেখা যাচ্ছে। গাল নেড়ে-চেড়ে তারা তখন কত কথাই বলে চলে। বলতে বলতে মুখের কষ বেয়ে বাদামের ফেনা এসে যায়।

রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা কানখাড়া করে সেসময় কত কী শুনেছে! শুনেছে, চুয়াড় মুনিষ-মাহিন্দররা তাদের 'গিরিহা'র তাদের মহাজনদের ঝিউড়ী-বউড়ীকে ভোগসুখের ফন্দি আঁটছে। কাকে ভোগ করলে, ঝিউড়ী না বউড়ীকে, বেশি আরাম পাবে—তারই তুখোড় আলোচনায় মশগুল থেকেছে।

রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা তো কান খাড়া করেছিল ঐটুকুই শুনতে যে, মুনিষ-মাহিন্দররা বাদামচুরির ঘটনায় তাদের জড়ায় কী না, ঐটুকুই দেখতে। নেই তো নেই, বাকি কথায় তাদের কাজ কী বা।

তো, এ-বাদাম সে-বাদাম নয়। গাছ-বাদাম। ভেলা-ভুড়রু, কেঁদ্-পিয়ালের মতো গাছেই ধরে। কে জানে কোন্ বাগানের গাছ, কোন্ কাননের ফুল। গাড়বাবুরা ফরেস্টারবাবুরা কোন্ বিদেশ থেকে এ-সব গাছ আমদানী করে এখানে পুঁতে রেখেছে।

এখন তো চারধারে লাট কে লাট কাঠ-বাদাম গাছ-বাদামের বন। কালচে-সবুজ কাজুর জঙ্গল। মগডালে ডালে ফিকা-ফিকা হল্‌দে মঞ্জরী, কাজু-বাদামের ফুল। আর তার গন্ধ।

কী গন্ধ, কী গন্ধ!

এখান থেকে গাঁ-গঞ্জ খুব দূরের নয় বলে মাঝে মাঝে কাল-চিল উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঢেপচুপাখি লম্বা ল্যাজ ঝুলিয়ে এককে টানে একেক ছন্দে কিছুদূর উঁচুতে উঠে ফের নিচেয় নেমে 'এ-ডালে বসব' 'ও-ডালে বসব' করে করেও কোথাও কোন ডালেই সে বসছে না।

উড়েই চলেছে, উড়েই চলেছে।

এসময় কোত্থেকে একটা গুয়েবনি এসে পাখিটার সঙ্গ নিল। সঙ্গে এসে ভিড়ল কী আর সাধে? চ্যা-এ-এ-এ-র চ্যা-এ-এ-এ-র করে পিছু লেগে এখন সে ঢেপচুটাকে ছুটিয়ে মারবে।

লোধাদের একদঙ্গল বউড়ী-ঝিউড়ী এসময় কাছে থাকলে এই দেখে বলত—

মরণ!

একটুক পাখকে ঢেপচুটার ডর দ্যাক্!

বোধায় চুরিটুরি করেচে?

তবে ত চোর!

চোর, চোর।

চমকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল রাইবু-গুড়গুড়িয়ারা। ফুলন্ত গাছে চোট দিয়েছে তারা। অসময়ে ফুল ঝরে গেলে ফলের দফারফা। বিশেষত এবছর কাজুবাদামের গাছে ফুল এসেছে মেলা। এখন শুধু 'নিলাম ডাকের' অপেক্ষা।

এটাই সময়, কাজুবাদামের গাছে ফুল আসার। আর, ফুল দেখে নিলাম ডাকার। যায় যায় করে শীত গিয়েছে। দখ্না-হাওয়া চালাচ্ছে মাঝে মধ্যেই। ভোরের দিকে আবার ঝিলঝিল কুয়াশা। এঁটেলমাটির আদড়া জমিনে হেথাহোথা চাগড়া চাগড়া বিরি-বাইগনের গাছের উপর ছেঁড়া কুয়াশার জাল সূর্য ওঠার পরেও অনেকক্ষণ অটুট থাকছে।

তাছাড়া আমেও বকুল এসেছে। কচড়াগাছের খোঁচও ভরে এল মহুলে। সময়কালে ফুলও ঝরে যাবে, ফল আসবে। ফল পাকবে। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কী? লোধাদের কী? ঝুড়ি ঝুড়ি পাকা কাজুবাদামের ফল তো চালান হয়ে যাবে 'নিলাম-ডাক্‌নেওয়ালা'র খামারে। কাজুবাদামের বন যে 'লিজ্' নিয়েছে, তার ঘরে। তারপর তো বীজ একধারে ফল একধারে—

টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো লাল, পাকা কামরাঙার মতো লাল লাল ফল সব। রসে টুস-টুস। গাছে থাকতেই বাদুড় এসে দাঁত বসায়, বনটিয়ার ঝাঁক ডানা ফরফরায়। খেতেও তো বেশ কষা কষা, অম্লমধুর। বীজ ছাড়া ফলগুলোও বিক্রি হয়ে যায় সের দরে।

এই কিছুদিন আগেও কাজুবাদামের জঙ্গল আর ছিল কোথায়! লাট কে লাট তো ডাহি-ডুঙোড়। কুমহারপাড়ার কাম্‌হারপাড়ার। মাহাতোদের ভুঁইয়া-ভূমিজদের। যার যেখানে জোত-জমিন, তার মাথার ডাঙা-ডুংরি তার দখলে। জঙ্গল কেটে বানানো ডাহি, তাতে আউসধান-জনার-কুরথিকলাইয়ের চাষ হত।

'আউসধান' বোনার আগে ডাহিময় গাছের 'মূঢ়া' কাটার ঠুক্‌ঠুক্ আওয়াজ উঠত। 'হিঁ-ই-ই-ই ন হ" বলে হালের চলমান গরুগুলোকে থামিয়ে চাষীরা অবলা জীবগুলোর গায়ে পিঠে হাত বোলাতো, আদর করত। তারপর আচমকা তাদের ল্যাজুড় মুচড়ে দিয়ে 'ট-ট' আওয়াজ করে 'কাঠুয়াতো'। গরুগুলো আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে অধিকতব উদ্যমে হালে ঘুরত। ঘুরত, ঘুরত। মাটি থেকে ফালের ডগায় ওঠা পোকামাকড় খাওয়ার লোভে মাথার উপর কাক-চিল চক্কর মারত, উড়ে-ঘুরে বেড়াত।

এনামেলের হাঁড়িকুঁড়ি পিতলের ঘটি-গেলাস রোদে যখন-তখন ঝলসে উঠত। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ হঠাৎ থালা-বাসনের আওয়াজ উঠত ঠুং ঠুং। গাছের তলায় গামছা-ঢাকা ছাতার তলায় ঘুমন্ত শিশু ডুকরে কেঁদে উঠত, 'অঁ-হা অঁ-হা!'

এতসব মিলে এই ক'বছর আগেও তামাম ডাহি-ডুংরি সরগরম হয়ে থাকত অন্তত বছরের তিন-চারমাস! আর তারপর তো জঙ্গলবাবুরা চাঁদাবিলা-পাঁচকাহিনার বীটবাবুরা গাড়বাবুরা উৎখাত শুরু করল।

আমিন এল, তহশীলদাররা ঘুর ঘুর করল। পিতলের চাকতি-লাগা বড় বড় শিকলি এল, এক মণ, দু মণ ওজনের ঝিজরি। জঙ্গল জরিপ হবে। দাগ নং খতিয়ান নং মিলিয়ে মিলিয়ে জঙ্গলমহালের বেদখলী জমি উদ্ধার হবে। সব উটবন্দী খাস-জমি।

জমি তো জরিপ হবে। কিন্তু এত ভারি ভারি অত লম্বা লম্বা চেইন কাঁধে করে বইবে কে? বন-জঙ্গলের লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে সর্ সর্ কবে লোহার অতবড় ঝিজরি টানবেই বা কারা?

কাম্‌হার-কুম্‌হার ভুঁইয়া-ভূমিজরা তো হাত গুটিয়ে বসে থাকল। জমি যাবে তাদের আর তারা কী না দু'হাত লাগিয়ে 'চেন' টেনে সাহায্য করবে বীটবাবুদের, গড়বাবুদের? নরসিঙাদের?

অত্তো নয়, অত সহজ নয়। 'চেন' টানতে হয় টানুক বীটবাবুরা, নরসিঙারা। খালভরাব জঙ্গলবাবুরা। লোধারাও ধারে কাছে ঘেঁষল না। রাইবু-গুবভা-গুড়গুড়িয়ারা তো কদিন কাটিয়ে দিল বড়খাঁকড়ির হাটে, লবকেশরপুরের রাশটাঁড়ে। 'ঢেন্ডিপালি' দেখে, 'চুড়িয়া গীত' শুনে। আর কিছু না হোক ভুখা-পেটে ঠায় দাঁড়িয়ে ক'দিন খেলা দেখেছিল বলখেলার মাঠে, গোঠটাঁড়ে।

রাইবুর মনে হয়েছিল—ওতেই রাগ লোধাদের উপর জঙ্গলবাবুদের। ওর জেরেই তারা 'লুটিশ' পাঠিয়েছিল দোরখুলির লোধাপাড়ার উপর—হটো হটো, রাজার বাগান থেকে হটো! সেই উচ্ছেদ-নোটিশ এখনো ঝুলছে।

কাম্‌হার-কুমহার-মাহাতো-ভুঁইয়া-ভূমিজদের আবাদী ডাহি-ডুংরি দখল হল। জঙ্গলের জমি ফের জঙ্গলের ভিতর ঢুকল। তাই নিয়ে কত কোর্টকাছারি। টিঁকল না, ধোপেই টিঁকল না। পুনর্দখল জমিতে পুনরায় গাছ বসানো হল। সোনাঝুরি, পটাশ, কাজুবাদামের গাছ।

গাছ বড় হল, ফুল ফুটল, ফল ধরল—সে ফল বছর বছর 'লিজে' বিক্রি হল। তবু লোধাদের পাছায় এখনো লটকাজারি—হেই হটো হটো, রাজার বাগান থেকে হটো!

ভার-কাঁধে কাঠ-কাঁধে কোথাও গেলে-এলে এখনো মনে হয়—যেন তাড়া দিচ্ছে কেউ।

তাড়া-খাওয়া জন্তু, দু'পা এগোয় তো লোধারা এক পা ঠুকে মারে, যেন লাথি খাও। আর যেন আপনার মনে বলে, বন থেকে বেরুল চিতি, চিতি বলে তোর পাতে মুত্তি—

পাতে না জঙ্গলবাবুদের মুখে। আপনার মনে বলে রাইবু বুড়িয়া তুলে ফের চটাতে গিয়েছিল গাছটাকে, আর থমকে গেল।

থমকে কাজুগাছের সাজানো বাগানের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখল—কে যেন আসছে হন্ হন্ করে। কে? কে?

প্রায় লাফ দিয়ে রাইবুর ঘাড়ের কাছে এসে পড়ল গুড়গুড়িয়া। কানে কানেই বলল, আসছে কুম্হার মাত্বর অনিল বেহেরা। লদোপদো আসছে পেটে হাত বুলাতে বুলাতে আর উপরের দিকে ভাল্তে ভাল্তে। যেন তুমার পেটটা গড়বড়াইছে, দম্মে চিপে আছে, কাছা খুলেই বসে যাবে কাজুর বনে, হুই দ্যাখ-অ!

বলেই দম্সম্ করে হাসতে লাগল গুড়গুড়িয়া।

তাকে এক দাবড়ানিতে থামিয়ে দিল রাইবু। —থাম বে গুড়গুড়ে! ম্যাড়া, এতদিনে এই বুঝলি? উপরের দিকে ভাল্তে ভাল্তে—তার মানে ত বেহেরাবুড়া কাজুর ফুল মাপছে, কত ধানে ক-স্তু চাল। নির্ঘাত লিলাম ডাকবে ইবচ্ছর।

হঁ-অ, তাই ত। তাই ত।

বলতে বলতে দুজনেই দৌড়ুল। দৌড়ুল কাজুর বন ছেড়ে, সাজানো বাগান ছেড়ে অঝোরঝর বনের দিকে। লাটাপাটার ভিতর দিয়ে। দাপুটে গামবুটের আঘাতে ছাগল-হাঁচি টাঁড়-ডিঙলার ফল পুটুস-পাটাস মাড়াতে মাড়াতে।

আগে তো দৌড়াক। এসময় দৌড়াতে হয়। অচেনা লোক দেখলে তো বটেই, এমন কী চেনা লোক দেখলেও। লোধারা দৌড়োয়।

রাইবু, গুড়গুড়িয়া দৌড়ুচ্ছে।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে সীতানালা খালধারে। জায়গাটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। অজস্র ঝোপঝাড়, লাটাপাটা। ঘপচি ঘুপচি।

তার তলায় তলায় বহন্তি জলের ধারা। উপরে, তারও উপরে তস্য উপরে উঠন্তি ল'গাছ, এঁকেড়-বেঁকেড় ল'য়ের ডগা। হাতিশুঁড়ের মতো দুলছে। আঁউলা-বাঁউলা পানআলু-খামআলু কাঁকড়ো-কুঁদড়ির কতরকম তো 'লত'! 'ডালে-পতরে' কতরকম গুটিধরা!

শীত গিয়েছে, খালের জলের উষ্ণতার 'উসম উসুম' ভাবটাও আর নেই। এখন জলে নামলেই কাল্হা-হিমশীতল। আরো তাত্ উঠুক, ক্রমশঃ ছাতিফাটা চাঁদিফাটা তাত্—তখন বুঝা যাবে এ-জলের সোয়াদ কত! এক ঢোক খেলেই প্রাণ-মন জুড়িয়ে যাবে না?

রাইবু, গুড়গুড়িয়া তো কতদিন ভোখ্লা-পেটে ভরপেট খালের জল খেয়েই খালধারে লাটাপাটার আড়ালে ঘুমিয়ে থেকেছে। সুখে বিভোর হয়ে।

এখন বহন্তি জলের হেথাহোথা দণ্ডায়মান কাঠি-খুঁচি, কী গুড়মনগাছের চিঙড়ির খোসার মতো শরীরে বহন্তি দলদলি-শ্যাওলা দিনের পর দিন জমা হচ্ছে, আর জমা হচ্ছে। কখন বর্ষায় বনে 'ঝোপ্' আসবে অর্থাৎ বুনো বান আসবে হুড়মুড়িয়ে আর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দলদলি শ্যাওলা, শুকনা পাল্হা-পতর, জব্‌রা-কাঠিখুঁচি, সাপ-খোপ—

এখন আটকে-থাকা দলদলি-শ্যাওলার আশপাশে একটা-দুটো চাঁদখুড়িমাছ ভাসতে বাসতে এসে ঠোক্কর মেরে আবার সরে যাচ্ছে। এগোচ্ছে আর পিছোচ্ছে। খেলা-খেলা।

তারা তো আর জানে না—খালধারে এসেছে গুড়গুড়িয়া। জানলে এতক্ষণে কোথায়

কোথায় যে লুকিয়ে পড়ত! দলদলি শ্যাওলার আড়ালে কী মাকড়াপাথরের তলায় তলায় হাজার আঁজলায় তুলে গামছায় ছেঁকেও কিছুতেই কব্জা করতে পারে না গুড়গুড়িয়া। চারধারে বাঁধ বেঁধে 'খাপরায়' জল ছেঁচে কত কায়দাই যে সে করে!

খালধারে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে গুড়গুড়িয়া বলল, দিব-অ শালার একদিন ঝাড়ে-বংশে নিকাস করে হঁ-অ।

বলেই হাতের বুড়িয়াটা সজোরে ছুঁড়ে মারে মাটিতে। এক খাব্‌লা মাটি তুলে অন্তরটা মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে তফাতে।

রাইবুও হাতের বুড়িয়াটা নামিয়ে রাখে। তবে জোরে নয়, ধীরে। তারপর ধপাস্ করে বসে পড়ে এমনি বলতে হয় বলে, কাকে বে গুড়গুড়ে? কাকে?

কাকে ফের উকে—হুই যে কাজুর বনটাকে।

হঁ, কাজুর বন। বলেই রাইবু থুতু ফেলল, তার দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও।

বলল, কাজুর বনের আর দোষ কী গুড়গুড়িয়া? কথায় আছে নাই—"কী ভাল্‌ছিস্ ভ্যাল্ ভ্যাল্, যার সর্ষা তার তেল?" যার টাকা আছে কাজুর বনের 'নিল্লাম' ত সেই ডাকবে। জিম্মা ত সেই লিবে। লব্ধাদের আর টাকা কই—তুঁই-হামি বুড়াআঙুল চুষব ন? সেই বলে নাই—"মনে করি খাব্ব চিঁড়া-দই, দেনেঅলা দিলেক ফপ্‌রা খই?" শালার ফপ্‌রা খইটুকুও ত সময়ে মিলে নাই।

বলেই রাইবু লম্বা শ্বাস ছাড়ল, তার চোখ এখন অদূরবর্তী বনভূমির দিকে। যেখানে শালের বন, কেঁদুর বন, আসনবন মেশামিশি মেশামিশি। তার ভিতর ভিতরে কোথাও বা একটা-দুটো কচড়াগাছ, কুসুমগাছ। তিঁতুড় বা তেঁতুলগাছ।

খালধারে জঙ্গলের এত ভিতরেও কচড়া কী কুসুম কী তেঁতুলগাছ হাটুয়াদের বাবুভায়াদের সাঁওতালদের 'জোতে'র যে হয় কী করে—রাইবু ভেবে পায় না। মহুলের সময় মহুল কচড়ার কালে কচড়া, কুসুমের সময় কী তেঁতুলের 'টায়েমে' তেঁতুল পাড়তে যাও 'খোঁচ' ধরে হিলাতে যাও, ব্যাস— কোত্থেকে যে দৌড়ে আসবে পাথরডহরার চৌধুরীরা, কিয়াঝরিয়ার জানারা কী বিরিবাড়িয়ার পাতররা!

কী করে যে টের পেয়ে যায় তারা!

রাইবু ভেবে পায় না। রাইবু আরো কত কিছুই যে ভেবে পায় না, এই যেমন—জঙ্গলবাবুরা জঙ্গলের ভিতরের তামাম জোতজমি খাস করে দেওয়ার পরেও চাষীরা কচড়া-কুসুম-তিঁতুড়ের উপর হকদার হয় কী করে? এখনও খালধারের ডাহিজমিনে কদো-গুঁদলি তিল-তিসি বোনে কী করে সাঁওতালরা?

অথচ লোধারা বনের আঁউলা-বাঁউলা, চাট্টি ফল-পাকুড়, ভুঁই-কুমড়া, ভুঁই-ছাতু, দাঁতনকাঠি, পাল্‌হা-পত্তর কী 'কুরকুটপটম' ধরে টানাটানি করলেও হাতে হাত-কড়া পরাবার ভয় দেখিয়ে গাড়বাবুরা বলবে, পারমিট দেখা। নচেৎ চ পাঁচকাহিনা।

পারমিট, পারমিট। পাঁচকাহিনা, পাঁচকাহিনা।

কতরকম 'গেঁড়াকলের' নাম—রাইবুর অতশত মাথায় ঢোকে না। তার মাথায় তো ঢুকে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে—"বনে জনম বনে মরণ বন লোধাদের হকের ধন।" ঐ যে ঐ ভুবনা-ফুলটুসুয়ার 'লিখা-পড়া-জানা' মেয়্যা নুকুর সেই কবিতা, সেই গীত।

বাপ গেঁড়াশবরও ত বলত, জঙ্গলের ভিতরের গাছপালাহা কেটে ঝাঁটি-মুড়হা তেড়ে 'খুঁট-কাঠি' পুঁতে যবে থেকে গ্রামের চেহারা-চৌহদ্দি ঠিক করে বসবাস শুরু করল সাত্তাল-ভূমিজরা—তারও আগে থেকে, বাপের বাপের বাপের তার বাপেরও চৌদ্দপুরুষের বাপের

আমল থেকে আমরা লোধাশবররা আছি। সত্য-তের্‌তা-দ্বাপরেও ছিলাম, কলি-ঘোরকলিতেও আছি, থাকব। থাকবই।

রাইবু দেখল—ঐ যে ঐ বুঢ়্‌হা শালগাছটা যার মোটা তেলতেলে পাল্‌হা-পতর এখন 'খরা' লেগে চক্‌চক্ করছে, ঐ গাছটাও আমাদের সঙ্গে কোন্ সেই যুগ থেকে আছে! কাঠ দিয়ে দাঁতন-কাঠি দিয়ে পাল্‌হা দিয়ে পতর দিয়ে ধুনা দিয়ে ফুল দিয়ে শালের বীজ দিয়ে শালপঙড়া ছাতু দিয়ে 'ডাড়ে-পতড়ে' 'কুরকুট পটম' দিয়ে—কত কিছু যে দিয়ে দিয়ে এতদিন সে আমাদের পেটের অন্ন জুগিয়ে আসছে!

আজ রাত পোহাতে না পোহাতে সেসব উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে? এই বন, 'বঁড়র' গাছ-পাল্‌হা, দুধিগদ-ধুদকুল-খুদিকড়-চিহড়-পাকুড় কতরকম বনওষুধের গাছ—সব, স-ব আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে? যখন যেমন মন করলে আর আমরা ছুঁয়েও দেখতে পারব না?

রাইবু খানিক চুপ থেকে আচমকা গর্জে উঠল, শালার কী যে শুরু হয়েছে 'লিল্লাম লিল্লাম'! লিল্লামবালা দু-আনা ছ-আনার পারা লাটকে লাট কাজ্জুর বন মোট্টা টাকায় বীটবাবুরা লিজ দিচ্ছে মাহাজনদের। মাহাজনরাও ফুল দেখে দেখে বন ধরছে। আর ফলও ফলছে অঝোরঝর!

ফল ছাড়ালেই বীজ। হাট্টে-বাজ্জারেও যেতে হচ্ছে নাই, ঘর থিক্যেই লিয়ে যাচ্ছে পাইকাররা।

গুড়গুড়িয়া বলল, হঁ, আর নরসিঙাগাড় ত এক্‌ক্ষণ তক্‌ক্ষণ বলে, লিজ্ নাই দিলে বন বাঁচ্চান দায়। শালার লদ্ধা-সান্তাল-কাম্‌হার-কুম্‌ভাররা লুট্টেপুট্টে খাব্বে।

হঁ, বন বাঁচাচ্ছে নরসিঙা। কাজ্জুর বন দিয়ে শুরু হয়েছে—কুনদিন দেখবি শালবন কেঁদ্‌বনও লিজ দিচ্ছে নরসিঙা।

রাইবু বলল বটে। কিন্তু শালবন কেঁদুবন লিজ দিলে কী যে ক্ষতি হয়ে যাবে লোধাদের—কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না গুড়গুড়িয়া। সে তার দু পা ভাঁজ করে ভাঁজের ভিতর মাথাটা ঈষৎ গুঁজে দিয়ে কাঠিখুঁচি জোগাড় করে মাটি আঁচড়াচ্ছে। রেখ্ কাটছে, রেখ্ কাটছে। লিজ? হ্যাঁ, তা দিতেই পারে নরসিঙা। এই একটা রেখ্ কাটল গুড়গুড়িয়া। ধরো, লিজ দিয়েই দিল নরসিঙা। আরেকটা রেখ্ কেটে তৎক্ষণাৎ কাটাকুটি করে দিল গুড়গুড়িয়া।

রাইবু কিন্তু চোখ বুজে বসে আছে গোঁজ হয়ে।

তার চোখের সামনে নিলাম হয়ে যাচ্ছে শালের বন কেঁদুপাতার বন। শালপাতা-শালফুল-শালদাঁতন-শালপঙড়া, বিড়িপাতা-কেঁদফল—সব, স-ব বেদখল হয়ে যাচ্ছে। লোধাশবররা দাঁড়িয়ে থেকে ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে দেখছে।

কী দেখছিস্ ভ্যাল্ ভ্যাল্ যার কচড়া তার তেল।

মহুল-কচড়ার গাছ তো গেছেই। জোতের গাছ—তার ফুল-ফল তো কুড়োবে জোত-মালিকরাই। লোধাদের—লুকিয়ে চুরিয়ে বড়জোর ঐ দু-দশ সের! আগে আগে ভালুকে খেত, এখন না হয় আ-দেখলা লোধারা খায়। তা খাক না।

কিন্তু শালের বন? কেঁদবন? তাও যদি নিয়ে নেয় হাটুয়ারা, নিলামবাজ মহাজনেরা—তবে তো শালের পাল্‌হা-পতর শালের ডগ্ শালবীজ কেঁদ্‌পাল্‌হা কেঁদ্‌ফল পাড়বার অধিকারও লোধাদের আর থাকবে না?

তখন? তার বেলা?

নিলামবাজ ডাক-ধরা ব্যবসায়ীরা তাদের যেমন খুশি পছন্দসই লোক দিয়ে পাতা তোলাবে, ডগ ভাঙাবে, ফুল কুড়াবে, শালের বীজ ছাড়াবে, কেঁদুপাতা তোলাবে, কেঁদু পাকাবে। লোধারা বাদ। বাদ, বাদ।

তখন ১ সের কেঁদুপাতার দাম কত? নির্ঘাত বিশ-পঁচিশ। আর ১ হাজার শালপাতারই দাম কী? দশ-পনর টাকা তো হবে হেসে-খেলে। দু-দশ গণ্ডা কেঁদ্ পাকিয়ে ঝুড়ি ভরে আঁচল চাপা দিয়ে লোধামেয়্যারা লোধাবুঢ়হি-বউড়ীরা হলিয়ে-ঢলিয়ে আর যেতে পারবে না গ্রামে-গঞ্জে।

আর পারবে না চার-ছ'গণ্ডার বিনিময়ে এক-আধসের চাল বাগিয়ে আনতে।

তখন মর্ শালা লোধারা 'ভকে' মর।

তিতিবিরক্ত রাইবুও কাঠিখুঁচি দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল। কথায় পারল না, মনে মনে অনেক হিসাব কষেও থলকুল পেল না। তো কাঠিখুঁচি নিয়ে বসল মাটি আঁচড়াতে, কাটাকুটি করতে।

রেখ্ কাটতে কাটতে গুড়গুড়িয়া উঠে পড়ল।

"আমার মন ন বড়াগুলীর বন?" পাকা কাজুফলের নাম-শোনা-ইস্তক টাক্‌রায় জল আসছে। কতক ফল আছে—যেমন কুল তেঁতুল আম আঁউলা, কতক শাক আছে যেমন চেঁকা শাক—দেখামাত্র এমন কী নাম শোনামাত্রই জিভে জল এসে যায়, জল 'শঁসায়'। মুখ ভরে যায় জলে।

একরকম পিঁপড়া আছে, লাল লাল ডিমাল পিঁপড়া, যাকে বলে কুরকুট—সেই 'কুরকুট-পটমের' নাম করলেও তো জিভে জল আসে? খেতেও বেশ টক টক ঝাল ঝাল। কথায় আছে না—"বনর কুরকুট বনর কুরকুট, ঘরত গেনে সবাই বলত দে টুক দে' টুক?"

গুড়গুড়িয়া উদ্‌ব্যস্ত হয়ে দৌড়ুল। দৌড়ুল খালের দিকে। ধান্দায় বেরিয়ে কোথায় কাজু কোথায় কুরকুট—সে হড়বড়িয়ে খালের জলে নেমে এল। জলে নেমে সে এখন জল খাবে।

সীতানালাখালের ঝিরিঝিরি জলে বড়জোর পায়ের পাতা ডোবে। গুড়গুড়িয়ার খড়ি-ওঠা পায়ের পাতা তো আর দেখা যাচ্ছে না। ছেঁড়া-ফাটা গামবুটে ঢাকা। তাই ডুবিয়ে আঁজলায় তুলে তুলে জল খেল সে। নদী হলে, খাল তো খাল, খালের জলের গভীরতা আরেকটু বেশি হলেও চারপেয়ে জন্তুর মতো মাথা নামিয়ে জলেই মুখ দিয়ে জল খেত গুড়গুড়িয়া।

আকণ্ঠ জল খেল সে, আর তারপর খালের জলেই মুখ দেখল। থুতনিতে চুরুক দাড়ি, কাঁচাপাকা। এর মধ্যেই কবে কবে যে গজিয়ে উঠল আর কখন যে তার অর্দ্ধেকটা পেকে ঝুনোও হয়ে গেল—গুড়গুড়িয়া টের পায়নি।

গুড়গুড়িয়া টেরই পেল না—তার পায়ের শব্দ পেয়ে কখন চাঁদখুড়িমাছগুলো দলদলি শ্যাওলার আড়ালে কী মাকড়াপাথরের তলায় কোথায় কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল!

খালের জল খেয়ে সে ঘাড় তুলে দেখল—খালের ধারের বন কেটে পাথরডহরার চৌধুরীমহাজনরা যে-জমি বানিয়েছিল সে-জমি লছিধানের পরিবর্তে এখন আখছার কদো ঘাসে ভরে আছে।

বেশ দেখতে ঘাসগুলো। এক হাত কী এক হাতমুঠ লম্বা চার শিরাওয়ালা ঘাসসব। মাথায় আবার চার-পাঁচটি ফ্যাঁকড়া। ফ্যাঁকড়ার মাঝখানে, ঠিক মাঝখানটিতে রূপার নাকফুলের মতো একটা গোলফুল।

ছাগল-চরানীরা গরু-চরানীরা সে-ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফুলের বোঁটা চিরে তার ভিতর তার ভিতর দিয়ে গলিয়ে জুড়ে জুড়ে 'হাঁসুয়ার' মতো একরকম হার তৈরি করে গলায় পরে। অবিকল রূপার 'হাঁসুয়া হার'।

গুড়গুড়িয়া দেখল—হাঁসুয়া হারের ঘাসগুলো এখন একজায়গায় কেমন এঁকে বেঁকে নড়ে চলেছে। নড়তে নড়তে যেন এগিয়ে চলেছে। তার মানে? তার মানে ত—

গুড়গুড়িয়া প্রায় চুপিসাড়ে নেচে উঠল। দু'পা এগিয়ে সন্তর্পণে ঘাড় উঁচিয়ে দেখল—'জাত' না এন্নি?

আর দেখেই চোখ না ফিরিয়ে পিঠের পেশীগুলোকে হাত উঁচিয়ে এমন একটা মোচড় দিয়ে মুখে "আ-বা-বা" চিৎকার করে সে রাইবুকে হাঁক দিল, আস-অ আস-অ, ঢ্যাম্‌না খাস্‌সি!

ঢ্যাম্‌নাসাপ দেখা দিয়েছে, তারমানে খাসিমাংসের জোগাড় হয়ে গিয়েছে। উল্লসিত গুড়গুড়িয়া তার ওস্তাদকে হাত লাগাতে ডাক দিল।

তার ডাক শোনামাত্রই রাইবু বুড়িয়াটা হাতে নিয়ে দৌড়ুল। দৌড়ুতে দৌড়ুতে গুড়গুড়িয়াকে সাবধান করে দিয়ে বলল, দেখ্‌খিস্ গুড়গুড়ে ঢ্যাম্‌না না খর্‌রিস্?

ঢ্যামনা আর খরিস প্রায় এক দেখতে। এক, এক। কিন্তু ঢ্যামনা এক-মুঠ মোটা আর ছ-সাতহাত লম্বা। খরিস অতটা লম্বা নয়, বেঁটে বেঁটে। ল্যাজ পর্যন্ত খাড়া হয়ে ফণা তুলে দাঁড়ায়। আর তার গর্জন? যেন তোমার শঙ্খচূড়। শঙ্খচূড়, শঙ্খচূড়।

ঢ্যামনাও গর্জায়। তবে যত গর্জে তত বর্ষে না, ফণাই নেই তার ঢালবে কী? চিতির জাত তো। ঐ বলে না—"চাটলে চিতি, কামড়ালে বড়া?" ঢ্যামনা হাতে-পায়ে জড়ালে হাড়-গোড় ভেঙে যাবার জোগাড়।

ঢ্যামনাসাপটা দৌড়ুচ্ছে। দৌড়ুতেও পারে সল্ সল্ করে। ঐ কদোঘাসের জমিন পেরিয়ে গেল, সামনে একটা বেনাবুদা। আর তারপর ঢুকে যাবে লাটায়-পাটায়।

গুড়গুড়িয়া ঝপ্ করে লাফ দিয়ে সাপের মুখে পড়ল। সাপ নিমেষে মুখ ঘুরিয়ে দৌড়ুল আরেক দিকে। ঐ মুখ ঘুরাতেই যেটুকু সময় তার মধ্যেই সাপটাকে কব্জা করে ফেলত গুড়গুড়িয়া। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে সে উল্টে পেড় গেল।

আর পড়েই তার কী হাসি! দেখাদেখি রাইবুও হাসল। যেন-বা যুদ্ধজয়ের হাসি। হ্যাঁ, তাই তো। একবার শিকার যখন তাদের গোচরে এসেছে, নাগালের মধ্যে, তখন জয় তো তাদের হবেই। হবেই হবে।

হয়ত আহারের সন্ধানে খালধারে এসেছিল সাপটা। ব্যাঙ-চ্যাঙ চাঁদখুড়ি-পুঁটি-দাঁড়িকিনি খেয়েছিল কী তার খায়নি—আর দেখে ফেলল গুড়গুড়িয়া।

পুরোদস্তুর লোধা তো লোধা, একটা লোধাছানাও দেখে ফেললে অতবড় সাপ কেমন আংকুড়া-বাংকুড়া হয়ে 'গুড়ুপুটলুর' হয়ে ছোট এই এতটুকু হয়ে যায়। কিন্তু গুড়গুড়িয়ার বেলা আলাদা অন্য নিয়ম।

গুড়গুড়িয়াকে দেখামাত্রই ঢ্যামনা দৌড়ুতে শুরু করে। আঁকশাল-ঢেঁকশাল ঘুরে সে কেবল ছুটিয়ে মারে গুড়গুড়িয়াকে। মুখে খিস্তিখেউড় করতে করতে গুড়গুড়িয়াও পিছু ছাড়ে না। বড়জোর মাঝুডুবকা-সুখজুড়ি-তপুবন—এইটুকু ত। কত ছুটবি ছুট!

দৌড়ুতে দৌড়ুতে রাইবুর কেবলই মনে হয়—ঢ্যামনা যখন দেখা দিয়েছে, আজ হোক কাল হোক ঝড়-জল হবেই। এ যেন সেই দূরে সভা কাছে জল, কাছে সভা দূরে জল, চাঁদের। চাঁদের চারধারে, দূরে, গোল করে মালার মতো সভা বসলে বৃষ্টি হতে দেরি নেই। আর চাঁদের চারধারে, খুব কাছে, সভা বসলে মন্ত্রীর সেনাপতির কোটালের, তবে জানবে বৃষ্টি হতে ঢের দেরি।

দেরি, দেরি। কিন্তু ঢ্যাম্‌না যখন দেখা দিয়েছে জল হতে আর দেরি নেই, আর বিলম্ব নেই? রাইবু জানিয়ে দিল, গুড়গুড়িয়া, দেখ্‌খিস্ আজ হোক কাল হোক জল হব্বে।

গুড়গুড়িয়া বলল, হঁ-অ।

কিন্তু সে ভেবে পেল না, আকাশ ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার, এর মধ্যে জল আসবে কী করে? না হয় 'গাড়া' থেকে বেরিয়েছে ঢ্যাম্‌না, তা বলে ঢ্যাম্‌নার সঙ্গে জলের কী?

সে অবশ্য শুনেছে, চোখে কখনও দেখেনি—নাকি ঝড়িয়া-বাদলার দিনে মেঘপাতাল থেকে জলের সঙ্গে 'গুড়ুপুটুলুর' করে 'হল্‌হলিয়া' সাপ পড়ে।

'হলহলিয়া' তারমানে হেলে সাপ।

গুড়গুড়িয়া ভাবল হলহলিয়া যদি পড়ে তবে ঢ্যাম্‌নাই বা না পড়বে কেন? আবার এও তো তার শোনা—বারটা যদি হয় গুরু কী মঙ্গলবার, যদি পায়ের হাড়ে পেঁচিয়ে ধরে ঢ্যাম্‌না, প্যাঁচের উপর প্যাঁচ দিয়ে মুচড়ে ভেঙে দিতে চায় পায়ের নলি, কিছুতেই আর ছাড়ে না। তখন উপায়?

উপায় একটা আছে—যদি মেঘপাতালে মেঘ ডেকে ওঠে, 'গুড়গুড়'! হল্‌হলিয়া, ঢোঁড়া-ঢ্যাম্‌না, সে যে-সাপই হোক আর পাঁচ-সাত-সতের, সে যত পাকই দিক, মেঘের ডাক শোনামাত্রই খুলে যাবে হল্ হল্ করে।

সাপটা এখন 'ভুলুকে' ঢুকেছে। খালধারের জমিনে জল বাতানোর জন্য আল কেটে বানানো হয়েছে 'ফোপর'। সেই ফোপরে ঢুকে সাপটা লুকিয়ে আছে। নিরাপদ ভেবে বিড়া পাকাচ্ছে।

গুড়গুড়িয়া একটা ঠ্যাঙা গুঁজে দিল ফোপরে।

রাইবু তাকে মানা করল, গুঁজ্‌জিস্ নাই, চামড়ায় চোট লাগবে রে গুড়গুড়ে। মানা করেই বলল, দমে থকে আছে। ইবার বরঞ্চ কাঠ-পাল্‌হার জোগাড় দ্যাক্।

গুড়গুড়িয়ার ঠ্যাঙার খোঁচা খেয়ে কী না, কিংবা রাইবুর মুখে নিজের 'দহনের' কথা শুনে কী না—সাপটা প্রায় বিড়া পাকানো অবস্থায় 'ভুলুক' থেকে ছলাৎ করে একটা লাফ দিল। ঈষৎ হলুদ পেটটা চোখের সামনে ঝলসে উঠল। তৎসহ গর্জন।

কী গর্জন, কী গর্জন!

ফুঁসতে ফুঁসতে নাকি ফোঁপাতে ফোঁপাতে সাপটা ফের দৌড় শুরু করল—দৌড় দৌড়—

রাইবু, গুড়গুড়িয়াও দৌড়ুচ্ছে।

চোটহীন ঢ্যামনাসাপের চামড়ার খুব দর। দোকানদার কী পাইকাররা পেলে খুব খাতির করে লোধাদের।

এখানে ওখানে মিছামিছি খুঁত দেখিয়ে হেসে হেসে বলে, ধুস্ দাগী চামড়া, দর একটু কমা।

রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা বুঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে মহাজনদের, রাই মাহাজন, খুঁত কুথা? উ ত 'ভকভকিটা'।

'ভকভকি' যার অর্থ পায়ু। সাপ বলে কী তার পায়ু থাকবে না? মলমূত্র বেরিয়ে যাবার 'ফুটা'?

রাইবু আগেভাগেই ঠিক করল—এবার যদি পটুমাহাজন এই ঢ্যাম্‌নাসাপটার চামড়ারও খুঁত ধরে তো তাকে নিশ্চয় করে সে বলবে, তবে তোমার চামড়াটা একবার খুলে দেখি মাহাজন, ফুটা আছে কী ফুটা নাই?

ধুর্, রাইবু মনে মনেই বিবেচনা করল, মহাজনদের অমন কথা কী সে কোনো জন্মে বলতে পারে? অমন অসভ্য অসভ্য কথা?

গুড়গুড়িয়া দেখল—ঢ্যাম্‌নাটা তো খুব খেলাচ্ছে। খুব দৌড়াচ্ছে। মাদী না মদ্দা? মাদী হলে তার মাংস খেতে একরকম। আবার মদ্দা হলে আরেক রকম।

ষাঁড়া-খুকড়া কী খাসির মাংস—তার সোয়াদ কত! ধাড় কী পাঁঠির মাংস কেমন একটুন জল জল। নিরামিষ নিরামিষ।

মাংসের কথায় গুড়গুড়িয়ার মনে পড়ল—কাঁচা শালপাতার দোনার কথা। গহীরা গহীরা। কানাচওয়ালা খালিপাতা। তার ভিতর বিড়া-বেঠ্‌নার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে রাখা ছালছাড়া ঢ্যাম্‌নার মাংস। গোটা শরীর।

সঙ্গে একটু নুন হলে বেশ হয়। না হলেও মন্দের কিছু নয়।

কাঠ-পাল্‌হার আগুন জ্বেলে এবার দাও বসিয়ে কাঁচা শালপাতার দোনা। 'কেরমে কেরমে' কাঁচা শালপাতাও পড়ুক, মাংসও 'সিজুক'। সিদ্ধ হওয়া না ছাই, কোনমতে 'ধুড়সে' নেওয়া। ঝল্‌সে নেওয়া।

গুড়গুড়িয়া মনে মনে খেতে বসল। মনে মনেই সে বলল, শালদোনায় কী?

ন, ঢ্যাম্‌নার মাংস। খাতে চাহ ত খাও।

হঁ-ন, হঁ-ন করতে করতে গুড়গুড়িয়াই যেন বলে, দিতে চাহ্ ত দেও একটুন।

তারপর তো খাওয়া। মিছামিছি মিছামিছি। হাড় বেছে বেছে মাংসটুকু খাওয়া। খেতে খেতে নিজেকেই সে জিজ্ঞাসা করে, খাণ্ডে কেমন?

নিজে নিজেই সে উত্তর দেয়, ঢ্যাম্‌নার মাংস খাচ্চি, ন 'স্বরগ' যাচ্চি?

এদিকে মনে মনে ঢ্যাম্‌নার মাংস খেতে খেতে গুড়গুড়িয়া স্বর্গসুখ অনুভব করলেও ওদিকে রাইবু তিতিবিরক্ত হয়ে 'শালার ঢ্যামনা' বলে হাতের বুড়িয়াটা সাপটাকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়ে মারল।

সাপটার লাগল.না। শুকনা মাটিতে চটা খেয়ে বুড়িয়াটা সাপটাকে ডিঙিয়ে ওধারে পড়ল।

প্রাণভয়ে ভীত সাপটা না পারলেও তার ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। অন্তত চেষ্টা তো করল।

আর এসময়ই একটা ডাক বন-বাদাড় ফেড়ে ডুব্‌কা-ডুংরি তোলপাড় করে ক্রমশ এগিয়ে এল। এগিয়েই আসছে। —মাত্‌বর হে-এ-এ-এ-এ-এ! ও হে-এ-এ-এ, গুড়গুড়িয়া হে-এ-এ-এ-এ-এ!

ডাক একটাই, ডাকছে একজনই। কিন্তু যাদেরকে ডাকছে তারা দুজন, ডাকছে দু'জনকেই। রাইবুকে, গুড়গুড়িয়াকে।

জঙ্গলের ভিতর এমন ডাক এলে—সে খুব ভয়ের, সে খুব ভাবনার। রাইবু, গুড়গুড়িয়া দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বুড়িয়াটা না হোক গুড়গুড়িয়ার ঠ্যাঙাটা তো খসে পড়ল!

তারপর তারা পিছন ঘুরে খানিকটা দৌড়ুল। দৌড়ুতে হয়। রাইবু-গুড়গুড়িয়া একদৌড়ে খানিকটা এসে দুজন দুদিকে দু'দুটো লোধাঝোড়ের মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। অপেক্ষায়।

তেমন খারাপ কিছু দেখলে, ভয়ের কিছু শুনলে লোধাঝোড়ের ভিতর দিয়ে মুহূর্তে কোথায় কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাবে তারা! যেমন যায় দলদলি শ্যাওলার আড়ালে কী মাকড়াপাথরের তলায় তলায় খালের জলের চাঁদখুড়িমাছেরা।

আ-হে-এ-এ-এ মাত্‌বর হে-এ-এ-এ-এ-এ !

ডাকটা কাজুবাদামের বন ঘুরে এদিকে আসছে, এতক্ষণে কদমডাঙার কষাফলতলা করণতলা ডাঙাসাহির পিতম হাঁসদার তেঁতুলতলা পেরিয়ে খালধারে তপোবনের অঝোরঝর বনের দিকে এগিয়ে আসছে।

এদিকেই আসছে যে জানল কী করে—এধারে রাইবু-গুড়গুড়িয়া? জানতে হয় না, জানা যায়। লোধাদের গায়ের উৎকট গন্ধই বলে দেয়—কে কোথায়! আজ রাইবু-গুড়গুড়িয়া কাজুর বন হয়ে তপোবনে খালধারের জঙ্গলে আসবে—এসব তো আগাম জানা কথা।

জানাতে হয়। না জানালে রাইবু-গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা শিশুবালা-ফুলটুসি-নিয়তি-ঢালো-চাঁদবদ্‌নী-নাকফুড়ড়িরা যে এক জায়গায় এসে গাদাগাদি করে একটা বনকুঁদড়ি দশজনে মিলে টানা-হিঁচড়ান করবে। একটা চুরকা একটা পানআলু কী খামআলু 'তাড়তে' দশটা শাবল একসঙ্গে উদ্যত হবে। আর তখন কার শাবল কার খন্তা পড়বে কার ঘাড়ে। একটা ধুন্দুমার রক্তারক্তিকাণ্ড বেধে যাবে না?

তার চেয়ে এই তো ভাল—তুমি যাও রণে-বনে তো আমি যাই গোচারণে। তোমরা দক্ষিণে তো আমরা উত্তরে। তারা পুবে তো নাদনগাড়িয়ার বিটিছানারা পশ্চিমে।

আজ রাইবু-গুড়গুড়িয়া কাজুর বন হয়ে খালধারে। খাওয়া নেই দাওয়া নেই, 'ভোখল' পেটে। চটা মেরেছিল কাজুর গাছে, দামীকাঠ তো নয়, বড়জোর 'চুল্‌হার কাঠ'। নাই নাই করে গাছও তো রয়েছে অজস্র।

এসে পড়ল অনিল বেহেরা। গাছ না কেটে কাজুর বনে এমনি ঘুরে বেড়াতে দেখলেও বেহেরাবুড়ো খেঁকিয়ে বলত, তোদের নামে থানা-পুলিশ করব, গাছ কেটেছিস। ও-হো, আজ না কাটিস কাল কেটেছিস। কাল না হোক পরশু। তরশু।

হঁ-অ, তুই না কাটিস তোর বাপ কেটেছে।

—মাত্‌বর হে-এ-এ-এ-এ-এ। আ-হে-এ-এ-এ-এ-এ!

ঐ ঐ, ঐ ডাকটাই অতবড় তেলাল ঢ্যামনাটাকেও হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। ফাঁক-তালে হাত ফস্‌কে কোথায় যে পালিয়েছে সাপটা! "কপালে নাইক ঘি, ঠক-ঠকালে হব্বেক কি?"

রাইবু, গুড়গুড়িয়া থ হয়ে দেখল—খালধারে ফুলটুসি! বেশ-বাসের ঠিক নেই, হাঁপাচ্ছে।

তাকে দেখামাত্রই লোধাঝোড়ের ভিতর দিয়ে প্রায় দৌড়ুতে শুরু করেছিল রাইবু, গুড়গুড়িয়া। ফুলটুসি ধমকে উঠল, থাম্ম-অ!

ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ পিট্‌ পিট্‌ করতে লাগল রাইবু, গুড়গুড়িয়া। যেন কী অপরাধ কবেছে তারা, অপরাধ করেছে করেছে, এখন সেই অপরাধের হেতু তাদের কী করতে হবে—যেন সেটুকুই ভেবে পাচ্ছে না। তাই ঘাড় চুলকোচ্ছে, মাথা। আসলে ভয়-ই পাচ্ছে রাইবু, গুড়গুড়িয়া। কী খবর এনেছে ফুলটুসুয়া?

মরা ছাগলের ছালের মতো জটাবুড়ির চিমসে উদোম বুক তো এ নয়, এই বয়সেও যথেষ্ট ভারি বুকজোড়াকে আগে পরনের কাপড় দিয়ে যতটুকু পারল ঢেকে নিল ফুলটুসি। তাতেও ঢেঁকির পাড় কিন্তু থামল না।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, উদিকে বন থিক্যে লদ্ধা খেদাচ্চে নরসিঙা। জলদি আস-অ।

বন থেকে লোধা খেদাচ্ছে নরসিঙা? তার মানে তো আবার উৎখাত! সঙ্গে নির্ঘাত নিয়ে এসেছে দারগা-পুলিশ নরসিঙা?

রাইবু শুধু একবার হাত নেড়ে ফুলটুসিকে ইঙ্গিতে বলল, ফিরে যাও। আরো বলল, আমরা এখন ফিরছি নাই।

নিমেষে লোধাঝোড়ের ভিতর দিয়ে লাটা-পাটা ঝুড়তে ঝুড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল রাইবু। আগেই গিয়েছিল গুড়গুড়িয়া। আঁটারি-চুরচুর 'ডগ', ডাল-পালার হিলন দেখে দুজনের দুটি পথ 'ভালমত চিহ্ন্ত' করল ফুলটুসি।

আর তারপর খালধারে দাঁড়িয়ে একা একাই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল। খারাপ-ভাল কত কথাই মুখে ফেনার মতো উথলে উঠে আসছে এখন।

তার মধ্য থেকে একটাই বেছে নিয়ে ফুলটুসি বিড়বিড় করে বলল, ডরপুক্ 'খেড়িয়া' কাঁহাকা!

বলেই যেমন এসেছিল তেমনই ফিরে চলল। সে আরো শুনে গেল না—আজ একটা ঢ্যাম্‌নার কাছেও ডাহা হেরে গেছে ঐ দুজন।



ফুলটুসি ফিরে চলেছে।

ফিরে চলেছে ধীরেসুস্থে, বেশ হেলতে-দুলতে তো নয়—সেই দৌড়ুতে দৌড়ুতে। তবে ডাকটা আর নেই, ডাকার প্রয়োজনও আর নেই। 'খববরটা' দেয়ার ছিল, দিয়ে দিয়েছে সে।

কে জানে এতক্ষণে বাড়ি-ঘরদোর ভেঙে দিয়েছে কী না নরসিঙা। ঐ তো পাতা-পতরের 'কুঁইড়া'—কোন্‌টা বা তালপাতায় ছাওয়া, কোন্‌টা খড়ের। টিন যা ছিল সব তো এতদিনে পেট-পূজায়! সব ছিটে-বেড়ার দেয়াল, ভুগড়া সব। এক হ্যাঁচকা-টান দিলেই ঘরের পড়াশ কী পটাশ ঝাঁটি-কাঠের রলা-বাতা মুর্ধুনসহ উপড়ে উঠে আসবে।

এখন কার কাছেই যা যাবে ফুলটুসি? লোধাদের এই চরম বিপদে আর কেই বা দেখবে? দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল ফুলটুসির। আইন আছে আইনে যাও—তা বলে ঘরদুয়ার ভাঙবে তুমি কুন্ আইনে? হঁ-অ?

মেয়েটাও নেই। এক এক করে এগারো 'কেলাস' পাশ দিয়ে সে এখন 'কালেজে'। আরো আরো বড় বড় হাতির পারা বই পড়ছে, ইন্‌জারির। সে থাকলে নির্‌বংশা নরসিঙার মুরাদ হত কী ঘর-ভাঙার? উৎখাত করার? উপ্‌রে এমন 'পিটিশন' দিত নাই যাতে তোমার গরমেট থর্‌থর্ করে কাঁপে?

আমার মেয়্যা বলে বলছি নাই—মেয়্যা খুবেই গুণের। গীত বানায়। গুঁড়ুর-কপ্‌তি কেঁদ্-ভুড়রু, আম্‌হর দরখুল্লির জঙ্গল, কুঁদড়ি-কাঁকড়ো তল্লাট লিয়ে গীত গাহে—কী যেন কী যেন—"কহে দে রানী কহে দে মুনু—"

আমার কিছু মনে নাই, মনত্ থাকে নাই। মেয়ের কথায় এখন তার কিন্তু মনে পড়ল—দু'সন কী তিনসন অগে, আঙিনায়, 'কাগজ-লত্' না কী একটা ফুলের 'লত্' লাগিয়েছিল, তার ডাল-ডগ্ কেটে কেটে আরো দু' পাঁচজন যে-যার খলায় পুঁতল—সেই সব 'লত্' আজ বেড়ে বেড়ে বিরাট হয়েছে। লাল লাল ফুরফুরে পত্‌নির মতন ফুল ধরেছে।

খালভরা নরসিঙা কী এতক্ষণে সেসব উপড়ে ফেলল—নিজেদের জঙ্গলের গাছ নয় বলে? কোত্থেকে জঙ্গলের বাইরের জিনিস জঙ্গলের ভিতরে এনে পুঁতেছে বলে?

ফুলটুসি দৌড়ুনোর গতি বাড়িয়ে দিল উৎকণ্ঠায়। নরসিঙা, নরসিঙা। যদি তাই-ই করে নরসিঙা—তবে? তবে আর কী করতে পারে ফুলটুসি? অনেক কিছুই করতে পারে সে, তার মধ্যে একটা ভেবে রাখল—টেনে নরসিঙার 'খাঁকী পান্টুলটা' ছিঁড়ে ফদরফাঁই করে দেবে না সে?

আন্‌সাট্‌কা দৌড়ুতে দৌড়ুতে কী একটা বটের ঝুরির মতো তার নাকে মুখে মাথায় ছুঁয়ে গেল, বেশ নরম নরম। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফুলটুসি।

ঘাড় তুলে উপরের দিকে দেখল—একটা হনু। এ-গাছ থেকে ও-গাছে যাচ্ছে। যা ধনো, যা! বড় বড় বাঁদরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙাতে করে মাথা হেঁট। মাতব্বর রাইবুও নরসিঙার ছামুতে দাঁড়াবার সাহস করল নাই? দাঁড়াতে পারল নাই?

ফুলটুসি আরেকবার বিড়বিড় করল, ডরপুক্ 'খেড়িয়া' কাঁহাকা!

'খেড়িয়া' তার মানে খরগোস। মেটে মেটে গায়ের রং, তুড়ুক তুড়ুক করে লাফায়। কচি কচি চিরোল চিরোল ঘাস পেলে খায় হামলে পড়ে। আর মানুষ দেখলে, দেখামাত্রই পালায় তুর্ তুর্ করে। ডর-পেল্‌কা! ডর-পেল্‌কা!

ফুলটুসি রাইবুকে এর চেয়ে কঠিন কোনো বিশেষণ দিতে পারেনি। খরগোশের মতোই নরম তুলতুলে বিশেষণ। কড়া কিছুতে পাছে রাইবু খুব আহত হয়!

এক ফোঁটকা মেয়্যা—আমার মেয়্যা বলে বলছি নাই—যা পারে, মাত্‌বর রাইবুও তা পারল নাই।

এখন ফুলটুসি যায় কোথায়? ডাঙাসাহির পিতম হাঁসদার বনতেঁতুলতলা ছাড়িয়ে এল। মাহাতোবুড়ির লতা-আমগাছতলা। জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে এর আমগাছ তার জামগাছ, কুম্‌হার লাইবুকাদের করঞ্জগাছ, ফাটাদার বুঢ়্‌হার কচড়াগাছ—ঐ নামে নামেই চলে আসছে একের পর এক—

লতা-আমগাছতলায় এসে রাস্তাটা চারভাগ হয়ে গেছে চারদিকে। একভাগ উত্তরে কাম্‌হারপাড়া দিয়ে কুম্‌হারপাড়ায়। আরেকভাগ দক্ষিণে নারদা-চাঁদাবিলার দিকে। সামনের রাস্তাটা এঁকে বেঁকে লোধাপাড়া পেরিয়ে দোরখুলির মাহাতোপাড়ায়।

দোরখুলির মাহাতোপাড়ায় বঙ্কামাহাতোর বাখুলে উঠে যাবে নাকি ফুলটুসি? মেয়্যা নুকুর স্যাঙাত-বাপের ঘরে?

লোকটা বিপদে-আপদে লোধাদের সাহায্য করে। চাই কী এ-যাত্রায় হটিয়েও দিতে পারে নরসিঙাকে। 'পঞ্চাতের' লোক বলে কথা।

ভাবতে ভাবতে দৌড়ুনোর গতি ধাপে ধাপে বাড়িয়ে দিল ফুলটুসি। আগের মতো পারে না আর। দৌড়ুতেও না, হলাতে-ঢলাতেও না। বুঝা যাচ্ছে—বয়স হচ্ছে।

বয়স, বয়স। যুবাকালের কথা একবার ভাব-অ-দেখি। দলছুট হ'য়ে—হ'য়ে বনে-বাদাড়ে খালধারে টাঁড়ে টাঁড়ে একলা ঘুরে বেড়াতে কী মন যেত্ত নাই, ন ইচ্ছা হত্ত নাই?

—সেই বন-বাদাড় খালধার টাঁড়-টিকর। ফুলটুসি দৌড়ুচ্ছে।

জঙ্গলের এধারে ওধারে গরু চরছে। গরু-বাগালরা মাঝে মাঝে কথা বলে উঠছে, ঐ বড়জোর একটা-দুটো। 'চোর-চুন্নী' গরুর গলায় 'ঠরকা' বাজছে, কুড়চিকাঠের গাম্বারকাঠের—

ঠ-র-ক! ঠ-র-ক! আর ফুলটুসি দৌড়ুচ্ছে।

কপ্‌তি-গুঁড়ুর কয়ের-ক্যার্‌কেটা সিমফুটি-জল পিপি— কত কী 'পাখ' ডাকছে। যখন তখন ডেকে যায়, ডেকে ওঠে। ফুলটুসি ভাবে, তার কতক আমরা চিনি কতক চিনি না। নতুন নতুন কতই তো আসছে যাচ্ছে। মনকে শুধায়, আচ্ছা ভালা, ঐ পাখটা—ঐ যে ঐ—

মনে করতে না করতেই পাখিটা কোন্ ডুব্‌কা কোন্ লাটা-পাটার আড়াল থেকে গলার নলি গলার থলি ফুলিয়ে ডেকে উঠল, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

—উ-ল টু-টু-উ-উ! —ডাকটার গুঁড়ো-ঝরানি ঝরতে ঝরতে এক লহমায় যেন চারিয়ে গেল গোটা বনটা, গোটা 'তাল্লাট'-টা।

ডাকতে ডাকতে একবার এধারে এল, পরক্ষণেই ডাকতে ডাকতে চলে গেল ঐ 'ধুরের' ভূতাল ভাদুগাছটার কাছে। ঘুরে এল, আবার গেল। হয়ত দক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে। উত্তর থেকে পুবে, পুব থেকে পশ্চিমে।

ঘোরেই পড়ে যাচ্ছে ফুলটুসি। তার কেমন যেন মনে হল—আগে তো 'মেঘপাতাল' আঁধার করে আসে, তারপর তো দর্ দর্ করে 'পানি' ঢালে। এও যেন তাই, তাই তাই—প্রথমে 'সুণ্ডসাণ্ড', তারপরই তো উথাল-পাথাল ডাক, অঝোরঝর।

পাখির ডাক শুনে প্রথমে ভয়ে কেমন যেন উথলে উঠল। দৌড়ুল। আগের চেয়েও জোরে। দৌড়ুতে দৌড়ুতে পরনের শাড়ির আঁচলায় জড়িয়ে গেল ফুলটুসি।

জড়িয়ে পড়ল। পড়ে গড়িয়ে গেল। গড়িয়ে আবার উঠল। পাখিটা এবার যেন তার ঠিক মাথার উপর ডেকে উঠল, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!

কোমরে শাড়ি জড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফুলটুসি। —মলা রে মলা, কী-ই পাখ? কেনে অত্ত ডাক্‌কে? মনে মনে বলে সে পাখি তাড়াতে একপাক হাত ঘুরালো মাথার উপর।

সেই কবে থেকে ডাকছে। ঐ ডাকটুকুই শোনা যায়, দেখা যায় না। একজন শোনে যদি তো আরেকজন শুনতে পায় না। কান খাড়া করে, কানের ধারে হাত রেখে একজন যদি শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে বলে, ঐ ঐ, ঐ যে ডাকছে—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!

তো অন্যজন বলে, কই ডাক? কিসের ডাক? একটা জনমাম্মি নাই, দিদি গ', ও-তুমার মনের 'ভম'।

কোপাইয়ের তীরে বাঁশবাদির কাহারদের গ্রামেও একটা শিস্ এই ক'বছর আগেও রাতভিত বেজে উঠত। তবে সেটা ছিল অন্য। সে-শিস্ একযোগে কাহারদের মেয়ে বসন শুনলেও তার মা সুচাঁদ শুনতে পেত না ঠিকই। তবে সেটা শিসের দোষ নয়, দোষ সুঁচাদের বধিরতার। কানে যে খাটো ছিল সে।

মন না মতিভ্রম? ধাতস্থ হয়ে আবার দৌড়ুতে শুরু করল ফুলটুসি। কিছুদূর গিয়ে আবার পড়ল, আবার উঠল।

পাখিটা এবার ডাকতে ডাকতে রাস্তার ওদিককার জঙ্গল থেকে এদিককার জঙ্গলে আসছে। বাট ভাঙছে, বাট ভাঙছে।

রাস্তায় ছড়ানো শাল-বাকল। রাতভিত নদীপারের, আন্ধারী-লব্‌কেশরপুর-নেপুরা-বহড়াদাঁড়ির কাঠ-চোররা 'হাটুয়ারা' কাঠচুরি করতে এসে 'সাইজ' করে গাড়িভরতি কাঠ নিয়ে যায়। ফেলে রেখে যায় কাঠের ছাল-চঁচ্-চোক্‌লা। খরায়-তাতে সেসব এখন ঝরঝরে শুকনো।

ফুলটুসির মনে হল—এখন হামলে পড়ে সেসব কুড়োয়। মন তো চায় কিন্তু ওই যে—ওদিকে নরসিঙা এদিকে পাখির ডাক?

আজ যেন উথালপাথাল ডাক দিচ্ছে পাখিটা। অন্যদিন ডাকতে ডাকতে এতক্ষণে চলেও যায়, আজ যেন কিছুতেই যাচ্ছে না। —উ-ল টু-টু টু-টু-উ-উ, ডাকতে ডাকতে এই মনে হয় গেল। তপুবনের 'সীতাকুণ্ড' শালদাঁতনকাঠির গাছ পেরিয়ে নারদা-নিগুই-পুখুরিয়ার ওদিকে। পরক্ষণেই ডাকতে ডাকতে ফের এসে গেল, টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু!

ঘুরে-ফিরেই আসছে। আসছে তো আসছে, ডাকছে তো ডাকছে।

—অ রে 'পেঁদের' ন 'সতের্' পাখ, তিড়ুন ন টিড়লিং আজ ছাড়— ছাড়ান দে আমাকে। আজ লদ্ধাদের মাহা বিপদ, নরসিঙা খেদাচ্চে।

চোখ বুজে বিড়বিড় করল ফুলটুসি। গড় করল। হাতের 'কঁড়ি' আঙুল দাঁতে কামড়ে বুকে থুতু ছেটাল।

আর পাখিটা উড়ে গেল। উড়ে যাবার যেন আওয়াজও শুনল ফুলটুসি। ডানা-ঝাড়ার আওয়াজ। টি-উ-ল টু-টু ডাকের তলানিটাও, উ-ল টুটু-টু-উ-উ।

—যেন এত্খনে রাত ভোর হয়ে গেল। চারধার সাফা ফৈ-ফিক্কির। 'বেড়া' উঠল বলে!

দাঁড়িয়ে পড়ে ফুলটুসি গলায় শাড়ি জড়িয়ে একবার নয় দু'বার 'নমো' করল। —'বেড়া'র ঠাকুর নমো নমো! অবিকল 'বামনা'দের মতো, বাবুভায়াদের হাটুয়াদের 'পুরহুৎ'-এর মতো।

রোদ। খরা।

এতক্ষণ জঙ্গলের ভিতরে ছিল। গায়ে-পিঠে রোদ লাগেনি। এখন 'তাত্' উঠছে। 'ভরম'টাও কেটে গেছে।

—ভরম? ভরম কী আর—পষ্ট শুন্‌লম আপনার কানে, চঁচ্‌রা ফুলাএে পাখ্'টা খৈ-খাল্লা ডাকছে।

এমনিতেই কানের লতি কান-পতর আবার খাড়া হয়ে উঠল ফুলটুসির—পাখিটা ফের ডাকে কী না?

উঁ-হু, ডাকছে নাই। হরির নাম কী বোঝা বোঝা? নাই নাই, অবরে-সবরে।

পাখি ছেড়ে ফুলটুসি কান খাড়া করল লোধাপাড়ার দিকে। —ঠাই-ঠুই আওয়াজ উঠছে কী? ঘরের রলা-বাতা টানা-হিঁচড়ার?

ন্নাই ন।

একটা-দুটা কথা যা উঠছে, গাঁদার-গুঁদুর হুরি-ঝুরি —

সে ত এম্নিতেও উঠে তেম্নিতেও উঠে। "হুরি হুরি সামলাতে নারি"—সে ত কথাতেই আছে।

কেউ কী কাঁদছে? সুরুক সুরুক মেয়্যা-মাড়ষের কাঁদ্না? হাত ললা পা সরু পেট গজ্জনদার গাল ফুলফুলু ছ্যাইলাগুলা কী 'লাথ্' খেয়ে ছিটকে পড়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে হুর্ হুর্ করে কাঁদছে?

ন্নাই, মেয়্যামানুষ কাঁদবে কেনে? মেঁয়্যামানুষের জান্ কাছিমের 'পাণ'। ডরপুক মরদরা মেয়্যাদের ভিড়াঁই দিয়ে লাটা-গাড়ায় লুকাঁয় থাকে। মেয়্যারাও পুরুষদের বাড়া, পুরুষদের ঘাড়ে হাগে। ডর-ভয় নাই, কাঁদবে কেনে? —"কাঁদিলে কী হবেক রানী ভাবিলে কী হবেক—"

আর ছাউ-ছানারা? তারা ত পাখ-পাখালির ছানার মতন সদাসর্বদা মুখ হাঁ করেই আছে। কিছু পায় যদি ত ভালো, না পায় যদি ত চ্যাঁ-ভ্যাঁ—। হাঁ বড় করেই কাঁদে।

একটা-দুটা কুকর যা ভুঁকছে, ভুক্ ভুক্।

কুকুর? —লুল্হি ভুলি, ছোটো লীলাম্বর ছোটো বাঘাম্বর—তারা নরসিঙাকে দেখলেও কী আর একটা ক্যাঁকলাসকে দেখলেও কী। দেখামাত্রই দু-চারবার ভুক্ ভুক্ ভু-উ-উ-উ করে থেমে যায়। গুড়ুপুটলুর হয়ে ঘুমায়।

কুকরের ভুকভুকানি শুনে কোনকিছু কী বুঝা যায়? নাই নাই—লোধাপাড়ায় না ঢুকে লোধাপাড়াকে মনে মনে অক্ষত রেখে ফুলটুসি কিছুটা ঘুরে দোরখুলির মাহাতোপাড়ায় বক্কার বাখুলে উঠে গেল।

আসলে সে কিছুতেই দেখতে চায় না নরসিঙার মতো কোনো তস্কর এসে তার চোখের সামনে তার কষ্টে কৃত বাড়িটা, তার আর প্রতিবেশীদের 'কুঁইড়া' ঘরগুলো ভেঙে ধুলিসাৎ করে দিক। কী পেয়েছে—এ কী 'তুঁবাঘর'?

একটা পায়ের উপর রসা রসা বালি 'তুপে' 'তুপে' তুঁবাঘর বানিয়ে অতি সাবধানে পা'টা

বালির বাইরে নিয়ে এসে ছোটো ছোটো ছেলেরা মেয়েরা যেমন খেলে। খেলা শেষে খেলবার মতো আর যখন বেলা থাকে না তখন নিজেরাই সে-ঘর ভেঙে ধুলিসাৎ করে দেয়। সে-বাড়ি ভাঙার ব্যথা গায়ে তাদের এতটুকুও লাগে না। বালির বাড়ি বালিতেই 'বালিপোত' হয়।

নরসিঙা লোধাদের কুঁড়িয়াগুলোকে কী অনুরূপ 'তুঁবাঘর' ভেবেছে? আনসাট্‌কা এদিক-সেদিক লাঠি মেরে ভেঙে ধুলিসাৎ করে দিলেও রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়া-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা দাঁড়িয়ে থেকে পরস্পর দাঁত বের করে হাসাহাসি করবে?

আর তাদের বউরা সোমত্ত ঝিউড়ীরা নরসিঙাকে ঘিরে ধরে শরীরে 'গিরগিতি' দিয়ে আনন্দ করে বলে, ভাল লাগছে, ত, হেঁ নরসিঙা, হেঁ ও হে?

নরসিঙা দম্‌সম্ হয়ে বলবে, তোমাদের তুল্য নারী আমার অঙ্গে হাত দিল, ভাল ত লাগবেই।

কি রকম ভাল?

ভাল, যেন তোমার অভ্রুতো।

আসলে 'বন-মা' কবিতার কবি কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের মা তো ফুলটুসি। একটু যেন কবি কবি 'উধাস' 'উধাস'। নতুন বাঁশকরোল দেখলে, চিরোল চিরোল পাতা দেখলে, সরুবালি-বড়বালি-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া ভুঁইছাতু দেখলে, বর্ষায় লাল লাল বোতামপোকা দেখলে তার গা যেন কী রকম শিরশির করে। নিস্‌পিস্ করে—

—তা'লে বলি তোমাকে, আমার বাপের দেশ বড়সোলে এক বাঁধ ছিল, তাতে উছুড়ুবু জল। কলমী আর শুশনিশাকের বন, দেখলেই মন যেত 'তুলি তুলি'। তুলতম, তুলতে তুলতে কী যে হত্ত নাই। আর কিছু ভাল লাগত নাই। তখন বাঁধের ধারে জঙলে—

হুঁউ, জঙলে টঙস টঙস ঘুরতম, আর শরীর অস্‌কস্ করলে ভাবতম সে আসুক, আমার কাঁধ দুটা চেপে ধরুক, তার যা ইচ্ছা করুক—

সয়া, মাহাবিপদ। বাঁচ্চাও!

অনেকটা দৌড়ে এসেছে ফুলটুসি। হাঁপাচ্ছে।

দোকানে গদীতেই বসেছিল বঙ্কা। খানিকটা হন্তদন্ত হয়ে বাইরে এল। বারান্দায়।

বলল, কী হয়েছে সয়ানী?

লুঙ্গির গিঁট খুলে আবার বাঁধল বঙ্কা। খালি গা।

ফুলটুসির নামের সঙ্গে দেহের মুখের বেশ মিল আছে। সর্বদাই ঠোঁটে একটা হাসি। ফুলেল। এখন হাসিটুকু নেই—দেখে ভারি চিন্তিত হল দোকানী।

সম্পর্কে দোকানী-লোধানী আর নেই, তার জায়গায় সয়া-সয়ানী। সে-আঁতাত রঞ্জু মাহাতোর এগারো ক্লাসে 'ফেল'ও ঘুচাতে পারে নি। ক্বচিৎ কোনদিন পূর্বেকার 'দোকানী-লোধানী' কথাদুটো মেঘলা আকাশে একটা-দুটো তারার মতো ফস্‌কে বেরিয়ে আসে। সেদিন বেশ জমেও।

সেই কখন থেকে দৌড়ুচ্ছে লোধানী! তার উপর তাকে দু'দুবার আছড়ে ফেলেছে পাখিটা। ঘামছে সে দর্‌দর্ করে। শাড়ির আঁচলটা 'বেঠনা'র মতো ভাঁজ করে সে এখন ঘাম মুচছে। মুখের, বুকের।

বারান্দায় দড়ির খাটিয়ায় দু'জন। এতক্ষণ গল্পগুজবে এত মশ্‌গুল ছিল যে দোকানে কে এল কে গেল—তাকিয়ে দেখার ফুর্সুৎ ছিল না। যেই লোধানী থপ্ করে বারান্দার মেঝেয় বসল—অমনি চোখ তাদের ঘুরে গেল।

হ্যাঁ, এতক্ষণে দেখার একটা জিনিস এল বটে। লোধা তো লোধা, একটা হা-ঘরে হা-ঘরীও এলে এরা হামলে পড়ে দেখত। এখন তো বলবে যাহোক—অবলা নারী বিপদ-

আপদের কথা যখন মুখ ফুটে তুলল তখন পুরুষ হিসাবে আমাদের জায়গায় তুমি থাকলে তুমি কী করতে? আর তা যদি বল-অ—দেখাচ্ছে তাই দেখছি।

জমিনে জল না থাকলে অন্যের জমিন থেকে কিংবা জমিনে জল বেশি থাকলে নিজের জমিন থেকে যেভাবে খাপরায় 'ছেঁচে' জল বের করে দেওয়া হয় বা আনা হয়, সেভাবেই দুহাতের ভঙ্গি করে খাটিয়া থেকে উটকো লোকদুটোকে বিরক্ত বঙ্কা হটিয়ে দিল, এই ভণ্ডী এই সুদর্শন, যা ত তোরা যা এখন—অনেক বেলা হল, গিয়ে চান-খাবা কর—

সুড় সুড় করে লোকদুটো খাটিয়া ছেড়ে গেলে সেই খাটিয়ায় আরামসে বসে বঙ্কা বলল, এবার লোধানী বল-অ, কী তোমার বিপদ?

বিপদ বলে বিপদ—

কিছুটা এগিয়ে এল ফুলটুসি, হাতে কাঠি-খুঁচি না থাকলে এদের যেন কথা বলেও সুখ নেই, কথা জোগায় না, ধারে কাছে কাঠিখুঁচি নেই, অগত্যা খাটিয়ার বুননকর্মে ব্যবহৃত দড়ির মোচড়ের গিঁটগুলোকেই নখ দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে ফুলটুসি বলল, নরসিঙা বন থিক্যে আজ আমাদের খেদাচ্ছে গ'।

খেদ্দাক। বঙ্কাও যেন লোধাদের মতোই জোর দিয়ে বলল আর এইটুকু বলতে সে যেন এতটুকুও ভাবল না। খেদাক, খেদাক। ভাবলেশহীন বঙ্কা।

সরু চোখ করে বঙ্কার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ফুলটুসি। বেধুয়ামড়া খালভরা!

লোধানীর মুখের কাছে মুখ আনল, উৎকট গন্ধ, এখনই একটা 'বাস্-সাবান' দেয়ার কথা মাথায় রেখে বঙ্কা বলল, কী হয়েছে, খেদাক না, তোমার ভয় কী সয়ানী?

অমন হল-বলিও হাঁ, বলে কী বঙ্কা? "বনে জনম বনে মরণ বন লোধাদের হকের ধন—"

আ-হা বলচি কি—আস-অ, এখানে ঘর তুলে দিচ্ছি, সুখে বস্‌বাস কর-অ। আর আর লোধারা মরুক না, তোমার কী?

তব্বু—

'এলেক' দেয়ার মতো কথাটা আগেভাগেই দুম করে বলে রাখল ফুলটুসি। তারপর যা বলার বলবে ভেবেচিন্তে।

'সাঙালী বহু' করতে চায় নাকি মাহাতো বুঢ়হা? 'ছুটকী' রাখবে? সে ত একর'ম হয়েই আছি—তল্লাট জানে। তবে কী এবার 'পাকী' করতে চায়? কাঁচা ঘুঁটি পাকাতে চায় বঙ্কা?

ফুলটুসি তো আর জানে না—কত লোধানীই চেয়েছিল বঙ্কার 'বহু' হতে। বঙ্কার দোকান থেকে বেরিয়ে কত লোধানীরই মনের ইচ্ছা—আচ্ছা, সে যদি বঙ্কার বউ হত? বঙ্কা মাহাতোর বউ? তার খুবই সুখ হত। হত কী? বনে জঙ্গলে সাপখোপের ভিতর এটা-ওটা ঢুঁড়তে হত না, দিব্যি খেতে পেত, সরু সরু চিকন চাউলের ভাত। শাড়ি, ব্লাউজ, কত কী পরতে পেত কাপড়-চোপড়। ভরপেট খেয়ে দুপুরে ভাত-ঘুম, রোদে-রোদ্দুরে ঘুরতে হত না। আড়বেলায় রুপোর গাড়ু থেকে একখিলি সাজা পান, দক্তা মেশানো, মুখে পুরে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ফুরফুর ঘুরে বেড়ানো। খালি যা রাত হলে তুলোর তুল্য বিছানায় বঙ্কার দরুন শুয়ে থাকা—

কী তবু?

বঙ্কা যেন বিরক্ত। জোর খাটাতে চায়।

লোধানী ফের বলে, তব্বু!

তবু, তবু, বঙ্কা ঝটপট কথা ঘুরিয়ে বলল, জঙ্গল জবরদখল করে জঙ্গলের গাছ-পাল্‌হা নষ্ট করবে, কাটবে-কুটবে, আর উৎখাত করলেই দোষ? আমি ত বলব, গরমেন্ট গরমেন্টের মতোই কাজ করছে, ঠিক করছে।

মুসুরডাল না তার নুন কিনতে এসেছিল শশী মাহাতো। পিছনে একটা হাত আরেকটা হাতের মুঠোয় রেখে সে এতক্ষণ আন্দাজ করছিল, কী নিয়ে কথা হচ্ছে। ধরতে পেরে বলল, ও বাবা, আমাদের লছিধানের ২ বিঘা ১৭½ ডেসমল জোতের ডাহিজমিনও ছিনিয়ে নিল না? বলল কী—এসব জঙ্গলের অংশ, আমরা গাছ লাগাব, আর তার পরেই ত—কাজু—

তবু লোধানী গোঁ ধরল—আমরা বলে সেই কুন্ যুগ থিক্যে আছি! সত্য তের্‌তা দ্বাপর। ম'লা, আজ 'উঠ্' বললেই—

ওসব 'পেঁদের' কথা ছাড়-অ লোধানী। ফের দোকান ঘরে উঠে যেতে যেতে বঙ্কা বলল, কুন্ যুগ থেকে আছো যে কোনো 'পরমাণ' আছে? টিপ্-ছাপ দেয়া কোনো কাগজ-পত্র? পাট্টা?

'পেঁদের' কথা? তার মানে মিছা কথা। রাইবু যা বলে, রাইবুর বাপ গেঁড়াশবর যা বলত, বড়সোলের গজনা এখনও যা বলে—সব, স-ব পেঁদের কথা? আমাদের চৌদ্দপুরুষরা তবে পেঁদা? সব 'পেঁদা-মানুষ'?

আর আমাদের লীলমাধব? আমাদের রক্তে খুড়দারাজার রক্ত নাই আছে? মহাপরভু রাম শবরবুড়ীর সঙে দেখা নাই করে? জরাশবর আমাদের আদিপুরুষা নাই বটে? নাই নাই—

হঁ-অ, হঁ-অ আমাদের টিপ-ছাপ দেয়া কাগজ-পত্র নাই। 'একড়ের-নামা' নাই। পাট্টাও নাই। নাই নাই—

তবে কী জীবনটাই 'পেঁদের' হয়ে গেল? ফুলটুসি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, খুব ত ফুটানি বঙ্কার! খালভরা বেধুয়ামড়ার। এবার একবার আসুক ত শুতে, 'জাঁকমাড়া' করতে—হাঁকাড় দিয়ে বলব, ফুট্‌ট-অ-

এতক্ষণে একটা কাঠিখুঁচি খুঁজে পেয়েছে ফুলটুসি। আর কী চাই? কাঠিখুঁচি দিয়ে সে এখন মেঝের মাটিতে আঁচড় কাটছে। রেখ্ কাটছে। মনের ভিতর সবকিছু হাণ্ডুল-মাণ্ডুল হয়ে গুলিয়ে গেলে লোধারা যা করে। রেখ্ কেটে যায়, রেখ্।

আর ওদিকে দোকানী ধীরেসুস্থে দোক্তা বানায়। শুকনো মতিহারী দোক্তাপাতা, তায় খানিকটা চুন মিশিয়ে বাঁ-হাতের চেটোয় ডান-হাতের বুড়াআঙুল ঘষে-ডলে ধুলোর মতো চূর্ণ করে। তারপর থাপ্পড় মেরে ফুঁ দিয়ে এক চিমটে দোক্তার ধুলোট লোধানীর হাতে দিয়ে বলল, এক কাজ কর-অ সয়ানি, তুমি 'পঞ্চাতে' যাও।

হঁ-অ আমি বড়দারগা কী না, 'পঞ্চাত্' আমার কথায় উঠবে-বসবে? এক তুমি যদি যা-ও! আব্দারে গলা ফুলটুসির।

বঙ্কা বলল, আমি এখন যাই কী করে? এই এত্তসব চারধারে খোলা—

বলেই নিজের রাজ্যপাট তারিয়ে তারিয়ে দেখল দোকানী। আজই নদীপার থেকে মাল গোস্ত করে এনেছে সে। সীল করা সর্ষেতেলের টিন তেমনি পড়ে আছে, এখনও কাটা হয়নি। এক বস্তা 'নলিতা' আলু। এক বস্তা চিনি—এর মধ্যেই সার সার কালো পিঁপড়ে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে...। লোধানীও দেখুক। কেমন বলেছিলাম না—আস্-অ, এখানে ঘর তুলে দিচ্ছি, সুখে বস্‌বাস কর-অ?

হঠাৎ যেন মনে পড়ল, এমনি ভাব করে বঙ্কা জিজ্ঞাসা করল, সয়ানী, রাইবু কোথা? আর গুরভা-গুড়গুড়িয়ারা? পাড়ায় আছে ত, নাকি নরসিঙার ভয়ে মাইচু-ডরপেল্‌কুরা সব এখন জঙ্গলে? সেই বলে নাই—

কুল্‌হিমুড়ায় কুল্‌হিমুড়ায় নাচ লাগাঁইছে।
বড়বহু ডরপেলকা চুল্‌হায় হেগেছে॥

খুউব মজা করছে, মজা পাচ্ছে দোকানী। ততোধিক লজ্জা পেয়ে লোধানী বলছে, হঁ-অ, উ ত জানা কথ্থাই।

জানি-ই ত, নিজের ডাঁটো মাগ ফেলে কী করে যে শালার ভুঁড়াশিয়ালরা জঙ্গলে পালায়।

বলেই গোস্ত করা মালের সঙ্গে ফর্দ মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বঙ্কা। আসলে রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়াদের ব্যাপার সে এড়াতে চায়। শুধু ফুলটুসি বাদ।

ফুলটুসি মনে মনে বলল, না পালালে তোমাদের আর সুবিধা-সুবিস্তা কোথায়? সে উঠে দাঁড়াল। হাতের কাঠিখুঁচিটা ছুঁড়ে ফেলল। না, আজ আর রেখ্ কেটেও লাভ নেই।

এখন কী করবে ফুলটুসি? 'পঞ্চাতে' যাবে কী? মাত্‌বর রাইবু ত রাগ করে, বলে, বনে-জঙ্গলে আবার 'পঞ্চাত্' কি? 'পঞ্চাত'ও তম্বি করে রাইবুর উপর, বলে 'পঞ্চাত' আছে পঞ্চভূতে—ক্ষিতি-আপ্-তেজ্-মরুৎ-ব্যোমে। রাইবু তার বাহির নয়, অধীনে।

অধীনে, অধীনে।

কাজে হোক অকাজে হোক কুটুম এসেছে ঘরে, এই 'দুপহরে', তাকে শুধু মুখে ছাড়ে কী করে বঙ্কা? বলল, যাচ্ছ কোথা? খাবাদাবা কর-অ। নচেৎ চাট্টি ফপ্‌রা মুঢ়্হি অন্তত নিয়ে যাও, নিজের জন্য না হোক, ছোট্টো মেয়্যাটার জন্য?

ন্নাই।

বঙ্কা বুঝল—লোধানীর 'মান' হয়েছে। আর 'পঞ্চাতে' না নিয়ে যাওয়াটাই যে এ-মানের কারণ সেটাও বুঝল। বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি দোকানের বাইরে এসে প্রায় হাতে ধরে লোধানীকে থামাল। জোর করে মুড়িও বেঁধে দিল আঁচলে।

আর তারপর 'পঞ্চাতের' খাতা, যা তার কাছেও এক কপি ছিল, পাতা খুলে দেখাল — লোধানী, এ্যাই দ্যাখো—শুনো—

কী?

লোধানীকে মেঝেয় বসে পড়ে আবার কাঠিখুঁচিটা খুঁজতে হল। আবার তো কিছুক্ষণ তাকে এঁচেড়-বেঁচেড় কাটতে হবে।

হাসতে হাসতে বঙ্কা খাতা খুলে পড়তে লাগল, তার পড়বার একটা গূঢ় হেতু আছে নিশ্চয়। লোধানী ধরতে পারল না প্রথমে। বঙ্কা পড়ে চলল—

॥ পশুখরিদা বাবদ দেয় টাকার হিসাব ॥

১। শ্রীমতী নিয়তি মল্লিক স্বামী শত্রুঘ্ন মল্লিক ছাগল কেনা
বাবদ ২০০০ টাকা

২। শ্রীমতী ঢালো মল্লিক স্বামী গুড়খা মল্লিক খুকড়া কেনা
বাবদ ১০০০ টাকা

৩। শ্রীমতী বাঁশরি ভক্তা স্বামী বধিরাম ভক্তা বাঁশ কেনা
বাবদ ৮০০ টাকা

৪। শ্রীমতী সৃজনী ভক্তা স্বামী বুধন ভক্তা বাবুই-চাষ করা
বাবদ ৩০০০ টাকা

....

ফুলটুসি এবার ঠিকই ধরতে পারল। আর ধরতে পেরেই মুখ টিপে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে কখনো গোটা আঁচলটাই চাপা দিল মুখে। হাসির গমকে কখন বা গড়িয়েই পড়ল। মনে মনে বলল, আর না, আর না বঙ্কা—

ওদিকে বঙ্কাও পড়ছে আর হ্যা-হ্যা করে হাসছে, থামছে না। তবে মাঝে মাঝেই লোধাদের মতো হ্রিস্ব আর তীব্র উচ্চারণে লোধানীর মুখের দিকে চেয়ে কটূক্তি করছে, তবে?

তবে?

অর্থাৎ কী না সে ধরে ফেলেছে, ধরা পড়ে গেছে লোধারা। পশুখরিদা, বাঁশখরিদা, বাবুইঘাস চাষবাবদ পঞ্চায়েত থেকে যে এত হাজার হাজার টাকা লোধারা নিয়েছে সেসব তো চলে গিয়েছে 'পেট-পূজায়'। আবার কোন্ মুখে 'পঞ্চাতে'? ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছে বক্কা? কম চতুর তো সে নয়?

হঁ-অ, কিনলে এতদিনে ধাড়ী-পেঁঠিতে খাসি-পাঁঠাতে ষাঁড়া-ষাঁড়িতে দোরখুলির লোধাপাড়া গম্‌গম্ করত। লাটায়-বুদায় মুখরোচক খাবার 'লত্' দেখলে দু'পা শূন্যে তুলে 'শুগ্‌নি' ছাগল হামলে পড়ে খেত টেনে-হিঁচড়ে। টাড়-টিকরে চরবার কালে ডুমোডুমো বেগুনে রঙের ছাগল-হাঁচির ফল নাকের ডগায় ঘষা লাগলে হেঁচে হেঁচে তুষ্টিনাশ হয়ে যেত ছাগলের।

বেলা পড়ে এলে এদিক থেকে এ ওর ছাগলকে ডাকত, এ-ড়-রে-এ-এ-এ-এ! সে তার ছাগলকে ডাকত, এ-ড়-রে-এ-এ-এ-এ! ঘরে না ঢুকে কট্‌কটি কাটুলটা এই ভর সন্ধেবেলায় উড়ে গিয়ে হয়ত লাফ দিয়ে পড়ত রাইবুর চালে। ডেকে ডেকে নামিয়ে আনার সে কী চেষ্টা হত! আয় তি তি! আয় তি তি! আয় তি তি!

জমি নেই জোত নেই—বাবুইঘাসের চাষ করবে কোথায়? লাগালে তবে না বেনাবুদার মতো ঘাসগুলো বেড়ে উঠবে? ঘাসগুলোর ডগা ধরে ধরে ঝুঁটি বাঁধবে। আসবে-যাবে বাবুইদড়ির পাইকার। কত কথা হবে, কত রফা হবে।

কিন্তু বাঁশ ক'টা কিনলেও কিনতে পারত, কাঁটাবাঁশ তরোলবাঁশ, বাঁশের খাঁচী-কুঁচি ঘুঘি-ঘুনি আড়-পাটা মাছ ধরার খলুই—কত কী তৈয়ার করা যায়। আর হাটুয়ারা হামলে পড়ে কিনেও।

নাই নাই, কেহ-ই হয়ত কিনে নাই, পশুখরিদা বাবদ গোটা টাকাটাই হয়ত খরচ কবেছে 'পেট-পূজায়'। কিন্তুক আমি ত কিনেছিলম দুটা 'ধাড়' দুটা পেঁঠি।

ধাড় দুটা খাইল শিয়াড়ে, পেঁঠি দুটা হুঁড়ারে, পেঁঠির চ্যাঙ চ্যাঙে ছানা চাট্টা এই সেদিনও তিড়িং-বিড়িং খেলছিল বেলতলা-খিরিসতলায়। কখন কুন্ ফাঁকে একে একে—

সেই বলে নাই—"বনের মইধ্যে বাস ভাবনা বারোমাস?" না'লে আমি ত, ধনো, কিনেছিলম কিনেছিলম—

হঁ-অ, সুজনী কে? গাগরি, বাঁশ্‌রি কে? ইটা একটা কথা বটে। এদের ত নাম কব্‌ভু শুনি নাই। টিপ ছাপ দিয়ে মোটা টাকা তুলেছে? মল্লিকও লহে, তাও ভক্তা ভক্তা। কে জানে কে—জিগাস করতে হবে বুঢ়হিদিদিকে। কেহ না কেহ ত আছে। ভালো নামটা আম্‌হর জানা নাই গ'। যেমন আমার বড়মেয়্যার নাম ত নক্‌খী। কেহ-ই জানে নাই—তাকে জানে ত 'নক্কু' বলে। নুকু, নুকু।

পঞ্চায়েতে গেল না ফুলটুসি, গেল না এইজন্য যে—যে-লিস্টি বক্কা তাকে শোনাল সেই লিস্টি ধরে ধরে 'পঞ্চাত' ফের যদি আদায় চায়? জোর করে?

কে জানে এতক্ষণে কী হয়ে গেল ওদিকে! ভয়ে ভয়ে ঘরের দিকেই তড়িঘড়ি ফিরে চলল ফুলটুসি। যা থাকে কপালে।

দোরখুলির মাহাতোপাড়া থেকে লোধাপাড়া—পথটা বক্র। কে আর লোধাদের আতা-যাতার রাস্তা সোজা রেখে দেয়। সহজ করে দেয়। সেই তো যেতে হয় ঘুর-পথে, ঘুরে ঘুরে। বুলান-হদহদি পেরিয়ে এর জমিনের আল তার জমিনের আল, আল-কাটান, ভুলুক-মুলুক

ভেঙে। কুলবুদা কেঁদ্‌বুদা বেনাবুদা বনখেজুরতলা তালতলা বেলগাছ খিরিসগাছ শালতলা ধ'তলা (ধ'গাছটা আর নেই।) আঁটারি-চুরচু লাটা—

পথ তবু মিলায় না। থাকে, থাকে। তার উপর ফুলটুসি আজ আবার লোধাপাড়া যাবার রাস্তাটাকে আরেকটু ঘুরিয়ে নেয়। কে জানে খালভরা বেধুয়ামড়ারা এখনও আছে কী না। এখনও ভাঙ্চুর করছে কী না।

থাকে থাকুক, ভাঙে ভাঙুক। বুক বেঁধে নিল ফুলটুসি। ঘর ভাঙলে না হয় উথলু ভুলিয়াদের মতন ঘুরে বেড়াবে হেথা-হোথা। উঠল বাই তো কটক যাই, জঙ্গলের এধার নয় ওধার। তোর কটা ঠ্যাঙ আছে নরসিঙা—দৌড়ে দৌড়ে কত খেদাবি খেদা।

কিন্তু পাড়ার কাছাকাছি পৌছে 'এড়ি' উঁচু করে ফুলটুসি দেখল, অন্তত দেখবার চেষ্টা করল—হাড়-গোড় ভাঙা কোনো 'কুঁইড়া', ধুনিয়ে ধুনিয়ে ওঠা আগুন, কুড়ুমুড়ু কোনো ধোঁয়া—

না, সেসব কিছুই নেই।

সে বরঞ্চ পাড়ায় ঢুকে অবাক হয়ে দেখল—দলবল নিয়ে ফিরে গেছে নরসিঙা। চালের একটুকরো খড়-পাতাও ফেলে দেয়নি, একটা রলা-বাতাও ভাঙেনি। যেমনকার ঘুপচি যেমনকার কুঁইড়া, তেমনি পড়ে আছে। শুধু—

শুধু আঙ্‌নায় রাখা গোটা কতক জলের কলসি জলের হাঁড়ি বাড়ি মেরে ভেঙে দিয়েছে। জল গড়িয়ে পড়ছে। তাতে এখন দু-চাট্টা উদোম বাচ্চা, 'ন্যাঙটাভুটুঙ সাধের কুটুমরা' কাদা কাদা খেলছে। দুয়েকজন আরেকটু বেশি উদ্যোগী হয়ে শিকড়সুদ্ধ ত্রিশিরা ঘাস তুলে এনে ধান রোয়ার মতো রুইছে।

হয়ত নরসিঙা এখনও বেশিদূর যায়নি। বড় বড় ছেলেগুলো প্রকাশ্যে ন্যাঙটাই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের লজ্জা নেই। কিন্তু বড় বড় মেয়েগুলো, যাদের 'বোস্' উঠেছে অর্থাৎ বুক দুটির ঈষৎ স্ফীতি ঘটেছে, তারা লুকিয়ে পড়েছিল।

লুকিয়ে পড়েছিল, লুকিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু যারা তাদের কোলের কাঁখের ছোট ছোট ভাইগুলোকে বোনগুলোকে, যারা রাস্তার ধুলোয় খেলছিল, খেলতে ছেড়ে দিয়েছিল, তারা, তাড়াহুড়োয় তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি।

তারা এখন চিল-চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগোচ্ছে। নরসিঙা চলে গিয়েছে। তবে তার গায়ের গন্ধ এখনও যায়নি। বড় বড় 'বোস্-ওঠা' মেয়েরা তাই এখনও বেরোয়নি।

ছোট ছোট 'ন্যাঙটা-ভটুঙরা' পা-পা করে এখনও অতটা হেঁটে যেতে পারেনি, পৌঁছাতে পারেনি তাদের দিদিদের কাছে। তার আগেই নিজের ঘরে পৌঁছে যাবে ফুলটুসি।



সকালবেলা।

কাজ-কামের ধান্দায় বের হবার আগে জড়ো হয়েছে রাস্তার ধারে। দোরখুলির লোধাপাড়ার লোধারা। রাইবু-গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা।

কাল অন্নের মধ্যে দিয়েই গেছে। তাই একটু স্বস্তি, ফুর্তি।

নরসিঙার দল কারো ঘুপচির চালে হাত বাড়ায়নি, একটা রলা-বাতা ধরেও করেনি টানা-

হিঁচড়ান, ভাঙার মধ্যে ভেঙেছে ক'টা হাঁড়ি-কলসি। অমন তো আঁধারে-অন্ধকারে চলতে-ফিরতে নিজে নিজেরাই পায়ের ধাক্কায় কত যে হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে ফেলেছে! মাটির হাঁড়ি, তাও তো কোন্‌টার কানা ভাঙা, কোন্‌টার গলা, কোন্‌টা বা ফুটো, ভিতরেবাইরে 'থেপে' রেখেছে মাটি।

গতকাল না হয় গিয়েছে উপর-উপর, কিন্তু আগামীকাল? পরশু, তরশু? তবে কী এতদিনের বাস উঠিয়ে ফেলবে তারা? দোরখুলি ছেড়ে নরসিঙা ছেড়ে চলে যাবে আর কোথাও?

বড়্‌সোল নাকবিঁধি পেটবিঁধি নাদনগাড়িয়ায়? পাতিনা চামরবাঁধ বড়ধন-কামরা ছোটধন-কামরায়?

না হলে কী আরো দূর পুরুল্যায়? জাহানাবাদ-গাড়াসাগমা-লটপদা-হলুদবনি-ঘাঁটিহুলি-পাড়গোড়ায়? ডুমুরডি-বেলডি-হেরবনা-ফুলঝোড়-হাড়জোড়া-বানজোড়া-পুঁড়িহাঁসায়? মিলেমিশে এক হয়ে যাবে কী বন-দিগার 'খেড়্যা'দের সঙ্গে?

বন ছেড়ে 'পুবাল' যাবে? চক্‌-পিয়াদা দোরো-হেদিয়া ভুএগ্রামুঠা হিজলী সোনাখালায়? ঘর করবে কী 'আকখুটি' শবরদের সঙ্গে?

বাস্তুচ্যুত হবার আশঙ্কায় দোরখুলির লোধাবস্তির লোধারা, বিশেষত পুরুষরা, যখন মনে মনে 'দুনিয়া' চষে বেড়াচ্ছিল, কার কত 'জাতের' নাম 'জাগার' নাম জানা আছে তাই মুখস্থ বলছিল—তখনই এল ফুলটুসি।

পরিস্থিতি বুঝে সে বলল, কাল এসেছে নরসিঙা, আজ আসছে 'পঞ্চাৎ'—কী করে সামলাবে সামলাও—

'পঞ্চাৎ? 'পঞ্চাৎ' কেম্নে?

খন্তা-শাবল কুড়্হার-বুড়িয়া রেখে 'পঞ্চাতের' ভয়ে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল লোধা-পুরুষরা, এবার লাটার দিকে দৌড়ুবে—

থাম্‌-অ! মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল ফুলটুসি।

বলল, কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী—টাকা লিয়ার বেলায় ত দু'হাত মেলে লিএগ্রেছিলে, এখন শুধবার বেলায় কাছা খুলে দৌড়? আ-হা-হা-রে পুরুষ!

অঃ এই? আমরা বলি কী-ই না কী—

লোধাপুরুষরা আবার যে-যার জায়গায় সুড় সুড় করে বসে পড়ল। তবে এবার ঘাড়-মুখ নিচু করেই বসে থাকল। মুখ নিচু করে যে যার কাঠি-খুঁচি নিয়ে 'এঁচেড়ঁ-বেঁচেড়' কাটতে লাগল মাটিতে।

সুযোগ বুঝে তড়পে উঠল রাইবু, তেখনই বলেছিলিম উসব পঞ্চাৎ-টঞ্চাৎ আমাদের জন্যে লয়। জঙল-জঙল, জঙলে আবার 'পঞ্চাৎ' কী? পাঁজ্জনা কী?

জঙ্গলে রয়েছে গাছ-পাল্‌হা, ছোটগাছ-বড়গাছ, লাটা-পাটা-ঝাঁটিবন, ল-লতা, আঁউলা-বাঁউলা কেঁদ্‌-ভুড়রু, গই-গোধি শিয়াড়-হুঁড়ার বন-টিয়া মেজুর বরা-ঝিকর খেড়িয়া ভাম-খটাস, খালধারে বড়জোর খঙ্গা-কাঁকড়া-ব্যাঙ—আর বাকি তো লোধাশবররা।

এখানে 'পঞ্চাৎ' আসে কী করে? পাঁচজনার পাঁচরকম কথা শোনার সর-অবসর কার আছে?—আমরা বলে মরছি নিজের জ্বালায়—

এ আরেক গেঁড়াকল। গেঁড়াকল, গেঁড়াকল,

হঁ-অ লোভে পড়ে ত টাকা লিয়েছিস। এখন শুধবি কী করে? লে শুধ ন। ছাগল-লোন লিয়েছিস, খুড়কা-লোন বাঁশলোন না পোঁদে বাঁশ লিয়েছিস—

হেসে উঠল ফুলটুসি। বলল, কাল যখন আমাদের নুকুর স্যাঙাত-বাপ লিস্টিটা পড়ে পড়ে

শুনাচ্ছিল—তেখনও আমার খুবেই হাসি পাচ্ছিল, দেওর। পরথম পরথম মুখে 'নুগা' গুঁজে হাসছিলম। তারপর ত হাসতে হাসতে 'ঘণ্টে' গেলম—

ফুলটুসি এখনও হাসতে হাসতে উল্টে পড়ার জোগাড় করছিল, রাইবু তাকে এক ধম্‌কানিতে থামিয়ে দিল।—ই কী হাসির কত্‌থা? হাস্‌সির সোময়? সেই বলে নাই—"বন পুড়ে সবাই দেখে, অন্তর পুড়ে কে দেখে?"

হ্যাঁ, তাই তো। এ কী হাসির সময়? কাল নরসিঙা আজ পঞ্চাৎ— ভিতরে ভিতরে পুড়ে আঙ্‌রা হয়ে যাচ্ছে লোধাদের অন্তর। বেড়ে বলেছে রাইবু মাত্‌বর। ঠোঁটে আঙুল চেপে হাসি থামাল ফুলটুসি।

রাইবু তড়পাচ্ছে, টাকা লিয়ে কটা ধাড়-পৌঁঠি কিনেছিস? কটা খুকড়া? ক ঝাড় বাঁশ? সব পেট-পূজায়—একটাও কিছু কিন্‌নিস নাই ত?

নাই নাই, কে আর কী কিনেছে—এক ভুব্‌নার রাঁড় ফুলটুসুয়া ছাড়া। শিয়াড়ে খাক হুঁড়ারে খাক—ঐ ত কিনেছিল কটা ধাড়-পৌঁঠি।

মাটিতে খুঁচিকাঠি দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে কেউ কেউ এই ভেবে খুব উথলে উঠল—কিনি নাই, ধাড়-পৌঁঠি কিছু কিনি নাই, কিন্তুক কিনলে কী আর হৈত? ঐ বড়জোর শিয়াড়ে-হুঁড়ারে 'চাভ্‌লাত'। তার চেয়ে তবু কটা দিন ত পেটপুরে—কথায় আছে নাই—রাঁড়ীর বেটা গোবিন্দ, পেট ভর্‌নেই আনন্দ?

রাইবু বলল, টাকা লিয়ে পশু খরিদা করাও চাই। খরিদা পশু খরিদা পাখ ঝাড়ে-বংশে বাড়াও চাই। সেই বাড়ন্ত পশু বাড়ন্ত লাভে 'বিকে' লোন শুধবি। তারপর আবার লোন লিবি—এই ত কথা। কিন্তুক ধর, তুই যদি মূলটাই ভেঙে ফেলিস? আলু-তুণ্ডা তাড়তে বলে যদি মূলশিকড়টাই ছিঁড়ে ফেলিস? তেখন? তারবেলা? বিনামূলে 'লত্‌' কী আর বাঁচে?

হঁ কী নাই বল্‌?

নাই নাই, গোড়া ছাড়া আগা কী করে বাঁচে!

জানিস কী করবে? লোন শোধ নাই দিলে 'কোরক' করবে, হঁ-অ 'কোরক'! বলতে বলতে রাইবু নিজেই শিউরে উঠল।

'ক্রোক' কী জিনিস লোধারা জানে না, আলাদা করে সে-কথার অর্থ তারা বুঝবে কী করে? নিত্যই তো তারা ভিটা থেকে উৎখাত হচ্ছে, তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তো যে-কেউ যখন-তখন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, কাল নরসিঙা আজ বঙ্কা—

গুরভা বলল, সে ত এম্নিতেও হচ্ছি, নরসিঙা ত রাদ্দিন খেদাচ্ছে মাত্‌বর।

রাইবু বলল, নরসিঙার খেদানি একরকম, এদিকে খেদালে উদিকে যাবি, বনের এধার লয় ওধার, গুরভা। কিন্তু 'কোরক' করলে যে হাতে হাত-কড়া, সোজা 'জিহলখানা'।

'জিহলখানা'কে রাইবুর বড় ভয়।

কিন্তু 'জিহলখানা'র নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল গুড়্‌গুড়িয়া। এক পায়ে ছেঁড়া-ফাটা গামবুট, আরেক পায়ে ছেঁড়া চটি, ঐ অদ্ভুত পাদুকাশোভিত পা জোড়া নিয়ে পিছনে হাতদুটো জেলখানার সার্জেন্টের মতো মার্চ করতে করতে সে বলে উঠল, হঁ-অ, জিহলখানার লপ্‌সি খাতে কিন্তুক খুবেই মজা।

তুই থাম্‌ বে গুড়্‌গুড়িয়া! তাকে রাইবু থামায়।

হাটুয়াপাড়ায় কাম্‌হার-কুমহারপাড়ায়-ভূমিজপাড়ায় লোন নিয়ে লোন শোধ করতে না পারায় 'ক্রোক' হেতু কার যে কী হেনস্থা হয়েছিল এরপর রাইবু সবিস্তারে দৃষ্টান্ত সহকারে একের পর এক বর্ণনা করে চলল।

আর তাই শুনে শুনে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিল গুড়কুঁদা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা। তাদের তো তবু গরু-মোষ ছিল, ঘটি-বাটি ছিল। তাই আটকে নিলামে চড়িয়ে বিক্রি করে লোনের টাকা উসুল করেছিল তারা।

গুরভা ভাবল—তাদের আর কী-ই বা আছে, এক খন্তা-শাবল কুড়হার-বুড়িয়া ছাড়া? সেসব তো ছুঁয়েও দেখবে না লোকগুলো। অতএব ন্যাঙটার নাই বাটপাড়ের ভয়।

কিন্তু ধরে যদি, অন্তত কিছু না পেয়ে বউড়ী-ঝিউড়ীদের? ঝুপড়ীর ভিতর ঢুকে এই বন-জঙ্গলে যদি তাদের হেনস্থা করে? বলে যদি, লোনের টাকা দে শালী, নচেৎ তোকে ছাড়ব না? তখন কী ঘুপচীঘরের মেঝের মাটি খুঁড়ে 'গাড়া'র ভিতর থেকে টাকা বের করে আনবে আমাদের পরিবার? লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা?

সেই তো লোধাপুরুষকে খুঁজে পেতে ধরে এনে পুরে দেবে 'জিহলখানা'য়। 'জিহলখানায়' 'জিহলখানায়'।

তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না—যারা নিয়েছে খুকড়া খরিদ বাবদ টাকা, বন-খুকড়া ধরে এনে খাঁচায় পুরে কিছুদিন বেখে দিলে হয় না? না হয় তেজী আদড়া, সহজে পোষ মানতে চায় না, ছেড়ে দিলেই 'বাঙ্' দিতে দিতে এ-ডুংরি সে-ডুংরি এ-ডুব্কা সে-ডুব্কা এ-বন সে-বন লাটা-পাটায় লাটা-পাটায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে উড়তে উড়তে কোথায় সে কোন্ ডালে কখন বসে থাকবে, "আয় তি-তি" "আয় তি-তি" করে গলা চিরে হাজার ডাক দিলেও আর কখনো খাঁচায় ধরা দিতে আসবে না—আসবে না—

হেঁ মাত্বর, টাকা ত লিঞে খেয়ে ফেলেছি, এখন উপায়?

শরাবণ-শত্রুঘ্নরাও বলল, হঁ-অ একটা বিহিত কর বাইবু। টাকাটা ত পেট থিক্যে আর উগ্রাঁই দিতে পারি নাই?

গরমেটের টাকা পেট থিক্যে উগরাঁই দিতে হৈলেও দিত্তে হবে। ফুলটুসি বলল।

রাইবু পড়ল আতান্তরে—এখন উপায় কী সে বাত্লে দেয়?

অবশেষে, অনেক ভেবে-চিন্তে বলল, 'কোরক' আইলে জঙলে সেঁধা. যার যা 'গুপন' ডেরায়—উপায় আছে ঐ একটাই।

একটাই, একটাই।

শোনামাত্রই গুরভা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা কুড়হার-বুড়িয়া হাতে নেংটির কাছা মালকাছা মেরে দৌড়ুনোর উদ্যোগ করল।

ফুলটুসি ফের হাত তুলে বলল, আ-হা-হা রে মরদ, 'কোরক' আইল কী তার ঠিক নাই—অহ্নি দৌড়াতে হব্বে? ডর-পেল্কা কাঁহাকা!

বলেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল ফুলটুসি। বলল, সে যতই কর-অ যেখানেই লুক্কাও—গরমেটের টাকা গাপ্ করে পার পাবে মনে করেছ? ঢুন্ডে তুমাকে বাহির করবেই করবে। শুন্নো, আরও কত্থা আছে—

ফুলটুসি এবার তুলল বাঁশরি আর সুজনীর কথা।

বাঁশরি ভক্তা? সুজনী ভক্তা? তাই ত, এরা আবার কারা? স্বামীর নাম বধিরাম, বুধন —কোথাকার লোক? কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল?

না, সবই তো দোরখুলির। সাং দোরখুলি, দোরখুলি। একটাই 'লিস্টি'।

এরা আবার হাতের বুড়া আঙুলের টিপ ছাপ দিয়ে সরকারবাহাদুরের ঘর থেকে বাঁশখরিদা বাবদ বাবুইচাষ বাবদ টাকা তুলেছে হাজার হাজার। টিপ্-ছাপ দিয়েছে তো ঠিক? টাকাটা তুলেছে তো ঠিক?

কেউ এদের হয়ে টিপ-ছাপ দেয়নি তো? কেউ এদের হয়ে টাকাটা তুলে নেয়নি তো? দোরখুলির লোধাপাড়ার কেউ? তাহলে কে বা কারা?

বঙ্কা 'লিস্টি' থিক্যে পড়ে শোনাচ্ছিল, আর ফুলটুসি তরা, শুনেছ ত ঠিক?

ঠিক, ঠিক।

তা'লে, ই বাবা, ই ত আরেক বিপদ। বিপদের উপর বিপদ।

এসময় শরাবণ-গুরভা-গুড়কুঁদা-শত্রুঘ্নরা ইচ্ছা করলেই দৌড়াতে পারে, দৌড়াতে দৌড়াতে বনের দিকে গোপন আস্তানায় চলে যেতেও পারে। কিন্তু তারা নড়ল না। নড়ছে না।

মুখ নিচু করে কাঠি-খুঁচি দিয়ে মাটিতে এঁচেড়-বেঁচড় কাটতে লাগল। রেখ্ কাটতে লাগল, রেখ্। কাটাকুটি করতে লাগল, কাটাকুটি। যেন এক কঠিন অঙ্ক দিয়েছে অঙ্ক-মাস্টার। কিছুতেই হচ্ছে না।

রাইবু বলল, দ্যাক্, কারোর হয়ত দুটা নাম—একটা 'সতের' নাম, একটা 'পেঁদের' নাম। দৌড়ে যা ত—ঘরে ঘরে জিগাস কর।

অতএব ঘরপ্রতি লোক দৌড়ুল। অন্য কারোর অন্যকোনো নাম আছে কী না—জেনে আসবে, বিশেষত মেয়েদের।

একজন গেল আর দৌড়ে এসে বলল, গুড়খার বহুর ভালো নাম ঢালো হৈলেও, কেউ কেউ তাকে 'গেন্ধু' বলে ডাকে, অন্তত বাপ-ঘরের লোকেরা ঐ নামেই ডাকত।

'কঁকু' কী 'সতের্' নাম ন 'পেঁদা' নাম? জিগাস কর ত!

লোকটা ফিরে এসে বলল, হঁ-অ, কঁকুর একটা ভালো নাম আছে।

কী? কী?

বেজলাল, বেজলাল। অর্থাৎ ব্রজলাল।

ফুলটুসি মজা করে বলল, তবে বজোলাল বজোধামে যাক, যেয়ে কিষ্টলীলা করুক। এক কলি গানও শুনিয়ে দিল ফুলটুসি—

প্রেমের আগুন জ্বেলে দিয়ে
পারলে নাই আর নিঝাতে
শ্যাম পারলে নাই আর নিঝাতে
ফুলের মালা হৈল বাসি
পারলে নাই গো পরাতে।

সে-মজায় যোগ দিল প্রায় সবাই। —আচ্ছা ভালা, ঐ যে ঐ সুখজুড়ির উদিকে থাকে, কী নাম যেন, উহার বউয়ের নাম কি? যা ত জিগাস করে আয়।

আবার লোক ছুটল, লোকটা ফিরে এসে বলল, ডাক নাম বিঝল, ভালো নাম রমণী।

রমণী, রমণী।

আচ্ছা, রমণী সুজনী হয়ে যায় নাই ত? লোন লিএেছে? যা, ভালো করে জিগাস কর।

লোক ছুটল আর শুকনো মুখে সে ফিরেও এল। তার পিছনে পিছনে এল একটা 'হুরি'। হুরি তার মানে সোরগোল।

—কুন্ শালা মিছা কথা বলে—আমি নাকিন লোন লিএেছি? আমার 'বহু'ও নাকিন লোন লিএেছে। না, না, কোনরকম লোন-ই তারা নেয়নি।

লোনের কথা আপাতত থাক। জিজ্ঞাসা করা হল তো সবাইকেই, এক জটাদিদি ছাড়া। তাকে না হয় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কাল।

খবরদার! এই কদিন পঞ্চায়েতের ওদিকে কেউ যেন না যায়। এমন কী 'পঞ্চাতের' লোক দেখলেও যেন পালায় শত হাত দূর দিয়ে।

রাইবু ফুলটুসিকেও মানা করে দিল। —অত ঘড়িক-ঘড়ি বঙ্কার ঘরে যাবা কেনে? কিসের অত্ত পীরিত?

ফুলটুসি অঝোরঝর কেঁদে ফেলল। —হঁ-অ আমার আর কিসের পীরিত! এই হাসছিল, এই সে কেঁদে ফেলল।

ফুলটুসি কাঁদতে কাঁদতে বলল, যেয়েছিলিম ত লক্ষ্মা জাইতের জন্যে, আমার জন্যে কী আর? বিপদ বলে বিপদ, মাহাবিপদ—যেয়েছিলিম যদি টুক্চার উব্‌গার হয়! কেন্নে, বিপদে-আপদে ডিল্লিশ্বরের কাছ্-কে বঙ্কার কাছ্-কে তুমি যেস্তে নাই?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যেতে হয় বৈ কি রাইবুকে। কখনো সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠতে, কখনো বঙ্কা-দিল্লিশ্বরের দু'পা জড়িয়ে ধরতে। তবে সে তো পুরুষমানুষ, সাত-খুন মাফ, কিন্তু ফুলটুসি—

রাইবু দেখল বেশি ঘাঁটাতে নেই ফুলটুসিকে। কখন কোথায় কী বলতে কী বলে ফেলবে, আন বলতে ধান—'কুঁচিয়া' খুঁড়তে সাপ বের করে ফেলবে। তাই সে চুপ করে থাকল, কাঠি-খুঁচি দিয়ে চুপচাপ মাটি আঁচড়াচ্ছে—

কিন্তু সহজে থামবে কেন ফুলটুসি? রাইবু তাকে বদনাম দিচ্ছে? অতএব সে রোদন শুরু করল—আমার জ্বালা কেহই বুঝল নাই! নাই, আমার জ্বালা কেহই বুঝল নাই!

গুরভা-গুড়গুড়িয়া-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা দেখল—এ তো মহাজ্বালা! সাত-সকালে 'হুরি'! তারা সমস্বরে বলল, আহা চুপ কর-অ না, চুপ কর-অ না—

তার ছোটোমেয়ে মুনকুও এসে মাকে আষ্টেপৃষ্টে ধরে বলল মা তুই চুপ কর, চুপ কর্—

গুরভা-গুড়গুড়িয়া-শরাবণরাও ঈষৎ হাসতে হাসতে মিঙমিঙে গলায় বলল, হঁ-অ মুনু, তর মাকে চুপ করতে বল্ ত! তকে মিঠাই দিব-অ।

ঝাঁঝিয়ে উঠল ফুলটুসি, চুপ করব? কেন্নে চুপ করব?

বলেই আরো জোরে জোরে রোদন করল। অগত্যা রাইবু বিপদ বুঝে রাস্তার মজলিশ ছেড়ে ঘরের দিকে উঠে গেল।

কাউকে চুপ করাতে হল না ফুলটুসিকে, চুপ সে নিজেই করল যখন দেখল—দোরখুলির ওদিক থেকে নয়, মাঝুডুবকার জঙ্গল পেরিয়ে ঠাকুরবাঁধ ধ'তলা (ধ গাছটা আর নেই) শালতলা পেরিয়ে সাফা-কাপড়ে লোক-দু'জন লোধাপাড়ার দিকেই উঠে আসছে।

কে দুজন? কে কে?

লোধাপাড়ার মেয়্যা-পুরুষরা একযোগে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়াল। —তবে কী কুটুম আসছে? কুটুম আসছে?

না, এমনটা তো তাদের জীবনে বড়-একটা ঘটে না।

আসে তো বড়জোর বঙ্কা, মনা, লক্ষ্মণ পাতর, আর 'হাটুয়া' মহাজনরা। লুঙ্গি পরে লুঙ্গির টুনি নাভির উপর-অব্দি তুলে চটি-পায়ে ছলর-বলর হাঁটতে হাঁটতে। মচর মচর পান খায়, কথা বলতে গেলে চোখে-মুখে পানের 'পিক' ছিটায়। তাতে তারা অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করে না।

আর আসে বসন্ত। হাতে-পায়ে আঙট-আঙটি পরাতে। তবে সে তো তেলচিটে বসনে, নখের চিমটি দিলে যেন চ্যাটচ্যাটে ময়লাও উঠে আসে। সে সাফা নয়, সাফা নয়।

সাফা-কাপড়ে কুটুম আসবে—সে তো পরবে, পরবের এক-দুদিন আগে। এখন আর

পরব কোথায়? সামনে বড়জোর 'দোল' কী 'বান্নি-যাত্'। দোল হোক বান্নি হোক কুটুম তো আসবে দোরখুলি-সুখজুড়ি-রুখনীমারার মাহাতোপাড়ায়, নারদা-চাঁদাবিলা-নিগুই-পুখুরিয়ায়, কাম্হারপাড়া-কুম্হারপাড়ায়, নুয়াসাহির ভূমিজপাড়ায়—

সে তো আসবে নদী পেরিয়ে খাল পেরিয়ে, খালধার দিয়ে নদীধার দিয়ে, আলের উপর দিয়ে কুল্হির ভিতর দিয়ে, পল্লাদের তেঁতুলতলা পাড়িয়ার করণতলা কিয়ঝিরিয়ার কেয়া-বাঁধ মাড়িয়ে—

সে তো ওদিকে ওদিকে, এদিকে নয়—

মাথায় গাঁটরি নিয়ে, ছাতা খুলে, লাল-নীল-হল্দা হল্দা জামাকাপড় পরে, শাড়ি-শায়া-বেলাউজ পরে, চুর-বালা-খাড়ুয়া-নেপুর ঝিনকি পরে, দড়ি-দেয়া বোতাম-দেয়া পেন্টুল-হাফপেন্টুল গলিয়ে, ঝুনঝুনি বাজিয়ে প্ল্যাস্টিকের পুতুলের পেট টিপে টিপে, তিন-চার হাত হনুমানের ল্যাজের মতো বেলুনের গা-রগ্ড়ানো অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে, ব্যাঙ-বাজনা বাজিয়ে, লাল-নীল-হল্দা হল্দা কাগজের প্ল্যাস্টিকের টিনের গোল গোল 'ঘোরা-কল', 'উড়া-কল' উড়িয়ে, উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে-উর্দ্ধে-অধেঃ ঠাই-ঠুই গোলাগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে—

সব তো ওদিকে ওদিকে, এদিকে নয়—

উল্টোপথে পথের ভুলে কে আবার এদিকে এল? কে? কে?

সাফা-সাফা 'নুগা' দেখলে, 'গরা গরা' গা দেখলে আমাদের চোখ টাটায়, চোখ যে সব্সব্ করে, মন পোড়ায়, মন ছুঁক্ ছুঁক্ করে, টাকরায় জল 'শঁসায়', জিভ যে লক্ লক্ করে—

পুরুষমানুষটার কাঁধে যেন একটা 'সিকা-বাঁহুক', কী যেন সে বয়ে আনছে, ধন-দৌলত। সামনে একটা 'মেয়্যামাড়ষ', এক হাতে ঈষৎ শাড়ি তুলে হাঁটছে।

কেউ একজন আরেকটু ভালো করে দেখে কে জানে কেন উল্লাস করে বলল, মেয়্যাটার কড়ে একটা ছাউ। তার কড়রে তার কড়রে—

মেয়েটার কোলে একটা ছেলে। তার কোলে তার কোলে—একটা পিলাস্টিকের পুত্লি, পুত্লিব পোঁদ টিপে টিপে ছোঁড়া কির'ম বাজাচ্ছে, ঐ শুন্নো—প্যাঁ-এ-এ-এ-এ প্যাঁ-এ-এ-এ-এ প্যাঁ-এ-এ-এ-এ—

মুখে প্যাঁ-এ-এ-এ করতে করতে চারধারে সে একপাক ঘুরে নিল।

কেউ একটু দৌড়ে গেল, কেউ আবার এখানেই দাঁড়িয়ে থেকে কপালে হাত রেখে দেখল। যা করল মেয়েরাই।

মেয়েরাই, মেয়েরাই।

একটু আগের যতরকম অসুবিধা, যতরকম সমস্যার কথা ভুলে তারা মেতে উঠল এই নিয়ে। মাতবার মতো একটা কিছু তো চাই, আর তা তারা পেয়েও যায়।

একজন লোধাবউড়ী অত্যধিক উৎসাহে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে, সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠল—গিড় গিড়া দাগিন গেঁদা—

দু'হাতেব চেটোয় তালি মারতে মারতে প্রায় নেচে-কুঁদে বলল, সাতসকালে যে গ' কুটুম আসচে লদ্ধাপাড়ায়। কুটুম কী—লদ্ধাপাড়ায় আসচে নৈতন মেয়্যা-জামাই—

মঙ্গলকাজে মঙ্গল হাঁড়ি কোন্ ঘরে বসে নৈতন হাঁড়ি

পাড়াপড়শিকে ডাকিঞে দিয় গ কোন্ ঘরে বইস্বে নৈতন হাঁড়ি গ—

নতুন না হলেও নতুন। দেখতে দেখতে প্রায় আড়াই বছর-তিনবছর গত হয়ে গেল সন্তোষ আর সাবিত্রীর বিয়ে। এরমধ্যে একবারও বাপের বাড়িতে আসেনি সাবিত্রী। ভৈরব-কুম্হার বনে-জঙ্গলে লদ্ধা-মদ্ধাদের পাড়ায় গুড়খার ভুগড়ায় কাঁচা-কুঁচো উন্দুর-বান্দুর গোধি-ঢ্যামনা খেতে বেটার 'বহু'কে একবারও আসতে দেয়নি।

আসতে না দেয়াটাই স্বাভাবিক। তাবলে লোধাপাড়া আর কুম্‌হারপাড়ার মধ্যে সেই যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাবটাও আর নেই।

কথায় আছে না—কাঁ্যাকলাসের দৌড় ঐ বান্নার মুড়া? ঝগড়া-বিবাদ যেটুকু—ঐ সেদিন পর্যন্ত। ডর্‌-পেলকা লোধারা তারপর থেকে এক পা-ও এগোয়নি। সাবিত্রী না আসুক সন্তোষকুম্‌হারের তো আতা-যাতা ছিল। জঙ্গলে, গুড়খার ভুগড়ায়।

লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীরা তাদের ঘরের মেয়্যা যাকে শিশুবেলা থেকে কোলে-কাঁখে মানুষ করল, তার 'বেহা ঘরে' এতটুকু 'হাউস' করবে না? এতটুকু ফুর্তি-ফার্তা?

আজ এতদিনে, এতদিন বাদে সেই আধ-খেঁচড়া অপূর্ণ ইচ্ছাটাকে লোধাবউড়ী যেন পূরণ করতে চায় নতুন করে মঙ্গল হাঁড়ি মঙ্গল ঘট বসিয়ে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, পাড়া মাথায় করে।

সন্তোষ-সাবিত্রীর দেড় বছরের ছেলেটার গাল টিপে দিয়েও মজা করে বউড়ী বলল—

বনে বনে আইলি বাবু কী খাঞে আইলি?
পেট্‌টা ত ডাবাক-ডুবুক রে বাবু শিয়াড় গিলে আইলি?

না না, এতটুকু বাচ্চা শিয়াল কী খাবে, শিয়াল তো খাবে লোধারা। তৎক্ষণাৎ সাবিত্রী সংশোধন করে দিয়ে বলে উঠল, নাই নাই কাকী, আমাদের পরিতোষ ত খায় বিলাইতী দুধ, লাক্টোজেন।

লোধাবউড়ী হেসেই বলল, ঐ একেই কথা সাব্বি, তোর বেটা শিয়াড় না খাক শিয়াড়ের দুধ ত খায়।

নাই নাই, লাক্টোজেন শিয়ালের দুধ কেন হবে—আড়পাগলী সাবিত্রী তা মানবে কেন? সে ঘন ঘন মাথা নাড়ল।

মাথা-নাড়ার মধ্যেই সে আগের কথাটা ভুলেই গেল, কত, কতদিন বাদে সে লোধাপাড়ায় ফিরে আসছে! বুলান-হদহদি কেঁদ্‌লাটা কুড়চি-আঁটাবিবুদা। এখন খালি-পায়ে এদিক-সেদিন হাঁটতে গিয়ে একটা পিট্‌না সিজের কাঁটাও যদি পায়ে ফুটে তো ফুটুক না!

লোধাপুরুষরা তো থ।

আজ এতদিন বাদে লোধাপাড়ায় সাবিত্তিরি? তবে ঘরের মেয়্যা কী ঘরে এল? এল যদি সঙ্গে সন্তোষ—সন্তোষিয়াকে আবার আনল কেন?

'কড়র ছাউ', কোলের বাচ্চাটাকে আনে আনুক সাবিত্রী, নাড়ি-ছেঁড়া ধন আর কোথায় বা রেখে আসবে, তাবলে সন্তোষকে? ঐ মাকড়া কুম্‌হারটাকে?

গুড়খার ভুগড়ার পাছুধার, লাটা-পাটা, টিপিক টিপিক করে বাঘ-যুগনী পোকা পাছায় টিপা-লাইট গুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর তুমি ভুচুঙ করে সেসময় এলে লীলা করতে—শ্যাম আমাদের ননীচোর, শ্যাম আমাদের কুলচোর—

লোধামাইয়ার কুল লিল্‌হে হে ওহে সন্তোষ আর আমরা তুমাকে ঝাপটে ধরে চিহড়লতে বেন্ধে রাখলম। মনে নাই তুমার মনত্‌ নাই?

আমাদের বিলকুল মনে আছে, ভুলি নাই সন্তোষ, চিহড়লতে বাঁধা অবস্থায় ছটফটাচ্ছ, খুবেই মলিন বদন, আর তুমার দশা দেখে আমরা হাসছি—

হেনকালে বনের ভিতর কুলকুলি, হুরি-হট্টগোল, তিনসেল পাঁচ-সেল টিপা-লাইটের এদিক-সেদিক ফোকাস, কুম্‌হারপাড়ার কুম্‌হাররা দমে খেপে গেছে—

আমরা ভয়েই বাঁধন খুলে দিলম তুমার। তুমি হাত-পা ঝেড়ে চিহড়লতের চঁচ্‌ মুছে মাথা উঁচু করে ঘরে চললে, আর আমরা বনে—

এই ক'ঘর লোধা অতবড় কুম্‌হারপাড়ার সঙে যুজ্‌ব কী করে? আমরা হেরে ভূত। তবে কুম্‌হাররাও আর বেশিদূর এগোয় নাই। মিএ্যা-বিবি রাজি ত ক্যায়া করে গা পাজী? কুম্‌হারদেরও ত জঙ্গলে না এলে চলে না। কাঠ না হলে হাঁড়ি পুড়বে কী করে?

অই সেদিনকার গন্‌গনে আঙরা আজ নিঝাই গেছে। তার তাপও নাই উত্তাপও নাই।

কাজে যাবার আগে মজলিশে উপস্থিত লোধাজনমাড়ষ, গুরভা-গুড়গুড়িয়া-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা শুনল, দেখল আজ এতদিন বাদে সাবিত্রী-সন্তোষ লোধাপাড়ায় এসেছে।

শুনল-দেখল, তারপর হাতের কাঠি-খুঁচি দিয়ে দেহে চুপসাড়ে শিরশির করে উঠে-পড়া গুছিপোকা কী শুঁয়াপোকাকে ঝেড়ে ফেলার মতো তারা 'সন্তোষ-সাবিত্রী'কে ঝেড়ে ফেলে উপস্থিত লোধানীদের নিরুত্তাপ ভাবে বলল, যাও, এদ্দিন বাদে মেয়্যা-জামাই আইল, আদ্দব করে ঘরত্‌ তুল-অ! চুম্মাও!

বলেই লোধাপুরুষরা দু'হাঁটু ভাঁজ করে, তাতে দু'হাতের বেড় দিয়ে, পা দুটোকে ঈষৎ তুলে দোলাতে লাগল কিছুক্ষণ। আর তারপর শাবল-খন্তা কুড়হার-বুড়িযা নিয়ে চলে গেল বনে। কেউ কেউ উদাসীন ভঙ্গি করে তখনও বসে থাকল—কী 'খব্বর' নিয়ে আসে দেখিই না!

মজলিশ ছেড়ে রাইবু উঠে গিয়েছিল আগেই, শুধু গুড়গুড়িয়া চলে যাবার আগে গুড়খার ঘরের দিকে 'আন্‌সাটকা' কিছুটা এগিয়ে গেল, দূর থেকে সাবিত্রীকে চোখ দিয়ে জরিপ করল—

সাবিত্রী জানতে পারল না, জানলে সে কী বলত—অমন চোখ তোর গেলে দিব রে নির্বংশা?

লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীদের অত কিন্তু রাখ-ঢাক নেই, বাধো বাধো নেই। তারা প্রায় দৌড়ুল। আর দৌড়ুল 'ন্যাঙ্টা-ভুটুঙ সাধের কুটুম'রা।

বড় বড় ছাউ-ছানারা না যাক, বড় বড় মেয়্যা-মাইয়ারা তো গেল।

গুড়খার ভুগড়া থেকে সাবিত্রী-সন্তোষ তখনও কিছুটা দূরে। লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে বাঘ-যুগ্‌নী পোকাব টিপিক্‌ টিপিক্‌ আলো-জ্বলার মধ্য দিয়ে গুড়খালোধার ভুগড়ার পিছন দিকে, যেখানে, বিয়েব আগে সাঁঝে-বাতে সাবিত্রী-সন্তোষ 'তোল-মাটি-ঘোল' করেছে—সাবিত্রী-সন্তোষ এখনও ততদূরও পৌঁছয়নি।

এমনকী গুড়খা, গুড়খার বউ ঢালো, তাদের ছানাপোনারাও তখন অবধি জানল না—তাদের ভুগড়ার 'পাছ-দিকে' কত কী ঘটে চলেছে। আর দৌড়ে সাবিত্রী-সন্তোষকে খপ্‌ করে ধরে ফেলল লোধাপাড়ার বউড়ী-ঝিউড়ীরা। নিয়তি-ভাদু-বড়পুটি-ভুটকী-গুরুবারি-দুলহা-চাঁদবদনীরা। কে জানে এদের মধ্যে গাগরি-সুজনীও আছে কী না।

তারা দৌড়াতে দৌড়ুতে গেল আর 'খব্বর' নিয়ে ফিরেও এল। বড়জোর এক-দুজন আর 'ন্যাঙ্টা-ভুটুঙ সাধের কুটুম'রা যা থেকে গেল। তারা আরো কিছুক্ষণ থাকবে, একেবারে হাঁড়ির খবর নিয়েই তারা ফিরবে।

যারা ফিরল তারা তড়িঘড়ি জেনে এল—কুম্‌হারপাড়া ছেড়ে এ-জন্মের মতো চলে এসেছে সাবিত্রী। আর যাবে না, আর যাবে না শ্বশুরের ভিটায়। কুম্‌হারপাড়ায়।

হারগিজ না, মরে গেলেও না।

আর তাই জেনে কী যে সুখ হয়েছে বউড়ী-ঝিউড়ীদের। তাদের অন্তরটা 'দম্মে' ভরে এল। সেই আড়-পাগলী 'মেয়্যাটা' যে কী না কিছু বুঝল না শুনল না, না-বুঝে না-শুনে আড়-বুঝের মতো একদিন নেচে-কুঁদে-বেজাতের ঘরে গিয়ে উঠেছিল, আজ সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের জাতের ঘরে আপনার মানুষজনের কাছে ফিরে এল।

ফিরে এল, ফিরে এল।

আর ফিরে যদি এলই—তবে, কিন্তু—সঙ্গে 'কুঁভারদের ছুয়া'টাকে আবার ল্যাজুড় করে নিয়ে এলে কেন?

আর কেন্নে? সেই বলে নাই—"গাই আইল বাছুরি আইল, বাগালছোঁড়া কুথায় রইল?"

থাকবে আর কোথায়? সে তো আসবে গরুগোঠের পিছু পিছু, ধুলোয় ধুল্লাট হয়ে, গরু-বাছুরকে সামলাতে সামলাতে।

আজ সন্তোষ এল পিছু পিছু, তার মানে দু'চারদিন বাদে সাবিত্রী আবার কী সন্তোষের পিছু পিছু ফিরে যাবে শ্বশুরঘরে, কুম্‌হারপাড়ায়? বনের আলু-তুণ্ডা খণ্ডা-কাঁকড়া ছেড়ে সে কী আবার চাষার ঘরে দুধ-ভাত খাবে? মাছ-ভাত খাবে?

তবে আর হল কী, যেমনকার জিনিস তেমনি তো থাকল, আড়-পাগলী সাবিত্রীর কপালের হের-ফের আর হল কই? কপাল ভাঙল কই?

বড়ই সন্দিগ্ধমনে লোধাবউড়ীরা এই বলে রটিয়ে দিল যে—সাবিত্রীর শ্বশুর রগচটা ভৈরবকুম্‌হার তার 'বেটার বহু'কে ঘর থেকে খেদিয়ে দিয়েছে।

বেটা, বেটার 'বহু'কে খেদাল খেদাল কুম্‌হারবুঢ়হা, তা বলে অত সাধের ঐটুন লাতিটাকেও 'বনবাস' দিল?

হঁ-অ, বনবাস। ও-হো-হো-হো আ-হা-হা-হা লব কুশ রে!

কেউ একজন তাকে সংশোধন করে দিয়ে ঠেলা মেরে বলল, একটাই ত লাতি, যেকুনো একটা বল্ ছুঁড়ি—হয় লব নয় কুশ।

আর সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

নাতির বনবাস-প্রসঙ্গ যে তুলেছিল সে এবার দৌড়ে সামনের দিকে দুলছুট হয়ে দু'হাত মাথার উপর তুলে তালি মারতে মারতে গেয়ে উঠল—

> হামার লাতির বড় ছাতি
> দুয়ারে বেঁধেছে হাতি
> লাগুক টাকা দিব-অ গুনাগারি
> তবু না ছাড়িব জমিদারি—

প্রসঙ্গ-টসঙ্গ আবার কি, ঐ 'লাতি' যখন আছে আর মুখস্থও যখন আছে তখন দু-এক ছাঁদ গেয়ে দিতে দোষ কী?

কে বলবে—এই কিছুক্ষণ আগেও গতকালের নরসিঙা আর আজকের 'পঞ্চাতের' পশুখরিদা লোন গোটা লোধাপাড়াকে যার পর নেই চিন্তিত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, চাপে পড়ে ভুবনার বউ ফুলটুসি তো কেঁদেই ফেলল।

এই মুহূর্তে সব কিছু ভুলে আরেক ফিকিরে মেতে উঠেছে তারা। লোধাপাড়ায় ফন্দিফিকিরের তো অভাব নেই, কখন কোনটা হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে, সন্তোষ-সাবিত্রীর আগমন এখন তাদের তুঙ্গে রেখেছে।

লোধাবউড়ীরা দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে অপেক্ষমান লোধাপুরুষদের খবর দিল, যারা এতক্ষণ হাঁ করে বসেছিল খবরটা শোনার জন্য। খবর শুনবে, তবে তো তারা বেরুবে ধান্দায়। কাজে যাবে বনে-জঙ্গলে। না-শুনে গেলে মনটা তো অষ্টপ্রহর খচ্‌খচ্ করবে। আর কখন কোন্ ফাঁকে অন্যমনস্কতায় বুড়িয়ার চটা এসে পায়ে—

কিন্তু ভাবখানা দ্যাখো পুরুষদের। চোখ পিট্‌পিট্ করছে, পা দোলাচ্ছে। নির্বিকার, নির্বিকার।

যেন তোমার খবরটা দিতে চাও দাও, তবে ওতে আমাদের কোনো প্রকার আগ্রহ নেই। আহিক্কা নেই।

নাই নাই।

শুন্নো কথা, লোধাবউড়ীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, শুন্নো খবর—

সেই চোখ পিট্‌পিট্, পা নাচাচ্ছে, শুনবার জন্য মনে-প্রাণে ছটফট করছে, তবু, তবু মুখ ফুটে জানতে চাইছে না—হঁ-অ, কী খবর?

বরঞ্চ কাঠিখুঁচি নিয়ে কাটছে এঁচেড়-বেঁচেড়, না না, আমাদের অন্য জরুরী কাজ আছে, চিন্তা-ভাবনা— এই ত একটা রেখ্ কাটলাম, ওপর থেকে আড়াআড়ি আরেকটা—

পুরুষদের কাছে থ্যাবড়ে বসে পড়ে লোধানীরা বলল, জানলে এতদিনে সন্তুষকুম্‌হার সন্তুষলব্ধা হয়েছে? বহু লিঞে ছাউ-ছনা লিঞে লব্ধাপাড়ায় এসেছে ঘর করতে?

চমকে প্রায় উঠে দাঁড়াল লোধাপুরুষরা—বলে কী লোধাবউড়ীরা? এ তো বহুত্ দিনকার কথা। লোধাদের মেয়্যা লোধাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না। বেজাতের লোককে বেহা করে যদি তো, বে-জাতের লোকটা লোধাপাড়াতেই আসুক। আসুক, আসুক, লোধা হয়ে যাক—

যেখানে খিঁচাখিঁচি বা টানাটানি বেহা, জোরজবরদস্তি বেহা, ধুক্কু বেহা বা পালাঁই যাওয়া বেহা লোধাসমাজে নেই। রাইবু-গুরভা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা তো একদিন চেয়েইছিল—সন্তোষকুম্‌হার আসুক লোধাপাড়ায়, সাবিত্রীকে বেহা করে লোধা হয়ে যাক।

তা নয় কুম্‌হাররাই তো জোর জবরদস্তি করে—

আজ এতদিন বাদে সেই সন্তোষকুম্‌হারই এল লোধাপাড়ায় লোধা হয়ে ঘর বাঁধতে? হাসবে না কাঁদবে লোধারা?

হাসল, খুব হাসল।

তারপর 'জরপ' করে বলল, কাল·নরসিঙ্গ এসে ঘরদুয়ার ভাইঙ্গে আমাদের খেদ্দাঁই দিচ্ছিল জঙ্গল থিক্যে। আজ উ-বোকা এস্‌চে জঙ্গলে লব্ধা হয়ে বস্‌বাস করতে? বেড়ে রসের কত্‌থা শুনালি নাকফুড়রির মা, লে, তা'শ্লে টুকচার দক্তা-বনা খাবা!

মতিহারি দোক্তার গুঁড়ো হাতে নিয়ে মুখে পুরে নিমেষে ধান্দায় বেরিয়ে গেল লোধাপুরুষরা।

লোধাপুরুষরা যা হোক করে গেল, কিন্তু লোধাবউড়ীর আজ যেন পা চলছে না বনে যেতে। কাজে-কামে ধান্দায় বেরুতে আজ যেন তাদের গা করছে না। গা করছে না, গা করছে না।

জঙ্গলে গিয়েও সেই তো 'এ-লত্' টানতে 'ও-লত্' টানতে মাঝেমাঝেই মন পড়ে থাকবে এদিকে। সবসময় শরীর 'উধাস' লাগবে।

ঐ গিয়েই মনে-মন সারাক্ষণ তো 'জিগাস' করবে—আচ্ছা ভালা, সন্দেহ তো হয়, এদ্দিন পরে এত সুখ ছেড়ে সাবিত্রী ফের কেন্দ এল জঙ্গলে? কী তার রহস্য?

নানান ছুতোয় গড়িমসি করে কেউ কেউ থেকেই গেল শুধু ঐটুকু জানতে। না জানলে যে তদের পেটের আলু-তুণ্ডা হজম হচ্ছে না।

সাবি!

হুঁউ।

এই সাবি!

হুঁউউ কী?

সাবিত্তিরি লো!

বল্ ন কী?

ডাকল, ডেকেও কথা বলল না, শাড়ির আঁচলায় ঠোঁটদুটি ঢেকে রাখল। হাসল, গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঐ বড়জোর একটু গা টিপে দিল সাবিত্রীর।

পায়ে আলতা, আঁচলে চাবিখাড়ি। চলতে-ফিরতে চাবিখাড়ি বাজছে, বাজাচ্ছে।

কেউ আড়-চোখে পায়ের 'আঙুট'টা একবার দেখে নিল। ইস্ খাড়ুয়া পরেনি? ধুর খাড়ুয়া কী পরবে? আজকাল ওসব আর কেউ পরে নাকি? পরে তো, পরে তো—লেপুর। লেপুর ঝুন্‌কি।

কেউ একজন দুহাতে ধরে সাবিত্রীকে ঘুরিয়ে দিল দুম করে। ঘুরিয়ে 'পাছ্য' দেখল—

মনে মনে বলল, কী ভর্‌ভরন্তই না হয়ে উঠেছে সাবিত্রী। আর কী রঙ-ই না খুলেছে তার। একদম ফেটে পড়ছে।

মুখে সে এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তুক হেঁ লো, খেদ্দাঁই দিল কেনে?

আকাশ থেকে পড়ল সাবিত্রী, একটা পা সামান্য উঁচুতে রেখে, উঁচা-পায়ের হাঁটুতে হাত, ঐ ভঙ্গিতেই বলল, ওম্মা! খেদ্দাঁই দিয়েছে কে বলল? আমরাই ত রাগ করে চলে এসেছি।

রাগ? কিসের রাগ লো? শ্বশুরঘর করতে অত রাগ-চাড় কী ভালো রাণী? সেই বলে নাই—রহিস বিটি সহে, সকল যাবেক বহে?

বয়স্কালোধানীরা এর মধ্যেই উপদেশ দেওয়া শুরু করল। আড়পাগলী মেয়্যাটার কোনো ওজর-আপত্তিই তারা শুনল না—

—যাহোক পেট পুরে খাত্তে ত পাচ্ছিলি, সুখে থাকতে থাকতে তোকে কী ভূত্তে কিলাইলো লো সাবিত্তিরি?

হঁঅ ভূতেই, ভূত না'লে কেউ উর'ম হাত্তের নক্‌খী 'গোড়ে' ঠেলে? হাতের লক্ষ্মী, লক্ষ্মী বলে লক্ষ্মী, অমন ক্ষেত-খামারি চাষ-চাষালি, পায়ে ঠেলে সাবিত্রী কী না এসেছে লোধাপাড়ায় আঁওলা-বাঁওলা আলুতুণ্ডা খেজুর-মেজুর খেয়ে পেট ফাঁপাতে?

বড় দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় গালে হাত দিয়ে লোধাবউড়ীরা তো গুড়খালোধার খলায় বসে থাকল।

বসে থাকল, বসে থাকল। আজ যেন বনে যেতে কাজে-কামে ধান্দায় বেরুতে তাদের গা নেই। গা নেই, গা নেই।

সন্তোষকুম্‌হার কিন্তু এদের কথা তেমন মন দিয়ে শুনছিল না, আবার শুনছিলও। সে বসেছিল গুড়খার 'পিঁড়হায়'। তার মানে দাওয়ায়।

তার তো লোধাপাড়ায় আতা-যাতা ছিল। গুড়খা-গুড়খার বউয়ের সঙ্গে তার তো খুব খাতির। বিপদে-আপদে পূজায়-পার্বণে, জনারের কালে জনার আখ মাড়াবার কালে পানা-গদ-গুড়-গুড়পণ্ড কত কী লুকিয়ে-চুরিয়ে যোগান দিয়ে যেত সন্তোষ।

এখন সে-ও একটা জেদী, গোঁয়ার ভাব নিয়ে ডুব্‌কা-ডুংরির দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। তার চোখের সামনে—

আঁটারি-কুড়চির লাটা-পাটা, কেঁদ্‌বুদা, চুরচুবুদা। মুঢ়্‌হা বন, তাকে ঘিরে ধরে নানাবিধ আগাছা। দূরে দূরে একটা-দুটো গাছ, বড় বড় গাছ। শাল, আসন। তাদেরও ঘিরে ধরে আছে নানাবিধ ল'গাছ। বাজবরণ-হাড়জোড়া-দুধিয়া-চিহড়।

হাওয়ায় হাওয়ায় পাল্‌হা-পতর কাঁপছে। কচি কচি চিরোল চিরোল পাতা। শীতে ঝরে বসন্তে ভরে গেছে আবার। বনসিম-আলকুসি-খিরিস-শিরিষের শুকনো ফল জোর হাওয়া লেগে নড়ছে কোথাও নড় নড়।

একটা দুটো পাখি। ভুচুণ্ড করে এ-ঝোপ থেকে বেরিয়ে ও-ঝোপে যাচ্ছে। কোন্ কোনটা বা ঝোপ-ঝাড়ের একটু ওপর দিয়ে উড়েই চলেছে তো উড়েই চলেছে। একটা দুটো পাখি, সিম-ফুচি কী গব্‌রা এতটুকু শরীর নিয়ে এত জোরে জোরে ডাকছে।

ঝুপ করে একটা কাঁকলাশ্ কাছে-পিঠের ঝোপে উঁচু ডালপালা থেকে নিচের ডালপাল্‌হায় নামল। নেমেই ভারি মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে সন্তোষকুম্‌হারের দিকে। মাঝেমাঝে সে মাথা দোলাচ্ছে, ড্যাবা ড্যাবা চোখ অর্ধেক ঢেকে ফেলেছে চোখের চামড়ায় আবার খুলছে।

কাঁ্যকলাসের দৌড় বড়জোর 'বান্না'র মুড়া—

যতই দৌড়াক ঐ বড়জোর বাঁশের এ-মাথা সে-মাথা।— ক্যাঁকলাশ হে, ওহে!

হুঁ, বল্ সন্তোষ।

কার রক্ত খাও যে তোমার চোয়াল অমন ক্ষণেক লাল ক্ষণেক ধবো হচ্ছে?

লোধাপাড়ায় আর কে-ই বা আছে সন্তোষ, এক লোধারা ছাড়া। লোধাদেরই খাই। এখন তুমি এলে, এসো তোমারটাও খাই। মাথাটা যেন এগিয়ে আনল ক্যাঁকলাশটা।

কী মনে করে একটা ঢিল তুলে গিরগিটিটাকে ছুঁড়ে মারল সন্তোষ।

—খালভরার রক্তচোষা!

জঙ্গল তো কী হয়েছে, ঠিক যখন করে ফেলেছি—এখানেই থাকব। এই জঙ্গলে লোধাপাড়ায় লোধাদের সঙ্গে লোধা হয়ে।

বাপ ভৈরবকুম্‌হারের মুখটা এই মুহূর্তেই মনে পড়ল। কী রাগ, কী রাগ—যেন পোআনশালের গন্‌গনে আঁচ। ভয়, ভয়েই পালিয়ে এসেছে সন্তোষ। ভৈরবকুম্‌হারের রাগ তো নয়, চণ্ডাল।

অনেকক্ষণ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে গোঁজ হয়ে বসেছিল সন্তোষ, পায়ের কাছে একঘটি জল পা-ধোয়ার। লোধাবউড়ী-ঝিউড়ীরা তাদের হারানো 'সাব্বি' হারানিধিকে ফিরে পেয়ে কী রকম যেন করছিল। কী যেন বলছিল গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর। —ঘর দ্যাখ্ লো রানী বাহির দ্যাখ্ লো, মুনু ছিলি লো ভালো—

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল সন্তোষ। উঠেই গুড়খালোধার ভুগড়ার আশপাশের লাটা-পাটা ঝুড়তে শুরু করল।

ঝুড়ছ যে?

হঁ-অ।

কী হঁ?

সাফ্-সুতোরো করছি।

করে?

ঘর তুলব।

তুলে?

তুলে আর কী, থাকব।

থাকবে যে, খাবে কী?

কেনে, হাঁড়ি গড়ব কুঁদা গড়ব।

এই জঙ্গলে?

ত কী, নিজের জাত-বেওসাটা ত ছাড়তে পারি না। মাটি আনব, মাটি 'সানব' বাল্লি ত

আছেই—বাঁশতল্লির বড়বালিতলায় সরুবালিতলায়। চাক, চকটবাড়ি সবকিছুই ধীরে ধীরে করে ফেলব। কাঠও ত আছে। খালি যা মাটিটুকু দূরে। তাও যেতে হয় যাব নদীধারে মাটিখানায়—

আর, পুড়াবে কী করে?

কেনে ঐ যে ঐখানে একটা 'পুয়ান' তাড়ব। নিজের জমিদারি দেখানোর ভঙ্গিতে আঙুল উঁচিয়ে সন্তোষকুম্হার জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

তাই দেখে তাই শুনে বেদম হাসতে লাগল লোধাবউড়ীরা। আর—

হাসতে হাসতে বলল, হঁ-অ, লদ্ধাপাড়া হয়ে যাবে কুম্হারপাড়া। আমরাও হাঁড়ি বানাব, হাঁড্ডি পুড়াব। জঙলে কাঠ-পাল্হা ত আছেই। হাঁড্ডি পুড়লে ঠং ঠং করে হাত-বাজাঞে দেখব। তারপর মাথায় করে বেশ হেলতে-দুলতে হাটকে যাব-অ। —হাঁড্ডি লিবে গ, হাঁড্ডি লিবে গ!

আম্হর সুখের আর অবধি থাকবে নাই। হ-অ, তাই থাক-অ জামাই, থাকতে থাকতে আমাদেরও হাঁড্ডি বনাটা শিখাঁই দিও।

মাঝখান থেকে কেউ একজন হাটে হাড়ি ভেঙে দিয়ে বলে উঠল, আর নরসিঙা? কাল যে আমাদেরকে মেরে জঙল থিক্যে খেদ্দাঁই দিচ্ছিল? তার বেলা?

একরোখা, জেদী সন্তোষ বলল, তারবেলা কী আর—

বলেও খানিক থমকে দাঁড়াল সন্তোষ। —তাই তো, হ্যাঁ তাই তো, যে-জঙ্গল থেকে লোধাদের মেরে ধরে তাড়িয়ে দিচ্ছে জঙ্গলবাবুরা, সেই জঙ্গলেই কী না তল্পিতল্পা বৌ-ছানা নিয়ে বসবাস করতে এল সে নিজে? কী পরিমাণ, কোথাকার বোকা সে?

—খেদায় খেদাক, খেদালে, সন্তোষ বলল, না হয় চলে যাব আমাদের দখিনসোলের বিলে, ঐখানেই ঘর তুলব, নরসিঙার ক্ষেমতা থাকে তাড়াক না।

উপস্থিত লোধানীরা মুষড়ে পড়ল। —এল এল, আবার সে ফিরে যাবে নিজেদের জোতে, নিজেদের চৌহদ্দিতে?

গুড়খাশবরের বউ ঢালোর মনে পড়ে গেল—ঐ দখিনসোলের হদহদির বিলে ভৈরবকুম্হারের ডাঙা জমিনের 'হিড়' কেটে সেবার দু'দুটো বড় 'উন্দুর' গুচ্চের চোখ-না-ফোটা ছানাপোনা, আর বেশকিছু উন্দুর-ধান, ধান-টুণ্ড পেয়েছিল সে। তার ছোটবেটা লুম্বু তো সেবার জন্মের আনন্দ পেয়েছিল লাল লাল চোখ-না-ফোটা উন্দুরছানাগুলোকে কাঁচায় কচমচ্ করে খেয়ে ফেলতে।

উন্দুর তো উন্দুর, দখিনসোলের বিলের নাম করতেই জিভে জল এসে গেল ঢালোর, সে মনে মনে বলল—দখিনসোলের বিলের ডাঙা-ডুঙোড়ে সন্তোষনন্দাই ঘর তুলে তো তুলুক না, এই তো মাঝ্ডুব্কার জঙ্গল পেরিয়ে বাঁশতল্লির সরুবালি বড়বালির টাঁড় থেকে বড়জোর এক হাঁকের ভিতর হদহদি-দখিনসোল।

যেখানে বর্ষায় রাতদিন হদ্হদ্ করে জল বয়ে যায় আর সে-জলের আওয়াজ দোরখুলির লোধাপাড়ার হাজার কেলর-বেলরের মধ্যেও স্পষ্ট শোনা যায়।

তা হয়ত শোনা যায়। জঙ্গলের ভিতর সুনসান লোধাপাড়ায় বসে বাইরের ওরকম কত শব্দই তো শোনা যায়।

রাত-ভিত কী আঁধারে-অন্ধকারে কী ফিন-ফোটা জ্যোৎস্নায় গরুর গাড়ির ক্যাঁচ্কোঁচ, হঠাৎ হঠাৎ পাথরে-চাকার মুখপাতে ঘর্ষণে গড়-র-র-র গড়-র-র-র —জঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কাঠচোররা, কিংবা গরুর গাড়ি নিয়ে কাঠ চুরি করতে জঙ্গলে ঢুকছে 'হাটুয়া'রা, কুম্হাররা।

জীপগাড়ির আওয়াজ লোধাপাড়ায় ঝুপড়ির ভিতর শুয়ে থেকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও টের পেয়ে যায় লোধারা। আর যান্ত্রিক আওয়াজ শুনেই লোধাবউড়ী-ঝিউড়ীরা পর্যন্ত বলে দিতে পারে—কোন্টা বক্কার, কোন্টা ডিম্লেশ্বরের, কোন্টা বা হাটুয়াপাড়ার বাঞ্ছার, কোন্টা মোপেটের, কোন্টা রাজদূতের।

কতই তো শব্দ, কত রকমই তো শব্দ। কিন্তু তার সঙ্গে তাদের কী? বনখুকড়া 'বাঙ' দিলে, কোথাও গুঁড়ুরপাখ কী পাঁড়কা-কপ্তি ডেকে উঠলে, এ-ডাল থেকে সে-ডালে হু-উ-প করে হনুমান লাফালে, মহুলগাছের 'খোঁচ' থেকে টুপটুপ করে মহুল পড়লে, এমন কী টিউল-টু-টু টি-উ-ল টু-টু করে সেই অচেনা 'পাখ'টা ডেকে উঠলেও সে-ডাক বড়ই আপনার মনে হয় লোধাদের।

সেসব আওয়াজ লোধাদের ঘরের, সেসব আওয়াজ লোধাদের মনের।

তড়পে উঠে সন্তোষ বলল, জঙ্গল কী নরসিঙার বাপের যে যখন খুশি হুট বলতে খেদাবে? যতসব ছো, জানবে ভয় দেখাচ্ছে—

ভয়, ভয়। কথাটা খুবই মনে ধরল লোধানীদের, অ, তাহলে ভয়-ই দেখাচ্ছে নরসিঙা? তাই শুধু জলের কলসিগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে, ঘর ভাঙে নি? ঘরের রলা-বাতায় হাত পর্যন্ত দেয়নি?

থাক-অ, থাক-অ জামাই লোধাপাড়ায় লোধাদের বল-ভরসা হয়ে, মনে-মনে বলতে বলতে আপাতত সন্তোষ-সাবিত্রীকে ছেড়ে যে যার ঘরে, তারপর যে-যার ধান্দায় বেরিয়ে গেল বনে।

সন্তোষ 'মূঢ়হা' কেটে জঙ্গল সাফা করছে, তার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে গুড়খাও। আজ সে ঘরে কুটুম এসেছে বলে কাজেও যায়নি, বেরোয়নি ধান্দায়।

আজ আর চাল-ডালের অভাব নেই, সিকা-বাহুঁক কাঁধে সন্তোষই তো নিয়ে এসেছে চাল-ডাল আলু-ডিঙ্গলা বেগুন-পুঁইখাড়া, নুন-তেল। নতুন করে সংসার পাতবার তৈজস, মাদুর-মশারি।

ফুঁ-ফুঁ করে ফুঁক-নলিতে আজ একটু বেশি করে উনুনে হাওয়া দিচ্ছে ঢালোলোধানী। আগুনের আঁচে চোখ-মুখ তো উথলে উঠছে। আজ কত-অ-কতদিন বাদে, কতদিন কী, হয়ত এই-ই প্রথম, যেন 'বন-ভুজনি'তে মেতে উঠেছে সে, তারা।

'বন-ভুজনি' লোধারা আর করে কই? তারা তো বনেই থাকে, বনেই খায়। 'বন-ভুজনি' পার্টি বনে এলে তারা বড়জোর, আহা তারা নিজেরা না হোক তাদের ছা-ছানারা 'বন-ভুজনি'র লোকগুলোকে ঘিরে ধরে দাঁড়ায়। খেতে বসে লোকগুলো তাদের দেখামাত্রই 'পাত্'টি ঘুরিয়ে নেয়। তবু তারা আশা ছাড়ে না।

অবশেষে খেতে না দিক, কিংবা খেতে দিয়েও পেটে খিম্চি কেটে লোকগুলো জিজ্ঞাসা করে, কী নাম?

লাইবুকু।

তোর?

সুরুয়া।

তোর?

নেড়ী।

আজ সব তো নিজেরা, সব কিছু তো নিজেদের। কেউ 'পাতে'র সামনে এসে দাঁড়াবে না, 'পাতে'র সামনে এসে দাঁড়ালেও আজ আর কেউ 'পাত'টি ঘুরিয়ে নেবে না।

ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়েছে সাবিত্রী, ছেড়ে দিয়েছে লোধাপাড়ার 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ-সাধের কুটুম'দের সঙ্গে। খেলুক, এমন অঝোরঝর খোলা-মেলা জায়গা তো সে আগে কখনও পায়নি! একটু বেচাল হলেই, নুড়ি কী আর কিছু খেয়ে ফেললে, বুড়হাদাদু তো সর্বক্ষণই হাঁই হাঁই করত, হাঁ কর, কী খেয়ে ফেলেছিস এই রে শালা, দেখি। বার কর! বার কর!

ছেলেটাও এতবড় জঙ্গল এতসব গাছপালা আগে কখনও দেখেনি। সে বড়জোর দেখেছে বড় বড় ধানের গাদা, বিঁড়াগাদা। দেখেছে বিঁড়াগাদার গলি-ঘুঁজি, আলো-ছায়া। সে আলোছায়ায় 'বিলাই' এসে পায়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমায়। ঠ্যাং উঁচিয়ে লাল জিভ বের করে চাটে। কাছে গেলেও পালায় না, বরঞ্চ উল্টে গিয়ে চার পা তুলে গড়াগড়ি খায়।

বিঁড়াগাদার ছায়া-ছাঁয়রায় সার সার শুকোতে থাকে হাঁড়ি। কাঁচা ও 'ঝারা' হাঁড়ি। দেড় বছরের ছেলেটা ছোটো ছোটো হাতের থাপ্পড় মেরে ঝারা হাঁড়িগুলোকে 'গিনতি' করে। গণনা ঠিক হয় না, তো আবার একটু জোরে জোরেই থাপ্পড় মেরে গুণতে থাকে। একটা একটা করে কাঁচা হাঁড়ি হাতের চাপড়ে ভাঙতে থাকে, ভেঙে যায়—

ভৈরবকুম্হার রুদ্রমূর্তিতে দৌড়ে এসে শিশুর কানটি টেনে ধরে বলে, এই রে শালা, লোধার বেটা লোধা—

এখানে কান টেনে ধরার লোকটি নেই, বিঁড়গাদা নেই, ধান নেই, মাটি নেই, কাঁচামাটির 'ঝারা-হাঁড়ি'ও নেই—চারধার যেন অবারিত অবারিত। তাই যেদিকে পারল সে দৌড়ুতে লাগল। তার পিছনে পিছনে লোধাপাড়ার ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুমরা।

তার তো পোশাক-আশাকের অভাব নেই, লাল-নীল কত রঙেরই তো পেন্টুল আছে, জামাও আছে। কিন্তু তার পিছন পিছন দৌড়ে যাওয়া ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুমদের জামাও নেই, পেন্টুলও নেই।

কিন্তু এত বৈষম্যই বা তারা মানবে কেন? তাদের মতো লোধাছেনা হতে গেলে তাকেও তো ন্যাঙটা-ভুটুঙ হতেই হবে। হতেই হবে, হতেই হবে।

অধিক উত্তেজনায় কেউ কেউ তার পেন্টুলটাকে কোমর থেকে তার পিছন থেকে বারেবারেই নামিয়ে দিচ্ছিল। আর সেও তার পেন্টুলটাকে ছোটো ছোটো হাত দিয়ে বারেবারেই টেনে তুলছিল।

একসময় অতি বিরক্তিতে বা বলা যায় অত্যধিক উৎসাহে নিজে নিজেই পেন্টুলটাকে খুলে রাখল। নটে গাছটিও মুড়োলো।

আজ সারাটা দিন খেটে বিকেলের দিকে চারধারে চারটা খুঁটি মাঝখানে তাদের চেয়েও বড় দুটি খুঁটি পুঁতে ঘরের মুর্ধুণ তৈরি করে ফেলল সন্তোষ। এখন বাকি যা রলা-বাতা।

অমানুষিক পরিশ্রম করল সন্তোষ। গায়ে-গতরে সে তো খুব খাটতে পারে, অমানুষিক খেটে গেল সে। এ-কাজে গুড়খাও তাকে সাহায্য করল খুব।

আর আড়-পাগলী সাবিত্রী? সে তো পাড়াময় আজ গাবিয়ে বেড়াল শুধু 'কুম্হার কুম্হার'—

দোরখুলির বুলানের দিকে যেতে ঠুঁটো আসনগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটা পা ভাঁজ করে গাছের গুঁড়িতেই রেখে শতুরাশবরের বউ নিয়তিশবরকে সাবিত্রী বলল, কুঁভারঘরে কাজ কী কম বহুদিদি? উদয়াস্ত খালি কাজ আর কাজ—

বলেই সাবিত্রী দু'হাতে জলে-ধোওয়া-মুখ মোছার মতো গালদুটো মুছে নিল, কপালে

এসে-পড়া উলুরি-ঝুলুরি চুল সযত্নে সরিয়ে নিল। এক ফাঁকে নাদনগাড়িয়ার 'বিটিছানা'ও নিজের গালদুটোয় হাত বুলিয়ে বলল, বিশ্‌কর্মার চাক্ লিয়ে কারবার, কাজ ত থাকবেই মুনু।

হঁ-অ, কাজ বলে কাজ, মাটিখানা থিক্যে এই মাটি আইল, খলায় পড়ল, মাটির ঢেলা ভাঙ্গো রে, মাটির গোঁড়া-ভাঙ্গা বাছো রে, পাথর বাছো রে, তারপর ত খরায় শুকাও, অদামাটি উল্টাও, বালি আনো, বালি চালো, জল দিয়ে ভিজ্‌জাও, 'বত্তর' কর-অ—

আজ কতরকম নতুন নতুন কথা শোনাচ্ছে সাবিত্রী, নাদনগাড়িয়ার 'বিটিছানা' নিয়তি তো বাপের জন্মেও শোনেনি। এই শুনল 'পিঁড়োল'—

'পিঁড়োল' কী লো? আমরা জানি তো 'বিঁড়োল', বিঁড়োলভূত, জলঘটি লিয়ে জলঘাট বসেছি ত ঘুরে ঘুরে আইল, ধুলা উড়াঞে বাও-বাসাত্—

নাই বহুদিদি, উসব নাই, পিঁড়োল গো পিঁড়োল। কুঁভার যে-পাথরটা হাঁড়ির ভিতরে হাতে ধরে 'পিটনা' দিয়ে হাঁড়ি পিটে—ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্!

হাসতে হাসতে নিয়তিশবরও সায় দিল, হঁ-অ, ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্!

তারপর তারা দুজনেই হাসল। তারপরেও সাবিত্রী থামল না, তার কথা এখনো ফুরোয় না, ফুরোচ্ছে না।

এখনো 'আঁথোল' আছে, 'নাতা' আছে। 'চাক' 'চকটবাড়ি' 'চকমকি পাথর' 'ছেউনি'। —বল-অ ত বহুদিদি, 'ভেঁইচা' কী আর 'ঝারা'ই বা কী?

আমি অতশত কী জানি লো সাব্বি? সে তো জানতে পারে এক শিশুবালা, ফুলটুস্‌সি—কুম্‌হারপাড়ায় তাদেরই ত আতা-যাতা বেশি।

শুধু কী কুম্‌হারপাড়ায়, কোথায় না যায় ফুলটুসি, শিশুবালা? কুম্‌হারপাড়ায় হামেশাই যেতে আসতে কত কী শিখে যায় শিখে ফেলে লোধাবউড়ীরা। শিশুবালা, ফুলটুসিরা।

কেউ কেউ তো হলাতে-ঢলাতে আরেকটু এগিয়ে কুম্‌হারদের 'আঁথোলে'ও বসে পড়ে। —দে ভাই টুক্‌চার হাঁড়ি-বনা শিখাই দে।

কুম্ভকার যুবক কী প্রৌঢ় হয়ত লোধানীকে বসিয়ে 'আঁথোল' ছেড়ে এই একটু ঘরে ঢুকেছে দোক্তাপাতা কী একটুকরো সুপারির কুচি নিয়ে আসতে। সে ছেড়ে গিয়েছে 'আঁথোল', তার মানে 'আধার' যেখানে কাঁচা 'ভেঁইচা' রেখে কুম্‌হাররা ঢুপ্ ঢুপ্ করে হাঁড়ি পিটে। আর ছেড়ে গিয়েছে বসবার আসন, ছেঁড়া চট।

কুম্‌হারের সঙ্গে লোধানীর সম্পর্ক সুমধুর হলে তবেই সে সেখানে বসতে পারে, নচেৎ নয়। হারগিজ্ নয়। 'বিশ্‌কর্মা'র আসনে কোথায় কী অকাজ কুকাজ করে আসা লোধানী বসবে কী, —বসতে হয় বসুক সে দশ-বিশ হাত তফাতে। যেমন করে লোধাপুরুষরা বসে, চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে, আর কাঠিখুঁচি দিয়ে হরবখত্ মাটি আঁচড়ায়।

কুম্‌হার, কুম্‌হার। আজ লোধাপাড়ায় এমন একটা হাওয়া তুলে দিয়েছে সাবিত্রী, 'বিঁড়োল বাও', ঘুর্-ঘুরে হাওয়া। ঘুরে-ফিরে তো সেই কুম্‌হার কুম্‌হার।

'কাল যে নরসিঙা এসেছিল লোধাপাড়ায় ঠেঙা নিয়ে, ঠেঙিয়ে 'লোধাজনমানুষ'দের বন থেকে খেদিয়ে দিতে —আজ লোধানীরা সেকথা বেমালুম ভুলে গেল। ভুলে গিয়ে মেতে উঠল সন্তোষ-সাবিত্রীকে নিয়ে, কুম্‌হার-কুম্‌হারিণীকে নিয়ে।

অপরাহ্ণ, বেলা হয়ে গিয়েছে 'আড়', বসন্তের আড়-বেলার রোদ এসে পড়েছে সাবিত্রীর মুখে। তার চোখ-মুখ 'ঝিলকাচ্ছে'। নিয়তিলোধানীর পিঠেও রোদ। সামনের দিকের ছায়ায় সে কতকটা ঢেকে রেখেছে সাবিত্রীকে। আদরে, ছায়া-ছায়ায়।

বলাই বাহুল্য, সাবিত্রী মুখ করে আছে পশ্চিমে আর লোধানী পুবে। একজনের পশ্চাতে

ঠুঁটো আসনগাছ, আরেকজনের পিছনে লোধাপাড়া, তাল্লাট 'তপুবন'। খানিকবাদেই ওদিক দিয়ে আলোর শিষ তুলে বেলা ডুবে যাবে, দিনের ঠাকুর অস্ত যাবে।

তার আগে যতটা পারে আলো শুষে নিয়ে, এক লোধামেয়্যা আরেক লোধাবউড়ীর গুহ্য কথা শুনে ফেলে রসস্থ হয়ে উঠতে চায় ঠুঁটো আসন গাছ। ধারে-কাছে কোথাও একটা 'বিঁড়োল-বাও' উঠেছে। ঘুরে ঘুরে সেটা এখন এদিকেই আসছে।

আচমকা আসনগাছ-সহ সাবিত্রীকে জড়িয়ে ধরে নিয়তি জিজ্ঞাসা করল, হেঁ লো এই করিস ঐ করিস— অষ্টকুট্টি ত কাজ-কামের লিস্টি দিয়ে চলেছিস—আর ঐ কামটা কক্‌খন করিস, বল্‌লি নাই ত?

বলে নাই বলে নাই, এখনও তো আসল কথাটাই সে বলে নাই। আড়-পাগলী সাবিত্রী ঠোঁটে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠল।

নিয়তিলোধানীর দিয়ে যাওয়া ক্রমাগত 'গির্‌গিতি'র চাপে অতিষ্ঠ সাবিত্রী একসময় মুখ খুলল—সে এক রগড়ের কথা বহুদিদি—

আজ থেকে কতদিন আগে 'জলা' মারের সময় রাইবুর উপুড় করে সব মাছ ঢেলে দেওয়ার বিনিময়ে যে বলেছিল, এত্ত দিলে, আমোও কিছু দিব-অ।

কী দিবি? রাইবু অবাক হ'য়ে বলে।

দিব-অ।

ছলকে ছলকে রাইবু নলখাগড়ার বনের ভিতর ঢুকে যায়, দাড়িঅলা বাগদাচিংড়ি দাবড়ে ধরে, পিছু পিছু সাবিত্রীও ঢুকে যায়।

রাইবুর প্রায় কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, টুকচার রাত করে ধ'তলে আস-অ, দি-ব-অ—

কবে থেকে পাকা-ঝিকুটি, আজ সে তো রগড়ের কথা শোনাবেই, এতে আর আশ্চর্য কী? রগড়ের কথাটা এই, কী পরিমাণ যখন-তখন তাকে নিয়ে সন্তোষ মেতে ওঠে—

এত তার ইচ্ছা যে তার সঙ্গে 'যুজতে' পারে না সাবিত্রী। এইটুকু শুনেই নিয়তি বিপুল পুলকিত হয়। সহসা চারধার জরিপ করে দেখে নেয়— পাছে আর কেউ শুনল কী, ওলো চুপ্ চুপ্—

তাতেও দমে না সাবিত্রী, সে বলতে বলতে হাসে, হাসতে হাসতে মরে যায়—তুমাকে কী-ই বলব বহুদিদি—

কথায় কথায় জানা যায়—দিনকে দিন সন্তোষের এই প্রবল ইচ্ছায় তার শরীর এত খারাপ, এত 'হাড়পু' হয়ে গিয়েছিল যে, শেষতক 'ছেনার বাপ'কে যেতে হয়েছিল বাল্‌কার কাছে—লদ্ধাদের যেমন গজনা, কুম্‌হারদের তেমন বাল্‌কা।

হঁ-অ, বাল্‌কা—বাল্‌কা কোব্‌রাজের নাম কে নাই জানে? তল্লাট-কে-তাল্লাট জানে।—নিয়তিশবরও জানে বই কি।

সাবিত্রী বলল, কোবরাজ ত লহে, সাক্ষাৎ ধননতরি, তুমাকে কী বলব বহুদিদি—বাল্‌কার জড়ীবটী খাএেই মরদের শরীর হয়ে গেল দুদিনেই চাঙ্গা, যেই-কে-সেই।

ইচ্ছাটা তার এখনও তেমনই আছে, কমে নাই, তবে দমে ইচ্ছাতেও তার শরীর আর ভাঙে নাই, ভাঙে নাই।

নিয়তিলোধানী গুম হয়ে মনে-মনে ভাবল—রোজ রোজ রোঁয়াঅলা 'বর্‌হম'টা এক 'চাঁখর' একটা ঝুরকার ভিতর দিয়ে এসে নকল শতুরা সেজে তার মধ্যে যে 'কাল বীজ' ফেলে দিয়ে যায়, আর তার শরীর 'সঁস্‌রায়', ভেঙে যায়—এর কী কোনো ওষুধ নেই? বাল্‌কাকে ধরতে হবে, বাল্‌কার 'থানে' একদিন যেতে হবে।

ভাবতে ভাবতে লোধানী থুতনি নিচু করে সাবিত্রীর পায়ে রূপার 'আঙট'টা দেখছে। দেখতে দেখতে বেলাটা 'বুড়ে' গেল।

বেলা শেষ হয়ে গেল, শিষ্-তোলা যেটুকু আলো এখনও ছড়িয়ে আছে শাল-আসন-অর্জুন-কষাফল-কেঁদ-কইম-ভেলা-ভুড়ুরুর মাথায়—সেটুকুও 'নিঝাই' যাবে, আঁধার ঘন হয়ে আসবে লাটা-পাটার গোড়ায়, নিচু থেকে উপরের দিকে ক্রমশঃ অঝোরঝর ভাপ উঠবে, সেঁ-এ-এ-এ-এ, সেঁ-এ-এ-এ-এ-এ—

আলোও নিভে গেল, গেল, দিনের তাপটুকুও জুড়িয়ে এল, জুড়ালো না কেবল লোধাপাড়ায় আজ সকাল থেকে ছড়িয়ে থাকা সেই 'কুম্হার কুম্হার' ভাবটা।

ইকিড়-মিকিড় তারা ফুটল, "একথালা সুপারি গুনতে নারি"—তারা গুনতে গুনতে হয়রান হয়ে গেল শরাবণের মেয়ে চাঁদবদনী, গুড়কুঁদার মেয়ে ভুটকী, বধিরামের মেয়ে গুরুবারি, শতুরার বেটা ফুলেশ্বর, লছুর বেটা বড়কই, গুরভার বেটা হাড়িয়া, সুরুয়া, নাকফুড়রি—

তারা কী আর, তারা তো নয়—সব তো চাঁদেরই ছানাপোনা।—কার ভয়ে রে দিদি, কার ভয়ে এতক্ষণ 'লুকাঁই' রেখেছিল 'ঠ্যাকা' চাপা দিয়ে? যেমন করে মুরগীর কাঁড়াল-কোঁড়ল বাচ্চাগুলোকে, চিয়াগুলোকে, কাক-চিলের ভয়ে ধামাচাপা দিয়ে রাখে গৃহস্থ। চাপা খুলে দিতেই এখন মেঘপাতালময় কিল্‌বিল্‌ করছে, চিকচিক করছে—

কাঁচায় তুলতুল পাকলে সিঁদুর—বল্‌ ত কী বঠে? বল্‌ ত কী? যে নাই বলতে পারে তার বাপ উঁদুর।

বাপ ইঁদুর এত বড় কথা? ভুটকী-গুরুবারির চেয়েও বড় চাঁদবদনী। ছোট থেকেই পাকা সে, তার উপর এখন তো বয়সেও পাকা। আর কদিন বাদেই তো 'ইনায়-বিনায়' কাঁদতে কাঁদতে চলে যাবে শ্বশুরঘর। আজ বিহালা সাবিত্রীকে দেখাঅব্দি তার মনে শ্বশুরঘর চেপে বসেছে। আর 'কুম্হার-কাম্হার'—

বেছে বেছে কুম্হারদের নিয়ে হিঁয়ালিও দিয়েছে সে।

ধাঁধাটা খুব সহজ, 'একথালা সুপারি গুনতে নারি'র চেয়েও সহজ, যে-কেউ বলতে পারে। সবচেয়ে ছোট নাকফুড়রিই হাতে তালি মেরে বলে দিল, কুম্হারঘরের মাটির হাঁড়ি বঠে, হঁ-অ।

তাহলে তার বাপ গুরভা তো ইঁদুর নয়! ইঁদুর নয়! ইঁদুর নয়! ইঁদুর কেন হবে, লোধাপাড়ায় রাইবুর পরেপরেই তো গুরুভা। রাইবুর চোরাই বন্দুকটা চালাতে পারে সে-ও।

নাকফুড়রির বাপ গুরভালোধার ইঁদুর বদনাম মুছল কী মুছল না, চ্যাঙফচ্‌কারা মেতে উঠল—রাবণের সিংদুয়ারের তারা খুঁজতে। যে-দুটো তারা রাবণের সিংদুয়ারে সারারাত পাহারায় থাকে, আর সারারাত ধরে জ্বলজ্বল করে।

কই কঁকা, কই ব?

হুই যে হুই—সবচায় দখিনে দখিনে, দখিনে, নারদা-নিগুইয়ের উদিকে, আ-নেক ধূরে। ধূর বলে ধূর—যোজন যোজন যোজন যোজন—

চাঁদবদ্‌নী বুঝল—লছুর বেটা বড়কই বাকি সারারাত ধরে একটানা 'যোজন-যোজন' বলে গেলেও রাবণের সিংদুয়ারতক পৌঁছুতে পারবে না।—রাবণের সিংদুয়ার সে আ-নেক ধূর।

এরই মধ্যেই গুড়কুঁদার মেয়্যা ভুটকী হিঁয়ালি দিল—

জলপাঁড়কা জলপাঁড়কা
জলের তলে বাসা,
হাড় নাই চাম নাই
'মাস'টা বেড়ে খাসা—

বল্ ত কী? সে এবার দিয়েছে কঠিন হেঁয়ালি, যার 'আগা-মুড়া' নেই, লোধাপাড়ায় তো নেই, কুম্‌হার-কুম্‌হারপাড়ায়ও নেই।

চারধার থেকে বর উঠল—ভেদ্ বল ভুটকী, ভেদ্ বল! দম্মে কঠিন! জলপিপিও নয়, জল-কপ্তির বাসা জলের তলায়, তার আবার হাড়ও নেই, চামড়াও নেই, খালি মাংস, মাছ নয় ত, মাছ?

ভুটকী বলল, বসমতায় নাই, আছে ত আছে খালে-বিলে আছে।

উত্তরটা চাঁদবদ্‌নী জানে, এখানেও কুম্‌হার কুম্‌হার, সে বলল, আর টুক্‌চার ভাব্ বড়কই—কুম্‌হারডুভির দল্‌হায়ও আছে।

কুমারডুভির জলায় ভেদ্ বলায় শুধু বড়কই কেন আরো অনেকেরই মনে পড়ে গেল—জলা মারের খবর। জলা মার হলে বড় বড় 'দাড়ুয়া', চিতল-সোল-গড়ুই, সিঙি যাবতীয় মৎস্য মায় পুঁটি-দাঁড়িকিনি পেট উল্টে মার খায়।

যেখানে কাজলপাতিশাক পুরু ভেলভেটের মতো, তার তলায় সোল-গড়ুই বেশি। আর নল-খাগড়ার দঁকে 'দাড়ুয়া' বেশি। 'দাঁড়ুয়া' তার মানে বাগদা চিংড়ি—এই সেই জলপাঁড়কা, হাড় নেই চামড়াও নেই খালি মাংস।

দাড়ুয়া, দাড়ুয়া। জল-পাঁড়কা, জল-পাঁড়কা।

তেঁতুলবীচি-সেদ্ধ পেট ভরে খেয়ে এসেছে চাঁদবদ্‌নী, তাই সে খুব মউজে আছে। খোসাছাড়া তেঁতুলবীচি জলে পড়লে এমনিতেই সে-বীচি ফুলে ঢোল হয়ে যায়। তার উপর সামান্য নুন দিয়ে জলে সেদ্ধ করলে তো 'অম্রুতো'!

পেটে হাত বুলোতে বুলোতে চাঁদবদ্‌নী ভাবছে—আছা ভালা, পেটে পড়লে তেঁতুড়মুজি কী আরোই ফুল যায়? পেট-তালাই আরোই ভরে যায়? আমার ত পেটগাড়ু ভরে উঠেছে লো!

সে দু'-হাত পেটে রেখে মনে-মন বলছে, নাই হেনে গোবিন্দ, পেট ভরনেই আনন্দ। সোমত্ত মেয়্যা, ঐটুকু গামছায় 'বোস্' ঢাকে না ঠিকমত।

ওদিকে বড়্‌কইটা বড়ই। রাবণের সিংদুয়ারের পাহারাদার দুটো জ্বলজ্বলে তারা খুঁজতে যোজন যোজন পথ, আ-নেক আ-নেক ধূর রাস্তা হেঁটে গেলেও সে চাঁদবদ্‌নীকে ছেড়ে বেশীদূর যেতে পারছে না। আঁধারে-অন্ধকারে চাঁদবদনী ও তার মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমশ ছোট হচ্ছে, ছোট, এই এক বিঘৎ হল, আধ-বিঘৎ, চার আঙুল, দু আঙুল, এক আঙুল—

এক ঝট্‌কায় বড়কইকে ঝেড়ে ফেলে চাঁদবদ্‌নী উঠে দাঁড়াল। রাগ নেই চাড় নেই, বরঞ্চ মুখের ভাবখানা-এমন তো হয়, হয়েই থাকে।

সে অধিকতর উল্লাসে ভুটকী-গুরুবারি, তার চেয়েও ছোটো ছোটো লোধা ছা-ছানাদের ডাক দিয়ে কাছেই আরেক জায়গায় যেতে যেতে বলল, আয় লো ছুঁড়িরা আয়, কইনী বলব।

তার 'কহিনী'তে আজ নির্ঘাৎ কুম্‌হার থাকবে, এম্নি না থাকলেও খুঁজে পেতে কুম্‌হার এনে ঢুকিয়ে দেবে চাঁদবদ্‌নী। কুম্‌হার, কুম্‌হার।

'মাড়ো' আসছে, পাটভক্তা-ঝুলন-অগ্নিপাট-জিভফোঁড়-গয়লাভারের পরব, নেত্-বাঁধার পরব। নুয়াসাহীর বটতলায় সাঁঝ হলেই ভূমিজ পাড়ার ভূমিজরা ডোমেরা মহড়া নাচের 'মহড়া' করে। আজ এই শুরু করল।

ঢোলের আওয়াজ, সেই সঙ্গে 'হরি' বুলান-হদহদি মাঝুডুব্‌কার জঙ্গল ভেদ করে লোধাপাড়ায় ঢুকে আসছে। যতসব বাইরের আওয়াজ, লোধাপাড়ার ছাউ-ছানাদের 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুম'দের খালি খালি উতলা করে মারবে। তাদের আড়াল করতে চাঁদবদ্‌নী তড়িঘড়ি 'কহিনী' শুরু করল—এক রাজা ছিল, রাজার সাত রাণী ছিল, ছিল ত ছিল—এই গুরুবারি , ওলো 'হুঁ' দে।

গুরুবারি 'হুঁকার' দিল জোরেই।

এরপরে যা হয়, রাজার সাত-সাতটা রাণী থেকেও রাজার মনে কোনোরকম সুখ নেই, সোয়াস্তি নেই, রাজার কোনো বেটাবেটী নেই, রাজা তো আঁটকুড়া। সদাসর্বদাই বিরসবদন, আর খালি তো রোদন করে—

কী করে? ছেলেদের দলটা থেকে ইয়ার্কি মেরে বড়কই-ই প্রশ্ন তোলে, বাবা, রাজার চইখেও জল?

রাজাও রোদন করে? মেয়েদের দলটাও নড়ে-চড়ে বসে, হুঁ-অ তাই ত, যে রাজা রাক্ষস মারে খোক্কস মারে—

চাঁদবদ্‌নী ফিস্ ফিস্ করে বলে, তুই চুপ মার খেড়িয়া-কান। লছুর বেটা বড়কইয়ের কানদুটো খরগোসের মতোই লম্বা কী না। তারপর গলার জোর দেখিয়ে বলে, রাজা ত রাজা, বনের হাতি-ঘোড়া পাখ-পাখালিও 'বিনায় বিনায়' রোদন করত।

এখন রোদনের সময় নয়, 'কহিনী'তে এখন এক আচানক সাধুবাবার আসার কথা, না হলে হাতি-ঘোড়াব রোদন করে শোনাতো চাঁদবদ্‌নী।

সে কথা ঘুরিয়ে বলল, মাথায় জট এক সাধু এসে বলল—রাজা তুমার কিসের অত দুখ? সব কিছু শুনে রাজাকে একটা 'আদ্দাশ' দিল সাধু—কাল ঘুম থিক্যে উঠে নাকবরাবর ঈশানে যাও, দেখবে এক গাছে এক বোঁটায় ধরেছে সাত-সাতটা আম। সেই আম এন্যে সাত রাণীকে খাবালেই রাণীদের কড় জুড়ে ছাউ। সাতবেটায় ঘর তুমার আলো হয়ে যাবে নাই? কই লো ভুটকী-গুরুবারি হুঁকার দে!

হুঁ-উ-উ-উ—রব উঠল পাড়া মাৎ করে।

তারপর তো সাত-সতীনের 'নিয়াই' ঝগড়া রেষারেষি। হরে-দবে ঐ এক গল্প—সাতরাণীর মধ্যে ছয়রাণী খায় আম, আর ছোটোরাণী আঁটি চুষে। তবু আর আর রাণীদের সন্তানাদি হয না, কেবল ছোটোরাণীরই কোল আলো করা বেটা-বেটী। ছয়রানী যোগসাজশ করে জীবন্ত ঐ শিশুদুটোকে ফেলে আসে 'কুম্‌হার'দের মাটিখানায় মাটিগাড়ায়। মরুক! মরুক মাটি চাপা পড়ে দম বন্ধ হয়ে! আর শিকার করতে যাওয়া রাজা ফিরে এসে দেখুক—কোথায় যোবরাজ-যোবরাণী, তার বদলে আদরের ছোটোরাণী জনম দিয়েছে কিনা একজোড়া বাটনাবাটা শিলনোড়ার? বড় রাণীরাই তো রাজাকে আহ্বান করে ডেকে এনে দেখায়—এই দেখ-অ রাজা, তোমার বেটা-বেটীর মুখ দেখ-অ!

রাজা ছোটোরাণীর বিছানায় আস্ত দুটো পাথরের নোড়া দেখে ভয়ানক চটে গিয়ে তাড়িয়ে দিল ছোটোরাণীকে, মনের দুঃখে ছোটোরাণী কাঁদতে কাঁদতে চলল বনের ধারে কুঁড়েঘরে, সুয়োরাণী দুয়োরাণীর সেই একই গল্প এখন দোরখুলির লোধাপাড়ায়।

সন্ধ্যেবেলা, রাত এখনও গাঢ়-ই হয়নি, বড়জোর উঠেছে সাঁঝতারা। কালপুরুষা, দধিভারিয়ার খোঁজ এখনও পড়েনি। বন-মুরগা এখনও ডাক দেয়নি তালখুড়ুরুর বনে কী ঘোড়াটাপুর জঙ্গলে কী আরো দূর নারদা-নিগুইয়ের জঙ্গলে।

পেটের ভিতর এখনই গজ্‌গজ্ করে উঠেছে তেঁতুলবীচি, পেট-ভরতির আপার আনন্দে লোধামেয়্যা হাট করে খুলে দিয়েছে তার দোকানদারি—লে ন মার, কইনী শুন্। শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ ঢুলে এলে, হুংকার আসা বন্ধ হয়ে গেলে সে মেয়ে তো হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, ওলো হুঁকার দে লো, হুঁকার দে!

অমনি কচিকাঁচারা 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুমরা', যাদের চোখে ঘুম নেই আর যাদের চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল—তারাও, তারাও, সমস্বরে চিৎকার করে জানান দেয়, না তারা মোটেও ঘুমোয়নি, এই তো হুঁকার দিচ্ছে-হুঁ-উ-উ-উ-উ-উ-উ—

ওদিকে এতক্ষণে 'কহিনী'তে এসে পড়েছে 'কুম্হার কুম্হার'—ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীর মতো দুজন আটকুঁড়া কুম্হার মাগ-মরদ মাটিখানায় এসেছে মাটি ভরতে। মাটি তো নয়, মাটির পুতুলও নয়, মাটি ভরতে এসে তারা কুড়িয়ে পেয়েছে দুটো টুকটুকে মানুষছানা। একটা 'মেয়্যা', একটা 'ছেইল্যা' মানুষ। তারপর থেকে তো 'কুম্হারঘরে' সুখে দুখে বড় হতে থাকে রাজার বেটা-বেটী, কুম্হার বাপ-মায়ের 'কুড়হাঁয়' পাওয়া ছা-ছানা।

তাবলে রাজার বেটাবেটীর বায়না তো কম নয়, রক্তের গুণ আর যাবে কোথায়? হাতি চাই, ঘোড়া চাই। চাই তো চাই, এক্ষুনি চাই। কিন্তু কুম্হার বাপে-মায়ে জ্যান্ত হাতি-ঘোড়া পাবে কোথায়? আন্ মাটি শান্ মাটি—দিই তো দিই, মাটির হাতি-ঘোড়া দিই।

সেই মাটির হাতি-ঘোড়াকেই রাজার বেটা-বেটী দানাপানি দেয়, হাতির হাওদায় চড়ে ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যায়। ছুটতে ছুটতে 'জল-শশ্' পেলে রাজার পুকুরে এনে হাতি-ঘোড়াকে 'পানি-পিয়ায়'—রাজার গাড়িয়ায় হাতি পানি পিও পিও! রাজার গাড়িয়ায় ঘোড়া পানি পিও পিও!

ভুটকী, গুরুবারি! কই লো ছুঁড়িরা, শুনছিস ত? হুঁকার দে!

—হুঁ-উ-উ-উ-উ-উ-উ—

কুচো-কাঁচা ন্যাঙটা-ভুটুঙ শ্রোতাদের ভিতর এসময় কেউ একজন, যেন এতক্ষণ তার মনে পড়েনি এই মাত্র মনে পড়ল, সে দুহাত তুলে বলে দিল, জানি জানি, ই কহিনীটা ত জানি—

মরার পরে ছানাদুটো গাছের ফুল হঞে ফুটে থাকবে আর রাজার বাগাল ফুল তুলতে আইলে ছোটোফুলটা রোদন করবে—

রাজার বাগাল আইছেন দাদা
ফুল দিব-অ ন নাই দিব-অ রে?

তখন বড়ফুলটা মানা করে বলে উঠবে—

নাই নাই বহিন, ফুল নাই দিয় গ বহিন
সরগে ডাল লাট্টাও বহিন—

তারপরেও, তারপরেও তড়বড় করে বলে যাচ্ছিল কুচো-কাঁচা, ন্যাঙটা-ভুটুঙ, তাকে থামিয়ে দিল চাঁদবদ্নী, থাম না মড়ি, অত্ত হড়বড়াস্ নাই!

আরো, আরো একটু রাত করে ঝুপ্ ঝুপ্ লোধারা বাড়ি ফিরল, বিশেষত পুরুষ লোধারা।

ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করেছে কী না-করেছে, গল্পের নটেগাছটা মুড়িয়েছে কী না মুড়িয়েছে—টর্চের আলোয় হ্যারিকেনের আলোয় হ্যাজাকের আলোয় দোরখুলি মাঝুড়ুবকার অন্তর্বর্তী বনপথ মানুষঝোড় আলোয় আলোময় হয়ে আসছে।

খাওয়া ফেলে, আঁচিয়েছে কী আঁচায়নি, সঁকড়ি হাতেই লোধাপুরুষরা ফের জঙ্গলে, যে-যার 'গুপন' ডেরায় নিরাপদ আস্তানায়—

রাতের জীবরা যারা বেরিয়েছিল খাবারের ধান্দায়, বিশেষত ভুঁড়া-শিয়ালরা, তারা সব হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে অবাক-আশ্চর্য হয়ে খানিক থম্ মেরে আবার দৌড়ুতে শুরু করল ল্যাজ তুলে ঊর্ধশ্বাসে।

রাত-পাখিরাও উড়তে শুরু করল ঝপ্‌ঝপ্, এদিক সেদিক, দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে। রাতের 'লতা'ও যারা চলেছিল খাবারের সন্ধানে ব্যাঙ-চ্যাঙ খেতে, তারাও, তারাও আলোর সামনে পড়ে থমকে মুখের দিকটা কিঞ্চিত কুঞ্চিত আঁকাবাঁকা করে ফের বিপুল গতিতে সল্‌সল্ দৌড়ুতে শুরু করল।

কী হল আবার এতদিন বাদে? অঝোরঝর অন্ধকারে আলোর এত ঝলসানি কেন? কে এল, কে এল? কাঠ-চোরেরা? তারা তো আসেই, এল যদি তো এদিকে কেন? তারা তো যাবে তপোবনের জঙ্গলে, আরো দূর নারদা-নিশুইয়ের শাল-আসন-ধ-পিয়ালশাল-কেঁদ-কইম-গামহার-বহড়ার আরো গভীর অরণ্যে?

তবে কী পুলিশ? থানার দারগাবাবু, জমাদারবাবুরা? কই, এই কদিন আগে-পিছে কোথাও, কোথাও—কী বাহাদুরপুর, আন্ধারী, লব্‌কেশরপুর, হাতিবান্ধী, কাঠুয়াপাল, নেপুরা, বহড়াদাঁড়ি কী রগড়ায়, পাতিনা, তালডাঙরায়—কোথাও, কোথাও তো চুরি-ডাকাতির কোনো 'খব্বর' নাই!

আর কে থাকল, তাহলে কী নরসিঙা? নরসিঙা আর তার দলবল, তারা আসে যদি তো দিনমানে দিনমানে, লোধাপাড়ায় 'ঘর-দোর' ভাঙতে—রাতভিত কেন? রাতেও আসে, আসতে পারে, তবে সে তো বনে-জঙ্গলে, কাঠচুরির অকুস্থলে, বামালসহ হাতে-নাতে ধরে ফেলতে।

আহা, লোধাপাড়া কী আর জঙলের বাইরে? বাহির বঠে? তা লয়, দ্যাক রাব্বু, তৈলকবাবু কী না—টিপা-লাইট লিয়ে আসছে জঙলে 'খেড়িয়া' মারতে?

আলোর লাইনটা, দু-সেল তিন-সেল টিপা-লাইটের অঝোরঝর ফোকাসটা, ভুষোপড়া হেরিকেনের হ্যাজাক-লাইটের অকুতোভয় আলোটা ভুঁড়া-শিয়ালদের অবাক-আশ্চর্য করে দিয়ে লোধাপাড়ায় ঢুকে এল।

শুধু কী লোধাপাড়ায় ঢুকল, লোধাপাড়ায় ঢুকে একেবারে সোজা গুড়খালোধার ভুগড়ার দিকে এগিয়ে চলল। ক্রমশ আলোয় আলোময় হয়ে উঠছে গুড়খা-ঢালোদের ঘর উঠোন।

আলো যতই সরে সরে যায়, সামনে সবকিছুই পরিষ্কার। পরিষ্কার, পরিষ্কার। ঐ তো গুড়খার ভুগড়া, পড়াশঝাঁটির উপর মাটি 'থুপা', মাটি থেপে থেপে দেয়াল। দেয়ালের ফাটলটুকুও এখন পরিষ্কার।

ঐ তো সন্তোষলোধার, থুড়ি সন্তোষকুম্‌হারের নবনির্মিত ভুগ্‌ড়ার হাড়-পাঁজরা। চারধারে চারটা খুঁটি, মাঝখানে ততোধিক উঁচু দু-দুটো মূর্ধুণ। একটা 'রাতচরা' মূর্ধুণে বসে 'চঁচ্‌রাঁয় ঠোঁট-মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ আলোর ঝল্‌সানিতে থতমত খেয়ে সে পড়ে যাচ্ছিল দুম্ করে।

পড়ল না, রাতের 'পাখ' ডানা ভদ্‌ভদিয়ে উড়ে গেল আরো রাতের দিকে।

চাঁদবদ্‌নীদের 'কহিনী' থেমে গিয়েছে ঠিক ঐখানটায়, ঐ যে—

আপনার মায়ে আইছ্নে দাদা
আপনার বাবায় আইছ্নে দাদা
ফুল দিব-অ ন নাই দিব-অ রে?
—নাই নাই বহিন, স্বরগে ডাল উঠ্‌ঠাও বহিন—

গুড়খা নেই, সে তো ভেগেছে আর আর লোধাদের সঙ্গে জঙ্গলে, লাটা-পাটার আড়ালে। একলা ঘরে ঢালো, উঁ-হুঁ, একলা কী আর—সন্তোষ-সাবিত্রী তো আছে!

আঁধার ঘরে গাঁদার-গুঁদুর—ভৈরবকুম্‌হার হিড়হিড় করে টেনে এনে ছেলের ঘাড় ধরে একটা কিল মারল। আর কোনো কথা নেই।

কথা নেই, কথা নেই। ঘুমন্ত নাতিকে কোলে তুলে ফের কুমহারপাড়ার দিকে হন্ হন্ করে হেঁটে চলল ভৈরবকুম্‌হার।

পিছনে, আরো পিছনে সন্তোষ, সাবিত্রী।

যেতে যেতে একবারের জন্যও পিছন ফিরে দেখল না সন্তোষ। কিন্তু সাবিত্রী পিছন ফিরে বার বার দেখছে, আর গর্বে তার বুক ফুলে উঠছে—

দেখুক, তামাম লোধাপাড়া দেখুক। তার কত খাতির। একটা রাতও কাটল না, তার শ্বশুর ভৈরবকুম্‌হার নিজে এল বেটার 'বহু'কে নিয়ে যেতে!

আলোটা, আলোগুলো ফিরে যেতে যেতে , আলোর রেখাটা রেখাগুলো মিলিয়ে যেতে যেতে একসময় মিলিয়েই গেল।

দ্বিগুন তিনগুন অন্ধকারে লাটা-পাটার ভিতর থেকে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ বেরুতে গিয়ে এর-তার মাথার সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে যেতেই লোধারা স্বগতোক্তি করল, লে বাবা! ই ত বেশ রগড় হৈল!



ঘুমোচ্ছে। সমগ্র লোধাপাড়াটা ঘুমোচ্ছে। লাটাপাটা ডুব্‌কাডুংরি বনজঙ্গলের গাছপালাগুলোও জেগে নেই। ঘুমোচ্ছে।

ঘুম নেই শুধু চাঁদবদ্‌নী-ভুটকী-গুরুবারিদের। রাত জাগছে চাঁদবদ্‌নী, রাত জাগছে ভুটকী-গুরুবারিরা।

যে-যার ঠেকা-পাছিয়া মাথা-সিথানে রাখা। কেউ কেউ উপুড় করা ঐ ঠেকা-পাছিয়াতেই মাথা রেখে কোনমতে ঘুমোচ্ছে। ঘুম কী আর—ঐ ঘুমঘুম।

একবার তো ভুটকী ধাকাল দিয়ে ডেকে তুলল চাঁদবদ্‌নীকে।—ওলো উঠ্‌ লো উঠ্‌! রাত যে কাবার হয়ে আইল। আর কত্‌ক্ষণে যাবি? তত্‌ক্ষণে সব তে৷ সাবাড় হয়ে যাবে।

ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠেছিল চাঁদবদ্‌নী।—হঁ তাই ত। কী কালঘুমে ধরল আমাকে! চ, খরো খরো চ।

বেশবাসের ঠিক নেই, হড়বড়িয়ে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল চাঁদবদ্‌নী।

ঠেকা-পাছিয়া কাঁখে আঙনায় এসে চোখ রগড়ে দেখল—ও হরি রাত যে এখনও সাঁই সাঁই করছে! রি-রি-আঁ পোকা এখনও একটানা করে চলেছে রিঁ-ই-ই-ই রিঁ-ই-ই-ই। তার মানে তো গভীর রাত, অঝোরঝর রাত?

হ্যাৎ করে ফের ঘরের ভিতর ভুটকীকে টেনে এনেছিল চাঁদবদ্‌নী।—এখনও অঝোরঝর রাত আর তুই মুখপুড়ি কী না উট্‌ঠে পড়লি? দ্যাক্‌ ন মার, পোহা-তারা কী ফুটেছে?

না, পোহাতারা এখনও ফোটেনি। সাঁঝতারা রাবণরাজার সিংদুয়ারের তারা সাতভায়া দধিভারিয়া খইফোটার মতো রদোবদো করে ফুটে উঠল আর কখন কোন্‌দিকে কোথায়—খান্দারপাড়ার মাথায় কী নদীজলে, বিরিবাড়িয়ার ঝাঁকড়া তেঁতুলতলার লাটা-পাটায়, চঁদরপুর-থুরিয়ার ওদিকে 'মহিষাসুর দঁকের' মধ্যে ঝুপ ঝুম ঝরে পড়ল! একটা দুটা করে 'পাপীতারা' তো ঝরে পড়ছে আকচ্ছার—এই একটা পড়ল বুলান-হদহদির ডাঙাবিলে তো ঐ আরেকটা পড়ল তপোবনের হিলহিলে জোড়াশালের মগডালে। কেমন ধারা ল্যাজটুকুন খসে খসে পড়ে!

. পাপীতারা পাপীতারা।

পাপীতারা দেখতে নেই, দেখলেই পাপ। তবু তো ঢুলু ঢুলু চোখে ঠিক পড়ে যায়। তখন কী আর করার থাকে? বড়জার কঁড়ে আঙুল দাঁতে কামড়ে বুকে থুতু ছেটোও, থুতু ছেটোও আর মুখে বল ছিছি পাপীতারা"! বললে পাপ কেটে যাবে, পাপ আর লাগবে না।

ঘুমচোখে ফের জড়াজড়ি করে ভুগড়ার ভিতর ঢুকে আসে ভুটকী, চাঁদবদ্‌নী।

ওলো, এত রাইতে যাস যদি—আর ধরে যদি কালপুর্‌ষা?

হঁ-অ কাল্‌পুর্‌ষা—

প্রথমে কেমন যেন থেমে গিয়েছিল ভুটকী। তারপরই ভয় কাটিয়ে বলে উঠল, হঁ কালপুরষার খাঁইদাঁই আর কাম নাই—সে কী না তোকে বাদ দিয়ে আমাকে ধরবে?

একথায় চমকে উঠল চাঁদবদ্‌নীও। বস্তুত কী বয়সে কী শরীরে কী চিকন-চাকনে সে ভুটকীর চেয়ে বড়, ভুটকীর চাইতেও দামী। ঝট্ করে তার মনে পড়ে গেল সাঁঝরাতের কথা। ধীরে ধীরে একটা হাত তো গুঁড়িগুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছিল তার দিকে, তার দিকেই।

কে জানে কাল্‌পুরষার হাত আরোও কত বড়! একবার ধরলে আর কী ছেড়ে দেবে তাকে? কখন মাছি হয়ে পোকামাকড় হয়ে সে যে ঢুকে আসবে ঘরের ভিতর! কখন ঘুমের ঘোরে ভোগ করে যাবে তাকে! কালবীজ ঢেলে দেবে তার অন্তরে!

জানতেও পারবে না সে, ধরতেও পারবে না সে।

বনে-জঙ্গলে রাস্তায়-ঘাটে সে তো অন্যকথা, অন্যজীবন। ধর্মের রাস্তায় হাঁটলে চললে কাল্‌পুর্‌ষার সাধ্য কী চেপে ধরে তাকে? 'জাঁকামাড়া' করে তার সঙ্গে? সেসব হয় তখন, যখন সে ধর্মের রাস্তা ছেড়ে বেপথু হয়, 'ভিনু পথে' হাঁটে।

সাঁই সাঁই রাত হলে কী হবে, ঘুম কী আর আসে? আসে না, আসে না। এখন তো ঘর-বাহির করা—কখন পোহাতারা ওঠে, 'ভুরখা ইপিল' উঠবে আর কখন—তাই শুধু দেখা অপেক্ষা আর অপেক্ষা।

ঘুমের চট্‌কা ভেঙে গেলে শোনা যায় রাতচরার ডাক। হুঁড়ার, ল্যাকড়া আর কোথায়! বনবরা, ভালুও আর নেই। আছে বড়জোর একটা-দুটো ঝিঁকর আর কতক খেড়িয়া-ভাম-শিয়াল।

আর আছে বনমোরগ, বনখুকড়া। তাও ধারে কাছে কী আর—মাঝুডুবকা-সুখজুড়ির জঙ্গ ল ছাড়িয়ে নারদা-নিগুইয়ের ওদিকে।

ডানা গুটিয়ে আঁটারি-চুরচুর ঝোপঝাড়ে, কখন বা ভাম-শিয়ালের হাত থেকে বাঁচতে উঁচু মগ-ডালে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী মনে করে যে ডেকে ওঠে! আর সে-ডাক লোধামেয়্যাকে সচকিত করে দেয়।

ঘুমের চট্‌কা ভেঙে ফের সে ভাবে—এই বুঝি হয়ে গেল ভোর, ফর্সা ফৈ-ফিকির। তবে কী দেরি করে ফেলল সে? আর ও বুঝি চলে গেল আগে? তাহলে? যা লম্বা হাত ওর, আক্‌খুটি ঐ তো কুড়িয়ে নেবে আগে-ভাগে সব! তার ভাগ্যে আর কী থাকবে? আর কী থাকল? মনে মনে নয় বেশ জোরে জোরেই সে গালি দেয়, 'খালভরি!' 'বারোভাতারি!' 'খালভরি!' 'বারোভাতারি!'

গালি দিতে দিতে ঝট্‌কা মেরে সে উঠে দাঁড়ায়, 'আড়িশ্‌' ভাঙে, ঘুম চোখে বাইরে এসে চোখ কচ্‌লে সে খোঁজে, কই কই, 'পুহা-তারা' কই? ভুরখা-ইপিল?

লোধাপাড়ায় এখন তারা খোঁজার রাত। যে সে তারা তো নয় শুকতারা রাতপোহাতি তারা ভুরখা-ইপিল—

ভুরখা-ইপিল, ভুরখা-ইপিল।

শুধু কী ভুটকী-চাঁদবদ্‌নী-গুরুবারিরা, বয়স্ক লোধাবুড়ি-বউড়ীরাও রাত জাগে, জেগে জেগে ঘুমোয়, ঘুমোতে ঘুমোতে জেগে ওঠে।

তারাও দেখে, তারা খোঁজে। তারাও মনে-মনে ভাবে—রাত কী হয়ে গেল ভোর? খুব কী দেরি করে ফেলল সে?

বাইরে এসে দেখেশুনে আশ্বস্ত হয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোয় কী আর, ঝিমোয়।

লোধাপাড়ায় এখন রাত জাগার রাত। উৎসব, উৎসব। কে কতক্ষণ আগে জাগে, কে জাগতে জাগতে রাত ভোর করে দেয়, কে রাত থাকতে থাকতে যেতে পারে। কে বেশি জাগে, কে কম। আজ কার জিৎ কার হার। কে ঘুমের ঘোরে সব কিছুই 'পাস্‌রে' গেল, হায়!

এই তো কটা দিন সময় সু-কাল।

রাত যত গাঢ় হবে, পাতলা কুয়াশার চাদর যত জড়িয়ে ধরবে গাছগুলোকে, কাঁকর পড়ে পড়ে যত ভিজবে, তারপর রাত যত গাঢ় থেকে পাতলা হবে, ভারি হয়ে যতই পড়বে টস্‌টসে জল, ততই বোঁটা আলগা হয়ে খোঁচ থেকে 'মহুল' পড়বে, পড়ে পড়ে গাছতলা ধবোয় ধবো হয়ে যাবে।

আকালের 'মহুল-সিজা' তেঁতুল-মুজি' দিয়ে—সে তো এক কথায় 'অম্রুতো'! অম্রুতো, অম্রুতো।

ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদ্‌নীদের চোখে তো ঘুম নেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তারা রাত জাগছে। উসুর-ফুসুর করছে বড়রাও। বড়রাও।

কে আগে যায়, কে ক'পাছিয়া বেশি কুড়োয়—তাই নিয়ে জোর 'কম্‌পিটিশান'। তার উপর কুম্‌হার-কাম্‌হার, সান্তাল, ভুঁইয়া-ভূমিজদের বউড়ী-ঝিউড়ীরাও তো হাত গুটিয়ে বসে নেই।

কোথায় কোথায় আছে মহুল-কচড়ার গাছ—চাঁদবদনী ভুটকীদের সব যেন মুখস্থ! আর কার বা তা না-জানা আছে? তবে কুম্‌হার-কাম্‌হার ভুঁইয়া-ভূমিজঘরের মেয়েদের হাত অতদূর যেতে পারে না। কিন্তু সাঁওতাল ঘরের ঝিউড়ী-বউড়ীদেরও একধার্‌সে সব গাছপাল্‌হা যেন মুখস্থ!

মহুল-কচড়াও যেন সোনার ফসল।

কাঁচা মহুল কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খাও, কষা কষা খেতেও বেশ। কাঁচা মহুলের রস গুড় করে খাও—আগুনের জ্বালে জ্বাল দিয়ে রস ফুটিয়ে বুগ-বুগ করে।

কাঁচা মহুল কুড়িয়ে রোদে শুকাও, চটের উপর বিছিয়ে রোদে মেলে দাও। শুকনো মহুল বস্তায় 'আঁটার' করো—পাইকাররা হামলে পড়ে ঘরের 'ছামু' থেকে নিয়ে যাবে হাসতে হাসতে।

আর কতক রেখে দাও আকালের দরুন আকালের জন্য। অভাবের দিনে তেঁতুলবীচিসহ শুকনো মহুলসিদ্ধ—কোন্‌টা তেতুঁলবীচি আর কোন্‌টা মহুল চোখের দেখ্‌তা চেনা-ই দায়! আর তার স্বাদ তো—'অম্রুতো' 'অম্রুতো'—

মহুল থেকে মহুলের মদ তো আছেই, তার ওপর কচড়া—

ডাঁটো কচড়া রেঁধে খাও তরকারি করে। কষা কষা, খেতেও তো মন্দ না। তার ওপর পাকা কচড়া, অম্লমধুর—আঁটি বাদ দিয়ে শাঁসটুকু চুষে চুষে খাও। ঐ দিয়েই তো একবেলার আহার।

এরপর তো কচড়ার আঁটি নিয়ে পড়া। আঁটি আলাদা করো রে, কচড়ার 'মাস' আলাদা করো রে। 'মুজি'গুলো রোদে শুকোও রে, ফের জলে ভিজাও রে, পচাও রে।

পচা জলের হাঁড়ি থেকে কচড়ার বীজ নিয়ে শিলনোড়ায় থেঁতলে বীজের ভিতরের শাঁসটুকু অক্ষত অবস্থায় বের করে নেওয়া ভবিষ্যৎ ভালো 'কচড়া তেলের' জন্য—কচড়ার দিনে এ-তল্লাটে এসব তো চেনা চিত্র।

রিন্‌ঠিন্ করে হাতের চুড়ি বাজছে, অবশ্য চুড়ি থাকে যদি তো, আর ঠুক্ ঠুক্ করে শিলনোড়ায় আওয়াজ উঠছে, আর তারপর দু'হাতের দ্রুত পরিচালনায় কচড়া বীজের খোসা শাঁস আলাদা হচ্ছে....আলাদা হচ্ছে...

আর সে-খোসার বর্ণ কী জেল্লা কী! তেল যেন ঠিকরে পড়ছে। এককেটা খোসা মনোমত কাটা হলে, জুত্‌সই হয়ে গেলে, পাশে বসা ছেম্‌ড়িরা ছোঁ মেরে হাতিয়ে নিচ্ছে, আর তারপর আঙুলে গলিয়ে আঙুট-আঙুটি করছে।

শুধু কী লোধাপাড়ায় লোধাবউড়ীরা লোধাঝিউড়ীরা, কচ্‌ড়ার দিনে কাম্‌হার-কুম্‌হার-মাহাতো-ভুঁইয়া-ভূমিজপাড়ায়ও প্রায় ঘর-ঘর বউড়ীরা পচা-জলের হাঁড়িতে হাত চোবাচ্ছে, শিলনোড়ায় থেঁত্‌লাচ্ছে, আর তারপর মনোমত খোসা পেলে আঙুটি করে নিজেরই আঙুলে গলিয়ে তৈলাক্ত স্মৃতি-বিজড়িত খোসা-আঙুটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হাতের কাজ কাম থামিয়ে কত কী ভাবছে, ভাবছে—

ভাবছে....সেই যে সেই অঞ্জলির বিয়ের দিন 'বরযাত্র'দের সঙ্গে এসেছিল একটা ছেলে সেই কোন্‌ দূরদেশ কেঁওঝর্‌ মুলুক থেকে, সে আমার গলায় শাঁখ-পুঁতির মালা দেখে বলেছিল, ব্বাস রে শঙ্খের মালা! তুমে কী শঙ্খবালা? আমি মুঠো থেকে একটা একটা খই ফেলে দিচ্ছিলাম তার মুখে, আর সে হাঁ করে বড় সুখে খাচ্ছিল, তার সঙ্গেই তো আমার বিবাহ হবার কথা ছিল, তবে সে 'যুবাকালে' আমার কাছে আর এল না কেন? 'তুমে আসিলে না কাঁহি কি?' তার সঙ্গে বিবাহ হলে কত ক-ত-অ যে সুখ হত! এ-বিয়েটা তেমন জুতের হল না, সেই তারসঙ্গে বিবাহ হলে আজ এমন করে কচড়া-পচা জলে হাত চুবিয়ে শিলনোড়ায় কচড়া না 'ছেঁচে' হাতের বুড়া আঙুলটা 'ছেঁচা' পড়ত না—উঃ মা গো!

হয়ত কখন অসাবধানে অন্যমনস্কতায় বধূটি—

শুকতারা উঠেছে। উঠে জ্বলজ্বল করছে।

ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীরা দৌড়ুচ্ছে। দৌড়ুচ্ছে ঝড়ের বেগে। উঁহু, ঝড়ের বেগে কী আর, চাঁদবদ্‌নী দশ পা দৌড়ুচ্ছে তো এক পা থমকে থেমে থাকছে।

ভাবছে—খুব কী দেরি হয়ে গের তার? নাকি অনেকটা আগেভাগেই বেরিয়ে পড়ল তারা? কেমন যেন 'আন্‌কা' 'আন্‌কা'!

নচেৎ লোধাবউড়ী-ঝিউড়ীদের কাছে বনের পথঘাট কী আঁধারে-অন্ধকারে আলোয় জোৎস্নায় তো জল-ভাত। মুখস্থ, মুখস্থ।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তারা ধর্মের রাস্তায় হাঁটে, গাড়ায়-গর্তে ভুলেও তাদের পা পাড়ে না। আজ যেন 'আন্‌সাট্‌কা' আঁদালে-কাঁদালে পা পড়ে যাচ্ছে চাঁদবদ্‌নীর।

আর সে নিমেষে নিমেষে পিছন থেকে খামছে ধরছে ভুটকীকে। আচমকা পিছুটানে ভুটকীও থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলছে, কী লো?

চাঁদবদ্‌নী হাত নেড়ে বলছে, না কিছু না। মনে-মনে বলছে, কালপুরুষা। বর্‌হুম বর্‌হুম। কুলবুদা-কেঁদবুদা-বেনাবুদা, কয়েতবেলের গাছ, বেলতলা-খিরিসতলা, আঁটারি-চুরচুর লাটাপাটা, ডুর্‌কা ডুংরি, ঐ দূরের বাঁশঝাড়—সবই তো চেনাজানা, বড়ো আপনার আপনার। তবু যেন আজ 'আন্‌কা' 'আন্‌কা'—

সুরথ-ত্রিলোচনদের বাঁশঝাড়টা কী উড়ে এসে জুড়ে বসল 'ছামু'তে? হাত বাড়ালেই যেন চাঁদবদ্‌নী ধরতে পেরে যাবে বাঁশপাতা। কুলবুদাটা লোধাপাড়া থেকে মাঝুডুব্‌কার ওদিকে যেতে বাঁয়ে পড়বে না 'ডাহিনে'?

কয়েতবেলের গাছটা, আঁটারি-চুরচুর লাটা-পাটা চোখ-দেখ্‌তা এদিক থেকে ওদিকে সরে গেল। ফের নিমেষে ভুটকীকে খামচে ধরল চাঁদবদ্‌নী।

ছুটন্ত ভুটকী থমকে থেমে ফের ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কী লো?

না, কিছু না। আস্তে চ, অত্ত হড়বড়াস্ নাই। মুখে বললেও চাঁদবদ্‌নী মনে-মন বলল কাল্‌পুর্‌ষা!

ভুটকীর মনে নেই, সে ভুলেই গিয়েছে। কিন্তু চাঁদবদ্‌নী কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ সেই তো ভুটকীকে ভয় দেখিয়েছিল ঐ বলে, ধরে যদি কাল্‌পুর্‌ষা?

কাল্‌পুরুষাকে ভুটকী ঠেলে দিয়েছিল চাঁদবদ্‌নীর দিকেই।-কালপুরুষার খাঁইদাঁই আর কাম নাই—সে কী না তোকে বাদ দিয়ে আমাকে ধরবে?

হেঁ অই ত, ঠিকেই ত।

চাঁদবদ্‌নী দৌড়ুনোর গতি কমিয়ে আনে। এখন সে কী করবে, কোন্‌দিকে যাবে—তপোবনের ওদিকে না মাঝুড়ুব্‌কা-দখিনসোল-হদহদির এদিকে? কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছে না সে, এই ভাবল একরকম তো ঐ হয়ে গেল আরেক রকম, তবে কী 'কেরম কেরমে' কাল্‌পুরুষায় ধরে ফেলছে তাকে? যখন ধরে সে কী এমনি করেই ধরে?

চিনিবাসকুম্‌হারের গাড়িয়ার ভূতও নাকি পায়ে শিকল বেঁধে এম্নি করেই একটু একটু টানে! গাড়িয়ায় সিনানে গেছ, তো কখন কোন্ ফাঁকে ডুব্ গালতে পায়ে জড়ালো এই এতটুকুন একটুকরা ঝাঁজি-শ্যাওলা।

ওরকম তো কত কিছুই জড়ায়—নোংরা-জব্‌রা কাঠি-খুঁচি পাঁক-পাঁকাল। কে আর অত গ্রাহ্য করে? তেমন অস্বস্তি হলে পা-টা একটু ঝেড়ে নেয়, যা-ঝরার তৎক্ষণাৎ ঝরে যায়। কিন্তু যা ঝরার নয়—

এক 'টুকচার' ঝাঁজি একটুকরা চুল কী পচাসূতা রয়ে গেল পায়ের এক আঙুল কী দু আঙুলকে বেড় দিয়ে, কোনমতে জড়িয়ে-মড়িয়ে সঙ্গোপনে। দিনমানে সে ঝাঁজি চুল কী পচাসূতা, কিন্তু রাত যত বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে, চুল-ঝাঁজি কী পচাসুতাও তত এঁটে বসতে থাকে আঙুল ছেড়ে পায়ে, পা ছেড়ে কোমরে।

তারপর টান, 'কেরমে কেরমে' 'টুকু টুকু' করে। কে টানছে কোত্থেকে টানছে—হুঁশ নেই দিক্-দিশা নেই। মনের ভরমে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তুমি হেঁটে চলেছ, হেঁটে চলেছ, মনে সাড় নেই দেহেও জোর নেই যে এক হ্যাঁচকায় পড়্ পড়্ করে ছিঁড়ে ফেলবে সে-শিকলি, সে-টান।

যে-সে শিকলি তো নয়, কাম্‌হারের কাম্‌হার রাজা কাম্‌হারের হাতে-গড়া মন্তর-পড়া ঝিঁজরি। নাকি মাঝুরাতে চিনিবাসকুম্‌হারের গাড়িয়ার ভূত এসে কাম্‌হারশালে বসে থেকে গড়িয়ে নিয়ে যায়, জনমান্নিও জানতে পারে না, কাম্‌হারের কাম্‌হার রাজা কাম্‌হারের পরিবার পর্যন্তও না।

সের'ম টান সের'ম ঝিঁজরি কী কাল্‌পুরুষারও আছে? কোন্ অদৃশ্য গাছপাল্‌হা লাটা-পাটার আড়াল থেকে সে কী কল-কাঠি নাড়ছে? সূতা ছাড়ছে সূতা গোটাচ্ছে? তবে তো কখন যে কাকে জড়িয়ে-মড়িয়ে টান দেবে, উদাস-উচাটন করে তুলবে, বিবশ-বেহুঁশ—আর তারপর ঢেলে দেবে কালবীজ কালপৌরুষ!

ফের, ফের ভুটকীকে খামচে ধরল চাঁদবদ্‌নী।

ঘাড় ঘুরিয়ে ফিস্ ফিস্ করে ভুটকী বলল, ও লো কী লো?

চাঁদবদ্‌নী একরাস্তা থেকে টেনে এনে ভুটকীকে আরেক রাস্তার মুখে দাঁড় করিয়ে দিল ঝট্ করে। উদিকে নাই, আগে মাঝুড়ুব্‌কার দিকে চ মুনু!

অথচ কাল রাতেই তো ঠিক হল—তারা আগে যাবে তপোবনের ওদিকে, খালধারে। খালধারে তপোবনের জঙ্গলে যে মহুলগাছটা, তার তলায় চারধারে রাত শেষে রদোবদো করে

এত মহুল পড়ে থাকে যে কুড়োবার লোক থাকে না। কতক যায় হেলায়-ফেলায় আর কতক ভালুতে খায়—

ধুর্! ভালু আর আছে নাকি?

আছে আছে, ঐ বড়জোর একটা দুটা। মনে নাই? তুমার মনত্ নাই—মহুল কুড়াতে যেয়ে সেবার লঙ্কাপাড়ার জটাদিদি একটা ভালুর সামনের জাঙ্ দুটা কীর'ম 'দুহুরে' দিয়েছিল?

মনে আছে, জটাদিদির সে-কিত্তিকাণ্ড কার না মনে আছে? অঝোরঝর অন্ধকার রাতের সঙ্গে গায়ের আলকাতরা-রঙ মিশিয়ে দিয়ে গাছতলায় ভালু হামলে পড়ে সাদা সাদা মহুল খাচ্ছে। আর ওদিকে—

জটাদিদিও হামলে পড়ে গসা গসা মহুল কুড়োচ্ছে। এত মহুল! কুড়োতে কুড়োতে 'আলা' হয়ে যাচ্ছে সে। খেয়াল নেই তার—খেয়াল নেই—ওদিকে একটা ভালু চরে চরে মহুল খাচ্ছে!

হি-হি করে এদিক-ওদিক থুতু ছেটাতে ছেটাতে ভালু দুপা শূন্যে তুলে উঠে দাঁড়াতেই জটাও হুঁশ ফিরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার শিরদাঁড়ায় আওয়াজ উঠল রট্ করে—তার 'দাঁড়াশির' ভেঙে গেল কী? ভেঙে গেল কী?

না, ভালু যত এগিয়ে এল, জটালোধানীও মহুলগাছের গুঁড়ির আড়ালে তত লুকোচুরি খেলল—লুক্লুকানি—

ভালু ওদিকে তো জটা এদিকে, ভালু এদিকে তো জটা ওদিকে। এদিক-ওদিক আর এদিক-ওদিক—তিতিবিরক্ত ভালুটা এক সময় রাগে-উত্তেজনায় সামনের পা দুটো বাগিয়ে ধরে মহুলগাছের গুঁড়িসুদ্ধ জটালোধানীকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করল। অবলা পশুর যেরকম মতি!

জটালোধানীও কী ভেবে নিজের হাতদুটো দুদিকে মেলে ধরে গুঁড়িসুদ্ধ ভালুর বাগানো সামনের পা দুটোকে সাপ্টে ধরল। মাঝখানে কর্কশ আ-ছোলা আদড়া বাকলবিশিষ্ট দু-দু চারহাতের বেড় পরিমাণ একটা মহুলগাছের গুঁড়ি আর এদিক-ওদিকে দুই যুযুধান অবলা প্রাণী—

জটালোধানী শুরু করে দেবে না দধিমন্থন, 'দুহুরানো'? দুই থাবা ধরে অনর্গল টানা-হিঁচড়ান, ভালুর পা থেকে গা থেকে রোঁয়াসুদ্ধ খাবলা খাবলা মাংস খুব্লে উঠে আসবে না? আর অঝোরঝর রক্ত?

দুহুরাতে দুহুরাতে ভালুকে আধমরা নিস্তেজ করে দিয়েছিল জটালোধানী, সেবার কোনমতে প্রাণে বেঁচে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল ভালু—তারপরেও তারপরেও—মহুল কুড়িয়েছিল জটা, ছাড়েনি।

আজ এতদিন বাদে মহুল কুড়োতে বেরিয়ে আরেক লোধামেয়্যা চাঁদবদ্নীর সেকথা মনে পড়লেও তার মনে এখন বড় ধন্দ—ভালুটা কী আর ভালু ছিল, ছিল তো কাল্পুরুষা। জটাদিদির অন্তরে ঢালতে চেয়েছিল সে কালবীজ, সেদিন কোনমতে পার পেয়ে গিয়েছিল মেয়্যাটা।

মনস্থ করেছিল চাঁদবদ্নী—তপোবনের জঙ্গলে খালধারে যে মহুলগাছটা, প্রথমে ওখান থেকেই শুরু করবে তারা। ভুটকীও তাই জানত, তাই চাঁড় চাঁড় হাঁটছিল, দৌড়ুচ্ছিল, তপোবনের ওদিকেই—

চাঁদবদ্নী মানা করছিল। চাঁদবদ্নী তাকে টেনে নিল হ্যাৎ করে।

আসলে ভয় করছিল চাঁদবদ্নীর। না বাবা না! এখনও অঝোরঝর্ অন্ধকার, এই আঁধারে-অন্ধকারে তপোবনের ওদিকে এখন কিছুতেই যাব না, যদি ধরে কাল্পুরুষা?

ভুটকীকে অভয় দিয়ে সে বলল, থাম্‌ ন মার, এত রাইতে কেউ উদিকে যাব্বে নাই, যেমনকার মহুল তেমনটা থাকবে। চ এখন, 'ছাঁচতলের'টা আগে কুড়হাই।

তাই তো, ঠিকই তো।

কাছেরটা আগে, দুরেরটা পরে গেলেও চলবে, কেউ তো আর এতরাতে অতদূরে যাচ্ছে না! থাক না পড়ে গাছতলায় অঝোরঝর্‌! যেমনকার তেমন! একসময় ভোর ভোর গিয়ে মনের সুখে কুড়িয়ে আনলেই হবে!

তার চেয়ে মাঝুড়ুব্‌কা-হদহদি-দখিনসোল—এই তো ছাঁচতলে, লোধাপাড়ার দোরগোড়ায়। ওদিকে ঘটি-হাতে মাঝুড়ুব্‌কার জঙ্গলে কেউ 'জলঘাট' বসে গুজ্‌গুজ্‌ ফুসফুস্‌ করলেও এদিক থেকে শোনা যায়।

ভুটকী, চাঁদবদ্‌নীরা এখন সেইদিকে।

ঘুম থেকে জেগে উঠছে জঙ্গলও। হাত-পা নাড়ছে, 'আড়িশ' ভাঙছে। এদিক-ওদিক বড় বড় গাছপাল্‌হার মগ্‌ডালগুলো ধীরে সুস্থে হিল্‌ হিল্‌ করে নড়ে উঠছে। কোনো কোনোটার খোঁদল থেকে একট-দুটো পাখি হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে উড়ে চলেছে জঙ্গল ছাড়িয়ে দূরে—হয়ত নদীনালায়—খালে—

কেউ কেউ বাসায় থেকে মাঝে মাঝে এমন আচমকা 'ভদ্‌কাতে' শুরু করল, একটানা 'কঁহরাতে' লাগল যে মহুল-কুড়ানীদের বুক আচম্বিতে কেঁপে কেঁপে উঠল, কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শুরু হয়ে গেছে উসুর-ফুসুর, ফিস্‌ফাস, কে বা কারা জঙ্গলের বালিরাস্তায় মস্‌ মস্‌ করে বালি ভাঙতে ভাঙতে হেঁটে চলেছে, কাশছে। বালিতে ছর্‌ ছর্‌ করে দেহের জলবিয়োগের আওয়াজ—পরমহূর্তেই কফ-থুতু-গলা খাঁকারি।

'কাঁকর' পড়ছে বেদম, কুয়াশাও জমে আছে বেশ, এই যত কাঁকর পড়বে কুয়াশা জমবে ততই 'খোঁচ' থেকে টপাটপ মহুল পড়বে। পড়েছেও হয়ত গাদা গাদা—গতকাল অবদি তো দেদার কুড়িয়েছে ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীরা।

এতক্ষণ চাঁদ কী ছিল? ছিল হয়ত—ক ঘড়ির 'জন' কখন ডুবে গিয়েছে! আজ আর উঠবে না। আলো নিভে যেতেই ঝুপ-অন্ধকার যেন আরো আরো গাঢ় হয়ে জেঁকে বসেছে, জঙ্গলে।

এখন এই মসিকৃষ্ণ অন্ধকারে চুপিসাড়ে আসে যদি কালো, কুচকুচে কালপুরুষা—তাকে কী করে ঠাহর করবে চাঁদবদ্‌নী, ভুটকীরা? বিশেষত 'বোস-ওঠা' চাঁদবদ্‌নী?

সে আচমকা ভুটকীকে কাছে টেনে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠল, চুপ—ঐ শুন্‌—

কার যেন, কাদের যেন চলে যাওয়ার পা ফেলার দৌড়ুবার আওয়াজ, ঝটপট্‌ এদিক থেকে ওদিকে গেল, পশ্চিম থেকে পুবে, পুবে—মাঝুড়ুব্‌কা ছেড়ে দখিনসোল হদহদির ওদিকে—

চাঁদবদ্‌নীও ভুটকীকে টেনে-হিঁচড়ে দৌড়ুল পুব থেকে পশ্চিমে, মাঝুড়ুব্‌কায়, কদমডাঙার খুকড়াপাড়ার ওদিকটায়, যেখানে ঝাঁকড়া মহুলগাছটা ঠায় দাঁড়িয়ে কত ক-ত বছর যে ফুল দিচ্ছে ফল দিচ্ছে—

ঠেকা-পাছিয়া বগলে প্রায় উলঙ্গ দু-দুটো মেয়ে , লোধামেয়্যা, একটার ছেঁড়া-ফাটা হাফ-পেন্টুল আর কোমরে গোঁজা ততোধিক ছেঁড়া 'নুগা' কোনমতে বুকে জড়ানো, আরেকজনের একটাই ঝিল্‌ঝিল্‌ গামছা, 'বোস-ওঠা' শরীরটাকে ঢেকেও ঢাকতে পারছে না, কাঠি-খুঁচিতে খুঁট

আটকালে আর খুলে গেলে সে বুঝতেও পারবে না 'আছে কী নেই' 'ছিল কী ছিল না' এমনই ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত।

দুজনেই দৌড়ুচ্ছে, দৌড়ুচ্ছে আগ্রাসী 'ক্ষুধা' নিয়ে, পেলেই হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে খাবে, খপাৎ খপাৎ করে খাবে।

চোর-চুর্নী!

খালভরি বারোভাত্তারি!

ফোঁ ফোঁ করে শ্বাস ফেলছে দুজনে নাকি তার ফিস্‌ফিস্ করে গালি পাড়ছে কাউকে, কাদেরকে—বুঝা যাচ্ছে না। বুঝা যাচ্ছে না। হাওয়া এসে হাওয়া ঘুরিয়ে দিচ্ছে, ঘুলিয়ে দিচ্ছে।—বেদ্‌ধুয়ামড়ী!

খান্‌গি!

এখন স্বয়ং কালপুরুষাও আসে যদি তো তাদের নাগাল পাবে না, তার যত বড়ই হাত হোক, তার যত সূক্ষ্ম শরীরই হোক—

লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে মাঝুড়ুব্‌কার মহুলগাছটার তলায় পৌঁছে ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীরা দেখল—গাছতলা সাফা! আগে ভাগেই কে বা কারা এসে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে সব মহুল! সাফা করে দিয়ে গেছে সারা মহুলতলা!

ভুটকী, চাঁদবদ্‌নীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, আঙুল কামড়াল। ছুঁড়ে মারল কাঁকালের ঠেকা-পাছিয়া।

মুখে বলল—ঐ কুম্‌হারপাড়ার চোর-চুরনীরাই—

কুম্‌হার নয়ত কাম্‌হারপাড়া মাহাতোপাড়া ভুঁইয়া-ভূমিজপাড়ার এমন কী লোধাপাড়ার কেউ না কেউ, কাউকে না কাউকে চোর সাব্যস্ত করে পরা-কাপড় ঝেড়ে ফেলে আবার পরল ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীরা।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই—

ফের তো ঠেকা-পাছিয়া কুড়িয়ে গাছ থেকে গাছান্তরে, হদহদি-দখিনসোলে যাওয়া।

দখিনসোল-হদ্‌হদিতে বন-জঙ্গল আর কোথায়! সব তো লাটা-পাটা ডুবকা-ডুংরি টাঁড়-টিকর, ধানহীন রাঙাশাল-কার্তিকছোলা-জামাইলাডু ধানের মাঠ। একটা দুটো যা গাছ—মহুল-শাল-ধ-আসন—

দখিনসোলের মাথায় উঁচু ডুংরির ওপর গাছটা। না সেখানেও নেই। ঐ বড়জোর একআধটা—তলানির মতো এখনও ঝরছে।

গাছতলায় মাথায় হাত দিয়ে বসল ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীরা। আজ কী তাদের ভাগ্যে এক কুন্‌কেও মিলবে না? তবে কী তারা দেরি করে ফেলেছে আজ? জ্বলজ্বলে পোহাতারা দেখে তারা ঘর ছেড়ে বেরুল—তবে কী পোহাতারা রাতপোহাতি তারাও চিনতে ভুল করে ফেলল আজ?

এক থালা সুপারি গুনতে নারি, কত ছোটো বয়স থেকেই তো তারা গুনতে তারা চিনতে শুরু করে দিয়েছে তারা। অরুন্ধতী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মৃগশিরা, ধ্রুবতারা নামে না জানুক না চিনুক সাতভায়া দধি-ভারিয়া ভুল্‌কা কাল্‌পুরুষা রাবণের সিংহদুয়ারের তারা ভুরখা-ইঁপিল পোহাতারা ভোরপোহাতি তারা, আরো কত নামে আরো কত কত তারাই যে তারা আবিষ্কার করে ফেলল, দোরখুলির লোধাপাড়ার মেঘপাতালে আজ যে জ্বলজ্বলে তারা দেখে ভোরপোহাতি তারা বলে তারা ভুল করল—সে তারা কী নতুন কিছু?

উ-হুঁ, এতদিন ধরে দেখছি ভুল কী করে হবে—সে— তারা পোহাতারাই। পোহাতারা, পোহাতারা।

ভুটকী বলল, দ্যাখ্ ভালুতে খেয়ে গেল কী না!

ভালু? ভালু কী আর আছে যে খেয়ে যাবে? একটা-দুটা যা আছে সে ত খেলার ভালু, নাকে দড়ি বাঁধা। দেখ্‌খিস নাই বহড়াদাঁড়ি না নেপুরার ভালুকবুড়া খেলাতে লিঞে আসে?

আর ভালু খেলেও সব কী আর সাফা করে খাবে? এত কী তার পেটের জ্বালা?

নাই নাই—ঐ কুম্‌হারপাড়ার চোর-চুন্নীরাই—

মাঝুড়ুব্‌কা-বুলান-হ্‌দহদি-দখিনসোল ছেড়ে রাত গাঢ় হোক পাতলা হোক, ধরে ধরুক কাল্‌পুরুষা—মরীয়া ভুটকী-চাঁদবদনীরা এবার যাবে খালধারে তপোবনের জঙ্গলে।

রাত হয়ে আসছে ফিন্‌ফিনে পাতলা, আরো হবে। জঙ্গল আর জঙ্গল থাকবে না, হয়ে উঠবে কলরব মুখরিত, মুখর মুখর। এখন যা কিছু—সব তো ফিসফাস চুপচাপ। কুড়িয়ে নেওয়ার হাতিয়ে নেওয়ার সময়।

এদিক-ওদিক আওয়াজ উঠবে ঠুকঠাক, 'টানা-হিঁচড়া'র। মহুল কুড়োনোর কাজ শেষ করে কেউ কেউ শুকনো ঝাঁটি টানবে, শুকনো ডালপালা।

কেউ কেউ দাঁতন ভাঙবে—শালদাঁতন রামদাঁতন। গোছা গোছা বোঝা বোঝা। কাম্‌হারপাড়ায় কুম্‌হারপাড়ায় হাটুয়াপাড়ায় মহাজনপাড়ায় বিক্রির জন্য, দুটো পয়সার জন্য দু মুঠো চালের জন্য।

কেউ কেউ দাঁতনকাঠি মুখে পুরে চিবোবে তো চিবোবে, চিবোচ্ছে তো চিবোচ্ছে—বেলা হোক, বেলা তো হবেই, দাঁতন করে খালধারে খালের জলে একেবারে মুখ ধুয়েই ঘরে ফিরবে।

শুধু কী লোধাঝিউড়ীরা লোধাবউড়ীরা, জঙ্গলে মহুল কুড়োতে ঢুকেছে কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-সাঁওতাল মেয়েরাও, বুড়ি-বউড়ীরাও।

কোথাও কোথাও দু'দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দেখা হলেই লোধামেয়্যারা বুড়িবউড়ীরা 'তরাসে' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, রাস্তা ছেড়ে দেয়—যাক বাবা তাদের যেথাকে খুশি।

ঝগড়াও হয়। ঝগড়া করে কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজদের ঝিউড়ী-বউড়ীরাই বেশী।—অ, তাই বলি এই গাছতলে এ্যাদ্দিন ক্যানে একটাও মহুল পাইনি! তবে চোর-চুরনী লোধাছুঁড়িরাই এসে আগেভাগে সব মহুল হাতিয়ে লিঞে যায়।

লোধামেয়্যারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়। রাগে গা তাদের রি-রি করে, ঝগড়া করতে তারাও উদ্যত হয়।

গাছ কী তোদের বাপের? গাছ তো জঙ্গলের, জঙ্গলের জঙ্গলের, জঙ্গলের গাছ জঙ্গলের গাছতলায় পড়া মহুল আগে আগে ভালুতে খেত, এখন না হয় আমরা খাচ্ছি—

না, উঁহু—আগে আমরাও খেতাম ভালুতেও খেত। আমরা বলে সেই কোন্ মান্ধাতার আমল থেকে আছি।

অত কথা কী আর 'অন্যজাইতের মেয়্যারা' শুনতে চায়, না শুনতে পায়? তারা তো পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করে, রাগে গরগর করতে করতে এগিয়ে এসে 'লোধা মেইয়া'দের বগলের ঝুড়িপাছিয়া পরীক্ষা করে—কই দ্যাখা!

নেই, নেই। হয়ত পাছিয়ার এককোণে পড়ে আছে গুটিকতক মহুল, টাটকা-টাটকি। তবে রূপে-রসে টই-টম্বুর।—দেখে বড়ো মায়াও হয় অন্যজাতের মেয়েদের, বুড়ি-বউড়ীদের। তারা তাদের ছেড়ে অন্যত্র চলেও যায়।

লোধামেয়্যারাও কী আর অবশ দাঁড়িয়ে থাকে? তারা তো মনে মনে গাছ খোঁজে, গাছ। কুম্‌হার-কাম্‌হার মেয়্যাদের চেয়েও 'লোধামেয়্যারা' গাছ-পাল্‌হার খবর বেশি রাখে।

গভীর জঙ্গলে অত সহজে ঢুকতেও চায় না 'ভিনুজাতের' মেয়েরা। কিন্তু লোধামেয়েরা সাপের মতো সল্ সল্ করে ঢুকে যায়। আঁতিপাতি খুঁজে পেতে মহুল কুড়োয়।

তবু যেন তাদের আজ কির'ম কির'ম লাগে! ভয়ও হয় ভাবনাও হয় ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীদের। বুক তো টিব্ টিব্ করে—একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলছে কী তাদের বিরুদ্ধে? যোগসাজস?

নইলে এতদিনকার চেনা পোহাতারাও আজ অচেনা হয়ে যায়? পোহাতারা হয়ে পড়ে ভুল্‌কাতারা—যে তারা পথ ঘুরিয়ে দেয়, ডানকে বাম করে বামকে ডান করে দেয়?

ডান-বাম, আজ যা থাকে কপালে—ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীরা দৌড়ুল খালধারে, তপোবনের জঙ্গলে।

জঙ্গলে ঢুকেছে কাঠ-চোরেরাও—সে তো ঢুকেছে একদল সাঁঝরাতে কী তার আগের দিন আড়-বেলায়। তারা চুপিসাড়ে গাছ কেটে কাঠ কেটে সাইজ করে রেখে গেছে লাটাপাটার আড়ালে, ডাল-পাল্‌হায় চাপাচুপি দিয়ে, নরসিঙার সাধ্য কী তাদের ধরে ফেলে!

আরেক দল ঢুকেছে মাঝরাতে কী 'মাঝু' রাত 'আড়' হতে। তারা ঢুকেছে গরুর গাড়ি নিয়ে, নদী-নদীবালি-টাঁড়টিকর পেরিয়ে, কুস্তুড়িয়া-হাতিবান্ধী-আন্ধারী-ছেলিয়াশিঙ্গা-গড়ধরা-হরিপুরা সেই কোন্ দূরদূর গ্রাম থেকে।

তারা এসেছে গাড়ি বোঝাই করে কেবল কাটা-কাঠ সাইজ করা-কাঠ নিয়ে যেতে। তাদের তত বেশি ঝুট্‌ঝামেলা পরিশ্রম নেই, পরিশ্রম তো করেছে তারা যারা হাঁপর-হাঁটি করে কাঠ কেটেছে চোরাগুপ্তা, প্রতিমুহূর্তে ভয়ে ভয়ে থেকেছে এই বুঝি এসে পড়ল নরসিঙা!

এখনকার যারা তারা তো এসেছে গাড়ি চেপে, যাবেও তারা গাড়ি করে। আসার সময় নদীবালিতে টাঁড়-টিকরে কান-মাথা যা ঢেকে রেখেছিল গামছায়। নচেৎ কুয়াশায়-কাঁকরে সপ্‌সপে ভিজে মাড়ি-মামড়ি ফুলে ঢোল হয়ে যায়।

নুয়াসাহী থেকে 'গিরিহা'র কাটা-কাঠ নিয়ে যেতে এসেছে আশুগাড়োয়ান। নদী পেরিয়ে সে আসেনি, সে এসেছে নদীর এপার থেকেই। পোহাতারা ওঠার একটু আগেই।

তখন আকাশে 'জন' ছিল, 'জনে'র আলোয় ছায়ায়-ছাঁয়রায় তখন চারধার অবশ ছিল। কেমন যেন আলো-আঁধার, কেমন যেন আলো-জল। কুয়াশায়-কাঁকরে বনের গাছ-পাল্‌হা ভিজে যাচ্ছিল। ভিজে যাচ্ছিল, ভিজে যাচ্ছিল।

ঘুম থেকে উঠেই গাড়ি জুতে ফেলেছিল আশুগাড়োয়ান, ঘন ঘন হাই তুলছিল, আর কেমন যেন ঘোরের ভিতর পড়ে যাচ্ছিল সে।

চলন্ত গরুর গাড়ির ওপর সে কখনো বসে বসেই ঢুলছিল, কখনো নঅ্ থম্ হয়ে শুয়ে পড়ছিল। গাড়ি চলছিল আপনার তালে আপনার ছন্দে, গরুর গাড়ির 'লিক্' বরাবর।

মাঝে মাঝেই ল্যাজের ঝাপট মারছিল গরুগুলো, কান-মুড় নাড়ছিল, আর হঠাৎ হঠাৎ রাস্তার পাথরে-গরুর চাকায় ঘর্ষণে ঘর্-র-র্-র্-র্ ঘর্-র-র-র-র আওয়াজ উঠলে গরুগুলো চমকে কিছুটা পথ দৌড়ে যাচ্ছিল।

ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল আশুগাড়োয়ানেরও। ঘুম-ভাঙা-চোখে সে আচমকা দেখে ফেলছিল চাঁদের মহিমা, চাঁদের লীলাখেলা। শাল-পিয়াশাল-ধ-আসন-কেঁদ-বহড়ার মগ্‌ডালে পাল্‌হা-পতরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চাঁদ যেন পিছলে যাচ্ছে, দৌড়ুচ্ছে, খেলা করছে—

'অপার মহিমা তোমার এ-ভব সংসারে'—যাত্রাপালায় না আর কোথাও শোনা

'ডায়লগ'টা মনে মনে আওড়ে গেল আশুগাড়োয়ান। তারপরেই সে নিজে নিজেই 'রচে' ফেলল—'আমি আশু অবোধ শিশু জ্ঞান নাই মোর একেবারে—'

নদীর ধারে বড়ডাঙা পেরিয়ে নুয়াসাহীতে আশু সিংয়ের ঘর, সে হরিশ দঁড়পাটের 'ভাতুয়া', ভাতে-কাপড়ে সম্বৎসর খাটে, লেখাপড়া তার 'টুথ্রী' অব্দি, বয়স এই বড়জোর একুশ কী বাইশ, এখনও অবিবাহিত।

নিজে নিজেই, এতদিন বাদে একটা গোটা লাইন রচনা করে ফেলে সে এত পুলকিত, তার মনে এত পুলক জাগল যে সে প্রথমে জোরে জোরেই লাইন দুটো মুখস্থ বলল—

অপার মহিমা তোমার এ ভব সংসারে।
আমি আশু অবোধ শিশু জ্ঞান নাই মোর একেবারে।।

মুখস্থ বলল বটে, কিন্তু কে আর শুনছে—এ তো জঙ্গল, অঝোরঝর জঙ্গল! কাঠ-চোরদের অন্যান্য গাড়িগুলো হয়তো এগিয়ে গেছে, পিছিয়ে পড়েছে, আর নয়ত কাঠ নিয়ে আগেভাগেই জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

এখন তো সুনসান, সুনসান।

সুনসান কী আর, খোঁচ থেকে অনবরত মহুল পড়ছে, শাল-মেচড়ি শালফুল। কাঁকর পড়ছে। মহুল-কুড়ানীরা ছুটোছুটি করছে—এদিক থেকে ওদিকে, এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্তে। তবে খুব নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে।

চুপিচুপি কে কত আগে কোন্ গাছতলায় রাত থাকতে থাকতে হাজির হয়ে রদোবদো পড়ে থাকা মহুল একা একাই কুড়িয়ে নেবে—এখন তো তারই প্রতিযোগিতা, তার জন্যই রাতজাগা।

রাত-উজাগর আশুগাড়োয়ানের মন কিন্তু ঘুরে গেল অন্য দিকে, চাঁদ দেখতে দেখতে চাঁদের দিকেই সে বাগিয়ে ধরল তার গোপন অঙ্গ। সতেজ সজীব এক মাংসল উদ্ভিদ।

এমন তো কতই ফুটে থাকে লাটা-পাটার আড়ালে, পাতালকোঁড়, বাঁশকোরল জঙলী গজাল। আশুগাড়োয়ানও তাই হতে দিল। তাই তাই।

শেষরাতের জঙ্গল, কাঁকর-মাকরে জড়ানো হিমেল ঝুরুঝুরু হাওয়া, নদীরধার থেকে বনধার থেকে মাঠঘাট থেকে 'শির-শিরানি' জড়ো করে পাল্‌হা-পতরের ভিতর দিয়ে ফাঁক-ফোকর দিয়ে দলে দলে জঙ্গলে ঢুকে আসছে।

কাঁটা দিয়ে উঠছে গা-গতর, আদড়া-আঁকড়া আশুগাড়োয়ানের শরীর কিন্তু শির্‌শির্ করে উঠল এমনিতেই।

চাঁদ মুখ লুকোচ্ছে, পালাচ্ছে—

গরুগুলো হেঁসর-ফেঁসর করে হেঁটে চলেছে যেমনকার তেমন। নির্বিকার, নির্বিকার। ভুঁইছাতু পাতালকোঁড় বাঁশকোরল আগামী ভোরের প্রতীক্ষায় উঁচু হচ্ছে, উঁচু। জঙলী গজাল আমূল প্রোথিত হওয়ার আশায় মাটি খুঁজছে, মাটি।

জঙ্গলে রাত-ভিত গাড়ি ঢুকলে পিছু নেয় কালপুরুষা, ছায়ার মতো গরুগুলোর পিছু পিছু হাঁটে। ল্যাজুড় মুচড়ে দেয়, আর হঠাৎ হঠাৎ গরুগুলো লাফিয়ে উঠে দৌড়োয়।

সচকিত সতর্ক গাড়োয়ান আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে 'ঠ্যাঙা' দেখায়, মারব শালা এক ঠ্যাঙা!

ছায়া সরে যায়, গুটি গুটি হেঁটে কাল্‌পুরুষা পালায়। একেবারে পালিয়ে যায় না, কিছুক্ষণ বাদে কুচ্‌লাগাছের তলে কী ঘোড়ানিমতলে ফের গরুগুলোর ল্যাজুড় মুচড়ে দেয়, গরুগুলোকে 'কাঠুয়ে' দেয়। হুড়বড়িয়ে গাড়ি নিয়ে গরুগুলো তো দৌড়োয়।

আর কাল্‌মুহী? কালো বর্ণের মুখ যার? আশুগাড়োয়ান এসময় ভাবে—সেই সেও এখন আসে যদি তো ছাড়ান-ছোড়ন নেই।

নেই, নেই।

সময় সময় কাল্‌মুহীও আসে গাড়ির পিছু পিছু, 'বিটিছানা'র ভেক ধরে। রিনঠিন করে মাঝে মাঝে হাতের চুড়ি বাজায়, পায়ের 'খাড়ুয়া'। কখনও কখনও চলে আসে গরুগুলোর পেট বরাবর, গাড়োয়ানের একেবারে হাতের কাছে ডাইনে কী বাঁয়ে।

লোভ হয়, দুরন্ত লোভ দুর্দান্ত লোভ, আর লোভে পড়ে স্খলন হয় যদি তো নির্ঘাৎ 'মেহ' রোগ, অকারণে শরীর শুকিয়ে কাঠি হয়ে যায়।

হয় হোক, মনে মনে 'কালমুহী'কে কল্পনা করে চাঁদের দিকেই মুখ রেখে আশুগাড়োয়ান কাজটা করতে থাকে।

একেকটা সঞ্চালন, আকুঞ্চন-প্রসারণে, হাতের কারিকুরিতে যেন বন-বাদাড় প্রবল ঝড়ে আন্দোলিত হয়ে একেকবার মুখ-থুবড়ে পড়ছে, মূল উপরের দিকে ডগাল নিচের দিকে।

পরমুহূর্তেই পাল্‌হা-পতরসহ লাটা-পাটা ভুঁই-ভাগাড় সোজা উঠে যাচ্ছে, যেমনকার তেমন।

চাঁদ পালাচ্ছে, ফর্‌কে ফর্‌কে পালাচ্ছে, কাল্‌মুহী হি-হি করে হাসছে। আর ততই পৌরুষ নিয়ে আশুগাড়োয়ান ঝাঁপিয়ে পড়ছে। একুশ-বাইশের আদড়া যৌবন, সে যে 'জলেও পারে জ্বালাতে আগুন'!

একেকটা ছড়ের টানে যে এত সুর, এত সুখ—আ-হা-হা-হা ও-হো-হো-হো সুখ-সুখ! এতদিন কোথা ছিলি রে ধন! চরম সুখে বুঁদ হয়ে আশুগাড়োয়ান কাল্‌মুহীর গর্ভে 'বলকে বলকে' ঢালতে থাকে গাঢ় গর্ভিল বীজদানা।

একসময়, শেষবিন্দুটি ঝরে পড়ার পর, এত কাহিল কমজোরী হয়ে পড়ে সে যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে—জীবনে এরকম কাজ, এত খারাপ কাজ সে আর কখনো করবে না!

ঝিম্ ঝিম্ করে হাত-পা অবশ হয়ে আসছে তার, মাথাও ঘুরছে। গল্ গল্ করে বের হয়ে গেল যা—তার নামই তো বীর্য। মানুষের বলবীর্য এমন হেলায় ফেলায় বেরিয়ে গেলে অচিরেই মানুষ তো দুব্‌লা হাড়পু হয়ে পড়বে!

'অপার মহিমা তোমার এ ভব সংসারে, আমি আশু অবোধ শিশু জ্ঞান নাই মোরা একেবারে'—নাই নাই, হাত জোড় করে আশু বসল চাঁদের দিকে মুখ করে। বিড় বিড় করতে করতে।

কিন্তু কোথায় চাঁদ? কাল্‌মুহী বা কোথায়? চাঁদ ডুবে গেছে, অঝোরঝর অন্ধকার ফের চেপে ধরেছে লাটা-পাটা। রাত শেষ হয়ে যাবার আগে, অন্ধকার কাবার হয়ে যাবার আগে অল্প সময়ের জন্য হলেও রাত যেন জেঁকে বসেছে আরো গাঢ় করে।

আঁধার-অন্ধকার জাপটে আছে গাছে গাছে পাতায় পাতায় পাল্‌হা-পতরে লাটায়পাটায়।

রাতের পাখ রাত চরা শেষ করে বাসায় ফিরছে ঝুপ্‌ঝাপ, দিনের পাখ সারারাত ঘুমিয়ে আড়মোড়া ভেঙে ডানা 'ভদকাচ্ছে'। কেউ কেউ দিনের আলোয় বিচরণে বেরুচ্ছে সাঁক্ সাঁক্ করে।

দেখা হয়ে যাচ্ছে আসা-যাওয়ার দুই পাখির সঙ্গে মাঝখানে। দেখা হলেই যে যার পথ সে তার ছেড়ে দিচ্ছে—যাও পাখি, তোমার হল শুরু আমার হল শেষ।

বুকে-হাঁটা জীবগুলোও যে যার ঘরে ঢুকছে, গাড়ায় ঢুকছে গর্তে ঢুকছে। রাতচরাদের রাত তো হয়ে গেল শেষ, এবার শুরু হবে দিনচরাদের পালা।

রাতচরা, দিনচরা।

আহা, ভুটকী, চাঁদবদ্‌নীরা তবে কোন্ চরা—রাতচরা না দিনচরা? তারা তো সেই কোন্ রাত থেকেই উসুর-ফুসুর করছে, ঘুমোয়নি একফোঁটা।

তারা তবে রাতচরাও বটে, দিনচরাও বটে। রাতচরা দিনচরা, দিনচরা রাতচরা। রাত এখনও কাবার হয়নি, পোহাতারা উঠলেও রাত এখনও পোহায়নি।

আশুগাড়োয়ানের সঙ্গে দেখা। একমনে হেঁটে চলেছে ভুটকী চাঁদবদ্‌নীরা ধর্মের রাস্তায়। আর কোনোদিকে তাদের নজর নেই। হঠাৎ কালো-ভুস্‌ভুসে গাড়োয়ানসহ গরুর গাড়ি দেখতে পেয়ে চাঁদবদ্‌নী ভাবল—কী কাল্‌পুরুষা?

কালপুরুষা, কালপুরুষা।

কতরকম ভেক ধরেই তো আসে! এই গোমুহা, গরুর মতো মুখ তো ঐ 'ছুঁচিয়া'—'হাতি' 'হাতি' বললেও সে নড়েও না চড়েও না, কখন দুপায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাবে! ঠেকা-পাছিয়া সমেত ভুটকীকে জাপটে ধরল চাঁদবদ্‌নী।

হাই দ্যাক্—ওলো কী লো? থমমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভুটকী।

ভোর রাতের ঝিল্‌মিল্ কুয়াশায় কাঁকরজলে কান-মাথা ঢেকে রেখেছে গামছায়। 'অকাজ' করে, অকালে অযথা 'ঝরণের' ফলে যথারীতি ক্লান্ত আশুগাড়োয়ান। মনমরা।

'বোস-ওঠা' 'লোধাছুঁড়ি'দের দেখেও তার এখন আগ্রহ নেই, বাঘ-ঝাঁপ দিয়ে শিকার ধরার কোনো বাসনা নেই।

বরঞ্চ এমনিতেই মনমরা আশু ভেবেচিন্তে ভয়েত্রাসে আরেকটু বেশিই মরে গেল অন্তরে—কালমুহী কী? কালামুহী?

যখন দেখল বগলে ঠেকা-পাছিয়া, মেটে আলুর মতো গায়ের রং, মহুল-কুড়ানী লোধাছুঁড়ি ছাড়া আর কেউ না, তখন কোথায় শিস্ দিয়ে গেয়ে উঠবে—"বারে বারে বারণ করি তপুবনে যাইও নাই, তপুবনে যাইও নাই, তপুবনের কাল্‌হা জলে লো গায়ের বরণ ফিরবে নাই"—তা নয়, সে কিন্তু ভাঙা গলায় ধরা গলায় গেয়ে উঠল—

হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ হরে।
কৃপা কর রমানাথ মুকুন্দ মুরারে।।

ভূতের মুখে নামগান, চাঁদবদ্‌নী যখন শুনল কালপুরুষা টিপিক-টিপিক করে কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ ছোঁড়াদের মতো গীত ধরেছে, ঠাকুর নাম জপ করছে, তখন যার-পর-নেই নিশ্চিত আনন্দিত হয়ে ভুটকীকে টেনে-হিঁচড়ে বলল, চ মড়ি, দাঁইড়ে পড়লি যে?

তপোবনের জঙ্গলে, খালধারে।

রাইবুর আবিষ্কৃত বনভূমিতে, যেখানে শালের বন কেঁদুর বন আসনবন মেশামিশি মেশামিশি। তার ভিতরে ভিতরে কোথাও বা একটা-দুটো কচড়াগাছ—

গাছতলা মহুলে মহুলে ছয়লাপ। এত মহুল যে কুড়োতে কুড়োতে 'আলা' হয়ে গেল তারা। ভুটকী, চাঁদবদ্‌নীরা।

ঠেকা-পাছিয়া যা সঙ্গে এনেছিল সব তো ভরে গেল—এখন উপায়? কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কতক মাটিতেই জড়ো করল। জ্বাল দিয়ে গুড় করবে, 'মহুলগুড়'।

কিন্তু তৈজস? জ্বাল দেওয়ার পাত্র আর আগুন?

আছে, আছে—লোধাজনমানুষ যখন জঙ্গলে ঢোকে, সে পুরুষ হোক আর মেয়েমানুষ হোক, কোমরে-ট্যাকে-আঁটাদড়িতে গুঁজে রাখে 'মাচিস্'। কখন কি পুড়িয়ে-ধুড়সে খেতে দরকার লাগে!

আর জ্বাল দেওয়ার পাত্র? এই মরশুমে 'গহীরা' ভাঙা খাপরা কী দুমড়ানো-মুচড়ানো

এনামেলের 'তাটিয়া' লোধামেয়েদের সঙ্গেই থাকে। মহুলের রস জ্বাল দিয়ে গুড় বাড়িয়ে 'তাহুত' করে খেতে কার না ভালো লাগে?

আঠা আঠা, চিটা-গুড়-গুড়—খেতেও তো বেশ! দাঁতে লটকে আঙুলে টানলে কেমন সুতার মতো লম্বা হয়ে যায়, লম্বা হয়ে যায়—

ভুটকী, চাঁদবদ্নীরা সঙ্গে এনেছিল ভাঙা খাপরা। এই কদিন আগে নরসিঙার পায়ের গামবুটে ভাঙা মাটির হাঁড়ির খাপরা। মাটির ঢেলা জোগাড় করে উনুন বানিয়ে তাতেই বসিয়ে দিল খাপরার 'ডেগ্'। 'আখুশালের' মতো 'ডেগে' রস ঢেলে জ্বাল দিলেই বুগ্ বুগ্ করে রস ফুটে সত্যিকারের গুড়ের মতো মহুল গুড়ের 'ভরা' উঠবে।

আর গন্ধে 'মহকে' উঠবে না লাটাপাটা, চারিভিত? বড় আনন্দে আশায় আশায় উলুরি-ঝুলুরি শুক্না পাল্হা-পতরের সন্ধানে ঘুরে বেড়ালো ভুটকী। শুকনা পাল্হা-পতর আর কোথায়—সব তো কাঁকর-ভেজা! তবু গাদা ভেঙে ভেঙে লাটা-পাটার ভিতর থেকে খুঁজে পেতে ভুটকী নিয়ে এল শুকনা কাঠিখুঁচি পাল্হা-পতর।

খাপরায় হাতমুঠোয় চেপে চাপ দিয়ে মহুলের রস নিঙড়োচ্ছিল চাঁদবদ্নী। ভুটকী কাছে এসে বসতেই বাঁ হাতের চেটোয় মুখের উপর এসে পড়া চুল সরিয়ে বলল, মহুল থিক্যে মদ হয়—সে ত জান্‌নিস?

হঁ জান্নি।

মদ চুঁয়ায়?

হঁ চুঁয়ায়।

পেরথম চুঁয়ানি মদ কব্‌ভু খেয়েছিস?

নাই, শুন্নি ত খাইলেই কল্‌জা জ্বালা করে।

হঁ জ্বালা তো করে, কিন্তুক লাগে কেমন?

উজবুকের মতো জুলুজুলু তাকায় ভুটকী। বুঁদ হয়ে প্রশ্নের নিজেই উত্তর দেয় চাঁদবদ্নী, লাগে কেমন? না, মানুষের পারা—

আর তার পরের চুমুকটা?

নাই জানি। মাথা নাড়ে ভুটকী।

চাঁদবদ্নী বলে, তার পরের চুঁয়ানিটা খাস যদি ত বাঘের পারা গর্জাবি—হাঁউ-উ-উ-উ হাঁউ-উ-উ-উ—হাঁউ-উ-উ-উ—

হঁ গর্জালম, ত কী?

শুন্ ন, ভুটকীকে থামিয়ে দিয়ে চাঁদবদ্নী বলে, আর শেষ চুঁয়ানিটা?

'লাস'টোকটা খাস যদি ত কেমন লাগবে? কেমন—হি-হি-হি—

মাথা নেড়ে উঠে গেল ভুটকী। সে জানে না। পাল্হা-পতরে সে এবার আগুন ধরাবে।

হঁ যদ্দি খাস—খাস যদি ত গুঁড়ুরপাখের পারা ঘন্টাবি—এইর'ম আর এইর'ম। চাঁদবদ্নী সত্যি সত্যি একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে উল্টে যায়। গড়াগড়ি খায়।

এইটুক গুঁড়ুরের আর কটুক জান বল্—হি-হি-হি—

চাঁদবদ্নীর হেঁয়ালি ধরতে পারে না ভুটকী। বলে, ওলো কী-ই লো—তখন থিক্যে খালি মানুষ-বাঘ-গুঁড়ুর আর মদ চুঁয়ানি?

শুন তবে।

চাঁদবদ্নী মহুলের রস নিঙড়াতে নিঙড়াতেই বলে চলে, এক ঢড়ঢড়ে বুড়হা ছিল। তার বহু নাই, আছে সাত বেটা সাত বেটার বহু। আছে ত আছে, ছিল ত ছিল—

উলুরি-ঝুলুরি পাল্‌হা-পতরে 'মাচিস্' জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ভুটকী। সে-আগুন দাউ দাউ জ্বলে। জ্বলন দেখে চাঁড় চাঁড় হাত চালায় চাঁদবদ্‌নী। খাপ্‌রা প্রায় কানায় কানায় ভরে যায়।

কথায় কথায় চাঁদবদ্‌নীর মুখও ভরে আসে, বলে, বুড়হার বয়স হয়েছে, খাটতে-খুটতে আর পারে নাই। বুড়হা হাড়ে আর জোর কুথা? নাই, জোর নাই।

কিন্তু জোয়ান বহুরা তাকে ছাড়লে ত? ছাড়ান-ছোড়ন দিলে ত? রাদ্দিন সেই ত এক খোঁটা—এত লোক মরে আমাদের বুড়হাটা মরে নাই ক্যানে? ক্যানে?

'কহিনী' বলতে বলতেই মহুলরসের খাপরা উনুনে চড়িয়ে দেয় চাঁদবদ্‌নী। খাপরার 'ডেগে' বুগ্ বুগ্ করে মহুলের গুড় ফুটবে আর 'আখশালের' মতো 'খেঁচনিবাড়ি' মেরে উনুনে পাল্‌হা-পতর গুঁজে দেবে ভুটকী। 'পঁড়াসুরের' পূজাও করবে কী তারা?

এত লোককে বাঘে খায় ল্যাকড়ায় ধরে, আমাদের শ্বশুরবুড়হাকে বাঘেও খায় নাই ল্যাকড়ায়ও ধরে নাই—বাবারে বাবা, কী অঝোরঝর পরমায়ু!

ঢড়ঢড়ে বাম্‌না, বামুনবুড়হা, মনের দুখে তাই জঙ্গলেই চলল বাঘের হাবড়ে একেবারে হাঁ-মুখে পড়তে।—এ ছার পরাণ আর রাখব নাই!

গান গেয়ে উঠবে কী চাঁদবদ্‌নী? সেই হাটুয়াদের 'বালক সঙ্গীত'-এ শোনা "এ ছার পরাণ আর রাখব নাই" গানটি? কৃষ্ণ বিরহে রাধা যখন প্রাণ 'ত্যজিতে' প্রস্তুত?

'কহিনী' চলতে চলতেই, 'কহিনী' শুনতে শুনতেই ভুটকীর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে সেই ভঙ্গিতে চাঁদবদ্‌নীর 'বাজু' আঁকড়ে ধরে বলল, ওলো শুন্ ন লো, গুড় হয়ে যাক, তাবাদে 'খদ্দা' লিব-অ। কী তাই ত?

আগুন নিভে গেলে, কী থাকতে থাকতেই পোড়া-আঙরা গুঁড়ো করে মহুলের রসে মিশিয়ে 'ভাবুর কাঁটা' দিয়ে হাতের কব্জিতে তালুর পিঠে মুখের থুতনিতে কী টোল-পড়া গালে ফুটিয়ে ফুটিয়ে খোদাই করা হয়ে যায় কত বিচিত্র ছবি আঁকিবুঁকি!

কত দূর দূর দেশ থেকে এসে 'খোদানীরা' চিরজীবনের কালিতে দাফন ছুঁচে এক কুনকে চাল কী দুআনা চার আনার বিনিময়ে বুকের ছাতিতে কব্জিতে ফুটিয়ে ফুটিয়ে রক্তে মিশিয়ে লিখে যায় 'রামসীতা" 'জয়জগন্নাথ" নিদেন পক্ষে নিজের নামটুকু, আরো আরো কত শত ছবি ইস্কাফন-রুইতন-হরতন-চিড়িতন।

মহুলের রসে কাঠকয়লা গুলে বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে ঈষৎ-কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে চেপে সহ্য করে এ-তল্লাটের লোধা-ভুঁইয়া-ভূমিজ-সাঁওতাল-কাম্‌হার-কুম্‌হার মেয়েরা তো 'খদা' আক্‌ছার নেয়।

তবে সে কী আর ঘাগরা পরা বুকে জামা এ্যাই লম্বা লম্বা চুলের বেণী কোন্ অলৌকিক অজান্তিক মুলুক থেকে আসা হল্‌বলি 'খোদানী' মেয়েদের মতো চিরস্থায়ী হয়? সে তো বড়জোর দুদিনের, খেলা খেলা, খালের জলে বিলের জলে গা ধুতে গা ডলতে মলতেই আবছা, উধাও হয়ে যায়।

চোখ ঠেরে মাথা নেড়ে চাঁদবদ্‌নী সায় দিল—হ্যাঁ, গুড় হয়ে যাক, তারপরেই তারা আঙরা-গোলা মহুলের রসে ভাবুরকাঁটা ডুবিয়ে ইচ্ছামতো 'খদা' আঁকবে। ঠেকা-পাছিয়া তো ভরে গিয়েছে মহুলে—আর অত চিন্তা কী?

চিন্তা নেই, চিন্তা নেই। নিশ্চিন্ত চাঁদবদ্‌নী এবার তার গল্পের বুড়োকে বাঘ-বাঘিনীর হাঁ মুখে গুঁজে দিল।—আমার বড়ই দুখ্, বাঘ তুই আমাকে খা।

বাঘ বলল, খালি খালি খাব কেনে, তার চাইতে তুই বুড়হা এক কাম কর।

কী কাম?

মেলাই গয়নাগাঁটি দিলম—এই লিঞে তুই বুড়হা ঘর যা। বেটার বহুদের দেখা। ওরা তোকে আর অপছেন্দা করবে নাই।

হাগুলমাগুল হয়ে যায় ভুটকীর সবকিছুই। গুড়ে 'ফুট' এসে গেল, খাপরার ডেগের হেথাহোথা একেকটা বিন্দুর চারধারে ঘুরে ঘুরে গুড় ফুটছে বুগ্ বুগ্ করে। কোথায় মহুলের মদের এক চুমুক দুই চুমুক তিন চুমুক। তার সঙ্গে বুড়হা ব্রাহ্মণ—তার সাতবেটা-সাত বেটার বউ-বাঘ-গয়নাগাঁটি এসবের সম্পর্ক কী? সময় সময় চাঁদবদ্‌নীটা এমনসব করে না! বলছে তো বলছে, করছে তো করছে, চলছে তো চলছে, চুপ করে আছে তো আছে—

চাঁদবদ্‌নী বলেই চলে, জানিস লো ভুটকী, বুড়হামানুষটা বাঘের মুখ থিক্যে ত ঘুরেই আইল। তাকে আসতে দেখে সাতবহুও সাত মুখে বলতে লাগল—হায় দ্যাক্, আমাদের শ্বশুরকে ত বাঘেও ছুঁল নাই? তার পিছ্কে যখন দেখল গয়নাগাঁটি তখন কী হাঁপরহাঁটি—বুড়হাকে এই বহু একবার আদর করে, বুড়হাকে ঐ বহু একবার আদর করে—

চাঁদবদনীর হাবে-ভাবে অঙ্গভঙ্গিতে আদরের বহর দেখে ভুটকী তো হেসেই মরে।

দুজনেই হাসে। হাসতে হাসতে মনে-মন ভাবে, বুড়হাকে ঘরে ঢুকিয়ে কেউ কেউ ঘরে আগড় দিল না ত? তারপরেই ভাবল, ঢড়ঢড়ে বুড়ো ঘরে আগড় দিলেই বা করবে কী? একসময় গয়নাও ফুরিয়ে আসে, বুড়োর আদরও শেষ হয়ে যায়। এতক্ষণে গয়না ফুরোনোর কথায় ভুটকীর মনে চাগাড় দিয়ে ওঠে একটা 'নাকফুল'।

'নাকফুল' অর্থাৎ নাকছাবি। উঁহু, নাকপোঁটার মতো নোলক সে চায় না, সে চায় বড়জোর একটা নাকছাবি। পাক বা না পাক, চাইতে দোষ কী? কিন্তু কার কাছেই বা চাইবে? সে-বাঘ কী আর আছে?

এক দিতে পারে কালপুরুষা। নানান ভেক ধরে সে তো ঘুরে বেড়ায় বনে-জঙ্গলে মাঠে-ঘাটে টাঁড়-টিকরে। কিন্তু নাকফুল দেয়ার নাম করে সে যদি ঢালতে চায় কাল্‌বীজ?

ঢালে ঢালুক—

কুড়োনো মহুলে ভরে গিয়েছে ঠেকা-পাছিয়া, লোধামেয়্যা এখন যা কিছু ভাবতে পারে, দিতেও পারে যা কিছু। আড়চোখে নিজের 'বোস' দেখতে দেখতে, চাঁদবদ্‌নীর 'বোস'-এর সঙ্গে নিজের 'বোস'-এর তুলনা করতে করতে ভুটকী আচমকা চিল-চিৎকার করে উঠল, ওল্লো মুখপুড্ডি! সব যে পুড়ে গেল ল্লো!

চাঁদবদ্‌নী বড়ই নিপুণ 'গুড়িয়া', দক্ষ কারিগর। কাঠিখুঁচি দিয়ে নেড়ে-চেড়ে এমন করে দিল যে গুড়ের সাধ্য কী পুড়ে যাবে হুট করে! পুড়ল না, যেমনকার গুড় তেমনই থাকল। বরঞ্চ 'চিটা' হয়ে গেল একটু বেশি বেশি! তবে সোয়াদ বাড়ল বৈ কমল না।

মহুলের চিটাগুড় খেতে খেতে ফের শুরু করে দিল চাঁদবদ্‌নী, তারপিছ্কে শুন ল্ল ভুটকী। গহনাগাঁটি যেই ফুরাঁয় গেল অম্নি শুরু হয়ে গেল সাতবহুর গঞ্জনা—এত লোকে মরে আমাদের শ্বশুর কেনে মরে না? আমাদের শ্বশুর কেনে মরে না?

বুড়হা ঠিক করল—এবার সে নির্ঘাত মরবে। "মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব"—বালকসঙ্গীতে শোনা 'হাটুয়াদের' মুখের গানটা বুড়হার মুখে অবিকল বসিয়ে দিল চাঁদবদ্‌নী।

আন্ বাঘ কাঠ-পাতা পাল্‌হা-পতর! বুড়হার কথামতো বাঘ, বাঘের বহু কাঠ-পাতা পালহ্যা-পতর কুড়াঁই আনল। বাম্‌না বলল, এবার কেরাসিন আন্।

বাঘ, বাঘের বহু হাটে চলল কেরাসিন আনতে। কেরাসিন আনলে বুড়হা বলল, কাঠ-পাল্‌হায় ঢাল!

··লল।

জ্বাল মাচিস খাড়ি!

জ্বালল।

দাউ দাউ আগুন, লহ লহ আগুন, মনের দুখে বাম্‌নাবুড়হা সেই আগুনে ঝাঁপাই পড়ল!

বাঘ ভাবল চোখের ছামুতে এত ভাল বুড়হাটা যখন মরেই গেল তখন এ ছার পরাণ আমিই বা রাখব কেনে? বুড়হার দেখাদেখি বাঘও ত ঝাঁপ দিল আগুনে।

ভুটকী মহুলফুলের চিটাগুড় তাহুত করে খেতে খেতে বুঝল— বাঘ গেছে, এবার বাঘবউও তো পুড়ে মরবে। বাঘের বিহনে বাঘবউয়ের আর বেঁচে থেকে লাভ কী?

বাঘবউকে পুড়িয়েই মারল চাঁদবদ্‌নী। বামুন গেল, বাঘ গেল, বাঘিনীও গেল—গল্প তো ফুরিয়ে গেল? তা নয় কোত্থেকে একটা 'গুঁড়ুর পাখকে' হাজির করল চাঁদবদ্‌নী।

গুঁড়ুরপাখ-গুড়গুড়ি পক্ষী-যে কী না একটানা গুড়-ড়-ড়-ড়-ড় গুড়-ড়-ড়-ড়-ড় শব্দে লাটাপাটা ডুবকা-ডুংরি মাৎ করে দেয়, সে গাছের ডালে বসে থেকে চোখের সামনে তিন-তিনটে মহাপ্রাণকে আগুনে ছারখার হয়ে যেতে দেখে তো একবারে থ। এ কী হচ্ছে! হায়! হায়!

সে নিমেষে ফর্‌ফর করে উড়ে গেল পাশের জলায়। ডানা ভিজিয়ে জল নিয়ে এসে ঝাড়তে লাগল আগুনে। ঝাড়ছে, ঝেড়েই যাচ্ছে।

কিন্তুক ঐটুকু পাখ তার ডানায় ক'ফোঁট্‌কা জল ধরে! দাউ দাউ আগুন ঐটুন জলে নিঝ্‌বে কী করে! নিঝল নাই, নিঝল নাই। জান্নিস লো ভুটকী, মনের দুখে গুঁড়ুরপাখও ঝাঁপ দিল্ল আগুনে। হামার কহিনীও ফুরাঁয় গেল।

দাঁড়া লো দাঁড়া, গুঁড়ুরপাখির মৃত্যুতে সত্যি সত্যি কাতর ভুটকী এতক্ষণে বলল, পর্‌থমে গেল বামুনঠাকুর, তার পিছুকে বাঘ, বাঘের পিছু পিছু বাঘবহু. তারও পিছুকে গুঁড়ুরপাখ—

হঁ মিল মিশ হয়ে জানবি মহুলগাছ।

ভুটকী তো থ। সে 'গুড়-চাটা' বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে গাছের দিকে। নির্দোষ বৃক্ষ, কে বলবে এই গাছ জন্মাতে চার-চারটা মহাপ্রাণ বলি হয়েছে! মৃতদেহের ছাই মেখে গাছ এত সবুজ হয়েছে!

ঐ তো নড়ল একটা পাতা, ঐ তো টস্‌ করে খসে পড়ল একটা বুড়োপাতা। বেলা উঠছে, দোরখুলির ওদিকে এতক্ষণে উঠে গিয়েছে অনেকটা, পশ্চিমে তপোবনের এদিকটায় আলো আসতে দেরি হচ্ছে। তবু তো উলুরি-ঝুলুরি.ল-লতা পাল্‌হা-পতরের ফাঁক দিয়ে ঝিলমিলে রোদ।

হাসছে, মহুলগাছটা হাসছে।

হাসছে, ন কাঁদছে?

ভুটকীর মনে হল, গুঁড়ুরপাখটাকে বুকে জড়িয়ে, ডাল্‌হা-পাল্‌হায় মুড়ে নিয়ে মহুলগাছটা 'বিনায়ে বিনায়ে' কাঁদছে।

কাঁদ্‌ মহুলা, কাঁদ্‌।

চাঁদবদ্‌নী বলল, তা বাদেও কথা আছে ভুটকী, মহুলমদ ত খাস নাই, একবার খাঞে দেক্‌খিস্‌।

খাইলে?

হব্বে।

মুরুব্বির মতো চাঁদবদ্‌নী বলল, খাঞেই দ্যাক্‌ না!

ভুটকীও কম যায় না, বলে মনে কর—এই খেলম—

হঁ খাচ্ছিস ত? পরথম বোতল খাঞে কেমন লাগছে?

নাই জানি।

জান্ তবে—পরথম বোতল খাইলে ভাল ভাল—ঐ ভালমানুষ বামনাবুড়হার মতন লাগবে। কারণ ঐ ত মরেছিল পরথম।

আর দু বোতলে?

আগে ত খা!

মিছামিছি মিছামিছি, হাসতে হাসতে দু'নম্বর বোতলটাও খেয়ে ফেলল।

খাইলি ত?

হঁ খেল্লম।

কেমন লাগছে?

সে ত নাই জানি।

জানবি, জানবি। দু'বতল মেরে দিল্লেই বাঘ-বাঘ করবি, বাঘের পারা গর্জাবি। বামুন বুড়্হার পিছু পিছুই ত বাঘ বাঘবহু মরেছিল 'নিয়ায়' পুড়ে।

হঁ, তাই ত।

ভেবে ভুটকী থলকুল পায় না—কার সঙ্গে কী, কোথাকার জিনিস কোথায়। চাঁদবদ্নীও এত জানল কী করে? না হয় সে খুব বুদ্ধিমান, তবু, তাহলেও—

আর শুনবি তিন বতল খাইলে কেমন লাগবে?

হঁ হঁ বল্ ন্ন।

চাঁদবদ্নী বলল, যেই তিন বতল খাব্বি সেই গুঁড়ুরপাখের পারা 'ঘন্টে' পড়বি। বলতে বলতে সত্যি সত্যি ডিগ্‌বাজি খেয়ে আবার উল্টে পড়ল চাঁদবদ্নী।

তার দেখাদেখি ভুটকীও। ডিগবাজি খেতে খেতেই সে বলল, হঁ এত্খনে সব বুঝলম।

তারা আজ এত এ-ত মহুল পেয়েছে যে আনন্দে কিছুক্ষণ শুকনাডাঙায় কাঁকর-ভিজা শুকনা পালহা-পতরের উপর গড়াগড়ি খাবে। চাই কী আজ তারা এমনি ধারার ডিগবাজি খেতে খেতেই পৌঁছে যাবে লোধাপাড়া।

মহুলের গুড় খাওয়া তো হল, এবার তারা কাঁচামহুলের রসে পোড়া-আঙরা গুলে 'খোদকারির' কাজ করবে, খোদাই করবে। লতাপাতা আঁকবে আর নয়ত ফুলপাতা।

লিখতে তো মন চায় হাতের কব্জিতে মণিবন্ধে 'চাঁদবদ্নী মল্লিক' 'ভুটকী মল্লিক'। আরো কত হাবিজাবি ঠাকুর-দ্যাবতার নাম। কিন্তু ক অক্ষর গোমাংস, কালি-ধোওয়া জলও যে এতদিনে পেটে পড়ল না!

এত গভীর জঙ্গলে ভাবুরগাছ ভাবুর কাঁটা না মিললেও মিলতে পারে বেলকাঁটা পিট্না-সিজের কাঁটা। তারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল ভুটকী। আজ সে হাতের কব্জিতে চাঁদবদ্নীকে দিয়ে আঁকা করাবেই করাবে 'মাছ কাঁটা'।

বেলকাঁটা কী পিট্না-সিজের কাঁটা আনতে দু পা গিয়েছে কী যায়নি ভুটকী, আচমকা চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘাড় ঘুড়িয়ে সে দেখল—পাথরডহরা কী বিরিবাড়িয়ার দু-পাঁচজন, সঙ্গে এক-দুজন বিটিছানাও আছে, ঠেকা-পাছিয়াভরতি সব মহুল কেড়ে নিয়ে হম্বিতম্বি করছে, বলছে, বাপের গাছ পেয়েছিস খালভরি? নিড়মুড় করে সব মহুল যে কুঁড়াই লিয়ে যাস রোজ রোজ?

হঁ তর বাপের গাছ ন চৌদ্দপুরুষের, বল্ ছেমড়ি?

একজন তো লাঠি হাতে হাতের লাঠিটাকে ক্রমশ এগিয়ে-পিছিয়ে অশ্লীল ভঙ্গি করে হেসে হেসেই বলছে, বারবার বলছে, খুল্ শালি, খুল কাপড়।



জামাটা ছেঁড়া। তাও ঠিক বগলের কাছটায়।

ছেঁড়া জামাটা ছাড়া আর তো জামা-ই নেই। ছিলও না। থাকলে কী আর এই পরে আসত?

আসত না, হরগিজ্ না। এখন কী রকম যেন লাগছে। কী রকম—পুনোই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বুঝে উঠতে পারছে না, বুঝে উঠতে পারছে না—

একে তো বেতের ডগাটা থ্যাত্‌লানো, ছ্যাত্‌রানো। টেবিলে আছাড় মেরে মেরেই মাষ্টার ঝুন্‌ঝুনিগাছের বেত-ছড়িটা ছ্যাত্‌রে ফেলেছে।

সেই ছ্যাত্‌রানো ডগাটা এখন ছেঁড়া জামার ফুটোর ভিতর দিয়ে বগলের আশেপাশে শরীরের হেথা-হোথা হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। ছড়ি-হাতে মাষ্টারের চোখদুটো বোজা।

পুনোইয়ের কী সুড়সুড়ি লাগছে? গির্‌গিতি?

হঁ হঁ এত্‌খনে—

মাঠঘাট ডুবকা-ডুংরি, কী নিদেনপক্ষে লোধাবস্তির খলা-খামার জইড়তল-বড়তল ধ'তল-শালতল, এমনকি ভুগড়াঘরের পাছ্‌তল হলেও, মাষ্টার-ফাষ্টার যে-কেউ গিরগিতি দিলেই পুনোই এমন হা-হা হি-হি করে হেসে উঠত যে তোমার 'এত্‌খনে পলয়' হয়ে যেত।

প্রলয় বলে প্রলয়, গাছের মগডালে একঝাঁক পাখি বসে থাকলেও পুনোইয়ের হাসির হল্লায় ছর্‌রার মতো সে-পাখি উড়ে যেত না ফুর ফার? ঝিমন্ত পাখি পুনোইয়ের আন্‌সাটকা হাসিতে বেভুলে ঘাড় উল্টে পড়ে যেত না থুপ্ করে?

কত কী যে হতে পারত! হয়ত হাসির লহরায় পুনোইয়ের 'আঁটা দড়িটাই' ছিঁড়ে পড়ত ফটাস্ করে। আর তখন পেট খুলে মনের সুখে কত হাসবি হাস।

আর এখন পুনোই কী না হাসতে পারছে না। পুনোই হাসতে পারছে না, পুনোই হাসতে পারছে না। কাঠ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে সে কাঠ-কাঠ।

বাঁদরের লোমঅলা ল্যাজুড় দু'নাকের ফুটোয় ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। অথচ হাঁচি আসছে না। কিংবা ধরো, ডুমো ডুমো ছাগল-হাঁচি ফল দু'নাকের ফুটোয় ঠুসতে ঠুসতে ফুটো দুটো বুজেই এল, তবু এখনও হাঁচতে পারছে না।

পুনোইয়ের হয়েছে সেই দশা আর কি।

উঠে-আসা উদ্‌গত হাসিটাকে দাঁতে কামড়ে কামড়ে ধরছে পুনোই। দাঁতে কামড়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করছে।

কী পারে? কী অতই সহজ? 'গির্‌গিতি'র হাসি তোমাকে উস্তন-খুস্তন করে মারবে না? নাস্তানাবুদ?

পুনোইয়ের মনে হচ্ছে, এই বুঝি সে হেসে উঠবে। আর পারছে না। পারছে না, পারছে না—

যেন মনে হচ্ছে, দোরখুলির লোধাবস্তির ওদিক থেকেই একটা ঘুরঘুরে হাওয়া বাও-বাতাস, যাকে বলে 'বিড়োল', ঘুরতে ঘুরতে ধুলোয় ধুলাক্কার নোংরা-জবরা জড়াতে জড়াতে সুখজুড়ি-নারদা-নিগুই পেরিয়ে বাবুইদড়ির বন-বাদাড় মাড়িয়ে শন্ শন্ করে আন্‌সাটকা চাঁদাবিলার এই ইস্কুলঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে একদম ভিতর-ঘরে এসে পড়েছে, আর তো নিস্তার নেই।

নেই নেই—

পুনোই তরাসে চারধারটা একবার তাকিয়ে দেখল। দেয়ালে কত দিনকার উইপোকার ঢিবি, পুনোইয়ের মনে হল দিয়ে দেয় দু-চাট্টা লাথি ঢিস্ ঢিস্। ঢিবি ভেঙে পিল্ পিল্ করে বেরিয়ে আসুক পোকারা, ছড়িয়ে পড়ুক সারা ইস্কুল-ঘরটায়। সাদা সাদা পিঁপড়াপোকা। কয়ের-তিতিরে খায় খুব।

কয়ের-তিতিরে খাক বা না খাক, উইপোকারা এখন নির্ভয়ে ওদিকে যাক। ওদিকে, ওদিকে—ঐ যে কাঠ-বেঞ্চিতে যেখানে সার সার বসে আছে হাটুয়া ছা-ছুআরা। কেমন 'ডাঙস্ ডাঙস' চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে।

—তোদের উর'ম চোখ গেলে দিব-অ রে নিরবংশা-নিরবংশীরা! মনে-মন বলল পুনোই।

বলতে বলতেই ঝট্ করে চোখে পড়ে গেল তার—হাটুয়াঘরের ছুআ বাঈধরো না বাঞ্ছানিধি, কী যেন নাম, কী যেন—পুনোইয়ের বসবার ছেঁড়া চট্‌টি পা দিয়ে খুব তো 'ম্যাচড়াচ্ছে'!

আসলে 'ছোট বাইরে' সারতে গিয়েছিল বাইরে, ভিতরে এসে পায়ের ধুলো বালি ঝেড়ে ফেলছে বাঈধর। তবে ঝাড়বি তো ঝাড়্—খোদ পুনোইয়ের বসবার জায়গাটাতেই? ঘর থেকে বগলদাবা করে নিয়ে আসা ছেঁড়া বস্তাটাতেই?

ও-হো-হো রে লিলাজ ছুআ—

আর এই করে তবু তো কিছুক্ষণ, তবু তো কিছুক্ষণ চোখটাকে মনটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারল পুনোই। হাসিটাকে গিলে ফেলতে।

কী ঘুমিয়ে পড়ল মাষ্টার? বেতটা তো আর নড়ছে না? নাকি অসাড় হয়ে গিয়েছে জায়গাটা? নড়তে নড়তে, হাসি চাপতে চাপতে এতক্ষণে আর কোনো 'সাড়' নেই। সাড়া শব্দ নেই।

এবার ভাবুরকাঁটা দিয়ে বিঁধলেও আর বুঝি লাগবে না। লাগবে না—

পরম নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে এবার নিজের বগলের দিকে চোখ রাখল পুনোই। আর দেখল আচমকা বেত-ছড়িটা ফর্ ফর্ করে ছেঁড়া জায়গাটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে আরো আরো কিছুটা নিচে নামল।

ছেঁড়া জামাটা আরো কিছুটা ছিঁড়ে গেল। ছিঁড়ে ছিঁড়ুক, ছেঁড়া জামাটা তো ছেঁড়াই। কিন্তু আবার যে সচল হয়ে গেল বেতের ডগালটা?

তাহলে আবার তো সামান্য 'বোস-ওঠা' বগলের আশপাশে ঘোরাঘুরি। আবার তো সেই 'গির্‌গিতি'! আবার—আবার হাসি চাপতে হাসি গিলে ফেলতে পুনোইয়ের প্রাণান্ত!

চোখ বুজেই মাষ্টার বলল, এটা ইস্কুল, মহুল-কচড়া কুড়াবার জঙ্গল নয় যে যা খুশি পরে আসবি, ছেঁড়া-খোঁড়া!

বলেই বেতের ডগাল দিয়ে ছেঁড়া জামাটায় আরেকটু টান, আরেকটু ফর্ ফর্।

তাই দেখে কী হাসি হাটুয়া ছা-ছুআদের! খিঁক খিঁক করে, হো হো করে, হাঁউ হাঁউ করে—

মাষ্টারের গোঁফের তলায় তলায়ও হাসি।

হাসি এসে যাচ্ছে পুনোইয়েরও। এক হাঁড়ি হাসি, এক গামলা হাসি, এক 'গাড়িয়া' হাসি, এক ডুংরি হাসি, একবন হাসি—এত এত্ত হাসি—অঝোরঝর্ হাসি—

পারলে হাসিতে আঁক-পাঁক করা পুনোই দু'হাতের বেড় দেখিয়ে হাসির পরিমাণ দেখায়, কিন্তু পারছে না। হাসিতে 'থকো বকো', কিন্তু হাসতে পারছে না পুনোই।

হাটুয়া, কাম্‌হার-কুম্‌হার ছা-ছুআদের যত হাসি হৈ-হল্লা যত উৎসাহ ততোধিক উৎসাহে চোখ-বোজা মাষ্টার বেতের ডগাটা নাড়তে থাকে, নাড়তে থাকে—

আর এদিকে পুনোই গলা অব্দি উঠে-আসা হাসি চাপতে ততই ফন্দি আঁটে। যেমন ওল তেমনি বাঘা তেতুঁল। কত নাড়বি নাড়!

ভুলে থাকতে, মনকে ভুলাতে মনে মনে আঁদাড়ে-কাঁদাড়ে কত ক-ত জায়গায় যে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে পুনোই! টঙ টঙ করে, টঙস্ টঙস্ করে।

গেল খালধারে, সীতানালার পায়রা-চঁচ্‌রা জলে। গেঁড়ি-গুগলি তুলতে, খঙা-বঙা খুঁজতে।

পাওয়া কী যায়, সব তো আগেভাগেই সাবাড়! হড়-গিদ্‌রে কাম্‌হার-কুম্‌হার হাটুয়া-বাটুয়া—যতসব চোর-চুরনীদের জ্বালায় আর একটা কিছু কী পাওয়া যায়!

মনে-মন বলতে বলতে পুনোই খালের জলে হেঁটে চলেছে। ছি-র্-র্-র্ ছা-র্-র্-র্-র্ জল দু'পায়ের পাতায় ছিটিয়ে চলেছে। খরায়-মরায় আর কতটুকু বা জল!

গেঁড়ি-গুগলি নেই, খঙা-বঙাও শেষ—তো মন গেল শাক তুলতে। তুলি তুলি।

কী শাক লো? চেঁকা?

চিরোল চিরোল চেঁকা, ভেলভেটের তুল্য শুশনি, নাহাঙা, ঘোড়াকানা, স্মরস্তি,—আগে আগে কত কী শাকে ভরে থাকত খালের জল খালধার বনবাদাড়!

এখন সে সব আর কোথায়, সব তো লুটে-পুটে সাবাড়। 'পোঙ' ফুটল কী ফুটল না, চিরোল চিরোল পাতা গজালো কী গজালো না—হাজারটা 'আক্‌খুটি' হাত হামলে পড়বে।

'ডগ্' তো 'ডগ্' 'লত্'টুকুও ছিঁড়ে ফেলবে। আগা-মুড়া এক নিমেষেই কাবার। গোড়া বিহনে গাছ কী আর বাঁচে? না লতিয়ে লতিয়ে ভেলভেটের তুল্য ছেয়ে ফেলবে খালের জল? খালধার?

উঁহু, পোষাচ্ছে না, সব তো বুড়ো-হাবড়া। ডগ-ছেঁড়া, হল্‌দা হল্‌দা শাক। পুনোই ঘুরে দাঁড়ায়, সে যাবে এখন কুমারডুবি জলায়। জলায় এখনও অন্ন আছে। কাজলপাতিশাক আছে।

কাজলপাতিশাক, কাজললতার মতো দেখতে শাকপাতার কুঁড়ি-গহ্বর, গর্ভাধান। তার ভিতরে তার ভিতরে 'লটো পটো' হয়ে শুয়ে আছে ফুল-পুষ্প। সে-ফুলের রঙ কী 'বন্ন' কী! ফুটলে 'আলা' হয়ে যাবে না কুমারডুবি জলা?

জলে থুতনি গুঁজে মনে মনে এখন গেঁড়ি-গুড়লি তুলছে পুনোই। কোমর বেঁকিয়ে জলে ছল্‌কে ছল্‌কে শাক তুলছে পুনোই। কাজলপাতিশাক। পুরু ভেলভেটের তুল্য। কাজল-লতার তুল্য।

কিন্তু তাতেও মন থাকল না পুনোইয়ের। সে যেতে চায় আরেকটু এগিয়ে নদীধারে, পাল জমিনে। যেখানে নদীর পলি পড়ে পড়ে মাটি হয়ে আছে 'সোঁসল' উর্বরা। হাটুয়াদের মাটি। যে মাটিতে ঘলঘসিশাক, ঘলঘসি ফুল বা দ্রোণ পুষ্প লাটকে লাট—

না, ঘলঘসিতেও মন দিল না পুনোই। টঙস্ টঙস্ করে সে হাঁটছে তো হাঁটছে। চিল উড়ছে, কুঁড়-বক। ট্যাঁসা-ঢেপচু।

হাটুয়া ঝিউড়ী-বউড়ীরা নদীতে যাচ্ছে গা ধুতে, কাপড় কাচতে। গুটুলে চিঁড়রা-চটি-ক্যাঁকলাস মারছে ন্যাঙট-ন্যাংটি পরা সাঁওতাল ছা-ছানারা। বাঁশঝাড়ে, কুসুমগাছে। 'ঢড়া-ধারে'।

কুম্‌হার বাবু-ভায়েরা 'মাহাজন'রা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মাটিখানায়। কোদাল-কুরপি হাতে, মাটি তুলতে। ঝড়াঝুড়ি বগলে ঝিউড়ী-বউড়ীরাও বসে আছে আশায় আশায় মাটি ভরতে। তারা 'দোক্তা' খেয়ে এখন কথায় কথায় পুচুর পুচুর করে থুথু ফেলছে। হেলছে-দুলছে, হাসছে।

বলে কত কী সুখ পড়ে আছে এখন মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে, আর পুনোই কী না ইস্কুল-ঘরে পড়ে পড়ে 'গির্‌গিতি' খাচ্ছে! 'গিরগিতি'!

এক ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে পুনোই ফের দৌড়ুল জঙ্গলের দিকে। জঙ্গল জঙ্গল। বন-

কাঁকড়ো বন-কুঁদরীর লত্ এ-গাছ সে-গাছের উপর ভর দিয়ে লহ লহ করে বেড়েই চলেছে। বেড়েই চলেছে। হল্‌দা হল্‌দা সাদা সাদা ফুলে আর কদিন বাদেই ভরে উঠবে গাছ-মাচান, বন-বিতান। ভেলা-ভুড়রু বেল-কোত্‌বেল কেঁদ্-কুসুমে ছয়লাপ! কুড়চি ফুটবে বন 'আলা' করে, আঁটারির ডগ্ ঝুলে পড়বে ফুলভারে। বনটিয়া-হরিয়াল-মুনিয়া, দলে দলে কত কারিকুরিপাখি আসবে ডাহি-ডুংরিতে, 'আসধান' খুঁটে খেত। পাকা ফল-পাকুড় ঠোকরাতে আসবে তিড়ুন, টিড়লিং—। আর আসবে সেই যে সেই পাখিটা—

যাকে কেউ কোনোদিন দেখেনি, লোধাপাড়ার জনমান্নিও না, রাইবুলোধাও না। খালি আসন্তি-যাওন্তি হঠাৎ হঠাৎ ডাক শোনা। আর সে কী রকম যেন ডাকে—

টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু!! উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ—

মনে মনে জঙ্গলে ঢুকেই ডাকটা শুনতে পেল কি পুনোই? —ঐ ত, হাঁ হাঁ ঐ ত সে ডেকে চলেছে ধুলমাদুল। —উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ—

যেন কানের কাছে 'ঘাগর' বেজে চলেছে একটানা। একঝাল দু ঝাল তিনঝাল, তিন সহস্র ঝাল—

শুনতে শুনতে পুনোইয়েরই কান যেন বুজে আসছে। এই ডাকল তপোবনের জঙ্গলে তো পরক্ষণেই সে ডেকে উঠল নারদা-নিশুইয়ের ওদিকে। সুখজুড়ির জঙ্গলে ডাকা ডাকটা জুড়োতে না জুড়োতেই 'বিজকুড়ি'র মতো ডাকটা ভেসে উঠল দোরখুলিব জঙ্গলে কী ঘোড়া-টাপুর জঙ্গলে।

মূঢ়াকাটি-রুখনীমারা-ডাঙাসাহি-কদমডাঙা—কোথায় না 'চঁচরা' ফুলিয়ে পাখিটা ডাকছে! ডাকতে ডাকতে এই চলে গেল মাথার উপর দিয়ে তো ডাকতে ডাকতে এই এসে গেল 'কানচলে'।

একটা পাখি কী? না দুটি? একলা না দোখলা। ঠিক পাখি-ই তো? না ভ্রম? কেমন যেন হাগুল-মাগুল হয়ে যাচ্ছে পুনোইয়ের। সে কড়ে আঙুল দাঁতে কামড়ে থুথু ছেটোল বুকে। আর নিমেষে—

কোথায় যে উধাও হয়ে গেল পাখিটা।—উ-ল টু-টু টু-টু-উ-উ—গুঁড়োঝরানি ডাকটাও আর নেই। যেন কেউ বলল 'থাম' আর পাখিটাও থেমে গেল, থেমে গেল বোতম-টিপা কলের পাখির মতো।

পুনোই এবার নির্ভয়ে ঢুকল জঙ্গলে। যেখানে শালেব বন, কেঁদুর বন, আসনবন—মেশামেশি মেশামেশি। তার ভিতরে ভিতরে কোথাও বা একটা-দুটো কচড়াগাছ—

মহুল-কচড়ার মাস, মহুলগাছ থেকে রদো-বদো মহুল ঝরছে। মহুল ঝরে ঝরে গাছতলা 'ধবোয় ধবো'।

পুনোই দেখল, কে যেন দুহাত লম্বা করে মহুল কুড়োচ্ছে, আর হাসছে। এত মহুল কুড়োতে কুড়োতেই তার 'গির্‌গিতি' লাগছে। আর সে 'গিরগিতি' খেয়ে হাসছে।

হাসছে একা একাই, হি-হি করে। হো হো করে।

—অরে 'হাটুয়া ছুয়া'! বেড়ে যে তোর ফুর্তি! আপনার মনে বলে পুনোইও হাসল।

হাটুয়ারা, দঁড়পাট মহাজনেরা, গাছের মহুল কুড়োয় না। তারা মহুলের কাজকাম জানে না, কারণ তারা মহুলের কারবারী না। তবু যে মহুয়াগাছতলায় মহুয়ার ফুল নিয়ে 'হাটুয়া-ছুআর' এত কাড়াকাড়ি এত হাবড়াহাবড়ি?

হঁ-অ, পুনোই যেন বলল, এত-অ মহুল লিয়ে তুই বা কী করবি, ছোটো মাহাজন?

দু'হাতে দু'খামচা মহুল তুলে পৌষমাসের টুসুর মতো দু'হাত দু'দিকে মেলে ধরে হাটুয়া-ছুআটা বলল, আমাদের গাছের মহুল আমি যা খুশি করব। বিলাব, গুড় করব, মদ চুয়াঁব—মাগনা টুকচার লিবি যদি ত আয়, আয় না লোধামাইয়া!

ঘন ঘন ডাকতে লাগল হাটুয়া-ছুআ।

হাসতে হাসতে মাথার চুলে চোখ-মুখ ঢেকে ফেলে পুনোই বলল, হামি? নাই-ন-ইঁ-অ—

বলেও পা পা করে হতভম্বের মতো এগিয়ে চলল পুনোই, এগিয়ে চলল হাটুয়া-ছুআটার দিকে। মহুয়াগাছটার দিকে, মহুলশস্যের দিকে।

মনে মনে বলতে বলতে গেল, যাচ্ছি ত মিছামিছি। 'শুধাইমুসুন'। সত্যিকারের যাওয়া তো আর নয়, শুধু শুধু যাওয়া। কতদূর কী করতে পারে করুক না হাটুয়া-ছুআ।

হাটুয়া-ছুআ হাটুয়া-ছুআ।

হাটুয়া ডাগর ছুআটা মহুল কুড়োল, সে-মহুল গাদা করল। একগাদা মহুল চুড়চুড়। তারপর বেরুল শুকনো কাঠ-পাতার সন্ধানে। কাছে-পিঠের ডাহি-ডুংরিতে। লাটায়-পাটায়!

পুনোইও হাত গুটিয়ে বসে থাকল না। প্রথম প্রথম নখে টিপে সে দেখল—এক ফোঁটকা মহুলফুলে কত বেশি রস। রসে টইটম্বুর। যেন জলের টোপা একেকটা। টিপে দিলেই জল গড়িয়ে পড়বে। জলভরা।

দুয়েকটা মুখেও পুরল বা পুনোই। 'মহু মহু'—।

মধুই তো। পুনোই উঠে পড়ল। কাঠি-খুঁচি খুঁজতে, পাল্‌হা-ঝাঁটি টানতে। লোকটা গেছে কাঠ-পাতা আনতে ডাহি-ডুংরিতে।

কাঠ-পাল্‌হা জোগাড় করে হাটুয়া-ছুআ আগুন জ্বালবে। রুমু রুমু আগুন। সে-আগুনে মহুলের রস মেরে গুড় হবে। রস ফুটবে বুগ্‌ বুগ্‌ করে। বনবাদাড় চারধার 'মহকাবে'। 'মহকাবে।'

লটপটি গুড়ের আশায় পুনোইও হাত লাগাল। পাল্‌হা-ঝাঁটি টানতে, কাঠ-পাতা কুড়োতে।

অবশেষে ট্যাকের 'ম্যাচিস্‌' খুলে আগুন জ্বালল হাটুয়া-ছুআ। লহ লহ আগুন। সে-আগুনে গুড়ের 'ডেগ' বসল। ডেগ-ভরতি কাঁচা মহুলের রস। আদড়া, সামান্য কষা কষা। পুনোই নিজেও খুব মন দিয়ে রস নিঙড়াল।

রস থেকে বাছল পাতা-পত্তর। নোংরা-জব্‌রা। ডান হাতের আঙুলের ছাকনা দিয়ে। যেন এ-কাজ তারই করার কথা, সে-ছাড়া করবে কে? হাটুয়া-ছুআর আর আছৌো কে? শুধু মাঝে মাঝে চোখে-মুখে উড়ুখড়ু ঝাঁপুড় চুল এসে পড়লে বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ফেলছিল পুনোই।

আর তখনই চোখাচোখি হচ্ছিল পুনোইয়ের সঙ্গে হাটুয়া-ছুআর। হাটুয়া-ছুআ হাসছিল!

হাসছে হাটুয়া-ছুআ, পুনোইও হাসছিল। এতক্ষণে মহুলগুড়ে পাক ধরেছে, পাক ধরতে না ধরতেই রংয়ের বাহার! রং কী—যেন বা কাঁচাসোনা! সেদিকে লোভাতুর তাকিয়ে থাকল পুনোই।

হাটুয়ারা, হাটুয়া মহাজনেরা, মহুলের গুড় করে না। তারা করে আখের গুড়, 'আখুগুড়'। নদীধারে পালজমিনে তাদের লাটকে লাট আখের ক্ষেত। 'আখুবিল'।

শীতের শুরু থেকে চৈত্রের প্রায় শেষ পর্যন্ত চলে তাদের 'আখু-শাল'। আখ মাড়াইয়ের কল। খোয়ার আগুন আর গাদের কালো ধোঁয়ায় নদীধারের আকাশ প্রায় ঢেকে থাকে।

আখের বিলে পাতা ঝম্ঝড় করে। দা-হাতে কালো মুনিষ 'আখুবিল' ঝুড়তে থাকে। ঝুড়তে থাকে।

বড়খাঁকড়ির হাটে যেতে আসতে পুনোইরা ভ্যাল্‌ ভ্যাল্‌ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। চেয়ে-চিন্তেও একটা আখ পায় না। পেলেও শেষদিকের 'আগাল'টা। যা খেতে একেবারে জল আর নয়ত নোনতা।

অথচ 'সুবল' 'ট্যানা' 'নম্বরী'—কত ভালো ভালো আখ হাটুয়াদের আখবিলে। আর রস? দাঁতে কামড়াতে না কামড়াতেই মুখের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

'আখুশালে' ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলে নতুন 'ভরা'র নতুন গুড়ে 'নজর' লেগে যাবে বলে অথবা হাত লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আখের খোয়া তুলে রোদে মেলে দিলে পারিশ্রমিক হিসাবে লোধারা পায় বড়জোর আলকাতরার মতো কালো কালো 'গদ্'। কালে-ভদ্রে 'পানা'। কাঁচা-পাকা আখের রস।

তাও পুনোই একদিনও পায়নি। কতদিন হাটুয়াদের 'আখুশালে'র আশপাশে ঘুর ঘুর করেছে, হ্যাল্ হ্যাল্ করতে করতে ছুটে আসা মাঠ-ঘাটের কুকুর যাতে না আখশালে ঢুকে পড়ে হাঁড়িকুঁড়িতে মুখ দিয়ে বসে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে 'হাড্ডি হাড্ডি বে' বলে তাড়িয়েছে কুকুর, কাক-চিল পর্যন্ত বসতে দেয়নি আখশালের টু'য়ে। তবু, তবু হাটুয়ারা হাটুয়া মহাজনেরা—

আজ যে বড় হাটুয়া-ছুয়া হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে, মাগনা টুকচার লিবি যদি ত আয়, আয় না লোধামাইয়া?

যাই না যাই, এম্নি এম্নি ত যাওয়া, সত্যিকারের যাওয়া ত আর নয়, পুনোই নির্ভয়ে থাকল। এখন কাঁধ দুটো চেপে ধরুক আর তার যা ইচ্ছা করুক হাটুয়া-ছুআ।

গুড় হল, মহুলগুড়, লটপটি গুড়। মুখে দিলে দাঁতে লটকে যায়। দাঁতে হাত দিয়ে ছাড়াতে গেলে হাতে লেগে 'ইলাস্টিকের' মতো সে-গুড় হতে থাকে লম্বা।

লম্বা, লম্বা।

চিটাল গুড় দাঁতে কাটতে কাটতে হাত দিয়ে টানে পুনোই, আর হাসে। গুড়ের আঠা ঠোঁটে-চিবুকে জড়িয়ে যায়। যতই জড়ায় ততই হাসে পুনোই।

মওকা পেয়ে হাটুয়া-ছুআ বগলে গির্গিতি দিয়ে পুনোইকে আরো হাসায়। লে, গুড় খা আর হাস। কত হাসবি!

হাসতে হাসতে চোখ বুজে ফেলে পুনোই, চোখ বুজে হাসতে থাকে। 'গির্গিতি' দিলেই পুনোই এমন হা-হা হি-হি করে হেসে যে ওঠে তোমার—

হাটুয়া-ছুআ এবার বুকের কুঁড়িকুসুমে হাত দেয় পুনোইয়ের। গির্গিতিতে এবার আরোই বেসামাল হয়ে ওঠে পুনোই। বোজা চোখ তার খুলে যায়।

খোলা চোখে সে বুঝতে পারে হাটুয়া-ছুআর। 'যা ইচ্ছা' আর বুঝতে পেরেই তার 'হু-হুঙ্কার'—তবেরে রে খালভরা নিরবংশা!

চমকে জেগে উঠল পুনোই। এতক্ষণ সে হাসি চাপতে 'গির্গিতি' ভুলতে মনে মনে বনে-বাদাড়ে মাঠে-ঘাটে কোথায় না ঘুরে বেড়াচ্ছিল!

গেঁড়ি-গুগলি স্মরস্তি-নাহাঙা-শুশনি-ঘলঘসি-চ্যাকা-ঘোড়াকানাশাক তুলছিল। মহুলের 'চিটা গুড়' খাচ্ছিল।

মহুলের গুড় খাচ্ছিল আর ভুলে থাকছিল ছেঁড়া জামার ফুটোয় ঢোকানো বেতের ছ্যারকানো ডগাটার কথা। শরীরময় চলে বেড়ানো একটা আস্ত কাঠি-খুঁচির কথা।

উথল্লে-ওঠা একটা প্রলয়ঙ্কর হাসির কথা। 'গির্গিতি'তে 'গির্গিতি'তে থকোবকো বা বিপর্যস্ত একটা হাসি-চাপার কথা।

এতক্ষণ পুনোই চেষ্টা করে যাচ্ছিল ইস্কুল-ঘরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে তার যা যা পছন্দের জায়গা সেসব জায়গায় মনে মনে ঢুঁড়ে-বেড়িয়ে গোটা ইস্কুল-ঘরটাকেই ভুলে থাকতে। ডগা 'ছ্যারকানো' বেতটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে।

এই যে হাটুয়া-ছুআর হাতে তৈরি মহুয়ার গুড় খাওয়া, নিজহাতে হাটুয়া-ছুআর গুড় খাওয়ানো, বাস্তবে যা কোনোদিনই হওয়ার নয়—আপনার মনে তাই তাই করে ফেলছিল পুনোই।

এমনকি সে চেয়েছিল হাটুয়া-ছুআর বউ হয়ে যেতে। বউ বউ ভাব নিয়ে সে তো কাঁচা মহুয়ার রস থেকে হাতের ছাঁকনি মেরে সযত্নে তুলে ফেলছিল নোংরা-জব্‌রা। মহুলের সুঙ!

এখানে ইস্কুর-ঘরে কাতুকুতু খেয়েও সে হাসতে পারছেনা, উথলে-ওঠা হাসিটাকে গিলে ফেলছে। আর তাই এখানকার গিলে-ফেলা-হাসিটাকে সেখানে যতখুশি মনে মনে উগরে দিচ্ছে পুনোই।

হাসছে। হাসতে হাসতে হাঁ-করা মুখে লটপটি মহুলগুড়ের আঠা জড়াচ্ছে তো জড়াচ্ছে। ইলাস্টিকের মতো লম্বা হচ্ছে। লম্বা, লম্বা।

রীতিমত লড়ে যাচ্ছিল পুনোই। মনে মনে লম্বা হচ্ছিল, আরো লম্বা। লম্বা, লম্বা। কিন্তু আর পারল না। মুড় মুড় করে ভেঙে পড়ল।

এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে 'ছ্যারকানো' বেতের ডগালটাকে রুখে দিচ্ছিল পুনোই। কত-অ গিরগিত্তি দিবি দে ন মার!

কিন্তু আর পারল না। গিরগিতির হাসি চাপতে গিয়ে সে একেবারে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল। তার ছেঁড়া জামার নিচে পেন্টুল ভিজিয়ে ডান পায়ের, হ্যাঁ ডানপায়েরই গা দিয়ে দরদর করে নামতে লাগল ঈষদোষ্ণ জলের ধারা।

পেচ্ছাপ করে ফেলল পুনোই।

মাটিতে গড়িয়ে পড়ে সে-জল স্তূপীকৃত চিহ্নিত হয়ে গেলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে বলে পুনোই মাটিতে পড়ার আগেই দৌড়ুল। অন্তত চেষ্টা তো করল।

কী পারে? যেটুকু পড়ার সে তো পড়লই। চিহ্ন তো থাকলই। সেই সঙ্গে থাকল একগাদা হাসি— হো হো করে হি হি করে।

থাকল পড়ে ছ্যারকানো বেত, ঝুনঝুনির ডগাল! আর থাকল পুনোইয়ের সংক্ষিপ্ত ইস্কুলজীবন। এসব ফেলে পুনোই দৌড়ুল। পড়ি-কি-মরি।

দৌড়ুনোর পরেও সে ভেবেছিল—চেপে-চুপেই দৌড়ুবে। দাঁতে দাঁত চেপে চেষ্টা তো করল। কিন্তু—

কী পারে? এতক্ষণ চেপে-চুপে রাখা জিনিসটা ছাড়া পেয়ে, বা যা হোক করে মুখ খুলে একবার ঝরতে শুরু করলে সে তো অনর্গল ধারায় ঝরবেই। ঝরতেই থাকবে।

অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ ফোঁটা ঝরে পড়ে। পুনোই তাই প্রবল ঝরাঝরির মধ্যে, পায়ের পাতা ভিজিয়ে এধার-ওধার ছিটিয়ে, দৌড়ুতে লাগল।

সে যাবে ইস্কুলের ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে থ্যাৎলানো ঝুনঝুনির ডগাল পেরিয়ে হাটুয়াদের বনডাহি-ক্ষেত-খামার মাড়িয়ে ঘুঘু-কপ্‌তি-ট্যাঁসা-ক্যারকেটার ডাকের ভিতর দিয়ে লোধাপাড়ায়, লোধাপাড়ায়—



পুনোইয়ের ইস্কুল-পালানোর ইস্কুল-ছাড়ার গল্পগাছা এখনও লোধাপাড়া পর্যন্ত না পৌঁছুলেও চাঁদবদ্‌নী-ভুটকীদের মহুল কুড়ানোর গল্প লোধাপাড়া পেরিয়ে আরো অনেকদূর পৌঁছে গেছে।

থানা-পুলিশ ইস্তক। গাড়-বাবুদের ডেরা ইস্তক। রুখনীমারা-দোরখুলি-সুখজুড়ি-মুঢ়াকাটি-ভালিয়াঘাটি-চঁদরপুর-বড়্‌ডাঙা-খান্দারপাড়া ইস্তক।

মাহাতো-কুম্হার-কামহার-ভুঁইয়া-ভূমিজপাড়া পর্যন্ত। বাবুভায়াদের হাটুয়াদের মহাজনদের ঘর-বাখুল পর্যন্ত।

থরপো-বিন্দা-জরিয়ার মায়ের কান এতক্ষণে শুনতে শুনতে ঝালাপালা হয়ে উঠল না? তারা মনে মনে বলল, মুখে মুখে চাউর করে দিল—এতদিনে ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে চোরচুন্নীদের আচ্ছা শাস্তিই দেওয়া গেছে।

সেই কথায় বলে না—চোরের সাতদিন তো গৃহস্থের একদিন? প্রযোজ্য না হলেও জরিয়ার মা আরো অধিকন্তু মুখস্থ বলে দিল—"চোর-ছেনাল চোপায় দড়, ঘন ঘন যায় শীতলামাড়ো।"

অর্থাৎ কী না, চোরের মায়ের বড় গলা। বড় গলাই তো। ঝাড়ে-জঙ্গলে দেখা হলে যদি বলিস, এই ছুঁড়ি কী করিস? চোপা দেখিয়ে বলবে কী, চুর্‌রি।

হঁ, চুরিই ত করিস। তার আবার বড় বড় কথা কী। সেই বলে নাই—লারি পারি মুখে কেনে হারি?

মনের সুখে জরিয়ার মা এই বলে থেমে গেলেও লোধাপাড়া অত সহজে থামল না।

এ কী কথা? এ কী রকম 'ল্যায্য' বিচার? পাথরডহ্‌রা নাকি তোমার বিরিবাড়িয়ার লোকজন এ কী করল? টেনে-হিঁচড়ে মহুলের 'ঝড়া' কেড়ে নিয়েছে নিয়েছে, তা বলে কাপড় ধরে টানাটানি?

কাপড় খোলাখুলি, খুল্ শালি খুল্ কাপড়, অ রে শুধু কী কাপড় খোলাখুলি? কাপড় খুলে আরো কী না কী করেছে দ্যাক্। সোমত্ত 'মেইয়্যা' অত কী আর মুখ ফুটে বলে?

একজন বলল, উসব করলেও উসব কথা এখন চাপা দে। চাপ্‌পা থাক, উদের সঙে, হাটুয়া-মহাজনদের সঙে ঝগড়া-বিবাদ করে কি পারবি?

পারি নাই পারি—চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

হঁ-অ দোষের আর কী, চেষ্টা কর তা হৈলে, আমি এর মধ্যে নাই বাবা। বলেই পাছার ধুলো ঝেড়ে সে মজলিস থেকে উঠে পড়ল। উঠে ঘরের দিকেই হাঁটা দিল। হাঁটতে, পিছু হটতে, পালাতে তো তোদের জুড়ি নেই।

জুড়ি নেই, জুড়ি নেই।

পালাই পালাই করছে এমন আরেকজনও তড়পে উঠল, ঢের চেষ্টা ত করলি রাইবু, কুম্হারদের সঙে বিবাদ করে পারলি? পারলি কী সাবিত্তিরির বেহাঘর আটকাতে? লব্ধা জাইতের কুল-মান রক্ষা করতে?

না, রাইবু পারেনি। "যার সঙ্গে যার মজে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" রাইবুর সাধ্য কী শাস্তরের বচনকে সে উল্টে দেয়! সাবিত্রী-সন্তোষের অসবর্ণ মিলনকে সে আটকে দেয়।

মজলিসে মাথা হেঁট-করেই তো বসে আছে রাইবু। পাশে-বসা গুড়্‌গুড়িয়া আনসাট্‌কা মাথা তুলে বলে উঠল, এই কে আচ্‌ছিস, ডাক ত একবার বদ্‌নীকে।

হকচকিয়ে উঠল আর আর লোধারা, ই বাব্বা! সব্‌ভার মাঝখানে এসে মেয়্যামানুষ কী করবে? ইট্টা কী কত্‌থা বলচে গুড়গুড়িয়া!

গুড়গুড়িয়া বলল, হঁ ঠিকেই বলচি, যাকে লিয়ে এত্ত তার মুখ দিয়েই সবকিছু সকল বিত্তান্ত শুনতে চাই।

আসলে খেদ রয়ে গেছে গুড়গুড়িয়ার মনে। নিজে লোধা, এক লোধাপুরুষা, তবু লোধা মেয়েমানুষ তার ধারে-কাছে ভিড়ে না। কেমন যেন খাপছাড়া, ছন্নছাড়ার মতো সে ঘুরে বেড়ায়।

কেউ তাকে 'বেহা' করবার জন্য সাধাসাধিও করে না। তবু একটু আধটু কথা যা বলত সোমবারি, চোখ তুলে তাকাত। তবে জুলু জুলু চোখে তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলে সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠত বৈকি, অমন চোখ তোর গেলে দিব রে নিরবংশা।

তা অমন একটু-আধটু মুখ-ঝামটা মন্দ লাগত না গুড়গুড়িয়ার। কিন্তু সেই সোমবারিও তো হাত ফস্‌কে পালাল, আর তারপর কার ভোগে যে লাগল!

সোমবারি গেল, সাবিত্রী গেল। আর এই তো বর্ষার কুড়চির মতো সল্ সল্ করে বেড়ে উঠছে চাঁদ, চাঁদবদ্‌নী, শরাবণশবরের মেয়্যা।

তা মেয়েটার উপরও কুদৃষ্টি পড়েছে কুলোকের, বিড়া-পাকা সাপের ডানা গজিয়েছে, আর সে-ডানাওয়ালা সাপ কুড়-র-র-র-র কুড়-র-র-র-র ডাকতে ডাকতে চাঁদবদ্‌নীর মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে, ছায়া ঘেরছে।

ওড়বার কালে তার ছায়া যার শরীরে লাগে সে অসাড়, জন্মের মতো পঙ্গু, না তো মৃত্যু হয়, না দংশালেও মরে। চাঁদবদ্‌নীও মরবে।

উসখুস করে উঠল গুড়গুড়িয়া। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পারলে নিজেই গিয়ে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে আনে চাঁদবদ্‌নীকে, বল্ মীনা বল্, কী থিক্যে-কী-হয়েছিল?—সবার মাঝারে হাট্ করে বল্, তোর কুনো ডর নাই, ডরাস নাই আমি তো আছি, গুড়গুড়িয়া যার সহায়—

তুই থাম বে গুড়গুড়ে। তাকে রাইবু থামায়। বলে, সেই বলে নাই—"ক্যারকেটা পড়েছে ফাঁদে, মাছরাঁকা ডাঙায় কাঁদে?"

সভাস্থ সবাই বুঝুক না বুঝুক হো হো করে তো হাসল। মাতব্বর রাইবু মাতব্বরি করে আরোই বলল, কান টানলেই মুড় আসবে গুড়গুড়ে—

এক্ষেত্রে কে কান কে মুড়—মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝা না গেলেও সভাস্থ সবাই আবারো হাসল, মাথা নাড়ল, কেবল হাসল না গুড়গুড়িয়া, মাথাও নাড়ল না। সে ভারি দুখ পেয়েছে।

দুখ বলে দুখ, অঝোরঝর দুখ। তার কথা কেউ 'গেরাহ্য'-ই করছে না, এমনকি ওস্তাদও না। সোমবারি যাবার পর থেকে 'জিহলখানা' থেকে গুড়গুড়িয়া আসা ইস্তক রাইবু তাকে যেন কেমন ধারা খর চোখে দেখে।

এক পায়ে একটা চপ্পল আরেক পায়ে ছেঁড়া-ফাটা একটা গামবুট, গুড়গুড়িয়া হুট বলতে সভা ছেড়ে উঠে পড়ল,—দুম দুম পা ফেলে হাঁটতে লাগল, যেন তোমার বিবাগী হয়ে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে লাটা-পাটার দিকে। আর কোথাও।

কান কিন্তু খাড়া—এই বুঝি ডাকল রাইবু, থাম বে গুড়গুড়ে, থাম। সভাস্থ লোকজন "হৈ রে মলা রে" বলে হাঁকাহাঁকি করছে, ডাকাডাকি করছে পিছু থেকে, আয় আয় বে গুড়গুড়ে, তা'লে তোর কথাই থাকল, ঐ কথাই রইল—বিটিছানা ত কী হয়েছে, আসুক সে সভার মাঝখানে, কাপড় ছেঁড়াছেঁড়ির কথা, কাপড় টানাটানির কথা বলুক সে হাট করে।

কেউ ডাকছে না, কেউ কিছু বলছেও না। খালি ঠাকুরবাঁধের ওদিক থেকে হিল-ঝিল করে পাখি ডাকছে। কঁহরাচ্ছে। পাঁড়কা কপ্‌তি-গুঁড়ুর-ক্যারকেটা-চুতিখুকড়া।

পিছু পিছু একটা লুল্‌হি কুকুর আসছিল, পিছন ঘুরে গামবুট পায়ে জোর একটা লাথি কষাল গুড়গুড়িয়া। কুকুরটা নামমাত্র চিৎকার করে যেদিক থেকে আসছিল সেদিকেই ফিরে চলল।

গুড়গুড়িয়া মুখ ফসকে বলল, শালা কুত্তার বাচ্চা! কাকে যে বলল!

হলতে-ঢলতে আসছিল ফুলটুসি। দেখে তো মনে হয় বেশ রঙেই আছে, গুড়গুড়িয়ার আরো মনে হল 'মেয়্যামানুষ' তো নয় পুরুষদেরও ঘাড়ে হাগে।

মনে মনে সে বলল, অক্কা-বক্কা কত লোকের সঙেই ত শুনি, কই তাকে ত একদিনের তরেও বলল নাই—আস-অ দেওর শুবে সঙে?

বরং এখন তাচ্ছিল্য করেই সে জিজ্ঞাসা করল, কী, তুমাদের শিয়াড়ীয়া যুক্তি হইল? 'শিয়াড়ীয়া' অর্থাৎ শিয়ালীয়া। অনেক শিয়াল যখন একত্রিত হয়ে একসঙ্গে যুক্তিহীনভাবে করে হুক্কা-হুয়া, হাঁউমাউ।

কথার উত্তর দিল না গুড়গুড়িয়া। সে এবার ছেঁড়াফাটা চপ্পল পরিহিত পা দিয়ে একটা চুরচু-বুদাকে 'শট' মারল, কতগুলো কাঁচাপাতা 'দুহুরে' ছিঁড়ে পড়ল।

আর এসময়ই পাশ দিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আচমকা গেল চাঁদবদ্‌নী, শরাবণশবরের 'মেয়্যা'। কাঁদতে কাঁদতে গেল কী? পিঠে চেলাকাঠ পড়েছে নির্ঘাৎ।

চেলাকাঠ, চেলাকাঠ।

ভারি দুঃখিত হল গুড়গুড়িয়া, সে আবার ফিরে চলল সভার মাঝখানে। ভাবখানা এই, বিড়ি ধরাবার জন্যে আগুন চাইতে গিয়েছিল সে ধারে কাছে, এই ফিরছে।

সত্যি সত্যি শালপাতার 'চুটা' টানতে টানতে ছেঁড়াফাটা গামবুট আর শতছিন্ন চপ্পল পায়ে আসরে ফের এসে হাজির হল গুড়গুড়িয়া।

আসরে তখন জোর আলোচনা, তর্কাতর্কি—আচ্ছ ভালা, ঐ অঝোরঝর জঙলে ঐ কটা কচড়াগাছই বা মাহাতোদের পাথরডহরার হাটুয়াদের হয় কী করে?

হয়, হয়, খালধারে তাদের আবাদী জমি আছে নাই? জমি যার জমির মাথাও তার, জমির মাথার লাটাপাটা গাছগাছড়া আঁউলা-বাঁউলা অমুক-টেক-ফাল্‌না-তুস্‌কা—সব, হাটুয়াদের মাহাতোদের, হয় কাম্‌হার লয় কুম্‌হারদের—

বললেই হল? কাগজ আছে? 'একড়ের নামা'?

থাকলেও তুই কী বুঝবি? পেটে ত খোঁচা মারলেও একফোঁট্‌কা কালিধুয়া জলও বেরাবে নাই বাপ, কী দেখবি? কী বুঝবি? সেই বলে নাই—পণ্ডিতে বুঝে কলা?

মজলিসে হো হো করে হাসির রোল উঠল, সবচেয়ে বেশি হাসল গুড়গুড়িয়া।

উঁ-হু, উঁ-হু, হাসির কথা লয়, রাইবু সবাইকে হাত তুলে থামায়। বলে, যে যাই বলুক, জঙল আমাদের হকের ধন, জঙলের গাছপালহা আঁউলা-বাঁউলা কুরকুট-মুরকুট সব আমাদের, আমরা বলে সেই কুন মান্ধাতার আমল থিক্যে—

সে ত তোর বাপও বলত, বড়সোলের গজনাও বলে। কিন্তুক গেঁড়াবুড়হা কী পারল হাটুয়াদের হাত থিক্যে জঙলকে বাঁচাতে? বেবাক লদ্ধা জাতকে বাঁচাতে? নাই, পারল নাই।

পারুক না পারুক, স্বরগে গেছে লোকটা, তাকে এখন টেনে এন্যে লাভ কী? তাছাড়া গেঁড়াকাকা কী কম করেছে আমাদের জন্যে? নেমকহারাম লদ্ধা জাত সবকিছুই ভুলে যায়। ভুলে যায়, ভুলে যায়।

আর সহ্য হচ্ছিল না রাইবুর, মরা বাপকে এতদিন বাদে সভার মাঝারে টেনে আনায় সে প্রায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, হুঙ্কার দিয়ে বলল, মুখ সামলে কত্‌থা বল্‌, নাঁলে জিভ তোর—

নিজেই নিজেকে সামলে নিল রাইবু, সে না মাতব্বর? লোধাদের মা-বাপ? কোথাকার কাল-কা যুগী, তার কথায় তা বলে অমন করে তড়পে উঠবে রাইবু?

গলা খাটো করে পরক্ষণেই মাতব্বরের ঢঙে সে বলল, সেই বলে নাই—'দিন যায় কত্‌থা থাকে, ঘা শুকায় দাগ থাকে?'

বলেই একটুক্ষণ থামল, বাপ মরার ঘা'টা শুকিয়ে গেছে কিন্তু দাগটা তো এখনও আছে, বেশ দগদগে দাগ।

কে কী করল কী করল নাই, এখন আমাদের ত একটা কিছু কত্তে হবে। কী বলিস গুরভা? ইভাবে পালাতে পালাতে সবকিছুকে ছাড়তে ছাড়তে শেষতক কুথাকে যাব্ব? ইদিকে নরসিঙা, উদিকে হাটুয়ারা কাম্‌হার-কুম্‌হার-মাহাতোরা—

মচর মচর করে পান চিবোতে চিবোতে মিটিঙে সদ্য আসা ফুলটুসি বলল, সব মাহাতো কী আর, কই আমাদের নুকুর সাঙাত বাপ ত বেশ ভাল।

ভুবনার বউয়ের অমন লালাসিক্ত কথায় জোরে না হলেও মুখ টিপে ত হাসল কেউ কেউ, এর-ওর গা টেপাটেপি ত করল।

হাত তুলে রাইবুও থামিয়ে দিল ফুলটুসিকে, তবে বক্কার নামে একটা কথাও বলল না, বলতে জিভ তার লক্‌লকাচ্ছিল বৈ কী।

কী বলবে? হাগন্তির লাজ নাই দেখন্তির লাজ। বলল, উসব কত্‌থা ছাড়-অ, লদ্ধা জাইতের এখন আ-ন্নেক বিপদ, পাছু থিক্যে নরসিঙারা, হাটুয়ারা, হুঁ মাহাতোরাও ঘড়িক ঘড়ি তাড়া দিচ্ছে—হাটো, হাট্টো, রাজার বাগান থিক্যে হাট্টো।

কী বলল রাইবু? রাজার বাগান? কে রাজা? রাজা তো রাইবুই? সামান্য আড়চোখে রাইবু দেখল—ফুলটুসুয়া হাসছে। মুচুক মুচুক।

হাসে হাসুক, রাইবু নাচার। অনেক, অনেকদিন বাদে রাজা রাজা ভাব আবার এসে যাচ্ছে রাইবুর।

এই যে এখন সভার মাঝারে কত কী ভাবছে, আসলে সে আপনার মনে টুর টুর হেঁটে যাচ্ছে, যাচ্ছে জঙ্গলের দিকেই।

শতেক লোধা-লোধানী তাকে নমো করছে, বলছে , হুই দ্যাক রাজা যাচ্ছে, শব্বর রাজা। নমো কর নমো কর।

ভিড়ের ভিতর অনেকদিন বাদে সে সোমবারিকেও দেখে ফেলল।

সোমবারি বলছে, অম্মা রাজাই ত, রাজা না?

রাইবু তাকে হাত তুলে আর্শীবাদ করল। তোলা হাত এখনও শূন্যে তুলে আছে সে। মজলিসের লোকজন ভাবছে—হাত তুলে আছে কেন রাইবু? কী বলতে চায় ও?

গুড়গুড়িয়াও দেখল ওস্তাদের হাতটা তোলা আর চোখদুটো বোজা। মনে-মন কিছু কী আর ভাবছে না ওস্তাদ?

আর কারও সাহস নেই কাছে গিয়ে হাতটা নামিয়ে দেয়—এক গুড়গুড়িয়াই পারে। আর পারে ফুলটুসি।

ফুলটুসি, ফুলটুসি।

তার কিন্তু গোঁসা হয়েছে, নুকুর স্যাঙাত বাপকে নিয়ে খোঁটা দিয়েছে রাইবু, সে এখন যাবে না রাইবুর কাছে, হার্‌গিজ্ না।

গুড়গুড়িয়াই গিয়ে হাতটা নামিয়ে দিল। চোখ খুলে রাইবু বলল, অ হাত? তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তেই খামচে ধরল সে গুড়গুড়িয়ার হাত।

চ তব্বে!

তারপর তো যাওয়া, দৌড়াদৌড়ি। ঢ্যাঙা আর বেঁটে বামন, ছেঁড়াফাটা হাফ-প্যান্ট আর তেলচিটে আটহাতি ধুতি। দৌড়, দৌড়।

আগে আগে রাইবু পিছনে গুড়গুড়িয়া।

যেতে যেতে জানতে নেই, 'জিগাস' করতে নেই 'কোথাকে' যাচ্ছি। যেতে যেতে জানাতে

নেই, আগ-বাড়িয়ে বলতেও নেই গন্তব্য কোথা। ভুলে হোক বেভুলে হোক 'জিগাস' করে ফেললে আগের জনকে বলতেই হয়, আগে-ত-চ, চ-ন্ন।

চুপচাপ যাওয়া, শুকনো পাল্‌হা-পত্তর মাড়িয়ে দু'পায়ে বালি ছিটিয়ে মস্‌মস্‌, বুলান-হদহদি পেরিয়ে, দখিণসোলের সোঁতা ডিঙিয়ে।

যাওয়া, শুধু তো যাওয়া। যতিহীন, বিরামহীন, টঙ টঙ টঙস্‌ টঙস্‌। লোধাজনমাড়যকে যখন যেতে হয় এমনি করেই যায়।

যেতে যেতে পথ বাড়ে, বাড়তে থাকে। দিন ছোট হয়ে হয়ে ফুরিয়ে যায়, রাত নামে। শাল-পিয়াশাল-ধ-আসন-করম-কইমের ফাঁকে ফাঁকে 'জন' দেখা যায় এক ঘড়ি দু ঘড়ির।

যাওয়া, তবু তো থামে না। নতুন করে শুরু হয়ে যায়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। রুখনীমারা থেকে দোরখুলি, দোরখুলি থেকে পাঁচকাহিনা, পাঁচকাহিনা থেকে নয়াগ্রাম বা।

খালি তো একজায়গায খানি বসে পড়ে পায়ের 'আড়িশ' ভাঙা। ব্যাথা তো আর মবে না, বরঞ্চ পায়েব শিরায় ধবে যায টান।

শিরা-টানা পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ফেব যাওযা। যেতেই হয়। দিল্লেশ্বর থেকে বঙ্কা, বঙ্কা থেকে নরসিঙা, নরসিঙা থেকে দারোগা—

হে' মা'জন, তুমি থাকতে আমাদের এই দুরগত্তি?

গোহাল থেকে দুধাল বাছুরটাকে খলায-খামাবে টেনে আনতে আনতে রুখনীমারার দিল্লেশ্বর বলল, তোদেব আবার কী হৈল? কোনো চুরি-চামারি ফৌজদারি কেস্‌?

চুরির খোঁটায় মনে মনে ফোঁস করে উঠল রাইবু, কিন্তু মুখে বলল, তার থিক্কেও বড় মা'জন। বড় বলে বড়, মহুল কুড়াতে গেছিল আমাদের শরাবণের মেইয়াটা—

মহুল ত লিলই, লুগাটাও টান মেরে খুইল্লে লিএ্যেছে পাথরডহরার হাটুয়ারা না তার বিরিবাড়িয়ার মাহাতোরা।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল দিল্লেশ্বর।—হাটুয়ারা না তার মাহাতোরা, এটা একটা কথা হৈল? ঠিক যদি না জানিস কারা ইজ্জত লুটেছে তোদের মেয়্যার—তবে কার বিরুদ্ধে বলতে এসেছিস? আসামী কে?

এসময় বুদ্ধি করে গুড়গুড়িয়া বলল, নাই মাহাজন, আসামী মাহাতোরাই বঠে। সাক্ষী আছে—বিরিবাড়িয়ার মাহাতোরাই মেইয়াটার ইজ্জৎ লুটেছে।

হুঁ, তোরা সব সাধুপুরুষ আর মাহাতোরা সব খারাপ লোক কী না।

গুড়গুড়িয়াকে দাবড়ে উঠল রাইবু, তুই থাম বে গুড়গুড়ে, কার কাছে কী বলছিস! পায়ে পড়ে গেল রাইবু দিল্লেশ্বরের, উ আন্‌খার কথা ধত্তব্যে আন্নো নাই মা'জন, কী বলতে কী বলচে। ক্ষেমা কর-অ আর ইহার একটা বিহিত কর-অ।

কী বিহিত করব? যার গাছ তার ফল-পাকুড় ত সে কুড়াবেই।

হুঁ হুঁ কুড়াক ন, কিন্তুক গাছ তো জঙ্গলের। মাটিতে এঁচেড়-বেঁচেড় কাটছে রাইবু।

জঙ্গলের গাছ যদি ত ফল-পাকুড় সব জঙ্গলেই পড়ে থাক না, তোরাই বা খামচা-খামচি করে কুড়াস কেনে?

ই বাবা, জঙ্গলের জীব আমরা, সেই কুন্‌ মান্ধাতার আমল থিক্যে আছি, সত্য-তেরতা-দ্বাপরে ছিলাম, কলিতেও আছি, ঘোর কলিতেও থাকব। জঙ্গলের ফল-পাকুড় সব ত

আমাদের। মা'জন, শুন্নো নাই মরবার কালে স্বয়ং ভগবান আমাদের জরাশব্বরকে কী-ই বলেছিল?

ফের দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল দিল্লেশ্বর, উসব পেঁদ ছাড়, রামরাজত্বও আর নাই, রামের বেটা ধুরন্ধর লব-কুশও আর নাই। তবু তোরা সেই মান্ধাতার আমলেই পড়ে আছিস, মান্ধাতা আমলের আইন দেখাচ্ছিস? জানিস কী নাই জানিস—এখন জঙ্গল আর লোধাদের লয়, জঙ্গল হৈল সরকার বাহাদুরের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে একটা আইন ছিল লাটসাহেবদের, এখনও আছে—ধুস আইন-টাইন তোরা কী বুঝবি!

হঁ মা'জন, নাই মা'জন। আইনের কথায় জোড় হাত করে বসে আছে রাইবু। তার দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও—ত্যালানি হয়েছে দিল্লেশ্বরের, খুব ত কপ্চাচ্ছে আইন!

বাছুরটার গল-কম্বলে হাত বুলাতে বুলাতে দিল্লেশ্বর বলল, জঙ্গলের গাছ্পাল্হা নষ্ট করবি, অঝোরঝর বনকে ডুংরি বানিয়ে ছাড়বি, আর সরকারবাহাদুর চোখ বুজে বসে বসে দেখবে? তোদেরকে জামাই-আদর করবে—অত গুড় আধসের নয় গুড়গুড়িয়া।

এবার রাইবুকে ছেড়ে গুড়গুড়িয়াকে।

রাইবুই বলল, সরকারবাহাদুরের কত্থা ছাড়ান দেও মা'জন, তুমরা কী বলচ? তুমি থাকতে আমাদের ঘরের মেইয়ারা বনের ফল-পাকুড় তুলতে যেঞে ল্যাঙটা হয়ে ঘরে আসবে?

হঁ, একদম জন্মের মতন দাগ লিয়ে? খচ্ করে বলল গুড়গুড়িয়া।

মনে মনে দিল্লেশ্বর বলল, আ-হা কত তোদেব মান-ইজ্জৎ! মুখে বলল, আমার কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিস নাই, ফায়সালা করতে চাস যদি ত থানায় যা, নরসিঙাদের আপিসে যা।

থানার নাম শুনেই গুড়গুড়িয়া পালাবার ধান্দা করছিল, সজোরে তার হাত চেপে ধরল রাইবু। —বস রে গুড়গুড়ে!

জেল-হাজত থেকে ছাড়া পাবার পর মাসে মাসে থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসতে হত গুড়গুড়িয়াকে। প্রথম প্রথম শুরুও করেছিল গুড়গুড়িয়া।

কিন্তু এক-দুবারের পর থেকে সে আর যাচ্ছ না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যদিও থানা থেকে এখনও তলব আসেনি, সমন পাঠায়নি বড়দারোগা। তবু ভয়—

এই বুঝি কোথাও চুরি-চামারি ঘটল, ডাকাতি কেস, আর অমনি হাতে হাতকড়া, গুড়গুড়িয়াকে ধরে টানা-হিঁচড়ান। তাবৎ লোধাপাড়ায় এসে হুজ্জুতি।

উসখুস করছিল রাইবুও! দিল্লেশ্বরের হাবভাব তার ভাল লাগছিল না। খুব যে বাছুর নিয়ে মাতামাতি! দিব নাকি একদিন হাপিস করে গাই-বাছুর?

আর কিছু করার ছিল না, বসে বসে খানিক চোখ পিট্ পিট্ করছিল রাইবু। তার দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও।

বাছুরের পায়ে আঙটাওয়ালা দড়ি বাঁধল দিল্লেশ্বর, মুখের কাছে ছড়িয়ে দিল কতক শ্যামাঘাস। টেংরিতে থাপ্পড় মেরে বলল, খা মুনাই খা!

এখনও বসে আছে রাইবু-গুড়গুড়িয়া, সেদিকে নজর পড়তেই খেঁকিয়ে উঠল দিল্লেশ্বর, এখনও বসে আছিস? বসে বসে চুরি-চামারির ধান্দা করছিস নাকি বে গুড়গুড়িয়া? হেঁ রাইবু?

রাইবু দণ্ডবৎ হয়ে বলল, কী যে বল-অ মা'জন!

তারপর বলা নেই কওয়া নেই হুট বলতে ধুলো থেকে উঠে দুহাতে পাছার ধুলো ঝেড়ে রাইবু-গুড়গুড়িয়া দৌড়ুল। দৌড় দৌড়—

ধু-উর! তোর ল্যাওড়া আইন কে মানছে! দৌড়ুতে দৌড়ুতে থমকে থেমে পড়ে একদলা থুতু ফেলল গুড়গুড়িয়া।

রাইবু বলল, আমারও ত ঐ কথা, আইন, আইন ত দেখাচ্ছে বাবুলোকেরা, হাটুয়া মাহাজনেরা।

আইন ত লয় গায়ের জোর। সেই বলে নাই—জোর যার মুল্লুক তার?

এতক্ষণে একটা খাঁটি কথা বলেছে গুড়্গুড়িয়া, মনে মনে তাকে বাহবা দিল রাইবু। একটু যা বোকা, ভীতু ভীতু, গায়ে কিন্তু অসুরের বল! গুড়গুড়িয়াই ত বলতে পারে—জোর যার আইন তার, মুল্লুকও তার।

চ দেখি বঙ্কার আইন কী বলে?

আর তারপর দৌড়, আবার দৌড়। রুখনীমারা থেকে দোরখুলি। দিম্লেশ্বর থেকে বঙ্কা।

সচরাচর বঙ্কার কাছে যায় না রাইবু। সে তো যায় ফুলটুসি। হলিয়ে-ঢলিয়ে ফুলটুসুয়া কাজ ঠিক হাসিল করে নিয়ে আসে। আজ গেল রাইবু, আজ গেল গুড়্গুড়িয়া।

কী রাইবু? কী বে গুড়্গুড়িয়া? কী ধান্দায়?

ধান্দা একটা আছে মা'জন—

বলে ফ্যাল্! বলে ফ্যাল্! যেন কত দরাজ দানশীল বঙ্কা যা কিছু চাইলেই এখন উপুড় করে ঢেলে দেবে হুড় হুড় করে।

দোকানীর গদি-ঘরে একলা বসে আছে, খদ্দের নেই। কালে-ভদ্রে এক-দুজনা আসছে চাল-ডাল নুন-তেল কিনতে। বাদবাকি সময় কোলের উপর একটা কুলো নিয়ে কী যেন বাছছে, কী যেন!

ঘাড় লম্বা করে রাইবু দেখল, মুসুরডালের ভিতর থেকে 'আরশুলা'র গু বাছছে দোকানী।

নড়ে চড়ে বসল রাইবু, বলল, একটা কত্থার জবাব দেও দেখি মা'জন।

কী?

জঙ্গল কার?

কেনে তোর বাপের।

বাপ তুলল খালভরা? বাপ তুলল নিরবংশা বঙ্কা?

ঢোক গিলে ফেলল রাইবু।

আর জঙ্গলের গাছ-পাল্হা পাল্হা-পতর ফল-পাকুড়?

গর্জে উঠল বঙ্কেশ্বর, আরশোলার গু-মেশানো মসুরের ডাল সরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোদের খুব বাড় হয়েছে রাইবু, খুবেই বেড়ে উঠেছিস। জঙ্গল তোর বাপের, জঙ্গলের গাছ-পাল্হা পাল্হা-পতর ফল-পাকুড় সব তোর বাপের—তা বলে জোত-জমার ফল-পাকুড়েও হাত দিচ্ছিস কী বলে? দিচ্ছিস দিচ্ছিস, তাও সবদিন কেনে? নিয়ম ত ছিল একটাই—ছ'দিন আমরা একদিন তোরা, সেই নিয়মের ব্যতয় ঘটালি কেনে? তার আগে জবাব দে, তার পিছুকে কথা।

এ-ওর মুখের দিকে চাইল রাইবু-গুড়্গুড়িয়া, বলে কী লোকটা? ছ'দিন-একদিন? জঙ্গলেও দিন-ক্ষণের হিসাব?

জঙ্গলে রাত-দিন মাস-ঋতু পূর্ণিমা-অমাবস্যার কে অত হিসাব রাখে। হাতের 'কড়' গুনে গুনে, আর নয়ত ছিটে-বেড়ার ছঁচ-মাটি লেপা দেয়ালে 'রেখ' কেটে কেটে যেটুকু হিসাব রাখা যায়, রাখা! যেতে যেতে রাস্তার ধারে কী গহীন বনে, হাটুয়াদের বাবুভায়াদের মাহাতোদের জোতজমিনের মুড়োয় পিয়াল কী ভুড়রুগাছে আঁউলা কী কষাফলগাছে, লাটায়পাটায় বৈঁচি কী শিয়াকুলগাছে ঘোর করে রদোবদো ফল এলে আর 'তুলি-তুলি' মন করলে লোধাজনমাড়ুষ

কী হাত বাড়িয়েও সে-হাত গুটিয়ে রাখবে? চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে ভাববে—আজ কী বার? ছ'দিন কী সাতদিন? আজ তাদের পালা না কাদের পালা? বর্ষায় সরুবালি বড়বালি কুড়কুড়িয়া কাড়হানছাতু ফুটলে লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীরা যেতে-আসতে দেখেও দেখবে না? আজ তাদের পালা নেই বলে চোখের সামনে সে দেখবে বেলা 'আড়' হতে না হতেই একটু একটু করে কেমন ঝরে পড়ছে ছাতু-ছত্রাকের শতদল-পাপড়ি? কেঁদ্‌গাছে কেঁদ্ পেকে 'আলা' হয়ে পচে যাবে, তবু, তবু লোধাজনমানুষ আজ তাদের 'দিন' নয় বলে নখে টিপেও দেখবে না সে-কেঁদ্ পাকল কী পাকল না? আজ হাটুয়াদের কাল মাহাতোদের পরশু কাম্‌হারদের তরশু কুম্‌হারদের আর কবে কবে যে লোধাদের—লহ লহ চিরোল চিরোল চ্যাকাশাক আর ভেলভেটের তুল্য শুশনিশাক দেখলেই কেমন যেন গুলিয়ে যায়। গুলিয়ে যায়, গুলিয়ে যায়। অঝোরঝর বনে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে মাথায় এসে ঠেকল দোদুল্যমান বন-ধুঁধুল, বুকের কাছে এসে ধরা দিল বন-কুঁদরী বন-কাঁকড়োর লত্, হাত বাড়িয়েও সে-হাত কী নামিয়ে রাখবে রাইবু-গুরভা-গুড়কুঁদা-গুড়গুড়িয়ার দল। আজ তাদের 'বার' নয় বলে? দেখেও তারা না দেখার ভান করে ঘরে চলে আসবে চোখের সামনে গাছতলা আলো করে পড়ে থাকা খোঁচের 'মহুল' খোঁচেই রেখে? খোঁচের মহুল খোঁচেই শুকিয়ে যাবে, তবু, তবু লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীরা ছুঁয়েও দেখবে না আজ তাদের পালা নয় বলে? গ্রীষ্মে কুসুমগাছের তলায় পাকা কুসুম পেড়ে বাঁশনলিতে ভরে নুন-লঙ্কা গুঁজে 'কুসুমকুচা' করবে হাটুয়ারা কাম্‌হার-কুম্‌হার-মাহাতোরা, আর লোধারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খরাক্লিষ্ট কুকুরের মতো হ্যাল্ হ্যাল্ জিভে টাক্‌রায় আসা জল চেটেপুটে সাফা করবে আজ তাদের 'দিন' নয় বলে? ছ'দিন-একদিন, একদিন-ছ'দিন। কবে গেল সেদিন আর কবে আসবে সেদিন? হিসাব যে গুলিয়ে যায়।

হঁ মা'জন, বসে হাঁটুদুটো জড়ো করে হাতের বেড়ে চেপে ধরে রাইবু বলল, কী যে তোদের গেঁড়াকলের হিসাব—ছ'দিন-একদিন—মেইয়ামানুষদের ত মেইয়ামানুষদের, আমারও হিসাব কির'ম গুলিয়ে যায়! একদিন খাব আর ছ'দিন ভকে মরব? কাহার যে কবে পালা—অত কী মনে থাকে মা'জন?

মনে কী আর থাকে না? থাকে রাইবু। ইচ্ছ্য করেই তোরা ভুলে যাস, ইচ্ছ্য করেই তোরা গড়বড় করিস। কই হাটবার-হাটবার বড়খাঁকড়ির হাটে যেতে ত ভুলিস নাই?

মনে মনে রাইবু বলল, খুব যে বুদ্ধি ধরিস! খুব যে ফুটানি দেখাচ্ছিস বঙ্কা! হিসাব করে সবকিছু করতে। তুই কোন্ হিসাবটা রাখিস? বেহিসাবির মতন ভুবনার বহুটাকে রাঁঢ় রাখিস নাই?

রাইবুকে চুপ করে থাকতে দেখে বঙ্কা তড়পে উঠল, মুখে কুলুপ আঁটলি যে রাইবু? এই গুড়গুড়িয়া, তোরা পঞ্চাৎ মানিস ত?

অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন, যে দিবারাত্র টঙস্ টঙস্ করে ঘুরে বেড়ায় লাটায়-পাটায় বনে-বাদাড়ে, যার জঙ্গলই মা জঙ্গলই বাপ, বনের ক্যাঁকলাশ-গোই-গোধি-ঢ্যামনা ট্যাঁসা-ঢেপচু-পাঁড়কা-ক্যারকেটা বর্‌হা-খেড়িয়াদের পিছন পিছন কেটে যায় অষ্টপ্রহর, খিদে পেলে যে খায় ভেলা-ভুড়রু বেল-কোত্‌বেল, ফল-পাকুড়ের অভাব ঘটলে নিদেনপক্ষে চিরোল চিরোল পাতা, তেষ্টা পেলে সীতানালার পায়রাচঁচরা জল—তার কী দরকার 'পঞ্চাতে'? পঞ্চাৎ তো মানবে বাবু-ভায়েরা হাটুয়ারা-কাম্‌হার-কুম্‌হার-মাহাতোরা।

বঙ্কার কথায় অনড় বসে থাকল গুড়গুড়িয়া।

রাইবু খালি বিড় বিড় করল, বনে-বাদাড়ে আবার পঞ্চাৎ কী? ঐ তুমার এক গেঁড়াকলের জিনিস।

গুড়গুড়িয়া খামচে দিল রাইবুকে।—লোক কিন্তু সুবিধার লয় ওস্তাদ, চল-অ কাট্যে পড়-অ।

কেটে পড়ল রাইবু। আগে আগে রাইবু পিছনে গুড়গুড়িয়া, যেতে যেতে রাইবু বলল, চ তবে পাঁচকাইনা।

পাঁচকাহিনা গেল, ফিরেও এল শুষ্কমুখে। নরসিঙা পরিষ্কার বলে দিল, খবদ্দার! জঙ্গলে সবদিন ঢুকবি নাই। ফয়শালা ত করাই আছে—গ্রামবাসীরা ঢুকবে ছ'দিন আর তোরা ঢুকবি একদিন।

ছ'দিন-একদিন কুন আইনে আছে নরসিঙা?

তোরা খুব বেড়ে গেছিস রাইবু। আমাকে আইন শিখাচ্ছিস? পিছনে কে আছে তোদের বাপ? দালাল? আন্, ডেকে আন।

রাগে ঠিরঠির করে কাঁপছিল নরসিঙা, চোখ-মুখ লাল।

ই বাবা! আজ নরসিঙাও বাপ তুলল! আজ সকালে ঘুম থেকে কার মুখ দেখে যে উঠেছিল সে! রাগ করে রাইবুও মনে মনে বলল, নির্ঘাত শিশুবালা। আঁটকুড়ি!

আঁটকুড়ি! আঁটকুড়ি!

পরক্ষণেই একেবারে জল হয়ে গেল রাইবু। না ন্না, বউটা তার ভাল। এই বয়সেও কচি পুঁইডাটার মতো চকচকে মুখটা। কী খায়, না দুধ না ঘি-ভাত, তবু শরীর—শরীর ছিল্ ছিল্ করে শিশুবালার।

নরসিঙার রাগের মুখেও পাঁচকাহিনার বীট অফিসে দাঁড়িয়ে রাইবুর মনে হল যেন কত-অ কত-অ কাল তার নারীসঙ্গ হয়নি।

সবেগে বেরিয়ে এল সে, পিছনে গুড়গুড়িয়া। এক পায়ে চপ্পল আরেক পায়ে ছেঁড়াফাটা গামবুট।

পাঁচকাহিনা ছেড়ে তারা এল তপোবনের জঙ্গলে, সাধুবাবার আশ্রমে। সাধুবাবা নেই, নিগমা মন্দির খাঁ খাঁ। থাকলে এতক্ষণে কাঠের খড়ম পায়ে খটাখট্ আওয়াজ তুলে এসে যেত এদিক থেকে সেদিক থেকে।

রাইবুর মনে হল এই বুঝি খড়মের আওয়াজ উঠল খালের ওদিক থেকে। পরক্ষণেই মনে হল, উঁ-হু, আওয়াজ উঠল সীতামাইয়ের গা-ধোওয়া হলুদ জলের সেদিকে।

সেদিকেও নয়, সেদিকেও নয়, আওয়াজ উঠল নিগমা মন্দিরের একেবারে ভিতর থেকে। যে মন্দিরের আগম-নিগম নেই, নিরেট পাথর, সেখানে ঢুকল কী করে সাধুবাবা? এতদিন ধরে তার ভিতরেই ছিল তবে সাধুবাবা পাথর হয়ে?

উঁহু উঁহু, আওয়াজ তো শোনা যাচ্ছে 'ভোগঘরের' ওদিকে। কলাপাতায় 'ভোগ' নিয়ে খড়ম পায়ে—ঐ তো খটা খট্! খটা খট্!

রাইবু যেন 'ভোগ' খাবার আশায় আশায় বাবু হয়ে বসলও। আচমকা ঘ্যান ঘ্যান করে উঠল গুড়গুড়িয়া, ভোখ্‌লা-পেটে আর কত্‌ক্ষণ বা থাকা যায়!

ঘোরটা কেটে গেল রাইবুর, গুড়গুড়িয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, শুঁন বে গুড়গুড়ে—

অতি ভোখে ভোখ নাই, ভোগ কর ক্ষেমা।
অতি রাগে রাগ নাই, রাগ কর ক্ষেমা।।
অতি ঘুমে ঘুম নাই, ঘুম কর ক্ষেমা।
ঐ ঘুমেই তা মরেছিল হস্তি নাগমণি জনা।।

—কী বুঝলি?

গুড়গুড়িয়া কিছুই বুঝেনি, সে শুধু শুনেছে 'ভোখ' 'রাগ' 'ঘুম' আর 'ক্ষেমা'। আর

অভিভূত হয়েছে মাতব্বরের 'জ্ঞেয়ান' দেখে। ধীরে ধীরে গেঁড়াশবরের মতোই ওস্তাদের ওস্তাদ হয়ে উঠছে রাইবু।

রাইবু বলল, তোর দমে ভোখ্ লাগচে ত?

হঁ, ভোখ্ লাগবে নাই? বেড়া কি কম হৈল? গুড়গুড়িয়া ছটফট করছে, অস্থির অস্থির।

মাতব্বরের মতোই রাইবু বলল, বলচি ভোখ্‌কে ক্ষেমা করে দে গুড়গুড়ে! শুনলি নাই—অতি ভোখে ভোখ্ নাই?

হিঁয়ালি রাক্‌খ! খাবারের সন্ধানে ছন্‌ছন্ করে বেরিয়ে গেল গুড়গুড়িয়া।

রাইবু দেখল—তেম্নি পড়ে আছে নিগমা মন্দির, সাধুবাবা নেই। শুকনো পাল্‌হা-পতরে ডাঁই হয়ে আছে আশপাশ। আরো বড় করে ফাটল ধরেছে নিগমা মন্দিরের গায়। আগাছার উলুরি-ঝুলুরি শিকড়।

ফাটাফুটোয় সাপের খোলস, হাওয়া ঢুকে নড়ছে হিল হিল করে। একটা-দুটো জ্যান্ত শিয়র-চাঁদা, খরিস, পাটার-ফাটার কী আর নেই? আছে, আছে।

তেম্নি পড়ে আছে 'ভোগঘর'। ভোগ রান্না আর কে করবে? সাধুবাবা তো আর নেই। তবে যজ্ঞকুণ্ডে এখনও 'ধুনি' জ্বলছে। যে-ই আসে সে-ই তো ফেলে যায় কাঠকুটো পাল্‌হা-পতর! রাবণের চিতার মতো তাই ধুনিকুণ্ড জ্বলছে ধিকধিক। ধোঁয়াচ্ছে।

আজ রাইবু গুড়গুড়িয়াও কাঠ ফেলেছে, আসন 'জুমড়া'। আরো কিছু পাল্‌হা-পতর ঝুড়িকাঠ জোগাড় করে ধুনিতে ফেলে রাইবু চাতালে বসল।

বেলা ঠিক এখন মাথার উপর। চোত-ফাগুনের বেলা। সামাল সামাল। চড়াৎ করে রাইবুরও খেয়াল হল—ভোখ্‌লা পেটে আর কতক্ষণ বা বসা যায়? মারো গুলি শাস্তরের কথায়—অতি ভোখে ভোখ নাই, ভোখ কর ক্ষমা।

এক লাফে রাইবু সাধুবাবার ভোগঘরে। কী-ই বা আছে—চাট্টি মুড়মুড়ে কলাপাতা কবেকার, পোড়া আঙরা এক মুঠো আর একটা মস্ত উইঢিবি এক কোণে। ঢিবিটায় শুধু শুধু লাথি কষাল রাইবু দমাদ্দম। তারপর তার উপর পেচ্ছাপ করল।

বাল্মীক তপুবনে—
রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘড়া
তপুবনের কাননে
বাল্মীক তপুবনে—
লব-কুশ ধরেছে ঘড়া হে
সীতায় বলে দও ছেড়ে।

গুন গুন করে গাইছে আর 'ধুনি'তে ফেলে মাছ পোড়াচ্ছে গুড়গুড়িয়া। ছোট ছোট মাছ, চ্যাঙ-গোড়ুই—।

চোত-ফাল্গুনের মাস। ঝিরিঝিরি জলের ধাবা সীতানালায়। সে-জলে ছোট ছোট মাছ। গুড়গুড়িয়া কোমরে বাঁধা গামছা খুলে ছেঁকে ছেঁকে কতক মাছ তুলেছে, খানায়-খন্দে হাত ভরে ভরে চ্যাঙ-গোড়ুই।

তাই এনে এখন পোড়াচ্ছে আর ফুর্তিতে গাইছে টুসু গীত। দেখে ভারি আনন্দ হল রাইবুর, সে মনে মনে তারিফ করল গুড়গুড়িয়ার। না, ব্যাটাচ্ছেলের উন্নতি হচ্ছে খুব। নুন-তেল ছাড়াই মাছপোড়া খাচ্ছে রাইবু গুড়গুড়িয়া বেশ তাগুত করে। মাছপোড়া খেতে খেতে আচমকা এক কাণ্ড করল গুড়গুড়িয়া—

সাধুবাবা যেখানে বসে সাধন-ভজন করত সেখানে সেই ঢিবিতে বসে গুড়গুড়িয়া সাধুবাবার মতই ভঙ্গি করল অবিকল। সাধুবাবা যেরূপ যেরূপ কথা বলত রাইবুর সঙ্গে সোমবারির সঙ্গে, তদ্রূপ ভঙ্গি করেই কথা বলে চলল গুড়গুড়িয়া।

সে সোমবারিকে বলল 'শবরকন্যা' আর 'শবরপুত্র' রাইবুকে। গুড়গুড়িয়া কথা বলছে আর ঘন ঘন হাসছে, অট্টহাস্য! সাধুবাবার মতো।

গুড়গুড়িয়ার ভাবগতিক দেখে রাইবুও হেসে গড়িয়ে পড়ল। কথা হারিয়ে ফেললে গুড়গুড়িয়াকে কথা জুগিয়ে দিচ্ছিল রাইবুই।

এখন আর তাদের মনে নেই কী জন্যে বেবিয়েছিল সকাল সকাল। কোথায় কোথায় বা গিয়েছিল টঙস টঙস্!

জঙ্গল, জঙ্গল। চারধারে শাল-পিয়াশাল ধ-আসন বহড়া-শিরিষ করম-কইম আঁটারি-চুরচু মহুল-কচড়া কেঁদ্-কুসুমের গাছ। হাতিবাঁধা-চিহড়-দুধিয়া-হাড়জোড়া-বনধুঁধুল-আঁউলা-বাঁউলা-পানআলু-চুরচুআলু-খামআলুর লতাবিতান।

এতদিন এই জঙ্গল এইসব গাছ লতাপাতা, হনুমানচৌকি, তিলকমাটি হুড়ি, তপোবন আশ্রম—হিসাব মোতাবেক সব, সব ছিল তাদের। এখন আর নেই। এখন এই জঙ্গল এই গাছ পাল্‌হা-পতর সব সব গাড়বাবুদের, সরকারবাহাদুরের। কিংবা তাও নয় হাটুয়াদের বাবু-ভায়াদের মাহাতো মহাজনদের। যে যার জোতজমির মাথার জঙ্গলে ভাগ বসাচ্ছে। আজ কেড়ে নিয়েছে 'মহুল', কাপড় খুলে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে। কাল হয়ত কাপড়ই খুলে নেবে, আরো কত কী করবে কাম্‌হার-কুম্‌হার-মাহাতো -ভুঁইয়া-ভূমিজরাও।

ই বাবা, তা'লে থাকব কুথাকে? বাঁচব কুথাল্লে? কোথায় থাকবে কোথা থেকে ফল পাকুড় সংগ্রহ করে বাঁচবে—এসবের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের আশায় আশায় তো সকাল সকাল বেরিয়েছিল রাইবু-গুড়গুড়িয়া।

কিন্তু এখন আর তাদের সেটুকুও মনে নেই। মনে নেই, মনে নেই। যেন সব কিছুরই সমাধান হয়ে গিয়েছে অথবা সব কিছুই, এতদিন যা ছিল তাদের একান্ত আপনার, বিলিয়ে দিয়ে আসছে হাটুয়াদের বাবু-ভায়াদের মাহাতো-মহাজনদের।

লে, ল্লে, সব কিছুই তোদের যখন তোরাই সব লিএে লে! হাত খুল্লে সব দিএে দিল্লম!

রাইবু গুড়গুড়িয়া মাছপোড়া খেয়ে মহাফূর্তিতে ঘরের পথ ধরল, লোধাপাড়ার পথ।

এদিকে ইস্কুল থেকে পালিয়ে পুনোই আর যায় কোথা? আনসাট্‌কা খানিক দৌড়ুল এদিক-সেদিক। কখনও সোজা। নাক বরাবর।

তারপর বড় একটা মাকড়া পাথরে পা ঝুলিযে বসে কিছুক্ষণ নাক খুঁটল। নাকে নোলক কী নাকফুলও নেই যে একবার খুলে আবার পরবে, বারবার খুলে বারবার পরবে। খুলবে পরবে আর সময় কেটে যাবে দিঙ দিঙ করে।

নথ-নাকফুল কিছুই না থাকলেও মনে মনে নাকফুল খুলে নাকফুল পরল পুনোই। সেই কবে কোন্ ছেলেবেলায় পিট্‌না সিজের কাঁটায় নাক ফুটিয়েছে সে। ফুটোটা এখনও আছে।

আছে, আছে।

কিন্তু ইস্কুলটা তো গেল।

গেল ত গেল হায় হৈল। অমন পাদের ইস্কুল থাকলে কী না থাকলে কী?

তবু—

কী তবু?

দুপহরের টিফিনটা? বিস্কুটটা পাউরুটিটা? অবরে-সবরে পাউডার দুধ? শুকনায় খেতে কত মিষ্টি! টাকরায় খালি লটকে যায়, লটকে যায়।

খানিক চুপচাপ বসে থাকল পুনোই। চুপচাপ।

এমনটা তো তার জীবনে খুব একটা আসেনি, এই চুপচাপ বসে থাকা। সারাক্ষণ তো ছোটাছুটি। এদিক-সেদিক। এধার-ওধার। খানিক যা ইস্কুলে, ইস্কুলে চুপচাপ বসে থাকা।

বসে থাকা কী আর, লেখাপড়া করা। লেখাপড়া, লেখাপড়া—

দুদ্দুর! লোদ্ধা জাইতে উসব ফের হয় নাকি? হয় হয়, নুক্কুটার হৈল কী করে?

নুকু ওরফে লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ায় আরো কত কী হুড় হুড় করে মনে এসে গেল পুনোইয়ের। কত কত-অ দিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে! কোথায় কোন্ শহর-বাজারে সে আই-এ বি-এ পড়ছে। আরো বড় বড় পাশ করছে।

ঐ ত একজনাই। কোটিকে গুটি। একটাই, একটাই।

আচ্ছা ভালা, নুক্কুদিদির বেহা হব্বেক কাহার সঙে? লোদ্ধা জাইতে উহার সম্‌মান কেহই আছে নাকি?

নাই, নাই।

কে আর অদ্দুর পড়েছে? সেই বলে নাই, জট্টাবুড়ি ত বলেই—"অতি বড় সুঁদ্‌রী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর?"

চিরকালের মতো ইস্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে পুনোই, আর কোনদিনও সে ইস্কুলে আসতে পারবে না।

ইস্কুলটা খারাপ, ইস্কুলের মাষ্টাররা খারাপ, ইস্কুলের হাটুয়াছুআরা খুবই পাজি? কিন্তু তবু—

তবু যেন কোথায় একটা মায়া রয়ে গেল, মমতা থেকে গেল পুনোইয়ের। ঘন ঘন গা শির্ শির্ করে উঠছে তার।

কটা দিনই বা ইস্কুলে গেছে সে! তার মধ্যেকার কটা স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করছে। সেই একবার কী একটা যেন হল ইস্কুলে, চাকা-আঁকা পতাকা উড়ল পত্ পত্ করে—

পুনোইও একটা পতাকা পেয়েছিল লালে সবুজে, লাল না ঠিক গেরুয়া গেরুয়া—

সেদিন সকাল সকাল ইস্কুলে যেতে বলেছিল মাষ্টার। লোধাপাড়ার যতেক ছেলেমেয়ে খাওন-দাওনের লোভে লোভে হাজির হয়েছিল ইস্কুলে। সঙ্গে জঙ্গল থেকে ফুলওয়ালা ডালপালা ভেঙে এনেছিল তারা।

মাষ্টার বলল, আরে জঙলী কোথাকার! এসব কী, এসবে হবে না। পতাকা তুলতে হবে, স্বাধীন ভারতের পতাকা।

বলেই হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ডাণ্ডা লাগানো লাল-সবুজের চাকা-আঁকা পতাকা।

সেই ধরেই তো লাইন করে যাওয়া! মুখে বলতে বলতে যাওয়া। কী যেন, কী যেন— জয়হিন্দ্ ভারত স্বাধীন!

আসছে বছর আবার হবে—'মেড়' ভাসান দিতে গিয়ে হাটুয়া ছেলেরা যেমন বলে—তাও বলেছিল কী? হয়ত বলেছিল, পুনোইয়ের এখন ঠিক মনে পড়ে না। মনে পড়ে না, মনে পড়ে না।

তবে সার সার লাইন বেঁধে যাওয়া, এ-গ্রাম সে-গ্রামের ভিতর দিয়ে। এ-ডাঙা সে-ডাঙার উপর দিয়ে। 'হুড়ি-ধুড়ি' পেরিয়ে। খাল পেরিয়ে।

অবশেষে পৌঁছুনো গেল, থামতে হল শ্রীশ্রী রামেশ্বর জীউর মন্দিরে। কত বড় মন্দির! কত বড় তার ঘণ্টা। একমণ দু'মণের নয়, দশমণের। দশমণী ঘণ্টা। কত বড় পাথরের ষাঁড় কালুয়া ষাঁড়। একদমে চাগিয়ে তুলতে পারলে কত পুণ্য!

সেখানেই খাওন-দাওন হবে। ক্ষীরিভোগ।

শুরু হল খাওয়া। মন্দির চাতালে 'খালি পাতা' পেড়ে খাওয়া। তার আগে নিজের খালি পাতাটা পুনোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল—ঠিক আছে কী নেই। ছেঁড়াফাটা তো নয়? এ-পাতা তো তাদের মা-কাকীমারাই বোনে। আরো কত কী যে বোনে তারা—খেজুরপাতা দিয়ে কাঁশিঘাস বাঁশ দিয়ে সিসলদড়ি দিয়ে কুলা খাঁচি, ঘোঙ-ঘুগি-ঘুনি, খাপুই-পলুই—

খালিপাতা সাজিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকল পুনোই। শুধু কী পুনোই? যতেক ছা-ছানা—হাটুয়া-কুম্‌হার-কাম্‌হার-মাহাতো-ভূঁইয়া-সাঁওতাল-বাগাল।

চাটু-ছান্তার নাড়ানাড়ি। টুং টাং আওয়াজ আসছিল মন্দিরের ভিতর থেকে। একসময় এসেও গেল খাবার। ক্ষীরিভোগ, ক্ষীরিভোগ। আতপচাল-ঘি-দুধ-কলার ভোগ। সঙ্গে লাল লাল বোঁদে।

স্বাদে একেবারে অমৃত!

'পাত' ভরে খাবারও দিল। খাওয়াও হয়ে গেছে অর্ধেকটা। আর এসময়ই বৃষ্টিটা এল, আকাশ ফুঁড়ে ঝমাঝ্‌ঝম! অঝোরঝর! বৃষ্টির ছাঁট তীরের ফলা হয়ে কাঁড়-কাঁড়বাঁশের পাটন হয়ে বিঁধতে লাগল পুনোইয়ের ক্ষীরিভোগের উপর।

দু'হাত চাপা দিল পুনোই 'খালিপাতের' উপর। দুহাত যদি চাপাই দিল পুনোই, তবে আর কোন্ হাত দিয়ে খাবে?

অথচ দু'হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে বহে যাচ্ছে শ্বেতনালার মতো দুধ-ভাত। দুধজল। জলের ধারায় ক্ষীরিভোগ জল হয়ে চাতালময় গড়িয়ে পড়ছে।

তাই দেখে ভয়ঙ্কর রাগী ও জেদী হয়ে উঠছে পুনোই।

আর আর ছা-ছানারা—হাটুয়ারা-কুম্‌হার-কাম্‌হার-মাহাতোরা এমনকি আর আর লোধা ছা-ছানারাও বৃষ্টি আসার সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করে উঠে গিয়েছে মন্দিরের ভিতর। আষাঢ়-শরাবণ মাস, শুধু শুধু বৃষ্টিতে ভিজবে কেন? যেমন-তেমন খাওয়াও তো হয়েছে।

সবাই উঠে গেল, শুধু থেকে গেল পুনোই। আহা কতদিন! কতদিন কেন, কোনোদিনও তো এরকম খাবার পুনোই পায়নি। পাওয়া তো দূরের কথা, চোখেও দেখেনি সে।

আজ যদি স্বচক্ষে দেখল, তবে না খেয়ে সে ছাড়বে কেন? সে খাবেই খাবে। অঝোরঝর বৃষ্টির মধ্যেও সে শুরু করল খাওয়া। একমুঠো খায় যদি তো দশমুঠো ভেসে যায় জলে!

খাওয়া ছেড়ে অগত্যা আগলাতে থাকে পুনোই, আগলাতে থাকে। পরমান্ন। মন্দিরের ভিতর থেকে তখন হা-হা হি-হি! কলরব কলরব।

তবু নড়ল না পুনোই। এক ইঞ্চিও না, একবিন্দুও না। গোঁজ হয়ে বৃষ্টির ফলার কাছে পিঠ পেতে দিয়ে, হাত চাপাচুপি দিয়ে বন-ঝিঁকরের মতো গায়ের কাঁটা খাড়া করে যুঝতে লাগল পুনোই।

আজ এতদিন বাদে দৃশ্যটা মনে পড়ায় বড় ঝামাপাথরের উপর বসে পা দোলাতে দোলাতে পুনোই ফিক্ করে হেসে ফেলল। হাসছে পুনোই।

এমন সময় আচমকা হাজির রাইবু-গুড়গুড়িয়া।—কী রে মিন্না, হাঁসছিস যে বড়? ইস্কুল থিক্যে পালাঁই এস্‌ছিস? ন, ইস্কুলেই যাস নাই?

মাকড়াপাথর থেকে একলাফে নিচেয় নেমে দৌড়ুতে শুরু করল পুনোই। দৌড়ুতে দৌড়ুতে বলতে বলতে গেল, ধু-উর বাব্বু, খালি হিস্কুল হিস্কুল!

হতভম্বের মতো রাইবু গুড়গুড়িয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। গুড়গুড়িয়াই বলল, মেয়্যাটাকে ধরেছে কালপুরুষাই।

হঁ, কাল্‌পুরুষা। রাইবুও বলল।



গড়কুস্‌মী একটা খালের নাম। বড়খাঁকড়ী হাটের কাছেই গড়কুস্‌মী। গড়কাটা, গড়কুস্‌মী, ভ্রমরগড়, অসুরগড় চারধারেই কেমন 'গড়' 'গড়'। আদিত্য তো কেমন বুঁদ হয়ে যায়, পড়ে যায় ঘোরে। মহাঘোরে।

আচ্ছা, কী ছিল এসব জায়গায়? অতীতে? ঘোর অতীতে?

হাত ছাড়িয়েও পাঞ্জাবির হাতা বেরিয়ে আসে, বোতামহীন লত্‌পত্‌ ঝুলতে থাকে। ঝুলতে থাকে, ঝুলতে থাকে।

অন্যমনস্ক আদিত্যমাষ্টার গড়কুস্‌মী খালধারে হেঁটে বেড়ায়। ধুতির খুঁটে জড়িয়ে যায় চোরকাঁটা। লালভেঁড়রার গাছের ডগায় এসে ঘাড় উঁচু করে দেখে গিরগিটি। ক্যাঁকলাশ, ক্যাঁকলাশ।

থেকে থেকে টিকটিকি ডেকে ওঠে, টিক্‌ টিক্‌!

হাতের আঙুলে টুস্‌কি মেরে আদিত্যমাষ্টারও সায় দেয়, ঠিক ঠিক। আচমকা ফিচেল কোনো ছেলে-ছোকরা, ছাত্রই, সঙ্গে এসে জুটে যায়। বলে, কিছু কি পেলেন স্যার?

কী? ঘোরের মধ্যেই পাল্টা প্রশ্ন করে আদিত্য। ঘোর কেটে গেলে হাসে, ও তুমি সঞ্জীব। কী যেন জানতে চাইছ?

মুচকি হাসে সঞ্জীবও। বলে, কিছু কি পেলেন স্যার ঐতিহাসিক উপাদান?

হুঁ-উ, ঐতিহাসিক উপাদান, ঠোঁটে আঙুল ঠুকে ঠুকে ভাবে আদিত্য, তারপর দুম করে প্রশ্ন করে বসে সঞ্জীবকে, বলো তো ঐতিহাসিক উপাদান কী কী?

এই রে পড়া ধরে বসল যে আদিত্য স্যার! কী কুক্ষণে যে পিছনে লাগতে এসেছিল সঞ্জীব! এখন পালাতে পারলে সে বাঁচে। পিছন ঘুরেই দৌড়ুবে—এক দৌড়—

হাতটা সস্নেহে জাপটে ধরল আদিত্য, সঞ্জীব, শোনো!

বলেই আদিত্য শুরু করল, এই যে দেখছ গড়কুস্‌মী ছল্‌ ছল্‌ করে বয়ে চলেছে সেই কবে কোন্‌ যুগ থেকে—এটাও একটা ঐতিহাসিক উপাদান। হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চিত এর তীরেই এর জলেই কত কী ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

গড়কুস্‌মী? যেখানে গ্রীষ্মকালে পায়ের পাতাও জলে ডোবে না, ছির্‌-ছার করে পুঁটি-দাঁড়িকিনী-চাঁদা-বাঁশপত্‌রিমাছ ডাঙায় উঠে আসে, ছুটি-ছাটার দিনে কাঁধে মাথা-ফাবড়ি জাল ফেলে যার জলে মাছ মারতে বেরিয়ে পড়ে ভূগোলের স্যার কার্তিক দাস—সেই গড়কুস্‌মীও কী না ইতিহাসের উপাদান?

সঞ্জীব তো বাংলা স্যারের কথা শুনে মনে মনে হেসে আকুল। যে নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে আন্ধারী-হরেকৃষ্ণপুর-কুস্তুড়িয়া-হাতিবান্ধী-বহড়াদাঁড়ি-দক্ষিণদাঁড়িয়া-নেপুরা-হরিপুরা-মৌভাণ্ডার, যে সব গ্রামের লোকেরা নদীর ধারে আখের খেতি করে, নদীর পলিমাটিতে খেঁড়ি-তরমুজ-ফুটি-কাঁকুড়-পুইখাড়া-বৈতাল করে, আর বড়জোর নদীর অঢেল মাছ দিয়ে শীতে শুকনায় শুঁটকী-শুকামাছ বানায়—তাদের, তাদেরও পূর্বপুরুষরা সব ঐতিহাসিক লোক?

বাংলার স্যার কী যে সব হাবিজাবি বলেন! সঞ্জীব তো মুখ টিপে হাসে মুচকো মুচকো।

এটা কি জানো সঞ্জীব? এই তল্লাটটা মানে ছোটনাগপুরের মালভূমিটা , বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম-মেদিনীপুরের এই অঞ্চলটা বুড়ো হিমালয়ের থেকেও বুড়ো, আরো আরো প্রাচীন?

তাই নাকি স্যার। সঞ্জীব কেমন ঘাবড়ে যায়।

আরো শোনো, রাণীগঞ্জ ঝরিয়ায় যখন গাছপালা বনজঙ্গল চাপা পড়ে ধীরে ধীরে কয়লার খনি হচ্ছে তখনও হিমালয় তৈরি করার কোনো পরিকল্পনাই নেই বুড়ো বিধাতার।

এবার সত্যি সত্যি হাসিতে ফেটে পড়ে সঞ্জীব। তার হাসির দমকায় একটা ঢেপচুপ্যাখি ফুড়ুর্‌র্‌র্ ফুড়ুর্‌র্‌র্ করে একবার উঁচুতে উঠে পরক্ষণেই নিচুতে থেমে উড়তে উড়তে গেল কুস্তুড়িয়ার দিকে।

হাসছ সঞ্জীব? কেন বইতে পড়নি— "টেথিস সাগরের গর্ভে....কোটি কোটি বছর ধরে সঞ্চিত পলল ও সামুদ্রিক অবক্ষেপ, ক্রমাগত পার্শ্বচাপ, ভাঁজ, মোচড় খেয়ে খেয়ে হিমালয়ের জন্ম?"

উরি-ই-বাব্ব! সব যে মুখস্থ!

মাথা ঘুরে যায় সঞ্জীবের। কোটি কোটি বছর ধরেই যদি হিমালয়ের জন্ম তবে তারও আগে তো এই অঞ্চল। কোটি কোটি বছর আগেও মেদিনীপুরের এই তল্লাট....ডুলুং গড়কুস্‌মী সুবর্ণরেখা?

আদিত্যস্যার নাছোড়, হাঁটতে হাঁটতে বলে চলে প্রাচীন বলে প্রাচীন, মহেঞ্জোদাড়ো বা হরপ্পার থেকেও প্রাচীন সভ্যতা এই মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার আশপাশেই ছিল।

খানিক থেমে, তামাজুড়ি গ্রামের নাম শুনেছ সঞ্জীব? তামাজুড়ি? কিংবা ধরো বীরভূমের চিনপাই? বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবি? বানেশ্বর ডাঙা? বীরভানপুর? আরো কত বলব— পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি? চন্দ্রকেতুগড়ের নাম শুনেছ? চন্দ্রকেতুগড়? মেদিনীপুরের তমলুক যে একদা তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল—সেসব তো পড়েছ? নাম শুনেছ বেড়াচাঁপার কাছে বালান্দার? আরে ঐখানেই তো খনা বরাহমিহিরের ঢিবি। জানো কি 'গঙ্গারিডি' নামে একটা দুর্ধর্ষ জাতি ছিল? এই মেদিনীপুরে কী মেদিনীপুরের আশেপাশে? যারা লড়েছিল কৃষ্ণসাগর উপকূলে গ্রীকসৈন্যদের বিরুদ্ধে? আরে মেগাস্থিনিসের বিবরণেই তো আছে—

'মেগাস্থিনিসের বিবরণ' ইতিহাসে টীকা লিখতে পড়ে। হিমালয়ের জন্ম থেকে মেগাস্থিনিসের বিবরণ—ভূগোল-ইতিহাস একসঙ্গে? ফিচলেমি করতে এসে এবার পালাতে পারলে বাঁচে সঞ্জীব। পালাচ্ছে— হাতটা ফের চেপে ধরল আদিত্য। শোনো,

অরণ্য পর্বতাবৃতং দেশং ঝাড়িখণ্ডখ্যাতং।
রাঢ় গঙ্গারাঢ়শ্চ অটবীরাজ্যং প্রণামিতম্।।
নির্বাণে পার্শ্বনাথশ্চ বর্ধমানস্ তীর্থঙ্করৌ।
বুদ্ধস্য শ্রীচৈতন্যস্য পদরেণুভিঃ পবিত্রম্।।

—মানে কী বলো তো?

এতক্ষণ ভূগোল-ইতিহাস, এবার আবার সংস্কৃত? এতক্ষণে সঞ্জীবের হয়ে গেছে, সংস্কৃতে সে তো দিগ্‌গজ! অনুস্বার-বিসর্গ গুলিয়ে ফেলে কতবার যে পণ্ডিতমশাইয়ের কানমলা খেয়েছে সে! এখনও কানের ভিতর ত্রিবেদী মাস্টারমশাইয়ের কাঠের খড়মের খটাখট্ আওয়াজ!

সঞ্জীব ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। না, সে জানে না। তবে ঝারিখণ্ড না হোক ঝাড়খণ্ড নাম তার জানা। কে জানে ঝারিখণ্ডই ঝাড়খণ্ড কী না।

আদিত্য বলল, জানো তো সঞ্জীব, এই অঞ্চল তীর্থঙ্কর মহাবীর, ভগবান বুদ্ধ আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পায়ের ধুলোয় পবিত্র। ইতিহাসে পড়নি? জৈন ধর্মের প্রচারক তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ আর মহাবীর এসেছিলেন রাঢ়ভূমিতে? জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্তেই' আছে, লাঢ়াদেশ বা রাঢ়াদেশ তখন বন্যপশু আর বন্যমানুষের বাসভূমি। খুব নিষ্ঠুর আর দুষ্টপ্রকৃতির

লোকজন সব বাস করত। তারা জৈন সন্ন্যাসীদের জোর করে কুখাদ্য খাইয়েছিল আর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল পিছন পিছন।

সঞ্জীব আনাড়ীর মতো জিজ্ঞাসা করে বসল, স্যার এসবও কী ঘটেছিল কোটি কোটি বছর আগে?

আরে না না, হেসে উঠল আদিত্য, হিসেব গুলিয়ে ফেলছ সঞ্জীব পুরা-ভূগোল, মানুষের প্রথম বসতি আর সভ্যযুগের মানুষের ইতিহাসের মধ্যে। জামার একটা হাতা অর্ধেক গুটিয়ে আদিত্য বলল, কী-ই পুরোটা বুঝা গেল না তো?

পুরোটা কেন এক আধলাও বুঝতে পারেনি সঞ্জীব। এত ভূগোল এত ইতিহাস—কেমন যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সে বরঞ্চ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে, ছুটির দিন, রাস্তায় ইস্কুলে যাবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের হুড়োহুড়ি ভিড় নেই। ফাঁকা, ফাঁকা। এক-দুজন গ্রাম্যবধূ যা গুড়াখু মাজতে মাজতে নদীঘাটে সিনানে যাচ্ছে, কেউ কেউ ভিজা-কাপড়ে নদী থেকে উঠে আসছে। এরা তো আর জানে না—এ নদী কত প্রাচীন! নিজেরা কোন্ অসুর-মসুরের বংশধর। পড়ত যদি আদিত্যস্যারের পাল্লায় বংশের ঠিকুজি-কুলজি সব মুখস্থ বলে দিত গড় গড় করে!

সঞ্জীব পালাতে চায়, আবার ঠিক যেন পালাতেও চায় না। আদিত্যস্যারের ছত্রছায়ায় সে থাকতে চায়। লোকটা বড় ভালো, জ্ঞান-তাপস, এত জানে তবু যেন এতটুকু অহঙ্কার নেই।

আদিত্য বলল, কথা মিথ্যা নয়, ঝারিখণ্ডই ঝাড়খণ্ড! আবার প্রায় ছ-সাত কোটি বছর আগে হিমালয়ের সৃষ্টি, তাও সত্য। তখন পৃথিবীর ভূ-ত্বক গঠনের তৃতীয় কী চতুর্থ পর্যায়।

থার্ড থার্ড। আর আমাদের ঝারিখণ্ড, ছোটনাগপুরের মালভূমি, ইত্যাদি ফার্স্ট। প্রথম পর্যায়।

কোথায় ফার্স্ট আর কোথায় থার্ড!

একটু একটু যেন বুঝতে পারছে সঞ্জীব। পৃথিবীর ভূ-স্তর গঠনের মতো করে তার মাথাতেও যেন স্তরে স্তরে জ্ঞান বাড়ছে।

আদিত্যস্যার বলে চলেছেন, আর ভারতে পুরাতন প্রস্তর যুগের শুরু তো মাত্র দু'লক্ষ বছর আগে। এই সেদিন। তোমাকে তো তাই বলছি সঞ্জীব—পুরাপ্রস্তর যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সব ছড়ানো রয়েছে এসব জায়গায়। কাঁকসার জঙ্গলে, তারাপীঠে, বনকাটি, জীবধরপুরে। কোথায় নেই? এই তো বড় নদী সুবর্ণরেখার ওধারে রামেশ্বর ডাঙায় দেউলবাড়ে, পাতিনা-নাকবিঁধি-তালডাঙরার তিলকমাটি হুড়িতে, শিলদা-বেলপাহাড়ি-ঝাড়গ্রামের বন-ঝাড়ে, ভৈরববাঁকি-তারাফেনী-গড়কুসুমী-ডুলুঙ-সুবর্ণরেখার নদী গর্ভে।

আচ্ছা, স্যার, খুদুপাড়ের চর খুঁড়লেও তো কত কী আবিষ্কার করা যায়?

যায় বৈকি, ভারি উৎসাহিত হয়ে সঞ্জীবের পিঠ থাবড়ে দিল আদিত্য, মনে মনে বলল, এই তো চাই।

খুদুপাড়ের চর। বড় নদী সুবর্ণরেখা আর ছোট নদী ডুলুঙের মাঝখানে গড়ে ওঠা ভূ-ভাগ। বৈঁচি-কাঁটাকুল-আকন্দ-ছাতিনার সমাহার। বড় বড় বালির ঢিবি। বড়জোর দু-দশটা ভুঁড়ো-শিয়াল শেষরাতে কী সন্ধের মুখে উলুম-ঝুলুম বেরিয়ে পড়ে। মুখময় যেন ভুসো কালি মাখা।

এহেন খুদুপাড়ের চরে খনন কার্য চালালে মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার মতো কোন নগর সভ্যতা বেরিয়ে আসতেও তো পারে। যা কী না সিন্ধুসভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। আরো আরো প্রাচীন।

আদিত্য বলল, বইয়েই আছে ব্রহ্মদেশের দুই বণিক 'তপোসা' আর 'পালেকাথ', সম্পর্কে দুই ভাই, পাঁচশ গাড়ি মালপত্র জাহাজ বোঝাই করে 'আদজেত্তা' বন্দর হয়ে প্রথমে 'সুয়োমা' দেশ, সেখান থেকে 'উরুবেল্লা' হয়ে নদীপথে মগধে যায়। তুমি জেনে রাখো সঞ্জীব—এই

'আদজেত্তা' সেই তাম্রলিপ্ত বন্দর আর 'সুয়োমা' সুম্মদেশ, যে সুম্মদেশের ভিতর মেদিনীপুরের এই তল্লাটটাও ছিল। এখন কে বলতে পারে—এইরকম কোনো বণিকের পণ্যবোঝাই অর্ণবপোত সুবর্ণরেখা নদীর ওধারে মহিষাসুর দঁকের ওখানে আজকের জাহাজকানার জঙ্গলে একদা ডুবে গিয়েছিল কী না? তোমারাই তো বল খররৌদ্রে দুপুরবেলায় এখনও ডুবন্ত জাহাজের কানা চিক্ চিক্ করে ওঠে আর দু'চোখ মাঝে মাঝে ঝল্সে যায়। যায় তো সঞ্জীব?

সঞ্জীব সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ স্যার যায়।

তাহলেই বুঝে দেখ—কোথা থেকে কী। একটু আগে জানতে চেয়েছিলে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ আর মহাবীরও কি কোটি কোটি বছর আগে লাঢ়াভূমিতে এসেছিলেন জৈনধর্ম প্রচার করতে? আরে না, তাঁরা তো এসেছিলেন এই সেদিন, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ কী সপ্তম শতকে। গৌতমবুদ্ধের আগে আগে। লাঢ়াভূমির তখন দুটো ভাগ—বজ্জভূমি আর সুব্বভূমি। এই সুব্ব বা সুম্মভূমিই দক্ষিণ-রাঢ়। আর দক্ষিণ-রাঢ়ে এই তল্লাটটা তো পড়েই। অস্ট্রিকভাষা গোষ্ঠীর লোকেরাই তখন জৈনগুরুদের পিছনে 'খুক্খু' বা ছু ছু বলতে বলতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কী সঞ্জীব, তোমাদের এখানকার লোকেরা কি এখনও কারোর পিছনে কুকুর ছোটাতে কী কুকুর লেলাতে 'ছু ছু' করে চিৎকার করে না?

অবাক বিস্ময়ে সঞ্জীব অস্ফুটে বলল, হ্যাঁ, তাই তো! মনে মনে বলল, আমিই তো কতবার কাগজ-কুড়ুনী কী পাগলদের পিছনে কুকুর লেলাতে মুখে 'ছু ছু' করে ঘুমন্ত কুকুরকে জাগিয়ে ছুটন্ত করেছি। সাঁওতালপাড়ায় ভুঁইয়াভূমিজপাড়ায় লোধাপাড়ায় এমনকি কামার-কুমোরপাড়ায় তো হরদম শোনা যায়—লে লে! ছু ছু!

আর বলামাত্রই কুকুরও দৌড়ুচ্ছে পিছন পিছন। সে যে-ই হোক পথচারী, সাধু-অসাধু। আদিত্য ফের শ্লোক আওড়ালো—

ইমাঃ প্রজাহতিস্র অত্যায়মীয়ু তানী মানি বয়াংসি।
বঙ্গ বগধাশ্চের পাদান্যন্যা অর্কমভিভো বিবিশ্রি ইতি।।

ঐতরেয় আরণ্যকের একটি শ্লোক। এই শ্লোকে বলা হচ্ছে বঙ্গ, বগধ বা মগধ আর চের দেশের লোকেরা 'পক্ষী-বিশেষাঃ' অর্থাৎ কাক-চড়ুইয়ের মতোই। দুর্বল, অনিষ্টকারী ও আরো নানা দোষে দুষ্ট।

বৌদ্ধশাস্ত্র আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এ-সমস্ত দেশের লোকেদের ভাষাকে বলা হয়েছে 'অসুর' ভাষা।

কালিদাসের 'রঘুবংশম্' পড়েছ সঞ্জীব? পড়লে জানতে পারতে রামায়ণের রাজা রঘু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সুম্মদেশ জয় করে 'কপিশা' নদী পেরিয়ে কলিঙ্গদেশে যান। বলো তো 'কপিশা' কোন্ নদী?

সঞ্জীব জানে না, সে জানবে কী করে? আদিত্যই বলল, কপিশা হল কাঁসাই, কংসাবতী। আমার তো মনে হয় 'কপিশা' হল সুবর্ণরেখা, সুবর্ণরেখা পেরোলেই তো উড়িশা, কলিঙ্গ। কী ঠিক না?

হ্যাঁ স্যার ঠিক।

শুধু কী রঘু, এদিকে দিগ্বিজয়ে কে না এসেছিলেন। কর্ণ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে হারিয়ে দিয়েছিলেন সুম্ম, বঙ্গ আর পুণ্ড্রদের। কৃষ্ণ হারিয়েছিলেন বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের। আর ভীম তো মুদ্গগিরি, আজকের মুঙ্গের, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, সুম্ম একের পর এক জয় করে সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছদের পরাস্ত করেছিলেন।

উরিবাব্বা! কর্ণ, কৃষ্ণ, ভীম! সব যে মহাভারতের রথী মহারথী! তাঁরাও এসেছিলেন এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে যুদ্ধ করতে? এতক্ষণে মাথাটা ফের ঘুলিয়ে উঠল সঞ্জীবের।

তারপর ভাবল হতেও পারে, কত কী হতে পারে, নদীর ওধারে জঙ্গলমহালের তপোবনে এখনও তো আছে তাড়কারাক্ষসীর হাড়, রামের শর, হনুমানচৌকি, সীতাকুণ্ড, লব-কুশ জন্মাবার পর সীতা যে শালদাঁতনে দাঁতন করেছিলেন, দাঁতন করে জিভ ছোলার জন্য দাঁতনটা চিরে দু'ভাগ করে অদূরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন আর তা থেকে দু'দুটো শালগাছ জন্মেছিল, দীঘল শাল, তাও তো এখনও আছে রুমরুম দাঁড়িয়ে।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল আদিত্যও। তার মনেও কি একে একে ভিড় করে আসছিল কর্ণ-কৃষ্ণ-ভীম? ঘোর পৌরাণিক যুগ? ইক্ষ্বাকু বংশ-পুরু বংশ-বৃহদ্রথ বংশ-যদু বংশ?

ইক্ষ্বাকু বংশের সেই বৈবস্বত মনু থেকে শুরু। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮১৪ সাল। বৈবস্বত-বিশ্বগস্য-যুবনাশ্ব-মান্ধাতা-হরিশ্চন্দ্র-সগর-অসমঞ্জস্য-অংশুমান-দিলীপ-ভগীরথ-রঘু-অজ-দশরথ-রাম-কুশ....। তারপরেও কত শত শত রাজা! রামের রাজত্বকাল তো আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২১২৪ সাল।

আর পুরু বংশের কুরু-শান্তনু-বিচিত্রবীর্য-পাণ্ডু? বৃষ্ণি বংশের অক্রূর, নীপবংশের উগ্রায়ুধ, যদুবংশের দেবকী, কৃষ্ণ? আহা বিষ্ণুপুরাণেই তো আছে—

যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।।

নন্দবংশের মহাপদ্ম নন্দের সিংহাসনে আরোহণ আর পরীক্ষিতের জন্মের সময়ের ব্যবধান তো মাত্র সহস্র বৎসর। মাত্র একহাজার বছর! পরীক্ষিত জন্মেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ১৪১৩ অব্দে আর মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক তো খ্রীষ্টপূর্ব ৪১৩ অব্দে। সে তো ঐতিহাসিক ঘটনা।

চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই তো শিশুনাগ বংশের এই মহাপদ্ম নন্দের শেষ বংশধরকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন? তারপর তো বিন্দুসার-অশোক....পুরো মৌর্যযুগ......

এসব তো বইয়েই পড়েছে আদিত্য, এতটুকুও মনগড়া নয়।

মনগড়া নয়, মনগড়া নয়। কেমন যেন অস্থির অন্যমনস্ক হয়ে উঠছে আদিত্য।

ভঞ্জভূম শবরভূম ভানদেশ মধ্যদেশ—এসব দেশেই তো এককালে শবর-পুলিন্দ-অসুর-দ্রাবিড়রা বাস করত। আর এসব অঞ্চলই তো কালে কালে রূপান্তরিত হয়ে আজকের এই মেদিনীপুর।

জৈন ধর্মগুরু তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমানের নামানুসারেই তো বর্ধমান ভুক্তি, আজকের বর্ধমান।

পূর্বজন্মে ভগবান বুদ্ধ তাঁর সবকিছুই এমনকি স্ত্রী-পুত্রকেও দান করে দিয়ে তপস্যা করতে করতে বঙ্কুগিরি পাহাড়ে দেহত্যাগ করেন। এই বঙ্কুগিরিই তো আজকের বাকুঁড়ার শুশুনিয়া পাহাড়। এই পাহাড়ে কে না এসেছেন, এসেছেন বুদ্ধও।

আর জিলিং সিলিং? গোতম ঝরা?

কম পরিশ্রম তো করেনি বড়খাঁকড়ি হাইস্কুলের বাংলার স্যার আদিত্য। এ-বই সে-বই ঘেঁটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কিছুই যে আবিষ্কার করে ফেলেছে সে!

তাম্রপ্রস্তর যুগের তামা-লাগানো চুল্লি, অসুরহুড়া বনআসুরিয়ায় অসুরের হাড়, তপোবনের জঙ্গলে সীতানালা খালধারে তাড়কা রাক্ষসীর হাড়, গনগনির মাঠে হিড়িম্বার হাড়, দেউলবাড়-খান্দারপাড়ায় রামের ছোঁড়া পাথরের কাঁড়, পাতিনার তিলকমাটি 'হুড়ি'—আরো কত শত জায়গা যেখানে পুরাপ্রস্তর যুগের অস্ত্র-শস্ত্রের ছড়াছড়ি।

সে-সব জায়গার কতক কতক জায়গায় ঘুরেও এসেছে আদিত্য, কী সব জায়গা, একটু মাটি খুঁড়লেই চাঙড় চাঙড় মোরামপাথর, যাকে বলে মাকড়াপাথর, সব যেন 'সাইজ' করা।

তিলকমাটি হুড়ির কাছেই রামেশ্বর জীউর মন্দির, মন্দির তো মন্দির, মন্দিরের চারধারে মাকড়া বা ঝামাপাথরের যে-খিলান যে-চৌহদ্দি তার একেকটা পাথরের স্তম্ভ একটা কেন দশটা লরিও বইতে পারবে না। সেসব যে কী করে এখানে আনা হল, কী করেই বা খাড়া করা হল একটার উপর আরেকটা—ভেবে অবাক হয়ে যায় আদিত্য।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মন্দিরের চূড়োর দিকে। কতক গোলাপায়রা ঘুরপাক খাচ্ছে চূড়োর চারধারে। উড়ছে, উড়তে উড়তে ভদ্‌ভদিয়ে ডানা মেলে মন্দিরের গায়ে পায়ের নখে আঁচড় কাটছে। আঁচড় কাটতে কাটতে পিছলে পড়ার উপক্রম হলেই ফের উড়ে উঠে টাল সামলাচ্ছে।

বড়খাঁকড়ি হাইস্কুলের গেটের কাছে বকুলতলায় আদিত্যকে ধরে ফেলল উপেন কম্পাউণ্ডার। টায়ারের ফিতে আঁটা কাঠের খড়মের খটা্‌খট্‌ আওয়াজেও ঘোর কাটেনি আদিত্যর।

উপেন কম্পাউণ্ডার বলল, এই যে আদিত্য, অমন হাঁ করে কী দেখছ?

হেসেই বলল আদিত্য, মন্দিরের স্বর্ণশিখর। দেখছেন না উপেনদা, মন্দিরের চূড়োর চারধারে কেমন ভদ্‌ভদিয়ে পায়রা উড়ছে? গোলাপায়রা কী আব, পায়রা প্রবাজ নচেৎ শুকশারী।

বুঝেছি।

কী বুঝলেন উপেনদা?

যা বুঝার তাই, তোমার মাথাটা একেবারেই গেছে।

জোর হেসে উঠল আদিত্য।

হাসছ? আর এদিকে তোমার বিরুদ্ধে চারদিকে সব বলে বেড়াচ্ছে —তুমি নাকি রাস্তায় যাকে পাচ্ছ তাকে ধরেই জ্ঞান দিচ্ছ, শোনাচ্ছ 'থিসিস'? তোমার 'শবর চরিত'?

ও, এই কথা। সঞ্জীব বলেছে বুঝি?

শুধু কি সঞ্জীব, আমিও তো বলছি—

বলেই হো হো করে হেসে উঠল উপেনও। এমন আত্মভোলা ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু মাষ্টার বড়খাঁকড়ি হাইস্কুলে তো এর আগে আসেনি।

তার হাত দুটো সাগ্রহে জড়িয়ে ধরে উপেন কম্পাউণ্ডার বলল, আর নতুন কিছু পেলে কি আদিত্য?

আদিত্য বলল, পেয়েছি বৈ কি—বিষ্ণুপুরাণেই আছে দনুর পুত্র 'শবর'। কপিল, অয়োমুখ, বিপ্রচিত্তি, দ্বিমুর্দ্ধা ও অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গে 'শবর'-এরও নাম আছে। এই 'শবর' থেকেই কি আজকের শবররা?

হতে পারে, হতে পারে।

আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছে, বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত পুত্রদের বংশধররাই শবর, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, পুলিন্দ, মুতিব, দস্যু আর অন্ত্য। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা মানব উপেনদা?

মানামানির কথা পরে, "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই"—

কম ঘাঁটাঘাঁটি তো করছে না আদিত্য! রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ,

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্বেদ, পরাশর সংহিতা, বৃহৎ সংহিতা, গর্গ সংহিতা, নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ্য, ঐতরেয, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র আরো কত কত যে শাস্ত্র!

উপেন কম্পাউণ্ডার বলল, লোধাশবররা কোত্থেকে এল শুধু তাই দেখলে হবে না আদিত্য, বর্তমানে কোথায় আছে, ভবিষ্যতে কোথায় থাকবে—এসবও দেখতে হবে। আর এই দেখাটাই বড় দেখা।

আগের আগের অভিযানগুলোর ব্যর্থতাব কথাই যেন মনে করিয়ে দিতে চায় উপেন কম্পাউণ্ডার। প্রথমবারের সেই বাঁশের 'আগড়ের' ফাঁক দিয়ে অবিরল একটা জলের ধারা, কোনো একটা বাচ্চাছেলেরই কুকীর্তি—শুধু তার ছবিটাই তুলতে পেরেছিল আদিত্য।

দ্বিতীয়বারের ফলাফল তো একেবারেই শূন্য। কটা কুঁড়েঘর আর গাছপালার ছবি ছাড়া আর কিছুই তুলতে পারেনি আদিত্য।

বরঞ্চ তৃতীয়বারে জঙ্গলে লোধাদের না পাক সাঁওতালদের একটা ন্যাড়ামুণ্ডি নেংটি পরা আট-দশ বছরের ছেলেকে হাতের কাছে পেয়ে সঙ্গের লোকটির কথামতো জিগ্গেস করেছিল, আমা অড়া, অকারে?

সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছিল, হুই যে ডাঙাসাই।

আমা উতুম চেদ?

তৎক্ষণাৎ উত্তর, রাবণ মাণ্ডি।

সেই থেকে আদিত্যর দুটি কথা মুখস্থ—আমা অড়া অকারে? তোমার বাড়ি কোথায়? আমা উতুম্ চেদ্? তোমার নাম কী? সাঁওতালি ঠার।

মাথা হেঁট করেই আদিত্য বলল, জানি, জানি উপেনদা। চেষ্টা তো করছি। কিন্তু—

কোনো কিন্তু নেই মাই বয়, ইউ হ্যাভ ওযেল ডান, চালিয়ে যাও। ও-বেলা ডিস্‌পেনসারিতে এসো একটা জিনিস দেখাব।

বলেই খড়মের খটাখট্ আওয়াজ তুলে উপেনকম্পাউন্ডাব আপনাব কাজে তড়িঘড়ি চলল। কাজ তো কত! এখন ঘুরে বেড়াবে এ-গ্রাম সে-গ্রাম। এ-তল্লাট সে-তল্লাট।

বকুলতলায় দাঁড়িয়ে থেকে আদিত্য লোকটার চলে যাওযা দেখল। আব অবাক হযে ভাবল, লোকটার লোকায়ত বিষয়-আশয়ের প্রতি এত আগ্রহ কেন? ডাক্তারি পেশায থেকেও এত কেন উদাস উদাস?

আদিত্য মনে মনে খুব জোর ভেবে রাখল, উপেনকম্পাউণ্ডাবও তলে তলে একটা কিছু করছে। লেখালেখি?

অর্জুনগাছের তলায় ছায়া ঘনিয়ে আসছে, বেলা ডুবছে। বেলা ডুবছে বেলা ডুবছে।

হোস্টেলের মাটির দোতলায় শুরু হয়ে গেছে হেবিকেন মোছামুছিব পালা। বেলা থাকতে থাকতে ভুসোপড়া হেরিকেনের কাচ মুছে সাফা করে বাখছে ইস্কুল হোস্টেলের খুদে পড়ুযারা।

মাস্টারদের ঘরে ঘরে লণ্ঠনে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে রেখে এল হোস্টেলের পিওন পঞ্চানন। এবার সে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে গুড়াখু মাজবে।

দাঁতে আঙুল ঘষে ঘষে এমন মাজা সে মাজবে যে আওয়াজ উঠবে চিক্ চিক্ কবে। আব এসময়ই মাঠ ভেঙে এগিয়ে যাবে আদিত্য। উড়োখুড়ো কোঁকড়ানো চুল। জামার হাতা হাত ছাড়িয়েও ঝুলবে এক বিঘৎ।

হ্যাজাক জ্বলছিল ডিসপেনসারির ভিতরে, রোজই জ্বলে। আলো থাকতে থাকতে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় আর্দালি। আর্দালি মনোহর ঐ এখন উপেনকম্পাউণ্ডারের বাসাবাড়ির উঠোনে কাঠ ফাড়ছে। টালির চালঅলা মাটির ঘরের মুর্ধুন বেয়ে ধোঁয়া উঠছে ধুনিয়ে ধুনিয়ে।

ডিস্‌পেনসারিতে ঢোকার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল আদিত্য, রোজই দেখে। কোনোদিন দেখতে পায় কোনোদিন পায় না, উপেনকম্পাউণ্ডারের মেয়ে বলাকা সেজে গুজে বাগানে পায়চারি করছে।

কিছুদিন আগেও বাগানে বড় বড় গাঁদা ছিল, রক্তগাঁদা। গাঁদার মরশুম আর নেই, তার জায়গায় ঢেঁড়স ফুল, 'দু-পহরিয়া' ফুল, টেবিল গোলাপ। বাগানে আজ অবশ্য বলাকাকে দেখতে পেল না আদিত্য।

বলাকা ছোট,বড় মেয়ে অলকার বিয়ে হয়ে গেছে কবেই। বলাকা ডিস্‌পেনসারির ভিতর। রুগীর ভিড় খুব একটা নেই, রুগী দেখতে দেখতেই উপেন কম্পাউণ্ডার ডাকল, আরে এসো আদিত্য! বসো।

এতক্ষণ ডিস্‌পেনসারির পেছনের বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে কী একটা পত্রিকা পড়ছিল শাড়ি-পরা বলাকা। আদিত্যমাস্টারের নাম শুনেই তড়িঘড়ি উঠে পড়ল। কোনমতে বাবার টেবিলে পত্রিকাটা রেখেই ডিস্‌পেনসারি ছেড়ে আলুথালু বেশে দৌড়ুল ঘরের দিকে।

উপেনকম্পাউণ্ডার, আদিত্য—দুজনেই হেসে উঠল।

উপেনকম্পাউণ্ডার বলল, একটু আগে মেয়েকে তাই বলছিলাম আদিত্য, যার হবার তার এমনিতেই হয়, এমনি করেই হয়। সে বনে জঙ্গলে যেখানেই জন্মাক না কেন।

আদিত্য কথার খেই পাচ্ছিল না উপেনকম্পাউণ্ডারের। বলল, কীসের কী উপেনদা?

উপেনকম্পাউণ্ডার একহাতে রুগীর নাড়ি টিপে আরেক হাতে আদিত্যর দিকে বাড়িয়ে ধরল পত্রিকাটা।—নাও, দেখ-অ—

আদিত্য উল্টে-পাল্টে দেখল আর অবাক বিস্ময়ে পড়তে লাগল—

"মানুষ জাতি এরাও, মানুষ এদের নাম,
বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকার ওদের কাম।
জাতিতে ওরা লোধা ছোট্ট ওদের ঘর,
তালপাতাতে ছাওয়া কিংবা কিছু খড়।
কিছু ঘরের অর্দ্ধেক প্রায় ধ্বসে পড়েছে জলে,
এমনি ঘরে বাস করে, কিন্তু মানুষ ওদের বলে।
ছিন্নবস্ত্র পরিধানে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল,
কাঁধে নিয়ে লোহার সাবল যায় তাড়তে বনের মূল।
উলঙ্গ প্রায় ছেলেগুলো সব ঘাঁটে বসে ধুলো,
বাগালী করে ওরা—ওদের ছোট ভাইবোনগুলো।
লিখাপড়ার ধার ধারে না কেউ জানে না ইহা,
কেবল জানে পেট ভরাতে ছেলে বন্ধক দিয়া।"

লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের কবিতা? লক্ষ্মীরাণী মল্লিক? তারমানে লক্ষ্মীরাণী লোধা? লোধাশবর?

হাঁ মাস্টার, হাঁ।

রীতিমত 'চর্যাপদ' আউড়িয়ে উপেনকম্পাউণ্ডার বলল, দেখ-অ তো আদিত্য মিলে কি না মিলে—

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসহি সবরী বালী।
মোরহী পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।"

বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি অদিত্যর, সে জিজ্ঞাসা করল, একে কী করে পেলেন উপেনদা? আচ্ছা উপেনদা, মল্লিক কেন?

উপেনকম্পাউণ্ডার বলল, শুধু কী মল্লিক আদিত্য, শবর আছে দিগার আছে কোটাল আছে দাসও আছে ভক্তা আছে নায়েক আছে লোধা আছে, আছে লোধা-শবরও, আছে দণ্ডপাটও। কতরকম পদবি কতরকম গোত্র। তিড়ুন পাখি, টিড়লিং পাখি, চিরকাআলু, শোলমাছ, শালমাছ, চাঁদামাছ। কি কানে খটোমটো ঠেকছে? বানিযে বলছি মনে করছ? না হে আদিত্য, পরের হাটবারে রাইবু আসে যদি তো মিলিয়েই দেখ-অ।

মেলাবে যে আদিত্য অবিশ্বাস হলে তো? অবিশ্বাস নেই, অবিশ্বাস নেই। আদিত্যর মনে হল—উপেনকম্পাউণ্ডার আদিবাসীদের একটা চলমান ডিকস্‌নাবী। ডিস্‌পেনসারিতে রুগী হয়ে আসা আদিবাসীদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে বলতেই কী এত কিছু শিখে ফেলেছে সে? এই যেমন এখন একজনকে জিজ্ঞাসা করল, এই তোরা চালে-ধরা চালকুমড়াকে কী বলু?

অসুস্থ বউটি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে প্রথমে হাসল, পরে বলল, কাঁখুযার।

উপেনকম্পাউণ্ডার তাই শুনে বিধান দিচ্ছে, খুব করি কাঁখুয়ার খা ত। নুন-লঙ্কা দি' সিদ্ধ।

তাই খামু ডাগতরবাবু।

হঁ, খা।

আদিত্যর দিকে মুখ ঘুরিয়ে উপেনকম্পাউণ্ডাব বলল, একটু আগে কী যেন জিজ্ঞাসা করছিলে আদিত্য—একে কী করে পেলাম? কী করে পেলাম না বলে বল-অ—কী করে আবিষ্কার করলাম?

চোখে-মুখে বড় তৃপ্তির ছাপ উপেনকম্পাউন্ডারের। আবিষ্কার তো আবিষ্কার, হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল আদিত্য।

তারপরই শুরু হল আবিষ্কারের কাহিনী। উপেনকম্পাউণ্ডারের মুখ থেকেই শুনল সে—সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে তিলকমাটি হুড়ি পেরিযে রামেশ্বব জীউর মন্দিরকে ডাইনে বেখে সীতানালা খাল মাড়িয়ে কদমডাঙার টাঁড়-টিকর ছাড়িয়ে শালবন-কেন্দুবন-আসনবন উঁচিযে যে দোরখুলির লোধাবস্তি সেই বস্তিরই মেয়ে কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিক।

আর সেই দোরখুলির লোধাবস্তিতেই তো পরের পব ব্যর্থ অভিযান চালিযেছে আদিত্য! আর বারে বারেই হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে সে। অথচ কত সহজেই সেই লোধাবস্তিতেই নিদেন একজন লোধাকবিকেই আবিষ্কার করে ফেলেছে কম্পাউণ্ডার!

আদিত্যর দুম্ করে মনে পড়ে গেল চর্যাপদের কবি শবরীপাদ বা শববপাদের কথা। চুবাশি সিদ্ধার এক সিদ্ধা। সরহপাদের শিষ্য। বইয়েই তো পড়েছে সে—শববপাদ 'বঙ্গালদেশেব পর্বতবাসী এক ব্যাধ বা শবর' ছিল। আহা, তার সেই যে সেই পদটা—

"গঅনত গঅনত তইলা বাড়ী হিয়েঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালী জাগন্তে উপাড়ী।
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসম সমতুলা।
সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহোঁ ভোলা।।
চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুন শিআলী।।"

এই তিলকমাটি হুড়িতেই হয়ত শবরপাদের বাড়ি ছিল। উঁচু পাহাড়ী জায়গা। অত উঁচুতেই শবর-শবরীদের বাড়ি, যেন আকাশকেই ছুঁয়ে আছে। বাড়ির চারধারে এখনকার মতো কেঁদ-আঁটারি-চুরচুর জঙ্গলও হয়ত ছিল, সেই সঙ্গে ছিল নিজের হাতে লাগানো কার্পাসগাছ। সেই

কার্পাসগাছে ফুল ফুটেছে। তাছাড়া নিজেদের চাষের জমিতে চিনা বা কাগনী ধান পেকেছে। তাতেই উৎসবে মেতে আছে শবর-শবরীরা। কিন্তু চারধারে শিয়াল-শকুনের বড় চিৎকার, কান্না। তারা ক্ষেতে ঢুকে ফসল নষ্ট করছে। তাদের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে শবর-শবরীরা ক্ষেতের চারধারে বাঁশের চাঁচ্ড়ার বেড়া দিয়েছে।

সে-যুগের শবরীপাদ লিখেছিল দশটা বজ্রযানী গ্রন্থ, এ-যুগের শবরী লক্ষ্মীরাণী লিখবে কটা?

উপেনকম্পাউণ্ডার বলল, বেশ লিখেছে না? কী যেন?

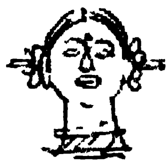
আদিত্য আবৃত্তি করে শোনাল—

"মানুষ জাতি এরাও, মানুষ এদের নাম,
বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকার ওদের কাম।
জাতিতে ওরা লোধা ছোট্ট ওদের ঘর,
তালপাতাতে ছাওয়া কিম্বা কিছু খড়।"

রুগীকে লাল মিক্স্চারের বোতলের দাগ বুঝিয়ে দিয়ে আদিত্যকে উপেনকম্পাউণ্ডার বলল, রীতিমত প্রতিবাদের কবিতা, কী বল-অ আদিত্য?

উপেনকম্পাউণ্ডার, আদিত্য—দুজনের কেউই জানল না, এর থেকেও প্রতিবাদের কবিতা কবেই লিখে ফেলেছে নুকু ওরফে লক্ষ্মী!

"ভখ্লাতে আলু-তুণ্ডা যদি ধরে নরসিঙা
বল্ বাণী বল্ মুনু একসঙে চেঁচাঞে—
বনে জনম বনে মরণ বন লোধাদের হকের ধন
কহে দে রাণী কহে মুনু, বন আমাদের মা বঠে।"



নদী।

সুবর্ণবেখা একটি নদীর নাম। ঐ দেখা যায় নদী। "আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে"। কিংবা, "বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে, জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে"।

'অজয়' কেটে দিয়ে এখানে 'সুবর্ণরেখা'।

আরো আছে, "সুবর্ণরেখা যদি বা নদীর নাম আমারো মায়ের ঐ নাম ছিল। বাবা তো নিয়ত মাকে ঐ নামে ডেকে যাবতীয় কথা কুলকুচোর মতো ফেলে রেখে চলে যেত নদীটার দিকে—নাকি সে নদীর রূপ মা আমার ধরেছিল বস্তুত জীবনে!"

গ্রাম-সমীক্ষায় বেরিয়ে নদী দেখে আদিত্যর এত কিছু মনে পড়ছে। নদী, নদী। সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মতো এ-নদীও কী তবে পুরোনো?

তার মনে আসছে ইন্দোব্রাহম নদীর নাম। নাকি হিমালয়ের জন্মেরও আগের নদী। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী, শতদ্রুও কি তাই?

আর কপিশা, সুবর্ণরেখা?

'রঘুবংশম্'-এ কপিশার উল্লেখ আছে। কপিশা তো কংসাবতী। বিষ্ণুপুরাণে শতদ্রু,

চন্দ্রভাগা, গোদাবরী, কুমারী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, গৌরী, কুমুদ্বতী, এমনকি সুকুমারী, বেণুকা, ধেনুকা, নলিনী, গভস্তী কত সব নদীর নাম আছে!

কিন্তু সুবর্ণরেখা?

নেই, নেই। আদিত্যর মনে হয়েছে এ-নদীর অন্য কোনো নাম ছিল আগে, সুবর্ণরেখা হালে হয়েছে। সরস্বতীই তো কখনো হরাবতী, কখনো ওঘবতী—

খোদ মেগাস্থেনিস্ অজয়নদীকেই বানিয়ে দিয়েছিলেন ''অ্যামিস্‌টিস্'' আর টলেমি কপিশা বা কাঁসাইকে 'ক্যামবিসন'!

দলবল নিয়ে গ্রাম-সমীক্ষায় বেরিয়েছে আদিত্য। স্কুলেরই ছাত্র সব। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা বাদ।

গ্রাম বলতে আশেপাশেরই গ্রাম সব। আদিত্যর মাথায় একটা ফন্দি আছে বটে, ছাত্রদের নিয়েই সে ঢুকবে দোরখুলির লোধাপাড়ায়। দোরখুলির লোধাপাড়াকেও গ্রাম-সমীক্ষায় ঢুকিয়ে দেবে সে।

নদীবালিতে হাঁটতে হাঁটতে আশপাশেরই গ্রামের ছেলে শশাঙ্ক হাটুই বলল, জানেন কী স্যার, সুবর্ণরেখা নদীবালিতে সোনা পাওয়া যায়?

জানে বৈ কি আদিত্য। এদিকটায় না হলেও পুরুলিয়া-উড়িশার ওদিকে সুবর্ণরেখা নদীবালিতে চালুনি দিয়ে বালি চেলে চেলে সোনার টিক্‌লি খোঁজা তো গরীবগুর্বো মানুষদের দৈনন্দিন জীবিকাই।

আরেক ছাত্র পূর্ণ পৈড়্যা সে-কথা উল্টে দিয়ে বলল, সোনা নয় স্যার, পাওয়া যায় অভ্র। দেখছেন না স্যার, কেমন রোদ লেগে নদীবালি চিক্‌চিক্ করছে?

আদিত্য গলা ছেড়ে আবৃত্তি করে উঠল, "চিক্ চিক্ করে বালি কোথা নাই কাদা, দুইধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা—"

কাশের ফুল নয়, এই কদিন আগেও নদীধারে ছিল আখের ফুল। আখের ফুল ফুটে থেকে হিমেল হাওয়ায় চামরের মতো দুলত আর আখের খরাল পাতায় ঘষা লেগে লেগে খড়মড়ো আওয়াজ উঠত। তদুপরি অজস্র তালচড়ুই আখশীষের চৌদিকে সন্ধের মুখে কী সকালের দিকে ফুর্ হুর্ ফুর্‌ফুর্ করে উড়ে-ঘুরে বেড়াত। আর উড়ে-ঘুরে বেড়াত।

সে-আখক্ষেত আর নেই, মাড়াই হয়ে গিয়েছে আখের বিল-কে-বিল। যেটুকু পড়ে আছে 'আখুশালের' পোড়াকাঠ, খুয়া, পাঁড়াসে শুকনো গাঁদা আর 'গদের' কালচে দাগ। আর কাক-চিল। আর তালচড়ুই, চটিবনি।

এই যে গ্রাম-সমীক্ষা, এসব নিয়ে ছাত্রদের ভিতর কৌতূহল ভারি। যদিও এসব গ্রাম তাদের নিজেদেরই গ্রাম, কতকালের চেনা। তবু আজ যেন অচেনা। নতুন, নতুন।

তার ওপর বাংলার স্যার আদিত্যবাবু। তাঁর যেন তুলনাই নেই। কী অগাধ পাণ্ডিত্য আর কী অগাধ ছেলেমানুষী! নদীধারে নদীবালিতে জমানো বালির স্তূপ, স্তর পড়ে রয়েছে নানা রঙের। কোনোটা কালচে, কোনোটা লাল কোনোটা বা শ্যাওলার মতো সবুজ সবুজ।

তাই দেখেও কল্প অবকল্প, হলোসিন প্লাইস্টোসিন, পুরাপ্রস্তর যুগ নব্যপ্রস্তর যুগের আলোচনা, পর্যালোচনা।

আদিত্যস্যার যখন বালির স্তূপে আঙুল গুঁজে আলোচনায় মত্ত তখন তার মাথার ওপর দিয়ে কালরুইয়ের কালীপদ হাটুই চোখ তুলে দেখে, আরে তাই তো ওধারে নদীর পাড়েও মাটির স্তরে চমৎকার দাগ পড়ে আছে একের পর এক! লাল-হলুদ-কালচে।

কালীপদ সোল্লাসে বলে উঠল, ওপারেও দেখুন স্যার—কেমন বেলে ল্যাটেরাইট গ্রানাইট বেসল্ট—

উঁ-হু, উঁ-হু, ওসব তো পাথরের নাম, পাথর নয় কালী, বল্ মাটি—বেলে, কাঁকর আর দোঁআশ। বলেই হাসিতে ফেটে পড়ল পূর্ণ।

তাকে থামিয়ে দিল আদিত্য। বলল, মাটি জমে জমেই তো পাথর পূর্ণ। আর বইয়ে পড়নি—পুরাতন যুগের উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে এই মাটি-পাথরের উপরই নির্ভর করতে হয় বেশি? মাটি-পাথরেই তো জমে থাকে শতক-হাজার-লক্ষ লক্ষ বছরের 'ফসিল সয়েল' বা মাটির জীবাশ্ম।

পূর্ণ পৈড়্যার দল আড়ালে সরে গিয়ে হাসাহাসি করে, বলাবলি করে, ফসিল না আউ কিছো স্যার, এ বছর লদীতে বান আইলা এতে দূর পর্যন্ত লদীপাড়ে মাটিতে দাগ ধরলা, পরের বছর ঘুরি-ফিরি ফের বান আইলা আরেকটা দাগ পড়লা, দাগের উপরি দাগ।

হাটুয়াঘরের 'ছুয়া' পূর্ণ-শশাঙ্ক-মিহির দঁড়পাটেরা হাটুয়া ভাষাতেই বলে, হাটুয়া তারমানে ওড়িয়া, আদিত্য সেনগুপ্ত তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারে না, না বুঝে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, এ্যাই কী বলছ?

তৎক্ষণাৎ তারা সমস্বরে আরো কঠিন ভাষায় বলে ওঠে, "মির্ধার টকামানে কুক্কুল্যা খরাবেলা গেড়্যাঘাটে ঝাপাসি ঝুরেঠে"। মানে কি বলুন তো স্যার?

তারা মাস্টারমশাইকে বোকা বানাতেই এ কথা বলে। যেন সংস্কৃত বা গ্রীক ভাষায় কোনো শ্লোক আওড়ে তার মানেটা জানতে চায়। আসলে তারা ভোলাভালা মাস্টারমশাইকে নিয়ে আরেকটু মজা করতেই চায়।

কী, কী বললে? আরেকবার বলো তো, মির্ধার টকামানে—

আদিত্য উদ্‌ব্যস্ত হয়।

ছেলেরা আবার শুনিয়ে দেয়, 'মির্ধার টকামানে কুক্কুল্যা খরাবেলা গেড়্যাঘাটে ঝাপাসি ঝুরেঠে, ঝাপাসি ঝুরেঠে—"

বলতে বলতেই হাততালি দেয়, মানেটা বলুন স্যার, বলুন!

গলদঘর্ম হয়ে ওঠে আদিত্য, কুলকুল করে ঘামতে থাকে, সাধ্য কী মানেটা অনায়াসেই বলে দেয়। 'কক্কুল্যা' কী রে বাবা? 'ঝাপাসি ঝুরেঠে'—তাই বা কী?

পরাজয় মেনে নিলে ছেলেরাই হয়ত মানেটা বলে দেয়।—তার মানে, "মির্ধাদের ছেলেরা কুলকুল করে ঘাম দেওয়া দুপুরবেলায় পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটছে।"

শুনে তো আদিত্যর মাথার ভিতর ধ্বক করে ওঠে, এ কী ভাষা? দ্রাবিড় না অষ্ট্রিক—কোন্ গোষ্ঠীর?

আজ মাস্টারমশাইয়ের ভাষাই পূর্ণ-শশাঙ্ক-কালীপদদের কাছে গ্রীক অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় লাগে।

'ফসিল সয়েল' না 'সয়েল ফসিল'—

নাম শুনেছ পূর্ণ—জয়াল স্তর অমরপুরস্তর দিদওয়ানা স্তর? না না তোমাদের এখানকার নাম নয়, তোমাদের শোনার কথাও নয়। ওসব নাম কাশ্মীর অঞ্চলের, লুনি নদীর আশেপাশের। 'প্ল্যাইসটোসিন' যুগ, যে-যুগে মানুষের চিহ্ন ছিল না, তখনকার চুনাপাথর, কাঁকর মেশানো মাটির স্তরই জয়াল স্তর। 'প্লাইসটোসিন' যুগ তারমানে আজ থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগেকার কথা, ভাবো পূর্ণ, ভাবো।

সত্যিই ভাবনায় পড়ে গেল পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-শরৎ-ফটিক-রঞ্জিতরা। এ কী ধাঁধায় ফেলে দিল তাদের আদিত্য স্যার! কুড়ি লক্ষ না হোক, দশ-পাঁচ না হোক, কমসে কম এক লক্ষ বছর আগেকারও তো হতে পারে এই সুবর্ণরেখা নদী বালিয়াড়ীর বালির স্তর।

সে-ভাবনা একরকম, তার চেয়েও বড় ভাবনায় এখন পড়ে আছে একলা কালীপদ। আদিত্যস্যারের মাথার ওপর দিয়ে চোখ তুলে দেখতে গিয়ে সে যেমন আবিষ্কার করে ফেলল সুবর্ণরেখা নদীপাড়ের কাদামাটির স্তর, 'ফসিল সয়েল', তেঁমনি দেখে ফেলেছে বড়োডাঙ্গার গেঁড়ীকে, গেঁড়ী দঁড়পাট।

দহের দিকে এক কোমর জলে নেমে আঁশছাড়া মাছের মতো হাত-পা নেড়ে ভাসছে। আর মাঝে মাঝে মুখে জল পুরে পুচুর করে জল ছুঁড়ছে গেঁড়ী। কালরুইয়ের কালীপদ হাটুই মনে মনে বলল, আরিব্বাশ! গেঁড়ী গা ধুয়েঠে! ঠিক দেখিঠি ত?

দৃশ্যটা নিজের কাছেই যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে কালীপদ। আর যেন কেউ না দেখে। কিন্তু কী করেই বা আড়াল দেবে কালী? এমন হাট-খোলা নদী-জলে? নদীঘাটে?

স্নানের বেলা, অমন কত লোকই তো ঝাপাসি ঝুড়েঠে। পঁড়ামোষ ধু'চ্ছে কেউ কেউ। কঁচিকাচারা তো ডোঙা-ডুঙি নিয়ে খেলছে জলকেলি, নৌকাবিলাস।

মাথায় ঝুড়ি-কাঠ বয়ে নদীপারের জঙ্গল থেকে এপারে আসছে আঁধারি লবোকেশরপুরের ঝিউড়ী-বউড়ীরা। তারা গিয়েছিল জঙ্গলে ঝাঁটিকাঠ কুড়োতে সকাল সকাল। প্রায় কোমর পর্যন্ত শাড়ি-সায়া তুলে বেআব্রু তারাও তো পারাপারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীজলে।

এ-দৃশ্যও লুকোবে কী করে কালীপদ?

আর গেঁড়ী, যার আঁশছাড়া মাছের মতো শরীর? জলের তলে একদিকে লেপ্টে আছে শাড়ি, আরেকদিকে হেথাহোথা ফুলে ফুলে উঠেছে জল বুদ্‌বুদ্‌, শাড়ি, শরীর।

রামেশ্বরের মেলা উপলক্ষ্যে বড়োডাঙায় কুটুম্বিতায় এসে সেই প্রথম দেখা হয়েছিল গেঁড়ীর সঙ্গে। তারপর থেকে কতবার তো দেখা। আর একবার ফিরে দেখার জন্যই তো কালীর গ্রাম-সমীক্ষায় আসা।

ফিরে দেখা, ফিরে দেখা।

উঠতি যুবক, হাই-হাইস্কুলের সেকেন্ডারী স্কুলের উঁচু-ক্লাসের ছেলে-ছোকরাদের এমনি কত গেঁড়ী-গুগ্‌লিকে ফিরে দেখতে আবিষ্কার করে ফেলতেই তো গ্রাম-সমীক্ষায় আসা!

নদী নিয়ে কিন্তু এখনও মেতে আছে আদিত্য। মনে মনে ভাবছে, কবে কোথায় জন্মেছে এ-নদী? জন্ম থেকেই আছে না মরে গিয়ে আবার জন্মালো? কতবার মরল কতবার জন্মালো?

ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকেই সুবর্ণরেখার জন্ম। আর ছোটনাগপুরের মালভূমি তো সেই কবেকার পুরাকালের মালভূমি!

প্রায় পাঁচশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম। তার একশ কোটি বছর বাদেই তো ছোটনাগপুরের মালভূমি। বইয়েই পড়েছে আদিত্য।

দলমা পাহাড় জন্মাল, ধনঝোরি পাহাড় জন্মাল। শুরু হল মৌসুমীবায়ু প্রবাহ। পাহাড়ের চূড়োয় বায়ুর ধাক্কায় বৃষ্টি নামল অঝোরঝরে। অবিরল বৃষ্টি, অঝোরঝর বৃষ্টি। বৃষ্টি, বৃষ্টি।

সৃষ্টি হল সুবর্ণরেখার। শুধু কী সুবর্ণরেখা, জন্ম নিল দামোদর আর দুই কোয়েল নদীও। দুইধারে এমনকি মাঝেমধ্যে নিস্‌-গ্রানাইট-ডোলেরাইট পাথর, পাথরস্তম্ভ আর শাল-মহুল-আসন-পিয়াশাল-ডকা-ভাদু-কেঁদ-কইম-কুসুম-করম-খয়ের-অর্জুন-আঁটারি-চুরচু-চিহড়-গাম্‌হার-ধ-কুড়চি-ভেলা-বাদভেলার গাছ।

তার ভিতর দিয়ে নদী। নদী, নদী। ভূ-আলোড়নের ফলে কতবার যে মরল আর কতবার যে জন্মাল!

পূর্ণ পৈড়্যা হয়তো ঠিকই বলেছে নদীবালিতে সোনা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অভ্র। উঁহু সোনাও পাওয়া যায় বৈকি। তবে সোনার চেয়ে অভ্রই বেশি।

সোনা পাওয়া যায় বলেই কি এর নাম সুবর্ণরেখা? আদিত্য জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেয়। আসলে সে আবিষ্কার করতে চায় নদীর নামরহস্য। আসলে সে-কিছুক্ষণ নদীর নাম নিয়েই মেতে থাকতে চায়। কপিশাই বা কী করে কংসাবতী?

অন্যমনস্ক কালীপদ প্রশ্ন শুনে বলল, কেন স্যার উত্তর তো খুব সহজ। নদীতে সোনার রেখা দেখা যায়, তাই নদীর নাম সুবর্ণরেখা। ঐ দেখুন স্যার, জলে সূর্যের আলো পড়ে নদী কেমন সোনার মতো চক্‌চক্ করছে।

এর মধ্যে বড়োডাঙার গেঁড়ী কিন্তু জল থেকে উঠে গিয়েছে ছলর বলর। হয়তো একসঙ্গে একগাদা ইস্কুলের ছেলে আর মাষ্টারকে দেখেই সে উঠে গিয়েছে লজ্জায়। লজ্জায়, লজ্জায়।

কালীপদকে কী আর দেখেনি গেঁড়ী? হয়তো উঠে গিয়েছে অনুরাগেই রাঙা হয়ে।

আদিত্য বলল, কিন্তু কালীপদ, সব নদীর জলেই তো সূর্যের আলো পড়ে নদীজল সোনার মতো চক্‌চক্ করে। তাবলে সব নদীই কি সুবর্ণরেখা?

বেদম হাসল পূর্ণ। হাসতে হাসতে কালীপদকেই সে বলল, কী যে আনাড়ীর পারা কথা কহু কালী। তুই জানুনি খাঁদারপাড়ার বেহারা-বুড়হা সোনার থালা জলে ভাসাইথিলা বলি ত নদীর নাম হেলা সুবর্ণরেখা? তোর হাঁটুর বয়সী টকামানে জানে আর তুই জানুনি?

বুঝতে না পেরে আদিত্য বলল, পূর্ণ কী বলছে কালীপদ? কীসব জানুনি-মানুনি টকা-ফক্কা?

ফের ছাত্রদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। এখনও 'হাটুয়া' কথা আয়ত্তে আনতে পারেনি আদিত্যস্যার, আর কিছুদিন থাকলে সবকিছু সড়গড় হয়ে গেলে তখন আদিত্যস্যারই উল্টে হাটুয়াছাত্রদের 'হাটুয়া' কথা বলে ব্যঙ্গ করবে। এরকম কত দেখল তারা!

মানেটা বুঝিয়ে দিতে আদিত্যও হাসল। হতে পারে, এরকম কত কিছুই তো হয়েছে। রাজা, জমিদার জলে সোনার থালা কাঁসার থালা ভাসিয়েছে বলেই নদীর নাম রাতারাতি বদলে গিয়েছে। কপিশা-কংসাবতী, হয়তো সূর্পনখা-সুবর্ণরেখা।

আদিত্য নদীবরাবর পুবদিকে চেয়ে দেখল। দুধারে গ্রাম, নদী খাড়াই নেমে গিয়েছে পুবে। পুবে, পুবে। সূর্য উঠলে উঠবে নদীর ঠিক মাঝ বরাবর। আর তখন?

তখন সোনায় সোনা, সোনার গহনায় ঝলমল করে উঠবে নদীজল। বাতাসের সামান্য ধাক্কায়, হিল্লোলে, নদীজল কেঁপে কেঁপে উঠবে। আর তখন?

তখন মনে হবে সোনার মখমল পাতা রয়েছে নদীর ওপর। এপারে আন্ধারী-লককেশরপুর-লাউদহ, ওপারে বড়ডাঙা-থুরিয়া-নরসিংহপুর-কল্‌মাপুখুরিয়া। এধার-ওধার সোনার কার্পেটে মোড়া। সোনা, সোনা।

তখন এ-নদীর নাম অমুক-টেক্-ফাল্‌না-তুস্‌কা হতেই পারে না, তখন এ-নদীর নাম কেবল সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা, সুবর্ণরেখা।

সুবর্ণরেখা অতিক্রম করে গ্রাম-সমীক্ষক দল উঠে গেল বড়োডাঙায়। আর ধীরে ধীরে শুরু হল কালীপদর পেট ব্যাথা। সে "আহা-উহু" করতে লাগল, দু'চারজন বন্ধুবান্ধবের ভিতর কথাটা চাউর করে দিল সে।

আর দশ-বিশ গজের ভিতর গেঁড়ী দঁড়পাটদের বাড়ি, কালীর পেটব্যাথা এখন উঠবে না তো আর কখন উঠবে?

এখন বেলা মাথায় করে গ্রাম-সমীক্ষকদল যাবে এ-গ্রাম সে-গ্রাম, জঙ্গল ফুঁড়ে লোধাপাড়ায়ও ঢুকে যাবে তারা। গেঁড়ী দঁড়পাটের হিমঘন ছায়া-ছাঁয়রা ছেড়ে এই মধ্যাহ্নে খররৌদ্রে ল্যাঙ ল্যাঙ্ করে কোথায় ঘুরবে কালীপদ?

তার চেয়ে এই তো বেশ, পেটব্যথার দোহাই দিয়ে দলছুট হয়ে যদি থেকে যাওয়া যায় বড়োডাঙায়? অসুস্থ মানুষকে দলের সঙ্গী করে নিয়ে যাবার ঝক্কি পোহাবে কে?

তাই, কাজে কাজেই, থাকুক সে বড়োডাঙায়। এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঢুঁড়ে দল ফিরলে ততক্ষণে সুস্থ হয়ে দলের সঙ্গে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেই হল। তার সঙ্গে সেই তার বনিবনার কথা জানাজানি না হলেই ভালো!

বড়োডাঙায় আদিত্য প্রথমেই ধরল বিশোই বুড়িকে। বড়োডাঙা গ্রামের বড় ডাঙা থেকে সে লাঠি হাতে নেমে আসছিল নদীর দিকে।

বুড়ি চোখের ভুরুতে হাতের চেটো রেখে চিনে ফেলার চেষ্টা করে বলল, কে যায়েটে? তারপর উত্তর না পেয়ে বিড় বিড় করে নিজে নিজেই উত্তর দিল, কাই কোউ না।

নদীধারের আকাশে চিল উড়ছিল, গুয়েবনি চটা। ভুচুঙ ভুচুঙ করে বাতাসে ঢেউ ভাঙছিল ঢেপচুপাখি। একটা লালবর্ণ ঝিঞ্জিরি ফড়িঙ উড়াকলের মতো বুড়ির মাথার চারধারে ঘুরছিল-ফিরছিল।

চেনা আবহাওয়া, হয়তো ধারে কাছেই আছে নোনাফলের গাছ। শাঁখারী পুকুরের নাল ফুল। খুঁজে দেখলে হয়তো একটা পিতলের ঘটী কাঁখে ও ডানহাতে একটা কাপড়ের পুঁটলিও পাওয়া যাবে।

. হয়তো একটু আগে ঝগড়া করে সর্বজায়াকে সে বলেও এসেছে, চল্লাম নতুন বৌ, আর যদি কখনো এ বাড়ির মাটি মাড়াই, তবে আমার—

অবিকল ইন্দির ঠাকরুণকে দেখতে পেয়ে আদিত্য ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করল। সাটার টিপতে যাবে আর দেখল ছবি তোলার আকাঙ্খায় হুড়মুড় করে ছেলের দল সামনে এসে ভিড় করেছে। তাদের ভিড়ে বুড়ি প্রায় হারিয়ে গিয়েছে।

আদিত্য বলল, এই সরো, সরো। তোমাদের ছবি পরে হবে, আগে তো 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার পিসি ইন্দির ঠাকরুণের ছবি তুলে নিই।

পথের পাঁচালী? অপু-দুর্গা সর্বজয়া ইন্দির ঠাকরুণ?

ছেলেদের মনে পড়ে গেল বৈকি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অচেনার আনন্দ' গল্পটির কথা।

ঐ যেখানে অপু তার বাবার হাত ধরে বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছে, যেতে যেতে "ঐ দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা" তার বাবা বলায় হুমড়ি খেয়ে অপু রেল লাইন দেখছে। রেলগাড়ি আসতে তখনও দুঘণ্টা দেরি।

রেলগাড়ি দেখা হল না বলে অপু জল-ভরা চোখে বাবার পিছন পিছন চলে যাচ্ছে। তাই দেখে লেখক বলছেন—

ঐ জায়গাটা পরীক্ষায় খুব পড়ে, লাইন 'কোট' করে, ঐ যে ঐ—"তুমি চলিয়া যাইতেছ....তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কি না, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিশোইবুড়ি জানতেও পারল না কখন কোন্ ফাঁকে আদিত্যমাষ্টার তাকে অপু-দুর্গার পিসি মনে করে চিরদিনের জন্য ক্যামেরাবন্দী করে ফেলেছে!

এতক্ষণ যাদের মনে হচ্ছিল ছায়া, ছায়া-ছায়া আপনার মনে বুড়ি যাদের জিজ্ঞাসা করছিল, কে যায়েটে? আবার নিজে নিজেই বিড় বিড় করে উত্তর দিচ্ছিল, কাই কোউ না।

সেই তোদেরই এতক্ষণে মনে হল, ছায়া নয় এরাই তবে। কিন্তু এরা কারা?

হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও তুমি রাজু......"

পূর্ণ পৈড়্যা বুড়িকে প্রায় চ্যাঙ-দোলা করে বলল, ঠাম্মা, ক্লিক্ করি তুমার ফটো খিঁচা হৈ গেলা, আর তুমি কিছ্বে টের পাইলা নি?

টের? না, সে তো পায়নি। আর ফটো? তার ফটো কে-ই বা তুলবে আর কেনই বা তুলবে? ফটোঅলা মুখপোড়া নৈস্যার ফটো তুলতে সখ হয় যদি তো তুলুক সে গেঁড়ী দঁড়পাটের সুলভ-সুবোধ-মম্‌তা বিশোইয়ের। তার মতো ঢড়ঢড়ে বুড়ি-হাবড়ীর ফটো খিচে কী হবে লা?

মনে মনে এত কিছু বললেও বিশোইবুড়ি পূর্ণ পৈড়্যার হাতের বেড়ে কাতুকুতুতে কী ফটো তোলার আনন্দে অস্থির-পঞ্চম হয়ে বলল, ছাড় ছাড় মোরো ঘৈত্যার টকামানে, মোতে ছাড়ি দে। ভারি সুড়সুড়ি লাগেটে বাপ-অ!

সুড়সুড়ি লাগছে? হাসতে হাসতে ছেলের দল বুড়িকে ফের মাটির ওপর খাড়া করে দিলে এগিয়ে এসে আদিত্য ইন্টারভিউ করল, সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ফিল্ম দেখেছেন মাসিমা?

একটু যেন কেমন অন্যরকম শোনাল গলার স্বর, ঈষৎ ভারি? তার ওপর ঠাকুরমা নয়, বলল মাসিমা? চোখ বড় করে বিশোইবুড়ি চিনবার চেষ্টা করল। 'টকামানে'র চেয়ে কিঞ্চিৎ বড়। হাফ-পেন্টুল নয়, পরনে ধুতি-শ্যার্ট।

কিন্তু না, বিশোইবুড়ি চিনতে পারল না।

পূর্ণ পৈড়্যাই এগিয়ে এসে বুড়ির প্রায় কানে কানে বলল, ঠাম্মা, ইনি আমাদের বাংলার স্যার। জিগ্যেস করছেন 'পথের পাঁচালী' সিনেমা কি দেখেছ?

কাই, না।

জিগাস করেটেন 'পথের পাঁচালী' না হউ, আর কুনো সিনেমা কী—অও ধরো 'ববি' 'তিসরি মঞ্জিল' 'আরাধনা' 'ইভ্‌নিং ইন প্যারিস' 'ঝিল কি উস্‌পার'—দেখিছ?

কাই, না।

পূর্ণ পৈড়্যা হেথাহোথা তার দেখা ছবিগুলোরই নাম করল। আর সবাই, এমনকি আদিত্যও, হেসে উঠল হো হো করে।

বেলিয়াবেড়া রাসটাড়ে, রামেশ্বরের মাড়োতলায়, শিবরাত্রিতে সারারাত্রিব্যাপী ভিডিও শো'য়ে শুধু কী পূর্ণ, কালীপদ-শশাঙ্ক-মিহিব-তিমির, কে না দেখেছে হিন্দি-বাংলো নতুন-পুরাতন কত রকম ছবি!

বিশোইবুড়ি কি ঠাকুর-দ্যাবৃতারও বই একটা দেখেনি?—ঠাম্মা, সত্যি করি কুহ ত, অও গা ছুঁয়ি কুহ, তুমার যুবাকালে রগরগে কটা সিনেমা দেখিথিল?

কাই, না।

কী তখন থেকে 'কাই, না' করে চলেছ! ঠাকুর-দ্যাবৃতার বইও, এই ধরো—'বেহুলা-লখিন্দর', 'বাবা তারকনাথ', 'জয় সন্তোষী মা'—এসবও দেখনি?

বুড়ি যেন ফের বলল, কাই, না।

আদিত্য বুঝল বুড়ি আসলে সিনেমা-ফিল্ম-ছবি কী জিনিস কিছুই বুঝেনি, কোনো কিছুই সে দেখেনি। দেখলেও এখন না-দেখাদেখির স্তরে, অর্থাৎ বিস্মরণে। ভুলে-বেভুলে সেসব মেরে দিয়েছে কবেই।

এখন তার কাছে সব প্রশ্নের বুঝি একটাই উত্তর, 'কাই, না'। কই না তো। বড়ই নিরাপদ সুস্থির উত্তর।

এর পরে, পরের পরে, যা কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বুড়ি আবার বলে বসবে না তো, কাই, না?

নাম কি আপনার?

কাই, না।

কত বয়স?

কাই, না।

নাম বয়স, কি কি সিনেমা সে দেখেছে—এসবই কী আদিত্যর গ্রাম-সমীক্ষার বিষয়? কম বয়সী ছেলে-ছোকরার দল বুড়ো-হাবড়ারা কে কী দেখেছে তাই নিয়ে করবেটা কী?

আসলে এখন একরকম মজাই পেয়েছে তারা। তাদের বাংলার স্যার আদিত্যবাবু তার থিসিসের জন্য গ্রাম-সমীক্ষায় বেরিয়ে বুড়ো-হাবড়াদের ধরে ধরে তাদের অতীত নিয়ে যত ঘাঁটাঘাঁটিই করুক, জঙ্গলে ঢুকে শবর-শবরীদের উদ্ভব-বৈভব নিয়ে যত পারে লিখুক 'শবরচরিত', ছাত্রের দল গ্রাম-সমীক্ষায় বেরিয়ে বুড়োবুড়ি ছেড়ে গেঁড়ী-গুগলির খোঁজেই তো ক্রমশ এগিয়ে যাবে।

এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাবে।

পূর্ণ-শশাঙ্ক-কালীপদ-মিহির-তিমিরের দল বিশোইবুঁড়ি আর বাংলার স্যার আদিত্যকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। তার ওপর কালীর পেটটা এবার মোচড় দিয়ে কঁকিয়ে উঠছে।

গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড আর নেই। তার বদলে গ্রামে এসেছে গ্রাম পঞ্চায়েত। অঞ্চল পঞ্চায়েত। তাও তো সে কবে! উনিশ শ আটান্নয়। পুরোপুরি চালু হতে লাগল আরো দশ-বিশ বছর।

এখন তো গ্রামে-ঘরে পঞ্চায়েতেরই রমরমা। গ্রাম-সমীক্ষায় বেরিয়ে আদিত্য কী তার নোটবুকের পাতা এসব প্রশ্নের উত্তরেও ভরিয়ে তুলবে না—ধানকুটা, চিড়া-মুড়ি তৈরি, ধূপকাঠি, গুঁড়োমশলা তৈরির প্রকল্প বাবদ কোন্ পঞ্চায়েত কত টাকা খরচ করল?

আর বিশোইবুড়িই বা তার কতটুকু পেল?

দেউলবাড় রামেশ্বর জীউর মন্দির থেকে ভায়া খান্দারপাড়া হয়ে বড়োডাঙার উদারডাঙা পর্যন্ত পাইলিংসহ মোরামরাস্তা সংস্কার বাবদ ৩নং বড়খাঁকড়ি অঞ্চল পঞ্চায়েত কত টাকা খরচ দেখাল? তার বাবদ কতগুলো শ্রমদিবস খরচ করল?

তার হিসাব নেবে না আদিত্য? ইন্টারভিউ?

কতরকম 'স্কীম'! ই এ এস, জে আর ওয়াই, এম পি ল্যাড্স, গ্রামীণ নারী ও শিশুবিকাশ কর্মসূচী, ইন্দিরা আবাসন, আই আর ডি পি—

সুবর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনার আওতায় কী এবারে পড়েছে বড়োডাঙা? ঐ দেখা যায় বড়োডাঙা, পুবে-পশ্চিমে সুবিস্তৃত, পল্লাদের ডাঙা থেকে উদারডাঙা বরাবর যার দৈর্ঘ্য।

ধারে ধারে বাঘ-নখী গাছের বন, টাঁড়-কলমীর বেড়া। ডহর রাস্তা, উঁচু থেকে নেমে এসেছে নিচে। নদীতে।

নদীতে, নদীতে। মহিষাসুর দঁকের বাঁক ঘুরে জাহাজকানার জঙ্গল পেরিয়ে চিল ঘুরে আসছে সাঁক করে। হাটুয়া বউড়ী-ঝিউড়ীরা দল বেঁধে স্নানে নামছে। তাদের ভিতর কেউ কেউ গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজছে। দাঁতে-আঙুলে আওয়াজ উঠছে কিথ্ কিথ্ করে।

কী করি যে মাজ-অ, বেউলা তুমার মাথা ঘুরে নি?

কাই, না।

বমি বমি ভাব আসেনি?

কাই, না।

ভইন সেদিনকু দেইথিলা এক নাদি, দাঁতো রে ছুঁয়াইনি, নাকোরে গন্ধ নাগি মথা ঘুরি গলা। আউ?

ম'লা, তুমার মথা না আউ কিছে, মুই তো দিনোরে চারবার মাজি। সকালে একবার, বেলাকু অউ গা ধুইবার কালে একবার, সাঁজোকু, রাতোরে—চারবার হেলা নি? না মাজিলে নিঁদ আসেনি দিদি।

আর তোর ঘৈতা ভালো না বাসিলে?

হেসে ঢলে পড়ে বলে, বাসিবে বাসিবে। মুখোরে গুড়াখুর গন্ধ পাইনে নেশা ধরি যাবেনি নৈস্যার!

বেহুলার জরপ শুনে গোটা দলটা হেসে উঠল। তাদের ভিতর একজন আরেকজনকে ঠেলা দিয়ে বলল, হা দেখ-অ! ইস্কুলের টকামানে বিশোইবুড়িকে ধরি কী করেটে!

কী করেঠে লা, কী করেঠে?

বুঝোনি?

যে বলল সে মুখে হাত চাপা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে খানিক দাঁড়িয়ে পড়ল।

আরেকজন বলল, বোধায় ফটো তুলেটে!

হঁ ফটোও তুলেটে আউ—

আউ কী?

করেটে 'ইন্টার ভিউ'।

কী ভিউ কইল?

ভিউ-মিউ, ও তুমি বুঝবানি দিদি। টকামানের সাঙে মাষ্টার আছে দেখছনি?

হ্যাঁ, ছাত্রদের সঙ্গে মাষ্টার আদিত্য তো আছেই, যে 'ইন্টারভিউ-মিউ'র অর্থ বুঝেনি, সে মনে মনে বলল, যেখানে বাছুরের দল সেখানে গাই তো থাকবেই। তাতে কী? তাতে 'ভিউ-মিউ'র কী হল?

শৈল তাকে পুরা অর্থ বলল না, একটু বেশি জানে বলে দেমাকে পা পড়ছে না শৈলর—

মনে মনে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে 'ইন্টারভিউ-মিউ'র অর্থ-না-বোঝা মেয়েমানুষটা নদীর দিকে একটু যেন এগিয়ে গেল দল ছেড়ে।

দলটা ধীরে ধীরে এগোল। শৈল-বেহুলারা অধীর আগ্রহে কান খাড়া রাখল। কান খাড়া রাখল বিশোইবুড়ির দিকে। ইস্কুলের 'টকামানে' আর তাদের মাষ্টারমশাইয়ের দিকে।

মাসিমা, এ গাঁয়ের নাম বড়োডাঙা হল কেন? নদী থেকে খুব উঁচুতে অবস্থিত বলেই কী?

কাই, না।

আগে আগে ঐ নদীর খাত কি এখান দিয়েই বইত? বড়োডাঙার নিচ দিয়ে?

কাই, না।

'কাই না, কাই না' বুড়ি এখনও করে চলেছে। হতাশায় বিরক্তিতে আদিত্যও বিশোইবুড়িকে ছেড়ে একটু যেন এগিয়ে গেল। আর তখনই 'কাই না' 'কাই না' করা বাঁধ যেন আচমকা ভেঙে গেল বুড়ির। তারপর থেকে বিশোইবুড়ি অনর্গল বকে যেতে থাকল—

'বড়োডাঙা' 'বড়োডাঙা' কী কুহুটু রে ছুয়ারা? বড়োডাঙা না, এ-গাঁয়ির নাম বড্ডাঙা। বড্ডাঙা, বড্ডাঙা। যেমন করি বড়ঠাকুর বড়গাছ—

মুই ত এগাঁয়ি আসাইস্তক অউ নাম শুনি আসিটি। আমি তো এ-গাঁয়ে আসার সময় থেকেই এই নাম শুনে আসছি।

হাঁ হাঁ, বড় বড় ডাঙা তো ছিলই। বিশোইবুঢ়হা মোকে বাহা করি নৌকায় বড্ডাঙা আইলা। নৌকা আসি ভিড়লা ঠিক তুমার অউখানে। অউ যে তুমার সাঙে কথা কহিঠি অউখানে। অউ ত লদীধার, অউ ত লদীঘাট।

অউখানে, অউখানে।

তখন বিশোইবুড়ার তাকত কী! মোতে চ্যাঙদোলা করি ডাঙায় তুললা। যেমতি বুকের পাটা, তেমতি তার হাত দুইটা। হাতের হাবড়ে পড়ি মুই আঁকুপাঁকু করিঠি আ! সে বুঢ়হা হি হি করি হাসেটে। অউ মোর ঘৈতা মুখপোড়া।

বুঢ়হা মরলা মরলা, মোকেও মারি গলা। অখন কে আর মোকে দেখেঠে। পেটের ছাওয়াল পর হৈলা, মোরো কপাল পুড়িলা। অখন সম্বল অউ কটি হাঁসবাচ্চা, মুরগীবাচ্চা। কাই গেলু রে? আয় চৈ চৈ! আয় তি তি! .

গ্রামপ্রধান রণজিৎ অধিকারী, বোষ্টমের পোলা, ডাকি কহিলা, বুড়িমা, অউ কটা হাঁসবাচ্চা মুরগীর বাচ্চা পঞ্চাৎ তোমাকে দেয়টে। পালি-পুষি বড় কর-অ। সোইতন সোনার হাঁস ডিম পাড়েটে। কাই গেলু রে? আয় চৈ চৈ। আয় তি তি!

কী কহঠ সিনেমা? দেখিছি বৈকি।

সেই যেবার ইস্কুল-ঘরে ছা-ছানাদের সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা হল, ইস্কুল-ঘরে কী আর, দঁড়পাটদের গোহালঘরে। কী কাণ্ড, কী কাণ্ড! ইস্কুল-ঘরের টিনের চাল তো ফাটাফুটো। দিনের বেলাতেও তারা দেখা যায়। তার ওপর জানলার পাল্লা নেই, একধারের দেয়াল ধ্বসে পড়েছে।

আলোয় আলোময় ইস্কুল-ঘর। এত আলোয় কী আর সিনেমা-বায়োস্কোপ দেখা যায়? ঘর আঁধার হবে, তবে না আঁধার ঘরে গাঁদার গুঁদুর। গা-টেপাটেপি কোমর জড়াজড়ি না হলে কী আর সিনেমা? তো খোঁজ-খোঁজ আঁধারঘর, দিনকে যে করে দেবে রাত। অঝোরঝর রাত।

বড় দঁড়পাট থাইলা ইস্কুলের পিসিডেন্ট না সেগ্রেটারি। কহিলা, হউ হউ ছিনেমা হউ। মুই মোর গোহালঘরটা ছাড়ি দেইটি। পরকাণ্ড ঘর, তুমার ছিনেমা হলেরও দেড়া। আর আন্ধার?

সবই ভালো তবে বাপু ঐ গোময়-গোমূত্রের গন্ধ। খড় পাতা হল, তার ওপর ত্রিপল, গ্রামফাণ্ডের। ছা-পুয়ারা ঝট্ঝট্ বসি গলা। আর আমরা? বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে কাপড়ে কানমাথা ঢেকে সিনেমা দেখলাম।

বিবশ-বেহুঁশ, মাঝে মধ্যে আনন্দী, না-নারী না-পুরুষ, খিলিপান সেজে এনে সিনেমা হলের মতোই ফেরি করছিল। আর বেশিরভাগ সময় পুরুষদের দলে না থেকে মেয়েদের দলে ভিড়ে নি-খরচায় পান-খাওয়ানোর অছিলায় অজুহাতে টিপে দিচ্ছিল খামচে ধরছিল এর-তার বুক। মেয়েরা তেমন গা করছিল না, সিনেমা হলে এরকম একটু-আধটু না হলে চলে?

কী কহ? শুনলা ত মোর জেবন-বেত্তান্ত? ধীবরের মাইয়া, কনে ছিলাম কুন্ঠি আইলাম। কত ঘাটের জল খাইলাম। অখন—

"মন ভাঙলে চপরা, হাঁড়ি ভাঙলে খাপরা।" সেই বলে না? আমার মন ভেঙে চপ্‌রা হয়ে গেছে, শুকনা খটখট্টি। তার উপর, "যে দিল মোর মনে ব্যথা তার সঙে ফের কিসের কথা?"

শুনঠ? কে? কে আমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করল? কে যায়েটে?

বিশোইবুড়ি চারধারে চেয়ে চেয়ে দেখল, কেউ তো না, আজকাল এই হয়েছে এক জ্বালা। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, কে যেন আশ-পাশ দিয়ে যাচ্ছে, কতকিছু জানতে চাইছে। আর সে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে বিড়বিড় করে।

হায় দেখ-অ! কে যায়েটে? কে মোতে পুছ্‌লা, বুড়িমা, সিনেমা দেখিছ্‌ন? কে? শুনঠ?

বুড়ি বিড়বিড় করল, তারপর নিজে নিজেই উত্তর দিল, কাই কো না।

কোথায়, কেউ না।

স্যার, পেটে ব্যথা করছে।

কার হে?

পেটে হাত চেপে ধরে কালীপদ বলল, আমারই স্যার।

এসময় হেসে পূর্ণ ফুটকুড়ি কাটল, তা যা না কালী, খাল আছে নদী আছে—

পেটটা মুচড়ে ধরে কঁকিয়ে উঠল কালীপদ, এ-ব্যথা সে-ব্যথা নয় পুনিয়া।

ও, তা'লে অন্য ব্যথা? ইয়ার্কি মারতে পূর্ণ দৌড়ুল শশাঙ্কের কাছে। একটা মাটির ঢেলা হাতে তুলে কালীপদ মারবার ভঙ্গি করে বলল, মোর পেট ব্যথা ত তোর কী পুনিয়া? মারমু ঢেলা!

ততক্ষণে শশাঙ্ক-পূর্ণ কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে হাতে হাত দিয়ে গাইতে লেগেছে গুনগুন করে, "এ-ব্যাথা কী যে ব্যাথা বুঝে কি আন্‌জনে? আমি যে বুঝেছি হে বুঝেছি মনে মনে—"

মাটির ঢেলাটা পূর্ণ-শশাঙ্কর পায়ের অনতিদূরেই পড়ল। লাফিয়ে উঠে পূর্ণ এবার ছড়া ধরল,

উবুর ডুবুর পানমৌরী
হিচকা নাচন ঘরচৌরী
সারীরে শুয়া,
কাকের পেটে গুয়া
ড্যাংরা কাকে বলে গেছে
—গাছে, না পেটে?

বাকি ছেলেরা হুল্লোড় করে বলে উঠল, পেটে পেটে। আর কেউ কেউ পরিষ্কার করে বলল, কালীপদরই পেটে।

কালীপদ পেটে হাত চেপে ধরে বসে পড়েছে। এখান থেকে সে আর একপা-ও নড়বে না। আর কদ্দুর বা সে যাবে? গেঁড়ী দঁড়পাটের বাড়ি তো ছেড়ে এসেছে কবে! বড়োডাঙা ছেড়ে গেলে আর তো গেঁড়ীর সঙ্গে দেখা হবে না। দোলও ফুরিয়ে যাবে।

অতএব বড়োডাঙা সে ছাড়বে না। হার্‌গিজ না।

আদিত্যমাষ্টার আজানুলম্বিত জামার হাতা গুটিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুঁজে চলেছে এ্যান্টাসিড, পেট দাওয়াই। বারে বারেই উঠে আসছে তার হাত-মুঠোয় 'অ্যাভোমিন', বমি-নিরোধক ওষুধ।

তবে কী নেই? নেই, নেই।

অগত্যা আদিত্য সস্নেহে বলে বসল, বড়োডাঙায় তোমার চেনা-জানা কেউ কি নেই

কালীপদ? থাকে যদি তো সেখানে বিশ্রাম নাও। ফেরার পথে আমরা তোমাকে—

হৈ হৈ করে উঠল ছেলের দল, ছাড়বেন না স্যার, চেনা-জানা আছে মানে—আছেই তো। সেখানে যাওয়ার জন্যই এত ছলছুতো কালিয়ার, পেটব্যথা না হাতি!

পেট-ব্যথার অসহ্য যন্ত্রণায় এবার কাটা ছাগলের মতো লাফিয়ে উঠল কালী। গোঙালো।

আদিত্য স্যার বলল, সঙ্গে কেউ একজন যাক, পৌঁছে দিয়ে আসুক অসুস্থ-কালীকে।

যেতে তো একপায়ে খাড়া অনেকেই, কিন্তু যেতে দিলে তো কালী? ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো সে খেঁকিয়ে আসে, 'ফলো' করতে গেলে পাগলের মতো সে ঢিল তুলে মারতে চায়। পাগল হয়ে গিয়েছে কালী। গেঁড়ী-গুগলিরা তাকে রীতিমত পাগল করে তুলেছে।

গেঁড়ী-গুগলির লোভে কালীপদ বড়োডাঙায় বড় নদীধারেই পড়ে থাকল, তাকে ফেলে গ্রাম-সমীক্ষকের দলটা এগিয়ে গেল। বড়োডাঙার চৌহদ্দি এখনও ছাড়ায়নি।

কালীপদর ভয়—এই বুঝি পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকের দলটা ফিরে এসে তার পিছনে লাগল। চ্যাঙদোলা করে তাকে ফের তুলে নিয়ে চলল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পেট-ব্যথা ভুলে ভয়ে এবার কুদি মেরে দৌড়ুল কালীপদ।

ঐ দেখুন স্যার, কালিয়া পেট-ব্যথা ভুলি কুদি মারি কেমুন দৌড়েটে! ধর্ ধর্ বাঁড়িয়া শিয়াল ভাগেটে বে ভাগেটে!

হাটুয়া-ছুয়ারা হৈ হট্টগোল শুরু করল ইয়ার্কি মারতে, কালীপদকে ভয় দেখাতে। কিন্তু ততক্ষণে আদিত্য আরেকজনকে ধরে ফেলেছে।

নোট নিচ্ছে—

কি নাম?

মড়ে।

মড়ে কি?

মড়ে সিং।

কি কর?

কাই, কিছো না।

পূর্ণ পৈড়্যার দল বলল, কিছু তো কর, না হলে খাও কী করে?

হঁ, খাই ত হাত দি।

আরে না, আমরা তা বলছি না, রোজগারপাতি কী কর?

কাই, কিছো না।

আচ্ছাই মুস্কিল ত! কাজটাজ কিছু কর?

কাই, না।

ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল আদিত্য, কাজে গিয়েছিলে?

কাই, না।

কাজে যাচ্ছ?

কাই, না।

বিরক্ত হয়ে আদিত্য বলল, কী যে এরা 'কাই না' 'কাই না' করে। ওদিক থেকে লোকটা স্পষ্ট এদিকে যাচ্ছে। অথচ কোথা গিয়েছিলে জিজ্ঞাসা করলে বলে, কাই না। কোথাও যাচ্ছ বললেও বলে, কাই না। অদ্ভুত তো!

বাড়ি কুন্‌ঠি? ঘর কোথায়?

অউখানে।

আরে এটা তো একটা মাঠ, রাস্তা। আসল বাড়ি কোথায়?

অউখানেই।

তুমি কি ভূত?

কাই, না।

মানুষ?

কাই, না।

মানুষও না ভূতও না?

কাই, না।

কিছু না?

কিছু না।

'কিছু না, কিছু না'-করা লোকটাকে ছেড়ে গ্রাম-সমীক্ষকের দল আরেকটু এগিয়ে গেল। পাশেই আরেকটা লোক পুকুর থেকে 'টেঁড়া'য় ভরে জল তুলছিল, জল দিচ্ছিল আনাজখেতিতে।

লোকটা এতক্ষণ মড়ে সিংয়ের কিত্তি দেখে দাঁত বের করে হাসছিল।

আদিত্য তাকেই এবার জিজ্ঞাসা করল, নাম?

দুলো।

দুলো কি?

বধুক।

হাসছিলে কেন?

কাই, না। বলবার আগে পর্যন্ত সে হাসছিল।

কাজ করছ?

কাই,না।

শশাঙ্ক বলল, তা'লে কী করঠ'?

কাই, কিছো না।

এই যে টেঁড়ায় ভরে জল দিচ্ছ?

কাই, না। টেঁড়ায় ভরে এখনও সে জল তুলছে।

তোমার পুকুর?

কাই, না।

তোমার খেতি?

কাই, না।

বেগার খাটছ?

কাই, না।

বাপ আছে?

কাই, না।

মা আছে?

কাই, না।

তাহলে তুমি অনাথ?

কাই, না।

গরু আছে?

কাই, না।

ছাগল-ভেড়া?

কাই, না।

হাঁস-মুরগী?

কাই, না।

হাতি?

কাই, না।

ঘোড়া?

কাই, না।

ঘোড়ার ডিম?

কাই, না।

তবে দুলো বধুক এবার হাসল। পূর্ণ পৈড়্যার দল আগেই হেসে সারা হচ্ছিল, এবার সাবা দলটা দুলো বধুকের সঙ্গে মিলে-মিশেই হাসল।

হাসল না কেবল আদিত্য। সে এই 'কাই না-না'র দেশে এসে কেমন ঘোরের ভিতর পড়ে যাচ্ছিল।

ঐ যে আকাশে চিল উড়ছে, আর মাঝে মাঝেই 'চিল-কুড়-র-র-র' বলে ডেকে উঠছে, তাকে ধরে পূর্ণদের ভাষায় 'চিল তুমি কি করঠ?' 'উড়ঠ?' বলে জিজ্ঞাসা করলে চিলও নির্ঘাৎ উত্তব করবে, 'কাই না'। ঐ যে বড়োডাঙার বউড়ী-ঝিউড়ীরা এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, লোকগুলোও এই অলস মধ্যাহ্নে এ-মজলিশ থেকে উঠে ও-মজলিশে যাচ্ছে, দালানের ভিতর থেকে হেঁকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে যায়েটে'র উত্তর আসবে, 'কাই কো না', কেউ যাচ্ছে না। এমনকি ঐ যে নদী, বহে চলেছে পশ্চিম থেকে পুবে, ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে বঙ্গোপসাগরে, তাকেও ধরে জানতে চাইলে, 'নদী তুমি কি বহঠ?' তাব উত্তরেও জবাব আসবে, 'কাই না!' আদিত্য এমন ঘোরের ভিতর পড়ে আছে, তাকে ধরেও কেউ যদি জিজ্ঞাসা কবে, আদিত্য, তুমি কি ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে করছ গ্রামসার্ভে? সঙ্গে সঙ্গে সেও উত্তর করবে, 'কাই না।'

কাই না, কাই না।

কই না, কই না তো। কই কেউ না, কোনোকিছুই না তো। যাচ্ছে তবু যাচ্ছে না, করছে তবু করছে না। আজব বুঝাপড়া, অদ্ভুত মার-প্যাঁচ। কথার, ভাষার।

বড়োডাঙা বড়ডাঙা।

তার ভিতর যেমন থাকে গেঁড়ী-গুগলি, থেকে গেল সার্ভে-টীমেব কালীপদও। বড়োডাঙা সার্ভে সমাপ্ত করে ছাত্রদের নিয়ে গাছতলায় বসল আদিত্য। রোদ চড় চড় করে বাড়ছে। খানিকটা জিরেন দরকার।

গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে আদিত্য হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, এই টকা, তোর নাম কি পূর্ণ?

কাঁচুমাচু মুখ করে পূর্ণও বলল, কাই না।

বড়োডাঙা, নুয়াসাহী, সোলপার আর বাছুরখোয়াড় গ্রামের গ্রাম-সমীক্ষা সেবে এবার জঙ্গলে ঢুকছে আদিত্য।

জঙ্গল, জঙ্গল।

আগেও দু-একবার জঙ্গলে ঢুকেছে আদিত্য। কিন্তু যতবারই জঙ্গলে ঢুকেছে ততবারই সে ঢুকেছে নতুন পথে। নতুন নতুন পথে।

কখনও রামেশ্বর মন্দিরের ওদিক থেকে কিয়াঝরিয়া-বিরিবাড়িয়ার পথ ধরে ডাঙাসাহি-কদমডাঙা ছাড়িয়ে। আর কখনও টটাসাহি-ভালিয়াঘাটি হয়ে মুঢ়াকাটি-রুখনীমারা গ্রামের ভিতর দিয়ে ঠাকুরবাঁধের হিল্-ঝিল্ জল পেরিয়ে।

এবার সে ঢুকছে কুম্‌হারপাড়া-কাম্‌হারপাড়ার এদিক থেকে।

কুম্‌হারপাড়া-কাম্‌হারপাড়া শেষ হলেই গোঠ-টাঁড়, মাঠ। তার একদিকে জঙ্গল আর তিনদিকে গ্রাম, গ্রামের খেতি-খামার। কুম্‌হারপাড়া-কাম্‌হারপাড়া-ভুঁইয়া-ভূমিজ পাড়া। একটু দূরে পশ্চিমে একটা ডুংরি পেরুলেই ডাঙাসাহি, সাঁওতালদের গ্রাম।

মাঝে দু-একটা বাঁশঝাড়, বাঁশতলা, কয়েতবেলের গাছ, কষাফলতলা। মনগাছ, ঝুনঝুনিগাছ, পিট্‌নাসিজ্-মনসাসিজের ঝাড়। নাথবুড়হা-ফাটাদারবুড়হাদের কুর্‌থি খেতি, রাঙাআলু, কদো-গুঁদলির মাঠ।

আর ধুলো। গোঠ-টাঁড়ের মাঠে যা ধুলো!

সকাল সকাল গোঠ-টাঁড়ের মাঠে গরু এসে জড়ো হয়। যাদের গরু সেই গৃহস্থরাই, 'গিরিহা'রাই, মাঠে এনে 'বাইটে' যায়। 'বাট' অর্থাৎ রাস্তা, গোঠ-টাঁড়ের রাস্তা দেখিয়ে দেয় তাদের গাইগরুকে।

একটু বেলা করে বাগাল এসে সে-গরু, গরুর পালকে জঙ্গলে নিয়ে যায়। ফের ওবেলা, বেলা ডুববার মুখে, জঙ্গল থেকে গরু বের করে ফের গোঠ-টাঁড়ের মাঠেই জড়ো করে।

সরু বালি লাল ধুলো উড়িয়ে, ধুলোয় ধুলাক্কার করে গরুগুলো গোঠ-টাঁড়ের মাঠে এসে দাঁড়ায়। ঘরে যাবার জন্য, 'তাড়' থেকে কুঁড়া-জল খাবার অস্থিরতায় গরুগুলো হেঁস ফেঁস করে। হেঁস ফেঁস করে।

তখন সামলানোই দায়। 'পইনা'র বাড়ি মেরে গরুগুলোকে কোনমতে থামায়। গিন্‌তি করে। গিন্‌তি করে, গিন্‌তি করে। রামে-রাম দুই-দুই.....। গিন্‌তি করে আর হাতের আঙুল এনে বুকে ঠেকায়। আর তারপর সবকিছুই ঠিকঠাক থাকলে গরু নিয়ে গ্রামে ঢোকে বাগালারা।

ছাগল বাগাল কান-কুটরী গরু বাগাল রাজা......

'গিরিহা'র গোহালে গরু 'খইড়িয়ে' অতঃপর তো ছুটি। ছুটি, ছুটি। তখন বাগালকে পায় কে? গিরিহার বউয়ের দেওয়া, কী গিরিহার বেটার বউয়ের দেওয়া এক সান্‌কি জল-ঢালা ভাত সেঁটে সে তো হাজির হয়েছে বিপ্‌নার উঠোনে আয়োজিত 'নোলিতা পালা' যাত্রার আখড়ায়!

জড়ো হয়েছে নির্ঘাত মাড়োতলায় 'ফরি খেলায়'। নচেৎ কুম্‌হারদের পোআনশালের আলো-আঁধারিতে। ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছে সুরুয়া কী ছোট সুরুয়ার 'বোস্ন-ওঠা' ধামড়ীকে।

আর নতুবা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে সে ততক্ষণে চম্পা সেজে 'বাঘাম্বর' পালায় রোদন করছে—

হে কান্ত তুমে যিব অনাস্ত করি গো।
আপনা ভারিজা বলি দয়া নাহি তুম্ভরী গো।। হে কান্ত।।
এ যেঁহু কমল পুষ্প দেখিতে কেড়ে সুবেশ।
শিশির পড়িলে পুষ্প ক্ষীণ হয় তা শরীর।। হে কান্ত।।
তুমে সরোবরে জল সরোবরে মু কমল।
কমল কি বঞ্চিথায়ে নদীজল শুকিনে গো।। হে কান্ত।।
তুমে গয়া তুমে কাশী তুমে নাথ মোর বারাণসী।

তুম্ভ বিনে এ রূপসী হেব আজি কাহার গো।। হে কান্ত।।
তুমে মোর প্রাণসখা মতে করি যিব একা।
তুম্ভ বিনে কিএ দশা হেব আজি মোহর গো।। হে কান্ত।।
মু নারী যুবা অবলা কাটি দেল মোর গলা।
কে সহিব কামজ্বালা এড়ে নিষ্ঠুর শরীরে গো।। হে কান্ত।।
কহই কৃপাসাগর ছাড়ি না যাও গো প্রাণেশ্বর।
মতে ন হুয় নিষ্ঠুর কহুচি পাদ ধরি গো। হে কান্ত।।

গোঠ-টাঁড়ের মাঠ এখন খাঁ খাঁ। গরুও নেই, গরু বাগালও নেই। এতক্ষণে সে হয়তো মাঝুডুবকায় কী তপোবনের জঙ্গলে গরু চরাতে চরাতে 'পাট' মুখস্থ করছে 'চম্পা'র। 'বাঘাম্বর' পালায় জয়ানন্দর স্ত্রী চম্পাবতীর।

গোঠ-টাঁড়ের মাঠে গোবর-নাদি কুড়োনোর বুড়ি-বউড়িরা ছুঁড়ি-ছেমড়িরাও আর নেই। বড়জোর একটা-দুটো গুয়ে-শালিক পোকামাকড়ের লোভে শুকনো গোবর ঠুকরে চলেছে।

কোত্থেকে একটা ল্যাজ-কাটা ঢেপচু এসে ভাসতে ভাসতে গুয়ে-বনিটার মাথায় ইয়ার্কি মেরে ঠুকরে দিল। আর "চে-র-র-র বে-র-র-র" করে উঠবে না গুয়ে-শালিকের দল?

তাই দেখে আদিত্যের সহযাত্রী ইস্কুল পড়ুয়ারা ছড়া কাটল, "তিনটে শালিক ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে—"

ছেলেমানুষের মতো আদিত্যও জুড়ে দিল, রান্নাঘরের চাল এখানে কোথায়? বলো 'মাঠের ওপরে'। ভাগ্যিস, আদিত্য জানে না—এ মাঠের নাম 'গোঠটাঁড়'। না হয় আরোই জুড়ে দিত, 'গোঠটাঁড়ের মাঠের ওপরে'।

কী অসাধারণ ছেলেমানুষি! ছেলেখেলা, ছেলেখেলা।

ইস্কুলপড়ুয়ার দল এটাকে ছেলেখেলাই মনে করেছে। আজ তাদের যেন কী হয়েছে! তারা হুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে, হুড়োহুড়ি। এ-তাকে খিমচাচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ এ-তার চুল ধরে টেনে দিচ্ছে। একটু লাফিয়ে একটু এগিয়ে পেছন থেকে কারুর কারুর চোখ টিপে ধরছে দুহাতে কেউ কেউ। চোখ-টেপা অবস্থায় এক পড়ুয়া আরেক পড়ুয়ার হাত হাতের লোম চিনে বলে দিচ্ছে, তুই পুনিয়া.....শশাঙ্কিয়া......ফটকে.....তিম্‌রা......

পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের দল আরোই উল্লসিত হয়ে রাস্তায় যেতে যেতে এ-গাছ সে-গাছ এ-লতা সে-লতার পাতা 'দুহুরে' টেনে-হিঁচড়ে চলেছে।

আশেপাশে ঝোপেঝাড়ে লাটায়-পাটায় ডুবকায়-ডুংরিতে যারা পাতা খুঁজছিল ঝাঁটি টানছিল, দা দিয়ে এ-গাছের সে-গাছের ডগাল কাটছিল, অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আঁতিপাতি খুঁজে হাতমুঠোয় হাতের কাছেই টেনে এনেছিল বুনো ফজপাকুড়ের 'লত্‌', আলকুসি-লালকুসি বাঁচিয়ে ঢুকে পড়েছিল চিরোল চিরোল বুনো শাকপাল্‌হা তুলতে, তারা সবাই চমকে ফিরে তাকাল, এরা আবার কারা?

কার্‌হা লো?

নাই জানি।

যা ন, দ্যাক্‌।

হামার কী দরকার?

যদি হয় নরসিঙা—

তোর যেমন কথা—

তবু ভয়ে ভয়ে সে উঁকি মেরে বলল, যত সব ইস্কুলছুয়া।

অ, বনভুজ্নীতে যাচ্ছে?

হামি কী জানি!

জান ন মার—

হামার কী দরকার?

বলেই সে ফের ডগাল চটাতে হয়ে পড়ল ব্যস্ত। যে যার কাজ গোছাতে। বেলা থাকতে থাকতে। নরসিঙা আসার আগে-ভাগে।

হাঁড়ি-কড়াই কই? হাঁড়ি-কড়াই ছাড়াই বনভুজ্নী?

হয় হয়, আজকাল ওসব লাগে নাকি? দ্যাক্ গে, সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে রান্না-করা খাবার দাবার। জঙ্গলে ঢুকে জায়গা বেছে খেতে বসলেই হল। 'বনভুজ্নী'—বনেই তো খাওয়া।

বনভোজন, বনভোজন।

ভোজনের গল্পে মেতে উঠেছে সেই সকালবেলা চাট্টি খেয়ে আসা, প্রায় দুপুর গড়িয়ে বিকাল, এখনও না-খাওয়া ভুখা-শুখা লোকগুলো। বউড়ি-ঝিউড়ীরা।

কেউ একজন বলল, তা কেন, তপোবনের আশ্রমে গিয়ে থালাবাসন 'উধার' চাইলেই তো হল। সব ব্যবস্থাই করা আছে।

ধুরো, কতদিন উদিকে যাস নাই? সেই তপুবনের আশ্রম কী আর আছে লো? এখন সব ভাঙ-ভুড়রু। শুকনা পাল্হা-পতর নোংরা-জবরায় ভরতি। সাধুবাবাই নাই তার আবার সাধুবাবার আশ্রম! লোধা চোর-চুরনিরাই খুলে নিয়ে গেছে জানলা-কপাট। শাবল-খন্তায় গুঁড়ো করে দিয়েছে নিগমা মন্দির।

লোধা কাটাকাটির বছরই তো—

হঁ, সেই বছরই সাধুবাবা পালাঁইছে।

স্যার, পুনিয়া পলাইটে!

ছাত্রদের ভিতর হঠাৎ রব উঠল। পূর্ণ পালাচ্ছে!

পূর্ণ পালাচ্ছে, পূর্ণ পালাচ্ছে।

পূর্ণ পৈড়্যাও কুদি মেরে দৌড়ে ডুব্কা -ডুংরির উদিকে হারিয়ে গেল। বাকি ছাত্রের দল 'পলাইটে'' "পলাইটে" বলে তার পিছন পিছন দৌড়ুল।

আদিত্যর হঠাৎ মনে এসে গেল দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র'-এর কথা। "ঐ কেষ্ঠা পালায়!" তৎক্ষণাৎ তাহারা সকলে তাহার পশ্চাতে ছুটিল। কৃষ্ণ প্রাণের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। শেষে বাঁশতলা দিয়া, জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, ডোবা ডিঙাইয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেরা তাহাকে বাগান পর্যন্ত তাড়া করিয়া চলিল; কিন্তু বাগানে দুর্গম জঙ্গল, আশশ্যাওড়ার বন, ভাঁটের গাছ। শিয়াকুল ও বুঁচির কাঁটা! তাহার মধ্যে কৃষ্ণ কোথায় গা ঢাকা দিল, কেহ সন্ধান করিতে পারিল না"—

কুড়চি-গাবগুবি-আঁটারি-চুরচু-মেহা-ডকা-ভাদু-বেনা-বৈঁচির জঙ্গলে এদিক-সেদিক খানিক সন্তর্পণে ঘুরে এসে পূর্ণ কিন্তু নিজে নিজেই ধরা দিল বন্ধুদের কাছে।

বলল, একটু মজা করছিল সে তাদের সঙ্গে। না, সে পালায়নি। আদিত্য একটু পিছিয়ে এসে হেসে প্রশ্ন করল, এই টকা, তুমি কি পলাওট?

হেসে পূর্ণও উত্তর করল, কাই না।

ঝাটি-পাল্‌হা শাক-পাল্‌হা খোঁজা ঝিউড়ী-বউড়ীরা তখনও গবেষণা করে চলেছে, না না ওসব না, বনভুজ্‌নী-টুজ্‌নী না, পড়ুয়া-ছুআরা যাচ্ছে জঙ্গলে গাছ-পাল্‌হা চিনতে। সঙ্গে মাষ্টার আছে না, ঐ দ্যাক্‌? ঘুরে ঘুরে কেমন গাছ-পাল্‌হা চেনাচ্ছে।

ঠিক ঠিক, আজকাল গাছ-পাল্‌হা নিয়েও কতরকম পড়াশোনা। এতদিন পাগলঠাকুর এই জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কতরকম পাতা খুঁজত। টাকাগাছের পাতা। যা পেলে, হাত ছোঁয়ালেই নাকি শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে টাকা!

পাগলাটা কি এখনও আছে?

নাই গ' দিদি, সে ত সেই উপ্‌রে, এখনও টাকার গাছ খুঁজছে। আহা রে, মরেও চিনতে পারল নাই?

নাই নাই, চিনা কি অতই সহজ। আমরা কি পারি? এই যে গাবগুবি—

হঁ গাবগুবি—

ছা-ছাওয়ালরা গাবগুবির পাতা দিয়ে যন্তর তৈরি করে গাব্‌গুব্‌ করে বাজায়, ঠিক ছাগলের পঁটা দিয়ে যেমন ডুগডুগি হয়—

হঁ ডুগডুগি।

তো এই ডুগডুগি-গাবগুবি, আমরা তো গাবগুবিই বলি, ইহারও একটা আলাদা নাম আছে।

কি নাম লো?

এগ' হামি কি জানি? নাই গ' দিদি। সেদিন ছতিশের ছোটবিটি—

হঁ ছোটবিটি ত কী?

সেই বলছিল, আসলে সে এসেছিল ধুতুরাগাছের ফুল খুঁজতে। তার ইস্কুলের খাতায় আঠা দিয়ে সাঁটবে বলে।

ধুতুরার ফুল? ধুতুরার বীচি লয় ত?

নাই, নাই।

ধুতুরার বিচি হলে সন্দ হয়—

কি সন্দেহ?

ধুতুরার বীচি বেটে গুড়ে লটপটি করে খা—

হঁ খেলাম।

এবার মরবি। নিশ্চিত মরণ। বিলাইয়ের গু খাওয়া ছাড়া তোর নিস্তার নেই। এক গু খেয়ে যদি হড়হড় করে বমি করিস, তবেই।

মরতেও চাই না দিদি আর বিলাইয়ের গু খেয়ে বাঁচতেও চাই না।

বলেই সে নিজের কাজে মন দিল, আরেকটু হলেই সে কব্জা করে ফেলবে ডালটাকে।

হঠাৎ কী হল, কাঠ কাটা থামিয়ে সে ফের জিজ্ঞাসা করল, কী বল্লে দিদি? বিলাইয়ের গু?

বিড়ালের গু'য়ের নামেই সে বমি করে ফেলল হড় হড় করে।

দলটা আরেকটু এগিয়েছে।

যতই এগুচ্ছে, আদিত্যর মনে হচ্ছে আজকের অভিযানটা বিফলে যাবে না। আগের আগের মতো।

খালি হাতে ফিরতে হবে না, শুধুমাত্র বাঁশের আগড়ের ফাঁক দিয়ে একটা জলের ধারার ছবি নিয়ে! চাই কী দেখা হয়ে যেতেও পারে লোধা মহিলাকবি কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের সঙ্গে।

কবিতায় আঁকা ছবিগুলো সে মেলাতে মেলাতে যাবে। যাচ্ছেও। "জাতিতে ওরা লোধা ছোট্ট ওদের ঘর, তালপাতাতে ছাওয়া কিংবা কিছু খড়। কিছু ঘরের অর্ধেক প্রায় ধ্বসে পড়েছে জলে, এমনি ঘরে বাস করে কিন্তু মানুষ ওদের বলে"—

এখনও আসেনি, এখনও দেখা পায়নি আদিত্য। তবে ঐ যে আশ-পাশে চলনরাস্তার দুধারে ঝোপেঝাড়ে যারা শুকনো ডালপালা টানা-হিঁচড়ান করছিল, এ-গাছ সে-গাছের ডাল-ডগাল কাটছিল, যারা তাদেরকে দেখে আচমকা থামিয়ে দিয়েছিল তাদের হাতের কাজ, পরনের ঢিলে-ঢালা শাড়ি খাটো জামা-কাপড় টানল-টুনল, যতটা পারল বুক ঢাকল, হাতের দা-কাটারি দিয়ে খড়ি-ওঠা গা-পিঠ চুলকালো, তারা কারা?

কারা? কারা?

"ছিন্নবস্ত্র পরিধানে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল"—ছেঁড়া শাড়ি-জামা তো এদেরও, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। এরাও কি লোধা? লোধাশবর?

কেমন যেন গুলিয়ে যায় আদিত্যর। সে উদাস দৃষ্টিতে চারধারে চেয়ে চেয়ে দেখে। কবেকার হলোসিন, প্লাইস্টোসিন অবকল্পের পুরাভূমি। নিয়ান ডার্থাল, এপ্, নরাকার এপ্, ক্রো ম্যাগ-নন্ মানুষদের বাসভূমি! পুলিন্দ, পুল্‌কস, বেণ, শবর, মেদ, ম্লেচ্ছ, কিরাত, অসুর, আভীর কতরকম বন্যমানুষদের চরাচর!

কী ছিল আর কী আছে! সে-জঙ্গল আর কোথায়! এখন সব তো ছন্নছাড়া, ছিন্নভিন্ন। ডুব্‌কা-ডুংরি লাটা-পাটা ঝোপ-ঝাড়। লাটাপাটা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে রাস্তা। খেড়িয়াঝোড়, ভালুকঝোড়, লোধাঝোড়, কাম্‌হারঝোড়, কুম্‌হারঝোড়, আরো কতরকম ঝোড়!

বড় বড় গাছ আর কোথায়! এখন সব তো 'মুঢ়া'। কেঁদ্‌মুঢ়া-আসনমুঢ়া-শালমুঢ়া-পিয়াশালমুঢ়া। কাটাগুঁড়ির চারপাশ থেকে এমনকি কাটাগুঁড়ি থেকেও গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট গাছ, চিরোল চিরোল পাতাওয়ালা লতা।

মাঝে মধ্যে একটা-দুটো শিমুলগাছ কুসুমগাছ হরিতকী বা কষাফলগাছ। আর সবই তো 'প্লানটেশান্'। সোনাঝুরি-আকাশমণি-ইউকেলিপটাস-শাল আর কাজুবাদাম।

কাজুবাদাম, কাজুবাদাম।

কোথাও কোথাও পাট-কে-পাট পড়ে থাকা জোতজমি লাট-কে-লাট। দখিনসোলের করণতলের ধ-তলের। আবাদী পুরাতন ডাহি। বেগুন-বরবটি মকাই-তিল-কদো-কুরথির চাষবাড়ি।

তার মাথায় হঠাৎ হঠাৎ ছিনিয়ে নেওয়া খাসডাহির উপর কাজুবাদামের গাছ। ফরেস্টের। গাড়বাবুদের। নরসিঙাদের। ফুল এসে ফুল ঝরে গিয়েছে কবেই, ডালে-পাতায় এখন আমকুসির মতো ফল। এই পাকল বলে!

মাঝু-ডুবকা। চিকনবালি-সরুবালির বাঁশতলা। তার ভিতর দিয়ে রাস্তা। দুধারে দূরে-অদূরে কাটা গাছের গুঁড়ি—ঐ তো কেঁদ্‌মুঢ়া, আসনমুঢ়া, শালমুঢ়া!

আদিত্য দেখছে—হঠাৎ হঠাৎ একটা-দুটো কালো অলম্ভুসের মতো গুঁড়ি, কেঁদ্‌মুঢ়হা কী আসনমুঢ়হা জেগে উঠে হাত-পা নাড়ছে! এক জায়গা থেকে উঠে গিয়ে আরেক জায়গায় বসছে থুপ করে। দা-কুড়ুল হাতে।

গুঁড়ি নয় গুঁড়ি নয়, কেঁদ্‌মুঢ়হা আসনমুঢ়হাও নয়, ওরা তবে মানুষ?

মানুষ, মানুষ।

কেমন যেন হাত-পা শিরশির করে উঠল আদিত্যর। সে পড়ে গেল ঘোরের ভিতর। এই

যে তবে চোখের সামনে দেখছে—কেন্দুগাছের একেকটা কালো কর্কশ গুঁড়ি, কুর্‌কুট্টে, আগুনে দিলেই কেমন চিড়বিড় করে জ্বলে উঠবে মুহূর্তে, এসব তবে গুঁড়ি নয়? মানুষ?

মানুষ, মানুষ।

কেঁদমুঢ়্হা, আসনমুঢ়্হার পাশে বসে কুডুল দিয়ে কাটা-গুঁড়ির শুক্‌না বাকল ছাড়াচ্ছে লোকগুলো। আর নয়তো খুপ্ খুপ্ করে গুঁড়িটাকেই ফালা করেছে। কাজ শেষ হলে হয়তো এখান থেকে চলে যাবে আরেক জায়গায়। এক গুঁড়ি থেকে আরেক গুঁড়িতে।

সবুজ ডালপালাওয়ালা জীবন্ত গাছ কাটা বারণ, তা বলে যে গাছ কেটে গেছে অন্য লোকে অনেকদিন আগে, এতদিনের রোদে-খরায় যে-কাটাগাছের গুঁড়ি শুকনো ঝুন্‌ঝুনে হয়ে গিয়েছে, সে-গাছের গুঁড়ি ফালা ফালা করে কাটতে এমনকি শাবল মেরে মূলসমেত উপড়ে ফেলতে বাধা কোথায়?

বাধা নেই, বাধা নেই।

তাই আশপাশের গ্রামের লোকেরা, ভালিয়াঘাটি-টটাসাহি-মুঢ়াকাটি-রুখনীমারা ভুঁইয়া-ভূমিজ-কাম্‌হার-কুম্‌হারপাড়ার লোকেরা একেকটা কাটা গাছের গুঁড়ি ঘিরে বসে আছে, যে-যার বেলাবেলি কাজ সারতে ব্যস্ত।

আদিত্যর সাধ্য কি তাদের চিনে ওঠে? আসল-নকল বুঝবে কী করে আদ্দিত্য? তাই বিভ্রমে পড়ে সে ডাকল পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের।—এই যে পূর্ণ! এই যে শশাঙ্ক! গাছ্-মানুষ দেখেছ, গাছ্-মানুষ?

তারাও দেখল একেকটা কাটা-গাছের গুঁড়িকে ঘিরে একেকটা লোক, গাছ্-মানুষ। গুঁড়ির রং আর তাদের গায়ের রং মিলেমিশে একাকার। একাকার।

কিন্তু পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের কাছে এ-আর নতুন কী? এ-তল্লাটেরই ছেলে-ছোকরা তারা। ছেলেবেলা থেকে এই দেখতে দেখতে তারা বড় হল, এখন বাংলার স্যার আদিত্যবাবুর কথায় তারা বড়জোর হাসল। তবে অবাক হল না।

বলল, জ্বালানীর সমস্যা বড় সমস্যা স্যার, তাছাড়া কাঠ নাহলে কুমোরপাড়ার কুমোররা হাঁড়ি পোড়াবে কী করে? হাঁড়ি না পোড়ালে খাবে কী?—পুনিয়া, খুলি বল্ না কী করি কত কষ্ট করি হাঁড়ি পুড়ায় কুঁভাররা।

কুম্‌হারপাড়ার কুম্‌হারদের সমস্যা শুনতে শুনতে দলবল নিয়ে আদিত্য এবার লাল মোরাম দেওয়া সড়কে উঠল। এ-সড়ক চলে গিয়েছে দোরখুলি হয়ে সোজা নারদা-চাঁদাবিলার দিকে। স্থানে স্থানে ভাঙা, কবেকার সড়ক! এই ভাঙা সড়ক ধরেই মাঝে মাঝে ছুটে আসে থানার জীপ, চাঁদাবিলা-পাঁচকাহিনার বীটবাবুদের মোটর গাড়ি।

ডিজেল পেট্রলের ধোঁয়ায় বন তখন ম ম।

ম ম।

"কে কে যাবে কাঠ কুড়াতে, আর কে কে যাবে বন,
ঐ বন যাওয়া মিছা কথা তোদের ভুড়রু খাবার মন,
তোরা যাস না গো বন—
পাতর চিয়ায় বিঁধে দিলে করবে রোদন
তোরা যাস না গো বন—

ছাগল-চরানীরা গান ধরেছে। টাঁড়-টিকরের লাগোয়া বনধারে তারা ছাগল চরাচ্ছে। বেশি ভিতরে তার যায় না পাছে শিয়াল-হুঁড়ারে ধরে ফেলে!

ছাগল চরছে। আর ছাগল চরানীরা জড়ো হয়ে গাছতলে গর্ত খুঁড়ে গুটি খেলছে।....একম দুকম....

এই ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে জঙ্গলে গাছতলে বসে গুটি খেলতে যে কী আরাম! গর্ত থেকে গুটিও কুড়োচ্ছে আর হাতের চেটো উল্টে গুটি ছুঁড়ছে শূন্যে, শূন্যে, চোখের সজাগ দৃষ্টি রেখে শূন্য থেকে নেমে আসা সেই গুটি হাতের চেটো সোজা করে লুফেও নিচ্ছে। আবার ওদিকে মুখস্থের মতো আউড়িয়েও চলেছে, সাবধান বাণী—এ-ড়-রে-এ-এ-এ—

ওলো ও কাব্রী! ও কালী! ও হল্‌বলি! ভিতরে যাস্ নাই লো!—এ-ড্-রে-এ-এ-এ-এ— কালী-কাব্‌রী-হল্‌বলি মাঝে মাঝে চরন্তি মুখ তুলে সাড়াও দিচ্ছে, মে-এ-এ-এ—

সাড়া-শব্দে নিশ্চিন্ত ছাগল চরানীরা অতঃপর গল্পে-মউজে মেতে ওঠে। কী আর গল্প, ছাতার মাথা। সেই তো ঘুরে-ফিরে এক কথা। এই তো মাঘে না ফাল্গুনে বিয়ে হল যে মেয়েটার, সে তো পৌষমাসেও তাদের সঙ্গে এই বনেই ছাগল চরাত, যেই বিয়ের ফুটল ফুল অম্নি সে—

অম্নি সে কী লো?

ঘৈতার গলা ধরি ঝুলি পড়লা।

হাটুয়াদের 'চুড়িয়া' নাচের নর্তকীর মতো এক পাক নেচে নিয়ে সে গাইলো, "আ লো ঘৈতা লো ঘৈতা—"

হাসি, হৈ হল্লা।

গল্পে বেশি বেশি করে এল তার বরের কথা, বেশি বেশি করে আলোচিত হল তার খুঁতের কথা। একজন বলল, লোকটা একটু ট্যারা। আরেকজন বলল, ট্যারা নয় ঠিক, তবে কেমন করে যেন তাকায়। একজন বলল, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেও। আরেকজন তীব্র প্রতিবাদ করল সে-কথার, মোটেও না, হাঁটার ধরনটাই তার ঐ রকম—

তবে তোরা যাই বলিস, বলতে বলতে সাজোবালা নামের মেয়েটি উঠে পরনের কাপড় ঝাড়ল, ঝেড়ে ঝুড়ে আবার পরল, তারপর নাক পাটায় নাকছাবি নেই তবু শুধু শুধু আঙুল মোচড়াল, মোচড়াতে মোচড়াতেই বলল, ও কিন্তু আমাকে নিজ্ মুখে কানে কানে বলেছে—

বলেই কথা অসমাপ্ত রেখে দৌড়ুনোর ভঙ্গি করল, দৌড়ুল—

ওলো, কী বলেছে লো? ওলো—

বলতে বলতে বাকিরাও খেলা ফেলে তার পিছন পিছন দৌড়ুল। দৌড়াদৌড়ি, হুটোপুটি, উস্তন-খুস্তন।

এ-বুদা সে-বুদা এ-লাটা সে-লাটা এ-ডুংরি সে-ডুংরি এ-ডুব্‌কা সে ডুব্‌কা অনেকটা ছুটিয়ে অনেক কিছু গুপ্তকথা বলে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ফের গাছতলায় ফিরে এসে সে বলল, তবে ওসব কাজে ওর ভাইটি কিন্তু আরো ভালো।

কী করে জানলি?

তাই তো, ঠিকই তো—সে কী করে জানল?

ভেবেচিন্তে চট্‌জলদি সে উত্তর করল, ও সব জানতে হয় না, লোক দেখলেই চিনতে পারি। অমুকের বরের ভাইয়ের জন্য তার যেন এখনই 'লালঝোল' গড়িয়ে পড়ল।

আর এসময়ই এল আদিত্যরা।

হ্যাঁ লো, ওরা আবার কারা? কুথাকে যাচ্ছে?

কোথায় আবার—তপুবন দেখতে।

হুঁ, তপুবন দেখবে, তাড়কা রাক্ষসীর হাড়-সীতাধুনি-হনুমান চৌকি—তোরা যাস না গো বন—পাতর চিয়ায় বিঁধে দিলে করবে রোদন—পাতর চিয়ায় না বিঁধুক যদি বিঁধে লোধায়?

হুঁ, লোধায়?

লোধায়, লোধায়।

আদিত্যদের সে-খেয়াল নেই। তারা তো চলেছে অভিযানে, অকুতোভয়। গ্রাম-সমীক্ষায়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। জঙ্গলের ভিতরেও তো গ্রাম আছে—সুখজুড়ি, দোরখুলি, রুখনীমারা, নারদা—

এ-তল্লাটের ম্যাপ, জে. এল. নং ৩৮-এর নক্সা তো তাদের হাতেই আছে। তদুপরি কুম্হারপাড়ার 'সরকার' শশিভুষণ নক্সা খুলে তাদের হাতে-নাতে দেখিয়ে দিয়েছে—উটবন্দী খাসের পরিমাণ, বন কেটে সীতানালা খালের উপর পরিকল্পিত বাঁধের নির্মাণ—

এখনও সীতানালা খালই এল না, তো কথা কী! বড়জোর এসেছে ঠাকুরবাঁধ, মাঝু-ডুব্‌কার জঙ্গল, সরুবালি-চিকনবালির বাঁশতলা।

আদিত্য, যার জামার হাতা হাত ছাড়িয়েও লুটোচ্ছে, মাঝে মাঝে সে হাতা গুটিয়ে নিলেও অত্যধিক হাত নাড়ানাড়িতে আবার হাতা নেমে যাচ্ছে, যে-কে-সেই, সে আউড়ে চলেছে, "এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবনগিরি। এই গিরির শিখর দেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়....."

কোথায় পড়েছ পূর্ণ? বলো তো শশাঙ্ক?

পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের দল পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে। তাই তো, ঠিকই তো, কোথায় যেন পড়েছে! খুবই চেনা লাইন। আহা পেটে আসছে তো মুখ আসছে না।

আদিত্যই বলে দিল, আসল যে-বইয়ের লাইন, সে-বই তোমরা পড়নি। পড়েছ ইংরেজী ট্রানশ্লেশান করতে গিয়ে।

ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল, হ্যাঁ, তাই তো। হ্যাঁ, তাইতো। পি-কে-দে সরকার, পি-কে-দে সরকার। —আবে এটা তো একটা প্যারাগ্রাফ অনুচ্ছেদ। করুনি? সোউ যেখানে আছে—"একদা রাত্রিতে মহম্মদ মহসিন ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার ঘরে চোর আসিল। মহসিনের ঘুম ভাঙিয়া গেল"—

আরেকজন বলল, হুঁ আরো আছে—"হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।"—

কম্‌পিটিশান দিয়ে আরো একজন মুখস্থ বলল, করিনি মানে? কত করেছি, আমার তো ঐটা মুখস্থ, ঐ যে—"সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কি চাও?"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, মুক্তি চাই, আকাশ চাই।"

পূর্ণ পৈড়্যা এসে তাকে চিমটি কেটে বলল, চাপি যা, অক্ষুনি ইংরাজি করতে কইব আদিত্য স্যার!

চাপল মানে? একেবারেই চেপে গেল সে। নাহলে পরের লাইনটা তো তার মুখের ডগায় এসে গিয়েছিল, সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

উষ্ণ প্রস্রবণ, আদিত্য শুনেছে এই জঙ্গলেও লবটুলিয়ার জঙ্গলের সরস্বতী কুণ্ডীর মতো খানকতক কুণ্ডী আছে, পাতালফোঁড়। এরকম একটি পাতালফোঁড় থেকেই তো সীতানালার জন্ম। আর সীতানালা খালই তো ঘিরে ধরে আছে তপোবন আশ্রমকে। লব-কুশের জন্মস্থলকে।

সীতানালা, সীতানালা।

এ-নালার জল শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে হিমশীতল। জননী সীতার হলুদমাখা দেহের অবগাহনের ফলে এ-নালার জল হয়ে আছে হলুদ। হলুদ, হলুদ।

যেখানে জড়াজড়ি করে কয়েকটা গাছ, অর্জুন-বহেড়া, চিহড়লতা আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে, তদুপরি দুধিয়ালতা, নিম্নে আঁটারি-চুরচুর লাটা-পাটা, জায়গাটা আঁধার-আঁধার, গুঁড়ুর ডাকছে, সিমফুচি-কয়ের, পাঁড়কা কপ্‌তি, ঝুরঝুর করে মাটি ঝরছে, তার মানে আংকুড়া-রে - বাংকুড়া, সর্ সর্ করে হেঁটে চলেছে বুকে ভর দিয়ে ঢ্যামনা কী শিয়র-চাঁদা, ধুদকুল-দুধিগদ-স্বর্পগন্ধা-কুড়চি-সেঁয়াকুল গাছের বন্য সমারোহ—

এরকম স্থান দেখলেই আদিত্যর মনে হচ্ছে, এই বুঝি সেই, সেই লবটুলিয়ার উত্তরপ্রান্তের সরস্বতী কুণ্ডী। চুপ! এখনই ডেকে উঠবে হরট্রিট, বনটিয়া, ফেজান্ট-ক্রো, সিল্লী, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল।

বউড়ী-ঝিউড়ীরা ঝুড়িকাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে একের পর এক বেরুচ্ছে জঙ্গল থেকে। তাদের বড়ো অদ্ভুত লাগছে। ঝুড়িকাঠের বোঝা সামনের দিকে প্রায় চারহাত, পিছনের দিকেও চারহাত। অতি লম্বায় ধনুকের মতো বেঁকে আছে। মুখ দেখা যায় না, চোখ দেখা যায় না। তারাই বা রাস্তা দেখছে কী করে?

দুল্‌কি চালে, একসঙ্গে একই ছন্দে, হেঁটে চলেছে। আদিত্যর মনে হল পিছন থেকে কেউ বুঝি এখনই বলে উঠবে, বি-শ্রা-ম। আর অমনি একসঙ্গে অতগুলো কদমতোলা পা থেমে যাবে।

থেমে যাবে, থেমে যাবে।

থামলও। আচমকা এলোমেলো হয়ে গেল তাদের চলা, এর বোঝার সঙ্গে তার বোঝার মাথা ঠোকাঠুকি লাগল। দু'দণ্ড থমকে দাঁড়ালো তারা। তারপর আবার ফিরে গেল ছন্দে। সামনে বাঁ-পা ফেলে, পিছনে ডান-পা তুলে, সামান্য ধুলো উড়িয়ে বউড়ী-ঝিউড়ীরা হাঁটতে লাগল।

হাঁটছে, হয়তো একসঙ্গে জামাকাপড়ের এতগুলো লোক দেখে খানিক ভড়কে গিয়েছিল। তবে খাকী তো নয়, সাফা। ফের সামলে নিল। সাফা জামাকাপড় দেখে অতঃপর নিশ্চিন্তে হাঁটতে লাগল।

'ঠরকা' বানাবে বলে তখন থেকে কুড়চিগাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে বাগালটা। একটু মোটাসোটা গাছ হলেই ভালো। বেশ বড়োসড়ো একটা 'ঠর্‌কা' বানাবে সে। চুর্‌নী গরুর গলায় বাঁধতে।

পাল্‌হা-পতর খেতে কত ভিতরেই তো ঢুকে যায় গরুগুলো। আবার মন পড়লে, বেলা ডুবে এলে, ফিরেও আসে। একটা-দুটো যা চুর্‌নী গরু, এত চরেও যাদের পেট ভরে না, তারা ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে থাকে লাটা-পাটার আড়ালে, এ-লতে সে-লতে মুখ দিতে দিতে।

সেই চোর-চুর্‌নী গরুদের জন্য 'ঠর্‌কা' চায় গলায় বাঁধতে। মুখ নিচু করে হামলে পড়ে যতই সে ঘাস-পাল্‌হা খাক, গলার 'ঠর্‌কা' অনবরত বাজতে থাকবে ঠ-র-ক ঠ-র-ক। ঠ-র-ক ঠ-র-ক!

সে-ঠরকার আওয়াজে চোর-চুরনী গরুটার 'চিহ্নত' পেয়ে যাবে বাগাল ছুআ। এখন হন্যে হয়ে ঠরকার কাঠ খুঁজে বেড়াচ্ছে ছেলেটা। ডকা, ভাদু হলেও কাজ চলে যায়। তবে ডকা-ভাদুর চেয়ে কুড়চিই সেরা। কুড়চি, কুড়চি।

কুড়চিকাঠ হাল্‌কাও বটে। 'ঠরকা' হিসাবে জুতসইও হবে। তবে কুড়চিকাঠের সন্ধানে কোথায় না গিয়েছে মঙলা! এধার ওধার সীতানালা খাল পেরিয়েছে কম করেও সাতবার! গোটা তপোবন হাল্লাট করে ছেড়েছে সে। সব তো কচি কচি, এই সেদিনকার চারা! মোটামোটা গুঁড়ি ওসব তো পগার পার করে দিয়েছে ঐ লোধারা। ঐ লোধারাই—

একটা অপুরুষ্ট গুঁড়ি পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে এনে মঙলা শুনল, কথা হচ্ছে দ্রৌপদীকে নিয়ে। গরু বাগালদের মাথা ঘুরে যাচ্ছে—একটা-আধটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা স্বামীকে সামলাতো কী করে দ্রৌপদী? তার উপর ভীম-অর্জুনের মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্বামী!

মঙলা এসে বলল, দ্রৌপদীর তো পাঁচটা, মোট্টে পাঁচটা, মোর দাদা কইথিলা কোথাকার কুন্‌ রানীর সোয়ামীর সংখ্যা চার শ।

চার শ?

হঁ, চা-র-শ।

তুই একটা পাগল। এক রাতকু চা-র-শ জন!

আচ্ছা ক'—কুন দেশে পাগল বেশি?

কেনে, অউ দেশে, তার মধ্যে মঙলা একটি।

মঙলা রেগে গেল, বলল, কচ্চু। পাগলের সংখ্যা সব চাইতে বেশি ব্রহ্মদেশে।

কে জানে ব্রহ্মদেশ কোথায়? গরু বাগালরা জানে না। তবে হাট-বাজার থেকে দু'টাকা-পাঁচটাকার বিনিময়ে কিনে আনা বই থেকেই দাদা-কাকাদের মারফৎ এসব শোনা। শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলছে কেউ কেউ।

নিদাঘে, রৌদ্রতপ্ত দিনে, গাছতলায় কী গাছের উপরে নিতান্ত গরু বাগালরা যখন 'আজব খবরের' আখড়া বসিয়ে ফেলে, তর্কে-বিতর্কে উত্তাল হয়ে ওঠে বনাঞ্চল, গরুগুলোও ঘাস-পাল্‌হা খেতে খেতে সহসা চমকে উঠে মুখ তুলে তাকায়, গলা দিয়ে আওয়াজ বের করে "অঁ-অঁ-অঁ-অঁ", তখন কে বলবে এরা নিতান্তই গরু বাগাল গো-মুখ্যু?

কুন্‌ দেশে কাক নাই।

লাক্ষাদ্বীপে।

কোন্‌ দেশে রাতকু রামধনু দেখা যায়?

হাওয়াইদ্বীপে।

লাক্ষাদ্বীপ, হাওয়াইদ্বীপ কোথায়? জিজ্ঞাসা করলে গরু বাগালরা হয়তো উত্তর করবে ঝাঁড়গা কি খড়গপুরের কাছে। আর ঝাঁড়গা-খড়গপুর?—সে তো এই কুস্তড়িয়া-হাতিবান্ধীর সেপাশে।

পৃথিবীর কোথায় তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের ভিতর তিনশ ষাট দিনই বর্ষাকাল, মাত্র পাঁচদিন শুকা-শুকনা। কোথায় একটি গাছে তেইশ রকমের ফল ধরে? আমগাছে কি আমড়া ফলে? ফলে, ফলে। বাঙলাদেশে কাঁঠালগাছেও খেজুরের রস হয়।

এসব বৃত্তান্ত গরু বাগালদের জানা। শুনে শুনেই মুখস্থ।

আচ্ছা, ক'ত—কুন পাখি কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে?

নাই জানি, তবে জানি আমাদের দেশের শকুনের বাচ্চাও মানুষের বাচ্চার মতন অবিকল কাঁদে।

বনে-জঙ্গলে এত তো ঘুরে বেড়াও, দেখেছ কী—কোন্ গাছের ফল আলো দেয়?

আলো?

হঁ, হঁ, আলো।

জানা বৈকি, ব্যাঙ-গাছ পনেরো মিনিট করে আলো দেয়।

কোন দেশের লোকেরা ঘরে ঘরে গোখরো সাপ পোষে?

মহারাষ্ট্রের শ্বেতপাল গ্রামে।

আর নতুন কথা কি, আমাদেরও তো ভিটায় বাস্তু সাপ থাকে। থাকে না?

কোন্ দেশের লোকেরা শুধু মাটি খায়, অন্য কোনো খাবার খায় না?

খায় না, না পায় না?

কোন্ দেশের মানুষ শুধু শিস্ দিয়েই কথা বলে?

গাছতলে, গাছের উপরে মুহূর্তে শিসের বন্যা ছুটল। দু-আঙুলে শিস দিয়ে, সিটি মেরে কতভাবে কী কী বলা যায়—তার মহড়া চলল।

আগে আগে মানুষ তো আকারে-ইঙ্গিতেই কথা বলত, গরুবাগালদের দু-একজন তো থ্রী-ফোর অব্দি পড়েছে, তারা তো মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার নাম শুনেছে। তারা কী আর জানে না সেকালে মানুষ পাথরে গুহার দেয়ালে ছবি এঁকে এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত? কথা বলত?

তা বলে এ যুগে? শিস্ দিয়ে?

হতে পারে, হতে পারে। এই আজব দুনিয়ায় কত কী হতে পারে। গরুবাগালরা শিস্ মেরে মেরে বড়জোর একটা-দুটা কথা বুঝতে পারল, বাকী কথা তো প্রথমে শিস্ মেরে মনোযোগ আকর্ষণ করে বোবাদের মতো আঙুল নেড়ে নেড়েই বলল।

না না, তা হবে না। শিস্ মারল, অম্নি খাঁচার পাখি গুড়-ড়-ড়-ড় করে ডাকতে শুরু করল, ঐ আর কি।

শিস্ দিতে দিতে একসময় তারা থেমেই গেল। তারপর যা গরম, উঠল বৃষ্টির কথা। টাঁড়-টিকর সব জ্বলে গিয়েছে, আর ঘাস নেই, তাই টাঁড়-টিকর ছেড়ে তারা গরু নিয়ে ঢুকেছে জঙ্গলে।

জঙ্গলে গাছতলে লাটায়-পাটায় গরুগুলোও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে আর তারাও একটু ঠাণ্ডা হয়।

যা গুমোট, এক-দু দিনের মধ্যে না বৃষ্টি হয়! হলে তো কালবৈশাখী, জল কম ঝড়ই বেশি।

উঠল বৃষ্টির কথা, উঠল রকমারি বৃষ্টির কথা। কে কত রকম বৃষ্টি দেখেছে, কে কত রকম বৃষ্টির কথা শুনেছে। তা বলে বছরে তিন শ পঁয়ষট্টি দিনের ভিতর তিন শ ষাট দিনই বৃষ্টি? মাত্র চার-পাঁচদিন রোদ? লোকগুলো চাষবাস করে কী করে? এত বৃষ্টির জল সে-দেশের নদীনালাই বা ধরে কী করে?

একজন বলল, সে যখন ছোট তখন চন্দন-বৃষ্টি হতে দেখেছে সে নিজের চোখে। ঝম্ ঝম্ করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল আর চারদিক থেকে মানুষজন চিৎকার করে উঠল, চন্দন! চন্দন!

গাছের পাতা ঘর-উঠোন খলা-খামার সব, সব জায়গা ভর্তি হয়ে গেল চন্দনের মতো ছিট্ ছিট্ দাগে। মানুষজন ঘর থেকে বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করল—মেঘপাতাল ফুটো করে কোত্থেকে চন্দন ঝরে পড়ছে, দেখি দেখি!

যেই চোখ তুলে দেখা, অমনি চন্দন ঝরে পড়ল চোখে-মুখে গায়ে-মাথায়।

কেউ কেউ তাকেই সমর্থন করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারাও দেখেছে বৈ কি। তবে একবার নয় দু'দুবার। লোকে বলাবলি করছিল, চন্দন নয় চন্দন নয়, জল-কাদার বৃষ্টি।

বললেই হল? স্বর্গে মেঘপাতালে জল-কাদা থাকে, না চন্দন থাকে? চন্দন, চন্দনই তো থাকার কথা।

মেঘপাতাল থেকে জলের সঙ্গে 'হলহলিয়া' সাপ পড়তে কেউ দেখেছ? আমি দেখেছি, এই আমি—

হুড়মুড় করে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বাকিরা গাছতলা মাত্ করে দিল, আমরাও দেখেছি, কতবার দেখেছি।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে 'গুড়ুপুটলুর' করে একেকটা মণ্ড পড়ছে থপ্ থপ্ করে। ঐ একটা মণ্ড পড়ল 'খলার' মাঝখানে, ঐ আরেকটা পড়ল গোবরগাদায়, একটা মণ্ড পড়ে ঐ ঐ তো বাঁশঝাড়ে আটকে গেল, ঘরের চালে একটা কেন দশটা মণ্ড গড়াগড়ি খাচ্ছে একসঙ্গে—

লম্বায় এক-দেড় হাত, ছোট ছোট মাথা, 'গুড়ুপুটলুর' খুলে একেকটা বেরুচ্ছে হল্ হল্ করে। কিল্ বিল্ করে চারধারে ছড়িয়ে পড়ছে।

খলায়-খামারে পড়েছিল যে মণ্ডটা, তার থেকে হল্ হল্ করে বেরুতে না বেরুতেই ঘরের বারান্দায় ছাঁচতলে বৃষ্টির ছাট থেকে গা বাঁচাতে দাঁড়িয়ে থাকা ডিম দেওয়া মুরগীটা দৌড়ে গিয়ে খপ্ করে একটা 'হলহলিয়া' সাপের মাথা ঠুক্রে ধরল।

ঠোঁটে করে নিয়েই আসছিল ঘরের ভিতর, ঘরের লোকজন ঘেন্নায় হৈ হৈ করে তাড়িয়ে দিল। বাঁশঝাড়ে পড়েছিল যে মণ্ডটা তার থেকে সাপগুলো বেরিয়ে বাঁশডগায় লটকে ঝুলে থাকল। ঝুলে থাকল, ঝুলে থাকল, ঝুলে থাকল।

ঐদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘরের লোকজন বলাবলি করছিল, ঐ-ঐ একটা পড়ল 'লদ্' করে, ঐ-ঐ আরেকটা—

বললে বিশ্বাস করবে নাই ঐ "লদ্ করে পড়ছে" কথাটা এখনও আমার কানে বাজছে।

মোর দাদা কইথিলা—

কী কইথিলা বে মণ্ডলা?

মোর দাদা কইথিলা, কুন দেশে—কুন দেশে কী লন্ডনে—একবার নাকি ব্যাঙ-বৃষ্টি হইথিলা। ভাবো চারুধারে থুপ্ থুপ্ করি ব্যাঙ ঘুরি বুলেটে—

শুধু ব্যাঙ ক্যানে গেঁড়ি-গুগুলিও তো হইতে পারে?

আর মাছ?

সাপ-ব্যাঙ-মাছ-গেঁড়ি-গুগলি ছেড়ে লাল-নীল-কালো কত রকম বৃষ্টির গল্প হতে থাকল। নানা রঙের বৃষ্টির গল্পের ভিতর কেউ কেউ কী আর ভেবে রাখল না—হোক বৃষ্টি, তবে এবারটা হোক টাকা-বৃষ্টি, মেঘপাতাল থেকে ঝন্ ঝন্ করে টাকা পড়ুক, টাকা টাকা!

আর এসময়ই তাদের চোখে পড়ল—কারা যেন একদঙ্গল জঙ্গলের আরো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। ওরা কারা? কারা?

মনে তো হয় ইস্কুল ছুআরা।

কিন্তু যাচ্ছে কোথায়?

কোথায় আবার, আশ্রম-টাশ্রম দেখতে, দেখার জিনিস আছে তো ঐ একটাই।

যদি ঘিরে লোধারা?

আর কি, বাবুদের দফা-রফা। তপোবন. বাল্মীকমুনির আশ্রম, সীতাধুনি, হনুমান-চৌকি অদেখা পড়ে থাকবে, কাঁধে ঝুলানো ফটো খিচার যন্তর তো যন্তর, জাঙ্গিয়া-আন্ডার প্যান্টটুকুও বাদ দিবে না লোধারা।

তবে যাও না ক্যানে বলে আসো।

আমার কী? ঐ বলে নাই "তোর লা তুই লে, খাল পারাইছে গোপাল দে"?

আড়বেলার রোদ ঝলমল করছে মাঝু-ডুব্‌কার মাথায়, সুখজুড়ির মাথায়, সুখজুড়ির জঙ্গলে, ঘোড়াটাপুর জঙ্গলে, সমগ্র তপোবন জঙ্গলমহালে। শাল-পিয়াশাল-ধ-আসন-বহেড়া-করঞ্জ-কুসুম-কইমের ঝাঁকড়া ডাল-পাল্‌হা পাতা-পতরের ফাঁক দিয়ে আলো চুঁইয়ে পড়ছে নিচে, আরো নিচে, গাছতলে লাটাপাটায় ঘাস-ভুঁইয়ে টাঁড়-টিকরে। চারধারে জাফরি-কাটা রোদ ছল্‌বল্‌ করে বেড়াচ্ছে। তার ভিতর দিয়ে তার ভিতর দিয়ে হাঁটা—আদিত্য-পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের দল আবিষ্কারের অচেনা আনন্দে মত্ত হয়ে হেঁটে চলেছে, হেঁটে চলেছে। পিছনে ছবির মতো পড়ে আছে আঁটারি-চুরচু পলাশ-কুড়চির ঝোপে-ঝাড়ে দা-কাটারি হাতে কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-ঝিউড়ী-বউড়ীরা, গুটি খেলায় আর সদ্য বিবাহিতা বন্ধুর গুপ্ত যৌন কথার একান্ত আলাপচারিতায় মশগুল হয়ে আছে কানকুটরী ছাগল-বাগালীরা, কেঁদমুঢ়হা-আসনমুঢ়হা-শালমুঢ়হা-পিয়াশালমুঢ়হার সঙ্গে আঠা দিয়ে আজ কে যেন সেঁটে রেখেছে ধনু-কাঁদ্‌রা-মহেন-ডিব্‌রা-লেড়া-বাণ্ড্বা-বড়কইদের, গরুবাগালরা আজ তাদের গল্পের গরুকে গাছে চড়িয়ে কাঁহা কাঁহা মুলুকে—যেখানে পাগল বেশি, এক রানীর চার শ স্বামী, কাক নেই যে দেশে, রাতেও রামধনু দেখা যায়, কাঁঠাল গাছে খেজুর, ফলেও আলো দেয়, যেখানে বৃষ্টির সঙ্গে অবলীলায় ঝরে পড়ে সাপ-ব্যাঙ-শামুক-মাছ-গেঁড়ি-গুগলি,—সেই সেই মুলুকে এমনকি এই জঙ্গলে চরণরত নিজেদের গরুগুলোকেও পাঠিয়ে দিতে ব্যস্ত, ভারি ব্যস্ত, মনে হয় সব কিছুই সাজানো-গোছানো টিপ্‌-টপ্‌, আদিত্য আজ শবর-চরিত উন্মোচন অভিযানে জঙ্গলে আসবে বলেই সকলে সবকিছুই যেন প্রস্তুত প্রস্তুত—

আদিত্যও কী আর মনে মনে একাধিকবার আউড়ে নিচ্ছে না সেই কবিতাটা? সেই যে সেই—

"উলঙ্গ প্রায় ছেলেগুলো সব ঘাঁটে বসে ধুলো,
বাগালী করে ওরা ওদের ছোট ভাইবোনগুলো।
লিখাপড়ার ধার ধারে না কেউ জানে না ইহা,
কেবল জানে পেট ভরাতে ছেলে বন্ধক দিয়া।"

দোরখুলির লোধাবস্তি তো এসে গেল! মাঝু-ডুব্‌কা পেরিয়ে ঠাকুরবাঁধ বাঁয়ে রেখে আর সামান্য এগুলেই তো দোরখুলির লোধাবস্তি। পাই-টু-পাই মিলিয়ে নেবে আদিত্য, "তালপাতাতে ছাওয়া কিংবা কিছু খড়, কিছু ঘরের অর্ধেক প্রায় ধ্বসে পড়েছে জলে—"

এই সেদিনও ছিল ঘরের চালে বাহারে টিনগুলো, সকালের রোদ লেগে ঝিলিক মারত। এখন আর নেই। নেই, নেই।

আগেও এসেছে আদিত্য, লোকজন সঙ্গে নিয়ে। 'ঢ্যাপচু' 'ট্যাঁসা' কত রকম পাখির নাম শুনেছিল সেবার। চারধারে কাটা গাছের গুঁড়ি, গুঁড়ির চারধার ঘিরে গজিয়ে-ওঠা সবুজ ঘন সবুজ ছোট্ট ছোট ডুংরি—সেবারও দেখেছিল সে।

কিন্তু এবার যেন সবকিছুই অন্যরকম। অন্যরকম, অন্যরকম। তার উপর এবারে সে মুখস্থ করে এসেছে লোধাকবি কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের কবিতা "জাতিতে ওরা লোধা ছোট্ট ওদের ঘর—"

সব কিছুই তো ছিল ঠিকঠাক, সাজানো-গোছানো, শান্ত-শান্ত। গুমোট ছিল, গাছপালার পাতাও যেন নড়ছিল না। হঠাৎ কী হল? সবকিছুই যেন পাল্টে গেল। জঙ্গল ফুঁড়ে হৈ-হৈ করে বেরিয়ে এল দল-কে-দল।

কাঠ-মাথায়, কাঠ-কাঁধে, শিকা-বাঁহুকে কাঠ নিয়ে কাঠ ছাড়াই। দৌড়ে তো এল, যেন তাড়া করেছে বাঘে-ভালুকে।

যে কাঠ নিয়ে এল সে তো এলই, যার কাঠ থেকে গেল জঙ্গলেই সে পড়ে গেল মহাফাঁপরে। দৌড়ুতে দৌড়ুতে থমকে থেকে আবার কিছুটা দৌড়োয় সে জঙ্গলের দিকেই। ফিরে ফিরে তাকায় কী যেন মহার্ঘ ফেলে এসেছে সে জঙ্গলে।

মহার্ঘ বলে মহার্ঘ, সারাদিন ঐ কাঠ কাটতে কাটতেই তার হাতের রেখা পর্যন্ত মুছে গেছে, কড়া পড়ে আছে হাতে!

যে পারে যেদিকে দৌড়ুচ্ছে, পাঁই পাঁই করে দৌড়ুচ্ছে।

প্রথমটায় হকচকিয়ে আদিত্যরাও ভেবেছিল দৌড়ুবে, কে জানে হাতি-টাতি অন্য কোনো বন্য জন্তু কী না। কাগজে তো পড়েছে দলমা পাহাড় থেকে এক দঙ্গল হাতি, সঙ্গে আবার একটা ছোট হাতি, খাবারের অন্বেষণে বেরিয়ে সুবর্ণরেখা-কাঁসাই-রূপনারায়ণ-গঙ্গা পেরিয়ে খোদ কলকাতা ঘুরে চুঁচড়া-চন্দননগর-ব্যান্ডেল-বর্ধমান হয়ে ফের ফিরে গিয়েছে দলমায়। যেতে যেতে কোন্ মাহাতো না সাঁওতালবুড়ির ঘরে মহুয়ার মদ না পেয়ে রাগে-দুঃখে ভাঙচুর করে গেছে তার ঘরদোর, তবে রসিকতা করে প্রাণে মারেনি তাকে।

সেই হাতি-টাতি এল নাকি জঙ্গলে?—এই যে হে দৌড়ুচ্ছো কেন? হাতি বেরিয়েছে, হাতি?

কোন্‌দিকে? কটা হে? পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকরাও সন্ত্রস্ত, ভীত। দৌড়ুতে দৌড়ুতে ছুটন্ত লোকগুলো পর্যন্ত হেসে ফেলল, কোথাকার আন্‌খা-বুড়বক! হাতি দেখছে! বলল, হাতি 'বাইরালে' কী আর ভয়, ভয় তো যদি 'বাইরায়' নরসিঙা।

নরসিঙা?

হঁ হঁ, নরসিঙা।

সে কে?

কী আর বলবে সে এইসব আন্‌খা-বুড়বকদের! নরসিঙাকেও চেনে না? বিড় বিড় করে সে বলল, ক্যানে জানো নাই—তুমার আমার শ্বশুর বঠে নরসিঙা?

—নরসিঙা খেদাচ্ছে!

নৃসিংহগার্ড ধর-পাকড় শুরু করেছে। তাই তো দিশাহারার মতো দৌড়ুচ্ছে লোকগুলো, ছুটতে ছুটতে।

দৌড়ুচ্ছে উর্ধশ্বাসে, যেন দৌড়ুলে আর নাগাল পাবে না নরসিঙা।

নরসিঙা, নরসিঙা।

নরসিঙাকে ছেড়ে, নরসিঙার ধরা-অধরা লোকগুলোকে ছেড়ে আদিত্যর দল এসে পড়ল দোরখুলির লোধাবস্তিতে।

আগের চেয়েও ভাঙ-ভুড়রু অবস্থা। বেল-কয়েতবেল-খিরিসগাছ-বেনাঝাড়-কুলঝাড় আঁটারি-চুরচুর ঝোপঝাড় সব আছে ঠিক, তবে কেমন যেন মরা-ঝরা। এতদ্‌সত্ত্বেও দুয়েকজনের 'খলায়' জঙ্গল-লাগোয়া আনাজ-পাতির খেতিতে যৎকিঞ্চিত সবুজের সমারোহ। সবুজ, সবুজ।

দূর থেকে মনে হচ্ছিল আছে, আছে সব। ঐ তো কালো কালো পিঁপড়ের মতো মানুষগুলো ঘুরছে-ফিরছে, কতক বসে আছে গাছতলে।

আদিত্যদের ডাইনে রেখে দু-একটা সাইকেল যাচ্ছে দোরখুলির মাহাতোপাড়ায়। যেতে

যেতে, লোধাপাড়ার দিকে সাফা জামা-কাপড়ের চলমান বেশ কিছু লোক দেখে অকারণে সাইকেলের ঘন্টি বাজাচ্ছে, কেউ কেউ সাইকেলে চেপেই একটা পা মাটিতে রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখার অছিলায় ঘন্টি বাজাচ্ছে জোরে আরো জোরে।

তালপাতার ছাওয়া কুঁড়েঘর চোখে না পড়লেও বনের 'পাল্‌হা-পতরে' ছাওয়া 'কুঁড়িয়া' বা 'কুম্বা' একাধিক চোখে পড়েছে আদিত্যর। আর খড়ের ছাউনি? সে তো কিছু আছে, কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়ে। আদিত্য জানে না, আজ কিছু খড় হিঁচড়ে টেনে ফেলে দিয়েছে নরসিঙাও।

আদিত্য আরো জানে না, এ না হলে অদূর ভবিষ্যতে লেখাও হবে না—

"এমন ঘরে জন্ম দিলি কেন আমার মা,
সারারাত্রি জল পড়ছে ঘুমাতে পারছি না,
অনেক শ্রাবণ পেরিয়ে গেল উথাল-পাথাল ঝড়
ভেঙে পড়ল বাঁশের বেড়া উড়িয়ে নিল খড়।
এমন ঘরে জন্ম দিলি কেন আমার মা।
সারাটা জীবন খেটে খেটে শান্তি পেলাম না।"

মুহূর্ত কয়েকের অন্যমনস্কতা, ঐ সাইকেলওয়ালাদের জন্যই, আর এর মধ্যেই কে যে কোথায় দৌড়ুল, লুকিয়ে পড়ল লাটা-পাটার ভিতর। এই তো ছিল একটু আগে, এই তো—

এই তো একটু আগে নরসিঙা এসে তাদের খলা-খামারের বাইরের উঠোনের হাঁড়ি-কুঁড়িতে ঘরের চালে-বাতায় ডাণ্ডা পিটিয়েছে। একেবারে ভাঙেনি, একটু একটু করে ভেঙে দিয়েছে, গোছা গোছা পচা খড় হেঁচকা মেরে টেনে ফেলেছে। এই বলে 'লুটিশ'ও জারি করেছে—হটো, এই হট্‌-ও, রাজার বাগান থেকে আভি হটো, জলদি নিকালো! না হলে—

ঐ বলে বলেই তো লাঠির খোঁচা মেরেছে চালে-বাতায়। তার আগেই তো লোধাপুরুষরা যে যার গোপন ডেরায়, মেয়েরা ঘরে ঢুকে কুলুপ এঁটেছে।

নরসিঙা গেল গেল, ও তো এমন কত আসে কত যায়, তা বাদে এরা আবার কারা? এক দঙ্গল? নরসিঙা যে-দাগা দিয়েছে, তার উপর এরা আবার এসেছে কী দাগা দিতে?

বাচ্চা-কাচ্চাগুলো চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে একটু আগেও কাঁদছিল, অচেনা লোকগুলোকে দেখে তারা এখন চুপ। চুপ, চুপ। সজোরে দৌড়ে গাছের আড়ালে লাটার আড়ালে ঘরের আড়ালে ভুগড়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

প্রতিবারের মতো পড়ে থাকল একটা-দুটা কচিকাঁচা 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ', যারা অতজোরে হাঁটতে পারে না, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করেও যারা নিরাপদ আশ্রয়ে ডেরায় পৌঁছুতে পারল না, তারা অগত্যা আরো জোরে জোরেই কাঁদতে লাগল।

শশাঙ্ক-পূর্ণ-তিমির-ফটিকরাও ধরবার অছিলায় আরো জোরে জোরে পা চালালো। ছাত্রদের ছাড়িয়েও এগিয়ে গেল আদিত্য। পাছে ফুরিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। ফুরোনোর আগে-ভাগেই তো পৌঁছুতে হবে তাকে।

ক্যামেরা তাক করে আছে সে। এই তুলল-তুলল—

পূর্ণ পৈড়্যা একদৌড়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কাঁদুল-মাদুল লোধাবাচ্চাটাকে ধরতে চাইল, যাতে সে ঝুপড়ির ভিতর না ঢুকে পড়ে।

পূর্ণ গেল বটে, তার বাঁ-হাত চেপে ধরে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাও করল, এই ছাউ, তোর বাপের নাম?

ছেলেটা তার নুনুটা চেপে ধরে আরো জোরে হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগল। আকাশ থেকে

চিল পড়ার মতো কোত্থেকে ছেলেটার মা এসে কথা নেই বার্তা নেই ঝাপট মেরে ছেলেটার ডান হাতে ধরে কেড়ে নিয়ে গেল, কেড়ে নিয়ে গেল ঝুপড়ির ভিতর।

কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পূর্ণ। দাঁড়িয়ে থাকল, দাঁড়িয়ে থাকল। ততক্ষণে আদিত্যসহ বাকিরাও পৌঁছে গেছে। অতঃপর মুখ চাওয়া-চাওয়ি পরস্পর। কারোর কিছু করার নেই।

কিন্তু এতদূর এসে এবারও হেরে যাবে আদিত্য?

লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীরা আগড়ের ফাঁক দিয়ে বড় বড় চোখ করে কী আর দেখছে না? বলাবলি করছে না—এরা আবার কারা? কী হুজ্জুতি করতে এসেছে?

থানার-দারোগা পুলিশকে তারা চেনে, ভালো করেই চেনে। কতবার এল কতবার গেল, এক অর্থে তারা তাদের ঘরের লোক। ঘরের মরদ যেমন মন ভালো থাকলে হেসে কথা বলে, রাগ হলে পিটিয়ে দেয়। তারাও তেমন হাসি তো হাসি, রাগ তো রাগ।

আর তো আসে নরসিঙারা, গাড়বাবুরা। তারা তাদের তো হাড়ে হাড়েই জানে।

নরসিঙার মুরাদ তো তাদের জানা। ঐ বড়জোর গামবুট পায়ে টিস্ টিস্ করে জলের কলসী কী ভুগড়ার দেওয়ালে লাথি মারা। হাতের ঠ্যাঙা দিয়ে এখানে-ওখানে ঘরের চালে কী বাঁশের আগড়ে, কোথাও কিছু না পায় যদি লাটায়-পাটায় অযথা ঠুকে মারে।

বাবু-ভায়েরা মহাজনেরা আর আসে না, বসন্ত কামিল্লাও বহুদিন নিপাত্তা। এতদিন পরে সাফা সাফা জাম-কাপড়ে এরা আবার কারা? কোন্ খোঁচড়ের দল? লোধাবউড়ী-ঝিউড়ীরা ঝুপড়ির ভিতর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে কী আর চিনবার চেষ্টা করছে না?

মনে তো হয় ইস্কুলের ছাউ-ছানা, সঙ্গে তাদের মাষ্টার, মাষ্টারের গলায় ঝুলছে আবার ফটো-খিঁচা যন্তর, মনে তো হয় তারা তেমন কিছু ক্ষতি করবে না, ঐ বড়জোর একটা-দুটা ছবি তুলবে, তা তুলুক না—

ও খালভরি, ই ত সেই বাবুটা, সেই সেবার আইল আর আমাদের বড়কাটা আগুড়ের ফাঁক দিয়ে ছর্ ছর্ করে মুতে দিল নাই?

হঁ ত কি, তার ছামুতে এখন বাইরাঁই 'নুগা' তুল্লে নাচবি? চুপ মার!

আর এসময়ই আদিত্য হাঁক দিল, লক্ষ্মীরাণী মল্লিক আছো? কবি লক্ষ্মীরাণী মল্লিক?

ঝুপড়ির ভিতর ধড়ফড় করে উঠল ফুলটুসি, যেন পেড়ির ভিতর সাপিনী খল্‌বলাচ্ছে।—লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের খোঁজ নিচ্ছে কেন? এরা তবে কারা? লক্ষ্মী তো আমাদের নুকু গো—এই আমি বাপ-হারা মেয়েটাকে এতটুকু থেকে এতবড় করেছি—নুকু, ওম্মা! নুকুর খোঁজ করছে কেন? কী জানি বাপু, কার মনে কী আছে—

জানা কথাও বলতে মানা। বলতে নেই, বলতে নেই। বাইরের লোক যত পারে চেঁচাক। এসময় কেউ একটা ঘরে নেই, পুরুষরা তো পালিয়েছে আগে-ভাগেই বনে জঙ্গলে। কী জানি বাপু কোত্থেকে কী হয়।

অতএব হাত গুটিয়ে বসে থাকাই ভালো।—দেখিই না কী হয়। কী করে লোকগুলো।

ঘরের ভিতর থেকে ঝুপড়ির ভিতর থেকে, লাটা-পাটা ডুবকা-ডুংরির ভিতর থেকে অনেক জোড়া চোখ এদিকেই চেয়ে আছে। একটু আগে ঐ চোখগুলোই তো দেখেছে—একটা খাকী রঙের গামবুট পরা পা কেমন টিস্ টিস্ করে উঠোনের হাঁড়ি-কলসী ভেঙে দিচ্ছে, বাঁশের আগড়ে জোড়া পায়ে লাথি মারছে।

আর এখন 'এই বাবুটা' খালি পরের পর ফটো খিঁচছে।—হায় দেখ-অ-গ, সুরুমুখীদের খুকড়া ষাঁড়াটা নাকফুড়রিদের কট্‌কটি কাটুলটাকে খেদাতে খেদাতে লিএ্যে গিয়ে বড়ামথানের উদিকটায় পিঠ্‌ঠের উপর উঠ্‌ঠে বসল, জাঁকা-মাড়া করল—আর ঐটাও তার ফুচুং-ফাচাং

যন্তরে তুলে ফেলল? চ মীনা, তুঁই-আমিও জড়াজড়ি করে বাবুটার কাছে ফট্টো খিঁচাই?

তোর যখন অত্ত শখ তুঁই যা। আমি যাব নাই, হার্‌গিজ নাই।

কেনে লো?

ঐ বলে নাই—কুথাকার কে দুটা আমড়া ভাতে দে?

ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্।

আদিত্যও বুঝে গেছে খুব কঠিন ঠাঁই। গ্রাম-সমীক্ষা, ইন্টারভিউ—আর কাকে নিয়ে করবে সে? সব তো এখন ঘরে ঢুকে কুলুপ এঁটেছে দরজায়। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে আর কী তারা কপাট খুলবে?

কিন্তু কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিক? সে নেই, সে থাকলেও কী এম্নি করে ঘরে ঢুকে হুড়কো দিত দরজায়? করত আত্মগোপন?

বলতে বলতে কী বেরিয়ে আসত না—"মানুষজাতি এরাও, মানুষ এদের নাম, বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকার ওদের কাম?"

হতাশ আদিত্য খানিক ঘোরাঘুরি করল এদিক সেদিক। আচমকা দেখল বোগেনভিলিয়ার ঝাড় লাট-কে-লাট—আরে এ-বনে বোগেনভিলিয়ার ঝাড় এল কোত্থেকে?

গ্রাম-শহর একত্রে? চলিতের সঙ্গে কোত্থেকে সাধু এসে মিশল? শব-পোড়া মড়াদাহের দল?

কিন্তু না, বেশ তো মানিয়ে গেছে! সাধু-অসাধু। সেই আগের মতোই—"হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসম সমতুলা। সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা।।"

বুনো ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর কার্পাসগাছ? কেউ নিজহাতে না লাগালে আসে কী করে? কেঁদ্-বহেড়া-চুরচু-চিহড়-আঁটারি-কুড়চির ভিতর থোকা থোকা বোগেনভিলিয়া?

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে একসময় পাটনার বাবুদের বাগান থেকে নানারকম শহুরে ফুল লতা-পাতা এনে পুঁতে দিয়েছিল যুগলপ্রসাদ। কিন্তু 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণও শহুরে শৌখীন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে গভীর সম্পর্কিত বোগেনভিলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর বনে বেমানান হবে এবং শহুরে ঝাড়ে পাছে বন্য সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায় কল্পনা করে লাগানোর যে দুঃসাহস দেখাতে পারেননি, এখানে কে বা কারা অবলীলায় তা করে ফেলেছে এবং কী অদ্ভুত ভাবে এখানে তা মানিয়েও গেছে।

আরে, এ বনে বোগেনভিলিয়ার ঝাড় এল কোত্থেকে? দৌড়ে এল পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের দলও।—তাই তো, এ তো কাগজফুলেরই গাছ, বড়খাঁকড়ির বাবুদের বাগানে সিংহদুয়ারে এ-গাছ তো আকছার দেখেছে তারা! আর এ-ফুলের অনুকরণেই তো তারা সবুজ হলুদ লাল দেশলাই বাক্সের কাগজের রঙের কাগজে সরস্বতী পূজার দিন কত রকম কাগজ-ফুল, ফুলের মালা বানিয়েছে!

আদিত্যদের দলের পিছনে পিছনে স্রেফ্ মজা দেখতে আসা গ্রামের একটা মাহাতো ছেলে ফুল নিয়ে ছেলেগুলোর আ-দেখলে-পনা দেখে বলতে বাধ্য হল, আঁটারিগাছের ফুল দেখতেও একইরকম। তবে সে-ফুল তো আর লাল-নীল নয়, সাদা, একটু ময়লা-ময়লা।

পূর্ণ-শশাঙ্ক এবার মাহাতো ছেলেটাকেই ধরে বসল, একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী যেন বললও। কী আর বলবে, হয়তো বলল—তুমি তো এখানকারই ছেলে, শবররা সব তোমার আলাপ-পরিচিতের মধ্যে, দ্যাখো না একটু হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি করে?

মাহাতো ছেলেটা কেমন অদ্ভুতভাবে তার বুকের কাছে হাত দুটো জড়াজড়ি করে এ হাতের আঙুল সে-হাতের আঙুল দিয়ে ধরছিল ছাড়ছিল। পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের কথায়

সে ভয়ে ভয়ে দৌড়ুল, একদৌড়ে সে নেমে গেল দোরখুলির বুলানে, পিছন ফিরে একবারও দেখল না।

লাইবুকা-বড়কই-সুরুয়া-পঙড়াদের সে আলবৎ চেনে, ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি করে তাদের ঘর-দোর তাদের মা-বাবাদের চিনিয়ে দিলে পরে লোধা ছা-ছনারাই তাকে শত্রু হিসাবে 'চিহ্নত্' করবে, 'চর-খোঁচড়' হিসাবে সন্দেহ করবে—এই ভয়ে ভয়েই সে দৌড়ুল, কে জানে বাবা, কার মনে বা কী আছে!

আর লক্ষ্মীকে আদিত্য এখানে আর পাবে কোথায়? সে তো আছে কলেজে তার। এখানে সে আসে ঐ কালে-ভদ্রে, অবরে-সবরে। তাও তো বেশির ভাগ স্যাঙাৎ-ঘরে, দোরখুলির বঙ্কামাহাতো যে তার স্যাঙাৎ-বাপ।

তবে আদিত্য এখানে আর কী করবে? বসে বসে খানিকটা ভেরেণ্ডা ভাজুক, খিঁচ খিঁচ করে কটা গাছ-ফুল-লতা-পাতার ছবি তুলুক আর করুক কবিত্ব।

কবিত্ব, কবিত্ব।

তাই করল আদিত্য। একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে খানিক উদাস হয়ে গেল সে। তার মনে হল—সে-ই সত্যচরণ। লবটুলিয়ার উত্তরে সরস্বতী কুণ্ডীর কাছে বসে আছে সে, ঐ তো একটা গাছের ডালে বাঁধা আছে তার ঘোড়া—

ধারে কাছে আর কেউ নেই। পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের দল এখন লোধাবস্তির এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করছে। কী যেন আবিষ্কারের আশায়-নেশায় তাদের পেয়ে বসেছে!

দরজায় দরজায় তারা হাঁক পাড়ছে, আকুলি-বিকুলি করছে, অউ শুনোটো গ' টিকে বাহিরে আস-অ না? ভয়ের কি, আমরা তো এসেছি 'ইন্টারভিউ' করতে। ইন্টারভিউ? তারমানে তো—এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করা। অউ ধর-অ, তুমার নাম কি? তুমার সেয়ামীর নাম কি?

তাদের হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি আর এখন কানে ঢুকছে না আদিত্যর। তার সামনে এখন কুলবুদা-কুলগাছের ঝাড়, কেঁদ্‌বুদা-কেঁদুগাছের ঝাড় আর বেনাবুদা-বেনাঘাসের ঝাড়। বেলগাছ কয়েতবেলের গাছ খিরিসগাছ।

আদিত্য তো আর গাছ চেনে না। তার কাছে শাল-পিয়াশাল-ধ-আসন-কেঁদ্-কইম-ভেলা-ভুড়রু-বহেড়া-আঁটারি-চুরচু—সব একসমান, একসমান। তার চোখের সামনে এখন গাছ-বুদা ছাড়াও লাটা-পাটা ডুব্‌কা-ডুংরি টাঁড়-টিকর। আর লাল মোরাম দেওয়া রাস্তা। তার উপর রোদ পড়ে খলবল করছে।

মরা-ঝরা আড়বেলার রোদ। খর রৌদ্রেও ডুবকা-ডুংরি লাটা-পাটা গাছতলা শান্ত-শীতল। হেথা-হোথা হরিদ্রা রঙের একট-দুটা উইঢিবি। শান্ত সমাহিত, ধ্যানমগ্ন। যেন ধ্যান ভাঙলেই উইঢিবি ফেটে বেরিয়ে আসবে একেকটা বাল্মীকি। গাছে শরাহত কাতর ক্রৌঞ্চী দেখে সমস্বরে রচনা করে উঠবে, মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং......

তন্মুহূর্তেই আদিত্য যেন প্রবেশ করল সুদূর অতীতে, অতীতেরও অতীতে, মহাঅতীতে, সেন-পাল-গুপ্ত-মৌর্য্য-বুদ্ধ-মহাবীর তো এই সেদিনের কথা। আদিত্যর সঙ্গে এইমাত্র দেখা হয়ে গেল ইক্ষ্বাকু বংশের বৈবস্বত-বিশ্বগস্য-যুবনাশ্ব-মান্ধাতার সঙ্গে।

ঐ তো একে একে আসছে পুরু বংশের পুরু মতিনার মুগ্দল কুরু আর শান্তনু। দেখা হয়ে গেল বৃহদ্রথ বংশের জরাসন্ধ সোমাধি শ্রুতশ্রবা সুক্ষত্রের সঙ্গে। যদু বংশের রোমপাদ বৃষিত আহুক দেবক-দেবকীর সঙ্গে।

কত কল্প মনুকাল যুগ যুগান্তর পেরিয়ে গেল, পেরিয়ে এল সে। তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল চর্যাপদের কবি শবরপাদের সঙ্গে। আজকের আঁটারি-চুরচু-চিহড়-দুধিয়া-হাতিবাঁধা লতায়

আকীর্ণ শাল-পিয়াশাল-ধ-আসন-শিরিস-কইম-কচড়া-করম-কুসুমের জঙ্গলে যেমন আচমকা বোগেনভিলিয়া, তেমনি শবরপাদের কলমে কবেই অর্জুন-বহেড়া-শাল্মলী-হরিতকীর ফাঁকে ফাঁকে শবর-শবরীর ভিটার পাশেই রোপিত হয়েছে কার্পাস আর কঙ্গুচিনা ঘাসের দানা!

কঙ্গুচিনা ঘাসের দানা পাকল আর শবর-শবরীদের উদ্দাম নৃত্যও শুরু হল। ঐ তো শবরপাদ নিজে এসে এক শবরীর হাত ধরল। আদিত্য স্বচক্ষে সেখল।

জঙ্গলে কোথায় যেন ডেকে উঠল হরট্রিট! বনটিয়ার ঝাঁক, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল, বাজবৌরী, চিল, কুল্লো, শিল্লী, কপ্‌তি, পাঁড়কা, তিড়ুং, টিড়লিং, ক্যাব্লকেটা, ঢেপচু, ট্যাঁসা, সোনাবনি, গুয়েবনি, সীমফুচি, বুড়িমাউকাল, গোবরা, কয়ের—

জম্বু কুশ প্লক্ষ শাল্মলী ক্রৌঞ্চ শকম্ পুষ্কর—কত রকম দেশ! দেশে দেশে তপোবনে তপোবনে আশ্রমে আশ্রমে ধ্যানে শিক্ষাদানে ব্যস্ত সমস্ত ঋষিকুল। গর্গ পরাশর কশ্যপ নারদ বিষ্ণুগুপ্ত দেবল অসিত ময় বৃহস্পতি গরুত্মন শক সপ্তর্ষি বদ্রুয়ন সরস্বত নগ্নজিৎ মনু বিশ্বকর্মা কপি ভরদ্বাজরা।

কুলুকুলু ধ্বনিতে নদী বয়ে চলেছে কখনো জোরে কখনো মন্দ মন্থরে। কখনো মুনিঋষিদের আশ্রমকে ঘিরে কখনো বা আশ্রমের পাশ দিয়েই। কতরকম নদী কতরকম নাম—সরস্বতী, দৃষদ্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, নর্মদা, গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেনী, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিরা, তোয়া, অন্তা, গৌরী, মনোজবা, কুমুদ্বতী, কুমারী, ধেনুকা, গভস্তী, কপিশা, সুবর্ণসিঁড়ি, সুবর্ণরেখা—

আর তাদের তীরে তীরে কত লোকের বাস! কুরুপাঞ্চাল, কামরূপ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ, অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্বুদ, কারুষ, মালব, সৌবীর, সৈন্ধব-হূন-শাল্ব, শালক, মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠবাসীদের বাস।

কখনো নদীবালিতে নদীজলে তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছেঁকে তুলছে সোনা যূক যব অঙ্গুলি লিক্ষ বালাগ্র পরিমাণ ছাঁকনি দিয়ে! দশহাজার ভাগ বালি তো দু-তিন-ভাগ সোনা।

কখনো বহস্তীনদী জলে আটকে রাখছে রেশমি পশুর চামড়া আর সে-চামড়ায় ধরা পড়ছে সোনাকণা। নদীজল থেকে তুলে রোমশ পশুর চামড়া শুকিয়ে ঝেড়ে নিলেই তো সোনা ঝরে পড়বে ঝুর্‌ঝুর—

আর এই করে করেই তো নদীনালার নাম হয়ে গেল সুবর্ণসিঁড়ি সুবর্ণরেখা!

গাছের গুঁড়িতে বসে পা দোলাতে দোলাতে আদিত্য অতীত ফেলে এসে ফের চোখ রাখল বর্তমানের দোরখুলির লোধাবস্তিতে। লোধাবস্তি, লোধাবস্তি।

না, লোধা-বউড়ী-ঝিউড়ীরা এখনও 'আগুড়' খুলে বাইরে আসেনি, ইন্টারভিউ দিতে মুখোমুখি হয়নি আদিত্যদের। তবে পূর্ণ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিকদের দল এখনও নাছোড়। সমানে হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি করে চলেছে।

লোধা-বউড়ী-ঝিউড়ীরা ঘরের ভিতর ঢুকল ঢুকল, যে-কজন 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ' রাস্তায় কোমরের ঘুন্‌ষি টেনে ধরে কিংবা নিজেদের 'নুনু' হাতে ধরে টানতে টানতে লম্বা করছিল, তারাও, তারাও এতক্ষণে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে আর লোধা-পুরুষরা তো আগেভাগেই—

এখন যতক্ষণ সাফা জামাকাপড়ের লোকজন লোধাপাড়ায় ঘুরবে ফিরবে ততক্ষণ আর এমুখো হবে না লোধা-পুরুষরা। কিন্তু তাদের পোষা মুরগীগুলো কুকুরগুলো তো আর ঘরের ভিতর ঢুকতে পারেনি।

তারা যেমনকার তেমন খুঁটে খাচ্ছে পোকা-মাকড়, এ-আগাছা সে-আগাছার পাতা

ঠোকরাচ্ছে। আর মাঝে মাঝেই তি-তি করে কঁ-কঁ করে ডেকে উঠছে। একটা-দুটো উদ্‌মা কুকুর হ্যাল্ হ্যাল্ করে এদিক থেকে সেদিকে যাচ্ছে। হয়তো বাঘাম্বর-লীলাম্বরেরই উত্তর পুরুষ।

তারা অচেনা লোকজন দেখেও ঘেউ-ঘেউ করছে না। বরঞ্চ পিঠে লাথি মারবার আগেই যেন কেউ লাথি মেরে ফেলেছে, ভয়ে তাই পিঠ বেঁকিয়ে কুঁই কুঁই করে ডেকে উঠে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে।

ছেঁড়া কাঁথা-কানি অপুষ্ট বেড়ার গায়ে লেগে কাকতাড়ুয়ার মতো ভেংচি কাটছে আদিত্যদের। যেন বলছে, ধারণা নেই ধারণা নেই, আদিত্যদের ধারণাই নেই, তাই তারা রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়া লোধাদের গাঁয়ে এতক্ষণ ঘুরছে-ফিরছে, গাছের গুঁড়িতে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখছে, অথচ—

অথচ আশপাশের গাঁয়ের লোকেবা ভয়ে দোবখুলির লোধাবস্তিতে কদাপি পা মাড়ায় না। পা মাড়ায় না, পা মাড়ায় না। কে জানে বাবা কখন ধরে-বেঁধে পরনের গামছাটুকু 'আন্ডারওয়াড়' টুকুও কেড়ে নেয়, ছিনতাই করে নেয়! বিষমাখা কাঁড়-কাঁড়বাঁশে বিঁধে দেয়! আর বিঁধে দিলেই তো 'মিত্যু', ধনুষ্টঙ্কার!

অথচ প্রকৃতি এখানে বড় সুন্দর। শীত গিয়েছে, ঝরা-মরা বুড়োপাতাও টস্‌কে ঝরে গিয়েছে। গাছে গাছে নবীন কিশলয়। শালগাছের পাতা কে যেন তেলে চুবিয়ে ফের গুঁজে দিয়েছে বোঁটায়, বৃন্তে। কাচের মতো ফুটে আছে শালফুল। মহুলগাছের খোঁচে খোঁচে ধরে আছে মহুল কুঁড়ি। একটু রাতের দিকে ফের ফুটে ঝরে যাবে ভোরে, আলো ফুটবার আগেই।

এখানে এই সবুজের সমারোহে আনন্দ-উৎসবে লোধাদের কুঁড়েঘরগুলি যেন এক-একটা মামড়ি-ওঠা ঘা, ক্ষতচিহ্ন। বড়ই বেমানান। আর তাই বুঝি নরসিঙা, অরণ্যের বরপুত্র অরণ্যেরই রক্ষাকর্তা উঠে পড়ে লেগেছে সেইসব ক্ষতচিহ্ন ধুয়ে মুছে সেখানে ইউকেলিপটাশ সোনাঝুরি কি আকাশমণি কি নিদেনপক্ষে কাজুবাদামের গাছ লাগিয়ে ছাড়তে।

আর লাগালেই সবুজে সবুজ হয়ে উঠবে লোধাবস্তি, সফল হয়ে উঠবে বনসৃজন প্রকল্প, অরণ্য ফিরে পাবে তার আগেকার স্বাস্থ্য আগেকার সম্পদ! লোধাকবি লক্ষ্মীরাণী মল্লিক যতই লিখুক—

ভখ্‌লাতে আলুতুঙা যদি ধরে নরসিঙা
বল্ রাণী বল্ মুনু একসঙ্গে চেঁচাঞে—
বনে জনম বনে মরণ বন লোধাদের হকের ধন
কহে দে রাণী কহে দে মুনু, বন আমাদের মা বঠে।

নরসিঙার চোখে কি পড়েছে এসব কবিতা? নরসিঙা কি পড়েছে? আর পড়ে থাকে যদি তো তার মনে কী ভাব উদয় হয়েছে? সে কি আরোই হিংস্র হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ভাঙতে এসেছে লোধাবস্তি? দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলেছে, ডেকে আন কে তোদের বাপ আছে?

শশাঙ্ক-পূর্ণর দল দৌড়ে এসে খবর দিল, ঐ দেখুন স্যার, একজন আসছে!

চকিতে ঘাড় ঘুরালো আদিত্য, পূর্ণ-শশাঙ্কদের আঙুল বরাবর চোখ রেখে দেখল, মানুষ কোথায়, একটা কাঠের গুঁড়ি এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। কাঠের গুঁড়িও না, একটা ঝুড়িকাঠের বোঝা।

যেন তার দুটি ছোট ছোট পায়ে ঝুড়িকাঠের বোঝাটা হেঁটে আসছে। হেঁটে আসছে, হেঁটে আসছে। হেঁটে আসছে লোধাবস্তির দিকেই। টলতে টলতে।

কাছাকাছি হতেই আদিত্য দেখল, একটা থুত্থুরে বুড়ি, মাথায় ঝুড়িকাঠের বোঝা নিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে আসছে। ঝুড়িকাঠের বোঝায় একগোছা কাঁচা শালপাতা গোঁজা।

আদিত্যর মনে হল আরেক ইন্দির ঠাকরুণ, আরেক ভাতরবর্ষ। চোখ দুটি আছে কী নেই—বুঝা যাচ্ছে না।

চোখ নেই, চোখের রেখা দুটি আছে। ভুরু নেই, ভুরুর রেখাও নিশ্চিহ্ন। মুখে ভারতবর্ষের ম্যাপ, লোল চর্ম কুঁচকে-মুচকে একশা।

ধুঁকছে, বোঝা ফেলে সে দৌড়ুবে তার শক্তিও নেই।

কি নাম?

নাম তো জটা, জট্টালোধানী, কিন্তু সত্যি কথা বলব কেন, কার মনে কী আছে। ফোঁ ফোঁ করে বলল, "আমগাছে আম নাই পাথর কিস্‌ক মারো হে, তহর দেশের মুই নাই, শ্যাম, আঁখি কিস্‌ক ঠারো হে?"

যা বুঝার বুঝো!

ফোগলা দাঁতে বুড়ি তো হাসল।

কিছুই বুঝল না আদিত্য, শশাঙ্ক-পূর্ণদের ডেকে বলল, আম-জাম কী বলছে কিছুই তো বুঝছি না পূর্ণ। ভালো করে শোনো তো কী বলছে!

পূর্ণ-শশাঙ্করা এবার ঘিরে ধরল বুড়িকে।—শুনতে পাচ্ছ বুড়িমা, কি নাম তোমার?

ভয়ে ঠির্ ঠির্ করে কাঁপছে বুড়ি—কী বলতে কী বলবে। বলল, "কেঁকড়াশের নেজে হাতি বাঁধা আছে।"

পূর্ণরাও বুঝতে পারল না। ফের জিজ্ঞাসা করল, এই বয়সেও জঙ্গলে? তোমার তো 'স্ট্যামিনা' খুব?

বুড়ি মনে মনে বলল, হঁ ত কেনে যাব নাই? জঙ্গল আমাদের মা বঠে, জঙ্গলই তো আমাদের দানাপানি দেয়।

মুখে বলল, "বনর কুরকুট, ঘরত্ গেনে সবাই বলত দে টুক।"

আদিত্য ভাবল লোকগুলো তো আচ্ছা রহস্যময়। কী কথার কী জবাব। বুঝতে পারে কার সাধ্য।—বুড়িমা তোমার কে কে আছে?

বুড়ি বলল, "ছাউ কাঁদত্ ভখে মাই কি কাঁদয় পথে বাপ কাঁদয় জেলের ভিত্‌রে—"

হ্যাঁ জেল, অনেকটা যেন বুঝে ফেলেছে আদিত্য, বলল, তোমার ছেলে কি জেলে আটক আছে?

বুড়ি বলল, "হীরার ব্যাটা হীরা, উদ্ খাইতে ক্ষুদ নাই কলমী শাকে জিরা।"

—বুঝো কিত্তি!

পূর্ণ বলল, লে হালুয়া! বুড়ি নি জরপ কাটে? স্যার, বুড়ি তো কথায় কথায় হেঁয়ালি করছে।

আদিত্য মনে মনে বলল, ওরা জীবনভর হেঁয়ালিই করে, ওদের ধরতে পারা অত সহজ নয়।

শেষ প্রশ্ন করল আদিত্য, বুড়ি মা, লক্ষ্মীরাণী মল্লিককে চেনো? কবি লক্ষ্মীরাণী মল্লিক?

বুড়ি হেসে বলল, "বাপ রাজা তো রাজার ঝি, ভাই রাজা তো আমার কি?"

এরা বড়বেশি রাজা-রাজড়ার গল্প করে, এদেরই একজন রাইবু না কী নাম যেন, উপেন কম্পাউণ্ডারের চেম্বারে "কী করো" জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়েছিল "রাজত্বি"।

এদের চিনতে পারা অত সহজ নয়।

কটা পটাপট ছবি তুলে ঝুড়িকাঠের বোঝাটা ফের বুড়ির মাথায় উঠিয়ে দিয়ে আদিত্য-পূর্ণ-শশাঙ্করা ফিরে চলল।

কিছু না হোক, কিছু তো হল। ঐ নিয়ে আদিত্যরা চলে যাচ্ছে। লোধাবস্তির ভিতর দিয়ে বুলান-হদহদি পেরিয়ে ঠাকুরবাঁধ ডাইনে রেখে মাঝুড়বক্কার পথ ধরে—

পিছন পিছন একটা কালো কুকুর হ্যাল্ হ্যাল্ করতে করতে যাচ্ছে।

ঘরের দরজার কাছে দৌড়ে এসেছিল ফুলটুসি। 'আগুড়ের' ফাঁক দিয়ে চোখ রেখে সে দেখছিল—ওরা চলে যাচ্ছে, যারা এসেছিল তারা চলে যাচ্ছে, পিছন পিছন একটা "কালিয়া কুকুর"—

ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কুকুরটা যাচ্ছে, মিশমিশে কালো।

দেখতে দেখতে ফুলটুসির মনে পড়ে গেল, এই সেদিন দেখা 'বাঘাম্বর যাত্রাপালার' কথা। মনে হল আজ যারা এসেছিল তারা লোধাপাড়ার কাউকে, কাউকে কী আমাদের নুকুকে, "কালিয়া কুকুর" বানিয়ে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

কালিয়া কুকুর, কালিয়া কুকুর।

রাজার আজ্ঞায় নৈরাট পাটনায় চন্দন-চামর আনতে যাচ্ছে দুই ভাই জয়ানন্দ আর হীরানন্দ। আর, এদিকে ফকিরের কারসাজিতে যুগীনাথ জয়ানন্দর বউ চম্পাকে হরণ করে "কালিয়া কুকুর" বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তাকে খুঁজতে জয়ানন্দ গেলে 'যুগদড়া' দিয়ে জয়ানন্দকে মেরে ফেলল যুগী। তখন তার ভাই হীরানন্দ খুঁজতে যাচ্ছে জয়ানন্দ আর তার বউ চম্পাকে।

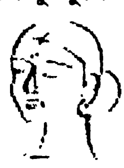
হীরানন্দর বউ রূপবতী বলছে, প্রাণনাথ! আপন যদি আপনঙ্কর ভাইর অন্বেষণে গমন করিব, আমে পঞ্চ মাস গর্ভবতী, আমর উপায় কি করি যাউচ?

হীরানন্দ বলছে, তুমর গর্ভর যদি দুহিতা জন্ম হয় তার নাম দব অমরাবতী, যদি পুত্র জন্ম হয় তার নাম দব বাঘাম্বর। সে পুত্রকু বিদ্যা শিক্ষা দেই আমর অন্বেষণে প্রেরণ করিব। এই জয়পত্র দেলে ধর!

শুনে শুনে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে ফুলটুসির। বাঘাম্বর জয়পত্র নিয়ে যুগীনাথের প্রাণভোমরাকে দু-হাতে টিপে, "যুগী ধড়ফড় কাঁথ ভাঙি পড়", মেরেও ফেলল। মেরে ফেলে বাপ-কাকা-কাকীদের উদ্ধার করল।

লম্বা শ্বাস ছেড়ে ফুলটুসিও মনে মনে বলল, এই লদ্ধা জাইতে কবে যে বাঘাম্বর জন্মাবে! আর কবে যে তার হাতে আমরা জয়পত্র দিব-অ!

এতক্ষণে ঘুপচীর 'আগুড়' খুলে ফেলল ফুলটুসি।



বহুদিন বাদে শিশুবালা-রাইবু জঙ্গলে একসঙ্গে।

আগে আগে একটা দল ছিল, দঙ্গল ছিল, লোধাপাড়ার দঙ্গল। সে-দঙ্গলে ছিল ফুলটুসি, জটা, শিশুবালা, নিয়তি, ঢালো, আর সবার উপরে ছিল সোমবারি।

সোমবারি, সোমবারি।

এখন সে সোমবারিও নেই, সে দঙ্গলটাও নেই। জটালোধানী বুড়ি হয়েছে, সোমবারি হারিয়ে গেছে, আর ফুলটুসি তো বেশির ভাগ সময় পড়ে থাকে দোরখুলিতে বঙ্কামাহাতোর ঘরে।

এখন যে-যার সে-তার একা একা, একা একাই।

তবে সে জঙ্গলও কী আর আছে? নেই, নেই। পরিবর্তে নতুন একটা জঙ্গল হয়েছে, একটা কেন দু-দশটা। কাজুবাদামের, আকাশমণির, ইউকেলিপটাশের। চাই কি শাল-সেগুনেরও।

তবে এ-জঙ্গল কী আর সে-জঙ্গল? জঙ্গলের ভিতর এখন ধরা ডু-ডু দাঁড়িয়া হা-ডু-ডু ছো-কিত্ কিত্ খেলা যায়, খেলা যায় না লুক-লুকানি।

দৌড়ুতে গেলে পায়ে পায়ে কী আর জড়িয়ে যায় আঁটিরি-চুরচুর লাটাপাটা? হাতিশুঁড়-চিহড়-দুধিয়ার লত্? পানআলু-চুনআলু-খামআলু-চুরকুআলুর 'চের্'? আঁউলা-বাঁউলার লতাবিতান? কাঁকড়ো-কুঁদ্ড়ির ঝাড়? আলকুসি-ঘোড়াবিছুটির ল-গাছ?

যায় না, যায় না।

তবু জঙ্গল জঙ্গল। একথা মানতেই হয়, এ-জঙ্গলে লোধাজনমাড়ষদের ঢুকতেই হয়। যতই খেদাক নরসিঙা, যতই 'চাভ্লাক' ভালুক-হুঁড়ার-রামবাঘা।

রাইবুর সঙ্গে শিশুবালা জঙ্গলে।

আজকাল রোগাভোগা মানুষটাকে একলা ছেড়ে দিতে কেমন যেন ভয় শিশুবালার। একলা কী আর, সদাসর্বদা তো সঙ্গে সঙ্গে থাকে গুড়গুড়িয়া।

হয়তো এখনও আছে ধারে কাছে। শিশুবালার ভয়ে ঘেঁষতে পারছে না।

শিশুবালা গেলেই এসে জুটে যাবে তড়াক করে। তারপর তো চেলায়-গুরুতে ওস্তাদে-ফোস্তাদে—

শিশুবালার তাই নিয়ে অত মাথাব্যথা নেই। তবু তো মানুষটা একলা নয় দোখলা, কেউ তো একজন আছে সঙ্গে। কেউ না কেউ।

যখন শিশুবালা-রাইবু একসঙ্গে, ঐ দুজনেই, আর কেউ না, তখনই রাইবুব নির্ঘাত মনে পড়ে যাবে সোমবারিকে।—সম্বারি, সম্বারি—

কদ্দিন হৈল বল-অ ত?

শিশুবালার জানা কথা, তবু বলল, কী কদ্দিন?

গুম মেরে যায় রাইবু, আর রা কাড়ে না।

অতটা আবার ভালো লাগে না শিশুবালার। তার ভয় করে, সে কথা চালিয়ে যেতে উস্কে দেয়, বলে, গুম্ মেরে গেলে যে? কীসের কদ্দিন?

ঘাড় ঘুরিয়ে শিশুবালাকে একবার দেখে নিল রাইবু, তারপর খানিক চুপ থেকে বলে, অভাগীটা গেল—

হঁ তা,—বলেই বিড়বিড় করে শিশুবালা, অত দিন-ক্ষণের হিসাব তার মনে থাকে না, কেমন গুলিয়ে যায়। আরোই গুলিয়ে দিতে সে বিড়বিড় করে। বিড়বিড় করে, বিড়বিড় করে—

আর তার ভয় হয় মানুষটা এক্ষুনি বুঝি 'উধাস' হয়ে 'বাউলা' হয়ে হুম্দুম্ করে কোথাও হয়তো চলে যায়!

আগে আগে যেত ঠাকুরবাঁধের ধ'তলে, মাঝুড়ুবকায়। এখন যায় যেদিকে ইচ্ছা।

"তুমি আর উসব ভেবে মন খারাপ কর-অ নাই ত" বলে চাপা দিতে চায় শিশুবালা। ব্যাপারটা রাইবুর মন থেকে ভুলিয়ে দিতে চায় সে। কখনও শরীর দিয়ে, সর্বাঙ্গ দিয়ে।

কখনও পারে, কখনও পারে না।

কখনও রাইবু গ্রহণ করে শিশুবালাকে, কখনও ঠেলে সরিয়ে দেয় হাত দিয়ে।

কখনও সাপিনীর মতো ফোঁস করে ওঠে শিশুবালা, ফোঁস কী আর ভান করে, বলে, দরকার কী? আমাকে তুমার দরকার কী? তুমার ত ইয়ে আছে, ইয়ে—

আর কখনও চুপচাপ হজম করে নেয় শিশুবালা। রাইবুকে ছেড়ে এ-দিক সে-দিক চলে যায়। একেবারে যায় কী আর, যাবার ভান করে।

ইয়ে, তার মানে ফুলটুসি, ফুলটুসুয়া—

শুনে-টুনে কখনও কখনও হাসে, হেসে উঠে রাইবু। আবার কখনও ভয়ানক রেগে যায়। রাগ বলে রাগ।

রেগে গিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে সে। হাড়পু শরীরেও তার বান ডাকে। দপ্ দপ্ করে উঠে হাত দুটোর জাঙ্ দুটোর শিরা-উপশিরা।

'চাড়লাতে' চায় সে শিশুবালাকে, পরস্ত্রী ভেবে 'জাঁকামাড়া' করে সে শিশুর সঙ্গে।

শিশুবালা, শিশুবালা।

মনে মনে এটাই তো চাইছিল শিশু। লোকটাকে তাতিয়ে দিতে, রাগিয়ে দিতে। রাগলে আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে পুরুষ। কীই বা খায়-দায়, বড়জোর আলু-তুণ্ডা। তবু—

আর তারপর সুখভোগের শেষে উঠে-আসা পুলকের সঙ্গে সঙ্গে একটা মনখারাপ ভাব রাইবুকে না, ঘিরে ধরে শিশুবালাকে। শিশুবালাকেই।

এতসব করেও এত কিছু করেও তার কোল আলো করা বাচ্চা হল না! ছাউ। এত লোকের হয়, আর তার হল না? আর কী হবে? ফুল তো পড়ে শুকিয়ে গেল!

ঐ মন খারাপ ভাব খানিকটা, আর তারপরই তো কাজে মেতে ওঠা।

কীই বা আর কাজ! খোঁজা, খোঁজা! আঁতিপাতি করে খোঁজা, লতায়-পাতায় খোঁজা, আগ-ডালে খোঁজা, মগডালে খোঁজা।

খুঁজে খুঁজে নারি, যে পায় তাহারি। বন-কুঁদ্‌ড়ি-কাঁকড়ো। ভেলা-ভুড়রু। কেঁদ্-কুসুম। আলু পান-চুন-চুরচু-খাম। ছাতু, কাড়হান-কুড়কুড়িয়া-পরব-শালপোঙড়া-সরুবালি-বড়বালি।

কখনও পায়, কখনও পায় না। কখনও খোঁচড় ভরে ওঠে, কখনও অ-ভরা। রাইবু খন্তা-শাবলে 'তাড়ে' আলু-তুণ্ডা আর শিশুবালা তো লতায়-পাতায় ডালে-আবডালে খোঁজে শালপাতা শালদাঁতন, কুরকুট-মুরকুট।

গায়ে-মাথায় লেপ্টে যায় লাল ধুলোমাখা কাদা, ঝাঁটি-কাঠি, নোংরা-জব্‌রা। আর তারপর খানিক কাজ ফেলে চুপচাপ বসে থাকা। মুখোমুখি, মুখোমুখি।

কখনও কথা হয়, কখনও কথা হয় না। ফিস্‌ফাস্। চোখ বুজে শালপাতার চুটা টানতে থাকে রাইবু। ভুড়ুক ভুড়ুক ধোঁয়া ওঠে। আর তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে শিশুবালা।

বিড়ি শেষে রাইবুও উঠে যায়, পিছু পিছু শিশুবালাও। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি, কাঠ কাটাকাটি। আবার বসা, আবার ওঠা। বিড়ি-দোক্তা। ধোঁয়া ওড়াউড়ি, 'ছেপ্' ফেলাফেলি—

হঁ-অ নরসিঙ্গা?

একদিন দিব-অ শালাকে ভকলাঁয়ে—

ম্লাই নাই, উর'ম কাজ কর-অ নাই!

বড় শালার বাড় বেড়েছে।

হঁ-অ বাড়ুক ন, তাতে তুমার আমার কী?

রাইবুর বাহুটা জড়িয়ে ধরে শিশুবালা।

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে রাইবু, বাড়ুক না মানে? কত-অ-ধূর বেড়েছে দেখেছ?

হঁ-অ কী আর দেখব? অরা সরকার বঠে, সরকারের সঙে নিয়াই করে কী পারব হামরা?

সরকার বলে কী মাথার উপর দিঞে হাঁটবে?

হঁ-অ, ঠ্যাঙ আছে হাঁটবে।

ন্নাই নাইরে শিশো, অতগুড় আধসের লয়। এ্যায়সা দিন নাহি রহেগা নাহি চলেগা—

মাথা থেকে পাকা চুল বাছতে বাছতে মনে-মন উত্তর দেয় শিশুবালা, চলছে তো? নাই চলছে?

ততক্ষণে দৌড়ে গিয়েছে রাইবু। কুড়ুল দিয়ে রাগ করে একটা কচি-কাঁচাল শালডগালকে এক চোটে নামিয়ে দিয়েছে এধার-ওধার।

রাগ করে ভুঁইয়ে ভাত খাওয়া—

বিড়বিড় করে বলতে বলতে দুহাতে কপাল চেপে ধরে শিশুবালাও উঠে যায় পাতা তুলতে ঝাঁটি কুড়োতে, ঠাণ্ডা তো ঠাণ্ডা, খেপলে এ-পুরুষ উগাল ষাঁড়, আঁদালে-কাঁদালে ঢুঁসবে।

আবার খানিক গাছ কাটাকাটি, ঝাঁটি টানাটানি, লতাপাতা ছেঁড়া। ফের মুখোমুখি বসা, কথা নয়, ফের চোখাচোখি। চোখাচোখি, চোখাচোখি।

আচমকা কী দেখতে কী দেখে ফেলল, উগ্রচণ্ড হয়ে শিশুবালাকে ফের বনভুঁইয়ে ফেড়ে ফেলল রাইবু।

ধরিত্রীর মতো শুয়ে আছে শিশুবালা, নিথর হয়ে। যা খুশি করে যাচ্ছে রাইবু। হাঁ হাঁ মরদ, এম্নিই তো করবে। খেতে চাইলে খেতে তো দিতেই হয়। বাধা দিলে আগুন জ্বলে যাবে মরদটার মাথায়। হাঁ হাঁ মরদ—

কিন্তুক—

বয়স হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। কতদিন কত বছর ধরে পুরুষটাকে দেখছে শিশুবালা! এসময় মনে-মন না চাইতেও এসে যাচ্ছে ফুলটুসি, ঢপের ফুলটুসুয়া। শিশুবালা নিজেকে মনে-মন করে ফেলল ফুলটুসি। রাইবুর কাছে ফুলটুসি হয়ে সে শুয়ে থাকল।

শিশুবালাকে ভোগ করতে করতে রাইবুর মনেও এসে যাচ্ছে ফুলটুসি। ফুলটুসি, ফুলটুসি। শিশুবালাকে ফুলটুসি ভেবে আরোই উগ্রচণ্ড হয়ে উঠল রাইবু।

রাইবু, না রাবণ? এ-দৃশ্য দেখলে ব্রহ্মাকুমার নির্ঘাত রামায়ণ থেকে মুখস্থ আউড়াত—

"হেঁট মুখে থাকে রম্ভা রাজার গোচর।
ভালমন্দ রম্ভা কিছু না দিল উত্তর।।
অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন।
ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজা দশানন।।
রম্ভার ইঙ্গিত তাহে একে ত' রাবণ।
ইঙ্গিতে শৃঙ্গার করে রাজা দশানন।।
একে দশানন তাহে শৃঙ্গারে প্রবীণ।
একাসনে শৃঙ্গার করয়ে সপ্তদিন।।
রাবণের শৃঙ্গার না সহে কোন নারী।
সবে মাত্র সহে রম্ভা আর মন্দোদরী।।"

রাইবু রাইবুই, সে রাবণ না। সে ভোখ্‌লা-দুখ্‌লা লোধাজনমানুষ। আশপাশের লাটায়-পাটায় সর্‌সর্‌ করে আগাছার ডগাল বেয়ে ক্যাকলাশ যেতে যেতে চকিতে চমকে ফিরে এ-রমন দৃশ্য দেখলে, লোধাপুরুষ বড়জোর ক্যাকলাশকেই তার কেরামতি দেখাতে আরেকটু উগ্রচণ্ড উদ্দাম হয়ে ওঠে। তবে শেষরক্ষা করতে পারে না, কারোর কারোর তলপেটে খুব জোর ব্যাথা হয়।

দেখতে দেখতে অনেক বেলা হয়ে যায়। এতক্ষণ 'ভোখে' কাঁচা শালপাতা শালডাঁটা চিবোচ্ছিল শিশুবালা।

তাই দেখে রাইবুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় এক ধরনের শিকড়ের কথা। বলে, রহ—

বলেই ছুটল শিকড়ের সন্ধানে। রসালো শিকড়, শাঁসে-জলে ভরা। একশিরা না ঈশ্বর মূল, কী যেন। খেলে খিদাও মিটে, তেষ্টাও।

জায়গা খুঁজে তাই 'তেড়ে' আনল রাইবু। একগোছা নিজে রাখল, একগোছা দিল শিশুবালাকে। তারপর দুজনে মিলে খেতে বসল 'তাহুত' করে। ভিতরে খালি সুতোর মতো একটা শিরা, আর চারধারে খালি শাঁস-মাংস। শাঁসটা দাঁতে 'দুহুরে' শিরাটা ফেলে দেওয়া।

যা হোক খেয়ে ফের কাঠ কাটা, পাতা খোঁজা। ডালে-ডালে পাল্‌হা-পতরে। লাটায়-পাটায় ডুব্বা-ডুংরিতে। রাইবু-শিশুবালা, শিশুবালা-রাইবু।

হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় রাইবু, কান খাড়া করে কী যেন শোনে। আর এতদিন, এতদিন বাদে ডাকটা হঠাৎই তার কানে ঢুকে আসে।

ঘাগর যেমন করে বাজতে থাকে, ঘাগর বাজার মতোই ডাকটা বাজতে বাজতে গুঁড়ো ঝরাতে ঝরাতে তার কানে এসে যাচ্ছে।

কান ঝালাপালা করে দিয়ে সে-ডাকটা আবার কোথায় যেন ডাল-পাল্‌হার ফাঁকে-ফোকরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে যায়, মিলিয়ে যায়।

শালার পাখ এত্তদিন বাদে ক্যানে? ক্যানে রে?

বিড়বিড় করে বলতে থাকে রাইবু, বলতে বলতে উদাস হয়ে যায়, উদাস হয়ে মনে-মন সে ভাবে, আছা ভালা, কী পাখ? কী পাখ অমন ঘাগর-মাগর ডাকে?

উঁ-হু, ঘাগর-মাগর কী আর, ডাকছে ত— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!—উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ!

ডাক না 'ভরম'? মনের ভরম?

ধু-র! যত্তসব বুজরুকি! ফের শুদ্ধ হয়ে কাঠ কাটায় মন দেয় রাইবু। ধারে-কাছেই আছে শিশুবালা। সে পাতা ছিঁড়ছে।

কিন্তু ভবী তো ভুলবার নয়, ভবী তো ছাড়বার নয়। আবার কান ঝালাপালা করে দিয়ে ডাকটা এসে গেলে রাইবু ফের হাতের বুড়িয়া থামিয়ে দেয়। ডাকটা ভালো করে শুনবে বলে প্রস্তুত হয়। এই এল, এই তো এসে গেল—

ঘাগর-মাগর ঘা-গ-র মা-গ-র। ঘাগর-মাগর কী আর, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ করতে করতে ডাকটা একবার এদিকে এল, একবার ওদিকে গেল।

উত্তরে গেল, দক্ষিণে গেল। সামনে গেল, পিছনে গেল। পুবে-পশ্চিমে—

এই রে ডাকটা শুনতে শুনতে পাগল হয়ে যাবে নাকি রাইবু?—হঁ হঁ পাখ, কী পাখ?

কোন্ পাল্‌হা-পতরের ফাঁক দিয়ে যে সে ডাকে! আর কী রকম যেন ডাকে—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ-উ-

তোর শাঁকনলা ছিঁড়ে লুব-অ রে নিরবংশা!

বলতে বলতে হাতের বুড়িয়াটা মাথার চারধারে ঘুরাতে লাগল রাইবু।—ডাক শালার পাখ কত ডাকবি ডাক!

এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারে না শিশুবালা। সে তার একমনে ছিঁড়ছে পাল্‌হা-পতর। গোছাগোছা শালপাতা। চকচকে, তেলাল—যেন একেকটা তেলে চোবানো।

এখন পাল্‌হা-পতরের খুব দাম। কাঠি খুঁচে খুঁচে খালিপাতা, দোনা বানাতে পারলে হাজারে কমসে কম চৌদ্দ টাকা।

হাজারে ব্যাজার। গোছা গোছা অত শালপাতাও সময়ে সময়ে ছিঁড়তে দেয় না নরসিঙা। বলে, পারমিট কই, পারমিট দেখা!

রাইবুকে মাথার উপর বুড়িয়া ঘোরাতে দেখে দৌড়ে এল শিশুবালা। বলল, হৈল কী? অমন বাউলার তুল্য করছ কী?

বুড়িয়া ঘোরানো থামিয়ে হাঁপাতে লাগল রাইবু।

বলল, বল-অ দেখি কী পাখ?

কুথায় কী?

হুই যে ডাকে—

কান খাড়া করে শিশুবালা, কই কী র'ম?

—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ!

হঁ হঁ। শিশুবালা ঘন ঘন মাথা নাড়ে। শুনতে পেয়ে গেল শিশুবালা? যে-ডাক একজন শুনে তো দু-জন শুনতে পায় না একসঙ্গে একত্রে, সে ডাক শুনতে পেয়ে গেল শিশুবালা?

সন্দেহ হয় রাইবুর।

—কী র'ম ডাকছে বল-অ ত?

ক্যানে ঐ ত—টি-লিং ডু-বু-ল ডু-বু-ল টি-লিং ডু-বু-ল ডু-বু-ল! টি-লিং ডু-বু-ল ডু-বু-ল? আন্ শুনতে ধান শুনছ তর্‌হা।

ধু-উর মড়ি! শিকার পরবের এখ্‌নও ঢের দেরি! সে তো বৈশাখে আরো খরা পড়লে।

শিশুবালা বলে, এখন থিক্যেই তার মহড়া চলছে, বুঝছ নাই?

নাই নো, ই সেই পাখটা।

রাইবু অনড়।

হঁ-অ, তাই যদি হয় তবে ত 'সুদাইমুসুন'।

'সুদাইমুসুন' অর্থাৎ শুধুমুদু। তবু, তবু শিশুবালা সজাগ হয়, কান খাড়া করে শুনে, সত্যিই যদি ডাকটা শুনতে পায় আর ঘড়িক করে পাখটাকেও দেখতে পায়, চিনতে পারে।

নাই নো সুদাইমুসুন ক্যানে হবে? স্পষ্ট শুনছি—ঐ যে ঐ, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! ঐ গেল, গেল—উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ.....

নাই নাই, পাখটাকে কী আর অত্ত সহজে চিনা যায়? উ কী আর যে-সে পাখ?

যে-কথা সোমবারিও বলত, বারবার বলত, সে-কথা শিশুবালাও মুখস্থের মতো বলে যায়, পাখ না আর কিছু, দেখ-অ তোমার মনের ভরম।

বলেই হাতের কাজে মন দেয় শিশুবালা। পরক্ষণেই ভাবে, তাও কী হয়? সে-ও তো মাঝে মাঝে শুনে—হাঁ হাঁ ঐ ডাক। লোধাপাড়ার আর পাঁচটা লোকও তো শুনেছে।

সে যখন শুনে ডাকটা যেন সেই একজনার কানের ভিতর ঢুকে পড়ে কানের 'জব্‌রা' বের করে দেয়, কানের ভিতর গিরগিতি দেয়, কান তার সুড় সুড় করে, 'সব্‌সবায়'।

শিশুবালা এই ভাবছিল, আবার যেন এই ভুলে যাচ্ছে। খেই হারিয়ে ফেলছে—কী যেন ভাবছিল? কী য়েন? ফের ভাবনা ভুলে কাঠ-পাতা ঝাঁটি-কাটি টানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

রাইবু কিন্তু স্বস্তি পায় না। কী যেন গুর গুর করে তার বুকের ভিতর থেকে 'নিশাসে'র ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বুকটা হু হু করছে, হাল্‌কা হচ্ছে, পরক্ষণেই আবার কী যেন গুম্ গুম্ করে ঢুকে পড়ে বুকটা ভারি করে দিচ্ছে। তার দম্‌সম্ লাগছে, দম্‌সম্ দম্‌সম্।

আচমকা রাইবু ফের চিৎকার করে উঠল, হুই ডাকল, হুই যে হুই—আস্‌নাগাছটার উদিকটায়, না না আস্‌না না, মুড়হা ধ' গাছটার মাথায়। শুনছ? শুন্নো—পাখটা এখন পিয়াশালগাছটার উদিকে, ওখানেই কঁহরাচ্ছে।

শিশুবালা এগিয়ে আসে।

কাই ডাকে? কাই? কাই?

শিশুবালা আরো একটু খাড়া হয়, 'এড়ি' উঁচু করে দেখে। হাত ঝাড়ে, পা ঝাড়ে। বলে, কাই? কাই ন?

ঐ ত ঐ, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ.......

এ ত পষ্ট-পরিষ্কার যে কালা মানুষও শুনতে পাবে আর শিশুবালা শুনতে পাচ্ছে না?

একজনা শুনে তো আরেকজনা শুনতে পায় না, একথা জানা সত্ত্বেও রাইবু শিশুবালাকে দোষ দেয়, বলে, মড়ি, কানে তুমার 'খোল' না আর কিছু? এত পষ্ট ডাক তবু শুনতে পাচ্ছ নাই? ঐ শুন্‌হ, ডাকছে, ডাকছে, ডাকছে.....

শিশুবালা ভাতারসোহাগী, মরদটা যে-পথে হাঁটে সে-ও সেই পথে হাঁটে। 'গেল্‌হাতে' 'গেলহাতে' অর্থাৎ আহ্লাদে আহ্লাদে উত্তর দেয়, হঁ-অ ইবার টুকচার পাচ্ছি।

বলে কী শিশুবালা? এবারে সে একটু একটু ডাকটা শুনতে পাচ্ছে? একটু একটু, তার মানে? যে পাখির ডাক একজন শুনে তো আরেকজন শুনতে পায় না, যে-পাখি একজনকে আউলা-ঝাঁউলা উস্তন-খুস্তন করে মারে যদি তো আরেকজনা ঘূণাক্ষরেও টের পায় না, তার 'থলকুল' পায় না। আর শিশুবালা শুনে ফেলল? ডাকটা স্পষ্ট শুনল?

মিছামিছি না সত্যি?

অবাক-আশ্চর্য হয়ে শিশুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রাইবু আর এসময়ই পাখিটা ঝাঁপান দিয়ে আরো জোরে জোরে ডেকে উঠল, ডাকতে লাগল, ডাকতে থাকল।—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!!-উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ—

হাঁকড়-পাকড় করে রাইবু দৌড়ল, দৌড়ুচ্ছে রাইবু।—ধত্ত বে! ধত্ত বে! শালার পাখকে ধত্ত বে! মুখে যেন বিড় বিড় করে বলতে বলতে যাচ্ছে সে।

উল্টোদিক থেকে আসছে গুড়গুড়িয়া। দৌড়ুচ্ছে, সেই ছোঁড়া গামবুট ছোঁড়া-ফাটা টায়ারের চটি। বেঁটে-বাঁটকুল, থপ্‌ থপ্‌ করে দৌড়ুচ্ছে গুড়গুড়িয়াও।

কী হৈল? হৈল কী?

রাইবুকে দেখে আকুল জিজ্ঞাসা তার, অমন ছুটছ যে?

হাঁপাতে হাঁপাতে রাইবু বসে পড়ে বলল, আর কী, ঐ শালার পাখটা—

পাশাপাশি গুড়গুড়িয়াও বসে পড়ে।

কুত্‌থায় পাখ? কী পাখ? পাঁড়কা? কয়ের? ন গুঁড়ুর?

নাই বে গুড়গুড়ে, উসব লয়। ই পাখ তোর সেই পাখ, সেই যে সেই—

হঁ-অ, বুঝেচি।

কী বুঝলি?

হাসছে গুড়গুড়িয়া।—বলব?

হঁ বল্‌ ন।

উ পাখ তো সুদাইমুসুন, চইখে কেহই দেখে নাই—

নাই দেখুক, কানে তো শুনেছে? পষ্ট শুনলম—কঁহরাতে কঁহরাতে গেল ইদিক থিক্যে উদিকে.....ঐ মার ন শুন আবার ডাকছে, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!—উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ—

থামছে না রাইবু, থামছে না। পাখির ডাকের সঙ্গে সে দোয়ারকি করে যাচ্ছে। পাখিও ডাকছে, রাইবুও ডাকছে।

মনে-মন গুড়গুড়িয়া ভাবল, ওস্তাদের মাথাটা গেছে, একেবারেই গেছে। 'ভইন'টা যাবার পর থেকেই কেমন আউলা-বাউলা হয়ে গেছে রাইবু।

গুড়গুড়িয়া অভিমান করে বলল, হঁ খাল্লি পাখ লিঞে থাকলে হবে?

কী বলতে চাহিস?

বলচি—উদিকে সব্বনাশ হয়ে গেছে ওস্তাদ।

কেনে কী হয়েছে?

তপুবনে আশ্রমের সীতাধুনির লাগাও বড় শালগাছটা কুন্ শালারা কেটে লিয়েছে!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রাইবু। অতদিনের পুরোনো সুবিশাল শালগাছটা যার ডাল-পাল্হার ছায়া-ছাঁয়রায় গোটা আশ্রমটা ঢেকে থাকত, কাঠ-ফাটা দিনমানেও জায়গাটা লাগত আঁধার আঁধার, তাই কী না কেটে ফেলেছে কাঠ-চোরেরা? এত আকালের দিনেও ভোখলা-দুখলা লোধারা যার গায়ে হাত দেয়নি, এমনকি তার ডালে বসা কপ্তি-পাঁড়কা-কয়ের-কুঁড়বক-মুনিয়া-টিয়া-ক্যারকেটার দিকে ভুলেও কাঁড়-কাঁড়বাঁশ তাক করেনি, যে-গাছের ডালে-আবডালে সর্‌সর্ করে চলে-বেড়ানো চিঁড়রা-ক্যাঁকলাশের গা থেকে একটা 'রোঁয়া'ও উপড়ায়নি 'চোরচোট্টা' লোধারা, সেই গাছটাকেই কী না কেটে ফেলল কাঠচোরেরা?

কে কাটল? কারা কাটল? চিন্তিত রাইবু!

কারা ফের, ঐ কুম্হাররাই।

কুম্হারদের উপর যত রাগ গুড়গুড়িয়ার। তারা 'লোধামাইয়া' সাবিত্রীকে হরণ করল, অথচ তাদের একটা 'মাইয়া'কেও ধরতে পারল না গুড়গুড়িয়া! একবারই একটা একটু একটু ঘটেছিল, দৌড়ে খালধারে কইম গাছের ঝোপে নিজেকে লুকিয়ে রেখে গুড়গুড়িয়া দেখল, সে জল খাচ্ছে।

বিন্দাদুতি শুশনিশাক আর গুড়মনগাছের দল সরিয়ে জল খাচ্ছে, অস্থির জলে তার প্রতিবিম্ব কেঁপে কেঁপে ভাসছে, চোখমুখ দেখতে দেখতে দু'হাত ডুবিয়ে জল তুলে মুখে দিল বিন্দা, ভেজা হাত মাথার চুলঅব্দি চলে যাচ্ছে, জরিয়ার মা ধারে-কাছে নেই কোথাও।

কইমতলে গুড়গুড়িয়া লোভাতুর, বাঘ যেন হরিণকে খেয়ে খালধারে ঘাসভুঁয়ে দাড়িগোঁফ মুছে নেবে, জনমাম্মিও জানবে না।

গুড়গুড়িয়া বসেছিল, তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো, গা-হাত-পা ঘামছে।

রুখনীমারার কেউ হবে, রুখনীমারার কি?

যেই হোক, গুড়গুড়িয়া আজ আর কাউকে ছাড়ছে না,—জলটুকু খাক না'লে যুজবে কী করে?

কইমতলে বসেই মনে মনে বিন্দার সারা শরীরে হাত চালাচ্ছে গুড়গুড়িয়া।

ভাল লাগচে ত?

তোমার তুল্য পুরুষ আমার অঙ্গে হাত দিল, ভাল তো লাগবেই।

কি র'ম্ম ভাল?

ভাল, যেন তোমার অব্রুতো।

খুশি হয়ে উঠছিল গুড়গুড়িয়া, আচমকা দেপে বসে গেল, একটা গুছিপোকা বড় সুস্থির গতিতে হাঁটু অব্দি উঠে এসেছে, ফেলে দিল।

আর তারপরেই দেখল, জঙ্গল ফুঁড়ে এক বুড়ি তার দুহাতে শুকনো ঝাঁটি টানতে টানতে খালধারে,—একদম তেষ্টাকাতর জীবটার কাছাকাছি এসে গেল।

বিন্দাদুতি বলল, কি'রম ঠাণ্ডা জল, আর জরিয়ার মা, খাবি ত।

গুড়গুড়িয়া আরো বলল, লবকেশরপুরের হাটুয়ারাও হতে পারে।

ই বাবা ইয়ে ধম্মের গাছ, কাটতেও মায়া লাগল নাই?

নাই, নাই।

মাথায় হাত দিয়ে বসল রাইবু। বলল, এখন কী গতিক হবে?

কাহার?

কেনে তপুবনের। ই যে বড় অধম্মের কাজ হৈল রে গুড়গুড়ে!

আর ধম্ম-অধম্ম!

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে গুড়গুড়িয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রাইবু। থুতনির ঠিক মাঝখানটায় কাঁচা-পাকা চুরুক দাড়ি। রাইবুর মনে হল সময় সময় ঠিক মুরুব্বির মতোই কথা বলে গুড়গুড়িয়া। এই এখন যেমন বলল, আর ধম্ম-অধম্ম—

ধম্ম-অধম্ম আছে বৈ কি গুড়গুড়ে। না'লে এ-দুনিয়া চলত? চলত নাই। এতদিনকে উল্টাঁই যাইত।

আর তারপর গুড়গুড়িয়ার হাত ধরে বলল, চ তবে।

ফের দৌড়। দৌড়, দৌড়।

এতক্ষণে সেই পাখিটাও আর নেই। এ-তল্লাটে তার ডাক আর শোনা যাচ্ছে না। কে জানে উড়ে গেছে কোথায় কোনদিকে। আবার হয়তো ঘুরে আসবে এদিকে।

রাইবুর মনটাও এতক্ষণে হাল্কা হাল্কা।

তেল্লি বহে চলেছে সীতানালা। সীতানালা পেরিয়ে আশ্রমে যেতে চাও এক নদী পার হও সতেরবার।

এ-টিলা পেরিয়ে সে-টিলা, এ-হুড়ি পেরিয়ে সে-হুড়ি, এ-ডুংরি পেরিয়ে সে-ডুংরি, এ-ডুব্‌কা তো সে-ডুব্‌কা, এ-বন থেকে সে-বন, মাঝে নদী, নদী সীতানালা।

সীতানালা, সীতানালা।

নদীজলের নিচে হাঁসা-পাথরের মেলা, জলের ভিতর দিয়েও পাথরের ঝকমকানি ঠিকরে পড়ছে। সোমবারি থাকলে, খালের জলে নেমে পড়ে গোল গোল পাথর খুঁজত, হাঁসা পাথর।

গোল গোল, ঠিক ডিমের মতো। কত যে ডিম-পাথর কুড়িয়ে রেখেছে সোমবারি! কাম্‌হারপাড়ায় কুম্‌হারপাড়ায় সে-পাথর এখনও বিক্রি করে লোধা-বউড়ী-ঝিউড়ীরা। সে-পাথরকে তুলসিতলায় পেতে শিবজ্ঞানে পূজা করে মাহাতোরা কাম্‌হাররা। আর কুম্‌হাররা তো গোল গোল ডিমের মতো হাঁসাপাথরের গায়ে ফুটো করে চাকে লাগিয়ে হাঁড়ি 'উলে' কুঁদা 'উলে'।

এখন রট্ রট্ করে হাঁসাপাথরের উপর পা মাড়িয়ে মাড়িয়ে সীতানালা খাল পেরুল রাইবু আর গুড়গুড়িয়া।

একজন ঢ্যাঙা, আর একজন বেঁটে-বামন। খাল পেরিয়ে এখন চলেছে দক্ষিণ মুখো, চলেছে লাটা-পাটা ভেঙে, দৌড়ুতে দৌড়ুতে।

লব-কুশ হওয়ার আগে পোয়াতি সীতামাঈ যেখানে গায়ে 'হুড়িদ' মেখে স্নান করেছিল তার গা-ধোওয়া 'হুড়িদ-জল' যেখানে এখনও আছে, এখনও আছে, এখনও আছে, এখনও আছে যেখানে শাল-দাঁতনকাঠি দিয়ে দাঁত মেজে স্নানের আগে দাঁতন কাঠি দুভাগে চিরে জিভ ছুলে ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেই ছুঁড়ে-ফেলা জিভ-ছুলা থেকে জন্ম নেওয়া দু-দুটো শালগাছ এখনও

আছে, এখনও আছে, এখনও আছে। কিন্তু সীতাধুনির পাশের গাছটা? যেখানে স্নান সেরে তাপ পুইয়েছিল সীতা, সেই গাছটা, নেই নেই—

রাইবু-গুড়গুড়িয়া পৌঁছে দেখল, সব কাবার, কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে ঠাকুরগাছটা।

কাটা গুঁড়িটাকেই বুকে হাত ঠেকিয়ে নমো করল রাইবু। তার দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও।

আর তারপর গুড়গুড়িয়ার হাত ধরে রাইবু বলল, চ।

ফের দৌড়। দৌড়, দৌড়।

আগে আগে রাইবু, পিছনে গুড়গুড়িয়া। জানতে নেই কোথায় যাচ্ছে, জানাতেও নেই কোথায় যেতে হবে। শুধু যাওয়া আর যাওয়া। দৌড় আর দৌড়।

এখন কোথায় বা যাবে রাইবু? পাঁচকাহিনা কী চাঁদাবিলা গিয়ে খবর দেবে নরসিঙাকে? নাকি কে বা কারা ঠাকুরগাছ কেটে ফেলেছে তার সুলুক-সন্ধান নিয়ে বামালসুদ্ধ ধরিয়ে দেবে তাকে? তাদেরকে?

বড় দো-টানায় পড়ে আছে রাইবু। সে কোন্ দিকে যাবে? উত্তরে যাবে না দক্ষিণে?

এদিকে শিশুবালা একমনে পাল্হা-পতর টানছিল-টুনছিল। রাইবু নেই, ধারে কাছে নেই। কোথায় বা আর যাবে লোকটা? এই বনের অলি-গলি অন্ধি-সন্ধি তো তার জানা।

জানা, জানা।

খালি 'পাখ'টার ভ্রমে তো এ-দিক সে-দিক যাওয়া। ভ্রম, ঐ ভ্রমই। মনের ভরম কেটে গেলে ঘরের মানুষ আবার ঠিক ঘরে আসবে।

সময় সময় একটা ভাবনা আজকাল ঘিরে ধরে শিশুবালাকে। মোটে দুটি তো মানুষ। আরেকটা মেয়েমানুষ সঙ্গে ছিল, সে-ও তো হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

কোথায় যে গেল সোমবারি! লোধাকাটার বচ্ছর লোকগুলো কী কেটে ফেলল তাকে? নাকি কেউ হাত ধরে নিয়ে পালালো? যেমন ছিল্‌ছিলে শরীর!

পালিয়ে যায় যদি তো ঠিক একদিন ফিরে আসবে, আসবেই আসবে। এই বনের টানে, তার ভাইয়ের টানে। আজকে হোক কাল হোক।

আর না আসে যদি তো এই শেষ। রাইবুর বংশ নিরবংশ। কুলে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না।

লাটা-পাটার মাঝে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে শিশুবালা ভাবছে, ভাবছে আর মাথা থেকে হাত দিয়ে বেছে বেছে একটা-দুটো পাকা চুল তুলে ফেলছে।

ঝোপে-ঝাড়ে লাটায়-পাটায় এখন পাখি কঁহরাচ্ছে। কপ্‌তি কয়ের। গুঁড়ুর ডাকছে। হুপ্ হুপ্ করে কোথাও কি, হয়তো খোদ হনুমানচৌকিতেই, হনুমান ডেকে উঠছে থেকে থেকেই।

আজকাল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পায়ে-হাঁটা রাস্তায় আর তেমন লোকজন চলা-ফেরা করে না, এক লোধাজনমানুষ ছাড়া। আগে আগে রাত-ভিতেও লোকজন যেত আসত, এখন আর আসে না। নাকি জঙ্গলে এলেই লোধারা জামাজুতা পোঁটলাপুঁটলি ছাড়িয়ে নেয়, সব নিয়ে নাঙ্গা করে ছেড়ে দেয়।

যত্তসব বাজে কথা, ঝুট কথা। কে না কী করে, অজাত-কুজাত, আর দোষ হয় ভোখলা-দুখলা লোধাদের। বলতে হয় বলা, বলতে তো আর মুখে ফোস্‌কা পড়ে না।

শিশুবালা ভাবে, এই তো কদিন আগে লোধাপাড়ায় এসেছিল এক দঙ্গল হাটুয়া-ছুয়া, ইস্কুল ছুয়া। ফটো খিঁচার যন্তর নিয়ে। কই রাইবু-গুরভা-গুড়খা-শরাবণ-গুড়গুড়িয়ারা তো তাদের সবকিছু 'ছিনায় লেয় নাই?' শুধুমুদু দোষ দিলে হবে?

ফের উঠে ডালা-পাল্‌হা পাল্‌হা-পতর টানতে লাগল ছিঁড়তে লাগল শিশুবালা। আলুতুণ্ডার লত্ দেখতে পায় যদি তো বেশ হয়।

কতদিন সয়া-সয়ানির সঙ্গেও তার দেখা নেই। সময় সময় সয়া-সয়ানিও তো জঙ্গলে আসে। হাঁড়ি পুড়াবার পুআন দেয়ার কাঠ-পাল্‌হা জোগাড় করতে। যদি দেখা হয়ে যায় ফট্ করে? হয় যদি তো বেশ হয়—

শিশুবালা ভেবে রাখল, সয়ার কাছে একটা হাঁড়ি একটা খলা একটা ত্যালান চেয়ে রাখবে।

ধারে-কাছে কোথাও কী একটা নড়ে উঠল? কী আর হবে, বড়জোর ভুঁড়াশিয়াল। কালিঝুলি মেখে খালধারে খণ্ডা-বণ্ডা শিকারে যাচ্ছে।

ডর-ভয় নেই শিশুবালার, মাতব্বর রাইবুলোধার বউ সে। বেধুয়া রাঁড়ি ফুলটুসির 'সে ত সেই গো, তার কুনো বাখান নাই' 'তাকেই ত ডর'—তাকে ভয় করার সেই বয়সটা কী আর আছে? নেই, নেই। সেই বয়সটাও নেই, সেই ডর-ভয়টাও নেই।

আসুক সে, কাঁধদুটো চেপে ধরুক, তার যা ইচ্ছা করুক। কী একটা আরো জোরে নড়ে উঠতেই শরীরের খাটো শাড়িটা আরো খাটো করে শিশুবালা রুখে দাঁড়ালো, আয়, আয় রে বাপের বেটা নিরবংশা আয়!

কেউ আসে না, কেউই না।

গাড়ির 'লিক' বরাবর যাওয়াই মনস্থ করল রাইবু। কাঠ-চোরেরা গাছ কেটে গরুর গাড়িতে বোঝাই করে এ-পথেই গেছে, মাটিতে চাকার দাগ। তাই তো গাড়ির 'লিক' বরাবর যাওয়া।

'লিক' বরাবর, 'লিক' বরাবর।

যেতে যেতে গাড়ির 'লিক' ধুয়ে যাচ্ছে সীতানালায়, হারিয়ে যাচ্ছে। ফের ওপাশে মাটিতে ফুটে উঠছে চাকার দাগ।

দাগটা গেছে তাড়কারাক্ষসীর হাড়ের পাশ দিয়ে। তেঁতুলতলা আমতলা হয়ে কুম্‌হারপাড়া কাম্‌হারপাড়ার দিকে।

তবে কি কুম্‌হাররা? মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে রাইবু, ধর্মের গাছে হাত দেবে না কুম্‌হাররা। তাদের চাক-চকটবাড়ি আছে, বিশ্বকর্মা আছে।

এ-কাজ নির্ঘাত হাটুয়াদের। লবকেশরপুর-হাতিবাঁধি-আঁধারি-কুস্তড়িয়ার হাটুয়ারাই।

একবার শালাদের ধত্তে পাল্লে—

হুঙ্কার দিয়ে উঠে গুড়গুড়িয়া।

ধত্তে পাল্লে কী? রাইবু তাকে জিজ্ঞাসা করে।

হুঙ্কার দিয়ে যতটা উঠেছিল ঠিক ততটাই দেপে বসে গেল গুড়গুড়িয়া। বলল, হঁ তাই ত, ধত্তে পাল্লে কী? তারপর নিজে নিজেই বলল, কী আর, ধত্তে পাল্লে দিব-অ শালাকে তুলে খোদ নরসিঙার হাতে।

হঁ নরসিঙা—

খানিক থেমে রাইবু বলল, তার পিছ্কে হাটুয়ারা বলুক, ঐ শালা খচড়া লোধারাই— লোধারাই লাগান-ভাঙান করেছে। তারপর যত 'আক্রস' আমাদের উপ্‌রে।

তব্বে?

তব্বে আর কী, আগ্‌গে তো দেখি কুন শালা চোর। এই কদ্দিন আগে লুয়াসাহীর হরিশা দঁড়পাটের ভাতুয়াকে ধরে বেন্ধে বেড়ে ঠ্যাঙান ঠ্যাঙিয়েছে নরসিঙা। খালি কি ঠ্যাঙানি, ধরে-বেন্ধে চালানও করে দিয়েছে হাজতে, ঝাড়গাঁয়।

'ফুঃ' করে মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ তুলল জেল-খাটা গুড়গুড়িয়া। বলল, উসব চালান-ফালান ছাড়-অ—

বলতে না বলতেই তাকে দাবড়ে দিল রাইবু, তুই থাম বে গুড়গুড়ে!

থতমত খেয়ে থেমে গেল গুড়গুড়িয়া। আচমকা রাইবু কান খাড়া করে কী যেন শুনছে, কী যেন! ফের সেই 'পাখি'টার ডাক? টি-উ-ল টু-টু?

উঁ-হু, কান খাড়া করে রাইবু শুনছে, ঝোপ-ঝাড় লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে কারা যেন লুকিয়ে-চুরিয়ে হাঁটছে থুপ থুপ, কথা বলছে ফিস্ ফিস্—

কারা কারা?

কারা আবার, ঐ কাঠচোরেরা। কাঠচোর কী শুধু লোধারা? কাঠচোর এখন শ'য়ে শ'য়ে। কাম্হাররা মাহাতো-ভুঁইয়া-ভূমিজ-হাটুয়ারাও।—তবু শালা চোর ধস্তে লোধাপাড়া?

রাস্তার দুধারে স্থানে স্থানে ফাঁকা, টিকরোল ভুঁই। ফাঁকা টিকরোল ভুঁইয়ের সীমানায় আঁটারি-চুরচুর গা ঘেঁষে পড়াশঝাঁটির বন।

রাইবুর চোখ আঁটারি-চুরচু'তেও নেই, পড়াশঝাঁটিতেও নেই। তার মন এখন পড়ে আছে গাড়ির 'লিকে'।

কিন্তু গাড়ির 'লিক' এসে হারিয়ে গেল তে-মাথানীতে। তে মাথানীতে একটা রাস্তা গেছে পাথরডহরার দিকে, একটা কাম্হারপাড়া-কুম্হারপাড়ার দিকে আরেকটা সোজা চলে গেছে বিরিবাড়িয়া হয়ে রামেশ্বরের দিকে।

গাড়ির 'লিক' তো গেছে তিনদিকে তিনটা। তিনটা, তিনটা। গরুর গাড়ির মুখপাতের ফিতা বাড়তে বাড়তে রামেশ্বর পেরিয়ে নদী পেরিয়ে রগড়া-পেটবিন্ধি-পদিমা পেরিয়ে কতদূর যে গেছে!

কোথায় কোন্‌দিকে আর কতদূর যে যাবে রাইবু! সে তে-মাথানীতে দাঁড়িয়ে 'যন্তর' বের করে তিনদিকেই তাক করে মুতে দিল ছর্‌ছর্ করে। তার দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও।

গুড়গুড়িয়া?

হুঁউ বল-অ।

বলচি ই-ভাবে যাবাই সার, চোর কী আর ধরা পড়বে?

গুড়গুড়িয়া 'থকে' গিয়েছে। সে বলল, আমার তো একেই কথা, হাঁটতে হাঁটতে গোড় ব্যথা।

এতক্ষণে রাইবুর মনে পড়ল শিশুবালাকে। বলল, শিশোকেও ফেলে এস্‌চি করণতলে খালধারে—

মনে-মন সেখানে যাবার বাসনা চাগিয়ে উঠল গুড়গুড়িয়ার। ওস্তাদের হলবলি বউ। বলল, জঙ্গলে মাত্বরের বহুর আবার ডর ভয়? বাঘও নাই ভালুকও নাই।

তার থিক্যেও বড় একজনা আছে রে গুড়গুড়ে।

কে সে?

নরসিঙ্গা, নরসিঙ্গা।

হঠাৎ কী হল, খুব জোর চেঁচিয়ে উঠল গুড়গুড়িয়া। চেঁচাচ্ছে আর লাফাচ্ছে, লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে।

তাকে থামাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না রাইবু। চড়-চাপড় দিয়ে কী থামাতে হবে গুড়গুড়িয়াকে? এই গুড়গুড়ে থাম। থাম বে! অত্ত হরি করার কী হৈল? বলবি ত?

লাফাতে লাফাতে গুড়গুড়িয়া বলল, ম্যাত্বরের বহুর আর ল্যাওড়া করবে নরসিঙ্গা, হাই দেখ-অ। নরসিঙ্গা ত শুয়ে আছে হেথা।

কী বললি? নরসিঙা হেথা?

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল গুড়গুড়িয়া, নিজের চইখেই দেখ-অ না!

গুড়গুড়িয়ার 'হুরি' আর থামছে না। হুরি করে যাচ্ছে গুড়গুড়িয়া।

রাইবু তো থ। শুয়ে আছে নরসিঙা? ঘুমিয়ে আছে? না মরে গিয়েছে? মরে গিয়েছে নাকি মরার ভান করে পড়ে আছে? কাছে গেলেই জ্যান্ত হয়ে ঘ্যাঁক করে ধরে ফেলবে নরসিঙা?

রাইবু-গুড়গুড়িয়া কিন্তু ধারে-কাছে ঘেঁষছে না। দূর থেকেই দেখছে, নড়ছে কি? নড়ছে না। মাল খেয়ে পড়ে আছে কি? একের নম্বর মাতাল তো নরসিঙা।

রাইবু-গুড়গুড়িয়া একের পর এক নুড়িপাথর তুলে নরসিঙাকে তাক করে মারতে লাগল। আসলে পরখ করে দেখতে চাইল, জেগে আছে কী জেগে নেই, বেঁচে আছে কী বেঁচে নেই।

একটার পর একটা ঢিল ছুঁড়েও নরসিঙাকে জাগাতে পারল না রাইবু-গুড়গুড়িয়া। যত না লাগছে ততই আরো মরীয়া হয়ে ঢিল ছুঁড়ছে রাইবু-গুড়গুড়িয়া।

ঢিল ছুঁড়ছে, ঢিল ছুঁড়ছে।

এই ছুঁড়ল একটা, এটা রাইবুর, লাগল না। তো এবার আরো মরীয়া হয়ে আরেকটা ছুঁড়ল, এটা গুড়গুড়িয়ার, লাগল না। একবার রাইবু তো একবার গুড়গুড়িয়া—

আর তারপর তাদের খেয়াল হল, এত ঢিল ছুঁড়েও তারা জাগাতে পারল না নরসিঙাকে। তবে কি মরেই গেছে লোকটা?

নরসিঙা মরে গেছে—একথা ভাবতেও পারছে না রাইবু। এত বড় একটা লোক। এত 'ভুখেল' যার দাপট—সে কী না পড়াশঝাটির বনে এম্নি মরে পড়ে থাকবে? এম্নি এম্নি? এত সহজে হেরে মরে যাবে সে? হেরে 'পাহুড়' হয়ে যাবে নরসিঙা?

এ কী আসল নরসিঙা, না নকল?

ভাবছে, ভাবছে, আর একটু একটু করে নরসিঙার দিকে এগুচ্ছে রাইবু, এগুচ্ছে গুড়গুড়িয়া।

ডাল-পাল্হার আড়ালে 'লহু'তে মাখামাখি পড়ে আছে নরসিঙা। মুখের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে গল্ গল্। কে বা কারা বুড়িয়ার ঘা মেরে গেছে নরসিঙাকে।

রাইবু সন্তর্পণে কাছে গিয়ে নাকের ডগায় হাত রেখে দেখল, না শ্বাস আছে, দেহে এখনও তাপ আছে।

বেঁচে আছে, বেঁচে আছে নরসিঙা!

কিন্তু এখন কী করবে রাইবু-গুড়গুড়িয়া? ফেলে যাবে তাকে? একটু একটু করে এই টাঁড়-টিকরে মরে যাবে নরসিঙা?

যাক, মরে যাক। মরুক মরুক!

পরক্ষণেই রাইবু ভাবল, ধুস! কী সব ভাবছে। হাজার হোক মানুষ তো। গুড়গুড়িয়াকে বলল, জীবন বড়ই ধন রে গুড়গুড়ে! সেই বলে নাই—

আংটি-ভাঙা পিতল-ভাঙা স-বই জুড়া যায়।
মানুষ মরিলে দাদা নাই গ' জুড়া যায়।

মানুষটা ত এখ্‌ন মরেও নাই, যদি বাঁচে, বাঁচাতে দোষ নাই। চ, দেখি।

কিন্তু কী করবে তারা? এই জঙ্গলে কী-ই বা তাদের করার আছে,—এক জড়িবটি ছাড়া? আর নয়ত গজনার কাছে গেলে হয়, গজনা—

নাকি কাঁধে করে নিয়ে যাবে নরসিঙাকে কোনো 'ডাগতরখানায়'? যেতে যেতে যদি কাঁধেই মরে যায় লোকটা? লোকে বলবে, মেরে দিয়েছে এই রাইবু-গুড়গুড়িয়াই।

বলে বলুক, বলুক। তবু ত—

রাইবু-গুড়গুড়িয়া নরসিঙার দেহের পাশে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকল। বসে থাকল, বসে থাকল। যেন তাদের দেহের ওম দিয়েই লোকটাকে বাঁচিয়ে তুলবে তারা।

বাঁচে বাঁচুক, বাঁচুক।

গুড়গুড়িয়া!

হুঁউ বল-অ।

বলচি চ্যাঙ-দোলা করে লিয়ে যাই চ।

কুথাকে মাত্‌বর?

কুথাকে আবার, ডাগতরখানা।

মাতব্বরের দিকে জুল্‌জুল্‌ চোখে চেয়ে থাকে গুড়গুড়িয়া, তার বিশ্বাস হয় না। পরম শত্রুকে হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দেবে রাইবু? বেকসুর খালাস করে দেবে নরসিঙাকে?

সময় নেই অসময় নেই যে-নরসিঙা তার জোড়া গামবুটে লোধাদের পাতার কুঁড়িয়ায় টিস্‌ টিস্‌ করে লাথি মারে, ভেঙে ফেলার হুমকি দেয়, ভাতের হাঁড়ি জলের কলসি বাড়ি মেরে ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে দেয়, তাকে দিজের 'হাবড়ে' পেয়েও ঘাড়-গলা মুচড়ে ধরবে না রাইবু? 'পুলটিশ' মারছে না তো মাতব্বর? গুড়গুড়িয়ার মন বুঝতে চাইছে না তো রাইবু?

গুড়গুড়িয়া দুম করে বলে ফেলে, উ ঢ্যাম্‌নাকে ফের বাঁচাচ্ছ মাত্‌বর? বল্‌-অ যদি তো বুড়িয়ায় আরো দু'ঘা দিয়ে দিই?

খানিক চুপ মেরে থাকে রাইবু, রাগে, রাগে। পরমুহূর্তেই ফেটে পড়ে বলে, গুড়গুড়িয়া!

ন্নাই-ন-ই-অ।

নড়ে চড়ে বসে গুড়গুড়িয়া, পিট্‌ পিট্‌ করে তাকায়, কাঠিখুঁচি দিয়ে মাটিতে 'এঁচেড় বেঁচেড়' কাটে, আর ঘাড় তোলে না।

রাইবু অতঃপর জল হয়ে বলে, উর'ম বলতে নাই বে গুড়গুড়ে, মরা মানুষকে বাঁচাতে পাল্লে বহুত পুণ্য।

উর'ম পুণ্যে মুতে দিই, মনে-মন বলতে বলতে গুড়গুড়িয়া উঠে গেল, নরসিঙার দিকে পিছন করে পড়াশঝাঁটির বনে দাঁড়িয়ে সত্যি সত্যি 'পিসাব' করল।

রাইবু হুকুম দিল মাত্‌বরের গলায়, একটা খাটিয়া আন বে গুড়গুড়িয়া, জলদি! খাটিয়ায় শুয়াঁয় লিয়ে যাবাই ত ভাল। মাহাতোপাড়ার উদিকে যা, দ্যাক্‌-ন-মার একটা খাটিয়া পাস কি নাই।

দৌড়ুল গুড়গুড়িয়া, দৌড়ুল। মাহাতোপাড়ার ওদিকে গেল না, লোধাবস্তির দিকেও না। গেল পাথরডহরার দিকে।

লোধাবস্তিতে শবর-ঘুপচিতে আর খাটিয়া কোথায় পাবে? খাটিয়া-তক্তপোশ কারুর আছে নাকি? নেই নেই। সব তো ভুঁয়ে গড়াগড়ি, ঘন্টাঘন্টি।

এক পায়ে ছেঁড়া-ফাটা টায়ারের চটি, আরেক পায়ে হপ্‌হপে গামবুট—গুড়গুড়িয়া দৌড়ুল। দৌড়, দৌড়।

পাথরডহরায় গিয়ে গাঁয়ের লোকের কাছে চাইলেই কী আর খাটিয়া পাওয়া যাবে?—ই-অ অত গুড় আধসের নাই! চুরি কত্তে হবে, চুরি। আবার আনবার বেলায় ধরা পড়লেও সবকিছু মাট্টি!

ঝোপ-ঝাড় ফেড়ে পাথরডহরার কাছে গুড়গুড়িয়া তো উলুক ঝুলুক করে। জঙ্গলের ভিতর গ্রাম, লাটা-পাটার ধারেই ঘরবাড়ি। এখন দুপুর গড়িয়ে আড়বেলা। চোত্‌-বোশেখের মাস।

যে যার কাজ-কামে গেছে। যে-দু'একজন আছে বউড়ী-ঝিউড়ীরা—তাদের ভিতর কেউ কেউ চুঁয়াতলে 'সিনাচ্ছে', আর কেউ রাঁধাশালে।

খলায়-খামারে পাতা বাবুইদড়ির খাটিয়াগুলো সকাল থেকেই রোদ খাচ্ছিল, 'উড়িশ' মারার জন্য। 'উড়িশ' তার মানে ছারপোকা। এখন সব দাঁড়-করানো ছাঁচতলে সার সার।

গুড়গুড়িয়া কতদিন দেখেছে, কী পুরুষ কী বউড়ী-ঝিউড়ীরা কাজে-অকাজে খলায় এসে খরায় তাতা খাটিয়ার বাজু ধরে আছাড় মারছে আর পিল পিল করে অজস্র 'উড়িশ' চারধারে ছড়িয়ে পড়ছে। আর তারপর তো পায়ের বুড়ো আঙুল টিপে টিপে 'উড়িশ' মারা—

গুড়গুড়িয়া এখন চুরুক-দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে আর ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের টিপনি টিপে 'উড়িশ' মারার ভঙ্গি করছে।

ছায়া-ছাঁয়রায় খুকড়াগুলো চুপটি করে বসে আছে। কুকুরগুলো গরমে জিভ বের করে হ্যাল্ হ্যাল্ করছে, ধুঁকছে, লালা গড়িয়ে পড়ছে তাদের জিভ থেকে, মুখ থেকে।

গুড়গুড়িয়া লাটা-পাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে খানিক জিভ বের করে কুকুরের মতো হ্যাল্ হ্যাল্-ও করল।

চোত-বোশেখের খরা, সব তো ঢুকে বসে আছে ঘরের ভিতর। একটা-দুটো 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুম' যা গোহালঘরে বাহিরঘরে 'ঘর-ঘর' খেলছে। বালিতে কাঠি গুঁজে লুক-লুকানি খেলছে।

তারাও না, তারাও না—খাটিয়া ধরে টানতে গেলেই ঝামেলা পাকাবে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ঐ খুকড়াগুলো, কুকুরগুলো। 'কট্ কট্ কটাশ', 'কট্ কট্ কটাশ' করে এমন চিল-চিৎকার জুড়ে শূন্যে উড়তে থাকবে, ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে আসবে যেন তাদেরই বাপত্তি-সম্পত্তি হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে গুড়গুড়িয়া।

গুড়গুড়িয়া একদলা 'ছেপ' ফেলল নিঃশব্দে।

কী আর জিনিস, মোটে তো একটা খাটিয়া বাবুইদড়ির? তাও কী নিজের জন্য? সব তো নরসিঙার।

নরসিঙা, নরসিঙা।

এ-গাঁ সে-গাঁ এ-কুল্হি সে-কুল্হির ভিতর দিয়ে যেতে-আসতে গুড়গুড়িয়া কতদিন দেখেছে—চারপায়ার এদিকে-ওদিকে দুজনে বসে বাবুইদড়ির ফাঁস লাগিয়ে লাগিয়ে গিরা এঁটে এঁটে 'খাট' বুনছে।

খাট বুনছে আর বুঁদ হয়ে গল্প করছে। খাট বুনছে আর বুঁদ হয়ে গল্প করছে। কত গল্প কত কথা। কী কথা? না, ব্যাঙের মাথা—

গুড়গুড়িয়া কী আর মনে-মন ভাবেনি? ভেবেছে, ভেবেছে। অমনি একটা চারপায়া তৈরি করবে কাঠ দিয়ে। সে তো তারা করেই, বনের কাঠ কেটে খাটের পায়া বাজু তৈরি করে তারাই তো কাম্হার-কুম্হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-মাহাতোদের হাটুয়াদের গাঁয়ে গিয়ে বিক্রি করে।

যে করে করুক, আজ হোক কাল হোক গুড়গুড়িয়া নিজের জন্য একটা বুনবে, চারপায়ার এধারে বসবে সে, ওধারে বসবে মাতব্বর। মাতব্বরের ওধারটা পছন্দ না হয় যদি তো মাতব্বর এধারে আসুক, সে উঠে যাবে ওধারে।

তারপর চারপায়ার পা তুলে তুলে বাবুইদড়ি গলিয়ে নিজের হাতের দড়ি মাতব্বরকে দিয়ে, মাতব্বরের হাতের দড়ি নিজে নিয়ে চার আঙুল ছ'আঙুল চারকড়া ছ'কড়ার ফাঁস দিয়ে গিরা এঁটে এঁটে চার-পুখুরি আট-পুখুরির ঘর তুলে গুড়গুড়িয়া খাট বুনবে।

মাঝে মাঝে খাট বুনবার ফাঁক-তালে ঘুপচীর দিকে মুখ তুলে সে হাঁক পাড়বে, কাই গেল্হে? মাত্বরকে বিঁড়ি-তামুক দেও।

বিড়ি-তামুক দেয়ার অছিলায় খলায়-খামারে যে এসে দাঁড়াবে, সে সোমবারি। সোমবারি, সোমবারি। আর কী তখন সে বলবে, অমন চোখ তোর গেলে দিব-অ রে নিরবংশা?

মনে-মন হাসতে হাসতে কুটি কুটি হয়ে গেল গুড়গুড়িয়া, হাসছে। হাসতে হাসতেই দেখল, মাহাতোদের একটা খাটিয়া বাইরের কলসির কাছে লাউমাচাতে ঝুলছে।

আর ধারেকাছে কেউ নেই। একটা খুকড়াও না কুকুরও না। ধাঁই করে খাটিয়াটা নিয়ে জঙ্গলের ভিতর নিমেষে ঢুকে এল গুড়গুড়িয়া।

আয়, আয়! এখ্‌ন শ্বাস আছে। সেই বলে নাই—"যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ?"

দুজনে ধরাধরি করে নরসিঙাকে খাটিয়াতে তুলল রাইবু-গুড়গুড়িয়া। রাইবু-গুড়গুড়িয়ার কাঁধে চড়ে এখন নরসিঙা যাচ্ছে চাঁদাবিলা।

মরামানুষের মতো নরসিঙার মাথাটা বাবুইদড়ির খাটিয়ায় শুয়ে নড় নড় করে নড়ছে। মাথার চুলে-রক্তে 'চিট' ধরেছে, মুখের কষ বেয়ে শুকনো রক্তের দাগ। আঘাত নির্ঘাত ঘিলুতে, মাথার ব্রহ্মতালুতে।

কখনো বা দৌড়ুচ্ছে রাইবু-গুড়গুড়িয়ারা, কখনো ঢিমে-তালে হাঁটছে। যাহোক করে বাঁচাতেই হবে নরসিঙাকে, যেন-তেন।

জল্‌দি, জল্‌দি বে গুড়গুড়িয়া! থেকে থেকে বলে ওঠে রাইবু।

গুড়গুড়িয়া হুঁ-কার দেয়, হুঁ-অ।

তারপরই হাঁটার গতি বাড়াতে থাকে, বাড়াতে থাকে। মরণপণ করে নরসিঙার খাটিয়া কাঁধে রাইবু-গুড়গুড়িয়া দৌড়ুচ্ছে।

দৌড়, দৌড়। জঙ্গলে জঙ্গলে লাটায়-পাটায়। সচরাচর 'জনমাড়ষের' রাস্তায় বাখুলের কুল্‌হি-রাস্তায় দিনমানে তারা তো হাঁটে না। তারা হাঁটছে বনরাস্তায়, লোধাঝোড়-ভালুকঝোড়-বাগালঝোড়ের ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে, শর্টকাট।

চাঁদাবিলা হেল্‌থ সেন্টারে পৌঁছুনোর মুখে তারা ভেবেছিল বৈ কি, খাটিয়াসুদ্ধ নরসিঙাকে ফেলে পালাবে?

যদি না পালায়, যদি বামালসুদ্ধ হাতেনাতে ধরে ফেলে লোকগুলো, যদি ভাবে রাইবু-গুড়গুড়িয়াই মেরে তাকে আবার হাসপাতেলে দিতে এসেছে, তখন হাতে পড়ে যায় যদি হাতকড়া? হ্যান্ড-কাপ?

তব্বে? তার বেলা?

তার চাইতে চ পালা!

হাসপাতালের বারান্দায় চুপিসাড়ে খাটিয়া রেখেই দৌড়ে পালাচ্ছিল রাইবু-গুড়গুড়িয়া।

গুড়গুড়িয়া তো চলে গিয়েছিল অনেকটাই। আনতে আনতেই সে ভেবেছিল, দি-ই 'থস্‌ড়ায়েঁ? হাত দুটো ছেড়ে দিলেই তো নরসিঙা আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে, আর দুম্‌ করে মরে যাবে সে?

রাইবু তখনও ভাবছিল, যাবে কী যাবে না, একটা রুগী মানুষকে হাসপাতালে 'চিহ্নত্‌' না দিয়েই ভেগে যাগে মাত্‌বরের মাত্‌বর রাইবুলোধা?

কব্‌ভি নাহি। রাইবু ডাকল গুড়গুড়িয়াকে, আব্বে আয় ন আয়। পালাচ্ছিস কেনে? কী দোষ কল্লি যে পালাবি?

দোনোমোনো করে গুড়গুড়িয়া এল। তক্ষণে হেল্‌থ-সেন্টারের ডাক্তাররাও এসে গেল। ওষুধ, ইন্‌জেক্‌সান, ছোটাছুটি। বীট অফিসার এল চাঁদাবিলার, পাঁচকাহিনার। গিড় গিড় করে গাড়ি ছুটল এদিক-সেদিক।

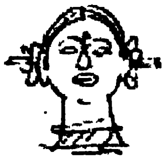
রাইবু-গুড়গুড়িয়া হাতজোড় করে সবার কাছেই যতটা বলা যায় বলল। কী জানি কেন বাবুরা তো এক কথাতেই বিশ্বাস করল। হুঁ-হ্যাঁ করল, মাথা-টাথা নাড়ল। কত কী বলল, কতবার যে ধন্য ধন্য করল!

পাঁচকাহিনার বীটবাবু যেচে এসে পিঠ-থাপড়ে বলল, তাই তো, তোরা না থাকলে এ যাত্রায় নৃসিংহবাবুকে বাঁচানো যেত না। ঠিক সময়েই নিয়ে এসেছিস। ঝামেলা মিটে গেলে একদিন আসিস, তোদের দু'জনকে বকশিস্ করব।

—এই 'পরথম', এ-ই প-র-থ-ম, অন্তত আমার দ্যাখ্‌তা 'বাবুলকরা' লদ্ধাদের, হুঁ-অ লদ্ধাদের ভালো বলল, ভাল্ল, খুবেই ভালো।

গুড়গুড়িয়াকে চিমটে কেটে রাইবু বলল ফিস্ ফিস্ করে, দেখলি ত?

গোঁয়ারগোবিন্দ গুড়গুড়িয়া, গায়ের চামড়া যেন 'কাড়া-চামড়া'। গোধুতের মতো বসে থেকে মুখ দিয়ে না-তার নাক দিয়ে উত্তর করল, হুঁ-অ।



দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে বড়ামথানে 'নম্‌থম্' হয়ে পড়ে গেল রাইবু-গুড়গুড়িয়া। দণ্ডবৎ করল। একবার নয় দুবার নয়, বারবার। এখনও করছে।

রাইবুই বেশি বেশি। তার দেখাদেখি গুড়গুড়িয়াও।

সমগ্র লোধাপাড়া জড়ো হয়ে গেল বড়ামথানে। রাইবু-গুড়গুড়িয়ার দণ্ডবৎ করার এত কেন ধুম্? কোনো অকাজ-কুকাজ করে এসেছে দুজনে? চুরি-টুরি? খুন-খারাপি?

গুড়ভা-গুড়কুঁদা-গুড়খা-শরাবণ-শত্রুঘ্ন-লছু-চামটু—সব একে একে হাজির। মজা দেখতে কী আর আসেনি ভুবনার বউ ফুলটুসি? নিয়তি-ঢালো-আদরি? চ্যাঙ্গনা-ম্যাঙ্গনা সুরুয়া-হাড়িয়া-বড়কই-টুরা-ফুলেশ্বর, কে না এসেছে? বড়ামথানে এতদিন বাদে আজ নির্ঘাত একটা কিছু হবে।

হবে, হবে।

কী হবে ব, কী?

মুচ্ছব।

রাইবু-গুড়গুড়িয়ার কী হবে?

মুচ্ছব।

খালি মুচ্ছব মুচ্ছব, খালি তোদের পেটপূজার কথা, আসল কথাটা কী খোলসা করে বল।

নাই জানি।

এই গুড়খা?

নাই জানি।

এই শরাবণ?

জানি নাই।

এই চামটু?

জানি নাই।

গুরভা তুই?

জানলে ত বলব?

তবে জান-ন-মার।

আগে ত অরা দঁড়বৎ শেষ করুক। ঠাকুর-পরণাম। হাসছে গুরভা।

জোড়াশালগাছ্ মহুলগাছের তলায় বড়ামথানে রক্তরাঙা সিঁদুর-লেপা মাটির হাতি ঘোড়া, ব্রহ্মাকুমারের বৃহৎ ঐরাবত পড়ে আছে যেমনকার তেমন। শুধু সমগ্র লোধাপাড়া ঠাকুরথানে উপছে পড়েছে দেখে বুকচরারা হল্ হল্ সর্ সর্ করে খানিক এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে। যেতে যেতেও ঘাড় ঘুরিয়ে থম মেরে খানিক দেখছে, আজ বড়ামথানে কী হচ্ছে কী হচ্ছে। কী হচ্ছে?

এখনও অন্ধকার তেমন গাঢ় হয়নি, ঝুঁজকো আলো-আঁধারি। এই তো 'বেলা বুড়ল' সবে! লাটায়-পাটায় বাঘযুগনীপোকাও এখনও পিছনে 'টিপা-লাইট' জ্বেলে উড়তে ঘুরতে বেরোয়নি। ঐ একটা-দুটো, একটা-দুটো।

সাষ্টাঙ্গে বড়ামথানে প্রণিপাত সেরে ঘুরে দাঁড়ালো রাইবু। গুড়গুড়িয়াও।

আজ যেন তারা রাজ্য জয় করে ফিরেছে, ঐ ভঙ্গিতেই বাদবাকি লোধা-জনমাড়ষদের রাইবু জানাল, কী হব্বে কি, বল-অ কী হয়েছে?

বলেই সবিস্তারে মাতব্বরের মতোই 'নরসিঙা-বৃত্তান্ত' শুনিয়ে দিল রাইবু।

তখনও পাছার ধুলো ঝাড়ছিল গুড়গুড়িয়া। যেন কত ধুলো! বনের ধুলো, নরসিঙার ধুলো, চাঁদাবিলার ধুলো, এতটা পথ যাতায়াতের ধুলো, তদুপরি এই বড়ামথানের ধুলো।

ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তেই সে বলল, আমি কিন্তু—

বিড়বিড় করে বলল, তাও বলল কি? কেউ শুনল কি? শুনলেও তাকে তেমন কেউ আমল দিল না। রাইবুই তো সবকিছু বলল, এর মধ্যে আবার 'কিন্তু' কি? না কোনো কিন্তু নেই, গুড়গুড়িয়া আবার কী-ই বলবে?

গুড়গুড়িয়া ফের বলল, আমি কিন্তু—

বলেই সে গলা-খাঁকরি দিল, ফাটা গামবুট ফের পায়ে জড়িয়ে বড়ামথানের অদূরে দাঁড়িয়ে শালপাতার চুটা টানল।

শালপাতার চুটা টানছে গুড়গুড়িয়া। ভুবনার বউ ফুলটুসি 'গ্যাল্‌হাতে' 'গ্যালহাতে' তার ঘাড়ে পড়ে বলল, হেঁ দেওর, খুব ত কেরদানি দেখালি। তাবলে ডাগরতরখানা কান্ধে করে লিয়ে গেলি কী বলে? বুড়িয়ার মাথা দিয়ে আর দু ঘা দিতে পাল্লি নাই?

গুড়গুড়িয়ার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফুলটুসির কথায়। ফুলটুসি বলল? ফুলটুসির মতো একটা 'মেইয়ালোক' বলল? গুড়গুড়িয়া যার পর নেই আহ্লাদিত হয়ে জোরে জোরেই বলল, আমি কিন্তু—

সঙ্গে জুটে গেল গুরভা, সেও বলল, কাজটা কিন্তু ভাল্ল করে নাই রাইবু। এটা একটা মাত্‌বরের পারা কাজ হৈল? আজ বাঁচলে কাল ত নরসিঙা লদ্ধাপাড়ায় হ্যাঙ্গাম করবে। করবে নাই?

ফুলটুসি। হঁ-অ আমো তো তাই বলি।

ফের মিঙ মিঙ করল গুড়গুড়িয়া, আমি কিন্তু—

কার্যত দু'ভাগ হয়ে গেল লোধাপাড়া। একদল বলল, ঠিক্কেই করেছে রাইবু, বীর ন? বীর বঠে সে, যাহার হাতে কুনো অসার নাই, তার সঙে কিসের যুদ্ধ? উকে ক্যানে মারবে রাইবু?

নাই নাই, মাত্‌বরের মতোই কাজ করেছে মাত্‌বরের মাত্‌বর রাইবুলোধা। এ-যাত্রায়

তাকে রাম-বাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছে বড়ামঠাকুর। তাই তো ঘরে ফিরেই বড়ামথানে রাইবুর এত কী না 'দঁড়বৎ'। 'গড়ের' পর 'গড়' করে চলছে রাইবু।

আজ যদি নরসিঙা মরত, মরার উপর খাঁড়ার ঘা মারত যদি রাইবু, তবে সমগ্র লোধাপাড়ার হাতেই হাত কড়া পড়ে যেত নাই?

এত্‌ক্ষণে পাত্তে আমার সঙে সুখ করে শুয়ে থাকতে? হেঁ পাত্তে? বুকে হাত দিয়ে তাই বল-অ নাই?

শতুরার বউ নিয়তি বলল শতুরাকে।

শতুরা সত্যি সত্যি নিয়তির বুকে হাত রেখে বলল, ন্নাই ন।

একটা কালো বিড়াল লাফ দিল রাস্তায়। শতুরাদের ভুগড়ার পিছনের তালগাছ দুটিতে ঝড়ঝড় করে পাল্‌হা-পতর কেঁপে উঠল।

শুধু কী কালো বিড়াল? কালো কালো মানুষগুলো আরো এই অঝোরঝর কালো রাত্তিরে এ-ঘুপচী থেকে সে-ঘুপচীতে গেল, এ-ঘর থেকে সে-ঘরে ঢুকল, এ-পাড়া থেকে সে-পাড়া।

একটাই কথা, শলা-পরামর্শ, রাইবু কি ঠিক করল? মাত্‌বরের মাত্‌বর রাইবুলোধা ভুল করল না তো? 'হাবড়ে' পেয়ে অতবড় শিকারটাকে ছেড়ে দিল কী বলে?

না ছাড়লেই বা কী হত? একটা নরসিঙা যেত, খতম হত, তো আরেকটা নরসিঙা জন্মাত। জন্মাত। ডালা-পাল্‌হা হিলিয়ে একদিন না-একদিন আবার আসত লোধাপাড়ায়। ঢিস্ ঢিস্ করে লাথি মারত লোধাদের ভুগড়ায়, রলা-বাতা মড় মড় করে ভেঙে পড়ত না? ভাতের হাঁড়ি, জলের কলসি?

গোপনে ফিস্ ফিস্ করে এ-ওকে বলে, এর-তার গায়ে চিমটি দেয়। গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্। গাঁদার-গুঁদুর।

কেউ কেউ! কান খাড়া করে শোনে। কে কাঁদছে, কে কে? কাই কেউ নাই, শরাবণদের ভুলিটা বঠে!

অমন করে 'ইনায়ে-বিনায়ে' রোদন করছে কেন ভুলিটা? কুকুরের কান্না কাক-কুয়ার ডাক—এতো ভালো কথা নয়। অশুভ, অশুভ।

রাইবুর বুকের ঠিক মাঝখানটায় আলতো করে 'মিছামিছি' কটা কিল মেরে শিশুবালা বলল, বনে-জঙ্গলে আমাকে ছাড়ি উর'ম পলাঁই গেলে কী করে? হেঁ কী করে, কী করে?

কিল মারছে শিশুবালা, আর বলছে।

ধকলে-ক্লান্তিতে রাইবু বলল, কেনে আবার, ঐ শালার পাখটা। বললম নাই 'গরহের' ফের? কে জানত শালার নরসিঙা উখেনে পড়ে আছে, অভাগা নরসিঙা আমাকে ডাকছে?

যেন পাখিটাই ডেকে ডেকে নরসিঙার কাছে নিয়ে গেছে রাইবুকে। পাখিটাই, পাখিটাই।

ঘুম এসে যাচ্ছে রাইবুর চোখে, ঘুম। পাখিটাও যেন ডাকছে, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! ঘুমের কিনারায় ঢলে পড়তে পড়তে রাইবুও যেন বলছে, রহো, দাঁড়াও।

কী দরকার ছিল তুমার ঐ হ্যাঙ্গামার? হাত বুলাতে বুলাতে বলে শিশুবালা।

রাইবু বিড়বিড় করে বলছে, উ-ল টু-টু! উ-ল-টু-টু!

এই শুনচ? শিশুবালা ডাকছে।

ধড়ফড় করে জেগে উঠে রাইবু, হুঁ-উ, কী বলছ?

বলছি আমি নাই, বলছিল ঐ ভুবনার বহু।

হুঁ-উ কী?

টুঙ করে একেবারে খাদে পড়ে গেল রাইবু।

ভুবনার বহু বলছিল—

রাইবু বিড়বিড় করল, উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ—

টুটু না ফু-টু উসব সুদাইমুসুন, ঘুম্মাও ত!

রাইবু ঘুমিয়ে পড়ল, শিশুবালা জেগে থাকল।

একটা খাড়াই শালগাছ, চিরোল চিরোল পাল্‌হা-পতরে ভরতি। বুড়িয়াটা কোমরে গুঁজে কে যেন তর তর করে উঠে গেল। উপরে, আরো উপরে।

তারপর চারধার চেয়ে চেয়ে দেখল,অত উঁচু থেকে চারধারের বন-ঝাড় দেখতে তো বেশ! তার উপর আঁধার নেমেছে, গাছগাছড়া পাল্‌হা-পতরের খাঁজে খাঁজে কে যেন আঁধারের দলা গুঁজে দিয়েছে।

অঝোরঝর আঁধার, তার মাঝে বুটি বুটি 'বাঘযুগনীপোকা', এ-ঝোপ থেকে সে-ঝোপে যাচ্ছে, এ-লাটা থেকে সে-লাটা, এ ডুংরি থেকে সে-ডুংরি।

ঝুর্‌ঝুর্‌ করে মেঘপাতাল থেকে ঝরে পড়ছে পাপীতারা। এই পড়ল একটা ভাদুতলে, এই আরেকটা করণতলে। করঞ্জ-কইমের দিকেও পড়ল আরেকটা।

পাপীতারা, পাপীতারা।

তরতর করে গাছে-ওঠা লোকটা এবার কোমরে গোঁজা বুড়িয়াটা হাতে নিল, দুহাতে। তারপর ডালটায় কোপের পর কোপ—

কাটা ডালটা ভেঙে পড়ছে, ঝম্মাড় ঝম্মাড়! এ-ডাল সে-ডালের গায়ে ঘষা লেগে লেগে পড়ছে। যেন সমস্ত ডাল-পাল্‌হা নিয়ে বন-ঝাড় ভেঙে পড়ছে একসঙ্গে।

ঘুমটা ভেঙে গেল রাইবুর।

নরসিঙা কী মরে যাচ্ছে?

রাইবুর মনে হল কোথাও বাঁশ-কোরল ভাঙছে হাতিশুঁড়। তবে কী হাতি নেমেছে জঙ্গলে? হাতি, হাতি।

কিন্তু ধারে কাছে বাঁশঝাড় আর কোথায়? সে তো আছে সুখজুড়িতে, দোরখুলিতে, বঙ্কা মাহাতোর বাখুলে। আর নয়তো মাঝুড়ুবকায় সরুবালি চিকনবালির বাঁশতলায়।

সে ধাকাল দিল শিশুবালাকে; এই শি-শো!

হুঁ-উ?

নরসিঙা মরল। শুন্নে রাখ-অ।

ধু-উর! স্বপন দেখচ, ঘুম্মাও ন!

তাই? স্বপ্নে দেখছে রাইবু নরসিঙা মরে যাচ্ছে? কই? সে তো দেখল, একটা লোক তরতর করে গাছে উঠল, ডাল কাটল, ভেঙে পড়ল, আর লোকটা পড়ল না? তাও সে তো নরসিঙা না।

আর বাঁশ-কোরল?

হাতিশুঁড় বাঁশ-কোরল ভাঙছে, আবারও যেন বাঁশ-কোরল ভাঙার আওয়াজ শুনল রাইবু, ম-অ-চ!

ম-অ-চ!

শরাবণের ভুলিটা ফের কঁকিয়ে কেঁদে উঠল, ভু-উ-উ-উ-উ-উ-উ।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাইরে গেল রাইবু। অঝোরঝর অন্ধকার, তার ভিতরে ভিতরে 'বুজকুড়ি' কাটছে রাতপোকা। থাকতে থাকতে দিন-দুপুরে নদীবালিতে যেমন চিড়িক চিড়িক করে ঝলসে ওঠে রোদের ঝাঁজ, তেমনি যেন রাতদুপুরে আঁধারের 'ফুড়গুনি' মাঝে মাঝে ঝাঁজিয়ে উঠেছে।

এত অন্ধকারেও লোধা-চোখ ঠিক দেখতে পায়। রাইবু দেখল—ঐ তো বড়ামথান, বড়ামথানের হাতিঘোড়া, সয়ার দেয়া বড়হাতি। বুঝে বুঝে সে একে একে 'চিহ্নত্' করল—ঐ তো কয়েতবেলের গাছ, কাঁটাবেল, খিরিসতলা, জোড়াশালতলা, শতুরালোধার জোড়াতালগাছ, আঁটারি-চুরচুর ঝাড়—

রাইবু মেঘপাতাল দেখল, তারায় ভরা। এক এক করে চিনে ফেলল কালপুরুষা, দধিভারিয়া, সাত-ভইনি, রাবণরাজার সিংদুয়ারের তারা। আর পোহাতারা?

পোহাতারা, পোহাতারা।

কই পোহাতারা তো এখনও উঠেনি? ভোর-পোহাতি তারা? রাইবু পেচ্ছাপ করে বাইরের কলসিতে পা ধুয়ে ঘরে এসে নমথম হয়ে শুয়ে পড়ল।

তারপর তো একঘুমে সকাল।

তাহলে মরেনি নরসিঙা? নরসিঙা মরে নি?

ঘুম ভেঙে চোখ কচলে রাইবু দেখল, বাইরের উঠোনটায় কেমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশুবালা। শাড়ির আঁচলটা মুখে চাপা।

কী হৈল মরণী? শালপাতার চুটা হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে রাইবু যেন হাসল। বলল, আগুন-জুমড়াটা দেও। আর অম্নি হুরহুর করে কেঁদে ফেলল শিশুবালা।

লাফ দিয়ে বাইরে এসে রাইবু দেখল, বড়দারোগা!

ডিগবাজি খেয়ে দৌড়ে গিয়েছিল সে ভুগড়ার পিছন দিকে, সেখানেও পুলিশ গিজ্ গিজ্ করছে। তালে নরসিঙা মরল?

ধরা পড়ে গেছে গুড়গুড়িয়া। কোমরে 'বরহই' দড়ি, হাতে হাতকড়া। তাতেও গোঁয়ারটার কোনো বিকার নেই, হিন্দোল নেই। চ্যাঙনা-ম্যাঙনাদের ওল ডাঁটার বল নিয়ে লাথি মারছে। লাথি মারছে।

কোমরে বাঁধা দড়ি হাতে পুলিশ-পুলিশ লোকটা দৌড়ে এসে গুড়গুড়িয়ার পাছায় হাঁটু দিয়ে কটা টুঁস মারল। খানিকটা গড়িয়ে গেল গুড়গুড়িয়া।

দু'জন পুলিশ, একজন হাতে হাতকড়া পরালো রাইবুর, আরেকজন কোমরে দড়ি। বাহ্য-পেচ্ছাপ রহিত।

রাইবু একবার ঘাড় তুলে এদিক-ওদিক দেখল। কাকে যেন খুঁজল। কী টের পেয়ে গিয়েছিল গুরভা-গুড়খা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা? পুলিশ আসার আগেই লুকিয়ে পড়েছিল বনঝাড়ে লাটায়-পাটায়?

কই, ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে গুরভা, গুরভার বউ। গুড়খা, গুড়খার বউ ঢালো। শতুরা, শতুরার বউ নিয়তি। গুড়কুঁদা-শরাবণ—চামটুরাও ধারে কাছে আছে নিশ্চয়।

তাহলে? পালাতে পারেনি একজনাও? বড়দারোগার বুদ্ধিতে পুলিশ এমন করে ঘিরে ধরে আছে লোধাপাড়া?

রাইবু খুঁজল বৈ কি ভুবনার বউ ফুলটুসিকে। একবারটি চোখের দেখা দেখবে। কিন্তু দেখতে পেল না। না পেয়ে মনে-মন বলল, সে কী আর আছে? সে তো গেছে তার বাপত্তি সম্পত্তি বঙ্কার কাছে, বিপদে-আপদে এক বঙ্কা যদি—

ততক্ষণে হেঁচকি তুলে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল রাইবু। হাতের হাতকড়াকে তার যে বড় ভয়!

কোমরের দড়ি-ধরা পুলিশ-পুলিশ লোকটা দৌড়ে এসে তার পিছনেও হাঁটু দিয়ে পরের পর টুঁস মারল। রাইবুও সামনের দিকে গড়িয়ে গেল বেশ কিছুটা।

তারপর তাদের দুজনকে দড়ি ধরে গরু-ছাগলের মতো টানতে থাকল পুলিশগুলো। দড়ির টানে এগিয়ে যেতে যেতে রাইবু ভাবছিল, মাত্‌বরের মাত্‌বর রাইবুলোধাকে পুলিশ ধরে-বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শত্রুঘ্নরা! ফুলটুসি-নিয়তি-ঢালো-আদরিরা! সুরুয়া-বড়কই -টুরা-হাড়িয়া-নীলেশ্বররা!

কিন্তু কই, 'হুরি' করতে করতে কিছুদূর যা এসেছিল শিশুবালা, আর এসেছিল বুড়ি জটালোধানী।

তাদের দুজনকেই পুলিশ লাঠি মেরে হটিয়ে দিল। হ্যাই হটো! হটো।

পুলিশ জিপগাড়ির পিছনে কোমরের দড়ি বেঁধে দিল রাইবু-গুড়গুড়িয়ার। অন্তত জঙ্গল রাস্তাটুকু গাড়ির পিছন পিছন ছ্যাঁচ্‌ড়াতে ছ্যাঁচড়াতে যাক!

গাড়ি ছুটছিল, গুড়গুড়িয়া হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে ঘষ্‌টাতে ঘষ্‌টাতে যাচ্ছে। রাইবুই যা মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে হাতকড়া পরা হাত দুটো দিয়ে দড়ি টেনে ধরে দৌড়ুতে দৌড়ুতে যাচ্ছে। যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে।

শাল-পিয়াশাল-ধ-আসন-বহেড়া-কুসুম-করম-করঞ্জ-কইম-কেঁদ্‌-চিহড়-ভেলা-ভুড়রু-আঁটারি -চুরচুর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে রাইবুর একবার, অন্তত একটি বার মনে হয়েছিল বৈকি—লোধা-লোধানীরা না হোক, বনঝাড়-লাটাপাটা-পাল্‌হা-পত্তর-পাখ-পাখালিরা তাকে যেন নমো করছে, বলছে, হুই দ্যাক রাজা যাচ্ছে। শব্বর রাজা। নমো কর, নমো কর।



গুড়খার বেটা নীলুরই উৎসাহটা সবচেয়ে বেশি। সকাল থেকেই সে লোধাপাড়ার এ-মাথা সে-মাথা ছুটে বেড়াচ্ছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। জলদি কর-অ, জলদি কর-অ। বাস ত তুমাদের জন্যে আর দাঁড়াই থাকবে নাই।

সে ইস্কুল-হোস্টেলে থেকে দু-চার ক্লাস পড়েছে। সে বাসটার নামও বলে যাচ্ছে 'মণিকাঞ্চন'। মণিকাঞ্চন, মণিকাঞ্চন।

তার একটা চিঁড়রা আছে, পোষা কাঠবিড়ালী। শিকলি-বাঁধা। তাকে কাঁধে নিয়ে সে এ-মোকাম সে-মোকাম ঘুরে বেড়ায়। তার চিঁড়রার নাম 'ইল্লি'।

ইল্লিটাও নীলেশ্বরের কাঁধের উপর মাথার উপর আজ যেন বড় বেশি তুড় তুড় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইল্লি ছাড়াও নীলেশ্বরের আছে একটা কাঁড়-কাঁড়বাঁশ আর একটা 'গুটুল'। কাঁড়-কাঁড়বাঁশ আর গুটুল দিয়ে সে শিকার করে। সময় সময় শিকার করতে সে মাঝুডুবকা-সুখজুড়ি-ঘোড়াটাপুর-তপোবন-নারদা-নিগুইয়ের জঙ্গল ছেড়েও উড়িশার গহীন জঙ্গলে ঢুকে যায়। বরা-বনখুকড়া-ঝিকর-খেড়িয়া-টেড়িয়া শিকার করে নিয়ে আসে।

সে বাসেও চড়ে। কখনও চাঁদাবিলায় কখনও ধন-কামরায়। বাসে করে কুঠীঘাট-ফেঁকো-লোধাশুলি হয়ে ঝাড়গাঁ যায়। কখনও লোধাশুলি-গুপ্তমণি-কলাইকুণ্ডা হয়ে মেদিনপুর যায়।

তবে আজকের যাওয়াটা যেন অন্যরকম। অন্যরকম, অন্যরকম। এক-দুদিনের জন্য তো নয়, এক-দুমাসের ধাক্কা। তিনমাস-ছমাসও হতে পারে।

সে বিলাতি প্যান্ট-শার্ট পরে, মাথায় বাঁধে চক্রাবক্রা রুমাল। রুমাল তো নয় 'উরুমাল'।

গলায় হার পরে, তার পিসি সাবিত্রীকুম্হারের দেয়া সে-হার ঝক্ ঝক্ করে। লোধাজনমাড়ষ ভাবে, সোনার লয় সোনার লয়, রূপা বঠে। বসন্ত 'কারিকরের'গড়া।

বসন্ত কারিকর অর্থাৎ বসন্ত কামিল্লা। সেই তো এসে বলে গেছে, কথা একেবারে পাক্কা। এখন দিনক্ষণ দেখে গেলেই হয়। গেলেই হয় কী, যেতেই হবে। না'লে পস্তাতে হবে, এ-সুযোগ তো আর আসবে না। বার বার আসবে না।

বোরো, হাই-ইল্ডিং তো পেকে ঝুনো হয়ে এল মাঠে। সেই কোন্ সুদূর পুবের দেশে—বালিচক-পাঁশকুড়া-সবং-ডেবরা-পিংলায়, বাঘাস্তি-কেশিয়াড়ী-দাঁতন-গোমুণ্ডা-মোহনপুর-সোনাকনিয়ায়, কেশপুর-নাড়াজোল-ক্ষীরপাই-ঘাটালে, শালবনী-গড়বেতা-সোনামুখী-পানাগড়-গলসী-ইন্দাস-পাত্রসায়রে।

বোরো, হাই-ইল্ডিং কাটা শেষ হতে না হতেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামবে। মাঠ ঘাট জলে ভরে যাবে। গরুহাল-বিদা-ট্রাকটরে লাটকে-লাট আবাদী জমি 'কাদা' হবে। জলে-কাদায় শুরু হয়ে যাবে আমনধান রোয়া। রোয়া, রোয়া।

দেখতে দেখতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুমাস কেন, আষাঢ়-শ্রাবণ এমনকি ভাদ্র নিয়ে পাঁচ পাঁচটা মাস। ধানকাটা-রোয়ায় কোনদিক দিয়ে যে হুরহুর ফুরফুর করে কেটে যাবে সময়!

চলছে প্রস্তুতি, সাজগোজ, গোছানো-গাছানো। 'লোধাজনমাড়ষ' কোনোদিন তো লোধাপাড়া ছেড়ে অতদূরের গাঁ-গঞ্জে শহর-বাজারে যায়নি। তারা গেছে বড়জোর বড়খাঁকড়ির হাটে, কাম্হারপাড়া-কুম্হারপাড়া-মাহাতোপাড়ায়, হাটুয়াদের গাঁ বড়োডাঙা-বিরিবাড়িয়া-রোহিণী-আন্ধারি-হাতিবাঁধি-কুস্তুড়িয়ায়।

'পুব খাটতে' 'নামাল খাটতে' অত দূর দুর দেশে যাওয়া তাদের জীবনে তাদের এত বড় জীবনে এই তো প্রথম! প্রথম, প্রথম। কী হবে খরা-ঝড়িয়া-বর্ষায়, কোথায় খাবে কোথায় শোবে, একসঙ্গে এক বাড়িতেই কী তারা থাকবে, গাঁসুদ্ধ ? অসুখ-বিসুখ-সাপকাটি হলে তারা গজনার মতো বাল্কার মতো গুণিন পাবে তো?—কতরকম ভাবনা মনের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে।

যাবে যে নিয়ে যাবে কী কী, পোঁটলা-পুঁটলি-কাপড়ছেঁড়া-মট-বিঁড়া এনামেলের গিনা-গিলাস-বাটি-তাটিয়া যার যেমন আছে, তাই ভরে নিতে যে যার ব্যস্ত। যা নিয়ে যাবে যাবে, আর যা-কিছু পড়ে থাকবে তাই বা দেখ-ভাল করবে কে?

কেউ না, কেউ না। কেউ থাকলে তো দেখবে? যাদের বাড়িতে বুড়হা-বুড়হি আছে, তাদের অন্য কথা।

অতএব 'গুঁজাগুঁজি' 'লুকালুকি' করো। কেউ ভুগড়ার চালে গুঁজে রাখছে এটা-ওটা, কেউ ঘরের মেঝের মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখছে বাটনা-বাটার শিলনোড়া। 'আরশি-কাঁকই' তো নিয়ে যাবে সঙ্গে, কিন্তু শাবল-খন্তা? দা-কাতান?

ধুয়ে-মুছে সাফ করে নিয়ে যাবে কী? নাকি রেখে যাবে গোপন ডেরায়? যে দু-একজন থাকল তাদের ঘরে? তাদের জিম্মায়?

হঁ-অ, উদিকের জমি-জিরেতে কী আর 'হিড় নাই? হিড়ের ভিত্‌রে 'উন্দুর' নাই? উন্দুর ধরতে তো শাবল-খন্তার বেড়ে দরকার। তা বাদে চোর ঢুকলে? মীনার বাপ, লিয়ে চল্-অ লিয়ে চল্-অ!

শাবল-খন্তা সঙ্গে চলল, 'কুড়হার-বুড়িয়াও', দা-কাতান, ছুরি-কাটারি।

নিয়তি-শতুরা পড়েছে মুস্কিলে। তাদের ভুগড়ার পিছনে দুটি তালগাছ আছে, সে-দুটি গাছে শ্রাবণ-ভাদ্রে মহার্ঘ তাল পড়ে। তার দেখ-ভাল কে করবে? সব তো খাবে লুটে-পুটে?

অতএব শতুরা যাবে না, কিন্তু লাদনগাড়িয়ার বিটিছানাও নাছোড়। তার তো শহরবাজার দেখা হয় নি। যেখানে যাচ্ছে সেখানে না হোক, যেতে যেতে তো বাজার পড়বে শহরের দেখা মিলবে।

যেতেও মন করে, আবার থাকতেও মন চায়। শতুরা পড়েছে মহাফাঁপরে। পাশাপাশি দুজনে মুখোমুখি বসে চেয়ে আছে দুটি তালগাছের দিকে।

তাল ঝম্মড় করে, তালগাছের পাতা-পত্তর হাওয়ায় হাওয়ায় মাঝে মাঝে ঝম্মড় করে কেঁপে কেঁপে ওঠে। যতই কাঁপে ততই শতুরার বুকও হুড়ঝুড় করে কাঁপতে থাকে।

কী করবে শতুরা? যাবে, না যাবে না? হাঁটুর উপর হাতের বেড় দিয়ে বসেছিল শতুরা। নিয়তি এবার শতুরার হাতের বেড়ের ভিতর নিজের হাত দুটো গলিয়ে নিল।

'গ্যাল্‌হাতে' 'গ্যাল্‌হাতে' বলল, হেঁ গ, তালফুল কবে ধরে? তাল ধরে কুন মাসে? আর পাকে?

শতুরার মনের ভিতর এসময় সময় গুলিয়ে যায়। আরে তাই তো, তালফুল কখন আসে? কী রকম দেখতে? ফুল কী এখন এসে গিয়েছে গাছে?

এতদিন ঘরের ধারে ভুগড়ার পিছনে তালগাছ দুটি চখা-চখির মতো আছে। কোনোদিন তো তেমন করে পাল্‌হা-পতর তুলে দেখা হয়নি শতুরার—কখন ফুল আসে। কখন ফল ধরে, আর কখনই বা পেকে ট্যাসট্যাসে হয়ে যায়।

আলু-তুপ্প 'তাড়তেই' তো সময় চলে যায়, এসব ফুল-ফলের হিসাব রাখবে কখন? আর রাখলেও এসময় এই চঞ্চলতার সময় সে-হিসাব গুলিয়ে যায়। গুলিয়ে যায়, গুলিয়ে যায়।

গুলিয়ে যাচ্ছে, বিশেষত শতুরার, শত্রুঘ্ন লোধাশবরের। নিয়তিলোধানী 'কড়' গুণে হিসাব করে দেখতে চায়, এই তারা যাচ্ছে, এখন যদি ফুল আসে, ফুল ঝরে ফল আসতে সময় লাগবে কতদিন? ক-মাস?

আর সে-ফল পাকতে আরো কতদিন? ততদিনে তারা কী 'নামাল' খেটে ফিরে আসবে? ফিরে এসে দেখতে পাবে কী ঝিরি ঝিরি বাতাসে তালগাছদুটিতে ফর্‌ ফর্‌ করে তালচটির বাসা দোল খাচ্ছে, মিচিক মিচিক করে বাঘযুগনিপোকা আলো দিচ্ছে, পাকা তাল পড়ছে, এই পড়ল একটা ঐ পড়ল আরেকটা, আর—আর—

ফুলেশ্বরের বাপ 'ভাঙ্গনী' বলছে—

"উপোরনু পড়ল দুম্‌।
দুম্‌ বলে মোর পঁদ সুঙ।।"

বল্‌ লদ্ধানী লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা, কী বঠে কী বঠে?

গিল্‌ গিল্‌ করে হাসতে হাসতে দুহাতে তালি বাজিয়ে সেও বলবে, পাকা তাড় পাকা তাড়।

সেই পাকা তাল কুড়িয়ে এনে বিক্রি করে, রস করে, পিঠা করে আর বুঝি এ-বছর তাদের খাওয়ার সময় হবে না। সে সব খাবে বারোভূতে।

শতুরা জড়িয়ে ধরল নিয়তিকে। যাত্রাকালে যেন শেষ-জড়ান জড়িয়ে নিল সে। আশ মিটিয়ে, বুক ভরিয়ে। দম নিয়ে, যেন অনেক অনেক দিনের রসদ ভরে নিয়ে।

এসব করল তারা, যেন এই ক'মাস বিদেশে-বিভুঁইয়ে এটাও তারা আর করতে পারবে না।

গুরভালোধা ভুগড়ার বাইরে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। বসন্ত কামিল্যা কী আসবে লোধাপাড়ায়? নাকি সে সোজা গিয়ে হাজির হবে বাসস্ট্যান্ডে? বাস যেখানে দাঁড়ায়?

এ-জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে, সেই নারদা বাসস্ট্যান্ডে? নাকি আরো কিছু দূর এগিয়ে চাঁদাবিলা বাসস্ট্যানেন্ড ?

কে জানে কী কথা হয়েছে নীলুর সঙ্গে বসন্তর! তবে নীলু তো তার চিঁড়রা-কাঁধে হেঁকে ডেকে গেছে সকাল-সকাল তৈরি হতে। গোছগাছ করতে, সাজগোছ করতে। আর ছোকরা নিজে, গুড়খার বেটা নীলু তো সেজেই বসে আছে।

সাজ কী! মনে মনে হাসল গুরভা।—রাইবু থাকলে ই-সাজ, হম্বিতম্বি তর ঘুচচাঁই দিত রে ছাউ! মনে-মন বলে একটা শালপাতার চুটা, উঁ-হু শালপাতার চুটা কী, কামিল্লার দেয়া একটা 'সিগ্রেট' ধরাল গুরভা।

শুধু কী আঙট চুর-বালাও পেয়েছে গুরভাবউ। সে খুব মজাতেই আছে। পায়ের আঙট দেখছে, একহাতের চুর-বালা আরেক হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে, নাড়ছে চাড়ছে। আর মাঝে মাঝেই 'ঠোঁট-বিদুর' করছে, দুঃখে নয় আনন্দে, আনন্দে।

কখন শেষ-ডাক ডেকে যাবে নীলু? নীলুয়া? এখন শুধু অপেক্ষা, আর অপেক্ষা। কতদিনকার সাধ তার পূরণ হতে চলেছে—

হলিয়ে-ঢলিয়ে বাবু-ভায়াদের খেতিতে নেমে ধানকাটা। সেই 'বাসিয়াম বেলা' থেকে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ধানগাছের গোড়ায় দা চালিয়ে ধান কাটা।

ধান কাটা, ধান কাটা।

ধানের সুঙ বিঁধছে গায়ে, গা কুট্ কুট্ করছে— তো দাও দায়ের ডগা দিয়ে পিঠ চুল্‌কে। 'গিরিহার' লোক 'বাসিয়াম' নিয়ে এলে ফের বাসিয়াম খাওয়ার ছুটি।

আশেপাশের জলে, সে খালের জল হোক্ বাঁধের জল হোক বুড়বুড়ি ঝর্ণার জল হোক, সে-জলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে মুড়হি নিয়ে বস-অ, জলেভিজা বতর করা সোঁদা সোঁদা মুড়হি খাও, চিবাও। ধানকাটা শেষে গিরিহার বাড়ি গিয়ে মজুরি নাও নগদা-নগদি। আর তারপর, তারপর কাছে পিঠের দোকানে বুলুং-উলুং সওদা করে বাসায় আস-অ। বাসায় এসে যত পার সুখ ভোগ কর! সুখ, সুখ।

পিছন থেকে হাত ধরে টানল গুরভার বউ গুরভাকে।

এই শুন-অ!

হঁ কি?

ঘুরে তাকাল না গুরভা, যেমন 'সিগ্রেট' খাচ্ছিল, খাচ্ছে।

শুন্ন!

অনড় গুরভা।

ধাঁই করে সামনে এল লোধানী।—কী ভাবছ?

'সিগ্রেট' ফেলে দিল গুরভা।

বলল, ভাবছি রাইবুর কত্থা গুড়গুড়িয়ার কত্থা। মাত্বরটা হাজ্জত ভোগ কচ্ছে।

হঁ ত করবে নাই? ঐ বলে নাই—যেমন কম্ম তেমন ফলভোগ। পাপ কল্লে পাপের 'পারাচিত' তো কত্তেই হবে!

পাপ করেছে রাইবু? তাই তার প্রায়শ্চিত্ত করছে সে? কেমন যেন সন্দেহ হয় গুরভার। আর সে নিজে কী করছে? কথার খেলাপ?

বসন্ত কামিল্লার পাল্লায় পড়ে ধারের কাছের খেতি-খামারে 'কামিন' খাটতে যাওয়া, এমন কী 'পুব খাটতে' যাওয়া লোধা-বউড়ী-ঝিউড়ীদের—একদম পছন্দ করত না রাইবু। মাতব্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ তাদের 'বাটিয়ে' কোন্ দূর দেশে বিদেশ-বিভুঁইয়ে চালান করে দেওয়া গুরভার পাপ না? এ-পাপের ফলভোগ তাকে করতে হবে না?

হুঁ পাপ, ভুখলা-দুখলাদের আবার পাপ!

বিড়বিড় করল গুরভা। তারপর বলল, হঁ কী বলচ?

কী বলতে এসেছিল গুরভার বউ 'এত্খনে' সেটা-ই ভুলে গিয়েছে সে! নিজের মধ্যে হাব্ডুল-মাব্ডুল হয়ে যেতে যেতে সে বলল, আজকাল কী-ই যে হএ্যেছে আমার, সব কত্থা পাস্রে যাচ্ছি ঘড়িক-ঘড়ি!

ঘড়িক-ঘড়ি, ঘন ঘন কথা ভুলে যাওয়া কী রোগ? বউয়ের এ-রোগ হল কবে থেকে? কই আগে তো কখনও শোনেনি গুরভা!

ধু-উ-র, ভুখলা-দুখলাদের আবার রোগ-শোক।

মনে-মন বলে বউকে গুরভা ঠেলে দিল, যাও, আগে 'মানত্' কর-অ।

হাসল গুরভা।

বউও।

চাঁদ্বদনী-ভুটকী-পুনোইরাও যাবে। একলা 'বোস-ওঠা' মেয়েরা এখানে থাকবে কী করে? রামবাঘা-হুঁড়ারকে তো ভয় না, যত ভয় দু-পা-ওয়ালা জন্তুকে।

কিন্তু যাবে কী করে ভুটকী-পুনোইরা, বিশেষত চাঁদ্বদনী? এই তো সবে 'মহুল' ঝরল, এরপর আসবে 'কচড়া', কচড়ার 'মুজি'-বাছা, খরায় শুকা, গুঁড়ি-কবা, সিদ্ধ-শুকনা, তাবপর তো 'যাঁতায়' পেড়া, তেল—

কচড়া তেল, কচড়া তেল—

কচড়া গেল, কুসুম এল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কুসুমগাছ ভরে উঠবে ডুমা ডুমা মেটে রঙের কুসুম ফলে। থোকা থোকা কুসুমফল, খোসা ছাড়ালেই রাঙা কুসুম—

'মুজি' বেছে খাও না খাও যত খুশি। তারপর তো বাঁশনলিতে ভবে 'কুসুমকুচা'। পোড়া লঙ্কা-নুন-টুকচার তেল ভরে কাঠি দিয়ে বাঁশনলিতে খোঁচাখুঁচি, যত খুঁচবে তত ঝরবে, টক টক ঝাল ঝাল।

চাঁদবদনীর দরকার 'কুসুমমুজি'। গাছতলা ঘুরে ঘুরে সে জোগাড় করবে কুসুমবীচি। বস্তা বস্তা। তারপর তো খরায় শুকা, 'মুজি'র খোসা-ছাড়ানো, ঢেঁকিতে কুটা, গুঁড়ি-করা, সিদ্ধ-শুকনা, তারপর তো 'যাঁতাকাঠে' পেড়া, তেল—

কুসুম তেল, কুসুম তেল।

মাখো রে, খাও রে, তরকারি রাঁধো রে, ফেলাও রে ছড়াও রে—

এতসব অঝোরঝর সংসার ফেলে যাবে কী করে চাঁদবদ্নী? যেতে মন চায় না, আবার যেতেও চায়।

যাবেই যখন, যত পারে নিয়েই চলুক সঙ্গে। বোঁচকা-বুঁচকি মট-বিড়া পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে লটবহর তো হল মেলাই।

সীতানালার 'পায়রা-চঁচ্‌রা-জল' থেকে কুড়িয়ে আনা গোল গোল গোটাকতক হাঁসাপাথরও সঙ্গে নিল চাঁদবদনী।

তারপর তাদের ঘরের ভিতর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোমর ভাঙল। আওয়াজ উঠল 'রট' করে। আর কী নেবে, আর কী নেবে—

দাঁতে আঙুল ঠুকল 'ঠক্' 'ঠক্' করে। গোটা মাঝুড়ুব্‌কাটাকে সঙ্গে নিল, সুরথ-ত্রিলোচনদের বাঁশঝাড়, সরুবালি-চিকনবালির বাঁশতলা, ঠাকুরবাঁধ, জোড়াশালতলা, বুলান-হদহদি, মহুল-শিমোল-কুসুমতলা। তপোবনটাকে আর ফেলে রেখে যাবে কোথায়? তাকেও নিল সঙ্গে। চিহড়-দুধলি-দুধেলতা, বনকান্না-কুঁদড়ি-কাঁকড়োর লত্, বনপুঁই-চেঁকা-ঘলঘসি-শুশনির দল, ভেলা-ভুড়রু-বেল-কয়েতবেল-কষাফল-আঁউলা-বাঁউলার ঝাড়, কেঁদ্-কুসুম-বৈঁচি-জাম-জামরুল—চাঁদবদনী কাকে ফেলে কাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে?

হঁ, চলুক সঙে-সঙে সবোই, সবকিছু।

পানআলু-চুনআলু-খামআলু-চুরকুআলুর 'লত্' ধরে টান মারল চাঁদবদ্‌নী। হুড়ঝুড় করে তারা এসে গেল হাত মুঠোয়। খরা গেলে, 'ঝড়িয়া' এসে গেলে, মাটি 'বতর' হলে আলু-তুস্তাও হয়ে উঠবে 'তুঁবা' 'তুঁবা' মোটা মোটা পুরুষ্টু-পুরুষ্টু।

ফের মেঝেয় বসে পড়ল চাঁদবদনী থুপ্ করে। হাতের কাছে যা পেল, সবই বেঁধে ফেলল পোঁটলা-পুঁটলিতে।

শুকা-মহুল বস্তায় পুরে 'আঁটার' করল। রাস্তায় পাইকার পায় যদি তো সের দরে বেচে ফেলবে।

মহুল কুড়ানোর ঠেকা-পাছিয়া-খাপোই-খলুই বা আর রেখে যাবে কোথায়? ফেলে গেলে চোর-চুরনীদের জ্বালায় আর কী পড়ে থাকবে?

হঁ, চলুক সঙে সঙে সবোই, সব কিছু।

কে জানে, সে ফিরে আসবে কতদিনে! যেন ক'মাস কত বছর পরে!

কোথাও 'চাঙ' বেজে উঠল, চাঙু নাচ। চাঁদবদ্‌নী ছুটে বের হল রাস্তায়। আর দেখল—বড়কই-লাইবুকা-সুরুয়া-নাকফুড়রি-হাড়িয়ারা 'চাঙ' বের করছে। ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে যাবে সঙ্গে।

ইন্নি-কাঁধে আবার এসে গেল নীলুয়া। এই শেষ ডাক—জল্‌দি বাহির হও, আর 'লেট' কল্লে বাসটা ধত্তে পারবে নাই, তুমাদের জন্যে বাস তো আর দাঁড়াই থাকবে নাই। এক কথা বারবার বলছি।

হ্যাঁ, তাই তো। বাস তো আর লোধাদের কেনা গোলাম নয়। 'নামাল' তো 'নামাল', 'পুবখাটা' তো 'পুবখাটা'—শুধুমাত্র বাসে চড়বে, বাসে চড়বার সুযোগ পাবে—এই আশাতেই কেউ কেউ তিড়িঙ করে লাফ দিয়ে ঘর থেকে রাস্তায় নামল।

আর কেউ কেউ অতি ধীরে, অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে চারধার ঘুরে-ঘারে দেখল। ভুগড়ায় আগড় দিল। তারপর কাঁটাগাছ কেটে এনে 'আগড়ে'র উপর 'ঝাঁপ' ফেলে দিল। হয়ে গেল 'কাঁটা-দুয়ারি'।

কাঁটা-দুয়ারি, কাঁটা-দুয়ারি।

কোথাও কেউ 'কেঁদ্‌রা' বাজাচ্ছে, ব্যাঙ-বাজনা। এতক্ষণ লোধাপাড়ার যারা খলায় খামারে দাঁড়িয়ে ছো দেখছিল, রাইবুর বউ ভুবনার বউ জটাবুড়ি আর আর বয়স্ক লোধারা লোধানীরা,

তারা এবার নামালিয়াদের রাস্তায় বেরোতে দেখে যে যার ঘরে ঢুকে 'আগড়' দিয়ে দিল।

বসন্ত এল কই? বসন্ত? বসন্তিয়া?

বসন্ত কামিল্লা লোধাপাড়ায় আসবে কেন? সে তো আসবে কুম্‌হারপাড়া কাম্‌হারপাড়ার ভিতর দিয়ে দোরখুলির সোজা রাস্তায়। নারদা কী চাঁদাবিলার বাসস্ট্যান্ডে। এত লোকের টিকিট কাটবে সে। হাত দেখিয়ে অতবড় বাস থামাবে। তাকে তো যেতে হবে আগেভাগেই।

আগেভাগেই, আগেভাগেই।

নয়াগেরাম.....বালিগেড়িয়া-খড়িকা হয়ে 'মণিকাঞ্চন' এসে গেল, লোধাপাড়ার নামালিয়াদের নিয়ে সে বাস চলেও গেল কুঠিঘাটের দিকে।

খানিক পরে কুঠিঘাটের দিক থেকে একটা বাস এল। বাস থেকে নামল লক্ষ্মীরাণী মল্লিক, ফুলটুসির 'মেইয়া' নুকু। আরেকটু আগে নামলে 'নামালিয়া' লোধাদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেত।

দেরি করে ফেলল সে।

চতুর্থ পর্ব



উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম। 'নামালিয়া' লোধারা যাবে পুবে। পুবে পুবে, আরো পুবে। পুবদেশে 'পুবাল খাটতে'। নামাল দেশে 'নামাল খাটতে'।

ভাদ্রমাসের একাদশী তিথিতে ডাহি-ডুংরি-বনঝাড় থেকে 'করম-ডাল' আনতে কাম্হার-কুম্হার-ভুঁইয়া-ভুমিজ-মাহাতোদের ঝিউড়ী-বউড়ীরা যেমন গাইতে গাইতে যায়, "ডহর ডহর রে দাদা ডহর কতদুর", আর এ-টাঁড় সে-টাঁড় এ-হুড়ি সে-হুড়ি এ-ডুব্‌কা সে-ডুব্‌কা পেরিয়েও তারা যেমন ডহরের অর্থাৎ রাস্তার দিশা পায় না, তেমনি লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীরা এখনও পুবদেশের দিশা পাচ্ছে না।

না পেয়ে আকুলি-বিকুলি করছে, গজল্লা করছে।

খাল্লি ত শুনি পুব-খাটা পুব-খাটা! পুব-খাটার পুবাল-দেশটা আরো কত্‌ত ধুর লো? সেও কী তব্বে সাত-সমুন্দর শাঁকলদীর পার?

যাচ্ছে তো যাচ্ছে, বাস আর থামে না। থামছে না। থামলেও নামতে দিচ্ছে না। নামতে মানা করে দিচ্ছে ঐ বসন্তই। বসন্ত কামিল্লা। বসন্তিয়াই আর নয় তো নীলু। গুড়খার বেটা নীলেশ্বর। 'চিড়রা'-কাঁধে। তার চিঁড়রার নাম ইল্লি।

ইল্লি, ইল্লি।

এক বাসের যাত্রা শেষ হয় তো আরেক বাসের শুরু। এ-বাস ছেড়ে তখন সে-বাসে ওঠো।

হুড়োহুড়ি হুড়োহুড়ি।

আর বাসও তেমন, যেন 'গিড় গিড়াঁই' যাচ্ছে, 'গিড় গিঁড়াই'—। যাচ্ছে তো যাচ্ছে — কখনও ধুলো উড়িয়ে, কখনও পিচ-সড়কের উপর দিয়ে 'রিঁ-ই-ই-ই রিঁ-ই-ই-ই' কেমন একটানা আওয়াজ করতে করতে।

বাপের কালে কুনোদিন ত বাসেও উঠি নাই। পেট্রলের 'বাসে' ত গা গুলাঁই উঠছে, মিনার মাই। হঁ ছাড় দেখি ঝুরকাটা! মুখ বাঁড়ায়ে বমি করি। ছাড়-অ-ছাড়, মুখ যে জলে ভরে আইল! আঃ উক্-আ-আ-হাক্-উ-উ-উ-উ-

ভক্ ভক্!

বাসের জানলায়, বাসের মেঝেয়।

বাসের কণ্ডাক্টার তো হাঁই হাঁই করে উঠছে, ই তোরা কী করছিস! মাথা চাপড়াচ্ছে, ই বাবা কাদেরকে আজ বাসে তুলেছি!

ধারে বসা বমি-না-করা লোধাবউড়ী কনুইয়ের ঠেলা মেরে বমি-করা বউড়ীকে করে দেয় সচকিত, থাম লো! বাব্বুলোকরা নাকে 'উরুমাল' গুঁজছে!

হঁ গুঁজুক, সদ্য বমি থেকে খানিকটা 'টেনক' হওয়া লোধাবউড়ী উত্তর দেয়, দোষ কাহার? বাসের ন হামার? এত কেনে পেটরলের 'বাস' ছাড়ছে বাসটা? গল্ গল্ করে এত যে কালো ধুঁয়া উগলাচ্ছে? তারবেলা?

পাশ থেকে কেউ একজন বলে, ই বাবা, উহার সঙে কথায় পারবি? উ যে হইলেন লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা।

লাদনগাড়িয়া, লাদনগাড়িয়া।

শতুরাশবরের বউ নিয়তিলোধানীর এখন যেন সবকিছুই কেমন গুলিয়ে যায়। কোন দিকে লাদনগাড়িয়া 'বাপঘর' আর কোন দিকে দোরখুলি 'শ্বাশুঘর'— এখন তার কোনো দিশা পাচ্ছে না। তার কেবলই ঘুরে-ফিরে একটা কথা মনে আসছে, 'হাটুয়া'দের বেহা-ঘরে গাওয়া একটা গীতের কথা। ঐ যে ঐ গীতটা, হাটুয়া মাইয়ারা বাপঘর থেকে শ্বাশুঘরে যাবার বেলায় গায়। রোদন করে, "উঠিলা সোয়ারি বসিলা নাহি মাগো। ফিরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি মা গো।।"

এ-বাসটাও তেমন, একবার ভঁ ভঁ করে দৌড়াতে শুরু করল ত দৌড়াচ্ছেই। আর থামছে নাই। পিছু ফিরে যে টুকচার দেখব তার উপায় নাই।

নিয়তির দু'চোখ ভরে এল জলে।

পুব, পুব।

সে পুবাল বা নামালের দেশ আরো কতদূর? যেতে হবে পুবে, আরো পুবে। ডাঙ্গ-ডুঙোড় পাহাড়-টিলা ডাহি-ডুংরি বন-বাদাড় চড়াই-উৎরাইয়ের দেশ ছেড়ে যেতে হবে নামালে-নিচে, সমতলে।

রাইবনিয়া-সর্দারবাঁধ-গোবিন্দপুর-খোঁয়াড়-অমরদা, চিতরড়া-বেতনুটি-বাংরীপোষী-প্রতাপপুর-উদলাখুঁচী-কয়ামাড়া কিংবা নারদা-চাঁদাবিলা-খড়িকা, বালিগেড়িয়া-ধুমসাই-কুলডিহা-দোরখুলি-রুখনীমারা-ভালিয়াঘাটি আর নয়তো মানবাজার-বান্দোয়ান-বরাবাজার-বলরামপুর-খাতড়া-রানীবাঁধ ছেড়ে যেতে হবে পুবে।

পুবে, পুবে।

যেতে হবে বালিচক-সবং-ডেবরা-পাঁশকুড়া-পিংলায়, কেশিয়াড়ি-বাঘাস্তি-দাঁতন-গোমগুা-মোহনপুর-সোনাকানিয়ায়, যেতে হবে কেশপুর-নাড়াজোল-দাসপুর-ক্ষীরপাই-ঘাটালে আর নয়তো শালবনী-গড়বেতা-সোনামুখী-পানাগড়-গলসী-ইন্দাস-পাত্রসায়রে।

পশ্চিমে অন্ন নেই, যেতে হবে পুবে। উত্তরেও না, দক্ষিণেও না। পুবে, পুবে।

কত আর শাবল-খন্তায় আলু-তুণ্ডা 'তাড়তে' গিয়ে হাতের ছাল-চামড়া তুলে ফেলবে, কত আর বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বনকাঁকড়ো-বনকাল্লা-বনকুঁদরী-আঁউলা-বাঁউলা মেহা-ভুড়রু-জাম-জামরুল-কেঁদ্-বৈঁচি-সঁয়া-কুসুম-কচড়া-মহুলের তালাস করতে খড়ি-ওঠা শরীরে কাঁটাখোঁচা আলকুসি-বিছুতির জ্বালা সইবে, কত আর "খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি" করতে করতে সরুবালি-বড়বালি-কুড়কুড়িয়া-কাড়হান-শালপোঙড়া-সাদাভগুা-হলদেভগুা-ঝালুয়া-পোয়াল-পরবছাতুর সন্ধান করবে, কত আর 'গিরিহা'র জমির 'হিড়' কোদালে-শাবলে কেটে-কুটে তছনছ করে 'উন্দুর' আর চোখ-না-ফোটা লাল লাল 'উন্দুরছানা' টুঁড়ে বেড়াবে, কত আর পাঁড়কা-গুঁড়ুর-কপ্তি-কয়ের-ক্যারকেটা বরহা-খেড়িয়া-খঙ্গা-বগুা-ঢ্যামনা-গোই-গোধি-চিঁড়রা-ক্যাঁকলাশের পিছুপিছু ধাওয়া করে সারাবন ঘুরে বেড়াবে, কত আর ঘরে বসে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে কী শরাবণ-ভাদ্রে বাবুইদড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে দু'হাতের চেটোয় ফোস্‌কা ফেলবে, কত আর রাতবিরাত জঙ্গল হাল্লাট করে নরসিঙা-ডমন-নেপালী-কান্‌চা গাড়বাবুদের হাবড়ে না পড়ে শালের বল্লা মহুলের আরা ধ'কাঠের ধুরি এককে কাঁধে ছ'টা, ছ'টা ছ'টা বারোটা, নদী পেরিয়ে নদীবালি পেরিয়ে রোহিণী-আন্ধারী-লব্‌কেশরপুর-হাতিবাঁধি-কুস্তুড়িয়ায় মহাজনদের ঘরে ঘরে আঙনায় আঙনায় 'বরাত' মতো পৌঁছে দেবে, কত আর মাহাতো-ভুঁইয়া-ভূমিজ-সাঁওতাল-কামহার-কুম্‌হার-হাটুয়াদের গায়ে-গঞ্জে একখিলি দু'খিলি কুরকুট কী

একভাগা দু'ভাগা জাম-জামরুল কী একগণ্ডা দু'গণ্ডা কেঁদ-ভেলা-ভুড়রুর বিনিময়ে এক-আধসের চাল আঁচলা পেতে সওদা করবে, কত আর খালে-বিলে-নদী...রে টঙস টঙস ঘুরে শামুক-গেঁড়হা-গুগলি খুঁজে তার 'মাস'টুকু ছাড়িয়ে খোলা শুকিয়ে খোলা পুড়িয়ে কলিচুন বানিয়ে হাটে-বাজারে মেলায়-যাতে বিক্রি করবে, কত আর 'ভুগড়া'র সামনে পিছনে সাঁঝরাতে দড়ির খাটিয়ায় কী খেজুরপাতার চাটাইয়ে শুয়ে তারায় ভরা 'মেঘপাতালের' দিকে তাকিয়ে তারা খুঁজবে, "এক থালা সুপারি গুনতে নারি" দধিভারিয়া-সাতভায়া-রাবণের সিংদুয়ারের তারা-কালপুরুষা-পোহা-ভুরকা, কত আর হাটুয়াদের-বাবুভায়াদের-মাহাতো-ভুঁইয়া-ভূমিজ-সাঁওতাল-কাম্হার-কুম্হারদের হাতে করা কুরথি-খসা-মুগ-বিরহি-ছোলা-বাদামের লহ-লহ খেতির পাশ দিয়ে যেতে আসতে— দুধ এল কী এল না, পেকে ঝুনো হল কী হল না— জানবার অছিলায় 'তুলি' 'তুলি' মনে করেও লালচ্ সামলে হাত গুটিয়ে যাবে আসবে—

অতএব চল পুবে।

পুবে, পুবে।

গুরভার বউ মউজেই আছে। ক্ষণেক আণ্ডট দেখছে, ক্ষণেক চুরবালা। শতুরার বউ নিয়তির মতো তার তো আর জল কাটছে না মুখে! আঁই-টাঁই ভাবটাও নেই দেহে ও মনে।

হুঁ মন, ফুর্তির মন বৃন্দাবন!

এই যে হলতে-ঢলতে বাসে বাসে যাওয়া, এর-তার গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে যাওয়া, ঢুলুনি পায় যদি তো ঘুমোও রে, না পায় যদি তো চোখ মেলে চাহো রে, ক-ত লোক, লোক দেখতে দেখতে যাওয়া, এই যে বাবুভায়ারাও বাসে বসতে না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আর আমরা বসে বসে যাচ্ছি, ফুর্তি না? এই যে বাসের ঝুরকায় মুখ বাড়িয়ে কথা নেই বার্তা নেই যে পারছে যখন খুশি ভক্ ভক্ করে বমি করছে, শতুরার বউ নিয়তিটাও করল, বেদম-পান-খাওয়া বাস মালিকের লোক মাথায় হাত চাপড়ে হাঁই হাঁই করলেও শতুরার বউকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নামিয়ে তো দিল না বাস থেকে, ফুর্তি না? এই যে আঁকশোল-বাঁকশোল-টটাসাই-ধুমসাই-আসনবনী কী কুড়চিবনী থেকে আসা সাঁওতাল ঝিউড়ী-বউড়ীরা, যারা শাক-পাল্হা তুলতে পাল্হাপতর ছিঁড়তে জঙ্গলে ঢুকলে আর দৈবাৎ আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে মুখে 'চোর-চুরনী' ছাড়া যাদের আর কোনো কথাই বেরোয় না, তারা আজ একবাসে আমাদের সঙ্গে 'নামাল' যাচ্ছে, এক সিটে বসে একটাও রা না কেড়ে দেহের উপর ঢলে পড়ে ঘুমাতে ঘুমাতে যাচ্ছে, ফুর্তি না?

গুরভার বউ আরো ফুর্তিতে বাসের সিটে গা এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। তার পায়ের 'আণ্ডট'টা এখন সোজাসাপ্টা আর খোলামেলা, আলোয়-ভালোয় ঝিলিক দিচ্ছে বেশ! তার মন বলল, আর পাঁচজন দেখে যদি তো দেখুক না!

লোধাবউ 'আণ্ডট'-পরা পা'টা আরো একটু বাড়িয়ে দিল।

একপায়ে আণ্ডট, আরেকটা পা খালি খালি। কেমন যেন, কেমন যেন। গুরভাবউ আণ্ডট-হীন পা'টা আরো একটু পিছিয়ে আনল। এই কিস্তিতে বসন্তকে আবদার করে সে বলবেই বলবে, একটা তো হল কামিল্লা, আরেকটা দে, হুঁ দে ন!

ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনী আর আর চ্যাঙ্না-ম্যাঙ্নারা বসেছে বাসের আরেকদিকে, একসঙ্গে। হৈ-হল্লা, গজল্লা করছে। এ-জন্মে তাদের এই তো প্রথম বাসে ওঠা। বাসে চড়ে এই তো প্রথম 'আনেক ধু-উর দেশ নামাল' যাওয়া।

চাঁদবদনী বলে, এই পেরথম কি?

হঁ নাই ত কি?

উঁহু সেকেন, সেকেন—

পুনোই ফার্স্ট-সেকেণ্ড-থার্ড, ছ্যার্কানো বেত, বেতের 'সুঙ'— বুঝে বৈকি। —এই যদি সেকেন্ তবে ফাস্ট কোন্টা লো?

চান্দাবিল্লা, চান্দাবিল্লা—

চান্দাবিল্লা ফাস্ট? হঁ ত কী করে?

নিজেদের দেশ সুখজুড়ি-রুখনীমারা-দোরখুলি পেরিয়ে নারদা পেরিয়ে তবেই না চাঁদাবিলা। সেই চাঁদাবিলায় প্রথম বাসে উঠেছিল চাঁদবদনী— সে কবে? কোন যুগে?

হতেও পারে, হতেও পারে। চাঁদবদনী যেমন ঘুরনচণ্ডী, টঙস টঙস কবে কোথায় না সে ঘুরে বেড়ায়! এই ঘুরে এল বাছুরখোঁয়াড়-বড়োডাঙা-থুরিয়া-ভালিয়াঘাটি কাম্হার-কুম্হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-হাটুয়াদের গাঁ তো নিমেষে ওই ঘুরতে বেরিয়ে গেল কিয়াঝরিয়া-বিরিবাড়িয়া-টিয়াকাটি-দেউলবাড়-খান্দারপাড়া বাগাল-সদ্গোপ-তাঁতি-তন্তুবায়-বামুন-করণদের গাঁ।

চাই কি একফাঁকে ছুঁয়েও এল রামেশ্বর জীউর মন্দিরতলা। কুঁড়পুকুরে ডুব গেলে এক-এক করে একশ'র কাছাকাছি সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠে পুরোহিত ফকিরমোহন আর নগেন দেহরীর রান্না করা ক্ষীরিভোগ খেয়ে সীতানালার 'পায়রা-চঁচরা' জলে হাতমুখ ধুয়ে ফের লোধাপাড়ায়।

লোধাপাড়ায়, লোধাপাড়ায়।

সেই মেয়ে কখন কোন্ ফাঁকে কী জন্যে সুখজুড়ি নারদাব জঙ্গল পেবিযে বাসে উঠেছিল চাঁদাবিলায় এসে— সে তো সেই জানে।

চাঁদবদনী বলল, সেই যেবার ভোটবাবুরা বাসগাড়ি চেপে গিড়গিড়াঁই আইল চান্দাবিলায় ভোট করতে, সেই সেবার বাসডেরাইভার বাবুটা আমাকে চ্যাঙদোলা করে তুল্লে দিল-অ নাই বাসে? সেই পেরথম—

বলতে বলতে চাঁদবদনী এই বাসেই আঙুল তুলে তুলে দেখায়— জায়গা বদলে বদলে ঠিক কোথায় কোথায় সেদিন সে বসেছিল আর কতক্ষণ বাদে বা গাঁয়ের জটাদিদিরই তাড়া খেয়ে সে নেমে এসেছিল বাস থেকে।

ভুটকী বলল, টিকিট লাগে নাই? টিকিট?

হঁ মাগ্না কী আর, বলেই পুনোইয়ের মনে পড়ে গেল দুম্ করে, মহুলগুড় আর সেই হাটুয়া-ছুআ'র কথা।

মহুলের লটপটি গুড় জ্বাল দিয়ে হাটুয়া-ছুআ হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে— মাগনা টুকচার লিবি যদি ত আয়, আয় ন লোধামাইয়া!

হঁ-অ, মাগনা কী আর, চিটাল গুড় দাঁতে কাটতে কাটতে হাত দিয়ে টানে পুনোই, আর হাসে।

মওকা পেয়ে হাটুয়া-ছুআও বগলে 'গিরগিতি' দিয়ে পুনোইকে আরো হাসায়। —লে, চিটাগুড় খা আর হাস। কত হাসবি!

বগলে কাতুকুতু খেয়ে হাসতে হাসতে চোখ বুজে ফেলে পুনোই, চোখ বুজে সে অঝোরঝর হাসতে থাকে। হাসতে থাকে।

সুযোগ বুঝে হাটুয়া-ছুআ এবার বুকের কুঁড়িকুসুমে হাত দেয় পুনোইয়ের। গিরগিতিতে আরোই বেসামাল হয়ে পড়ে পুনোই। বোজা চোখ তার আচমকা খুলে যায়।

খোলা চোখে সে দেখে, বুঝতে পারে হাটুয়া-ছুআ'র 'যা-ইচ্ছা'। আর বুঝতে পেরেই তার 'হু-হুঙ্কার'— তব্বে রে খালভরা নিরবংশা!

বললেই হল সেদিন টিকিট না কেটে হাটুয়া-ড্রাইভার এম্নি এম্নি বাসে তুলেছিল চাঁদবদ্‌নীকে?

চাঁদবদ্‌নী বলল, বাস ত চলেই নাই, না চল্লে টিকিটও নাই।

হাত নেড়ে নেড়ে হাসছে চাঁদ, হাসছে ভুটকী। বাকিরাও হাসিতে ডগোমগো। কেবল যা হাসছে না পুনোই।

পুনোই ভেবে পাচ্ছে না— কী অতই সহজ! অত সহজে পার পেয়ে গেল চাঁদবদ্‌নী? দেহে এতটুকুও আঁচড় লাগল না? তবে তো বলতেই হয় লোক ভালো হাটুয়া বাস-ড্রাইভারটা?

হাটুয়া বাস-ড্রাইভার, হাটুয়া-বাস ড্রাইভার।

নিমেষে একবার এই বাসের ড্রাইভারটাকেও দেখে নিল পুনোই। মুখ দেখা যাচ্ছে না, খালি পিছনটা। বাবরিচুলো, পরনে লাল বগল-কাটা গেঞ্জি! গলায় মেয়েমানুষের মতো 'চিক চিকে' হার। 'ডাহিন-হাতে' বালা। নির্ঘাত হাটুয়া বটে।

চাঁদবদ্‌নীর অতশত খেয়াল নেই, অতশত ধর্তব্যেও নেই। সেবার সে চেপেছিল একটা না-চলা বাসে, তাই সেদিন বাসে চেপেও তার চাপা হয়নি বাসে।

আজ সে চলা-বাসেই চেপেছে, নিজে না কাটুক বসন্ত কামিল্লার কাটা-টিকিটেই চেপেছে। আজ কার কত 'ক্ষ্যাম্‌তা' আছে— এখন হাতে ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে তাকে বাস থেকে নামাক তো!

হঁ নামাক দেখি, চাঁদবদ্‌নী তার দখল-করা 'সিট'টায় আগের চেয়ে আরো একটু চেপে-চুপে বসে থাকল।

পুনোই কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না— সেদিন চাঁদবদনীকে 'হাটুয়া-ডেরাইভার' বাসে উঠতে দিয়েছিল কী এম্নি এম্নি? আর চাঁদবদনীও তেম্নি কিছুতেই ভাঙছে না। কিছুতেই না। পরনের ফ্রকজামাটার কোথাও একটু ফাটাফুটি দেখলে সে-ফুটোয় ঝুনঝুনি বেতের ডগা ঢুকিয়ে যে-হাটুয়ারা 'গিরগিতি' দেয়, চাঁদের পারা অমন চাঁদবদনীকে হাতের কাছে একলা পেয়েও দাম না নিয়ে মাঙ্‌না গাড়িতে উঠতে দিল— তাও কী ভাবা যায়?

ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

আর কিছু না করুক, অন্তত নিজের কোলে বসিয়ে ধুমসো দুটো হাত দিয়ে বদ্‌নীর ভাতি মাদালের পারা বুক দুটোকে—

ভুটকীকে চিমটি কেটে যেন এইরকমই একটা কিছু ইঙ্গিত করল পুনোই। আর হাসল। ভুটকীও চিমটি কাটল পুনোইকে। আর হাসল।

চোখ এড়ায়নি চাঁদবদনীরও। সেও দু'হাতে দুদিকে বসা দু'জনকে রাম চিমটি কেটে বলল, হঁ-অ অমন ঠার্‌রে-ঠুর্‌রে কী বলছিস লো? ঠিস্‌সারা করে বেড়ে হাসছিস যে?

বলে সে নিজেও হাসিতে যোগ দিল।

বাসের শব্দে বাস চলার শব্দে বাসের ভিতর সাতমানুষের পাঁচ কথার শব্দে তাদের হাসির আওয়াজ তেমন উচ্চতা পেল না।

নাই পাক, তবু তারা যেন এযুগের কোনো দুরন্তগামী চলন্ত বাসে বসে নেই, তারা যেন এখনও জোড়া শালতলা-ধ'তলায় কী সরুবালি-চিকনবালির বাঁশতলায়, বুলান-হদহদির মাথায় কী ঠাকুরবাঁধে জড়ো হয়ে বালিতে কাঠি-খুঁচি গুঁজে লুকলুকানি খেলা খেলে চলেছে একমনে।

বালির বাঁধ বেঁধে চোখ বুজে বালিতে খাড়ি-খুঁটি গুঁজে দিচ্ছে একজন, চোখ-বোজা অবস্থায় আরেকজন এ-হাতের সবকটা আঙুল সে-হাতের সবকটা আঙুলের খাঁজে ঢুকিয়ে থাবা বানিয়ে থাবা বসিয়ে কাঠি খুঁজছে.. খুঁজে খুঁজে নারি... এই পাচ্ছে তো এই পাচ্ছে না—

কিংবা, তপোবনে কেঁদ্-ভেলা-ভুড়রুর সন্ধানে এ-লাটা সে-লাটা এ-ডুংরি সে-ডুংরি এ-ঝোড় সে-ঝোড় এ-গাছ সে-গাছ এ-ডাল সে-ডালে ঝাঁপিয়ে পাঁতি পাঁতি খুঁজেও একটা কিছু না পেয়ে সীতানালার 'পায়রা-চঁচ্‌রা' জলে পেট ভরিয়ে তারা যেন এখনও খেলে চলেছে 'গুটি'... একম-দুকম-টিলিংঠয়া...

আর নয়তো মেতে আছে 'বাহাঘর'-এ, বন্ধুর 'কাদোঘাঁটি'-তে, কাদোঘাঁটি-কাদোঘাঁটি, বুলান-হদহদির ডোবায় কী ঠাকুরবাঁধের জলে, জল ঘেঁটে তুলে এ-ওকে ছুঁড়ে মারছে কাদা, হাবড়ে পেয়ে নতুন বউকে জাপটে ধরে মাকড়া বর তো আচ্ছাসে গায়ে-মাথায়-মুখে মাখিয়ে দিচ্ছে মাটি, বউকে ছেড়ে এইবার— এইবার সে কাদামাটি হাতে 'তাক' করেছে কনেবউয়ের বন্ধুদের, ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীদের, আর কাদা জলে হাতের থাবড়া মেরে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে কোনোমতে নিস্তার পেতে তারা যেন, এখনও আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে—

—ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীরা—

গুরভা-গুড়কুঁদা-চামটু-শরাবণ-শতুরারা তো বসে আছে বাসের উপরে, সেই টোঙে।

মাঝে মাঝে ইস্লি-কাঁধে তাদের দলে এসে ভিড়ছে নীলু, নীলেশ্বর। আসছে না কেবল বসন্ত।

সে তো সেই বসে আছে নিচে, বাবুদের মাঝখানে, বাবু হয়ে। মাঝে মাঝে "এ বসন্ত" "আহে-এ-এ-এ বসন্ত" "বসন্তিয়া হে-এ-এ-এ" বলে উপরঅলাদের ডাক কী আর তার কানে আসছে না?

আসছে, আসছে।

তবে ঐ যে— সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে তার যত ভয়! পাছে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নামালে নিয়ে আসার রাগে-সন্তাপে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেয় তাকে, আর নয়তো চলন্ত বাসে দৈবাৎ গাছের ডালের 'বাড়ি' খেয়ে সে যদি মরে যায়!

তাই হাতে ধরে টানলেও সে এখন উঠবে না, হরগিজ্ না।

শুধু কী গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণরা, খালি দোরখুলির লোধাপাড়ার লোধারা, বাসের টোঙে উঠে বসে আছে সাঁওতালরা, ভূঁইয়া-ভূমিজরা, বাগাল-বাউড়িরা, করণ, কুড়মিরা।

ক'টা হাটুয়াছোঁড়াও উঠেছে ছাদে, হাওয়া খেতে। বেশ তো হাওয়া খেতে খেতে, এ-ডালের পাতা সে-ডালের পাতা ছুঁতে ছুঁতে, ছিঁড়তে ছিঁড়তে যাওয়া!

গঞ্জের মতো একটা জায়গায় এসে বাসটা কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। আর থামতেই মুরুব্বির মতো বাস থেকে নেমে গেল নীলু, হাতে ধরে টানতে টানতে নামিয়ে নিয়ে গেল বসন্তকেও।

হাত ছানি দিয়ে ডেকে গেল সঙ্গীসাথীদের, সুরুয়া লাইবুকাদের— আয় আয়—

তারা যে গেল, সিট ছেড়ে একেবারে গেল না। সিটের উপর রেখে গেল 'উরুমাল' গলার গামছা, আর কিছু না হোক— মাথা আঁচড়াবার আরশি-কাঁকই।

বসন্ত কিছুতেই রেখে গেল না তার তেল-চিটে ময়লা কিড্ব্যাগটা। তার জায়গায় 'চিহ্নৎ' হিসাবে রেখে গেল ততোধিক ময়লা নস্যিমাখা নাকঝাড়া তার রুমালটাকে।

তার কাছে তো 'উরুমাল' নয়। রুমাল, রুমাল।

তারা যেমন হুড়-দুড় করে নেমে গেল, তেমনি ফিরেও এল তড়িঘড়ি। কামিল্লার খালি

ভয়— এই বুঝি বাস দেয় ছেড়ে! একটা বাস 'ফেল্' করলে আরেকটা বাসে যাওয়া-শুধুমুধু গচ্ছা অতগুলো টাকা!

ইন্নি কাঁধে নীলুর অত ডরভয় নেই। এই বাসটা যায় যদি তো যাক না, হাত দেখিয়েই পরের বাসটা সে থামিয়ে দেবে। এন্নি হাবভাব।

হাতে হাতে চপ-মুড়ির ঠোঙা নিয়ে নীলু-সুরুয়া-লাইবুকারা বাসে উঠল। ঠোঙা ঠোঙা মুড়ি আর আলুর চপ। কামিন্না না-খাইয়ে 'নামালিয়া'দের ভোখে মারবে—অততো নয়।

লোধা ঝিউড়ী-বউড়ীদের হাতে আদর করে ঠোঙা গুঁজে দিতে দিতে নীলেশ্বর মস্‌করা করে বলল, লে মার খা। বাপের জম্মে চপ ত কখনও খাস নাই।

হুঁ খাই নাই আবার, গুরুবারের হাটে সরো বেহেরার চপ ত খাএছি। বড়াভাজা-পকোড়া।

অ, সরো বেহেরার চপ-পকোড়া! সে ত গুরুবারের 'সুরু' হাটের। শহর-বাজারের চপ-কাটলেট ত খাস নাই। খা, বসন্ত খাবাচ্ছে।

হুঁ গো চপ-চাপলেট ত খাবা হবেকই, লোধাবউড়ীরা এবার চেপে ধরল নীলুকে, কিন্তুক তুঁই বল্ ন, তোর ভরসাতেই ত আসা— পুবদেশটা আরো কত দূ-উর?

বাড়ি থেকে এইটুকু আসাতেই এত, অস্থিরতা অস্থিরতা, না জানি কতটা এসে পড়েছে তারা! আরো যেতে হবে কতটা? এ কী জন্মের মতো যাওয়া? এ-জন্মে আর ফিরতে পারবে তো?

এই নিয়ে একটু আগে এ-ওকে আচমকা জড়িয়ে ধরে সজোরে ঠেলা মেরে বলা, "দিদি লো" "বহিন লো" পরিহাস করে বলা, "বাপের নাম মনে আছে নাই?"

"হুঁ-অ, যা বলেছিস— বাপের নামটাও ভুলাঁই দিছে।"

ঘর ছেড়ে এইটুকু আসাতেই এত, হাসবে না রাগবে নীলেশ্বর? রাগ চেপে রেখেই বলল, আরো ঢের দূর।

ঢের ধূর? ঢের-র-র-র-র-

হুঁ-হুঁ ঢের দূর, এ কী তোদের নারদা-চাঁদাবিলা বড়খাঁকড়ি-হাতিবাঁধি, কী আরো টুকচার দূর কুলটিকরী-কেশিয়াড়ী, কী বড়ামারা-খুকড়াকুঁপি কাশীডাঙা-বরদা-কেশিয়াপাদা—

হুঁ গুপ্তমণি একটা জায়গা আছে বটে, আর কতকটা গেলেই দেখতে পাবি, নাম করা ঠাকুর থান—

ঠাকুরথানের নাম শুনেই লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা কেউ কেউ দু'হাত জড়ো করে নমো করল।

নীলেশ্বর বলল, ঠাকুরথান বলে ঠাকুরথান, মন্দিলে লোধারাই পূজা করে লোধারাই ভোগ রাঁধে—

কেমন যেন বিশ্বাস হয় না লোধা বউড়ীঝিউড়ীদের। এই শহর-বাজার, যেখানে বন-জঙ্গল নেই, নদীনালা নেই— যেখানে 'সাফা-সাফা' মানুষ, সেখানে লোধারা আসে কী করে? লোধা দেহুরী?

এ গো, বন নাই ঝাড় নাই আঁউলা নাই বাঁউলা নাই, লদ্ধারা আইল কুথাম্নে?

কোথা থেকে এল লোধারা?

নীলেশ্বর বলল, ধু-উর মড়ি! বনঝাড় নাই কে তোকে বলল? চল্ ন কত্ত দেখবি!

বনঝাড় আঁউলা-বাঁউলা লোধামন্দির লোধাদেহুরী লোধাপত্‌রি—সে না হয় দেখা যাবে কত কত, কিন্তু তাবলে গুড়খালোধার বেটা নীলু, নীলেশ্বরশবর এত জানল কী করে?

এই তো সেদিন সে মাঝু-ডুবকায়, মাঝুডুবকার চুরচু-আঁটারি-ধ-ডকা-ভাদু-কুড়চি 'ডগ্'

নাড়িয়ে গুলির বেগে দৌড়ে কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজদের গোঠ-টাঁড়ে বলখেলার মাঠে পৌঁছে ওলডাঁটার কী চামড়ার বলে লাথি মেরে মেরে পা দুটোয় ফেলে দিয়েছিল কড়া, যে কী না কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-হাটুয়াদের বাঁশঝাড়ে চল্লা-নিম-তেঁতুলের ডালে ডালে 'গুটুল' নিয়ে গব্‌রা-ক্যারকেটা চিড়রা-পাঁড়কা শিকার করে বেড়াত 'শিকারা মরদের' মতো, না হয় সে লছুপুর না মছুপুর বড় ইস্কুল হোস্টেলে থেকে খেয়ে পড়ে, পড়ে আর খেয়ে দু'চার ক্লাস পাশ দিয়েছে— তা বলে তার পেটে পেটে এত?

নীলুটা বলে কী না জায়গার নাম শুগনীবাসা, ঠাকুরের নাম গুপ্তমণি, লোধাদেহুরী। ঠাকুর বলে ঠাকুর, সড়ক দিয়ে যেতে-আসতে যত বড় বাস-ড্রাইভার ট্রাক-ড্রাইভার হোক না কেন গাড়ি থেকে ঠাকুরের নাম করে পয়সা তাকে ছুঁড়তেই হবে। আর সে-পয়সা ঠাকুরথানে পড়ে ঠং করে আওয়াজ দিলে তবেই শান্তি! তখন চালাও গাড়ি বেলপাহাড়ী।

নীলু বলে, শুধু কী গুপ্তমণি? পিতলকাঁটি যাও যদি তো দেখবে জয়চণ্ডীর মন্দিরে লোধাদেহুরী কাড়া-মোষ কাটছে, সেই বলে নাই— 'রকতে বান বঁহেছে'। রক্তে বন্যা বইছে!

লোধাদেহুরীর কী দাপট, কী দাপট! কিন্তু পিতলকাঁটির 'হাটুয়ারা' সে-দাপট মানবে কেন? ষড়্ করে তারা তো বসিয়ে দিল 'বেরাম্ভণ' দেহুরী। 'বেরাম্ভণ' দেহুরীও পূজা করে, লোধাদেহুরীও পূজা করে। মা জয়চণ্ডী তামাশা দেখে অন্তরে হাসে।

মাহাতোদের পঁড়া-মোষ হারায়, কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজদের গরু-ভেড়া হারায়, আঁটারি-চুরচু-ডকা-ভাদুর জঙ্গলে ডুব্‌কা-ডুংরিতে হাটুয়াদের চ্যাঙচ্যাঙে খাসি ধবলী ছাগল কাবরী ছাগলের দিশা নাই। নাই তো নাই।

লোধাদেহুরীর হাত দিয়ে দেবীর কাছে কতক পূজা যায়, বেরাম্ভণদেহুরীর হাত দিয়েও কতক পূজা যায়। কিন্তু লোধাদেহুরীর পূজায় খুশি হয়ে দেবী তো বেশি বেশি হারানো পোঁড়া-মোষ গরু-কাড়া ছাগল-ভেড়া খুঁজে দেয়। আর তাতেই, তাতেই না—

নীলুর মুখে জয়চণ্ডীর মাহাত্ম্য শুনে লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা মনে মনে হাতজোড় করে 'নমো' করল। একবাস লোকের সামনে প্রকাশ্যে তারা বড়জোর মাথার কাপড়টা এদিক থেকে সেদিকে একটু টানল-টুনল। আর—

মনে মনে নালিশ করল, 'কাই' কোনদিন তো মাতব্বর রাইবু, রাইবুর বাপ গেঁড়াশবর, কী বড়সোলের গজ্‌না গুপ্তমণি কী জয়চণ্ডীর এত কথা বলেনি, নীলেশ্বর, সেদিনকার ছাউ যার গাল টিপলে এখনও দুধ বেরোয়, আজ যা বলল? 'কাই' কোনদিন তো মাতব্বর রাইবু তাদেরকে বাসে চাপিয়ে আঁকসোল-বাঁকসোল ঘুরিয়ে শুগনীবাসার 'গুপ্তমণি' কী পিতলকাঁটির 'জয়চণ্ডী' ঠাকুরের থান দেখায়নি আজ যা গুড়খার বেটা নীলেশ্বর দেখাচ্ছে!

নীলুর কথা মতো আর কিছু দূর যেতেই একটা জঙ্গল এসে গেল। অঝোরঝর শালের বন। বনঝাড়ের ভিতর ভালুকঝোড় খেড়িয়াঝোড় লোধাঝোড় খুঁজতে বাসের ভিতর লোধাবউড়ীঝিউড়ীদের চোখগুলো বড়ই অস্থির হল।

'লোধাঝোড়ে' লোধাজনমাড়ব দু'হাতে ঝোপ ফেড়ে ঢুকে যায়, যেন মায়ের গর্ভে ঢুকে, তারপর দেহতত্ত্বের গোলকধাঁধায় বিচরণ, তারপর দুহাতে ঝোপ ফেড়ে বেরিয়ে আসা। লোধারাই জানে, লোধাবউড়ীঝিউড়ীরাই পারে অমন অঝোরঝর বনঝাড় চিরে লোধাঝোড় বানিয়ে বনের আঁউলা-বাউলা কাল্লা-কুঁদরি কেঁদ-ভুড়রু কাঁকড়ো-কষাফল কুরকুট-মুরকুট কী করে হাব্‌ড়ে নিয়ে আসা যায়।

লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা বাসের 'ঝুরকায়' উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। —ঐ ঐ তো একটা।

ঐ ঐ তো আরেকটা। অবিকল তাদের তপোবনের জঙ্গলে হনুমান চৌকির ওদিকটায়, তাড়কা রাক্ষসীর হাড়ের ওদিকটায় যেমন যেমনটি আছে।

তরোল তরোল শালগাছের নিচে আঁটারি-কুড়চি তো না, ডকা-গাবগুবিও না, শালগাছেরই করোল গজিয়েছে কচি কচি চিরোল চিরোল। লহ লহ করছে তাদের পাল্হা পতর। তুলতে বসলে, ছিঁড়তে পারলেই নিমেষে কাহণ-কাহণ।

শালঝাড় কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে না? তির্ তির্ করে কে যেন, কারা যেন পাল্হা-পতর ঝাঁটি-ডাল সর্ সর্ করে টানতে টানতে এগিয়ে আসছে না?

'চইখের দেখা' একবারটি যে দেখব তার কুনো উপায় অন্তর নাই, এ গো বাস যে গিড়্গিঁড়াই যায়, গিড়্গিঁড়াই—। মার ন ভাল্, পিছু দিকে দেখতে পাস কি নাই পাস!

পিছনের মানুষও দেখতে পায় না, তবে অনুমান করে তৎক্ষণাৎ বলে, হঁ-হঁ দেখাইল-অ যেমন— এগো কালোহাঁড়ি মাথাটা!

কালো হাঁড়ির মতো মাথাটা সে যেন দেখে ফেলেছে, আর কিছু না দেখুক। যে দেখল দেখল, যে দেখল না তার মন খারাপ। তার মন খারাপ বাসটা যদি আরেকটু—আরেকটু আস্তে চালাত হাটুয়া বাস-ড্রাইভারটা!

তার মন খারাপ— দোরখুলির লোধাপাড়ায় থাকলে সেও এতক্ষণে বেরিয়ে পড়ত তপোবন জঙ্গলমহলে— ঝাঁটি কুড়োতে, পাতা ছিঁড়তে। হনুমান চৌকির ওদিকটায় কী তাড়কারাক্ষসীর হাড়ের ওদিকটায় লোধাঝোড়ের ভিতর এতক্ষণে তারও কালো হাঁড়ি মাথাটা—

লোধাশুলি এসে গেল।

বাঁদিকে হাত দেখিয়ে নীলু বলল, ঝাড়েগ্গ্রাম্ যাবার রাস্তা ঐ দ্যাক!

উঁকিঝুঁকি মেরে লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা তো ঝাড়গাঁশহর যাবার রাস্তা দেখল। হঁ, উদিকেও জঙ্গল আছে বটে।

এক লোধানী তো দু'হাত জড়ো করে জোড়া হাত কপালে ঠেকিয়ে 'গড়' করল।

নীলু বুঝতে পারল না— কাকে? ঝাড়গ্রাম শহরকে, না কলাবনীর জঙ্গলকে? না বুঝে মনে মন হাসল।

ই বাবা শহর-বাজারে জঙ্গল! এগো এত কাছকে! তবে বেধুয়াশালা নীলুয়া ঐদিগেই চ ন!

এত কাছে যখন, নীলু ঝাড়গাঁ শহরেই চলুক না। লোধা বউড়ীঝিউড়ীরা আব্দার ধরল।

শুনে তো আপনার মনে খেপে গেল নীলেশ্বর।

বলল, ধু-উর মড়িরা! উদিকে জঙ্গল থাকলেও টাঁড়-টিকরে ভরতি, মরা হাজা শুকনা নহড় খাল ছাড়া আর কোনো নদীনালা নাই, তেমন ধানবিলও নাই ধান কাটবি কোথাকে? পুবখাটা বাদ দিয়ে কী ঝাড়েগ্গ্রাম জঙলে হিলাঁয় হিলাঁয় কেঁদ্-ভুড়রু পাড়বি? তবে ত দোরখুলিতেই থাকলে হত। অ্যাই ডেরাইভার, বাস ঘুরা!

ভয় পেয়ে গেল লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীরা। যেন নীলুর 'হাঁকড়ানি'তেই বাস এই বুঝি থেমে গেল!

তারা সব কাঁচুমাচু মুখ করে বলে উঠল, হঁ-অ তাই ত! ই কী কথা! ঘরের বাহির যখন একবার হএঞছি তখন আর ঘুরব নাই। নাই নাই, নাই ন। লে নীলুয়া লিয়ে চল্ তোর যেথাকে খুশি।

লোধাশুলিতে বাসটা খানিক থামল বটে, তবে একেবারে থেমে গেল না। নীলুর হাঁকড়ানিতে ঘুরেও গেল না।

বাস থামল, লোক নামল, কিছু লোক উঠলও।

বাবুলোকরা বাসে উঠেই নাকে রুমাল চাপল।

লোধাবউড়ীরা এ-ওকে ঠেলা মেরে বলল, গন্ধ ন? এ গো আমাদের গায়ে গন্ধ আছে যে।

হঁ-অ গন্ধ। বাবুদের গায়ের লে ত খালি ভুরভুর করে বাস সাবনের 'বাস' আসছে আর কী! ঠেস মেরে লোধানী আরো বলল, কেমন বিট্‌কাল গন্ধ, ভাকুভাকু—শুঙ ন শুঙ।

চুপ মার, শুনতে পাবে!

হঁ শুনুক, ফের ফোঁস্ করে উঠল লাদনগাড়িয়ার 'বিটিছানা'। নিয়তিলোধানী হিস্ হিস্ করে বলল, বাব্বুদের যেমন কান আছে আমাদেরও ত চোখ আছে। চোখে দেখতে পাচ্ছি নাই? নাকে শুঙতে পাচ্ছি নাই? ই কী চাপা দিবার জিনিস বঠ্‌ঠে দিদি?

নাই ত নাই, চুপ মার!

ওদিকে চুপ মেরে কেমন রাগ রাগ মুখ করে বসে আছে নীলু। তার পোষা 'চিঁড়রা'টা লাফালাফি করছে বাসের জানলায়।

বাবুলোকরা ভয়ে তটস্থ, এই বুঝি কামড়ে দেয় বুনোটা, আর কামড়ালেই তো হাইড্রোফোবিয়া, গুনে গুনে চৌদ্দটা!

কাঠবিড়ালীটা কিন্তু নির্বিকার। নীলুর হাতের তালুতে রাখা কটা মুড়ি সামনের পা দুটোয় নিয়ে তুর তুর করে দাঁতে কাটছে। আর জানলায় লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে।

বাবুদের তাতেই ভয়। এই বুঝি তাদের কানটাও কুট্ করে কেটে নেয় বুনোটা! ভয়ে আক্রোশে তাই তাবা কটমট করে তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে।

আর তাতেই কী রাগ-রাগ মুখ করে বসে আছে নীলেশ্বর?

লোধাশুলিতে বাসটা থেমেছিল, লোধাশুলি ছেড়েও গেল। সামনে ক্ষেমাশুলির জঙ্গল, তা বাদে গুপ্তমণি।

গুপ্তমণি, গুপ্তমণি।

এই সেই গুপ্তমণি, যেখানে লোধাদেহুরিরাই পূজা করে, লোধাপতরিরাই ভোগ রাঁধে।

বাস তো এখানে দাঁড়াবেই, দাঁড়ালও। বাস-ড্রাইভারটা বাস থেকে তড়িঘড়ি নেমে বোধহয় পূজা দিতে গেল মন্দিরে।

লোধাবউড়ীঝিউড়ীরাও আঁপশা-ঝাঁপশা করল বাস থেকে নেমে গুপ্তমণি ঠাকুর দেখতে। কিন্তু বাস থেকে নামতে মানা করে দিল নীলু, নীলেশ্বর। অগত্যা বাসের 'ঝুরকা'তেই লোধাবউড়ীঝিউড়ীদের হাঁপরহাটি—

মন্দিরের গা সিঁদুরে সিঁদুর, পূজা দিতে এসে ভক্তরাই হাতে হাতে সিঁদুর ঘষেছে এত! মন্দিরের বাইরে রাস্তার ধারে ডালায় ডালায় বিক্রি হচ্ছে ভোগ-বাতাসা, ফল-পাকুড়। ভাঙা নারকেল, গোটা নারকেল। বনের বেলপাতা।

যেন চারধারে মেলা বসে আছে গুপ্তমণি মন্দিরতলায়। লোকজনে জমজমাট। বড় 'সড়পে' তেলতেলে পিচরাস্তায় বাস-ট্রাক-ছোটগাড়ি-বড়গাড়ি হুঁকরে ছুটে যায়।

আর ঠং ঠং করে পয়সা উড়ে এসে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে মন্দিরের 'শানে'। এত পয়সা, সে-পয়সা কুড়ানোর আলাদা লোক আছে, সে সারাদিন ঘুরে ঘুরে পয়সা কুড়োয়।

নীলু গর্ব ভরে বলে, এ সেরকম নয়, ঐ যে রেডিওয় পল্লীগীতি আছে নাই— "সারারাতি ফুল কুড়ালি পৈসা পেলি কই", এ এই রকম— সারাদিনরাত পৈসা কুড়ালি—

বলে আর হাসে নীলু। নীলুর কথার সূত্র ধরে লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা ঘুরে ঘুরে-পয়সা জড়ো করা-লোকটাকে খুঁজে মরে। কিন্তু বাস ছেড়ে দেওয়ায় দেখতে পায় না।

তাদের মনোকষ্ট ভারি, যেন ঠাকুরতলায় এসেও তারা ঠাকুর না দেখে চলে যাচ্ছে, শেষটায় 'সিট' ছেড়ে বাসের জানলায় উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে এর-ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ঘুরে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করবে না লোধাঝিউড়ীবউড়ীরা? বাসের মধ্যে চুপটি করে বসে ছিল বসন্ত। বসন্ত কামিল্লা। এসব দেখে-শুনে তার মনে হল—আদেখ্‌লেপনা, লোধামেয়েমানুষগুলোর হ্যাঙলাপনা। আসলে নিজেদের দেশ-গাঁ ছেড়ে কখনও কোথাও তো যায়নি। আজ বাসে চড়ে পরের ঘাড় ভেঙে 'বিলাত' যাচ্ছে। মাগনায় যা দেখা যায় তা তো দেখবেই। রাস্তায় ঘাটে শহর-বাজারে এখনও আরো কত কী দেখার আছে, তা বলে ঐ নিয়ে হ্যাঙলাপনা— সেই বলে না, "বসতে দিলে খাইতে মাগে, খাইতে দিলে শুইতে মাগে?"

বসন্ত আড়চোখে দেখল গুরভার বউকে। ঐ বউটাই যা একটু অন্যরকম। বাসের 'সিট' ছেড়ে কিছুতেই উঠছে না। হাতের চুর-বালা পায়ের আঙট নিয়ে যেন সে মউজেই আছে। আপনার মনে বসন্ত ডাকল, "এ বউ!" গুরভালোধানী যেন সাড়া দিয়ে বললও, 'কী গো?' 'কী কথা ব্যাঙের মাথা, পরে শুনব, আগে আরেকটা আঙট দে কামিল্লা, হুঁ দে ন!' মনে মনে তাকে আচমকা আষ্টে পৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে বসন্ত কামিল্লা 'সিলোক' কাটল—

"ঠাটি লো সুলোচনা।
তোকে দেখে আর পারি না।।"

একবাস লোক, তার মধ্যে বাবু-ভায়েরাও আছে, তার মধ্যেও বসন্তের দাগে ভরতি মুখওয়ালা একটা লোক 'সিটে' বসে কথা নেই বার্তা নেই ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

আপনার মনে হাসতে হাসতে সিদ্ধান্ত একেবারে পাকা করে ফেলল বসন্ত, খড়গপুরে পৌঁছে গোটা দলটাকে সে ভাগ করে দেবে দু'ভাগে। এক ভাগ যাবে বালিচক-সবং-ডেবরা-পিংলা-পাঁশকুড়ার ওদিকে। আর একভাগ যাবে দাঁতন-গোমুণ্ডা-মোহনপুর-সোনাকানিয়ার ওদিকে। গুরভা একদিকে, নীলেশ্বর আরেকদিকে। দুই মাতব্বর একদিকে একসঙ্গে— হারগিজ্ না! কস্মিনকালেও না।

খড়গপুর বাসস্ট্যাণ্ডে কী রেল-ইস্টিশনে 'মুনিষের' আশায় আশায় কত মহাজনই তো এই কদিন হাজির থাকবে, ঘুরঘুর করবে। কে না আসবে— বামনদার অদ্বৈত পৈড়্যা, বসন্ত সাউ, কড়িয়ার কার্তিক পৈড়্যা, রাখাল দত্ত, গৌড়দার পঞ্চানন সাঁপুই, জেনকাপুরের উমেশ করমহাপাত্র, কলিদার রাধারমন মহান্তি, বালিচকের সুবল শাসমল, লুটুনিয়া-তেমাথানীর হরিমাধব জানা, রাতুলিয়ার মুকসেদ আলী—

তাদের সঙ্গে বসন্ত কামিল্লার জান-পহেচান তো এক-দুদিনের নয়, বছর বছরের। সে-সম্পর্ক দেয়া-নেয়ার হলেও, তাতে ভাব-ভালোবাসার অভাব নেই, অন্তত তাই মনে করে পোড়-খাওয়া বসন্ত। তবে এবারের 'খেপ' যা একটু অন্যরকম, দেহে-মনে ডাঁটো-মাটো হলেও তপোবন জঙ্গলমহালের লোধা-লোধানীরা এসব কাজে একেবারে নতুন তো! 'গছাতে' কিছু তো বেগ পেতেই হবে বসন্তকে।

তা হোক, তবু খেলিয়ে খেলিয়ে এতদিনে বঁড়শিতে যা সে 'গাঁত্‌তে' পেরেছে তা কী ছেড়ে দেবে এত সহজে! চাই কী রোদে-জলে পোড় খেয়ে গেলে ধানকাটা শেষে করেও রেখে দেবে ধান-রোয়া ইস্তক, সেই শ্রাবণ-ভাদ্রের মাঝামাঝি।

গুপ্তমণি ছাড়িয়ে বাস একটু জোরেই ছুটছিল, উল্টোদিক থেকে ভারি ভারি ট্রাক পেরিয়ে যাচ্ছিল সাঁই সাঁই করে। যাবার মুহূর্তে, এই বুঝি তাদের বাসটাকে ধাক্কায়-আক্রোশে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় সেই ভয়ে-আশঙ্কায় "ওলো দিদিলো" বলে এ-ওকে মুর্হুমুহু জড়িয়ে ধরছিল, এর-তার গায়ে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা।

আর তাই দেখে বাবুদের হাসি—

—কী হাসি! কী হাসি!

যেতে যেতে লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা এই প্রথম, আরো একটা 'মজার কল' দেখল, রেলগাড়ির কল। কেমন 'বন-কেঁড়রই'য়ের অর্থাৎ বন-কেন্নোইয়ের মতো এগিয়ে চলেছে পিল্ পিল্ করে ছোট ছোট পায়ে, ছোট ছোট চাকায়।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, স্পষ্ট।

কত জোরে ছুটে চলেছে! তবু মনে হয় ধীরেই চলেছে। অবিকল কেন্নোর মতো। কেন্নোর গা ছুঁইয়ে একটা কাঠি ধরলে কেন্নো যেমন গুটি পাকিয়ে চাকা হয়ে যায়, লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা ভাবল, লাঠি ধরলে এই রেলগাড়িও তেমন বুঝি গুটিয়ে চাকা হয়ে যায়।

হোক না হোক ভাবতে দোষ কী?

এ গো, তাই ভাব।

হঁ ভাবছি।

রেলগাড়ির শব্দ শুনেই চাঁদবদনী-ভুটকী-পুনোইরা তো জোরে জোরেই 'আউড়ে' চলেছে— হাপা পাপা তেঁতুল পাপা—

—হাপা পাপা তেঁতুল পাপা—

আহা, বেশ তো রেলগাড়ি চলার শব্দের সঙ্গে মিলে যায়! মিলিয়ে নেয়ার ইচ্ছায় বড়রাও, লোধাঝিউড়ীবউড়ীরাও, বিড় বিড় করল—

হা-পা পা-পা তেঁতুল পা-পা।
যাকে পাবি তাকে খাবা।।

যে-সে 'রোড' তো নয়, বম্বে রোড। গাড়ি তো দৌড়াবেই, দৌড়াতে দৌড়াতে মন করে যদি তো সোজা বোম্বাই। বোম্বাই, বোম্বাই।

সাঁই সাঁই করে বাসগাড়ি তো পেরিয়ে যাচ্ছিল দু'ধারের অনুচ্চ অগভীর শালের বন, কাজুর বন।

ছোট ছোট আমবকুলের মতো ফুল সব। থোকা থোকা, গুচ্ছ গুচ্ছ। সাদাও নয়, আবার হলদেও নয়। মাঝামাঝি, রং যেন-বা মন্দের ভালো। তায় আবার কী গন্ধ!

কী গন্ধ, কী গন্ধ!

এটাই সময়, কাজুবাদামের গাছে ফল আসার। আর, ফুল দেখে নিলাম ডাকার এ-বচ্ছরকার 'কাজ' বোধহয় সারা। ফুল ঝরে গিয়ে তো গাছে গাছে 'কষি' আসছে।

বাসের 'ঝুরকা' থেকে এক হাতের ভিতর সব চেনা গাছপালা, আর তাদের হিলন-ঢলন দেখতে দেখতে গুরভালোধানীর আচমকা মনে পড়ে গেল— আচ্ছা, সেই 'পাখটা' তিড়ুন না টিড়লিং, ঐ যে কী রকম ডাকে "টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু"—সে এখন গলার নলি গলার থলি ফুলিয়ে কাকে আর তার ডাক শোনাবে বন-বাদাড় ডুবকা-ডুংরি টাঁড়-টিকর উথাল-পাথাল উস্তন-খুস্তন করে দিয়ে?

রাইবু নেই, গুড়গুড়িয়া নেই, আমরাও নেই, ঘর করে এক-দু ঘর যে আছে তাও না-থাকারই মতো, জটাবুড়ি-শিশুবালা-ফুলটুসিরা, আচ্ছা ভালা, বনের 'পাখ' মনের লোক না পেয়ে পোঁদ ফেড়ে গলার ডাকও কী ছেড়ে দেবে?

বাসে বসেও গুরভার বউয়ের কত চিন্তা।

একটু আগে এক জায়গায় বেশ কতক ফলন্ত আমগাছ দেখেছিল। কে জানে— উদমা না জোতের। সেখানেও ফুল ঝরে গিয়ে গাছে গাছে 'কষি'। বেশ বড় বড় কষি!

তাই দেখে গুরভালোধানীর দুম্ করে মনে পড়ে গিয়েছিল বৈকি তপোবন আশ্রমের গাছগুলোর কথা। সেখানেও ফুল ঝরে গিয়ে এতদিনে 'কষি' হয়েছে, বেশ বড় বড় কষি!

গুরভার বউয়ের চিন্তা, ততদিনে চোর-চুরনী কাম্হার-কুম্হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-সান্তাল-মাহাতো মাইয়াদের জ্বালায় আর একটাও থাকবে মনে করেছ! সব লুটে-পুটে ফাঁকা!

ফাঁকা, ফাঁকা।

ফলপাকুড়, কেঁদ-বেল-ভেলা-ভুড়রু, কাঁকড়ো-কুঁদরী-কাল্লা তুলল তুলল, আক্‌কুটিরা গাছ্-লত্-পাল্হা-পতর ছিঁড়ে-কুটে একশা করল, আলু-তুণ্ডার 'পোঙ'টাও উপড়ে ফেলল, ভাবল না—গাছ না থাকলে পরের বছর ফল আসবে 'কোথাস্নে'?

সেই বলে না— আদেখ্‌লায় পায়, তো চকরমকর খায়?

ছুটন্ত বাসে বসেও ভবিষ্যৎ-চিন্তায় গুরভালোধানী যখন মশগুল তখনই যেন বিপরীত দিকে ছুটন্ত কাজুর বনে পাখিটা ভুস করে ডেকে উঠল, গুরভার বউ পরিষ্কার শুনল— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

—উ-ল টু-টু টু-টু-উ-উ-উ—

বাসের ঝুরকায় ঘাড় গুঁজে, ঘাড় বেঁকিয়ে পাখিটাকে আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে চলেছে লোধাবউড়ী। —কই, এত করে 'ভাল্‌ছি' 'পেঁদের' ন 'সতের' পাখটাকে ত দেখছি নাই!

নাই, নাই।

কিন্তু ডাকটা যেন ছর্‌রার মতো বাঁদিকের কাজুর বন থেকে উঠে এসে তেরছা ভাবে বাসটার পেটের দিকে ধেয়ে আসছে। —উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু-উ-উ-উ-!!

সেই গুঁড়ো-ঝরানি! -ঐ যে ঐ-

নিজের মনে ধন্দ ঘোচাতে বাসের জানলায় কানটা ফের চেপে ধরল গুরভাবউ।

বাস চলাচলের আওয়াজ, মানুষ কোলাহলের আওয়াজ, তদুপরি রাস্তার দুধারে গাছে-বাতাসে কোলাকুলির আওয়াজ ঝজ্‌ঝড় করে— তার ভিতরে তিডুন কী টিড়লিং পাখের ডাকের কোনো আলাদা আওয়াজ সে শুনতে পেল না।

নিশ্চিন্ত মনে বাসের সিট আঁকড়ে পুনরায় সে বসে থাকল।

বসে থাকল, বসে থাকল।

বাস যাচ্ছে, বাস থামছে। লোক নামছে, লোক উঠছে। "এ গো" "হেঁ গো" করে লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা কথা বলছে। কত কথা, ব্যাঙের মাথা! লোধাছেমড়িরা লোধাছাউছানারা 'আখুশালে' 'ভরা' তোলার মতো মাঝে মাঝে সোরগোল তুলছে।

তাদের দিকে ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে গুরভাবউ। আগুটে, চুরবালায়— তার এখন মন নেই। মন নেই তার এখন— বাসভরতি বাপু-ভায়া, আর আর প্যাসেঞ্জারে। গুরভা যে গুরভা, সেই বসে আছে কোন্ টোঙে উঠে—তারদিকেও তার এখন মন নেই।

মন নেই, মন নেই। সে খুব 'উধাস' 'উধাস'।

ঘাই মারার মতো ডাকটা ফিরে এল হঠাৎ ভুস্ করে। —টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল-টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

'জুরগুঁড়ার' মতো, অর্থাৎ চোরকাঁটার মতো ডাকটা যেন গায়ে-গতরে লেপ্টে আছে। গুরভাবউ হাত দিয়ে ছাড়ালেও ছাড়ছে না। এই ছাড়ল তো এই লেগে গেল!

—উ-ল টু-টু! —টু-টু-উ-উ-উ-! —ঐ যে ঐ—

গুরভালোধানী মাথা ঝাঁকিয়ে চনমন করে ঘোর থেকে যেন উঠে বসল। কান খাড়া করে শুনল— একবার, দু'বার, বারবার।

তারপর পাশের লোধানীকে ধাকাল দিয়ে বলল, দিদ্দি লো, শুন!

কী শুনব?

ঐ যে ঐ-ডাকছে-শুন ম্ন মার!

বলেই গুরভাবউ 'ডাকের' দিকে কান-মন একত্র করল।

কাই, কে ডাকছে?

পাশের লোধানী হতাশ হয়ে হাত নেড়ে 'বা-ঙা' করল। আঙ-বাঙ সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

কান চেপেই আছে গুরভার বউ। —ঐ, ঐ-এগো, পষ্ট শুনছি—

কী?

সেই পাখটা ডাকছে—ঐ যে টি-উ-ল টু-টু-

ধু-উর মড়ি! পাখ কুথা লো— উ ত 'উড়াকল' উড়ছে।

হঁ-অ উড়াকল? আমি বলে পষ্ট শুনছি—

খানিক হাঁ-করে, চুপ থেকে, যেন পাখির ডাকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মিলিয়ে গুরভা-লোধানী চুপিসাড়ে ডাকছে— উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ-

—ঐ দ্যাক! শুন ম্ন মার!

মন না মতিভরম? বিড় বিড় করে বলে পাশের লোধানীও হাঁ-করে, খানিক চুপ থেকে, গুরভার বউয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মিলিয়ে বলছে, ভঁ-ভঁ! ভঁ-ভঁ! ভঁ-অ অ-অ-অ—

তার মানে কলাইকুণ্ডর সামরিক বিমানও আকাশে চক্কর দিতে বেরিয়েছে। ভোঁ ভোঁ আওয়াজ দিচ্ছে, আর অর্নগল ধোঁয়া ছাড়ছে।

কলাইকুণ্ডা এসে গেছে, এরপরে নিমপুরা। তা বাদে খড়গপুর।



বাসটা এসে হুমড়ি খেয়ে থামল খড়গপুর বাসস্ট্যাণ্ডে। খড়গপুর তো নয়, লোধারা বলে 'খড়পপুর'। খড়পপুর, খড়পপুর। আর একটা বাস তো নয়, দশটা। দশটা কী বিশটা। বিশটা তো নয়, পঁচিশটা। পঁচিশটা কী তিরিশটা।

বাস যেমন, লোকও তেমন। বাস আসছে তো আসছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছে। লোক নামছে তো নামছে, উঠছে তো উঠছে।

অঝোরঝর, অঝোরঝর!

বাসস্ট্যাণ্ডের চারধার ঘিরে আছে দোকানপাট, হোটেল-রেস্টুরেন্ট। মিষ্টির দোকান, পানের দোকান। পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। চপ-পকৌড়া ফুলুরি-মুড়ি-বাতাসা-ঘুগনি-তেলেভাজার দোকান।

ফলের দোকান, বইয়ের দোকান।

গোটা কতক সেলুন— মডার্ন সেলুন, বিউটি সেলুন, এমনকি 'বিদিশা'— চুল তার কবেকার—

রেডিমেড জামাকাপড়ের দোকান, লাল-হলুদ-কাগজী সরবতের দোকান, কুলপি-মালাই-

কাঠিলোজেন্স-লাঠিলোজেন্স, রঙ-বেরঙ বেলুন, ফেরিওয়ালা— কী নেই, কী নেই!

যেন মেলা বসে আছে খড়গপুর বাসস্ট্যাণ্ডে। তার উপর আজকেই এই প্রথম এসে নামল তপোবন জঙ্গলমহালের 'নামাল' খাটতে আসা লোধারা, লোধা বউড়ীঝিউড়ীরা।

বাস থেকে মাটিতে নামার আগেই তারা ধপাস্ ধপাস্ করে ফেলতে লাগল পোঁটলা-পুঁটলি-কাপড়ছেঁড়া-মট-বিঁড়া-এনামেলের গিনা-গেলাস বাটি-তাটিয়া শাবল-খন্তা-দা-কাতান-কুড়হার-বুড়িয়া-কাঁড়-কাঁড়বাশ—

লোধাবউড়িঝিউড়িরা বাস থেকে নেমেই 'আড়িশ' ভাঙল। হাত-পা ঝাড়তে লাগল, যেন এতক্ষণ মুরগীর খাঁচার মতো একটা বাসে তারা গাদাগাদি করে বন্দী ছিল। ছাড়া পেয়ে ডানা ঝাপটে এতক্ষণে 'অসার' হচ্ছে।

'অসার'— তার মানে প্রশস্ত। চওড়া।

লোধাবউড়িদের কেউ একজন অবাক-আশ্চর্য হয়ে বলল, ওম্লো! হাই দ্যাক খড়পপুর! সে আঙুল তুলে বড়জোর দেখাল বাসস্ট্যাণ্ডের চৌহদ্দিটাকে।

বাকিরাও মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, এগো হঁ সেই ত, তাই ত। তাই তাই।

তারা তো আর জানে না— খড়গপুরের ভিতরেও আছে খড়গপুর, আছে ইন্দাবাজার, কৌশল্যাবাজার, গোলবাজার, প্রেমবাজার, মালঞ্চবাজার, নতুন ও পুরাতন বাজার, রেলবাজার, হিজলী, আই আই টি, সালুয়া—

আরেকজন বলল, এইটুকু 'জাগার' ভিতর দশ-দশটা মাথাঅলা অতবড় রাবণরাজাকে এরা পোড়ায় কী করে? বোমের 'নিয়া' ছিটকে এসে 'নুগায়' লাগে নাই?

সে শুনেছে 'খড়পপুরে' রাবণ-পোড়া হয়। মা দূর্গার পূজার পরে পরেই রাবণের দশ-দশটা মাথা যখন আগুনে পুড়ে দমাদ্দম ফাটতে থাকে, তখন তার আওয়াজ সেই অতদূরে দোরখুলির খলা-খামারে বসেও শুধু সে কেন আর আর লোধারাও তো শুনতে পায়।

সেই রাবণরাজাকে এই এতটুকু জায়গার মধ্যে আগুনে পোড়ালে তার আগুন ছিটকে এসে গায়ের কাপড়ে তো লাগতেই পারে, হয়ত লাগেও।

কিন্তু ইল্লি-কাঁধে নীলেশ্বর এগিয়ে এসে সে-ভুল ভাঙিয়ে দেয়। রাবণপোড়ার মাঠ— সে এখানে কী, সে তো অন্য জায়গায়, এর চেয়েও অনেক বড় মাঠে, তবে খড়গপুরেই।

সেই সঙ্গে আরো জানিয়ে দেয়, দোরখুলিতে বসে রাতের দিকে তারা শুধু যে রাবণরাজার মাথা-ফাটার আওয়াজ পায়, তা তো নয়, মাঝে মাঝে রাতের আকাশে একটা লম্বা আলোর ফোকাশকে একেবার আকাশের গোড়া থেকে এধার-ওধারে নড়তেও দেখে।

হঁ হঁ, দেখি ত।

প্রায় সমস্বরে লোধাবউড়িঝিউড়িরা বলে ওঠে।

নীলেশ্বর সবজান্তার ভঙ্গি করে বলে, তার মূলেও জানবে এই খড়গপুর।— খড়গপুর, খড়গপুর—

তার মানে?

মানে বলতে বসল নীলু। —ঠাণ্ডার মাসে, সাঁঝরাতে, অঝোরঝর আকাশে তারা ফুটুক আর নাই ফুটুক, 'টিপা লাইটের' মতো একটা আলোর ফোকাস দোরখুলির উত্তর দিকের আকাশে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায় টাইমে টাইমে।

হঁ, কিসের আলো?

ন, দারোগার জীপগাড়ির আলো।

উঁ-হু, সে-আলোর ফোকাস তো ঐ বড়জোর এক-দু'মাইল। কিন্তু এ তো যোজন

যোজন— এ আলো খড়পপুরের কোনো 'সার্কাস পার্টি'র সার্চ-লাইটের আলো, 'শো' চলাকালীন আরো বেশি বেশি দর্শক টানার জন্যে উঁচু থেকে সার্চলাইট ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাঁ-গেরামের লোককে জানান দেওয়া— আসুন বসুন দেখুন—

তখন, মাঝুডুবকার কী দখিনসোলের কী সুখজুড়ির জঙ্গলের সবচেয়ে উঁচু গাছটায়, উঁচুমাথাঅলা গাছটার মগডালে চড়ে কত লোধামানুষই তো দেখেছে সে-আলোর কেরামতি। না না, মুড়া-ঝেঁটার মতো দেখতে, নড়েও না চড়েও না— সে অন্য জিনিস, অন্য আলো। — মানে বলতে বসে এতকথা নীলুই বলল।

নীলুর ইস্কুল তো খড়গপুর থেকে খুব দূরে নয়। এই তো সালুয়া-ডিমৌলী-খেজ্‌রা-কেশিয়াড়ী পেরোলেই লছিপুর! ধারে-কাছে সাতসোল, নারানগড়—

রীতিমত বুক বাজিয়ে নীলেশ্বর বলল, নারানগড়-সাতসোলে— এগো হেঁ গো হেঁ— আমাদের মতনই গাদা-গুচ্ছের লোধা আছে।

ফের লোধা? সে-লোধারাও কী আমাদের মতো 'নামাল' খাটতে যায়? এত কথা, এত দেশ-বিদেশের কথা— জানলো কী করে 'গুড়দুম' গুড়খালোধার বেটা নীলু, নীলেশ্বর?

নীলুকে যতই দেখছে ততই অবাক-আশ্চর্য হচ্ছে লোধাবউড়িঝিউড়িরা। আজ তার সঙ্গে ঘরের 'বাহার' না হলে এমন করে কে চিনত নীলুকে? তার কুম্‌হার 'পিসা'-ই কী তাকে এতদূর শিখিয়েছে?

লোধাদের ভিতর আরেকজনও 'বিদ্বান' হচ্ছে, লোধাবউড়িরা ভাবল, সে ভুবনা-ফুলটুসির বিটি নুকু, ভালো নাম লক্ষ্মীরানী— সে যে এখনও কতদূর যাবে—অঝোরঝর—

শুধু কী লোধারা, নামাল খাটতে এসেছে সাঁওতাল-ভুঁইয়া-ভূমিজ-বাগাল-বাগদীরাও। যে যার সে তার মতো। একেকটা 'গ্রুপে'। লোধাদের নিয়ে যেমন এসেছে বসন্ত।

এ-দলের পোঁটলা-পুঁটলি, ঠেকা-পাছিয়া হাঁড়ি-ডেকচিকে সে দলের কাপড়ছেঁড়া-মট-বিঁড়া-এনামেলের গিনা-গেলাস-বাটি-তাটিয়া-শাবল-খন্তা-দা-কাতান একটু একটু করে ঠেলা দিচ্ছে। ঠেলে সরিয়ে বসবার জায়গা করে নিচ্ছে চুপিসাড়ে।

ঠাসাঠাসি গাদাগাদি অবস্থা। নামাল-খাটা পুবাল-খাটা জনমানুষ তো আছেই, তার উপর সাধারণ যাত্রীবাও রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে 'শেডের' নিচে ঢুকে পড়েছে। আর 'শেড' তো বাসের অপেক্ষায় যাত্রীদের দাঁড়াবার জায়গা বিশেষ।

তবু তো 'আমন' কাটার মরশুম নয় এখন। এখন তো পেকেছে কেবল 'বরো'-হাই-ইল্ডিং। কাজ কম, সে তুলনায় 'মুনিষ' এসেছে বেশি। যদি হত কার্তিক-অঘ্রাণ, আমন-কাটার মরশুম— তবে তো এতক্ষণে লেগে যেত ধুন্দুমার, হাতাহাতি, একটুকরো বসবার 'ভুঁই' নিয়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ !

আর তেমন হয়েছে বাসের খালাসি-কণ্ডাক্টররা। যে যার বাসের আশপাশে দাঁড়িয়ে হেঁকে যাচ্ছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

চিৎকার, চিৎকার।

কার বাস কোথায় যাবে, কার বাস আগে ছাড়বে, কার বাসে 'সিট' এখনো খালি-ই আছে।

আর কত রকম বাস! কত দিক থেকে আসছে, কত দিকে চলে যাচ্ছে।— খড়গপুর-মেদিনীপুর টাউনবাস তো আছেই। তার উপর কলকাতা-দীঘা-ভায়া পানিপারুল, কলকাতা-দীঘা-ভায়া কাঁথি, মেদিনীপুর-দীঘা-ভায়া নারায়নগড়-বেলদা-খাকুড়দা, মেদিনীপুর-মোহনপুর-ভায়া বেলদা-খাকুড়দা-সাউড়ী-তুরকা, হলদিয়া-মেদিনীপুর-ভায়া পাঁশকুড়া, হলদিয়া-মেদিনীপুর-ভায়া মেছেদা-তমলুক, ঝাড়গ্রাম-মেদিনীপুর, নয়াগ্রাম-মেদিনীপুর, ভসরাঘাট-

মেদিনীপুর-ভায়া কেশিয়াড়ী, গোপীবল্লভপুর মেদিনীপুর—

মেদিনীপুর, মেদিনীপুর।

সে যে 'পুরে'-ই যাক না কেন, তাকে একফাঁকে আসতেই হবে খড়গপুর, খড়গপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে একবার 'বুড়ি' ছুঁয়ে না গেলে তার যেন যাওয়াই হয় না।

বাস আসছে, গল্ গল্ করে কিছু লোক উগ্‌রে দিচ্ছে, বাকি লোক নিয়ে সে-বাস হুড়মুড় করে চলেও যাচ্ছে। যারা গেল, তারা তো গেলই। যারা থাকল, তারা হয় অন্য বাসে উঠে গেল, নচেৎ রিক্‌সায়, আর নয় তো পায়ে হেঁটে, ট্রেনে—

ঐ ঐ তো লোহার ব্রীজ, যার উপর দিয়ে লোকজন হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে-আসছে, তার তলা দিয়ে তার তলা দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে, ট্রেন আসছে। কতক নামাল-খাটা পুব-খাটা মানুষ, যারা ট্রেনেই যাবে, তারা গিয়ে ভিড় জমিয়েছে সেখানে।

এত কাছে লোহার ব্রীজে ওঠার সিঁড়ি! এত কাছে ইষ্টিশনে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর সুন্দর রেলগাড়ি!

চ'লো দেখে আসি! বলেই চাঁদবদনী-ভুটকী-পুনোইরা এক দৌড়ে দেখে ঘুরে আসা মনস্থ করল। 'শেড' থেকে এ-ওকে হাতে ধরে টানাটানি করে যাত্রাও শুরু করল।

কিন্তু দৌড়ে এসে তাদের মানা করে দিল নীলেশ্বর। নীলেশ্বর, নীলেশ্বর। লোধাঝিউড়িরা ভাবল— এই কদিনে নীলু খুব মাতব্বর হয়েছে। উঠতে-বসতে তাদের মানা করে চলেছে— হেনা করিস নাই, তেনা করিস নাই।

তার উপর চাঁদবদ্‌নী দেখেছে— কেমন আড়চোখে তার দিকে লুকিয়ে-চৈরিয়ে দেখে যাচ্ছে নীলেশ্বর। চোখে চোখ পড়লেই ইল্লিকে নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে, সার্কাস।— বাপের ব্যাটা হোস্ যদি তো চোখে চোখ রেখেই বল্ কথা। না'লে ওর'ম চোখ তোর গেলে দিব-অ রে নির্বংশা!

মনে মনে ভেবেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল চাঁদবদ্‌নী। অমন কড়া কড়া কথা কী সে বলতে পারবে নীলুয়াকে?

আর এসময়ই সুরুয়া-লাইবুকাদের মাঝখান থেকে কে যেন 'কড়র' কাঠ আর গোধির চামড়া দিয়ে তৈরি 'চাঙু' যন্তরটায় মেরে দিল চাঁটি—

—ঘেনী ঘেনীচ, ঘেনী ঘেনীচ—

হৈ হৈ করে বাকিরা তাড়া করে উঠল তাকে। তাড়া খেয়ে সে শুধু না-না করেও বলল যে, সে তো চাঙু বাজায়নি, তার হাতটুকু যা বেভুলে লেগে গেছে যন্ত্রটায়।

বলল বটে, তবে চাঙু-নাচের দু'কলি শুনিয়ে দিতেও সে ছাড়ল না—

"কুহ সখী কাঁহি গলে
মুড়রে পঙ্কাল।
কাঁহিকে আনুছি জল
দেখ হে রঙ্কাল।।
কুহ সখী ....."

চাঙু-বাজনা শোনা ইস্তক তারদিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে নীলেশ্বর।

লোধাবউড়িরাও এসময় দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একধারে একজোট হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলছে, কী যেন! বোধহয় 'পিসাব' করবে কোথায়, 'জলঘাট'-ই বা যাবে কোথায়, কোন্ 'লাটা-পাটায়'— তাই নিয়ে ফিসফিসানি।

তাই তাই।

বুঝতে পেরে বসন্ত গুরভাকে ডেকে লোধাবউড়িদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, গুরভা, তোর পরিবারকে কহি দে— এঠি-সেঠি য্যান্ কাপড় তুলি না বসি পড়ে।

বসন্তর মুখের দিকে জুলু জুলু চোখে তাকিয়ে আছে গুরভা।

আ-হাঃ সোউ যে দেখুটু, হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল বসন্ত, 'ঘিরা-ঘর' তার ভিতরকু যাইতে ক।

মাথা নাড়ল গুরভা। হাঁ হাঁ, তা তো বটেই, তারা তো শুনলই— যেখানে সেখানে কাপড় তুলে পেচ্ছাপ-পায়খানা করবে কী, শহর-বাজার, তার জন্য আলাদা ঘর আছে, সেই ঘরেই যা করার—

লোধা বউড়িঝিউড়িরা ঘরটার দিকে টেরিয়ে-টেরিয়ে দেখল, তারপর বসন্তর কথায় এ-ওকে ঠেলা মেরে হাসল, কেউ কেউ বলল বৈকি, নৈসা! খালভরা!

তারপর মনে মনে তুলনা করে দেখল— তপোবন জঙ্গলমহালের, এদিকে বাছুরখোয়াড়-বড়োডাঙা ওদিকে নারদা-চাঁদাবিলা, মাঝের ঐটুকু পৃথিবীতে দোরখুলি লোধাবস্তির ঐটুকু ঘুপচিতে তবু তাদের হাত-পা নাড়বার খোলামেলা অনেক জায়গা ছিল, কিন্তু শহর-বাজারের এত বড় পৃথিবীতে, কাঁহা কাঁহা খড়গপুর কাঁহা কাঁহা মেদিনীপুর, তবু জায়গা যেন ছোট হয়ে আসছে। বাসের ঐটুকু 'সিট', অতবড় বাসস্ট্যান্ডের ঐটুকু চালাঘর, তার উপর এখন আবার এত লোকের জন্য ঐটুকু ঘেরাঘর!

এ্‌ গো, চল্ ন মাব— দেখি কী গেঁড়াকল।

বলতে বলতে লোধাবউড়িঝিউড়িরা একদঙ্গল চলল 'ঘেরাঘরের' দিকে। যেন যাবে জঙ্গলে, ঝাঁটি কুড়োতে পাতা ছিঁড়তে। এখন বৈশাখ কী জষ্টিমাস, জাম জামরুলের কাল। খুঁজলে বন-আলু, নানাবিধ ফলমূলও পাওয়া যাবে। তারা এর তার গায়ে ঢলতে ঢলতে হল্লা করে হাঁটছিল।

ফিরে এসে দেখল— লাল-নীল গেঞ্জিপরা দুটো ছোকরা এসে কী যেন হুজ্জুতি বাধিয়েছে বসন্ত আর নীলুব সঙ্গে।

কী যেন কথা বলছে, কিসের জন্য যেন আব্দার তুলছে। লাল-নীল গেঞ্জিপরা পরদেশী ছোকরাদুটো যতজোরে না কথা বলছে, তাব থেকেও বেশি জোরে জোরে কথা বলছে নীলু।

নীলেশ্বর রীতিমতো তড়পাচ্ছে, তাব ইল্লি চিড়িক-চিড়িক শব্দ করে নীলুর এ-কাঁধ থেকে সে-কাঁধে লাফাচ্ছে, ঝাঁফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে।

পরিস্থিতি বে-গতিক দেখে নীলেশ্বরকে টানতে টানতে অন্যদিকে নিয়ে গেল গুরভা। লোধাবউড়িঝিউড়িরা ভাবল— 'মাত্‌বর' রাইবু নাই, এখন এসব কাজ তো গুরভাই করবে, সে-ই তো 'ছোট মাত্‌বর'।

ততক্ষণে রফা করতে ছোকরাদুটোকেও আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল বসন্ত। বসন্ত, বসন্ত। এখন তো দায় 'তাহারই'।

গুরভার বউয়ের ঘোরটা এখনো কাটেনি, সেই না-দেখা অচেনা 'পাখ'টার ঘোর। তার মাথার মধ্যে যেন আস্ত সেই 'পাখ'টা ঢুকে পড়ে অঝোরঝর ডেকে চলেছে— টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু -উ-ল টু-টু টু-টু-উ-উ-উ—

বসন্ত ফিরে এলে গুরভার বউ পাখির ডাকের ঘোর নিয়ে টলতে টলতে ঢলতে ঢলতে ঢলাতে ঢলাতে তার কাছে হাজির হয়ে যেন আব্দার করে বলল, দে, দে কামিল্লা!

কী?

ঐ যে -টি-উ-ল টু-টু, 'পাখ'-টা—

তো, কী?

ধরে দে, হুঁ!

বসন্তও যেন হাসল। এই লোধামেয়েমানুষটার প্রতি তার যেন একটু দুর্বলতা আছে। যখন লোধামাতব্বররা— কী রাইবু কী গুরভা কী শতুরা, রাইবু তো খেদিয়েই দিয়েছে তাকে— তখন গুরভার বউই কোমর বেঁধে বলেছিল, কেহ যাক না যাক, আমি কিন্তুক যাব্ব, কামিল্লা। বল্ ত কুথাকে, কার ধান কাটতে হবে?

পাখি-ধরা-টরা না, বসন্তর হাত ধরে লোধানী আসলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সরবতের দোকানে, ঐ যেখানে বিক্রি হচ্ছে লাল-হলুদ-কাগজী নানারঙের সরবত। তেষ্টা না? ধারে-কাছে তো সীতানালা খালও নেই, সীতানালার পায়রা-চঁচ্‌রা জলও নেই। চিবিয়ে খাওয়ার 'জল-সঁসর' চেঁকা-শাকও নেই।

গ্রীষ্ম। গরম বাড়ছে। এদিকটায় গরমও বেশি। মাঝে মাঝে বাসের গা রোদে-গরমে ঝলসে উঠছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু 'লোধাজনমাড়যদের' আবার গরম কি! কী গ্রীষ্ম কী বর্ষা কী 'জাড়'—বনে-বাদাড়ে ডুবকা-ডুংরিতে তো টঙস-টঙস করে ঘোরা!

সারা গায়ে রদোবদো ঘামাচির ফুস্‌কুড়ি। বসে থাকতে থাকতে চার আঙুলের নখ দিয়ে তাই মাঝে মাঝে আঁচড়ায়। চার আঙুলের 'পষ্ট' দাগ পড়ে যায়। খানিক বাদে ঘামে-জলে সে দাগ মুছেও যায়।

লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা বড়জোর শাড়ির আঁচলাটা 'ব্যাঠ্‌না'র মতো লম্বালম্বি মুড়ে গলার চারধারে 'বিঁচে বিঁচে' হাওয়া খায়।

আর বনে-জঙ্গলে, কেঁদ-কইম-বহেড়া-ভেলা-ভুড়রুর ডুব্‌কা-ডুংরিতে ফের গরম কোথায়! 'গাছতল' আছে না? আঃ দোরখুলির 'গাছতলে' এতক্ষণে বাবুইদড়ির খাটিয়া পেতে, খাটিয়া না হোক খেজুরপাতার চাটাই মেলে, চাটাই না হোক খালি ভুঁইয়েই শুয়ে ঘুম! ঘুম-ঘুম—

ঘুম, ঘুম।

এখানে এই শহর-বাজারে গাছ কোথায়? গাছই নেই— তার 'গাছতল'! খড়গপুর বাসস্ট্যান্ডের চৌহদ্দিতে যে-কটা গাছ এখনও আছে, তাদের মাথায় এত 'কাগা-বগা' হেগেছে আর বাসের তেল-কালি মাখা এত ধুলা-ধুঁয়া লেগেছে যে তাদের পাতা দেখে আর চিনবার উপায়ই নেই— কী গাছ ওটা? কিসের 'গাছতল'?

গুরভা দেখল— গালভরতি বসন্তের দাগ-ধরা কামিল্লাকে হাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে তার বউ। দেখেও সে কিছু বলল না, বলতে নেই— খালি সে পিট্ পিট্ করল তার চোখ দুটি।

কী এম্নি এম্নি? হাতে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধান্দায়। হাড়-কিপ্টে কামিল্লাকে নির্ঘাত জপাতে।

সরবতের দোকানে পৌঁছে গুরভালোধানী আব্দার করল, দে কামিলা, এক গিলাস সরবৎ খাবা। তিষ্টায় হামার ছাতি ফাটছে!

ছাতি ফাটেটে?

বসন্তর মতলব— তেষ্টায় সত্যি সত্যি বুক ফাটছে কী না লোধানী আগে বুক খুলে দেখাক। হাসতে হাসতে জরপ করে বলল, কীর'ম ছাতি তুমার লোধানী— অউটিকে খরায় ফাটি গলা?

ঠিসারা রাখ্ কামিলা, দুকানীকে বল— দু গিলাস সরবৎ দিতে।

আঙুল তুলে বোতলের দিকে দেখাল— এক গিলাস লাল এক গিলাস হলদা—

উরি বাবারে! কামিল্লা বলল, মাগনা কি? পৈসা?

বসন্তকে জোর ঠেলা লোধানীর। —হঁ হঁ মাগনায়, আমরা ত এখন তোর জিম্মায়। তুঁই খাবা!

বলল কি লোধানী— তামাম লোধাবউড়িরা এখন আমার জিম্মায়? মনে-মন খুশি হয়ে গেল বসন্ত। দর জিজ্ঞাসা করল দোকানীকে— হল্‌দা কত? লাল কত?

ফের গুরভার বউকে। —এক গ্লাস বলি?

দু-দুটো আঙুল দেখিয়ে গুরভালোধানী বলল, দু-গিলাস!

দু-গ্লাস তো দু-গ্লাসই। বটুয়া থেকে পয়সা বের করছে বসন্ত।

হলদা সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গুরভাবউ বলল, আঃ বাঁচে থাক কামিলা!

বসন্ত কামিল্লা আর থাকতে পারল না, বসন্তের দাগ-ধরা মুখে, নিজে এক গ্লাস সরবতও না খেয়ে, মুচকি হেসে ঢলে পড়ে বলল বিড় বিড় করে,

"ডাঁটি লো সুলোচনা,
তোকে দেখে আর পারি না।"

একটা গ্লাস শেষ করে গ্লাস থেকে মুখ তুলে গুরভালোধানী বলল, হঁ, কী একটা বললি কামলা?

কাই কিছে না।

কই কিছু না তো।

যা ভয় করছিল বসন্ত, হলও তাই। তাই, তাই। একা গুরভালোধানীকে সরবৎ খাওয়ালে হবে? বাকিরা কী ভেসে এসেছে বানের জলে?

বাসস্ট্যাণ্ডের 'শেডে' বসন্ত ফিরে আসতে না আসতেই তার হাত ধরে উল্টোদিকে হেঁচকা-টান দিল শত্রুঘ্নলোধার বউ নিয়তিলোধানী, কামিল্লা তাকেও তো একটা 'আণ্ডট' গড়িয়ে দিয়েছে পায়ে।

ব্বাসরে কামিলা! নিজের বেলা আঁটিসুঁটি পরের বেলা দাঁতকপাটি? না হয় গুরভার মাগ তোর আমনার লোক, তা বলে আমরা কী পর?

কথায় তো হারবে না 'লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা।'

মুচকি হাসল বসন্ত, বেশি হাসলে বুঝি আরো কিছু খসে যায়! মিঁউ মিঁউ করে বলল, আপন-পর— কী কওট লোধানী?

হঁ-অ কী কওট, মুখ ঝামটিয়ে উঠল শতুরার বউ, ছাড় তোর 'হাটুয়া ঢাম্'— আগে বল্ কী খাবালি গুরভার মাগকে?

"আপন-পর", "গুরভার মাগ-গুরভার মাগ"—বলে হাতে ধরে টানাটানি করে কী সব শুরু করেছে শতুরার বউ! আর আর লোধারা— গুড়কুঁদা-শরাবণ-চামটু-নীলু-গুরভা,বিশেষ করে তার মরদ শতুরা এ সব দেখে-শুনে কী ভাবছে? ঐ ত তারা থাপসা-গাদা হয়ে বসে পিট্‌পিট করে চেয়ে আছে এদিকেই।

ইঙ্গিতও করল বসন্ত।

কিন্তু উড়িয়ে দিল নিয়তি।

বলল, পোঁদের কত্থা নাই শুনব, গুরভার বহুকে যা খাবালি—আমাকে তা-ই খাবা!

খাবার কথা তো বলবেই— সেই তো তাদের ঘর থেকে তুলে এনেছে পুব-খাটার লোভ দেখিয়ে। হাত তো তার ধরবেই— বসন্ত কামিল্লা তো আর পর নয়, লোধাপাড়ায় সেই তো

সময়-অসময়ে ঘুরঘুর করে, চুর-বালা-আঙুট জলের দরে গছায়, জলের দরে বলতে কি একরকম মাগনায়।

মাগনায়, মাগনায়।

ভুবনার বউ ফুলটুসির সঙ্গে বঙ্কা মাহাতোর 'ইয়ে'— তখন? তার বেলা লোধামরদরা তো ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে— কই, এমন এমন যে রাইবু সেও তো একটা কথাও 'উদ্চারণ' করে নি।

' লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা'— ভবী ভুলবার না।

হাত ঝাঁকিয়ে বলল, বল্ কী খাবালি?

সরবত।

গাঁইগুঁই করে বসন্ত অবশেষে স্বীকার গেল।

ক গিলাস?

এক আঙুল দেখাল বসন্ত, অর্থাৎ এক গ্লাস। এইখানে সে একটু মিথ্যা বলল। কারণ সে হিসাব করে দেখেছে— দলটায় যতজন লোধানী এখনও আছে, তাদের প্রত্যেককে দু'গ্লাস 'লাল-হলদা' সরবত খাওয়ালে যত খরচা-বরচা হবে— তার তুলনায় যতদিন সে মাথাপিছু যত 'কমিশন' পাবে— সে-কমিশনের 'পড়তা' কত পয়সা বৃদ্ধি করলে তা উশুল হবে, আর তাতে 'মহাজন' কতটা রাজি থাকবে আর তাদের প্রত্যেককে এক গ্লাস লাল বা হলদা বা কাগজী সরবত খাওয়ালে—

তাই এক গিলাসই খাবা!

লাল খাবে না হলুদ খাবে না কাগজী খাবে— জিভে জল নিয়ে লোধানী তো বাছতে বসল।

'মহাজনরা' আসতে শুরু করেছে।

কেউ কেউ এক ফাঁকে ঘুরেও গেছে। আবার আসবে। তারা হয়ত হোটেলে স্নানাহার সারছে। স্নানাহার সেরে একেবারে 'মুনিষ' নিয়ে ঘরে ফিরবে।

প্রয়োজনের তুলনায় এবার 'মুনিষ' এসেছে বেশি। আর তাই দর-কষাকষির সুযোগ থাকছে, দেখে-শুনে ধীরে-সুস্থে যে যার পছন্দসই 'মুনিষ' কিনবে।

পুরাতন মনিব পুরাতন মুনিষ খুঁজবে। না-পায় যদি তো নতুনই সই। এখন না হলেও পুরাতন মুনিষরা আসবে আষাঢ়-শ্রাবণে আমন রোয়ার মরশুমে, আসবে কার্তিক-অঘ্রাণে সে-আমন কাটার দিনগুলোয়।

এখন তো বরো, হাই ইল্ডিং! তাও হেলা-ফেলার কী? এবছর চাষ হয়েছে দেড়গুন বেশি।

বসন্ত কামিল্লার মহাজনরা এখনও এসে পৌঁছায়নি, তবে এসে যাবে। তার আগে নীলু-গুরভার সঙ্গে কিছু জরুরী শলা-পরামর্শ সেরে নেবে বসন্ত।

দুই লোধানীকে সরবত খাইয়ে ফিরে এসে ঐ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল বসন্ত। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল এই জন্য যে, ফাঁক বুঝে আবার কোন্ লোধানী দৌড়ে এসে হাত-মুঠ চেপে ধরে বায়না না করে বসে— দে কামিল্লা আমাকেও সরবত খাওয়া!

সরবত যেমন-তেমন, ভাত? আজ দুপুরের ভাত এত বড় 'বিড়হো' গুষ্টিকে কে খাওয়াবে? মহাজন এসে পড়লে আজ দুপুরের ভাত না হয় তার ঘাড় দিয়েই আদায় করা যেত।

কিন্তু সে তো, তারা তো এখনও আসে নি! বসন্ত মনে-মনে ভাবল— যারা এবেলা ওবেলা সীতানালার আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে পেট ভরায়, তাদের আবার দুপুরের ভাত কী? মট-বিঁড়া-বোঁচকা-বুঁচকিতে আলু-তুম্বা থাকে যদি তো তাই বের করে খাক না।

বসন্ত কামিল্লা দফায় দফায় আলোচনায় বসল গুরভার সঙ্গে, নীলেশ্বরের সঙ্গে। রফা কিছু হল না। তখন দু'জনকে নিয়ে বসন্ত বসল একসঙ্গে।

আর এসময়ই লোধাঝিউড়িবউড়িরা হিড়িক তুলল গা-ধোওয়ার। —এই গরমে গা না ধুলে শরীর 'অসকস' করবে না?

চকিতে শুনতে পেয়ে বসন্ত কমিল্লা বিড়বিড় করে বলল, "বসতে দিনে খাইতে মাগে, খাইতে দিনে শুইতে মাগে"—

ইল্লির শিকলিটা টেনে ধরে নীলেশ্বর বলে উঠল, হঁ কী বললি কামিল্লা?

কামিল্লা বলল, কাই কিছ্রে না।

এতক্ষণে নীলেশ্বর লক্ষ্য করল— কামিল্লার চোখের পাপড়ির চুলগুলো 'পাঁড়রা'। তার মানে পিঙ্গল।

পাঁড়রা-চুলঅলা চোখের মানুষ ভালো না মন্দ?

নীলেশ্বর বুঝতে পারল না।

এ গো, গা না-ধুয়ে কী থাকা যায়? তার উপ্রে এই বিদেশ-বিভুঁই— কত অ-লোক কু-লোকের ছুঁয়াছুঁয়ি—

হঁ ত সিনা!

তা স্নান করুক না লোধাবউড়ি!

কিন্তুক—

হ্যাঁ, একটা 'কিন্তু' আছে। এখানে কোথায় গা ধোবে লোধাবউড়ি? বুলান-হদহদি নেই যেখানে হদ্ হদ্ করে জল পড়ছে। হিল হিলানি গতর দুলানি মন ভুলানি ঠাকুরবাঁধের পানিও নেই যে গা-ডুবিয়ে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা। ধারে-কাছে সীতানালাও নেই। তপোবন জঙ্গলমহালে ঝাঁটি কুড়োতে পাতা ছিঁড়তে যাও যদি তো এক-এক করে সতেরবার সীতানালা খাল পড়বে। মন চাহে যদি তো একবার কেন সতেরবার খালের 'পায়রা-চঁচ্‌রা' 'কাল্‌হা' জলে বাউলা হয়ে গা ভিজাও দেখছে বা কে।

কিন্তু এখানে, এই খড়গপুর বাসস্ট্যাণ্ডে, নদী বল নালা বল খাল বল বিল বল— সব তো ঐটুকু, ঐ 'ঘিরা-জাগা'টা।

লোধা মরদদের হাঁক্‌ডাক সত্ত্বেও গুরভার বউ শতুরার বউ বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে 'সিনানে' চলল। তাদের দলে ভিড়ল পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরাও।

তেমন জল না থাকে তো তারা না হয় কাক-স্নানই করবে। কোনমতে গা ধু'য়ে 'সাফা' হয়ে আসা। তারপর তো খাওয়া—

এ গো কে খাবাবে?

সে একজনা।

কে সে?

বলছি ত কেউ একজনা।

নাম কি?

থাম ত— অত্ত ভেড় ভেড়াইস্ না। পাইলে খাব্বি ত?

হঁ খাব্ব।

হাঁ কর্।

দু'হাতে তালি মেরে লোধাবউড়ি মস্‌করা করে 'হাটুয়া-ছুআদের' মুখ থেকে শোনা ছড়াটা এই ফাঁকে উঠল,

"ঘোষের ঘরে রসের পিঠা খেতি কাঁকড়ার ঝোল।
কাই থাইলা রে মিরধা বাঁদর দিলা হরিবোল।।"

বসন্ত কামিল্লার 'পরস্তাব'-টা হল— একটা দল নিয়ে গুরভা যাক একদিকে, সেটা দাঁতন-সোনাকনিয়ার দিকে হোক কী খাকুড়দা-সাউরী-তুরকার দিকে হোক। আরেকটা দল নিয়ে নীলেশ্বর যাক আরেকদিকে— ডেবরা-বালিচক-পাঁশকুড়ার দিকে।

গুড়খার বেটা নীলু তো একপায়ে খাড়া। যেদিকেই যেতে হোক না কেন— উত্তরে হোক দক্ষিণে হোক—মাতব্বরি করার এত বড় সুযোগটা সে ছাড়বে কেন?

গুরভার এককথা—এই সেদিনকার ছেলে নীলুয়া, এখনও গাল টিপলে দুধ বেরোবে। এতবড় একটা দল নিয়ে একা সে পারবে কেন? আর তাছাড়া—

আর তাছাড়া— কি কহ্টু গুরভা?

নাই কামিলা, পথে-ঘাটে একটা কিছুক হয়ে গেলে তার বাপ-মাকে আমি কী বলব— তারা ত আসে নাই হঁ।

আড়বুঝ লোধাকে এখন কে বুঝাবে?

বসন্ত জানে— একবার বেঁকে বসলে গুরভাকে আর সোজা করা কঠিন। রাইবুর চ্যালা তো— কুকুরের লেজ! ঘি দিয়ে ডললেও সোজা হয় না!

তবু হাল ছাড়ে না বসন্ত। মহাজন লাগার আগেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে তাকে। দু'জন দু'দিকে— যাবে না মানে? আলবাৎ যাবে!

দরকার হয় যদি তো গুরভার বউকে দিয়ে বলাবে। না হয় আরেকটা 'আণ্ডট' লোধানীকে এম্নি এম্নিই গড়িয়ে দেবে বসন্ত।

বেলা 'আড়' হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডে বসে থাকা নামাল-খাটতে-আসা মানুষের সংখ্যাও কমে আসছে।

কমে আসছে, কমে আসছে।

কতক গেল 'মহাজনের' সঙ্গে বাসে উঠে, কতক যাচ্ছে এখান থেকে ঐ ওভার-ব্রীজের উপর দিয়ে খড়গপুর রেল-ইস্টিশনে— সেখান থেকে তারা তাদের মহাজনের সঙ্গে যাবে ট্রেনে চড়ে।

বসন্ত কামিল্লার 'মহাজন' এখনও আসেনি। —কে জানে সে কোন্ জন! আর তাই তাদের এখনও খাওয়া জোটেনি।

বসন্ত তো হাত নেড়ে দায় সেরে ফেলেছিল এই বলে— সে তো এতক্ষণ খাওয়ালোই, আর সে তাদের মালিক নয়, মালিক তো এখন নতুন মহাজন। দায় তারই— আসুক সে, হোটেলে নিয়ে গিয়ে সেই তাদের আচ্ছা করে খাওয়াবে।

খাবার আশায় গা ধুয়ে হাত ধুয়ে তো বসে আছে নামাল-খাটতে-আসা লোধাজনমাড়ষ লোধাবউড়িঝিউড়িরা।

এক তপোবন আশ্রমে সাধুবাবার কালে অষ্টমপ্রহর কী চব্বিশ প্রহরের 'মোচ্ছব' ছাড়া আর কখনও বাইরে এক-দু জন ছাড়া বাকিদের খাওয়া জোটেনি। —এই বেশভূষায় হোটেলে ফের ঢুকতে দেবে তো? মট-বিঁড়া-বোঁচকা-বুঁচকি ঘাড়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লে হোটেলের লোকজন ঘাড় ধরে ফের বের করে দেবে না তো?

বের করে দিয়ে হয়ত বলবে—'আপনাড়া খাবার জাগায় লাইন দি ঢুকিব'।

হুঁ, 'আপনাড়া' না আর কিছ্রে বলে বাজারিয়া লুকো তোদের দঁড়বৎ করবে!

বলে নিজেরাই এ-ওকে ঠেলা মেরে হাসাহাসি করল।

তবে হ্যাঁ, খাওয়া হত বটে 'মোচ্ছবে'! আশ্রমের দেদার কলাগাছের পাতা কেটে সীতানালার পায়রা-চঁচরা জলে ধুয়ে লাইনে বসে যাও— কেউ কিছু বলছে না। ধোঁয়া-ওঠা কুড়চিফুলের মতো সাদা সাদা জাউ-ভাত আর খোসাসুদ্ধ কাঁচা মুগের ডাল, সে-ডালের ঝোল কলার পাতা বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে— কেউ কিছু বলছে না। বৈতাল আর পুঁইখাড়ার ল্যাব্ড়া হাঁপ্রে যত কিছু খাচ্ছ— কেউ কিছু বলছে না। খাওয়ার শেষে এঁটো কলাপাতাটাও তুলে না নিয়ে ফেলে রেখেই চলে যাচ্ছ— কেউ কিছু বলছে না।

সে-রকম না হোক, তবু, কিছু তো খাবার আশায় আশায় নতুন মহাজনের পথ চেয়ে 'থামসা-গাদা' হয়ে বসে আছে লোধাজনমাড়ষ লোধাবউড়িছেমড়িরা।

লোধাবউড়ী-ঝিউড়ীদের এতক্ষণ ডর-ভয় ছিল না। তারা বেশ একসঙ্গে এতলোক—মজাই পাচ্ছিল একরকম। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে— এখন একটু যেন অন্যরকম।

অন্যরকম, অন্যরকম।

একেকটা বাস চলে যাচ্ছে লোক নিয়ে, একেকটা বাস লোক নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে, বাস থেকে নামা লোকজন লটবহর কাঁধে পোঁটলা-পুঁটলি হাতে যে যার বাড়ি যাচ্ছে।

শতুরাশবরের বউ নিয়তিলোধানী এতক্ষণ বাসগাড়ির আসা-যাওয়া দেখছিল। তাদের এতদূরে নিয়ে এসেছিল যে-বাসটা, মণিকাঞ্চন, এতক্ষণ তার দৃষ্টির মধ্যেই ছিল— তারপর কোথায় যে হারিয়ে ফেলল!

সেই তারা গোনার মতো—"একটা তারা দুইটা তারা, বামুন ঘরের ঝারাপারা"—গুনতে গুনতে চোখের দৃষ্টি কখন যে আরাঝারা হয়ে গেল! তারাটা হারিয়ে গেল!

বাসটাকে হারিয়ে ফেলল নিয়তি। হারিয়ে ফেলে মনে মনে সে কেঁদে আকুল হচ্ছিল, এবার সে সত্যি সত্যি ডুকরে কেঁদে উঠল।

সবাই চলে যাচ্ছে, যে যার 'ঘর'। শুধু তারা-ই যেতে পারছে না—আর কোনোদিনও যেতে পারবে কি দোরখুলির লোধাবস্তি?

লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা, ডাকাবুকো বলে যার বেশ খানিকটা খ্যাতি ছিল, সবকিছুকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার যার সত্যি সত্যি বুকের পাটা ছিল, সে-ই কী না সবচেয়ে আগে কাঁদল!

আকুলি-বিকুলি কান্না! অঝোরঝর কান্না!

চোখ বুজে সে এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে—জোড়া শালতলা-ধ'তলা-ঠাকুরবাঁধ-মাঝুডুবকা—

কুলবুদা-কেঁদ্‌বুদা-বেনাবুদা সুরথ-ত্রিলোচনদের বাঁশঝাড় বুলাম-হদহদি সরুবালি-চিকন বালির বাঁশতলা—

নিয়তি তাদের ঘুপচীর চালবাতায় কী-একটা জিনিস গুঁজে রেখে এসেছে-এখন কিছুতেই মনে করতে পারছে না। মনটা আঁই-ঢাঁই করছে তাই।

'সাফা-ছেলে' ফুলেশ্বরকে সে তো রেখে এসেছে তার 'আজা ঘরে', নাদন-গাড়িয়ায়। 'মামু-ঘর যৌটা, আজাঘর সৌটা।'

জিনিসটা যে কী— মনে করতে না পারলেও তার মনে মনে ইচ্ছা হচ্ছে, ফিরে গিয়ে এখনই চাল-বাতায় হাঁতড়ে হাঁতড়ে দেখে।

কিন্তু ফিরবে যে তার উপায় কই? বাসটা তো নেই, মণি না ফণিকাঞ্চন— সে তো কোন্

ফাঁকে চোখে ধুলা দিয়ে হাওয়া! যেন সে লোধালোধানীদের খড়গপুর বাসস্ট্যাণ্ডে পেট থেকে উগরে দিয়ে থাপস্-গাদা করে দিতেই এসেছিল! কাজ হয়ে গেছে সে চলেও গেছে!

নিয়তিলোধানীর দুম্ করে আরও মনে পড়ে গেল তার ঘরের পিছনে দুটি চকাচকি তালগাছের কথা। মনে পড়ল কী— স্পষ্ট সে দেখতে পেল দিনের আলোর মতো।

ফুল হল, ফুল ঝরে গিয়ে কাঁদিতে তালের 'কষি' এল, সে-কষি বড় হল। তাল হল, তাল পাকল, তাল পড়ল—

উপোরন্যু পড়ল দুম্।
দুম্ বলে মোর পোঁদ্ সুঙ।।

তালের পিছনটা শুঁকে যেন পাকাতালের গন্ধও পেয়ে গেল শতুরার বউ। সে যেন দেখলও— তার স্বামী শতুরাশবর গামছার দু'মুড়োয় দু-দুটো পাকা তাল বেঁধে, কাঁধের সামনে-পিছনে ঝুলিয়ে হাটুয়াদের গ্রামের দিকে হেঁটে চলেছে।

সে যাবে বড়োডাঙা কী থুরিয়া, কিয়াঝরিয়া কী বিরিবাড়িয়া, চঁদরপুর কী খান্দারপাড়া। তাল বেচে সে চাল আনবে। সে-চাল ফুটিয়ে লোধানীকে ঘরে খাবার যোগাড়যন্তর রাখতে হবে, করতে হবে— হাঁ-হাঁ মরদ খেতে চাইলে উপায়?

রীতিমত অস্থির অস্থির। কেঁদে-কেটে একশা হয়ে যাচ্ছে লোধানী। কাঁদতে কাঁদতে রেগে যাচ্ছে, আর যত রাগ গিয়ে পড়ছে—বসন্ত-গুরভা-নীলুয়া— ঐ তিনজনের উপর। তারাই তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে এতদূর নিয়ে এসেছে ঘর থেকে!

সবচেয়ে বেশি রাগ কামিল্লার উপর— নামাল দেশের সুলুক-সন্ধান ঐ তো দিয়েছে! ট্যাকের পয়সা খরচ করে বাসে চড়িয়ে ঐ তো নিয়ে এসেছে! মন ভুলাতে আণ্ডট গড়িয়ে দিয়েছে কে? —ঐ তো, ঐ।

নিয়তিলোধানীর মন চায়— দৌড়ে গিয়ে কামিল্লার চুলের মুঠি ধরে তাকে এখন 'ভুঁয়ে' শোয়ায়, তার ছাতির উপর চড়ে বসে দমাদ্দম কিল মারে। কে জানে— হয়ত এই লোকটাই যোগসাজস করে রাইবুকে ধরিয়ে দিয়েছে, লোধাদের 'নামাল' খাটাতে নিয়ে আসবে বলেই লোধাবস্তি থেকে সরিয়ে দিয়েছে 'মাত্‌বর'কে।

এ-দিগরে রাইবুর পরের জন, ছোট 'মাত্‌বর' গুরভাকেও ভালো চোখে দেখছে না নিয়তি নির্ঘাত— গুরভা-কামিল্লা— দুই স্যাঙাতে ভিতরে-ভিতরে একটা কিছু আছে।

নিয়তিলোধানী মনে-মন ভাবল— আমি মরছি আমার জ্বালায়, হাফ্‌সে-ঝাঁপ্‌সে, আর সে কী না দুধের ছাউ-ছেনাদের মতো খাড়িখুঁচি নিয়ে মাটিতে এঁচেড়-বেঁচেড় কাটছে? তার কোনো হেল-দোল নেই?

দেখে-শুনে বসন্ত পড়েছে ফাঁপরে! নামাল খাটাতে এ-কাদের সে নিয়ে এল! ভস্‌কা ভস্‌কা খাম-আলু মেটে-আলুর মতো ঐ গা-গতরই সার! সেই বলে না?—

গতরের নাম আদরমণি।
গতর নাই ত পচাপানি।।

গতর কোথায়? এ তো পচা গাড়িয়ার পচাপানি— লেকের-পেকের ছিচ্‌কাঁদুনী, একটুতেই কেঁদে ভাসাচ্ছে।

এ লোধানী, চুপ মার! চুপ মার!

বসন্তর মহাভয়— এই বুঝি মহাজন না এসে পড়ে! মহাজন এসে কাঁদুল-মাদুল 'মেয়েমুনিষ' দেখলে— সে কী আর মুনিষ কিনতে রাজি থাকবে? তার তো 'ডাহা লস্—'

অ্যাই গুরভা, অ্যাই নীলুয়া! কিছু কহিবু ত— হা দ্যাখ্ কীর'ম কাঁদেটে-আ—রি-

গুরভা একবিন্দুও নড়ল না, কাঠিখুঁচি দিয়ে মাটিতে যেমন এঁচেড়-বেঁচেড় কাটছিল, তেমনি কাটতে থাকল।

তার রাগ হয়েছে, রাগ বলে রাগ! —এই ধুরন্ধর কামিল্লার ব্যাটা কামিল্লা কী না তার আর নীলুর মধ্যে 'কাইজা' লাগাচ্ছে। দুজনকে দুদিকে ঠেলে দিচ্ছে। একাকে বকা —একা একা যাবই বা কেন? ঝামেলা কামিল্লার— কামিল্লাই পোহাক। গুরভা নড়বে না।

থাপস্-গাদা হয়ে বসে থেকে কাঠিখুঁচি দিয়ে আরো জোরে জোরে মাটি আঁচড়াতে লাগল গুরভা।

বসন্ত দেখল— এ তো মহাযন্ত্রনা! এক লোধানীকে হাফ্সে-ঝাঁফ্সে কাঁদতে দেখে আর আর লোধানীরা লোধাছেমড়িরাও না কাঁদতে বসে যায়! কেউ তো কখনও নিজের ঘুপচী ছেড়ে, নিজেদের বস্তি ছেড়ে, বন-ঝাড় ছেড়ে 'নামাল' খাটতে এর আগে এতদূর আসে নি!

কিন্তু বসন্ত ভেবে পায় না— কী-ই বা রেখে এসেছে তারা? কতক ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙা খাপরা, শুকনা পাল্হা-পাতর, চাট্টি বেল-মেলের খোসা— এই তো বড়জোর? তার চেয়ে বাস-ট্রেন-উড়াকল, এত লোকজন-বাবুভায়েরা, সঙ্গে যে যার মরদ, যে যার 'টকা', কোলের কাঁখের, তার উপর অউ মুই বসন্ত— বসন্ত, বসন্তিয়া যা কও— মুই ত অছি— আমি তো আছি— আর কী চাই—

কামিল্লা নীলেশ্বরের হাত ধরে বলল, মোর নীলুভাই, তোর হাতে ধরি কহিঠি— যা, অউ বেলে সামলা! যাক, নীলু এখন সামাল দিক!

খুড়ী-মউসীদের কাঁদ্না, কাঁদুল-মাদুল মুখ দেখে নীলেশ্বরও মুহূর্তে চলে গিয়েছিল বৈকি কুঠিঘাট-গোপী-কমলাসোল-চাঁদাবিলা-নারদা পেরিয়ে মাঝুড়ুবকার দোরখুলিতে।

লোধাপাড়ার সদর রাস্তায় না গিয়ে, তাদেরই তৈরি করা ঘুরপথে, খিড়কি-বাটে। সেই যে প্রতিদিন শুকনা ডাঙায় পা ফেলে ফেলে, চলে চলে চলে, ঝোপঝাড় কেটে, ঘাস মেরে, মাটি চেঁছে নিজেরাই যে-পথ-বানিয়েছে, সেই পথে।

পথের দু'ধারে এই খরায়-মরায়ও বেশ ঘন সবুজ আর লাল হয়ে উঠেছে সাদা ভেরেণ্ডা আর লালভেরেণ্ডার বন। দুধে ভারি হয়ে আছে ভেঁড়রাগাছের পাতার বোঁটা, ভাঙলেই দুধ ঝরে পড়বে টোপা টোপা।

নীলেশ্বর স্পষ্ট দেখল— তার ছোটভাই লুলু ভেঁড়রাপাতার দোনা বানিয়ে সে-দোনায় সাদাভেঁড়রার দুধ দুইছে।

দুইতে দুইতে যখন বেশ খানিকটা হল, তখন পাতার বোঁটা চিরে গোলাকার ফাঁস বানিয়ে সেই ফাঁস দুধে ডুবিয়ে লুলু ফুঁ দিচ্ছে, আর ফুঁ দিচ্ছে।

ফুঁ দিয়ে ছোট-বড় অজস্র ঘোড়ার ডিম বানিয়ে আকাশে ছেড়ে দিচ্ছে। শুধু কী আকাশে, 'গ্যাল্হাতে গ্যাল্হাতে' হাসতে হাসতে কতক ছেড়ে দিচ্ছে মায়ের মুখের উপর, কতক বাপের মুখের উপর।

বাউকোও হাসছে, লুলুর সঙ্গে মজা করতে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দুয়েকটা ধরারও চেষ্টা করছে। মুখের উপর এসে পড়লে মা খালি সামান্য হাত নেড়ে না ধরেই বলছে, 'হামি নাই পারি, হামি নাই পারি'। বলতে বলতে হাসছে।

নীলেশ্বর দেখল— লুলুর আকাশে ভাসিয়ে দেওয়া দুয়েকটা ঘোড়ার ডিম যেন ভাসতে ভাসতে খড়গপুর বাসস্ট্যাণ্ডেও এসে গেল— ঐ আসছে।

ধরতে হাত বাড়িয়ে আপনার মনে হেসে উঠল নীলেশ্বর।

তুই হাসুটু, চিন্তায় মোর পেসার বাড়ি যায়েটে আর তুই হাসুটু নীলু? বসন্ত কামিল্লা ধাকাল

দিচ্ছে নীলেশ্বরকে।

নীলেশ্বর বলল, হঁ আমারও কী কম চিন্তা কামিল্লা?

চিন্তা তো আছেই, সেও তো রেখে এসেছে তার বাপ-মা-ছোটভাইকে। নামাল খাটতে তারাও তো আসতে চেয়েছিল, আসতে দেয়নি নীলুই। ঘর করে একজনও না থাকলে— সময়ে-অসময়ে দরকার হলে—

সাবিপিসির শ্বশুর ভৈরবকুম্হার তো একটা 'ছিটিয়াল' লোক— তার মাথায় কখন যে কী পোকা নড়ে! এই আদরে-আপ্যায়নে নাতিকে বেটার বউকে অতিষ্ঠ করে তুলল তো পরমুহূর্তেই— দূর দূর-হাড়ি হাড়ি-

নীলেশ্বর ভাবল— এম্নি কোনো অঘটন দৈব-দুর্বিপাক যদি ঘটে যায়, কাঁদতে কাঁদতে যদি ফিরেই আসে সাবিপিসি— তবে কোথায় কার কাছে দাঁড়াবে লোধাপাড়ায় এসে?

অতএব থাক, ছোটভাই লুলুকে নিয়ে বাপ-মা থেকেই যাক— তারা না হয় দেখে-শুনে আসছে বারে যাবে।

এবার হাতে ধরে হ্যাঁচকা মেরে নীলুকে বসন্ত তুলে দিলে নীলু বলল, আমি কী করব কামিল্লা।

যা, শতুরার বউটারে চুপ করা!

হঁ-অ খালি কথায় চিড়া ভিজে? সাধে কী কাঁদছে কামিল্লা? —কাঁদছে ত ভোকে, খিদার জ্বালায়। কখন আসবে তোর মহাজন, তখন হবে খাবার আয়োজন—

কথাটা লুফে নিয়ে আর কেউ জরপ করে বলল, হঁ-হঁ সেই বলে নাই— কবে পাকবেক তাল সে অনেক কাল?

ওসব শুনছি নাই, দায় ত তোর— তুঁই খাবা!

চারধার থেকে কামিল্লাকে ঘিরে ধরল লোধাজনমাড়ষ।

খিদার কথা ভুলে গেছে একমাত্র গুরুভার বউ। সে এখনও মউজেই আছে— কতদিনকার সাধ তার পূরণ হতে চলেছে! হলিয়ে-ঢলিয়ে বাবু-ভায়াদের খেতিতে নেমে ধানকাটা। সেই 'বাসিয়াম বেলা' থেকে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ধানগাছের গোড়ায় গোড়ায় দা চালিয়ে ধানকাটা।

ধানকাটা, ধানকাটা।

ধানের সুঙ বিঁধছে গায়ে, গা কুট্ কুট্ করছে— তো দাও দায়ের ডগা দিয়ে পিঠ চুল্‌কে। 'গিরিহার' লোক 'বাসিয়াম' নিয়ে এলে ফের বাসিয়াম খাওয়ার ছুটি।

আশপাশের জলে, সে খালের জল হোক বাঁধের জল হোক, বুড়বুড়ি ঝর্নার জল হোক, সে-জলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে মুড়হি নিয়ে বস-অ, জলে-ভিজা বতর করা সোঁদা সোঁদা মুড়হি খাও, চিবাও। ধানকাটা শেষে গিরিহার বাড়ি গিয়ে মজুরি নাও নগদা-নগদি। আর তারপর, তারপর কাছে-পিঠের দোকানে বুলুং-উলুং সওদা করে বাসাকে আস-অ। বাসায়, সে যত পার সুখ ভোগ কর। সুখ, সুখ।

এত সাধের 'সুখ-সুখ'টা কী না শতুরার বউ কেঁদে ভাসিয়ে দেবে! আলু-তুগু 'তাড়া'র সময় যেমন করে কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে নেয়, তেমন করে কোমরে শাড়ি জড়িয়ে গুর্‌ভার বউ হাজির হল শতুরার বউয়ের কাছে।

এগো চুপ মার। ধম্‌কে চুপ করিয়ে দিল শতুরার বউকে। বলল, কী তেখন থিক্যে সুরুক সুরুক কাঁদ্‌না। কাহার না ছাউছুনা ঘরকে আছে? তাও ত সে আছে মামুঘরে—তাই তাই তাই মামুঘরকে যাই, মামুঘরের—

শেষ করতে হল না, তার আগেই নিয়তিলোধানী হেসে উঠল।

তারপর তারা দুজনেই এর-ওর গলা জড়িয়ে হাসতে লাগল।

একে একে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মহাজনরা আসছে। কেউ আসছে বাস থেকে নেমে, কেউ ট্রেন থেকে, কেউ বা হোটেল থেকে খেয়ে-দেয়ে পান চিবোতে চিবোতে বেলা পার করে দিয়ে, যাতে না কুলি-কামিনদের অতবড় 'বিড়হো' গুষ্টিকে আজ দুপুরের 'খাওয়াটা' খাওয়াতে হয়!

তবু তো তারা এল কারো-কারোর জন্য, কোনো কোনো 'গ্রুপের' জন্য। যাদের এখনো কেউ এল না—তাদের কী যে নাজেহাল অবস্থা! কম দামেও কেউ যদি নিয়ে যায়—ভগবানের কাছে এখন এই তাদের প্রার্থণা।

ঘরে তারা আর এখন ফিরবে না, ফিরলেও লোক-হাসাহাসি হবে—কারণ তারা তো ঘরে-দোরে কাঁটা পুঁতে দিয়েই পথে নেমেছে। —একটু আগে চিঁড়রা-কাঁধে ওদিকটায় ঘুরে এসে এতসব 'রহস্যকথা' জেনে ফেলেছে নীলেশ্বর।

দলটায় তার বয়সী এক ছোকরা আছে— মহাজন কী 'গিরিহা' কেউ এল কী এল না, এসবে তার কোনো হেল-দোল নেই। নীলুর কাঁড়-কাঁড়বাঁশ-গুটুল আর ইল্লির মতো সেও সঙ্গে এনেছে বাঁশের চোঙায় ভরে পাখি ধরার 'আঠা কাঠি'।

ঘাড় নিচু করে আপনার মনে বাঁশের চোঙা থেকে 'আঠাকাঠি'র গোছা অর্দ্ধেক বের করে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ্‌নি ছুঁইয়ে তর্জনীর সঙ্গে বুড়ো আঙুল মিল-মিশ করে 'আঠাকাঠি'র আঠার ধার দেখছিল সে বারবার। যেন আঠার ধার ঠিক থাকলেই ঠিক— আর কী চাই?

ওদিকটায় ঘুরে এসে দেখে-শুনে নীলুও কেমন হয়ে গেল 'উধাস'।

উদাস, উদাস।

আর এসময়ই দাঁতনের ওদিকে কড়িয়া না বামনদা থেকে কামিল্লার চেনা-জানা এক মহাজন এল।

হোটেল থেকে খেয়ে-দেয়ে পান চিবোতে চিবোতে লোকটা আসছে, দেখামাত্র দৌড়ে গেল বসন্ত।

তারপর থেকে একদণ্ডও মহাজনের পিছু ছাড়েনি কামিল্লা। পান খেতে যাচ্ছে তো-সে পানের দোকানে। 'সিগ্রেট' কিনতে যাচ্ছে তো— সে 'সিগ্রেটের' দোকানে।

লোধাজনমাড়য লোধাবউড়িঝিউড়িরা পর্যন্ত ফিস্ ফিস্ করে বলল, হঁ যাচ্ছিস ত পাছু পাছু, ইবার আমাদের খাবার কথাটা বল, খিদায় পেট যে দঁহরাচ্ছে! আর কবে খাবাবি?

যা হয় হোক, সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল নীলেশ্বর। বসন্তকেই সে বলল, কামিল্লা, আমাদের খাবার ব্যাপারটা—

খাবার কথা উঠতেই মহাজন ঘড়ি দেখে তড়িঘড়ি বলল, এখন আর খাবার 'টায়েম' কোথা? বাস ধরতে হবে যে! তার চে' এক কাম কর—

বলেই পকেট থেকে দু-দুটো দশটাকার নোট বের করে বসন্তকে না, নীলুয়াকে ডাক দিয়ে বলল, কাঁই গেলু রে! এই লেই যা, ভুজা-তেলেভাজা কিনি আন, বাসে যাইতে যাইতে খাবু!

ভুজা তো ভুজা-ই সই। আসবার সময়ও বাসে তারা মুড়ি-তেলেভাজা খেয়েছে, না হয় 'গিরিহা'র ঘরে যাবার সময়ও বাসে তারা মুড়ি-চপ-পকোড়াই খাবে।

চিঁড়রা-কাঁধে নীলেশ্বরকে নতুন মহাজনের বেশ পছন্দই হয়েছে। ছোকরা যেন একটু

অন্যরকম। অন্যরকম, অন্যরকম। হাত-পায়ের 'গোছ' আছে। এ তো এনেছে শিকলিবাঁধা কাঠবিড়ালী, কেউ কেউ নিয়ে আসে বেজী 'নেউলো', খুকড়া লড়াইয়ের খুকড়া ষাঁড়া—

তবে সঙ্গে আনা কাঁড়-কাঁড়বাঁশ দেখে মহাজন মনে মনে চটে গেল খুব। —এসব আবার কী? বেলদা-খাকুড়দা-দাঁতন-সোনাকনিয়ায় বন-ঝাড় কোথায় যে তীরধনুক নিয়ে 'বাঘো-হুঁড়ারো শিকার করবু'?

লোধাবউড়ীঝিউড়ীদেরও মনে ধরেছে মহাজনের। আড়চোখে সে তাদের দেখেছে— ফোপরা 'নুহে' শাঁসে ভরা। খাটবে খুব। কিন্তু পুরুষগুলো— আলিসা ধাকুড়ধুমা! গতর আছে, অলস— খাটবে না।

যাক গে, এদের দিয়েই বরো-হাই-ঈল্ডিং-আই আর ছত্রিশটা যাহোক করে তুলে নেবে বামনদার অদ্বৈত পৈড়্যা।

মনে মনে কুলি-কামিনদের পছন্দ হলেও অদ্বৈত মুখ ব্যাজার করে বসন্তকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, বসন্তিয়া, কী সব লোধাগোদা লোক তো আনিছু মেলা! এরা কাজ-কাম জানে তো? এরমেনে ধানগাছ চিনে তো?

ধানগাছ চেনে তো! কথাটা শুনতে পেয়ে রাগে রি-বি করে জ্বলে উঠল নীলেশ্বর। পারলে নোট দুটোই 'গিরিহা'র মুখের উপর ছুঁড়ে দেয় সে। —এত বড় কথা! ধানের এত বড় অহঙ্কার! বলে কী না—

মুড়ি কিনতে যেতে যেতে নীলেশ্বর কুম্‌হারপাড়ায় তার সাবিবিটির শ্বাশুঘরটাকেই মনে মনে তুলে আনল। —খলা খামার ধানবিঁড়া ধানগাদা ধানপাটা ধানের ডোল ধানের বোড়া ধানের শিষ ধানের টুঙ ধানের মোড় ধানতলা একচাষ-দুচাষ কাদা-বতর তলারোয়া ধানের বোয়ালি কাড়হান উপড়ান ধানফুল ধানথোড় ধানের সুঙ তুষ-আগড়া—

সাবিবিটিই বলেছে কতরকম ধানের নাম— জলকলস কলমকাঠি সীতাশাল নুনিয়া ঝিঙাশাল জামাইলাড়ু কার্তিকছোলা কালোজিরা জয়া রত্না আই-আর-ছত্রিশ—

আর ধানবিল? —পাড়িয়া কুমারডুবি দলা করনতলা পাকুড়তলা জাঁতাল বুড়বুড়িতলা ঢড়াধার দখিনসোল পুন্নাডিহি বুলান হদহদি—

আমি কী জানি নাই? —যদি বর্ষে মকরে ধান ফলে টিকরে—মকরের দিন যদি জল-ঝড়িয়া হয়, তবে সে-বছর টাঁড়ে-টিকরেও ধান ফলবে। কিম্বা সেইটা?—আমে ধান তেঁতুলে বান— যে বছর আম বেশি হবে, সে বছর ধানও বেশি ফলবে আর তেঁতুল বেশি হলে তো বন্যা-বন্যা-বন্যা-

তবু বলে কী না— 'এরমেনে' ধানগাছ চিনে তো? ধানগাছ তো ধানগাছ, লোধারা ধানগাছের 'চের'-টুকুও 'ভাল্লমত' চিনে বৈকি। 'চের'- তার মানে শিকড়। সেই বুলান-হদহদির মগরা-ডোবায় ধানগাছের গোড়ায় লেগে-থাকা ছঁচমাটি বহন্তি জলের ধাক্কায় ধাক্কায় ধুয়ে গেলে বেরিয়ে পড়ে ধানগাছের গোছা গোছা শিকড়— সিনানকালে লোধাবউড়িঝিউড়িরা সে তো 'কত্‌ত' দেখেছে!

বিড় বিড় করতে করতে নীলেশ্বর অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেল মুড়িওয়ালার দোকানে মুড়ি কিনতে। সঙ্গে আসতে হাঁক দিয়ে গেল সেই সুরুয়া-লাইবুকু-নাকফুড়ড়িদের।

এদিকে অদ্বৈত পৈড়্যাকে রীতিমত তোয়াজ করে চলেছে বসন্ত কামিল্লা। অদ্বৈত দাদা তো নয়— বসন্তর অদা।

বুঝল নি অদা, ধীরপানি পাথর কাটে? দেখতে ঐ রকম ধীরস্থির হাবাগোবা— কিন্তু কাজে-কামে লোধালোধানীরা হিড়গোড় মানে না, বেদম খাটতে পারে।

অদ্বৈত পৈড়্যা ঝানুলোক— সে কী আর বুঝে না!

তবু হেসে বলল, তু কহ্চু?

হোউ হোউ, তুমার শোশরার রান অদা—

হাত ধরে ফেলল কামিল্লা। তাকে যে করেই হোক গছাতেই হবে। সে তো ভুলতে পারছে না— চ্যালা-কাঠ-হাতে রাইবুর সেই তাড়া! লোধাঝিউড়িবউড়িদের 'নামাল খাটতে' পাঠানোর কথা বলতে সেদিন উগ্রচণ্ড রাইবু কী কাণ্ডটাই না করেছিল তাকে নিয়ে!

যে-লোধাবস্তিতে কাক-চিলও ঢুকতে পারে না, সেখানে ঘরের লোকের মতো তো ঢুকে পড়েছিল সে। শুধু কী ঢোকা— চুর-বালা-আঙট পরানোর ছলে কতবার যে লোধানীদের হাত-পা ধরেছে সে!

অদ্বৈত পৈড়্যা আরেকবার চারধারে চোখ বুলিয়ে বলল, বেশ বেশ, তু যখন কহ্চু—

বলেই কুলি-কামিনদের তাড়া দিল মহাজন, যা যা সোউ বাসটায়— সোউ যে "মেদিনীপুর-দীঘা-ভায়া এগ্রা-কাঁথি-বালিসাই" লিখা অছি— সোউ বাসটায় ধাই গিড়িগিড়ি উঠি পড়, যা!

কতই যেন লেখাপড়া করেছে তারা— বাসের নম্বর, বাসের নাম দেখেই ঠিক বাসে উঠে পড়বে!

তবু মট-বিঁড়া-বাটি-গিনা-তাটিয়া-ঘটি-গিলাস-বোঁচকাবুঁচকি-দা-কাতান-শাবল-খন্তা-কাঁড়-কাঁড়বাঁশ-চাঙ-চিঁড়রা যাবতীয় লটবহর চলল ঠিক-বাসের দিকেই। সেই— "মেদিনীপুর-দীঘা ভায়া এগ্রা-কাঁথি-বালিসাই"—

এগ্রা-কাঁথি-বালিসাই—অতদূরও যেতে হবে না। ঠাকুরচক পেরিয়ে খাকুড়দা, খাকুড়দার ডাহিনা সুরকি রাস্তা—

রাস্তার একধারে তুরকা—

তার আশপাশে সাউরী-রসুলপুর-কিয়ারি-রেনজুড়া-কড়িয়া-বামনদা-কুলিদা-জেনকাপুর-গৌড়দা-গাঙ্গুটিয়া। থানা দাঁতন।

আরো কিছুটা এগিয়ে সাউটিয়া-গোমুণ্ডা-সোলপাট্টা-মাটিবিরুয়া। থানা মোহনপুর।

পটাশপুর-এগ্রা-সাতমাইল-কাঁথি-বালিসাই-রামনগর তো আরেকদিকে। আরো দূরে।

বামনদা-কুলিদা-কড়িয়া, সে-তল্লাটেরই মাটি খুব উর্বর, জমি দু-তিন ফসলা। তার উপর এবছর বোরো-হাই ইল্ডিং হয়েছে দেড়া।

বসন্ত ছাড়া বাকিরা উঠে পড়েছে। বসন্ত উঠল না, বসন্ত তো যাবে না। সে এসেছিল এ-পর্যন্ত, এখান থেকেই সে ফিরে যাবে।

তার কাজ ছিল নতুন মহাজনের হাতে নতুন 'নামালিয়া'দের সঁপে দেওয়া। সঁপে সে দিয়েছে— সঁপে সে তো দিয়ে-ই-ছে দুটো হাত এক করে!

মুড়ি-তেলেভাজা নিয়ে নীলেশ্বররা ফিরে এলে মেদিনীপুর-কাঁথি-দীঘাগামী বাসটা ছেড়ে দিল। দোরখুলির লোধাজনমাড়ষ লোধাঝিউড়িবউড়িরা লোধাছউছনারা এই প্রথম, 'সেকেন' নয় 'ফাস্ট', নামাল গেল।

নামাল গেল, নামাল গেল।

যেতে যেতে বাসের জানলায় ঘাড় বের করে হাত নেড়ে নেড়ে কিছু কী বলল অদ্বৈত পৈড়্যা? শুনবে বলে বাসের পিছু পিছু কিছুদূর দৌড়েও গিয়েছিল বসন্ত।

বাসের ধুলোমুলোয় এমন জেরবার হয়ে গেল যে কোনোকিছুই শুনতে পেল না। —বোধহয় টা-টা করেছে অদ্বৈত। বলল কি অদ্বৈত— টা-টা গুডবাই, আবার যেন দেখা পাই?

দেখা তো হবেই অদা, মনে মনে বলল বসন্ত, আমহর লুকো ত রহি গলা, তাবাদে গুড়ের নাগরী-গুড়কুঁদা তিল-ত্রিসির পাইকিরি—

লোধারা চলে গেল। এতক্ষণ সে-ই —এই বসন্তই-তাদের মালিক ছিল। কোথাকার কোন্ দৈত্য না অদ্বৈত এখন থেকে তাদের 'গিরিহা' হয়ে গেল।

ভেবেই কেমন মুষড়ে পড়ল বসন্ত। এতক্ষণ এই তো বেশ ছিল, হাসি-ঠাট্টায় জরপে-ঠিসারায় ঠাসাঠাসি-ঠারাঠারিতে! সরগরম, সং[illegible]। না হয় লোধানীরা মুখ তুলে খেতে চেয়েছিল এক-দু'গিলাস' লাল-হলদা সরবত্, বায়না ধরেছিল গা-ধোয়ার জন্য জলের, না হয় ঘরের জন্য বনঝাড়ের জন্য বনের আঁউলা-বাঁউলা কাঁকড়ো-কান্না শাক-পাল্হার জন্য 'সুরুক-সুরুক' করে কেঁদে ভাসিয়েছে কেউ কেউ, কিন্তু লোধাপুরুষরা, হ্যাঁ লোধাপুরুষরা কেউ একজনও তো একটা কিছু বলেনি! কেবল ঘাড় নিচু করে হাতের কাছে কাঠি-খুঁচি খাপরা-আঙরা যা-কিছু পেয়েছে, তাই দিয়ে মাটিতে কেটে গেছে এঁচেড়-বেঁচেড়।

বাসস্ট্যাণ্ডে 'গিরিহা'র অপেক্ষায় এখনও কুলি-কামিনরা আছে। 'গিরিহা' আজ এলে ভালো, না আসে তো আসবে কাল। আজ যেমন এল না বসন্তের চেনা-জানা বালিচকের সুবল শাসমল, লুটুনিয়া-তেমাথানীর হরিমাধব জানা।

এলে এই দলটাকেই দু'ভাগ তিনভাগ করে এর-ওর কাছে সঁপে দিত বসন্ত। তখন গুরভা 'যাব নাই নাই যাব' করে হাজারবার কেঁদে ভাসালেও কী-আর সে-কথা শোনা যেত!

আজ এদের নিয়ে এসেছে একজন বসন্ত, অন্যদের নিয়ে এসেছে আরো একজন বসন্ত, কাল তাদের নিয়ে আসবে আজকের বসন্ত, অন্য তাদের নিয়ে আসবে অন্য অন্য বসন্ত, বসন্তে বসন্তে এই কদিন মেলা বসে যাবে বাসস্ট্যাণ্ডে।

বসন্তর এতক্ষণে মনে পড়ে গেল— আরে, অন্যদের খাওয়াতে হবে সেই ভয়ে আজ তার নিজেরও তো নাওয়া-খাওয়া হয়নি! আজ রাতে আশপাশে খড়গপুরের কোনো হোটেলে দেখবার মতো খাবার খাবে সে!

আচ্ছা, কী কী খাবার খেতে পারে সে? ভাত-ডাল-আলুপোস্ত-পোস্তর বড়া-একটা কিছু সব্জি— ধুত্ এসব নিরামিষি খাবার সে তো নিজের বাড়িতে হামেশাই খায়। আজ সে খাবে আমিষ—

চিকেন-বিরিয়ানী চিকেন-কবিরাজী চিকেন-দোপেয়াঁজী চিকেন-কষা চিকেন-কারি মাটন-বিরিয়ানী মাটন-কষা মাটন-কারি মোগলাই-পরোটা ফিস-ফ্রাই ফিস-কাটলেট মাছের কালিয়া মুড়িঘণ্ট মাছ-পোস্ত দই-ইলিশ—

বাড়ি-ফেরার লাস্ট বাস যদি বা পাওয়া যাবে, গ্রামের বাসস্ট্যাণ্ড থেকে গ্রামে যাওয়ার পথটা অতরাতে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ হবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ আজ রাতটা কোনো হোটেলেই কাটিয়ে দেবে বসন্ত। কাল ভোরে বাস ধরে সে বাড়ি ফিরবে।

বাড়ি ফেরার কথা মাথায় আসতেই আচমকা ভয়ে ভাবনায় কুঁকড়ে গেল বসন্ত। রাতে হোটেলে বসে চর্ব-চোষ্য নানা পদ খাওয়ার কথা তার মাথা থেকে উবেই গেল।

আচ্ছা, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রাইবু লোধাবস্তিতে ফিরে এসে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা-নীলুয়াদের না দেখে গাছের 'কোটরায়' রাখা তার চোরাই বন্দুকটা হাতে নিয়ে তাকে রাস্তা-ঘাটে ঘেরাও করে কৈফিয়ৎ চাইবে না তো— অ্যাই কামিল্লা, বল্ লোধাদের কোথায় বেচলি?

মনে মনে যুক্তি খাড়া করে কামিল্লা— যা যা, বললেই হল? আমি কী তাদের কাঁধে করে বয়ে এনেছি, তাদের পা নেই? —আরে রাইবু, তোর অঁটার লুগা সাপ হিনে তু কি করবু! ঘর শত্রু বিভীষণ!

জানুক রাইবু— তার কোমরের কাপড় যদি সাপ হয়ে যায়, তবে সে কী করবে!



কড়িয়া-বামনদা-গৌড়দা-জেনকাপুর-রংশঠিয়া-কুলিদা-সাবড়া-সাউরী-তুর্কা-সাউটিয়া-গোমুণ্ডা-সোলপাট্টা-মাটিবিঁরুয়া-

কতরকম নাম 'পুবাল' দেশের 'নামাল' দেশের! —অতসব নাম কী আর বাপের জম্মে কখনও শুনেছে দোরখুলির লোধাবস্তির গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা-নীলুয়া-নিয়তি-আদরি-রুদনী-পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা?

তারা তো বড়জোর মুখস্থ করেছে, তাদের কাছে 'জল-ভাত' হয়ে আছে ঐ তো দোরখুলি-রুখনীমারা-সুখজুড়ি-মুঢ়াকাটি-বড়খাঁকড়ি-নারদা-চাঁদাবিলা-নিশুই-পাঁচকাহিনা-

তারা যে মায়ের পেট থেকে পড়েই শুনে আসছে শাল-পিয়াশাল-ধ-আসন-কেঁদ-কইম-করম-করঞ্জ-গামার-বহেড়া-মহুল-জাম-অর্জুন-ভাদু-কুচলা-

পিয়াল-বেল-ভেলা-ভুড়রু-চিহড়-হরিতকী-আঁটারি-চুরচু-কুসুম-কুড়চি কী বনকাল্লা-বনকুঁদরী-বনপুঁই-বনকাঁকড়ো-বনকরমচা-

বৈঁচি-কুল-সেঁয়াকুল-অনন্তমূল-ঈশ্বরমূল-পানআলু-খামআলু-চুন-চুরকা-শ্বেতবেড়ালা-বনআদা-বনহলদি-কুঁচ-ভুঁইআঁকড়া-আলকুসি-খারদুধি-শতমূলী-আঁউলা-বাঁউলা-

কুরকুট-কুকরবিছা-সরুবালি-বড়বালি-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া-পরব-শালপণ্ডড়া-আলু-তুণ্ডা-কান্দা-খঙ্গা-ঢ্যাম্‌না-গোই-গোধি-

বর্গভীমা-সরশঙ্কা-বকডিহি-গোধনটিকরী-হিড়িম্বাডাঙা-সানপুকুর-বুড়াবুড়ি কালুপুর মোগলমাবী-লাড়মা-বারদুয়ারী-মুণ্ডমারী-সখীসেনার পাঠশালা-কুড়ুমবেড়ার নাম কী আর তারা শুনেছে?

শুনলেও শুনতে পারে বড়সোলের গজ্‌না, গুড়খার বেটা নীলুয়া, ভুবনার 'মেইয়া' সেই নুকু। লক্ষ্মীরানী, লক্ষ্মীরানী।

দোরখুলির জঙ্গলে আলু-তুণ্ডা আর কাল্লা-কাঁকড়ো নিয়ে আজও পড়ে থাকলে এতসব কী আর জানতে পারত তারা? এই যেমন গতকাল বাসে আসতে আসতেই তারা শুনেছে—

কোথায় কোন্ দেশে নাকি বাঁশগাছে ফুল ফুটেছে! বাঁশফুল, বাঁশফুল। তার মানে খারাপ, খুব খারাপ! আকাল আসছে।

লোধাদের আর বাঁশগাছ কোথায়— সেই তো এক দোরখুলির লোধাবস্তির অদূরে মাঝু-ডুবকায় সরুবালি চিকনবালির বাঁশতলা। সেসব বাঁশগাছে বাপের জম্মেও ফুল ফুটতে দেখেনি গুরভা-গুড়কুঁদা-শতুরা-শরাবণরা।

নাকি ছোট ছোট কাঁচা কেঁদ ফলের মতো ফুল সব! মাটিতে ঝরে পড়লেই 'চুটিয়া'র উৎপাত। 'চুটিয়া'— তার মানে ইঁদুর। উন্দুর, উন্দুর। বাঁশ-পণ্ডড়া বা বাঁশ-করোল খেতে ভালবাসে 'হাতি শুঁড়' আর 'উন্দুর' খেতে ভালবাসে বাঁশফুল।

খাওয়া মানে খাওয়া! শ'য়ে শ'য়ে ইঁদুর, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ইঁদুর। তুড় তুড় করে বাঁশবনে বাঁশঝাড়ে বাঁশডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বাঁশফুল খাচ্ছে। বাঁশফুল খাচ্ছে, বাঁশফুল খাচ্ছে, আর জন্ম দিচ্ছে আরো শ'য়ে শ'য়ে ইঁদুর, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ইঁদুর।

এগো, বাঁশফুল ফুরালে উন্দুর খাবে কী?

কেনে বন ফুরালে তুঁই যা খাবি।

অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা ঘামিয়ে লোধাবউড়ি বলেছিল, হঁ তাই ত, আমরাও উন্দুর, বন ফুরালে কী বা খাব— ধান কাটতে নামাল যাব।

ত সেইর'ম, বাঁশফুল ফুরালে উন্দুরও কী-ই বা খাবে— ধানের টুঙ কাটতে নামাল যাবে।

বাঁশঝাড় থেকে নেমে আসবে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ইঁদুর। বাঁশফুলের সোয়াদ মুখে নিয়ে পিল্ পিল্ করে ধেয়ে আসবে মানুষজনের খেতি-খামারে, ঘরবাড়িতে।

ফসলের টুঙ কাটবে, আনাজপাতির 'গেঁড়ু' কাটবে। মরাই থাকলে মরাই, ডোল থাকলে ডোল, মট-বিঁড়া-বোঁচকাবুঁচকি যা থাকবে— সব কিছুই কেটে-কুটে ফাঁকা করবে। ফাঁকা, ফাঁকা।

নেই তো নেই— 'জনমাড়ষের পিন্ধনের লুগা' ধরে টান!

চলতে-ফিরতে মানুষজনের পরনের কাপড় ধরে টান মারবে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে শ'য়ে শ'য়ে ইঁদুর চলন্ত মানুষের 'পরন্ত' কাপড়ও কেটে ঝিল্‌ঝিল্ করে ছাড়বে।

তুমি খেতে বসবে— ইঁদুর। 'জলঘাট' বসবে— ইঁদুর। শুতে যাবে—ইঁদুর। ঐসব করবে— ইঁদুর। খেতিখামারে কাম করবে— ইঁদুর। বাবু-ভায়েরা আপিসে কলম ধরবে— ইঁদুর। গাড়িতে উঠবে—ইঁদুর। বাসগাড়িতে বসবে—ইঁদুর। ইঁদুর, ইঁদুর—

"ই-রি-বা-বা-রি" বলে বাসের মধ্যেই কেউ একজন লোধাবউড়ি তো 'চিম্নে' উঠে শুরু করে দিল কাপড় ঝাড়তে। এখানেও ইঁদুর!

—হঁ গ এই ত গেল সরসর করে—

নাকি সেদেশে শুরু হয়েছে ইঁদুর-মারা, শুরু হয়েছে বাঁশফুল-পাড়া, বাঁশফুল পেড়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া। 'সাফা সাফা' জামা গায়ে বাবু-ভায়েরাও ইঁদুর মারছে। 'গরমেন্টের' লোক পর্যন্ত বাঁশফুল পেড়ে পোড়াচ্ছে।

রাজ্যপাল থেকে প্রধানমন্ত্রী, ছোট মন্ত্রী থেকে বড় মন্ত্রী— কে না তটস্থ!

লোধাপুরুষরা তাই শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করেছিল, নামাল খাটতে এদিকে না এসে ওদিকে গেলেই বোধহয় ভাল হত।

—শালা একেকটা চুটিয়ার ল্যাজের দামও কী না দু'টাকা!

ইঁদুর ধর, মার, আর কুচ করে ল্যাজ কেটে 'গরমেন্টের' ঘরে জমা দাও। দিলেই নগদা-নগদি হাতে-গরম দু'টাকা। দু'টাকা, দু'টাকা।

কেউ একজন লোধাবউড়ি হুটমুট বলেও ফেলেছিল, শুধু ট্যাকাটাই দেখলে? আর লাল লাল চোখ-না-ফুটা উন্দুর ছানা? —কাঁচায় কচমচ করে কী ভাল্ল যে খেতে! -সেটাও ধর-অ!

বলতে বলতে নির্ঘাত জল এসে গিয়েছিল লোধানীর টাকরায়-জিভে।

বাসে আসতে আসতে তারা আরো শুনেছিল, বাসের ঐ 'হাটুয়া' লোকগুলোই বলাবলি করছিল— এদেশে, এই নামাল দেশেও নাকি আজ কদিন ধরে বৈকালের দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি 'হল্‌দা-বৃষ্টি' হচ্ছে।

তার মানে 'মেঘপাতাল' থেকে হলুদ গোলা জল পড়ছে।

সে পড়তেই পারে, লোধা-লোধানীরা তাতে তেমন অবাক-আশ্চর্য হয়নি। তার কারণ তারা তো এমন বৃষ্টি হামেশাই দেখেছে—

সীতানালা খালধারে তপোবন জঙ্গলমহালে আলু-তুণ্ড 'তাড়তে' গিয়ে, কাঁকড়ো-কুঁদরী ভেলা-ভুড়রু পাড়তে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে এসে গেল 'ছাগল-ভিড়কানো' বৃষ্টি।

তেমন জোরেও নয়, গুঁড়িগুঁড়ি— যা মাঠে মাঠে চরন্ত ছাগলের গায়ে পড়লে ছাগল তো ভড়কে যায়, 'ম্যামাতে ম্যামাতে' ঘরমুখো দৌড়ায়।

লোধা-লোধানীরা বড়জোর গাছতলে মাথা গোঁজে, জল থেকে মাথাটুকু গায়ের ন্যাতাটুকু বাঁচায়।

অঝোরঝর নয়, জল তো সামান্যই। হয়ত চোখ বুজেই ছিল, গায়ের নুন জলে ভিজে চোখে আসছিল।

বোজা-চোখ খুলতেই জল-ঝড় হাওয়া, বৃষ্টি থেমে গেছে। আর দেখে কী— লাটা-পাটার পাল্হা-পতরে গাছ-গাছড়ার ডাল্হা-পাল্হায় ছিট্ ছিট্ দাগ। কখন 'হল্‌দা' কখনও চন্দন-বাটা কখনও রক্তফোঁটা। বনঝাড়-ডুবকা-ডুংরির কী পাতাবাহার।

তারা কবে দেখেছে! আর নামাল দেশের লোক কী না এই দেখল 'হলদা বৃষ্টি'।

গুরভার বউ মুখিয়ে উঠেছিল যখন শুনল বাবু-ভায়েদের একজন কেউ হাত নেড়ে নেড়ে বলছে—খাল-বিলের 'হল্‌দা' ঘোলাজল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, মেঘপাতালে গিয়ে 'হল্‌দা' মেঘ হয়, সেই মেঘ 'হলদা বৃষ্টি' হয়ে 'বসমতায়' ঝরে পড়ে।

গুরভার বউ মন করেছিল বলতে— নাই গ' নাই, অতই সহজ বাবু? মূল কথাটা তবে শুন গ' বাবু— আসমানে রাম-সীতার 'বাহা ঘর' হচ্ছে—

রামের ঘরে রাম তেল-হলুদ মাখছে, সীতার ঘরে সীতা তেল-হলুদ মাখছে। 'গায়-হুড়িদ' হচ্ছে। রামের বাপঘর থেকে তেল-হলুদ এসেছে, সীতার বাপঘরের বউড়িরা সীতাকে সেই তেল-হলুদ মাখাচ্ছে—

"মা কৈ জাগানাক রাই-সরষর তেঁড় গ
বাউ কৈ জাগানাক হেম-সাগর হুড়িদ হে গ
গাবি বে না সিতা হেম-সাগর হুড়িদ
আরো হুড়িদ আনবেক মাই গ
তবে সিতা-বিহাতে সাজবেক হে গ"

মা মাখাচ্ছে রাই সরষের তেল, বাপ মাখাচ্ছে হেম সাগরের হলুদ। রাম-সীতা তেল-হলুদ মেখে 'সিনান' করছে। সেই 'সিনান-জল' আসমান থেকে গদ্‌গদ্ করে—

—হঁ তাই 'হল্‌দা জল'বাবু গ'।

'হলুদ বৃষ্টি' নিয়ে মাথা ঘামাবার অত 'টায়েম' কোথায় বামনদার অদ্বৈত পৈড়্যার। মাঠময় পড়ে রয়েছে হাই-ঈল্ডিং।

অবশ্য এখন পর্যন্ত কী কড়িয়ার রাখাল দত্ত, গৌড়দার পঞ্চানন, তুর্কার নীলকণ্ঠ— কেউই তেমন সুবিধা করতে পারেনি। একমাত্র গতকালই তো নামালিয়া কুলিকামিন তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে অদ্বৈত।

শঙ্কর, আই আর ছত্রিশ— "গোছ পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলে— আমি এইঠি অছি।" অদ্বৈতর খেতি-খামারে লক্ষ্মীর ছড়াছড়ি!

আজ হচ্ছে হোক 'হলদা বৃষ্টি' ছিট্ ছিট্। কাল যেন না নামে সাদা দরদরিয়ে! তাহলে তো মাঠের ধানের দফা-রফা। তার উপর কাটা হয়ে থাকে যদি তো মাঠেই পচবে। এতগুলো কুলিকামিন ঝড়িয়ায়-বাদলে ঘরের ভিতর তখন থাপ্‌সা-গাদা!

অদ্বৈত ঘুম থেকে উঠেই ত্বরিতে পা চালাল পুকুর 'আড়ায়'। গোহালঘরের লাগোয়া পুকুরের পাড়ে চারধার খোলা চালাঘরে গাদাগাদি করে আছে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা নিয়তি-রুদনী-পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীরা।

পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই হাঁক ছাড়ে অদা পৈড়্যা, কাঁই রে নীলুয়া, খরা হেলানি আউ কেতে বসি থিবু?

কই রে নীলুয়া, বেলা যে উঠে গেল— অর কত বসে থাকবি? নতুন 'গিরিহা' নীলুয়াকেই হাঁক পেড়ে বলল। বলতে হয় বলা— এখনও তো কাজের কোনো 'দিশা' নাই। সেই কোন্ ভোর থেকেই তো উঠে বসে আছে নীলুয়া-গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা।

নীলুয়ার নামটাই আগে জানা হয়ে গেছে অদ্বৈতর। মনে তো হয় কাঠবিড়ালী কাঁধে নীলুয়াকে মনে ধরেছে নতুন 'গিরিহার'। উঠতে-বসতে— নীলুয়া, নীলুয়া।

কথা শুনে গুরভা গুড়কুঁদাকে ঠেলা মেরে বলল, লোকটা উড়িয়া।

হঁ ত কী?

শুন্‌নিস নাই— এক উড়িয়ায় গাঁ উজাড়, এক বুড়িয়ায় বন উজাড়? হাতে একটা বুড়িয়া থাকলে বন কেটে উজাড় করতে কতক্ষণ?

হঁ, উড়িয়া-বুড়িয়া, লোকটারও বুড়িয়ার মতো ধার আছে— ধারে কাটে। আঁউ-মাউ করে কী সব বলছে।

কেউ একজন ছোকরা বলল, কেন্নে, আমরাও ত উড়িয়া, আমাদের চাঙু-নাচের গীত ত উড়িয়াই, এগো শুনো ন—

মিহি ও চেরা গলায় সে ধরল—

"টভা নারঙ্গ ফল পাকুছি ডালে ডালে
বহুছি হে মধুমালতী।
কি রসবতী মো নারী অবলা যুবতী
পাকি পড়ুছি তলে যাচিন দিবা বলে
পাকুছি কি হে মধুমালতী।।
কি রসমতী মো নারী অবলা যুবতী—"

আরে তাই তো, নামালে এসে তারা বাপের নাম তো ভুলেইছে, জাতের নামও ভুলে গেল! উড়িয়া, উড়িয়া —তারা তো উড়িয়াই। বসুশবরের বংশধর —পুরীতে এখনও রথের দড়ি টানে!

'গিরিহার' ডাকে 'পোখরীর' আড়ায় আড়ায় কিছুটা এগিয়ে গেল নীলেশ্বর। তার ইল্লি চালাঘরের খুঁটিতে শিকলি দিয়ে বাঁধা। 'পভুর' বিহনে চিড়িক চিড়িক করে সে লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে।

কী মনে করে তার কাছে চুপিসাড়ে এগিয়ে গেল চাঁদবদনী। নীলুয়া যেমন বুনো ওল তেন্নি চাঁদবদ্নীও তো বাঘা তেঁতুল। —এরকম একটা কেন দশটা 'চিড়রা' সে পুষতে পারে। গোবরের নাদি কুড়াতে, খণ্ডা-বণ্ড্র খুঁজতে সেও তো এদিক-সেদিক কম ঘুরেনি। কুম্‌হারপাড়া-কাম্‌হারপাড়া-খান্দারপাড়া-বড়োডাঙা-চাঁদরপুর-লব্‌কিশোরপুর-কুস্তুড়িয়া-হাতিবান্ধি—

কোথায় কোথায় না সে ঘুরেছে! না হয় নীলুয়ার মতো দু-চার ক্লাস পাস দিয়ে হিল্লি-দিল্লি সে করেনি, নছিপুর না অছিপুরে 'হাটুয়াদের' হোস্টেলে থেকে 'শুধু খাচ্ছে আর পড়ছে, পড়ছে আর খাচ্ছে' —সেই ব্যাপারটা সে করতে পারেনি—

তা বলে পাঁড়কা-কপতি-ক্যারকেটা-কয়ের-গুঁড়ুর-বনি-চটি-চিড়রা ধরতে তার সঙ্গে নীলুয়া পারবে কেন? নীলুয়া যদি চলে পাতায় পাতায়, সে চলে শিরায় শিরায়।

শিকলি টেনে ইল্লিটাকে কব্জায় নিয়ে এল চাঁদবদনী। রামের পাঁচ-আঙুলে দাগা বুলানো শরীরটায় তারও পাঁচটা আঙুল মিলিয়ে মিলিয়ে হাত বুলালো। তারপর ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে

একদিকের গালটা চিঁড়রার গালে প্রায় ঠেকিয়ে চাণ্ডুগীত-গাওনেঅলা সেই লোধা ছাউয়ের ধুয়ো ধরল খুব ধীরে প্রায় চুপিসারে—

“টভা নারঙ্গ ফল পাকুছি ডালে ডালে
বহুছি হে মধুমালতী—”

ঘুম থেকে জেগে উঠে উবু হয়ে বসে আছে গোটা দলটা হাঁ করে। এর আগে এত কাছ থেকে 'হাটুয়াদের' একটা গোটা বাড়ি এত ভাল করে কভু কী দেখেছে? সেই তো আঁউলা-বাঁউলা ভুড়রু-মুড়রু কেঁদ-কষাফল নিয়ে বাছুরখোঁয়াড় বড়োডাঙ্গা কী খান্দারপাড়ার হাটুয়াদের বাখুলে লোধাবউড়িঝিউড়িরা সওদা করতে গেলে এলে বড়জোর কুল্‌হিরাস্তায় কী খলা-খামারে বসিয়ে রেখে জিনিস কিনে চাল কী পয়সা আনতে ঘরের ভিতর যায়।

তখন লোকগুলোর দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে উলুক-ঝুলুক ঘরের ভিতর দিকে তাকালে হাঁকাড় দিয়ে খেঁকিয়ে উঠবে না সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি খেঁকুড়ে-মড়া হাটুয়া বুড়োগুলো?

চোর-চুরনির পারা ভিতর-ঘুরকু কি দেখুটু আঁ?

মুহূর্তে চোখ বুজে ফেলে লোধানী। তার চোখের উলুক-ঝুলুক চাহনি কী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সত্যি সত্যি চোর-চোট্টাদের মতো?

ততক্ষণে খেঁকুড়ে-মড়া হাটুয়া বুড়োগুলো মুরুব্বির মতো হয়ত বলতে লেগেছে, চোরকে আল্‌হো সয়নি।

চোখ বুজে ফেলেছে, চোরের তো আলো সহ্য হয় না। কোথায় লোধানী জড়ো হওয়া পায়ের ফাঁক খুঁজে তার চোখকে পাঠিয়েছিল গৃহস্থের ভিতর-ঘরে কুকুরের জিভ বের করা খাঁ খাঁ খরায় পুড়ন্ত দেহে 'টুকচার' ঠাণ্ডা-কাল্‌হা-ওম্ আনতে, কোথায় হা-ঘরে টঙস্ টঙস্ করে ঘুরে-বেড়ানো লোধানী হাতে না হোক চোখে বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছিল ঘরের ভিতর ঘর তার ভিতরেও ঘরের অবস্থাটাকে, কোথায় কুল্‌হিরাস্তায় বসে থাকা লোধাবউড়ি চোখে চোখে পরখ করে দেখছিল ঘরের ভিতর 'গিরিহানী'র জায়গায় সে থাকলে কেমন হয়— আর সেই তাকেই কী না 'চোর' অপবাদ?

চোর, চোর।

চমকে উঠে চোখ বুজে ফেলেছে লোধানী। আজ এতদিনে নামাল খাটতে এসে সেই কোন্ ভোর থেকে উঠে পোখরি-আড়ায় চালাঘরের নিচে বসে লোধাবউড়িঝিউড়িদের কয়েকজোড়া চোখ চোখ-ভরে দেখে যাচ্ছে নতুন 'গিরিহা'র অর্ধেক পাকা অর্ধেক টিনের চাল-অলা বাড়িটাকে।

বাড়ি বলে বাড়ি— মস্ত ভর-ভরন্ত।

এই তো লাগোয়া গোহালঘর, গোহালঘরের ভিতর ক'জোড়া যে গরু কান লট্‌পট্ করছে! গোহালঘরটাই যে আড়ে-দীর্ঘে কত!

ওদিকটায় মেসিন-ঘর, ধান-কুটা। কত বস্তা 'কুঁড়া' যে ডাঁই হয়ে আছে মেসিন ঘরের বাইরে। এনামেলের থালায় জলে গুলে দিলে সে-কুঁড়া কতগুলো হাঁস যে কতদিনে খাবে।

কতগুলো ঘর! —এত গুলো ঘরে কত লোক, কত কী যে আছে! গুরভার বউয়ের চোখে ধাঁধার মতো! বড় বড় ঝুরকার ভিতর দিয়ে ঘরের আলো-আঁধারিতে মনে মনে সে যে কত কী দেখে ফেলছে!

এই দেখল— পালঙ্কে শুয়ে আছে নতুন 'গিরিহানী'। হুঁশ নেই। 'গিরিহা' তো কাজ-পাগল, রাত থাকতে থাকতেই লদোপদো উঠে পড়েছে।

ঘুমোচ্ছে 'বহুরানী'। ঘুমাক। তার আর কাজ কী অত ভোরে উঠে! কাজ তো তার একটাই—গতর! গতর ধরে রাখা, গতর না টসকায়! সেই বলে নাই—

গতরের নাম আদরমণি।
গতর নাই ত পচাপানি?

গিরিহানী 'করট' ঘুরল। পাশ ফিরতেই হাতে-হাতে চুড়িতে-চুড়িতে চুর-বালায় ঠোকাঠুকি। রিন্‌ঠিন্‌ রিন্‌ঠিন্‌। গিরিহার বউ কত কী পরে আছে— নাকে নাকফুল, কানে কানপাশা, পায়ে মল, কোমরে বিছাহার—

গুরভার বউ স্পষ্ট শুনল, স্পষ্ট দেখল। নতুন 'গিরিহা' দোতলা থেকে নেমে এসে 'খলায়' দাঁড়িয়ে উপরের দিকে থুতনি উঁচু করে নীলুয়াকে হাঁক দেওয়ার আগে বউকে হাঁক দিয়ে বলল, কাঁই গো শুনুচ! মেসিন-ঘরর চাবিখাড়ি দও ত!

বলামাত্র 'গিরিহানী' পালঙ্কে শুয়েই শাঁখা-বালা-পরা-হাত ঘর থেকে বাড়িয়ে বারান্দা ছাড়িয়ে নিচের দিকে গিরিহার হাতেই চাবিটা ফেলে দিল টুক্‌ করে।

গুরভার বউ দু'চোখে কী ঝিলিঝিলি দেখল? না স্পষ্ট? এত বড় লম্বা হাত গিরিহানীর? না, সময় বিশেষে হাতটা সে লম্বা করে নেয়? লম্বা, লম্বা—

দৃশ্যটা খপ্‌ করে পেটের ভিতর চালান করে দিল গুরভাবউ। কাউকে কিছু বলল না। এমনকি গুরভাকেও না।

মেসিনঘর খুলে অদ্বৈত নীলুয়াকে সঙ্গে নিয়ে বের করে আনল— বাঁশের চাঁচড়া, বাঁশবাতা, দড়ি, ছেঁড়া চট, খড়ের হেঁস্‌।

বলল, অউ দি' চালাঘর জলদি ঘিরি প্যাকা!

মরশুমে মরশুমে আসা নামালিয়ারা চারপাশে চাঁচড়া আর বাঁশের বাতা দিয়ে যে-যার মতো চালাঘরটাকে ঘিরে নেয়। আর তাছাড়া সম্বৎসর হাট-খোলা পড়েই থাকে। পড়েই থাকে, পড়েই থাকে।

রোদে-জলে বাঁশের চাঁচড়া, বাঁশবাতা, খড়ের হেঁস এম্নি এম্নি পড়ে থেকে নষ্ট হবে, তাই, কুলিকামিনদের দিয়েই যত্ন করে তুলিয়ে রাখে চাষী গিরিহা। সময়ে, এখন যেমন, অদ্বৈত চাবি খুলে ফের কুলিকামিনদেরই দিয়ে দিল।

নিজেদের থাকার জায়গা নিজেরাই ঠিক করুক। থাকে তো বড়জোর বনে-জঙ্গলে পাতার কুঁড়িয়ায় কুম্বায় রোদে-জলে। তার চেয়ে এ তো রাজপ্রাসাদ! গর্ব বোধ করে অদ্বৈত— কামিল্লার পুআ বসন্ত এ-'সিজন'টায় লোক দিয়েছে মন্দ না।

হা-ঘরে গুরভা-গুড়কুঁদা-বুধন-শরাবণ-বধিরাম-শতুরারা ঘর বানাতে উঠে-পড়ে লাগলো। তাদের সঙ্গে হাত লাগালো নিয়তি-রুদনী-আদরিরাও। গুরভার বউও হাত লাগায়, তবে সে ফাঁকে ফাঁকে নতুন গিরিহার ঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—হাত-লম্বা গিরিহানী ঘুম থেকে এতক্ষণে উঠল কি? উঠলেই চোখের দেখা একবারটি অন্তত দেখে আসবে গুরভানী।

সত্যি হয় যদি তো দোরখুলিতে ফিরে গিয়ে "আম ফলে থোকা থোকা, তেঁতুল ফলে বাঁকা,নামাল দেশে দেখে আইলম রাঁড়ির হাতে শাঁখা"-র মতো অন্তত একটা কিছু তো সে বলতে পারবে!

গুরভা-নীলুয়া-শরাবণ-শতুরারা তো এদিকেই মেতে আছে ঘর করতে।প্রায় উথলু বিরহড়দের মতো যারা এতদিন নরসিঙার তাড়া খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে, এই ঘর ভাঙে তো সেই ঘর গড়ে— তারা আজ কী না মিল-মিশ করে চারধারে চাঁচড়া ঘিরে থাকবার জন্যে ভুগড়া বানাচ্ছে!

শুধু কী ভুগড়া, গিরিহার বাড়িতে তো খড়ের অভাব নেই— চালাঘরের মেঝেয় এন্তার খড় বিছিয়ে তারা বিছানা করল। বিছানার উপর এ মাথা সে মাথা গড়াগড়ি খাচ্ছে কেউ কেউ।

কেউ কেউ মজা করে বাবু-ভায়েদের মতো আধশোয়া হয়ে পায়ের উপর পা তুলে হাত বাড়াচ্ছে— মাথা যে রাখব বাল্লিশ?

আরে, হাঁ, তাই তো— বালিশ! বালিশ, বালিশ।

লম্বালম্বি তিন-চারটা খড়ের আঁটি একসঙ্গে বেঁধে বাণ্ডিল করে তৈরি হল বালিশ। বাপের জন্মে কখনও তো নিজের হাত দুটো খ্বড়া মাথা-সিথানে অন্য কিছু রাখেনি, আজ মাথার নিচে খড়ের আঁটি গুঁজে রেখে এতদিনে দেখল— শুয়ে পড়েও কী করে মাথা উঁচু রাখা যায়।

বেছে বেছে দু'জনকে— চাঁদবদনী আর পুনোইকে— গোহাল সাফা করার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে অদ্বৈত। আগে তো এসব করুক— তারপর ধান কাটতে বিলে যাবে। ধান কাটুক না সেই 'বেলা বুড়া' অব্দি।

অদ্বৈত তো আর জানে না— চাঁদবদনী গোবরের নাদি কুড়োতে কী দড় কী দড়!

গোবর কুড়োতে ঠেকা-পাছিয়া বগলে গোঠ-টাঁড়ের মাঠে গরুগোঠের পিছন পিছন ঘোরা, কখন কোন্ গরুটা 'নাদবে' ল্যাজুড় তোলা দেখেই বুঝে ফেলা, কোন্ নাদিটা শ্যামাঘাসের কোন্ নাদিটা খড়ের আবার কোন্টা তুষ-কুঁড়োর, দেখামাত্র 'চিহ্নত' করা— এসব কাজে চাঁদবদনীর সমতুল আর কে ছিল সে-তল্লাটে? লোধাপাড়ায়? দোরখুলিতে?

কখনও একা একা, কখনও মায়ের সঙ্গে। কখনও গোঠ-টাঁড়ের মাঠে গরুগোঠে, কখনও গরুগোঠের পিছন পিছন ডুব্কা-ডুংরিতে। এই এক পাছিয়া রেখে এল তো ভরতি হয়ে গেল আরেক পাছিয়া। মহুল কুড়োনোর মতো, কাটা-ধানবিলে ধানের টুঙ কুড়োনোর মতো গোবরের নাদি কুড়োচ্ছে মায়ে-ঝিয়ে আঁকছা-আঁকছি করে-এ দৃশ্য তো আকছার!

'গঁইঠা'— তার মানে ঘুঁটে। 'গঁইঠা' বানিয়ে গঁইঠা দিয়ে শামুক-শামকা পুড়িয়ে কলিচুন বানানো, গোবরের নাদি জমিয়ে চাষের মরশুমে চাষীদের খত্ বিক্রি করা— চাঁদবদনীর ও তার মায়ের আরেক কাজ!

'কিন্তুক' কাজটা কী অতই সহজ? সহজে কী গোবর-নাদির অধিকার ছেড়ে দেয় বাগালের বাগাল গরুবাগালরা? গরু খেদাবার 'পইনা' উঁচিয়ে 'চোর-চুরনী' বলে তেড়ে আসবে না?

আর এখানে, এখন এই অদ্বৈত পৈড়্যার গোহালঘরে, হাতের নাগালে এত গোবর— কুড়াও রে 'গাদাও'রে! কোনো গরুবাগালই এসে বলবে না, হেই হাটো হাটো, রাজার বাগান থেকে হাটো!

রাজার বাগান, রাজার বাগান। রাজার বাগানই বটে— একটা গোহালঘর যে আড়ে-দীর্ঘে কত! আর কত জোড়া যে গরু 'ঝাল', গাই-গরু!

এর আগে 'হাটুয়া'দের গোহালঘরে পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীদের ঢোকা তো দূর অস্ত্, উঁকি মেরে দেখলেও লোকজন বলাবলি করত— এখন ছাউছানাদের দিয়ে সুলুক-সন্ধান নিচ্ছে, 'রাতকে' আসবে আসল চোরেরা।

গাঁময় হুলিয়া জারি হয়ে যেত—সাবধান! রাতর টিকে সজাগ থিব— লধাদের টকামেনে ঘুরি ঘুরি এপাশ সেপাশ চাঁহি বুলেটে—রাতের বেলা গৃহস্থ সামান্য সজাগ থাকুক—কেননা লোধাদের ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে এদিক-সেদিক দেখে যাচ্ছে। হয়ত বড়ই কৌতূহলে চাঁদবদনীরা দেখে যাচ্ছিল গোহালঘরে কেমন তিড়িং বিড়িং খেল্ দেখাচ্ছে সদ্যোজাত মাথায় চাঁদি বাছুরটা!

গোহালঘরে গোহাল-কাড়তে ঢুকে চাঁদবদনী-পুনোইরা দেখল— এখানে এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই তো ঘটছে না। বরঞ্চ চাঁদবদনীর মনে বিশেষ করে এই ভাব তো উদয় হল— এত গোবর! আহারে, সে যদি তার কিছুটাও দোরখুলির লোধাপাড়ায় নিতে পারত! এত

মিহি! হাত দিয়ে ময়দার মতো ফেঁটে-ফেঁটে-ফেঁটে-ফেঁটে-ফেঁটে—

কাজ করতে করতে কী যে হল নিয়তির ফের পুকুর-আড়ায় গিয়ে থুপ্ করে বসে পড়ল। ফের রোদন করতে শুরু করল কী নিয়তিলোধানী?

পোখরী-আড়া, পোখরী-আড়া। পুকুরের লাগোয়া ঢালু জমি কিছুটা। তাতে তরি-তরকারী আনাজপাতির চাষ— ঢেঁড়শ, উচ্ছে, পুঁই, লাল নটে—

তাছাড়া ঝোপঝাড় ভাটজাংলা হোগলা ডাব খিরিস ঘোড়ানিম। শাল-আসন-ধ'-পিয়াশাল-আঁটারি-চুরচু-ডকা-ভাদু আর কোথায়! বড়জোর আকাশমণি ইউকেলিপটাস বাবলা সুবাবুল।

পুকুরপাড়ে একটা ডাবগাছের তলায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা। বিরসবদন। 'সাফা' ছেলে ফুলেশ্বরের জন্যই কী বারে বারে আকুলি-বিকুলি করছে তার মন? লোধাপাড়ায় তার ভুগড়ার পিছন দিকে খাড়া দুটি তালগাছের মতো এখানেও হাওয়ায় হুড়-ঝুড় করে পাতা কাঁপাচ্ছে ডাবগাছটাও। পুকুরের জলে তার হিল হিলে ছায়া-ছাঁয়রা। লাটায়-পাটায় আঁধার আঁধার— ঠিক যেন— ঠিক যেন 'চেঁকা শাকের' লই-লতি মাথায় নিয়ে তপোবন জঙ্গলমহালে সীতানালা খালপাড়ের গলিঘুঁজি!

আচমকা একটা লোক, মাথায় চুলের ঝুঁটিবাঁধা, গুন গুন করতে করতে গড়ান থেকে পুকুরের আড়ায় উঠে এল। বোধ হয় কোথাও গিয়েছিল কিংবা কোথা থেকে আসছিল— এদিক দিয়ে শর্ট-কাট করছে।

চোখের সামনে রুদনী নিয়তিকে দেখতে পেয়ে কাঁউ-মাঁউ করে যাত্রার 'ডায়লগ' দিল লোকটা— "পঞ্চবটীরে সীতা—

অযোধ্যারে রাম   হুঅন্তে রাজন
বিধাতা হেলা ভিখারি
পিতাঙ্ক বচন   করিলে পালন
রাম হেলে বনচারী গো
সঙ্গে লক্ষ্মণ ভাই—
সীতা পছরে গলে গোড়াই গো।
তিনি জন মিলি   বনন্তকু গলে
তঁহি কিছিদিন গলা
খাই ফল মূল   পিন্ধিলে বকল
দইব এমন্ত কলা গো
তুঁহু পঞ্চ বটীরে
তঁহু বঞ্চিলে করি কুটীর গো।"

যেতে যেতে হাঁক পেড়ে অদ্বৈতকে বলল, পৈড়্যার পো, এ কাদের ধরে নিয়ে এসেছ? এ যে অবিকল— পঞ্চবটীরে সীতা— পাউডার ঘষে মুখে যাত্রার আসরে নামিয়ে দিলে— "ঝর ঝর হোই বহে নয়নরু নীর। হে সানুজ বীরবর সুমিত্রা কুমর—"

ততক্ষণে 'জামডু' সাপের মতো ছল্‌কে উঠে গাছতলা ছেড়ে দঙ্গলে ফিরে গিয়েছে লোধানী। —এগো মাথায় জটা সাধুবাবার মতো লোকটা কে গো?

নীলুয়া 'নতুন গিরিহার' কাছেই শুনল—লোকটা আটবাটীর ভুবন মহান্তি, যাত্রা করে, পালা গাওনা করে। সীতাহরণ, সীতাবিলাপ, রাধাবিলাস, বেহুলা রোদন, কৌশল্যা রোদন, সাবিত্রী সত্যবান, মাধব ও সুলোচনা, চিড়িয়া-চিড়িয়ানী—

হরেক কিসিমের পালাগান, যাত্রাপালা!

ভুবন মহান্তির কথায় হুঁশ হল অদ্বৈতর— আরে তাই তো, বেশ তো সীতা-সীতা মুখ কামিনটার! যাত্রার ভুবন মহান্তির চোখে যখন ধরেছে তখন একটা কিছু আছে নিশ্চয় 'মেইয়াটার'। শরীর, শরীর— চাট্টি শাকপাতা আর ফলমূল, এসব খেয়েও গতরের ঝকমকানি থাকে কী করে!

যাত্রাপাগল লোকটা কী বলতে কী বলে গেল আর তাই নিয়ে কাজপাগল অদ্বৈত মেতে থাকবে তেতে উঠবে —'অত গুড় আধসের নয়'! সে কাঁই কাঁই করে দঙ্গলটার দিকে হাঁক পাড়ল, কাঁই রে, খর খর কর! বিলকু যাইতে হবনি?

বিল? দখিণসোলের বিল, বুলান-হদহদির বিল, করণতলার বিল, পাড়িয়ার বিল পাকুড়তলার বিল, জাঁতাড়ের বিল, কুম্হারডুবির বিল— এতদিন এসব বিলের নামই তো শুনে আসছে দোরখুলির লোধাজনমাড়ষ লোধা মেয়েমাড়ষ। কে জানে নামাল খাটতে এসে আজ আবার নতুন কী বিলের নাম শোনাবে নতুন গিরিহা।

বছরের পর বছর নামাল খাটতে এসে একদিন এসব নামও তাদের মুখস্থ হয়ে যাবে— পুবের বিল দক্ষিণের বিল বাঘমারী পড়িয়া চিড়িয়ামারী পড়িয়া। নতুন গিরিহাও একদিন হয়ে যাবে পুরাতন গিরিহা। গিরিহার জমিজিরেত একদিন তাদেরই জমি জিরেত বলে কথায় বার্তায় বর্ণনা করা হবে।

কুলিদা-কড়িয়া-বামনদার পুবের বিলে দক্ষিণেব বিলে ধানপাকলে কী আষাঢ়-শ্রাবণে ধান রোয়ার প্রাক্কালে তপোবন জঙ্গলমহালে দোরখুলির লোধাবস্তির ঘুপচিতে শুযেও একদিন চিন্তায় ঘুম আসবে না— ইস্ মাঠে পাকা ধান পড়ে আছে! আব কবে যাব আর কবে কাটব! কিংবা, মাঠে জল থৈ থৈ করছে, এক চাষ মেরে দু'চাষ পড়ল! আর কবে যাব আর কবে রুইব!

কিন্তু আজ? সামান্য মুড়ি চাইতেও লজ্জা! গুড়কুঁদালোধা কী কদনীলোধানী হাতে ধানকাটার দা নিয়েও তাই উঠবার গা করছে না। পেটে খিদা মুখে লাজ! এ-ওকে ঠেলা মেরে খালি বলছে, হঁ তুঁই বল্ ম্ন।

তুঁ-ই-ই বল।

বলব? বলি তালে?

হঁ বল।

নাই হামার ডর লাগচে।

তব্বে ভোকে মর্ ডর-পেল্কা!

আচ্ছা, ধরে থাক আমাকে— বলচি।

সে উঠে দাঁড়াল, তাকে কেউ ধরে থাকল। তবু সে বলতে পারল না। ধরাধরি করেও তাকে কেউ খাড়া রাখতে পারল না। সে থুপ্ করে ফের থাপস্-গাদা হয়ে বসে পড়ল।

দলের মধ্যে যে সবচেয়ে রোগা ভোগা, সহজে রা কাড়ে না, সে গুড়কুঁদা-সেই অবশেষে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পা জড়িয়ে জোর হাত করে বলল, গিরিহা মা'জন! হামাদের টুকচার 'আপত্তি' আছে।

আপত্তি? কে জানে কিসের আবার আপত্তি! অদ্বৈত মনে মনে ভাবল— এ আবার কী আপদ জুটিয়ে দিয়ে গেল বসন্ত!

গুরভার বউই উত্তর দিল, নাই, কী আর কথা ব্যাঙের মাথা, ভোখ লাগচে চাট্টি ভুজা দে মাহাজন —তবে ন কামে যেত্তে পারব।

হা কপাল! ই শড়ার গুষ্টি খালি ত খাইতে চায়! তবু অদ্বৈত ক্ষমা-ঘেন্না করে দোতলা পাকাবাড়ির দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ল.

কাঁই গো শুনুচ— নীলেশ্বর-চন্দ্রবদনী ভুজা মাগুচি!

নীলেশ্বর-চন্দ্রবদনী— এ পর্যন্ত ঐ দুটি নামই সড়গড় করেছে অদ্বৈত। গুরভা-গুড়কুঁদা চামটু-বুধন-বধিরাম-গুড়দুম না হুঁকুরদুম— ঐ বাকি নামগুলো আয়ত্বে আনতে তার আরো কয়েকদিন সময় লাগবে।

আয়ত্বে একবার এসে গেলে সে গুরভাকে অনায়াসে করে নেবে গোবর্ধন, গুড়কুঁদাকে গুড়ের নাগরী বধিরামকে বুদ্ধুরাম, গুড়দুমকে গূঢ়াকেশ, চামটুকে চম্পক কুমার—

গুরভার বউ অপেক্ষায় আছে, অপেক্ষায়— এবার সে নির্ঘাৎ হাত-লম্বা বউটাকে দেখতে পাবে স্বচক্ষে।

বাঁশের পাতিয়া দিয়ে বোনা 'পাছিয়ায়' মুড়ি নিয়ে হেলতে-দুলতে দোতলা থেকে নেমে আসছে 'গিরিহানী'। কাঁখে পাছিয়া— গিরিহানীর বামহাতটা লম্বালম্বি নেমে এসে পাছিয়ার কানাচ ধরেছে, ডানহাতটাও পেটের পাশ দিয়ে নেমে ঈষৎ বাঁক নিয়ে পাছিয়ার কানাচ ছুঁয়েছে।

ভুজা নিয়ে 'গিরিহানী' নেমে আসছে। নেমে আসছে, নেমে আসছে। পেটের কাছে ডান হাতটা কিঞ্চিৎ গোটানো থাকলেও দুটো হাতই তো সমান সমান আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। গুরভালোধানী ভাবল— তবে যে দেখলম! তবে যে—

হুমড়ি খেয়ে একে-ওকে ঠেলে সরিয়ে গুরভাবউ আরো একটু এগিয়ে গেল। আর আর লোধা বউড়িঝিউড়িরা ভাবল— ছোট মাত্বরের বউয়ের 'বাঘের লাখান' খিদা, খিদার জ্বালায় তাই হালুম-হুলুম করছে!

এগো, এত সুন্দর দেখতে! এত সুন্দর। গুরভাবউয়ের যেন বিশ্বাসই হয় না— মানুষ এত সুন্দরও হতে পারে। কপালে, সিঁথির নিচেই গোলাকার চাঁদের পারা সিঁদুরের টিপ, দু'হাতে

ঝকমকে সোনার খাড়ু। নামাল দেশের বউড়ীঝিউড়ীরা জল-হাওয়ার গুনে কী এত 'সাফা'ও হয়?

ফর্সা বলে ফর্সা, গুরভালোধানীর মনে হল— নদীপারে 'বাবুঘরের' দুর্গামেড়ের মুখও এত ফর্সা আর এত সুন্দর নয়।

বেতের 'কুঁচি' দিয়ে এক-এক কুঁচি মুড়ি ঝুড়ি থেকে নিয়ে নতুন গিরিহানী পান-খাওয়া ঠোঁটে মুচকি হেসে সোনার খাড়ুনেড়ে নেড়ে বিলোচ্ছে।

নিয়তি-আদরী-রুদনী-পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা শাড়ির আঁচলার একখুঁট কোমরে গুঁজে একখুঁট হাতে ধরে মুড়ি নিচ্ছে। যাদের শাড়ি নেই, ঝিউড়ীরা, যারা পরে আছে ফ্রকজামা, তারা জামার প্রান্তটাকেই আঁচলা করে মুড়ি মাগুছে।

আর গুরভারা—তারা তো কাঁধের গামছার দু'খুঁট কোমরের দুদিকে গুঁজে আরেক প্রান্ত বামহাতের মুঠোয় টেনে ধরে সসঙ্কোচে মুড়ি নিচ্ছে। নতুন গিরিহানীর সঙ্কোচ নেই, এ-কাজ সে করে আসছে সেই কবে থেকে!

গুরভার বউ আচমকা দেখল—শরাবণের 'মেইয়া' চাঁদবদ্‌নী-সে তো দাঁড়িয়েছিল সবার শেষে ঐদিকে ঐ অতদূরে! সবার আগে সে মুড়ি পেল কী করে? তবে কী হাত লম্বা করেছিল নতুন গিরিহানী?

দৃশ্যটা ফের গপ্‌ করে গিলে ফেলল গুরভালোধানী। 'কারেও' কিছু বলল না— এমনকি গুরভাকেও না। তার কাছে মুড়ি দিতে এসে নতুন গিরিহানী যেন একটু বেশি বেশি হাসল। তার মানে কি হাসি দিয়ে সে বলল— লোধানী তুই, একমাত্র তুই-ই আমাকে চিনে ফেললি?

ইন্নি-কাঁধে নীলেশ্বর দাঁড়িয়েছিল তফাতে মেসিনঘরের ওদিকটায়। তাকে সস্নেহে ঘাড়ে হাত দিয়ে কাছে ডেকে আনল গিরিহানী। বলল, এই টকা, তুই নিবু কিসে? —এই যে ছেলে তুই মুড়ি নিবি কী করে?

তাই তো, নীলুয়া তো পরে আছে প্যান্ট-শার্ট, শার্টের ঝুল হাত-মুঠোয় ধরে যে কোঁচড় বানাবে তারও তো উপায় নেই —সে তো জামা গুঁজে পরে আছে প্যান্টের ভিতর। গিরিহা রগড় করে বলল, আর কী করব, নীলুয়াকে 'পছিয়াটা' দও —সে পছিয়া সুদ্ধ খাউ।

নীলুয়া 'পছিয়া' কী ঝুড়িসুদ্ধ খাক —সে অত কিছু দেখতে যাবে না। সে দেখল—দেখল কী—এখানে দাঁড়িয়েও ঐ অতদূরে নীলুয়ার ঘাড়ে হাত দিয়ে তাকে ডেকে আনা যায়? কাগজের ঠোঙায় করে মুড়ি নিল নীলুয়া। তারপর গোটা দঙ্গলটা, বাম হাতের বগলে 'দা' চেপে রেখে বামহাত দিয়েই গামছা কী শাড়ির আঁচলা ধরে ডান হাতে মুঠো মুঠো মুড়ি তুলে শুকনো মুড়ি খেতে খেতে চলল বামনদার পুবের বিলে ধান কাটতে।

এক দঙ্গল লোধাজনমাড়ষ লোধামেয়েমাড়ষ। যেন ভোর ভোর, যাবে জঙ্গলে, ঝাঁটি কুড়োতে পাতা ছিঁড়তে। এখন খরার মাস, জাম-জামরুলের কাল। খুঁজলে বন-আলু, নানাবিধ ফলমূলও পাওয়া যাবে।

ধারেকাছের জঙ্গলে ঝাঁটি নেই, যা ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে সাফা। তাই দূরের বনভূমিতে যাওয়া, যেখানে অন্ন আছে।

তারা এর-তার গায়ে ঢলতে ঢলতে হল্লা করে হাঁটছিল।

আগে আগে বামনদার অদ্বৈত। মুড়ি খেতে খেতে যাওয়া, ফোঁপরা 'মুড়্হি' খেতেও যে এমন 'অম্রুতো' —তারা এমন মুড়ি এর আগে কখনও কী খেয়েছে? মনেও তো পড়ে না।

খালি যেতে যেতে গুরভাবউয়ের ফিরে ফিরে নতুন গিরিহা-গিরিহানীর বাড়িটাকে দেখা। পোখরিআড়ায় গিরিহানী কী এখনও দাঁড়িয়ে? 'মুড়্হি' তো নয় নির্ঘাত হাত-লম্বা নতুন গিরিহানীর হাতের তুক্ —মনে মনে ভাবা!

গিরিহানীকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। হয়ত দোতলাবাড়িটার কোনো কুঠরিতে এতক্ষণে ফের ঢুকে পড়েছে। ফের পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। রুপার খাড়ি সোনার খাড়ি তো নিয়ে এসেছে নতুন গিরিহা দৈত্য না অদ্বৈত।

কোমরে চাবিকাঠি গুঁজে ঝনাৎঝন্ বাজাতে বাজাতে আগে আগে হেঁটে চলেছে অদ্বৈত। যাচ্ছে জমি চেনাতে, এক লপ্তে শালি জমি কোথা থেকে কতটা।

যারা আমনের রোয়া-কাটা দুই-ই করে গেছে তারা নামাল খাটতে অদ্বৈতর ঘরেই এসেছে চার-চারবার! সেই মনো-লছুরাম-ভন্দু-জগরু-হাগরু-ফুনগী-তারামণি-কালাচাঁদরা। তাদের আর হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চেনাতে হত না—কোথায় পুবের বিল কোথায় দক্ষিণের বিল বামনদার। কোথায় কতটা রত্না জয়া লালস্বর্ণর চাষ অদ্বৈতর।

পোখরি-আড়া থেকে অদ্বৈতর শোয়ার ঘর—সব, সব 'তাহাদের' মুখস্থ! এই তো এক-দেড়মাস বাদেই জল-ঝড়িয়া মাথায় করে আবার আসবে ফুনগী-তারামণি-হাগরু-লছু-কালাচাঁদরা। এসেই রগড় করে হাঁক না পেড়ে দরজায় টোকা মারবে। —কে? তার উত্তরে বলবেই বলবে, এগো খুল্ ন্ন, কুটুম আইল।

কুটুম এল, কুটুম এল।

অদ্বৈতর পিছু পিছু গোটা দলটা রাস্তা পেরিয়ে পুবে, আরো পুবে হেঁটে গেল। আঁচলার মুড়ি এখনও ফুরোয়নি, ফুরিয়ে যেতে দিতেও তারা চায় না তো। ধীরে ধীরে খাচ্ছে, একটু একটু খাচ্ছে, একটা একটা খাচ্ছে—

গিরিহার কাছে কাছেই নীলেশ্বর। একমাত্র তারই ঠোঙার মুড়ি ফুরিয়েছে, খাবলা খাবলা খেয়ে ঠোঙাটা হাতের কায়দায় পটকার মতো ফাটিয়ে সেই কখন সে ফেলে দিয়েছে।

না হলে মুড়ি-মুখে গিরিহার সঙ্গে তেমন 'জুত' হচ্ছিল না কথা বলতে, একমাত্র তাকেই

তো খাতির করে এটা-ওটা 'জিগাস' করছিল অদ্বৈত।

ঘরে-দুয়ারে কলাগাছ, পুবাল দেশের গ্রামগুলো ঘরগুলো যেন কলাগাছ দিয়ে মোড়া। একে তো পাকাবাড়ি, পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঘরে লোক আছে কী নেই—বাহির থেকে দেখা যায় না। তার উপরু কলার বন ডাবগাছের মাথা আরোই 'রহস্য' করেছে।

মহাজন, এত কলাগাছ?

তুই জঙ্গলী বুঝবু কী কলাগাছের মাহাত্ম্য? জম্মনু ত খালি দেখলু শাল-পিয়াশাল। শুন—

আট হাত অন্তর
এক হাত খাই—
লাগারে কলাগাছ
এ চাষী ভাই।
না কাটো পাত
এতেই কাপড়
এতেই ভাত।

—কী বুঝলু? পাকাচাষী অদ্বৈত 'হেঁয়ালি' দিয়ে হাসে। জন্ম থেকে শাল-পিয়াশাল দেখে আসা লছিপুর হাইস্কুলের চার ক্লাস গোটাটা বুঝতে না পারলেও কিছুটা তো বুঝে। চাষাদের চাষ নিয়ে যেমন অহঙ্কার তেমনি চাষ নিয়ে হেঁয়ালিও বানিয়েছে চমৎকার।

—কী যেন, কী যেন— "না কাটো পাত এতেই কাপড় এতেই ভাত"। পাতা না কাটলে কলার কাঁদিও হবে 'পুরুষ্ট' আর তাতেই ঘুচে যাবে ভাত-কাপড়ের কষ্ট। ধানগাছ নিয়ে একবার, আজ আবার কলাগাছ নিয়ে খোঁটা দিল অদ্বৈত।

শোনাইস্তক ফের গুমরে থাকল নীলেশ্বর।

কিন্তু ধানবিল দেখে আর সবকিছুই ভুলে গেল নিয়তি-আদরি-রুদনী-চাঁদবদনী-ভুটকী-পুনোই, বিশেষ করে গুরভার বউ। পাকা ধানগাছ দেখে ধান কাটতে হাত তো তার 'সব্ সব্' করছে।

এগো এত ধান—

গুরভাবউয়ের কবেকার সাধ— হলিয়ে-ঢলিয়ে বাবু-ভায়াদের খেতিতে নেমে ধান কাটবে। সেই 'বাসিয়াম বেলা' থেকে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ধানগাছের গোড়ায় গোড়ায় দা চালিয়ে ধানকাটা—

ধানের 'সুঙ' বিঁধবে গায়ে, গা কুট্‌কুট্ করবে। কুট্ কুট্ করেলেই দাও দা'য়ের ডগা দিয়ে পিঠ চুলকে।

এগো এত ধান—

কভু কী ধানে ভরতি ধানবিলের ভিতর দিয়ে কী 'হিড়ের' উপর দিয়ে তারা গিয়েছে? যাক বা না যাক, ধানে ভরতি ধানবিলের সামনে দাঁড়িয়েও কখনও কী শুনেছে— হাওয়ায় হাওয়ায় ধানছড়ায় ধানছড়ায় ধাক্কা লেগে কেমন 'বসমতার' পায়ের নূপুর হয়ে রুনুঝুনু আওয়াজ দেয়?

ধানে ভরতি ধানবিলের সামনে জুলু জুলু চোখে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো ধানবিলের মালিক ধাঁই ধাঁই করে দৌড়ে এসে গঞ্জনা দিয়ে বলে উঠবে, এখানে দাঁড়িয়ে কী চুরি চামারির ধান্দা করছিস?

ধানবিলের ভিতর 'মগরায়' অর্থাৎ কালভার্টের নিচে যেখানে ভুলুক-ভুলুক করে জল যায়, সেখানে জলের ডোবায় তাদের স্নান করতে যাওয়াও মানা— কে জানে কখন গা ধোয়ার ছলে হাতের কায়দায় গাছটুকু রেখে ধানের শিষটুকু না ছিঁড়ে নেয়!

ধানে ভরতি ধানবিলে তারা হারগিজ যাবে না, তারা তো যাবে ধানকাটার পরে ন্যাড়া ধানবিলে ধানের 'টুঙ' কুড়োতে। তারা তো যাবে মাগ-মরদে নাঙ্গ ছাউছানা সঙ্গে নিয়ে ধানহীন ধানবিলে শাবল-খন্তা দিয়ে আল ভেঙে 'উন্দুর' ধরতে।

কোঁচড়ে মুড়ি দিয়ে এমন হাতে ধরে বামনদার পুবের বিলে ধান কাটাতে নিয়ে যাবে নামালের অদ্বৈত-বসন্ত ছাড়া আবার কে? দোরখুলির আশপাশে রুখনীমারার বক্কা বড়োডাঙার নুনিয়া কী লক্ষ্মণপাতর পারবে— পারবে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের নিয়ে 'গজল্লা' করতে করতে নিজেদের ধানবিলে ধানকাটাতে?

এখন এখানে পাকাধানে ভরতি ধানবিলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিয়তি-আদরি-রুদনী-গুরভানী-ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনী-নীলুয়া-গুরভা-শরাবণ-শতুরারা।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে, এত কাছে! ধান তো?

ধানশিষের 'গোছ' গায়ে-গালে বুলিয়ে দেখছে, কেউ বাধা দিচ্ছে না! ধান তো?

ধানের 'শুঙ' ফুটিয়ে দেখছে গায়ে, বিঁধছে! ধান তো?

নতুন ধানের খোসা ছাড়িয়ে কাঁচা চাল দাঁতে কুটছে, লাগছে আঠা-আঠা দুধ দুধ! ধান তো? হাওয়ায় ধানছড়ায় ধানছড়ায় ধাক্কা লেগে বাজনা বাজছে, যেন 'বসমতা'র পায়ের 'মল' বাজছে। ধানই তো?

এত ধান? বামনদার পুবের বিল দক্ষিণের বিল উত্তরের বিল— সব যে একাকার, ধানে ধান! এত ধান? এসব মায়া নয় তো?

মায়া, মায়া।

গুরভাবউ নিজেরই গায়ে চিমটি কেটে দেখল— এই যে তারা, কোথাকার কোন্ দোরখুলির লোধারা নামাল দেশের 'বাভনদা' না 'বষ্টমদা'তে ধানকাটতে এসে এখন ধানবিলে দাঁড়িয়ে আছে— এসব 'পেঁদ' নয় তো?

'সুদাই মুসুন'?

শুধু শুধু?

ছাতা মাথায় ধানবিলের সীমানায় দাঁড়িয়ে অদ্বৈত পৈড়্যা চেঁচিয়ে বলে উঠল, খরা হেই গলা আউ কেবে আরম্ভ করিবু— নে নে। এই নীলুয়া, অখন-অ ধানগাছ চিনুচু?

এ কথায় নীলুয়া তেড়েফুঁড়ে চাঁদবদনীকেই বলল, আর কত 'গ্যাল্‌হাবি'? —মার ন শুরু কর, এই চাঁদবদনী!

নীলেশ্বরকে চাঁদবদনী গ্রাহ্য করে না মোটেও।

সে আর আর সঙ্গীদের— ভুটকী, পুনোইদের—ডেকে নিয়ে গেল 'স্যালো টিউবওয়েলে' জল খেতে। বলে গেল, র'ন পানি খাঁই আসি, বেড়ে তিয়াস লাগচে —চ লো ভুটকী—

শুধু কী ভুটকী পুনোই, চাঁদবদনীর দেখাদেখি জল খেতে গেল নিয়তি-আদরি-গুরভানীরাও। আলে দাঁড়িয়ে ছাতা মাথায় নতুন গিরিহা বৃথাই বকে চলেছে, বেলা চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে আর কখন তারা ধান কাটতে শুরু করবে! এ কোন্ রাজার ঝি-দের রেখে গেল বসন্ত! বামনদায় একবার আসুক কামিল্লা!

তারপর নিজে নিজেই ভাবল নিজে নিজেই বলল, জল খাউক, খাউক জল যেতে খুশি। শুকনা 'মুড়হি' চিবোতে চিবোতে টাক্‌রা শুকিয়ে গেছে, জল না খেলে তারা এত রোদে যুঝবে কী করে?

ধাতস্থ হয়ে এতক্ষণে চারধারটা চেয়ে চেয়ে দেখল অদ্বৈত। পুবের বিল উত্তরের বিল দক্ষিণের বিল— এবার এ বলে আমায় দ্যাক সে বলে আমায় দ্যাক। গতবারের থেকেও

এবার ফসল দিয়েছে দেড়া! ঐ যে ঘট্ ঘট্ করে অবিরত জল দিয়ে চলেছে 'স্যালো'—ঐ দু-চারটা 'আট ঘড়া' 'দশ ঘড়া' স্যালোই যে কত 'বাঘমারি পড়িয়া' কত 'চিড়িয়ামারি পড়িয়া'কে জলে ভিজিয়ে বতর করে দিয়েছে!

আসলে থুতনি উঁচিয়ে অদ্বৈত পৈড়্যা জরিপ করে দেখছিল— কার বিলে মজুর লেগেছে কতজন। কে তার চেয়েও আগে 'নামালিয়া' মজুর লাগিয়েছে বিলে। এখন ধানের দরটা রয়েছে চড়া, কোনমতে কেটে কুটে তড়িঘড়ি নামাতে পারলে।

কম্‌পিটিশান, কম্‌পিটিশান।

কিন্তু না, লাল-নীল-সবুজ নানারঙের কমদামী ক্যাট্‌ক্যাটে ব্লাউজ, মিঠাইরঙ শালোয়ার কামিজ টিয়ারঙ শাড়ি, মাথায় কোমরে লালডুরে গামছা বাঁধা কালো কালো চিহ্ন তো কারোর বিলে কোথাও দেখা যাচ্ছে না? ঐ তো বসন্তর বিল, শ্রীকান্তর বিল, পূর্ণরাজের সম্পূর্ণ পড়িয়া, ঐ তো ওদিকে উমেশ ভুঞ্যা, রমেশ ভুঞ্যা —কেউই তো এখনো শুরু করেনি!

হয়ত তাদের 'নামালিয়ারা' এখনো আসেনি, হয়ত কাছে-পিঠের কামিন দিয়েই এ-বচ্ছরকার হাই-ঈল্ডিংটা তারা তুলে ফেলবে। কাছে-পিঠের 'লেবার' আসবে বেলায়।

বেলায়, বেলায়।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে অদ্বৈত ফের হাঁকাড় দিয়ে বলে উঠল, কাঁই রে নীলুয়া, তোর মাউসি-পিসিদের জলকেলি থামা, আমহর কাজটা হেলা ন করি তাড়াতাড়ি করি প্যাকা!

নীলেশ্বর নামাল দেশের লোকটার কাঁই-মাঁই প্যাকা-ম্যাকা কী সব ভাষা ঠিক বুঝতে পারে না, তবে ধরতে পারে। লোকটা বলছে— আর অবহেলা না করে তার কাজটা অর্থাৎ ধানকাটার কাজ তাড়াতাড়ি করে ফেলতে।

নীলেশ্বরও চেঁচিয়ে বলল, থাম্ মহাজন, অত কাজ-কাজ করিস নাই, মানুষকে জল খেতেও দিবি নাই নাকি?

জল খেয়ে এসে গোটা দঙ্গলটাই ধানকাটার কাজে হু হু করে নেমে পড়ল। সেই যে কোমর বেঁকিয়ে ধানকাটা একবার শুরু করল সহজে আর সোজা হল না। পুরুষগুলো যাও বা একটু সোজা হয়ে এদিক-সেদিক উলুক-ঝুলুক দেখল-টেখল, বউড়ীঝিউড়ীরা নড়ল না পর্যন্ত। গাছে-দা'য়ে ঘষাঘষিতে যেটুকু শরীর তাদের হিলল-দুলল।

মহাজন তো থ— চৌদ্দপুরুষেও যাদের এক ছটাক জমি ছিল কী ছিল না, আছে কী নেই, সে তাদের ঘরের বউড়ীঝিউড়ীরা ধানকাটার কাজে এত দড় হল কী করে? দেখে দেখে, মনে ভেবে ভেবেই শিখে ফেলল?

হাত দিয়ে বনের পাত পালহা-পতর ছিঁড়েছে, 'দুঁহুরেছে', কাতান দিয়ে বনঝাঁটি গাছের ডাল নিপুন হাতে ছেঁটে ফেলেছে, বন তো তাদের —সে সব তো জন্ম থেকেই শিখেছে। তা বলে দা দিয়ে ধানকাটা?

অদ্বৈত পৈড়্যা আরো একটা জিনিস ভেবে পায় না—কী-ই বা খায়-দায়, মেটে-মুটে কী-ই বা গায়ের রঙ, তবু মুখ দেখলে একটা কিছু 'ঝিলিক' মারে। এত 'ঝিলকানি-বিঝলানি' থাকে কী করে মুখে? শরীরে?

মনে মনে সাব্যস্ত করল অদ্বৈত—কামিল্লার পুআ বসন্ত না হয় এ-যাত্রায় শরীর স্বাস্থ্য দেখেশুনে বেছে বেছে নিয়ে এসেছে এদের 'নামাল খাটাতে'! তাবলে কাছেপিঠের দাঁতনের শঙ্করীডাঙা-বেনাডুবি নারানগড়ের মামনসা-ডহরপুর-করঙ্গবাড়ি কেশিয়াড়ির কুকাই-রংটিয়া-শিমুলডাঙার লোধারা? তাদেরও বউড়ীঝিউড়ীরা 'জন' খাটতে আসে বামনদা-কড়িয়া-কুলিদায়। তাদেরও তো চোখে-মুখে-শরীরে অদ্বৈত দেখেছে—

তবে কী জঙ্গলী লতাপাতার গুণ?

আহা, দাঁতন-নারানগড়ে ফের জঙ্গল কোথা?

ছিল, ছিল। কসবা-নারানগড়ে ভদ্রকালীর জঙ্গল তো এখনও আছে। আর দাঁতনের

জঙ্গলে সরশঙ্কা দীঘির পাড়ে অর্জুনগাছের ডালে বসে জরাশবরের হাতে তীরবিদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ সে তো সবাই জানে!

অদ্বৈত ভাবে—জঙ্গল এখন থাক বা না থাক, জঙ্গল তো থেকে গেছে নীলুয়াদের রক্তে। সে নীলুয়া-গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের ধানকাটা দেখল। মেয়েমানুষগুলোর তুলনায় পুরুষমানুষগুলো ধানকাটায় যেন ততটা সড়গড় নয়। কোমর বেঁকিয়ে অতক্ষণ থাকতে পারে না।

মেয়েদের মতো চেকনাই মুখ এক ছেলেমানুষ নীলেশ্বরের ছাড়া আর কার বা আছে। কারোর বা চিবুকে মাত্র দু-চাট্টাই কাঁচাপাকা দাড়ি, কেউ বা মাকুন্দ, কারোর টাঙ্গির মতো বেঁকানো গোঁফ-জোড়াটি আছে বটে তবে চোখ দুটি নেহাৎই কুতি কুতি।

এক নীলেশ্বর ছাড়া বাকি পুরুষগুলো কথাও তো বলে না, ঐ হুঁ-হাঁ! অদ্বৈত পৈড়্যা ভালো করে দেখল— পুরুষগুলো তাদের পরিবারদের দিকে চেয়েও তো দেখে না!

এটুকু আবিষ্কার করে হেসে উঠল অদ্বৈত।

বলল, কাঁই রে গোবর্দ্ধন—

গুরভা যে গিরিহার কাছে এতক্ষণে গোবর্দ্ধন হয়ে গিয়েছে— সে তো আর জানে না মাত্বরের পরের মাত্বর গুরভালোধা। তাই ডাক শুনেও তার হাতের দা আর থামল না।

অদ্বৈত ফের হাসতে হাসতে ডাকল— কাঁই রে নীলেশ্বর—

বলা মাত্র খাড়া হযে উঠে দাঁড়াল নীলেশ্বব। তার পোষা 'চিঁড়রা' এতক্ষণ তার পিঠের উপর ঘুরছিল-ফিরছিল, নীলুয়া খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই জীবটা ভয়ার্ত সিটি মেরে ধানক্ষেতে নেমে গেল।

নীলুয়াকে যেন কিছুটা খাঁতির করতে শুরু করেছে অদ্বৈত। বলল, নীলেশ্বর, আমে কুন্থচি-টিকে খরখর করিবু— আরে, একটু তাড়াতাড়ি করিস, আজও তো আবার চারটায় হলদা-বৃষ্টি হবে!

হলুদ-বৃষ্টির কথায় গোটা দলটাই সোজা হয়ে দাঁড়াল। গুরভার বউয়ের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না— সত্যি সত্যি সে এসেছে নামাল দেশে ধান কাটতে? ধানের খেতে নেমে সত্যি সত্যি সে ধান কাটছে? কিন্তু বাঁশফুল, উন্দুর, হলদা-বৃষ্টি, গিরিহানীর লম্বা হাত— এসব কী হচ্ছে 'বসমতায়'? সময় সময় পাপে ধরা পূর্ণ হলে এসব হয়?

গুরভার বউয়ের মনে পড়ল— এই তো ক'বছর আগে বড়সোলের গজনার মারফৎ 'খব্বর' এসেছিল লোধাপাড়ায়। নাকি ঝাড়গাঁর ওদিকে দুবড়া না হাবড়ায় বড় বড় 'গেঁড়হা' জল থেকে ডাঙায় উঠে আসছে। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে 'গেঁড়হা' লাখ লাখ 'গেড়ুঁহা—

'গেঁড়হা' তার মানে স্থল-শামুক।

সেসব জীবের পিঠের 'খোল'টি ছাই-ছাই রঙের, তার উপর হালকা বাদামি ডোরা। দিনের বেলা তো বেরোয় না, বেরোয় রাতে।

রাতে, রাতে। নিশাচর, নিশাচর

শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে লাখে লাখে নিশাচর শামুক নদী থেকে খাল থেকে বিল থেকে উঠে পিল্ পিল্ করে চাষাদের বাবু-ভায়াদের ঘরে-খলায়-খামারে শশা-ফুটি-ঝিঙা পটল-গাঁদাফুলের খেতিতে ঢুকে আনাজের গাছ ফুলের গাছ ঝাড়ে বংশে নির্মূল করে ছেড়েছে।

রাতে ঘুম নেই বাবুভায়াদের চোখে— জঙ্গল থেকে গ্রামের কুল্‌হিরাস্তায় 'ঝোপ' আসার মতো —কখন আসে, কখন আসে! 'ঝোপ' তার মানে বন্যা।

আসামাত্র নুন ছিটোচ্ছে বাবু-ভায়েরা, চাবারা। মুঠো মুঠো নুন, বস্তা বস্তা নুন।

লাঠির বাড়ি মেরে ফটাস্ ফটাস্ করে ডাঙায় উঠে আসা 'গেঁড়হা'র খোল ফাটাচ্ছে। এই ফাটল এদিকে দশটা তো ওদিকে ফাটল বিশটা, উত্তরে পঞ্চাশটা তো দক্ষিণে একশ'টা—

শেষ কী আর হয়! শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে, অঝোরঝর! গুরভালোধানী ভাবল— সেদিনকার 'গেঁড়হা' আর আজকের 'উন্দুর'— তফাৎ তো আর নেই কিছু। না না, তফাৎ একটা আছে বৈকি। সেদিন 'গেঁড়হা' ভাঙলে জুটত না এক কানাকড়ি আর আজ 'চুটিয়া'র একটা ল্যাজ দেখাতে পারলেও দু'টাকা!

দু'টাকা, দু'টাকা।

গুরভালোধানীর কাছে 'হলদা-বৃষ্টির' আর দাম কী! সে তো অমন কতই দেখেছে! তবু রাম-সীতার 'গায়ে-হ্লুদ-জল' একটু বেশি পরিমাণে পড়ে যদি তো সে 'উছুর-ডুবুর' হয়ে সে-জলে বড়জোর সিনান করবে।

কিন্তু নতুন গিরিহার 'হলদা-বৃষ্টি'-তে ক্ষতি বৈ লাভ হবে না এক ফোঁটা। জল একটু বেশি হয় যদি তো কাটাধান মাঠেই পচবে। তাই বেলা চারটের আগে যা কাটবার কেটে নিয়ে 'হেলা' বেঁধে আজকের মতো ঘরে তুলবে নতুন গিরিহা। তাই নীলুয়াকে তাড়া— টিকে খরখর কর্—

বড়োডাঙা-থুরিয়া-চঁদরপুরের 'হাটুয়া'-দের ঘরে গিয়ে অমন 'করিবু-খাইবু' দু-চাট্রা উড়িয়া কথা তো হামেশাই শিখে ফেলেছে লোধাবউড়িঝিউড়িরা। তাছাড়া চাঙু-গীতেও তো আছে অমন— আসুছন্তি-যাউছন্তি-কহুছন্তি—

চড় চড় করে বেলা মাথার উপর উঠে গেছে। এখন আর বামনদার পুবের বিল উত্তরের বিল দক্ষিণের বিল জনমানবহীন নয়। শুধু কী অদ্বৈতের বিলে ধান কাটতে 'মুনিষ' নেমেছে, মুনিষ নেমেছে শ্রীকান্ত-বসন্ত-পুনিয়ার বিলেও।

চাঁদবদনী-ভুটকী-পুনোই-নিয়তি-আদরী-গুরভালোধানীরা গুরভা-নীলুয়া-গুড়কুঁদা-শবারণ-শতুরারা ধান কেটে কেটে সামনের দিকে এগুচ্ছে আর পিছনে ফাঁকা বিলে ধানগাছ থেকে ছিটকে-পড়া গুছিপোকা শুঁয়াপোকা ফড়িং-মড়িং খেতে খেতে এগুচ্ছে বনি-চটা কাগা-বগা পাখিরা।

নামালিয়া লোধাবউড়িঝিউড়িদের ধান কাটবার যেমন একটা ছন্দ আছে তেমনি ধান-পোকা খাওয়া পশুপক্ষীদেরও একটা ছন্দ আছে। তালে তালে শতুরা-গুরভা-নীলুয়ারা যেমন যেমন এগুচ্ছে, বনি-চটা-কাগা-বগারাও তেমন-তেমন এগুচ্ছে। ধান কাটতে কাটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে কাগা-বগারাও দু'পা পিছিয়ে এসে তাল রাখছে। কে কটা পোকা বেশি খেল তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধলে 'চ্যার-র-র-র ম্যার-র-র-র' করে বনি-চটারা তাল কেটে দিচ্ছে।

তার উপর তাল একটু বেশিই কেটে দিল কানু পৈড়্যার গরুবাগাল চুটিয়া। সে ছ-সাতটা গরু নিয়ে যাচ্ছিল আলের উপর দিয়ে চরানে মাঠের দিকে। তার এক হাতে গরুর দড়ি-বাঁধা খুঁটা, খুঁটা পুঁতবার পাথর, আরেকহাতে গরু খেদাবার 'পইনা বাড়ি'। গরুর যা স্বভাব, যেতে যেতে হড়বড়িয়ে অদ্বৈত পৈড়্যার ধানক্ষেতে নেমে পড়ল।

নামল তো কিন্তু খেতে পারছে না, মুখ নেড়ে নেড়ে খালি ঐ 'শেঁ-এ-এ ফঁ-অ-অ' আওয়াজ। তাল কেটে বনি-চটা কাগা-বগারাও লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, ঐ এক দেড়হাত।

তার চেয়েও বেশি লাফিয়ে উঠে হুঙ্কার ছাড়ল অদ্বৈত, এ শড়া চুটিয়া-আ-আ-আ! গরুগুলা খেদি দে-খেদি দে-এ-এ-এ! বিড়াগুলা বুনি দেব অ-অ-অ।

গরুগুলোকে তাড়া, তাড়া! নচেৎ ধানের বিড়াগুলোকে ছিন্-ছাতুর করে ছাড়বে।

অদ্বৈত পৈড়্যার বিল থেকে গরুগুলোকে তাড়িয়ে ফের আলের উপর নিয়ে যেতে যেতে চুটিয়াও গরম দেখিয়ে উত্তর করল, বিলে নামনে হেব কী— মুখে জালি দিয়াঅছি।

গরুগুলোর মুখে জাল পরানো আছে। বিলে নেমে এখানে ওখানে মুখ দিলে কী হবে খেতে তো পারছে না!

শনের দড়ি দিয়ে বোনা ঝোলার মধ্যে গরুর মুখ ঢুকিয়ে কানদুটোর দু'পাশ দিয়ে খিঁচে-টেনে মাথার উপর গিঁট দিয়ে বাঁধা। জালের ভিতর শ্বাস নিতে তো কষ্ট হয় না গরুগুলোর, কষ্ট যেটুকু কালো লম্বা জিভ ঠেলে-গুঁজে বের করেও খেতে না-পারা।

খাক বা না খাক মুখ তো দিয়েছে। ঐটুকুই অপরাধ, ঐ অপরাধেই অদ্বৈত হাঁকাড় দিয়ে বলে উঠেছিল— এ শড়া চুটিয়া-আ-আ-আ—

আলের উপর ছাতা-মাথায় অদ্বৈত, ধানকাটা দেখতে দেখতে বিভোর। একবার বেলার দিকে একবার অদ্বৈতর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল চাঁদবদনী।

ভাবল— লোকটা তো আচ্ছা! তার খিদা-তেষ্টা নেই নাকি? সেই তো কোন্ সকালে দানাপানি মুখে না দিয়ে বিলে এসেছে— নাইতে-খেতে আর যাবে না?

সে না যাক, ধানকাটা দেখেই তার না হয় পেট ভরুক। কিন্তু এতগুলো পেট, এতটা বেলা অব্দি না খেয়ে— 'বাসিয়াম বেলা' সে তো কবেই পেরিয়ে গেছে!

ফিচেল তো কম নয় চাঁদবদনী। গিরিহার উড়িয়া কথা শুনে শুনে কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছে সে, 'হাটুয়া'দের মুখে প্রায় এরকম কত কথাই তো শুনেছে সে বড়োড়াঙা-থুরিয়া-চঁদরপুরে!

কী গো গিরিহা, জল-খিয়া কাঁই?

বলে তো ফেলল সে।

জল-খিয়া, জল-খিয়া। অর্থাৎ জল-খাবার।

তাই তো এতক্ষণেও জল-খাবার নিয়ে বাড়ি থেকে কেউ তো এল না। তবে কী ভাতুয়াটা হালুয়াটা অন্য কাজে মেতে আছে? অন্য কোনো কাজ পড়ে গেছে খুব?

জমির আল থেকে পিছনে ঘরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল অদ্বৈত। —কই কেউ তো আসছে না?

অগত্যা মেয়েকামিনদের ভিতর থেকে বেছে বেছে চাঁদবদনীকেই ইঙ্গিত করে অদ্বৈত বলল, অউ যে ছটফটিয়া ঝিঅটা, চন্দ্রবদনী, যা না বদ্‌নী পখাল ঘেনি আয় —ঘরে বোধহয় কাম লাগিছি।

এই যে ছটফটে মেয়েটা, চন্দ্রবদনী, যা না বদনী পান্তা নিয়ে আয় —ঘরে বোধহয় কাজ লেগেছে!

ঘরে কোনো হঠাৎ কাজ পড়ে যাওয়ায় ভাতুয়া-মাহিন্দররা পান্তাভাতের হাঁড়ি নিয়ে 'বাসিয়াম' দিতে বিলে আসতে দেরি করছে। কিন্তু ধানকাটার কাজ ছেড়ে কোনো কামিনকে 'জল খিয়া' আনার জন্য ঘরে পাঠাতেও অদ্বৈতর দ্বিধা। তবু অগত্যা—

এই তো কাছেই, চাঁদবদনী তো যাবেই, সে তার হাতের দা কাটাধানের হেলার উপর রেখে আড়মোড়া ভেঙে তৈরি হচ্ছে যাবার জন্যে।

গুরভার বউও কাজ ফেলে উঠে এল, সেও যাবে। পাখাল দিতে গিরিহানীর হাতের যাদু দেখতে— দু'হাত না চার হাতে গিরিহানী পাখাল বাড়ে?

সে তো শুনেছে—'শাবরী' অর্থাৎ তন্ত্রমন্ত্রজানা, যেমন বড়সোলের গজ্‌না, যাদুবিদ্যার অধিকারী গুণিনদের 'মড়া' কেটে কেটে নানা জায়গায় পুঁতলে সেই সেই জায়গায় জানগুরুদের 'মন্দিল' হয়, সেই 'মন্দিলে' বসে তপস্যা করলে সহজেই জানবিদ্যা ডানবিদ্যা শেখা যায়।

'হাটুয়া'দেরও তেমন কিছু আছে নাকি? তেমন জায়গায় বসে নতুন গিরিহানী এমন কিছু শিখে ফেলেছে যাতে করে এ-ঘরে বসেও হাত বাড়িয়ে ও-ঘরের জিনিসকে হাঁতড়ে আনা যায়? এ-ঘরের খাটে শুয়েও ও-ঘরের কাঁদুল-মাদুল ছাউ-ছুয়াকে কোলে নেওয়া যায়?

কিন্তু যেতে চাইলেই গুরভার বউকে যেতে দেবে কেন অদ্বৈত? এক কাজে দু-দুটো 'জন' কামাই? হয় তারা ঘরের ভাতুয়া-মাহিন্দরদের জন্য অপেক্ষা করুক নচেৎ একজনই যাক, ঐ চন্দ্রবদনীই যাক।

একা একাই রওনা দিল চাঁদবদনী। এই তো কিছুটা বিল পেরিয়ে, বড়রাস্তায় উঠে, বড়রাস্তা পেরিয়ে, দূরে দূরে দু-চাট্টা ঘর ডাইনে-বাঁয়ে ফেলে অর্দ্ধেক টিন অর্দ্ধেক পাকাবাড়িটা। চাঁদবদনী যাবে আর আসবে।

দোরখুলির লোধাবস্তি ছেড়ে এদিকে তপোবন ওদিকে মাঝুডুব্‌কা পেরিয়ে গোঠটাঁড়-বলটাঁড় ছাড়িয়ে বাছুরখোঁয়াড়-বড়োডাঙা-খান্দারপাড়া গাঁ-গঞ্জকে পিছনে ফেলে সুবর্ণরেখা-ডুলুং-গড়কাটা খাল মাড়িয়ে হাতিবান্ধি-রোহিণী-আন্ধারি হিল্লি-দিল্লি কোথায় কোথায় না গিয়েছে চাঁদবদনী!

তার চেয়ে 'গিরিহা'র ঘর তো কাছেই, বলতে কি টুই দেখা যাচ্ছে। 'হাটুয়া'দের কথাতেই তো আছে—

যিব ত যাও বন্ধু টুই দিশুচি।
রুইব ত রুহ বন্ধু ধান শুকুচি।।

এত কাছে যে বন্ধু যেতে চায় তো যাক— ঐ তো ঘরের মুর্ধুন দেখা যাচ্ছে। আর থাকতে চায় থাকুক— এই তো ধান শুকোচ্ছে, ধান শুকোলে ধান ভানিয়ে চাল হবে, চাল থেকে ভাত।

সকালে আসার সময় রাস্তাঘাটে তেমন লোকজন ছিল না, এখন লোকজন যাচ্ছে আসছে। যদিও পায়ে চলার লোকের সংখ্যা কম, যারা যাচ্ছে সাইকেলে কিংবা মোটর সাইকেলে। জঙ্গলের ভিতর দোরখুলি-রুখনীমারার ঐটুকু গ্রামে বঙ্কা মাহাতোর দোকান ছিল একটা, নামাল দেশ বামনদায় দোকান তো দশ-বিশটা! চায়ের দোকান, পানের দোকান, চাল-নুন-তেলের দোকান বই-খাতা-কাগজ-কলমের দোকান, বাসতেল-বাসসাবান-সিঁদুর-আলতার দোকান, বালতি-কড়া-কোদাল আরো কত কী যন্ত্রপাতির দোকান।

সকালে এতসব বন্ধ ছিল, বেলায় সব খুলে গেছে। চাঁদবদনী দেখল— নীলুয়ার মতো ছোকরারা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে গজল্লা করছে। তাদের সামনে বাঁশের চাঁচড়ায় সাঁটা কতরকম 'বেটাছেলে মেয়েছেলের' ছবি!

কেউ নাচছে, কেউ 'চুমা' খাচ্ছে, আর কেউ মারামারি করছে— চাঁদবদনী জানে, শুনেছে, ওগুলো সিনেমার। নীলুয়ার মতো ছোকরারা তাকে দেখে নির্ঘাত একটা কিছু বললও। আর তারপর তড়িঘড়ি পা চালিয়ে গিরিহা-গিরিহানীর বাড়ি পৌঁছে গেল চাঁদবদনী।

কই গো গিরিহানী, পাখাল বাড়!

ঘরের ভিতর থেকে ডাক শুনে শাড়ির আঁচলায় ভিজাহাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে

গিরিহানী। বলে, তোর কি নাম? —আয় সবু হেই যাইছি তু খালি লেই যা।

সবই তো হয়ে গেছে তুই শুধু নিয়ে যা।

নিজের নাম শুনিয়ে দিয়ে ছায়া বেছে সিমেন্টের মেঝের উপর বসে পড়ল চাঁদবদনী থাপস-গাদা হয়ে। ততক্ষণ পাখাল বাড়ুক না গিরিহানী!

মেসিনঘর থেকে কাজে ব্যস্ত ভাতুয়া-হালুয়ারা বেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখতে লাগল চাঁদবদ্‌নীকে। —দেখুক না যতখুশি! নির্বিকার চাঁদবদ্‌নী।

চাঁদবদনী, চাঁদবদনী।

অদ্বৈতর বউ নীলিমা এগিয়ে দেয় অ্যালুমিনিয়ামের একটা বড় হাঁড়ায় ভরতি জল-ঢালা-ভাত। তার সঙ্গে বড় জামবাটিতে বৈতাল-পুঁইখাড়ার ঘন্ট। তার একধারে কিছু সামুদ্রিক মাছের 'শুকা পোড়া'। নুন-লঙ্কা।

গামলাব মুখ কলাপাতায় ঢেকে অদ্বৈতর বউ মুচকি হেসে বলল, লেই যা, টিকে বেল হই গলা। নাকি রে চাঁদনী?

চাঁদবদনী মনে মনে বলল —বেলা হয়ে গেছে তো কী হয়েছে। এমন তো কত বেলাই বড় হতে হতে 'বুড়ে' গেছে, পেটে এক কণাও দানা পড়েনি! মুখে কিছু বলল না, গিরিহানীর দেখাদেখি চাঁদবদনীও হাসল।

—এগো এত সুখ! এ যে গো অঝোরঝর সুখ!

চাঁদবদনী কোমরের গামছাটা খুলে 'বিঁড়া' বানিয়ে মাথায় দেয়। আর ঐ 'পাখাল' হাঁড়ির উপব জামবাটি চাপিয়ে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে মাথার উপর তুলে বসায়।

তারপর তো 'হাঁড়া' নিয়ে হাঁটা—রাস্তায় উঠে এই তো ডাইনে-বাঁয়ে কটা ঘর-দোকান ফেলে বিলের দিকে, বিলমানুষদের দিকে।

চাঁদবদনী হাঁটছে।

এর আগে এত অন্ন একসঙ্গে তার মাথায় কখনো উঠেনি। অন্নভারে ঈষৎ নুয়ে নুয়ে সে হাঁটছে। চাঁদবদনী হাঁটছে।

চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসা ছোকরাগুলো এখন আর কিছু বলছে না। এতক্ষণে তারাও জেনে গেছে—যে-সে নয়, অদ্বৈত পৈড়্যার ধানকাট্‌নী। নামালিয়া ধানকাট্‌নীদের উপর একটা কিছু হলে—

চাঁদবদনী এখনও আসছে না দেখে ধানবিলে ধান কাটতে কাটতে অস্থির হয়ে উঠল নীলেশ্বর। —বদনী আসছে না কেন? রাস্তা চিনে 'গিরিহা'র বাড়ি গিয়েছে তো ঠিক? বদনী যেমন ঢঙী, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বামনদার কারো সঙ্গে, হয়ত কোনো ছোকরার সঙ্গেই বক্ বক্ করছে —এই যেমন তারা কারা, কোথা থেকে এসেছে, কার ঘরেই বা থাকছে—

হয়ত লোভ দেখাচ্ছে এটা-সেটার, লোভে পড়ে পিছু নিয়েছে আ-দেখলা মেয়েটাও।

নামাল দেশের গলি-ঘুঁজি ব্যাপার-স্যাপার যে-টুকু জানার— সে জানে তো একমাত্র নীলেশ্বর!

'চিঁড়রার' শিকলি টেনে 'গিরিহা'কে কিছু না বলেই কুদি মেরে দৌড়ল নীলেশ্বর।

নীলেশ্বর, নীলেশ্বর।

হাত তুলে হৈ হৈ করে উঠল অদ্বৈত, কুদি মারি কাঁই যাউচু রে নীলুয়া—শুন শুন—

কে কার কথা শোনে? নীলেশ্বর দৌড়ুচ্ছে-না দৌড়ুলে কে জানে চাঁদবদনী এতক্ষণে—

বিল ছেড়ে বড়রাস্তা অতদূর পর্যন্তও যেতে হল না নীলেশ্বরকে, চাঁদবদনীকে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল সে—এ কোন্ চাঁদবদনী? এর মধ্যেই এত বড় হয়ে গেছে সে?

বড়দের মতোই শক্তপোক্ত করে শাড়ি জড়িয়েছে দেহে, 'বোস' তো কবেই উঠেছে! শাড়ি ব্লাউজ ভেদ করে তার স্পষ্ট উদ্ধত-রেখা! মাথায় পাখালের হাঁড়ি, দু'হাত দু'দিকে উঠে আছে গাছের সল্‌সলে ডালের মতো।

চাঁদবদনী হাঁটছে।

থমকে দাঁড়িয়ে-থাকা নীলেশ্বরকে দেখেও দেখল না সে, মাথায় অন্ন অতি সাবধানে পাশ কাটিয়ে নেমে এল বিলে। পিছনে পিছনে নীলেশ্বর, খানিকটা দূরে, তফাতে।

বামনদার পুবের বিলে দক্ষিণের বিলে উত্তরের বিলে এসময় একটা হাওয়া উঠল। ঠিক 'লু'র হাওয়া নয়, অন্যরকম হাওয়া। সে-হাওয়া ধানছড়াগুলোকে রুনঝুন করে বাজিয়ে দিল, সে-হাওয়া দূরের দূরের ডাঙাবিলে জল সেচরত স্যালোর জলকে গুঁড়ি গুঁড়ি করে চারধারের ধানবিলে ছড়িয়ে দিল।

তার কতক এসে পড়ল লোধাবউড়িঝিউড়িদের চোখে-মুখে। লোধাজনমাড়যদের চুলে-দাড়িতে। তারা কোমর সোজা করে খাড়া হয়ে দেখল—'বিঁড়োলবাও'! ঘুর-ঘুরে বিঁড়োল বাও, হাওয়া। সে-হাওয়ার ঘুরনদাঁড়িতে চাঁদবদনীও ডুবে গেল।

চাঁদবদনী আর হাঁটছে না।

চাঁদবদনী দাঁড়িয়ে থেকে মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুলের টিপনী গুঁজে মাথায় 'পাখালের' হাঁড়ি নিয়ে সামলাচ্ছে। নীলেশ্বর এগুচ্ছে। নীলেশ্বর ও চাঁদবদনীর মাঝখানের দূরত্ব ক্রমশ: ছোট হচ্ছে।

ছোট হচ্ছে, ছোট হচ্ছে।

'পাখালের' হাঁড়া-মাথায় চাঁদবদনীকে দেখে লোধাবউড়িঝিউড়িরা তাদের দা-গুলো কাটা ধানের হেলার উপর থুপ্ থুপ্ ফেলে রেখে পাশের জমির চলন্ত 'স্যালো'য় হাত-মুখ ধু'তে চলল আগ-বাড়িয়ে তড়িঘড়ি।

শুধু দাঁড়িয়ে থাকল শরাবণশবর আর তার বউ। তারা তাদের মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবল— হিল্ হিল্ করে বেশ তো বেড়ে উঠেছে 'মেয়্যা'টা! নামাল থেকে ফিরেই 'বর' খুঁজতে না বেরুতে হয়! আচ্ছা, 'বর' হিসাবে কেমন হয় গুড়খার বেটা নীলুয়াটা?

দু'জনেই ভাবল আবার দু'জনেই মনে মনে বলল, সকাল হলেই মুখ 'চাঁহা-চাঁহি', ঘরের ধারে 'বিটি'-কে নাই দিব-অ!

শরাবণ-শরাবণের বউ ঘরের ধারে তাদের 'বিটির বেহা' হারগিস দেবে না, কেন না সকাল হলেই মুখ দেখাদেখি—

চাঁদবদনী অদ্বৈতর বিলে পৌঁছে অতি যত্নে 'পাখাল' হাঁড়িটা মাথা থেকে নামায়। মাথার করে এতদূর হেঁটে এসেছে—সেই ক্লান্তিতে মাথার 'বিঁড়া'টা খুলে মুখের-ঘাড়ের ঘামটুকু মোছে। আর তারপর আলের উপর জিরোতে যায়, আর তখনই—

আর তখনই অদ্বৈতর ভাতুয়া বগলে একগাদা এনামেলের 'গহীরা' থালা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে চাঁদবদনীকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, থালা আনলুনি খাবু কী করি, চন্দ্রবদনী?

একে তো কাজ-কামাই করে থালাবাসন দিতে এসেছে ভাতুয়াটি, তার উপর 'চন্দ্রবদনী' বলে নামালিয়াদের সঙ্গে এখন ঠিসারা করছে, তাই দেখে বেজায় বিরক্ত অদ্বৈত প্রায় মারতে যাবে না তাকে? বলে,

যার বাহা তার মনে নাই।
সাই-পড়িশার নিদ্ নাই।।

নীলুয়ার উপরও মনে মনে চটে আছে অদ্বৈত।



এখনো শুরু হয়নি হলুদ-বৃষ্টি, সে তো শুরু হবে বেলা চারটায়। নামাল দেশ জুড়ে এই কটা দিন রোজ রোজ বেলা চারটায় গুঁড়ি-গুঁড়ি হলুদ জল পড়ছে 'মেঘপাতাল' থেকে। আকাশে রোদও থাকছে, আবার জলও হচ্ছে। অঝোরঝর নয়, গুঁড়ি গুঁড়ি ঝিপি-ঝিপি। সে-জলে কারোর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না— না ধানগাছের, না কাটা-ধানের। বরঞ্চ সে-জল গায়ে মাখতে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে না বামনদা-কলিদা-কড়িয়া-জেনকাপুর-গোমুণ্ডা-মাটিবিরুয়া-কাঁথি-সাতমাইল-বালিসাইয়ের লোকজনের মধ্যে!

কেউ কেউ হাত ঘড়ি দেখছে—চারটা বাজতে আর কতক্ষণ? প্রতিদিনের মতো আজকেও কী হবে সেই—সেই জিনিসটা? একটুও এধার ওধার হবে না—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় চারটা? কেউ কেউ ভাবছে—আচ্ছা, হলদা-বৃষ্টি শুভ না অশুভ? হলদা-বৃষ্টির আগেই গা ধোবে, না পরে? শুধু কী গা-ধোয়া, খাওয়াও তো আছে—আগে খাবে, না পরে?

দোনো-মনোয় এ-ঘর ও-ঘর করছিল অদ্বৈতর বউ নীলিমাও, এমন সময় বিল থেকে আনা হাঁড়ি-থালাগুলি শব্দ করে নামিয়ে রেখে হাঁক পাড়ল চাঁদবদনী, কাই গো গিরিহানী, 'সিদা' দেও—ভাত রাঁধতে হবে যে?

ভাত? এই তো নিয়ে গেল হাঁড়িভরতি 'পাখাল'—এর মধ্যেই ভাত? ডাক শুনে ঘরের ভিতর থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে এল 'গিরিহানী'। বলল, তু চালি আইলু? আউ টিকে ধান কাটি আসতু— অখনও ত হলদি-বৃষ্টি ন হেলা?

তার মানে স্মরণ করিয়ে দিল চাঁদবদনীকে নীলিমা—আজ এখনও হলুদ-বৃষ্টি হয়নি, তার মানে চারটেও তো বাজেনি! এর মধ্যেই সে এসে গেল? আর কিছু ধান সে কেটে আসতে পারত।

তা হয়ত চাঁদবদনী পারত। কিন্তু এতগুলো লোকের সাঁঝবেলার ভাত একা-হাতে রাঁধতে হলে বেলাবেলি শুরু না করলে হয়?

যেমন 'গিরিহা' তার তেমন 'গিরিহানী'। চাঁদবদনীও উত্তর করল, হঁ কী যে কহিস গিরিহানী, এত লকের ভাত-তরকারি রাঁধতে হবে নাই? তুমি সিদা দেও।

আব্দার করে বসল চাঁদবদনী। নাছোড়।

বেজার মুখে ফের ঘরের ভিতর ঢুকে গেল 'গিরিহানী'। বলতে বলতে গেল—এবার কোত্থেকে কীসব লোক ধরে এনেছে রে বাবা—'ঘোড়িকি ঘোড়ি' খালি খেতে চায়!

সেই তো সকালে এক কুঁচি ফপ্‌রা মুড়ি, দুপুরে 'পাখাল', আর এই তো সাঁঝবেলায় চাট্টি ভাত—আর তাতেই কী না ঘড়ি ঘড়ি?

চাঁদবদনী ভাবল—হাটুয়া গিরিহানীরা তো 'গেহলা ঝিঅ', হাটুয়া পাড়ায় ঘুরে ঘুরে সে এসব শুনেছে, হেলতে-দুলতে তারা এরকম কথা বলেই থাকে, —সে কী আর সত্যি সত্যি? সে তো কথার কথা!

আসলে এত লোকের 'বনভুজ্‌নী'র রান্না রাঁধবার দায়িত্ব পেয়ে আর কোনো কিছুকেই গ্রাহ্য করছে না চাঁদবদনী। এতবড় 'রন্ধাবড়া'র কাজ তার জীবনে এই তো প্রথম। প্রথম, প্রথম। লোলুপতায় গিরিহানীর কথা ধর্তব্যে না এনে সিদার অপেক্ষায় ঘরের ভিতর দিকে চেয়ে বসে থাকল চাঁদবদনী।

ঘরের ভিতর থেকে ধামাভরতি চাল নিয়ে বেরিয়ে আসে নীলিমা। আর তখনই শরাবণ-লোধার মেয়ে চাঁদবদনী গুরভার বউয়ের মতোই দেখে ফেলে—বড়খাঁকড়ির 'বাবুঘরের' দুর্গা 'ম্যাড়'। দশহাত!

বেতের কাঠায় একেক জনের জন্য একেক কাঠা চাল দশ হাতে যেন দু'বার করে ঢেলে দিচ্ছে গিরিহানী আরেকটা ধামায়। তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে চাঁদবদনী। — মানুষ এত ফর্সা, এত সুন্দরও হয়!

নে নে গেহলী, 'ঝড়া' ভল করি ধর—

নে নে আহ্লাদী, ধামাটা ভাল করে ধর। বলেই নীলিমা চাঁদবদনীকে নিয়ে টিপ্‌নী কাটল—

হেলা তো বয়স ষোল সতের।
যিবু ত শাশুঘরকু এথর।।

চাঁদবদনী বলল, বেহা-ই করব নাই তার আবার শাশুঘর!

ধামার চালের উপর গোটা কতক আলু, কয়েকটা বেগুন, এক দাবড়া শুটকীমাছ কিছু তেঁতুল ফেলে দিয়ে গিরিহানী মজা করল—জানু কি?

বিহি ঘটনা যে হোইছি এহা।
ঘর ঝিঅ পর পুঅর বিভা।।

কেন জানবে না, চাঁদবদনী জানে বৈ কি—ঘরের মেয়ে হল পরের ছেলের শোভা, নারীজন্ম বড় মন্দ—পবের ঘবেই তার জীবন বন্ধ। কিন্তু গিরিহানী তো আর জানে না—লোধা 'জাইতের' বিয়েতে আছে, বিয়ের পরে বর ঘরের টুইয়ে কী গাছের ডালে উঠে পড়ে, কিছুতেই নামে না। বরঞ্চ ভয় দেখিয়ে বলে, "মুই পড্ডি মরি যামু!"

কনেকে দাঁড়াতে হয় নিচে, আর বলতে হয়, "অলি আস-অ, তুঙ্গা তাড়ি খাওয়ামু।" তার মানে আলু খুঁড়ে বরের ভরনপোষণের দায়িত্ব নিলে তবেই বর উপর থেকে নেমে আসে। — হায় রে বাহাঘর, হায় রে "ঘর ঝিঅ পর পুঅর বিভা"!

চাঁদবদনী বলল, হেঁ গিরিহানী, এই দিয়ে কী রাঁধব?

কেনে শুকা-তেন্তুলি দেই টক করিবু, আলু-বাইগন ঘন্ট করিবু-আউ কি?

অদ্বৈতর বউ হাসছে।

পাকা-ঝিঁকুটির মতো চাঁদবদনী ঘাড় নাড়ল। —নাই নাই গিরিহানী, এইটুকুন তরকারি খেয়ে মুনিষ-কামিনরা কী কাজ করতে পারবে?

খুব পারিব। মুখ-ঝামটা দিয়ে গিবিহানী বলে উঠল, ঘরে নুন বি জুটেনি, এবে সেবু বাবু হই যাইছি।

ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, নুনও জোটেনা—আর এখানে এসে সব বাবু হযে গেছে। বলতে বলতে ফের ঘরের ভিতর ঢুকে যায় নীলিমা। দুটো হাতে আরো দুটো আলু আরো দুটো বেগুন এনে ঝুড়িতে ফেলে দেয়।

গজরাতে গজরাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি এগিয়ে দিয়ে আঙুল তুলে বলে, তোতে কহুচি-শুন-স্নান সারি আসি ধোইবু হাণ্ডি।

সে আর বলতে! নামাল দেশে এসে বাসি কাপড়ে সে রাঁধতে বসবে না, যে দেশের যে-নিয়ম— স্নান সেরে এসেই সে রাঁধতে বসবে।

'সিদা'র ঝুড়ি নিজেদের আস্তানায় রেখে পুকুরের ঘাটের দিকে চাঁদবদনী-। পিছু ডেকে গিরিহানী বলল, তু কি পোখরী ঘাট যিবু মনা?

হঁ-অ।

তেবে তু টিকে বাসনগুড়াক ধুই দে না!

পুকুরের ঘাটে বাসন পড়ে আছে গুচ্ছের। দুপুরের এঁটো বাসন। এমন কী মেসিনঘরের লোকগুলো খেয়েছে— তাদেরও সঁকড়ি বাসন। ভাতুয়ানী আসেনি—তাই বেবাক বাসনগুলো মেজে দিতে বলল গিরিহানী।

সকালে গোহাল-কাড়া, এখন আবার বাসন-মাজা—আরো কী কী যে করতে বলবে গিরিহা-গিরিহানী! ধান কাটতে এসে আরো কত কী যে করতে হবে!

মনে-মন হাসল চাঁদবদনী—কী যেন বলল গিরিহানী? মনা?

মনা, মনা।

ছাই আর শুকনা ঘাস দিয়ে ঘষে ঘষে বাসন মাজছে চাঁদবদনী, মেসিন-ঘরে ধানকুটা মেসিন চলছে, গরুরগাড়ি আর ভ্যান-রিক্‌সায় ধানের বস্তা এসেছে মেলা!

বিলে ধান 'খলায়' ধান খামারে ধান মেসিনে ধান ঘরে ধান বাইরে ধান, ধানে-ধান! এত ধান কী আর আছে বুলান-হদহদির বিলে দখিনসোলের সোঁতায় পাড়িয়া-কুমারডুবির 'দলায়'?

কিরে হেলা?

গিরিহানীর গলা।

ভাবতে ভাবতে হাত থেমে গিয়েছিল চাঁদবদনীর, ফের হাত চালু করে যেন নিজেকে নিজেই শুনিয়ে বলল, আর টুকচার।

তার মানে আর সামান্যই।

হাতে সোনার বালা, কপালে চাঁদের মতো সিঁদুরের মস্ত টিপ। ফর্সা, এত ফর্সা! সুন্দর, এত সুন্দর—মানুষ তো নয়, দূর্গাম্যাড়। দশহাত!

কি রে হেলা?

ডাক শুনে চমকে উঠে বাসনগুলো খরখর ধুতে লাগল চাঁদবদনী, খর খর! হাতে জলে খলখলানি আওয়াজ। পুকুরঘাটের শান-পাথরে বসে ঝুঁকে পড়ে বাসন ধুচ্ছিল, হঠাৎ কে যেন বলল— কে যেন—

> যেবে তু হোইবু গড়িয়াঘাট পথব পরি।
> তেবে সিনা ঝিঅ হোইবু ভবে আদর্শ নারী।।

—কী বুঝলু?

গিরিহানীরই গলা।

ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদবদনী নিঃসাড়ে হাসল। তার মানে সে কিছু বুঝেনি।

অদ্বৈতর বউ নীলিমা তাকে বুঝিয়ে দিল—

পৃথিবীতে সেই হবে আদর্শ নারী যে কী না পুকুরঘাটের পাথরের মতো। 'গাধাইতে' অর্থাৎ গাধুতে এসে কত লোকই তো পুকুরের শানপাথরে পা ঘষে লাথি মারে, কিন্তু পাথর তো একটা প্রতিবাদও করে না!

তোতে কহচি-শুন্—

> যে যাহা কহিব সহিবু, করি পথর স্তুতি।
> তেবে সিনা ঝিঅ হোইবু ভবে আদর্শ নারী।।

চাঁদবদনী ভাবল— বউটা একের নম্বর পাগলী। পাগলী, পাগলী। এত কথা আমাকেই বা শোনাচ্ছে কেন?

আর তখনই শুরু হয়ে গেল 'হলুদ-বৃষ্টি'। হলুদ-বৃষ্টি, হলুদ-বৃষ্টি! চারধারে হৈ-রৈ করে আওয়াজ উঠল। মেসিন-ঘর থেকে লোকগুলো বেরিয়ে এল।

একে তো পুকুরের জলে ধোয়া, নামালিয়া কামিনের হাতে মাজা, তার উপর দু-চার ফোঁটা লেগে আছে 'হলদা-বৃষ্টি'র— ঘরের জলে তাই ঘষে ঘষে ফের বাসন ধুতে বসল নীলিমা। সে এখনও ভেবে পাচ্ছে না—হলুদ-বৃষ্টি শুভ না অশুভ? হলুদ বৃষ্টির ভিতর সে গা ধোবে না ধোবে না?

মেসিন-ঘরের লোকগুলোর কেউ কেউ হাত পেতে হলুদ জল ধরছে, কেউ কেউ মাথায় মাখছে, আর কেউ ইস্কুলে পরীক্ষার খাতায় প্রশ্ন দেখে উত্তর লেখার মতো ভেঙে ভেঙে লাইন বাই লাইন বলতে শুরু করেছে— বৃষ্টি কী করে হয়? বৃষ্টি কয় প্রকার ও কি কি?

হলুদ-বৃষ্টির ভিতরই চাঁদবদনী কিছুক্ষণ একা একা 'গড়িয়া ঘাট'-এ বসে থাকে, আড়ালে। নুন-গুঁড়ি হলুদ বৃষ্টি তার চুলে-মাথায় জড়াচ্ছে ধুল ধুল। বনে-বাদাড়ে ডুবকা-ডুংরিতে এরকম কত জলই তো সে মেখেছে!

শান-পাথরে বসে পা দুটো জলে ডুবিয়ে নাচাচ্ছে। সীতানালার ঝিরি ঝিরি পায়রা-চঁচ্‌রা জল এ তো নয় যে পা ডোবালেও পায়ের পাতার লোম পর্যন্ত দেখা যাবে। গাঢ় জল, তার উপর হলুদ জলের 'টপা' পড়ে ঘোলাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে জলে নামল, পুকুর-আড়ার দিকে বারে বারে তাকিয়ে দেখল—না না, কেউই নেই। সব তো মেতে আছে 'হলদা বৃষ্টি'-তে। 'হলদা-বৃষ্টি' 'হলদা-বৃষ্টি'।

কোমর-অব্দি নেমে গেল জলে, তারপর গলা। তারপরেও কী মনে করে আড়ার ধারে উঠে এল চাঁদবদনী। পড়ে থাকা বালির এক খামচা বালি নিয়ে রগড়াতে লাগল গা-হাত-পা।

একবার গলা ডুবিয়ে দেখে নেয় চারধার। না, কেউ তো নেই! ফের কোমর-জলে দাঁড়িয়ে বুকে-পিঠে বালি ঘষে। কাদাবালিতে 'ডলতে' থাকে। —এত সাফা এত সুন্দর হয় কী করে 'হাটুয়া' বউড়িরা?

হলুদ-বৃষ্টি এখনও থামে নি, চাঁদবদনী উঠে পড়ে। ভিজা শাড়ির একদিকটা নিঙড়ে কোমরে জড়িয়ে নেয়। সায়া আর খোলে না। ফের দেখে নেয় চারধারটা—নেই নেই, কেউ তো নেই। তারপর ভিজা শাড়ির আরেক প্রান্ত নিঙড়ে 'বোস-ওঠা' ভরন্ত বুক ঢেকে নেয় চাঁদবদনী।

স্নান তো হল— এবার 'রন্ধাবঢ়া'। গিরিহানীর কথা মতো "স্নান সারি আসি ধোইবু হান্ডি" চাঁদবদনী হাঁড়ি ধুতে ফের গেল 'গড়িআ-ঘাটে'। সবই তো হচ্ছে ঠিক ঠিক, তবু ভয়— কোথায় কখন পান থেকে চুন খসলে—

বামনদার পুবের বিল দক্ষিণের বিল উত্তরের বিলেও হলুদ জল পড়ছে। একে তো পাকা হলুদ ধান তার উপর ঝিপি ঝিপি ধারায় হলুদ-বৃষ্টি— সমগ্র বিল-বাতান হলুদে হলুদ।

ছাতা-মাথায় আলের উপর বসে আছে অদ্বৈত, চারধারে, আর তার কালো ছাতার উপরে হলুদ জল পড়ছে তেমন জোরে নয়— গুঁড়িগুঁড়ি। কিন্তু লোধাজনমানুষদের বউড়িঝিউড়িদের এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা যে-যার কাজে মত্ত। তাদের গা-গতর হলুদ জলে 'গেবে' যাচ্ছে।

অদ্বৈতও ভাবছে— শুভ না অশুভ এই যে 'ইয়োলো বৃষ্টি'? চারুধারে এহিপরি কেতে কী ঘটি যাউছি— বাঁউশর ফুল, মুসার বংশবৃদ্ধি, পুঅর 'নুনু'-রু জিয়ন্ত মাছি—

চারধারে এইরকম কত কী ঘটে যাচ্ছে—বাঁশের ফুল, ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি, ছেলের 'নুনু' থেকে জীবন্ত মাছি—

কি রে নীলুয়া, তোর পাঁহী লাগেনি কেনে? তুই পিছিয়ে পড়ছিস কেন? ঘোর থেকে জেগে উঠে হঠাৎ হাঁকাড় দিয়ে বলে উঠল অদ্বৈত। ধানকাটার লাইন থেকে যে পিছিয়ে পড়েছে নীলেশ্বর।

আর এসময়ই দাঁতন ইস্টিশনে ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল। কে জানে কটার ট্রেন! তবু ধানকাটা থামিয়ে খাড়া হয়ে নীলেশ্বর বলল, সময় আর নেই, ঐ ত বাঁশি বাজল— টুকচার ভোকও লাগছে গিরিহা।

ভোক? অউ ত একগামলা পখাল সাঁটলু—তা পরে ক ঘড়ি হেলা?

হুঁ, তা চার ঘণ্টা ত হল।

দাঁতন-ইস্টিশনের ট্রেনের বাঁশির ঠিক সময় নীলুয়া না জানলেও অদ্বৈত তো জানে সে বাঁশি কটার বাঁশি। তাই খানিকটা নরম হয়েই বলল, ঠিক অছি, ঠিক অছি—

—ধান ন কাটিবু কিছি বিড়া বাঁধি পকা।

ধান না কাটিস না কাটিস, কিছু বিঁড়া বেঁধে ফ্যাল্।

হাতের দা ছুঁড়ে ফেলে আলের উপর বসতে বসতে নীলেশ্বর বলল, খালি তোর দিকটাই দেখলে হবে গিরিহা, আমাদের ব্যাপারটাও দেখতে হবে ত।

বলেই মাথা গুঁজে বসে থাকল নীলেশ্বর।

অদ্বৈত বুঝে গেল—ছোকরা 'আলিসা ধাকুড়ধুমা'। যাকে বলে গতর কুঁড়ে। —শিয়ালের গু দরকার হিনে, পর্বতে যাই হাগে।

তোয়াজ শুরু করল অদ্বৈত, নীলুয়া যা যা বাপা, বিহান ধরতে হব —কিছি বিড়া বাঁধি পকা, ও বেলকু ত মোচ্ছব হবই।

ওবেলার মোচ্ছবের লোভ দেখাচ্ছে অদ্বৈত। সে তো এতক্ষণে শুরুও করে দিয়েছে চাঁদবদনী মচ্ছবের রন্ধাবড়া। হলুদ-বৃষ্টিটাও আর নেই, চারধারে ঝলমলে হলদা-রোদ।

চোখ তুলে নীলেশ্বর দেখল— গিরিহার ভাতুয়া স্বপন কটা বাঁশের 'বাঁউক' আর 'আঁকড়া-দড়ি' নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

তাকে দেখে গিরিহা ফের 'হুরি' শুরু করল, অউ আসি গলা— হা দ্যাক, কাঁই রে— যা না নীলুয়া খর খর কর।

একদণ্ডও বসতে দিতে চায় না অদ্বৈত। কাজে ফাঁকি দিয়ে ফের বসবে কী? কাজ করবার একটা 'তাল' আছে, কাজ করতে করতে 'জিরেন' দিলে সে-তাল কেটে যাবে। কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কাজ করলে কোমর তো বাঁকবেই, খাড়া হয়ে বাঁকা কোমরকে একবার সোজা করলে সোজা কোমর আর সহজে বাঁকা হবে না। বাঁকা হবে না। বাঁকা হবে না।

কামিল্লার পো বসন্ত এ কাদের গছিয়ে গেল তার কাছে, যারা নামালিয়াদের কাজের তাল-জ্ঞান জানে না? দেখুক না উঠে দাঁড়িয়ে আলের উপর—পুবের বিল উত্তরের বিল দক্ষিণের বিলে যারা কাজে নেমেছে—ঐ তো নীল-লাল-হলদা-সবুজ রঙের শাড়ি-সেমিজ ঐ তো ডুরে-লাল-দু'হাতি-তিন হাতি লুঙ্গি-গামছা— তারা কি কাজ ছুটি করে বিল থেকে 'ডুবন্তি বেল'র আগে আগেই উঠে গেছে!

কজন 'গিরিহা' ছাতা-মাথায় আলের উপর খবরদারি করতে এখনও বসে আছে? গিরিহা গেলা ঘর তো তারা কি নাঙল তুলে দিয়েছে? অদ্বৈত বিড় বিড় করে, এরা এমন ব্যস্ততা দেখাচ্ছে, বিশেষ করে পালের গোদা নীলুয়াটা, যেন ঘরে ছা ছাড়ি দি আসা—

অদ্বৈত ভাবে— তবু ভালো দলটার ভিতর কচি ছার মা নেই একটাও, থাকলে আর দেখতে হত না—কতবার যে বাচ্চার মুখে মাই গুঁজতে সে 'উঠাপড়া' করত? আর তাকে বার বার হাঁকাড় দিয়ে বলতে হত—আউ কেতে উঠাপড়া হেবু রে গেহলী? এই নি হেলা তো চারি বার—পাঁচবার—

নীলুয়ার সমবয়সী সঙ্গীসাথী সুরুয়া-লাইবুকুরা তো ধান কাটতে কাটতে যখন-তখন

নীলুয়ার মতো দা ছুঁড়ে ফেলে আলের উপর গিরিহার কাছাকাছি বসে গিরিহার মুখের উপর 'টপরা' করতে পারে না।

তারা বড়জোর নীলুয়ার কিস্তি দেখে হাসে, 'টপরা' শুনে মজা পায়, তবে সময় নেই অসময় নেই 'চিঁড়রা'র শিকলি টেনে দুম-দাম পা ফেলে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে না।

অথচ বাঁকা কোমর টন টন করে, এতটা সময় ধরে ঝুঁকে পড়ে কাজ করবার অভ্যাস তো তাদের নেই। দা দিয়ে ধানকাটা তো এমন কিছু কঠিনের কঠিন কাজ নয়, ধানের গোছ ধরে দা ছোঁয়ালেই ধান আপনা থেকেই কাটা হয়ে যায়। তারপর হেলা করে করে আগা-গোড়া ঠিক রেখে ফেলে ফেলে যাওয়া।

ধান না হোক, এমন তো দা দিয়ে কত ঘাসই তারা কেটেছে—শ্যামা বাবুই কাঁসি! তা বলে নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! দু দণ্ড দাঁড়িয়ে যে দু কলি 'চাঙু' গাইবে গাঁয়ের 'গরাম'-কে বন্দনা করে "এহি বাটে আসুছন্তি গাঁয়ের গরাম"— তার কোন উপায় নেই, যমদূতের মতো ঠায় বসে আছে গিরিহা!

সুরুয়া বলল, লাইবুকা, থাম! নীলুয়া থামতে বলছে।

লাইবুকু থেমে পড়ে গুনগুন করে উঠল—"মিছে পড়ি ভুলা মন ভুলু কাঁহি কি। শূন্যরে বাজুছি চাঙ মন শুনু নাহি কি—"

গুরুভার বউ ঘাড় নত করেই ছিল, চুলে-মাথায় ধুল ধুল ফুলের হলদা-রেণুর মতো রাম-সীতার গায়ে-হলুদের গুঁড়িগুঁড়ি জল মাখছিল জেনে-বুঝেই এতক্ষণ। আর আড়চোখে দেখছিল ছাতা-মাথায় আলের উপরে বসে-থাকা তার গিরিহাকে।

কালো ছাতার উপর ছিটি ছিটি হলুদ দাগ, গিরিহা হাত উঁচিয়ে দুয়েকবার ছাতার গা থেকে হলুদ জল হাতের তালুতে নিয়ে দেখছিল—কী জিনিস?

তাই দেখে গুরভার বউ মনে মনে বলছিল—বোকা গিরিহা, ছাতাটা 'সিপ্‌টা'! ঠাকুর দ্যাবতার গা-ধোয়া জল গায়ে-মুণ্ডে মাখ! মনে-মন আরোই বলছিল—তোর 'বহুর' মতো হাত-লম্বা-করার বিদ্যা তো আমার নাই, না হলে এখান থেকেই হাত বাড়িয়ে ছাতার মুটকি ধরে ছাতাটাকেই তুলে আনতাম!

দা ফেলে খানিক থেমে নিজের হাত দুটোকে মনযোগ দিয়ে দেখল গুরভানী। কালোকুলো হাত, না-থাকারই মতো কটা চুল, ঘষা-মাজায় 'চুল্‌হার' আঁচের ঝলসানিতে সব তো প্রায় শেষ! বাঁ হাতের কব্‌জির খানিকটা উপরে ফাঁকা জায়গায় খোদানীর আঁকা লতাপাতার উল্কি, ঠোঁটের নিচে চিবুকের ঠিক মাঝখানটায়ও একটা ফুটকি।

শিরা-ওঠা হাত দুটোয় এখন ধানের ধোঁয়া, এতদিনে বেশটি করে গায়ে-পিঠে ধানের রোঁয়া মাখার শখ তার মিটেছে। দা'য়ের ডগা দিয়ে আজ কতবার যে পিঠ চুলকেছে গুরভাবউ! হিজিবিজি পড়ে আছে পিঠে।

গুরভার বউ তার হাত দুটোকে সামনের দিকে বাড়াচ্ছে—এই গেল এতটা ঐ গেল অতটা—এক বিঘৎ-দু বিঘৎ—এক হাত—দু হাত—

কে জানে কেন— হয়ত হাওয়ায়— গিরিহার মাথার ছাতাটা উড়ে গেল। উড়ন্ত ছাতা ধরতে পিছু পিছু লদোপদো দৌড়ুল অদ্বৈত। —কাঁইরে নীলুয়া, ধর্ না রে নীলুয়া—

শতুরার বউ নিয়তি গুরভার বউয়ের হাত-লম্বা-করা দেখে 'জিগাস' করল, এগো দিদি, ধান কাটতে কাটতে হাতে কি 'আড়িস' ধরল?

চমকে উঠে গুরভার বউ বলল, নাই-ন্ন হঁ-তাই ত।

হ্যাঁ তাই তো। এতক্ষণ ধরে একটানা ধান কাটতে কাটতে হাতে তো আলস্য ধরবেই।

তাই হাত দুটো টেনে-টুনে লম্বা করে সে 'আড়িস' ভাঙছে।

বলল, কাই আর লম্বা হচ্ছে!

কি গো দিদি?

হাত।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নীলেশ্বর বিড়া বাঁধতে ফের বিলে নামল। গুরভাই তাকে হেঁকে-ডেকে নামাল।

অদ্বৈত হিসাব করে দেখছে—একেক জনে কম করে পাঁচ গণ্ডাও বিড়া বেঁধে দিলে বেশি না হোক তিন পনের কাছাকাছি বিড়া আজই ঢুকে যাবে ঘরে।

'ছুট্' মুড়ে মুড়ে কাটা ধানের 'হেলা'কে গিঁট দিয়ে বিড়া বেঁধে চলেছে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-নীলুয়া-শতুরারা। এ কাজে তাদের দক্ষতা আছে। আস্ত গাছকে কেটে চ্যালা করে চিহড়-দুধিয়া-হাতিবাঁধি লতায় কী কচি কচি ঝাঁটিতে মুহূর্তে বেঁধে ফেলতে তাদের জুড়ি নেই। বনে-জঙ্গলে ডুবকা-ডুংরিতে এরকম তো তারা কতই বেঁধেছে!

বিড়া বাঁধা হলে—দুদিকে পাঁচটি করে মোট দশটি বিড়া সাজিয়ে তার উপর বাঁউকটি রেখে ফের পাঁচটি-পাঁচটি বিড়া দুদিকে চাপিয়ে 'আঁকড়া দড়ি' দিয়ে বিড়ার মাথার দিকটা বেঁধে 'বাঁউক'টি কাঁধে তোলা—

বাঁউক কাঁধে তুলবে পুরুষরা। আর মেয়েরা মাথায় তুলবে বোঝা। তারপর তো হাঁটা। গিরিহার বাড়ির দিকে, গিরিহার খলা-খামারের দিকে।

এরকম তো তারা কতই হেঁটেছে। —দু'জনের কাঁধে তিন-তিন ছ', ছ-ছ বারটা শালবল্লা। এক হাত সামনে, কুড়ুল সুদ্ধু আরেক হাত পিছনে, শালবল্লায় ঠেস মারা। কাঠ-কাঁধে এভাবেই গোঠটাঁড়ের মাঠ ভেঙে—

গোঠটাঁড়ের মাঠ ভেঙে উত্তরমুখো চলেছে, চলেছে হাওয়ার টানে ভাসতে ভাসতে। সরু বালি লালধুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে চলেছে।

বামনদার পুবের বিল অদ্বৈতর আ-কাটা ধানের বিল, কাটা ধানের বিড়া-না-বাঁধা ধানের হেলা পিছনে পড়ে থাকল। গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা-বুধন-বধিরামরা ধানবিড়ার বাঁউক-কাঁধে, নিয়তি-রুন্দনী-গুরভানী-পুনোই-ভুটকীরা ধানবিড়ার বোঝা মাথায় হাঁটছে।

হাঁটছে, মাঠ ভেঙে বড়রাস্তায় উঠে উত্তরমুখো হেঁটে চলেছে, হাঁটছে হাওয়ার টানে ভাসতে ভাসতে। একটার পর একটা মাটির ঢেলা সাজিয়ে তৈরি করা জমির আল ছাড়িয়ে, ধানপোকা খাওয়া কাগা-বগা-চটি-বনাকে পিছনে ফেলে।

ধানের সামান্য টুঙ কী ইঁদুর গর্তের এক কুনকে ধান ছাড়া ধানের সঙ্গে যাদের আর কোনো সম্পর্কই ছিল না— সেই দোরখুলির লোধাবস্তির লোধাদের কাঁধে-মাথায় এতদূরের বামনদায় এসে এতদিনে যে ধান চেপে বসল সে-ধান সহজে তাদের ছাড়ছে না।

বাঁউকের ধানবিড়াগুলির মাথা তো উপরের দিকে, ধানের শিষগুলি নিচের দিকে। বাঁউক কাঁধে এক পা হাঁটলে, শরীরে একটাও হিন্দোল উঠলে, সে-ঢেউ সে-হিন্দোল ধানের শিষগুলির ডগায় এসে থামে, তারপর মিলিয়ে যায়। ফের আরেক পা হাঁটলে, শরীরে আরেকটা ঢেউ উঠলে, সে-ঢেউ ধানের বিড়া বেয়ে নেমে ধানশিষের ডগায় এসে শেষ খেলা খেলে যায়।

খেলা সেখানেই শেষ হয় না, মানুষটা যতক্ষণ চলে চলতেই থাকে। চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। কাঁধে-বাঁউকে একটা আওয়াজ হয়, বিড়ায়-আঁকড়াদড়িতে একটা আওয়াজ হয়, ধানশিষে-ধানশিষে একটা আওয়াজ হয়।

বাঁউক-কাঁধে মানুষটা, ধানছাড়া মানুষটা, কাঁধে-বাঁউকের আওয়াজ শুনতে পেলেও ধানশিষের আওয়াজ শুনতে পায় না। আবার ধানশিষের আওয়াজ ধানমালিক শুনতে পেলেও কাঁধে-বাঁউকের আওয়াজ সে পায় না।

গিরিহার 'খলায়' পৌঁছে মাথা থেকে কাঁধ থেকে 'বাঁউক' সুদ্ধ ধানের বিড়া লোধাজনমানুষ লোধাঝিউড়িবউড়িরা ঝপাঝপ ফেলতে থাকে। পুরুষরা তড়িঘড়ি বোঝা থেকে বাঁউক থেকে আঁকড়া-দড়ি খুলে বিড়াগুলো গোছায়। তারপর আজকের মতো কাজকাম হয়ে গেল মনে করে হাত-পা ঝেড়ে যে-যার মতো বসে পড়ে। ঘামে দরদর করে।

নমথম শুয়ে পড়ে গুরভাই হাঁক দিল চাঁদবদনীকে, এ মুনু, বন-ভুজনীর রাঁধাবাড়া হৈল ন? নাই যদি ত পানিই খাবা বিটি।

হঁ-হঁ আন পানি এক কলসি!

বাকিরাও জল খাওয়ার জন্য হাঁ করে বসে থাকল। খালি নীলেশ্বর তার ইন্নিকে খাওয়ানোর নাম করে উঠে গেল রাঁধাশালে।

বন-ভুজনীই। বাবু-ভায়ারা বনভুজনী করতে শহর ছেড়ে বনে যায়। না হয় লোধারা বনভুজনী করতে বন ছেড়ে এসেছে বামনদায়।

বনভুজনী নিয়ে কিছুক্ষণ রগড় হল। —এর আগে তারা কখনও কি বন-ভুজনী করেছে ? নাই, নাই। সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া বলতে যেটুকু— সে তো ঐ বড়াম থানে আর নয়ত তপোবনে সাধুবাবার আশ্রমে।

নামালিয়াদের জন্য ঠিক করা অ্যালুমিনিয়ামের ঘড়ায় জল এনে রাখল চাঁদবদনী। ঘড়া থেকে জল নিয়ে জল খেল সবাই। জল খাচ্ছে আর ঘামছে দর দর করে।

একমাত্র গুরভার বউ ছাড়া অদ্বৈত পৈড়্যার বাড়িটার দিকে আর কেউ ঘুরেও দেখছে না। তাদের নিজস্ব আস্তানা-রাঁধাশাল-এমনকি জল খাওয়ার ঘড়াটাও যখন হয়ে গেছে তখন আর কী দরকার গিরিহার দ্বারস্থ হওয়ার? উথলুদের মতো উঠল বাই তো কটক যাই— আর কী দরকার?

কিন্তু গুরভার বউয়ের পলক পড়ে না। সে তাকিয়ে আছে তো আছেই। দোতলার বারান্দায় টাঙানো দড়িতে ঝুলছে গুচ্ছের শাড়ি-সায়া, মেয়েদের বড়জামা। বড় জামা, বড়-জামা। কেমন মাথা গলিয়ে নিলেই গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে যায়। 'বোস-উঠা-বুক' ঢাকার জন্য আঁচলার আর দরকার হয় না। 'হাগরী-খোদানী'দের ঘাগরার মতো কেমন পায়ে পায়ে লুটোয়!

গিরিহানী কী ঘুমোচ্ছে? কী আর কাজ— খাওরে ঘুমোওরে শুয়ো রে। কাজ যে টুকু— সে তো করবে ভাতুয়া-ভাতুয়ানীরা, নামালিয়া-নামালিয়ানীরা। আর যেটুকু— সে তো হাত লম্বা করলেই—

সত্যি সত্যি কী 'বিদ্যা' জানা আছে গিরিহানীর? গুরভার বউ ভেবে মরে— নাকি মনের ভরম? আর কেউ দেখল না, খালি সে-ই দেখল? আর কাউকে দেখালো না খালি তাকে-ই দেখালো?

যাকে-তাকে কী দেখায়? যার-তার সামনে কী দেখা দেয়? গুরভার বউ তো শুনেছে— তেমন উপযুক্ত লোক খুঁজে না পেলে 'ডান' তার 'ডান-বিদ্যা' নিজের পোষা 'বিলাই'কেই দিয়ে যায়। —তো সেই রকম আর কি।

বসে বসে এত আরাম করতে কী আর দেবে গিরিহা? অদ্বৈত পৈড়্যা খলায় নেমে এসে তাড়া দিল—যা যা গোবৰ্দ্ধন গাধোও।

অদ্বৈতর কাছে গুরভা তো কখন হয়ে গেছে গোবর্দ্ধন। সেই গোবর্দ্ধন আর তার দলবলকে গা ধুয়ে নিতে তাড়া দিল অদ্বৈত।

গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা চাঁদবদনীর কাছে তেল চেয়ে নিয়ে ঘাটে চলল। আগে তো পুরুষরা— তারপর গা ধোবে মেয়েরা।

এই খরায় পুকুরের জল নেমে গেছে নিচে, তবু তো একগলা-একমানুষ! যারা সাঁতার জানে তারা কেরামতি দেখাতে চলে গেল পুকুরের মাঝখানে, আর যারা সাঁতার জানে না তারা থাকল 'পোখরী-আড়ায়' ঘাটের কাছে। তারা এক-হাঁটু জলে কাক-চান করল—কোনো মতে এ-হাত দিয়ে সে-হাত দিয়ে পিঠে-মাথায় জল ছিটিয়ে।

যারা পুকুরের মাঝখানে তারা কতপ্রকার সাঁতার কাটল— ডুব-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার। ফূর্তি, ফূর্তি! আজ কতদিন বাদে তাদের অন্নের কথা ভাবতে হল না! তেল মেখে 'সোড়া মাটি' মাথায় ঘষে গা ধুয়ে খেতে বসলেই— গরম গরম ভাত, আলু-বেগুনের ঘন্ট, শুকা-তেন্তুলির টক—

শালপাতার খালিতে এক পঙক্তিতে হাপুস-হুপুস করে খেলও তাই। লাইনের একপ্রান্তে খেতে বসেছিল নীলেশ্বর। সে ইশারায় চাঁদবদনীকে ডেকে মুখটা নামিয়ে আনতে বলে ফিস্ ফিস্ করে জানতে চায়, কালকের 'পাখালের' তরে ক'পালী চাল বেশি দিয়েছে ত বদনী?

এগো হঁ হঁ, হাত লম্বা করেই চাল দিয়েছে গিরিহানী।

শোনা মাত্র ধাঁই করে কী যেন মাথায় উঠে গেল গুরভাবউয়ের— কী বলল, বলল কী চাঁদবদনী লম্বা হাত? লম্বা হাত, লম্বা হাত—

ধুরো, কী কথার কী মানে! কী বলতে কী বলেছে চাঁদবদনী। গুরভার বউ দমে গেল কিছুটা, তবে 'ভাঙল' না, চাঁদবদনীকে ডেকেও জানতে চাইল না। —রোজ তো দু'বেলা দেখতে পাব, আর কিছুদিন দেখি-ই না।

খাওয়ার পর্ব আজকের মতো চুকে গেল কী? পড়ন্ত বেলা, আর তো কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধে নামবে, শুধু শুধু রাতের খাবার কী আবার দেবে 'গিরিহা'?

নাই দিক, ভরন্ত পেটে নিজেদের আস্তানায় খড়ের বিছানায় 'হেঁস'-এর উপর ভাত-ঘুম দিতে এগিয়ে গেল কেউ কেউ। কেউ কেউ শালপাতায় আগুনে-ঝলসানো-মতিহার গুঁজে টানতে থাকল। আর কেউ ভাবতে থাকল— কোথায় জেলখানায় রাইবু-গুড়গুড়িয়া 'জিহলখানার' লপ্‌সি খাচ্ছে আর কোথায় আমরা—কাকে বলে 'দুখ' আর কাকে বলে 'সুখ'—

সুখ, সুখ।

গোবর্দ্ধন বিলকু চল!

খলায় এসে দাঁড়ায় অদ্বৈত।

এই তো বিল থেকে এল, আবার কেন বিলকে?

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা। —কী রে বাবা, একটু 'জিরাতেও' দেবে না?

নীলুয়া গিরিহার মুখের উপর বলে দিল— সে যাবে না, তার অন্য কাজ আছে।

বেশ তো নীলুয়া না যাক বাকিরা?

অগত্যা উঠতেই হল গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের। শুকোতে দেওয়া যে-যার গামছাগুলো ফের কোমরে-মাথায় জড়িয়ে নিল।

শুধা গামছা লেই গলে হব? বাঁউক-আঁকড়াদড়ি বি লেই চল। সাঁঝকু আউ এক খেপ বিড়া ঘেনি আসিবু।

শুধু গামছা নিয়ে গেলেই হবে? সঙ্গে বাঁউক-আঁকড়াদড়িও নিয়ে চল। সন্ধ্যার মধ্যে আর এক খেপ বিড়া নিয়ে আসবি।

গিরিহার কথা মতো বাঁউক-আঁকড়াদড়ি সঙ্গেই চলল, সঙ্গে চলল লোধা বউড়ি-ঝিউড়িরাও। বামনদার পুবের বিলে ফের ধান কাটতে, বিড়া বাঁধতে। আগে আগে চলল অদ্বৈতও।

পুবের বিল দক্ষিণের বিল উত্তরের বিলে রোদ এখনও ঝলমল করছে। বিলময় আ-কাটা ধান, কাটা-ধানের হেলা, ধানপোকা-খাওয়া-পাখিদের ওড়াউড়ি, কতক লাল-নীল-হলদা-' সবুজের ওঠা-বসা। আর তাছাড়া অঝোরঝর ধানগন্ধ!

ধানগন্ধ, ধানগন্ধ।

এখান থেকে খুব দূরেও না বেলদা-নেকুড়সেনী-সোনাকনিয়া-দাঁতনের ধানমিল। সেখানে বয়লারে ধান সেদ্ধ হচ্ছে হরদম, চাতালে সে-ধান শুকোচ্ছে। ধানের ধোঁয়া ধুনিয়ে ধুনিয়ে উঠছে আকাশে।

সে-আকাশের ধানগন্ধ এ-আকাশের ধানগন্ধ মিলে-মিশে একাকার। একাকার, একাকার।

এবেলা চাঁদবদনীও নেমেছে ধান কাটতে। তার উৎসাহটাই এখন সবচেয়ে বেশি। এতগুলো লোকের বন-ভুজনীর 'রান্ধাবাঢ়া' সে একা হাতেই করে ফেলেছে— সফলতায় সফলতায় তার উৎসাহ তো বেশিই হবে। পুনোই, ভুটকী আর আর 'সহী সঙ্গাত'রাও তাকে তোয়াজ করছে।

চাঁদবদনীর হাতও চলছে খর খর। সঙ্গী-সাথীদের 'পাঁহী' তার সঙ্গে লাগছে না। লাগছে না, লাগছে না। দেখে বড় পুলকিত অদ্বৈত।

চাঁদবদনীর সঙ্গে খুব ভাবও হয়েছে গিরিহানীর। কী যেন, কী যেন—ধান কাটতে কাটতে মনে করে চাঁদবদনী—কেমন সুর করে বলছিল গিরিহানী, "হেলা তো বয়স যোল সতের-যিবু তু শাশুঘরকু এথর"—

এ্যাঁ, শ্বশুরঘর যাবার বয়স হয়ে গেল তার? ষোল-সতের?

এই তো কদিন আগেও মহুল কুড়োতে কচড়া কুড়োতে সে রাত জেগেছে, রাত-ভিত বেরিয়ে গেছে দখিনসোল-তপুবন-মাঝুডুবকায়, তখনও পোহাতারা ওঠেনি—ওঠেনি ভুরখা ইপিল—

ভয়ে ভয়ে সারারাস্তা কুঁকড়ে থেকেছে—দেহে কালবীজ ঢালতে কখন এসে পড়ে কালপুরুষা! কালপুরুষা তো না, এসে পড়ল পাথরডহরার মাহাতোরা।

আর তারপর তো— হেঁচকা-হেঁচকি-কাপড় ধরে টানাটানি—

—এখন একবার আসুক না বাপের বেটা খালভরা নিরবংশা—

দা ফেলে খাড়া হয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল চাঁদবদনী। দেখামাত্র আলে-বসা অদ্বৈত হাঁক পাড়ল— আউ কেতে উঠাপড়া হেবু চন্দ্রবদনী?

হায় গ হায়! এই ত মোট্টে একবার উঠলম! পুনোই-ভুটকীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল চাঁদবদনী, 'বহু'টা ভাল আর বরটা দ্যাক্— ঝাড় ত ঝাড় কাল্লা ঝাড়।

তার মানে লোকটা আগাগোড়াই তিতা।

তিতা-ই হোক আর মিঠা-ই হোক, অদ্বৈত পৈড়্যার এক কথা— 'বিহান ধরতি হব'। আজকের ভিতর বীজধান ঝেড়ে ফেলে তুলে রাখতে হবে। —'খর খর কর, খর খর—'

বেলাও পড়ে এল। ধানবিলে ধানগাছের গোড়া থেকে রিঁ-রিঁ করে 'রিরিঁয়া পোকা'ও ডাকতে শুরু করেছে। ধানপোকা খেতে খেতে মাঠেঘাটের পাখিরাও ঝিমিয়ে পড়েছে। মুখের গ্রাস ফেলে রেখেই উড়ে যাচ্ছে গাছের দিকে বাসার দিকে। শিরিশ-খিরিশ-অ্যাস-শ্যাওড়া গুলঞ্চ-গাবগুবি-হোগলাঝাড়ের চারধারে ঘুরে ঘুরে চড়াই-চটিরাও কিচির-মিচির শুরু করেছে।

অদ্বৈতর এক হিসাব—একেকজনে কম করেও পাঁচগণ্ডা বিড়া বাঁধলে তিন পনেরও বেশি বিড়া ঘরে চলে যাবে আজকের মধ্যেই। —নে নে, খরখর হাত চালা, ঝপাঝপ সবু বিড়া বাঁধি পকা।

কাটা ধানের বিলে অদ্বৈত নেমে এল— পারলে নামালিয়াদের সঙ্গে সেও যেন হাত লাগায়।

গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা বিড়া বাঁধে। তাদের সঙ্গে চাঁদবদনী-রুদনীরা, বিশেষ করে নিয়তিলোধানীও হাত লাগায়।

লাদনগাড়িয়ার 'বিটিছানা' তাদের গ্রামের বড়বাঁধের লাগোয়া বিঘার পর বিঘা ধানক্ষেতে এরকম বিড়া বাঁধতে কতই তো দেখেছে! হাতের মোচড়ে সে পটাপট বেঁধে যাচ্ছে।

দেখে দেখে অদ্বৈত পুলকিত— এ লোধানী তো পুরুষদেরও ঘাড়ে হাগে!

বিড়া-বাঁধা শেষ, আঁকড়া-দড়িতে বিড়া বেঁধে বাঁউক-সাজানোও শেষ, বিড়ার বোঝা-মাথায় লোধাবউড়িঝিউড়িরাও তৈরি—এবার তো ফেরার পালা গিরিহার খলা-খামারে।

আলের উপর দিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো এগিয়ে চলেছে নামালিয়ারা, কালো কালো পিঁপড়েরা। ধানের 'সুঙ' গায়ে বিঁধাতেও যাদের কত দিনের ইচ্ছা!

ধান, ধান—

ধান নিয়ে একটা গীতের কথা ধানবোঝা মাথায় নিয়ে ঝমর ঝমর চলতে চলতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল গুরভাবউয়ের—

> ধান ধান ধানরাজা
> কিয় ধান বটে গো—
> বাসমতী কমলিনী কয়াধান বটে গো
> বাসমতী কমলিনী কয়াধান বটে।

ধানের বোঝা থেকে উলুরি-ঝুলুরি ধানশিষ নেমে এসে হাঁটার দুলুনিতে মুখের সামনে দুলছে, দুলছে 'মৌড়ের' মতো।

গুরভাবউ ভাবে—এ-ধান কী ধান? বাসমতী? কমলিনী? কয়া? ধানের রাজা? কয়া-কমলিনী-বাসমতী—ধানের রাজা কী প্রজা যা-ই হোক, এত কাছে ধানশিষ? একটা ধানের 'টুঙ' কুড়াতেও যেখানে টঙস টঙস করে এ-বিল সে-বিল ঘুরে বেড়াতে হয়, কপতি-বনি-চটি কতরকম পাখ-পাখালি এসে পড়ে ভাগীদার হিসাবে, তার উপর গরুবাগাল ছাগলবাগালরা তো আছেই— সেই ধানের 'টুঙ' নয়, আস্ত ধানশিষ, বোঝা বোঝা চোখের সামনে দুলছে— ভাবা যায়?

গুরভাবউয়ের এখনও 'ধন্দ' যায় না— এসব সত্যি তো? চোখের সামনে কোনো ঝিলিঝিলি নয় তো? গিরিহার বউয়ের লম্বা হাতের কারসাজির মতো?

অদ্বৈত 'পিছু' ছাড়েনি, লেগেই আছে। লেগেই আছে, লেগেই আছে। কর্মঠ-শাঁসালো-জবরদস্ত্ চাষী হিসাবে তল্লাটে নামডাক আছে অদ্বৈতর। মগলামাড়ো কালীনগর এমনকি খাকুড়দা-বেলদা-দাঁতন-নেকুড়সেনীর রাইস মিলেও তার ধান যায় গাড়ি-কে-গাড়ি লরি-কে-লরি।

নামালিয়াদের সবার পিছনে অদ্বৈত, ছাতা-হাতে ফতুয়া-গায়ে গিরিহার গিরিহা রাজা গিরিহা অদ্বৈত। সবদিক-ডান-বাম অগ্র-পশ্চাৎ—দেখতে দেখতে সে হেঁটে চলেছে

বাঁউক-কাঁধে বোঝা-মাথায় যেতে যেতে ধানশিষের 'হিলনে' একটা কী দুটো ধানশিষ টুঙ করে খসে পড়ল রাস্তায়। সে-ধানের টুঙ অতি ক্ষিপ্রতায় কুড়িয়ে নিচ্ছে অদ্বৈত। কুড়িয়ে 'গোছ' করে হাতেই ঝুলিয়ে রাখছে।

লোধাদের মাথায়-কাঁধে উঠেছে আস্ত ধানশিষের বিড়া আর ঝুঁকে পড়ে রাস্তায় ধানের 'টুঙ' কুড়োচ্ছে গিরিহা।

তারপর তো সেই এক চিত্র— গিরিহার 'খলায়' পৌঁছে কাঁধ থেকে মাথা থেকে বিড়াগুলো ঝপাঝপ ফেলে দেয় লোধা লোধানীরা। পুরুষলোধারা তড়িঘড়ি বোঝা থেকে বাঁউক থেকে আঁকড়া-দড়ি খুলে নিয়ে বিড়াগুলো গোছায়।

আজকের মতো এখানেই শেষ মনে করে হাত-পা ছড়িয়ে গোল হয়ে বসে। মাথার গামছায় শাড়ির আঁচলায় ঘাম মোছে আর 'বিঁচে বিঁচে' হাওয়া খায়। ঘাম মোছে ফের শেম্-শেম্ করে ঘেমে ওঠে।

এখানে তপোবন-মাঝুডুবকা-ঠাকুরবাঁধ-বুলান-হদহদির মতো, সীতানালা খালের মতো ঝিরিঝিরি ঝুরুঝুরু হাওয়া আর কোথায়—'কুক্কুল্যা' খরায় কুলকুল করে ঘাম দেওয়া দুপুর রোদে এল তো এল হড়কা-হাওয়া, নুন-বাতাস, ঘূর্ণিঝড়, না এল তো দমবন্ধ কুলকুলিয়া ঘাম।

এখানে আর 'গাছতল' কোথায়? বড়বালি সরুবালির বাঁশতল ধ'তল জোড়াশালতল পাড়িয়ার করনতল মাটিডাঙার কুসুমতল মাহাতো বুড়ির লতা-আমতল পাথরডহরার মহুলতল—

এখানে তো শুধু রাস্তাঘাট হাটবাজার দোতলা-তেতলা মেঠোবাড়ি পাকাবাড়ি আর তো খালি কলাবন ধানবন— পুবের বিল দক্ষিণের বিল উত্তরের বিল, বাঘমারী পড়িয়া চিড়িয়ামারী পড়িয়া,—

গাছ কোথায় আলের উপর বসে যে দু দণ্ড জিরিয়ে নেবে? আদড়া, 'চিটা মিটা', শাবল-খন্তা 'ঢুকান্' দিলেও 'চটান' ফাটে না— এমন আল-ই বা কোথায়? সব তো মাটির ঢেলা একটার পর একটা সাজিয়ে সাজিয়ে জমির সীমানা-চৌহদ্দি ঠিক করা।

ঝুপ্ করে অন্ধকার নেমে এসে কালো-কুলো মানুষগুলোকে ঢেকে দিল। এখন আর তো কিছু করার নেই, অন্ধকার অন্ধকার—

কিন্তু গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের পা তো 'সব্ সব্' করে! এক ঘড়ি দু'ঘড়ির 'জন' থাক বা না থাক, অন্ধকারে অন্ধকারে, তিন-তিন-ছ', ছ-ছ বার, বার-বার চব্বিশটা কী আরো বেশি শালবল্লা কাঁধে গোঠটাড়ের মাঠে নদীবালিতে বালি ভেঙে মস্ মস্ করে সেই যে হাঁটা!

এখানে এখন আর তো কিছু করার নেই— অন্ধকার অন্ধকার— নিজেদের আস্তানায় খড়ের বিছানায় গড়িয়ে পড়া ছাড়া। আর তো কিছু করার নেই— পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীদের-"একটা তারা দুইটা তারা বাভন ঘরের ঝারা পারা, দও ত মাসি কাঁড়বাঁশটা বিঁধে দিব ভারভুরটা"— মেঘপাতালের দিকে চেয়ে তারা গোনা ছাড়া। আর তো কিছু করার নেই— নিয়তি-রুদনী-আদরীদের— যে-যার পুরুষের পাশে শুয়ে গতরের সুখভোগ করা ছাড়া। আর তো কিছু করার নেই— গুরভার বউয়ের—অন্ধকারে বসে বসে গিরিহানীর হাতের কারসাজি চোখে না দেখে মনে মনে দেখা ছাড়া। আর তো কিছু করার নেই— অন্ধকার অন্ধকার—

'সিদা' তো যা-দেওয়ার দিয়েছে গিরিহানী, 'রন্ধাবড়া' যা-করার করেছে চাঁদবদনী, লোধাজনমানুষ লোধাবউড়ীঝিউড়ীরা আজকের মতো যা-খাওয়ার খেয়েও নিয়েছে, আর তো কিছু করার নেই অন্ধকারে খড়-হেঁসের বিছানায় 'পেট-তাবুড়' দিয়ে শুয়ে-পড়া ছাড়া।

গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা 'খলা' ছেড়ে পুকুরঘাটে হাত-মুখ ধুতে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় খলায় নেমে এসে অদ্বৈত শশব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক শুরু করল, কাঁই গেলু রে স্বপ্না, হারকিন-লাইটটা জ্বালি দে!

লাইট? লাইট জ্বালাতে বলছে গিরিহা? 'টিপা-লাইট' না হাওয়া-দেওয়া-লাইট? সেই যে সোঁ-সোঁ করে আওয়াজ দেয় আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'মুড়তে' হয় পিন?

কেন যে লাইট— গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা বুঝতে পারে না। অদ্বৈতও ভাঙে না। সে যে অন্ধকারে খলায় কার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে লোধাজনমানুষ লোধাবউড়ি ঝিউড়িরা সেটাও বুঝতে পারে না।

একবার তাদের মনে হল— পিছনে আড়মোড়া করে হাতদুটো ধরে থুতনি উঁচু করে 'মেঘপাতালের' দিকে তাকিয়ে আছে গিরিহা। মনে মনে কী একটা তারা খুঁজছে? —"একটা তারা দুইটা তারা—"

'সঞ্ঝা' হল কী হল না মিলিয়ে দেখার জন্য খুঁজছে কী 'সঞ্ঝাতারা'? —এই ছেলেটা ভ্যাল্‌ভ্যালেটা—ঐ তো ঐ তোর ঘরের টুইয়ের উপর দিয়ে ডানদিকে-ডান দিকে— আরেকটু আরেকটু উত্তরে-হ্যাঁ—

পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওযি করে, বোধ হয় ভাবেও— এই লোকটা এত চেনে, ধান চেনে ধানবিল চেনে, কত ধানে কত চাল তাও জানে, কী করে নামালিয়াদের বেশি-বেশি খাটাতে হয় সে-মন্ত্রও জানে— আর এটুকু জানে না সাঁঝতারা-দধিভারিয়া-সাতভায়া-কালপুরুষা-রাবণরাজার সিংদুয়ারের তারা-ভুলকাতারা-পোহাতারা কোথায় কখন কোন আকাশে ওঠে?

জানে না, জানে না।

তারা তো যা কিছু কবে মাথা নিচু করেই করে! —বিলে জমিনে লাঙ্গল হচ্ছে, লাঙলের ফালে 'চিটা-মিটা' মাটি ঠিকমতো 'ঢুকান্' হচ্ছে কী হচ্ছে না— ঘাড় নিচু করে তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কুলি-কামিনরা নামালিয়াবা ধান রুইছে, 'ধানতলা'র গোড়া কাদামাটিতে হাতের টিপনীতে ঠিকমতো পুঁতছে কী পুঁতছে না— মাথা হেঁট করে তারা বড় বড় চোখে দেখে। 'বিদা' করে বোয়ালি ধানবিলে নিড়েন দিচ্ছে, বিদার ফলায় ধানগাছ উঠছে না ঘাস উঠছে— ঘাড় নত কবে তারা বেছে বেছে দেখে। বিলময় ধান পেকে উঠলে আলে দাঁড়িয়ে তারা চোখের দৃষ্টি কিছুটা নিচু কবেই দেখে—'গোছ পাতলা ডাগর গুছি' ঠিক হয়েছে কী না। ধান কাটবার কালে আলে বসে তাদের চোখ তো সেঁটে থাকে নামালিয়ার হাতের দা'য়ের সাথে।

মাথা উঁচু করে আকাশ দেখার আর তাদের অবসর কোথায়? দূর্গা 'ম্যাড়ের' মতো মুখ বউয়ের মুখের দিকেও চেয়ে দেখবার ফুরসুৎ নেই তাদের— তার আবার—

মাথা উঁচু করে যা কিছু করার তা তো করে লোধাজনমাড়ষরা লোধাবউড়িঝিউড়িরা। কাল্লা-বনকাঁকড়ো-বনকুঁদরির 'লত্' তো উলুরি-ঝুলুরি ঝুলতে থাকে এ গাছের ডালে সে গাছের ডালে— ঘাড় উঁচু করে থুতনি উঁচু করে 'খুঁজে খুঁজে নাব্বি যে-পায় তাহারি' আঁতিপাঁতি খুঁজতে হয়। কেঁদ-ভেলা-ভুড়রু-জাম-জামরুল সব তো গাছে গাছে— উপরের দিকে চোখ রেখে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হয়। এমন যে পিঁপড়ের ভাত-ওয়ালা ডিম, কুরকুট পটম, সেও তো ঝুলতে থাকে শালগাছের টোঙে— থুতনি উঁচু রেখে গাছে উঠে পাড়তে হয়। 'পারমিট' নিয়ে বন-ডহরে শুকনা ঝাঁটি-ডাল খুঁজতে হলে—সেও তো ঘাড় উঁচু করে মরা ডাল ধরে 'হিলাতে' হয়! উঁচু করে মহুল-কচড়ার 'খোঁচ' আঁকশি দিয়ে হিলাতে হিলাতে উঁচু ঘাড় ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠবে না?

কাজে কাজেই ঘাড় উঁচু করে আকাশ তো দেখবে তারা-ই, তারা তো চিনবে লোধাজনমাড়ষ লোধাবউড়িঝিউড়িরাই।

দৌড়ে মেসিন-ঘর থেকে হ্যাজাক-লাইট খলায় নিয়ে এসে ভাতুয়া স্বপন জ্বালাবার

উদ্যোগ করলে তাকে খেঁকিয়ে উঠল অদ্বৈত— কেমা যাইথিলু? আন্ধার হেই গলা লাইট জ্বালুনি কেনি?

কোথায় সে গিয়েছিল? অন্ধকার হয়ে গেছে এখনও লাইট জ্বালেনি কেন?

নামালিয়ারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ভাবছে— অন্ধকারে তারা কালো-কুদ্রার মতো বসে আছে খলায়, তাই ভাতুয়াকে আলোর ব্যবস্থা করতে বলে দিচ্ছে গিরিহা।

দেশালাইয়ের কাঠি মেরে পিন মুলে মুলে আলো তো জ্বালিয়ে দিল স্বপন ভাতুয়া। ফিট-আলোয় চোখ-মুখ ধাঁধিয়ে গেল কুলি-কামিনদের। এম্নিতেই লোধাপুরুষরা দিনমানের আলোয় চোখ পিট্‌পিট্‌ করে অনবরত। তদুপরি হেরিকেন-লাইটের আলো তাদের চোখকে একেবারে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

চোখ সয়ে গেলে তাদের কেউ কেউ এগিয়ে গেল জ্বলন্ত আলোটার কাছে। —এর আগে এত কাছ থেকে এত বড় আলো তারা তো কখনও দেখেনি! তাই হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখল— হেরিকেন-লাইটের 'স্টেইনলেস স্টিলের' তৈলাধারে কত প্রকার বিকৃত মুখচ্ছবি!

কেউ কেউ দু'হাতের পাঁচ-পাঁচ দশটা আঙুল কী দু'হাতের দুটো বুড়ো আঙুল-ই আলোটার পেটের কাছে এগিয়ে ধরল— কী ধ্যাবড়া কী ধ্যাবড়া! গোড়াটা এত সরু আর ডগাটা এত মোটা!

অত্যধিক কৌতূহলে কেউ কেউ তুলে ধরল নিজের পা। ধুলোমলিন শত কাটাকুটির চিহ্ন আঁকা এত বড় পা যে আলোর তেল-পেট ছাপিয়ে চারধারে কোথায় কোথায় যে ছড়িয়ে পড়ল! খলায় দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে কী কারণে হাসছিল অদ্বৈত— তার মুখেও কিছুটা লেগে গেল।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল অদ্বৈত—কাঁইরে স্বপ্না!

ভাতুয়া স্বপন ধারেকাছেই ছিল, তবু সামনে এসে দাঁড়ালে স্বপনকে ছেড়ে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের বলল অদ্বৈত, উঠি পড় উঠি পড়, বিহান ধরতি হব—

বিহান, বিহান। বীজধান, বীজধান।

গিরিহার তাই এত আলোর আয়োজন— এতক্ষণে বুঝতে পারে গুরভা-গুড়কুঁদা-নিয়তি-আদরি পুনোই-চাঁদবদনীরাও।

—বিড়া কিছি পিটি দে বাপ!

কাজ করিয়ে নিতে গুরভা-গুড়কুঁদাকে 'বাপ' বলল গিরিহা? পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনী-সুরুয়া-লাইবুকারা হাসে।

বিড়া পিটে ধান ঝেড়ে তারা তো দেবেই— কিছু করতে না পেয়ে এতক্ষণ পা তো তাদের সব্ সব্ করছিল, ধান কাটতে কাটতে নিয়তি-আদরী-রুদনীদের হাত এমন হয়ে গিয়েছিল যে কিছু করতে না পেয়ে হাত তাদের নিস্ পিস্ করছিল।

গোটা দলটাই ঝাঁপিয়ে পড়ল, শুধু ঝাঁপাল না গুরভার বউ। সে ঠায় বসে থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছে গিরিহার বাড়িটাকে— যদি চোখের দেখা একবারটিও দেখতে পায় গিরিহানীর হাত লম্বা করা কলকাঠিটাকে।

গুরভা-গুড়কুঁদারা বিড়া পিটবার তক্তাটা আগে ঠিক করে নেয়। তক্তা তো নয়, কব্জা খোলা একপাল্লা দরজার পাল্লা। দু'ধারে ধানের বিড়া বেঁধে বেঁধে উঁচু-করা, তার উপর দরজার পাল্লা পাতা। পাল্লা যাতে গড়িয়ে না যায় তার জন্য ধানের বিড়া দিয়েই গিট-বাঁধা।

পাল্লা তো পাল্লা— তার জেল্লা কী! কবে থেকে কোন্ যুগ থেকে তার উপর ধানের বিড়া আছাড় খাচ্ছে! আছাড়ে আছাড়ে কাঠের তক্তা এত তেলতেলে পিচ্ছল হয়ে গেছে যে ধানের

বিড়া পড়তে না পড়তেই ধানের দানাগুলো ঝরে পড়ে ঝুরঝুর করে।

গুরভা-শরাবণ আর শতুরা কেউ কেউ পরনের ধুতির এক খুঁট কোমরে, আরেক খুঁট পিঠের উপর দিয়ে মাথায় বেঁধে তক্তায় বিড়া পিটছে। ধানের ধুলো ধানের সুঙ যাতে না পিঠে-মাথায় লেগে যায়— তার জন্য এই নিরাপদ ব্যবস্থা।

নিজেদের ভিতর হাসাহাসি করে বিড়া পিটছে শরাবণ-শতুরা আর গুরভা। ধান ঝরে গেলে ধানবিহীন 'অটংগা' গুলোকে গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিচ্ছে দূরে।

পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনী-গুড়কুঁদা-নিয়তি-আদরীরা সেই সমস্ত বিড়া জড়ো করে গাদা মারছে। গাদা মারছে, গাদা মারছে।

গোটা দলটার 'হাউস' দেখে দেহে-মনে পুলকিত অদ্বৈত।

কেউ কেউ ঝাড়া-ধান কুলোয় নিয়ে ধুলো উড়োচ্ছে। সে এক 'কৌশল' করা— ধানসুদ্ধ কুলো মাথার উপরে তুলে খেপে খেপে 'খলায়' আছড়ে ফেলা, ধুলো যা-ওড়ার উড়ে যাচ্ছে, পড়ে থাকছে ঝরঝরে ধান। তার উপর কুলোর বাতাস—

আর কী থাকে ধুলো? ধুলো-ধুলোর গুঁড়ো যা কিছু সব তো উড়ে বেড়াচ্ছে খলায়-খামারে চারধারে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয সে-এক ধানধুলোর কুয়াশা!

কুয়াশা, কুযাশা।

গুরভার বউ কুয়াশার ভিতর ডুবে বসে আছে, যেমন করে জলের ভিতর ডুবে বসে থাকা। চোখের সামনে জলের মাছ খেলে বেড়াচ্ছে খলবল করে। এ এদিকে বিড়া পিটছে, সে সেদিকে বিড়া পিটছে। এ এদিকে ধান 'উড়াচ্ছে', সে সেদিকে ধান 'পাছড়াচ্ছে'। এ এদিকে ঝাড়া-বিড়া গাদা মারছে সে সেদিকে ঝাড়া-বিড়া ছুঁড়ে মারছে—

ধানধুলোর কুয়াশায় 'ঝিলি ঝিলি' দেখছে গুরভা বউ। —গিরিহার বাড়িটা যেন এই আছে এই নেই। এই জানলায়-ঝুরকায় আলো জ্বলছিল, গিরিহার 'বেটা-বিটিরা' ছুটোপুটি করছিল— দেখতে দেখতে আব নেই, নেই নেই, এই তো ছিল। এই তো আছে, ঐ তো ফের জ্বলে উঠল—

নিজের দেহেই চিমটি কেটে দেখল গুরভার বউ। —এগো, 'স্বপ্নাচ্ছি' নাই ত? স্বপ্ন দেখছি না ত?

নতুন গিরিহা এগিয়ে এল তার দিকে। বলল, অউ বউটা বসি গলা কেনি? যা বউ উঠি পড়— সবু লুক ত কিছি না কিছি করুচি।

সবাই তো কিছু না কিছু করছে, এই বউটাই বা বসে গেল কেন? গিরিহার কথার কী জবাব দেবে গুরভার বউ— অগত্যা উঠে পড়ে পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীদের সঙ্গে হাত লাগাল ছুঁড়ে ফেলা 'অটংগা'গুলোকে ফের জড়ো করে গাদা মারতে।

খলায়-খামারে হৈ-হুল্লোড় যত কমে আসছে, সন্ধ্যার বামনদা তত ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। আশপাশের গ্রামে কোথাও কোনো পুজো হচ্ছে, সন্ধ্যারতি, তার ঢাকের শব্দ কাঁসরের শব্দ ভেসে আসছে—কাঁই নানা কাঁই না-না!

বড়রাস্তায় মাঝে মাঝে মোটরসাইকেলের আলো আর গর্জন চোখ-কানকে ধাঁধিয়ে আর ঝাঁজিয়ে যাচ্ছে। দু-চাট্টা কুকুরের ঘেউ ঘেউ। তাছাড়াও মানুষের কথাবার্তা। কে যেন কাকে ডাকছে— 'কাঁই গেলু রে বেনুধর...!' কোথায় গেলি রে বেনুধর।

গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের মনে পড়ে গেল— নীলেশ্বরটাও তো এখনও ফিরছে না! সে কোথায় গিয়েছে? বলে গেল তো তার কাজ আছে—

কাজ আছে, কাজ আছে।

এখানে কাছাকাছি কোথায় বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙায় নাকি তাদের স্বজাতির পঁচিশ-তিরিশ ঘর আছে। তাদেরই গ্রামের জিতেন নায়েক নাকি লছিপুর না অছিপুর হাই ইস্কুলে নীলুয়ার সঙ্গে দু-তিন ক্লাস পড়েছে। তারই সুলুক-সন্ধানে কী গিয়েছে নীলেশ্বর? কুটুম্বিতায় গিয়ে আজ কী আর ফিরবে সে?

বেশ, ঐটুকুই ভাবা। 'বেটাছাউ-ছেনা' বড় হয়ে গেলে তার জন্য আবার ভাবাভাবি কি? সে তার নিজের ভাবনা নিজেই ভাবুক। নিজের ব্যবস্থা নিজে নিজেই করুক, খুঁটে খেতে শিখুক সে। হারাবে আর কোথায়? ঠিক ফিরে আসবে নীলুয়া।

ভাবনা ঝেড়ে ফেলে গুরভা-গুড়কুঁদারা ফের ধানপিটা ধানঝাড়া-বাছার কাজে মন দিল। কতটুকু কাজ আর অতগুলো লোক! —দেখতে দেখতেই কাজ হয়ে গেল শেষ! ঝাড়াই-বাছাই বিহানধানগুলো গোলায় তুলে রাখাও শেষ।

শেষ, শেষ।

এবার তো ঝাড়া হাত-পা, খালি বসে বসে গা থেকে ধানের সুঙ ধানের রোঁয়া ধানের ধুলোগুঁড়ো ঝেড়ে ফেলা আর ধুয়ে ফেলা।

সাফ-সুতোরো হয়ে ফের গোল হয়ে বসা, চোখ পিট্ পিট্, মুখে রা নেই লোধাজনমাড়ষদের, কাঠিখুঁচি নিয়ে খলায়-খামারে এঁকেড়-বেঁকেড় কাটা। একজনের পিছনে আরেকজন বসে খুনসুটি আর হাসাহাসি করছে খালি লোধাবউড়িঝিউড়িরা।

খলায় ফের নেমে এল অদ্বৈত। —কাঁইরে স্বপ্না শুনুচু?

ভাতুয়া স্বপন দৌড়ে এল, আজ্ঞা!

হাটখোলারে ভুবন মোহান্তির যাত্রা হোউচি —এ মানকু লেই যা তু —যা যা যাত্রা দেখে আয় তোরা—

গুরভা-গুড়কুঁদারা নিয়তি-রুদনীরা ভুটকী-চাঁদবদনীরা সুরুয়া-লাইবুকারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে— লোকটা বলে কী?

কাজকাম করালো, খাওয়ালো-দাওয়ালো— এর পরে যাত্রাও দেখাবে লো? এ গো সাচাই বলছে ত লোকটা?

অদ্বৈত বলল, আজ সকালা 'সীতা সীতা' বলি যে লুকটা 'ডায়লগ' দেইথিলা পোখরি আড়িরে সোউ লুকটার যাত্রাপালা আজ গাউনা হোউচি হাটখোলারে—যা যা স্বপ্না— অন্ধকার—আলোটা লেই যা—

সকালবেলায় "সীতা সীতা" বলে যে-লোকটা পুকুরপাড়ে 'ডায়লগ' দিয়েছিল সেই ভুবন মোহান্তির যাত্রাপালা আজ হাটখোলায় গাওনা হবে— আর 'নামালিয়া'দের তাই দেখাতে আলো নিয়ে যেতে বলছে গিরিহা?

বামনদার বিলে যে-মানুষটা রেগে কাঁই হয়ে গিয়েছিল—ধানকাটুনী চাঁদবদনীর সঙ্গে রঙ্গ করে দুটো কথা বলতে— সেই মানুষটাই কী না বলছে, যা যা স্বপ্না, হাটখোলারে যাত্রা হোউচি এমানকু লেই যা? কী না যাত্রা দেখাতে নিয়ে যেতে বলছে গিরিহা?

ভাতুয়া স্বপনের উৎসাহের আর অন্ত থাকল না।

বামহাত তৈলাধারের তলায়, ডানহাত হেরিকেন লাইটের হ্যাণ্ডেলে—যাবার জন্য একপা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

লোধাজনমানুষ লোধাবউড়িঝিউড়িদের উৎসাহ দিতে সে গদ গদ হয়ে বলল, অউ ত সাহি পড়িশা ঘরু বাহার— বাজনা বাজুচি, শুনচু নি?

এই তো পাড়া প্রতিবেশী ঘরের বাইরে— বাজনা বাজছে শুনছ না?

হ্যাঁ, হাটুয়া যাত্রার বাজনা যে বাজছে তারা তা শুনতে পেয়েছে আগে থেকেই। বনে থাকতে রাতভিত তারা এরকম কত বাজনার আওয়াজই তো শুনতে পায়— শীতলামঙ্গল, বিরাটরাজার গলা, রানী সুদেষ্ণার রোদন, বাঘাম্বর পালা, জয়ানন্দ-হীরানন্দর গলা, চম্পাবতীর রোদন, নোলিতাপালা, বসুশবরের হুঙ্কার, নোলিতার রোদন—

আজ চোখের দেখা দেখতে পাবে— আহ্লাদে তো নেচে উঠল চাঁদবদনী-পুনোই-ভুটকী সুরুয়া-লাইবুকু-চ্যাঙনাম্যাঙনারা। গুরভার বউও কাপড় ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল— সেও যাবে।

সে শুধু একবারটি ভাবল—আচ্ছা আমরা তো যাচ্ছি এখন হাটখলায় যাত্রা দেখতে, যাত্রা দেখার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে নতুন গিরিহা, পরে-পরে নতুন গিরিহানী কী আর যাবে না যাত্রা দেখার লোভে লোভে?

যাত্রাটাঁড়ে ফের দেখা হয়ে যাবে গিরিহানীর সঙ্গে— সেই আশায় আশায় গুরভার বউ তো লাফিয়ে উঠল—সেও যাবে, সেও যাবে যাত্রা দেখতে।

যাত্রা দেখতে, যাত্রা দেখতে।

বনে-জঙ্গলে ডুবকা-ডুংরিতে আঁউলা-বাঁউলা ভেলা-ভুড়রু কেঁদ্-কষাফল, কী খালধারে বিলধারে খণ্ডা-বণ্ডা কাছিম-কাঁকড়া গোই-গোধি ঢোঁড়া-ঢ্যামনা ধরার আশায় আশায় যারা সারাদিনমান টঙস টঙস করে ঘুরে বেড়ায় তাদের আর সুযোগ কোথায় দুদণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে 'হাটুয়া যাত্রা' দেখে।

তারা বড়জোর দেখেছে—ঐ বড়াম-গরাম কী শীতলাপূজায় 'চাঙ নাচ'—"কুহ সখী কাঁহি গলে—"

আজ দেখবে যাত্রা। ঐ তো 'হারমানি' বাজছে— প্যাঁ-পে-র প্যাঁ-এ-এ-এ-

হ্যাজাক-হাতে ভাতুয়া স্বপনেরও আনন্দের অন্ত নেই। মনে মনে আশা— চাঁদবদনীকে পাশে বসিয়ে, আহা যদি তা না হয়, চাঁদবদনীদের পাশে বসে কাছে কাছে থেকে সেও আজ দেখবে ভুবন মোহান্তির ভুবনজয়ী যাত্রাপালা—

কী পালা আজ সে গাওনা করবে— সীতাহরণ, সাবিত্রী সত্যবান, মাধব ও সুলোচনা, বাঘাম্বর, চিড়িয়া-চিড়িয়ানী, শীতলামঙ্গল—

না না, শীতলামঙ্গল তো হবে একমাত্র শীতলাপূজায়। আজ তো হাটখোলায় বামনদার ছেলেছোকরারা তাদের ক্লাবঘরে উৎসব করছে। ক্লাবঘরের কী যেন নাম, কী যেন—"বামনদা লোকক্লাব"!

স্বপনভাতুয়াও যাত্রাপাগল। তবে সেসব কী আর হেঁজিপেঁজি যাত্রা? কলকাতার নামীদামী কোম্পানী— এই যেমন নট্টকোম্পানি, সত্যম্বর অপেরা, ভারতী অপেরা, লোকনাট্য। আর কী সব পালা—সিঁদুর নিও না মুছে, বধূ আসামী শাশুড়ী বিচারক, এক চিলতে সিঁদুর, শয়তান ও সুন্দরী, নটীবিনোদিনী...

সে তুলনায় চিড়িয়া-চিড়িয়ানী? তবু ভুবন মোহান্তির এ-তল্লাটে খাতির আছে, খুব মান্য গন্য লোক। কথায় কথায় মুখে মুখে পালা 'রচে'। আজ ভুবন মোহান্তির যে কোনো পালাই ভাতুয়া স্বপনের কাছে ভুবনবিখ্যাত!

আগে আগে হ্যাজাক-হাতে স্বপনভাতুয়া। তার পিছনে 'চাঁড়ে চাঁড়ে' পা ফেলে এগিয়ে চলেছে চাঁদবদনী-পুনোই-ভুটকী-সুরুয়া-লাইবুকারা। তারও পিছনে নিয়তি-রুদনী-আদরী-গুরভানী গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা।

তে-মাথানীর মোড় একটা, এখানেই হাট বসে, তাই হাটখোলা। এদিক-সেদিক ছড়ানো-ছিটানো কতক হাটচালা। ছোটখাটো হাট। বড় হাট তো খাকুড়দায়, দাঁতনের কালী-চণ্ডীতে,

কাঁথির এগরায়।

লোক জড়ো হয়েছে মেলা। মা-বোন-বড়ড়ি-ঝিউড়িরাই বেশি। আটঘড়া-দশঘড়ার জেনারেটার দিয়ে শহর-বাজারের মতো আলোর ব্যবস্থা হয়েছে—ঘট্ ঘট্ করে মেসিন চলছে।

ম্যারাপ বেঁধে একধারে মঞ্চ করা। মঞ্চের উপর দু-চাট্টা মাইকের নল, যা দিয়ে লোকে 'হ্যালো-হ্যালো' করে। সেখানে বসে কে একজন বড়োডাঙা-নুয়াসাহির মথো ডোমের মতো গাল ফুলিয়ে সানাই বাজাচ্ছে। গুরভা-গুড়কুঁদারা তো পড়তে পারে না, পড়তে পারলে এতক্ষণে জেনে যেত নিশ্চয়, পিছনে লেখা আছে— "বামনদা লোকক্লাব"।

স্বপনভাতুয়াকে কিছু করতেই হল না, এগিয়ে এসে বামনদা লোকক্লাবের 'ভলেন্টিয়ার'রাই আদর করে ত্রিপলের উপর বসিয়ে দিল লোধাজনমাড়ষ লোধাবউড়িঝিউড়িদের।

এ গো তেরপল ত?

ধন্দ দূর করতে কেউ কেউ পাছার তলায় হাত বুলিয়ে দেখেও নিল— হ্যাঁ, তেরপলই বটে। তারপর ভাবল—সুখ, সুখ, এত সুখ? হাটুয়া লোকগুলো তাদেরও কী না তেরপলে বসতে দিয়েছে? আদর করে ডেকে ডেকে বসাচ্ছে?

ধন্দ দূর হয় না—জানতে পারলে ফের উঠিয়ে দেবে না? গুরভার বউ, নিয়তি-আদরী-রুদনীলোধানীরা বাসের সিটের মতো ত্রিপলটা চেপে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকল।

বসেই এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে তারা হঠাৎ দেখে ফেলল নীলুয়াকে— ঐ তো 'চিঁড়রা-কাঁধে' বামনদার হাটুয়া ছেলেছোকরাদের সঙ্গে একাসনে বসে আছে নীলেশ্বর!

নীলেশ্বর, নীলেশ্বর।

তবে কী সে শাঁকরিডাঙা-বেনাডুবিতে কুটুম্বিতায় যায়নি? যায়নি যায়নি, না-গিয়ে ভালোই করেছে নীলেশ্বর, গেলে তো আজকের এই হাটুয়া যাত্রা সে কী আর দেখতে পেত?

একসঙ্গে যে-কজন এসেছিল নামাল খাটতে পুবাল দেশে, সবাই, সব্বাই একসঙ্গে বসে আজ হাটুয়াদের যাত্রা দেখছে—এই আনন্দে চোখ-পিট্ পিটানি থামিয়ে চোখ বড় বড় করে দেখল-গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা।

খালি গুরভার বউয়ের চোখেই আকুলি-বিকুলি, অস্থিরতা অস্থিরতা—গিরিহানী এখনো কেন আসছে না? ঐ তো এধারে-ওধারে কত বসে আছে সুন্দরপানা, 'ম্যাড়ের' মতো মুখ হাটুয়া 'মেয়েছানা'!

অসুবিধা হয়ে গেছে স্বপনভাতুয়ারও। হাটচালার একটা খুঁটোয় হেরিকেন-লাইটটা ঝুলিয়ে সে কোথায় এসে বসবে চাঁদবদনী-পুনোই-ভুটকীদের পাশে, বসে থেকে ভুবন মোহান্তির দলটাকে ঘন ঘন হাততালি মেরে এনকোর্ দেবে, তা নয় চোখাচোখি হয়ে গেল কাঠবিড়ালী-কাঁধে সেই লোধাছোকরাটার সঙ্গে!

যেখানে শর সেখানে শবর।

তীরধনুককে ভাতুয়ার বেড়ে ভয়! সে তো দেখেছে কাঠবিড়ালী-কাঁধে ঐ নীলুয়া না কালুয়ার গোছা গোছা 'পাটন' আছে। কে জানে জঙলীদের 'পাটনে' কিসের না কিসের বিষ কী না কী তুকতাক করা আছে!

হ্যাজাকটা ঝুলিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল স্বপন—সে এখন কী করবে—তাকে দেখতে পেয়ে হরিশ জানার ভাতুয়া উদয় কাছে এসে পিঠে থাপ্পড় মেরে বলল, "ছি ছি হট নাগর একি রীতি তুন্তর"—এই যে স্বপ্না, খুব যে—

পিঠে হাতের থাবড়া খেয়ে বেঁচে গেল স্বপন—যা হোক একজন সঙ্গী তো পাওয়া গেল!

এতক্ষণ সানাই যে বাজাচ্ছিল তার নাম নাকি চৈতন্য ঘোড়ুই। বেড়ে বাজাচ্ছিল 'পান'

ভরে— তার সানাই শুনে মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল বুকটা! সানাই-এর বাজনা তো নয় যেন 'বিভার' পরে শাশুঘর যাবার কালে ইনায়ে-বিনায়ে কাঁদছে রানী। সেই আছে নাই—

"কাঁদিলে কি হবেক রানী
ভাবিলে কি হবেক
যখন জনম তখন লেখন লো বানী
এখন কেনে কান্দিস?"

সানাই থামলে শুরু হল হাততালি চড়বড় চড়বড় করে। কত বাবুলোক যে বুকে জড়িয়ে ধরল চৈতনকে! দশটাকা বিশটাকার নোট বুকে 'গুঁথে' দিল সেফ্‌টিপিনে।

এরপরেই যাত্রা 'চিড়িয়া-চিড়িয়ানী'—

হাটুয়া ঘরের 'মা-বহিন-বোহু'রা আসর আলো করে বসে আছে সামনের দিকে, গুরভা-গুড়কুঁদা-নিয়তি-আদরী-সুরুয়া-চাঁদবদনীরা বসে আছে মঞ্চ থেকে দূরে। দূরে, দূরে।

যাত্রা শুরু হবার আগে মঞ্চে উঠে মাইকের 'চোঙা' ধরে একজন কিছু বলল। একজন বলল, দুজন বলল...। একজন দিদিমণিও অনেক কথা জোরে জোরে, খুব জোবে জোরেই বলল।

'ঝ্যা-এ-এ-ঙ্' করে যাত্রার ঘণ্টা বাজল—'চিড়িয়া-চিড়িয়ানী'—

নামটা শোনা শোনা, গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা ভার-কাঁধে নদীপারে রাত-ভিত যেতে-আসতে নুয়াসাহীর রাজুর পো অনন্ত দত্তের 'খলায়' চিড়িয়া-চিডিয়ানীর মহড়া শুনেছে। তবে সে-সব কী আর তাদের মনে আছে? না, মনে বাখার কথা? ঐটুকু মনে আছে— 'হারমানি' বাজত, পাখোয়াজ বাজত। ঝ্যা-এ-এ-ঙ্ ছ্যাচে-এ-এ-ঙ্ কবে ঝাল বাজত, হাটুয়া-ছুআরা দল বেঁধে নাচত—

নিয়তি-রুদনী-আদরী-পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা মঞ্চেব দিকে সবে সরে বসল। সরে সবে বসল।

বন্দনা শুরু হল। একদল সখী 'চিড়িয়া' সেজে আসরে নেমে নেচে-কুঁদে আসর মাৎ করে দিল! ছেলেরা মেয়ে সেজেছে নাকি মেয়েরাই সখী সেজেছে—নিয়তি-রুদনী-আদরীরা কিছুতেই ধরতে পারছে না, কিছুতেই না!

মুখে অভ্রের গুঁড়ো মেশানো পাউডার, গাল দুটো চিক্ চিক্ করছে। এত নরম আর নাদুস-নুদুস যে নিয়তির টিপে দেখতে সাধ যায়! তার উপর চিবুকের মধ্যিখানে কালো চিড়িতনের ঐ উল্কিটা? —এ গো বেড়ে লাগছে!

স্বপনভাতুয়া আর থাকতে পারল না। যাত্রা দেখতে নামালিয়াদের কোনো কিছু অসুবিধা হচ্ছে কী না— তাই জানবার অজুহাতে প্রায় চাঁদবদনীর পাশটিতে এসে থপাস্-গাদা হয়ে বসে পড়ল সে।

চাঁদবদনী-পুনোইরা তখন জোর মেতে আছে তর্কে—চিড়িয়ারা 'নাইলেন শাড়ি' না 'সিলকের শাড়ি' পিন্ধে আছে? 'বোস-ওঠা' বুকগুলো আসল না নকল?

নিজেদের ভিতর হিস্ হিস্ ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছিল পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা। টুকটাক শুনে ফেলে মুরুব্বির মতো একটা কিছু বলতে গিয়েছিল স্বপন ভাতুয়া, তাকে মুখ-ঝামটা দিয়ে থামিয়ে দিল চাঁদবদনীরা, তোর কথা কে শুনছে খালভরা, যা পালা!

পালাবার পথ পেল না স্বপনভাতুয়া, আর এসময়ই দলের ভিতর এসে পড়ল নীলুয়া। নীলুয়া, নীলুয়া। এমনভাবে সে এল আর এমন ভাব করে সে 'হাসি-হাসি' মুখ নিয়ে দলের ভিতর বসে পড়ল যেন মনে হল— শঁকরিডাঙা-বেনাডুবিতে কুটুম্বিতায় সে যায়নি বটে তবে

কুটুম্বিতার চেয়েও বড়জিনিস তার আয়ত্তে সে এনে ফেলেছে।

আয়ত্বে এনে ফেলেছে, এনে ফেলেছে।

গুরভার বউ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসরময় খুঁজে বেড়াচ্ছে—'চিড়িয়া-চিড়িয়ানী' যাত্রা দেখতে গিরিহানী কী এসেছে? সেই দূর্গা 'ম্যাড়ের' মতো মুখ, চাঁদের পারা টিপ, 'বিদ্যা' জানা আছে যার? নীলুয়া কী দেখেছে?

নীলুয়াকে 'জিগাস' করবে বলে নীলুয়ার মুখের দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখ করেও থমকে গেল গুরভার বউ, ভাঙল না।

আর এসময়ই আসরে প্রবেশ করল 'চিড়িয়া'। তার মানে পুরুষ-চড়ুই। সে গিয়েছিল বিদেশে, খাদ্য 'আনিবাকু'। খাদ্য অন্বেষণে বিদেশ গিয়ে বারো বছরেও চিড়িয়া ফিরল না দেখে 'চিড়িয়ানী' তার মানে স্ত্রী-চড়ুইও উড়ে গিয়েছে চিড়িয়ার খোঁজে।

চিড়িয়ানী খুঁজতে গেছে চিড়িয়াকে, আর চিড়িয়া একা একাই ফিরে এসে খুঁজছে চিড়িয়ানীকে। মঞ্চের সামনে-বসা লোকজনকেই চিড়িয়া-সাজা লোকটা জিজ্ঞাসা করছে—

কুহ কেহি দেখিয়াছ কি— কনে গলা মো চন্দ্রবদন
হেলা বার বর্ষ— মু গলি বিদেশ
কা বুধিরে পড়ি—গলু ঘর ছাড়ি
দশ দিগ আঁধার তো বিনা—

গুরভার বউয়ের চোখ ছলছল করে উঠল— সত্যি সত্যি কার বুদ্ধিতে পড়ে ঘর ছেড়ে চিড়িয়ানী বেরিয়ে গেল চিড়িয়াকে খুঁজতে? আর চিড়িয়াকেও বলিহারি—গেলি গেলি একেবারে বারো বছর? কথায় আছে নাই?—

জমি-ঘড়া-নারী
যে-চড়ে তারি।।

একবার ঘরের বউ বেহাত হয়ে গেলে সে কী আর ফিরে আসে? ঘোড়ায় যে-চড়ে ঘোড়া তো তার-ই। কে জানে চিড়িয়ানী কার সঙ্গে ভেগেছে?

বিরসবদনে গুরভার বউ ভাবল—আচ্ছা, নামাল খাটতে এসে তার সঙ্গে গুরভার যদি এরকম ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়? পরক্ষণেই আঁতকে উঠল—ধুস্! কী ভাবতে কী ভাবছি! ঐ তো মাত্বর গুরভা গুড়কুঁদার কাঁধে হাত রেখে, যাত্রা দেখছে জলজ্যান্ত মানুষটা!

গুরভা ভাবছে অন্য কথা। —ঐ যে বলল, 'কা বুধিরে পড়ি —গলু ঘর ছাড়ি'? মাতব্বর রাইবু যদি ফিরে এসে 'জিগাস' করে —কার বুদ্ধিতে পড়ে দেশ ছেড়ে নামাল গেলি? তার উত্তরে কী বলবে সে?

বলবে কী —ঐ যে বসন্তিয়া, শালা কামিল্লাই ভুলিয়ে-ভালিয়ে? বললেও রাইবু 'বিশ্বাস' করবে কী? দৌড়ে যাবে না গুপ্ত জায়গা থেকে চোরাই বন্দুকটা নিয়ে আসতে?

শুনি থিবে সুজনে—
মু অতি বিবসমনে স্বর্ণরেখা পার হই দেউলবাড়।
রামেশ্বর শ্রীপদরে নমস্কার কলি আর।।
লক্ষ্মণ নাথরে যাই প্রবেশ হেলি।
গড় করি টঙ্কা দেলি।।
বেলদারে গলি কেশিয়াড় রে গলি।
নারানগড়ে যাই বিশ্রাম কলি।।

আর কী ধরে রাখা যায় গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের? নিয়তি-আদরী-রুদনী-

গুরভানীদের? —এগো সবু যে চেনা গো! দেউলবাড়-রামেশ্বর-বেলদা-কেশিয়াড়ী-নারানগড়-

আর কে না বুঝতে পারছে —স্বর্ণরেখা-ই 'শবর নেকা'? সুবর্ণরেখা, সুবর্ণরেখা। স্বর্ণরেখা পার হই —তার মানে তো তারমানে তো-

এগো এ যে গো আমাদের 'সেদিগ্‌গার' কথা! কাটে-কাট মিলে যাচ্ছে! তবে কী চিড়িয়া-চিড়িয়ানী 'তপুবনেই' থাকত?

গুরভার বউ দুম করে ভেবে বসল —আছ্য ভালা, চিড়িয়া-চিড়িয়ানী কী সেই পাখ্‌টার পারা-ঐ যে ঐ—

ভাবতে না ভাবতেই পাখিটা কাছে পিঠের গহীরার জঙ্গলের অর্জুন-নিম-খিরিশ-কাঁটাবাবলা-তাল-হিজল-জারুলের কোন্ ডুব্‌কা-ডুংরি কোন্ লাটা-পাটার ভিতর থেকে গলার নলি গলার থলি ফুলিয়ে ডেকে উঠল, আর সে-ডাক এই যাত্রার আসরেও এসে পড়ল — টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

—উ-ল টু-টু-উ-উ— মাথাটা দু'হাতে জাপটে ধরে আচমকা উঠে ফের বসে পড়ল গুরভাবউ। ডাকটা গুঁড়ো ঝরাতে ঝরাতে চলে যাচ্ছে। -উ-ল টু-টু টু-টু-উ-উ-উ—

চিড়িয়া সুবর্ণরেখা পার হল। দেউলবাড়ের রামেশ্বরনাথের মন্দির শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করল। লক্ষণনাথের মন্দিরে প্রবেশ করে গড় করে প্রণামীর টাকা দিল। তারপর তো চিড়িয়ানীর খোঁজে কেশিয়াড়ি ঘুরে বেলদা গিয়ে নারানগড়ে এসে বিশ্রাম নিল।

লোধাজনমাড়ষ লোধাবউড়িঝিউড়িরা মনে মনে ভাবল— খাকুড়দা হয়ে চিড়িয়া কী আর বামনদায় আসে নি?

নারানগড়ে পৌঁছে গ্রামের মোড়ল উঁচুজাতের এক বুড়োকে "কোথায় থাকবে কী খাবে" চিড়িয়া জিজ্ঞাসা করলে মোড়ল সর্বাগ্রে জানতে চাইল—তুমর জাত কি কুহ ত?

আমে শবর—

হেই-তু শবর লুক- তু ত আস্তর ঘররে খাইবুনি। তাহানে তু সিধাপত্র লেই পুখুরি-আড়ি বটগাছমূলরে ভাত রান্দি খুইবু যা।

কী বলল? বলল কী 'শব্বর'? গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা তো ঝাঁপিয়ে পড়ল। — চিড়িয়া তাদেরই জাত? এতদূরে বামনদায় বসে তাদের নিয়েই যাত্রা হচ্ছে 'চিড়িয়া-চিড়িয়ানী'? তবে তো তপোবন থেকেই চিড়িয়া এদিকে এসেছে চিড়িয়ানীর খোঁজে? তারাও তো তপোবন থেকে এদিকে এসেছে চিড়িয়ানীর তালাসে না হোক কাজের খোঁজে? —এগো মিল আছে নাই?

আছে, আছে।

নীলুয়া বলল, অনেকেই ত আমাদের লিঞে করে খাচ্ছে, হাটুয়ারা বিদ্যাধর হাটুয়ারা যাদুকর, অনেক বিদ্যা অনেক যাদু ওদের জানা আছে —ধীরে ধীরে বাইরাবে-

কী বলল? বলল কী নীলুয়া? অনেক বিদ্যা অনেক যাদু হাটুয়াদের জানা আছে— ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে? নীলুয়ার কথা শুনে গুরভার বউ তো তেতে উঠল— হঁ-অ তব্বে ত ঠিকেই ধরেছি।

গুরভা-শরাবণ-শতুরারা, বিশেষত গুরভা, গুরভাই নীলেশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে মিচকি হেসে ভাবল— ছাউ ত এক বেলাতেই দেখি 'আনেক' জেনে এসেছে!

যার যেমন ভাবনা, লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা নিয়তি ভাবছে— ঐ যে বলল, শবর লুক— তু ত আস্তর ঘররে খাইবুনি— তার মানে মোড়ল লোকটা কী জাতের?

—বাম্‌ভন, বাম্‌ভন—

ব্রাহ্মণের ঘরে লোধাশবর লোক তো খাবে না, তারা তো ব্রাহ্মণের থেকেও বড় জাত। গর্বের সঙ্গে 'কথাটার' মানে আদরী-রুদনীদের বুঝিয়ে দিল নিয়তি।

ব্রাহ্মণ মাতৃবর ঠিক কাজই করেছে, বলেছে, তু সিধাপত্র লেই পুখুরি আড়ি বটগাছ মূলরে ভাত রান্ধি খুইবু যা—

চাল-ডাল-আনাজপাতি নিয়ে পুকুরপাড়ে বটগাছের তলায় রান্নাবান্না করে খেতে বলল লোধালোকটাকে।

কী মিল, কী মিল! আজও তো তারা পোখরি-আড়ায় বটগাছতলায় না হোক ডাবগাছতলায় রান্নাবান্না করে খেয়েছে!

যাত্রা শেষে স্বপনভাতুয়ার হেরিকেন-লাইটের আলোয় পথ চিনে সেই তো পোখরি-আড়ায় ডাবগাছের তলায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে এসে বিশ্রাম করা। "নারানগড়ে যাই বিশ্রাম কলি"—নারানগড়ে না হোক বামনদায় এসে তারা বিশ্রাম করছে।

আর তো কিছু করার নেই, আর তো কিছু খাওয়া-দাওয়াও নেই। সারারাত হরিমটর, হরিমটর। নতুন গিরিহার ভালোই ফন্দিটা— এক খাবারেই দুবেলা! বৈকাল-বৈকাল খাওয়া-দাওয়া করালে দুপুরের খাওয়াও হল আবার রাতেরও।

যত দোষ চাঁদবদনীটার— তার অত 'চাঁড় চাঁড় রন্ধাবঢ়া' করার দরকার কী ছিল? অতটা আগ-বাড়িয়ে তার গিন্নিপনা না-দেখালেই কী আর চলছিল না? চাঁদবদনীটা বড্ডবেশি পোঁদ-পাকা! বৈকাল বৈকাল না রেঁধে 'টুকচার' সাঁঝ করে রাঁধলেই তো হত।

এখন আর কী করার— এক পেট-তাবুড় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া? সারাদিন সারারাত না খেয়ে এমন কত ঘুমই তো তারা ঘুমিয়েছে!

কিন্তু ঘুম আসছিল না নীলেশ্বরের চোখে। বিকালে একবেলা বিলে ধান কাটতে না গিয়ে 'তার কাজ আছে' বলে অন্যত্র কেটে পড়েছিল সে। শঁকরিডাঙা না শঙ্করীডাঙায় তার এক 'ক্লাসফ্রেন্ড' আছে, তার কাছেই যাবে বলে প্রথমে ঠিক করেছিল নীলুয়া। একে অচেনা তার উপর এত কম সময়ে সেখানে কী যাওয়া যায়! কে জানে কত দূরের রাস্তা!

অগত্যা থেমে গিয়েছিল নীলুয়া। তারপর তো খেলা—

ফুটবল, ফুটবল।

রাস্তার ধারে এক চিলতে মাঠে নীলুয়ারই সমবয়সী ছেলেরা ফুটবলে লাথি মারছে, আর তাই দেখে একেবারে মগ্ন হয়ে যাবে না নীলুয়া? গোঠটাড়ে এরচেয়েও বড় মাঠে কুমহার-কামহার-মাহাতোদের ছেলের সঙ্গে— ওলডাঁটার বল থেকে চামড়ার বল— কতরকম বলই যে খেলেছে নীলেশ্বর! তল্লাটে কে না জানে— নীলুয়ালোধা এখন নামকরা 'সেন্টার-ফরোয়াড়'?

বামনদার ছেলেদের সঙ্গে খেলায় ভয়ঙ্কর তেতে উঠল নীলেশ্বর। দেখিয়ে দিল খেলায় সেরার সেরা সে। তারপর তো তাদেরই সঙ্গে তাদেরই ক্লাবে আসা, যাত্রা দেখা—

সেই ছেলেগুলোই তাকে কতরকম ম্যাজিক দেখাল! ম্যাজিক, ম্যাজিক। তাসের ম্যাজিক, দেশলাই কাঠির ম্যাজিক,হাতের ম্যাজিক, পায়ের ম্যাজিক, 'গিরিহাদের' ম্যাজিক, 'পঞ্চাতের' ম্যাজিক—

এক বেলাতেই কত কী ম্যাজিকের কত কী যাদু-ভেল্কির কথা শুনে এসেছে নীলেশ্বর! আর তাই এতক্ষণ মউজ করে শোনাচ্ছিল গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের। গুরভার বউয়েরই আগ্রহ বেশি। বাকিরা ঘন ঘন হাই তুলে যে-যার ঢলে পড়ছিল ঘুমে।

সেই গুরভার বউও ঢুলতে ঢুলতে একসময় খড়ের বিছানায় আরামসে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম, ঘুম। ঝুঁকে পড়ে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে, অভ্যাস নেই, তবু হাতের দা চালিয়ে যাওয়া— কী সোজা কথা?

শুধু ঘুম আসছে না নীলুয়ার চোখে, কত কী মনে আসছে-যাচ্ছে! পোখরি-আড়ায় ডাবগাছের বাকলায় বাঘযুগনী পোকা—'ডালে বসে পিছনটা জ্বলে'। তার মানে জোনাকি, জোনাকি। করঞ্জা গাছে পাখি 'কঁহরাচ্ছে'—

কান খাড়া করল নীলুয়া— ফিস্ ফিস্ করে কে যেন কাকে ডাকছে। ডাকটা চালা ঘরের পিছনে। —ভুজা লেই যা চন্দ্রবদনী! ভুজা—

গিরিহা-গিরিহানী নয়, নির্ঘাৎ ভাতুয়াটা। লুকিয়ে মুড়ি দিতে এসেছে চাঁদবদনীকে। এতলোক থাকতে ফের বদনীকে কেন?

মটকা মেরে পড়ে আছে নীলুয়া, আর দেখে কী চুপিসাড়ে ভুজা নিতে বেরিয়ে যাচ্ছে চাঁদবদনী। এতটুকু ডর-ভয় নেই মেয়েটার? সেই বলে নাই— 'অতি ভোখে ভোখ নাই, ভোখ কর ক্ষেমা—?

তড়াক্ করে উঠে পড়ে মেয়েটার পিছু নিল নীলুয়া।

জেগেই শুয়েছিল গুরভা, সেই বলে নাই— অতি রাগে রাগ নাই, রাগ কর ক্ষেমা!' নীলুয়ার পিছন-পিছন বেরিয়ে গেল গুরভাও।



ধরা পড়ে গিয়েছিল স্বপনভাতুয়া। লুকিয়ে চাঁদবদনীকে মুড়ি দিতে এসে ধবা পড়ে গিয়েছিল সে।

হাটখোলা থেকেই মুড়ি কিনেছিল স্বপন। শুধু যে চাঁদবদনীর জন্যই মুড়ি কিনেছিল সে— তা তো নয়, সে মুড়ি এনেছিল গোটা দলটার জন্যই। শুধু কী মুড়ি, মুড়ির সঙ্গে চপ-পকোড়াও।

সবার জন্যই সে মুড়ি দিতে এসেছিল চাঁদবদনীকে। চাঁদবদনী তো আগে নিক, নিয়ে সবাইকে বিলিয়ে দিক। এতগুলো লোক না-খেয়ে সারারাত উপোস করবে!

স্বপনের ধারনা গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যা লোকটা হাড়-কঞ্জুষ, তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে একফোঁটা জল গলে না। যা-কিছু করে সবই আগে-ভাগে হিসাব করা।

ধরা পড়ে গেল স্বপনভাতুয়া, সেই সঙ্গে ধরা পড়ে গেল চাঁদবদনীটাও। হাতেনাতেই ধরল নীলুয়া। স্বপনভাতুয়ার হাত থেকে 'রাকা' মেয়েটা যেই মুড়ির ঠোঙা নিয়েছে, অমনি খপ্ করে ধরে ফেলেছে নীলুয়া।

তা বলে চাঁদবদনীও তো কম যায় না, সে বার বার গলা উঁচিয়ে বলে চলেছে, যা করার করবে আমার মা-বাপ, যা বলার বলবে আমার বাপ-মা, আমাদের ঘরের লোক— তুই কোথাকার কে, আমড়া-ভাতে দে, বাইরের লোক হয়ে তুঁই কেনে আমাকে ধরবি তুঁই কেনে আমাকে বকবি?

হক কথা, খাঁটি কথা— কথা তো ঠিকই, সঙ্গে আছে তার বাবা-মা, শরাবণলোধা শরাবণের বউ লোধানী, কই তারা তো উঠে এসে কেউ কিছু বলছে না? মাঝখান থেকে বাইরের লোক হয়ে নীলুয়া—

দোরখুলি ছেড়ে পুব খাটতে আসাইস্তক চাঁদবদনী দেখে যাচ্ছে— তার পিছনে টিকটিকির মতো লেগে আছে নীলুয়া। সদাসর্বদা পিছনে টিক্ টিক্ করছে— এটা করিস না সেটা করিস না, এধার যাস না সেধার যাস না—

নিষেধ করতে হয় করুক তার বাবা-মা, ও করার কে? তার সঙ্গে চাঁদবদনীরই বা কী? সঙ্গে তার বাবা-মা আছে?

নীলুয়া যে একথা ভাবে না, জানে না, বা বুঝে না— তা তো নয়। বুঝে সবই, তবু তো মাঝে মাঝে অবুঝের মতো চাঁদবদনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

ঐ নিয়ে তুমুল হচ্ছিল, আর ওদিকে ফাঁকতালে পোখরি-আড়া ছাড়িয়ে অদ্বৈত পৈড়্যার বাস্তু-চৌহদ্দি ছাড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল স্বপ্না। স্বপন ভাতুয়া পালাচ্ছে।

কাজকাম শেষে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে গিরিহার বাড়িতেই ঘুমোয় স্বপ্না— কে জানে রাতভিত কখন কী দরকারে লাগে। আজ সে পালিয়ে গেল। কে জানে গিরিহার কানে কথাটা উঠলে গিরিহা আর তাকে রাখবে কী 'ভাতুয়া' করে?

চাঁদবদনীর পিছু পিছু যেমন নীলেশ্বর দৌড়েছিল, তেমন নীলুয়ার পিছু পিছু দৌড়েছিল গুরভা। সে অনুমান করেছিল— উগ্রচণ্ড নীলুয়া হয়ত চড়-চাপড়ই মেরে বসবে গিরিহাব ভাতুয়াটাকে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে তখন আরেক হ্যাঙ্গামা। কোথায় কাজকাম করে গায়ে-গতরে খেটে দুটো পয়সা কামাতে এসেছে তারা— তাও রাইবু থাকলে কী আর আসা হত? অশান্তির একশেষ করত না লোকটা? এসে পড়েও তো এই উটকো অশান্তি—

এ্যাই নীলুয়া, থাম থাম, 'হুর্‌রি' করিস নাই! হয়েছে কী? আমরা ভকে মরছি, একজন কেউ খেতে দিচ্ছে— এই ত! আচ্ছা, বদনীর 'জাগায়' তুঁই থাকলে কী করতিস? খাবারটা হাত বাড়াঞে লিতিস ন লিতিস নাই, বল ত?

মাতব্বরের মতোই কথা। কিন্তু নীলুয়া মানবে কেন, তার তো এক কথা— ও তুমি বুঝবে নাই। এর ভিতর রহস্য আছে।

রহস্য? তার মানে ফন্দি?

হঁ-হঁ ফন্দি।

কাহার ফন্দি? কী ফন্দি?

নীলুয়া বলে, উয়াকেই জিগাস কর।

চাঁদবদনীর দিকে গুরভা চোখ তুললে চাঁদবদনী মুড়ির ঠোঙাটা আরেকটু জোরেই আঁকড়ে রাখল, তারপর হিসিয়ে উঠল—

ফন্দির কী দেখলি তোকে বলতেই হব্বেক, হঁ বল! নাম ধরে ডাকছে, ডাক শুনে উঠ্‌ঠে আইলম 'চিন্‌হা' লোক— উহেই ত টুকচার আগেও লাইটের আলোয় যাত্রা দেখায় আনল। এর ভিত্‌রে হিঁয়ালি-ফন্দির কী হৈল?

খানিক থেমে চাঁদবদনী সাফসুফ জানিয়ে দিল, আর যদি কিছো করেই থাকি তব্বে বেশ করেছি! ফের করব একশৎবার করব হাজারবার করব!

বলেই মাটিতে থুথু ফেলল চাঁদবদনী।

এ মেয়ে সেই মেয়ে, রাইবুর বহিন সোমবারি। সোমবারি, সোমবারি।

চাঁদবদনীর ভিতর সোমবারিরই ছায়া দেখল গুরভা।

কথা শুনে রক্ত মাথায় উঠে গিয়েছিল নীলুয়ার। তার মনে হচ্ছিল চুলের মুঠি ধরে মেয়েটাকে এক্ষুণি আছড়ে মারে, পিঠে দমাদ্দম কিলোয়—

কিন্তু কিছুই করতে পারল না সে। একে তো সম্মুখে মাতব্বর গুরভা, তার উপর

এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠে এসেছে শরাবণ-শরাবণের বউ, চাঁদবদনীর মা-বাপ।

'কী হয়েছে, কী হয়েছে' বলে তারা কিছুক্ষণ হাঁই-হাঁই করল, তারপর সব শুনে-টুনে বলল, তোরা কিছো মনে করিস নাই গুরভা-নীলুয়া, মেয়্যাটা আমার বজ্জাত আছে।

ফের ফোঁস করে উঠল চাঁদবদনী, অঃ রে অত গুড় আধসের না— এতে বজ্জাতির কী হৈল?

জিদ্দী মেয়ে জবাব চাইছে।

তার ঘেঁটুতে একটা কিল মারল তার মা।

—চো-ও-প বজ্জাত!

তারপর তার ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ফের চালাঘরের আস্তানায়, চাঁদবদনীর হাতে তখনও চেপে-ধরা মুড়ির ঠোঙা।

চালাঘরের পিছনে অন্ধকারে কিছুক্ষণ একা একাই দাঁড়িয়ে থাকল নীলেশ্বর। হাতে-ধরা ছিপটিটা দিয়ে এদিক-সেদিক তলোয়ারের মতো স্নিক্-স্নিক্ করে কোপ মারল, ডগা ধরে মাথার চারধারে বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে ছিপটিটাকে মন্ত্রপুতঃ করে ছেড়ে দিল 'ব্যাকড়া' করে।

—যা রে ব্যাকড়া যা, ধরে আন স্বপ্নাকে!

সেই আছে না— একখণ্ড 'বাঁড়িয়া' বা 'খাঁড়িয়া' অর্থাৎ বেঁটে-খাটো কাঠকে মন্ত্রপুতঃ করে বাঘ কী ল্যাকড়ার পিছনে তাড়া করতে ছেড়ে দিলে সে বাঁই বাঁই করে বাঘ-ল্যাকড়ার পিছন-পিছন ঘুরতে ঘুরতে বাঘ-ল্যাকড়াকে হেনস্থার এক শেয করে?

তেমনি আর কি। নীলেশ্বর হাতের ফাবড়া ছেড়ে দিল—

কড়ার হাতে কাঁড়বাঁশটা কুড়ির হাতে দা।
ভেজা বিঁধা হাতযশটা এবার দেখে যা।।

তাবলে গুরভা-শরাবণ-শরাবণের বউ স্বপনভাতুয়ার দেওয়া মুড়িগুলো ফেলে এল না, সঙ্গে করেই নিয়ে এল।

মানা করেছিল নীলুয়া। বাকিরা শুনল না। খাবার বলে কথা, অন্ন, যাচা অন্ন ছাড়তে নেই পায়ে ঠেলতে নেই হাতের লক্ষ্মী।

লোধাদের কথা শুনে 'রাগে ভুঁইয়ে ভাত খাওয়ার' মতো নীলেশ্বর মুড়ি না খেয়ে মনে মনে হতাশায়-বিরক্তিতে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেল।

ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছিল সবাই, ঠোঙাভরতি মুড়ি নীলুয়া ছাড়া বাকিরা ভাগাভাগি করে খেল। চপগুলোও ভেঙে ভেঙে একে একটুকরো তাকে একটুকরো দিল।

চাঁদবদনী যে খেল না, তা তো নয়, সেও খেল 'তাহুত্' করে বেশ রসিয়ে রসিয়ে, পুনোই ভুটকীদের সঙ্গে ঠাট্টা-ঠিসারা করতে করতে।

রাতের অন্ধকারে এতকিছু ঘটে গেল, গিরিহা-গিরিহানী তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারল না। তবে ঘুমোবার আগে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল নীলুয়া— কাল সকালে গিরিহার কানে সাতকাহন করে তুলে দেবে কথাটা! দেবেই দেবে।

গিরিহা শুনুক তার প্যায়ারের ভাতুয়ার কিত্তিটা। আর নীলুয়ার আশা— একথা শুনলে গিরিহা ত দুহাতে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে তার হাড়গোড় ভেঙে দেবে না?

ইস্ কী করতে কী যে করে ফেলল সে। ভেবে ভেবে আকুল স্বপনভাতুয়াও। মনের যে কী 'গতিকে' পড়ে ট্যাকের পয়সা খরচ করে এত দরদ দেখিয়ে ঐ হা-ঘরেদের জন্য হাটখোলার সুবলের দোকান থেকে অত রাতে চপ-মুড়ি কিনতে গিয়েছিল সে।

আর কারোর জন্য তো নয়, খালি ঐ চন্দ্রবদনীটার জন্যই। চন্দ্রবদনী, চন্দ্রবদনী। একেবারে উপোস না থেকে রাতে মুড়ি খাবার কথা ইসারায় চাঁদবদনীকে বলেছিল সে। চাঁদবদনীও যেন চোখ ঘুরিয়ে তার কথায় দিয়েছিল সায়। আর তাতেই তো—

তাতেই তো ঘোরে পড়ে সে করে ফেলেছিল অপকর্মটা! অপকর্ম বলে অপকর্ম। সেই বলে না— "শনিবারের হাট কানফুল ঘিনি জাগনু বাট?" শনিবারের হাটে কানের দুল কিনে রাস্তায় বসে আছে তারই পথ চেয়ে।

ডাক শুনে ভুজা নিতে সে এল, ভুজাও নিল সে হাত বাড়িয়ে, আর তারপরই তো দৌড়ে এল দুঃশাসন-বিভীষণটা। খপ্ করে ধরে ফেলল হাতটা।

চাঁদবদনীর হাত না ধরে সে যদি হাত ধরত স্বপ্নার? আর ধরেই হাতের ছিপ্‌টি দিয়ে পরের পর চাবকাত গায়ে? তা না করে সে নরম হাতের লোভে হাত ধরল চাঁদবদনীর। আর তাতেই তো—

ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল সে। কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছিল স্বপনভাতুয়া। স্বপন মনে মনে ভাবে— ছিপটি দিয়ে চাবকাতে এলেই হল? ছিপ্‌টির ডগা হাতে ধরে মুচড়ে মুড় মুড় করে ভেঙে দেবে না? তারও তো গায়ে জোর আছে, তারও তো গাঁয়ে পাঁচ ঘরের দশজন লোক আছে, লোকবল আছে, আছে না? নামাল খাটতে এসে কারণে-অকারণে এদেশের লোকের গায়ে হাত তুললে তারা কী এম্নি এম্নি ছেড়ে দেবে? প্রতিশোধ নিতে মেরে পাট করে দেবে না তাকে?

আশায় আশায় লোক জোগাড় করতেই কী সেরাতে গ্রামে গিয়েছিল স্বপনভাতুয়া? স্বপনভাতুয়ার গ্রাম বামনদারই আশ-পাশ শিমুলদাঁড়ি না শিমুলবাড়ি। ঘরে মা-বাপ ছাড়া দু-দুটো ভাই দু-দুটো বোন।

আজ যারা অবস্থার ফেরে দূর দূর দেশ থেকে নামাল খাটতে এসেছে বামনদায়, তাদের সঙ্গে তাদেরই বা তফাৎ কী? সেই তো দিনআনা দিনখাওয়া—সে ভাতুয়া, বাপও দিনমজুর! বরঞ্চ বাঁধা-ধরা ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়ার ভিতর একমাত্র সে-ই তো আছে।

গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার বাড়িতে 'ভাতুয়া' আছে সে বহুত দিন। এরকম কত 'নামালিয়ার' উপর চোটপাট করে কত আমন কত বোরো কত রোয়া কত ধানকাটার মরশুম সে কাটিয়ে দিয়েছে! কই কিছু তো ঘটেনি! আজ যা ঘটল স্বতন্ত্র।

গিরিহার কানে কথাটা উঠলে—উঠবে কী, উঠিয়ে ছাড়বে সেই নীলুয়া—সব শুনে আর কী তাকে বহাল রাখবে অদ্বৈত? মারুক ধরুক বকুক— তবু তো দুবেলা দুমুঠো খেতে দিচ্ছিল অদ্বৈত!

তার মা বলল, এত্তে রাতকু আইলু কেনি স্বপ্না?

এম্নি শুধা শুধা।

শুধু শুধু এসেছে, এম্নি এম্নি।

হ, তোর চোখ কহেটে —তুই গিরিহার সাঙে চোপা করলু।

মায়ের মন তো! ঠিক ধরে ফেলেছে।

স্বপন হাসল, তবু ভাঙল না।

বলল, হাটখলায় যাত্রা থাইলা, সোউ দেখি অউ ত ঘরকু। টিকে পানি দও, খাই চালি যিমি।

পানি আনতে মা গেছে, ইত্যবসরে খাটে শুয়ে থেকে ঘাড় উঁচু করে বড়বোনটি জানতে চাইল, কী যাত্রা দেখলু রে দাদা?

চিড়িয়া-চিড়িয়ানী।

সোউ বল্—গাঁর যাত্রা? মুঁ মনে করনু-কী না কী বড়কুম্পানী। তাহানে ত মাইকে কইতা।

থাপ্পড় মারার ভঙ্গি করে হাত তুলল স্বপ্না।

মারমু থাবড়া!

গাঁয়ের যাত্রাকে 'হ্যাটা' করছে বোনটি। কিন্তু যে-যাত্রা আজ চন্দ্রবদনীর একসঙ্গে বসে দেখেছে, সে-যাত্রাকে হ্যাটা করলে মানবে কেন স্বপ্না?

জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। বলে তো এল যাচ্ছে গিরিহার বাড়ি, কিন্তু কোন্ মুখে সেখানে যাবে সে? এতক্ষণে সেখানে তো-কার মুড়ি, কে দিল—ঐ নিয়ে চলছে তুলকালাম।

আর তবে কোথায় যাবে স্বপ্না? কোনমতে হেঁটে বড়রাস্তায় যেতে পারলে দীঘাগামী ট্যুরিস্টদের বাস দেখতে দেখতেই ভোর হয়ে যাবে রাত! ঘুম পায় যদি তো না হয় ঘুমিয়ে পড়বে ধাপার সামনের কোনো এক বেঞ্চিতে।

বাস যেমন-তেমন, বড়রাস্তায় একটার পর একটা ট্রাক-লরিও তো যায়। সেই একটা ট্রাক-লরিতে খালাসির কাজ জোগাড় করে আজই সে চলে যাবে দূরে। দূরে, দূরে।

শিবরাত্রির সময় হলে না হয় ভিডিও দেখে রাত কাটাত। কত ভিডিও হলই তো আছে খাকুড়দা-ললাট-জাহালদায়।

নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে আপনার মনে ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পড়ল হাটখোলায়। হাটচালায় বাঁশের বেঞ্চিতে বসে সে কিছুক্ষণ পা দোলালো, পা দোলাতে দোলাতে শুনল, বেঞ্চির বাঁশে কালো ভোমরা কী ঘুনপোকা একনাগাড়ে কুটুর কুটুর করে 'ফোঁড়' করছে, সে-ফোঁড়ে আর কিছুদিনের মধ্যেই জমা হবে কুচিকুচি তুঁত কী কুলের পাতা।

হাটচালার বাঁশের মাচায় বসে ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবল সে— কী এমন দোষ করেছে? মুড়ি কিনেছে, এ তো আর গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার ঘরের মুড়ি নয়, গিরিহার পয়সাযও কেনা নয়, মুড়ি কিনেছে সে তার নিজের পয়সায়।

মুড়ি কিনে সে নিজে নিজেই খেতে পারত, তাতে কারোর বাপের কিছু বলার ছিল না। কিন্তু নিজে না খেয়ে কাউকে বিলিয়ে দিল। কাকে দিল? কাদেরকে দিল? না, একদল ভুখা-শুকা মানুষকে।

আ-হা না হয় সে চাঁদবদনীর হাতেই দিয়েছে, তা বলে সে তো আর বলেনি— চন্দ্রবদনী, খালি তু খাইবু লেই যা! মুড়ি তো কিনেছে সে সবার জন্যই।

এতে দোষের কী? হাত পেতে মুড়িও তো নিল চন্দ্রবদনী? তবে কী গিরিহার ঘরেই ফিরে যাবে স্বপনভাতুয়া?

তার কেন জানি মনে হল— হ্যাজাক নিয়ে এক্ষুণি তাকে খুঁজতে হাটখোলায় এসে পড়বে গিরিহা আর নীলুয়া না লালুয়া। অতএব দৌড়— দৌড় দৌড়—

নিজের গ্রামেও না, ভিডিও দেখতেও না, বড় রাস্তায়ও না, গিরিহার ঘরেও না— দৌড়ুতে দৌড়ুতে সে গিয়ে হাজির হল পুবের বিলের সেই স্যালো-টিউবওয়েলের ঘরে। বাকি রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেবে সে।

রাতের বিল। চারধারে 'স্যাঁ-স্যাঁ' করে একটানা আওয়াজ রাতপোকার। মাঝে-মধ্যে 'টু-উ-প' করে দুটো-একটা শব্দ অন্যরকম।

অন্যরকম, অন্যরকম।

আগেও যে 'স্যালো ঘরে' রাত কাটায়নি স্বপন, তা তো নয়— তবে সে তো প্রয়োজনে,

হয় সারারাত ধরে মেসিন চলেছে। অদ্বৈত পৈড়্যার বিল ভিজিয়েও ভেজাতে হয়েছে শ্রীমন্ত-পূর্ণ-কেশব রামকেশব— সদানন্দ-নিত্যানন্দ-প্রশান্ত-বংশী-অনাদিদের।

অকারণে-অজান্তে এই প্রথম। তবে আজও তো মেসিন চলেছে প্রায় সারাদিন। ভেজাতে হয়েছে সাঁপুই-সামন্তদের দূরবর্তী ডাঙা-ডুঙোড়। এক ফসল তুলে আরেক ফসলের প্রস্তুতি। সাঁপুই দাঁড়িয়ে থেকে ভিজিয়েছে-চষিয়েছে সারা দুপুর। সাঁপুইয়ের বউও খোলাচুলে একবার এসে স্বামীর সঙ্গে হেঁটে বেড়িয়েছে চষাজমির এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো।

স্বপনভাতুয়া সে-দৃশ্য দেখেনি, দেখেছে ছাতা-মাথায় 'আলে' বসা অদ্বৈত, আর দেখেছে ধানকাটায় ব্যস্ত নামালিয়ারা। কিছু মনে করেনি তারা, এমন তো কতই দেখেছে— সুখজুড়ির গোবরাসান্তালের বেটা লাঙলের বোঁটা ধরে আছে আর হালের ফালে 'তাড়া' ভুঁইয়ের রেখা বরাবর মকাইয়ের দানা ফেলছে বেটার বউ!

শুধু কী গোবরা-গোবরার বেটা-বেটার বউ— কুম্হারপাড়া মাহাতোপাড়া এমনকি হাটুয়াপাড়ায়ও দেখেছে মহাজনের বউকে চুল আলগা করে প্রথম 'তলা'টা রুইতে, রুইতে না পারে যদি তো চাষীমহাজনের হাতে অন্তত বীজতলাটা নিজের হাতে তুলে দিতে।

হয়ত বেশি বেশি ধান ফলাবার 'টুটকা' করতেই চষা-ভুঁইয়ে কাদা-করা জমিতে লোকটার হাত ধরে হেঁটে বেড়িয়েছে বউটা মাথার চুল খোলা রেখে!

স্যালো-মেসিনের ঘরে বসে স্বপন ভাতুয়া দেখল— বেশ কিছু কাটা-ধান এখনও পড়ে আছে গিরিহা অদ্বৈতর জমিতে। না হয় সেই কাটাধানের পাহারায় সারারাত বসে থাকবে সে, ভোর ভোর গিরিহার বাড়িতে হাজির হয়ে গিরিহার "কাল রাতর কাঁই গলু কাঁই থাইলু রে" কথার উত্তরে বেশ গর্বের সঙ্গেই বলবে, "পুবর বিলে কাটা-ধান পাহারা দেইথিলি, খুড়া।"

ধান-পাহারা দেওয়ার মোক্ষম কাজ পেয়ে আর সব কিছুই ভুলে গেল স্বপন ভাতুয়া।—ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি!

স্যালো-মেসিনের ঘরটা তালাবন্ধ, বারান্দাটা খোলা— ঐ খোলা বারান্দাতে বসেই ধান-পাহারাদারি শুরু করল স্বপনভাতুয়া।

কে আর ধান চুরি করতে এখানে আসছে! ধান ছাড়া অন্য অনেক জিনিস আছে চুরি করার বামনদা-খাকুড়দা-জাহালদা-বেলদার হাটে-বাজারে কী সাউরী-তুরকার নির্জন পথে-ঘাটে।

অতএব নিশ্চিন্তে স্বপন অৰ্দ্ধেক ঘুমে অৰ্দ্ধেক জাগরণে বসে থেকে পুবের বিল-দক্ষিণের বিল-উত্তরের বিলের শোভা দেখছে রাতের।

রাতের, রাতের।

যেন ময়লা জ্যোৎস্না ছেয়ে আছে গোটা বিলটায়। আকাশে এক-আধ টুকরো পোঁছ-লাগা মেঘ। দূরে অদূরে দু-চাট্টা ডেঙ্গা তালগাছ, করঞ্জগাছ, কাঁটা বাবলা, কলার বন। মাঝে মাঝে এদিক-সেদিক ভদ্‌ভদিয়ে উড়ে যাওয়া একটা-দুটো রাতচরা।

রাতের বিলে রাত-ভিত কত কী যে হয়, কত কী যে হতে পারে— এক স্বপনভাতুয়া ছাড়া বামনদার কে আর দেখছে, সবাই তো ঘুমোচ্ছে!

ঘুমোচ্ছে, সমগ্র বামনদাটা ঘুমোচ্ছে। বিজলীবাতির ঈষৎ আভা শুধু জেগে আছে দাঁতনের ওদিকটায়, জাহালদা-খাকুড়দা-বেলদার ঐদিকে, হাওড়া-ভদ্রক-পুরী রেললাইনের মাথার উপরে।

হাওয়া দিচ্ছে রাতের। সে-হাওয়ায় পাকাধানের 'ছড়া'গুলো বেজে চলেছে। এই রাতে সে-বাজনা বড়বেশি স্পষ্ট হয়ে কানে বাজছে। "কোন্ কোন্ গাছে বাজন বাজে"— হেঁয়ালির উত্তরে স্বপন আবিষ্কার করল, শুধু 'শন' কেন হবে, ধানও তো হতে পারে।

ঐ তো ঝুন্ ঝুন্ করে ধানগাছে হাওয়ায় বাজনা বাজছে!

স্বপনভাতুয়ার ঘুরে-ফিরে মনে আসছে— সেই চাঁদবদনীর কথা, আজকের রাতের সেই ঘটনাটার কথা। কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, কে জানে এতক্ষণে আরো কত কী হচ্ছে!

বেদম মার খাবে চাঁদবদনী? নীলুয়া না লালুয়া তো মারবেই, আরো কে কে মারতে পারে একে একে হিসাব করে ফেলল স্বপন ভাতুয়া।

সে-হিসাব থেকে বাদ পড়ল গুরভা, না না ঐ লোকটা— সে তো এসেছিল উগ্রচণ্ড নীলুযাকে থামাতে। কে জানে— পেরেছে কী পারেনি। তার আগেই তো তাকে পালিয়ে আসতে হল।

যে মারে মারুক যে ধরে ধরুক, চন্দ্রবদনী মেয়েটা কিন্তু ভালো। কেমন অত রাতে 'ভুজা লেই যা' বলতেই সুট্ সুট্ এসে গেল!

স্বপনভাতুয়া তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না, কিছুতেই না। কত নামালিয়াই তো গিবিহার্ বাড়িতে এল-গেল, কই, কারোর সঙ্গেই তো তার এমন ভাব হল না?

আহা, 'ভাব' কী আর হয়েছে, হওয়ার পথেই তো—

স্বপনভাতুয়ার ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে, চোখ রগড়ে ফের সজাগ হলে সে। এখনও মনে মনে আশা— রাত তেমন বেশি হয়নি, ইচ্ছা করলে সে গিরিহার বাড়ি ফিরলেও ফিবতে পারে।

ফিরবে কী? দোটানায় পড়ে কিছুক্ষণ ঘর-বাহির করল স্বপ্না। না, আজ আর সে ফিরবে না। রাতটা এখানেই কোনমতে কাটিয়ে হালচাল বুঝতে ফিরবে সে ভোর ভোর।

কান খাড়া করে শুনল— গিরিহার বাড়িব ওদিক থেকে কেমন 'সোর' শোনা যাচ্ছে না? পাঁচজনে মিলে কেমন জোয়ে জোরে দশটা কথা বলছে না?

না না, দু-চাট্টা রাস্তার নেড়ী বড়জোর হল্লা পাকিয়েছে, কোনো মানুষের গলা না। হতে পারে কোনো মাতাল এসে পড়েছে দলে, সেই দু-চার কথা বলছে কুকুরগুলোর সঙ্গে।

ফের ঢুলতে শুরু করল সে, ঢুলতে ঢুলতে মাঝে মাঝেই ঝুঁকে পড়ছে সিমেন্টের মেঝের দিকে। একটুবাদে লম্বা হয়েই তো শুয়ে পড়বে সে, তবু যতটুকু জেগে থাকা যায়! যতক্ষণ জেগে বসে রাতের বিলের শোভা দেখা যায়!

জ্যোৎস্না আরেকটু মরে গিয়েছে, আলো-আঁধারিতে বামনদার বিলের রহস্য আরেকটু দানা বেঁধেছে। মনে হচ্ছে গাছগুলো— তাল অর্জুন করঞ্জ কাঁটাবাবলা— এমন কী কলার বনও আব নড়ছে না। একটা কিছু ঘটবার প্রতীক্ষায় চুপ কবে আছে পুবের বিল উত্তরের বিল দক্ষিণের বিল।

স্বপনভাতুয়া দেখল— গণেশ সাঁপুইয়ের বিলে কেউ দুজন হেঁটে বেড়াচ্ছে। পাকা ধানগাছের আড়ালে এতক্ষণ চোখে পড়েনি। একজন না দুজন?

দুজন, দুজন।

তবে কী ধান চুরি করতে পুবের বিল-দক্ষিণের বিল-উত্তরের বিলে ধানচোর নেমেছে? স্বপনভাতুয়ার মনে হল-চোর বুঝি গুলিয়ে ফেলেছে কতধানে কত চাল।

একে তো ধানচুরির অনেক হ্যাঙ্গামা। কাটাধানের হেলা বাঁধো রে, বাঁধা বিড়া বহো রে, 'আগুড়ে' আছাড় মেরে ঝাড়ো রে, ঝাড়া ধান 'আছড়াও'রে 'পাছড়াও'রে। ঝেড়ে-পুছে ধান যদি বা ঘরে তুলল, খড়গুলো রাখবে কোথায়? ধরা পড়লে হাতে হাতকড়া পড়ে যাবে না?

চোখ রগড়ে ভাল ভাবে দেখার চেষ্টা করল স্বপনভাতুয়া। নারী না পুরুষ? গুলিয়ে যাচ্ছে, ফট্ করে আলো একটু বেশি হল তো পরক্ষণেই কমে যাচ্ছে।

আঁধার, আঁধার।

তবু স্বপ্না আবিষ্কার করল— একজন নারী একজন পুরুষ। ধন্ধ যাচ্ছে না—তারা কী এখানেই ছিল, না এইমাত্র এল? আশপাশের মানুষ, না আসমানের?

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল স্বপনের। এক বিপদ থেকে বাঁচতে সে তো পড়ল আরেক বিপদে! ভূতগ্রস্তের মতো ভ্যাব্‌লা-মেরে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকল সে।

উঁ-হু, ভূত তো নয় মানুষ। মানুষ, মানুষ—

তবে কী চন্দ্রবদনীকে ফুসলিয়ে এই বিলে নিয়ে এসেছে নীলুয়া না লালুয়া? বারান্দার ভিতর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল স্বপ্না।

হাত ধরাধরি করে জমিটার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়োয় নিয়ে ফের এ-মুড়োয় ফিরে আসতে চোখ বড় বড় করে দেখল সে— না নীলুয়া না চাঁদবদনী, অন্য কেউ।

কে হতে পারে? কারা? এত জায়গা থাকতে 'ইয়ে করতে' এত রাতে এই বিলে? তাও 'কাদা করা' জমিনে, কাল যেখানে রোয়া হবে চারা, বছরের প্রথমে?

'আঁটিয়াল' মাটির দেশ, আগে যেখানে একটা ফসল ফলত, এখন সেখানে তিনটা। লহ লহ ধানে প্রায় সারা বছরই এখন ভরতি বামনদার পুবের বিল দক্ষিণের বিল উত্তরের বিল। একটা কাটছে তো আরেকটা রুইছে। লোকজন পড়েই আছে বিলে।

তা বলে রাতেও? আর এত রাতে?

'জিহুড়'-এর রাতে অর্থাৎ ডাক-সংক্রান্তিতে অন্য অনেকের সঙ্গে বামনদার বিলে এসে রাত জেগেছে বৈকি স্বপ্না। —ঐ যে "ছোট-বড় ধান সব ফুলো-ও-ফুলো"— ঐ যে- "লোকের বিলে আল্‌থাল, আমার বিলে শুধুই চাল—"

জিহুড়ের রাতে নাকি বৃষ্টি হয়। ঐ বৃষ্টির জল গায়ে-মাথায় মাখতে সারারাত বিলে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা— ঝিপি ঝিপি পানি কেবে ঝরিব গা-মথার, তবে সিনা হোইব—

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির জল মাথায়-মুখে পড়লে তবে তো দেবীর আশীর্বাদ মিলবে আর ফসলও ভাল হবে।

গিরিহার ফসল ভালো হোক কী না হোক তাতে ভাতুয়ার কী? তবু তো মজা করতেই দলে ভিড়ে সে এসে পড়ে। তবে সে তো অন্যদিন, অন্য কাল। কিন্তু আজ?

একবার মনে হল চাঁদবদনীই। মারতে মারতে চুলের মুঠি ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে রাতের অন্ধকারে এতদূর নিয়ে এসেছে নীলুয়াই।

ব্যাধের জাত। সিনেমা-ভিডিওয় স্বপনভাতুয়া কতই তো দেখেছে— জাতের মেয়ে যদি বেজাতের ছেলের সঙ্গে পালাতে চায়, কোনোরকম ফষ্টিনষ্টি করে, তবে সে-মেয়েকে তারা ছেলেটার সঙ্গে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে! নতুবা ছেলেটাকেই গুম করে দেয়।

দৌড়ে গিয়ে দেখে আসবে স্বপনভাতুয়া— নীলুয়া-চন্দ্রবদনী কী না? ভেবেও দমে গেল সে। বাধা তো ঐ নীলুয়া— সামনাসামনি দেখতে পেলে এই রাতে ঐ সাঁপুইদের 'কাদা-করা' বিলেই তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে নীলুয়া, কাকপক্ষীও টের পাবে না!

কিন্তু এ-মেয়ে তো সে-মেয়ে নয়। একটু যেন বড় বড়, লম্বা, ঢ্যাঙা। পুরুষটাও ঐরকম, যণ্ডাই মার্কা। পুরুষটা এইমাত্র মেয়েটার কোমরের কাছে হাঁটুমুড়ে বসল, দুহাত জড়িয়ে ধরল মেয়েটার কোমরে।

সিনেমা-ভিডিওয় এরকম কত 'পোজ'ই তো স্বপনভাতুয়া দেখেছে! সে হাঁ করে ছবি দেখার মতো একদৃষ্টে সাঁপুইদের চষাবিলের দিকে তাকিয়ে থাকল।

তাকিয়ে থাকল, তাকিয়ে থাকল।

পুরুষটা এবার যেন মুখ রাখল মেয়েটার নাভিমূলে। চুমু খাওয়ার দু-চারটা শব্দ উঠল 'চকাস' 'চকাস'! চুলসমেত পুরো মাথাটাই এবার মেয়েটার পেটে ঘষতে লাগল পুরুষটা।

মেয়েটাও তো কম খেলুড়ে-মেয়ে নয়! কোমর থেকে পুরুষটার হাত সরিয়ে সে কাদা-করা বিলে কাদা-জল ছিটিয়ে দৌড়ুল—দৌড় দৌড়—

এক দৌড়ে মেয়েটাব কাছে পৌঁছে মেয়েটাকে ফের জড়িয়ে ধরল পুরুষটা। এবার সে মুখ রাখল মুখে। যেন এক চুমুকেই মেয়েটার সব কিছু শুষে নিল পুরুষটা!

জোৎস্না এত মরে যাচ্ছে কেন? মরা আলোয় ঢেকে যাচ্ছে বামনদার পুবের বিল দক্ষিণের বিল উত্তরের বিল। তার মাঝখানে নারী-পুরুষকে একবার হারিয়ে ফেলল স্বপ্না!

এই তো ছিল—দুজনে জড়িয়ে একাকার হয়ে— চক্ষুর নিমেষে উবে গেল নাকি? 'চিড়িয়া-চিড়িয়ানী' যাত্রায় দেখা 'চিড়িয়ানী'র মতো? —"কুহ কেহি দেখিয়াছ কি —কনে গলা মো চন্দ্রবদন?"

ফের দৌড়ুচ্ছে মেয়েটা, পিছনে পিছনে পুরুষটা। ভালো করে চোখ রগড়ে দেখল স্বপনভাতুয়া— নারীপুরুষ দুজনেই নাঙা। নাঙা, নাঙা—

উলঙ্গ, উলঙ্গ।

তবে কাপড় ছেড়ে রাখল কোথায়? এই তো মেয়েটার আঁচল উড়ে বেড়াচ্ছিল হাওয়ায়! তবে কী নারী-পুরুষ দুজনেই অশরীরী? অশরীরী আত্মা সবাইকে দেখা দেয় না, কেউ দেখতে পায় কেউ দেখতে পায় না।

দু'চোখ ভবে যেন দেখে যাচ্ছে স্বপনভাতুয়া।

মেয়েটাকে এবার ঘাড়টা হেলিয়ে পুরুষটা শুইয়ে দিল 'আলে'। আলের উপর চষা ভুঁইয়ের মতো শুয়ে থাকল মেয়েটা। আর পুরুষটা—

পুরুষটা মেয়েটাব উপর উপগত হয়ে শক্ত হাতে যেন হালেব বোঁটা চেপে ধবে হালের ফাল দিয়ে আদড়া মাটি খুঁড়ে চলেছে!

ফের কোত্থেকে আচমকা এসে পড়ল মরা জ্যোৎস্না। অর্জুন-করঞ্জ-ছাতিম-তাল-কাঁটা-বাবলার গাছগুলো আঁধার-জ্যোৎস্নায় ঢেকে গেল।

কে যেন সঙ্গমরত নারীপুরুষের দেহের উপর কাপড় বিছিয়ে দিল মরা জ্যোৎস্নার। স্বপনভাতুয়া গিরগিটির মতো ঘন ঘন মাথা তুলেও দেখতে পেল না— কখন বীর্য যোনি-গহ্বর ভরিয়ে উপচে পড়ে গড়িয়ে গেল গণেশ সাঁপুইয়ের 'কাদা-করা' বিলে।

'স্যালো টিউবঅয়েলের' ঘরে ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেল স্বপনভাতুয়ার। সাঁপুইদের কাদা-করা বিলের দিকে প্রথমেই তাকিয়ে তার মনে হল— গতকাল রাতে ঐখানে কী ঘটতে দেখেছিল সে? কত কাণ্ড!

কে হতে পারে? কারা? তবে কী বেশি-বেশি ধান ফলানোর টুটকা করতে বছরের প্রথম 'কাদা করা' বিলে 'রতি' করতে এসেছিল গনেশ সাঁপুই আর তার বউ মালতী? চাষাভুষা গিরিহাদের কতরকম ছুতো!

সকাল সকাল ঝাড়া হাত-পা আর ঝরঝরে মন নিয়ে তো গিরিহার বাড়িতে গরু খুলতে এসেছে স্বপনভাতুয়া।

গত রাতের ভাতুয়া-ভুজা-চাঁদবদনী কাণ্ডের পরে ভয়ানক গোঁসা হয়েছে নীলেশ্বরের। দোরখুলি ছাড়া ইস্তক এমনকি বাসের মধ্যেও গোটা দলটাই মান্য করেছে তাকে। কিন্তু যেই একবার বামনদায় এসে একটা ঠেক পেয়ে গেল লোধারা, আর তাকে মানছে না।

বিশেষ করে চাঁদবদনীটা, গুরভাটা।

যখন যা কিছু দরকার পড়ছে, সরাসরি গিয়ে কথা বলছে গিরিহার সঙ্গে। এতদূর 'ইস্মার্ট' হয়ে গিয়েছে তারা! পেটপূজার জোগাড় হয়ে গেছে তো ব্যাস্ আর কিছু চাই না। মান-অপমান বোধ আর তাদের নেই।

কিন্তু লছিপুর হাই-ইস্কুলে কম করেও চার-ক্লাস-পড়া নীলেশ্বর এসব মানবে কেন? সে যেমন ইচ্ছা করলে মন দিয়ে কাজ করতেও পারে, তেমনি কথায় কথায় কাজ ছেড়ে দিতেও পারে।

গতকাল বিকালে কাজ না করে কোথায় কোন্ বন্ধুর বাড়ি যাবে বলে বেরিয়ে গিয়েছিল নীলুয়া, যেতে পারেনি, আজ সেখানে যাবে— একথা ভোর হতে না হতেই জানিয়ে দিল নীলুয়া, দিয়েই হুটমুট বেরিয়ে গেল।

গেল তো গেল, তাতে গিরিহার কী? তার তো ঘড়ির কাঁটা ধরে হিসাব— কাজ নেই তো পয়সাও নেই। আর আর লোধারা ভেবে পায় না— নামাল খাটতে এসেছি যখন নামাল খাটব না? পয়সা রোজগারের ধান্দায় যখন এসেছি দু'পয়সা কামাব না? তা নয় উঠল বাই তো কটক যাই? শুধু ঘুরে বেড়ালেই হবে?

কী যেন কী যাদুর কথা বলছিল সে। সেই যাদুবিদ্যার খোঁজেই হেথা-হোথা দৌড়ে বেড়াচ্ছে নীলুয়া।

একবার সে যদি ঐ 'বিদ্যা' আয়ত্ত্বে নিয়ে আসতে পারে তবে আর তাকে পায় কে? ঐ বিদ্যার গুণেই তার সব কিছু হবে।

সে সার বুঝেছে— নামাল দেশটাই এক যাদুবিদ্যার দেশ! না হলে এত এত ধান, এত বড় বড় ধানক্ষেত, এত এত চাল, এত বড় বড় চালকল, এত বড় বড় ব্যবসা, এত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, এত সব বাড়ি-গাড়ি-ট্রাক-ট্যাক্‌সি, এত সুন্দর সুন্দর লোক মেয়েলোক— হয় কী করে?

গুরভা মনে-মন হাসে— নীলুয়ার মাথাটা একেবারে গেছে! কে যেন ওর মাথার ঘিলুতে 'বান' মেরে দিয়েছে! 'উধাস' হয়ে বলে কী না— এদেশের জনে জনে তুক-গুণ জানে, আমাদেরও ঐ তুক-গুণ শিখতে হবে।

ঐ তুক-গুণ শিখতেই এখানে-ওখানে 'চিঁড়রা'-কাঁধে নীলুয়ার দৌড়াদৌড়ি। —তা তুক-গুণ শিখতে চাস যদি তো যা না বড়সোলের গজনার কাছে!

বড়সোলের গজনার কাছে নয়, খড়গপুর-বেলদা-কন্টাই রোড ধরে নীলেশ্বর যাবে নারায়নগড়ে। ওখানে লোধাদের মা-মনসা ডহরপুর করঙ্গবাড়ি নামে তিনটি গ্রাম আছে। তার যেকোনো একটাতে সে আজ যাবে।

স্বপনভাতুয়া আসার আগেই, তার মুখ না দেখেই বেরিয়ে পড়ল নীলেশ্বর। গুরভা, কী আর আর লোধারা তাকে কিছু বলল না।



মা-মনসা গ্রামের মুখিয়া-মাতব্বর পঁচাশি বছরের ভিকা ভক্তা তার ফোগলা গালে হেসে একটু হেঁয়ালি দিল—

তিন কুনিয়া পোখরে ন্যাকড়া ভাসে।
পিছুতে কাঠি দিলে ফিক্ ফিক্ হাসে।।

—কী উত্তর?

উত্তরটা জানা নেই নীলেশ্বরের। সে উত্তর না দিয়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে বোকার মতো। বাবুইদড়ির খাটিয়ায় লাঠি-হাতে ভিকা ভক্তা। তার সামনে বাবুইদড়ির 'মাচিয়ায়' বসা নীলেশ্বর। মা-মনসায় এসে আচ্ছা ধাঁধায় সে পড়েছে!

মকরা, নীলুয়ারই সমবয়সী ছেলেটা, যে তাকে খড়গপুর-বেলদা পিচরাস্তা থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, একটা হাত গালে আরেকটা হাত কনুইয়ে রেখে সেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

এ-হে, বলতে পারলি নাই?

ঘাড় নাড়ে নীলুয়া, নাই।

জাত কী?

লোধা।

উঁ-হু, তা বলি নাই। গোত্র?

ফের ঘাড় নাড়ে নীলুয়া, না, এটাও সে জানে না।

ভিকা ভক্তা আপশোষ করে, আজকালকার ছেলেছোকরারা তাদের জাত-গোত্রেরও খোঁজ রাখে না— এটা ভাল কথা না।

বেশ, নাম কি?

আগেও একবার বলেছে, আবার বলল নীলেশ্বর।

ল্যাজুড় আছে তো?

ল্যাজুড়? তার মানে তো ল্যাজ? মানুষের আবার ল্যাজ থাকে নাকি?

উঁহু, তা বলি নাই। নীলেশ্বর কি?

ও, পদবী? ভক্তা।

ভিকা ভক্তা বলল, তবে ত চিরকা। আজকালকার ছাউছোনারা মনে রাখ—পদবী ভক্তা হলে গোত্র হবে চিরকাআলু, মল্লিক মকর, কোটালদের চাঁদ আর কাছিম, নায়েক হলে শালমাছ, আড়িদের চাঁদামাছ, ভুঁইয়াদের শোলমাছ, মাছ আছে পাখি আছে, বাঘ-হরিণ-ইঁদুরও আছে—

খেই ধরিয়ে দিল মক্‌রা, ঐ যে ঠাকুর্দা— "তিন কুনিয়া পুখুরে ন্যাকড়া ভাসে— পিছুতে কাঠি দিলে ফিক্ ফিক্ হাসে"-হেঁয়ালি বলছিলে—

হঁ ম্যাড়হা, তুইও বলতে পারলি নাই মক্‌রা? —প্রদীপ, প্রদীপ—

তাই তো, তিনকোনা আধার, আর মধ্যে তেলের ভিতর সল্‌তেটা ভাসছে, কাঠি দিয়ে সল্‌তে উস্‌কে দিলেই হাসির মতো আলো জ্বলে উঠছে।

ভিকা ভক্তা বলল, যা কইছিলাম—হাঁদলার নারানগড়ে ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দিল যে সময়

থাপ্না হল তখন এত ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলেছিল যে কী কইব—সেই প্রদীপ ছ'শ বছর ধরে সমানে—

ছ'শ বছর!

ওহো ছ'শ ত কম বললাম, সাতশ কী তার বেশিও হতে পারে।

সবই ব্রহ্মাণীদেবীর ভেল্কি, তুকগুণ। এসেছিস যখন ব্রহ্মাণীদেবীর মাটির ঘরে লালসুতায় একটা মাটির ঢেলা বেন্ধে যাস!

কসবা নরায়নগড়। খড়গপুর-বেলদা পাকারাস্তা ছেড়ে নারায়নগড় বাজার থেকে দু' কিলোমিটার পুবে। পুবে, পুবে।

সেখান থেকে আরো কিছুটা পুবে ভদ্রকালীর জঙ্গলের ধারে হাঁদলা মৌজায় নারায়নগড়ে ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দির। মাটির দেওয়াল টিনের ছাউনি।

মা-মনসা গ্রামের মুখিয়া ভিকা ভক্তা,যার কথায় গোটা গ্রামের লোক উঠে বসে, সে বলল, মা ব্রহ্মাণীর একটা শিকড়ের তুক-গুণ শুনবি?

বলেই জিভে একরকম শব্দ করে দুঃখ প্রকাশ করল মুখিয়া— কী না, সেই শিকড়টা— দুধিগদ, ধুদ্‌কুল খুদিকড় না জিহুড়— কী গাছের শিকড় ছিল জানা যায়নি বলে।

না হলে ভদ্রকালীর জঙ্গল এই ত হাতের কাছে!

নীলেশ্বর শুনেছে— তাদের তপোবনের জঙ্গলেও রোহিণীর শ্রীনিবাস ষড়ংগী নামে এক পাগলাচণ্ডী বামুনঠাকুর শিকড় নয়, কী-একটা গাছের পাতা খুঁজে বেড়াত কী ঝড় কী বৃষ্টিতে।

কারো সনে দেখা হলে—

ঠাকুর, কী অত খুঁজো?

পাতা।

কী পাতা?

তোকে বলব কেন?

গোল, না লম্বা?

তোকে বলব কেন?

অন্তত গুণাগুণটা ত বল।

গুণাগুণের কথায় শ্রীনিবাস ঠাকুরের চোখ-মুখ নাকি চক্‌চক্ করে উঠত। বলত, সে-পাতা একবার পাস যদি তো সারাজীবনের মতো তরে যাবি রে, শাল্লা! যত পাতা তত টাকা, যত পাতা তত টাকা, যত পাতা তত টাকা....

ভিকা ভক্তার মুখ থেকে নীলুয়া শুনল—

তীর্থ করতে পুরীধামে যাচ্ছে বর্ধমানের গন্ধর্ব পাল নারায়নগড়ের উপর দিয়ে। জাতে সে সদগোপ। পায়ে হেঁটে পুরী যাবার এটাই তো পথ— নারায়নগড়-বেলদা-নেকুড়সেনী-দাঁতন-সোনাকনিয় হয়ে জলেশ্বর-উড়িশা—

তীর্থযাত্রীদের জন্য নারায়নগড়ে একটা চটি ছিল। রাত কাটানোর আস্তানা। খাওয়া-দাওয়া-শোওয়ারও বন্দোবস্ত ছিল।

খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েও পড়েছিল গন্ধর্ব। তারপর তো স্বপ্নে—

—গন্ধর্ব, নারায়নগড়ের কাছে ভদ্রকালীর জঙ্গলে আমরা তিনজন পাথর হয়ে আছি— ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী আর ইন্দ্রাণী। তুই আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যা, নিয়ে প্রতিষ্ঠা কর। এখন পুরী যাচ্ছিস যা, তবে এই শিকড়টা রাখ।

ঘুম ভাঙতেই গন্ধর্বের হাত মুঠোয় সত্যি সত্যি একটা শিকড়! তারপর তো ঐ শিকড়ের

গুণেই পুরীর মহারাজার সন্তান লাভ, পুরীর মহারাজার দানেই গন্ধর্ব পালের বিরাট রাজত্ব।

মন্দির প্রতিষ্ঠায় মণ মণ ঘি তো পুড়বেই। ঘিয়ের প্রদীপ তো জ্বলবেই। ছ'শ সাত শ কেন, শ শ বছর ধরেই জ্বলবে।

মা-মনসার মুখিয়া-মাতব্বরের খালি আপশোষ— ঐ শিকড়টার নাম যদি একবার জানা যেত! যদি একবার—

শিকড়টার নাম জানা যাক বা না যাক, তার-জন্য যত আপশোষই থাক মুখিয়ার মনে, আজ এই মুহূর্তে তার ভারি ইচ্ছে হয়েছে— নীলেশ্বরকে তার 'ধরম-নাতি' বানায়।

তার মানে মকরা, ঐ যে ছেলেটা, যে কী না পথ দেখিয়ে নীলেশ্বরকে এতদূর নিয়ে এসেছে— তার সঙ্গেই নীলেশ্বর এখন 'মালা-ঘুনসী' বদল করুক।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, মুখিয়া যখন চেয়েছে তখন 'মালা-ঘুনসী' কিনতে লোক দৌড়ুল নারায়নগড় বাজারে।

নীলেশ্বর এতদূর ভাবেনি। নামাল খাটতে আসা লোধাদের গোটা দলটার উপর রাগ করে সে বেরিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল যে-পথ দিয়ে এসেছে সে-পথ ধরেই ফিরে যাবে দেশে। তাই তো খাকুড়দা-বেলদা হয়ে নারায়নগড়ে—

নারানগড়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তার মনে হল— এতগুলো গ্রামেব লোককে, বলতে কী ঘরের লোককে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে সে কোথায় যাবে?

একে তো তারা গ্রাম থেকে কখনও তেমন কোথাও যায়নি, তার উপর গিরিহা খাওয়া-দাওয়ার খোরাকি বাদে কতটা মজুরি দেবে নগদে, আর সেই নিয়ে তারা রাস্তা চিনে বাসে-ট্রেনে দেশে ফিরবে—

এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় এখনও না-যুবক নীলুয়া মাঝপথে বাস থেকে নেমে পড়বে না?

হয়ত পথ হারিয়ে ফেলবে গোটা দলটাই, হয়ত কু-লোকের পাল্লায় পড়ে যেদিকে যাবার কথা সেদিকে না গিয়ে যাবে অন্যদিকে, যাবে জন্মের মতো।

বিশেষত চাঁদবদনীটা। এই কদিনে সে যেমন হয়ে উঠেছে ফনফনে, এরই মধ্যে তার পিছনে স্বপন ভাতুয়ার মতো যেমন লেগে গেছে ফেউ— কে জানে কোনদিন কোন ফেরেরবাজ তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবে কোথায় কোন জাহান্নামে, যেমন নিয়ে গিয়েছে রাইবুলোধার বোন সোমবারিকে।

সোমবারি, সোমবারি।

চনমন করে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল নীলেশ্বর। 'নারানগড়' 'নারানগড়'। দুদিন আগে এ পথেই নীলুয়ারা বাসে চড়ে পৌঁছেছিল বামনদায়। আজ আবার সেই ফিরতি পথেই নীলুয়া—

লছিপুর হাই-ইস্কুলে পড়তে পড়তেই সে শুনেছিল— এদিকে কুকাই, সাতসোল, মা-মনসা, করঙ্গবাড়ি, ডহরপুর, বেনাডুবি, শঙ্করীডাঙা, আরো কী কী জায়গায় তাদের বেশ ক'ঘর স্বজাতি আছে। তার মধ্যে কুকাই করঙ্গবাড়ি তো বর্ধিষ্ণু, তাদের জমিজমাও আছে।

নারায়নগড়েই করঙ্গবাড়ি মা-মনসা ডহরপুর। কুকাই তো কেশিয়াড়ীতে। নারদা-চাঁদবিলা-খড়িকামাথানী-বালিগেড়িয়া-নয়াগ্রাম হয়ে ভসরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে লছিপুর-কুকাই—

সেদিকটা ভিন্ন দিক, ভিন্ন রাস্তা।

দিশা করে নেমে পড়েছিল নীলুয়া। কিন্তু কেন? স্বজাতির গ্রাম মা-মনসা ডহরপুর করঙ্গবাড়ি গিয়েই বা সে কী করবে? দেখে আসবে— তারা কী ভাবে আছে, নামাল খাটছে কী খাটছে না, নাকি নিজেদের বিলেই নামাল খাটাচ্ছে অন্যদের?

নাকি অন্য ধান্দা? ঐ যে তুক-গুণ, ভেল্কী, যাদুবিদ্যা—

নীলুয়ার দৃঢ় বিশ্বাস- নামাল দেশের লোকেরা একটা কিছু জানে! এই তো সেদিন মেমারি না বর্ধমানে একটা দশ-বারো বছরের ছেলের লিঙ্গ থেকে বের করে আনল ঝাঁকে ঝাঁকে জীবন্ত মাছি! যে-ছিদ্র দিয়ে বের হবে মূত্র, সেখান দিয়ে বের হচ্ছে মাছি!'

ডানা-ওয়ালা, জীবন্ত?

নারায়নগড়ে নেমে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে নীলুয়া পেয়ে গিয়েছিল মকরাকে। অজানা অচেনা লোককে হুট্ বলতে নিজেদের গ্রামে নিয়ে যাবে কেন লোধাছানা? তার উপর অদ্ভুত এই লোকটার সঙ্গে আছে কী না একটা শিকলি-বাঁধা 'চিঁড়রা'?

তবে ঐ 'চিঁড়রা' দেখেই বুঝেছিল মকরা— এ-ছাউ লোধা না হয়ে পারে না। গ্রামের নাম বলতে হয়েছিল নীলুয়াকে— দোরখুলি। উঁহু, দোরখুলি বললে কে চিনবে, পাশের কোনো বড় গ্রামের নাম বলতে হবে।

নীলেশ্বর বলেছিল— দোরখুলি-পাথরডহরা।

মা-মনসায় পৌঁছে নীলেশ্বর দেখল—এদেব অবস্থা ঠিক তাদের মতো নয়। রকমফের আছে। বাড়িগুলোও অন্যরকম। ভদ্রস্থ।

তার উপর চাষ করবার প্রবণতা ষোল আনাই আছে, তবে জমি তেমন নাই। নীলুয়া এটুকু বুঝল— তাদের ঘরের আশ-পাশের 'বাড়িতে' খলায় 'মকা' চাষেব বহব দেখে।

মকার গাছগুলো গোঁয়ারের মতো বেড়ে উঠছে, তাদের ঢেউ-খেলানো পাতাগুলো আখপাতার চেয়েও জোবে নড়ছে। তবে হাটুয়াদেব চাষ-কবা আখপাতার যে-ধার সে-ধার তারা পাবে কোথায়?

পাহারা দেওয়ার এখনই দরকার নেই, তবু কেউ কেউ অতি সতর্কতায় খেতের মধে টাঙিয়ে রেখেছে চুন দিয়ে চোখ-মুখ-আঁকা কালো হাঁড়ি, গরুর মাথার খুলি।

মুখিয়া ভিকা ভক্তার নাতি মক্‌রাই তার ঠাকুরদাব কাছে নিয়ে এল নীলুয়াকে। নীলুযা দেখল—এ যেন অবিকল দোরখুলির মাতব্বর রাইবুলোধার বাপ গেঁড়াশবর।

গেঁড়া শবর, গেঁড়া শবর।

বড়সোলের গজ্‌নাকে নীলুয়া চোখে দেখেনি, শুনেছে গজ্‌না এই গজ্‌না সেই, সরপঞ্চ গেঁড়াশবরের পরে এই আরেক সরপঞ্চ ভিকা ভক্তাকে স্বচক্ষে দেখল নীলেশ্বর।

তার অত দেখবার সময়ই বা কোথায়? সে তো 'ফুটবল-ম্যাচ' খেলতে ঘুরে বেড়িয়েছে হাটুয়া-মাহাতো-কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজদের পাড়ায়। মুখিয়া-মাতব্বর-সরপঞ্চ না, আর বড়জোর দেখেছে লছিপুর হাই-ইস্কুলের হেডমাষ্টারকে।

হেডমাষ্টারের মতোই পা ছুঁয়ে 'গড়' করল ভিকা ভক্তাকে। আর তাতেই বিগলিত হয়ে উঠবে না মা-মনসার 'কড়া' মুখিয়া-মাতব্বর ভিকা ভক্তা?

'মালা-ঘুনসী' আনতে লোক গিয়েছে নারায়নগড় বাজারে। ভিকাবুড়ার নাতির সঙ্গে 'মালা-ঘুনসী' বদল করবে দোরখুলি-পাথরডহরার ছেলেটা। 'হরির লুটের' মতো 'বাতাসা-লুট' হবে শীতলা মাড়োতলায়।

—খবরটা রটে গেছে গোটা মা-মানসায়। মুখিয়ার বাড়িতে-খলায় লোক জড়ো হচ্ছে একে একে। দেখতে— কে উড়ে এসে কুটুম হয়ে জুড়ে বসল? কৌতুহল, কৌতুহল।

বিশেষ করে বউড়ি-ঝিউড়িরা। ছেলে কোলে-কাঁখে নিয়ে তারা এসে দাঁড়াল এক বিশেষ ভঙ্গিমায়। একদল গেলে আরেকদল এল। আগের দল ছাগল-নাদির মতো ছেড়ে গেল ছা-ছানাদের।

তার মধ্যে একটা একটু বড়। তবু ন্যাঙটা। সে ঘুর ঘুর করছিল মুখিয়ার আশ-পাশে। মুখিয়া সহাস্যে তার পাছায় একটা চড় কষিয়ে বলল, এই শালা ল্যাঙটা লোদ্ধা! যা পেন্টুল পিন্ধে আয়!

হাড়িয়া নামের ন্যাঙটো ছেলেটা, পেন্টুল নেই, তবু লজ্জায় পড়ে দৌড়ুল পেন্টুল আনতে। আর আর ছা-ছানারা বউড়ি-ঝিউড়িরা, এমনকি নীলুয়ারাও হাসল।

'মালা-ঘুনসী' বদলা-বদলির পরব বেশ জমে উঠেছে! নীলেশ্বর অবশ্য এতটা আশা করেনি— মা-মনসার লোকজন তাকে নিয়ে এতটা মেতে উঠবে। আরেকটু বাদেই মকরার 'কাঠমালা' লাল ঘুনসী সে পরবে, তার পরা লাল ঘুনসী কাঠমালা পরবে মকরা।

আর তারপর থেকেই নীলেশ্বর হয়ে যাবে ভিকা ভক্তার 'ধরম নাতি', হয়ে যাবে মকরার 'স্যাঙাৎ ভাই' আর মুখিয়া হয়ে যাবে নীলুয়ার ধরম ঠাকুরদা।

অধীর আগ্রহে 'মালা-ঘুনসী'র প্রতীক্ষায় আছে মুখিযার বাড়ির লোকজন। তারা বলাবলি করছে, গেছে তো সাইকেলে এখনও আসছে না কেন? ফের তারাই বলছে, মালা-ঘুনসী না হয় মিলবে একটা দোকানে, কিন্তু বাতাসাব হাঁড়ি?

বাতাসার হাঁড়ির কথায় নীলুয়ার মন উদ্বেল হয়ে উঠল। হাঁড়ি হাঁড়ি বাতাসা বিলি হবে আর তার ঘরের লোক, নামালিয়ার দলটা, দলের একটা লোকও, নিদেন পক্ষে চাঁদবদনীটাও হাত তুলে 'বাতাসা-লুটের' একটা বাতাসাও ধরতে পারবে না—কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল নীলুয়ার।

সে চায়— অন্তত গিরিহার ভাতুয়াটা এসে দেখে যাক!

গিরিহার ভাতুয়া স্বপ্না না, তার হাত ধবে টানল মকবা— এই ফাঁকে সে তাব মা-মনসা গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখিযে দিতে চায় নীলুয়াকে।

ইল্লি-কাঁধে বেরিয়ে পড়ল নীলুয়া।

যেই দেখে সেই বলে, অন্তত মনে মনে তো বলে— হাটুয়াবা বাবুলোকরা শিকলে কুকুর বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, কাগমারা বেদিয়ারা মাশুড়িয়ার শবররা ঝিঁজ্‌রিতে বাঁদর-বাঁদরী বেঁধে টানাটানি করে আর পাথরডহরাব লোধাবা কী 'চিঁড়রা'-কাঁধে 'গাঁ বুলে'?

'গাঁ বুলে' তার মানে গাঁ বেড়ায়। বলল বিশেষত চাঁদবদনীর বয়সী মেয়েরাই। অবশ্য নীলেশ্বর শুনতে পেলে জবাব দিতে ছাড়ত না। কিন্তু মা-মনসার মুখিয়া ভিকা ভক্তার কুটুমকে কার অত সাহস শুনিয়ে শুনিয়ে খোঁটা দেয়?

মা-মনসার মুখিয়া বহুত কড়া লোক। কার ঘাড়ে কটা মাথা তার জমানায় 'ইন্টুসিন্টু' করে পার পেয়ে যায়?

মনে নেই লবঘন কোটালের সঙ্গে বিধবা সমি'র ঘটনাটা? চৈতন ভক্তা কী ছাড়া পেয়ে গেল ঝড়িশববের বউ ভাদরীকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে? জিলপা মল্লিকের বউড়ি কুন্তার সঙ্গে আঘনু কোটালের আর আঘনু কোটালের 'স্তিরি' কাজলীর সঙ্গে জিলপা মল্লিকের অদল-বদল ভাব-ভালবাসার ব্যাপারটার এ-মুখিয়া না থাকলে সহজে জট খুলত কী?

কী হল খাঁদুর বোন টুনির?

ভাই বেশ তো তেজ দেখিয়ে এ-গাঁয়ে বিয়ে না দিয়ে মুখিয়াকে অমান্য করে নিয়ে গেল হাটুয়াদের গাঁয়ে। হাটুয়ারাও মাথায় টুপি পরিয়ে এটা-সেটা কাজকাম করিয়ে 'বাধিয়েও' তো দিল! তার বেলা?

কতক ভেড়া-ছাগলের ভিড়ে চলতে চলতে মুহূর্তের জন্য আটকা পড়ে গেল নীলুয়া আর মকরা। সকালে চরাতে নিয়ে যাওয়া ছাগল-ভেড়া এখন এই দুপুরে ফিরছে। ফিরছে গ্রামের

রাস্তায় সামান্য ধুলো উড়িয়ে। ছাগল-ভেড়ার খুরে আর কতটুকু বা ধুলো!

কিন্তু যেন স্বপ্ন দেখছে নীলেশ্বর— এ কী জাতের ভেড়া, এ কী জাতের ছাগল? যারা কান ফুঁড়িয়ে একেকটা কানে একেকটা দুল পরেছে।

হয়ত আঁতি পাঁতি করে খুঁজলেও মা-মনসা গ্রামের বউড়ি-ঝিউড়িদের কানে দুল পাওয়া যাবে না একটাও। আর তাদেরই গ্রামে কানে দুল পরে দু'কান ঝাড়তে ঝাড়তে সার সার এগিয়ে চলেছে ছাগল-ভেড়া!

এ কী দেখছি, সাঙাৎ?

ছাগল-ভেড়াগুলোর দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাচ্ছে নীলেশ্বর।

ও, কানে দুল? হাসছে মক্‌রা।

এদেশে দেখছি বউড়ি-ঝিউড়িরা কান ফুঁড়ায় না, ছাগল-ভেড়ায় কান ফুঁড়ায়? গহনাও পরে?

হুঁ, পরে বৈকি।

মকরা অবশেষে ভাঙে—

দুল নয়, দুল নয়— কানে ওটা 'পঞ্চাতের' চিহ্ন, সাঙাৎ। ঘর ঘর ওরাই তো দিয়েছে লালন-পালন করে বড় করতে, সংখ্যায় বাড়াতে। ছাগল-ভেড়া কিনে বিলি করার ধুম—সে যদি দেখতে!

'মালা-ঘুনসী' এখনও বদল হয়নি, শীতলা মাড়োতলায় এখনও শুরুই হয়নি 'বাতাসা লুট', তবু তারা এ-ওকে 'স্যাঙাৎ' বলেই ডাকছে, কুটুম-কুটুম ভাব নিয়েই কথা বলছে পরস্পর।

নীলেশ্বরের ভালো বৈ মন্দ লাগছে না। মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ রোদ, এখানে-ওখানে ছিটে ফোঁটা 'হলদা-বৃষ্টি' বৈ আর কোনো বৃষ্টি নেই। কানে দুল-পরা ভেড়া-ছাগলের পাল চলেছে সামনে-পিছনে। তার ভিতর দিয়ে, তার ভিঁতর দিয়ে মা-মনসার বড়াম থান, লোধাদের ঘর, মকার ক্ষেত, সরকারী নলকূপ দেখতে দেখতে দুই স্যাঙাৎ হেঁটে চলেছে।

হাটুয়াপাড়া হলে দুই স্যাঙাৎ-কে এর-ওর কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে দেখলে হাটুয়াছুআরা হাটুয়া ঝিঅরা এতক্ষণে টিটকারি দিত—

দুই সাঁগাৎ কাঁকড়া-গাত্।
ঘুরি পড়বে ত মারলা লাথ।।

মকরা শোনাচ্ছে— এই হাটে হুলিয়া জারি হল, পরের হাটে যার যত ছাগল-ভেড়া আছে বিক্রির জন্য নিয়ে আসতে, সরকার নগদ টাকা দিয়ে সব ভেড়া-ছাগল কিনে নেবে। আর তারপরে যা হল সে দৃশ্য দেখবার মতো—

চারধার থেকে ছাগল-ভেড়া নারায়নগড় হাটে আসছে। এদিক থেকে সেদিক থেকে, উত্তর-দক্ষিণ থেকে। পিচরাস্তা, মোরাম রাস্তায়, আলের উপর দিয়ে, খাল-বিলের ভিতর দিয়ে। কেউ চ্যাঙ-দোলা করে নিয়ে আসছে, কেউ ঘাড়ে বয়ে নিয়ে আসছে। কেউ দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে, কেউ পিছনে তাড়া দিয়ে নিয়ে আসছে। কেউ তুলেছে ভ্যান-রিক্সায়, কেউ তুলেছে টেম্পোয়। প্যাসেঞ্জার-বাসের মাথায়ও ছাগল-ভেড়া উঠে পড়েছে।

যারা জানত জানত, যারা জানত না তারা, বিশেষত ছাগল-ভেড়ার পাইকাররা, তারা ভাবল—ভেড়া-ছাগলে বুঝি মড়ক ধরেছে, সস্তায় গছিয়ে দিতে মালিকরা হাটে আনছে! মওকা বুঝে দাঁও মারতে তারাও ট্যাকে অতিরিক্ত পয়সা গুঁজে হাজির!

হাজির, হাজির।

একসময় পরিস্থিতি এমন হল যে, হাট ছাগল-ভেড়ায় ভরে গিয়ে উপছে পড়ল।

মুদিখানার মালিক একদিকে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ভেড়া-ছাগলের। বস্ত্র ব্যাপারী যাও বা এক-দু গাঁটরি খুলেছিল, তাও গুটিয়ে ফেলল। পুঁইডাঁটা-কলমী-লটিয়া শাকউলীরা, পটল-শশা-ঝিঙা-চিচিঙ্গা-বেগুন আনাজউলীবা ভেড়া-ছাগলের ভয়ে আনাজের বোঝা-ই খুলল না।

তখন কে জানত ঐ সব ভেড়া-ছাগল কিনে সরকার লোধাদেরই দাদন করবে। সবাই তো ভেবেছিল— সরকার ছাগল-ভেড়া কিনে কেটে-কুটে মাংস করে চানাচুরের মতো প্যাকেট প্যাকেট বিক্রি করবে।

সরকারী লোকেরা একেকটা ছাগল, একেকটা ভেড়া কিনছে, দাবনায় শীলমোহরের দাগ মারছে আর কানে দুল পরাচ্ছে। সেই দাগ, দুল-পরা ছাগল-ভেড়াগুলোই তো এই—

শুনতে শুনতে নীলেশ্বর ভাবছে—একসময় তাদেরও তো ভেড়া-ছাগল-হাঁস-মুরগী পঞ্চাৎ থেকে দিয়েছে। কিন্তু তার কী হল? তার কতক তো খেল শিয়ালে আর কতক খেল ঐ যে বলে না— 'দু'গোড়িয়ায়'— তারমানে দু'পাঅলা মানুষে।

এদিকে জঙ্গল নেই, শিয়ালও নেই। বেঁচে থেকে ভেড়া-ছাগলগুলোও বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। তার উপর, নীলুয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নামালদেশেব লোধারাও যাদু জানে।

নীলুয়া বলল, তোমাদের হাতে ম্যাজিক আছে, সাঙাৎ। না হলে এত ছাগল-ভেড়া 'পাল-পোষ' করলে কী করে?

মকরা স্বীকার করল— শুধু তাদের গ্রামেই নয়, ডহরপুর-শঙ্কবীডাঙা-কুকাই গ্রামেও শুকু কোটাল, চুনারাম দিগার, ভঁটল ভক্তাব মতো কিছু গুণীণ আছে যারা সত্যি সত্যি তুকগুণ আব ম্যাজিক জানে।

মা-মনসার গ্রাম্যপথে নীলুয়া-মকরাদেব আর বেশিদূর যেতে হল না। খবর এসে গেল— 'মালা-ঘুনসী' আর বাতাসার হাঁড়ি এসে গেছে।

খবর যাবা আনল তারা সবাই চ্যাঙনা-ম্যাঙনারই দল। এ কাজে তাদেরই উৎসাহটা বেশি, তারাই ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিয়ে গেল।

তারা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আরো বলে গেল— মকরার দাদু ভিকাবুঢ়া তাদের এখন-এখনই ফিরতে বলেছে।

হোক না চ্যাঙনা-ম্যাঙনা, তবু তাদের কথা অমান্য করে নীলুয়া-মকরার সাধ্য কী? গ্রাম-দেখা অসমাপ্ত রেখেই তারা ফিরল।

গা ধুয়ে গেল মাড়োতলায়। শীতলা মাড়োতলায় ব্যাপারটা না হয়ে হতে পারত যে কোন হাটে, যে কোনো মেলায়, মকর-যাতে, 'বান্নিতে'।

নতুন কাপড় পরারই নিয়ম। কিন্তু হুট্ বলতে নতুন কাপড় তারা এখন পাবে কোথায়? ঐ লাল ঘুনসীতেই তো সাতগাছি নতুন সুতার ফেরতা আছে— ঐ দিয়েই নতুন কাপড়ের কাজও চলে যাবে। দোষ নেই।

শীতলা মাড়োতলায় লোক জুটে গেল মেলা। সবই চ্যাঙনা-ম্যাঙনা বউড়ি-ঝিউড়ির দল। মা-মনসার পুরুষদের সে আর এখন পাচ্ছো কোথায়? সবাই তো গিয়েছে যে-যার ধান্দায়। ফিরবে সেই আড়বেলায় কী বেলা 'বুঢ়লে'।

গ্রামের মুখিয়া-মাতব্বর তো আছে। ভিকা ভক্তা একাই এক শো। সামনে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে সব কিছুরই। পাঁচাশি না, এক লাফে যেন তার উমর কমে গেছে আরো কুড়ি বছর, পঁয়ষট্টি!

নীলুয়ালোধা ভেবে ভেবে আকুল— এই তো কিছুক্ষণ আগে সে এল মা-মনসায়, সবার সঙ্গে এখনও ঠিক মতো আলাপ হল না। আর সে হয়ে গেল কুটুম, কী না নাতি?' একেবারে ঘরের লোক।

দুজনা মুখামুখি দাঁড়া।

মুখিয়ার গলা, নির্দেশ।

শীতলা মাড়োতলায় দুজনেই মুখোমুখি দাঁড়াল। নীলুয়া-মকরা।

দুজনের মুখেই হাসি।

হাসছিস্ যে ম্যাড়া, মারব থাবড়া!

হেসে ভিকাবুঢ়া থাপ্পড় মারার ভঙ্গি করল।

মাড়োতলায় অট্টরোল উঠল হাসির।

মকরার মা বলল, দুজনা দুজনাকে মাল-ঘুনসী পরা!

মালা তো কাঠ-মালা, ছোট ছোট কাঠের সাবুদানা, সুতো দিয়ে গাঁথা। তিলক-কাটা বোষ্টমরা পরে। তারা বলে কণ্ঠীমালা। আর ঘুনসী তো লাল সুতোর ফেরতা, কোমরের মাপে কেনা।

নীলেশ্বরের গলায় প্রথমে কাঠমালা পরিয়ে দিল মকরা। এবারে মকরার গলায় কাঠমালা পরাচ্ছে নীলুয়া। কাঠমালা পরানোর পালা শেষ হলে নীলুয়াই প্রথমে হাসতে হাসতে মকরার কোমরে বেঁধে দিল লাল সুতোর 'অঁটা-দড়ি', লাল ঘুনসী।

মকরাকে ঠেলা দিয়ে তার বুড়ো ঠাকুর্দা বলল, শালা, তুই আগু পরাবি ত!

ঠেলা খেয়ে মকরা তাড়াতাড়ি লাল সুতোর ঘুনসীটা জড়িয়ে দিল নীলেশ্বরের কোমরে। মেয়েদের মধ্য থেকে এসময় কে যেন দু'কলি গীতও গেয়ে উঠল—

কুঁখির ভিখারি দুয়াড়ে ডাঁড়ালে
ভিখ দিড়ে ভিখ নাই ক
কড়র ঝিক খজয়
কড়র ঝিক দিম নাই কড় হেবেক শুখা
গাছের বাইগন দিয়েঁ দিড়ে গাছ হেবেক শুখা।।

ভিখারী সেজে বর এসেছে, এম্নি ভিক্ষা দিলে সে নিচ্ছে না, সে তো খুঁজছে কোলের মেয়েকে। কোলের মেয়েকে তো দেব না, কোল তাহলে শূন্য হবে। গাছের বেগুন তুলে নিলে গাছ যেমন খালি হয়ে যায়।

গায়িকার পিঠে আলতো কিল মেরে আরেকজন বলল, এগো ই যে বেহাগীত, ইখেনে গাইছিস কেনে?

তাই তো, এখানে তো 'মালা-ঘুনসী' বদলা-বদলি, 'ছামড়া-গাড়া' 'গায়ে-হ্‌ড়িদ' কী 'বাঁধাপাণির' গান এখানে চলবে কেন? বেদী তৈরি করা, গায়ে-হলুদ, বর-কনে বিদায়ের গান তো সবই বিয়ের গীত—এখানে চলবে না।

কিল খেয়েই সে থেমে গেল। মা-মনসার মুখিয়া-মাতব্বর ভিকা ভক্তার মনে হল—বেশ তো হচ্ছিল, থামল কেন?

সে চ্যাঙনা-ম্যাঙনাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, আবেব হুরি কর!

ছেলেপুলেরা আনন্দে মহা সোরগোল তুলল।

আর এসময়ই 'বাতাসা লুট' শুরু হল। সোরগোল বেড়ে দ্বিগুন-তিনগুন-চৌগুন হল। ওদিকে এখন শীতলাথানের সম্মুখে চলছে মালা-ঘুনসী বদলাবদলি।

নীলুয়া তার পরা-ঘুনসী খুলে জড়িয়ে দিল মকরার কোমরে। মকরা তার পরা-ঘুনসী খুলে পরিয়ে দিল নীলুয়াকে। নীলুয়ার মালা গেল মকরার গলায়, মকরার গলার মালা উঠে এল নীলুয়ার গলায়।

আজ থেকে একজন আরেকজনের স্যাঙাৎ হল। তারা দুজনে গড় করল শীতলা মাকে, গড় করল উপরে ধরম দ্যাবতা তলে বসুমাতাকে। গড় করল গ্রামের গরাম গ্রামের বড়াম দ্যাবতাকে। গড় করল আজ থেকে দুজনেরই ঠাকুর্দা ভিকা ভক্তাকে। মাকে, অন্যান্য গুরুজনকে।

শীতলা মাড়োতলার বেলগাছের ডালে বাঁধা ইল্লি এতক্ষণ লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চিক্-চিক্ করছিল, কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি, ভেবেছিল বন-ঝাড়ের চিড়রা বন-ঝাড়েই ডাকছে। ক্রিয়া-কর্মে ছাড়া পেয়ে নীলেশ্বর এবার তাকে নামিয়ে নিয়ে এল।

ফুটবলের হাই-শটের মতো বাতাসার বল আকাশে উঠছে, তুখোড় গোলকীপারের মতো মা-মনসার চ্যাঙ্গা-ম্যাঙ্গারা তাই লুফে নিচ্ছে।

খেলোয়াড়ী কায়দায় কতক ধরে ফেলল নীলেশ্বরও। কিছু মুখে পুরল, কিছুটা তুলে ধরল ইল্লির মুখের কাছে। সে তার সামনের দুটো পা দিয়ে তুর তুর করে কুরে কুরে বাতাসা খাচ্ছে।

দুপুরের খাবার খেতে বসে মুহূর্তের জন্য হলেও নীলেশ্বরের মনে পড়ে গেল— গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার বিলে এতক্ষণে চাঁদবদনী-ভুটকী-পুনোই গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা 'বাসিয়াম' খাচ্ছে।

সেই বড় হাঁড়ায় ভরতি পাখাল-ভাত। তার সঙ্গে বৈতাল-পুঁইখাড়ার ঘন্ট, শুকামাছপোড়া। আজও মাথায় করে নিয়ে এসেছে চাঁদবদনী। আজও কী সে ভুলেছে খাওয়ার থালাবাসন আনতে? আজও কী গিরিহার ভাতুয়া স্বপন ছুটতে ছুটতে এসে থালাবাসন দিয়ে বলে যাচ্ছে, থালা আনলুনি খাবু কী করি?

নাকি এতক্ষণে মারধোর খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে স্বপন? নাকি গুরভাই বলেনি গিরিহাকে লোকলজ্জার ভয়ে? কত কী হতে পারে, কত কী ভেবে খেতে বসেও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল নীলেশ্বর। তার মনে হল— একদৌড়ে এক্ষুণি সে গিয়ে সরেজমিনে সমস্ত কিছুই তদন্ত করে দেখে।

খাচ্ছিস নাই নাতি? নাকি বাঁধ্না ভাল হয় নাই?

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করে ভিকাবুঢ়া, তার তো সবকিছুই বেশ 'জুতের' লাগছে।

কী যে বল-অ ঠাকুর্দা! রান্না বেশ জুতের হয়েছে!

তবে খা, হাঁপরে হাঁপরে খা!

বলেই মা-মনসার মুখিযা ধরম নাতিকে কী করে 'হাঁপরে' খেতে হয় যেন শেখানোর নিমিত্তই মুরগার জুসের বাটিতে ডান হাতের আঙুলগুলো জড়ো করে ডুবিয়ে তাতে সামান্য ঝোল তুলে অসামান্য শব্দে মুখের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিল। তার ছিটেফোঁটাও এদিক-ওদিকে পড়ল না।

নীলুয়ার মুখের দিকে চেয়ে মকবা লুকিয়ে হাসল।

মকরার মুখের দিকে চেয়ে হাসার ভঙ্গি করে কোনমতে ম্যানেজ দিল নীলুয়াও।

আয়োজন ভাত, মুরগা, মুসুরের ডাল, 'বাড়ির' কাঁচকলা। নীলুয়ার কাছে এ-খাওয়া 'মকর' পরবের কী 'বাদনার', তাও জোটে কী জোটে না। চোখ না-ফোটা লাল লাল ইঁদুরের ছানা কাঁচায় কচমচিয়ে খাওয়াই যাদের আহ্লাদের খাওয়া, তাদের কাছে এ-খাওয়া তো স্বর্গ। কে জানে তার বাপ-মা-ভাই এখন কী খাওয়া খাচ্ছে। খালি পিসিটাই যা—

ভৈরবকুম্হারের বেটার বউ, তার সাবিপিসির এত সব খাবার অত 'টায়েম' কোথায়? তার তো খালি কাজ আর কাজ— এই ধান এল, এই কুরথিকলাই তো ঐ বিরিকলাই, এই মুগ এল তো ঐ ছোলার ডাল, নতুন গুড়ের পায়া এসে হাজির, গেঁড়ি-গুগলির খোল বেছে

বেছে রোদে দিতে হচ্ছে মাটি, খলায় গোবর লেপে তার উপর এক্ষুনি আঁকতে হবে লক্ষ্মীর 'পাঁজ', কাজ আর কাজ—

এরকম একটা কেন, রোজ রোজ দশটা মুরগা সে রাঁধতে পারে। কিন্তু নীলুয়ার তবু মনে হয়— নামাল দেশে-ঘরের লোকেরা ম্যাজিক জানে। এই তো কেমন এইটুকু সময়ের মধ্যেই 'কুটুম' বানিয়ে কুটুম্বিতা রক্ষায় রেঁধে ফেলল মুরগা!

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন মকরার মা কেবল মুখিয়ার থালার পাশে একটা 'গহীরা' জামবাটিতে একটা কিছু রেখে গেল।

সলজ্জ হেসে ভিকা ভক্তা বলল, লইতন লাতির সামনে আজ আবার ইসব কেনে দিতে গেলে মকরার মা?

নীলুয়াকে আকারে-ইঙ্গিতে 'কী জিনিস' বুঝিয়ে দিল মকরা— সেই বলে নাই "এক বোতল ভাকু এক জাম পাঁচু— "

খাওয়ার শেষে ঐটুকু না হলে মা-মনসা গ্রামের মুখিয়া-মাতব্বব ভিকা ভক্তার চলে না যে! নীলুয়া-মকরার সামনেই আহ্লাদ করে এক জাম হাঁড়িয়া চোখ বুজে খেয়ে নিল নীলুয়ার ধরম-ঠাকুদা।

বাইরে ছাতি-ফাটা রোদ, মাটির ঘরের হিমশীতল আবহাওয়ায় খেজুবপাতার চাটাই বিছিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়ার অনুরোধ এম্নিতেই এড়াতে পারল না নীলেশ্বর। আর তার পরেই কথায় কথায় আসর বেশ জমে উঠল।

কথা হচ্ছিল সাতসোলের। কেশিয়াড়ী-খড়গপুর রাস্তায় হাতিগেড়িয়া থেকে পশ্চিমে বেশ কিছুটা ভিতরে সাতসোল গ্রাম।

সেখানে লোধাদের নাকি বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে! মা-মনসার মুখিয়া-মাতব্বর ভিকা ভক্তা জানাচ্ছে—

সাতসোলের নিত্যানন্দ আড়ি। তার জামাইয়ের নাম হিরণ্যকশিপুর ছাউয়ের নামে নাম ঐ যে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ ভক্তা। বালিচক-চকমাপুরের মাষ্টার। বিশেষত তারই উদ্যোগে মন্ত্রী-এম.এল.এ-দের সাহায্যে নাকি সাতসোলের খাস জমিনে গড়ে উঠেছে একটা লোধা-হোস্টেল, একটা পুকুর, দুটো কির্লোস্কার, দুটো স্যালোমেশিন, তিন-চারটে ইন্দিরা-আবাস, চার-পাঁচটা ডি.আর.ডি লোন—

নীলেশ্বর শুনল—হিরণ্যকশিপু-প্রহ্লাদের নাম করল ভিকা ভক্তা। শুধু কী হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের? নাম করল রোহিনীর রসিকানন্দ মহারাজের। নাম করল রাজেন্দ্রনাথ দাস ব্রহ্মঅবধূতের। নাম করল কাঠিয়া হরিদাস বাবাজীর। নাম করল ধ্যানমঙ্গল গোস্বামীর। নাম করল গোকুলানন্দ মহারাজের।

এত নাম একসাথে শুনতে শুনতে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলল নীলেশ্বর। একে তো খাওয়া হয়েছিল ভারি, তজ্জন্য ঘন ঘন হাই। তদুপরি ঢুলছিল সে। একরকম জোর করেই চোখ খোলা রাখছিল নীলুয়া।

নীলেশ্বর শুনল— কুলটিকরীর লোধারা রসিকানন্দের তুক-গুণে কী করে মল্লিক-ভক্তা-কোটাল-দিগার-দণ্ডপাট ছেড়ে হয়ে গেল 'দাস'। আর ভিকা ভক্তারাও রাজেন্দ্রনাথ দাস ব্রহ্ম অবধূতের যাদুতে পড়ে কী করে শিখতে লাগল যাগ-যজ্ঞ-হোম—

নীলেশ্বর কী ঘুমিয়ে পড়েছে? সে কী স্বপ্ন দেখছে? এই তো 'ধরম-ঠাকুদা'র বলা ব্রহ্ম-অবধূতের নারায়নগড় এলাকায় লোধাদের সঙ্গে দিন-কাটানোর গল্প শুনে 'হুঁ-হাঁ' করছিল। এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল?

না, না। এই তো তাকে জাগিয়ে রাখার জন্য তার স্যাঙাৎ মকরা একটু আগে একটা অশ্লীল হেঁয়ালি দিয়েছিল— 'আস দেওর কাজ করবে— দু জাঙের মাঝে'— কী উত্তর? উঁহু, যে-টি ভাবছ সে-টি নয় হে স্যাঙাৎ।

তা তো নয়-ই। প্রশ্নটা অশ্লীল অসভ্য শোনাতে পারে, তা না হলে আর 'হেঁয়ালি' কেন? তা বলে উত্তরটা অশ্লীল কেন হবে? সে তো হবে গঙ্গাজলের মতো পবিত্র, চাঁদ-সুরুযের মতো সত্য। সেই সত্য-পবিত্র-শ্লীল উত্তরটাই এতক্ষণ হাঁতড়ে বেড়াচ্ছিল নীলেশ্বর।

উত্তর-বৌদি গাইগরুর পিছনের দু পায়ের মাঝখানে বসে দুধ দুইয়ে দিতে দেওরকে ডাকছে, কাজের জন্যই, অ-কাজের জন্য নয়। —বলতে পারেনি নীলুয়া, উত্তরটা বলে বুঝিয়ে দিয়েছিল মকরাই।

শুনতে শুনতে এই তো জেগেছিল— এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল? না না, এই তো জেগে আছে, চিমটি কাটলেই বেশ বুঝা যাবে— ঐ তো শুনছে। 'ধরম-ঠাকুর্দা' বলছে, কাঠিয়া হরিদাস বাবাজী—

এই নারায়নগড়ের লাড়মায় কেঠো হরিদাস বাবাজীর আখড়া। বোষ্টমদেরই আখড়া। খোল-করতাল বাজিয়ে রোজ দুবেলা নাম-সংকীর্তন হয়। বোষ্টম-বোষ্টমীরা আসে। আরো নানান ভক্তরা।

কেঠো হরিদাস ধ্যানমঙ্গল গোস্বামীরই জ্ঞাতিপুরুষ, পূর্বপুরুষ। তল্লাটে তাঁর বহুত নামডাক! সিদ্ধ-পুরুষ— তুক-গুণ, জানা আছে যাদুবিদ্যাও।

'হরিসভা' বসে, পাঁচ-পাঁচটা তুলসীমঞ্চের চারধারে ঘুরে ঘুরে নাম-গান হয়, বৈঠকী-কীর্তন। সকল সময় হরিনামে মত্ত হরিদাস বাবাজী। বাদবাকি সময় বনে-জঙ্গলে, ঐ ভদ্রকালীর বন-ঝাড়েই ঘোরাঘুরি।

কতদিন চাঁদড় শিকড়-বনপাড়-আঁকনালী শিকড় খুঁজতে গিয়ে লোধাদের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে।

বুঢ়াদাদু, তোমার সঙ্গেও?

জেগে আছে জানান দিতে কোন ক্রমে চোখ খোলা রেখে মকরাই জিজ্ঞাসা করে।

ভিকা ভক্তা বলে, নাই আমার সঙে কী আর, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের সঙে।

অ।

রেগে গেল ভিকা—

ম্যাড়হা, শুন! তারা নিজের চোখে দেখেছে— বাবাজী হাত বাড়িয়ে বনের গাছ থেকে ফলপাকুড় ছিঁড়ে ফের গাছেই লাগিয়ে দিচ্ছে অবিকল।

খেজুরপাতার চাটাইয়ে তড়াক করে উঠে বসল নীলেশ্বর। বলে কী লোকটা! এ-কাজ যে পারে তার তো অসীম ক্ষমতা!

ক্ষমতা বলে ক্ষমতা, মা-মনসার মুখিয়া নীলুয়ার 'ধরম ঠাকুর্দা' এতদিন বাদে এত ভালো শ্রোতা পেয়ে ফের শোনাতে শুরু করল—

জঙ্গলের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে বাবাজী একদিন দেখল— রূপসী এক 'মাইয়া' —কে জানে কার ঘরের—মরে পড়ে আছে জঙ্গলে! ডাকাডাকি করেও কাছে-পিঠে কাউকে তো দেখল না। বেওয়ারিশ লাশ।

হরিদাস বাবাজী তার যাদু শুরু করল। দেখতে দেখতে সে-মেয়ে তো জীবন-দান পেয়ে চোখ খুলে হাসল।

হাটুয়া যাত্রা 'সাবিত্রী-সত্যবান'-এ শোনা একটা ডায়লগ "তুষ্ট তোর বাক্যর বঞ্চই দেলি মু স্বামী তোহর" উচ্চারণ করে মা-মনসার মুখিয়া ভিকা ভক্তা বলল, এ ঠিক সাবিত্তিরি-সত্যবানের উল্টাটা— লাড়মায় কতজন যে যেঞে দেখে এসেছে— হরিদাস বোষ্টম ঐ মাইয়াকে বোষ্টমী করে সুখে সংসার করছে!

তবে নাতি—

নীলেশ্বরের বিস্ময়ের অবধি নেই। গাছ থেকে ছেঁড়া ফলকে ফের গাছেই জুড়ে দিল, মরা মেয়েমানুষকে জীবন্ত করে তাকেই স্ত্রী করল— যাদু না জানলে বাবাজী এত সব করল কী করে? আর জ্ঞানী-গুণিনদের সঙ্গে উঠা বসা না করে এতসব জানল কী করে মা-মনসার মুখিয়া? এতকিছু জেনেও একটা 'খুঁত' রেখে দিচ্ছে মুখিয়া 'তবে' বলে?

কী 'তবে'?

মা-মনসার 'গুন্নী' বাঁকা দিগারও কিছুকটা জানে—

নিঃসন্দেহে বলল নীলুয়ার ধরম-ঠাকুরদা।

অপার কৌতুহল নিয়ে নীলুয়া বলল, কী জানে? মনে মনে সে অবশ্য ভেবে রাখল— মা-মনসার গুণিন বাঁকা দিগার কী আর জানে— বড়জোর জানতে পারে ঐ সাপ-কাটির মন্ত্র দু-চাট্টা, ধুলা পড়া, জলপড়া, নুনপড়া কী গা-ঝাড়ার ঝাড়ফুঁক আর হয়তো বান মারার কূট-কৌশল।

ভিকা ভক্তা জানাল— মরা মেয়েমানুষকে কবর থেকে তুলে জীবন্ত করে ফেব মানুষ করতে না পারুক, বাঁকা দিগার তাকে 'চিড়কিণ' ভূত থেকে মেয়েমানুষের রূপ দিয়ে ঘরে এনে বউয়ের মতোই ঘরের কাজ-কাম করাতে পারে বৈকি। তার জন্য লাগে কটা সামান্য উপাচার— একটা ছুরি, কিছু শালপাতা, যাদু-জানা শিশুর মাথার খুলি, একটা কাজললতা, এক প্যাকেট সিঁদুর, কাঠের পিঁড়া একটা—

কী ঘুমিয়ে পড়েছে নীলেশ্বর? নীলেশ্বর কী ঘুমোচ্ছে? না কিছুটা জাগত থেকে ভিকা ভক্তার মুখ থেকে শুনছে, বাকিটা ঘুমের ঘোরে নিজে নিজেই ভেঁজে নিচ্ছে? নাকি ধরম-ঠাকুরদার মুখ থেকে যা শুনল শুনল, আর বাকিটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে নীলেশ্বর?

চারধারে ভয়ানক খরা চলছে। মাঠের গাছপালা, বিলের ধান, খেতির আনাজ সব শুকিয়ে যাচ্ছে। দোরখুলির ঠাকুরবাঁধ, গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার পুকুর— সব টাঁউ টাঁউ। বামনদার পুবের বিল উত্তরের বিল দক্ষিণের বিলের যে-কটা স্যালোমেসিন, সাতসোলের দুটা— সব অকেজো হয়ে পড়ে আছে। মাটির তলায় জল নেই তার জল তুলবে কী? মকরামপুর—ভদ্রকালী-বাখরাবাদ—নারায়নগড়-বেলদা লাইনে যে-দুয়েকটা বাস এখনও চলছে, তাবা মাঝে মাঝে হেঁচকি তুলে দাঁড়িয়ে পড়ছে। ইঞ্জিনে জল নেই, জল ঢালতে হবে— কিন্তু জল কোথায়? জল, জল। বিকালে ঠিক বেলা চারটায় বামনদা-কুলিদা-তুরকা-কাঁথির ওদিকটায় দু-চার ফোঁটা 'হলদা-বৃষ্টি' হয়ে যাবার পরে সাদা-কালো দুয়েকটা মেঘ আকাশে আসছে বটে, তবে জমছে না— কোথায় উড়ে যাচ্ছে ফুৎকারে!

এভাবে আর কিছুদিন চললে নির্ঘাত দুর্ভিক্ষ, মহামারী। অতএব হরি হে রক্ষা কর! জমিদারের লোক দৌড়ুল লাড়মায় হরিদাসের আখড়ায়। কেঠো হরিদাস আর নেই, তার জায়গায় ধ্যানমঙ্গল গোস্বামী আর শিষ্য গোকুলানন্দ। গোসাঁইজী, গোসাঁইজী! হরিনাম সংকীর্তন শুরু করো। দর দর করে বৃষ্টি নামাও! চলল নামগান— হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। সঙ্গে খোল-করতাল-মন্দিরা বেজে চলল— ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম। বৃষ্টি নেমে এল ঝম্ ঝম্ করে। আর সে কী

বৃষ্টি— অঝোরঝর অঝোরঝর। সে বৃষ্টিতে নারানগড়ের 'বসমাতা' শান্ত হল। মাঠের গাছপালা, বিলের ধান, খেতির আনাজ সব আবার সবুজ হল। দোরখুলির ঠাকুরবাঁধ, গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার পুকুর— সব আবার কানায় কানায় ভরতি। বামনদার পুবের বিল উত্তরের বিল দক্ষিণের বিলের যে-কটা স্যালো মেসিন, সাতসোলের দুটা— সব কটাতেই আবার ভর-ভর করে জল উঠল। মকরামপুর-ভদ্রকালী-বাখরাবাদ নারায়নগড়-বেলদা লাইনে আবার সব কটা বাস চলতে লাগল। ধ্যানমঙ্গল গোস্বামী-গোকুলানন্দের তুক-গুণ আর ভেল্কিতে দুর্ভিক্ষ-মহামারী নারায়নগড় থেকে বিদায় হল।

যার তুক-গুণে যার ভেল্কিতে এতকিছু হল তাকে তো কিছু দান-ধ্যান করতেই হয়! বিশাল ধনসম্পত্তির মালিক দানবীর জমিদার তদনন্তর ঘোড়া ছুটিয়ে লাড়মায় উপস্থিত। ঘোড়া থেকে নেমে জুত করে ঘোড়া বাঁধল একটা খুঁটিতে। জমিদার এসেছে আশ্রমে, শুনতে পেয়ে প্রজারাও একে একে আসছে। মা-মনসা-ডহরপুর-করঙ্গবাড়ির লোধা প্রজাদেরও দুয়েকজন যে সেদিন সেখানে আসেনি কে বলবে! ধ্যানমঙ্গল গোস্বামী ধ্যানে, গোকুলানন্দ ব্যস্ত আশ্রমের কাজে, তবু জমিদারের খাতির যত্নের অভাব হল না। জমিদার বলে কথা! জমিদার দেখল— বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত আশ্রমের চেহারা, তেমনি মরা-কাঠ দশা আশ্রম-মালিকের, কিছু ধনরত্ন দিলে এরা দুজনেই সাগ্রহে নেবে। ধ্যান ভাঙলে জমিদারকে দর্শন দিল বাবাজী। বাবাজীকে গড় করে জমিদার বলল, গোসাঁইজী, তোমাকে, তোমার আশ্রমকে কিছু দিতে চাই, ধনরত্ন। প্রজারা ফিস ফিস করছে— কে বড়? জমিদার না গোসাঁই? গোসাঁই না জমিদার?

ধ্যানমঙ্গলের মুখে শিশুর হাসি। হাতে ধরা পিতলের লোটা থেকে কিছুটা জল ছিটিয়ে দিল জমিদারের ঘোড়া-বাঁধা খুঁটিতে— অমনি সে-খুঁটি কেলিকদম্বের গাছ! সামনেই পড়ে আছে একটা শুকনো দাঁতনকাঠি। ধ্যানমঙ্গল গোস্বামীর লোটার জল পেয়ে সে-দাঁতনকাঠিও মস্ত বকুলের গাছ।

আর কী থাকে জমিদারের 'দাপ'? ইচ্ছা করলে ধ্যানমঙ্গল গোস্বামী তার লোটার জল ছিটিয়ে জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি সমস্ত ধনরত্নকেই করে দিতে পারে মাটি!

মা-মনসার মুখিয়া-মাতব্বর এত জানল কী করে? এত সে জানে যদি তো তার ক্ষুরে ক্ষুরে নীলুয়ার দণ্ডবৎ! সে কী সত্যি সত্যি এইসব ঐসব শোনাচ্ছে? নাকি স্বপ্ন দেখছে নীলেশ্বর, স্বপ্নেই—? এই যেমন শুনল— কে বড়, গুরু না শিষ্য? ধ্যানমঙ্গল না গোকুলানন্দ? কে যেন বলছে— কেউ কম যায় না, দুজনেই সমান সমান, দুজনেরই বিস্তর বিদ্যা জানা আছে।

গুরুর কাছে একবার বকুনি খেয়েছে শিষ্য— কী একটা অপরাধে! অপরাধে, অপরাধে। লজ্জায় গোকুলানন্দ নিজেকে গুরুর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে— এজন্মে এমুখ আর সে গুরুকে দেখাবে না। কিন্তু লুকিয়েছে কোথায়? না, কেলেঘাই নদীর জলের তলায়। কালিয়াঘাই বা কেলেঘাই গ্রীষ্মে এতটুকু কিন্তু বর্ষায় সে দুরন্ত! নারায়নগড়ের পাশ দিয়ে দাঁতনের বাঘুইখালের সঙ্গে মিশে বর্ষায় সবং-পটাশপুর-ভগবানপুরকে সে কাঁদায়। তারই জলের তলায় বসে আছে গোকুলানন্দ! দিনকতক বাদে তার দেহ জলের উপরে ভাসতে দেখা যায়। গোকুলানন্দ মরে গেছে ভেবে কাছে-পিঠের লোকেরা তার দেহকে সৎকারের জন্য তুলতে যায়।

কী অতই সহজ? তুলতে গেলেই তো সে ফের চলে যায় জলের তলায়। ফের দিনকতক অদৃশ্য। আবার ভেসে উঠলে লোকজন আবারও সচেষ্ট হয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যে-কে-সেই। আবার সে টুপ্ করে কেলেঘাইয়ের তলায়। এমনি চলল যতদিন না ধ্যানমঙ্গল—

নীলেশ্বরও ডুবছে-উঠছে, এই ঢুলছে তো এই জেগে যাচ্ছে। অদ্বৈত পৈড়্যার ভাতুয়া স্বপনকে পিটিয়ে সে তাদের দোরখুলির ঠাকুরবাঁধে, উঁ-হু অদ্বৈত পৈড়্যার পুকুরের জলের তলায় লুকিয়ে আছে। উঠবে সে কিছুদিন বাদে। উঠলেও তাকে তো কেউ ধরতে পারবে না, সে ফের জলের তলায় তলিয়ে যাবে। কেন না— সে তো ম্যাজিক জানে!



এখানে-ওখানে হেথা-হোথা, বামনদা-কুলিদা-তুরকা-এগ্রা-কাঁথিতে, প্রতিদিন বিকাল চারটায় বিক্ষিপ্তভাবে ছিটে-ফোঁটা 'হল্‌দা-বৃষ্টি' হলেও গরম একেবারেই কাটেনি, বরঞ্চ ঐ সামান্য জলে মাটি ভিজল-কী-ভিজল না, মাটি থেকে উষ্ণতায়-আর্দ্রতায় যে 'ভাপ' উঠল, সে-ভাপে গরম আরোই বাড়িয়ে তুলল। অস্বস্তিতে অস্বস্তিতে কেউ কেউ বৃষ্টির জন্য জলের জন্য পূজা-পাঠ শুরু করল, যুগীনাচ-ব্যাঙের বিয়ে-নাম সংকীর্তন ইত্যাদি লোকাচার হুবহু পালন করল। আর কেউ মনে-প্রাণে মানা করে দিল বৃষ্টিকে— সামনের এই কদিনে হলদা-বৃষ্টি তো দূরঅস্ত, লাল-নীল-সবুজ যেন কোনো বৃষ্টিই না হয়। কেননা তাদের পাকা ধান পড়ে আছে মাঠে, চালাঘরের তলায় বৃষ্টিতে কাজের অভাবে অলস বসে থাকবে 'নামাল' খাটতে আসা অসহায় কুলি-কামিনরা। ধান-কাটাও হবে না, তাদেরও কাজ থাকবে না, আর কাজ না থাকলে পয়সাও মিলবে না। কিন্তু বসিয়ে বসিয়ে খাবার তো দিতে হবে ঠিক, যার দাম না হয় ভবিষ্যতে মজুরি থেকে উশুল করে নেবে গিরিহা।

বৃষ্টি হয়নি। ধানকাটাও থেমে থাকেনি। নারায়নগড়ের মা-মনসা থেকে ফিরে এসে নীলুয়াও ভেল্কি-ম্যাজিক-তুক-গুণের কথা ভুলে গিয়ে মন দিয়ে একমনে কাজকাম শুরু করল। মনে মনেই ঠিক করল— আজ থেকে সে আর কারোর কথারই অবাধ্য হবে না বিন্দুমাত্র।

কিন্তু রাগ এখনও পড়েনি চাঁদবদনীর। সে-রাতে নীলুয়া-গুরভা আর তার বাপ-মা মিলে তাকে যে পরিমাণ বকেছে তার জের এখনও কাটেনি। সে তাদের সঙ্গে কথাও তেমন আর বলছে না।

আজ নীলুয়াও হয়েছে তেমনি। সুরুয়া-লাইবুকাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় সে এম্নি মগ্ন হয়ে আছে, অন্তত ভাবে-ভঙ্গিতে তো তাই দেখাচ্ছে, তার কাছে আজ চাঁদবদনীও পাত্তা পাচ্ছে না।

নারায়নগড়ের বাজার থেকে হাতে ধরে নিয়ে গেল ছেলেটা, মকরা, তার সঙ্গেই তার মালা-ঘুনসি বদল করে 'সাঁগাৎ-পাতানো' হল, তার আগে বাজার থেকে মালা-ঘুনসি-বাতাসার হাঁড়ি আনতে কত কী কান্ড! পাড়া 'বুলতে' বেরিয়েছিল তারা, বাঁশঝাড়-'বোস ওঠা' বড় বড় স্তনের মেয়ে -কানে দুল-পরা ভেড়া-ছাগল— কত কী যে দেখল! চ্যাকা-চ্যাকা কদলী ভাজা-মুশুরের ডাল-মুরগার ঝোল— কত কী যে খাওয়া! তার উপর বড়সোলের গজনা কুম্‌হার-কাম্‌হারপাড়ার বাল্‌কার থেকেও বড়, 'গেঁড়াশবর-গেঁড়াশবর' দেখতে লোকটা, তার সঙ্গেই পাতানো হল ধরম-ঠাকুরদা। তারপর খেজুরপাতার চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে ভাত-ঘুম ঘুমোতেঘুমোতে সেই ঠাকুরদার মুখ থেকেই শোনা গেল নাকি তার দেখা গেল স্বপ্নে— ঐ যে ছ'শ না সাত'শ বচ্ছর ধরে জ্বলন্ত প্রদীপ, মরামানুষকে জীবন্ত করা, জলের তলায় একনাগাড়ে মাসের পর মাস ডুবে থাকা, চিড়কিন ভূতকে বউ করে ঘরে আনা—

—এই সব কত কি!

সুরুয়া-লাইবুকাদের জোরে জোরেই শোনাচ্ছে নীলুয়া যাতে করে চাঁদবদনীও শুনতে পায়। চাঁদবদনী যে শুনছে না— তা তো নয়।

কান খাড়া করে সে সবই শুনছে, আবার বন্ধুদের— ভুটকী, পুনোইদের— সে মাঝে মাঝেই বলছে ওসব 'পেঁদের কথা' শুনতে তার বয়েই গেছে! 'পেঁদের কথা' তার মানে মিছা কথা, বুজরুকি।

শুনছিল গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারাও। আর প্রতিটা কথাই তাদের মনে হচ্ছিল সত্য, ধ্রুবসত্য। কারণ সব না হলেও কিছু কিছু কথা তো তারা আগেই শুনেছে তাদের বাপ-ঠাকুর্দার কাছে, গ্রামের মুখিয়া মাতব্বর গুণিন-দেহুরিদের কাছে।

গুরভার শরীরটা আজ তেমন জুতের বোধ হচ্ছিল না, কেমন যেন লাগছিল 'ম্যাদা-মারা' 'ম্যাদা-মারা'। কাল যেমন 'হলদা' রঙের বৃষ্টি হচ্ছিল, আজ তেমনি 'হলদা' রঙের রোদ উঠেছে চারধারে।

হলদা-রোদ, হলদা-রোদ।

তার হাতের পায়ের গাঁটগুলি অসহ্য ব্যথা করছে, কোমরটা টাটিয়ে উঠছে। আর সে পারছে না। একসময় আলের উপর গিয়ে থাপস-গাদা হয়ে বসে পড়ল।

একটা ছোটখাটো গাছের তলায় ছাতা মাথায় আজও 'গিরিহা' অদ্বৈত পৈড়্যা বসেছিল।

তার থেকে দূরে রোদের মধ্যেই গুরভা বসল। বসেই সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল, তার ভারি শীত করছিল।

কী হেইচি, বসি গেলু যে?

কিছু হয় নাই, এন্নি বসলাম।

গিরিহার কথার উত্তরে ঘাড় নেড়ে সে একথা বললেও গুরভা তো জানে— তার একটা কিছু হয়েছে। ফাঁকা বিলে কদিন ধরেই তো কাজ করছে, হাওয়া-বাতাস লেগেছে বোধহয়। যেমন থেকে থেকে পাকাধানের ডগা মুচড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'বিঁড়োল বাও'!

গুরভার কিছু হোক-না হোক, গিরিহার সোজা হিসাব। প্রথম দিন তাদের কাজ দেখে খুশিই হয়েছিল সে। আসলে তাকে খুশি করতেই, অপটু হাতে পটুত্ব দেখাতেই যেন সেদিন 'খর খর' কাজ করেছিল তারা। আর তারপর থেকেই ধীরে ধীরে ধরা পড়ে যাচ্ছে তাদের কাজের খামতি আর ঢিলেমি।

একজন তো 'পার্টিবাজি' করতে এসেই বেরিয়ে গিয়েছিল, বাবু আজ এল। তবে তুলনায় পুরুষগুলোর চাইতে মেয়েগুলোই ভালো। গতর আছে, খাটতেও পারে।

গুরভা উঠে পড়ল। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই উঠতে হল তাকে— কেন না 'শুগনি' গিরিহা তার দিকে যেভাবে ঘন ঘন তাকাচ্ছে!

গুরভা ধান কাটছে, দেহের জোরে তো নয় মনের জোরে। মনের জোরে, মনের জোরে। এই তো সবে শুরু হয়েছে ধানকাটা, এখনও 'বাসিয়ামের' পাখালী-হাঁড়ি আসেনি, সারাটা দিন সে লড়বে কী করে?

একরকম জোর করেই সবার চেয়ে বেশি জোরে জোরেই হাত চালাচ্ছে গুরভা। যেন 'পাঁহী'র এ-মুড়ো সে-মুড়ো সে কেটে ফেলবে আগে-ভাগেই। আর কাটলেই তার ছুটি হয়ে যাবে, সবার আগে তাকেই ছেড়ে দেবে গিরিহা।

বামনদার পুবের বিলে অদ্বৈত পৈড়্যার দু-দুটো জমির ধানকাটা শেষ। আজ হাত পড়েছে তৃতীয়টায়। এরকম যে কত কটা আছে! ইতিমধ্যে আরো অনেকেরই বিলে ধানকাটুনীরা এসে

গেছে। পুবের বিল ছাড়া দক্ষিণের বিল উত্তরের বিলেও কালো-মাথা উঠন্তি-ডুবন্তি।

অদ্বৈত পৈড়্যার নিজের যা-জমি ধানঝাড়া-বাছার যা-কাজ তাতে লেগে যাবে আরো আট-দশ দিন। তারপরেও গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা ধানকাটবে অদ্বৈতের ভাইয়ের। ভাইয়ের হয়ে গেলে আরো আরো একজনের। সব মিলিয়ে কুড়ি-পাঁচিশদিনের ধাক্কা।

তারপরেই তারা ফিরবে বাড়ি। চাঁদাবিলা-নারদা পেরিয়ে রুখনীমারা-দোরখুলি। সেই ঠাকুরবাঁধ-মাঝুড়ুব্‌কা-সরুবালি চিকনবালির বাঁশতলা।

সেই বাসে চড়ে গজল্লা করতে করতে, এর গায়ে-তার গায়ে ঢলতে ঢলতে। উঁহু, আসার সময় তারা ট্রেনে চড়তে পারেনি। ফেরার সময় তারা অবশ্য অবশ্য ট্রেনে চড়বে।

কে জানে তারা আবার কবে আসবে না আসবে, আর কোনোদিন আসতে পারবে কী পারবে না— এতদিনের ইচ্ছা ট্রেনে চড়ার, সেই ট্রেনে চড়ে যাবে না?

ধানের 'সুঙ' গায়ে-হাতে লাগাতে লাগাতে এখনও 'আলা' হয়ে যায়নি গুরভার বউ। দিন দিন তার অদম্য ইচ্ছা বাড়ছে বৈ কমছে না। কী যে ঘর-ঘর করে মরে 'উয়ারা', তাও তো ঘর বলতে ঐটুকু মাটির 'কুঁড়িয়া' যার 'ভুগড়ার' ভিত ধসে গিয়েছে নরসিঙার গাম-বুটে।

হ্যাঁ, হত যদি নতুন গিরিহার বাড়িটার মতো, আড়ে-দীর্ঘে এক যোজন। তবে তার অন্দরে যেতেও সুখ, বাস করতেও কত আরাম। গদীর বিছানায় খালি তো শুয়ে থাকা, গিরিহা একটা কিছু চাইলে শুধু তো হাতটা লম্বা করে যতদূর খুশি বাড়িয়ে দেওয়া—

গুরভার বউকে নিজের পরা একটা পুরাতন শাড়ি দিয়েছে গিরিহানী। আর তাই পরে আজ ধান কাটতে এসেছে গুরভার বউ। পুবের বিলে হলদা-পাকা ধানক্ষেতের ভিতর সে-শাড়ির জেল্লা কী!

এতদিনের চেনা এতদিন ধরে সহবাস করা শাড়িটাকে হঠাৎ হঠাৎ ধানবিলে নড়তে-চড়তে দেখে মাঝে মাঝে চমকে উঠছে অদ্বৈত— একী, কাটনীদের সঙ্গে ধান কাটতে লেগেছে নীলিমা!

পরক্ষণেই হেসে উড়িয়ে দেয়, যে কী না এখনও বিছানায় শুয়ে পায়ের উপর পা তুলে নরম নরম হাতদুটোয় ধরে অনূঢ়া মেয়ের মতো 'গেহলা ঝিঅ' পড়ে রোদন মুখস্থ করে— "নদী সে পারে কি বাজিলা তুরী মাগো।। ঝিঅ গলা বলি আইলা হুরি মা গো।। ভাঙ্গা গাড়ি রে কি ছিঁড়া পাটিয়া মাগো। সোয়ারী আইলা বেহারী কাঁহি মা গো।। উঠিলা সোয়ারী বসিলা নাহি মাগো। ফিরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি মা গো—"

শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছে অদ্বৈতও। —সে কী না আসবে ধান কাটতে? ধানের 'সুঙ' ফোটাতে গায়ে-হাতে? তবে নীলিমা কী আর অদ্বৈতর সঙ্গে তাদের পুবের বিলে আসে নি? সে তো এসেছে এক-আধবার এলো চুলে "শুভ" করতে—

কাল রাগ করে রাঁধতে যায়নি চাঁদবদনী, এতগুলো লোকের 'রান্দাবাঢ়া'র কাজ একা-হাতে করতে হয়েছিল গুরভার বউকে। তাতে অবশ্য তার কোনো 'আলা' নেই। ডাক পেয়ে সে তো একপায়ে খাড়া।

ডাক পেলে আজও সে চাঁদবদনীর বদলি হিসাবে যেতে চায়। কিন্তু রোজ রোজ এক কাটুনিকে যেতে দেবে কেন গিরিহা? চাঁদবদনীর কথা অবশ্য আলাদা।

চাঁদবদনী, চাঁদবদনী।

যা মিনা, রান্ধাবাঢ়া কর।

ঘাড় নেড়েছিল চাঁদবদনী। না, সে যাবে না। না, না।

সহাস্যে দলের কেউ কেউ বলেছিল, মিনার রাগ হয়েছে।

হঁ, তা তো হয়ে-ই-ছে। আগের রাতে নীলেশ্বর-গুরভা আর তার মা-বাপ মিলে তাকে যে বকেছে তার জের কাল তো কাল আজ পর্যন্তও কাটেনি।

কাল সে যায়নি, তার জায়গায় গিয়েছিল গুরভার বউ। গুরভার বউ— সে তো চেয়েছিল যেতে আগের দিনেও। তার তো একটা লোভ আছে— গিরিহার বউয়ের সঙ্গে একটু ভাব-ভালোবাসা করে আর তারপর ঘনিষ্ঠ হয়ে—

কই, তেমন কিছু তো দেখেনি? আর পাঁচটা হাতের মতোই তো সাধারণ—

সাধারণ, সাধারণ।

ছুঁয়েও দেখেছে গুরভার বউ। —আঃ কী নরম!

বরঞ্চ সাধারণ মানুষের মতো ঠিসারা করে বউটা বলল, ঘটি-পারা 'মাই' লেইকি ঘুরুচু, শাড়ি দেই ঢাকছুনি কেনি?

নাই, লুগা-টা খাটো আছে গিরিহানী।

বলতেই তার 'পিঁধা' পুরাতন একটা কাপড় এনে তক্ষুণি দিল নীলিমা—

ছাড়ি আয়!

কাপড় ছেড়ে এসে তার সামনে দাঁড়াতেই নীলিমার কী হাসি, কী হাসি!

বলল, দেখবু বাদ্যানি, তোকো দেখি আমহর বর তাঁকর বউ ভাবি ন বুস্সে!

গুরভার বউও হাসল। —কী যে কহিস গিরিহানী!

সেই শাড়িই আজ আবার পরে এসেছে গুরভার বউ, আর তাই দেখে মাঝে মাঝেই গুলিয়ে ফেলছে অদ্বৈত। —ধানকাটনী না নীলিমা? নীলিমা না ধানকাটনী?

ফের আলের উপর এসে বসল গুরভা। এবার তার মাথাটা ঘুরে যাচ্ছিল, কোনমতে সামলে নিয়ে ডাঙায় উঠে এসে বসল গিরিহা থেকে তফাতে, সেই একজায়গায়।

সোউ ক—

সেইটা বল্, গিরিহা জিজ্ঞাসা করল— জ্বরজ্বালা নি বধাইছু গোবর্দ্ধন?

কথা বলে না, খালি তো মাথা নাড়ে গুরভা— না না, জ্বরজ্বালা সে বাধায়নি, তবে গা'টা গরম, হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে!

জ্বরজ্বালা না হিনে কাম ছাড়ি ঘোড়ি-কি-ঘোড়ি উঠি আসিছু কাঁহিকি?

তাই তো জ্বরজ্বালা না হয়ে থাকে যদি তো গুরভাই বা ধানকাটা ফেলে এত ঘন ঘন উঠে আসছে কেন? না এম্নি এম্নি, মাথা নিচু করে দা চালাতে গেলেই মাথাটা কেমন ঘুরে যাচ্ছে গুরভার।

কী লোধাপুরুষ কী লোধাবউড়িঝিউড়ি, প্রায় সমস্ত কাটনীরাই হাতের দা থামিয়ে গুরভা-গিরিহার কথাবার্তা শুনছে। ফের হাসি হাসি মুখ করে গুরভা কাজে এসে যোগ দিলে, তাদেরও হাতের দা সমানে চলতে থাকল।

তার মধ্যে গুরভার বউ-ই একবার নিজের কাজ ফেলে গুরভার কাছে এসে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখল— সত্যি সত্যি জ্বর আছে কী না। শাড়ির আঁচলা দিয়ে মুছিয়ে দিল পিঠের কুলকুইল্লা ঘাম। ঝুঁকে পড়ে কী যেন বললও ফিস্ফিস্ করে।

হাটুয়া বসন্ত থাকলে এতক্ষণে মনে মনে নির্ঘাত বলত— "ডাঁটি লো সুলোচনা, তোকে দেখে আর পারিনা।" তার সঙ্গে তার ভাব। সে থাকলে এই কদিনে আরেকটা 'আণ্ডট' চেয়ে তাকে উস্তন-খুস্তন করে মারত না গুরভার বউ? 'ডাঁটি সুলোচনা'?

গিরিহা অদ্বৈতর অতশত নেই, তার সাফ-সুফ কথা, সে মনে মনে বলল— "পরের খাও। পরকে দিতে অসুখ পাও।।"

জ্বরজ্বালা নেই, তবু নিজের কাম ফেলে 'ঘৈতা'র কাছে এসে ঢঙী বউটাকে 'ফাসুর-ফুসুর' করতে দেখে রাগে হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল অদ্বৈতর। সে গুরভাকে শুনিয়ে-শুনিয়েই বলল, আরে ও গোবর্দ্ধন, অউ হিঁয়ালিটার ভাঙানি কী ক'ত! সোউ যে—

"ফাসুর ফুসুর বউ মোর সর্বগুণে সোনা।
চাঁইফরকি বউ মোর টুই করে কানা।।"

মানে না বুঝে তো দুজনেই হাসল। ভাঙানি জানলে, ভাঙানি ধরে ধরে অর্থভেদ করে গূঢ়ার্থ জানতে পারলে আর কী তারা হাসত? বিশেষ করে গুরভার হল-বলি বউটা?

যে-বউ ফুসুর-ফুসুর করে স্বামীর কানে কানে কথা বলে, সেই চঞ্চলা ছটফটি বউ আপাত দৃষ্টিতে ভালো, সবদিক থেকেই ভালো, তবে যেকোনো দিন ঘর ছেড়ে এমন কী ঘরের 'টুই' ফুটো করেও চলে যেতে পারে।

অর্থ বুঝলে গুরভার বউ সহজে কী ছেড়ে দিত অদ্বৈতকে? ঝাঁ ঝাঁ করে বলে উঠত না— খালভরা নৈস্যা নির্বংশা, আমার মধ্যে কী-ই এমন দেখলি যে অতবড় অপযশ-অপবাদ দিতে পারলি?

গুরভাকে ছেড়ে গুরভার বউ লজ্জায়— হ্যাঁ হ্যাঁ লজ্জায়, ঐ যে লজ্জার কথাটা 'ফাসুর ফুসুর'— ঐ লজ্জায় নিজের 'পাহী'-তে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে পাখাল-হাঁড়ি কাঁধে বিলে এল স্বপনভাতুয়া। আজ আর গিরিহাকে উদ্বিগ্ন মুখে বলতে হল না— যা যা বদ্‌নী পখাল ঘেনি আয়। আর বললেও চাঁদবদনী কী আর অত সহজে যেত? যেত না।

পাখালের হাঁড়ি থালা-বাসন নামিয়ে রেখে সাঁপুইদের বিলের দিকে চলে যাচ্ছে স্বপন। সাঁপুইদের বিলের সেদিনকার রাতের রহস্য-হিঁয়ালিটা এখনও ভাঙতে পারেনি সে। কে জানে— চুড়ি-ভাঙা বা অন্যকিছু এখনও সেখানে পড়ে আছে কী না।

কাই যাউছু?

সাঁপুই-বিলকু।

সিত্র কী?

কাই কিছো না।

তেবে?

তবে সে কেন যাচ্ছে? বলবে কী— খুঁজতে যাচ্ছে চুড়ি-ভাঙা, অন্য কিছু— পোরশুরাতকু দুইটা নারীপুরুষ— তানে সারারাত ধরি জড়াজড়ি করি সাঁপুই বিলরে—-

ধমকে উঠল অদ্বৈত— যতসব আফুয়া কাম করু! পখাল-হাঁড়ি আনলু, আঁকড়াদড়ি-বাঁউক গুড়াক আনলু নি যে?

তাই তো, বিড়া বাঁধবার আঁকড়া-দড়ি-বাঁউক সে আনে নি। একবারে সে আনবে কী করে— এক কাঁধে তো পখাল-হাঁড়ি, থালা-বাসন—?

ফের দৌড়ুল স্বপন। নীলুয়া ভাবল— গিরিহার ভাতুয়াটা তো বেশ বহাল-তবিয়তেই আছে। গিরিহা তো তাকে আছড়ে ফেলে তার হাড়গোড় ভেঙে দেয়নি? তবে কি গিরিহার কানে কথাটা তুলে দেয়নি গুরভা? এতবড় জাতের বজ্জাতি মেনে নিল সে? কী ধারার মুখিয়া-মাতববর সে— হোক সে রাইবুর পরে-পরে?

দেখে আসুক গিয়ে মা-মনসা গ্রামের মাতব্বর ভিকা ভক্তাকে। পঁচাশি বছরের বুড়ো হাড়েও সে ভেল্কি দেখাতে জানে। হিরণ্যকশিপুর নাম, পাঁজি-পুঁথি, নারায়নগড়ের ছত্রিশ মৌজার ইতিহাস, কুকাই-সাতসোল-পাথরডহরা-জাড়ালতা-বেনাগুলি-বাঁধগোড়া-দামদাসোল,

লোধাদের যেখানে যত আস্তানা আছে তাদের লোকজনের নাম— সব, সব তার মুখস্থ।

তার ভয়ে রাজু-সদগোপ-হাটুয়ারাও তটস্থ। এক রাজু ছোকরা এক লোধা ছুকরীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পেট-বাঁধিয়ে ভিকা ভক্তার কাছে কী দণ্ডটাই না পেয়েছিল— গিয়ে জেনে আসুক গুরভা।

গুরভা কিছু বলুক না বলুক, স্বপনভাতুয়া আঁকড়া-দড়ি-বাঁউক নিয়ে ফিরে এলে এই বিলে সকলের সামনেই গিরিহার কানে কথাটা তুলে দেবে নীলেশ্বর, দেবেই।

মনে মনে সংকল্প করে চাঁদবদনীকে একবার আড়চোখে দেখে নিল নীলেশ্বর। তার কোনো হিন্দোল নেই, পুনোই-ভুটকীদের সঙ্গে হাসতে-খেলতে সে ধান কাটছে। স্বপনভাতুয়া পাখালের হাঁড়ি নিয়ে বিলে এল, গিরিহার ধমক খেয়ে আঁকড়া-দড়ি-বাঁউক আনতে ফের গিরিহার ঘরে গেল— এসব যেন দেখেও দেখছে না চাঁদবদনী।

যার যা 'পাহী'— একটা গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা ও আর আর পুরুষদের, একটা নিয়তি-আদরী-রুদনী আর আর লোধাবউড়িদের, একটা নাকফুড়রি-সুরুয়া-লাইবুকু-নীলেশ্বরদের, আরেকটা পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীদের।

সবচেয়ে এগিয়ে আছে পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা। তাদের প্রায় সমান সমান চলছে রুদনী-আদরি-নিয়তিরা। এতক্ষণ গুরভার কাছে থাকার ফলে কতকটা পিছিয়ে পড়েছে গুরভালোধানী। পাহীতে প্রায় সবার থেকে পিছিয়ে আছে ঐ লোধাছাউছানারা— নীলুয়া-নাকফুড়রি-সুরুয়া-লাইবুকারা।

তারা হাসি-ঠাট্টা ঠিসারা-তামাশা রঙ্গ-রসিকতাই করছে বেশি, কাজ করছে কম। তাদের কাজের পদে পদে দোষ ত্রুটি ধরে ফেলছে অদ্বৈত আর মাঝে মাঝেই তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয় বলেই যেন বলে যাচ্ছে 'আফুয়া' 'গতরকুঁড়ে' 'আড়িশা ধাকুড়ধুমা'—

একেকটা এদেশীয় গালি-গালাজ। একটা-দুটোর মানে বুঝলেও বাকিগুলোর মানে তারা বুঝল না। আর যে-কথার তারা কোনো মানেই জানল না, সে-কথা সে-গালিগালাজ তাদের গায়ে দাগও কাটল না।

নাকফুড়রি বামনদার পুবের বিলে অদ্বৈতরই জমিতে বিছিয়েছিল 'আঠা-কাঠি' পাখ-ধরার। গত দুদিন সে একটা পাখিও পায়নি। আজ তার কেন যেন মনে হচ্ছে— আঠা-কাঠিতে আজ একটা হলেও 'লটকাবে'। লটকাবেই লটকাবে।

তাই ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝেই সে খাড়া হয়ে দেখছিল যেদিকে 'আঠাকাঠি' পাতা সেদিকের ধানগাছগুলো নড়ছে কী না। কাটা ধানের 'পাহী'তে কত রকম তো পাখি আসে— কাগা-বগা-গুয়েবনি-চটা-ক্যারকেটা-পাঁড়কা— ধানের কতরকম পোকা খেতে।

খড়গপুর বাসস্ট্যাণ্ডে সেই 'শেডের' নিচে থাপ্সা-গাদা হয়ে বসে বাঁশের থেকে আঠা-লাগানো-কাঠিগুলো বের করে ডানহাতের বুড়োআঙুল আর তর্জনী ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে কতবার যে আঠার ধার পরীক্ষা করেছে নাকফুড়রি। প্রতিবারই প্রমাণিত হয়েছে আঠায় যা ধার আছে সে-ধার মোক্ষম ধার।

কিন্তু কেন যে পাখি এসে পাতা-কাঠিতে বসছে না? জীবন্ত 'ঘুরঘুরিয়া পোকা' ধরে তার পেটে সুতো বেঁধে বিছানো আঠা-কাঠিতে বেঁধে রেখেছে নাকফুড়রি। আর সে-পোকা তো এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ফাঁদের নিচে। পোকা খাবার লোভে পাখি উড়ে এসে মউজ করে আঠা-কাঠিতে বসলেই—

নাকফুড়রি ভাবে— ধানের 'পাহী'তে মাগনা এত ধানপোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেসব ছেড়ে কে আর পড়ে মরতে ফাঁদের নিচে রাখা 'ঘুরঘুরিয়া' পোকা খেতে যায়? রাগে-দুঃখে 'পাহী'-

তে পায়ের কাছে এসে-পড়া কাগা-বগা-গুয়েবনি-চটাগুলোকে সে উড়িয়ে দিল হুস্ হুস্ করে।

আর এর মধ্যেই ফাঁদ-পাতা জায়গার ধানগাছগুলো নড়ে উঠল হিল হিল করে। প্রথমটায় ধীরে ধীরে তারপর প্রচণ্ড জোরে জোরে। সাধারণ বাতাস কী 'বিঁড়োল-বাও' অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের কাঁপন তো এ নয়— নিশ্চয় ফাঁদে পাখি পড়েছে!

হাতের দা ফেলে দৌড়ুল নাকফুড়রি। নীলুয়া-সুরুয়া-লাইবুকা শুধু তো না— গোটা দলটাই ধানকাটা থামিয়ে দাঁড়িয়েছে খাড়া হয়ে। শিকার, শিকার। দলের ছেলে শিকার ধরেছে— কম কথা তো না!

গিরিহা অদ্বৈতও আলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে সে বেজার-বিরক্ত হলেও তারও তো কৌতহল— দেখি দেখি— কী পাখি ধরা পড়েছে?

কাঁথির হিজলী, ভগবানপুর থানার মাগুড়িয়া গ্রামেও ক'ঘর শবর আছে। অদ্বৈত পৈড়্যা দেখেছে— তারাও মাঠে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে পাখি ধরে। তবে তাদের পাখি-ধরার কায়দা-কৌশল তো আলাদা! একটার পর একটা মোট সাতটা 'বাঁশরলা' জুড়ে 'সাতনলা' বানিয়ে নলের মুখে লোহার শিক লাগিয়ে উঁচু ডালে বসা ঘুমন্ত পাখিকে শিকেয় 'গুঁথে' অথবা অশথ আর মনসাগাছের রস সর্ষের তেলে ফুটিয়ে আঠা বানিয়ে সেই আঠা নলের মাথায় লাগিয়ে—

কাই কী পাখ ধরচু, দেখি?

আঠাকাঠির আঠায় লটকে যাওয়া পাখির ডানা বুক-পেটের পালক ছাড়াতে ছাড়াতে নাকফুড়রি বলল, ক্যারকেটা!

সে আবার কী পাখ?

ক্যারকেটাও চেনে না— গিরিহার এ-হেন অজ্ঞতায় গোটা দলটাই হাসল, বেশ জোরে জোরে হাসল বিশেষ করে লোধাবউড়িঝিউড়িরা।

অত্যধিক আগ্রহে কিছুটা এগিয়ে গেল অদ্বৈত, অত্যধিক আনন্দে পাখি-হাতে কিছুটা এগিয়ে এল নাকফুড়রিও। আঠা-কাঠি ফের যথাস্থানে পেতে বাখল সে। 'ঘুরঘুবিয়া পোকা'— যেমনকার পোকা তো তেমনই আছে, ছুঁতেও পারেনি পাখিটা।

অ দোয়েলা।

দেখেই চিনল অদ্বৈত।

বলল, ছাড়ি দে।

ছেড়ে দেব? বলে কী লোকটা? এখন ছেড়ে দিলেও সে কী আর উড়তে পারবে? তার ডানার পালক তো আঠায় লটকে উপড়ে গিয়ে 'খেঁড়রোবুচির' দশা হয়েছে!

নাকফুড়রি বলল, নাই গিরিহা, এত কষ্টে 'লট্কাইছি'— ছাড়ব নাই।

খড় দিয়ে পাখির পাদুটো বেঁধে নিজের 'পাহীতে' পায়ের কাছেই ফেলে রাখল সে।

'গিরিহা'র স্বপনভাতুয়া গিরিহার বাড়ি গিয়ে আঁকড়াদড়ি-বাঁউক নিয়ে এসে দিয়ে ফের বাড়ি চলেও গেল—তবু নীলেশ্বর 'বলি-বলি' করেও একটা কিছু বলল না।

শুধু মনে মনে বলল—এত কিছু করেও কেমন পার পেয়ে যাচ্ছে স্বপন! ধরা পড়েও পড়ছে না। সেদিন সেই রাতেই ধরা যখন পড়ল— ধরে-বেঁধে তখনই বেশটি করে মেরে হাতের সুখ মিটিয়ে নিলেই হত।

তা নয়— হাত ধরল তো ধরল স্বপনভাতুয়ার হাত না, চাঁদবদনীর হাত। কী ইচ্ছা করেই সুযোগ বুঝে বদনীর চুড়িপরা নরম নরম হাতটা নিজের হাতমুঠোয় চেপে ধরেছিল নীলেশ্বর? সহজে ছাড়ত না— যদি না এসে পড়ত গুরভা?

গুরভা, গুরভা। মুখিয়া-মাতব্বর হয়ে অমন 'ম্যাদা-মারা' হলে চলে? দলের মেয়ে অতবড়

অপরাধ করল চোখের সামনে— চোখ বড় বড় করে তাই দেখেও তাকে কিছু বলল না পর্যন্ত মাতব্বর? পড়ত যদি মা-মনসার ভিকা ভক্তার হাতে? নীলুয়া ভাবে— সে তো নিজের কানেই শুনে এসেছে রাজুদের ছেলেটার সঙ্গে লোধাদের মেয়েটা লট-ঘট বাধিয়ে কী শাস্তিটাই না এখনও ভোগ করে আসছে তার গুষ্টিসুদ্ধ সেই মেয়েটা।

এর চেয়েও ঢের ঢের ভালো ছিল রাইবু। কে জানে কার পাল্লায় ফাঁদে পড়ে কোথায় কোন্ লক-আপে এতদিনে হাজত ভোগ করে পচে মরছে বেচারা। শিকলি-বাঁধা ইল্লিকে ধানক্ষেতে চরে খেতে ছেড়ে দিল নীলুয়া।

কাগা-বগা-গুয়েবনি-চটা-ক্যারকেটাও পোকা খেতে নেমে পড়েছে ধানক্ষেতে। কাগা-বনিতে ভাব নেই— এ-ওর পিছনে ঠুকরে দেয়। এ-ওকে পেট ভাসিয়ে তাড়া করে। 'একটুক' শালিক পাখিকেও কাকের ডর বেশি। কাটা-পাহীতে আগে আগে বনি-চটারা। পিছনে কাগা-বগা—তাও দু'পায়ে লাফিয়ে একটু এগিয়ে, ফের পিছিয়ে। ভয়ে ভয়ে।

'হলদা-বৃষ্টি' আজ আর নেই। হলদা-রোদ ধুলমাদুল পড়ে আছে বামনদার পুবের বিল দক্ষিণের বিল উত্তরের বিলে। যেখানে আই-আর-ছত্রিশ শঙ্কর জয়া-রত্না-সব নম্বরী-নম্বরী ধান। উড়ি হোড়ো-বাদ কলমা-ভুন্ডি কলমা-দুবরাজ-জটা-সুরজমণি-ঝিঙাশাল-মুগহিশালও কী নেই?

না, নেই। সে সব সাবেকী ধান এখন আর নেই। যাও বা দু-দশ বিঘা করা হয়— সে করা হবে আমনে। এই তো আর কদিন বাদে 'অম্বুবাচী' পড়লেই সে সব ধান রোয়া হবে। রেললাইনের এ-ধার ও-ধার সরশঙ্কার চারধার—চড়কাপাড়া-জেনকাপুর-শালপুর-কড়িয়া-বামনদা—রাউতারাপুর-বড়া— মালযমুনা-কালিদহ-তররুই-ঘরাঘাই-পুন্দড়া-মনোহরপুর-কুস্থড়া-আঙ্গুয়া- সোনাকনিয়া-সোলপাট্টা-বিরুয়াঁ-হরিপুরা-চাউলিয়া-সরাইবাজার-ভবানীপুর-বড়বাঘড়া-নৈকুলবেঁচা— কে না কাদা-জলে মেতে উঠবে?

ধান কাটতে কাটতে হাতের দা ফেলে ফের একবার আলের উপর উঠে বসল গুরভা। এবার বসল যে সহজে উঠল না। গিরিহা নেই— কেউ তাকে নিষেধও করল না। খানিক বাদে হাতের দা ফেলে গুরভার বউও উঠে গেল গুরভার কাছে।

নির্ঘাত একটা কিছু 'উপসর্গ' ভর করেছে গুরভার দেহে। এই অঝোরঝর বিলে যে-ভাবে বাও-বিঁড়োল ঘুর-ঘুরনী হাওয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাটবন্দন-মাঠবন্দন করা না থাকলে 'উপসর্গের' হাওয়া তো লাগবেই।

গুরভার বউ ভেবে রাখল— সাঁঝবেলায় কাউকে দিয়ে 'ঝাড়াতে' হবে। নিজেদের ভিতর আর কেই বা আছে— একটু-আধটু নুন-পোড়া জল-পোড়া— সে তো দিতে জানে একমাত্র গুড়কুঁদা। গিরিহার ভাতুয়াকে ধরলে সে হয়তো দিলেও দিতে পারে তল্লাটের নাম-করা গুণিন-দেয়াসীর দিশা।

যা বদনী, রান্ধাবাড়া কর!

গুরভাই বলল।

চাঁদবদনী আগেরদিনের মতোই ঘাড় নাড়ল, একটু জোরে জোরেই। না সে যাবে না। তার রাগ এখনও পড়েনি। বলতে কী ভুলেই গিয়েছিল সে। কিন্তু আজ আবার নীলুয়াকে কাজে আসতে দেখে রাগ তার বাড়ল বৈ কমল না। নীলুয়াকে রাগ তো দেখাতেই হবে চাঁদবদনীকে।

এগো, দেখছি মিনার রাগ যে এখনও পড়ে নাই! তবে ভুটকী-পুনোই দুজনার একজনা যাক।

গুরভার পাশে বসে গুরভার বউ বলল।

গুরভা নাকচ করে দিল এক কথায়— ধুত্ উসব চ্যাঙনা-ম্যাঙনার কাজ কী? যেতে হয় ত আজ যাক শতুরার বহুটা।

অ, লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা—

গুরভার বউ ভাবল— কেন, গুরভা নিজের ইস্তিবির নাম করল না কেন? নাম করলেই তো কালকের মতো আজও সে হাসতে হাসতে চলে যেত। গিরিহানী কাল তাকে দিয়েছে একখান শাড়ি, আজ সে পেত আর একখান। আরেকটা কথা— তবে অসুস্থ গুরভাও যেতে পারত তার সঙ্গে। তার আর অসুস্থ শরীরে কাজ করে লাভ নাই।

এগো, আমি যাই?

নাই।

কেন্নে নাই?

হরির লুট কী বোঝা বোঝা? কাল ত গেল্হে?

আজও যাব।

নাই, আজ যাক লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা।

লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা, লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা। —তার সঙে ফের তুম্হাব কী? হেঁ? বলেই ভুলে গিয়ে পা তুলে পায়ের 'আঙট' দেখে গুরভার বউ।

কী মনে করে ফের নিজেই ডাক দেয় শতুরার 'বহু'-কে—

এই যে গ' নিয়তি না ফিয়তি— "সিঁদুরের বুঁদি, পরের রানী গ"— যাও, রান্ধাবাড়া কর-অ। আজ তুম্হার পালা। মিনা ত যাবেক নাই।

ডাক শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে এল নিয়তি। আজ তার পালা, আজ সে 'বনভুজনীর' রাঁধাবাড়া করবে। আজ সে এতগুলো লোকের এতবড় 'বীরহো-গুষ্টির' ঘরকন্না-রান্নাবান্না সে একা-হাতেই সেরে ফেলবে।

পরিবর্তে সে গিরিহানীর হাত থেকে চক্রাবক্রা রঙচঙা একটা শাড়ি পাবে। 'লইতন' না, 'পুন্না'। হোক পুরাতন তবু তো দামী। ঐ তো পরে আছে চাঁদবদনী, এই তো পরে আছে গুরভার বউ!

গিরিহানীর সঙ্গে চাঁদবদনীর, গুরভার বউয়ের ভাব-ভালোবাসা হয়েছে। আজ তার সঙ্গেও হবে। শুনেছে বউটা আল্লাদী ভারি— উড়িয়া গীত গেয়ে কত কী বলে!

গুরভার বউ, চাঁদবদনী তেমন উড়িয়া বুঝতে পারে না। কিন্তু সে—লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা— উড়িয়া তো বলতেও পারে। ললিতা-শবরের সেই গীত— "ব্রাহ্মণ বোইলে তুম্ভে জাতিতে শবর। কেমন্তে হইবি বিভা— দুহিতা তুম্ভর।।" সব তার মুখস্থ।

চাঁড়-চাঁড় যা গো ফুলেশ্বরের মা, দমে ভোক পাচ্ছে।

ধান-কাটা থামিয়ে আদরী-রুদনীরাও নিয়তিকে 'বলতে হয়' বলল। ভোখ লাগুক চাই না লাগুক জরপ করেই বলল— শতুরার বউ তাড়াতাড়ি গিয়ে হাঁড়ি চড়াক, তাদের খিদে পেয়েছে নিদারুণ।

আসলে তারা দুজনেই মনে মনে ভাবছিল— আজ হল শতুরার বউ নিয়তির পালা, পালা যে এল সে তো চাঁদবদনী গেল না বলে। কাল যদি রাগ ভেঙে যায় চাঁদবদনীর, কাল যদি যেতে রাজি হয়ে যায় সে— তবে তাদের পালা আর আসবে কবে? এ-জম্মে না।

এ জম্মে না, এ-জম্মে না।

চাঁদবদনী-গুরভানী একজোড়া দামী শাড়ি পেয়েছে, আজ পাবে নিয়তি। আর তারা পাবে

কাল-পরশু-তরশুও না। যে-কাপড় পরে আর সঙ্গে নিয়ে এসেছে নামাল খাটতে তাই নিয়েই তারা দোরখুলি ফিরবে।

তাদের শুনিয়ে দিল নিয়তি— অত 'ভোক ভোক' কর-অ নাই, এগো এই ত যাচ্ছি।

বলেই ছলর-বলর হাঁটতে লাগল 'সিঁদুরের বুঁদি পরের রানী'।

বামনদার রাস্তায় গিরিহার বাড়ি যেতে গিয়ে নিয়তির সঙ্গে সেই 'সীতা-সীতা'-বলা দাড়িঅলা সাধুলোকটার দেখা— বইখাতা হাতে নিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে যাচ্ছে।

ভুবন মোহান্তি।

শতুরার বউকে দেখেও দেখল না। শতুরার বউয়ের কিন্তু দেখেই মনে হল— সাক্ষাৎ বাল্মিক মুনি 'তপুবনের'। আর সে 'সীতা'— কী যেন "পঞ্চবটীরে সীতা অযোধ্যারে রাম হুঅন্তে রাজন বিধাতা হেলা ভিখারি—"

সেদিন 'চিড়িয়া-চিড়িয়ানী' যাত্রা দেখতে গিয়েও ঐ 'সাধু-সাধু' লোকটার সঙ্গে দেখা— ভারি ব্যস্ত! সেদিনও ফিরে তাকায়নি।

তবে লোকটার হাতের তুক-গুণ আছে— কেমন 'বেটাছ্যনা'গুলোকে 'পাউড়ার' মাখিয়ে শাড়ি-চুড়ি পরিয়ে অবিকল 'মেইয়াছ্যনা' বানিয়ে তুলেছিল সেদিন সে দেখবার মত! বুকের 'উঁচা-ঢিপা'গুলো যে আসল না নকল মেয়ে-মানুষ হয়েও ধরতে পারেনি নিয়তি! ঐ লোকটাই তো তার মুখের মিল দেখে তাকেও 'সীতা' কারে নামাতে চেয়েছিল যাত্রায়? —কী যেন, কী যেন— "ঝর ঝর হোই বহে নয়নরু নীর—"

পাশ দিয়ে সাঁক্ করে একটা বাইক বামনদার মোরাম রাস্তায় ছুটে যেতেই দৌড়তে শুরু করল নিয়তি। তার যেন আচমকা মনে হ'ল— দোরখুলির জঙ্গল রাস্তায় পুলিশের জীপগাড়িটাই—

গিরিহার বাড়ির দিশাটাই হারিয়ে ফেলল নিয়তি। এই তো বিল থেকে উঠে কিছুদূর হেঁটে বাঁদিকে আরো কিছুটা গিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে আদ্ধেক পাকা আদ্ধেক টিন—

এগো, তবে কী পার হঞে আইলম গিরিহার ঘর-মোকাম?

আপ্‌সে-ঝাঁপ্‌সে একশা হয়ে ঘেমে নেয়ে উঠল নিয়তি। এই কী না সে লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা? তপোবন জঙ্গল মহালে ভালুকঝোড় লোধাঝোড় খেড়িয়াঝোড়ের আলকুসি-মালকুসি কিরকিচ্-মিরকিচ্ কাঁটার ভিতর দিয়েও যে কীনা কোন্ মুলুক থেকে কোন মুলুকে চলে গিয়েও দিশা করে করে ঠিক ফিরে আসে ঘরে— সে কী না বিল থেকে এইটুকু আসতে গিয়ে হারিয়ে ফেলল দিশা? গুলিয়ে ফেলল রাস্তা?

কত লোক তো যাচ্ছে-আসছে। একে ধরে তাকে ধরে 'জিগাস' করে নিলেই হয়— গিরিহার ঘর কোথায়? মনে মনে দু-চারবার জিজ্ঞাসাও করল একে-তাকে—

এগো লোকটা, গিরিহার ঘর কোনটা?

কোন্ গিরিহা? কী নাম?

তাই তো, কী-নাম, নামটাই তো ভজঅ-কটঅ— মনেও থাকে না। আচ্ছা, আদিত্য? লাদনগাড়িয়ার একজনার নামে নাম?

উঁহু, ঐ নামে এই গ্রামে কেউ থাকে না।

তবে নিত্য?

উঁ-হু উঁ-হু, মিলছে না। ঐ নামেও বামন্দায় কেউ থাকে না।

আর দৈত্য?

ধুউস! দৈত্য-দানো ওসব তো রাক্ষসপুরীতেই থাকে।

ঈস্, পেটে আসছে তো মুখে আসছে না!

শতুরার বউ নিয়তি কিছুটা বিলের দিকেই পিছিয়ে এল। কী লজ্জা! এইটুকু আসতেই সে রাস্তা গুলিয়ে ফেলল! লোকেরা শুনলে কী বলবে? ঐটুকু মেয়ে যার গাল টিপলে এখনও দুধ বেরোয় সেই চাঁদবদনীও দিনের ভিতর কতবার যাচ্ছে-আসছে! কেন গুরভার বউও তো গেল-এল।

পিছিয়ে এসেই রাস্তাটা পেয়ে গেল নিয়তি। ঐ তো 'লেদা' নিমগাছটা যার গায়ে একটা টিনের পাত মোড়া, সেই টিনের পাতটায় 'লিখা-পড়া'র কাজ আছে— ঐটাই দিশা। গাছটাকে বাঁয়ে রেখে কিছুদূর গেলেই বাড়িটা।

কাই গো গিরিহানী, সিদা দেও।

এই রকমই বলতে হয়। নিয়তিও বলল।

বৈকাল বেলা। রাঙা রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। অদূরে মেসিনঘরে ডুব্ ডুব্ করে ধানকুটা মেসিন চলছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বারান্দায় হুটোপুটি করছে। পুবের সূর্য গিয়েছে পশ্চিমে। বাড়ির দ্বিতল ছায়ায় উঠোনের অনেকটাই ঢেকে ফেলে মেঝের তাপ শুষে নিচ্ছে।

স্নান সেরে সেজেগুজে 'গিরিহানী' বসে আছে বারান্দায়। তার কাছেই বসে আছে এক প্রতিবেশী বুড়ি পা ছড়িয়ে। পানের ডাবরে হাত ভরে গুয়া-পান সাজার উদ্যোগ করছে সে— আর এসময়ই ফ্রক-জামা পরা সাত-আট বছরের ঝাঁপুড়-ঝাঁপুড় চুলের ধুমসী এক মেয়ে, সে তার কোলের উপর বসে পড়ল। বসেই প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে থাকল নিয়তির দিকে

একবার সে-বুড়ি মেয়েটার গালে ঠোনা মেরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে, একবার সে-বুড়ি বাইরের উঠোনের ছায়ায় বসা শতুরালোধার বউ নিয়তিলোধানীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছড়া কাটল—

তেঁতুল গাছে বাঁসা, বউ ভাঙছে কাঁসা।
সে-বউ কাঁই? — জল আনতে যাইছে।।
সে-জল কাঁই? — সাপ ছুঁই দিইছে।
সে-সাপ কাঁই? — বনকে পলাইছে।।
সে-বন কাঁই? — লোধা কাটি লিইছে।
সে-লোধা কাঁই? — কাপড় কাচতে যাইছে।।
সে-কাপড় কাঁই? — রাজা পিঁধি যাইছে।
সে-রাজা কাঁই? — পাখি মারতে যাইছে।।
সে-পাখি কাঁই? — গগনে গগনে উড়িছে....

ঐ 'লোধা' শুনেই নিয়তিলোধানী রাগে গজ গজ করে বিড়বিড় করছে, এগো এ কী ধরনের লোধাদের ঠেস মেরে বলা? একটু জোরে জোরেই বলল, আ গো না, সে-বন কাঁই? লোধা কাটি লিইছে— এস্তে সহজ শোলক না বুড়িমাউসী। বন লোধামেনে কাটি নিছে ঠিক কথা না— বন কাটি নিছে চোরে। হঁ হঁ চোরে।

আস্তে আস্তে বললেও গিরিহানী শুনতে পেয়েছিল ঠিকই। সে লোধানীকে বলল, তুই কেনে রাগি যাউচু? তোতে কী আর কহুচি, সিলোকে আছে যেত্তি।

বলেই গিরিহানী ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। খানিক বাদে লাল রঙের একটা পুরাতন শাড়ি-হাতে বেরিয়ে এল। শাড়িটা নিয়তির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, অউ নে, পোখরি পানিরে গাধোই শাড়ি পিন্ধি আয়।

হাসতে হাসতে শুনিয়ে দিল সেই এককথা— শাস্ত্ররে অছি "স্নান সারি আসি ধোইবু হান্ডি। রন্ধাবঢ়া পাঁই যতনে পানি আনিবু ছানি—"

শাড়ি পেয়ে মহানন্দে পোখরি-আড়ায় ধানের 'শুঙ'-ফোটা গা ধুতে চলে গেল নিয়তি— তাহলে চাঁদবদনী-গুরভানীর মতো তাকেও একটা শাড়ি দিল গিরিহানী? শাড়িটা এ-কাঁধে একবার সে-কাঁধে একবার ফেলে দেখতে দেখতে সে জলকে চলল।

ধানকাটনীটা যেতেই প্রতিবেশী বুড়িটা পান চিবোতে চিবোতে নীলিমাকে বলল, ঝিঅ, এতে দামী শাড়িটা দান করি দিলু? তোর হাত খুব লম্বা অছি মা। শুন, শাস্ত্রর অছি—"আয় বুঝি ব্যয় করিবু বিলাসিনী বালা ন হেবু।"

নীলিমা বলল, সে তো ঠিক কথা কাকিমা। কিন্তু ছেঁড়া শাড়ি পরে ধাঙড়ী-ধাঙড়ী ধানকাটনীরা মেসিনঘরের লোকগুলোর সামনে ঘুরছে-ফিরছে আমার কেমন যেন লজ্জা হয়।

ঠিক কহুছি রে মা। শাস্ত্রর অছি— "দান পুণ্য কিছি দেবু লো ধন খরচ করি।" অদ্বৈত পুআটাও ত ঘর-বাহার করুছি সবুসময়, তা ছামুরে পড়িনে—

তাহলে বলুন কাকিমা।

কোল থেকে নামিয়ে নাতনীকে উঠোনে অন্যান্যদের সঙ্গে 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' খেলার ইন্ধন জুগিয়ে নীলিমার প্রতিবেশী বুড়ি কাকিমা ফের পানের ডাবরে হাত রেখে বলল, কাঁই পান বনি খাবা, দুইটা পাঁচটা কথা কইবা— তা না কেনি আসি থুপ্ করি বসি পড়লা। খ্যাল্ যা!

নাতনীকে উঠোনে পাঠিয়ে পান খাওয়া আর দু-পাঁচটা কথা বলার সময়টা আরেকটু লম্বা করে নিল নীলিমার বুড়ি কাকিমা।

বিল থেকে ঘরে এসেছিল অদ্বৈত। শুধু বিল নিয়ে পড়ে থাকলে কী আর চলবে— ঘরের কাজ তো দেখতে হবে। তবে নামালিয়ার দলটা নতুন, এখনও ঘাঁত-ঘোঁত চেনে না— তাদের পিছনে লোক না থাকলেও চলবে না।

মেসিন-ঘরে ঢুকেছিল অদ্বৈত। মেসিনের কটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে আজই— কর্মচারীরা জানিয়ে দিল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে স্বপনভাতুয়াকে অর্ডার দিল খাকুড়দায় গিয়ে মেসিন-পার্টসের দোকান থেকে সেসব জিনিস এক্ষুণি কিনে আনতে। নগদ টাকা তো লাগছে না— দোকানী রাধাগোবিন্দ জানা খাতায় টুকে রাখবে।

গিরিহার ঘরের বাইরে কোথাও যেতে পারলে স্বপন যেন বর্তে যায়। খাকুড়দা তো যাবেই, সেই সঙ্গে যাবে তুরকাও। মদন পেড়ীর 'পেট্রোলিয়াম এজেন্সী' থেকে ক লিটার ডিজেলও আনবে।

আজ হাটবার নয়। হাটবার হাটবার ফুলে ফেঁপে ওঠে খাকুড়দা। কাঁথি-রামনগর-দীঘা থেকে যে কতরকম শুকামাছ আসে! হাটবার হলে গিরিহানীও নির্ঘাত 'অর্ডার' দিত শুকামাছ আনার আর তাহলে শুকার হাটে গন্ধে বিভোর হয়ে শুকামাছ কিনে বেড়াত স্বপনভাতুয়া—

আসলে গিরিহার কাছ থেকে এই কদিন সে একটু দূরে দূরেই থাকতে চায়— কে জানে কখন কে গিরিহার কাছে ফাঁস করে দেবে সেদিনের সেই ঘটনাটা।

গিরিহার সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল স্বপন। যেতে গিয়েই দেখল— কেমন যেন হাঁ হয়ে গেছে অদ্বৈত। পোখরি-আড়ায় গা ধুয়ে তার বউয়েরই শাড়ি পরে লোধানী দাঁড়িয়ে আছে! অদ্বৈত রাগবে না হাসবে!

হেসেই ঠিসারা করে বলল, আগো তুমি কে গো? বড়বউ না সানোবউ?

মাত্রই ক' সেকেণ্ড। পর মুহূর্তেই নিজমূর্তি ধারণ করে বেজার বিরক্ত হয়ে নীলিমাকেই হাঁক পাড়ল— কাঁই গো শুনুচ? মনে মনে বলল— মাঝে মাঝে কী যে করে নীলিমাটা! যথেষ্ট দামী দামী শাড়ি নামালিয়া বেদিয়া-বেদিনীদের অকাতরে বিলোচ্ছে!

মেসিন-ঘর থেকে বেরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরের দিকে যাচ্ছিল অদ্বৈত, কে যেন মেসিন-ঘরের অন্ধকার বারান্দার ওদিক থেকে তাকে ডেকে বলল, বাবু বার্‌হাওঠ? তার মানে-- বাবু, বের হচ্ছো?

অদ্বৈত ঘুরে দেখল— নাকো হাড়ি। পুরাতন পাল্কী বেহেরা, তারচেয়েও পুরাতন পাল্কীটার কাছে দাঁড়িয়ে। পাল্কী তো নয় আদরের ডাক নাম পরীযান।

পরীযান, পরীযান।

অদ্বৈত বলল, হঁ ধানকাটা লাগিছি, বিলকু যাইতে হেব নি? তু কী কহুচু, ক'?

কাই, কিছো না।

তেবে যে—?

বাবু, অমুন অমুন আইলি।

বলেই বোকার মতো হাসতে লাগল নাকো বেহেরা। সে তো এম্নি এম্নি এসেছে। কিন্তু অদ্বৈত জানে— সে কী জন্যে এসেছে। পাল্কীটার উপব মায়া পড়ে আছে তার। একদিন তো ওর কাঁধে চড়েই সোয়ারীটা কোন্ মুলুক থেকে গিয়েছে কোন্ মুলুকে!

ঠিকই তো। এখনও যেন নাকো হাড়ির নাকে এসে লাগছে আতরের ভুরভুর গন্ধ, বর-কনের 'মোড়ের' গন্ধ, দেহের গন্ধ, নতুন কোরা শাড়ি-ধুতির গন্ধ—

অথচ এখন এত অবহেলায় অন্ধকার ঘুপচীতে ধুলায় ময়লায় আরশোলা-টিকটিকি-মাকড়শার জালের ভিতর মুখ-থুবড়ে পড়ে আছে? পৈড়্যাঘরের পরীযান তান্‌জাম!

কাঁধের গামছা দিয়ে আচমকা ঝাড়পোঁছ শুরু করল নাকো বেহেরা।

অদ্বৈত হৈ হৈ করে উঠল, করু কী করু কী নাকো? ছাড়ি দে— ধুলা ঘাঁটি হেব কী?

কে শোনে কার কথা! ততক্ষণে মেসিন ঘরের লোকজনও উঁকি-ঝুঁকি মারছে। তারাও জানে— কেন নাকো হাড়ি সরশঙ্কার ওদিকে করঞ্জি না কুহুড়া থেকে মাঝে মাঝেই অদ্বৈত পৈড়ার বাড়িতে চলে আসে। না এসে পারে না— আসলে সে পৈড়্যাঘরের পবীযানটা কিনতে চায়।

অদ্বৈত পৈড়্যা দিতে চাইলেও দিতে চায় না অদ্বৈতর বউ নীলিমা। কেন না— ঐ পরীযানের ঐ তাঞ্জামের কারুকাজ করা সিংহাসনে বসেই তো 'কুহুরে কুহুরে' কাঁদতে কাঁদতে মুখস্থ করা রোদন বলতে বলতে একদিন এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছিল নীলিমা।

এখনও তার দু-চার লাইন মনে আছে অদ্বৈতর। ধরলে মুখস্থ বলে দিতে পারে সেও—

উঠিলা সুয়ারী বসিব নাহিঁ। মাগো—
ঘুরি চাঁহিলে ত দিশিব নাহিঁ॥,,
গড়িয়া আড়িরে শ্বেত মান্দার।
সাত ভের ঘর হব অন্ধকার॥,,
কপোতী বুলই করঞ্জ ডালে। মাগো—
মু ত ঝুরুথিব রোশাই শালে॥,,
ঝিপি ঝিপি পানি মুহকু ছাটে।,,
পর ঘর কথা পাষাণ ফুটে।।,,

গোপীনাথপুরের 'পরীযান'— হাতের কাজে সেখানকার ছুতারদের খুবই নামডাক। যেমন নামডাক করঙ্গার। সেই বলে না— 'চাষি চিনে ধান, পানুয়া চিনে পান। গয়লা চিনে গাই মহিষ, করঙ্গা চিনে কাঠ।।'

কোরঙ্গা বউড়ি-ঝিউড়িরাও নরুন-হাতে কুদে কুদে খোল-মুরজের মতো ছোট ছোট গুটি বানিয়ে জুড়ে জুড়ে এমন কণ্ঠী বা কাঠমালা তৈরি করে দেয় যা দেখবার মতো। তেমনি ছিল গোপীনাথপুরের মিস্ত্রিরা।

অদ্বৈত পৈড়্যা তো আর পরীযান কিনেনি, কিনেছে তার বাপ দুষ্মন্ত পৈড়্যা। নাকো হাড়ির গামছার ছোঁয়াতেই জ্বল জ্বল করে উঠল সেই সব পুরাতন কাচ— লাল-নীল-হলদে। সেই সব পিতলের কারুকাজ।

পরীযান লেই তু কী করিবু? কাঠবাতা ভাঙি পকাই চুল্‌হা জ্বালাবুনি? কাঠবাতা ভেঙে ফেলে তো উনুন জ্বালাবি?

না না বাবু কী যে কহ!

তেবে কি করিবু?

কিছো না। বলেই পাল্কীটাকে বারবার গড় করল নাকো হাড়ি।

ধমকে উঠল অদ্বৈত—

কী কিছো না?

নাকো হাড়ি বলল, বাবু মু গরীব লুক-অ—'পরীযান' লেই আউ কী করিবি? কহিঠি— তুমর-আমহর বিভাঘরে ভাড়া দবা।

হেসে উঠল অদ্বৈত— যা যা পালা! তোর মা দেখলে তাড়া করবে। যতসব আফুয়া কথা। কেউ আজকাল বিয়ে-সাদিতে পাল্কী চড়ে না— চড়ে তো মারুতি-টাটা সুমো—

বিলের দিকে দ্রুত পায়ে চলে গেল অদ্বৈত।

পোখরি-আড়ায় গিরিহানীর শাড়ি পরে মুহূর্তের জন্যে হলেও গিরিহার বড়বউ কী সানোবউ হয়ে গিয়েছিল নিয়তি। তার আবেশে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। তার মধ্যেই সেও দেখল 'পরীযান'কে।

পরীযান, পরীযান।

পরীযান কী আবার, সোয়ারী। এমন সোয়ারী তো তারা দেখেছে বড়োডাঙার দঁড়পাট মহাজনের ঘরে। গায়ে কাঁকই-কাজললতা-সিঁদুরচুবুড়ির নক্‌সা আঁকা। চারধারে কড়ি দিয়ে মালা গাঁথা।

তারা কত দেখেছে— নুয়াসাইয়ের সিং-বেহারারা কাঁধে সোয়ারী নিয়ে হুম্ হুম্ করে দৌড়ে চলেছে।

এই দেখা গেল মন্মথ কুম্‌হারের কুসুমতলায় তো ঐ দেখা যাচ্ছে পল্লাদ সিংয়ের পাটাঘাটিতে। এত জোরে জোরে বেহারাগুলো পাল্কীকাঁধে দৌড়ুচ্ছে যে 'কনিয়া-বোহু' এই বুঝি উল্টে পড়ে মরবে! মাথায় ঘোমটার উপর দিয়ে বাঁধা খোঁপার তলা দিয়ে টোপরের দড়ি এমনভাবে বাঁধা— পাল্কীর দোলুনিতে নতুন বউয়ের বাঁধা খোঁপাও তালে তালে দুলে উঠছে।

আগে আগে সানাই বাজিয়ে মথো ডোম। ঢোল বাজাচ্ছে মিতিএল। চ্যাচ্চেড়ি সন্তোষিয়া। ভটা ডোম গিনা-তাটিয়া-

সে আর সোয়ারী চাপল কোথায়! শতুরাশবর তো তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল সেই লাদনগাড়িয়া থেকে 'তপুবনের' দোরখুলি।

স্নান সেরে ভাতের হাঁড়ি ধুয়ে উনুন জ্বালিয়ে 'বনভুজনী'র রাঁধাবাড়া করতে বসল নিয়তি। 'সিদা' আনল— বৈতাল-পুঁইখাড়া, চাল-বিরির ডাল। প্রতিদিনেব মতো 'শুকামাছ' গোলআলু তো থাকলই।

নিয়তি মনে মনে ভাবল— পয়সা-ট্যাকা দিক বা না দিক গিরিহা, এই যে একবেলা , 'পখাল' ধরলে দুবেলাই ভাতের সঙ্গে নিয়ম করে আঁশ খুঁটতে দিচ্ছে লোকটা— বনেজঙ্গলে পড়ে থাকলে কী আর এত সব জুটত?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল— 'সাফা-ছাউ' ফুলেশ্বরকে। সঙ্গে থাকলে সেও তো 'হাঁপ্রে' খেত দুমুঠো ফেলে-ছড়িয়ে? কে জানে এতক্ষণে দাদুবুঢ়া নানাবুঢ়ির সঙ্গে "তালকাটি-তালকাটি-খেজুরকাটি" না "উবুর-ডুবুর-পানমোহরি" খেলা খেলছে সে?

ওদিকে 'গিরিহা' বিলে যেতেই শতুরার বউ দেখল— মেসিন-ঘরের লোকজন নাক হাড়ি না কান হাড়ি সেই লোকটাকে নিয়ে রগড় করতে বসে গেল। ঠাট্টা-ঠিসারা চলল। সেদিকেও কান খাড়া রাখল নিয়তি। তাকে যেন শোনাতেই তারা আরো জোরে জোরেই বলল—

নাকো, গটে গীত গাও না?

মোর মনর সুবিস্তা নাই।

নাই কেনে?

বাবুমনে মোকে পরীযান দেয়টে নি।

ন দেই যাবে কাঁই? দিবে।

দেখ্‌লনি— কেমুন ফক্কি মারি চালি গেলা?

বাবুমনে ন দেই ন দও, বিবিমনে দিবে। বিবিকু 'পকড়ও'!

তাই তো বউঠাকুরানীর লম্বা হাত। বউঠাকুরানীকে ধরলে একটা 'সুসার' হয়ে যেত। — এতে দিনকু পরীযান সাজুগুজু করি তার দোরকু চালি যাইতা। নাকো হাড়ি ভাবল— আ গো হঁ গো, এতদিনে পরীযান তার ঘরেই 'বিভা' ছড়াত!

যাহা হউ গটে গাও। একটা গান অন্তত হোক।

ঝালিয়ে নিতে এমন আব্দার নাকো হাড়ি আর পাবে কোথায়? সেও গুন গুন করে 'মুড' আনল— হু হুম্ না, হু হুম্ না—

দাদাবাবু খাবাইছে ভাল গো
হু হুম্ না, হু হুম্ না
মণ্ডা মিঠাই দিইছে বাঁধি গো
হু হুম্ না, হু হুম্ না—

মেসিনঘরের লোকজন আবদার ধরল, উঁ-হু এসব ম'া-মিঠাই খাওয়ার গীত না— আউ টিকে উপর মুহা, আরেকটু উপরের দিকে—

নাকো হাড়ি ভালোই জানে 'বাবুমনে' তারমানে বাবুরা কী গীত শুনতে চায়, সেও তো উঠবে উপরের দিকে ধীরে ধীরে, রসিয়ে রসিয়ে। এবার ধরল— "চালভাজা তিলে খাজা। বর্ষা রাত বউয়ের হাত। হেই আ হোও হৈ আ হো-ও হৈ-ই-ই-হা হো-ও-ও-ও—"

উঁ-হু, আউ টিকে উপর মুহা।

আরো কত উপরে উঠব রে বাবা? হেউ তেবে শুন-অ—

পাল্কী বড় ভারি রে
ধামসা ধামসী পোঁদরে
হু হুম্ না, হু হুম্ না—

শালা বড় ভারি রে
হু হুম্ না, হু হুম্ না—

গান শুনে মেসিনঘরের লোকজন হো-হো করে হেসে উঠল। আগাগোড়াই কান খাড়া রেখেছিল শতুরার বউ নিয়তি। পরপুরুষের সামনে, অচেনা লোকজনের সামনে 'মায়া ঝি' হয়ে হো-হো করে সে হেসে উঠবে কী করে? তবু—

তবু গানের কথা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারল না শতুরার বউ। লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা হয়ে সে তো শাস্তরের কথা জানে— "পর পুরুষকু দেখিন হসি ন কহ কথা। হসি কথা যেবে কহিবু খাই বসিবু মথা।।"

হাসলেই হয়েছে আর কী— পরপুরুষ চেপে বসবে ঘাড়ে। এক্ষেত্রেও তাই হল। তাকে হাসতে দেখে মেসিনঘরের লোকজন তার দিকেই চেয়ে এর-তার ঘাড়ে ঢলে পড়ে হাসতে লাগল।

হাসুক না যতখুশি! নিয়তিলোধানীর মনে কিন্তু অন্য চিন্তা। —আচ্ছা ভালা, পাল্কীবেহারার মুখের গীত কী আর শুনতে পেত না ধামসা-ধামসীরা? নাকি 'হু হুম্ না-হু হুম্ না' করতে করতে কখন কোন্ ফাঁকে ঐ কথাগুলোও বলে নিত পাল্কীবেহারারা?

আগো, ইগো! বেশ করত বলত। ভারি লাগলে, কাঁধ চড়চড় করে উঠলে, কোন্ মুলুক থেকে কাঁহা কাঁহা মুলুকে অত মন ওজন বইতে হলে 'কেতে বেলে গুমগুম কেতে বেলে দুম দুম' তো বলতেই হবে।

নাকো হাড়ি এখনও উঠে যায়নি, সবাইকে হাসিয়ে দিয়ে সে ফের উঠে গেল পরীযানের কাছে। গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে পিতলের ময়লা তুলল। আর এসময়ই ডাক এল গিরিহানীর—

—কাঁইরে মায়াঝি নিয়তি-না-ফিয়তি, টিকে শুনি যা!

ধানবিলে যেতে অদ্বৈত অনেকদূর থেকেই দেখতে পেল— কাজ ফেলে আলের উপর বসে আছে কে দুজন। নিকটে পৌঁছে দেখল— গোবর্দ্ধন আর তার বউ।

মনে মনে বলল— সেই বলে না, বামুন গেলা ঘর তো নাঙল তুলে ধর? হাঁকাড় দিয়ে বলে উঠল, যা যা বসি ন থাই বিঁড়া বাঁধি পকা, গোবর্দ্ধন!

বসে না থেকে বিঁড়া বাঁধতে লেগে গেল গুরভা। নিজের 'পাহী'তে ফিরে গেল গুরভার বউ। এ কেমন কাজের ধরন? সেই তো কোন্ সকাল থেকে বেরিয়ে বিলে জমিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমর বেঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ে ধানকাটা! কাজ কাজ, তা বলে দু-দণ্ড জিরিয়ে নিতেও দেবে না? অসুস্থ মানুষের বেলায়ও না?

এমন এমন যে গুরভার বউ, যে কী না গায়ে ধানের 'সুঙ' বিঁধাতে সেই কোন্ মুলুক থেকে এসে পড়েছে কোন্ মুলুকে, সেই গুরভার বউও ভাবল —এর চাইতে 'পাতর চিয়ার' বিঁধা খেতে বনে যাওয়াও তো ভাল।

কিন্তু 'বলিবলি' করেও বলতে পারল না গুরভার বউ। গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা অমন অমন যে নীলুয়া যে কী না কথায় কথায় বলে "বোহুর আঁচলে মুখ লুকাএ্যে আর থাকব নাই। হামরা এবার কুড়ার-খন্তায় 'ভগলাঁই' দিব ভাই।।" —সেই নীলুয়াও তো চুপ করে আছে থোতনা নিচু করে?

দু-গণ্ডাও বিড়া বাঁধেনি, ফের চোখে আঁধার দেখল গুরভা, তবু মাটিতে পায়ের বুড়োআঙুল টিপে কোনোমতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্ধকার কেটে যেতেই ফের বাঁধতে লাগল বিড়া।

ঘোড়ি ঘোড়ি ঢলি পড়ুছু— হাঁড়িয়া গিলুছু নাকি রে গোবর্দ্ধন?

হেসে রগড় করেই বলল গিরিহা।

এবারে ফোঁস করে উঠল নীলেশ্বর— মদ-হাঁড়িয়ার গল্প না ফেঁদে অসুস্থ লোকটাকে এবার ছুট্টি দে গিরিহা! মনে মনে সে বলল— জানিস তো আমরা গান ফেঁদেছি—

"মদ হাঁয়ড়া শতরু হামদের
আর নাই যাব শুঁড়ির ঘরে।
একেই গলায় সবাই বলব—
মদ-হাঁয়ড়া আর খাব নাই।।"

বিড়া-বাঁধা ছেড়ে সত্যি সত্যি এবার কাজ থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গুরভা। তার হাতগুলো ঝুল-ঝুল করছে—আরেকটু হলেই বুঝি হাত দুটো খসে পড়বে!

নীলুয়ার কথায় টনক নড়ল অদ্বৈতর। আরে তাই তো— লোকটা বুঝি অসুস্থ! মোলায়েম করে ভাং-থাপ দিয়ে বলল, যা যা গোবর্দ্ধন ঘরকু যা—তেবে খালি-হাতে যাবু কেনি, এক বাঁউক বিড়া লেই যা!

তাই করল গুরভা। আঁকড়া-দড়িতে বিড়া বেঁধে বাঁউক-কাঁধে গিরিহার ঘরের দিকে ধুলো ভেঙে হাঁটতে লাগল। এ কাজে তারা যেন একটা ছন্দ পায়। বেশ তো দুলকি-চালে নাচতে নাচতে যাওয়া!

রাত-বিরাত গোঠটাড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে সরুবালি লালধুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া। হাওয়ার টানে ভাসতে ভাসতে যাওয়া।

দু'জনের কাধে তিন-তিন ছ', ছ-ছ বারটা শালবল্লা। এক হাত সামনে, কুড়ুল শুদ্ধু আরেক হাত পিছনে, শালবল্লায় ঠেস মারা।

কাঠ-কাঁধে এভাবেই গোঠটাড়ের মাঠ ভেঙে হাঁটা, যেন তাড়া দেয় কেউ। হেই হাটো হাটো, রাজার বাগান থেকে হাটো!

তাড়া খাওয়া জন্তু, দু'পা গিয়ে বাঁ পা ঠুকে মারে, যেন লাথি খাও। আর যেন আপনার মনে বলে— বন থেকে বেরুল চিতি, চিতি বলে তোর পাতে— ।

পাতে না জঙ্গলবাবুদের মুখে। বলেই আপনার মনে হাসা। ধানের বিড়া-কাঁধে যেন হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছে গুরভা। সেই একটা ঢেউ ধানবিড়ার মাথা থেকে নেমে ডাইনে-বাঁয়ে ছাঁদা-ছন্দে নাচতে নাচতে একবার এদিক একবার সেদিক করতে করতে ঝরে পড়ছে ধানশিষের ডগায়।

মাটিতে পড়ছে না, একটার পর একটা এসে জমা হচ্ছে ধানছড়ার 'টুঙে'। গুরভা অতকিছু দেখতে পাচ্ছে না। সে শুধু দেখছে— একটা ঢেপচু পাখি, ঢেপচু তার মানে ফিঙে পাখি, — সেই বিল থেকে পিছু নিয়েছে তার। কখনো সামনে এসে ফিতার মতো পাক দিয়ে পেট ভাসিয়ে উড়ে যাচ্ছে পিছনে, ফের পিছন থেকে আসছে সামনে।

মলারে মলা!

গুরভাকে উস্তন-খুস্তন করে মারছে পাখিটা। হয়তো বাঁউকে-বাঁধা ধানবিড়ার গাদায় কোনো পোকামাকড় দেখেছে সে। তাই খুঁটে খেতে তার এত আঁকসানি-ঝাঁকসানি, সামনে আসা পিছনে যাওয়া। —দেখব না দেখব না করেও দেখে ফেলছে গুরভা।

চেপচু পাখিই তো? নাকি ফিঙা পাখির কাটা লেজের মতো চোখের সামনে কালো রঙের কাটাকুটি দেখছে সে জ্বরের ঘোরে? কী জ্বর এসেছে তার?

গিরিহার খামারে পৌঁছে কাঁধ থেকে ধানের বিড়া নামিয়ে তার উপরই আছড়ে পড়ল গুরভা। রাঁধতে রাঁধতে দৌড়ে এল নিয়তি—

এগো কী হৈল গো? শরীল জুত নাই ত বিড়াভার আনলে কেনে? আহা গো, আগে ত জান তার পিছ্কে কাম। জল এনে মুখে-মাথায় থাপতে লাগল শতুরার বউ।

মেসিন-ঘর থেকে এসে পড়েছে লোকজন। দোতলা থেকে নেমে এসেছে নীলিমা। একটা তালপাতার 'বিছুনী' এগিয়ে দিয়ে নিয়তিকে বলল, অউ নে, টিকে খরখর বাতাস কর্। ভিড়-করে-আসা লোকজনকে বলল, তুমারমনে সরি যাও! সর-অ ত!

বলামাত্রই লোকজন সরে গেল যে-যার কাজে। আর জল-হাওয়া পেয়ে খানিকবাদেই চোখ খুলে উঠে বসল গুরভা। কোমরে 'লুগা'র কসি খুঁজে সেঁটে বাঁধল আগে। তারপর লজ্জায় বোকার মতো হেসে ফেলে বলল, নাই, হয় নাই কিছু— খালি 'মুড়'টা ঘুরাঁয় গেল একটুক।

কিছুই হয়নি, শুধু তো মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল এতটুকু তার। গিরিহানী চোখ পাকিয়ে গোল করে বলল, সোউ কুহ-অ, মু ত ভাবনু কী না কী—থ্রম্বসিস্—

কী 'সিস্'? শতুরার বউ 'জিগাস্' করতে হয় করল। না হয় 'সিস্-টিস্' জেনে সে কী করবে! সে কী ডাক্তার না ফাক্তার?

অদ্বৈতর বউও তেমন, বলল, ধানশিষ। শুনিচু?

লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা ঘাড় নাড়ল— হবে হয়ত! শহর-বাজারে কতরকম রোগ, কতরকম নাম!

খানিকটা 'টেনক' হয়ে উঠে গিয়ে পোখরি-আড়ায় বসল গুরভা। ঢেপচু না ফেপচু— সেই পাখিটা কিন্তু তাকে এখনও ছাড়ে নাই। ঐ তো লেজ নাচাতে নাচাতে উড়ে গেল ওদিকটায়। নিম-সাঁসড়া-খিরিস গাছগুলোকে বেড় দিয়ে ফের উড়ে এল এদিকটায়।

নেমে গেল গিরিহার খলা-খামারে, উঠল উপর-টুলটুলি, টাঙ্গির মতো বাঁকা লেজ দোলাতে দোলাতে উপরে আরো উপরে। ভুচুঙ করে আচমকা নেমে এল নিচে।

বেলাও ডুবে গেল। ছায়াচ্ছন্ন আলো-আঁধারিতে পোখরি-আড়ায় চামচিকার মতো সে উড়তে লাগল এ-গাছ থেকে সে-গাছ। কখনও গাছ ছাড়িয়ে গাছের মাথার উপরে। কোথাও বসছে না, শুধুই উড়ছে।

উড়ছে, উড়ছে।

আর এসময়ই সেই পাখিটা ডেকে উঠল। ডাকছে, ঐ যে ঐ— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

চনমন করে জেগে উঠল গুরভা— এখানে এ 'পাখ' কোত্থেকে এল? এ তো 'তপুবনের পাখ', এ-পাখের কথাই তো রাইবু এত করে বলে!

তবে কী ঢেপচুটাই অমন করে ডাকছে? উঁ-হু, তার ডাক তো ভিন্ন। সে তো ডাকে অন্যরকম, এই যেমন— থেকে থেকে ভু-ই-চু-ঙ! ভু-ই-চু-ঙ!! মাঠে-ঘাটে পড়িয়া-পাড়িয়ায় এরকম কত ডাকই তো শুনেছে গুরভা!

তা বলে ঐ ডাক— ঐ যে ঐ আবার ডাকছে— উ-ল-টু-টু! টি-উ-ল-টু-টু! টু-টু-উ-উ-

একজন শুনতে পায় তো আরেকজন পায় না। যে শুনে সে তো শুনে, যে শুনতে পায় না সে শুধু হা-হুতাশ করে— কই কিছু তো শুনছি নাই? উল্টে শোনা-মানুষটাকে "তার মন না মতিভ্রম" বলে দোষারোপ করে।

গুরভা চোখ-কান দুটোই খাড়া রাখল— দেখি ত ভালা এই 'পাখ'টাই সেই কী না? উঁ-হু উঁ-হু উঁ-হু, কিছুতেই মিলছে না। কোথায় এ-'পাখ' তো কোথায় সে-'পাখ'। এ-যদি উড়ে যায় এদিকে তো সে-ডাক গুঁড়ো ঝরাতে ঝরাতে চলে যাচ্ছে ওদিকে।

ঐ তো ঢেপচুটা ভুচুণ্ড করে উড়ে গেল গিরিহার দোতলা বাড়ির টুইয়ের দিকে আর টিড়িং না তিড়লিং চারহা না মনডুরি— কে জানে কি 'পাখ'— সে তো ডেকে ডেকে চলে যাচ্ছে পোখরি-আড়া ছেড়ে সাঁসড়া-নিম-খিরিসের গাছ-গাছড়া পেরিয়ে বিলের দিকে।

বিলের দিকে, বিলের দিকে।

ঐ তো, ঐ তো— উ-ল-টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ টু-টু-উ-উ-উ— গুঁড়ো-ঝরানি ডাক! ফের তো ডাকতে ডাকতে এসে গেল এদিকে। আসছে— টি-উ-ল টু-টু! ঐ এল— উ-ল টু-টু! মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে— ঐ তো— টু-টু-উ-উ-উ—

মাথার উপর দুহাত নাড়তে নাড়তে মাটি থেকে দেড়-দুহাত লাফিয়ে উঠল গুরভা। বিড়বিড় করতে করতে 'বান' মারল— "আসমানেতে যায় বান আসমানেতে ছুটে! অনায়াসে পড়ল বান অমুকের ছাতিতলে।। অমুকের উপর যদি না চড়ে ক্লিং কু কিষ্টের মুন্ডে বাঁ পাখালে। কার আজ্ঞা আসমান তারা লোছমন গুরু ভানমতীর আজ্ঞা।।".....

যতটুকু শিখেছিল এখানে ঝেড়ে দিল গুরভা। কিন্তু কোথায় কী— সেই তো পাখিটা, উঁ-হু পাখি তো নয় পাখির ডাকটা ঘুরে-ফিরেই আসছে— উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! যেমন ডাকটা তেমনি ঢেপচুটা! সেও তো ঘুরে ফিরেই আসছে।

একটা ফাবড়া তুলে এলো-পাতাড়ি ছুঁড়ে মারল গুরভা। ঢেপচু পাখির গায়ে তো না, গাছের ডালাপালায় লেগে শব্দ উঠল 'ঠকাস'!

রান্নাবাড়া করতে করতে এতক্ষণ গুরভার বাউলার তুল্য কিত্তি দেখছিল শতুরার বউ নিয়তি। তার অবশ্য মনে হচ্ছিল জ্বরের ঘোরেই এমনটা করছে লোকটা।

কিন্তু আর থাকতে না পেরে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, হেঁগো— এগো হাড়িয়ার বাপ, কাকে কী ফাবড়াচ্ছিস? কাকে কী ফাবড়া ছুঁড়ে মারছে সে?

গুরভা বলল, শুন ফুলুয়ার মা, ঐ যে—

কী?

ঐ যে ডাকছে, শুন ন!

কিছুই শুনতে পেল না নিয়তি। বলল, কাই ত কিছুই শুনছি নাই?

মলা! ঐ যে ডাকছে— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! এত পষ্ট!

হাসল শতুরার বউ। ভাবল— এখানেও সেই ডাক? সেই মন না 'মতি ভরম'? জ্বরের বেহুঁশে লোকটা বকছে ভুলভাল। আব্দারের গলায় নিয়তি বলল, ডাকছে ডাকুক— সাঁঝ হৈল ঘরকে চল্‌ হাড়িয়ার বাপ!

হাড়িয়া-সুরুয়া-নাকফুড়রির বাপ গুরভালোধা উঠল না। বলল, থাম্‌, আর টুকচার বসি। দেখি ন— পাখটার চিহ্নত্‌ পাই কী নাই! যদি কুনো সুলুক সন্ধান—

হাঁ-হাঁ— ঐ সুলুকসন্ধান। মাত্‌বর রাইবুলোধাও কাঁড়-কাঁড়বাঁশ হাতে নিয়ে ঐ ডাকটার সুলুক-সন্ধান করতে গিয়ে আচানক রাতভিত বাউলার তুল্য কেঁদবুদা-চুরচুবুদা-আঁটারিবুদার লতাপাতা রটপট মাড়িয়ে কোথায় কোথায় না চলে যেত!

গুরভা তো ছোট মাতব্বর। গুরভাকেও মায়ায় ভুলাতে সে-পাখী ছাড়বে কেন? শতুরার বউ নিয়তি গুরভাকে পোখরি-আড়ায় ছেড়ে রেখেই রাঁধাশালে দৌড়ুল। এখনই ঝামর ঝামর ধানভার কাঁধে হাঁ-হাঁ মরদরা এসে পড়েই খেতে চাইবে। তখন? তারবেলা?

পোখরি-আড়ায় বসে থেকে গুরভা দেখল— ঢেপচুটা যদি বা আছে, সেই ডাকটা আর নেই। সে ভাবে— ডাকতে ডাকতে আসেই বা কেন পাখিটা, 'চিহ্নৎ' না দিয়ে যায়ই বা কেন গুঁড়ো-ঝরানি ডাকতে ডাকতে? তপোবনের নিগমা মন্দিরের মতো— যার আগমও নেই নিগমও নেই।

গুরভা অবশ্য এটাও ভাবে— ধুস্! বনের পাখ চরাচরের পাখ বনে আসবে-যাবে চরাচরে ডাকবে-কঁহরাবে-ডানা ভদকাবে তার যেমন খুশি— তার সঙ্গে তাদের কী? লোধা 'জাইতের' কী?

—এই লাবড়া-লবডঙ্কা! বলেই গুরভা মন থেকে পাখির চিন্তা পাখির ডাকের চিন্তা ঝেড়ে ফেলল। সে বরঞ্চ মন দিল গিরিহার পুকুর দেখতে। যে-সে পুকুর তো নয় এ-আড়ায় দাঁড়িয়ে সে-আড়ায় বসা একটা কুচো কুঁড়বককে দেখতে গেলে আরো কুচো দেখায়। আরো ছোটো।

খরার কাল হলেও গিরিহার পুকুরে জল বড়ো কম নয়। এ-কোনে সে-কোনে আড়ার ঝোপঝাড় লাটাপাটা এখনও ছুঁয়ে আছে জলের কানাৎ। হোগলা-হিজল-নিম-খিরিস কতরকম গাছপালা। পোখরি-আড়ায় খাপরি কেটে পেঁয়াজ-রসুন-আদা-হলদির চাষ।

পাড়ের একদিকে পড়ে আছে 'সেনি'। টিনের তৈরি। সেনি টানলে পুকুর থেকে 'ডবকা-ঝিঁটা' জল হদ্ হদ্ করে চলে যায় আনাজক্ষেতে। জ্বর-গায়ে অস্কষ-শরীরে গুরভার মন গেল 'সেনি' টানতে। কোনোদিন তো 'সেনি' ছুঁয়েও দেখেনি— কে আর বলবে 'সেনি' টানতে লোধাদের!

গুরভা আড়ায় বসে উঁকি মেরে দেখল— দু-দুটো তেলে-কাঁকড়া দাঁড়ায় ভর করে জল-আড়ার লাগাও মাটিতে এঁচেড়-বেঁচেড় কেটে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। ঝপ্ করে গুরভা লাফ দিল আর গড়িয়ে গেল জলে। কোথায় কাঁকড়া? অদ্বৈতর পোষা মাছগুলোর সঙ্গে তারাও চলে গেল আড়া থেকে ভিতরে। চাঁদা-সরপুঁটি-দাঁড়িকিনি-ধানাহলু-তুড়-গেঁতিমাছ কী আর, যতসব রাঘব বোয়াল! বুড়বুড়ি কেটে খাই মারছে!

জ্বরগায়ে জলে দাঁড়িয়ে কীরকম ঘোরের ভিতর পড়ে গেল গুরভা। বেলা 'বুঢ়া'র সঙ্গে সঙ্গে জলতল থেকে যেন সেঁ-সেঁ করে ধোঁয়া উঠছে হালকা 'কুহড়ার' মতো। কুহড়া তার মানে কুয়াশা। যেমনটা হত ঠাকুরবাঁধে, তপোবনে সীতানালায়, রামেশ্বরের কুঁড়-পুকুরে, বুড়বুড়িতলায়।

নীলুয়া বলেছে— নাকি এই বামনদার কাছে 'সরশঙ্কা' নামে আড়াইশ একরেরও বেশি একটা পুকুর আছে। ঐ পুকুর-আড়ায় অর্জুনগাছের ডালে বসা ভগবান লোধাদেরই পূর্বপুরুষ জরাশবরেরই কাঁড়ে মারা যায় মকরের দিনে। লোধারাই তাকে দাহ করে। মকরের দিনে এখনও সেখানে মেলা বসে। নীলুয়া বলেছে— একদিন সবাইকে দেখিয়ে আনবে।

কত কাঠায় বিঘা আর কত বিঘায় একর— কিছুই তো জানে না গুরভা। মাঝুডুবকা-সুখজুড়ি-দোরখুলি—তপোবন থেকে নারদা-নিগুই-কমলাসোলের জঙ্গল পর্যন্ত যাদের অবাধ যাতায়াত, যাদের জঙ্গলদারি—তারা আবার কাঠা-বিঘা-একর দাগ-খতিয়ান-পড়চা আলাদা আলাদা জেনে কী করবে?

গুরভা জলে দাঁড়িয়ে মনে মনে পরিমাপ করল— এ-পুকুরটার চাইতেও সে-পুকুরটা কী বড়? বড়, বড়। কিন্তু কত বড়— একূল থেকে সেকূল দেখা যায় না! আরো কত পুকুরের নামই তো এই কদিনে নীলুয়ার মুখে না হোক গিরিহার মুখে গিরিহার ছাতুয়ার মুখেই শুনল গুরভা!

ভীমাপুকুর, বিদ্যাধর, বুড়াবুড়ির দহ, রানীসাগর—

বামনদার অদ্বৈত পৈড়্যার এই 'চাম্ব কুনিয়া পুখর'টি, সেই বলে নাই— "চারকুনিয়া পুখরটি নানা পাখের বাসা রে। উড়ে গেল পংখরাজ পড়ে রইল বাসা হে"—? কাঁকড়া দেখে লোভে পড়ে ধরতে গিয়েছিল গুরভা আর পা পিছলে সে জলে পড়ল।

ঘোরের ভিতর সে বুঝতে পারছে না— সে কী জলে ভাসছে না দাঁড়িয়ে আছে না ডুবে গেছে? সে শুনেছে— ডান-ডাইনীরা কিছুতেই জলে ডুবে না। না ডুবে জলের উপর সোলার মতো হালকা হয়ে ভাসতে থাকে।

ভাসতে থাকে, ভাসতে থাকে।

সে তো এক পারে ডান-ডাইনীরা। আর পারে তুক-গুণ-জানা সাধুবাবারা। তবে কী ডাইন হয়ে গেছে গুরভা? পুকুরের এ-মুড়ো সে-মুড়ো ভাসতে ভাসতে দেখছে— তার আগে আগে পোখরি-আড়ার ধারে ধারে চকচকে কী যেন ভেসে যাচ্ছে? কী যেন?

ধারে ধারে চাক বেঁধে চারাপোনারা জলে বুজকুড়ি কেটে ঘুরে বেড়ায়। উঁ-হু, চারাপোনা তো নয়। গুরভা চোখ বড় বড় করে দেখল— সোনার গাগরা ভেসে যাচ্ছে! হাত বাড়িয়ে জলদি সে ধরতে গেল। অমনি সে-গাগরা হাতছাড়া হয়ে ডুবে গেল।

মরীয়া হয়ে উঠল গুরভা। হাতের থাবড়ায় পুকুরের জল তোলপাড় করে ছাড়ল সে। ধরা দিয়েও অধরা? এই তো ছিল— গেল কোথায়? বোকা লোধার ভাগ্যটাই এমন। না হলে চাষ করবার বলদটাকেই সেগুনপাতায় ফালা ফালা করে কেটে খেয়ে ফেলল?

একটা গুয়া একটা পান দিয়ে 'মানত' করলে পুকুরের জল থেকে থালা-বাসন-বারকোশ তো বারকোশ, সোনার গহনা-টাকার গাগরাও উঠে আসে। বিল থেকে এসে গুড়কুঁদা-শরাবণ শতুরা-নীলুয়ারা ধরাধরি করে আড়ার ধারে জ্বরে বেঁহুশ হয়ে পড়ে থাকা গুরভাকে তুলে এনে শুইয়ে দিল। গুরভার ধূম জ্বর।



সন্ধে তো নেমে গেছে কবে। কিন্তু গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরাদের সন্ধে নামল এই সবে। রাত আসতে এখনও ঢের-ঢের দেরি।

খলায়-খামারে ধান এল। সে-ধান 'পিটা' হল। ঝাড়া হল। ধানঝাড়া বিড়াগুলো 'গাদাই' হল। ঝাড়াধান তুলে দেওয়া হল ডোলে, মরাইয়ে। বেশিরভাগ ঢেলে রাখা হল মেসিনঘরের টানা-লম্বা চাতালে।

তারপরেও তো গিরিহা অদ্বৈত দাঁড়িয়ে থেকে বলল— অউটা কর, সোউটা কর, এধারনু সেধারকু লেই যা, কিছি ধান বস্তায় ভরি প্যাকা, এইঠে ঝাঁটা, সেঠিরে গাদি মার, কাঁই গেলু রে শ্রাবণ, কাঁই গেলু রে শত্রুঘ্ন, কত অজস্র কাঁই কাঁই—

তারপরে তো ছুটি। গা-ধোওয়া খাওয়া-দাওয়া। একটা পর্ব তো শেষ হল। তারপর তাদের মনে পড়ল 'কাঁটা-দুয়ারী' করে ফেলে আসা ঘরের কথা, দোরের কথা, দোরখুলির কথা, তপোবন জঙ্গলমহালের কথা।

এই তো তারা এল সেদিন, তিনদিন কী চারদিন। কিন্তু মনে হচ্ছে— তারা এসেছে কত মাস কত বছর একেকটা দিন যেন একেকটা বছর। ফুরোয় না, ফুরোয় না।

একেকটা দিন ফুরোলেই আরেকটা দিন এসে পড়ে। রাত নেই, আর থাকলেই বা সে কতটুকু! কতটুকুই বা তারা ঘুমোয়! 'সঞ্জা তারা' দেখে ঘুমিয়ে পড়ে 'করট' ঘুরলেই পোহাতারা। ভুরখা ইপিল। ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতেই ভোর হয়ে যায়।

কিন্তু দেশে থাকতে তো অন্যরকম।

অন্যরকম, অন্যরকম।

সেখানে দিনটা ছোট, রাতটা বড়। সকাল সকাল বেরিয়েও পাল্‌হা-পতর ছিঁড়তে, লই-লতা সরিয়ে বনকাল্লা-বনকুন্দড়ী-বনকাঁকড়োর জালি তুলতে, কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-সান্তাল বউড়ি-ঝিউড়িদের সঙ্গে ঝগড়া করে মহুল-কচড়া কুড়োতে, ভালুকঝোড় খেড়িয়াঝোড়ের ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে ঢ্যামনা-গোই-গোধির পিছন পিছন তাড়া করতে, আঁউলা-বাঁউলা চুরকা-পান খামআলুর 'লত্' খুঁজে খুঁজে শাবল-খন্তা দিয়ে 'তাড়তে', ক'গণ্ডা ভেলা-ভুড়রু বেল-বৈঁচি কেঁদ-কষাফলের খোঁজে এ-ডুংরি সে-ডুংরি টঙস টঙস করে ঘুরতে, তপোবনের জঙ্গলে সীতানালার কাল্‌হা পায়রাচঁচরা জলে চাঁদখুড়ি-পুঁটি-দাঁড়িকিনি-চ্যাঙ-গোড়ুই আঁচলে ছেঁকে তুলতে তুলতেই কখন যে বেলা 'বুড়ে' যায়, লাটায়-পাটায় ডাহি-ডুবকায় কখন যে ঘনিয়ে আসে রাত, ছোট হতে হতে কখন যে ফুরিয়ে যায় দিন— লোধাবউড়ি-ঝিউড়িদের হুঁশ থাকে না, কাজের কোনো 'সুসার' হয় না, আঁপশা-ঝাঁপশা করে সেদিনের মতো যে-যার ফিরে আসে ঘরে। অথচ তাদের অলক্ষ্যে তাদের অ-খোঁজে কত যে কাড়হান-কুড়কুড়িয়া-সরুবালি-বড়বালির ছাতু মাটিতে ফুঁড়ে উঠেও মাটিতে মিশে গেল সেইদিনেই, কত যে মহুল-কচড়া কুসুম-কুড়চি গাছের তলায় পড়ে পড়ে 'আলা' হয়ে সেদিনের মতো পচে গিয়ে বাসি হল, কত যে জামড়ু-ঢ্যামনা-গোই-গোধি নির্ভয়ে বুকে ভর দিয়ে বুক ফুলিয়ে হলহল করে সেদিনের মতো ঢুকে গেল গাড়ায়-গর্তে— লোধারা লোধাবউড়িঝিউড়িরা দ্রুত দিন ফুরিয়ে রাত এসে গেল বলে কোনকিছুই করতে পারল না।

লোধাপুরুষরা দিনের বেলা তো ঘুপচিতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। দিনের মর্ম তারা বুঝে না, দিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও নেই। যত কাজ তাদের রাতের বেলা। দিনের আলো ফুরিয়ে গিয়ে আঁধার নামলে, জঙ্গলমহালের সবচেয়ে উঁচু শাল-আসনের ডগায় যেটুকু মরা আলো লটকেছিল— আভা ছড়াচ্ছিল চিক্‌চিকি কাগজের মতো— তাও নিভে গেলে, রাজপথ প্রজাদের পথ তস্য প্রজাদের পথ ভালুকঝোড় খেড়িয়াঝোড় লোধাঝোড় কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়াভূমিজঝোড় গরুবাগাল-কাড়াবাগালঝোড় ঝুপ্ অন্ধকারে আবছা-অস্পষ্ট হয়ে এলে লোধাপুরুষরা ভুচুঙ করে বেরিয়ে যায়, ধান্দায়।

ধান্দায়, ধান্দায়।

কাঁধে বস্তা, হাতে দা-খন্তা। কাঁধে শালবল্লা, তিন-তিন ছ' ছ-ছ বারটা, একহাত সামনে, কুড়ুল শুদ্ধু আরেক হাত পিছনে, শালবল্লায় ঠেস-মারা।

কিন্তু এখানে, এই নামাল-পুবালে, এই বামনদায়? তাদের সারাদিন তো কেটে যায় ধানবিলে। আগে যেখানে ধানের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না এখন সেখানে নড়তে-চড়তে ধানের 'সুঙ' গায়ে বিঁধে।

এখন তারা অনায়াসেই বলতে পারে— 'পাহী' কি? 'হেলা' কি? আঁকড়া-দড়ি? 'ছোট্' কি? আর ঝাঁটা কাটা? ধানপাটা? 'জল-খিঁয়া' কি? বিড়াগাদার মাথাকে কী বলে? ঝাড়া ধান-শিষের টুঙের নাম কি?

গিরিহার মুখে শুনতে শুনতে এতদিনে তারাও জেনে ফেলেছে— গতরকুঁড়ে হল 'আলিসা ধাকুড়ধুমা' আর 'গোধি আঁড়ুলা' তাদের মতোই গরীবগুর্বো।

আড়পাগলী 'মেয়্যা'টা এবার গড়গড় করে কুঁভার-ঘরের বিত্তান্ত শোনাতে এলে, পিঁড়োল-পিট্‌না-আঁথোল-চাক ছেউনি-চকটবাড়ির কথা বড়মুখ করে বলতে এলে লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা নিয়তিও সাবিত্রীকে পটাপট বলতে ছাড়বে না, হেঁ লো, ও লো বল ত— 'জল-

খিঁয়া' কি? 'পাহী' কি? 'এক গড়ে' কি? 'গাবা' কি?

কুঁভারঘরের 'বোহু' হয়ে আড়পাগলী সাবি কী আর বলতে পারবে— 'জল-খিঁয়া' হল জল-খাবার, বাসিয়াম? 'পাহী' ধানকাটবার লাইন? 'এক গড়ে' হল ধানবিড়ার মাথা একদিকে করে রাখা? আর 'গাবা' হল ধানগাদা?

এত সবে 'শিক্ষিত' হয়েও তবু—

তবু সারাদিনমানটা একরকম। সন্ধে হলেই হু হু করে ওঠে মনটা। —কবে ফিরবে তারা? আদৌ ফিরতে পারবে কি? এই তো জ্বরে পড়ল গুরভা। 'টেনক' হয়ে উঠতে কে জানে কতদিন লাগবে তার!

পোখরি-আড়ায় বসে গিরিহার পুকুরের জল দেখে মনে পড়ে যায় বৈকি ঠাকুরবাঁধ, বাঁধগোড়ার কথা।

এই গরমের দিনে লোধাদের গোঁসাঘর ঠাকুরবাঁধেও তেমন জল নেই। জল নেই, জল নেই। রাগ হোক চাড় হোক মান হোক অভিমান হোক, কান্না পায় তো বুক খুলে কাঁদতে, হাসি পায় তো পেটের কাপড় ঢিলে করে হাসতে দোরখুলির লোধাপাড়ার জনমানুষ জঙ্গলে যায় আর নয়ত জোড়াশালতলা ধ-তলা পেরিয়ে এসে পড়ে ঠাকুরবাঁধে।

এমন এমন যে ঠাকুরবাঁধ— তার কথা পুব খাটতে আসা লোধাদের মনে তো পড়বেই পড়বে। খাঁ খাঁ খরায় সেখানে জল হয়ত তেমন নেই। চোত-বৈশাখের এক-দু'পশলা বৃষ্টির ঘোলাজল মাত্র লেগে আছে বাঁধগোড়ায়। কেঁদবুদার কেঁদ চারাগুলো পাল্‌হায়-পতরে ঘোলাজলের লাল ছাপ ছোপ নিয়ে জেগে আছে দূরে দূরে।

সোমবারি নেই। লুকিয়ে-চুরিয়ে বাঁধগোড়ায় গিয়ে "সোমবারি" "সোমবারি" বলে ডাক দিয়ে কথা বলার লোকটাও নেই। সে তো পচছে খুনের দায়ে 'জিহলখানায়'।

রাইবু নেই। রাইবুর বাপ গেঁড়াশবরকে পোড়াতে চলে গেছে ধ'গাছটাও। তবু তো জোড়া শালতলার ওদিকে ঠাকুরবাঁধটা আছে। এই তো কদিন বাদেই বর্ষা নামবে। বর্ষার জল ডাহি-ডুঙোড় ভাসিয়ে নোংরা জব্‌রা নিয়ে 'ঝোপ' হয়ে ঠাকুরবাঁধে নেমে আসবে।

জলে ছিল্‌ ছিল্‌ করে উঠবে ঠাকুরবাঁধ। তখন কোথায় লাগে গিরিহার এই পচাপুকুর! ডুব-সাঁতার দিয়ে এ-পার ও-পার করবে সাধ্য কার? মাঝে মাঝেই হাওয়া লেগে ছলাৎ ছলাৎ করে উঠবে কাতা-ধার।

পোখরি-আড়ায় বসে থেকে কেউ কেউ এখন-এখনই শুনতে পেল— ভরা ঠাকুরবাঁধের আড়ায় লেগে জল ভাঙছে ছলাৎ ছলাৎ। আর তাই শুনেই সে বুক খালি করে হু-হু কেঁদে উঠল।

কাঁদছিস কেনে টুরার বাপ? পেট 'দুখাছে'?

টুরার বাপের মাঝেমধ্যেই পেট ব্যথা করে— তাই জিজ্ঞাসা করা।

টুরার বাপ মাথা নাড়ল— নাই।

তবে কী মাথা দুখাছে?

নাই।

নাই, নাই।

তব্বে যে ফঁ-ফঁ কচ্ছিস? থাম্‌।

'আঁটার লুগা' দিয়ে নাক মুছতে মুছতে টুরার বাপ বলল, টুরাটা—

হ্যাঁ তাই তো, টুরাটাকে তারা তো ছেড়ে এসেছে ঘরে। ঘরে কী আর হোস্টেলে— সে তো বালিগাড়িয়ার বড় ইস্কুলে পাঁচ না ছ' ক্লাসে পড়ে। তার ভাবনা তার বাবা-মাকে ভাবতে হবে কেন— সে তো ভাববে সরকারে!

হঁ সরকার ভাবছে ভাবুক, তা বলে তার জনমদাতা বাপ-মা— সেই কথায় আছে নাই— "ঘরে ছ্য ছাড়ি দি আসা?" পরাণ হাঁক-পাঁক ত করবেই গো। এগো 'নাড়-কাটা' ধন বলে কথা।

নাড়ি-ছেঁড়া সন্তানের সহমর্মিতায় কেউ কেউ বিশেষত টুরার বাপ শরাবণের কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের দিকে ভুল-ভুল চেয়ে থেকে শরাবণ বলল, আমরা আর কব্বে ঘুরেঁ ঘর যাব? যাতে পারব কি? এই ত গুরভা গাড়ায় পড়ল— এখন টেনিক হয়ে উঠতে কে জানে লাগবেক কতদিন!

রাইবুর বিহনে দলের মাতব্বর গুরভাই যখন পড়ে গেছে অসুখে, তখন কে আর তাদের নিয়ে ঘরে ফিরবে? চ্যাঙড়া নীলুয়ার উপর ভরসা কোথায়? এই আছে তো আছে, রাগ চাড় হলে কে জানে কোথায় চলে যাচ্ছে টঙ টঙ করে।

সেদিন-সেরাতে আর ফিরছে না, রাগ ভাঙলে সে ফিরে আসছে তার পরের দিন। তবু তো যাহোক ফিরে আসছে— একদিন রাগচাড় করে বাউলার তুল্য বের হয়ে আর যদি সে না ফিরে? তারপরের দিন, তারও পরের দিন? তবে? তার বেলা?

হলেই হল। তার তো কিছু পিছুটান নেই। বাপ-মা-ভাই-পিসি-পিসা— সবই তো সে রেখে এসেছে ঘরে, দোরখুলিতে।

শরাবণ ভাবল— বোকার মতো কেবল তারাই, টুরাকে বাদ দিলে বাকি তো গোটা সংসারটাই তুলে এনেছে 'নামালে'! গুরভা নেই, নীলুয়া নেই— একা একাই আর কী তারা ফিরতে পারবে ঘরে? দোরখুলিতে? তপোবন-ঠাকুরবাঁধ-মাঝুডুব্‌কায়?

মাঝুডুব্‌কা, মাঝুডুব্‌কা।

কে জানে এতদিনে মাঝুডুব্‌কার সরুবালি-চিকনবালির বাঁশতলায় বাঁশগাছ থেকে কত বাঁশ-খোলই যে খুলে পড়ে বাঁশতল্লা ঢেকে ফেলল! কে যে সেসব কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে— কে জানে!

ঘরে-ফেরার কথায় লোধাবউড়িঝিউড়িদের কারোর কারোর মনে পড়ল বৈকি— দখিণ-সোলের ঝাঁকড়া কচড়াগাছটার কথা। সেখানে কচড়া পেকে এতদিনে মধু ঝরছে। বাদুড়ে-বাঁদরে-টিয়া-মৌটুসিতে সেসব চুষে চুষে ফেলে দিচ্ছে।

আর সান্তাল-কুম্‌হার-কাম্‌হার-মাহাতোদের মাইয়াদের তো পোয়া বারো। চোর-চুরনী লোধামাইয়ারা তো আর নেই। ফাঁকা-টাঁড়, কচড়া কুড়োতে নেমে পড়েছে সুখজুড়ি-রুখনীমারা-মুঢ়াকাটি-বাছুরখোয়াড়-ডাঙাসাহির গোটা দল। আক্‌কুটিদের জ্বালায় আর কী একটা কচড়াও ডাল্‌হায়-পাল্‌হায় পড়ে থাকবে? ঘরে ফিরে চোখের দেখ্‌তা একটাও কী আর দেখতে পাবে তারা?

সীতানাল্যা খালধারে বুড়বুড়িতলায় তাড়কারাক্ষসীর হাড়ের কাছে ঝোপে ঝাড়ে লাটায়-পাটায় ঢেঁকাশাকের লাট লেগে গেছে এতদিনে। শুশনি-স্মরস্তি-নাহাড়ার বন 'হালি' থেকে 'হলদা' হয়ে শুকিয়ে মরেও যাবে একদিন। কাল্লা-কুন্দড়ি-কাঁকড়োর গুপ্ত-আস্তানা লোধারা বৈ আর কেউ জানে না। সেখানটা সাদা-সাদা হলদা-হলদা ফুলে 'আলা' হয়ে থাকবে রাতদিন— লোধারা বৈ আর কেউ জানবে না। ফুল ঝরে গিয়ে মামড়ি শুকিয়ে ফল আসবে, সে-ফলের 'গুঙ' শুকিয়ে অজান্তে ফল পেকে ঝুনোও হয়ে যাবে একদিন। ততদিনেও ফিরতে পারবে কী তারা?

কে জানে কতদিনে মাস, কত মাসে বছর— এই কদিনে সেসব হিসাবও তো গুলিয়ে

গেছে তাদের! যারা এখনও আঁকড়ে পড়ে আছে সেখানে— সেই শিশুবালা, ঢালো, ফুলটুসুয়া, জটা, ছিটকে-ছুটকে আরো দুয়েকজন— যেটুকু ভোগ করার ভোগ করবে তারাই।

কিন্তু বনে-ঝাড়ে লাটায়-পাটায় বনকুন্দড়ি-কাঁকড়ো-কাল্লা খুঁজতে ফুলটুসি কী আর যাবে? তার তো বক্কা আছে, নুকার 'ধরমবাপ'— সেই-ই তো জোগাবে আহার। তাছাড়া লোধাবস্তিতে পাল্‌হা-পতরের কুঁড়িয়াতে এতদিনে তারা কী আর আছে? হয়ত লেখাপড়া জানা মেয়ে নুকুই তাদের নিয়ে গেছে শহর-বাজারে। লোধাবস্তিতে আর তাদের দেখা যাবে না।

দেখা যাবে না, দেখা যাবে না।

হয়ত এতদিনে পরিচর্যার অভাবে লোধাপাড়ার সদর রাস্তার দুধারে ফুলটুসুয়ার নাচদুয়ার থেকে বড়ামথান অব্দি নুকুর নিজহাতে লাগানো বিলাইতী ফুলের চারা থেকে চারিয়ে চারিয়ে বেড়ে-ওঠা গাছগুলো ঘাড়ে-গর্দানে ভরে গেছে 'বন-বুদায়' 'ঝাঁটি-পাল্‌হায়'—

এতদিনে, এতদিনে—

কিন্তু এত যে ভাবছে তারা 'এতদিন' 'এতদিন'— কদিন হল? হল তো মোটে চার-পাঁচদিন! এর মধ্যেই হয়ে গেল এতসব? ঘটে গেল এত কিছু?

তাই তো মনে হয়।

থেকে থেকে নিয়তিরও মনে পড়ে 'সাফা-ছুয়া' ফুলেশ্বরের সঙ্গে ভুগড়ার পিছনের ঢেঙা তালগাছ দুটোকে। সাঁঝ-সকালে দুই 'ঢেঙা-ঢেঙিতে' কত কথাই না বলাবলি করছে!

ঝুরু ঝুরু, ঝুরু ঝুরু! ঝুরু ঝুরু, ঝুরু ঝুরু!!

তাল-চটার বাসা দুলছে হাওয়ায়। তালচটা বুদ্ধি করে একদলা কাঁচা গোবর এনে রেখেছে বাসায়। সঞ্ঝা হলেই বাঘ-যুগ্‌নী পোকা তারমানে জোনাকি ধরে এনে গুঁজে দিয়েছে সেথায়। গোবরে গোঁজা হয়ে মিচিঙ মিচিঙ করে টিপা-লাইটের মতো আলো দিচ্ছে বাঘ-যুগনী পোকা। আলোয় আলোময় হয়ে উঠছে তাল-চটার বাসা।

এত দূর-দেশ থেকেও সে-আলোর 'ফুড়গুনি' যেন স্বচক্ষে দেখতে পেল নিয়তিলোধানী। আর হুর-হুর করে কেঁদে ফেলল।

—এ গো কাঁদ্‌দিস্ কেনে, থাম্ ন মার!

কাঁদবে না? এই তো তালফুল ঝরে গিয়ে তালের কুসি আসবে গাছদুটোয়। ধীরে ধীরে সে কুসি বড় হয়ে শাঁসঅলা তাল হয়ে যাবে এই কদিনেই। দোরখুলিতে যে কজনা আছে— তাদেরই চ্যাঙনা-ম্যাঙনারা কে জানে এতদিনে ঢিলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে-ফুল ঝরিয়ে দিল কী না!

ফুল ঝরে গেলে ফল আসবে কী করে? ফল না এলে দেশে ফিরে তারা পাকা তালই বা পাবে কোত্থেকে? পাকা ফলের আশায় আশায় শতুরার বউ যেন এখান থেকেই মনে মনে "হাট-হুট" করে চ্যাঙনা-ম্যাঙনাদের তাড়াতে লাগল।

কেন যে ঘরে 'কাঁটা-দুয়ারী' করে এসেছে তারা! কেন যে 'দুধের ছাইলা' ফুলেশ্বরকে রেখে এল না ঘরে— সে তো তার দাদুবুঢ়হা-দাদীবুঢ়হির সঙ্গে ঘরে থেকে তালগাছ দুটিকে চোখে চোখে রাখত! সেই বলে নাই— হাতের লাঠি সাথের সাথী?

গুরভার বউ ভাবছে অন্য কথা— আজ জ্বর হয়েছে গুরভার। কাল হয়ত সেরেও যাবে এমন তো 'পেট-দুখা' 'গা-দুখা' কতই তো হয়েছে তার। বৈশাখ-জষ্টি-আষাঢ়-শরাবণ— সব মাসেই কী আর শরীর সমান থাকে? না হাতের পাঁচটা আঙুল একসমান?

তার তো মন্দ লাগছে না। এই যে 'হাটুয়া-বোহুরা' কেমুন সকাল-সাঁঝ সাজুগুজু করে বসে থাকে— এ কী খারাপ না মন্দ? এই যে 'টায়েমে' 'টায়েমে' রান্ধাবাড়া এই যে 'টায়েমে' 'টায়েমে' খাওয়া— এ কী ভাল না মন্দ?

এই যে ধানকাটা কী ধানঝাড়ার ফাঁক-তালে গিরিহা রগড় করছে, ঠাট্টা-ঠিসারা করছে— এ কী খারাপ না মন্দ? এই যে ধানের 'সুঙ' হরদম গায়ে-গতরে বিঁধছে, তো মনে হচ্ছে না মা লক্ষ্মী সোনার গাগরা-কাঁখে পদ্মের উপর এক পা রেখে একটুক হাত 'বাড়াএঞ' ছুঁয়ে দিচ্ছে?

আর ছুঁলেই গা কেমন শিউরে-শিউরে উঠছে। শিউরে উঠার এই যে এত সুখ— এ কী 'ঘর ঘুরেঁ' গেলে আর পাব? ধান কাটতে মহাজনরা যাও বা নিয়ে যাবে ধানবিলে দিনের বেলা, রাত হলে ঐ মহাজনরাই ধানচুরির অপবাদ দিয়ে লোধাপাড়ায় পুলিশ ঢুকিয়ে লোধাবউড়িঝিউড়িদের হাত ধরে টানাটানি করবে, লোধাপুরুষদের হাতে হাত-কড়া পরাবে— কোনটা ভাল? এটা না ওটা?

না হয় একটু খাটতে হচ্ছে বেশি, গিরিহা খাটাচ্ছে— তা বলে বনে-ঝাড়ে লাটায়-পাটায় বনকুন্দড়ি-কাঁকড়ো-কাল্লা ভেলা-ভুড়রু-কেঁদ্-কুসুম তুলতে কী আর কম মেহনত? খাটতে খাটতে পেটের 'দঁক' ফুরিয়ে আসত না? খেতে না পেয়ে পেটের খোল এতক্ষণে গহীরা বাটির মতো খোঁদল হয়ে যেত না?

খাটাচ্ছে কী মাগ্না? পয়সা দিচ্ছে না? তার উপরি গিরিহানীর শাড়িটা সায়াটা— আচ্ছা নীলুয়া বলছিল, এই যে জ্বর হল গুরভার, কাজ করতে না পারলে সে এখন নাকি পয়সাও পাবে না?

আহ্আ পৈসা না দেয় না দিক। খেতে দেবে তো গিরিহা? খেতে দিলেই হবে, 'পেট ভর্নেই আনন্দ'। সে আর তার বেটারা মিলে চারজনে যা কামাবে— ঐ তো ঢের ঐ তো 'আনেক'। আর আরেকটা 'আণ্ডট'? সে তো মাগ্নায় দেবে কামিল্লা।

এখন ভালো হয়ে উঠুক গুরভা। ভালো হলেই ভালো। গুড়কুঁদাকে ডেকে এক্ষুণি 'ঝাড়িয়ে' নেবে গুরভার বউ। গা-বন্ধ করাবে গুরভার— নির্ঘাত হাওয়া-বাতাস লেগেছে তার!

না হলে, গুরভার বউ ভাবছিল, কী করে পোখরি-আড়া থেকে গড়িয়ে একেবারে পুকুরের জলে পড়ে গেল গুরভা! কেউ তাকে আড়া থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল নির্ঘাত? তাও তো শতুরার বউ হাতে ধরে টেনেও ছিল, বলেছিল— এ গো হাড়িয়ার বাপ ঘরকে চ ন।

শোনে নি, তার কথা শুনল না গুরভা। ঐ বলে না গ্রহের ফের— ঐ হাওয়া-বাতাসই ঠেলে ফেলে দিল তাকে।

নাকফুড়রি আঠা-কাঠি পেতে একটা পাখি ধরেছিল আজ— কেরকেটা। বাপকে বলেও ছিল— পাখির মাংস খাওয়াবে তাকে। বিল থেকে ফিরে পালক উপড়ে কেটেকুটে পাখির মাংস তৈরিও করেছিল নাকফুড়রি। শতুরার বউকে বলতেই তেল-নুন-হলুদ দিয়ে রেঁধেও দিয়েছিল বেশটি করে।

খেল নীলুয়া-সুরুয়া-লাইবুকা-হাড়িয়া-নাকফুড়রিরা। গুরভা খেতে পেল না, গুরভা কী খাবে— জ্বর ছাড়ুক আগে। জ্বর-গায়ে ভাত খেলে শরীর আরও ভারি হয়ে যায়। জ্বর-গায়ে ভাত খেলে ফের তো জ্বর এসে যাবে। না না, বরঞ্চ না খেয়ে থাকুক গুরভা। না খেলে রস শুকিয়ে শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে তার।

ভাত না খায় না খাক লোকটা, 'শুখা-পেটে' একটা রাত পড়ে থাক গুরভা— গুরভাকে 'ঝাড়তে' বসল গুড়কুঁদা।

গুড়কুঁদা কী আর তেমন জানে! বড়সোলের গজ্নার মতো? কী কাম্হারপাড়ার বাল্কার মতো? সে তো জানে ঐ খুটুমুটু।

তবু গুরভাকে দেখেই পাকা গুণিনের মতো ভাব করে গুড়কুঁদা বলল, হাওয়া-বাসাতেই। শালার ঐ যে মাঝে মাঝে বিলের মইধ্যে হুর-হুর ফুর-ফুর করে 'বিঁড়োল' আসে— অরাই।

ওরাই, ওরাই।

ঝাড়তে শুরু করল গুড়কুঁদা। হিস্ হিস্ ফিস্ ফিস্ করে কী যে বলছে আর মাঝে মাঝেই 'ফুঃ' করে ফুঁক দিচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে গুরভা। তার মানে কাজ হচ্ছে।

আচমকা উঠে গিয়ে 'খলা' থেকে ফিরে এসে গুরভার নাম ধরে হাঁক দিল গুড়কুঁদা। একবার, দুবার, তিনবার। হুঁ-হাঁ করল গুরভা।

অতঃপর গুরভার কাছে গিয়ে গুরভার মুখের ভিতর কী একটা পুরে দিল সে। গুরভা তৎক্ষণাৎ ছিঃ থুঃ করে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলে তার মুখটা চেপে রাখল গুড়কুঁদা। কানের কাছে মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করল—

কি বট্ঠিস?

গোঁ গোঁ করে কী যেন বলল গুরভা।

কুথায়্যে?

ফের গোঁ গোঁ।

কী শুনতে কী শুনল ঘাড় নেড়ে তো গুঁড়কুঁদা ভরাপেটে চাপড় মেরে বলল, ঠিকেই ধরেছি—উ শালা বিলের 'বিঁড়োল'-ই বঠে।

কী পাইলে খুশি হবি— লাল না কালিয়া?

লাল না কালো মোরগের পূজা চায়— কী বলল গুরভা, আর ভাঙল না গুড়কুঁদা। হাঁকাড় দিয়ে বলে উঠল, সেসব হবে, একখন ত যা।

চালার বাতা ধরে দাঁড়িয়েছিল শত্রুঘ্ন। তাকে মানা করে দিল গুড়কুঁদা— হাত নামা শতুরা! ঝট্ করে হাতটা নামিয়ে রাখল সে।

নির্ঘাৎ বিঁড়োল মাড়িয়েছিল গুরভা। পুকুরের জল এনে তাতে মন্ত্র পড়ে গুরভার চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিল গুড়কুঁদা। বিড় বিড় করল—

> ভূত পুড়ে ভূতিনী পুড়ে ডাইনী পুড়ে যুগনী পুড়ে
> বাও পুড়ে বাসাত পুড়ে
> কার আজ্ঞায়—
> সীতা-ছিরামের আজ্ঞায়

আর কুনো ভয় নাই— বলেও গুড়কুঁদা নিজের চিবুকে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, ইস্ টুকচার বিলাইয়ের গু যদি মিলত! অভাবে কাঁচা বাঁশের ছাল আর গজশিমূলের মূল বেঁটে আগুনের উসুম-উসুম সেঁক দিলে ভূত বাপ-বাপ বলে পালাতে পথ পাবে নাই!

আর জ্বর?

হাত কচলাতে কচলাতে গুড়কুঁদা চালাঘরের এ-মুড়ো সে-মুড়ো হাঁটতে হাঁটতে বিধান দিল— বনকুন্দড়ির শিকড়, ধুদকুলের শিকড় আর শেঁয়াকুলের শিকড় একসঙ্গে বেঁটে যদি বড়ি করে দু-চাট্টা বড়িও গিলাতে পারতাম জ্বর ত জ্বর জ্বরের বাপও—

তবে যে-ঝাড়ান ঝেড়ে দিয়েছে সে, ভূতের সঙ্গে জ্বরও যে বাপ-বাপ বলে ছেড়ে পালাবে সে-বিষয়ে গুড়কুঁদার সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র।

আ-আহা, 'গনতি'তে ত ঐরকমই বলছে।

বলেই পোড়াকাঠের আঙরা দিয়ে আঁকি-বুঁকি কাটতে কাটতে বিড়বিড় করল গুড়কুঁদা—

ভূত-পেরেত-ডাইনী-যুগ্‌নী যে করবে ঘা
তার জ্বলে যাবে গা—

নীলুয়া বলছিল— ডাগতরের ওষুধ খাওয়াতে। ওষুধ না খেলে ঐসব ঝাড়ফুঁকে কিস্‌সু হবে না। —এগো আজকালকার ছঁড়া ওসবের কী বুঝবে? খাওয়া-দাওয়ার শেষে গিরিহা-গিরিহানীর ঘরের দিকে মুখ করে পা ছড়িয়ে বসে মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মনে-মন ভাবছে গুরভার বউ। গুরভা ঘুমোচ্ছে।

গুরভা ঘুমোচ্ছে, গুরভা ঘুমোচ্ছে।

আর কোথাও কোনো অশান্তি নেই, নিশ্চিন্তে, গিরিহার 'খলায়' ধানগাদার ওদিকে চাঁদনী রাতে গুরুবারি-ভুটকী-পুনোইদের নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে চাঁদবদনী। মাঝে মাঝেই এসে ছুঁক ছুঁক করছে লাইবুকারা।

এই তো মওকা। কোনমতে একবার ঢুকে পড়লে, ঢুকতে তারা দিলে, হাতটা লম্বা করতে আর কতক্ষণ। নাগালে এসে যাবে বস্তুটা। ঠিকমতো 'পটাতে' না পারলে ঝট্‌কা মেরে 'বোস-উঠা' বিতাড়ন।

এইসব খুচ্‌খাচ্‌ প্রেম-প্রনয় আশা-নিরাশা কাম-অকাম নিয়েই তো সাঁঝরাতের তারা গোনা, রাতপহুড়ী, কইনী কী হিঁয়ালি বলা। সে দোরখুলির লোধাপাড়ার নাচ-দুয়ার ঘর-আঙনা-ই হোক আর এতদূরের বামনদার অদ্বৈত পৈড়্যার খলা-খামারই হোক— চাঁদবদনীর কাছে কোনো ফারাক নেই।

ফারাক নেই, ফারাক নেই।

সে যেন এখনও বসে আছে দোরখুলির লোধাবস্তিতে। বসে আছে তাদেরই ঘরের খলা-খামারে। খামার তো কত! আঙনা, আঙনা। টিকরোল ভুঁই।

সেখানে খেজুরপাতার 'পাটিয়া' বিছিয়ে সে যেন এখনও বসে আছে গুরুবারি-ভুটকী-পুনোই আর আর সঙ্গীসাথীদের মাঝখানে। চ্যাঙনা-ম্যাঙনারা 'বোস-ওঠা' সমবয়সী ঝিউড়িরা একবয়সী 'বিহাল' বউড়িরাও তাকে 'গুরু' মানে।

সেখানে 'পাটিয়া' এখানে 'হেঁস'। নামালিয়ারা তো পাটিয়াও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। চাঁদবদনীর 'সাইত্‌-করা' কহিনী-বলা পাটিয়াটা সে নিয়ে আসবে 'আর-বছর'। সে-পাটিয়ায় বসলেই 'মেঘপাতালে' কতকিছু নতুন তারা সে দেখতে পায়! কত কী নতুন নতুন কহিনী যে সে ফেঁদে বসে!

আর হিঁয়ালি?

বসতে না বসতেই সে তো আসে গড়গড় করে! এখানে হেঁসে বসে তেমন জুত হয় না। এদিক-ওদিক কত দিকে যে মন চলে যায়! একটা তারা দেখতে না দেখতেই আরেকটা তারা হারিয়ে যায়। একটা হিঁয়ালির 'ভেদ' বলে দিয়ে আরেকটা নতুন হিঁয়ালি যে ফেঁদে বসবে, এই দ্যাখো, তার আগা আসে তো গোড়া আসে না!

মাঝে মাঝে লাইবুকারাও এসে কঠিন-কঠিন হিঁয়ালি দিচ্ছে। এই যেমন দিল—

উপরন্যু পড়ল তারা ভুঁই থর্‌ থর্‌ করে।
সোনার নূপর ভাইঙে গেল কে জুড়তে পারে।।

তাই তো কী জিনিস? মেঘপাতাল থেকে সোনার নূপুর হয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল? আর জোড়া গেল না, আর জোড়া গেল না?

লাইবুকা, ভেদ্‌ বল, ভেদ—

এত্ত যখন জানিস— ফের ভেদ কি?

ভাঙতে চায় না লাইবুকা।

ভেদ অর্থাৎ মান্‌তি। সূত্র। সুতো ধরে ধরে ধারে কাছে যাওয়া। তারপর তো লক্ষ্যভেদ। উদাহরণ দেখে দেখে আসল হিঁয়ালির রহস্য ভেদ।

লাইবুকা-সুরুয়া-হাড়িয়ারা সবাই আসছে। আসছে না কেবল নীলুয়া। নীলুয়া, নীলুয়া। নীলুয়ার ভয়ে কেউই কিন্তু 'মেয়্যাদের' আড্ডায় থাপস-গাদা হয়ে বসে পড়ছে না। ঐ দূর. থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

অবশেষে লাইবুকা ভেদ বলল।

—বাদলার দিনে মেঘপাতাল প্লে পড়ে।

আসমান থেকে পড়ে? মেঘ-বাদলার দিনে আকাশ থেকে কী কী পড়ে? কী কী? কী আর বা— হাতের 'কড়' গুনে গুনে ভাবতে শুরু করে মেয়েরা। এক তো মেঘ পড়ে, দুই হলহলিয়া সাপ পড়ে। তিন— আর কি? আর কি?

হঁ-হঁ— আর টুকচার ভাব।

দোরখুলির লোধাবস্তির নিজেদের পাটিয়ায় বসলে এত কী আর ভাবতে হত চাঁদবদনীকে! এতক্ষণে গড় গড় করে এসে যেত ধাঁধার উত্তরটা। কতবার যে ছেলেদের একা একাই হারিয়ে দিয়েছে চাঁদবদনী!

আজ পুনোই-ই হিঁয়ালিটা ভেঙে ফেলল। উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে পড়া বলার মতো বলল, উত্তর হবে 'বাজ' —বাজ-পড়া।

হেঁ তাই ত। বাজের কড় কড় 'আবাজ' হলেই বস্‌মতা ত থর থর করে কাঁপে! আর সোনার নূপর? বিদ্যুৎ চমকালেই ত সোনার বরণ নূপরের মালা হয়ে যায় এক নিমিষে। তার পিছ্কে ভেঙেও যায়। একবার ভাঙলে আর কী সে-মালা গাঁথা যায়? তুঁই-হামি পারব?

নাই, নাই। ঐ তাহলে উত্তর। বাজ, বাজ, বাজ।

এবার শোলক দিল চাঁদবদনী—

তেল চুক্ চুক্ পাল্‌হা, ফলে ধরে কাঁটা।
পাকলে মধুর মুজি গোটা গোটা।।
যে নাই বলতে পারে সে হৈল পাঁঠা। পাঁঠা পাঁঠা—

ইস্ এত বড় কথা! এক ফোঁট্‌কা মেয়ে হয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা— কী না আমরা ছেলেরা সব একধারসে পাঁঠা? মুখ নিচু করে থাকে লাইবুকা-সুরুয়া-হাড়িয়ারা— বলতে তো পারে না।

মুজি গোটা গোটা। তার মানে গোটা গোটা বীজ। সে তো কত ফলেরই হয়। আর তেল চুক চুক পাতা? শালের আছে, বটের আছে, আমের আছে। কিন্তু ফলে ধরে কাঁটা? সে তো তাদের নেই?

অগত্যা—

ভেদ বল চাঁদবদনী। ভেদ কি?

চাঁদবনী বলল, গাছে ফলে।

বনে-জঙ্গলে ফল তো গাছেই ফলে। প্রায় সব গাছেই তো কিছু না কিছু ফলে। কিন্তু ফলে ধরে কাঁটা? সে আবার কী?

কাঁটা 'বাইগন' হতে পারে। বোঁটায় কত কত কাঁটা—

উঁহু, চাঁদবদনী বলল, বোঁটায় কেনে হবে? কাঁট্টা ত ফলে। ফলে, ফলে।

ফলে কাঁটা— সে-ফল কী খাবা যায়?

খাবা যায় মানে? পাইলেই খাবি— চাভ্লাঁই চাভ্ঁলাই খাবি। তবে কী আর যেথাসেথা পাবি? এক তপুবনে-হঁ-তপুবনের আশ্রমে পাবি।

সুরুয়া-হাড়িয়া-লাইবুকারা কাকঁড়ো-কুন্দড়ি খোঁজার মতো তন্ন তন্ন করে খুঁজল— দেখি তো তপোবনের আশ্রমে কী কী কাঁটা ফলের গাছ আছে? কদ্‌লী আছে, আম আছে, জাম আছে, বেল আছে—

হঁ বেলেও ত কাঁটা আছে?

হঁ আছে— সে তো গাছে।

গাছে, গাছে।

তবে আর কী হতে পারে?

লাইবুকার আচমকা মনে পড়ল— তপোবনে পঁড়শেরও গাছ আছে। পঁড়শ— তার মানে কাঁঠাল। কাঁঠালের গায়েই তো কাঁটা। সব্‌জের উপর কাল্‌চে কাল্‌চে সরু সরু কাঁটা।

তাই তো। তা হলে পঁড়শই হবে। পঁড়শ, পঁড়শ। কাঁঠাল, কাঁঠাল।

—তোর উত্তর হৈল-শুন্‌-পঁড়শ। খেতেও অম্রুতো। আর মুজি তো গোটা গোটাই। গোটা গোটা কোয়া, কোয়ার ভিতর গোটা গোটা মুজি।

ছেলেদের উত্তর দিয়ে দিল মেয়েরা। মেয়েদের উত্তরও দিয়ে দিল ছেলেরা। শোধবোধ হয়ে গেল। সমান সমান।

কিন্তু 'বিস্তর' হিঁয়ালি-জানা চাঁদবদনী কী হার মানবে অত সহজে? কাম্‌হারপাড়া কুম্‌হারপাড়ার গরুগোঠের পিছন-পিছন ঘুরে গোবরের নাদি কুড়োতে কুড়োতে গরুবাগাল-কাড়াবাগাল-কানকুট্‌রি ছাগলবাগালদের মুখ থেকে পড়ামাত্র হিঁয়ালি শুনে শুনে মুখস্থ-করা-চাঁদবদনীর পেটের ভিতর সেসব গজ্‌গজ্ করছে। উগরে উঠে আসছে মুখে।

বল ত কী—

বন থাকতে আসছে বীর কুড়হার কাঁধে করে।
নাইকো এমন বাপের বেটা তাকে ধরে মারে।।

পারছে না ছেলেরা। এবার 'দমে কঠিন' হিঁয়ালি দিয়েছে চাঁদবদনী। —অরে ভেদ বল, ভেদ বল। খালি ত আন্ধার দেখছি —আন্ধার ঘরে কান্দুল-মান্দুল!

ছেলেদের অক্ষমতায় হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে ভেদ বলল চাঁদবদনী, সবু সময় ত মানুষের সঙে সঙেই আছে। এক-টায়েমও ত ছাড়াছাড়ি দেখি নাই।

ভুটকী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খুবেই সহজ— বলব? দুই হাতে মুখ চেপে আছে ভুটকী।

তাকে ঠেঙা দেখিয়ে মারতে গেল চাঁদবদনী। সে শুধু খানিকটা পিছু হটে তার ডানদিকে বাঁদিকে কখনও পিছনে ঘুরে ঘুরে দেখছে আর কী যেন ইসারায় দেখাচ্ছে।

তবুও পারল না ছেলেরা।

ক্ষমা-ঘেন্না করে চাঁদবদনী বলল, অদের বলে দে ত ভুটকী!

বলামাত্রই ভুটকী নাচতে নাচতে বলল, মাড়ষেরই ছায়া-ছাঁয়রা।

মাড়ষ—তারমানে মানুষ। আরে তাই তো, এতক্ষণ তারা আঁদালে-কাঁদালে টুঁড়ে মরছে। মানুষের ছায়া-ছাঁয়রা তো মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কুড়হার-কাঁধে মানুষের ছায়াও তো 'কুড়হার' কাঁধে নিয়ে মানুষের মতোই হাবভাব দেখায়।

ছায়া-ছাঁয়রাকে কেউ কী মারতে পারে? না, মারলেও তার গায়ে লাগে?

লাগে না, লাগে না।

মানুষের ছায়া-ছাঁয়রাকে কোন্ বীর কোন্ বাপের বেটা মারতে-ধরতে পারে?

কেউ না, কেউ না।

হেরে গেল ছেলেরা, হেরে গেল। কিন্তু হারতে হারতে তাদের রাগও তো বেড়ে গেল। রাগ হল চণ্ডাল। তারা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে যতসব আঁশটে-আঁশটে হিঁয়ালি খুঁজতে লাগল মেয়েদের জব্দ করতে।

বড়কই বলল, বল ত কী?—

"জাঙদুটা চিরে তার মইধ্যে পুরে কচর কচর করে"

মেয়েরা রা কাড়ল না কিছুক্ষণ, একেবারে চুপ। তারপর নিজেদের ভিতর শুরু করল গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌। গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌।

বড়কইটা বড়ই। কখনও কখনও এদেরই হাত তো লম্বা হয়ে অন্ধকারে তাদেরই 'বোস-ওঠা' বুকের কাছে কাঁকড়ার মতো দাঁড়া মেলে ঘুরতে থাকে।

ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে।

চমকে উঠে ঠেলে সরাতে হয় হাতটা। কখনও কখনও আবার 'উধাস' হয়ে দেখতে হয়— দেখি ন ভালা কী করে! কতদূর আর এগুতে পারে!

ঝাঁ করে সচকিত হয়ে লোধাঝিউড়ি তার বুকের ঢেউ দুটোকে আগলে রাখে। আর বেশিদূর এগোতে দেয় না।

বলব না বলব না করেও উত্তরটা দিয়ে ফেলল চাঁদবদনী— ও ত কে নাই জানে সুপারি-কাটা যাঁতি। যাঁতির ঠ্যাঙ দুটা ফাঁক করে তার মইধ্যে সুপারিটাকে পুরে কচর কচর করেই ত সুপারি কাটে— দেক্‌খিস নাই?

তা আবার তারা দেখে নাই? সে তো দেখেছে তারা একশতবার। অগত্যা রণে ভঙ্গ দিল লোধা চ্যাঙড়ারা। আর তাল-চটার মতো হুরহুর-ফ্‌রফুর করে হাসতে লাগল লোধা-ছেমড়িরা।

ঠিক্‌কেই করেছে চাঁদবদনী! যেমন কুকরকে তেমন মুগর।

আকাশে চাঁদের আলো, চাঁদ উঠেছে। অর্জুন-নিম-শাঁসড়া-খিরিসের ভিতর দিয়ে আলোর ফুড়গুনি এসে পড়েছে গিরিহার খলা-খামারে। একধারে জ্বলছে পেট্রোম্যাক্‌স— তার উপর উড়ে উড়ে এসে লুটিয়ে পড়ছে কতক পোকামাকড়।

পেট্রোম্যাক্‌সটা ততক্ষণই জ্বলবে যতক্ষণ না খলা-খামারের শেষ হয় কাজকাম। শেষ তো হয়ে গেল ধানঝাড়া-ধানপাছুড়া। ঘরের ভিতর ধানতোলা যা বাকি— সে তো করবে বড়রা।

চ্যাঙনা-ম্যাঙনাদের কাজ শেষ। খাওয়া-দাওয়াও শেষ। এখন তো খালি অবসর অবসর।

লাইবুকা-হাড়িয়া-বড়কই-সুরুয়াদের তাড়া দিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে নীলুয়া। লোধাচ্যাঙড়ারাও গেল আর ধীরে ধীরে হিঁয়ালিও ফুরিয়ে এল চাঁদবদনীদের। কত আর ভেদ-মানতি বলে বলে একটার পর একটা সিলোক-হিঁয়ালির জাল ছাড়াবে। কতক্ষণ আর মেঘপাতালের দিকে চেয়ে চেয়ে তারা শুনবে! নতুন নতুন তারা আবিষ্কার করবে! ব্যাথায় ঘাড় টনটন করে উঠবে না?

চাঁদ এসে উঁকি দিচ্ছে অদ্বৈত পৈড়্যার খলায়-খামারে। চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে ফাঁক ফোঁকর দিয়ে গিরিহার দোতলা বাড়ির বারান্দাতেও। সেদিকে চোখ বড় বড় করে তো তাকিয়ে আছে গুরভবউ— লম্বা হাতের খেল্‌ একঝলক হলেও দেখতে পায় কী না পায়!

কান খাড়া করে আছে চাঁদবদনীও— কে জানে কখন আবার কী কাজে ডাক দিয়ে বসে গিরিহানী। হয়ত রাতের খাওয়া শেষ করে পাতের খাবারটুকু খেতে দিয়ে বলবে— বদনী যা মনা সঁকড়ি বাসনগুড়াক ধুই আন!

গিবিহানী বললে 'না' করবে না চাঁদবদনী। কিন্তু কোনটা ভালো? দোরখুলির লোধাবস্তিতে ভুগড়ার আঙ্গিনায় শুয়ে 'বাঘযুগ্নী' পোকার ল্যাজে মিচিং মিচিং আলো-জ্বলা দেখতে দেখতে 'সিলোক কহিনী'বলা? নাকি বিদেশ-বিভুঁইয়ে 'পুব খাটতে' এসে সারাদিনের কাজকাম শেষে খলায়-খামারে শুয়ে বসে শোলক-হিঁয়ালি-ধাঁধা-'রাত পুছড়ী' বলা?

কোনটা বেশি ভালো? কোনটা?

চাঁদবদনী বুঝতে পারে না— অত বেশি-কমের কী আছে? অত বুঝাবুঝির বা কী আছে? সে শুধু বুঝে— যখন যেমন তখন তেমন। যখন যেখানে আছি সেখানটাই ভালো। চাঁদ-বদনীর কাছে নিজের দেশ আর পুবাল দেশে কোনো ফারাই নেই।

ফারাক নেই, ফারাক নেই।

তার আপশোষ শুধু একটাই, সে এখন হাত কামড়াচ্ছে— কেন যে সঙ্গে করে নিয়ে এল না খেজুরপাতার পাটিয়াটা? সঙ্গে থাকলে এতক্ষণে সে হিঁয়ালির ফুলঝুরি ফাটাত। দু-চাট্টা বলেই 'থকে' যেত না। গিরিহার 'হেঁসে' বসে কী যে হচ্ছে— আগা পাচ্ছে তো গোড়া পাচ্ছে না!

চাঁদবদনী হিঁয়ালি বলতে বলতে থকে গিয়ে থেমে গেলেও পুনোই-ভুটকী-গুরুবারিরা থামবে কেন? সিলোক-হিঁয়ালি না বলে না বলুক চাঁদবদনী— 'কহিনী' তো বলতে পারে। কত যে 'কহিনী' জানা আছে তার!

পুনোই-ভুটকী আব্দার ধরল— সেই-সেইটা বল্ ন বদনী!

কুনটা লো? কুনটা?

কুনটা আবার, ঐ যে মেঘপাতালে— একথালা সুপারি গুনতে নারি। সুপারি কী আর, সুপারি তো নয়— সব তো চাঁদেরই ছানাপোনা। কার ভয়ে রে বদনী, কার ভয়ে এতক্ষণ 'লুকাঁই' রেখেছিল ঠ্যাকা চাপা দিয়ে? চাপা খুলে দিতেই এখন মেঘপাতালময় কিল্‌বিল্ করছে, চিঁক চিঁক করছে—?

হ্যাঁ, সে একটা তো আছে। 'সদা সতীনের বিটি নিত্ নিয়াই লাগে'। যেন দুই বোন দুই সতীনের মেয়ে— প্রতিদিনই ঝগড়া করে, পরস্পর মুখ-দেখাদেখি বন্ধ!

চাঁদ আর সূর্য।

চাঁদবদনী 'কহিনী' শুরু করে—

বামনদার গাঁ-গেরামে, পুবের উত্তরের দক্ষিণের বিলে-বাতানে, হাওড়া-ভদ্রক-ভুবনেশ্বর রেললাইনের এ-ধার ও-ধারে, সরশঙ্কায়, দূরবর্তী বেলদা-খাকুড়দায়, কুড়িয়া-কুলিদা-তুরকায়, এগ্রা-কাঁথিতে, কসবা নারায়নগড়ে সন্ধ্যা উত্‌রে রাত ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে। রাত বাড়ছে।

রাত বাড়ছে, রাত বাড়ছে।

সেঁ-এ-এ-এ-এ সেঁ-এ-এ-এ-এ করে অন্ধকারে রাতের 'ভাপ' উঠছে মাটি থেকে ধানবিল থেকে খালবিল থেকে বেনাবুদা-লাটাপাটা থেকে। দখিনসোল-বুলান-হদহদি থেকে, পাড়িয়া-করনতল-পাকুড়তল-জাঁতাল মহিষাসুর-পঁড়াসুরের দঁক থেকে। বাছুরখোয়াড়-বড়োডাঙা-চঁদরপুর-খান্দারপাড়ার ওদিক থেকে।

তিলকমাটি হুড়ির পাশ দিয়ে পাল-রাস্তায় যেতে যেতে 'ডর-পেল্‌কা' কেউ কী এতক্ষণে হেঁকে গেল— স্যাঙাৎ-হে-এ-এ-এ-এ? স্যাঙাৎও তাকে অভয় দিয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল— আছি হে-এ-এ-এ-এ?

এ-ধার ও-ধার, এ-মেঘপাতাল সে-মেঘপাতাল— সব একাকার, একাকার। যেমন করে

মুরগীর কাঁড়াল-কোঁড়ল বাচ্চাগুলোকে কাক-চিলের ভয়ে "চিল-কুড়-ড়-ড়-ড়-ড়" ডাক দিয়ে মুরগী পেট-তলে লুকিয়ে রাখে, লুকিয়ে রাখে তার 'চিয়া'গুলোকে, তেমনি করে চাঁদ যেন এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিল তারাগুলোকে। চাপা খুলে দিতেই এখন মেঘপাতালময় কিল্‌বিল্‌ করছে, চিক চিক করছে।

চাঁদবদনী বলল, চাঁদ আর সুরুজ দুই বহিন এক মায়ের পেটের—

বাধা দিয়ে বলে উঠল পুনোই, নাই ভুল বললি— সূর্যের মা চাঁদের সৎমা।

হেঁ-এগো, তাই তো। কী করে ভুল বলল 'কহিনী'-বলার রাজা চাঁদবদনী? আজ যেন কী হয়ে গেছে চাঁদবদনীর! হেঁয়ালিতেও হারিয়ে দিচ্ছিল চ্যাংড়ারা!

হঁ ত হঁ - শুন্‌ ম্ন। চাঁদ হৈল ছোট বহিন— বেশ ত সৎমায়ের পেটের। চাঁদ-সুরুজের আনেক ছানাপোনা! এত্ত যে এক মেঘপাতালে ত আর ধরে নাই!

হঁ-উউউউউ—

হুঁকার দিয়ে উঠল ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা। লোধাঝিউড়িদের হঁ-কারের 'হুরি' শুনে বারান্দায় দৌড়ে এল গিরিহানী-গিরিহা। —কী শুরু করেছে এরা?

গিরিহা-গিরিহানী দেখল— বিড়াগাদার ধারে চাঁদের আলো-ছায়ায় গায়ে দেওয়ার 'হেঁস' মাটিতে পেতে জোর আসর বসিয়েছে নামালিয়াদের মেয়েরা। এতটাই মজে আছে যে স্থান-কাল ভুলে গেছে তারা।

গিরিহানী বলল, সোউ চাঁদবদ্‌নীটাই?

পাশে দাঁড়িয়ে নীলিমার কোমরে একহাত বেড় দিয়ে অদ্বৈত বলল, হঁ সোউ ত হেলা মউড়মণি, সাধে কী নাম রখিছি তার চন্দ্রবদনী?— তারা ঘেনি কোলরে চন্দ্রপরি সভা আলো করি বুস্‌লানি?

কাতুকুতুতে হাসতে হাসতে নীলিমা বলল, ঠিক বলেছ, তারাদের কোলে নিয়ে সভা আলো করে যেন বসে আছে চাঁদ-চাঁদবদ্‌নী—

আর থাকতে পারল না অদ্বৈত। কোমরে হাত রেখেই নীলিমাকে টানতে টানতে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। সারাদিন ধানবিলে নামালিয়াদের সঙ্গে থেকে নামালিয়া বউড়িঝিউড়িদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উঠা পড়া দেখতে দেখতে— এই করবে সেই করবে— কত কী তো ভেবে রেখেছিল অদ্বৈত!

দেখামাত্রই ঝপাঙ করে উঠে দাঁড়াল গুরভার বউ। কী দেখল সে? কে কাকে হাত লম্বা করে টেনে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর— বউটা না বরটা?

আর এসময়ই কুট্‌ কুট্‌ করে উঠল তার ডান পায়ের 'আঙট'-টা। এতটাই অস্বস্তি যে ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে আঁচড়াতে লাগল আঙটের চারধারটা।

আঁচড়াতে আঁচড়াতেই দেখছে গিরিহার দোতলার বারান্দাটা। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না— খালি তো অন্ধকার, অন্ধকার। পরক্ষণেই দেখছে একপায়ের আঙটটা— চাঁদের আলো পড়ে ঝকঝক করছে, ঝকঝক।

ঝকঝক তো করবেই। গা-ধোয়ার সময় বালি দিয়ে রোজ রোজ ঘষে-মেজে সে তো সাফা করে! এক পায়ের আঙটের ঝকঝকানি দেখে আরেক পায়ের আঙটের কথা মনে কী আর পড়ছে না গুরভানীর?

মনে তো পড়ছে। কিন্তু সে তো মনে মনেই ঠিক করে রেখেছে সে-আঙট মাগনায় দেবে বসন্তিয়া। বসন্তিয়া, বসন্তিয়া। মনে-মনেই বলল— একবার দেখা হোক 'নৈসা-খালভরার' সঙ্গে, চুলের মুঠি ধরে ঘরের ভিতর টেনে এনে বলব, 'বার' কর তোর রূপার আঙট! এত দূর দেশে 'নামাল' খাটাতে পাঠালি—কী মাগনা?

হাত 'সব্‌সব্' করে উঠল তার। কিন্তু ঐ যে— ঘড়িক-ঘড়ি, ঘন ঘন কথা ভুলে যাওয়া— কী ভাবতে কী ভাবছিল— ভুলেই গেল গুরভার বউ। গিরিহা-গিরিহানীর ঘরের দিকে কী দেখতে কী দেখবে— আশায় আশায় ভুলভুল চোখ সেঁটে রইল তার।

ওদিকে এতক্ষণে চাঁদবদনীর 'কহিনী'তে 'সুরুবহিন' চাঁদের 'মন' হয়েছে— সে আরো কিছু ছানাপোনার মা হবে। তার 'আনেক-আনেক' ছানাপোনা হবে।

কিন্তু—

এর মধ্যে ফের কিন্তু কেন? বয়সেও ছোট, দেহেও তাকত আছে, ফুলও তো মরেনি— হোক 'আ-নেক আ-নেক' ছানাপোনা।

কিন্তুক নাই— এক মেঘপাতালে তো বড়বহিন 'বেলা'রও ছানাপোনা আছে। আছে ন নাই— হুঁকার দে ভুটকাই-পুন্নাই—

ভুটকী-পুনোইরা সমস্বরে হুঁকার দিয়ে উঠল— হুঁ-উ-উ-উ-উ-উ—

সমস্যা হল— একটাই তো মেঘপাতাল। তার মানে আকাশ। এক আকাশে দু'বোনের, এত ছানাপোনারই বা জায়গা কোথায়? এখনই তো ঠাসাঠাসি গুঁজাগুঁজি অবস্থা।

সুরুবহিন বড়বহিনকে তাই ছল করে বলল, দ্যাক দিদি আর ত পারি নাই।

কিসের কী বহিন?

এই যে তর-আমার এত গুচ্ছের ছানাপোনা! অন্দের খাবাদাব্বা পালপোষ—

হঁ ঠিক্কেই ত সুরুবহিন। —এ লো হুঁকার দে লো ভুটকাই-পুন্নাই!

হুঁ-উউউউউ—

ত কী উপায়?

আয় তুঁই-আমি সবকট্টাকে খাই।

'ঠেকা' বা ঝুড়ির ভিতর নিজের ছা-ছানাদের লুকিয়ে রেখে এসে চাঁদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল— এই দ্যাক দিদি, এখন আমার ঝাড়া হাত-পা— কেমন সবকটাকে খেয়ে ফেলেছি!

সূর্য দেখল— তাই তো, চাঁদের তো আর একটাও ছা-ছানা নেই। ছা-ছানা নেই, ভরণ-পোষনের দায়-দায়িত্বও নেই। ঝাড়া হাত-পা, ঝাড়া হাত-পা।

অমনি সূর্য ছোটবোনের দেখাদেখি একটা একটা করে নিজের সব কটা 'ছাউ-ছানাকে' গিলে ফেলল। চাঁদবদনী বলল, আর আমার কইনীটাও ফুরাঁয় গেল। কেনে রে কইনী ফুরালি? ন ব্যাঙ ডাকে নাই। কেনে রে ব্যাঙ ডাকিস নাই? ন সাপে ধরে নাই। কেনে রে সাপ ধরিস নাই? ন মেঘ ডাকে নাই। কেনেরে মেঘা ডাকিস নাই—

নাই, নাই—

প্রতিবাদ করে বলে উঠল ভুটকী, কইনী ত ফুরায় নাই, গোড়াটা বললি 'ডগ্'টা ত এখনও বলিস নাই?

হঁ ডগ্-টা? চাঁদবদনী মুচকি মুচকি হাসে। সে যেন 'আ-নেক' হাঁপার হাঁটি উক্তন-খুক্তন করে এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে লাটা-পাটার ভিতর উলুরি-ঝুলুরি কন-কুন্দড়ীর 'ডগ'-টা। এখন কাকে ছেড়ে সে কাকে ধরবে?

কইনীর ডগ্ না কুন্দড়ীর ডগ্?

পায়ের 'এড়ি' তুলে লাটা-পাটার ডান্দা ধরে 'হিলাচ্ছে' চাঁদবদনী। হিলো-ও-হিলো। হিলো-ও-হিলো!

কইনীর ডগাটাই সে ধরে ফেলল। বলল, হঁ ডগ্‌টা—

বড়বহিন সুরুবহিনের ঘরে সেঁধায় বলল— বহিনরে এই দ্যাক— আমারও এখন ঝাড়া হাত পা, কাঁড়াল-কোঁড়ল আর একটাও নাই— নাই নাই—

দুখে ত বুক ফাটে বড়বহিনের আর সুরুবহিনের ত সুখের তল-অন্ত নাই। হামরা চাঁদাকে দেখে যতই ডাকি নাই কেনে— চাঁদা চাঁদা আ-লে-আ দুদু-ভাতি লে-লে-আ— হামার লুলু খাবে গুব গুব গুবা— চাঁদাবহিন কিন্তুক খুবেই রাঁকা।

হঁ কি নাই?

হুঁ-কার দিয়ে উঠল গুরুবারি-পুনোই-ভুটকীরা।

—হুঁউউউউউ—

রাঁকা তার মানে লোভী। চাঁদ তো লোভীই, হিংসুটে। তা না হলে নিজের ছা-ছানাদের বাঁচিয়ে রেখে কেউ কী দিদির ছা-ছানাদের খেয়ে ফেলতে বলে? এইটুকু কী আর বুঝে না ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা? জেনে-বুঝেই তারা হুঁ-কার দিল বড় করে। সে-হুঁকার গিরিহার দোতলার বারান্দা টপকে ঢুকে গেল ভিতর-ঘরে।

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর-ঘরটাও হেসে উঠল হি-হি করে।

চাঁদবদনী বলল, ইবার ঠেকা-চাপা ছাউ-ছানাদের মেঘপাতালে ত ছাড়িঁ দিল চাঁদবহিন হাসতে হাসতে। আর চিক চিক করতে করতে তার ছানাপোনারাও দৌড়ে বুলল সারা মেঘপাতালে মাউসীর চোখের সামনেই। সেই বলে নাই?—

একটা তারা দুইটা তারা বাভন ঘরের ঝারাপারা।
দও ত মাউসী কাঁড়বাঁশটা বিঁধে দিব ভারভুরটা।।

বড়বহিন আর কী ছাড়ে? তার পিছ্কে দুই বহিনে কী ঝগড়া কী ঝগড়া! মুখ দেখাদেখিও বন্ধ।

ভুটকী বলল, হঁ তাই ত, —এক মেঘপাতালে চাঁদ থাকে ত চাঁদ, 'বেড়া' থাকে ত 'বেড়া'। চাঁদ-সুরুজ একসঙে কখনও থাকে নাই।

এক-দু ক্লাস-পড়া পুনোই বলে উঠল, হঁ থাকে। পুবে সূর্য উঠছে আর পছিমে ডুবতে ডুবতে কিছুক্ষণের জন্য হৈলেও চাঁদ থাকে।

তাকে দাবড়ে বসিয়ে দিল চাঁদবদনী। বলল, থাকলেও সে মরাচাঁদ— তার কুনো আলো থাকে নাই।

আলো থাকে নাই, আলো থাকে নাই।

চাঁদবদনী ঠিকই তো বলেছে। সে তো মরা চাঁদ— থাকলেও আলো ছাড়া কেমন ফ্যাকাসে হয়ে মড়ার মতো ভাসতে থাকে মেঘপাতালে। চাঁদবদনীর প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়ল গুরুবারি-ভুটকীরা।

আর এসময়ই দোতলার বারান্দা থেকে ডাক এল— বদ্‌নী, তু টিকে শুনি যা!

গিরিহানীর গলা শোনামাত্রই দলে 'ভাঙ-ভুড়রু' দিয়ে উঠে দাঁড়াল চাঁদবদনী। পরনের 'লুগা' ঠিক করল। এই পাগলী বউটাই তো তাকে গীত গেয়ে শুনিয়েছিল— "গুরুজন সঙ্গে ঝিঅ লো লুগা রখিবু মুন্ডে।"

মাথায় কাপড় দিক না দিক কোমরে শাড়িটা জুতসই পেঁচিয়ে 'বোস-উঠা' বুক ঢেকে দৌড়ুল চাঁদবদনী। একটু বাদে দৌড়ুতে দৌড়ুতে ফিরেও এল। এসেই হুলিয়া জারি করল— এগো গিরিহা খুশি হঞে ভিডিও দেখতে তুমাদের-আমাদের ট্যাকা দিল এই দেখ-অ—

বলেই দু'হাতের মুঠো খুলে চাঁদবদনী টাকা দেখাল। তারপর বলল, এখন কে কে যাবে ভিডিও দেখতে— হাত তুল-অ হাত তুল-অ—

টুসুর মতো দু'হাত মেলে সে ঘুরে ঘুরে আহ্লাদে নাচতে লাগল, গাইতে লাগল—

কে কে যাবে কাঠ কুড়াতে, আর কে কে যাবে বন।
ও যে বন যাবা মিছ্ব কথা তদের ভুড়রু খাবার মন।।

যেন গিরিহা-গিরিহানীর কাছ থেকে সব কিছুর ইজারা পেয়ে গেছে চাঁদবদনী, এই মুহূর্তে সে-ই মালিক সে-ই মালিকান। হাত তুললেই সে তাদের নিয়ে যাবে ভিডিও-টাঁড়। আর তাদের আলো দেখিয়ে পথ চেনাতে সঙ্গে যাবে সেই একজন— ঐ তো সে ঘুরঘুর করছে, টুস্‌কি মেরে ইশারা করলেই সে একহাত হ্যাজাকের তলপেটে আরেকহাত হ্যাণ্ডেলে রেখে আগে আগে হাঁটতে থাকবে।

হাঁটতে থাকবে, হাঁটতে থাকবে।

গিরিহানী খুশি করে দিয়েছে গিরিহাকে, গিরিহা খুশি হয়ে গিরিহানীর কথামতো ভিডিও দেখাচ্ছে নামালিয়াদের। মাগ্‌না কী?

যে-লোকটা জ্বর হলে জ্বর গায়েও কাজ না করলে নামালিয়ার খাওয়া-খরচসহ মজুরি কেটে নেয়, যার দরুন দাঁতন পঞ্চায়েতের লোকের কাছে দলবল নিয়ে দরবার করতে গিয়েছে দলের ছোট মাতব্বর নীলেশ্বর— সেই লোক কী না হাত খুলে পয়সা বিলোচ্ছে ভিডিও দেখতে!

এগো ভিড়িও না বিড়িও? এতদিন তা শুন্নে আসচি খড়িকার বিড়িও আপিস?

কেউ একজন বলল— ঐ ভিড়িও-বিড়িও-রেঞ্জার-ফরেস্টার এক্কেই জিনিস।

আরেক জন বলল— নাই, ভিড়িও-বিড়িও এক মায়ের পেটে দু'ভাই, পিঠাপিঠি।

ঝাঁপিয়ে পড়ল চাঁদবদনী। ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, দেখতে নাই মন করে দেখ-অ নাই, তা বলে রগড় করে বল-অ নাই ভিড়িও-বিড়িও দুই ভাই!

সে হাসবে না কাঁদবে? কোথায় বি-ডি-ও আর কোথায় ভি-ডি-ও— কোথায় পাতাল আর কোথায় মেঘ-পাতাল!

হাত-পা ঝেড়ে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলল, ভিড়িও-বিড়িও এক্কেই জিনিস কেনে হবে, পিঠাপিঠি ভাই-বহিনও কিসের— ভিড়িও ত সিনিমা, দেখ-অ নাই সেবার গোঠটাঁড়ের মাঠে?

লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা নিয়তিলোধানী তার বাহুমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে বলল, জানি লো জানি, অত আর বলতে হবে নাই, বল্ টকিঘর— উর'ম টকিঘর লাদনগাড়িয়ার আশপাশকে একটা ছাড়িঁ দশটা পাবি। লে লিস্টি কর তোর দলে আমো আছি— হঁ কী নাই ফুলুর বাপ?

'সাফাছুআ' ফুলেশ্বরের বাপ শতুরাশবরের সাধ্য কী ঘাড় না-নেড়ে সে পারে। ঘাড় নাড়ল সে, বেশ জোরে জোরেই নাড়ল।

সবজান্তা নিয়তিলোধানীর অত জোরে জোরে বাহুমূল নাড়ানো আবার পছন্দ হল না চাঁদবদনীর। কে জানে কোথায় সে লাদনগাড়িয়া, কোন্ মুলুকে— সেখানে একটাও ভিডিও-হল আছে কী না, লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা তো শুনিয়ে দিল একটার জায়গায় দশটা।

না না করে গুরভা, গুরভার বউ আর গুড়কুঁদা ছাড়া সবাই রাজি হয়ে গেল ভিড়িও দেখতে। নীলুয়া-বড়কই-সুরুয়া-হাড়িয়ারাও ফিরে এলে যেতে পারে— তাদের টাকাও তো এই একসঙ্গেই আছে।

শত অনুরোধেও গুড়কুঁদা রাজি হল না ঐসব ছো দেখতে— নাকি ঐ রকম হাজারো ছো সে দেখেছে 'তপুবনের' জঙ্গলে। "লব-কুশ ধরেছেন ঘড়া হে বাল্মীক তপুবনে"—

চাঁদবদনীর দল চলে গেল ভিডিও দেখতে। আর বসে বসে নিঝুম হয়ে তপোবনের সেই সব ছো মনে মনে একটার পর একটা দেখতে লাগল গুড়কুঁদা।

কাঁধ দুটো তুঁবো তুঁবো— তাতে কড়া পড়ে গেছে ভার বইতে বইতে, তার উপর ন্যাড়া ভুঁইয়ে ঘাস-গজানোর মতো দু-চাট্টা চুল গজিয়েছে ফুড়ুং-ফাড়াং। এ হেন গুড়কুঁদা তার ধ্যাবড়া হাত দুটো এটার-ওটার ভিতর ঢুকিয়ে হাত মস্‌কাতে মস্‌কাতে ভাবছে। কত কী ভাবছে।

কত কী ভাবছে, কত কী!

ঝিরি ঝিরি একপশলা ঝরার পরে পরেই রামের কাঁড় উঠল বনের এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো। গোটা বনটাই সে-কাঁড়ের ছিলার ভিতর এঁটে গেল। কী এঁটে গিয়েও এ-পাশ ও-পাশে ফাঁক রয়ে গেল অনেকটাই। কাঁড়ের মাঝ-বরাবর তপোবনের হনুমান চৌকির ওদিকটায় কাঠ কাটতে কাটতে গুড়কুঁদার তো সেসব মালুম নেই।

মালুম নেই, মালুম নেই।

এ কী ছো! কী করে যে ওঠে, ফের আবছা হতে হতে কী করে যে মিলিয়ে যায়— গুড়কুঁদার জানত্ নেই। জানত্ নেই, জানত্ নেই।

বড় বড় শাল-আসনের গাছগুলিও থম্ মেরে দেখে, ডগাটিও নাড়ে না। কে জানে ডগা নাড়লেই বুঝি সে-বস্তু হস্ করে কখন মিলিয়ে যায়! গুড়কুঁদা তো শুনেছে সেদিকে আঙুল তুলে দেখালেই রামের কাঁড় মিলিয়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে-হাতের আঙুলও তো পচে যায়। এই করে কত লোকের আঙুল যে পচে গিয়েছে— লোধাপাড়ায় সে-খবরও বড় কম নেই!

কম নেই, কম নেই।

গুড়কুঁদা পারতপক্ষে দুহাতের আঙুল গুটিয়ে রাখে। 'কুড়হারের' চটাটিও মারে না— কে জানে কুড়হার চালাবার জন্য হাত তুললেই সে-হাত বে-ভুলে রামের কাঁড়ের দিকে ফের চলে না যায়! আর গেলেই তো হাত পচে নুলো!

খরার মাস আর বর্ষার মাসগুলোয় যখন লাল-নীল আর 'ধবো' ফুলে তপোবন-মাঝুড়ুবকা-নারদা-নিগুইয়ের জঙ্গলমহাল 'আলায় আলা', কুড়চি-কুসুম-পলাশ-শিমূল-আঁটারি-সোনাঝুরি-গুঁজ-রঙন-দ্রোণ-দুধলি-ছাগলহাঁচির ফুলে ফুলে একাকার একাকার—তখন তো আরেক ছো!

কতদিন যে গুড়কুঁদা বৃষ্টি থেকে গা-মাথা বাঁচাতে এসে দাঁড়িয়েছে কুড়চি-আঁটারির লাটা পাটায়। বৃষ্টি থেমে গিয়েও কুড়চি-আঁটারির ফুল থেকে টসা টসা জল ঝরছে আর সে-জল, সে-ফুলের জল ফোঁটা ফোঁটা মায়ের দুধের মতো মুখে-মাথায় ঝরে পড়ছে আর গুড়কুঁদা জিভ বের করে চেটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে— কী কম ছো?

বর্ষার 'ঝোপ' এসে বালিপোত করে দিয়েছে ঝোপ-ঝাড় লাটা-পাটা। লাল-কালোর দাগ এঁকে চিত্র-বিচিত্র করে তুলেছে চিকনবালি সরুবালির স্তূপ।

ঘুম ভেঙে ভোর ভোর কেউ যদি দেখে সেখানে হাত দিলেও পিছলে যায় এমন চেকনাই গা-গতর নিয়ে কুড়মুড় বালি ভেদ করে উঠে আছে সরুবালি-বড়বালি-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া-পরবছাতুর দঙ্গল আর তাদের ঘিরে পাহারায় বসে আছে ভেলভেটের তুল্য জামা গায়ে লাল লাল অসংখ্য বোতাম-পোকা— সেও কী কম ছো?

এমন ছো তো তার উমরে কম দেখেনি গুড়কুঁদা। কার সঙ্গে কী। এর কাছে কোথায় লাগে গিরিহার ভিড়িও না বিড়িও। হাত ঝেড়ে ডাক দিল গুড়কুঁদা— আয় গুরভার বোছ। পাশকে আয় ন! দু-চাট্টা ছো-এর কথা বলি।

গুরভার বউ ডাক শোনামাত্রই উঠে এল। বলল, হঁ-অ বল-অ দাদা।

লাইবুকা-বড়কই-সুরুয়াদের কাছে নীলুয়ার গল্প যেন আর ফুরোয় না, ফুরোয় না। ঐ এক গল্প— মা-মনসা গ্রামের মুখিয়া ভিকা ভক্তা আর মকরার গল্প। ধরম-ঠাকুর্দা আর তার স্যাঙাতের গল্প।

একবার যদি দেখতিস তর্‌হা আমাকে লিয়ে কী হুরি কী হল্লা।

বল্‌লিস কী চাঁদবদনীর ল্যাখেন মাই-উঠা বড় বড় মেয়্যারা?

চাঁদবদনীর উপর নীলেশ্বরের রাগ এখনও পড়েনি। ধুৎকারে সে চাঁদবদনীকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, ধু-উ-স! কোথায় চাঁদে আর মেনিবাঁদরের পোঁদে—

হো-হো করে হেসে উঠল বড়কই-লাইবুকা-সুরুয়ারা। ভাগ্যিস সঙ্গে নেই চাঁদবদনীর ভাই টুরা— সে তো হোস্টেলে— থাকলে না-জানি কী ভাবত!

গম্ভীর হয়ে নীলেশ্বর বলল, হঁ-অ, তবে রাইবুর বহিন সোমবারির সঙে এক-লাইনে আনতে পারিস।

রাইবুর বহিন সোমবারি? সোমবারি, সোমবারি। যাহোক এতদিনবাদে মনে করিয়ে দিল নীলেশ্বর। বড়কই-লাইবুকা-সুরুয়ার— কারোরই তেমন মনে নেই, কেউ দেখেছে কেউ দেখে নাই।

তবে শুনেছে— দোরখুলির লোধাপাড়ার মাতব্বর রাইবুলোধার এক 'আ-নেক' সুন্দরী বহিন ছিল। তপোবনের সাধুবাবা তাকে নিয়ে কে জানে কোথায় ভেগেছে! এই তো সেদিনও রাইবু ঠাকুরবাঁধের ধ'গাছটাকে বহিন ভেবে কত কী করেছে!

সেই সবেধন ধ'গাছটাও রাইবুর বাপ গেঁড়াশবরের সঙ্গে চিতায় উঠল। —'কহিনী'ও ফুরাইল লটিয়া গাছটাও মুড়াইল—

এসব তো লাইবুকা-বড়কই-হাড়িয়া-সুরুয়াদের শোনা কথা। আর এতদিনে মাতববরের মাতব্বর রাইবুলোধাও তো নরসিঙা গাড়ের খুনের দায়ে 'জিহল থানায়' পচছে! এখন নীলুয়াই তাদের আশা-ভরসা— নীলুয়াই তাদের সর্দার। উঁ-হু, ছোটমাতব্বর গুরভা এখনও আছে। তবে সে-ও তো শুয়ে পড়েছে জ্বরে। আর তার জন্যই তো তাদের নিয়ে নীলুয়া যাচ্ছে—

নারায়নগড়ের মা-মনসা গ্রামের কুল্‌হি রাস্তার বর্ণনা— অমুক-টেঁক্-ফাল্‌না-তুস্‌কা-এখনও ফুরোচ্ছে না, ফুরোচ্ছে না। ফেনিয়েই চলেছে, ফেনিয়েই চলেছে নীলেশ্বর।

"ছাগল-বাগাল কান-কুটরী গরু-বাগাল রাজা"— ঐ তো ছাগল-বাগালরা কানে দুল-পরা ছাগল-ভেড়া বাটিয়ে ধুলা উড়িয়ে গেল। তাদের 'পাঁড়রা চুল' তাও বলল নীলেশ্বর।

নারায়নগড় বাজার থেকে 'মালা-ঘুনসী' এখনো এল না, ধরম-ঠাকুরদা ব্যস্ত হয়ে উঠল— আর কখন আসবে মালা-ঘুনসী? লোক দৌড়ুল। মা-মনসার মুখিয়া ভিকা ভক্তার 'আন্দাশ' পেলে একজন কেন দশজন দৌড়ুবে, নারায়নগড় বাজার 'মালা-ঘুনসী'র জন্য হাল্লাট করে ছাড়বে। নাই তো তৈরি করে আনবে। দেখতে দেখতে 'মালা-ঘুনসী' এসেও গেল।

এতবার বলেছে আবারও বলে চলেছে নীলেশ্বর। কাজ-কামাই দিয়ে আরো একদিন সে ঘুরে আসবেই আসবে— জানিয়ে রাখল একফাঁকে বড়কই-লাইবুকা-সুরুয়াদের। চাই কী মা-মনসা ছাড়িয়ে কেশিয়াড়ীর সাতসোলও সে দেখে আসবে। সাতসোল থেকে লছিপুর হয়ে দোরখুলি আর কতদূর!

বামনদার হাটখোলায় তারা এসে গেল। ঐ তো 'লোক ক্লাব'— ভিডিওটাঁড়। দু-চাট্টা

গুমটিতে গ্যাস-লাইট জ্বেলে এখনও আলু-পটল বিক্রি হচ্ছে। রাত তেমন গাঢ় হয়নি। 'স্যাঁ-এ-এ স্যাঁ-এ-এ' করে গ্যাস-লাইটের গর্জন এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে।

ঐ তো অফিস-ঘর— হ্যারিকেন জ্বলছে। উঁকি মেরে দেখল নীলেশ্বর— ভিতরে কেউ আছে কী নেই? আছে। তবে সে 'হোল-টাইমার'। মান্যগণরা কেউ এখনও আসেনি।

লাইবুকা-বড়কই-সুরুয়াদের নিয়ে চায়ের দোকানেই বসল নীলেশ্বর। চায়ের অর্ডার দিল, সঙ্গে বিস্কুট। একটা বিস্কুট সে বেশি করেই চাইল— তার ইল্লির জন্য। বিস্কুট পেয়ে ইল্লি সামনের পা দুটোয় ধরে বাচ্চাছেলের মতো একটু একটু করে খেতে লাগল। বেশি বেশি করে খেলে পাছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়!

চা-দোকানীর পয়সা মিটিয়ে সুরুয়া-লাইবুকাদের নিয়ে অফিস-ঘরে ঢুকল নীলেশ্বর। 'লোক ক্লাবের' ছেলেরাই অফিসটা চিনিয়ে দিয়েছিল নীলুয়াকে। বলেছিল— বিপদে-আপদে পড়লে ওখানে যাও— গিয়ে বল— বললেই ম্যাজিকের মতো কাজ হবে।

সেই ম্যাজিক, ম্যাজিক।

এই তো একটু আগে চায়ের দোকানেই শুনছিল নীলুয়ারা— কোথায় নাকি চড়কাপাড়া না নেকবাটিয়ার 'টিপকলে' এমন এমন জল উঠছে যা খেলে পেটের রোগ যায় যাবতীয় অসুখ-বিসুখ সেরে যাচ্ছে! আর তাই ঘড়া-গাগরা-হাঁড়া-কলসি-জারিকিন-বালটিন হাতে রাজ্যের লোক সারাদিন সারারাত ঐ গ্রামে ভিড় করছে। কল-টিপার একটুও বিরাম নেই।

বিরাম নেই, বিরাম নেই।

এও তো এক ম্যাজিক। শুনেই সুরুয়া ভেবে রেখেছিল— মাকে বলবে কাজ কামাই করে একদিন গিয়ে বাপের জন্য এক হাঁড়া ম্যাজিক জল নিয়ে আসতে। না হয় সেও যাবে মায়ের সঙ্গে।

অফিস-ঘরে ঢুকে বড়কই-লাইবুকা-সুরুয়া-হাড়িয়ারা দাঁড়িয়েই থাকল। শুধু বলা নেই কওয়া নেই টেবিলের সামনে পাতা কয়েকটা চেয়ারের একটায় তার ইল্লিকে নিয়ে বসে পড়ল নীলেশ্বর।

টেবিলের উল্টো দিকে পাতা একমাত্র চেয়ারটা ফাঁকা। ফাঁকাই। টেবিলের এধারে বাকি চেয়ারগুলোও ফাঁকা। ফাঁকাই। দুধারের বেঞ্চিগুলোও ফাঁকা। ফাঁকাই।

অফিসের লোকটা বড়কই-হাড়িয়া-সুরুয়াদের ফাঁকা বেঞ্চি দেখিয়ে বলল, তুমারমনে বুস-অ না! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আসার টায়েম ত হেই গলা!

টেবিলের ওধারে ফাঁকা চেয়ারটার মাথার উপরে সত্যিসত্যিই একটা ঘড়ি। টিক্ টিক্ করছে। বড়কই-লাইবুকা-হাড়িয়ারা তো আর জানে না— সে-ঘড়িতে একটা না দশটা বাজে। শুধু জানে নীলুয়া— সেও তো চুপ করে আছে। কিছু বলছে না।

একটা টুলে বসে কোলের উপর ডায়রী রেখে হেরিকেনের আলোয় কী যেন হিসাব টুকছিল লোকটা।

তখনও লাইবুকা-সুরুয়াদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফের সে বলল, আঙুল দেখিয়েই বলল, অউ বেঞ্চিটায় বুস-অ। বুস-অ না!

বড়কই-লাইবুকা-সুরুয়া-হাড়িয়ারা বেঞ্চিতে বসে বড়ই আরাম পেল। কেউ তো তাদের এমন আদর করে বসতে বলে না। এই লোকটা একবারের জায়গায় দু'বার বলল।

পেন গুটিয়ে এতক্ষণে নীলুয়ার শিকলি-বাঁধা 'ইল্লি'টাকে দেখতে পেল লোকটা। মনযোগ দিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর হাসল।

বলল, পুষা?

ঘাড় নাড়ল নীলেশ্বর।

সুঁই দিয়া অছি? হাসছে লোকটা।

সুঁচ? কিসের সুঁচ? কিছুই বুঝতে পারছে না নীলেশ্বর। তবু—

তবু তেঁটিয়া হয়ে বলে উঠল, হুঁ-উউউ—

শিকারী কাঠবিলেই? শিকার-টিকার মারি বুলে? হঁ, নাহানে সাঙে লেই ঘুরুচ কেনি? সোউ বলে নাই— বিলেই নাই পুষবু ত মুসা পুষ?

বিড়াল-ইঁদুর পোষা— কে জানে কী বলতে চায় লোকটা! 'ইল্লি' কিছু শিকার-টিকার করে না। সে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তবু সব কথাতেই ঘাড় নেড়ে দিল নীলেশ্বর।

আরো কিছু এ-কথা সে-কথার পরে আসল কথাটা নীলেশ্বরের কাছ থেকে জেনে নিল লোকটা। ফের চুপচাপ। ফের হেরিকেনের আলোয় গাড়ার-বাঁধা ডায়রী খুলে হিসাব টুকতে বসে গেল লোকটা।

বড়কই-সুরুয়া-হাড়িয়ারাও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। খালি যা নীলুয়া বাইরে খসর-মসর একটা কিছু আওয়াজ পেলেই ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে দেখছিল। দরজাটা খোলা। খোলাই।

হাটখোলায় কিন্তু কথাবার্তার বিরাম নেই। চায়ের দোকানের আড্ডায় লোকজন বাড়ছে। লোকজন বাড়ছে। কী একটা ট্রেন লম্বা সিটি বাজিয়ে চলে যাচ্ছে— কে জানে কোথায় যাচ্ছে? হাওড়া না ভদ্রক?

কিছুক্ষণবাদেই 'মাষ্টার-মাষ্টার' একটা লোক আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। বড়কই-লাইবুকা-সুরুয়া-হাড়িয়াদের আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে যে যার চেয়ারে ঝুপ ঝুপ বসে পড়ল।

কাঁধের ঝোলাটা চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে 'মাষ্টার-মাষ্টার' লোকটা বলল, এরা কারা, হীরালালদা?

নীলুয়ার কী জানি কী হল, ইল্লিকে বড়কইয়ের হাতে গছিয়ে দিয়ে লছিপুর স্কুলের 'মাষ্টার-মাষ্টার' দেখতে লোকটাকে ঘুরে গিয়ে ঢিব্ করে একটা প্রণাম করল সে।

'থাক থাক' বলতে না বলতেই 'হোলটাইমার' হীরালাল বলল, এরমনে অদা পৈড়্যার ঘরকু ধানকাটার কামে লাগ্‌ছে।

তো কী?

কিছি আর্জি লেই আসিছি— এই যে তুমার মনে সোজা সট্‌পট্ কুহ না! কুহ!

সোজা-সাপ্টা বলতে বলায় উৎসাহিত হয়ে নীলেশ্বর সব কথাই খুলে বলল। শুনে-টুনে জেরা শুরু করল লোকটা—

ঘর ছেড়ে এতদূরে কেন এসেছ? সে দেশে চাষবাস নেই? ধানকাটা নেই? পঞ্চায়েৎ নেই? নাকি পঞ্চায়েৎ-টঞ্চায়েৎ মান না?

—তোমাদের এই বোহেমিয়ান আই মীন ভবঘুরে স্বভাবটা—

মাষ্টারবাবু বেছে বেছে আমাদের ভবঘুরে বলল? ভবঘুরে? নীলেশ্বর মনে মনে আউড়াল— সান্তাল-কুড়মি-ভুঁইয়া-ভূমিজ-বাগাল-মাহাতোরাও তো শ'য়ে শ'য়ে নামাল খাটতে হেথা-হোথা যাচ্ছে। তারবেলা?

টেবিলের সামনে চেয়ারে বসা একজন বলল, এরাই কী লোধাশবর? সাপ-টাপ ধরে? সাপ খেলায়? গোত্র কি? কাশ্যপ?

নীলেশ্বর কোনোকালেই শুনেনি দোরখুলির লোধাপাড়ার কেউ কখনো সাপ ধরে সাপ খেলিয়েছে। সাপ খেলায়— সে তো আক্‌কুটি শবররা।

তবু সে তেঁটিয়া হয়ে ঘাড় নাড়ল।

ঠিক ঠিক, ঋষি কাশ্যপ আর সর্পমাতা কদ্রুর ঔরসে লোধাশবরদের জন্ম। তাই তো শুনেছি।

'মাষ্টার-মাষ্টার' লোকটা বলল, না না, বোধহয় ঠিক হচ্ছে না শাসমল। সাপ-টাপ যারা খেলায় তারা অন্য— ঐ যেমন আমাদের ভগবানপুরের মাশুড়িয়ার শবররা।

লোকটার প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠল নীলেশ্বর। যেন সাপ-খেলানোর মতো মস্ত বড় একটা অপবাদ থেকে মুহূর্তে বাদ পড়ে গেল দোরখুলির লোধাপাড়ার লোধাশবররা! অপবাদ ঘুচিয়ে দিল ঐ লোকটাই।

শাসমল নামের লোকটা এবার স্বীকার করল, হাঁ হাঁ, মাশুড়িয়ার শিবমন্দিরের কাছে কিছু শবরলোক আছে জানি— ঐ যারা 'বাঁশরলা' জুড়ে জুড়ে পাখি ধরে, সাপ খেলায়, সাপের মণি বলে ঝুটো পাথর বেচে। আবার শুনি তো গানও বাঁধে— তবে তারা কী লোধাশবর নয়? তোদের স্বজাতি নয়?

নীলুয়া-বড়কই-লাইবুকা-সুরুয়া-হাড়িয়া— এবার যেন সবাই মিলে ঘাড় নেড়ে 'না' বলল—না না, ওরা কোথাকার আক্‌কুটি না ঝিক্‌কুটি শবর— আমাদের কেউ না।

'মাষ্টার-মাষ্টার' লোকটা বলল, শাসমল, ঐ যে বললে মাশুড়িয়ার শবররা গানও বাঁধে— এককালে ওদের বাঁধা কত গান লোকের মুখে মুখে ফিরত, শুনেছ কি—

"কি খেলা খেললি গোপাল নন্দীগ্রামের বাজারে।
খেলার দাপে গুমগড় কাঁপে, রাইমন ঘোষ পুড়ে মরে
—কুটাগাদার ভিতরে।।"

শাসমল ঘাড় নাড়ল— না সে শোনে নি। কিন্তু হাসতে হাসতে বলল, তোমার তো খুব মনে আছে দেখছি?

মাষ্টারবাবু লোকটা বলল, তা আছে বৈকি। তবে আমাদের দাঁতন-১ এর বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙায় ক'ঘর ওদেরই স্বজাত লোধাশবরও আছে— ঐ যারা চাঁচ বুনে পানের টুকরি বুনে খাকুড়দা মোহনপুরের হাটে বেচে— দেখেছ হয়ত?

শাসমল এবার জোরে জোরেই ঘাড় নাড়ল— হাঁ সে দেখেছে।

ধাঁই করে 'মাষ্টার-মাষ্টার' লোকটা নীলুয়াকে যেন বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে কোশ্চেন করল—এতদূরে 'নামাল' খাটতে আসার কী দরকার? শালপাতার থালা তৈরি করে বেচতে পারো না— সেও তো হাজারে চল্লিশ টাকা?

বড়কই উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, নরসিঙ্গ গাছ থিক্যে পাতা ছিঁড়তে দিল্লে ত?

তাকে কনুই হিঁচড়ে বসিয়ে দিল লাইবুকা। বলল, থাম বে, কব্বে মরে গেছে নরসিঙ্গ!

তাই তো— নরসিঙ্গ গাড়-কে তো খুন করেছে রাইবু-গুড়গুড়িয়া! বলতে বড়ই ভুল হয়ে গেছে বড়কইয়ের। সে জোড়-হাত করেই থাকল, করেই থাকল।

লাইবুকা-বড়কই-সুরুয়া-হাড়িয়া-নীলুয়ারা ছাড়া বাকিরা হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু কী বলতে এসে কী সব বলা হয়ে যাচ্ছে ভেবে ক্রমশঃ তেঁটিয়া হয়ে উঠছে নীলেশ্বর।

মজুরি ঠিকঠাক পাচ্ছ ত?

নীলুয়া বলার আগে লাইবুকাই বলল, নাই।

অদ্বৈত দৈনিক মজুরিও ঠিকমতো দিচ্ছে না?

হাত জোড় করেই বড়কই বলল, হঁ দিচ্ছে কী দিচ্ছে নাই— সে ত জানে এক বসন্তিয়া। তার সঙ্গেই ত কথা হঞেছে।

সে কে?

কামিল্লা।

এ-ধারে ও-ধারে ঠাই-ঠুই কী যে বলে যাচ্ছে বড়কই-লাইবুকারা— শুনতে শুনতে আরো কত দূর যে তেঁটিয়া হয়ে উঠবে নীলুয়া। এখনও তো কোনো কিছুই বলছে না।

কে কামিল্লা?

ঘর ত লদীপারের কাঠুয়াপাল।

লাইবুকা আরোই জুড়ে দিল তার সঙ্গে— ঐ যে গো মুখভরতি মায়ের দাগ, সোনারূপার বানিয়া।

'মাষ্টার-মাষ্টার' লোকটা এবার সামান্য হেসে শাসমলের দিকেই চোখ তুলে বলল, কী বুঝলে শাসমল?

শাসমল বলল, বুঝাবুঝির কী আছে— এইরকমই তো হয়, হচ্ছেও।

এতক্ষণে নড়ে উঠল নীলুয়া। খালি বসন্ত কামিল্লাকে দুষলেই হবে? সে কী আমাদের হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে এতদূর টেনে এনেছে? পেটে টান পড়লে নামাল তো নামাল আরো দূর দেশেও আমরা যাব। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার যুগ আর নেই।

নীলেশ্বর খুলেই বলল সবকিছু। কেন তারা দেশে-ঘরের চাষাদের চাষের কাজে ডাক পায় না, আর ডাক পেলেও কেন তারা যায় না বা যেতে চায় না। দেশে-ঘরে কাজের তুলনায় লোক তো মেলা— কাম্‌হার-কুম্‌হার-ভুঁইয়া-ভূমিজ-মাহাতো-বাগাল— কার বাড়ির বউড়ি-ঝিউড়িরা এখন না কামিন খাটে? শুধু কী লোধারা? নামাল খাটতে তো এসেছে সাঁওতাল-বাগাল-ভুঁইয়া-ভূমিজ-বাগদি-কাহাররাও? নামালিয়ারা না এলে 'নামাল' দেশের এত বড় চাষের কাজ তুলবে কারা? বাবু-ভায়েরা? হাটুয়ারা?

মাষ্টারসুলভ ভঙ্গিতে নীলুয়াকে ধমকে উঠল লোকটা। বলল, থাম্‌ যা কহ্‌ছ সবু ঠিক মাননু। তেবেও গুটে কথা অছি— "গাল দিনে মানুষ মরেনি, তাতলা পানি-এ ঘর পুড়েনি"— আউ—

উত্তেজনায় উত্তেজনায় লোকটা হাটুয়া কথা বলে ফেলেছিল, শুধরে নিয়ে বলল, সবই মানলাম। তবুও একটা কথা আছে— গালাগাল দিলে তো মানুষ মরে যায় না আর গরমজলে ঘরও পোড়ে না। 'চোর' বললেই তো তোরা আর চোর হয়ে যাচ্ছিস না?

নাই মানে? চোর বলেই ত দার্‌গা ধরে ধরে হাজ্জতে পুরছে। তারবেলা?

বিড় বিড় করল লাইবুকা।

ঐ কথাটাই জোরে জোরে বলতে চাইল নীলুয়া। অথচ বলতে পারল না। কেন যে বলতে গিয়েও আজ পদে পদে পিছিয়ে পড়ছে সে— নীলুয়া বুঝতে পারছে না।

নীলুয়া বুঝতে পারছে না, নীলুয়া বুঝতে পারছে না। অথচ তার থেকেও 'চাঁড় চাঁড়' বলে দিচ্ছে বড়কই-সুরুয়া-লাইবুকারা। আজ কে জানে কী হয়েছে তার।

মাষ্টারবাবু লোকটা বলে চলেছে— আড়কাঠির পাল্লায় পড়ে দেশ-গাঁ ছেড়ে এতদূরে নামাল খাটতে আসাটা তোদের ঠিক হয়নি। এবারে এসেছিস এসেছিস— আর কখনও আসিস না।

লোকটা দোরখুলির লোধাপাড়ার মাতব্বর রাইবুলোধার মতোই কথা বলছে। তার কথার পিঠে একটা কথাও বলতে পারছে না নীলেশ্বর।

আর এসময়ই ইল্লিটা একলাফে বড়কইয়ের হাত থেকে নীলুয়ার কাঁধে এসে পড়ল। পড়ি-মরি করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল শাসমল। আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল, এই সব ঝুট্‌-ঝামেলা বয়ে বেড়াও কেন?

হি হি করে হাসতে লাগল হীরালাল— পুষা কাঠবিলেই, সুঁই দিয়া অছি শাসমলের পো— ভয়ের কিছি নাই, খালি খালিটা ঝাপাসি ঝুরেঠে। এ্যাই ছুআ কাঠবিলেইটাকু বাঁধি প্যাকা।

পোষা কাঠবিড়ালী, ইন্‌জেকশান দেওয়া আছে। কামড়াবে না— এম্নি এম্নি ঝাঁপাচ্ছো হাঁকাড় দিয়ে হীরালাল বলল— এই ছোকরা, জন্তুটাকে বেঁধে ফ্যাল!

ফের ইন্নিকে বড়কইয়ের হাতে গছিয়ে দিল নীলেশ্বর। সন্তুষ্ট হয়ে এবার শাসমল নামের লোকটা নিজে নিজেই বলল, তোমরা দেশে ফিরে পঞ্চায়েতের কাছে যাও, আজকাল তোমাদের জন্য কতরকম স্কীম বেরিয়েছে, সারাবছর কাজের কোনো অভাব থাকছে না— আই আর ডি পি, এস জি এস ওয়াই, এস জি আর ওয়াই, এস এইচ জি— কত কী! কত রকম যোজনা!

'মাষ্টার-মাষ্টার' লোকটা বলল, না শাসমল, ওরা হল 'বন-দিগার', বনের কাঠ-পাতাই বেশি চেনে। জনমজুরী কৃষিমজুরী বাদ দিয়ে বনমজুরীই ওদের বেশি মানায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এখন বনসৃজন প্রকল্প তো হামেশাই হচ্ছে, হচ্ছে না? দেশে ফিরে গিয়ে তাই ওরা করুক না!

ফের তেঁটিয়া হয়ে উঠছে নীলেশ্বর। ঐ তো লোধাদের এতদূর ডেকে এনেছে। তার ঘাড়ের শিরা দ্রুত ফুলে উঠছে, ফুলছে। শিরার ভিতর কোথায় যেন একটা টুঙ করে আওয়াজও উঠল। ভিতরে ভিতরে কোনো কিছু কী খসে পড়ল? মনে মনে তো আউড়ে চলেছে নীলেশ্বর—

কোন্ কোন্ গাছে বাজন বাজে।
কোন কোন গাছে সাজন সাজে।।
কোন কোন গাছে মাথায় জটা।
কোন কোন গাছে শিরায় কাঁটা।।

নীলুয়ার উপর যেন ধীরে ধীরে 'বীর' ভর করছে, ঝাঁপানের 'ব্যাকড়া' লাগছে—

কাঁসা পিট্ পিট্ কাঁসিন বাজে— আওরে।
কোন্ কোন্ দ্যাবতা— আওরে আওরে।।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে নীলেশ্বর বলল, কিন্তু যে জন্য আসা তার কী হবে— হুঁ, তার কী হবে? ফের লাফ দিয়ে নীলুয়ার একেবারে মাথার উপর উঠে বসল ইন্নি।

কিত্তি দেখে গোটা অফিসঘরটাই ফের হেসে উঠল। হাসতে হাসতে হীরালাল বলল, বুস-অ না! তুমহর কাঠবিলেইটাকু খিঁচি রখ-অ! তুমারমনে খালি আকাপকা হউচ, এমুন করুছ, সোউ বলে নি— ঘরে ছা ছাড়ি দি আসা?

এমন কথা বলতেই পারে হীরালাল, এ ঘরে সে কতদিন ধরে আছে, চোখের সামনে কত রকম ঝড়ঝাপ্‌টা দেখেছে, কত তর্কবিতর্ক শুনেছে। সে ঠাট্টা করে বলতেই পারে— সবুর কর! ঘরে ছেলে ছেড়ে রেখে আসার দরুন মেয়েদের মতো খালি ব্যস্ততা দেখিও না। নিজের 'বিলেই' টাকে আগে সামলাও!

নীলেশ্বর ইন্নিকে খিঁচে ধরলে মাষ্টারবাবু লোকটা হীরালালকে বলল, অদুকে ডাকাও ত, হীরালালদা। তোমরা যাও, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে কাল থেকে ধানকাটা বন্ধ করে দাও— দেখবে ম্যাজিকের মতো কাজ হবে।

ম্যাজিক, ম্যাজিক— ঐ যে বলল ম্যাজিকের মতো কাজ হবে— তাতেই খুশি হয়ে উঠল নীলেশ্বর। মাঝে মাঝে মেঘলা হচ্ছে, তার উপর এই কদিন নাগাড়ে ধানকাটা বন্ধ করে দিলে পাকা ধানে মই হয়ে যাবে অদ্বৈতর। তখন রফা করতে ছুটে এসে হাতে পায়ে ধরবে সে।

ধরবেই ধরবে। ঐ আনন্দে চকচকে চোখে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে তো বেরিয়ে এল নীলেশ্বর। পিছু ডেকে হোলটাইমার লোকটা বলল, গুটে জরুরী কথা শুনি যাও। জ্বরজ্বালা হিনে নিজির ট্যাঁক খালি করি কেতেদিন আউ বুস্যয়-বুস্যয় খাবাইবে গিরিহা, ঝাড়ফুঁক ছাড়ি তাকু ডাগ্‌তর দেখাইতে হেব।

এ তো সত্যি কথাই। অসুস্থ লোকটাকে কতদিন আর কাজ না করিয়ে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে গিরিহা! ঝাড়ফুঁক ছেড়ে গুরভাকে ডাক্তার দেখাতে হবে— সে তো বলেই এসেছে নীলুয়া।

অতঃপর, হীরালালের কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে দলবল নিয়ে হাঁটতে লাগল সে। এখন অদ্বৈত পৈড়্যার পোখরি-আড়ার সেই চালাঘর ছাড়া কোথায় বা আর যাবে তারা। বড়রাস্তায় উঠে সেদিকেই পা চালালো নীলুয়া-সুরুয়া-বড়কই-লাইবুকারা।

দোরখুলির লোধাপাড়া হলে এতক্ষণে তারা হয় ঠাকুরবাঁধে নয় বুলান-হদহদির 'মগরায়' বসে গুড়াখু দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁত মাজত আর থু থু করে থুথু ফেলত, কতক থুথু গিলে ফেলে নেশায় টলত টলমল করে।

নীলেশ্বর ভাবল— গুড়াখু কিনে গিরিহার পোখরি-আড়ায় দলবল নিয়ে বসে বসে এখন গুড়াখু মাজলেই হত। হাটখোলায় গুড়াখু কী পাওয়া যায়? আসার সময় বঙ্কা মাহাতোর দোকান থেকে কাঁচা শালপাতায় একদলা কিনে আনলেই হত! এখন হাত কামড়াচ্ছে নীলুয়া।

নীলুয়া হাত কামড়াচ্ছে, নীলুয়া হাত কামড়াচ্ছে।

যেতে যেতেই শুনল ভ্যান রিক্‌সায় বলতে বলতে যাচ্ছে— কোথায় যেন কোন্ ভিডিও টাঁড়ে টিকিট কেটে ভিডিও দেখাচ্ছে। টিকিটের দাম—

গুড়াখু থাক, লাগুক দাম ভিডিও-ই দেখবে। একে তাকে জিজ্ঞাসা করতে করতে তারা গিয়ে উপস্থিত হল ভিডিও-টাঁড়ে।

আর গিয়েই দেখল— লাইন দিয়ে টিকিট কেটে হাসতে হাসতে, হেসে ঢলে পড়তে পড়তে ভিডিও-হলে ঢুকছে ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীরা আর হ্যাজাক-লাইটটা রাখার জন্য ছোলাভাজা-বাদামভাজা-চানাচুরভাজা দোকানীদের সাধাসাধি করছে স্বপন ভাতুয়া।

দেখামাত্রই তেঁটিয়া হয়ে উঠল নীলেশ্বর। তেঁটিয়া বলে তেঁটিয়া। তবু, আগে কোনমতে ঠেলে-গুঁজে লাইবুকা-বড়কই-সুরুয়া-হাড়িয়াদের 'হলের' ভিতর ঢুকিয়ে দিল নীলুয়া।

তারপর ইল্লি-কাঁধে এক লাফে হ্যাজাকঅলার মুখোমুখি। আগেই দেখেছিল স্বপন ভাতুয়া। আর তাই হ্যাজাক রাখার অজুহাতে এর-তার কাছে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল সে। মারবে নাকি জংলীটা? ঐ একটা পুঁচকে 'কাঠবিলেই' ছাড়া খালি হাতেই তো এসেছে নীলুয়া।

ভাবতে না ভাবতেই কাঠবিড়ালী বাঁধা শিকলিটার কোনাচটা সপাং করে মুখের উপর আছড়ে পড়ল স্বপনভাতুয়ার। তার আগেই শিকলির আঘাতে আলটপ্‌কা খসে পড়ে চুরমার হয়ে গেল হ্যাজাক লাইটের ম্যান্থেলটা। আলো আর জ্বলছে না।

গাল চিরে রক্ত ঝরছে স্বপনভাতুয়ার। হাত বুলিয়ে সে একমুহূর্ত দেখল— আঠা-আঠা চিট্-চিট্। তারপরেই রক্ত গরম হয়ে উঠল তার। না হয় শাল-আসন-ধ-পিয়াশালের দেশে সে জন্মায়নি, তা বলে কুকসিমা-নিম-কাঁটাবাবলার কাঁটা তো তার পায়েও কম ফুটেনি। মায়ের দুধ সে-ও তো কম খায়নি!

গায়ে অজুত-অর্বুদ হাতির বল নিয়ে নীলুয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বপনভাতুয়া। মার খেল সে বেদম, তবে মারও সে কম দিল না!

লোক জড়ো হয়ে গেল মেলা। কেউ কেউ মারামারি থেকে দুদিকে ছাড়িয়ে দিল দুজনকে। আবার কেউ কেউ অজানা একজনের হাতে দেশের লোক, বিশেষত অদ্বৈত পৈড়্যার ভাতুয়া মার খাচ্ছে দেখে চটে-মটে এক তরফা প্রচণ্ড মার দিল নীলুয়াকে।

ইন্নিকে এক হাতের তালুতে যতক্ষণ পেরেছিল মারের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল নীলেশ্বর। হাতের তালু আলগা হতেই সে বড়জোর চিক্ চিক্ করে যত পারল লাফ দিল এদিক থেকে সেদিকে।

একেবারে প্রভুকে ছেড়ে পালিয়ে গেল না ইন্নি। পালাবার পথ নেই, কারণ আরেক হাতের তালুতে এত মারামারির মধ্যেও শিকলিটা চেপে রেখেছিল নীলেশ্বর।

বেআইনী ভিডিও হলের সামনে মারামারির খবরে পুলিশ এসে পড়তে পারে যেকোনো মুহূর্তেই— ঐ ভয়ে আহত নীলুয়ার গায়ের ধুলোবালি ঝেড়ে বিনা টিকিটেই হলের ভিতর তাকে তড়িঘড়ি ঢুকিয়ে নিল ভিডিও হলের মালিকরা।



চড়কাপাড়ার না, নেকবাটিয়ার 'টিপকল' থেকে গুরভার জন্য তুক-তাকের জল আনতে যাবে গুরভার বউ। তার সঙ্গে যাবে সুরুয়া।

তার মানে আজও অসুখ সারেনি গুরভার। তার মানে আজও কাজে যাবে না গুরভা।

গুরভা কাজে যাবে না, গুরভার বউ যাবে না, সুরুয়াও যাবে না। এক সঙ্গে তিন-তিন 'জন' কামাই! জানতে পারলে চটে মটে একশা হয়ে যাবে অদ্বৈত। দলটার উপর যত না বিরক্ত হবে তার চেয়েও বেশি বিরক্ত হবে বসন্তের উপর। কামিল্লার পো এবছর কী ধারার লোক গছিয়ে দিয়ে গেছে তাকে!

দলের লোকজনের কিন্তু আপত্তি নেই। একটা শুভ কাজে যাচ্ছে— যাক না, যাক! দুজন যাচ্ছে, বরঞ্চ জল একটু বেশি করেই আনুক। আনলে অনেকেরই উব্‌গার হয়— কত লোকের কত প্রকার অসুখ!

যেতে বায়না ধরেছিল লাদনগাড়িয়ার বিটিছানাও। তাকে মানা করে দিল দলের বয়স্ক লোধারা। বলল— সকলে তো আর গিরিহার কাজকাম ফেলে তুক-তাকের জল আনতে অতদূরে যেতে পারে না। না হলে কার না ইচ্ছা হয়? কত রকম অসুখেই কে না আর ভোগে?

গুড়কুঁদা— ঐ কেবল একজনা— এত করেও তার বিদ্যা 'ফেল্' মারছে দেখে ফের ভোরে উঠেই ঝাড়তে বসেছিল গুরভাকে। যতটুকু জানে তার মধ্যে সেরা— ঐ যে ঐ মন্তরটা— "শালকাঠ পিয়াল মুড়া দুবলা দলা হাড়ির মুড়া। এ বাট ছাড়িঁ সে বাটে যা হরিণ-মিরগি ধরেঁ খা।। লাগলি বন্ধন ছাড়বি নাই। কার দোহাই— সীতা শ্রীরামের দোহাই"— আউড়েই তো গা বেঁধে দিয়েছিল গুরভার। দিয়ে বলেছিল— যাচ্ছিস যা, এই বেলাটা দেখে গেলে হত নাই সুরুয়া?

মাথা নেড়েছিল সুরুয়া, সুরুয়ার মা। কে জানেত কোথায় কতদূরে নেকবাটিয়া! তারা

পুবালদেশের পথঘাট চেনে না— একে-তাকে 'জিগাস্' করতে করতেই তো যেতে হবে তাদের। তবু এবেলা গেলে সেবেলা ফিরতে পারবে। সেবেলা গিয়ে রাতভিত ফিরতে না পারলে কোথায় থাকবে?

তাই তো, ঠিকই তো। এ তো আর তাদের তপোবন জঙ্গলমহাল নয়। যত পারো সুতো ছাড়ো আর সুতো ছাড়ো— সেই তো এক খাল পেরোতে হবে সতের বার! বনকান্না-কুন্দড়ী-কাঁকড়ো কেঁদ-ভুড়রু-ভেলা-কষাফল বড়বালি-সরুবালি-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া কুরকুট-পটম-বনবরা-খেড়িয়া-ঝিকর-সাঁওসিন-বনখুকড়া পাঁড়কা-কয়ের-কপ্তি-ক্যারকেটা টুঁড়তে টুঁড়তে যত পারো যাও—ওদিকে পাঁচকাহিনা এদিকে কিয়াঝরিয়া, একদিকে নারদা-নিগুই-চাঁদাবিলা আর একদিকে কমলাসোল-টিয়াকাটি-পাথরডহরা— ঐ তো বড়জোর সীমা-সীমানা। সুতো গুটিয়ে নিলেই এর তার ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে এসে পড়া।

এক জঙ্গলেই তো সাঁওতাল-ভুঁইয়া-ভূমিজ-কাম্হার-কুম্হার-মাহাতোরা। কিন্তু সসাগরা নামাল দেশ আড়ে-দীর্ঘে যে কত ক-ত বড়— তার সীমা-পরিসীমা তো গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা-নিয়তি-রুদনী-আদরীদের জানা নেই।

জানা নেই, জানা নেই।

অজানার উদ্দেশ্যে ছাউ সুরুয়ার হাত ধরে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ঘড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গুরভার বউ।

সে তো আর জানে না কতদূরে নেকবাটিয়া— সে কী এখানে? কড়িয়া-বামনদা থেকে মোরাম রাস্তায় আরো পুবে শোলপুর-জেনকাপুর, তা বাদে উত্তরে দক্ষিণআড়বনা-চড়কাপাড়া-গাজীপুর, সামনে সায়র সরশঙ্কা, সায়র তো নয় সাগর, পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতেই মির্জাপুর, অবশেষে নেকবাটিয়া—

আর না হয় পশ্চিমে পাইকবাড় হয়ে পীচরাস্তা, তা বাদে বকুলতলা- সরশঙ্কা, আরো পশ্চিমে রেললাইন— রেল লাইন, রেল লাইন—

রেললাইনের ওধারে পড়ে থাকল দাঁতন-চাউলিয়া কৃষ্ণপুর-কৃষ্ণমাইতিপুর, এধারে কুহুড়া-করঙ্গি-শালিকোঠা-কাকরাজিৎ, পীচরাস্তাবরাবর সোজা পুবে চললে তুরকা-খাকুড়দা-জাহালদা, আর দক্ষিণে মোড় নিলেই নেকবাটিয়া—

নেকবাটিয়া, নেকবাটিয়া—

নেকবাটিয়ার 'টিপকল' টিপলেই হদ্ হদ্ করে জল। আর সে-জল আনতেই এতদূর থেকে তত দূরে যাওয়া। চা-দোকানেই শুনে এসেছে সুরুয়া— এত লোক যাচ্ছে তত লোক যাচ্ছে, কলের কাছে গাঁয়ের এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো মস্ত লাইন পড়ছে—

মাকে বলতেই মা বলল, চাঁড় চাঁড় চ, যদি ফুররাঁয় যায়?

তাই তো, জলদি-জলদি না গেলে যদি ফুরিয়ে যায়? মাটির তলে 'বস্মতায়' যদি জল আর না থাকে?

হেসেই উড়িয়ে দিল সুরুয়া। বলল, বস্মতা জলের উপ্রে ভাসছে মা, তলে জল মইধ্যে জল— তার জল কখ্নও ফুরাঁয় যায়?

হঁ তা ত ঠিকেই সুরু, খালি কী তলে-মইধ্যে, উপ্রেও ত জল আছে— মেঘপাতালে জল আছে নাই?

মায়ের জ্ঞানের দৌড় দেখে অবাক হয়ে যায় সুরুয়া। হ্যাঁ তাই তো। যাকে বলে আকাশ মেঘপাতাল— তাও তো জলে ভরা! আকাশ থেকে 'ঠপা ঠপা' জল তো 'ঝড়িয়ার' দিনে পড়েই। তবে কী 'বস্মতা' জলের উপরে নয়, জলের মধ্যেই ভাসছে?

সুরুয়ার মা গুরভার 'বহু' ততক্ষণে শোনাকথা বলতে লেগেছে। —গোড়ায় ত বস্‌মতা ছিল নাই, ছিল ত জল— অঝোর-ঝর জল! তার পিছুকে জলের উপরে বাসুকী নাগের পিঠে 'বস্‌মতা' হৈল। সেই থিক্যে বস্‌মতা ত নাগের পিঠেই আছে আর সে-নাগ অষ্টপহর ঘুঁমায় থাকে, ঘুঁমায় থাকে। ঘুমের ঘোরে লড়লে-চড়লে, 'করট' ঘুরলেই ত ভূমিকম্প হয়— নাই জানিস ত জেম্নে রাখ বেটা।

হাঁ-হাঁ, জানে বৈকি সুরুয়া। নাগমাতা বাসুকী নড়লে চড়লেই তো 'বস্‌মতা' টলমল করে, টলমল করে। বছরে একবার করে তো 'করট' ঘুরেই। 'করট' ঘুরলেই অর্থাৎ পাশ ফিরলেই তো নাগের পিঠে বসে-থাকা বসুমতী থত্থর করে কাঁপে! আর কাঁপলেই ভূমিকম্প।

নিচে জল মধ্যে জল উপরেও জল, যে-জলের তল-অন্ত নেই সে-জল কখনও ফুরোয়? তবু তড়িঘড়ি পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল মা-ছাউ। বলা তো যায় না— ধর্মের কল কাঁড়া-আঁকাড়া।

মোরাম রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে ধানবিল। কতক ধান ঝুনো হয়ে আছে পেকে, কতক ধান এখনও ঠিকমতো পাকেনি। কতক ধান কাটা হয়ে পড়ে আছে মাঠেই, কতক উঠে গেছে কাঁধে-বাঁউকে-মাথায় গরুর গাড়ি-ট্রাক্টরে চেপে খামারে।

নামালিয়ারা এখনও মাঠে নামেনি। কটা ঢেপচুপাখি ভুচুং-ভাইচুং করে ডাকতে ডাকতে ধানবিলের এ-মুড়ো সে-মুড়ো লেজ নাচিয়ে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুরভার বউ মনে করল— হয়ত এতক্ষণে কাজে বেরুবার আগে 'ভুজা'র জন্য চাঁদবদনীর পীড়াপিড়িতে গিরিহা গিরিহানীকে বলতে লেগেছে— 'কাঁই গো শুনুচ? চন্দ্রবদনী ভুজা মাগুচি।"

লম্বা হাতে এক পাছিয়া মুড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসছে দূর্গা 'মেড়ের' মতো দেখতে গিরিহানী— গুরভার বউ যেন স্পষ্ট দেখল!

মোরামরাস্তায় আগে-পিছে লোক যাচ্ছে। বেটা-ছেলে মেয়ে-ছেলে। কারোর হাতে ঝোলা-ব্যাগ, বোঁচকাবুঁচকি। কেউবা খালি-হাতে। জল আনবার হাঁড়া-কলসি গাড়ু-গাগরা নিয়ে কাউকেই তো তারা যেতে দেখল না! খালি একজনা— ঐ একজনই— এই তো একটু আগে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে মস্ত একটা জারিকেন ঝুলিয়ে সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল সাঁই সাঁই করে।

সে কী ধর্মের জল আনতে চলেছে নেকবাটিয়া? ডেকে যে জিজ্ঞাসা করবে সুরুয়া তার আগেই অনেকদূর চলে গেছে সাইকেলিয়া!

সাইকেলিয়া, সাইকেলিয়া।

সেই তখন থেকে ভাবছে সুরুয়া— এমন একটা সাইকেল, আহা রে, তার যদি নিজেরই থাকত! তাহলে আর ভাবতে হত না, অতদূর নেকবাটিয়া যেতে এতদূর হাঁটতেও হত না, পিছনের ক্যারিয়ারে মাকে বসিয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঘটি-গাগরা ঝুলিয়ে টঙস্ টঙস্ করে এতক্ষণে সেও তো চলে যেত নেকবাটিয়া!

এমন একটা সাইকেলের দামই বা কত? হাজার বারো শ'? তারাও তো বাপ-বেটা-মা পাঁচজনে মিলে এতদিন নামাল খাটছে, এই কদিন না হয় বাপের অসুখ করেছে, আজ না হয় তারা দুজনে কামাই দিয়েছে, তবু তো—

তবু তো নীলুয়া কাল বাপের হয়ে বলতে গিয়েছিল পার্টি অফিসে, কাজ করতে এসে কাজ করতে করতে কারোর অসুখ করলে তার খাওয়া-দাওয়া সহ তাকে পুরা বেতন দিতে হবে!

তার উত্তরে পার্টির 'মাষ্টার-মাষ্টার' লোকটা তো বলেওছে, হ্যাঁ তা দিতে হবে, আর সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলটা বাঁকাতে হবে, তার মানে কাল থেকে ধানকাটা বন্ধ।

গিরিহা অদ্বৈত রাজি না হলে সত্যি সত্যিই কী আজ থেকে ধান কাটা বন্ধ করে দেবে নীলেশ্বর? কে জানে এতক্ষণে ওদিকে কী হল, হয়ত অদ্বৈতর সঙ্গে নীলুয়ার জোর বেধে গেছে বিতর্ক, টেঁটিয়া তো বড়ো কম নয় অদ্বৈতও!

ভাবতে ভাবতেই আরেকটা সাইকেল, আরেকজন সাইকেলিয়া, পিছনের ক্যারিয়ারে দড়িতে বাঁধা দুধ বয়ে নিয়ে যাবার দু-দুটো ক্যান্। দুধ কী আর, ধর্মের জল আনতেই নেকবাটিয়া চলেছে সাইকেলিয়া।

ফুর্তিতে গাইতে গাইতে চলেছে, সুরুয়া স্পষ্ট শুনল জল আনতে যাবার গীতই গাইছে লোকটা— "কাঁসার গাগরী ঝলকে যাই যেই ঘাটে যাই গো রাই—"

সুরুয়া দুম্ করে ভেবে বসল— সাইকেলিয়া ঘড়া-কাঁখে তার মাকে দেখেই গীত ফেঁদেছে, তবে কাঁসার ঘড়া তো নয় অ্যালুমিনিয়ামের ঘড়া এই যা!

সুরুয়ার মা পিছন থেকে সুরুয়াকে খাম্চে ধরে বলল, লোকটাকে জিগাস্ কর ন মার— ঠিক্কেই রাস্তায় যাচ্ছিস কী নাই?

তাই তো, লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হত, সাইকেলে টিনের ক্যান্ ঝুলিয়ে সত্যিসত্যিই তুক-তাকের জল আনতে সে যাচ্ছে কী না নেকবাটিয়া? তাই যদি হয় তবে নেকবাটিয়া আর সে কতদূর? এখান থেকে সোজাই যাবে তারা নাকি আর কিছু দূর গিয়ে ডাইনে- বাঁয়ে এদিক-ওদিক বাঁকতে হবে?

সিধা হোক বাঁকা হোক, তাদের রাস্তা তাদের কাছে, হুটমুট একটা লোক যে কী না তার মাকে নিয়ে জল আনতে যাবার গান বাঁধে, তাকে অত খাতির করে 'জিগাস্' করা কেন—

মাকে মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল সুরুয়া, বলল, ঠিক-বেঠিক কী আবার, ঠিক্কেই ত যাচ্ছি— এখনো সুরশুঁকা সায়রই এল নাই!

হ্যাঁ তাই তো, সরশঙ্কা দীঘি, দীঘি কী আর সায়র, সায়রও নয় সমুদ্র। আড়ে-দীর্ঘে যে কত যোজন! জল আর জল, এদিকে দাঁড়ালে নাকি ওদিকের 'আড়া' দেখা যায় না। কোথায় লাগে তোমার মাঝুড়ুবকার গহমবাঁধ-ঠাকুরবাঁধ!

গুরভার বউ মনে-মন উথলে উঠল, দেখব-দেখব করেও এতদিন দেখা হয়নি তার। আজ না-চাইতেই দেখা দিতে সে হাজির হবে একটুবাদেই, এই তো আরেকটু গেলেই, চলা পথের ধারে—

'নামালে' না এলে কী আর এতকিছু দেখা হত তার? এই যে চারধারে— গেঁতুই, দুধকলমা, লাঠিশাল, হাজার-নয় না হাজার-দশ— কত কী 'ইঞ্জিরি' নাম, এতসব ধানের শুঙে গা বিঁধাতে কত যে সুখ কত যে আরাম, গা শির-শিরানি— নামাল খাটতে না এলে কী আর এতকিছু জানা হত তার?

তারা তো বড়জোর জানে, সাঁওতাল-তাঁতি-মাহাতোরা চুরচুবুদ্দা কেঁদবুদা আঁটারিলাটা কুড়চিলাটা ঝুড়ে ঝুড়ে ডাহি বানিয়ে 'আশ ধান' কদো-গুঁদলি বুনে, আর ডাহি-কে-ডাহি মকাইয়ের চাষ করে, কুরথিকলাই করে—

যেতে-আসতে রাস্তার ধারে, গোবরার মকাইক্ষেতে কুরথিবিলে, লুকিয়ে-চুরিয়ে কত যে মকাই তারা রট্ রট্ ভেঙে খেয়েছে, কত যে কলাই কুরথি ছিঁড়ে খেয়েছে কাঁচায়! খেতেও তো বেশ, দুধ দুধ—

এতক্ষণে পায়ের 'আঙট'-এর দিকেও চোখ গেল লোধানীর, আলোয়-ঝালোয় ঝকমকাচ্ছে রূপার আঙট! একটা হয়েছে, আরেকটাও হবে, দেবে না মানে?— ঐ বসন্তিয়াই দেবে। নামাল-ফিরতি হাতের নাগালের মধ্যে কামিল্লাকে একবার পায় যদি লোধানী, তবে, চুলের মুঠি ধরে টেনে-হিঁচড়ে একশা করবে, মিটিয়ে নেবে হাতের সুখ—

—কী-ই না করি একবার ধরা দিয়েই দেখুক না কামিল্লা মুখপোড়া নৈস্যা। আপনার মনে বলে ছেলেকে ধরতে একটু জোরেই পা চালাল লোধানী, তার হাত দুটো এখন থেকেই সব্ সব্ করছে।

সুরুয়া নতুন কেনা সাইকেল ছুটাচ্ছে দোরখুলির লাল রুগড়িভরা রাস্তায়, টায়ারে-রুগড়িতে সর্ সর্ আওয়াজ! এই গেল সে বুধুতাঁতির ঘর পেরিয়ে নারদার জঙ্গলে। জঙ্গলের ওধারে মাদা করে করে বাবুইঘাসের চাষ করেছে মাহাতোরা। এ-মাদা সে-মাদা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে সাইকেল চালিয়ে কত কী কসরৎ দেখাচ্ছে সুরুয়া! এই সাইকেলের সিটের উপর বসে বসেই ডিগবাজি খাচ্ছে সে, এই পিছনে মুখ করে সাইকেল ছুটাচ্ছে সামনের দিকে খেল দেখাচ্ছে বটে সার্কাসের, আর মনে মনে ভাবছে— এখন কী, জোছনারাতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালাতেই আসল আরাম। ক্যারিয়ারে লোক বসিয়ে সাইকেলের রডে প্রায় বুক ঠেকিয়ে ছুটাও রে সাইকেল সাঁই সাঁই! ডুবকা-ডুংরি লাটা-পাটার পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে উলুরি-ঝুলুরি গাছ-গাছড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো এসে গায়ে পড়ছে ছপ্‌কা ছপ্‌কা, উল্টোদিক থেকে কুলকুলিয়ে আসছে হাওয়া, তখন মনে কী আর হয় না— "আম পাতা জোড়া জোড়া মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া?"

সাইকেলে চড়ে সুখজুড়ির গোবরাসাঁওতালের ঘরে, একেবারে নাচদুয়ারে এসে ক্রিং ক্রিং 'বেল' বাজাচ্ছে সুরুয়া।

বেল শুনে বুড়হা সাঁওতাল ঘরের বাইরে এসে তার টাঙির মতো বেঁকানো মোচে তা দিতে দিতে বলছে, কার ঝেড়ে আনলি?

সম্বিত ফিরে পেয়ে সুরুয়া আব্দার করল, নামাল-খাটা টাকায় একটা সাইকেল কিনলে হয় না? জিনিসটা থাকলে সুবিস্তা কত! এই যে এখন—

খানিক চুপ থাকল সুরুয়ার মা, পরক্ষণেই শ্বাস ছেড়ে লোধানী বলল, হঁ কিনলেই হল, দর এমন কী আর, কিন্তুক মনা, যেই দেখবে সে-ই বলবে— চুরিচামারি করেছে বোধায়—

হক টাকায় কিনলেও?

হঁ, সেই বলে নাই— ভালার সব ভালা মন্দের সব শালা?

রাগে মায়ের কাঁখ থেকে ঘড়াটা ছিনিয়ে নিল সুরুয়া। নিয়েই ছুঁড়ে ফেলল না, বরঞ্চ মায়ের কষ্ট লাঘব করতেই হাতে ধরে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু কতদূর আর নেকবাটিয়া? সরশঙ্কা সায়রই বা আর কতদূর? সরশঙ্কা, সরশঙ্কা। নীলুয়া বলেছিল— দেখবি ঐ জলার পাড়ে এখনো একটা অর্জুনগাছ আছে, ঐ গাছে বসা স্বয়ং ভগবানকে আমাদের জাতেরই জরালোধা কাঁড়ে বিঁধে মেরেছিল। ভগবান মরে গেলে তাকে আবার ঐ গাছতলেই সব লোধা মিলে পুড়িয়েছিল, তার চিহ্ন এখনো বর্তমান। দিনটা ছিল 'মকর-সাঁকরাত', তাই আজও মকরে পুকুরআড়ায় মস্ত মেলা বসে। আশপাশের বেনাডুবি, শঁকরিডাঙর লোধারা তো আসেই, তাছাড়াও রাজ্যের লোধা এসে 'মকর-যাত' বসায়—

নীলুয়া এতও জানে, নীলুয়ার কথা মনে আসায় দুম্ করে কাল রাতের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল সুরুয়ার।

'ভিড়িও' দেখতে গিয়ে কাল রাতে কী কাণ্ড, মারামারি! চিঁড়রা-বাঁধা শিকলির চাবুক মেরে স্বপনভাতুয়ার নাক-মুখ ফাটিয়ে দেবে না নীলুয়া? তবে নীলুয়াও কম মারটা খায়নি। জোর লড়াই, দু-পক্ষই সমান সমান, তবু যেন নীলুয়ার জোরটাই বেশি। যেমন সে তড়পেছে পার্টি

অফিসে, তেমনি তড়পেছে ভাতুয়াটার সঙ্গে। লোকজন এসে না ছাড়ালে একটা কিছু তো হত, ঘটতই।

কিন্তু কেন যে শুধু শুধু গিরিহার ভাতুয়াটার উপর সারাক্ষণ রেগে বোম্ হয়ে থাকে নীলুয়া— সুরুয়া বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না—

যেন একজনের উপর আরেকজনের জাত-আক্রোশ। শুধু শুধু কী আর, একটু হলেও ঠারে ঠুরে বুঝতে পারে বৈকি সুরুয়া। মূলে ঐ চাঁদবদ্‌নীটাই—

যেতে যেতে গুরভার বউ পিছিয়ে পড়ল, আর হাঁটতে পারছে না। মোরাম দেওয়া রাস্তায় সেই তো সকাল থেকে হাঁটা— রুঁ রুঁ!

কী, কী হল? হাঁটতে পারছিস নাই?

নাই, বেড়ে খরা, ঐ গাছতলটায় টুকচার বসি, আয় মনা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মায়ের ডাকে ঘুরে দাঁড়াল সুরুয়া। আজ অবশ্য রোদটা এখন থেকেই চড়তে বসেছে। বাদল কাটা, এই 'ছাঁয়রা' তো এই খরা।

এ তো আর মাঝুড়ুব্‌কা-সুখজুড়ি কী তপোবন জঙ্গলমহাল নয় যে এক হাত অন্তর অন্তর এই লাটা সেই লাটা, এই ঝোড় সেই ঝোড়, আঁটারি-চুরচু পড়াশ-কুড়চি ডকা-ভাদুর ডুব্‌কা-ডুংরি। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকা শাল-পিয়াশাল ধ-আসন কেঁদ-বেল ভেলা-ভুড়রু করম-কইমের দল-দঙ্গল। তার উপর আছে সীতানালা, এক খাল সতের বার। তার 'পায়রা চঁচ্‌রা' জল, দুধারে ঘাসবন, ঝামাপাথর। চাগড়া চাগড়া রসকলির তিলকমাটি। আর জলে পুরু ভেলভেটের তুল্য শুশনিশাক। ঝোপঝাড়ে 'চেঁকাশাক', খেতেও তো বেশ টক টক! সেই আছে না— "রাম ভাঙেন তরুডাল লক্ষ্ণণ ধরেন শিরে। তাহারই ছায়ায় সীতা চলেন ধীরে ধীরে"—? ছায়া তো ছায়া; লোধাজনমানুষ দু'হাতে ঝোপ ফেড়ে ঢুকে যায়, যেন মায়ের গর্ভে ঢুকে—

সে-গর্ভের ওম্ লোধানী এখানে আর পাবে কোথা। এখানে তো "একা নদী বিশক্রোশ"— গাছপাতাহীন টানা মোরাম কী পিচের রাস্তা—

গাছতলে বসতে বসতে গাছের উপরের দিকে তাকিয়ে সে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, এঁক্কেড় বেঁক্কেড়, ইটা কী গাছ বট্‌ঠে?

আঁকাবাঁকা, কে জানে কী গাছ! সুরুয়া চিনতে পারে না। নামাল দেশের গাছপালা তারা ঠিক চিনতে পারে না, কেমন যেন খসখসে পাল্‌হা-পতর, শালপাতার মতো তেল-চুকচুকে পাতা এদেশে একটাও নেই।

আর কী সব নাম— টভা, খদির, করঞ্জা, গাব, পিটলি, ঝাউ, হিজল, গরান, ডেঁউস! খালি যা কাঁটা ভাবুর— কাঁটা বাবলা— ঐ যা একটা চেনাগাছ এখানকার ডাঙা-ডহরে জমির আলে যত্রতত্র দণ্ডায়মান!

সুরুয়া বলল, ঠিক নাই জান্নি মা, আঁইশা গাছটাছ হবে।

ধুরো! আঁইশা গাছ? —সে তো আলাদা, পাকা জামের পারা ফলসব, কত্‌ত খেঞেছিস— খাস নাই?

হুঁ-অ।

কিন্তু হুই দ্যাক্—

বলেই গুরভাবউ আঙুল তুলে গাছের মগডালে দেখায়। খালি কী মগডাল, উপরের ডাল তলার ডালেও হল্‌দে পাকা চালতার মতো ফল সব।

সুরুয়া মাটির ঢেলা খুঁজে তাক করে— উপর টুলটুলি।

আর সেই বলে না— যেখানে শর সেখানে শবর— অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ, মাটির ঢেলা খেয়ে পাকা ফল খসে পড়বে না মাটিতে টুঙ্ করে?

পাকা ফলটা ফাটিয়ে খাবে কী খাবে না— নাকে শুঁকছে সুরুয়া, আচমকা কোত্থেকে এক হল-বলি ছাগলচরানী মেয়ে এসে বলল, খাও না খাও, বিষ নুহে ডেঁউচ ফল।

ডেঁউস ফল, ডেঁউস ফল। বিষ নয় খাবার জিনিস, খাও না খাও—

বলেই সে নিজেও ঢিল তুলে দুলে দুলে ছুঁড়তে লাগল, আর প্রায় গুনগুন করে বলতে লাগল—

আয় আয় রে কাজল পাতিয়া
গাই মুনিতে যিবা,
মা বাপ গালি দিনে যুগি ভেশ হবা।
নিদ মাড়নে শুইবু কেঠি?
গাই পেটতল।
শীত করণে ঘুড়িবু কিস?
গছ্র বকল।
ভুখ করনে খাইবু কিস?
জষ্টি মাসর ফল ....

একটা পাড়ল, দুটো পাড়ল, তিনটে পাড়ল, পাড়তে পাড়তে 'এলা' হয়ে গেল মেয়েটা। গুরভার বউ 'হাটুয়া ঝিঅ'টার কিত্তি দেখে তো থ! ফিস্ ফিস্ করে কী যেন 'ঢক্' বলছে— কী যেন—

গাই চরাতে যাবে, আর তার জন্য মা-বাপ গাল পাড়লে যুগি-ভিখারীর ভেক ধরবে, আর ঘুম পেলে কোথায় শোবে? না, গাইয়ের পেটতলে। শীত করলে গায়ে কী দেবে? না, গাছের বাকল। আর খিদে পেলে খাবে কী? না এখনকার, এই জষ্টিমাসের ফল। জষ্টিমাস, জাম-জামরুলের কাল—

লম্বা লম্বা খসখসে পাতা, ডেঁউসগাছ, কে জানে বাবা, বাপের জন্মেও তো কখনো নাম শোনেনি সুরুয়ার মা! তার উপর হল-বলি মেয়েটা যখন কাছে এসে ডেঁউচ ভেঙে কোনটা খেতে হবে আর কোনটা ফেলতে হবে বুঝাচ্ছে তখন সে পেট খুলে হাসল

হাসট কেনি?

নাই অম্নি, শুদাশুদাই।

হাটুয়া মেয়েটা তো আর জানে না সে কাকে কী বুঝাচ্ছে, খাপ খুলেছে সে কোথায়! সুখজুড়ি-মাঝুডুবকা-নারদা-নিগুই, এদিকে কমলাসোল ওদিকে পাঁচকাহিনা, গোটা তপোবন জঙ্গলমহালের নাড়ীনক্ষত্র যাদের চেনা, বনকুন্দড়ির 'ডগ' কোথায় মেলেছে কতদূর, বনকাল্না-বনকাঁকড়োর ফুলে কোথায় জালি ধরেছে কতটা, কোথায় কোন খালধারে লাটায়-বুদায় লহ লহ করছে বনপুঁই, কেঁদ-ভেলা-ভুড়রু আম-জাম-জামরুল বৈঁচি-কুল-সেঁয়াকুল মেহামাদাল-বেল-কোৎবেলের গাছে ফুল ঝরে গিয়ে কখন আসবে ফল, সে ফল কখন 'হালি' হবে আর কখন পাকবে, কোন ডুবকায় দিনে দিনে চিরিক চিরিক করে বেড়ে চলেছে চুরকাআলুর 'লত্', পানপাতার মতো পাতা যে-আলুর সেই পানআলুর 'পোঙ' এতদিনে কোথায় কতটা বড় হল, কোন ডুংরিতে আঁটারি-চুরচু লাটার আড়ালে তলে তলে খামআলুর মূল 'খামের' মতো মোটা হয়েছে কী না, সরুবালি-বড়বালি-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া-পরবছাতু-শালপঙড়া, আর তাদের ঘিরে থাকা লাল ভেলভেটের মতো জামা পরা বোতামপোকা কোথায় কোন বাঁশতলে কী

কষাফলতলায় খইচালার মতো ফুটে আছে রদো বদো, কোন মহল্লায় শালগাছের টুঙে পাতার 'পটম' বেঁধে ঝুলে আছে সাদা সাদা ডিমওয়ালা লাল পিঁপড়ে, 'কুরকুট পটম', শাল-আসন গাছের ক্ষীর চোখের জল পড়ার মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে কোথায় কোন গাছে জমে জমে কতটা ধুনো হল, কোথায় কোন ডকাগাছের ডালে কী কুড়চিগাছের গুঁড়িতে বেঁধে আছে কতটা 'গ্যেঁঠালা', কোন 'হুড়ি'তে কোন হনুমান চৌকিতে কোন 'ঢড়্হা'য় পাওয়া যাবে কানকুলি-মেঢ়ামারী-শ্বেতবেড়ালা-দধিগড়-কালকাসুন্দীর শিকড়, গদগাছ, কোন খালে কোন বিলে কোন গাঢ়ায় কোন গাঢ়িয়ায় হাত দিলেই মিলবে খঙা-বঙা-দাড়ুয়া-সরপুঁটি-দাঁড়িয়া ঢ্যামনা-গোই-গোধি-কাঁকড়া-কুঁচুয়া-কাছিম সব, সব যাদের একধারসে মুখস্থ, সেই তাদের কাছে, তাদের একজনার কাছে, একজনা কী দু'জনার কাছে হাটুয়া মেয়েটা এখন বুঝাচ্ছে, ডেঁউস না ডেঁউচ ফলের কোনটা খেতে হবে কোনটা ফেলতে হবে?

হাসছে বটে গুরভার বউ, কিন্তু সেও তো সত্যি সত্যি জানত না এ-গাছের আদি-অন্ত! তবে সে না জানুক গুরভা জানে, আর গুরভা না জানে যদি তো রাইবু জানে। রাইবু না জানলে গেঁড়া জানে। গেঁড়াও ফেল মারলে বড়সোলের গজনা— মাথার উপর আছে এখনও ঐ একজনা—

এই এক পুঁচকা হাটুয়াছোঁড়ির কাছে গুরভার বউ হারবে না কিছুতেই। কথা ঘুরিয়ে সে বলল, এ গো হঁ হঁ— যেমন আমাদের কচড়া, কাঁচায়ও খাওয়া যায় পাকায়ও।

কচড়া, তার মানে মহুয়াফল। লোধা তো লোধা, কাম্হার-কুম্হার ভুঁইয়া-ভূমিজ সাঁওতাল-মাহাতোরাও কাঁচা কচড়ার তরকারি খায়। গাঁছপাঁঠার মতো খেতেও তো বেশ!

পুবাল দেশের হাটুয়া মেয়েটা আবার কচড়া চেনে না, কচড়া-মচড়া কে জানে কী সব, সে চোখ বড় বড় করে বলল, তুমারমনে যাব কাঁই, ঘর কঁঠে?

তাই তো তাদের ঘর কোথা, এক কথায় কী বলবে সুরুয়া, সুরুয়ার মা? দোরখুলি বললে কী চিনতে পারবে মেয়েটা?

অত কথার জবাব দিতে ভাল লাগছিল না সুরুয়ার, সুরুয়ার মা-ই বলল, হুই যে দেখছিস 'বেড়া'-টা হুল্‌কে হুল্‌কে যেদ্দিকে যাচ্ছে, গিয়ে যেখানটায় বুড়বেক, সেই বলে নাই মায়ের ছাউ মায়ের 'কড়ে' ফিরছে, —ঐখানটা আমাদের ঘর যে গ। কী বুঝলি?

হাসছে গুরভার বউ।

হাটুয়া ঝি কী আর 'ঢক'টা বুঝতে পারেনি, না ধরতে পারেনি? ধরতে পেরেছে বৈকি, ঐ তো সূর্যটা যেতে যেতে যেখানে গিয়ে অস্ত যাবে, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরবে— ঐখানে ঐ অতদূরে তাদের দেশ-গাঁ!

হাঁ হয়ে গেছে মেয়েটা। ঢোক গিলে বলল, ব্বাসরে! যাব কঁঠে, আ গো?

ধম্মের জল আনতে নেকবাটিয়া।

নেকবাটিয়া, নেকবাটিয়া।

হাটুয়ামেয়েটাও শুনেছে নেকবাটিয়ার টিপকল থেকে যে-জল উঠছে, সে-খেলে বড় বড় রোগ-ব্যারামও সেরে যাচ্ছে। তাদের গাঁ পাইকবাড়ের কত লোকই তো হাঁড়া-গাগরা জার-জারকিনে দুধের ক্যানে জল ভরে এনে ঘরে ঘরে জমাচ্ছে!

খালি এখন পর্যন্ত তাদের ঘরের একটা লোকও যায়নি। এত কাছে, বলতে কী হাত বাড়ালেই ধন্বন্তরি, তবু কেন যে যায়নি তার মাথায় ঢোকে না। মাকে গিয়েই সে এক্ষুনি বলবে— কেউ না যাক সে তো যেতে পারে? ছাগল নিয়ে কত দূর-দূরান্তে, শরশঙ্কা-বিদ্যাধর, এ-সায়র সে-সায়র, আড়বনা-গাজীপুর-চড়কাপাড়া— কোথায় কোথায় না সে যায়! আর এ তো ঘরের ধারে নেকবাটিয়া—

গুরভাবউ মনের মতো লোক পেয়ে তালাস করল, হেঁ মিনা, কোনদিক দিয়ে আর কতটা যেতে হবে নেকবাটিয়া?

অউ ত, বলেই হাত-পা নেড়ে নাকবরাবর উত্তরে আঙুল তুলে হাটুয়ামেয়েটা বলল, মুরামরোড দি' সিধা সরশঙ্কা, শুশনি-কলমি-শালুক ল ল করেটে, গাছতলকু গাছতলকু ছাই-ছাই, এবাটে মির্জাপুর সেবাটে পাশুবঘাট, চোখ তুলনে দিশুছি খাকুড়দার বাস—

অবশেষে সে বলল, এ বেলে ঘরকু কাম ন থাইনে মু তোরমনকু নেকবাটিয়া দেখেই লেই আসতে। এত্যে বেলে ঘরকু ন গলে মা মোকে মারিবু, যাই।

বলেই সে ছিপ্‌টি হাতে ছাগলগুলোকে মারবার ভঙ্গি করতে করতে তড়িঘড়ি খেদিয়ে নিয়ে চলল।

ফিক্ করে হেসে ফেলল সুরুয়া।

তুঁই যেমন, জিগাস করার আর লোক পেলি নাই! জানলে ত বলবে কতদূর আর কোনদিকে নেকবাটিয়া।

গুরভার বউ হাটুয়ামেয়েটার চলন পথের দিকে তখনও চেয়ে আছে, বলে, হঁ এক তালাটের মেইয়্যা, গাঁ-পাশের গাঁকে চিনবে নাই? তোর যেমন কথা।

কেন যে সুরুয়া মেয়েটাকে অপছন্দ করছে— সুরুয়ার মা বুঝতে পারছে না। অথচ কেমন সে গড়গড় করে বলল, এবেলা ঘরে না কাজ থাকলে তাদরেকে নিয়ে সে নেকবাটিয়া দেখিয়ে আনত, এখন ঘরে না গেলে মা তাকে মারবে!

গুরভার বউয়ের ইচ্ছা হল দেখতে— কেমন মা তার। ঐ তো ডাঙা-ডহর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছাগলগুলোকে বাটিয়ে নিয়ে চলেছে মেয়েটা। কাবরী ছাগল, ধবলী ছাগল। একবারের তরেও সে তো পিছন ফিরে দেখছে না?

একমাথা পাঁড়রা চুল, উলুরি-ঝুলুরি। কতই বা উমর— আট কী দশ। এ বেলা ঘরে তার কী কাম? কাম না করলে মা তাকে মেরে পাট করবে—

গুরভার বউয়ের মন গেল "মেইয়্যাটার" মা হতে। ঐ তো বাখুলে ঢুকতেই নাচ-দুয়ারে দু-দুটো ভাই-বহিন তালগাছ। তালচটা, হাওয়ায় নড় নড় তালচটার বাসা, পাতা ঝল্মড়! হঠাৎ হঠাৎ ঘূর্ণিতে খসে পড়া তালবল্লা একটা কী দুটা।

মেয়েটা গেছে ছাগল চরাতে, সেই গেছে তো গেছে! সে এসে ঘন ঘন দাঁড়াচ্ছে নাচ-দুয়ারে কপালে হাত রেখে— কই, এখনো তো আসছে না? আর কখন আসবে? অথচ কত কাম পড়ে আছে চারধারে! কোথায় কার সাথে মজে গেছে খেলায়— "চাক দুলদুল মাদালফুল" আর নয় তো "হোল্ কিত্ কিত্ বিন্দাবন"—

এক ধামা সিদ্ধ ধান এনে ফেলল খলায় সে। তারপর লাঙল চষার মতো পা দিয়ে চষে চষে ভাপা ধান মেলে দিচ্ছে রোদে। পা তার চলছে, কিন্তু মন তার পড়ে আছে বাইরে, ঐ যেখানে সায়রের ধারে শুশনি-কলমি লহ লহ করে, ডেঁউসগাছের তলে মেয়েটা ছাগল চরাচ্ছে।

পা দিয়ে ধান মেলছে আর ঘাড় উঁচু করে দেখছে— কই, মুখপুড়ী মেয়েটা তো এখনও আসছে না? "এ-ড়-রে" "এ-ড়-রে" করে ছাগল-ডাকার ডাক কী শুনতে পেল সে? ঐ তবে আসছে!

কত কাজ। এই বলে কেটে আনতে হবে কলাপাতা, ঢেঁকিতে পা দিয়ে ছাঁটতে হবে আতপ চাল, পাঁচ ঘরের দশজনকে ডাকতে হবে, দেখতে হবে পান-বিড়ির ব্যবস্থা। গাইটা হাম্বাচ্ছে, এক্ষুণি দুইতে হবে, দুধ তো লাগবেই পাঁচ সের কী দশ সের।

দেউলবাড় থেকে বামুনঠাকুর এখনো এল না, যা-না যা মিনা, দৌড়ে ডেকে আন। 'ডেকে আন' বললে কী হবে? বলতে তো হবে হাটুয়া ভাষায়— যা-না যা বাপা, খরখর ডাকি আন।

মেয়ে না এলে এত কাজ কে করবে? 'আঁখুশাল' থেকে মোষের গাড়ি করে ঘরে এসেছে একশ কী দেড়শ 'গুড়পায়া'। মেয়ের বাপ তো সেই কোন্ সকাল থেকে চক খড়ি দিয়ে দাগা মারছে কলসিতে! ক গণ্ডা ক কাহন। আর মাঝে মাঝেই গাইটার মতো হামলাচ্ছে, কাঁই গো শুনুচ?

কাছে গেলেই সেই তো, আঁধার ঘরে গাঁদার গুদুর, একবার হয়েছে আর তর সইছে না, মেয়ে এসে পড়লে তবু ছাড়।

ছাগলচরানীর মা হয়ে একেবারে অদ্বৈত গিরিহা-গিরিহানীর মতো করে সংসার সাজিয়ে ফেলেছে গুরভার বউ। ভর ভরন্ত সংসার। ধনদৌলত উপছে পড়ছে। কোথায় লাগে তোমার কুম্হারপাড়ার ভৈরবকুম্হার, সাবিত্রী-সন্তোষ!

কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না— আজ কিসের পূজা, কিসের পার্বণ? কলাপাতা-আতপচাল-দুধ, তার উপর বামুনঠাকুর, এসব তো পূজা উপকরণ। কী পূজা? শীতলা-মনসা-গরাম-বড়াম? মেয়েকেই বা এত কেন দরকার? সময়মতো না এলে পিটিয়ে পাট করবে কেন?

হাত ধরে টেনে মায়ের ঘোরটা ভেঙে দিল সুরুয়া।

ঢুলছিস মা?

ন্নাই, একটুন তন্দ্রা—

তন্দ্রা, তন্দ্রা।

ডেঁউসগাছের ছাঁয়রাও কম ঠাণ্ডা না, কী বলিস?

হঁ, ঠাণ্ডা। কিন্তু যেতে হবে ত নেকবাটিয়া?

হঁ-হঁ, চ ন্ন চ!

উঠে পড়েও পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে গুরভার বউ একবার অন্তত দেখল— মেয়েটা ছাগল বাটিয়ে কতদূর গেল! এতক্ষণে ঘরে পৌঁছে গেল কী?

ধানবোঝাই গরুর গাড়ি, ট্রাক্টর চলে চলে মাঠের উপর ধানক্ষেতের উপর স্পষ্ট হয়ে আছে গাড়ির লিক্। গাড়ির লিক্ ধরে বরাবর চললে একসময় তো পৌঁছুবে না পৌঁছুবেই কারোর না কারোর খলায় খামারে।

যখন বয়সটা কাঁচা ছিল, টঙস টঙস করে হেথা হোথা ঘুরে বেড়াবার মন ছিল, খালে-বিলে গেঁড়া-গুগলি খণ্ডা-বণ্ডা গরুর নাদি ধানের টুঙ কুড়াবার তাগদ ছিল, গাড়ির লিক্ বরাবর তখন হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কোথায় না চলে যেত গুরভার বউ! কখনো দলে ভিড়ে, কখনো একা একাই।

গাড়ির লিক্ দেখে ফের কেমন 'উধাস' হয়ে গেল নাকফুড়রি-সুরুয়া-হাড়িয়ার মা। যাবে নাকি লিক্ ধরে ধরে? 'নামালে' সব লিক্‌ই তো যায় হাটুয়াদের খলা-খামারে—

কই, আসবি ত? ফের দাঁড়ালি যে?

সুরুয়াও জানে মায়ের এই এক বাতিক আছে, ক্ষণে ক্ষণ উদাস, ভুলোমন। তার উপর ছাগলচরানী হাটুয়া মেয়েটা এসে কী যেন করে গেল মাকে, আর তারপর থেকে—

হঁ এই ত, চ ন্ন! মেইয়্যাটা কী যেন বল্ল— সুরগুঁকা নাক বরাবর সিদ্দা, গুশনি-কলমি-শালুক লহ লহ করছে—

তারা ছেড়ে এসেছে কড়িয়া-বামনদা-শোলপুর-জেনকাপুর, ঢুকে পড়েছে এক পঞ্চায়েত ছেড়ে আরেক পঞ্চায়েতে, দক্ষিণ আড়বনা-পাইকবাড়-গাজীপুরের ত্রিভুজও শেষ, পিছনে পড়ে থাকল ডেঁউস গাছ, সামনে ফের মোরামরাস্তায় উঠে চোখ তাদের জুড়িয়ে গেল।

এই তাহলে সরশঙ্কা?

সরশঙ্কা, সরশঙ্কা।

এ-আড়ায় দাঁড়ালে সে-আড়া দেখা যায় না, আড়ে-দীর্ঘে যে কত! সুরুয়া, সুরুয়ার মা তো আর জানে না সরকারবাহাদুরের লোকেরা, রেলবাহাদুরের লোকেরা চেইন টেনে টেনে মেপে জোকে নক্‌সায় দাগিয়ে রেখেছে— এ দীঘি দৈর্ঘ্যে পাঁচহাজার ফুট, আড়াই হাজার প্রস্থে।

গুরভার বউ এক দৌড়ে আড়ায় উঠে প্রথমে দুহাত জোড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে 'গড়' করল। তাতেও হল না, তারপর মাটিতে নম্‌থম্ শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

তকু গড় করুছি গো গড় করুছি—

মনে-মন বলল, কী হবে গিয়ে আর নেকবাটিয়া না যুগ্‌নীবাটিয়া, জলের ঠাকুর, তোর জলই নিয়ে যাই এক গাগরা?

বলেই হড়বড় করে সে নেমে গেল জলে। জল উছু-ডুবু না হোক, এখন গরমের কাল তবু সরশঙ্কার জল কখনো শুকোয় না, ছিল্ ছিল্ জল।

নাকি এ-দীঘি আর সে-দীঘি, সরশঙ্কা আর বিদ্যাধর, ভিতরে ভিতরে যোগ-সাজস— সাড়ে সাত ফুট উঁচু আর সাড়ে চারফুট চওড়া পাথরের সুড়ঙ্গ পথে জল আসা-যাওয়া করে অষ্টপ্রহর।

এ-জল শুকোবে কি! কে জানে তলে তলে কে কোথায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এক গঙ্গার জল মিশিয়ে দিয়েছে আরেক গঙ্গায়! এ তল্লাটে কত তো পুকুর— কলমা, অস্তিয়া, কামারিয়া, কুণ্ডু, রানা, রাজগেড়িয়া, ভেটিয়া, যৌলপনিয়া—

কলমি-শুশনি-স্মরস্তির বন লহ লহ করছে, দেখেই মন বলছে 'তুলি তুলি'। কোমরের শাড়ি সাপটে গুরভার বউ মন দিল শাক তুলতে। পুড়ুং পাড়াং কটা কলমির ডগ ছিঁড়েছে কী ছিঁড়েনি, হাঁই হাঁই করে দৌড়ে এল পাহারাদার।

করু কি করু কি, মাগনা পাউচু? দস্তুর মত ট্যাকা খরচ করি শাগ লগৈচি—

যে ক'টা ছিঁড়েছে তাও জলে ভাসিয়ে দিল লোধানী, লোকটা বলে কি? টাকা খরচ করে শাক লাগিয়েছে জলে?

এ তো আরেক নরসিঙা! সেই যে কথায় কথায় বলে, তোর বাপের বন যে কাটছিস? মুহূর্তে ধুলমাদুল মনে পড়ে গেল— রাইবু-গুড়গুড়িয়া-নরসিঙা—

নরসিঙা মরেছে, চালান হয়ে গেছে রাইবু-গুড়গুড়িয়া। পুলিশ জিপগাড়ির পিছনে কোমরের দড়ি বেঁধে দিল রাইবু-গুড়গুড়িয়ার। গাড়ি ছুটছিল, গুড়গুড়িয়া হ্যাঁচোড়-প্যাঁচড় করে ঘষ্‌টাতে ঘষ্‌টাতে যাচ্ছে। রাইবুই যা মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে হাতকড়া পরা হাত দুটো দিয়ে দড়ি টেনে ধরে দৌড়ুতে দৌড়ুতে যাচ্ছে। যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে....

ছাঁত্ করে পুকুরের জল থেকে উঠে এল গুরভার বউ। সুরুয়া তখনও হদিস পাচ্ছে না— কোনটা উত্তর কোনটা দক্ষিণ, কোনটা পূর্ব কোনটা পশ্চিম? অগ্নি কোনই বা কোনটা!

বেলা যেদিকে ওঠে সেটাই তো পূর্ব। বেলা উঠে গেছে অনেকটাই, কোনদিক থেকে উঠে এতদূরে এল— সেটাই ঠিক করতে এতক্ষণ হিমসিম খাচ্ছিল। এবারে বেলার দিকে মুখ করে দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে রুম রুম দাঁড়িয়ে থাকল সুরুয়া।

কী কচ্চিস?

দিক ঠিক।

কেনে, তোর ছামুটাই ত পুবদিক?

হঁ-হঁ, পাছুদিকটা পচ্ছিম, বাঁয়া উত্তর ডাঁয়া দখিন— দ্যাখ, ত মা, উদিকে ঈষাণ-অগ্নি-নৈঋত-বায়ু, ঐ অগ্নিকোনে কী গাদা করা আছে মাটির হাতি-ঘোড়া?

নাই জানি অগ্নি কী ফুগ্নি, কতক পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া ত আছে।

নীলুয়া বলেছিল— উটাই পীরবাবার দরগা মা, হাতি-ঘোড়া মানসিক দিয়ে যা চাইবি তাই পাবি।

ইস্! আগে জানলে বস্তাকুম্হারকে দিয়ে ঘোড়া-হাতি—

ঘুরে দাঁড়াল সুরুয়া, বলল, আসছে মকর-সাঁকরাতে আসব, তার ত দেরি আছে মা। মকর-সাঁকরাতে এখানে মস্ত 'যাত' বসে, কত্ত দূর দূর দেশ থাকতে লদ্ধারা আসে! লদ্ধাদেরই ত সুরশুঁকা মকর-সাঁকরাত!

অভিমানে ঠোঁট-বিদুর করল সুরুয়ার মা, নাই বাপ, মিছা কথা।

কী মিছা কথা?

ঐ যে বল্লি লদ্ধাদের সুরশুঁকা মকর-সাঁকরাত—

হঁ ত কী?

সুরশুঁকা মকর-যাত লদ্ধাদের লহে এখন হাটুয়াদের বাপ, ঐ যে হাটুয়া বুঢ়হাটা—

আড়চোখে চেয়ে দেখল সুরুয়া— গলায় কাঠমালা কাঁধে গামছা, খালি গা লোকটা সরশঙ্কার জলে নেমে কলমি লতের ডগ্‌গুলোকে পরম যত্নে বিছিয়ে দিচ্ছে। হয়ত নীলামে জমি ধরে কলমির চাষ করেছে!

একটা কী দুটা টুঙ ছিঁড়েছি কী ছিঁড়ি নাই, অম্নি হাটুয়াটা—

এতক্ষণে বুঝতে পারে সুরুয়া— কী কারণে লোকটার উপর বেজায় চটে আছে তার মা। বিড় বিড় করে বলছেও, খালভরা নৈস্যা! আসিস যদি দোরখুলি-বড়োডাঙা-কিয়াঝরিয়ায়, কলমি-শুশনি-নাহাঙা-ঘোড়াকানা-ঘলঘসি-কাজলপাতি-চেঁকা— যা তোর মনে চাহে তোকে মাগনা খাওয়াব, কত খাবি!

আসলে সরশঙ্কা দীঘির ধারে ধারে কতকটা ডাঙায় কতকটা জলে 'লিজ' নিয়ে চাষীরা কলমি করেছে, সেই কলমি-শুশনি ভেলভেটের তুল্য এখন লহ লহ করছে। তার উপর আড়ায় আড়ায় বনসৃজন প্রকল্পে লাগানো হয়েছে ইউকেলিপটাস, সুবাবুল। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে পুরাতন খদির-করঞ্জা-বেল-বকুল—

সুরুয়া নীলুয়ার কথামতো সেই অর্জুন গাছটাকে খুঁজছে, ঝাঁকড়া অর্জুন গাছ, যার ডালে পা ঝুলিয়ে বসে পা দোলাতে দোলাতে জরার কাঁড় খেয়ে মরে গিয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। গাছেই মরল, গাছতলেই তাকে পুড়িয়ে ফেলল লোধারা। তার হাতের শাঁখটা এখনও পোঁতা আছে ঐ সরশঙ্কার জলে!

তামাম লোধারা জানে, কিন্তু কেউ জানে কেউ জানে না— যে এখানেই এই নামাল দেশেই ঐ সেই অর্জুনগাছেই, অর্জুনগাছের ডালে অর্জুনতলেই ঘটে গিয়েছিল অতবড় কাণ্ডটা।

সুরুয়া মাকে বলতেই গুরভালোধানী আঁতকে উঠল! এনামেলের ঘড়া মাটিতে রেখে ফের দু হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে গড় করল।

দু'চোখ বুজে সে দেখতে পেল— ভগবান স্বয়ং গাছে বসে আছেন পা ঝুলাএঞ, পদ্দোফুলের মতো রাঙা পা দুখান, ত জরালোধা কাঁড়বাঁশ লিয়ে ইদিক-সিদিক ঘুরচে, ঘুন্তে ঘুন্তে গাছের উপর মিরগির কান দেখে কাঁড় ছেড়ে দিল্ল-অ, সেই কাঁড়ে ভগবান মরে যাচ্ছেন,

আর বলে যাচ্ছেন, জরা রে তু বেড়ে পুন্নবান, ইবার থিক্যে তোর জাত হবে বেরাম্ভনের চেয়েও বড়।

সুরুয়া খুঁজছে অর্জুনগাছটাকে। দৌড়ুচ্ছে, দৌড়ুতে দৌড়ুতে থমকে দাঁড়াচ্ছে। উঁ-হু, এটা তো পাকুড়, অর্জুন নয়। অর্জুন, অর্জুন।

নেকবাটিয়া আর এখন তাদের মনেও নেই। মনে নেই নামাল দেশের কোনো এক গ্রামে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে টিপকল টিপলে হুদ হুদ করে যে-জল বেরুচ্ছে সে-জল ওষুধের বাড়া, এক ঢোঁক খেলেই রোগজ্বালা হাওয়া!

সরশঙ্কার জলে চারধারে বক বসেছে মেলা। সাদা বক, কুঁচো বক। সুরুয়ার দৌড়ানিতে কঁ-অ-ক কঁ-অ-ক করে ডাক ছেড়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ মেলে উড়ে গেল দু-চাট্টা। উড়লও যেমন উড়ে এসে বসলও।

গাছ-গাছালির ছায়া। ছায়ায় ছায়ায় গরু চরছে। গরুবাগালরা কেউ উঠেছে গাছে, দু-চারজন বসে আছে গাছতলে।

গুরভার বউয়ের এতক্ষণে মনে হল— এ যেন কতকটা মাঝুড়ুব্কার ঠাকুরবাঁধের আড়া। ছাব্কা ছাব্কা ছায়া-ছাঁয়রা, ছাব্কা ছাব্কা খরা। গাছতলে গাছতলে গরু চরছে, জায়গাটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, জল-ছায়ায় কাল্হা।

তবে সার সার কেঁদগাছের মুড়ো, আঁটারি-চুরচুর লাটা, মাত্বর রাইবুলোধার বহিন-বহিন ধ' গাছটাই বা এখানে কোথা? এখানকার মতো পীরের দরগা, ভাঙা অ-ভাঙা ঠাকুর-দ্যাবতার মন্দির, এত কলমি এত শুশনির বন-ই বা সেখানে কোথা?

সুরুয়া ক্ষণেক ক্ষণ দৌড়ুলেও সুরুয়ার মা হাঁটছিল ধীরে ধীরে, চারপাশ দেখতে দেখতে। তারা মোরামরাস্তা ছেড়ে পীর নস্কর দাওয়ানের আস্তানার গা ঘেঁষে সরশঙ্কা পাওয়ার স্টেশন পেরিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে, যেদিকে যাবার কথা নয় সেদিকেই হেঁটে গেল কিছুটা।

অবশেষে সুরুয়া পেয়েও গেল ঝাঁকড়া অর্জুনগাছটা। এই কি সেই? অদূরে একটা বটগাছও তো আছে। বকুলগাছ, চৌরাস্তা। এদিক দিয়ে পীচরাস্তা বরাবর গেলেই তো কুহুড়া-করঞ্জি।

গাব-পিটালির ঝুঁজকো জঙ্গল, জাড়াগাছ। ডাকছে কুয়া-কুইরী। গুরভার বউ দেখল-লম্বা ঘাড় কালো কুচকুচে 'জলকুয়া' উঠছে-ডুবছে। মেঘপাতালের দিকে খাড়া হয়ে চেয়ে আছে শালুক কুঁড়ি, পদ্ম নাল।

হাটুয়া 'মেইয়া মানুষরা' জাঙের উপর শায়া-শাড়ি তুলে ছবক্ ছবক্ জল হিলিয়ে জলে একদিকের গাল পর্যন্ত ছুঁইয়ে কুড়োচ্ছে গেঁড়ি-গুগলি, পানিফল।

গুরভালোধানীরও মন গেল— তুলি তুলি। ভয়ে মুহূর্তে সিঁটিয়েও উঠল— কে জানে কখন এসে পড়বে হাটুয়া দেশের হাটুয়া পাহারাদার! এসেই বলবে, হেই হাটো হাটো, রাজার বাগান থেকে হটো!

অর্জুনগাছতলায় দাঁড়িয়ে সুরুয়া হাঁক পাড়ল— এই যে গ মা এদিগে, এদিগে!

যেন লোধাঝাড়ে ঝুড়েই একদৌড়ে ছেলের কাছে পৌঁছে গেল লোধানী। মনে-মন বলল, এই তাহলে সেই গাছ?

ফের দুহাত জড়ো করে নমো করল। নমো করতে ঘাড় তুলেই দেখল— গরুবাগালরা গাছে চড়ে পা ঝুলিয়ে ডালে বসে গজল্লা করছে।

পদ্মফুলের মতো জোড়া জোড়া রাঙা পা, 'মিরগি'র কান ভেবে লোধানী হেসে উঠল।

হাসছিস মা?

ছুই দ্যাক্, হাত ধরে ছেলেকে দেখায়।

ঝুলন্ত পা দেখে সুরুয়াও হাসে।

গাছের মানুষরা অত গ্রাহ্য করে না। খরার মাস, রোদে গা পুড়ছে। পথচলতি মানুষ দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে তাই গাছতলে এসেছে। এ আর নতুন কী!

আয় টুকচার বসি!

ফের বসছিস? তা'লে কখন যাবি নেকবাটিয়া?

থাম ন্ন মনা, এই ত সুরগুঁকা, হাটুয়া মেইয়াটা কী বল্ল শুন্নিস নাই— গাছতলকু গাছতলকু ছুই ছুই, এ বাটে মির্জাপুর সে বাটে পাণ্ডবঘাট, চোখ তুলনে দিশুচি খাকুড়দার বাস? দ্যাক্ ন মার কুনো বাসগাড়ি দেখতে পাস কী নাই!

বলতেই বাস দেখতে চৌরাস্তার দিকে এগিয়ে গেল ছেলেমানুষ সুরুয়া।

ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ।

ধক্ করে উঠল গুরভার বউয়ের বুকটা! এই গাছতলেই তাহলে ভগবানকে মেরে মকর-সাঁকরাতের দিনে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিল লোধারা?

নির্বিকার হাটুয়া বাগালরা ঐ গাছে চড়েই পা ঝুলিয়ে বসে এখন 'ঢক' দিচ্ছে, ঢক তার মানে হেঁয়ালি—

বটগাছ তলে ঘর।
নিতি পড়ু থায় বটপতর।
এভে ছাতি করে ধড়পড়—

ক ত কী?

তাই তো, বটগাছতলে ঘর, ঘরের উপর বটপাতা তো পড়বেই, প্রতিদিনই পড়ে, আজ বটপাতা পড়ার শব্দ শুনে বুক ধড়ফড় করছে কেন?

গরুবাগালরা কেউ বলতে পারে না। না পেরে বলে, অউটা ঢক না গীত সুব্‌লা? আগা নাই মুড়া নাই—

ঢকদাতা সুবলও বলতে পারে না। তাই তো উত্তরটা কী? হেরে। সুবল হেসেই 'ম্যানেজ' দেয়। বাকিরাও বোকার মতো হাসে।

ঢক শুনে গুরভার বউয়ের কিন্তু হাণ্ডুলমাণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে ভিতরটা! প্রতিদিন টুঙ থেকে খসে বটপাতা পড়ে, পাতা পড়ার আওয়াজ গৃহস্থের চেনা। আজ সে-আওয়াজে ধড়ফড় করছে বুক। কী ভয়ে?— হঁ ত কিসের ভয় লোধানী ভেবে পাচ্ছে না।

এর মধ্যেই সরশঙ্কার চারধারে সাদা বক বসে থাকতে দেখে এক বাগাল হেঁয়ালি দিয়েছে— "বক বসিচি ধাড়িকে ধাড়ি ইন্দ্র করে তপ। এই ঢকটি যে ভাঙি দব তাকু দেমি সনার শঁক।।"

এর উত্তরটা সবারই, এমন কী গুরভার বউয়েরও জানা। হাটুয়া বাগালরা বলবার আগেই সে বিড়বিড় করে বলল, ধবলা দাঁতের ঝোড়া।

উত্তর না দিয়ে সারি সারি সাদা দাঁত দেখিয়ে হাটুয়া বাগালরা হাসছে— হো হো করে হা হা করে হি হি করে।

এবারে সায়রের মাছ দেখে— "অতটুকু জলে মাছ কব্ কব্ করে। সাতশ জালির ব্যাটা নাহি ধরতে পারে"— যে নাই কই পারে তার বাপ হাড়ি।

সায়রের মাছ দেখে কী, ঐ তো লোকটা— পেটের নাইকুণ্ডলে লাঠি গুঁজে চলতে চলতে না দেখেও জালের ফাঁস বুনে, দশপনিয়া বাজ্মাড়ি জাল— গুরভার বউয়ের মনে হল তাকে দেখেই এবারের হেঁয়ালিটা দিয়েছে হাটুয়া ছা।

শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে ঐ লোকটাই ঢকটা ভেঙে দিল। বলল, সাতশ জালি কী কও, মুই জালুয়ার পো একাই মাছটা ধরি দেইটি। ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি— লেই যাও।

তাই তো হাঁড়িতে কব্ কব্ করে ভাত ফুটছে, তাতে হাত ঢুকিয়ে একটা ভাতও তুলে আনবে সাতশ লোকের সাধ্য কী!

হাটুয়া বাগালরা এবারেও হেসে উঠল, তাদের একজন লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ভল কহ্চ জালুয়া মাউসা, এবে কুহ্ ত—

হল্দি পত্র মলা।
রাম যেতেক বেলে বন্কু গলা,
দশরথের কি হেলা?

জালুয়া কতবার গাজনের ভক্তা হয়েছে, ঝাঁপানের বারি তুলেছে! এ সব সাকীর উত্তর তার তো জানাই। ঢক ছেড়ে বাগালরা এবার তবে চাপান দিয়েছে।

রসিয়ে রসিয়ে উত্তর দিল জালুয়া মাউসা।— "হল্দি পত্র মলা। রাম যেতেক বেলে বন্কু গলা দশরথ প্রাণ ত্যজিলা।।"

চুপ করে গেল হাটুয়া বাগালরা, জালুয়াকে ঘাঁটাতে আর তাদের সাহস হল না। লোকটা সবজান্তা— কপাকপ মাছও ধরে, ফের টপাটপ ঢকও ভেঙে দেয়!

তারা এবার নিজেদের ভিতর ফিস্ ফিস্ করে ছোট ছোট ঢক ভাঙছে। ঢক ভাঙছে, ঢক ভাঙছে। এই যেমন— "আঁক পুকুরে পাঁক নাই জল ছিল্ ছিল্, মাছ নাই—"

ডাব, ডাব।

"হেঁ হেঁ নাথ ভুঁইরু বাহারলা আঢ়িই হাত। পুঅর মাথায় চুল পাকি গলা বাপের বয়স কত হেলা?" অঙ্ক নয়, সোজা হিসাব। মাটি থেকে গাছটি বেরিয়ে লম্বায় হয়েছে আড়াই হাত, তার ফলটি আরো বেঁটে। কিন্তু তার চুল অর্থাৎ রোঁয়া পেকে ঝুনো হয়ে গেছে এর মধ্যেই। তাহলে তার বাপের বয়স কত?

ভুট্টাগাছ, ভুট্টাগাছ।

সুরুয়া ফিরে এসেছে, সে দেখে এসেছে খাকুড়দার বাস দূর থেকে। মাকে সে বলছে, এখান থেকে বাসেও যাওয়া যায় মা। কিন্তু বাসভাড়া?

সে আর ভাবতে হত নাই যদি থাকত কামিল্লা!

বলেই চকিতে পায়ের আঙটে মন চলে গেল গুরভার বউয়ের। শুধু কী বাসভাড়া? আরেকটা পায়ের আঙটও কী এতদিনে গড়িয়ে দিত না কামিল্লা?

সময় সময় মা আপনার মনে কী যে বিড় বিড় করে বলে— সুরুয়া বুঝতে পারে না। সে ফের হাঁক দেয়, নাই হোক বাস, হেঁট্টেই যাব, রাস্তা আর কতটা— এখন উঠ ত মা।

দিবি ত দে গাছের উপর গরুবাগালরা এসময় ঢক দিয়েছে—

তলে মাটি উপরে মাটি।
মাঝু বুসচে পাথর বাটি।।

শুনেই ছেলেকে হাত ধরে টেনে বসায় লোধানী, বলে, ঐ শুন। চেনা জিনিসের ঢক শুনে চোখ তার চক্ চক্ করছে। —কী জিনিস বল ত?

তলে মাটি উপরে মাটি মাঝখানে পাথরবাটি— সে তো কত কী হতে পারে! একেকটা জিনিস মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে সুরুয়া, কই একটাও তো মিলছে না। ফাল্না-ঢক-হেঁয়ালি যারা ফাঁদে তাদের তো আচ্ছাই বুদ্ধি! যতই যাই করো খাপে-খাপে না মিললে উত্তরটাও সঠিক হবে না।

এসবে সুরুয়ার মা মজে গেলেও সুরুয়া কিন্তু বিরক্ত। তার উপর হেঁয়ালিটাও কঠিন, আগা পাচ্ছে তো মুড়ো পাচ্ছে না! সে তেড়িয়া হয়ে বলল, ছাড় ত মা, পড়ত যদি আমাদের চাঁদবদনীর পাল্লায়! কাকে বলে হিঁয়ালি দেখাঁয় দিত নাই?

হঁ চাঁদবদনী, বলেই ঢকটা ভেঙে দিল সুরুয়ার মা, এত্ত জান্নিস আর এইটা জান্নিস নাই বোকা? ওল রে ওল, আলু-তুঙ্গাও হতে পারে।

হাটুয়া বাগালছুআরা জানবে কী করে বনের আলু-তুঙ্গা? মাটির উপরে ছাব্‌কা-ছুলিয়া লই-লত্, মাটির ভিতরে পাথরের মতো আঁটি-সুঁটি আলু-তঙ্গা, তার তলায় আবারো মাটি— তারা তো ঢকের উত্তরে আলু-তুঙ্গা না বলে বলবে ওল—

ওল, ওল।

ফের হাত ধরে মাকে উঠতে বলল সুরুয়া, পাশে রাখা ঘড়াটার গলা সাপটে ধরে উঠতে যাবে সুরুয়ার মা, জালুয়া লোকটা জিজ্ঞাসা করল, কাঁই যিব?

অর্জুনগাছতলে ছায়ায় বসে জালের ফোঁড় না দেখেও সুতো-পরানো 'কলমকাঠি' চোখ বুজেই গুঁজে যাচ্ছিল লোকটা, কে জানে আর ক' 'গাঁইট' বুনলে তবে জালটা পুরা হবে! এতক্ষণ ধরে সে চোখ বুজেও সুরুয়া সুরুয়ার মায়ের ভাবভঙ্গি দেখে যাচ্ছিল, আর দেখেই সে বুঝেছিল—

সুরুয়া নেকবাটিয়ার কথা বলামাত্রই সে প্রায় লাফিয়ে উঠল, তাই কও, যা ভাবিছি তাই। ঘড়া দেখিই মালুম হেইথিলা তুমারমনে যাউঠ নেকবাটিয়া— আগো যাও যাও, সবু দয়াময়র মায়া, তার মায়া বুঝা ভার—

বলতে বলতেই লোকটা চলে গেল দীঘির পশ্চিমে ঐ যেদিকে পলাশিয়া গ্রামেব চৌধুরীদের ভাঙা মন্দির জগন্নাথদেবের।

সুরুয়া সুরুয়ার মা .চলল পুবে, তারা যাবে পুব থেকে বাঁয়ে ঘুরে আরো উত্তরে ঐ যেদিকে পাণ্ডবঘাট।

এখন এখনই যাবার ইচ্ছা ছিল না গুরভার বউয়ের। লোকটা ভালো, ঠাকুর-দ্যাব্‌তা করে বোধহয়. না হয় ঐ জালুয়ার সঙ্গে গিয়েই ঐ 'মন্দিলে' ঠাকুর দর্শন করে আসত গুরভানী?

না করে দিল সুরুয়া, বলল যে সবটাতেই তার হ্যাঙলামি, এখন কী, সে দেখতে হয় দেখবে ফিরতি পথে আড়-বেলায়। ওদিকে জলদি না গেলে জল যদি ফুরিয়ে যায়? আহা জল না ফুরাক কল যদি ভেঙে যায়? যন্ত্রপাতির ব্যাপার, বলা তো যায় না!

গুরভাবউ হাসল, বলল, সবু দয়াময়র মায়া, তার মায়া বুঝা ভার সুরুয়া।

নাই নাই করে সুরুয়াও ভাবে, তাই তো এ-সমস্তই মায়া, নচেৎ ভগবান স্বয়ং কোন্ 'স্বরগ' ছেড়ে এখানে এই এতদূরে সরশঙ্কায় এসে পাকুড় না অর্জুনগাছের ডালে বসে পা দোলায়, আর পায়ে ফুটবি তো ফোট জরালোধার কাঁড়? আর জগৎ সংসারে এত লোক— বামুন-বোষ্টম-করন-হাটুয়া-কাম্‌হার-কুম্‌হার থাকতে মুখে 'নিয়া' দিল কী না লোধারা?

'নিয়া', 'নিয়া'। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল সায়রের একধারে, আড়ার অন্তরালে খোল-কত্তাল, হরিবোল উঠল। তাহলে ওধারে কী শ্মশানঘাট? ভগবানকে দাহ করার পর থেকেই আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা কী মরলে দাহ করে আসছে এখানেই? নীলুয়া তো বলেছিল 'মকর-সাঁকরাতে' নাকি ঐ শ্মশানের উপরেই মেলা বসে।

ফের দু'হাত জড়ো করে নমো করল গুরভানী।

কী যে হাটুয়াদের মতন ঘড়িক ঘড়ি গড় করিস মা! বাঁওন-বষ্টম— কে জানে কার মড়া। আর বাঁভনাদের ত গড় করতেই মানা, লদ্ধাদের থিক্যেও ছোটজাত।

তা হোক, মড়ার আবার জাত-পাত! সেই বলে নাই— "মরিলে হয় গো মড়া আর বার করিলে দেয় গো ছড়া?"

শ্মশানস্থানে কাঁচা ছেলেকে আর বেশিক্ষণ রাখতে চায়নি লোধানী, বাও-বাতাস লাগতে পারে, তাই এবার ছেলেকে নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে গেল সে।

তার উপর ঐ তো একটা কেয়াগাছ, পুকুর-আড়ায় কেয়াগাছ থাকে যদি তো সেখানে 'সাতবহিনী' থাকবেই থাকবে। তাদের হাবড়ে পড়লে জলের ভিতর ডুবিয়ে রাখবে দিনের পর দিন।

আড়া থেকে মোরাম রাস্তায় নেমে এল সুরুয়া, সুরুয়ার মা। ডান দিকে এখন ধান আর ধান, ধানকাটনীরাও নেমে গেছে বিলে।

ট্রাক্টর এসেছে, সেই ট্রাক্টরে চড়ে গিরিহার ঘর থেকে বিলে এসেছে নামালিয়ারা। পাহীকে পাহী ধান কাটবে, বিড়া বাঁধবে, সেই বিড়া তুলে দেবে ট্রাক্টরে। ট্রাক্টর যাবে আব আসবে।

অদ্বৈত গিরিহার ট্রাক্টর নেই, তার ভরসা গরু-গাড়ি শিকা-বাঁউক আব নামালিয়াদের মাথা। কে জানে এতক্ষণে ক'পাহী কাটল নিয়তি-আদরী-ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীরা! গুবভার বউয়ের হাত তো অস্-কস্ করছে। গায়ে ধানের শুঙ বিঁধাতে গা তো সব্ সব্ করছে।

গুয়েবনি চড়ে পায়রা সাদা বক পাহীতে কাটা ধানগাদার এদিক-ওদিক উড়ে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুরুয়ার মনে হল— নাকফুড়রির আঠাকাঠিটা সঙ্গে আনলে বেশ হত। এদিকে এখানে-ওখানে বড় বড় 'জলা' আছে বলে কত পাখি! এতক্ষণে কত ক'টা যে লটকাত!

এখনো কতদূরে নেকবাটিয়া?

কত লোক যে 'জিগাস' করল— কুন্‌স্থা যাব?

কেউ বলল, কাঁই যাওট?

কখনো সুরুয়া কখনো সুরুয়ার মা উত্তর করল সেই এক উত্তর— নেকবাটিযা।

কে জানে এ-গ্রাম ভূ-ভারতে আছে কী না।

মোরাম রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে নয়ানজুলির মতো একটা-আধটা ডোবা। সে-ডোবায় এত গ্রীষ্মে এখনও জল আছে। তাছাড়া 'স্যালোর' জল নিয়ে যাবার নালায় এখনও চিক-চিকে দাগ। এ-নালা সে-নালায় জোড়া আছে নামালদেশের বিল-বাওড় দলা-দল্‌কি ঘোলা-ঘোগ। পাথরের সুড়ঙ্গ। জল শুকোবে কি!

মাঠময় বরো, পাকা হাই-ঈল্ডিং, কাটা ধানের হেলা। আর তো খালি মাটির চাপড়া দিয়ে উঁচু করা জমির আল, যাকে বলে কাঁথি।

রাস্তায় ছাগল যাচ্ছে, কোনো একটা ছাগল হয়তো আচমকা কান নাড়ল। সুরুয়ার মা তাই দেখে সুরুয়াকে ঠেলা মেরে বলল, হাই দ্যাক্ কান নাড়ছে যে গ!

যেতে যেতে কোনো একটা গরু হয়তো গলা দিয়ে 'ঘ-অ-ঙ' 'ঘ-অ-ঙ' আওয়াজ করল। ফের ঠেলা মেরে সুরুয়াকে বলল, হুই দ্যাক্ সুরু, গরুটা কাশছে!

সুরুয়া বুঝতে পারে না, না হয় ছাগল কান নেড়েছে, গরুটা কেশেছে, তো কী?

সুরুয়ার মা সুরুয়াকে বলে, ছাগলের কান নাড়া বিলাইয়ের হাঁচি গরুর কাশ-তবে জানবি সর্বনাশ। কে জানে তোর বাপের এতক্ষণে কী হৈল!

ধু-উ-স! বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল সুরুয়া। লোধাদের ছাগল নেই গরু নেই বিড়ালও নেই, তবু জানোয়ারগুলো হাঁচলে কাশলে কান নাড়লে লোধাদের কী? তার মায়ের যতসব বেশি বেশি!

সরশঙ্কার পুবের চৌহদ্দি শেষ হতে আরো কিছুটা, পিছনে পড়ে আছে মির্জাপুর। সরশঙ্কার শেষ— অতদূরেও যেতে হবে না, তার আগে ডাইনে ঘুরলেই নেকবাটিয়া—

গুরভার বউ দেখল— এক হাটুয়া 'মেইয়্যা', মাছউলী, একপাছিয়া মাছ কাঁখে মোরাম রাস্তা পেরিয়ে পুকুরের আড়ায় খর খর উঠে যাচ্ছে, বোধহয় জল-কাদা মাখা মাছগুলো ধুতে।

ডোবা ছিঁচেছে, জলা 'মার' হয়েছে, কাদায় হাত মুঠো করে করে ধরেছে চ্যাঙ-গোড়ুই-সোল সেই কোন্ সকাল থেকে। কৌতূহল বশতঃ ঝুড়িতে উঁকি মেরে লোধানী দেখল— সব মাছই মরা, পেট উল্টে সাদা।

কাই গ কী মাছ দেখি? সব ত মরা, সোল-গোড়ুই-চ্যাঙ জ্যান্ত একটাও নাই?

যেন জ্যান্ত থাকলেই লোধানী এক-আধটা চ্যাঙ-গোড়ুই-সোল কিনত বৈকি। মেছুনী পান খাওয়া মুখে পানের পিক ফেলে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে কী যেন বললও লোধানীকে। দ্রুত পায়ে মেছুনীর পিছুপিছু গুরভার বউও সরশঙ্কার আড়ায় উঠল।

উঠেই দেখে কি, সরশঙ্কার জলে মেছুনী মাছের পাছিয়া চুবিয়ে ঝাঁকানি দিতেই সব মাছ ফের জ্যান্ত হয়ে নড়তে লাগল! খল্ বল্ করে!

লোধানী তো থ, হতবাক। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুচ্ছে না। মাছউলী কিন্তু ততটাই হলবলি—

কী গো খুড়ী, জ্যান্ত মাছ নিবা যে?

আর মাছ! মাছউলী মাছের পাছিয়া জলে ঝাঁকিয়ে হাসতে হাসতে আড়ায় উঠে ভিন্ন দিকে হাঁটতে লাগল।

গুরভার বউ হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, দাঁড়িয়েই থাকল।

ওদিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অধৈর্য হয়ে উঠল সুরুয়া, সে তার মাকে ঘন ঘন ডাকতে লাগল, মা গো, এ গো আয়! যেতে হবে ত নেকবাট্টিয়া?

হাত নেড়ে গুরভার বউ বলল, ন্নাই।

নাই ত জলের কী হবে? বাউকোর কী হবে?

এই সুরশুঁকার জলই নিয়ে চল, ভালো হয় ত এই জলেই তর বাপ ভালো হবে। গ্যাল্‌গেলে মরামাছও যে-জলে জ্যান্ত হয়—

সুরুয়ার মা সব বৃত্তান্তই খুলে বলল সুরুয়াকে। শুনে-টুনে সুরুয়া বলল, ধু-উ-স! কী দেখতে কী দেখেছিস! মরা কী আর, কাদায় লটোপটো হয়ে মাছগুলা বেঁচেই ছিল বোধায়।

ন্নাই, যা দেখেছি ঠিকেই দেখেছি। ঐ ত মাছউলীটা যাচ্ছে— হাঁকা!

এদিক-ওদিক তন্নতন্ন খুঁজেও মাছউলীকে পাওয়া গেল না। আড়া থেকে নেমে এতক্ষণে বিলের 'হিড়ে' 'হিড়ে' সে চলে গেছে কোথায় কোন্ পাইকবাড়-চাউলিয়া-কুহড়া-করঞ্জি-শালিকোঠা-কাকরাজিৎ কী ষড়রঙ-কঁতাই-খড়িঝাঁপড়ি-বিরুঁয়া-হরিপুরা—

কেমন হাগুল-মাগুল হয়ে গেল গুরভাবউয়ের ভিতরটা। সে কি দেখতে কী দেখল! আর এসময়ই ডেকে উঠল সেই পাখিটা— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু!!!

ভাট-পিটালির বনে, অর্জুন-পাকুড়-খিরিস-করঞ্জার ডালে, বাবুল-সুবাবুল-ইউকেলিপটাশ-কাঁটাবাবলার মগডালে, ডেঁউস-চালতা-টভা-ডেমুরের গাছে— কোথায় কোথায় যে ডেকে উঠছে পাখিটা!

উথাল-পাথাল হয়ে যাচ্ছে গুরভার বউ। —টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! —ঐ ডাকতে ডাকতে আসছে, গুঁড়ো-ঝরানি ডাক কী!

—উ-ল টু-টু টু-টু-উ—

ঐ তো এসে বসল পুকুর-আড়ার ঝাঁকড়া খিরিসগাছটায়। ঐ গাছে বসেই চঁচরা ফুলিয়ে পাখিটা ডাকছে। লোধানী যেন স্পষ্ট শুনল।

কোথাকার 'পাখ' কোথায় এসেছে, এই পাখটার কথাই তো মাত্‌বর রাইবু বারবার বলত? লোধানীর মনে হল, লোধাদের সঙ্গেই পাখটা সেই কোন সুখজুড়ি-মাঝুডুবকা-তালখুড়রু-ঘোড়াটাপুর তপোবন জঙ্গলমহাল ছেড়ে এতদূরে এই নামাল দেশে সুরশুঁকায় এসেছে। গুপ্তমণি পেরিয়ে 'খড়পপুর' ইস্টিশনে ঢোকার আগে বীরভাসা না বালিভাসার জঙ্গলে তাকে ফের ঘিরেছিল না?

কীর'ম যেন ডাকে! গলা ফুলিয়ে, দমকে দমকে। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে লেজের দিকটাও কী নাচে? ঐ তো ডাকছে— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু!!!

ঐ শুন বেটা—

কী মা?

ঐ যে ডাকচে— রাইবুর পাখটা, একদম পষ্ট!

কান খাড়া করল সুরুয়া, কাই?

ঐ ত খিরিসগাছটার ঝাঁকড়া ডালটায়, শুন্ ন্ন।

ধুত্! কী শুনতে কী শুনছিস্। আন্ শুনতে ধান।

গুরভার বউ কানের কাছে হাতের চেটো পেতে শুনছে, ঐ ত ঐ ত—

ডাকতে ডাকতে ডাকটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে পাখিটা। তার গুঁড়ো ঝরছে ঝুর ঝুর— উ-ল টু-টু-টু-টু-টু-উ-উ-উ—

ঐ গেল, ডাঙা-ডহর ধানবিল পেরিয়ে, তাদের ছেড়ে-আসা ডেঁউসগাছটা ছাড়িয়ে, গাড়ির লিক্-ট্রাক্টর-নামালিয়াদের মাথার উপর চক্কর দিতে দিতে— দিতে দিতে—

ঝাঁ ঝাঁ করে ফিরেও আসছে— ঐ এল—

ঐ আসছে যেন 'ঘাগ্‌গর' বাজিয়ে, 'ঘাগ্‌গর মাগ্‌গর কচ্‌ছিম তাল— কে কে যাবি কাম্‌হার শাল—"

—উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু—

কানচল, একদম কানের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, আরেকটু এদিক-ওদিক হলেই চোখে এসে ধাক্কা মারত পাখিটা!

নাকের নথ নাড়ার মতো ঝট্ করে মাথাটা সরিয়ে নিল সুরুয়ার মা। আর তাই করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল সে, তন্মুহূর্তে তাকে জড়িয়ে ধরল সুরুয়া—

কী? কী হৈল মা?

বিড় বিড় করছে সুরুয়ার মা, শুন ন্ন মার! এত্ত পষ্ট— আর তুঁই শুনতে পাচ্চিস নাই?



গত রাতের সমস্ত ঘটনাই কানে এসেছিল অদ্বৈত নীলিমার। মারামারি হয়েছে তার ভাতুয়া আর তার এক নামালিয়ার সঙ্গে। মারামারির ঘটনা সে যত ছোটোই হোক তার ফল হবে সুদূর প্রসারী— এই ভেবে স্বপন ভাতুয়াকে রাতারাতি বিদায় করে দিল তার গিরিহা-গিরিহানী।

শিকলি-কাটা রক্তারক্তি মুখ নিয়েই সকালে গরু খুলতে গোহালে ঢুকেছিল স্বপন। দেখতে পেয়ে গিরিহা অদ্বৈত হাঁক পাড়ল— এ্যাই স্বপ্না শুনি যা, তোকো আজ গরু খুলতে হেব নি।

মুই না খুলনে কে খুলবে?

ঘোরের মাথায় উত্তর করেছিল স্বপন। কত দিনকার ভাতুয়া সে!

সে আর কেউ খুলবে, গধা, তুই অখন শুনি যা!

ঘরের ভিতর ডেকে গিরিহা-গিরিহানীতে শলা-পরামর্শ করে স্বপনকে বলল,. স্বপ্না তোর মঙ্গলের তরে আমনে কুহুচি— অউ কদিন ঘুরকু যাই নুকি থা, ধানকাটা শেষ হিনে ঘুরি আইসবু।

তার কী দোষ, কেন শুধু শুধু সে ঘরে গিয়ে এই কদিন লুকিয়ে থাকবে— স্বপন বুঝে উঠতে পারল না। তবু, অগত্যা সে গরু না খুলে ঘরের দিকেই হাঁটতে লাগল।

ধানকাটা চলছে, নামালিয়ারা ধান কাটছে। এসময় কোনরকম ঝুটঝামেলা হলে বন্ধ হয়ে যাবে ধানকাটা। তার উপর করেছে মেঘলা। যদি বর্ষে তবে পাকাধানের রফা! অত ঝুঁকি অদ্বৈত নেবে না।

স্বপন চলে যেতেই সে ধানকুটা মেসিনঘরের এক ছোকরাকে ডেকে আদেশ করল, বিন্দাবন, গুহালের গরু লেইকি পড়িয়ায় যা!

বৃন্দাবন তো একপায়ে খাড়া, তার উপর গিরিহার আদেশ। স্বপনভাতুয়ার অনুপস্থিতিতে সেই তো একেকদিন গরু নিয়ে চরাতে যায় বাঘমারি-চিড়িয়ামারি পড়িয়ায়। সেই তার মনেও আজ চিন্তা— স্বপ্নাটা এই সকাল-সকাল গেল কোথায়? তাকে কী খেদিয়ে দিল গিরিহা? কাল রাতের ঘটনাটা কানাঘুঁষোয় সে যা শুনেছে—

রাস্তায় নেমে স্বপন ভাতুয়ার মনেও চিন্তা— এমন অসময়ে ঘরে যেতে বললেই কী যাওয়া যায়? ঘরে তার মা-বাপ ছাড়াও চার-চারটে ভাইবোন আছে, এমন কাটা-ছেঁড়া মুখ দেখলে তারা কী ভাববে? জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় অস্থির করে ছাড়বে না তাকে?

এ মাগো, তোর মুখের দশা অমন কে করলা রে বড়ছুয়া?

কেঁদে আকুল হয়ে যাবে না মা?

গালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে হয়ত ছোটবোনটি বলবে, মারি যে ফাটাই দিছে দাদা? কী হিছে রে?

ফের গিরিহার সাঙে 'লজ্' করলু? মা'র সেই এক কথা।

গিরিহার সঙ্গে ফের ঝগড়া করলি?

কাঁই রে দাদা, তুই যে কইথিলু গটে শাড়ি আনি দিবু? তোর গিরিহানী দামী দামী শাড়ি সবু যাকে-তাকে নাকি মাগ্না দেয়টে?

হ্যাঁ তাই তো, ঠিকই তো, তার বড়লোক গিরিহানী, অদ্বৈতর 'গহলী' বউ, দামী দামী শাড়িসব নামালিয়াদের এন্নি এন্নি বিলিয়ে দিচ্ছে। তাই দেখে স্বপনই তো তার বড়বোনকে বলেছিল— তোকেও একটা এনে দেব ফুল-পাতা আঁকা ঝিলিমিলি শাড়ি।

গিরিহানীকে বললেই হত, বউদি গো, মোর বুনটার লাগি গট্টে শাড়ি দও না? একটার জায়গায় হয়ত তিনটা শাড়ি হাত লম্বা করে ছুঁড়ে দিত গিরিহানী।

এখন আর কী করে বলবে? বলা কী যায়? যেতে যেতেও ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরে অদ্বৈত পৈড়্যার বাড়িটার দিকে হাপুস নয়নে তাকিয়ে থাকে স্বপ্না। কুকশিমা-নিম-চালতা-বাঁশঝাড়ের আড়ালে ঐ দেখা যায় আদ্ধেক টিন আদ্ধেক পাকা দোতলা বাড়িটা!

পোখরি আড়ায় অস্থায়ী চালাঘরের খড়ের গাদায় থাপস্-গাদা হয়ে এখনো বসে আছে ধান কাট্নীরা। বসে বসে এর-ওর গায়ের ঘামাচি মারছে, উকুন বাছছে। তার মধ্যেই চাঁদবদ্নীকে দেখে ফেলল স্বপ্না। সেই তো মধ্যমণি।

কিন্তু সেই আছে না— "মুষা ধান খায় কুটুর কুটুর নেজটি করে ছুটুর পুটুর?" —সেই লেজ ছুটুর পুটুর করা কাঠবিলেইঅলা ছোকরাটা নীলুয়া না হালুয়া কই?

তার সঙ্গে আরেকবার, অন্তত আরেকবার দেখা হয় যদি তো স্বপ্নার বেশ হয়, বেশটি করে মেরে, যাকে বলে 'গড়েই নুটেই মারা' রামধোলাই দিয়ে হাতের পায়ের সে সুখ করে নেয়!

দাগা নিয়েই সে যাচ্ছে, না হয় তার কয়েকটা দাগ সে রেখে যেত ঐ কাঠবিলেইঅলা নামালিয়াটার গায়ে। একেবারে গেঁড়ু তেড়ে দিত তার, তার মানে সমূলে বিনাশ!

রাগে জ্বলতে জ্বলতে হিড়গোড় না মেনে গাঁয়ের দিকে হাঁটতে লাগল স্বপন। তার গাঁ তো শিমূলদাঁড়ি। ঐ তো ওদিকে কড়িয়া-বামনদার আশপাশে। সত্যি সত্যিই কী এই সকাল সকাল গাঁয়ে যাবে সে? কাটা-ছেঁড়া মুখ দেখলে গাঁয়ের লোকই বা বলবে কী?

অত বলাবলির কী আছে, অকারণেও তো মানুষ 'পড়িয়া ভুঁইর কচাড় খায়' অর্থাৎ শুকনো ডাঙায়ও আছাড় খায়? পড়ে গিয়ে গালে-মুখে চোট লাগলে রক্তারক্তি তো হতেই পারে। তাই না হয় গাঁয়ের লোককে স্বপন বুঝিয়ে বলবে।

যেতে যেতে ঢোল-কলমির বেড়া থেকে একটা গজাল উপড়ে সে ভাঙতে ভাঙতে যাচ্ছে। কী পল্‌কা কী পল্‌কা! কলমিপাতার মতো পাতা না হলেও ফুল একেবারে কলমি ফুল। লোকে বলে 'অমরী' গাছ, ডাঙা-ডুঙোড় যেখানেই পুঁতে দাও ডগ্‌ডগিয়ে বেড়ে উঠবে, কিছুতেই মরবে না।

গ্রামে যেতে একটা ডাঙা পড়ে, চড়কাডাঙা, এই সেই চড়কাডাঙা। ভুস্‌ভুসে বালিমাটি, খেড়ি-তরমুজ আর জাড়ার চাষ হয়। খেড়ি-তরমুজের দিন প্রায় শেষ, লই-লতায় হলদে রঙ ধরেছে। বাকি যা জাড়া।

পেঁপে গাছের মতো গাছ, পেঁপে পাতার মতো পাতা। শুধু যা শিরায় শিরায় ডগা-ডগালে অন্ধিসন্ধিতে বেগ্‌নে রঙের ডুমো ডুমো ফল, জাড়া।

জাড়ার তেল হয়, তেল খুব গাঢ়। জাড়া-তেলে প্রদীপ জ্বলে আর লোকে মাখেও। জাড়ার তেল মেখে স্কুলে গেলে নাকি মাষ্টারের বেতের ছাটও গায়ে লাগে না! গাঢ় বলে গাঢ়!

কাল রাতে জাড়ার তেল মেখে ভিডিও দেখতে গেলে নীলুয়ার শিকলি-চেইনও কী গায়ে পড়ে পিছলে যেত? চড়কাডাঙার চরে জাড়ার গাছ দেখে স্বপনের মনে পড়ল কথাটা।

আর মনে পড়তেই ফের চড়কাডাঙায় একটাও লোক নেই ভেবে জোরে জোরেই তড়পে উঠল স্বপ্না, কানা এক থর বাড়ি হারায়, ফের যদি তোর সাঙে দেখা হয় নীলুয়া না হালুয়া গোখি আঁড়ুলা— ত্বকে মুই গড়েই নুটেই মারমু!

কানা একবারই লাঠি হারায়, তোর সঙ্গে আবার যদি দেখা হয় নীলুয়া না হালুয়া হতদরিদ্র হতভাগা, তবে তোকে আছড়ে ফেলে গড়িয়ে-উল্টিয়ে রামধোলাইটি দেব!

আচমকা জাড়াবন থেকে রুম রুম উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে মাথায় গামছা বাঁধা লোকটা বলল, কাকে? কাকে গড়েই নুটেই মারবু রে অদাপেড়্যার ভাতুয়া?

চমকে উঠল স্বপ্না, এতটাই চমকে গেল যে ভুস্ করে ভেসে-ওঠা লোকটাকে 'কাঠবিলেইঅলা' নীলুয়ার লোক ভেবে প্রথমে মনস্থ করল পিছন ফিরে দৌড়ুবে, পরমুহূর্তেই চিনতে পেরে হাসল।

বলল, যাত্রার ডায়লগ্ মুখস্থ করিটি।

কুন্ যাত্রা?

শীতলা পালা।

শীতলাপালারু ত খালি বিরাট রজা, রানী সুদেষ্ণা ... নীলুয়া না হালুয়া ত নাই?

মূল পালারু ন থাউ, মু ত ফার্স দেইটি।

পরের বাড়িতে পরগাঁয়ে রাতদিন থেকে বাগালি করে ফাইফরমাশ খেটে হাটুয়া ছ্য-ছ্যাদের সঙ্গে মেলা মেশা করে এতদিনে স্বপ্নাও তো কম চতুর না? সে বলল, মূল পালায় না থাক সে তো 'ফার্স' দিচ্ছে।

'ফার্স' আছে না? হাস্যকৌতুক? একটা গুরুগম্ভীর দৃশ্য থেকে আরেকটা গুরুগম্ভীর দৃশ্যে যাওয়ার ফাঁকে লোক হাসাতে নানারকম সাজ দিয়ে, কখনো বর-বউ কখনো চোর-পুলিশ কখনো প্রেমিক-প্রেমিকা সেজে আসরে প্রবেশ করে, আর প্রবেশ করা মাত্রই লোকজন হেসে গড়িয়ে পড়ে, সেই আর কি!

লোকটার নাম ভবতারণ, স্বপনের চেনা, তার পাশের গ্রামের লোক। পেশায় সে আলু-পেঁয়াজের কারবারী। গলায় বটুয়া ঝুলিয়ে লাটকে লাট আলু-পেঁয়াজ বেচে বামনদার হাটে কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে।

হয়ত সে চড়কাডাঙা 'লিজ্' নিয়ে জাড়া, খেড়ি-তরমুজ করেছে। সেই বলল, কুন্ঠা যিবু? যিবু কি ঘরর দিকে?

চট্ করে 'না' বলে দিল স্বপ্না। বলল যে তার হাতে এখন কত কাজ! ধানকাটা চলছে মুর্হুমুহু ডাক, এ্যাই স্বপ্না 'বাসিয়াম' ঘেনি আয়, এ্যাই স্বপ্না সিকা-বাঁউক ঘেনি আয়, যা না স্বপ্না কটা বিড়া বাঁধি প্যাকা, —সে কী না যাবে ঘরে?

এতক্ষণে স্বপনের মুখের দিকে নজর পড়ল ভবতারণের। বলল, আরি তোর মুহে কী হেলা? কারসাথে মারামারি করতলু?

মারামারি কেন করব, নামালিয়া নীলুয়ার কাঠবিলেই ইল্লি না বিল্লি তার নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে— তুমি কী কও সুঁই নিতে হিবে কি?

সুঁই, তার মানে তো টিটেনাস ইন্জেকসন? কে জানে বাপআ তোর গিরিহা অদা পৈড়্যাকে পুছ্লু নি?

অদা পৈড়্যা, অদা পৈড়্যা, স্বপ্না মনে মনে বলল, সেই তো এই সাত-সকালে কুয়া-কুইরী ডাকার আগেই খেদিয়ে দিল তাকে!

শুনুনি? জেনকাপুরের শ্রীধর জেনা কি পাঁই মলা? ভাবুর কাঁটা পায়ে ভুঁকি ধনুষ্টঙ্কার হি কি মরি গলা—

বাবলার কাঁটা পায়ে ফুটে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে লোকটা মরে গেল।

মাত্র বাবলার কাঁটা, আর এ তো লোহার শিকলি? আরেক চিন্তায় মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল স্বপন ভাতুয়া। সে এখন কোনদিকে যাবে, কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে?

ভবতারণ তাকে দস্তুর মতো 'ভাং থাপ' অর্থাৎ শলা-পরামর্শ দিল।

যা, কিপ্টা অদাকে চাপি ধর— ইন্জেকসনের খরচাটা ঘেনি আয়। না দিনে আর কি করবু— অরখিতকে দৈব সখা!

হাড়কঞ্জুষ অদ্বৈত পৈড়্যার কাছ থেকে ইন্জেকসনের খরচাটা আদায় করে আনতে বলল ভবতারণ। আর তা যদি না দেয় তবে আর কী— অরক্ষিতের দৈবই সহায়।

বলেই হরির নাম করতে করতে চড়কাডাঙা ছেড়ে নিজের কাজে চলে গেল ভবতারণ— "বদন ভরিয়ে একবার হরি বল মন— হরি হে—"

চড়কাডাঙায় বসে মাথায় 'চড়কা' পড়ে গেল স্বপ্নার, সেই বলে না— "চড়কা পড়নে শ্রীরাম ভজে?" কার বা পোষ মাস কার বা সর্বনাশ।

জাড়াবনে বসে কাঠিখুঁচি দিয়ে বালিমাটিতে এঁচেড়-বেঁচেড় কাটতে লাগল স্বপ্না। কখনো আঁকল একটা পুরুষ মানুষের মুখ, কখনো আঁকল একটা মেয়েমানুষের মুখ। তারপর কাঠিখুঁচি ছেড়ে খালি হাতে মুঠো মুঠো বালি তুলে মূর্তি গড়ল। মেয়েমানুষের 'মেড়'।

বালি দিয়ে তার বুক আঁকতে, বুক ভরাট করতে এত সহজ হয়ে গেল যে স্বপ্না কী বলবে! চাঁদবদনীর বুক, তার কোমর, জানুদেশ—

ডাঁটি ভেঙে দুটো জাড়াপাতা এনে চাঁদবদনীর দুটো বুকের উপর বসিয়ে দিল স্বপ্না। আরেকটা রাখল তার জঙ্ঘায়।

তারপর পাশটিতে জায়গা করে নিজেও শুয়ে পড়ল নম্‌থম্‌। চাঁদবদনীর শরীর ছুঁয়ে এখন শুয়ে আছে স্বপ্না, চারধারে জাড়াবন, কুয়া-কুইরী ডাকছে। শুয়ে-বনি, চড়ি, কপতি।

চড়কাডাঙায় কে এল কে গেল তার কোনো হিন্দোল নেই স্বপ্নার। সে তো শুয়ে আছে সেই তার কাছে! মনে ধনুষ্টঙ্কারের আর 'ধ' ও নেই, চেনে বাঁধা চিঁড়রা নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে নীলুয়াও।

ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

যেন ঘুমের মধ্যেই শুনল ঝুঁকে পড়ে কে একজন কানের কাছে বিড়বিড় করছে, "আয় আয় রে কাজলপাতিয়া গাই মুনিতে যিবা। মা বাপ গালি দেনে যুগি ভেশ হবা। নিদ্‌ মাড়নে শুইবু কেঠি? গাই পেটতল। শীত করনে ঘুড়িবু কিস? গছ্র বকল—"

ধড়ফড় করে উঠে বসল স্বপ্না। রাগে-আক্রোশে 'শট্‌' মেরে গুঁড়িয়ে ফেলল চাঁদবদনীকে। কেউ নেই ধারে-কাছে, প্যান্ট খুলে মনের সুখে বালিতেই 'পিসাব' করল সে ছ্র্‌ছ্র্‌ করে।

কিন্তু কানের কাছে ঐ সব বলে বিড়বিড় করছিল কে? ঐ যে "শুইবু কেঠি? গাই পেটতল— ঘুড়িবু কিস? গছ্র বকল—"

কই? কেউ নেই তো?

চড়কাডাঙার এ-পাশ ও-পাশ ঘুরে দৌড়ে দৌড়ে দেখে এল সে— হ্যাঁ, তাই তো। ধারেকাছে একটা জনমাম্মিও নেই কোথাও! অথচ একদম স্পষ্ট— ঘুম পেলে কোথায় শোবে? গাইয়ের পেটতলে। শীত করলে গায়ে কী দেবে? না, গাছের বাকল—

গিরিহার বাড়ি ছেড়ে খেতে না পেয়ে পেয়ে একদিন স্বপনভাতুয়ারও কী হবে ঐ দশা? ভয়ে-ভাবনায় আঁতকে উঠল সে। তারপর বাড়ির দিকেই হাঁটতে লাগল স্বপ্না।

হাঁটছে, দুধারে ধানক্ষেত, ধীরে ধীরে রাস্তায় লোকজনও বাড়ছে। আর তো একটু বাদেই হৈ হৈ করে ধানক্ষেতেও নেমে পড়বে নামালিয়ারা।

হাই-ঈল্ডিং, গাছ খুব বড়ো নয়, কিন্তু ধানের হেলা ধানছড়ার বাহার কী! গিরিহার বাড়িতে থাকতে থাকতেই স্বপ্না শুনেছে কত কী ধানের নাম— বাঙি-সুরজমণি-চামরমণি-বাঁশকাঠি-বাদকলমা-ঝিঙাশাল-সীতাশাল-মুগুশাল—

সেসব এখন আর হয় না, হয় তো লালস্বর্ণ, আই আর ছত্রিশ, হাজার নয় হাজার দশ, সব হাজার হাজার!

তাদের দু-দশ বিঘা জমিও নেই যে গরুর সঙ্গে জোয়াল কাঁধে জমি চষে, 'স্যালো' থেকে জল কিনে ফাঁক-ফোকর-মগরা বুজিয়ে জল-কাদায় রুয়ে দেবে লালস্বর্ণ কী হাজার দশ? তার আগে জ্যোৎস্না রাতে, অর্জুন-করঞ্জ-ছাতিম-তাল-কুকসিমা-কাঁটাবাবলার গাছগুলোর আঁধার জ্যোৎস্নায় কাদা করা বিলে নেমে গনেশ সাঁপুই আর তার বউ মালতীর মতো সারারাত 'শুভ' করবে?

পৈড়্যা-সাঁপুই-জানা-মাইতি-সামন্ত-মিশ্র-গিরি-মহান্তিদের এত এত জমি অথচ তাদের একছটাকও নেই?

নেই, নেই।

জমিও নেই, কাজও নেই। আর কাজ না থাকলে, সেই বলে না— "কাজ নাই থিনে মাটিয়া ধান বাছ্য"— নেই কাজ তো খই ভাজ? অগত্যা পরের বাড়িতে ভাতে-কাপড়ে থাকা, ভাতুয়া খাটা, স্বপ্নার হয়েছে সেই তো ঝাঁঝরা-মার্কা দশা! বাপ তো দিনমজুর!

মাথায় ডেকচি-হাঁড়া গাঁটরি-গুঁটরি, হাতে প্লাস্টিকের ঝোলাঝুলি, কোদাল-কুডুল, সঙ্গে একটা কুকুরও আছে। কচি-কাঁচা মেয়ে-মরদা মিলে গোটা পঁচিশ-তিরিশের দল একটা। স্বপ্নার গাঁয়ের দিক থেকে এদিকেই আসছে।

এরা কারা? নামালিয়ারা কী?

না থেমে এগিয়ে চলল স্বপন। কত লোক কত কাজে কতদিকে যাচ্ছে! কতই তো গ্রাম শিমূলদাঁড়ি-কড়িয়া বামনদার আশপাশে এদিকে-ওদিকে— তুরকা-সাউড়ী-কুলিদা-পুরুন্দা-জাহালদা-জেনকাপুর-কুরুল-রেঁজুড়া-অর্জুনি-ধুকুড়দা-গৌড়দা-নেগুঁয়া-জলপানিয়া-পাইকবাড়-কাকরাজিৎ-পাঁচরোল-মনোহরপুর-বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙা—

তার কটা গাঁয়ের কটা লোককেই বা চেনে স্বপ্না! কটা গাঁয়েই বা সে গিয়েছে! সেই তো 'এন্ডাবেলা' থেকে পড়ে আছে কড়িয়া-বামনদার গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার ঘরে। গিরিহার ঘরে থাকতে থাকতে সে তো বড়জোর চিনেছে পুবের বিল দক্ষিণের বিল বাঘমারী পড়িয়া চিড়িয়ামারী পড়িয়া আর কড়িয়া-বামনদার হাটতলা।

তুমারমনে কাঁই যিব গ ডেক্‌চি-হাঁড়া গাঁটরি-গুঁটরি মথায় লেইকি? ডেকচি-হাঁড়া ঝোলাঝুলি নিয়ে তোমরা কোথায় যাবে?

ঢের দূর— সেই সোনাকানিয়া!

সোনাকানিয়া, সোনাকানিয়া।

কেউ একজন সুদূরের দিকে আঙুল তুলে দেখায়, যেন ঐ তো! উঁ-হু, সোনাকনিয়া এইঠি নেকি? সোনাকানিয়া কী এখানে? সে তো প্রথমে যেতে হবে সরশঙ্কা-নেকবাটিয়া-পাইকবাড়-চাউলিয়া পেরিয়ে দাঁতনে, দাঁতন থেকে আরো দক্ষিণে তকিনগর-বলভদ্রপুর ঘোলাই হয়ে মির্জাপুর তা বাদে সোনাকনিয়া—

সেঠি কি হউচি?

স্বপন জিজ্ঞাসা করল— সেখানে কী হচ্ছে? কোনো মেলা-টেলা কী?

হঁ মেলাই বঠে, চ ন দেখবি— কেমন লাড়ু বিকাচ্ছে, সেই বলে নাই লাড়ু খাচ্ছে স্বরগ যাচ্ছে? বলেই তাদের দুয়েকজন হো হো করে হেসে উঠল। রগড়ের লোক সব।

হাসি থামিয়ে বলল, নাই ছ্যানা, হামরা কামে যাচ্ছি সোনাকনিয়ার ইঁটভাটায়।

এসময় হ্যাল্ হ্যাল্ করে পিছু পিছু আসা কুকুরটা কী ভেবে ঝপ্ করে আল থেকে নেমে একদৌড়ে দলটার আগে আগে যেতে লাগল।

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্নাও। দলটার সঙ্গে সেও যাবে সোনাকানিয়ায়। সুবর্ণরেখা যেখানে হাঁসুলীর মতো বাঁক নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে উড়িশায়, সেখানে তীরে তীরে সুবর্ণরেখার পলি নিয়ে গড়ে উঠেছে একের পর এক ইটভাটা। সার সার চিমনি।

এই দলটার সঙ্গে গিয়ে তার যেকোনো একটায় কাজ জুটিয়ে নেবে স্বপ্না। মাটির 'লাডু' ছাঁচে ফেলে ইট তৈরি করবে একটার পর একটা।

নাকি সোনাকনিয়া ফেলে আর দু'পা গেলেই উড়িশা, জিলা বালেশ্বর। চাই কি ফাঁক দিয়ে

গলে আরো ভিতরে ঢুকে সে চলে যাবে কটক-ভুবনেশ্বর। না হয় কটক-ভুবনেশ্বরে সে একটা কিছু জুটিয়ে নেবে। হলই বা উড়িশা, সেই বলে নাই— "অজাঘর যৌটা মামুঘর সৌটা।"

দলটার পিছন পিছন যেতে যেতে সর্দার মতো লোকটাকে স্বপন জিজ্ঞাসা করল, বুঢ়াভাই অখনও বিস্তর রাস্তা যাইতে হব, সোনাকানিয়া এইঠি-নেকি? যাব কী করি? এই ভাবর হাঁটি হাঁটি?

নাই, সুরশাঁকার ঐখেন থিক্যে ভ্যানে চাপব, ভ্যানে চাপি দাঁতন যাব, তারপর ত বাস— গিড়গিঁড়াই পৌঁছে যাব সোনাকানিয়া গেহলাতে গেহলাতে। হঁ কী নাই বল?

স্বপনভাতুয়া বুঝল শুধু কী বুঢ়াভাই, তেতে আছে গোটা দলটাই। অতটা রাস্তা, তবু তারা 'গেহলাতে' 'গেহলাতে' তার মানে খুশিতে এর-তার গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে কাবার করে দিয়ে পৌঁছে যাবে সোনাকনিয়া।

সোনাকনিয়া, সোনাকনিয়া।

আর থাকতে না পেরে বলে ফেলল স্বপ্না, বুঢ়াভাই, গটে কথা কউচি— তুমার সাঙ্গর মোকেও লেই চল মুরুব্বি সোনাকনিয়া?

হঁ হঁ চ ন্ন! তোর গোড় দিঞে তুঁই যাবি, আমি কী আর তোকে কাঁধে করে লিঞে যাব?

তাই তো, যার পা আছে সেই তো যেতে পারে সোনাকনিয়া, কেউ তো আর কাঁধে করে নিয়ে যাবে না?

অতএব স্বপনভাতুয়া নিজের পায়েই চলল সোনাকনিয়া। সোনাকনিয়া, সোনাকনিয়া। কোথায় কতদূরে পড়ে থাকল তার শিমূলদাঁড়ি গ্রাম, কড়িয়া-বামনদা, মা-বাপ ভাই-বোন গিরিহা-গিরিহানী।

হঁ হঁ, ছ্যানাটা চলুক সঙে।

মজুরি না হোক, কেউ অসুস্থ হলে খাই-খোরাকি দিতে রাজি হয়েছে অদ্বৈত চাপে পড়ে। না হলে সোজা আঙুল বাঁকাতে হত, কাজকাম ছুটি হয়ে যেত নামালিয়াদের।

জয়ের আনন্দে আজ আর কাজে গেল না নীলুয়া। তাছাড়া গেল রাতে গিরিহার ভাতুয়াটার সঙ্গে মারামারি করে হাতে-পায়ে ব্যথা। ইল্লিটার গায়েও লেগেছে ঘা।

আজ সে বেড়িয়ে বেড়াবে লছিপুর হাই ইস্কুলের বন্ধুরবাড়ি, একদিন যেতে গিয়েও যেতে পারেনি। আজ সে যাবেই যাবে বেনাড়ুবি-শঙ্করীডাঙা—

মেদিনীপুর-খড়গপুরে নারায়নগড়-বেলদা-বালিচক-দাঁতন-কেশিয়াড়ী শহর-বাজারে হাটুয়াদের গ্রামের আশপাশে কী চর্তুসীমানার বাইরে ডাঙা-ডহরে-বনে-বাদায় কোথায় কোথায় যে লুকিয়ে আছে লোধাদের গ্রাম—কুকাই-সাতসোল-মামনসা-আসানপুর-বাগুয়ান-সানচাহারা-বড়চাহারা-বেনাড়ুবি-শঙ্করীডাঙা— দোরখুলির লোধাবস্তির জনমাড়ষদের জানা নেই, জানা নেই পাঁচ-ছ ক্লাস পাশ করা নীলুয়ারও!

এ যেন জঙ্গলমহালে লাটা-পাটায় ঢুকে উলুরি-ঝুলুরি লই-লতা পাতাপতর সরিয়ে 'খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি" কায়দায় বনকাল্লা-কাঁকড়ো-কুঁদড়ি টুঁড়ে টুঁড়ে দেখা! আজ সেভাবেই খুঁজে খুঁজে দেখবে নীলুয়া বেনাড়ুবি-শঙ্করীডাঙা।

বন্ধুর নাম জিতেন, জিতেন নায়েক। কোথায় দাঁতনে শঙ্করীডাঙায় বাড়ি আর কোথায় পড়তে যেতে হয়েছে কেশিয়াড়ির লছিপুরে! নাকি কেশিয়াড়ির কুকাই-এ তার আত্মীয়বাড়ি, ছোট থেকে সেখানেই মানুষ।

নামেই 'মাত্বর' নামেই 'মুখিয়া' গুরভা, কোথায় বেনাড়ুবি কোথায় শঙ্করীডাঙা জিজ্ঞাসা করলে বলে 'ই গো জানি নাই, এক জানলেও জানতে পারে বড়্সোলের গজ্না।'

মামনসার স্যাঙাৎ-দাদুর মতো বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙার লোকেরাও দেখামাত্র নীলুয়াকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করবে না তো— পদবী ত ভুক্তা, গোত্র কী?

গোত্র? গোত্র তো চুরকাআলু মুখস্থই আছে নীলুয়ার, আর কখনো ভোলে? তাদের কত রকম পদবী— ভুক্তা মল্লিক নায়েক পরামানিক কোটাল দিগার, বড়োডাঙার 'হাটুয়া'দের মতো দঁড়পাটও আছে বৈকি।

কতরকম নাম— রাইবু-গুরভা-গুড়কুঁদা-গুড়গুড়িয়া-চামচু-চামটা-রাইবনিয়া-নাকফুড়রি-বকা-লাইবুকা-সুরুয়া! কতরকম 'টাইটেল'! তাদের যতরকম টাইটেল ততরকম গোত্র। সাপ-ব্যাঙ কী নেই? আছে চাঁদামাছ শালমাছ শোলমাছ, ট্যাসা টিড়িং না টিড়লিং পাখ, চুরকাআলু পানআলু, কাছিম—

কী করে যে এই সব হাবিজাবি সাপ-ব্যাঙ গোত্র হয়ে গেল লোধাদের, কারা করল এসব— নীলুয়া বুঝতে পারে না। শিকলি ধরে টেনে ইল্লিকে হাত মুঠোয় এনে গালের সঙ্গে চেপে ধরে মনে-মন বলে, বেনাডুবি শঙ্করীডাঙার যে কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে বলবেই বলবে, তার গোত্র এই ইল্লি 'চিঁড়রা'।

ট্যাসা-টিড়লিং হতে পারে, আর চিঁড়রা নয় কেন? চিঁড়রা, চিঁড়রা। আজ থেকে নীলুয়া চারধারে গাবিয়ে বেড়াবে হুলিয়া জারি করবে তার গোত্র চিঁড়রাই। সাপ-ব্যাঙ হতে পারে, চিঁড়রা কেন হবে না? এম্নি একরোখা এম্নি একগুঁয়ে নীলুয়া।

গিরিহা-গিরিহানী জানতেও পারল না— বেরিয়ে গেল নীলুয়া। নামাল খাটতে এসে এরমধ্যেই কিছু বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ফেলেছিল সে, বেলা 'বুঢ়লে' দিনের কাজ কাম সারা হলে ফি-রোজ সন্ধ্যায় সে হাটচালায় যেত আড্ডায়, কখনো নাকফুড়রি-হাড়িয়া-লাইবুকাদের সঙ্গে নিয়ে, কখনো একা একাই। 'বামনদা লোকক্লাব'-এর কিছু ছেলে-ছোকরা, খেলার মাঠের জনাকয়েক খেলুড়ে এর মধ্যেই বন্ধু হয়ে গিয়েছিল তার— নীলুয়ার মতো বারফাট্‌কা আলিসা ধাকুড়ধুমাও তো কম নেই বামনদায়!

ঘর থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে প্রথমে সেই তাদেব কাছে গিয়ে জুটল নীলুয়া। হাটচালায় চায়ের দোকানে মউজে লেড়ো-বিস্কুট সহকারে চা খেল সে মাটির ভাঁড়ে করে।

খেয়েই ফেলে দিল না ভাঁড়টা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল, মতলব বুঝে কেটলি থেকে আরেকটু চা ঢেলে দিল দোকানী, বয়ামের তলা হাঁতড়ে একটা ভাঙা লেড়ো বিস্কুটের টুকরোও ছুঁড়ে দিল ইল্লিকে।

তবুও ভাঁড়টা ফেলে দিল না নীলেশ্বর, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলই। কুম্‌হারদের হাতে-গড়া মাটির ভাঁড়, কুম্‌হার কুম্‌হার— দিঙ্‌ দিঙ্‌ করে মনে পড়ে গেল কুম্‌হার-ঘরে বিয়ে হওয়া তার সাবিপিসিকে!

সন্তোষ কুম্‌হার আর সাবিত্রী লোধা।

কে জানে এতদিনে তাদের বাড়ি থেকে ফের খেদিয়ে দিয়েছে কী না উগ্রচণ্ড ভৈরবটা! কে জানে এতদিনে ফের দোরখুলির লোধাবস্তিতে এসে ভুগড়া বানিয়ে চাক আর 'চকটবাড়ি' ঘুরিয়ে হাঁড়ি-কলসি গড়তে পুরোদমে লেগে গেছে কী না বোকাহাঁদা সন্তোষটা!

মাঝুড়ুব্‌কার জঙ্গলের এদিক থেকেই কী এতক্ষণে শোনা যাচ্ছে লোধাপাড়ায় কাঠ ফাড়ার বদলে হাঁড়ি পেটার ঢাব্‌-ঢুব্‌ আওয়াজ?

সন্তোষকুম্‌হারের সঙ্গে অকারণে খিটিমিটি বাধিয়ে তাকে কী চিহড় না হাতিবাঁধি লতায় ফের বেঁধে রেখেছে লোধাপাড়ার লোধারা? উঁ-হু, লোধাপাড়ায় লোধারা আর কোথায়!

রাইবু-গুড়গুড়িয়া তো হাজতে। লোধাপাড়ায় পুরুষ বলতে তো এখন একমাত্র তার বাপ গুড়খা-ই।

গুড়খা, গুড়খা।

মনে-মন আশ্বস্ত হয়ে মাটির ভাঁড়টা ভাঁড়ের স্তুপে আছড়ে ভেঙে ফেলল নীলুয়া। আওয়াজ উঠল— ঠকাস্! ভাঁড় তো নয় যেন ভেঙে পড়ল ভৈরবকুম্হার।

অঙ-টঙ দেখে দোকানী বলল, নামালিয়া ছুয়া, কাজে যিবনি? সাজিগুজি সকাল সকাল বাহার হিচ যে, ছুটি নেকি?

টেরি বাগিয়ে সাজগোজ করেই তো বাইরে এসেছে নীলুয়া, সে বলল, নাই ছুটি কেন হবে, আমি যাব বেনাডুবা-শঁকরীডাঙা, কুটুমবাড়ি। দোকানীর জানা আছে কী এই নামের গাঁ-দুটা কোন দিকে?

মামুঘর না অজাঘর?

মামার বাড়ি না দাদুর বাড়ি?

রসিকতা করে জানতে চাইছে দোকানী, নীলেশ্বর কী আর জানে না মামার বাড়ি যেটা দাদুর বাড়িও সেইটা!

মুচকি হেসে সেও বলল, মামার বাড়িও না দাদুর বাড়িও না, যাব ত বন্ধুর বাড়ি। ক্লাসমেট।

বলে কী ছোকরা? ক্লাস-মেট? 'কাঠ-বিলেই' কাঁধে জঙ্গলী ছেলেটা পাস দিয়েছে নাকি দু-চার ক্লাস?

অতঃপর রীতিমতো খাতির করে দোকানী জিজ্ঞাসা করল, কার দরকে যাব? নীলুয়া কার দরজায় যাবে?

নীলুয়া বুঝল— বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙার ঠিক-ঠিকানা জানা আছে বৈকি লোকটার। এনামেলের মগে দুধ নিয়ে গামলায় ঢেলে ফেনাতে ফেনাতে চায়ের দোকানী কাকে যেন হাঁক পেড়ে বলল, এ্যাই শ্রীকণ্ঠ, বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙা বেড়িইতে যিবু নেকি? যিবু ত যা, অউ ছুয়াটা যায়েটে—

নীলুয়ার ততক্ষণে বলা হয়ে গেছে, বন্ধুর নাম জিতেন, জিতেন নায়েক। সাকিন শঙ্করীডাঙা।

শ্রীকণ্ঠ নামের লোকটা হাটচালায় বসে এতক্ষণ কাঠিখুঁচি দিয়ে মাটিতে ফালতু আঁকি-বুঁকি কাটছিল। উঠে এসে নীলেশ্বরকে আপাদমস্তক দেখল।

তারপর দোকানীকে বলল, শরীলটা আজ মোটে ভালা নাই, ম্যাজ ম্যাজ করেটে। নাহানে গেনে হিতা। তেবে এইঠি নেকি বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙা? দূর অছি বিস্তর। হউ, গটে, চা খিয়াও দোকানী বেশ কড়া করি।

তাই বল, নেশা না করলে কাজের ঠিক জুত হচ্ছে না তোর!

বলেই দুজনে হাসল।

যা বুঝার বুঝে গেল নীলুয়া— শ্রীকণ্ঠ নামের লোকটা এর-তার ফাইফরমাস খেটে পেট চালায়। হয়ত এ গাঁয়ে নতুন এসেছে লোকটা, দূর দূর গ্রামগুলো মোটেও চেনে না, অথচ গ্রাম দেখার ইচ্ছা আছে ষোল আনা— তখন ডাক পড়ে শ্রীকণ্ঠর।

লাঠির ডগায় গাঁটরি-গুঁটরি বেঁধে সেই তো এগিয়ে চলে আগে আগে। এধার ওধার আঙুল দেখিয়ে বলে, এই কড়িয়া ঐ বামনদা জেনকাপুর-কুলিদা—

তেবে শুন-অ, বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙার কথা কইঠি—

চায়ের দোকানে শ্রীকণ্ঠর মুখ থেকেই নীলুয়া শুনল— এই কড়িয়া-বামনদা থেকে রেনজুড়া-সাবড়া-মনোহরপুর হয়ে সায়াপাড়া, তার পরে পরেই তো বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙা। আর এদিক দিয়ে সোজা উত্তরে গেলে চড়কাপাড়া-আড়বনা-মেনকাপুর-শান্তিকোঠা-কাকরাজিৎ-পাঁচরোল-বেনাডুবি—

নীলুয়া যেন পাখির ডানার মতো দুহাত দুদিকে মেলে ধরে হাতের দশ আঙুল নাড়াতে নাড়াতে উড়ে চলল— রেনজুড়া-সাবড়া-মনোহরপুর—

নামধাম জানা হলেও নামাল দেশের পথঘাট চেনে না নীলুয়া। পিচরাস্তা ছেড়ে মোরাম রাস্তা, কখনো মোরাম ছেড়ে পিচ, কখনো পায়ে হেঁটে কখনো ভ্যান রিক্সায়।

রেললাইনের ধারঘেঁষে বাস রাস্তায় বাসে চড়ে একদা তারা এসেছিল কড়িয়া-বামনদায় বেলদা-নারায়নগড়ের ওদিক থেকে। ফের কী ঐদিকেই ফিরে চলেছে নীলুয়া ঘুরপথে?

আচ্ছা, ঘুরপথে ঘুরতে ঘুরতে কখনো কী ভুল করেও সে এসে পড়বে না নদীধারে? সুবর্ণরেখা নদীধার, এমন তো কতবার লছিপুর হাই ইস্কুল থেকে ভসরাঘাট পেরিয়ে নয়াগ্রামে উঠে গোপীর বাস ধরে সে নেমে পড়েছে নারদা-চাঁদাবিলায়।

আর নারদা-চাঁদাবিলায় নামলে তার দেশ-গাঁ রুখনীমারা-দোরখুলি আর কতদূর! তবে কী সোজাপথে যেতে যেতে ঘুরপথে, ঘুরপথে যেতে যেতে একবারের জন্যেও ভুলপথে পা রেখে দেখবে নাকি নীলেশ্বর কোথায় নদীধার?

আখ-অড়হরের ক্ষেত পালবেগুন-জাড়া-তরমুজের বিল, নদীর এধারে কাঠুয়াপাল-রগড়া-খাড়বান্ধি-হরিপুরা-আন্ধারী-লাউদহ-কুলবনি-ভসরাঘাট-রাউতাড়াপুর-কাঁটাপাল-বড়া-কোটপাদা-পানসোলা-বেলমুলা-বাঘড়া-পলাশিয়া-মালপাড়া-সোনাকনিয়া কতসব গ্রাম! ভুল পথে যেতে যেতে কোথাও না কোথাও পৌঁছুবেই পৌঁছুবে নীলুয়া।

তার পরে তো নদী পেরিয়ে ওধারে নদীপাড়ের গ্রাম মাকড়িয়া-ওলমারা-চূড়ামণিপুর-নয়াগ্রাম-কুড়চিবনি-কলমাপুখুরিয়া-থুরিয়া-বড়োডাঙা-বাছুরখোয়াড়-খান্দারপাড়া-দেউলবাড়-পাতিনা—

ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নীলুয়া, তখন আর তাকে পায় কে? ডাঙা-ডুঙোড় বিল-বাওড় লাটা-বুদা মাড়িয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে মুহূর্তেই পগারপার, গোঠটাঁড়ের মাঠ পেরিয়ে মাঝুডুব্কা-জোড়াশালতলা ছাড়িয়ে দোরখুলির লোধাপাড়া।

চেষ্টা করেই একবার দেখবে নাকি সে? মনে-মন ভাবতে ভাবতে জোরে জোরেই পা চালাল নীলুয়া।

যেতে যেতে তার মনে হল— ভূ-ভারতে সত্যি সত্যি কোথাও কী আছে বেনাডুবি শঙ্করীডাঙা? নাকি সে-দুটো ম্যাজিক-গ্রাম— এই ছিল, এই নেই? সেখানে যেতে হলে তাকে কী জানতে হবে কারিকুরি, ইন্টু-সিন্টু ম্যাজিক? তুক-গুণ?

দেখতে দেখতে বেলা মাথায় চড়ল, চড় চড়ে খরা। তবু তো দাঁতন-এক নম্বর দাঁতন-দু নম্বর ব্লক নাবাল এলাকা, জলাভূমি! এখানে কতরকম গাড়া-গাড়িয়া পুকুর-পোখরী সায়র সরশঙ্কা-সায়র বিদ্যাধর। খরার মাসেও ধান ফলেছে মেলা!

একজন মোটর সাইকেলিয়া নীলুয়াকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েও দু'পা এদিকে-ওদিকে মাটিতে রাখতে রাখতে গাঁক্ গাঁক্ আওয়াজ তুলে গাড়িটাকে পিছিয়ে এনে স্টার্ট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বোধহয় শিকলি-বাঁধা কাঠবিড়ালী কাঁধে এক 'চনকা'কে দেখে কৌতুহল হয়েছে তার।

কাঁই যিব? হাসছে লোকটা।

তড়িঘড়ি হাটুয়া-তে বলেও শুধরে নিয়ে পরিষ্কার বাঙলাতে বলল, কোথায় যাবে?

বেনাডুবি-শঁকরীডাঙা।

কার কাছে?

জিতেন নায়েক।

সে কে?

নীলুয়া বিস্তারিত বলল।

মাথা নাড়ল লোকটা, না, সে চেনে না।

হউ তুমে উঠি বস, গাড়ির সিটটা ঝেড়ে দিয়ে বলল, আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি মনোহরপুর—

মোটর সাইকেলে দাপটে উঠে পড়ে নীলুয়ার মনে হল— এই তাহলে ম্যাজিক! তুক-গুণ! ইল্লি-টা নীলুয়ার কাঁধ ছেড়ে লোকটার হেলমেটে উঠল।

পিছনে ধুলোর ঝড় তুলে হিরো হুণ্ডা যখন নীলুয়াকে নামিয়ে দিল রাস্তার মোড়ে এক গাছতলে তখনও বেনাডুবি আসেনি।

লাফিয়ে বাইক থেকে নামতেই লোকটা বলল, শঙ্করীডাঙা যাব কইথিল না? অউ ঝুঁজকা জঙ্গলটা পার হিনেই শঙ্করীডাঙা।

বলেই লোকটা ফের বাইক চালিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল পশ্চিমে। কিছুক্ষণ গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকল নীলুয়া। শঙ্করীডাঙা যাবার রাস্তা ঐ তো লাটা-পাটার ভিতর দিয়ে সোজা।

আঁটারি-চুরচু পড়াশ-কুড়চি কেঁদমুঢ়্হা-কুলবুদার ঝাঁটি জঙ্গল না, এ তো গাব্ ভেঁড়রা-ভাট-পিটালি-তুলসী-কাঁটাভাবুরের বন।

দোরখুলির লোধাবস্তির কুল্হি রাস্তায় একটা রাস্তা আছে বটে, সোজাসুজি, সে রাস্তা যেমন ছুঁয়েছে রাইবুলোধার ঘুপচি তেমন শরাবণ-গুরভা-গুড়কুঁদালোধার ঘরও তো ছুঁয়ে আছে। তাছাড়াও, এতদ্সত্ত্বেও যে যার একটা নিজস্ব রাস্তা আছে, বাট আছে। সে বাট বক্র, কখনই সোজা নয়, সহজও নয়—

সোজাপথেই গাবভেঁড়রা ভাট-পিটালি তুলসী কাঁটাভাবুরের বনের ভিতর ঢুকে গেল নীলুয়া। তার পোষা চিঁড়রাটা শিকলি বাঁধা সত্ত্বেও এ-ঝোপ সে-ঝোপ করে যাচ্ছে। তাকে একেকবার টেনে আনছে নীলুয়া, ফের নীলুয়াকে টান দিচ্ছে ইল্লি।

টানাপোড়নে এতটুকুও বিরক্তি নেই, বরঞ্চ কী এক অজানা আনন্দে বারবার ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠছে নীলেশ্বর। কুটুম্বিতা করতে আরেকটু বাদেই তো সে গিয়ে হাজির হবে শঙ্করীডাঙা!

ঝুঁজ্কো জঙ্গলের এদিক-ওদিক উঁকি মেরে সে দেখল, কারা যেন হাঁটুর উপর ছেঁড়া-ফাটা শাড়ি তুলে তাপ্পিমারা ফ্রক গায়ে এ-ঝোপ সে-ঝোপ 'হিলাচ্ছে'। হিলানিতে একটা-দুটো শুকনো কাঠিখুঁচি ঝরে পড়লে 'কাবা-বনি'দের মতো ঠোঁটে তুলে 'একজেগ্যাই' জড়ো করছে।

এরা কারা? নির্ঘাৎ শঙ্করীডাঙার লোধারা। লোধারা, লোধারা। মনে-মন উল্লসিত হয়ে উঠল নীলুয়া। ভালো করে দেখতে সে তার হাঁটার গতি কমিয়ে দিল।

এতক্ষণ একমনে যারা শাক-পাল্হা কাঠিখুঁটির জোগাড় দেখছিল 'নুই নুই', তারা এবার কোমর খাড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাদেরও জিজ্ঞাসা— ই গো কে গো? চিঁড়রা-কাঁধে, কার ঘরে যাচ্ছে?

মনের ভাব বুঝতে পেরে মনে মনে নীলুয়াও যেন বলে উঠল, আমি গো আমি, তোমাদেরই স্বজাতি, নাম নীলেশ্বর ভক্তা, গোত্র চিঁড়রা। তোমাদের শঙ্করীডাঙার জিতেন

নায়েক আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, লছিপুর হাইস্কুল। তার ঘরেই যাচ্ছি।

এসময় একটা কাণ্ড করে বসল নীলুয়া ইচ্ছে করেই, হাত-মুঠো থেকে ছেড়ে দিল ইল্লিকে। আর ছাড়া পেয়ে বনের জীব তো লেজ নাচিয়ে নাচিয়ে নিমেষে এ-ঝোপ সে-ঝোপ এ-ডাল সে-ডাল কুদি মেরে লাফাচ্ছে।

মুখে একরকম শিস্ দিতে দিতে পিছন পিছন দৌড়ুচ্ছে নীলুয়াও। গাব্-ভেঁড়রা-ভাট-তুলসী-পিটালি-কাঁটাভাবুরের বন মুহূর্তে সরগরম! শঙ্করীডাঙার কাঠকুড়ানী ঝিউড়ি-বউড়িদের কাছে ইল্লি আচমকা থেমে সামনের দু'পা তুলে কুচিমুচি করলে লোধাবউড়ি-ঝিউড়িরা তো "ইগো মাগো" বলে একজায়গা থেকে সরে দাঁড়াল আরেক জায়গায়। সরতে গিয়ে কেউ কেউ তো উল্টে পড়ে গেল পা হড়কে।

তবু হেসে ফেলল।

হেসে ম্যানেজ দিল নীলুয়াও। বলল, পুষা চিঁড়রা, ভয়ের কিছু নাই, পা দিয়ে শিকলিটা চেপে রাখুন— হেঁ চাপুন—

একজন লোধানী, হ্যাঁ লোধানী-ই তো, পা 'ম্যাচ্ড়ে' শিকলিটা চেপে ধরল দাঁতে দাঁত কামড়ে। বলল, এত থাকতে চিঁড়রা পুষা কেনে গ' বাবুয়া? আমাদের এ-দিগরের হাটুয়ারা যেমন বলে, বিলাই নাই পুষবি ত মুসা পুষ?

বিড়াল না পুষে ইঁদুর পোষা! ইল্লিকে ছেড়ে দিয়ে এইটুকুই তো চেয়েছিল নীলুয়া। ভিনদেশী লোধানীদের সঙ্গে একটুকু আলাপ, আগ-বাড়িয়ে দুয়েকটা কথা—

এতক্ষণে একজন বলল, কোথাকে আসা হচ্ছে, কোথায় যাবে গ' বাবু?

ভারি উল্লসিত হয়ে উঠল নীলেশ্বর, এই তো চেয়েছিল সে, কেউ তাকে এ-কথাই জিজ্ঞাসা করুক— "বনে বনে আইলি বাবু, কী খাঞে আইলি? এত কেনে দেরি বাবু, এত কেনে দেরি? তোর বহিন বাহিরাঁই গেল, ভাত দিতে দেরি"—

নীলেশ্বর বলল, আমরা নামালিয়ারা, জাতে লদ্ধা, নামাল খাটতে এসেছি তোমাদের দেশে কড়িয়া-বামনদায়। যাব শঁকড়ীডাঙা।

উথলে উঠল নামালদেশের লোধা বউড়ি-ঝিউড়িরা। এতক্ষণে কেউ কেউ পরনের পিঁধান দাঁতে কামড়ে, উদ্‌লা বুক টায়ে-টুয়ে চেপে হে হৈ করে বলে উঠল, হায় দ্যাক্ বাবুগ' হামরাও ত লদ্ধা বঠিন— ঐ যে গ' নাম করলি, হামার শ্বশুরের নাম, মুখে আনতে নাই। ত ঐ গাঁয়ে কার ঘরকে যাবি?

জিতেন নায়েক।

বলতেই একজনকে তারা এমন ঠেলা মারল, যে-বেচারী পড়ে যাবার উপক্রম! তাকে উস্তন-খুস্তন করে বলল, এই ত গ' জিতার ফুফু, যা মিনা ঘরকে কুটুম আইল।

ফুফু তার মানে পিসি। সাবিপিসির মতো জিতেনেরও পিসি আছে দেখে মনে-মনে ভারি পুলকিত হয়ে উঠল নীলুয়া। লজ্জাও পেল সঙ্গে সঙ্গেই— ইল্লিকে দেখে "ইগো মাগো" বলে ভয়ে ঐ তো প্রথম সরে দাঁড়াল!

পরনে সরু পাড় খুড়দা শাড়ি, টিয়া রঙের। তবে কী জিতেনের পিসি বিধবা? কে জানে কী। মাথায় ঝুড়ি ঝাঁটি, আগে আগে জিতেনের পিসি, পিছনে ইল্লি-কাঁধে নীলুয়া।

ইল্লিকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও হাত ছাড়া করল না, ছাড়া পেয়ে পাছে সে ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ে জিতেনের পিসির ঘাড়ে।

মার্জিত, সংযত নীলুয়া চারধার দেখতে দেখতে চলেছে শঙ্করীডাঙা। খানা-ডোবা মরা-হাজা 'ঢড়্‌হাধারের' গা ঘেঁষে পায়ে চলার রাস্তা, দুধারে মাঝে মাঝে পিট্‌না-সিজের ঝাড়।

আগে আগে বোঝামাথায় চলমান মানুষটা আচমকা বলে উঠল, যেন মনে মনেই বলল, কে জানে পুত্রাটা ঘরে আছে কী নাই— সারাদিন ত সাইকেলেই টঙস-টঙস!

পুত্রা তার মানে ভাইপো, দাদার ছেলে। নীলুয়া কিছু বলল না— পাছে জিতেন ঘরে না থাকায় এই মাঝপথেই ফিরে যেতে হয় তাকে।

একটা আমবিহীন আমগাছ পড়ল। আমতলা ছাড়াতেই একটা গাঁ। গাঁয়ের মাথায় বাবুই নয় সাবুই ঘাসের চাষ, হিড়-বাঁধা দুয়েক ফালি ডাঙা-ডুঙোড় জমি— এই কী তবে শঙ্করী-ডাঙা?

এই দ্বিপ্রহরেও একটা উড়াকল গাঁ'টার মাথার উপর দিয়ে গল্ গল্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উড়ে যাচ্ছে। তার তলা দিয়ে, তলা দিয়ে দু-দুটো ন্যাঙটাভুটুঙ ছেলে এক হাতে যে যার নুঙ্কু চেপে ধরে পড়ি-কি-মরি দৌড়াচ্ছে।

দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে।

যেন উড়াকলটাকে না, ধোঁয়াটাকেই ধরে ফেলবে আজ যে করেই হোক।

এই রে শালা! ফুচুক্ করে হেসে ফেলল নীলুয়া।

হাসচিস্ বাবুয়া?

নাই পিসি, ও এম্নি খালি খালি— ঐ কী শঙ্করীডাঙা?

'চনকা'টা তাকে পিসি বলল? পিসি? আনন্দে যার পর নেই বিগলিত হয়ে উঠল ঝিউড়িটা। বলল, হঁ বাবুয়া, ঐটাই আমাদের গেরাম।

সঙ্গে সঙ্গে ট্রানশ্লেসন করে দিল নীলুয়া, 'আওয়ার ভিলেজ"।

কী বললি?

কাই, কিছু নাই।

হঁ বাবুয়া, তর চিঁড়রাটাকে সামলা!

ঘরেই ছিল জিতেন। আঙিনায়, ছাঁচতলের ছায়া-ছাঁয়রায় কারখানা খুলে বসেছে সে। চারধারে ছড়ানো যন্ত্রপাতি, টুকটাক সাইকেল পার্টস্। পাংচার হয়ে গিয়েছে সাইকেলের টিউব, নিজে নিজেই সারাচ্ছে সে।

মোটামুটি অবস্থাপন্ন বাড়ি, দেখেই হাঁ হয়ে গেছে নীলেশ্বর, আঙিনার একধাবে ছোট হলেও খড়ের গাদা আছে একটা, তুলসিচউরা। অ্যাঁ, গৃহস্থ চাষী নাকি জিতেন?

ঝাঁটিবোঝা ঝপাঙ্ করে মাটিতে ফেলার শব্দে ঘাড় ঘুরোতেই চিঁড়রা-কাঁধে মূর্তিমান নীলেশ্বরকে দেখতে পেল সে। আর দেখামাত্রই উঠে দাঁড়াল জিতেন, দু'হাতে কালিঝুলি, নচেৎ দু'হাত দিয়েই জড়িয়ে ধরত ইস্কুলের ক্লাসমেটকে।

কী করবে কী যে বলবে সব হাগুল-মাগুল হয়ে যাচ্ছে তার। খালি দু'হাতের কালি দেখিয়ে হাসছে জিতেন।

এত দূরদেশে কী করে এলি নীলু? রাস্তা চিনলি কী করে?

নীলুয়াও কোন কথা না বলে হাসছে।

মাথার বোঝা নামিয়ে দুই স্যাঙাতের কিত্তি দেখে শাড়ির ব্যাঠ্না খুলে গায়ের ঘাম মুছতেও ভুলে গেছে জিতেনের পিসি।

দাঁত বের করে এতক্ষণে সে বলে, কিয়াড়ুংরিতে বাট হারাএঞে ঘুরছিল বাবুছানাটা। ত দেখতে পেয়ে লইতনের মা, কালীবিটিরা বলল, তদের ঘরের কুটুম তুঁই সঙে করে ঘরকে লিয়ে যা বকড়ি—

জিতেন বলল, হঁ ত বিটি, খাটিয়া পাত্— কুটুমকে বসতে বল, বসা।

হাতের কালিঝুলি মুছে ধুতে যাচ্ছিল জিতেন, তাকে মানা করে দিল নীলেশ্বর, আরে না না, কুটুম্বিতা থাক— হাতের বাকি কাজটা সার আগে।

পাশে ছাঁচতলে বাবুইদড়ির খাটিয়ায় বসল নীলেশ্বর, ফের আগের মতোই ভোঁতা উকো দিয়ে ঘষে ঘষে টিউবের ফুটোর মুখটা পাতলা আরো পাতলা করতে লাগল জিতেন। এর পর ঘষা জায়গাটায় আঠার 'সলিউশন' লাগিয়ে তাপ্পি মেরে দিলেই হল।

জিতেনের ফুফু একঘটি জল এনে রাখল নীলুয়ার পায়ের কাছে, বাবুয়া, গোড় ধু'।

নীলুয়াকে পা ধুতে বলছে জিতেনের বকড়িবিটি। নীলুয়াও তো এই চাই— "সাঁজরাতে আসবার কথা সকাল রাতে আইলি। সকাল রাতে আইলি বাবু খেতে দিব বাসি—"

পা ধুয়ে এসে খাটিয়ায় বসতে বসতে নীলুয়া জিজ্ঞাসা করল, জিতেন, মাউসা-মাউসিকে দেখছি নাই?

আর বলিস নাই, ঘরে থাকার মানুষ কী তারা? গেছে তো গিরিহার বাড়ি 'জন' খাটতে পাঁচরোল। পাঁচরোলের হরিশ মিশ্র আমাদের 'বাবুঘর'।

বাবুঘর, বাবুঘর। তাহলে এদিককার লোধাদের বাঁধা 'বাবুঘর'ও আছে? সম্বৎসর ভাতে-কাপড়ে কী নগদা নগদিতে গিরিহার বাড়িতে 'জন' খাটে?

ভেবে ভারি আশ্চর্য হয়ে যায় নীলুয়া! অথচ তাদের ওদিককার বড়োডাঙা-খান্দারপাড়া-মুঢ়াকাটি-রুখনীমারার হাটুয়াঘরের কথা ভাব— বাঁধা 'বাবুঘর' তো দূরঅস্ত, রোয়া কী কাটার মরশুমে 'চোরচোট্টা' অপবাদ দিয়ে 'জন' খাটাতেও কেউ তাদের ডাকে না!

খাটিয়ায় বসে বসে জিতেনকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করছিল নীলুয়া আর চারধারটা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল সে।

কতদিনকার শঙ্করীডাঙা শঙ্করীডাঙা— এই তবে সেই! গাঁ'টা সুনসান, দুপুর দুপুর লোক বিশেষ নাই, যে-যার গিয়েছে খাটালিতে, কাজেকম্মে। পড়ে আছে বুড়ো হাবড়ারা— কেউ বা শুয়ে গাছতলে, কেউ বা মাটির দাওয়ায়, ধুলোতেই। ঘঙ্ ঘঙ্ কাশি আর নয়ত ভুড়ুর ভুড়ুর করে ঘন ঘন বাতকম্ম।

এরকম সময়ে হাটুয়াদের গাঁ গঞ্জে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বাট ভাঙে ভাট-ভিখারী, গোঙা সাধু, যে খালি মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে, একটাও কথা বলে না। রাস্তার এ-ধার ও-ধার থেকে হাটুয়া ছা-ছুয়ারা গোঙানি শুনেই চালের কাঠুয়া হাতে ছুটে এসে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুলিতে চাল ফেলে দেয়।

এরকম দৃশ্য তো লোধাপাড়ায় দেখা যায় না কস্মিনকালেও। তাই শঙ্করীডাঙার লোধাপাড়ার ভিতর দিয়ে যখন একটা মস্তবড় তালপাতার ছাতা অতি ধীরে হেঁটে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, একটা 'বকড়ী সাধু', তখন আর স্থির থাকতে পারল না নীলেশ্বর, দৌড়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

মস্ত বড়, তার মানে মস্ত বড়ই। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার ফুট চওড়া, তালপাতার বিছনী, হাতলটাও তালবল্লার। রোদের দিকে পেতে ধরলে রোদ লাগবে না, বৃষ্টির ছাঁট এড়িয়ে সময়ে মাথাটুকুও বাঁচানো যায়।

এরকম একটা তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে 'বকড়ি সাধু' হেঁটে চলেছে শঙ্করীডাঙার লোধাপাড়ার রাস্তায়। মজা দেখতে উঠে এসেছে নীলেশ্বর, সাইকেল ছেড়ে চুপিসাড়ে চলে এসেছে জিতেনও। যাদের নামে নাম সেই জিতেনের বকড়িপিসিও এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে।

কিন্তু কই, এদিক-ওদিক থেকে একটাও তো ছাউ-ছানা, এমন কী 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের

কুটুমও' তো চাপ্পের কাঠুয়া হাতে আসছে না?

জিতেন বলল, 'ঘঙ্' দেখিস নাই নীলু?

'ঘঙ্' দেখে নাই মানে? চিহড়পাতা দিয়ে 'ঘঙ্' তো তৈরি করে তারাই, আর করে সুখজুড়ির গোবরারা। দর্ দর্ করে যখন মাঝুড়ুবকায় তালখুড়রু-ঘোড়াটাপুর-তপোবনের জঙ্গলে অঝোর-ঝর বৃষ্টি পড়ে, শাল-আসন-কেঁদ্-করম-কুড়চি-চিহড়গাছের বড় বড় পাতায় বড় বড় করে আওয়াজ হয় তখন তো চিহড়পাতা তালপাতার 'ঘঙ্' মাথায় দিয়ে লোধারা লোধাবউড়ি-ঝিউড়িরা জঙ্গলের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত এদিকে রুখনীমারা ওদিকে পাথরডহরা পর্যন্ত আঁউলা-বাঁউলা আলু-তুঙা কেঁদ্-ভেলা-ভুডরুর সন্ধানে বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

নীলেশ্বর হাসল, 'ঘঙ্' না, আমি দেখছি ঘঙ্-মাথায় 'বকড়ি' সাধুকে, লোধাপাড়ায় বকড়ি সাধু?

হাসল জিতেনও, তাই বল, বকড়িসাধু? ও তো রোজ যায় এদিক দিয়েই গোপীনাথপুর, গোপীনাথপুরে বকড়িসাধুদের আখড়া আছে।

নীলুয়ার মনে পড়ে গেল তাদের তপোবন জঙ্গলমহালেও সাধুবাবাব আখড়া আছে। এককালে সেখানে এক ভণ্ড সাধু ছিল, ঐ ভণ্ড সাধুটাই তো ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছে রাইবুর বহিনকে। নাকি সেই থেকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাইবু মাতব্বর খানিকটা 'দুব্‌লা', হয়ে গিয়েছে কমজোরী। এখন তো সে 'জিহলখানায়'!

জিতেন রঙ করে বলে উঠল, জানলি নীলু, আমার এই পিসিও বকড়ি বটে, বকড়িবিটি, ঘঙ্ বুনে। তোর তালপাতার ঘঙ্‌টা বন্ধুকে একবাব দ্যাখা বিটি। কত বড় ছাতা আর কত হাত তার হ্যাণ্ডেলটা!

ছাতা না দেখিয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল জিতেনের বকড়ি-বিটি। গোপীনাথপুরের 'বকড়ি সাধুদের' দেখেই বুঝি তার নাম রাখা হয়েছিল 'বকড়ি'।

অতঃপর 'বকড়ি সাধু' নিয়ে কিছুক্ষণ নিষ্ফল গবেষণায় মেতে উঠল তারা। দুজনেই ন-ক্লাসে উঠে ছেড়ে দিয়েছে পড়া। হোস্টেল ছেড়ে নীলুয়া চলে গিয়েছে দোরখুলির লোধাপাড়া, জিতেন ফিরেছে শঙ্করীডাঙা।

তারা তো আর জানে না 'বকলী', যে-সাধুরা গাছের বাকল পরে, হাটুয়াদের কথার টানে কখন হয়ে গিয়েছে 'বকড়ি'। আর 'শুকলী', যে-সাধুরা শুক্ল অর্থাৎ সাদা পোযাক পরে তারাও হয়ে গিয়েছে 'শুকড়ি'।

কেন যে নীলুয়ার মনে শুধু শুধু অন্যকথা ভিন্ন উপমা হুট্ বলতে এসে যাচ্ছে। আ-হা-হা সে তো আর 'বকড়ি' নয়, বখরি, বড়জোর হলেও হতে পারে 'বখড়ি'।

নীলুয়ারা তো আর জানে না 'বকড়ি'রা বখরি খায় না, তারা সূর্যের ভজনা করে, তারা নিরাকার নিরামিষাসী। উঠল বামুন-বোষ্টমদের কথাও।

বামুনরা তো লোধাদের থেকেও ছোটজাত, এ তো শাস্ত্রেই আছে, আর বোষ্টমরা? হাটুয়াদের গাঁয়ে মিলেমিশে থাকা, হাটুয়াদের গা ঘেঁষে থাকা বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙার জিতেন বলল, বোষ্টমের জাত নাই, গঙ্গার ঘাট নাই— সেই বলে নাই "মাংস খিয়া দাঁত পড়নে বোষ্টম? বোষ্টম টম টম, হাঁড়ির ভিতর পৈতা রাখে খুকড়া খাবার মন—"

হাসি-ঠাট্টায় কাজে-অকাজে সাইকেলের 'লিক্' মেরামতিতে বেলা হয়ে গেল ঢের, এবার তো কোনমতে গা ধুয়ে দুপুরে যাহোক-তাহোক খাওয়া। কুটুম তো কি, নীলেশ্বর তো আর বলে-কয়ে আগাম পত্র দিয়ে আসেনি?

সন্না শাকভাজা, পেঁপে দিয়ে গেঁড়ি-গুগলির ঝোল আর জল ঢালা ভাত। মহা আনন্দে তাই খেয়ে একপ্রস্ত নির্ধুম্সে ঘুম। নীলুয়ার মনে হল— এমন ঘুম সে আর কোনো কালেই ঘুমোয়নি!

দরমা কী ছিটে-বেড়ার 'ভুগড়া' তো নয়, দেড়হাত দু'হাত চওড়া খড়ের কুচি মিশিয়ে সানামাটির দেওয়াল দেওয়া ঘর, খড়ের চাল। মাটিতে পাতা 'দোপুরা' মোটা কাঠির রঙ করা মাদুর, 'মসিনা'। এসব শুয়ে শুয়ে জিতেনের মুখ থেকেই শোনা। শুনতে শুনতেই নীলুয়ার মনে-মন প্রতিজ্ঞা— করতে হয় তো করব এম্নি একটা, যা জিতেনদের থেকেও বড়, দোতলা।

দোতলা, দোতলা।

দোতলা বাড়ির স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল নীলুয়া, জিতেনের বকড়িপিসির ডাকে ঘুম থেকে উঠেই ফের দেখতে লাগল, দোতলা—

দোতলা, দোতলা।

দোতলা বাড়িটাকে এবার সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল দোরখুলির লোধাপাড়ায়, কেঁদ্‌মুঢ়হা শালমুঢ়হা আসনমুঢ়হার মাঝখানে। তারপর দুহাত পিঠে আড়াআড়ি রেখে চারধার ঘুরে ঘুরে থুতনি উঁচু করে দেখল। শুধু কী সে? ঐ তো দেখছে রুখনীমারার বক্কা, ঐ তো দেখছে সুখজুড়ির গোবরা। শুধু কী দেখছে? হয়ত বলছেও, চোর লোধারা বাড়িটাও কার ঝেড়ে আনল!

নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখল নীলুয়া— সে কী জেগে আছে না ঘুমুচ্ছে? ধারে-কাছে জিতেন নেই। জিতেনের বকড়িপিসি এসে বলল, চোখে-মুখে জল দে বাবুয়া। জিতা আছে এক 'জেগ্যাই', তোকে সেঠিনে লিঞে যাব। জিতাই বলেছে।

কোথায় গিয়েছে জিতেন? যাবার সময় বলে গেছে তার ফুফুকে, ঘুম থেকে উঠলে নীলুকে সেখানে নিয়ে যেতে? সে কত দূর?

কিন্তু নদীর কী হবে নীলুয়ার? শঙ্করীডাঙা থেকে বেরিয়ে 'হাডু-ডু-ডু' কী 'ছো-কিত্-কিত্' খেলতে খেলতে যেদিকে দু'চোখ যায় 'আনসাট্‌কা' দৌড়ুবে নাকি নীলুয়া?

এপারে কাঁটাপাল-রাউতাড়াপুর-কোটপাদা-পানসোলা-বেলমূলা-মালপাড়া, সেপারে মাক্‌ড়িয়া-ওলমারা-চূড়ামণিপুর-নয়াগ্রাম-কুড়চিবনি-থুরিয়া-বড়োডাঙা—

মাঝে নদী, নদীজলে কুদি মেরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জাড়া-খেড়ি-তরমুজের বিল ভাঙতে ভাঙতে দু'পায়ে সিম-বরবটির শুঁড় জড়াতে জড়াতে উজানে আরো উজানে উঠতে উঠতে নীলুয়া একসময় হাঁতড়ে পেয়ে যাবে ঠিক গোঠটাড়-মাঝুড়ুব্‌কা—

বকড়িপিসির সঙ্গে শঙ্করীডাঙার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল নীলুয়া। আগে আগে পিসি, পিছনে নীলুয়া। জিতেনদের বাড়ির অদূরে রাস্তার ধারে একটা অশ্বত্থ গাছতলা। গাছতলায় খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে কেউ। খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটা ষাঁড়া-খুকড়া বাঁধা।

জিতেনের পিসি যেতে যেতে হাঁক দিয়ে মস্‌করা করল, কাঁই গ' পাদুরা বুঢ়হা, আর কবে 'পাহড়' মারবে তোমার ষাঁড়াখুকড়া?

স্প্রিংয়ের মতোই লাফ দিয়ে উঠে বসল বুড়োলোকটা, বলল, হঁ ধনি, তুঁই যবে আমাকে সাঙা করবি, হঁ সাঙা না বিহা?

মর্ মর্ খালভরা বুঢ়্হা! আর যায় কোথায়, জিতেনের পিসি কপট রাগে তক্ষুণি ফেটে পড়বে না? নীলেশ্বর বুঝল— বুড়ো আর পিসির ভিতর রসিকতার সম্পর্ক, দেখা হলেই এ-ওকে ঠাট্টা-মসকরা করে।

গালি খেয়েও বুড়ো তো ফোগলা দাঁতে হাসে, হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরে দড়ি বাঁধা মোরগটাকে। মোরগটার দু'ঠোঁট ফাঁক করে মুখের ভিতর পুচুর করে ফেলে দেয় একদলা থুতু।

নীলেশ্বরও জানে, এইভাবে থুতু খেয়ে খেয়ে ষাঁড়াটা একদিন রাগী হবে, রাগী ষাঁড়াটা 'খুকড়া-লড়াই'য়ে 'পাহুড়' মারবে। কাত্‌কার পায়ে কাত্ বেঁধে লড়াইয়ের মাঠে ছেড়ে দিলে চঁচরা ফুলিয়ে গলার কেশর দুলিয়ে নিমেষে উড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের বুকে আমূল বিঁধিয়ে দেবে তার ধারালো 'কাত্'! ছিরছিরিয়ে রক্ত ঝরে ধীরে ধীরে কমজোরী 'পাহুড়' হয়ে যাবে না বিপক্ষের লড়াকু মোরগটা?

কদমডাঙায় নীলুয়া এরকম কতই তো দেখেছে খুকড়া-লড়াই! তাদের আর খুকড়া কোথায়? বন-খুকড়া কী সাওসিন্ ধরে ঘরে এনে কী পোষ মানানো যায়? ধরাও কী অত সহজ! এই 'বাঙ' দিল মাঝুডুব্‌কায় তো পরমুহূর্তেই ডাক শোনা গেল তপোবনের হনুমান চৌকায়!

ছর্‌কে-ফর্‌কে জিতেনের পিসি আগ-বাড়িয়ে দুম্ দুম্ হেঁটে গেলেও বুড়ো তাকে ছাড়ে না, বলে, আমার কথার জবাব কিন্তুক নাই দিলি মিনা, হঁ বল্ ন্ন বিহা না সাঙা? কে জানে হয়ত লালঝোল গড়িয়ে পড়া বুড়োলোকটা ভাবেও একদিন না একদিন যেমন 'পাহুড়' মেরে আনবেই আনবে তার ষাঁড়া-খুকড়াটা, তেমনি একদিন না একদিন তাকে 'সাঙা' কী 'বিহা' করবেই করবে জিতেনের ফুফুটা।

এ হেন কুচিন্তাকে চাপা দিতেই মনে-মন ফের নদী এনে ফেলল নীলুয়া। নচেৎ লোধাদের আর নদী কোথায়! নদী, নদী—

হেঁ বিটি, এখান থেকে নদী কতদূর?

লদী? নদীর কথায় আন-চান করে উঠল জিতেনের ফুফুও। হ্যাঁ, নদী একটা আছে বটে তবে সে তো পশ্চিমে, আরো পশ্চিমে। 'মকর-সাঁকরাতে' সরশঙ্কায় না গিয়ে একবার গিয়েছিল বৈকি সে দলে ভিড়ে সুবর্ণরেখায় টুসু ভাসানে। সুবর্ণরেখার 'কাল্‌হা' জলে টুসু ভাসিয়ে ভাসন্ত টুসুকে দেখে সেও তো গেয়েছিল— "জলে জলে যায়ো টুসু জলে তুমার কে আছে? গো জলে তুমার কে আছে? মা-বাপ ছাড়া সবাই আছে গো, জলে শ্বশুরঘর আছে"—

কোথায় পড়ে আছে তার নিজের শ্বশুরঘর সাতসোল না বাঁকসোল! টুসু ভাসিয়ে তার তো মনে হয়েছিল— টুসুর সঙ্গে ডুব দিয়ে নদী জলে ভাসতে ভাসতে সেও কী পৌঁছে যাবে শ্বশুরঘর?

এই বিদেশিয়া ছ্যানাটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে শ্বশুরঘরের কথা ভাবতে তার এখন লজ্জাই করছে! লজ্জা, লজ্জা। মাথায় খুড়দা-শাড়ির ঘোমটা আরেকটু টেনে জিতেনের পিসি বলল, হঁ বেটা, সবন্নেখা নদী— সে ত বহৎ ধূর! এখান থেকে বেনাডুবি হয়ে মোগলমারি-নেকুড়সেনী, তার পিছ্‌কে রেললাইন-তররুই-খরাখাই-নীলপুরা— নাই জানি বেটা আরো কী কী গোরাম হই যে 'বেঢ়া' যেদিকে ডুবে, পছ্‌ছিমে—

ধারে-কাছে অতবড় একটা আস্ত নদী না থাকলেও খাল-বিল-গাঢ়া-গাঢ়িয়া যে আছে— ঝরাগেড়িয়া, খোলাগেড়িয়া, আঠিলাগেড়িয়া— একে একে সব বলে গেল জিতেনের পিসিটা। কিন্তু এই আড়বেলায় গা-ধোয়ার পর নদী-গাঢ়া-গাঢ়িয়া যে কী কাজে লাগবে ছুয়াটার কিছুতেই বুঝতে পারল না।

না বুঝে বলল, এই আড়বেলায় শুধুশুধু লদী খুঁজছিস কেনে বাবুয়া?

নাই পিসি শুধু শুধু কেনে— ঐ নদী পার হলেই ত আমাদের দেশ-গাঁ, দোরখুলির লোধাপাড়া?

তা হোক, তবু তোকে আজ যেতে দিলে ত জিতুয়া!

জিতেন আজ তাকে কিছুতেই যেতে দেবে না শুধু জিতেনের পিসির কেন, নীলেশ্বরেরও নিশ্চিত ধারনা। এতদিনের বন্ধুত্ব, তার উপর 'স্কুল-লাইফ'— কী এত সহজেই শেষ করা যায়? সাইকেল সারাতে সারাতে হল তো দু-চাট্টা গল্প, বকড়িবাবাজী, এখনো পড়ে রয়েছে 'হোল' স্কুল-লাইফ— তার কী হবে?

কিন্তু জিতেনের নাম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে জিতেনের পিসিটা? জিতেন-ই বা কোথায়? শঙ্করীডাঙার লোধাপাড়ায় চিঁড়রা-কাঁধে নীলুয়াকে যে-ই দেখে সেই তো হেসে মরে, বিশেষত মেয়েরা। হয়ত ভাবে— এ আবার কোন দেশি 'বাজ্‌কার' চিঁড়রা কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘুরে? উট-বান্দর-ভেড়া-ছেড়ী এসব নিয়েই তো হা-ঘরে বাজীকররা একদেশ থেকে আরেক দেশ টঙ টঙ করে ঘুরে বেড়ায়। তাবলে 'চিঁড়রা'?

ভুল ভেঙে দেয় জিতেনের ফুফু, বলে, জিতেনের সাঙাৎ আমাদেরই স্বজাত গ'।

মুহূর্তে হাঁ হয়ে যায় শঙ্করীডাঙার লোধারা, লোধা বউড়ি-ঝিউড়িরা। লোধাছ্যানা? তবু মনে-মন ভাবে, এই বয়সী চ্যান্‌কারা কোথায় 'টুইলা' 'লাটাচুলী' কী 'গুটুল' কী 'সাতনলা' নিয়ে এ-লাটা সে-লাটা এ-বিল সে-বিল এ-ডাংরি সে-ডাংরি এ-পড়িয়া সে-পড়িয়া জল-ঘুন্নি পোকাব মতো ঘুরে বেড়াবে, তা নয় 'চিঁড়রা'?

নীলুয়াও আড়চোখে দেখে, ফর্সা, গোলগাল, গামছা কী আর সালোয়ার কামিজ বড়জামা, তবু 'সিঁগননাকী' চাঁদবদ্‌নীর মতো একটাও না। অথচ কেন যে তাকে নিয়ে গিরিহার ভাতুয়াটার সঙ্গে বেধে যাচ্ছে ধুন্দমার! মারামারিও হয়ে গেল একপ্রস্থ, মারও খেল সে কম না— কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না নীলুয়া। কে জানে এতক্ষণে ওদিকে ঘটে গেল আরো কত কি ঘটনা!

যাই ঘটুক নীলুয়ার এখন একটা নদী চাই, যে-সে নদী না সেই নদী। শুনেছে সে, যে নদীতে ভরাকালে দাঁতন-ঘাটে 'কাবা' ডাকার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কাকভোরে নৌকা ছাড়লে সে-নৌকা বড়োডাঙার শিমূলতলের ঘাটে গিয়ে ভিড়ত আসমানে তারা ফুটলে, সাঁঝতারা উঠলে।

তারপর তো টাঁড়-কলমির বেড়া ঘেরা ডহর দিয়ে সোজা রাস্তা—

শুনেছে সে, ঐ নদীব দহে, সীতানালা খালমোহানায় 'অর্গলাভূত' থাকে, আর সেভূত কাম্‌হারপাড়ার ফাটাদার কাম্‌হারকে রাতভিত দাঁড়িয়ে থেকে 'ঝিজ্‌রি' গড়ার বায়না দেয়। আর কাম্‌হারের কাম্‌হার রাজা কাম্‌হার ফাটাদার বায়না পেয়ে এমন ঝিজরি এক গড়ে দেয় যা চোখে দেখা যায় না, নদীজলে গা ধুতে নামলে যা কী না শ্যাওলার মতো পায়ের বুড়ো আঙুলে অজান্তে জড়িয়ে যায়, হাজার পা ঝাড়া দিলেও সে আর খোলে না। খালি রাত হলে, রাত আরো গাঢ় হলে 'অর্গলা ভূত' সেই শেকল ধরে টান মারে। শেকলের টানে ঘোর লাগা মানুষ নদীর দিকে দহের দিকে বেঁহুশের মতো এগিয়ে যায়—

না হয় তাকে এখন ঐ 'অর্গলা ভূতে'ই ঝিজ্‌রি ধরে টান মারুক, তার টানেই সে নদীধারে এগিয়ে যাক। আর তারপর তো গামছা ছুঁড়ে কী করে ভূতের ঝিজরি ছিঁড়ে ফেলা যায় সে জানে বৈকি নীলুয়া।

নদীধারে কী আর, গাঁ থেকে বেরিয়ে সামান্য দূরে দক্ষিণে উঁচুডাঙায় একটা ঝুপড়ি ঘরের উঠোনে ঝাঁকড়া গাছতলে নীলুয়াকে নিয়ে হাজির হল জিতেনের ফুফুটা।

জিতেন তো আছেই, তাছাড়া সেখানে সেই সরুকাঠি-বড়কাঠির মাদুব পেতে বসে বিড়ি-তামুক খাচ্ছে আরো কেউ কেউ। তারমানে গাঁয়ের পাঁচজন মাথা জড়ো হয়েছে এক 'জেগ্যাই'। 'সরপঞ্চ' বসেছে একটা কিছুর সালিশি কবতে নির্ঘাৎ!

ঝুপড়ি ঘর একটা, তার চালে উঠে তেজী 'কাঁখুয়ার' লতা সবুজে সবুজে ডগোমগো করছে। 'কাঁখুয়ার' তার মানে চালকুমড়ো। জালি এসেছে সবে, তবে ফল এখনো 'পুরুষ্ট' হয়নি চোখে পড়ার মতো। কথায় আছে, "ঘরে নাই দুকড়া উঠানময় খুকড়া"— এদিকে ওদিকে মুরগী চরে বেড়াচ্ছে ছ-সাতটা। ঝুপড়ির দরজায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে বুড়িটা— ঐ ঐ— ওকে নিয়েই আজকের সভা—

জিতেন নায়েক কাছে ডেকে নিল নীলুয়াকে, বলল, ঐ ঐ— ঐ হল শুশনি নায়েক, স্বামী শ্রীধর। পঁচিশ শতক জমি পেয়েছিল 'পঞ্চাৎ' থেকে, সেই জমিও বেদখল। দাগ নং-২৩৯ জে. এল নং-১১। এখন একদম বাট ভিখাবী, রাস্তায় বাস্তায় ভিখ্ মেঙে খাচ্ছে।

কে জানে পঁচিশ শতক ক'বিঘা ক'কাঠা, শঙ্করীডাঙার লোধারাও তাহলে জমি পেয়ে চাষবাস করছে, ঐ তো শুশনির আঙিনায় ছোট হলেও খড়ের গাদা আছে একটা। নীলুয়া আরো শুনল, জমিতে ধানের 'তলা' ফেলেছিল শুশনি এই তো কিছুদিন আগে, সেই তলার উপর দিয়ে হাল লাঙল চালিয়ে সবকিছুই তছনছ্ করে দিল পাঁচরোলের বাবলু শাসমল, নাকি এ-জমি তার 'রায়তি' খাস কী বর্গা না—

জিতেন বলল, জানবি এর মূলেও আছে ঐ হাটুয়ারা। তবে এমনও বলছি না, বললে ভুলই হবে— সব হাটুয়ারাই খারাপ, বড়লোক, সেমানকার এতটিকে কষ্ট নাই, তারমনে গরীব না—

বলতে বলতে উত্তেজনায় জিতেনের কথায়ও এসে যাচ্ছে উড়িয়া টান। কখন ছাড়া পেয়ে চিড়িক্ চিড়িক্ করে পাঁচ গ্রামের দশজনের ভিতর ঢুকে পড়েছিল ইল্লিটা, ধড়ফড়িয়ে উঠে পাছার ধুলো ঝেড়ে হৈ হৈ করে বলতে লাগল লোকগুলো, হেই বাবুছ্যানাটা! তোর চিঁড়রাটাকে সামলা, সামলা! হোক না যতই শিকলিতে বাঁধা, সেই বলে নাই— "ছুঁচা যদি আতর মাখে তবু কী তার গন্ধ ঢাকে?"

আরেকজন বলল, যা বলেছ, আতর মাখলেও ছুঁচিয়ার গায়ের বট্‌কা গন্ধ কী আর উবে যায়? যায় না, যায় না। যেমন— "কুকুর যদি রাজা হয় সোনার মাকড়ি পরে কানে। তবু তল্ চোখে চাইবে কুকুর ছেঁড়া জুতার পানে।"

জিতেন-নীলেশ্বর দুজনেই হেসে উঠে, মনে মনে ভাবে, এবা এতও জানে, হেঁযালি খনার বচন! ঠেলা মেরে জিতেন নীলুয়াকে বলে, কোশ্চেন ঃ একটি গৃহপালিত পশুব নাম কর? আন্‌সার ঃ চিঁড়রা।

ফের দুজনে হাসে, লজ্জায় অতঃপর শিকলি টেনে ইল্লিকে প্রায় পকেটে পুরে ফেলে নীলুয়া। আলতো থাপ্পড় মেরে মনে মনে বলে, সেদিনও পার্টি অফিসে এমনি তরো 'ডিস্‌টাব' করেছিলি ইল্লি! সভা-সমিতিতে এলে তোকে কী পিঁপড়া কামড়ায়? নাকি তুই কিছু বলতে চাস?

চুপ করে পড়ে থাকে ইল্লি, নড়েও না চড়েও না, খালি পিঠের উপর প্রভুর হাত বুলানোয় লেজটা তার মোটা হচ্ছে ক্রমশ।

আসলে নীলুয়ার মনের ভিতর এতক্ষণ ধরে একটা নদীর চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে সেই নদীধারে পৌঁছুবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল আপ্রাণ। এদিক ওদিক দিয়ে কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। তারপর তো জিতেনের পিসিই তাকে ধরে আনল এখানে।

এখানে এসেই সে যেন দেখল— এগিয়ে আসছে 'বহলিয়া' নদীটা। ভূগোলের ম্যাপ্ জানা

থাকলে সে দেখতে পেত— অজগর সাপের মতো শরীর উল্টাতে উল্টাতে ধেয়ে আসছে সুবর্ণরেখা—

বাউতাড়াপুর, কাঁটাপাল, বড়া ডুবিয়ে দিল। কোটপাদা, পুড্ডা, কুস্তুড়িয়া জলের তলায়। ওদিকে ডুবল বেলমুলা পানসোলা নইকুলবৈঁচিয়া। খরাখাই, তররুই, জ্যোতিদোবেড়িয়া। দাঁতন-চাউলিয়া ডুবে গেল নিমেষে। সোনাকনিয়া তো ডুবেছে আগেই। চকইসমাইল, সাবড়াপিং, সিজুয়া, বাইপাটনা, বাগমারি আরুয়া পালসাই কসবাগোলা সব, সব তো একে একে জলের তলায়। সরশঙ্কা-বিদ্যাধরের সঙ্গে নদী মিশে কাকরাজিৎকে ডুবিয়ে ছাড়ল। সাধুয়া পুকুর, কুণ্ডুপুকুর, ভেটীয়া পুকুর, অস্থিয়াপুকুর, রাজগেড়িয়া জলে জলে একাকার!

কেয়াডাংরি-বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙার এদিকটাই যা একটু ডাঙা ডাঙা। ডাঙায় একটা ডেঁউচ গাছের গোড়ায় বাঁধা নৌকায় উঠে দড়ি খুলে দিল নীলেশ্বর। তবু তো এদিকে কাক-কুইরি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দিলে সে-নৌকা ওদিকে বড়োডাঙার ঘাটে ভিড়বে আসমানে ঝিলিমিলি তারা ফুটলে।

নদীর 'কাতা' ধসে জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে শুশনি নায়েকের পঁচিশ শতক। ডাঙায় দাঁড়িয়ে জিতেন হাঁক পাড়ছে, যাস না নীলু, অন্তত সই-সাবুদটা করে যা, আমরা 'উপরে' পিটিশান পাঠাচ্ছি— এই দ্যাক্—

"মাননীয় অমুক, দাঁতন ১ নং ব্লকের ৩ নং মনোহরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন শঙ্করীডাঙা মৌজায় এক বাট-ভিখারীর জমি বেদখল হয়। বাট-ভিখারীর নাম— শুশনি নায়েক, স্বামী শ্রীধর। দাগ নং— ২৩৯ জে.এল. নং— ১১। পেশা—ভিখ্ মাঙা। জাতি— লোধা।

শুশনির জমি ভাগে চাষ করত পাচরোলের শ্রীবাবলু শাসমল। এককালে নিয়মিত ভাগ দিত। ইদানীং চাষের ভাগ কিংবা জমি কোনটাই ফেরত দিচ্ছে না। শুশনি ধানের তলা ফেলেছিল জমিতে বহুকষ্টে। বাবলু শাসমল ধানতলা সহ সে-জমি চষে দিল—"

আর পড়তে হবে না, কলমটা দে। বলেই কলমটা হাতে নিয়ে প্যাঁচ খুলে ধরার জায়গায় লেগে থাকা কালিটুকু মাথার চুলে মুছে সই করল নীলেশ্বর। তার আগে আগে সই করেছে— ১। শ্রীত্রিলোচন ভক্তা ২। শ্রীবলাই নায়েক ৩। শ্রী খুদু মল্লিক ৪।শ্রীবাঁঠু মল্লিক ৫। শ্রীমার্কুণ্ড কোটাল ৬। শ্রীজিতেন নায়েক। সব শেষে এই সই করল নীলুয়া— ৭। শ্রীনীলেশ্বর ভক্তা।



নীলুয়ার উপর ভয়ানক চটে আছে অদ্বৈত। ছোকরা ভেবেছে কী? কাজকাম ছেড়ে 'কাঠবিলেই' কাঁধে কাকমারা-শিয়ালমারাদের মতো যখন যেদিকে খুশি চলে গেলেই হল? যার তার সঙ্গে কারণে-অকারণে ঝগড়া-মারপিট বাধালেই হল? কাজ করবি না ঐ সব করবি? তবে আর নামাল খাটতে এসেছিস কেন? ঢাম দেখাতে হয় ঘরে বসে দেখা, রঙ দেখাতে হয় তোর বাবা-মাকে দেখা।

অউ যে গুরভা—

'গুরভা' বলেও সংশোধন করে নিল অদ্বৈত, বলল, অউ যে গিরি গোবর্দ্ধন। এসব হচ্ছে কী!

কিসের কী, গুরভা ভাবল তার অসুখের কথাই বলছে গিরিহা। আজ তো তার শরীর কিছুটা ভালোর দিকেই, তার উপর ধর্মের জল আনতে গেছে নেকবাটিয়া তার বউ আর তার

ছোট ছেলে সুরুয়া, সেই জল খেয়ে কোনমতে—

হাত জোড় করে গুরভা বলল, আজকের দিনটা টুকচার ছাড়ান দে গিরিহা, কাল লে—

হউ কাল, তেবে হঁ— তোর সেই উঁদুরছুয়া টকাটা কাঁই গেলা?

কে? নীলুয়া? কে জানে কোথায় গেল, বলে তো যায় না! উহার কথা ছাড় গিরিহা উ হচ্ছে সেই বলে নাই ছটফটিয়া?

উঁদুর ছুয়া, তার মানে ইঁদুরের বাচ্চা। ইঁদুরের বাচ্চার মতোই ছটফটে নীলেশ্বর সকালে উঠে কোথায় চলে গিয়েছে, সে খবর তার দলের লোকেরা জানে না। নাকফুড়রি লাইবুকা হাড়িয়ারাও জানে না?

না, বললে তো জানবে! বড় মুখ করে গুরভা বলল, কী করবি হাতের পাঁচটা আঙুল ত সমান হয় না মা'জন। একজনা গেছে আমরা ত আছি।

গিরিহার কাছে, হাজার হোক একটা পরদেশী লোকের কাছে নিজেদের লোক নীলুয়া সম্বন্ধে নিন্দামন্দ করা— অতটা আবার পছন্দ হচ্ছে না আর আর লোধাদের, বিশেষত শতুরার বউ নিয়তির।

সে-ই বলল, কুথাকে আর যাবেক মা'জন, আশ-পাশেই আছে।

হঁ, আশপাশে না আর কিছু, দ্যাক্ এত্খনে লুকাঁয় লুকাঁয় ঘর পালাঁইছে!

কে? কে বলল কথাটা? লুকিয়ে লুকিয়ে এতক্ষণে সে নদী পেরিয়ে মাঝুড়ুবকা পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে লোধাপাড়ায়?

বলল যে সে পুনোই নয় ভুটকীও নয়, স্বয়ং চাঁদবদনী। চাঁদবদনী, চাঁদবদনী। কী 'হেরো পার্টির' মতো মাথা নিচু করে চুপি চুপি নীলেশ্বরের পলায়নে অভিমানে ঠোঁট বিদুর করেছে চাঁদবদনী? নীলুয়ার জন্য হাহাকার উঠেছে তার মনেও?

কে জানে বাবা তার মুখ দেখে তো বুঝবার উপায় নেই, একই হাবভাব। হাসছে, 'চড়ৈ'-এর মতো ফরফরিয়ে এদিক-ওদিক উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুরুষদের মতো কোমরে সিল্কের লুঙ্গি পরেছে ঘের দিয়ে, খালি উপরের দিকে যা প্যাঁচানো শাড়ির উড়না, ছোট জামা। এই কদিনেই লকলকিয়ে লই-লতির মতো বেড়ে উঠেছে চাঁদবদনী। মুখে গুনগুন করে যখন তখন গাইছে গিরিহানীর মুখ থেকে সদ্য শুনে শুনে মুখস্থ করা হাটুয়া পদ্য—

দুলি পেঁ পেঁ দুলি পেঁ পেঁ কপতি পতর।
বড়বউকু ছাড়ি আইনি দুলিয়া ভিতর।।
কটি কটি চড়িগুলি পিঁয়াজ পতর খায়।
বড় বউকু আনতে গ্যানে ঝুমরি গীত গায়।।
ঝুমরি মা লো, ঝুমরি মা কি কাণ্ড কলু।
এতটিকে ঝিঅটাকু বুঢ়া বরকে দেলু।।
দেলু দেলু ভল কলু কালকু দবু শাড়ি।
রাত পুইনে দেখি আইস্‌বু পাক্‌লা পাক্‌লা দাড়ি।।

এই তো গাইছিল, ঘরের ভিতর থেকে গিরিহানী ডাকল, বদনী ও বদনী, কী রে কী হউচি? কাম অছি, টিকে শুনি যা!

কে জানে কী কাজ আছে গিরিহানীর, হাঁক শুনেই তো দৌড়ুল চাঁদবদনী। এদিকে মনটা ভালো হয়ে গেল অদ্বৈতর। ঐ যে গুরভা বলল 'আমরা ত আছি'। কত বড় বল ভরসা! আসলে মনটা খিঁচড়ে গিয়েছিল অদ্বৈতর— ঐ যে পার্টি অফিসে গিয়ে নীলুয়ার চুক্‌লিবাজি।

এই তো এসেছিস বড়জোর ছ'সাতদিন, এর মধ্যেই এত কিছু? ধীরে 'টকামনে' ধীরে।

অদ্বৈতও একজনকে হাঁক মেরে বলল, অউ যে কচি, ঝাঁটা ত অউখানটা, অক্‌খুনি টেরাক্‌ আসি পড়ব— মেঘরাজ আর হনুমান রাইস মিলে ধান পঠাইতে হেব।

ট্রাক আসবে শুনেই হাড়িয়া নাকফুড়রি লাইবুকা তিনজনই দৌড়ুল— কে আগে ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট দেবে খলাটা।

খলার এ-মুড়া সে-মুড়া পায়চারি করছে অদ্বৈত। অস্থির অস্থির। অদ্বৈতর ধানকাটা শেষ হতে এখনও তিন-চারদিন। তার শেষ হলে শুরু হবে তার ভাইয়ের ধানকাটা। অদ্বৈতর ভাই রোজ দু'বেলা এসে তাগিদা দিয়ে যাচ্ছে নামালিয়াদের। তাই ঠিক হয়েছে আজ অর্ধেক নামবে অদ্বৈতর বিলে, বাকি অর্ধেক যাবে তার ভাই শ্রীমন্তর জমিনে। রান্নাবাড়া-খাওয়া-থাকা সব এক জায়গায়, এই যেমন হচ্ছে, হবে।

এত এত বরাত পেয়ে নামাল খাটতে আসা নতুন নামালিয়া গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা ভাবছে, ইস্‌ কত কাজ! এ ডাকছে সে ডাকছে, এখানে কাজের কী শেষ আছে! কত লোক নামছে ধান বিলে রোজ, কত জাতের মানুষ! তবু তো ধানবিল ফাঁকা হচ্ছে না, এখনো কত 'পাঁহী' যে বাকি!

চাঁদবদ্‌নী কাছে এলে গিরিহানী বলল, আয় মনা!

যেন মেয়েটা কবেকার চেনা! এ-বাড়িতে বউ হয়ে আসা ইস্তক বছর বছর কতই তো দেখল নীলিমা। নামালিয়াদের একটা দল এই বছর এল, পরের বছরও এল। তার পরের বছর কোথায় যেন হারিয়ে যায়, আর আসে না।

আর আসে না, আর আসে না।

সেই তো এসেছিল— কী যেন নাম কান্দরি, ভটা, বিজ্‌লী। পরের বছর, তারপরের বছরও এসেছিল তারা। তাদের সঙ্গে কত ওঠা-বসা নীলিমার।

অদ্বৈত মানা করত, গাঁয়ে গা ঠেকাবে না একদম নীলিমা। কতরকম চর্মরোগ— খোস-পাঁচড়া। ঠিকমতো স্নান করে না। জিভ-ঘাও কানে পুঁজ রাত-কানা। কুষ্ঠও থাকতে পারে।

হয়ত নীলিমা বলল, যা কান্দরি তেল মাখি গড়িয়ারু গা ধোই আয়। তেল মেখে পুকুর থেকে স্নান করে আয়।

নাই গিরিহানী, আজ বেড়ে জাড়! সিনাব নাই।

আজ খুব শীত, গা ধোবো না।

মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে নীলিমা, শিগ্‌গির যা, নইলে আমিই তোকে ঠেলে ফেলে দেব পুকুরের জলে। শীতকালে ঠাণ্ডা থাকবে না তো কী গরম থাকবে?

হায় গ মাই রাগিস কেনে? হামরা ত সবুদিন সিনাই নাই, মাঝে এক-দু'দিন। এই ত হেঁথা স্নে গেলে মকরসাঁকরাতে লদীর কাল্‌হা জলে টুসুকেও সিনান করাব, হামরাও সিনাব। সেদ্‌নে জাড়জুড় মানব নাই।

বলেই আঁচলে মুখ ঢেকে কান্দরির কী হাসি! এই মেয়েটা তেমন নয়, নিয়মিত স্নান করে। হাটুয়াদের দেখাদেখি সাজতেও চায়। তাকে গিরিহানী এটা-ওটা কাপড়-চোপড়ও পরতে দেয়। তা বলে গোটা দলটা কী আর!

ক্যানে ডাকছুলু গ?

বাইগন বিলকু চ।

পোখরিআড়ার ধারে ঘরের লাগোয়া অদ্বৈতর আনাজখেতি। ঝিঙা-বৈতাল-ভেণ্ডী-বেগুন-বরবটি কী না হয়! পুকুর থেকে 'সিনিতে', সময় সময় কির্লোস্কার পাম্প চালিয়েও জল ছিঁচে

চাষ হয় তরি-তরকারির। করে তো ঐ স্বপ্নাই। চাষের জন্য মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে তার জুড়ি আর কেউ-ই নেই।

স্বপন থাকলে ঐ তুলে আনত আনাজপাতি, আলুটা মূলাটা। আজ চাঁদবদনীকে নিয়ে খেতিতে নামবে নীলিমা। তার সঙ্গে তার বিশেষ কথা আছে। নচেৎ মেসিনঘরের কাউকে হাঁক দিলেই তো সে এসে এতক্ষণে আনাজের ঝুড়ি উপুড় করে ঢেলে দিত রান্নাঘরের দলিজে।

বেগুনবিলে যেতে বলছে গিরিহানী, চাঁদবদনী তো এক পায়ে খাড়া। গাছ থেকে পাতা তুলতে 'ডগ্' থেকে ফল ছিঁড়তে হাত তো তাদের নিস্ পিস্ করে। বনে-জঙ্গলে ডুব্কা-ডুংরিতে লাটায়-পাটায় টঙস টঙস করে ওর জন্যই তো ঘোরা।

গিরিহানীর সঙ্গে আনাজখেতিতে ঢুকল চাঁদবদনী। আগে আগে নীলিমা, পিছনে ঝুড়ি বগলে সে। সাদা সাদা হলুদ হলুদ 'পত্নী' উড়ছে হেথাহোথা, আর ফিনফিনে ডানাওয়ালা 'ঝিঞ্জিরি বাগাডুলু'। এত থাকতে চাঁদবদনীর চোখ তো আগেই চলে যায় সেদিকে। এসময় গোঠটাঁড়ের আশপাশে কদমডাঙা-পুরাতন ডাহিতে সুখজুড়ির গোবরাসাঁওতালের খসাবিলে এরকম কত প্রজাপতি ফিনফিনে ফড়িং-ই যে ঘুরে বেড়ায় চাঁদবদনীর সেসব তো চোখে দেখা।

এক হাতেই আস্ত একটা ঝালরওয়ালা প্রজাপতিকে কব্জা করতে ঝুড়িবগলে লাফিয়ে উঠেছে চাঁদবদনী, আর গিরিহানী বলল, গটে কথার জবাব দে তো ছেমরি।

কী কথা গ?

আগে ক'— হঁ অউ ডেমরিয়া ছুঁকি ক'— মিছা কইবু নি।

হাতের বাহু বাড়িয়ে ধরল গিরিহানী। বাহুতে হাতের মাংস চেপে কালো ঘুনসীতে বাঁধা এক মাদুলি। ঐ মাদুলি ছুঁয়ে শপথ করেই চাঁদবদনীকে সত্যি কথা বলতে বলল নীলিমা।

যে-সে মাদুলি তো নয়, 'সাত বেউনি' ঠাকুরের মাদুলি। পদুমাঝির দেওয়া 'ডেমরিয়া'। এ'দিয়ার' তার নামডাক কত! এই ছুঁয়ে মিথ্যা কথা একবার বলুক দেখি মেয়েটা?

মেয়েটাও তেমন, গিল্ গিল্ করে হাসতে হাসতে অবলীলায় ছুঁয়ে ফেলল মাদুলিটা। বলল, হঁগ এই ত তুমার 'ডেমরিয়া', তুমার গা ছুঁয়ে বলছি— সাচাই বলব, মিছা বলব নাই। হঁ কী কথা?

সোউ যে চ্যান্কাটা, নীলুয়া না ফীলুয়া, তার সাঙে তোর কী?

কাই, কিছু নাই।

সচ্ কচ্ছু?

হঁ ত কী, মিছা বলছি?

তেবে তোর উপর তার এত্তে র‍্যালা কাঁহি কি? কী জন্যে এত কর্তালি করছে?

কী করেছে?

কেনে শুনুনি? কাল রাতর স্বপ্নাকু মারি তার মুহ-মথা ফাটি দেলে? স্বপনকে মেরে তার মাথা-মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে নীলেশ্বর।

এত কিছু শুনেনি চাঁদবদনী। তবে ভিডিও দেখতে গিয়ে একটা কিছু গোলমাল যে হয়েছে বুঝতে পেরেছিল সে। নাকফুড়রি-হাড়িয়া-লাইবুকারাই বলছিল গুজ্গুজ করে।

গিরিহানী ফট্ করে বলে বসল, আমহর সৌউ ভাতুয়াটা তোকো কিছি করথিলা নেকি— ইয়ে-টিয়ে? ইশারা-টিশারা?

কেমন যেন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল মেয়েটা। মাথা নিচু করে শুধুই ঘাড় নাড়ল।

নীলিমা বেগুন তুলতে শুরু করে বলল, আরে, তেবে ম্যাড়া দুইটা খালি খালি নড়েটে গোবরা নঁড়ে?

বেগুন তুলতে তুলতে চাঁদবদনীও এতক্ষণে বলল, নীলুয়াটা বেড়ে ছটফটিয়া, হুট বলতে রাগিঁ-ই যায়।

তার রাগ তার ঘরে থাউ, অউ র'ম ছটফটিয়া লুক-অ— আজ অছি ত কাল নাহিঁ— নামাল খাটতে আসিচন কেনি? ছেড়িদেই কি চাষ হব? আরে ছাগল দিয়ে কী আর চাষ হবে?

হঁ তাই ত, আমিও ত সেই কথা বলি— কিন্তুক উঠ্‌তি মাত্‌বর যে গিরিহানী। ঐ ত পথ দেখাঁয় আমাদের এতদূর আনল। ইগো এর আগে নামাল পাঠাতে কেউ ত সাহস করে নাই। রাইবুকাকা শুন্‌লে বেদম হুরি করবে— যাক্ উ এখন জিহলখানায়। তাকেও ত মানে নাই নীলুয়া, গুরভাকেও নাই—

আচ্ছা ছিটিয়াল ছুয়া তো।

বলেই পোড়-খাওয়া মেয়ে নীলিমা কী আড়চোখে একবার দেখে নিল চাঁদবদনীকে? আর দেখেই বুঝল ছোঁড়াটার প্রতি ছেমড়িটারও চোরা টান? তলে তলে কী গজিয়ে উঠছে লম্বা চুলো কাঠবিড়ালী কাঁধে ভ্রাম্যমান নীলেশ্বরের প্রতি চাঁদবদনীর মোহ-মুগ্ধতা? ভাব-ভালোবাসা?

টেঁড়শের গাছে ধরে আছে টেঁড়শ। চাঁদবদনীরা তো আর টেঁড়শ বলে না, বলে ভেঁড়ী। লাল ও আছে, সাদাও আছে।

বৈতাল 'লতে' বৈতালের জালি এসেছে। গাঢ় সবুজ রঙের। ফল এখনও পুরুষ্ট হয়নি। ঝিঙামাচানে উলুরি-ঝুলুরি একমাচনি ঝিঙা 'লত্'। ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঝুলে আছে তরোল তরোল ঝিঙা। অদ্বৈতর পোখরির জল এই খরার কালেও আনাজের ভুঁইকে 'বতর' রেখেছে। তার পোখরির কাদামাটিতে যেমন চরে বেড়ায় লুবু-কাঁকড়া, তেমন জলে ভাসে সোনার গাগরা। সিনি-ছেউনি, জল-ছিঁচা মেশিন, কিছুরই তো অভাব নেই— চাষা তো কম বড় নয় অদ্বৈত পৈড়্যা!

জঙ্গলে বন-কুঁদড়ি কাঁকড়ো বনপুঁই বন-কান্না খোঁজার মতো করে নামালদেশে গিরিহা-গিরিহানীর এই আনাজখেতিতেও ভেঁড়ি-ঝিঙা-বেগুন-বৈতালের তালাস করে চলেছে চাঁদবদনী। লাটা-পাটা টুঁড়ে পাল্‌হা-পতর সরিয়ে তন্ন তন্ন খোঁজা কী আর, হাত বাড়ালেই তো গিজ্ গিজ্ করছে লুড়কী বাইগনের 'ছড়া'।

বেগুন তুলছে আর গুনগুন করে গাইছে সেই 'বেহা গীত'টা—

কড়র ঝিক দিম নাই কড় হবেক শুধা
গাছের বাইগন তুল নাই গাছ হবেক শুধা—

গিরিহানীর এককথা, চেপে যাচ্ছিস বদনী? সোউ ছোঁড়াটার সাঙে তোর একটা কিছি অছি—

একটা কিছু, একটা কিছু।

ইগো নাই, আর কী থাকবে? এক গাঁয়ের লোক এই বড়জোর।

নীলিমা যেন মরীয়া, হঠাৎ যেন তার বয়স কমে গিয়ে সমান সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে চাঁদবদনীর, সে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে সেই তার সঙ্গে তার একটা কিছু আছে। আছে, আছে।

বদনী!

হঁ গিরিহানী।

হউ তার সাঙে তোর কিছি নাই মাননু, আচ্ছা গটেয় ব্যাপার স্বীকার যা তু— তোকো আজ্জাত কেই 'কিস্' খাইলা নি?

একটা কথা স্বীকার করবে কী চাঁদবদনী— তাকে আজ পর্যন্ত কেউ 'কিস্' খেয়েছে কী না?

কিস্? সেটা আবার কী গ'?

চুমা লো চুমা।

মাটিতে আনাজের ঝুড়ি রেখে লুঙ্গি ঝেড়ে চাঁদবদনী বলল, হঁ সে ত কত্ত খেয়েছে! গিরিহানীর কাছে এই একটা কথা স্বীকার করতে পেরে সে যেন গর্বিত।

চমকে উঠল অদ্বৈতর সুন্দরী বউ। বলে কী নামালিয়া 'মাইয়া'টা? চুমায় চুমায় তার পুরু ঠোঁট পাতলা করে দিয়েছে ঐ সব নামালিয়া ছোঁড়ারা? তার মধ্যে আছে নাকি ঐ 'কাঠবিলেই' কাঁধে নীলুয়াটা?

বদনী, সোউ ক ডুবিডুবি জল খাউ— তাহানে 'কিস্' খাইছে নীলেশ্বর? ছটফটিয়া কাঠবিলেইঅলা ছুয়াটাও?

ধু-উর! কী যে বলিস গিরিহানী তার ঠিক নাই। উ ম্যাড়হাটা কেনে হবে— চুমা খেঞেছে জটাবুড়হি, হামার মা-কাকী-ফুফুরা, হামার বিটিরা—

খিল খিল করে হেসে উঠল নীলিমা। বলল, তোকে আর মানুষ করা গেল না। মুখপুড়ী তারমনে কেনে, নীলুয়ার পারা আদড়া ছোকরা তোর ঠোঁটে ঠোঁট দিকি চুমা খাইনে বুঝ্তু, তোকে জড়ি ধরি তোর কোত্রে শুই পড়ি তোর স্তনর 'নিপিলে' মুখ দিনে বুঝ্তু—

আজ যেন কামশাস্ত্র চাঁদবদনীকে বুঝিযেই ছাড়বে নীলিমা। চাঁদবদনীর মাথায় কিন্তু ঢোকে না— কিসের সঙ্গে কী। সেই সেই জিনিসটার সঙ্গে চুমা খাওয়ার কী?

গিরিহানী বলল, তোদের আর সেসবের দরকার কী? জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে টেনে-হিঁচড়ে মাটিতে শুইয়ে দিলেই হল— শৃঙ্গারের মর্ম কী বুঝবু? আখু পেড়েইনে রস, বস বুগ্ বুগ্ করি জ্বাল দিনে তেবে সিনা গুড়— চাঁদবদনী কিরে শুনুচু?

আখ থেকে রস, রস জ্বাল দিলে তবেই তো গুড়! বড়োডাঙার পিবো দঁড়পাটের 'আখুশালে' সে তো চাঁদবদনী কত্তো দেখেছে!

গুড় কী আর, টুঙ করে মাথার মধ্যে কী যেন একটা ফেটে গেল চাঁদবদনীর। সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল তার। গিরিহানী ঐ যে বলল— টেনে-হিঁচড়ে মাটিতে শুইয়ে দিলেই হল— শোয়া তো পূব অস্তু, চাঁদবদনী স্বচক্ষে দেখেছে দাঁড়িযে দাঁড়িযেই—

খোঁড়া মুর্মু, তার নুলো পা'টা লাঠিতে চাপিয়ে দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িযে হাঁটে, ডোরাকাটা প্যান্টালুন পরে, বাঁশের বাঁশি বাজায়। গোঠটাঁড়ের মাঠে গরুর নাদি কুড়োতে গিয়ে চাঁদবদনী দেখেছে বৈকি— গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে খোঁড়া বাঁশি বাজাচ্ছে আর খোঁডাব বউ রাখো গিরিহার 'খসা' কেটে গাদা করছে কষাফলতলায়।

শুধু কি গোঠটাঁড়ের মাঠে, কদমডাঙায়— খোঁড়া আর খোঁড়ার বউ রাখোর সঙ্গে চাঁদবদনীর দেখা হয়ে যায় আরো যে কত জায়গায়! তাড়কারাক্ষসীর হাড়, হনুমানচৌকি, লব-কুশের জন্মস্থান, সীতার 'সিনান ঘাট' তপোবন জঙ্গলমহালের যেখানে যা সুলুকসন্ধান আছে বনকুঁদড়ি-কান্না-বনকাঁকড়োর ভুড়রু-কেঁদ কুসুম-কচড়া-আঁউলা-বাঁউলার কাড়হান-কুড়কুড়িয়া-শালপোঙড়া-সরুবালি-বড়বালির চ্যাঙ-গোড়ুই-চাঁদখুড়ি-ধানাহুলুর, সেখানে সেখানেই আচমকা 'ভেট্' হয়ে যেত খোঁড়া আর খোঁড়ার বউ রাখোর সঙ্গে চাঁদবদনীর।

আর কখন না দেখা হত? শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা— সব সময়ই। খোঁড়ার বউ লাটা-পাটা থেকে শুকনো ঝাঁটি-কাঠি টানছে, আর খোঁড়া অদূরে আড়কাঠি কী লাটাচুলীতে ঘুরঘুরিয়া পোকা

বেঁধে পাখি ধরছে ক্যারকেটা-কপ্‌তি-গোবরা-সীমফুচি-গুয়েবনি। ফল পাড়তে গাছে উঠেছে খোঁড়ার বউ রাখো, আর গাছতলে লাঠিতে ভর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ফল কুড়োচ্ছে খোঁড়া— এদৃশ্য তো চাঁদবদনীর কতবার দেখা।

'ঝড়িয়া'র দিনে একবার অঝোরঝর জল হল, জল বলে জল, সে-জলের পরিমান নেই। প্রথমে রদবদিয়ে খইফোটার মতো গাছে পাতায়, তারপর তো একটানা অঝোরঝর। বড় বড় ছাট, তার ভিতরেও গুঁড়িগুঁড়ি, যেন জলেরও ধোঁযা বেরুচ্ছে, সে-ধোঁয়া উড়তে-ঘুরতে এ-গাছমাথায় সে-গাছমাথায় লটকে লটকে জল ধোঁয়ার কুয়াশা সারা জঙ্গলময়। এক হাঁক এক হাতের মানুষকেও ঠিকমতো চেনা যাচ্ছে না।

পাখ-পাখালি ভিজছে, কেউ ডালে কেউ মগডালে কেউ পাতার আড়ালে। পাতাকুড়ানি ঝাঁটি কুড়ানী বউড়িঝিউড়িরা, কাঠ কাটা বন লিজ্ নেওয়া পুরুষ মানুষরা গাছতলে যে যেখানে দাঁড়িয়ে 'খণ্ড' মাথায় ফাটা ছাতা কাঁধে ভিজছে।

ভিজছে, ভিজছে।

এর মধ্যেই 'ঝোপ' এসে গেল না ঝপ্ ঝপ্ করে? এ-লাটা সে-লাটা এ-গাছতল সে-গাছতল এ-হুড়ি সে-হুড়ি এ-ডুবকা সে-ডুবকা এ-ডুংরি সে-ডুংরির জল এক জোট হয়ে খল্ খল্ করে এ-ঢড়হা সে-ঢড়হা এ-খাল সে-খালের ভিতর দিয়ে হড়পা বান হয়ে মুহূর্তে এসে যাবে না? 'ঝোপ' তার মানে জঙ্গলী বান-বন্যা।

বর্ষার কুড়কুড়িয়া ছাতু কুড়োতে জঙ্গলে ঢুকেছিল চাঁদবদনীও। হঠাৎ বৃষ্টিটা এসে গেল ঝমঝমিয়ে। ছাগল-ভিড়কানো বৃষ্টি তো নয়, গদগদিয়ে কিছুক্ষণ ঢালবে— ধরণ দেখেই বুঝেছিল সে। আর বুঝেই আসনগাছতলে আঁটারি লাটার ছাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল সে। তার ঠিক মাথার উপরে সাতভায়া পাখির তিনটে পাখি ডানা গুটিয়ে ভিজছে, বাকি চারটা আশপাশে আছে কোথাও।

সাতটার তিনটে দেখা শুভ না অশুভ মনে মনে ভাবছে চাঁদবদনী আর দেখে কী সামান্য দূরে পিয়াশালতলায় গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঐ দুজন— খোঁড়া আর খোঁড়ার বউ-দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—

অঝোরঝর বৃষ্টি, বৃষ্টির ধোঁয়া তাদের ঢেকে দিচ্ছে বার বার, বৃষ্টির ছাট ভিজিয়ে দিচ্ছে খোঁড়ার পাছা-পিঠ। তবু বিরামহীন অনবরত....। খোঁড়ার বউ রাখো পরম যত্নে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে খোঁড়ার নুলো পা।

চোখ সরিয়ে চোখ কচলে সাতভায়ার বাকি চারটাকে খুঁজে চলেছে চাঁদবদনী। সাত তো শুভ, তাবলে তিন? জল, জল, বৃষ্টির জল— কে জানে এতক্ষণে বৃষ্টির জলও ঢুকে গেল কী না খোঁড়ার বউ রাখোর 'ইয়ের' ভিতর!

চাঁদবদনীর মনে হল গিরিহার বউটা একটা গুড়ের কলসি, রসে ভরতি। যেমন দুর্গা 'মেড়ে'র মতো ধবধবে ধবলা গা, তেমনি রসের কথাবার্তা।

কোত্থেকে একটা পায়রা ভদভদিয়ে এসে আনাজ খেতির ধারে করঞ্জ গাছে বসল। পায়রা না কপ্‌তি? একটা না দুটো? শুভ না অশুভ? 'সিনান' করা গিরিহানীর মাথা থেকে টুপ টুপ করে এক-দু ফোঁটা জল এখনও ঝরছে।

খোলা চুল হাত দিয়ে ঝেড়ে কপতি দেখে অমনি বউটা গীত গাইল— "কপোত বুলই করঞ্জ ডালে। মু ত ঝুরুথিব রোশাঁই শালে।। মাগো"

পাগলী, একদম আড়পাগলী। মনে মনে বলে চাঁদবদনীও খোলামেলা ঠিসারা করে জানতে চাইল, মানে কি গ?

না ভেঙে নীলিমা বলল, বুঝবু শাশুঘর গেনে। অখন চ ঘড়িয়ে বেল হেলানি।

হ্যাঁ, বেলা তো হয়েইছে। ধান কাটতে বেরুতে হবে— কে জানে তার আজ ভাগ পড়বে কোনদিকে? গিরিহার দিকে না গিরিহার ভাইয়ের দিকে?

আনাজের ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে গিরিহানীর পিছু পিছু রোঁশাইশালের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চাঁদবদনীর ফের মনে পড়ল— "দুলি পেঁ পেঁ দুলি পেঁ পেঁ কপতি-পতর—"

আজ অদ্বৈতর ভাইয়ের বিলে কারা কারা নামবে আর অদ্বৈতর বিলেই বা থাকবে কারা— বেছে দিল অদ্বৈতই। থাকা, খাওয়া-দাওয়া তো এক-জায়গায়। এখানে এই চালা- ঘরে, পোখরি আড়ায়। জল-টলের এরকম সুব্যবস্থাই বা আর আছে কোথায়?

এ-পক্ষে থাকল গুরভা-গুরভার বউ-শতুরা-শতুরার বউ নিয়তি-চাঁদবদনী-পুনোই-ভুটকী গুরুবারিরা, গুড়কুঁদা-বধিরামরা। সে-পক্ষে গেল শরাবণ-শরাবণের বউ-গুড়দুম-চামটু-আদরি-ভাদরিরা, সুরুয়া-লাইবুকা-হাড়িয়া-নাকফুড়রি-নীলুয়া, তার মানে যতসব চ্যাঙনা-ম্যাঙনারা।

সরেসগুলো বেছে বেছেই নিল অদ্বৈত। সে তো নেবেই। তারই তো সব, সেই তো এনেছে নামালিয়াদের। বসন্তের সঙ্গে তার কাজ-কারবার কী আজকের?

ভাগ-বাঁটোয়ারা সেরে হাত ঝেড়ে অদ্বৈত বলল, যা যা শিগ্গি বারিই পড়, আজ শ্রীমন্তর দখিণ বিলর কাটা হেব, আমহর বিলর আশপাশকু। তুমারমেনক্যব কুনো অসুবিধা হেবনি।

পুবের বিল দক্ষিণের বিল উত্তরের বিল— সবই তো একসঙ্গে মিলেমিশে আছে। একাকার একাকার। আর ছুটকে-ছাটকে এক-দু ফালি সাঁপুই-জেনাদের ছাড়া সবই তো পৈড়্যাদের। অদ্বৈত পৈড়্যার শ্রীমন্ত পৈড়্যার, তাদের কাকার, তাদের জেঠার, তাদের আর আর খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাইয়েদের।

আজ শ্রীমন্তর দক্ষিণের বিলে ধানকাটা হবে, শ্রীমন্তর বিল তো অদ্বৈতর বিলের আশপাশেই। চেনাজানার মধ্যে, কোনো অসুবিধাই হবে না নামালিয়াদের।

একটু বাদেই শ্রীমন্ত নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেল শরাবণ-গুড়দুম-চামটু-সুরুয়া-লাইবুকা আদরি-ভাদরিদের। বিলে এ বেলা যেতে পারবে না অদ্বৈত। মেলা কাজ আছে তার ঘরে, ধান পাঠাতে হবে দাঁতনের মেঘরাজ আর হনুমান দু-দুটো রাইস মিলে! ঐ তো এসে পড়ল একসঙ্গে চার-চারটা লরি। আজ তারা সারাদিন বামনদা-দাঁতন দাঁতন-বামনদা করে যাবে। লরির আওয়াজ শুনেই হৈ-হৈ করে ছুটে এল ধানকুটা মেসিন ঘরের 'লেবাররা'। আজ তারাই তো ধানসব তুলে দেবে লরিতে, এখানে কাঁটা করার দরকার নেই সবই তো ষাট কেজি বস্তা! ওজন যেটুকু হবে মিল-গেটে, কাঁটা করে সব ধান গুদামে তুলবে রাইসমিলারা।

অদ্বৈতর অনেকদিনের ইচ্ছা— সেও একটা রাইস মিল খুলবে। কড়িয়া-বামনদার আশপাশে তার জন্য এক লপ্তে ক'বিঘা জমি খুঁজছে। মেইন রাস্তার ধারে, ডাঙা জমি। এই নিয়ে সে কথা বলেছে মেঘরাজ রাইসমিলের মালিক তুলারাম আগরওয়ালার সঙ্গে।

মেঘরাজ রাইসমিলের সুবিশাল চাতালে তুলারামের সঙ্গে পাশাপাশি চেয়ারে বসে সে দেখেছে 'টোকা' সরিয়ে সিদ্ধ-ভাপা ধানের এককেটা গাদা ভেঙে মাথায় ফুল গোঁজা নানা রঙের শাড়িপরা মেয়েরা পা দিয়ে রোদে ধান মেলতে মেলতে দল বেঁধে চলে যাচ্ছে চাতালের সেই কোন্ দূরান্তে, ফের ধান ঠেলতে ঠেলতে এসে যাচ্ছে এ-প্রান্তে।

যেন 'পাঁতা' নাচছে, মনে মনে কী আর গাইছে না— "একদিনকার হলৈদবাঁটা তিনদিনকার বাসি লো। মা-বাপকে বলেঁ দিবি বড়ই সুখে আছি?"

লরিতে ধান বোঝাই হচ্ছে আর কেমন যেন উদাস-উদাস হয়ে যাচ্ছে অদ্বৈত। ঘরের ধান চলে যাচ্ছে পরের মিলে, আজ নিজের একটা মিল থাকলে—

দোতলা থেকে নীলিমা ডাকল, খাই যাও।

অদ্বৈত বলল, খাড়াও, টিকে কাজ অছি।

দুটিয়া খাই যাও না, এতে বেলজা খালি পেটে অছ, পিত্তি পড়ব। এত বেলা অব্দি না খেয়ে সে খালি পেটে আছে, পিত্তি পড়বে। ঘরের বউ সাবধান করে দিল।

অদ্বৈত বলল, হউ অউ যাউচি।

ধানকুটা মেসিন ঘরে ভিড় করেছিল ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা। এই সাত সকালেই মেসিন চালিয়ে দিয়েছে মেসিন ঘরের লোকজন। পুনোই-ভুটকীরা ঘুরে ঘুরে দেখছে— কেমন চাল যাচ্ছে একদিকে আর তুষ-আগড়া আরেকদিকে। রেলগাড়ির মতো ফিতটা যাচ্ছে-আসছে, কোথায় যেন কী লেগে মাঝে মাঝে আওয়াজ উঠছে— খটাঙ্ খটাঙ্!

ফিতাটায় হাত দিতে গিয়েছিল পুনোই, তাকে হৈ হৈ করে মানা করে দিল মেসিনের লোকটা, মরবার শখ হেইচি? হাত দিনে হাত তোর ছিঁড়ি নিবে নি? তুমারমনে শুন, মোর কোত্‌রে আস্‌স— তোমরা শোন আমার কাছে এস—

পুনোইও তেমন, এক দৌড়ে লোকটার কাছে গিয়ে বলল, এই ত এসেছি, কী দেখাবি দেখা!

লোকটা তাকে অতঃপর বেশটি করে জড়িয়ে ধরে প্রায় কোলে বসিয়ে বলল, এইটাকে বলে 'হ্‌লার' এইটা 'হর্সপাওয়ার' এইটা 'নাটবল্টু'—

পুনোই বুঝল, এও তো সেই আর কি। সেই যে ছেঁড়া ফ্রকের ফুটো দিয়ে ডগা থ্যাত্‌লানো ঝুনঝুনি গাছের বেত ঢুকিয়ে খুঁজে খুঁজে বুক দুটো খুঁচিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া? এও তো— কোলে বসিয়ে পাছার তলে কী যেন নাড়ছে!

লাফ দিয়ে কোল থেকে নেমে পড়ল পুনোই। লোকটাকে ঠেস মেরে বলল, ধুস্ এই তোর মেসিনের কারসাজি! ইহার ল্যে আমাদের 'বাবুঘরের' টা ঢের ঢের বড়।

বড়খাঁকড়ির হাটে যেতে-আসতে পুনোই দেখেছে গড়-কাটা খালের ওধারে 'বাবুঘরেও' একটা ধানকুটা মেশিন আছে, রাতদিন ডুব্ ডুব্ ভুট্ ভুট্ করে সে-মেসিনও ধান কুটছে। তবে তুলনায় এর থেকে সে-মেসিন ঢের ঢের বড়। যেমন বড় 'বাবুঘরের' দুর্গা মেড়, তেমন বড় ধানকুটা মেসিন। এতক্ষণে ক'ঝাল গাড়ি যে ধানবস্তা নিয়ে হাজির হয়েছে বাবুঘরে!

বড় কী ছোট তার নেই ঠিক, তবু তো পুনোই ঝেড়ে দিল লোকটার মুখের উপর। আর এসময়ই মেসিনঘরের দরজায় অদ্বৈত হাজির হয়ে হাঁক পাড়ল, কাঁইরে অখনও ঘুরি বুলুচু? বেল হেলানি, তোরমনে আউ কেতে লুক-লুকানি খেলবু? বিলকু যিবুনি?

বেলা হয়েছে, বিলে না গিয়ে তারা আর কত এখানে-ওখানে লুকোচুরি খেলবে? জানতে চাইছে অদ্বৈত?

মেসিনঘর থেকে হুড়মুড়িয়ে বেরোতে গিয়ে এর-তার ঘাড়ের উপর পড়তে পড়তে ভুটুকী-পুনোই-গুরুবারিরা বলল, বিলকে যাব— হঁ ত ভুজা দে!

মেসিনঘরেরই একজনকে হুকুম দিল অদ্বৈত, ভিতর ঘরকু যা, কহি আয়— নামালিয়ামনে ভুজা মাগুচি। বলেই বিড়বিড় করল, কাক-কুইরীর ছা, ঘুমনু উঠি খাইতে চায়। যত দিনে তত খায়, নেগুড়ে হাত দিনে পছেই যায়—

কাক-কোকিলের ছা, ঘুম থেকে উঠেই ঠোঁট ফাঁক করে খেতে চায়। যত দাও ততই খাবে— অথচ কাজের বেলা ল্যাজুড় মুচড়ে দিলেও পিছিয়ে পড়বে। আড়িশা ধাকুড়ধুমা, অলস কোথাকার যতসব।

চ্যাঙনা-ম্যাঙনাদের মেশিনঘর থেকে বের করে দিয়ে ধানগুদামের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল অদ্বৈত। এর মধ্যেই ধানে ভরতি তিন-তিনটে গুদাম। সরু ধানও আছে মোটা ধানও আছে। মোটার দর একটু চড়া। লেভির চাল দিতে মোটা ধান হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে মিলমালিকরা।

অদ্বৈত মনে মনে ভাবে, ধানের দর তো চড়া হবেই, আরো চড়বে। আজকাল ধানচাষে যে কী হ্যাপা— "যাদের বাপের জন্মে নেই কো চাষ, ধানকে বলে দুব্বো ঘাস" সেই তারা কী বুঝবে? দিতে হয় কত রকম সার— কম্পোস্ট কেঁচো-গোবর, সাদা-সবুজ কত রকম সার তার উপর স্যালো-ডীপ মাঠ নালা-পাকা নালা বাওড়-বুড়বুড়ি গাড়া-গাড়িয়া থেকে করতে হয় কত রকম জল-ছিঁচার ব্যবস্থা!

আর, এই তো কিছুদিন আগেও ছিল সবটাই আকাশ-নির্ভর। জল-টল না হলে বুঢ়া শ্যামলেশ্বর মহাদেবের কাছে স্বস্তি-সোস্তান করলে বুড়ো শিবকে জলে-টলে ডুবিয়ে রাখলে তবেই না জল-টল হত? জল ঢালতে— জয়পুরা কারকপুর ঝিনুকপলাশিয়া মানিকডাঙর বালিডাংরি পানগুলা বেলমুলা বেতারুই কুরুল পানিতুনিয়া ভিঞ্চিগেড়িয়া বৈঁচা নহঞ্জরা ললাট— কত দূর দূর থেকে কত লোক যে আসত!

যন্ত্র ফিট করি পাতালনু জল তোলা ইগো অউ ত সেদ্‌নের কথা! যেন আপনার মনে বিড়বিড় করল অদ্বৈত। আর এসময়ই কে যেন আচমকা ঢোল বাজিয়ে দিল ডুম্ ডুম্।

কিসের বাজনা? এ আবার কিসের ছো? রাস্তায় ঢোল বাজাতে বাজাতে কে বা কারা যাচ্ছে? ঢেঁড়া পিটিয়ে কোনোকিছু কী জানান দিচ্ছে 'সরপঞ্চ'? গ্রাম পঞ্চায়েতে আজকাল কত কী হচ্ছে— ট্যাক্স আদায়, রক্তদান, ছানি অপারেশান, কৃত্রিম উপায়ে গাইগরুকে পাল খাওয়ানো, পোলিও খাওয়ানো, হাঁস-মুরগী-ছাগল-গরু বিতরণ— লেগে আছে বারোমাসে তেরো পার্বণ।

কান খাড়া রাখল অদ্বৈতও। ঠাণ্ডা উপোস, ঠাণ্ডা উপোস। আগামীকাল শীতলামাড়োয় শীতলা পুজো, তার মানে কাল অরন্ধন। চুলো-ধরানো নিষেধ। যা রাঁধবার রাঁধতে হবে আজ রাতেই। কাল সারাদিন যতক্ষণ না পুজো শেষ হচ্ছে জল-ঢালা ভাত— নামালিয়াদের জন্যও ঠাণ্ডা পখাল-পেঁইজ-নুন আর ঝাল।

ঢোলিয়ার ঢোল শুনেই দৌড়ে এসেছিল রাস্তায় ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। তাদের সব কিছুতেই হুটোপুটি। লোধাপাড়ায় বসন্ত কামিল্লা এলে যেমন, 'গম্‌হা-পূর্ণিমার' দিন গোছা গোছা পৈতা হাতে বামুনঠাকুর লোধাপাড়ায় না এসে দূর দিয়ে পৈতা বেচতে মাহাতোদের গ্রাম রুখনীমারা-নারদা-নিগুই পুখুরিয়ার দিকে চলে গেলেও তেমন।

ধান কাটতে না গিয়ে চ্যাঙনা-ম্যাঙনারা ঢোলিয়ার ঢোল শুনতে বড় রাস্তায় দৌড়ুচ্ছে দেখে ধান গুদামে না ঢুকে তাদের পিছুপিছু হাঁ-হাঁ করতে করতে দৌড়ে গেল অদ্বৈতও।

আরে আরে ছুয়ামনে করুচু কী? কাঁইকু যিবু? বিলকু চ, ঠিয়া হ, গটে কথা শুন—

আর কথা! দাঁড়াতে বললেও তারা দাঁড়াচ্ছে না, একটা কথা শুনতে বললেও আর তারা শুনছে না। ঐ যে বেজেছে ডুম্ ডুম্! গজ্ গজ্ করছে— ছাগল দিয়ে কী আর ধান মাড়ানো যায়। একবার আসুক কামিল্লা বসন্তিয়া!

ডুব্‌কা-ডুংরি লাটা-পাটা এ-ঝোড় সে-ঝোড়ে যারা মহুল-কচড়া কেঁদ-কুসুম ভেলা-ভুড়রুর সন্ধানে দেদার ঘুরে বেড়ায়, কেউ যাদের পিছু ডাকে না, ধমকানি দিয়ে যাদের কেউ কোনদিন থামতে বলে না— সেই তারা কোথাকার কে অদ্বৈত না ফদ্বৈত গিরিহা না ফিরিহা তার ডাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে অত নয়। ঐ তো ঢোলিয়া বাজিয়ে চলেছে— ডুডুম ডুম-ডুডুম ডুম—

বাবুমানে সবুলোক শুন, শুন— আজ বাদ কালকি ঠাণ্ডা উপাস, ঠাণ্ডা উপাস। শীত্‌লা ঠাকুরর পূজা—

ঘরের ভিতর ব্যস্ত ছিল নীলিমা, ঢোলের আওয়াজ তার কানেও এসেছে। অতটা গ্রাহ্য করেনি। তার তো জানা, কানাঘুঁষোয় শুনেছে। আর ফি-বছর শীতলা মাড়োতলায় জষ্টি মাসের এরকম সময়ই তো— তাঁকর পূজাপাঠ হেই থায়।

শীতলাপুজো কোন্ মাসে না হয়! জষ্টিতে বামনদায় আষাঢ়ে হানুভূএগ্রায় আশ্বিনে হোগলবেড়িয়ায় বৈশাখে জাহালদায়—

বারান্দায় বেরিয়ে স্বামীর হেনস্থা দেখে নীলিমা চিল্লে উঠল, এই বদনী শিগ্গি শুনি যা, কাঁই যাউচু দুলু দুলু করি? পারে তো হাত লম্বা করে চুলের মুঠি ধরে চাঁদবদনীকে টেনে আনে নীলিমা।

মন্ত্রের মতো কাজ হল, ঢোলিয়ার পিছু ছেড়ে গিরিহানীর ডাকে খামারে ফিরে এল পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা। তারপর আঁচলে ভুজা বেঁধে মাথা নিচু করে যেন গিরিহানীর উপদেশ মেনে "গুরুজন আগে চালিবু মথা তলকু পোতি" ধান কাটতে বিলে চলে গেল চাঁদবদনী।

অদ্বৈত-নীলিমা দুজনেই হেসে উঠল। দুজনেই বলল, পালের গোদা ঐ চাঁদবদনীটাই।

চাঁদবদনী, চাঁদবদনী।

একদল আগেই চলে গিয়েছিল অদ্বৈতর ভাইয়ের বিলে, চাঁদবদনীরা গিরিহা-গিরিহানীর তাড়া খেয়ে এইমাত্র চলে গেল অদ্বৈতর বিলে।

চালাঘরে একলা পড়ে থাকল গুরভা। একদিন এই পোখরি-আড়ায় বসে থাকতে থাকতে কাঁকড়ার দাঁড়া দেখে ধরতে গিয়েই সে দেখে ফেলেছিল সোনার গাগরা। সেই সোনার গাগরা তুলতে গিয়েই তো জলে ডুবে তার বেহুঁশ জ্বর!

আজ সেই জ্বর তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে গুরভা। তার বউ-বেটা ধর্মের জল আনতে গিয়েছে নেকবাটিয়া। হয়ত এতক্ষণে তারাও পৌঁছে গেছে সেই ধর্মের 'টিপকলে'। যেখানে পাতাল থেকে গল্ গল্ করে জল উঠছে, জল তো নয় অম্রুতো! সেই খেয়ে নিমেষে 'টৈনক' হয়ে উঠবে গুরভা।

খড়ের উপর হেঁস-পাতা বিছানা ছেড়ে খানিক এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াল গুরভা। গিরিহার পুকুর দেখল, গাছপালা। দল্‌দলি শ্যাওলা, পুকুরের জল, জলের উপর ঘুরে ঘুরে খেলায় মত্ত জলঘুন্নি পোকা কালো কালো।

দেখতে দেখতে কেমন 'উধাস' হয়ে গেল গুরভা। গলায় দড়ি দিতে যে যায় তাকে যেমন ডাকে 'গলাসিয়া'য় "আয় আয়", ঠিক তেমনি পুকুরের তল থেকে কে যেন গুরভাকে ডাকছে "আয় আয়"!

ফের ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি গুরভা?

আচ্ছা গেঁড়াকলের পুকুর তো! তেড়েমেড়ে পোখরি-আড়া ছেড়ে ঝোপজঙ্গলের দিকে হুটমুট নেমে গেল গুরভা। জঙ্গল, জঙ্গল।

ঐ তো বড়জোর নিম-অর্জুন-কুকসিমা-করঞ্জ-নারকেল-আম-পেয়ারা-মেহা-মাদাল, তলে তলে গাবগুবি-বেগুনা-ঘিকুমারীর লই-লতি। আনাজ খেতি। ঐ দেখতে দেখতেই গুরভা চ্যাঙনা-ম্যাঙনাদের বালিতে ঘাস পুঁতে ধানরোয়ার কল্পনা করার মতো অদ্বৈতর পোখরি-আড়ার 'নামোতল' টাকেই ভেবে বসল তপোবন জঙ্গলমহাল।

জঙ্গলমহাল, জঙ্গলমহাল।

ঐ তো হনুমান হুড়ি, তাড়কারাক্ষসীর হাড়, সীতাকুণ্ড। সীতানালা, দু'ধারে ঘাসবন, ঝামাপাথর। চাগড়া চাগড়া রসকলির তিলকমাটি। পায়রা-চঁচরা জলে শুশনিশাক, ঝোপেঝাড়ে চেঁকা, কান্না-কুন্দড়ি।

মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর খালধারের ফাঁকা মাঠ, বাঁশপত্‌রি ঘাসে ভরা। কোথাও কোথাও সাঁওতাল মাহাতোদের কদো-গুঁদলি-বাবুইয়ের চাষ।

খালটাও বিচিত্র, এঁকে বেঁকে গেছে। এখান থেকে আশ্রমে যেতে চাও, এক এক করে সতেরবার এক খালের জল পেরোও—

দৌড় শুরু করল গুরভা-দৌড় দৌড়— এক এক করে সতেরবার সীতানালা খাল পেরুল। পাথরডহরার কাছাকাছি পৌঁছে দেখা হয়ে গেল তার রাইবুর সঙ্গে—

রাইবু? মাত্‌বর? তুম্মি?

হঁ, আমি নাই ত কী আমার ভূত?

ন্নাই, তা বলচি নাই—

তব্বে?

জিহলখানা থিক্যে ছাড়া পাইলে কব্বে?

তাতে তোর কী দরকার?

ন্নাই, আমি ভাবলম—

কী?

জিহলখানায় এখনও পচ্‌ছ।

ভাবলি জিহলখানায় পচ্‌ছি ন আর কিছু?

আর কিছুক কী?

জিহলখানায় পোদে হুড়কো দিয়ে মেরে মেরে লাশ গুম করে দিয়েছে আমার— যেমন করেছে বাঘঝাঁপা-সরোর খাঁদু আর গুনধর কোটালকে— বল্ ভাব্বিস নাই?

হঁ-অ, মিছা বলব নাই, তা টুক্‌চার মনে-মন, তব্বে—

কী তব্বে?

অমন জলজ্যান্ত লোকটাকে কী বলে তুম্মি আর গুড়গুড়ে দুজনা মিলে খুন কল্লে?

আর তুঁই যে কামিল্লার কথায় লদ্ধা বউড়ি-ঝিউড়িদের নামাল খাটাতে লিঞে তাদের ইজ্জৎ লুটালি, আমার সঙেও বেইমানি কল্লি— তার বেলা?

ন্নাই মাত্‌বর, খালি আমাকে দুষছ, নীলুয়াটাকেও ধর— ঐ ত—

থাম বে গুরভা। নীলুয়া একটা সেদিনকার চ্যানকা— গাল টিপলে এখনও দুধ বেরাবে, তার কথায়—

তুমাকে আগেও বলেছি মাত্‌বর এখনও বলছি— ইভাবে নাই খেঞে ভকে মরার প্লে নামাল খাটতে যাবা ঢের ঢের গুণে ভাল। আর নামালে খাবা-দাবা কী— ভাত-মুড়হি-পাখাল আলু-বাইগন-শুকামাছের চচ্চড়ি, যতখুশি খাও, অসুখ-বিসুখ কল্লে কাজ না করে বসে বসে খাও। সেই বলে নাই— নাই হেনে গোবিন্দ পেট ভরনেই আনন্দ? তব্বে—

ফের কী?

ঐ যে হাতে হাত-কড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে দড়ির খুঁটটা জীপগাড়ির পিছনে লট্‌কে গাড়ি ছুটাই দিল গিড়গিড়াঁই— আর তুম্মি হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে ঘঁষড়াতে ঘঁষড়াতে যাচ্ছ, ঐ দেখে সেদ্‌নেও কেঁদেছি, মনে পড়তে আজকেও কাঁদছি মাত্‌বর— এই দেখ-অ হুর হুর জল।

অদ্বৈতের পোখরি-আড়ায় ঝোপজঙ্গলে হাঁটু মুড়ে বসে গুরভা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল।

কখনো সুরুক সুরুক, কখনো অঝোরঝর।

অনেকক্ষণ চালাঘরে অসুস্থ নামালিয়াকে দেখা তো দেখা, তার কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ব্যস্ত সমস্ত অদ্বৈত অধৈর্য হয়ে উঠল, ফের রোগা-ভোগা মানুষটা পুকুরের জলে পড়ে ডুবে গেল না তো?

কাঁই গেলু রে গোবর্ধন? আছু ত?

কাজ করবার দরকার নেই, থাকলেই হল। জলে ডুবে মৃত্যু হলে থানা-পুলিশ, সেই বলে না— বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা? টানা-হিঁচড়ান— খুন না আত্মহত্যা? ততদিনে চাষবাসের দফা-রফা!

অদ্বৈত ফের চেঁচিয়ে উঠল, সাড় নাই কেনি রে? 'জলঘাট' বসিচু? ছেরানি হেলা কী? কুকুরের পেটে ঘি-ভাত সয় না। কদিন ভাল-মন্দ খেয়ে নির্ঘাৎ পেটের অসুখ বাধিয়েছে গুরভা।

অউ যে নির্মাল্য, যাও ত! দেখি আস-অ— লুকোটা কঁঠে গেলা?

মেসিনঘরের ম্যানেজার নির্মাল্য নামের সেই লোকটা অতঃপর দৌড়ে গেল গুরভার খোঁজে চালাঘরের দিকে। এম্নিতেই তো ছুতোয়-নাতায় লোকজনে ভরতি চালাঘরের দিকে যেতে মন তার ছুক ছুক করে। কখনো গুড়াখু দাঁতে নিয়ে ঘষতে ঘষতে, কখনো জিভ-ছুলার জন্য দাঁতনকাঠি খুঁজতে। ছলে-বলে চালাঘরের আশপাশে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখত নামালিয়া জঙ্গলী বউড়ি-ঝিউড়িরা এতটুকু ঘরে গাদাগাদি হয়ে কী করে কী করে।

বউড়ি-ঝিউড়িরা এখন নেই, যে যার চলে গিয়েছে কাজে। মাত্র একজনাই আছে, তাও আছে কী না সন্দেহ। হয়ত এতক্ষণে তলিয়ে গেছে পুকুরে জলে। ভাবতে ভাবতে নির্মাল্য গুরভার খোঁজে দৌড়ুল, আর তাকে পেয়েও গেল ঝোপঝাড়ের আড়ালে।

কী করুচু?

কাই কিছু নাই।

তেবে যে বসি আছু?

বসতেও মানা নাকি? আমি বলে আমনার মনে বসে আছি—

চোখ পিট্‌পিট্ করল গুরভা।

তাহলে তলিয়ে যায়নি পুকুরের জলে, বেঁচেই আছে লোকটা? আশ্বস্ত হয়ে হাস্কিং মিলের ম্যানেজার বলল, হউ তু বসি থা। বসি বসি কাঁদ্‌না কাঁদ! তেবে তোকে কউচি শুন— গিরিহা ডাকে রে।

গিরিহার কথায় ধনফড়িয়ে উঠল গুরভা। গিরিহা ডাকছে— পাছার ধুলো ঝেড়ে দৌড়ুল সে। এখন শরীরটা তার বেশ 'টেনক' লাগছে।

অদ্বৈত দেখেই একগাল হেসে বলল, অউ ত গোবর্ধন— কাঁই থাইলু রে?

ঘরেই ত আছি মা'জন— কী কাজ?

না না তু যে রহিছু সোউ যথেষ্ট, আজ আর কাজ করতে হেবনি। ঘুরি বুল্ নাহানে কাঁইকু যিবু ত যা।

কোথায় আর যাব মা'জন? আজ থাক, কাল থাকতে বিলেই যাব।

কথাটা বড়ো ভাল লাগল অদ্বৈতর। লোকটা কাজের মানুষ, তার শরীরটা কী করে কী অসুস্থ হয়ে পড়েছে, নচেৎ—

একেকবার একেকটা দলে এক-আধজন থাকে বৈকি যে কী না ভাবে গিরিহার সম্পত্তি তার নিজেরই সম্পত্তি, বিড়া তো বিড়া একটা ধানের টুণ্ড পড়ে থাকলেও যে কী না তুলে

গুছিয়ে রাখে। বলতেও হয় না সকাল-সন্ধে ঝারি ভরে জল ঢেলে দেয় ফুল-গাছগুলোয়, না চাইতেই আনাজ খেতিতে ঢুকে বেগুন-ঢেঁড়শের গোড়ায় মাটি থুপে দেয় কোদাল কুপিয়ে।

অদ্বৈতর মনে পড়ে যায় হাতে লোহার বালা পরা কুলাই টুডুকে, বরো কাটার সময়ে না এলেও আসবে সে আষাঢ়ে রোয়ার মরশুমে। আসবেই আসবে।

গোবর্ধন, কাল বিলকু যিবু ভল কথা, অসুস্থ মানুষ, অখন ত চালাঘরে যাই শুই পড়।

গিরিহার কথায় আশ্বস্ততায় চালাঘরে গিয়ে বড়ো স্বস্তিতে শুয়ে পড়ল গুরভা, শুয়ে নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে এখন দক্ষিণের বিলে জোর লড়াই। কম্‌পিটিশান, কমপিটিশান। শতুরা-গুড়কুঁদা-বধিরাম-নিয়তি-পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা সংখ্যায় একটু কমা হলেও চাঁড় চাঁড় করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে নিজেদের পাঁহী।

ওদিকে শ্রীমন্তের বিলে শরাবণ-গুড়দুম-চামটু-লাইবুকা-ভাদরি-আদরিরা সংখ্যায় ভারি হয়েও মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ছে। থমকে থেমে একদণ্ড দাঁড়িয়ে তাই দেখে লাইবুকা-হাড়িয়া-নাকফুড়রিরা ফের জোর কদমে লেগে নিজেদের পাঁহী বাড়িয়ে নিচ্ছে।

আর তখনই পুনোই-ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীদের হারিয়ে দেয়ার হল্লা উঠছে। কেউ কেউ কুল্‌কুলি মেরে এক ছাঁদ গেয়েও দিচ্ছে— "ও বিহা দিলি মা অকারণ, যৈবনজ্বালা বড় জ্বালা গো— আমার হদ্‌কে উঠে মন—"

গুরুবারি-চাঁদবদনীরা কী হারবার পাত্র? ঠেস্‌ মেরে গাইতেও কী তারা কম পারে? দু-দণ্ড যেতে না যেতেই লাইবুকা-নাকফুড়রিরা পাঁহীতে পিছিয়ে পড়ে। আর তখনই চাঁদবদনীরাও— "বাগাল, ও বাগাল শাড়ি কিনে দে— শাড়ির ভারে চলতে লারি বাগাল কোলে করে লে—"

বড়রা, শতুরা-শতুরার বউ শরাবণ-শরাবণের বউ গুড়কুঁদা-গু'ড়দুমরা হেসে মরে, হাসতে হাসতে ভাবে, ই গো এইসব চ্যাঙনা-ম্যাঙনারা ই গীত কোথা থেকে শিখল? আমরা তো ছোট থেকে এত বড় হলাম, বাপের জন্মে কখনো তো এত কিছু শুনি নাই?

কেউ বলল, ই বাব্বা যুগটা কী যুগ পড়ল আগে দেখবি ত! বাপের জন্মে কখনও কী নামাল খাটতে এসেছিস? আজ তব্বে কেনে আইলি?

হঁ তাইত, যুগটা উল্‌টাইছে যা বলেছিস্‌।

যুগটা উল্টে যাওয়ায় আরো কী কী অদল-বদল ঘটছে এতদিন বনে থাকতে তারা সেসব টের পায়নি, আজ নামাল খাটতে এসে তারা যেন হাড়ে হাড়ে বুঝছে— সেসব আলোচনা অতঃপর চলতে থাকল ধানকাট্‌নীদের ভিতর। এর মধ্যে চ্যাঙনা-ম্যাঙনারা কতবার যে 'ভরা' তুলল 'ভরা' ছাড়ল! এখন তো তারা বিশেষত ছোঁড়ারা সমবেত সুরে ধরেছে 'চাঙ্‌'—

পোষেতে মুলা-মুড়ি
খাএছিলেন রাম গো সজনী
খাএছিলেন রাম—
বারো মাসে তেরো খাইলে আর খাবেক কী?
আউটা দুধে পাকা কলা
খিঁচড়ি ভাতে ঘি গো সজনী—
কান্ত বিনে কান্দে প্রাণ দিবসে।।

ছাতামাথায় আলের উপর গাছতলে আজ বসে আছে অদ্বৈত নয় শ্রীমন্ত। একেকবার একেক জায়গায়, একবার সে বসছে নিজের জমিতে। কিছুক্ষণ বসে থেকে ফের উঠে যাচ্ছে

দাদা অদ্বৈতর বিলে। নামালিয়াদের কাছে শ্রীমন্ত 'ছুটুগিরিহা' তার মানে ছোটো গিরিহা।

ছোটো গিরিহা শ্রীমন্ত আলের উপর বসে থেকে মনে মনে ভাবছে— রুইলেই ধান আর শুলেই ছা হয় না, সেই বলে না? ধানচাষে আজকাল কত মেহনৎ! কত হ্যাপা! ভালো জাতের বীজ খোঁজো রে, লাঙল নয় ট্রাক্টরে জমি চযো রে, বর্ষা না হলে স্যালো-ডীপ টিউবওয়েল-ক্যানালের জল নাও রে। এত করে ধান রুইলেই হবে না, সার দাও, সময়ে পোকা মারার ওষুধ ছড়াও। তার উপর তো আছে খরা-বন্যা-ঝড়! কুলি-কামিনের অভাব। এর চাইতে যদি একটা চাকরি পাওয়া যেত মাস-মাইনের?

চেষ্টা কী আর করে নি শ্রীমন্ত, বি.কম ফেল? রেল-প্রাইমারী টিচার-কনেষ্টবল, শুধু মিলিটারীটা বাদ। মিলিটারীতে গিয়ে কাজ নেই বাবা— আজকাল ঘন ঘন আসছে কফিনে লাশ। মরার পরে বুকে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আর ফুল নিয়ে হবে কী? আছে তো হাতের পাঁচ— বাপ-ঠাকুর্দার চাষ।

আজকাল তাই চাষবাসেই মন দিয়েছে শ্রীমন্ত পৈড়্যা। দাদা অদ্বৈতর দেখাদেখি সেও হতে চলেছে তল্লাটের নামজাদা চাষী। শুধু কী ধান চাষ, পানচাষ চিংড়ি চাষেও ধীরে ধীরে পারদর্শী হয়ে উঠছে শ্রীমন্ত।

পানগাছেরও যে স্ত্রী-পুরুষ আছে, স্বামী-স্ত্রী-কখনো কী জানত শ্রীমন্ত? এখন তো পাতা দেখেই সে অনায়াসে বলে দিতে পারে— কোনটা স্ত্রী কোনটা পুরুষ পান, স্ত্রীমঞ্জরি পুরুষমঞ্জরির ভেদাভেদ কী?

এর আগে শ্যামলেশ্বর কী সরশঙ্কার মেলায় 'রজনীভাইয়ের পানের দোকানে' বড়জোর পয়সা ফেলে বলত, গটে মিঠাপান! এখন মিঠা কেন বাংলা-সাঁচি, কালীঢল-আয়মাল-চাকুলা ভবানী-বেনারসী-ভাবনা কড়ে-ঢল-বোরঘাই কড়ি-বীরকুলি-মনগেটে— কত কত নামই যে তার মুখস্থ!

অউ যে বাঙরি, আউ কেতে উঠাপড়া হেবু? আর কত উঠবি-বসবি?

লম্বায় খাটো পুনোইকে 'বাঙরি' বলল শ্রীমন্ত। ছটফটিয়া পুনোই তো রেগে কাঁই— যাকে যা খুশি বললেই হল? সে কী আর তেমন বেঁটে, গুড়গুড়ে, এই এতটুকু? সব হাটুয়াদেরই একই রা। বড় গিরিহাও থেকে থেকে কোঁৎ পেড়ে যাকে-তাকে বলে উঠত— আউ কেতে উঠাপড়া হেবু?

মুখরা, সে মুখ ঝামটিয়ে বলেও উঠল, খালি উঠতে-বসতেই দেখলি ছুটু গিরিহা? এই ক'ঘড়ি বেলায় ক'বিঁড়া ধান কাটলম— সিটা দ্যাক! তা বলে টুকচার জিরাতেও দিবি নাই?

ছোট গিরিহাকে মুখের মতো জবাব দিতে ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরাও একসঙ্গে ধানকাটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউ দা'টা কোমরে গুঁজে মাথার উপরে হাত রেখে আরেক হাতে হাতটা টেনে ধরে আড়মোড়া ভাঙল। কেউ এগিয়ে গেল পুনোইয়ের কাছে।

এই তো দু দ'লে চাপানউতোর দিয়ে জোর ঝুমুর হচ্ছিল, পাঁহী এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তর তর করে— এর মধ্যেই কী হল যে বিগড়ে গেল? নামালিয়াদের মন বুঝা ভার— এই ভেবে নিরস্ত হল শ্রীমন্ত। আসুক দাদা অদ্বৈত।

সে ধান-পান ছেড়ে এবার ভাবতে লাগল চিংড়ির কথা— বর্ষার ধানবিলে তলে তলে বঁথড়-ঢোলা-গলদা চিংড়ির চাষ করা যায় কী না। বিঘার পর বিঘা তো পড়ে আছে পুবের বিল উত্তরের বিল দক্ষিণের বিল: আহা রে কড়িয়া-বামনদা যদি হত দীঘা-জুনপুট-দাদনপাত্রবাড়-শংকরপুর-রামনগর এমন কী কাঁথি-খেজুরীরও কাছাকাছি! তবে আর দেখতে হত না— হুদহুদিয়ে ঢুকে আসত নোনাজল আর সে-জলে—

দাঁতনেও এদিক-ওদিক নুনমাটি নোনাজলের জলাশয় কিঞ্চিৎ আছে বৈকি। লিজ্ নিয়ে তার এক-আধটাতে চিংড়ির চাষ করেছে শ্রীমন্ত। তা বলে ধানবিলে? পুবের কী উত্তরের কী দক্ষিণের? এই বর্ষাতেই শুরু করে দেবে সে এক্সপেরিমেন্ট মনস্থ করল।

অউ যে বঁথড়!

কে জানে কাকে আবার 'বঁথড়' নামে ডাক দিল লোকটা। তাদের জানাশোনার মধ্যে 'বক-অ-বঁড়' বলে একটা কথা আছে, যার মানে কী না বোকা হাঁদা— তা বলে বঁথড়!

লাইবুকার মাথাটা একটু চ্যাপ্টা, বুদ্ধিটাও ভোঁতা। ডাক শুনে সেই প্রথম মুখ ঘুরিয়েছিল।

তার গায়েই নামটা লেপ্টে দিয়ে শ্রীমন্ত বলল, হঁ হঁ তু। বলেই সে হাসল। —চুম্ড়ি মছ-অ খাইচু কবু? সোউ অছে নি?— "পড়িবু শুনিবু রইবু দুখে। মছ-অ ধরিবু খাইবু সুখে।।"

শালা কী যে "চুম্ড়ি-মুম্ড়ি মছ-অ মছ-অ" করছে! আদ্ধেক বুঝিও না। বলেই নিজেদের ভিতর বলাবলি করছে বড়কই-হাড়িয়া-লাইবুকারা। বড়কই-ই বলল, মছ-অ, তারমানে মাছ রে। আর চুম্ড়ি বোধায় চিংড়ি-টিংড়ি হবে।

সেই ভেবে লাইবুকাই উত্তর করল, হঁ-হঁ খাব্ব নাই কেনে? কত্ত খেএেচি! খাল মু'-য়ে ভুসা চিংড়ি, বুলান-হদহদিতে গলদা, কুম্হারডুভি দলায় ত বাগদা—

অবাক আশ্চর্য হয়ে গেল শ্রীমন্ত। বনে-জঙ্গলে থেকেও এরা ভুসা-গলদা-বাগদা চিংড়ির খোঁজ রাখে, ধরে ধরে খায়ও!

সাব্বাস, শ্রীমন্ত বলল, চুম্ড়ি খাইচু যে এত বেলে স্বীকার হেইচি। কিন্তু চুম্ড়ির কেত্তে কেত্তে নাম— বঁথড়-ঢোলা-গোগো-চাপড়া— তোরমনে শুনুচু?

ধু-উ-স! নামে আমাদের কী যায় আসে? খাব্বার জিনিস যেমন যেমন পাই তেমন তেমন খাই। নাম-ধাম অত্ত বুঝি ন্নাই, আমাদের পেট ভরনেই আনন্দ।

সোরগোল উঠল, ছাঙনা-ম্যাঙনারা সমস্বরে হরিবোল দেয়ার মতো করে চেঁচিয়ে উঠল, নাই হেনে রাধাগোবিন্দ, পেট ভরনেই আনন্দ—

কাজ ছেড়ে নাকফুড়রি এসময়ই 'লাঠাচুলী' হাতে এক বিল থেকে বিলান্তরে পড়ি-কি-মরি দৌড়ুল। দূরের বিলে অনেক পাখির সমাগম দেখতে পেয়েছে সে।

হাঁই হাঁই করে ওঠে শ্রীমন্ত, ছুয়াটা অমন দৌড়ুচ্ছে কেন পাঁই পাঁই করে? তার হাতে ওটা কি?

আরে আরে অমন কুদি মারি যাবু কাঁহিকি?

অদ্বৈত দেখেছে, শ্রীমন্ত তো আর দেখেনি আঠাকাঠি পেতে নাকফুড়রির পাখিধরা! বাঁশনলে ভরা চিট-লাগানো বাঁশকুচি। ফাঁকা জায়গা দেখে প্রথমে কাঠি পেতে চৌখুপি করা, চৌখুপির তলায় জ্যান্ত ঘুরঘুরিয়া পোকা। এই নামাল দেশে খুঁজে পেতে এত ঘুরঘুরিয়া পোকাই বা পায় কোত্থেকে নাকফুড়রি?

শরাবণ রগড় দেখে বলে, জান্‌নিস্ নাই ছুটু গিরিহা, উ হৈল গুরভার বেটা, ক্যারকেটা-কপ্‌তি ধরার যম বঠে। দাঁড়া টুকচার, দেখবি ফাঁদে পড়ে কাগা-বগা কেমন ছটফটাচ্ছে!

সত্যি সত্যি ধানকাটা পাঁহিতে, দূরের ন্যাড়া ধানবিলে লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ-অলা সাদা সাদা বক গুচ্ছের গোলা পায়রা চটি-বনি নেমে খুঁটে খুঁটে ধান খাচ্ছে ধানপোকা খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ভদ্‌ভদিয়ে উড়ে উঠছে, ফের বসছে।

দেখে-শুনে শ্রীমন্ত বলল, তোরমনে আউ বাকি কী রখিচু, সবু জঙ্গলটা লেই আস্‌সি পারতু তাহানে আর ঘর যাইতে হিতানি, কি কউ?

তাই তো, আচ্ছা কথাই বলেছে ছোট গিরিহা— নামাল খাটতে আসার সময় সুখজুড়ি মাঝুডুবকা মায় গোটা তপোবন জঙ্গলমহালটাই সঙ্গে নিয়ে এলে আর ঘরে ফিরে যেতে হত না, এখানেই ঘরদুয়ার—

গজ্ গজ্ করছে শ্রীমন্ত, ধান কাটবু না এখুন অউসব পশুপাখি শিকার করতে নাচিকুঁদি বেড়িইবু?

খাটব-খুটব টুক্‌চার হাউস্ কত্তেও দিবি নাই, যন্ত্র নাকি?

কে? কে বলল কথাটা? নিশ্চয় চ্যাঙনা-ম্যাঙনাদের ফচ্‌কা-ফচ্‌কিদের কেউ একজন হবে। যে বলেছে সে তো মুখ লুকিয়ে এতক্ষণে মন দিয়ে ধান কাটছে।

অউ যে ঢোলা—

কে জানে এবার কাকে শ্রীমন্ত 'ঢোলা' বলল! কেউই তো মুখ তুলল না। শ্রীমন্তও আর কিছু বলল না। মনে মনে বলল, দাদা অদ্বৈত আসুক!

দক্ষিণের বিলে এতদিনে ধানকাটার ঢল নেমেছে। দক্ষিণের বিল, দক্ষিণের বিল। যতদূর চোখ যায় এ-বিলে সে-বিলে পাঁহির পিছুপিছু এগিয়ে চলেছে সার সার নামালিয়ারা। লাল-নীল-সাদা-হলদা শাড়ি-লুঙ্গি-গেঞ্জি-সালোয়ার-সেমিজের উঠা-পড়া। এখানে ওখানে গাছতলে আলের উপর ছাতা মাথায় অতন্দ্র পাহারায় বসে ধানবিলের মালিকরা। মাঝে মাঝে রোদে ঝলসে উঠছে, ঠুং ঠাং আওয়াজে বেজে উঠছে কাঁসা-পিতল ঘটি-বাটি-কাঁশকুটের থালা। বক-পায়রা-চড়িই-চটির ওড়াউড়ি। আ-কাটা ধানবিলে ঝমর ঝমর ধানসিঁড়ি হাওয়া।

মাঝ-দুপুরে একটা ট্রেন চলে গেল হাওড়া-ভদ্রক লাইনে। কানের কাছে এত শব্দ হল যেন ট্রেনটা মাঝ-বিল দিয়েই গেল! ট্রেনের আওয়াজ শুনে নামালিয়ারা প্রায় একযোগে ধানকাটা থামিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকল। কোত্থেকে হাটুয়া ছুয়ারা বেরিয়ে পড়ে অদূরে মেইন রাস্তায় ছোটাছুটি শুরু করল। কে জানে তারা কেন ছোটাছুটি করছে— এত দূর থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না।

কিছু করার নেই, শ্রীমন্ত হাঁক দিয়ে বলল, অউ যে ভুসা—

কে জানে আবার কাকে সে 'ভুসা' বলল, কেউ তো তার ডাকে সাড়া দিল না!

ট্রেনটা কী কহুচি ক ত?

লাইবুকা-হাড়িয়ারা বলল, কী?

কহুচি— ছ' ছ' পৈসা তেঁতুল পাকা— যাবু কতবা খাবু কতবা—

লাইবুকারা মানল না, মাথা নেড়ে বলল, উঁহু ছুটু গিরিহা, তুঁই জান্নিস নাই। বলছে— হা-পা পা-পা তেঁতুল পা-কা— যাকে পাবা তাকে খাবা—

শ্রীমন্তর মনে আরেক চিন্তার উদয় হল— ট্রেন চলার সঙ্গে তেঁতুলের অত কিসের সম্পর্ক? তারাও বলে হা-পা পা-পা তেঁতুল পা-কা আমরাও বলি ছ' ছ' পৈসার তেঁতুল— তেঁতুল তেঁতুল— তেন্তুলি— চুম্‌ড়িশুকা তেন্তুলি দেই টক রসা—

চিংড়িমাছের শুঁটকি আর তেঁতুল দিয়ে টক তরকারি— জিভে জল এসে গেল শ্রীমন্তর! তেঁতুলের পাতা ট্রেনলাইনের পাটার মতো সারি সারি বিছানো বলেই কী অত তেঁতুল তেঁতুল? কে জানে কোত্থেকে কী!

শ্রীমন্ত বলল, হউ ট্রেন চালি গলা, এখুন তেঁতুল পা-কা'র কথা থাউ, মন দেই ধান কাটি যা!

নাকফুড়রি দূরের বিলে 'লাঠাচুলী' পেতে প্রায় ফিরে এসেছিল ছোট গিরিহা শ্রীমন্তর বিলে, ফের দৌড়ুল। ফাঁদে পাখি পড়েছে। পালকে আঠা আটকে ছটফট করছে। যতই ছটফটাচ্ছে আঠা ততই লটকে যাচ্ছে পালক ভেদ করে দেহে।

দেহে, দেহে।

ধানকাট্‌নীরা ধানকাটা থামিয়ে ফের কোমর খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে মনে গর্ববোধ করে বলল, আমাদের নাকফুড়রির হাতে পাখি ধরার বিদ্যা আছে, সে তুকগুণ জানে। নচেৎ—

ঝটকা মেরে আলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছিল শ্রীমন্তও। নামালিয়াদের ফাঁকি-ফক্কড়ি দেখে পরক্ষণেই গর্জে উঠল, অউ যে ঢোলা-চাবড়া-ভুসা, তোরমনে খালি ত উঠা-পড়া হেউচু, ট্রেন দেখুচু পাখি মারুচু, তাহানে কাজের কাজ ধানকাটা করবু কত বা? বেল ডুবি গলে?

ট্রেন দেখছে পাখি মারছে, খালি ত উঠছে বসছে, তা হলে কাজের কাজ ধান কাটবে কী বেলা ডুবলে? বেলাও তো মাথার উপর থেকে সরে গিয়ে পশ্চিমে হেলে পড়ল! এর মধ্যেই পেঁইজ-ঝাল শুকা-বাইগনের চচ্চড়ি দিয়ে গামলা গামলা 'পখাল' সাঁটা হয়ে গেছে পেটপুরেই।

শ্রীমন্তর দাবড়ানিতে নামালিয়ারা ফের মুখ গুঁজে যে-যার পাঁহী চাঁড় চাঁড় এগিয়ে নিচ্ছে। বক-কুঁড়বক-ঘুঘু-পায়রা না, নাকফুড়রি ধরেছে একটা গুয়েবনি। খাবার হিসেবে গুয়েবনি তত উপাদেয় না— হ্যাঁ, যদি হত কয়ের-কপতি কী গুঁড়ুর'পাখ'! ধামাচাপা পড়ে গেল নাকফুড়রির বনি-শিকার।

এই নামালদেশে গুঁড়ুর-কয়ের নেই, কপতি আছে পায়রা আছে সিমফুচি-ক্যারকেটাও আছে। গুয়ে শালিক গোবরা চড়ে বক-কুঁড়বক তো আছে গাদা গাদা। লম্বা লম্বা ঠ্যাংয়ে গরুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে লম্বা লম্বা ঠোঁটে তারা গরুর গায়ের 'কেঁতর' খুঁটে খুঁটে খায়!

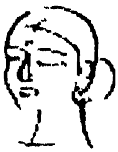
শ্রীমন্ত পৈড়্যা ফের খুশি হয়ে উঠল নামালিয়াদের কাজে। দু-দলে ফের শুরু হয়ে গিয়েছে কম্‌পিটিশান। এ-কম্‌পিটিশান যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ বড়-ছোট দুই গিরিহারই লাভ। শ্রীমন্ত অতঃপর ভাবতে বসল— তার থেকে কিসে কিসে এখনও এগিয়ে রয়েছে তার দাদা অদ্বৈত? সেখানেও কম্‌পিটিশান!

কম্‌পিটিশান্ কম্‌পিটিশান।

দাদা তো নয়, বউদি নীলিমা। একের নম্বর সুন্দরী, একের নম্বর বুদ্ধিমান। তার বুদ্ধিতেই এত। নচেৎ অদ্বৈত শ্রীমন্ত তো এক ঝাড়েরই বাঁশ। সেই বলে না— "এক ঝাড়ের বাঁশ কোনটাতে হয় দুর্গার কাঠামা কোনটাতে হয় ডোমের ধামা"?

মুনিষের কাঁধে ধানের বিড়া বইবার শিকা-বাঁউক চাপিয়ে অদ্বৈত দক্ষিণের বিলে এসে পড়লে শ্রীমন্তর ছুটি।— যা যা বেল আড় হেলানি, গা ধেই দুটিয়া খাই নে। মু এদিকটা দেখুচি। কাঁই রে চন্দ্রবদনী মোর নয়নর মণি—

দক্ষিণের বিলে শ্রীমন্তর পরে এবার অদ্বৈত তার দেয়া নামডাক শুরু করল।



হল্‌দা বৃষ্টি আর নেই, কাঁটায় কাঁটায় ঘড়িতে ৪টা বাজলেই শুরু হয়ে যেত হল্‌দা বৃষ্টি। আর তার পরই বৃষ্টি থামলে বিল থেকে রাঁধাবাড়ার কাজ করতে কেউ না কেউ গিরিহার বাড়ি এসে যেত। গুরভার বউ এসেছে চাঁদবদনী এসেছে শতুরার বউ নিয়তি এসেছে, কেউ একবার কেউ দু'বার, আজ আবার ডাক পড়ল শতুরার বউ নিয়তিরই। ডাক দিয়েছে গুরভার বদলে গুড়কুঁদাই। পা বাড়িয়েই ছিল নিয়তি, ডাক শুনে ধানবোঝা মাথায় তুলল। এম্নি এম্নি হলতে-ঢলতে খালি হাতে ফিরবে কী, ক'বিড়া ধান নিয়ে যাক মাথায়— গিরিহা অদ্বৈতরই বিধান।

গুরভার বউয়ের যেমন, শতুরার বউ নিয়তিরও স্বভাব মাঝে মাঝেই হাটুয়া ঘরে উঁকিঝুঁকি মারা। কী করছে গিরিহার বউ, কী ভাবে সে হাঁটছে-চলছে ঘরের ভিতর, কখন শু'চ্ছে কখন উঠছে, ঘরে থাকতে থাকতেই বউটা ক'টা শাড়ি 'পিঁধল', সব সময়ই কী তার মুখ চলছে, খাচ্ছে নচেৎ গীত গাইছে? লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা আড়চোখে উঁকিঝুঁকি মেরে এসবই দেখে। দেখে দেখেও তার আশ মিটে না, আশায় আশায় থাকে কখন হাঁক পেড়ে বউটা বলবে, কাঁইরে নিয়তি টিকে শুনি যা! কখন হাত লম্বা করে বলে উঠবে, অউ শাড়িটা পিন্ধি আয়। কথায় কথায় ছড়া কেটে সদুপদেশ দেবে, "নারী জন্ম বড় মন্দ লো নিয়তি কহুছি তোতে"—

গিরিহার খলার ঠিক মাঝখানে মাথার ধানবোঝা ঝপ্ করে আছড়ে ফেলল নিয়তি। চাট্টি ধান শিষ থেকে খুলে খলাতেই চিটকে গেল।

দিনের প্রথম ধানবোঝা, আছড়ানোর আওয়াজে ঘর থেকে বারান্দায় এসে চকিতে দেখে গেল নীলিমা।

শাড়ির আঁচলা দিয়ে বানানো মাথার 'ব্যাঠ্না' খুলে সেই আঁচলাতেই মুখের ঘাড়-গলার ঘাম মুছল নিয়তি। আর তারপর বিড়াগাদার ছাঁচতলে ছায়ায় বসে পড়ে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকল সে।

কতদিন এন্নি করে কাঠবোঝা মাথায় নিয়ে হ্যাল্‌হ্যালে কুকুরের জিভ বের করা রোদে আঁকসোল-টাকসোল পেরিয়ে হাটুয়াদের গাঁয়ে গিয়ে তাদেরই খলা-খামারে কাঠবোঝা নামিয়ে বিড়াগাদার ছায়ায় হাঁ করে বসে থেকেছে সে আশায় আশায় কখন মহার্জনের 'বহু' সদয় হয়, ঘরের আগড় খুলে বাইরে এসে বলে, লুধানী, চাউল নিবু না ট্যাকা?

খলার একধারে ধানবোঝাই হচ্ছে লরিতে। মেসিনঘরের লোকেরা সেই যে সাতসকালে শুরু করেছিল ধানের বস্তা নিয়ে উঠা-পড়া, তার এখনও বিরাম নেই। ঝমর ঝমর করে বিল থেকে যেমন ধান আসছে, ধান ঝাড়াই হচ্ছে, বস্তায় 'অটার' হচ্ছে, ফের সেই ধান চলে যাচ্ছে লরি করে মিলে।

শতুরার বউ নিয়তি একবার ঘরের দিকে একবার লরির দিকে ভুল ভুল চেয়ে থাকল। চেয়ে থাকল, চেয়ে থাকল। আর তার চোখের সামনে দিয়ে ইস্কুল থেকে ফিরে এল গিরিহা-গিরিহানীর খোকা-খুকুরা। দেখামাত্রই সাফা ছ্যনা ফুলেশ্বরকে মনে পড়ে গেল তার।

ফুলেশ্বর, ফুলেশ্বর।

কে জানে এতদিনে 'ছ্যানাটা' কেমন আছে লাদনগাড়িয়ায় তার দাদু-দিদার কাছে! কান্না লুকোতে নিয়তি আচমকা আঁচলে মুখ ঢেকে দৌড়ুল চালাঘরের দিকে।

রাগ হোক চাড় হোক মান হোক অভিমান হোক, কান্না পায় তো বুক খুলে কাঁদতে হাসি পায় তো পেটের কাপড় ঢিলে করে হাসতে দোরখুলির লোধাপাড়ার জনমানুষ জঙ্গলে যায় আর নয়ত জোড়াশালতলা ধ-তলা পেরিয়ে এসে পড়ে ঠাকুরবাঁধে।

এখানে আর ঠাকুরবাঁধ কই? আছে তো বড়জোর অদ্বৈতর পোখরি আড়া, খড়ের আটচালা। তাই তো তাই, সেখানেই মুখ গুঁজে কঁকিয়ে উঠল নিয়তি।

হায় দ্যাক্ ন মার। কাঁদচিস ক্যানে ফুলুয়ার মা?

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল গুরভা। মনে-মন বলল, এই মেয়েমানুষগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। কথায় কথায় সুরুক সুরুক কান্না।

তারপর ভাবল, শতুরার বউয়ের তবে কী গা ভারি হয়েছে? কোনো কিছু অসুখ করেছে?

জিজ্ঞাসা করল, পেট দুখাছে ফুলুয়ার মা?

বনের আঁউলা-বাঁউলা আলু-তুণ্ডা চেনা-অচেনা শিকড়-বাকড় মহুল সিজা-তেঁতুল সিজা জানা-অজানা শাকপালহা পাট্‌রা কুঁড়হা খেয়ে পেট তো হামেশাই ডাবাক্‌ ডুবুক করে। একটা কিছু হলেই লোধা 'জড়মাড়ষ' তাই প্রথমেই জানতে চায়, পেট কী ব্যথা করছে?

উপুড় হয়ে ডুকরে উঠল শতুরার বউ।

গুরভা বলল, কাঁদ্‌দিস ন্নাই, হাটৎ-বাটৎ বিদেশ-বিভুঁইয়ে কাঁদতে ন্নাই। জলর কলসির তলার মাটি নাইকুণ্ডুলে বুলা, ধীরে ধীরে মালিশ কর— পেট দুখা যাবে।

বলে সে নিজেই কলসি মাটির সন্ধানে উঠে পড়ল।

মাটি এনে বাঁ হাতের তালুতে সামান্য জল দিয়ে গুলে ডাক দিল গুরভা, ফুলুয়ার মা পেটটা দেখা!

এর আগে কোনোদিন শতুরার বউয়ের গায়ে হাত দেয়নি গুরভা, বরঞ্চ লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যানাই গুরভাকে ধরাধরি করে পোখরিআড়ার পাঁক থেকে তুলে এনেছিল সেদিন। আর আজ?

হেঁস-পাতা খড়ের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে নিয়তি। মাঝে মাঝে কান্নার দমকে উঠা-পড়া হচ্ছে তার শরীরটা। তার পাশে মাটি-হাতে উন্মুখ হয়ে বসে আছে গুরভা।

পোখরি-আড়া সুনসান। মেসিনঘরের লোকেরাও নেই, সব তো মেতে আছে ধানের গুদামে। লরিতে মাল তোলার কাজে।

যেন কতদিন বাদে শরীরটা শরীর হয়ে উঠছে গুরভার। জ্বরজ্বালা নেই, পেট-দুখা মাথা-দুখাও নেই। 'টেনক' হয়ে গেছে সে।

মন না মতিভ্রম? তার সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কে— তার বউ না শতুরার বউ? 'পেট-তাবুড়' দিয়ে শুয়ে থাকলে সব মেয়েমানুষকেই কী এক লাগে? গুরভার চোখের সামনে তার বউ আর শতুরার বউ এখন এক-সমান।

এক সমান, এক সমান।

কাই গো শুনছিস? পেট-টা উল্টা, নাইকুণ্ডুলে টুকচার কলসিমাটি ঘষেঁ দি— আয় দেখি।

খানিক গোঁজ হয়ে শুয়ে থাকল নিয়তি। তারপর আচমকা উল্টে গিয়ে পেটটা সোজা করল। ফাটা দাগ-ধরা পেট! সাফা-ছানা প্রসব করে গ্রামফণ্ডে একবার জরিমানা দিতে হয়েছে শতুরা-শতুরার বউকে।

ছোট মাত্‌বর গুরভা মাটি-জলসহ বাঁ হাতের তালুটা শতুরার বউয়ের নাভিতে থেপে দিতে উদ্যত হলে সটান উঠে বসল নিয়তি। বলল, নাই হাড়িয়ার বাপ, হামার পেট-দুখা নাই, ফুলেশ্বরের তরে মনটা বেড়ে দুখাচ্ছে।

হুঁ-অ, তার সঙে তোর পেট-দুখাও আছে, নাই বললে মানব কেন্নে? তোর মুখ বলছে ফুলুয়ার মা।

হাড়িয়ার বাপের কথায় হেসে ফেলল নিয়তি। সেই বলে নাই— হাঁ-হাঁ-মরদ খেতে চাইলে উপায়? হাতের তালুতে মাটি নিয়ে হাত বাড়িয়েছে লোকটা, এখন না বললেও পেটময় লেপ্টে দেবে গুরভা। সে দেবেই।

অগত্যা নম্‌থম্‌ 'বস্‌মতা'র মতো পেট দেখিয়ে শতুরার বউ শুয়ে পড়ল। বলল, লে, যখন মানা করলেও শুনছিস নাই তখন কত মাটি লেপবি লেপ্‌-ন-মার!

আহা, মুখ দিয়ে চুক্‌ চুক্‌ করল গুরভা, তোর ভালর জন্যই বলছি ফুলুয়ার মা। বুলাতে দে, দেখবি এক নিমেষেই কত আরাম!

চোখ বুজে পড়ে থাকল শতুরার বউ, পর-পুরুষের হাতের ছোঁয়া যেই তার 'নাইকুণ্ডুলে'

পড়ল অমনি শির্ শির্ করে উঠল জাঙ দুটো, উত্তেজনায় একটা পা মাটি থেকে সামান্য উঁচু করল সে।

ছাড়, 'গিরগিতি' লাগছে। গিরগিতি তার মানে কাতুকুতু।

বলেও উঠবার গা করল না নিয়তি, পরম মমতায় পরস্ত্রীর নাভিতে কাদামাখা হাত বুলোতে বুলোতে গুরভা বলল, টুকচার আরাম লাগছে? হঁ-অ, না'লে গিরগিতি আসছে কেনে?

ততক্ষণে তার বোজা চোখের দুপাতায় ঘুম এসে যাচ্ছে, ঘুম! ঘুমন্ত চোখে সে যেন দেখছে তাদের ভুগড়ার পিছনে দুটি তালগাছে ঝিরিঝিরি বাতাসে তালচটির বাসা দুলছে, তালচটা ফরফর করে উড়ে-ঘুরে বেড়াচ্ছে—

ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে নিয়তির মনে হল, কে যেন তার শরীরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে। কে? শতুরা না গুরভা?

গুরভা না শতুরা?

আসল না নকল?

ঝাঁপিয়ে পড়ে নিয়তি ধরতে গেল, দেখল, তার সারা গা রোঁয়া রোঁয়া—

এক ঝট্‌কায় গুরভাকে প্রায় ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়াল লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা। বলল, পেট-দুখা লিঞে থাকলেই হবে? পেট-পূজার তবে রান্ধাবাঢ়া কত্তে হবে নাই?

হঁ ত কর— কে মানা করছে?

হতভম্ব গুরভা রাগে রি রি করে বলল কোনমতে।

বলেই সে হন্‌হন্ করে হাঁটতে লাগল গিরিহার নাচ-দুয়ারের দিকে। আর সেখানেই দেখা হয়ে গেল তার বউ আর তার বেটার সঙ্গে।

কাঁখে জলের ঘড়া, এ-জল যে-সে জল নয় ধর্মের জল, এক ঢোঁক খেলেই রোগজ্বালা 'দূরীভূত্' হবে।

ঘড়া-কাঁখে বউকে দেখে মনে হল গুরভার— এ কে? এ গো কে এ?

এই যেন প্রথম দেখছে! তার বউ এত সুন্দর! এত রূপসী! কী-ই বা খায়, খায় তো বড়জোর বনের আঁউলা-বাঁউলা আলু-তুণ্ডা।

নাকি ধর্মের জল খেয়ে গা-গতর আমূল বদ্‌লে ফেলেছে, 'যৈবন' যেন ফেটে পড়ছে।— সেই বলে নাই, যৈবনে ব্যাঙাও বড় সুন্দর? এর কাছে কোথায় লাগে লাদনগাড়িয়ার নিয়তি না ফিয়তি!

আসলে নিয়তির উপর ভয়ানক রেগে আছে গুরভা— ঐ যে শতুরার বউয়ের গা থেকে ছিটকে ফেলাটা। কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না, কির্‌কিচ্ কাঁটার মতো খোঁচাচ্ছে।

মনে মনে সে ভাবছে— আচ্ছাই মেয়েমানুষ ত! কাজের বেলা গলার মালা, কাজ ফুরালেই ঢ্যামনা শালা?

ছোট বেটা সুরুয়াকে হেসে বলল গুরভা, এত্‌খনে সময় হৈল বেটা?

বাপকে পেরিয়ে চালাঘরের দিকে যেতে যেতে সুরুয়া বলল, যেতে-আসতে গোড় দুটা দুখাঁই গেল, এইখেনে কী নেকবাটিয়া!

তাই তো, জায়গাটা কতদূর, পা তো ব্যথা করবেই ছেলেমানুষ সুরুয়ার।

পারে তো এক ঢোঁক এখানেই খাইয়ে দেয় গুরভাকে গুরভার বউ। কাঁখ থেকে গাগরা মাটিতে নামিয়ে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

গুরভার বউ হাসছে।

হাসছে গুরভাও।

এগো জ্বর ত আর নাই?

মাথা নাড়ল গুরভা।

গা ছুঁয়ে দেখে গুরভার বউ বলল, হঁ নাড়িতে জ্বর আছে, আস-অ দেখি এক ঢোঁক খাও। বলেই গাগরা কাঁখে তুলল। পেট তার গজ্ গজ্ করছে— কত কী বলার আছে, আচম্বিতে কত কী দেখে ফেলেছে সে!

নেকবাটিয়া থেকে গুরভার বউয়ের গাগরা ভরে ধর্মের জল আনা, শতুরার বউয়ের উপর গুরভার উপগত হওয়া, নীলুয়ার অন্তর্ধান, আজ বাদ কাল বামনদায় শীতলাপূজা, সাউরির মেলা— এর কোনোটাই লোধানামালিয়াদের কাছে আজ আর বড় খবর নয়, আজকের সবচেয়ে বড় খবর নামালিয়া লোধাদের খোঁজে বামনদায় এসে পৌঁচেছে ভুবনালোধার 'মেইয়া' নুকু, লক্ষ্মীরানী। লক্ষ্মীরানী, লক্ষ্মীরানী।

হেঁগো এগো কার সঙে আইল এদ্দূর ঐটুকু মেইয়া?

বল্লি ভাল ঐটুকু মেইয়া! দশ কেলাস পাশ দিয়ে এম.এ বি.এ পড়ছে। মনে নাই একবার কলম দিয়ে কী একটা লিখে দিয়েছিল চর চর করে? সেই যে— "দরখুলির জঙলে কপ্তি-গুঁড়ুর পাখ ডাকে?" ঐ লিঞে শতুরা— ফুলুয়ার বাপ গো— মদ খেয়ে বিনায়ে বিনায়ে কত্ত গাইল গীত গো বাদনার দিনে— "অহীরে, কেঁদ-ভুঁড়রু পাঁকে আছে কুঁদরী-কাঁকড়ো ধরেঁ আছে— তুল্ রানী তুল্ মুনু যত্ত ইচ্ছা হাত ভরেঁ"— মনে নাই?

হঁ, মনে কী আর নাই? আছে, আছে। নুকু নামাল দেশে এসেছে শুনেই সব মনে পড়ে যাচ্ছে একে একে।

সেই ফুলডাল—

কী যেন নাম? কাগজের মতো খড়খড়ে ফুল— কাগজ ফুল, কাগজ ফুল—

আঁটারি ফুলের মতো দেখতে খানিকটা। লাগিয়েছিল এইটুকু একটা ডাল নিজেদের খলায় এক ঝড়িয়া-বাদলায়। সে এখন চারিয়ে চারিয়ে খলা পেরিয়ে আঁটারিলাটার মতো মস্ত লাটা! কে জানে হয়ত একদিন বাড়তে বাড়তে সে পৌঁছে যাবে তপোবন আর ঢেকে ফেলবে সীতাকুণ্ড-হনুমান চৌকি-তাড়কার হাড়—

একা এসেছে কী আর? কেউ হয়ত নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। লোকের কী তার অভাব আছে? যার বক্কার মতো ধরম বাপ!

কী করতে এসেছে? আমাদের-তোদের মতো ধান কাটতে কী আর? নাকি যারা এসেছে তাদের এবার সে 'বাটিয়ে' নিয়ে যাবে ফের দোরখুলির লোধা ঘুপচিতে?

বাটিয়ে নিয়ে যাব বললেই কী যাওয়া যায়? কেউ তো আর ধরে-বেঁধে আনেনি, স্ব-ইচ্ছায় এসেছি। নিজের হাতে খাটছি-খুটছি, দু-বেলা দু-মুঠা খেতেও পাচ্ছি। কে নুকু না ফুকু— এসে বলল ঘর যেতে আর অম্নি সুড় সুড় করে ঘরে চললম? অত্ত গুড় আধসের নয়।

নাই ধন, ঘরের জন্য আমার বেড়ে মন টানছে। এসে হাত ধরে টানুক একবার ল্যাজ তুলেই দৌড়াব। ওদিকে এতদিনে 'ধবো ধবো' কত কুড়চি ফুটে যে আলা হয়ে গেল, বহিন!

হঁ ত যাব, তব্বে আজ বাদ কাল শীত্‌লাপূজা, নাকি মস্ত মেলা! মেলা নাই দেখেঁ ঘর নাই যাব গ'।

বেশ বেশ, আর কথা কহিস্ না। কিন্তু যার জন্য অত, সে কোথায়? কে দেখল? এসেছে তো ঠিক? নাকি 'শুধা শুধা'?

হঁ-হঁ এসেছে, দূর থেকে একঝলক 'আনেকেই' দেখেছে। লেখাপড়াজানা 'মেইয়া' এখন শহর 'বুলছে'। হাটুয়া বাবু-ভায়াদের সঙ্গে কথা বলছে।

বলুক ন্ন যতখুশি চংবং কথা, কিন্তুক—

কী কিন্তুক?

যাদের জন্য এতদূর এসেছে ফুলটুসুয়ার ‘মেইয়া’, সেই তাদের কাছে আর কখন আসবে? বাবু-ভায়াদের ছেড়ে আর কবে কথা বলবে নিজের গাঁ-গেরামের লোকেদের সঙ্গে?

সর্বত্র অস্থিরতা। অস্থিরতা, অস্থিরতা। কী দক্ষিণের বিলে কী অদ্বৈত পৈড়্যার চালাঘরে। ধানবোঝা মাথায় ধানভার কাঁধে লোকজনের আসা-যাওয়ার রাস্তায়।

কোথায় ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে গুরভা-শতুরা গুরভার বউ-শতুরার বউ, কাকা-কাকী জেঠা-জেঠীদের কোলে, কোন্ সেই ছোটবেলা থেকে কোলে-কাঁখে লুফালুফি করে যারা মানুষ করল, যারা বন-ঝাড় টুঁড়ে কেঁদ্-ভেলা-ভুড়রু·বেল-কোৎবেল-জাম-জামরুল বছরের প্রথম ফল তুলে এনে তোর হাতে দিয়ে বলল, লে মিনা, খা আগে। সেই তাদের কাছে প্রথমে না এসে কোথায় হাটুয়া বাবু-ভায়াদের পিছে পিছে—

কে যেন দৌড়ে গিয়ে খবরও নিয়ে এল, না না ভুবনার ‘মেইয়া’ নুকু একলা আসে নাই, সঙ্গে এসেছে বড়খাঁকড়ি হাই-ইস্কুলের ‘মাষ্টর’ সেই যে সেই লোকটা যে কী না লোধাবস্তিতে এসে মেরেছিল উলুক-ঝুলুক, ফটো-খিঁচা যন্তর নিয়ে বারকতক ভুগড়ার শিকল ধরে করেছিল টানাটানি, যদিও একবারের তরেও সুবিধা করতে পারেনি, —সেই লোকটা! শুধু কী সেই লোকটা, সঙ্গে এসেছে আরো কতক ইস্কুল-পড়ুয়া।

কে জানে তারা এসেছে অন্য কাজে কী না। তাদের সঙ্গে আসা নুকুর দায় পড়েছে নামাল খাটতে এসে দোরখুলির লোধারা মরল কী ধসল তার খোঁজ-খবর করতে। মনে মনে হতাশ ও ক্ষুব্ধ নামালিয়া লোধারা ফের যে-যার কাজে মেতে উঠল।

ফের কম্‌পিটিশান দিয়ে চাঁড় চাঁড় করে যে-যার ‘পাঁহি’ এগিয়ে নিয়ে চলল তারা। কখনো এগিয়ে গেল মেয়েরা, কখনো এগিয়ে থাকল ছেলেরা। পুরুষরা পিছিয়ে থেকে কাটা ধানের হেলা গোছ করে ‘ছড়’ দিয়ে বাঁধতে লাগল বিড়া। বাঁধা-বিড়া মাথায়-কাঁধে-বাঁহুকে গিরিহার খলায় ঝমর-ঝমর এসে একের পর এক হতে লাগল জমা। অচিরে ভুলেই গেল তারা— তাদেরই গাঁয়ের তাদেরই রক্তের কেউ একজন এত কাছে এসে পড়েছে বামনদায়।

বামনদায়, বামনদায়।

ভোলা কী যায় অত সহজে? থেকে থেকে সেই তো মনে পড়ে— বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে মেয়েটা গেল কোথায়? ঘরের লোকের কাছে এখনো আসছে না কেন?

ফের অস্থির হয়ে উঠল অদ্বৈতর আটচালা-খলাখামার কী দক্ষিণের বিল। ধান কাটতে কাটতে হঠাৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ধানকাট্‌নীরা কপালে হাত রেখে দেখছিল নুকুর মতো দেখতে কাউকে ‘দিশে’ কী না।

একটা কিছু আন্দাজ করছিল অদ্বৈতও। এত কেলর-বেলর কেন, এ যেন ‘বনির বাসায় সাপ পশা’! শালিকের বাসায় সাপ ঢুকলে যেমন হয় আর কি, একটুতেই চিচু-চিড়ানি ডেকে-হেঁকে একশা!

অস্থিরতা, অস্থিরতা

অদ্বৈত বলল, কী হউচি রে চন্দ্রবদনী? কেনে অত ফাসুর-ফুসুর করুচু? এ-বাটে সে-বাটে চাঁহি চাঁহি অত কী দেখুচু?

কাই কিছু নাই। এই ত যেমনকার তেমন ধান কাটছি।

ভাঙবে তবু মচকাবে না! চেপে গেল চাঁদবদনী। কী হবে পরকে অত কিছু বলে। তার উপর যদি জানে লোধাদের ফের ঘরে নিয়ে যেতে এসেছে নুকু, থাকল তোর ধান-কাটা?

তিতিবিরক্ত অদ্বৈত মনে-মন ভাবে, আজকাল এদেশে 'ফুরনে'ও ধানকাটা শুরু হয়েছে। কোনো হ্যাপা নেই, ঠিকা, দশবিঘা তো দশ বিঘা বিশ তো বিশ, নিজের গরজে কাজ শেষ করো আর টাকা নাও পুরো। ফেলো কড়ি মাখো তেল।

কাঁহাতক আর নামালিয়াদের পিছু পিছু ঘোরা! আসছে বছর আমনের মরশুমে না হয় ঠিকাই দিয়ে দেবে সে।

একটা কিন্তু আছে, নামাল খাটতে আর যদি নাই আসে নামালিয়ারা? দেশেই কাজ পেয়ে যায় তারা? যে-হারে পঞ্চাত্ আর তার সরকারের লোকেরা উঠে-পড়ে লেগেছে বারো মাসে তাদের তেরো রকম কাজ দিতে।

তখন? তার বেলা?

কী আর হবে? চাষের দফা রফা!

আলের উপর গাছতলে বসেছিল অদ্বৈত। অস্থিরতায় উঠে পড়ল, তারপর কী মনে করে ধানকাট্নীদের 'পাঁহি'তে এসে চাঁদবদনীকেই জিজ্ঞাসা করল, তোরমেনকার দেশ-ঘরনু কে আসিচে রে চন্দ্রবদনী?

তোদের দেশ-ঘর থেকে কে এসেছে?

ফট্ করে চাঁদবদনী বলে ফেলল, ভুবনালোধার মেইয়া নুকু। যা বুঝার বুঝুক গিরিহা!

অ, মাইয়ালুক-অ!

কিছুটা যেন আশ্বস্ত হল অদ্বৈত।

আস্সে কেনে, ক'ত?

কেনে এসেছে, তার আমি কী জানি?

সত্যিই তো জানে না চাঁদবদনী, কেন এসেছে লক্ষ্মীরানী। লক্ষ্মীরানী, লক্ষ্মীরানী। লেখাপড়ার কাজে দেশ-বিদেশ ঝাড়গাঁ-মেদিনপুর— কত দূর দূর জায়গায় তো যেতে হয় ইস্কুল পড়ুয়াদের, সেই কাজেই হয়ত এতদূর এসেছে লক্ষ্মী, সঙ্গে একজন মাষ্টারও তো এসেছে।

অদ্বৈত পৈড়্যা খুশি, —তা হলে বামনদায় আরেকজন নামালিয়া কামিন এসে জুটল?

ভাবতে ভাবতে গাছতলে গিয়ে ফের 'থাপস্গাদা' হয়ে বসে থাকল সে।

বেলাও পড়ে এল। রিঁ-রিঁ আওয়াজ মাঠময় উঠতে শুরু করল। কুলি-কামিনদের মাঠ থেকে উঠে যাবার ডাকও যেন এসে গেল। —ঐ তো আজকের মতো কাজ রেখে স্যালোর জলে হাত-পা ধু'চ্ছে নামালিয়া কুলি-কামিনরা। কে যেন, কে যেন কানের কাছে গেয়েও গেল দুকলি— "ঝিঙাফুল কাঁকুড়ফুল ফুটে রদো বদো গো"—

এতক্ষণে ওদিকেও রুখনীমারা-মুঢ়াকাটি-সুখজুড়ি-দোরখুলির বিলে-বাতানে শেঁ-শেঁ করে আওয়াজ উঠছে, আর ধোঁয়া মহিষাসুরের দঁকে বুড়বুড়ি ঝর্নাতলায়। কাক-কুইরী ডেকে-হেঁকে বাসায় ফিরছে। ঝিঙালতা কাঁকুড়লতা কাবাগুড়ি ফলের লতায়ও রদোবদো করে বনি-চটি-কাক-কোকিলের সদ্য হওয়া ছানার হলদে হাঁ-মুখের মতো ফুলের কুঁড়ি ফুটে 'আলা' হচ্ছে!

নুকু বসেছিল অপেক্ষায়, রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে। কাঠুয়াপালের বসন্ত কামিল্লাই চাপে পড়ে জানান দিয়েছিল দাঁতনের বামনদায় অদ্বৈত পৈড়্যার জোতেই কাজ করছে দোরখুলির লোধারা।

সুলুক-সন্ধান করে তাই আসা। হড়বড়িয়ে লোধাদের খোঁজে পুবের বিল উত্তরের বিল কী দক্ষিণের বিলে নেমে গেলে পাছে জোতদারের কাজের ক্ষতি হয়ে যায়, মাগ্না তো নয়

রীতিমত টাকাপয়সা আর খোরাকি দিয়ে করা, তাকে পেয়ে সেসব ফেলে যদি উল্লাসে মেতে ওঠে লোধা নামালিয়ারা, —তাই নুকুর বসে থাকা অপেক্ষায়, আগে তো শেষ হোক কাজ!

সিকা-বাঁউক-কাঁধে ধানের ভার নিয়ে তার চোখের সামনে দিয়ে কতবার গেল-এল শরাবণজেঠা গুড়কুঁদালোধা! ডেকে কথা বলতে কী আর ইচ্ছা হয়নি তার? প্রায় সমবয়সী পুনোই-ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদ্‌নীরা এই তো ক'হাত দূরে বামনদার বিলে হুল্লোড় করে মেতে আছে ধানকাটায়, এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে জড়িয়ে ধরে কী আর বলতে পারে না নুকু— যা হওয়ার হয়েছে এবার ঘরে চল বহিনরা?

পারে, পারে। কিন্তু ঐ যে—

পাছে ধানকাটার ক্ষতি হয়ে যায় 'গিরিহা'র, তাই নিয়ে সে কুলিকামিনদের সঙ্গে অশান্তি বাধায়, তাই শুধু কাজ শেষের অপেক্ষা। অপেক্ষা, অপেক্ষা। হলেও ঐটুকু, নুকু কী কম বুঝদার?

এখন তারা বসে আছে চায়ের দোকানে। তার আগে তারা সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে বেলদা থেকে দাঁতনের আশপাশে। বামনদা আসার তাদের কথাই ছিল না, লক্ষ্মীরানীর পীড়াপিড়িতেই তারা এসেছে। এখান থেকে তারা ফিরে যাবে বেলদায়, বেলদা কলেজে তাদের ক্যাম্প অফিস।

সাকুল্যে জনাপঁচিশ। একটা মিনিবাস রিজার্ভ করেই তারা এসেছে। ৬জন মেয়ে ১৮ জন ছেলে। সঙ্গে এসেছে বড়খাঁকড়ি হাই-ইস্কুলের মাষ্টার আদিত্য। সে আজকাল কলেজেও পার্ট-টাইম পড়ায়।

সেই যে সেই উপেন কম্পাউণ্ডার একবার তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, দে আর ভেরি সিম্পল এ্যাণ্ড ইন্টারেস্টিং। তুমি আদিত্য, এদের এসব নিয়েও তো লিখতে পারো? সেই থেকে সে তো লিখেই চলেছে লিখেই চলেছে 'শবরচরিত', এখনও শেষ হয়নি। কবে যে শেষ হবে! এর মধ্যে সে আবিষ্কার করে ফেলেছে লোধাদেরই মেয়ে লক্ষ্মীরানী মল্লিককে। মেয়েটা একটা 'জিনিয়াস'!

তপোবন জঙ্গলমহালে লোধাবস্তিতে বারবার অভিযান চালিয়েও যেখানে বিন্দুমাত্র সফল হতে পারেনি আদিত্য, সেখানে এই ক'মাস হল কলেজেই খুঁজে পেয়েছে তাদেরই মেয়ে লক্ষ্মীকে। আর আজ? এই তো একসঙ্গে বেরিয়েছে প্রত্নতত্ত্বের সন্ধানে দাঁতনে!

এর আগে কোথায় কোথায় না গিয়েছে আদিত্য! অসুরহুড়া-অসুরগড়-বনআসুরিয়া বনকাটি। ধানশোল-হাতিবাড়ি-ঘোড়াপিণ্ডা-ডোম্কি। ঘুরে এসেছে কয়াশোল-কুড়চিবনি-রাইবনিয়া-পায়রাকুলি-পানিশোল-পণ্ডাপেটা। দেখে এসেছে প্রস্তর যুগের কোয়ার্জাইট-মাকড়া-হাঁসাপাথরের তৈরি চাঁচনী-ছেদনী-তীরের ফলা-হাত কুঠাব।

এবারের অভিযান দাঁতন-বাহিরী-এগরা। আজ সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে মোগলমারী এক্তারপুর-তকিনগর-সাতদেউলা। লক্ষ্মীরানী এই প্রথম। কে জানে কেন দাঁতনের নাম শুনেই নাম লিখিয়েছে সে। দাঁতনকে তারা তো দাঁতন বলে না, বলে দাঁতুন।

দাঁতুন, দাঁতুন।

একদিন বড়খাঁকড়ি হাই-ইস্কুল হোস্টেলের আশপাশে, কুসমী-গড়কাটা-ডুলুং-সুবর্ণরেখাকেই প্রাগ-ইতিহাসের সরস্বতী-দৃষদ্বতী ভেবে তার তীরে তীরে আভীর-দরদ-তুখার-পহ্লু-কালতোয়ক-অপরান্ত-দ্রাবিড়-পুলিন্দ-শবর-শূদ্রদের বসবাস কল্পনা করে, দুহাতের জামার খোলা-হাতা ঝুলিয়ে হাতিবান্দির ডোমপাড়ার ভিতর দিয়ে গড়কাটা-ডুলুংয়ের দিকে যেতে

যেতে নিভন্ত লম্পো-ডিভার মাত্র জ্বলন্ত শিষটুকুর আলোয় ডোম্নীর আড়ভাঙা দেখে সচকিত আদিত্যর মনে পড়ে যেত "নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহরি কুড়িয়া"...., আজ সেই আদিত্য দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সত্যিকারের প্রত্নতত্ত্বের বেলাভূমি তন্দ্রবুত্তি-দণ্ডভুক্তি-দন্তপুর-দন্তবন-দাঁতনে!

কবে যে ছিল তণ্ড বুত্তি আর কবে যে দন্তপুর-দন্তবন ঘুরে সে হয়ে গেল দাঁতন— তার ইতিহাস প্রাক্-ইতিহাসের আলো-আঁধারিতে আদিত্য আজ কাটিয়েছে সারাদিন। আজ আর কে অস্বীকার করবে আভীর-দ্রাবিড়-পুলিন্দ সাঁওতাল-হো-মুণ্ডা শবর-খেড়িয়া-লোধাদের আদি পুরুষরা সুবর্ণরেখা-কাঁসাই-তারাফেনি নদীর অববাহিকায় বন থেকে বনান্তরে পাহাড়ে-টিলায়-ডুবকা-ডুংরিতে ডুলুং-তমাল-কুবাই-কেলেঘাইয়ের লাল বালিয়াড়িতে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া পায়ের ছাপ ফেলে হেঁটে বেড়িয়েছে! বিনপুরের সিজুয়ায় পাওয়া গেছে এদেরই কারোর চোয়ালের হাড়, 'হোমো-সেপিয়েনস্ সেপিয়েনস্', যা কী না আদি 'হোলোসিন' যুগের, যার বয়স আজ প্রায় দশ হাজার বছর! তমলুকের বাঁকা-নাটশাল-অমৃতবেড়িয়া থেকে পাওয়া গেছে খ্রীষ্টেরও জন্মের দু-আড়াই হাজার বছর আগের হাড়ের তৈরি 'হারপুন', মাছধরার বঁড়শি!

আদিত্য তো বই পড়েই জেনেছে অতীতের কলিঙ্গে 'দন্ডভুক্তি' একটি সবিশেষ জনপদ। কারোর কারোর মতে কলিঙ্গের রাজধানীও বটে। মধুক গাছে ভরা। মধুক তার মানে মহুয়া গাছ। কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধের মৃত্যুর পর কোনোমতে তাঁর বাঁ চোয়ালের একটা দাঁত পেয়েছিলেন বুদ্ধেরই এক প্রিয় শিষ্য 'ক্ষেম'-এর হাত ঘুরে। দাঁত পেয়ে সযত্নে রেখে দিলেন রাজধানীরই এক স্বর্ণমন্দিরে। সেই থেকে রাতারাতি 'দন্ডভুক্তি' হয়ে গেল দন্তপুর। দন্তপুর, দন্তপুর। যদিও 'দন্তপুর' আগে না 'দণ্ডভুক্তি' বা 'দন্তভুক্তি' আগে— ঐ নিয়েও যথেষ্ট গোলমাল আছে। আর 'দন্তবন'? তাই বা হল কবে? নাকি যেখানে পোঁতা হয়েছিল বুদ্ধের দাঁত, তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল দাঁতবন, যেমন কুড়চিবন-আঁটারিবন-শালবন-আসনবন।

রাজা শিবগুহ ব্রহ্মদত্তেরই বংশধর, জাতে ব্রাহ্মণ। বুদ্ধ-দাঁতের তুক-গুণে মুগ্ধ হয়ে বৌদ্ধ হন। এতে উৎকল ব্রাহ্মণেরা খেপে যান। তাঁরা পাটলিপুত্রের মহারাজার শরনাপন্ন হয়ে বুদ্ধের দাঁতসহ শিবগুহকে বন্দী করে পাটলিপুত্রে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করেন। বন্দী হয়ে অতঃপর দাঁতসহ শিবগুহ এলেন পাটলিপুত্রে। পাটলিপুত্রে আসামাত্রই অঘটনের পর অঘটন! ক্ষয়ক্ষতি! ঝড়ঝঞ্ঝা। আরো অমঙ্গলের আশঙ্কায় পাটলিপুত্রের মহরাজা দন্তপুরে ফিরিয়ে দিলেন বুদ্ধের দাঁতসহ শিবগুহকে। শুধু কী ফিরিয়ে দিলেন— নিজেও হয়ে গেলেন বৌদ্ধ! ততদিনে দাঁতের সুখ্যাতি পৌঁচেছে দণ্ডভুক্তি-পাটলিপুত্র ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র। মালব রাজপুত্র এলেন দাঁত দেখতে। দাঁত দেখে মুগ্ধ হলেন, তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন শিবগুহের মেয়ে হেমকলা। রাজকুমার রাজকন্যার বিয়ে হল। তারপরই রাজকুমার ফন্দি আঁটলেন দাঁতটা চুরি করে নিয়ে যাবার। এ যেন সেই 'ললিতা পালা'— ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির বসু শবরের মেয়ে ললিতাকে বিয়ে করে শবরদেরই ইষ্ট দেবতা 'নীলমাধবের' বিগ্রহকে চুরি করা! যেমন ফন্দি তেমনি কাজ। গোপনে দাঁত নিয়ে সস্ত্রীক মালব রাজকুমার তাম্রলিপ্ত হয়ে সিংহলে। অতঃপর সিংহলরাজ মেঘবাহের হাত ঘুরে বুদ্ধের দাঁত শ্রীলঙ্কার 'দেবানম্-প্রিয়' মন্দিরে। দাঁত না থাক, দাঁতের উৎসব আজও আছে।

আদিত্যর কৌতূহল— যে-সময় দাঁত নিয়ে অত কাণ্ড দন্তপুরে, দন্তপুরের ওধারে নদী পেরিয়ে সুবর্ণরেখার 'কাতা'ধারে শাল-আসন-পিয়াশাল-ধ-বহেড়া-মহুল-কইম-করমগাছের জঙ্গলে বসবাসকারী লক্ষ্মীরানী মল্লিকের আদিপুরুষরা কী ঘুণাক্ষরেও সেসময় টের পায়নি? নাকি লোধাঝোড় থেকে বেরিয়ে দলবেঁধে এসেছিল দেখতে দন্তপুরের স্বর্ণমন্দির? কিংবা, তারও

পরে যখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা ট্র্যাঙ্করোড বা জগন্নাথ সড়ক ধরে ঝারিখন্ড হয়ে পুরী যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে দন্তপুর বা দন্তবনে বিশ্রাম কালে দাঁত মেজে দাঁতন ফেললেন, আর তারপর থেকে দন্তপুর বা দন্তবন হয়ে গেল 'দাঁতন', তখনও কী তারা খবর পায়নি? নাকি ফের এসে জড়ো হয়েছিল নদীর 'কাতা'ধারে? লক্ষ্মীরানীর এখনকার বংশধররাও কী জানে জয়পুরার বামুনঘরে এখনও সে-দাঁতনকাঠি পাথর হয়ে পড়ে আছে? প্রায় দু'ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া? তারা কী তখনো সুবর্ণরেখা নদীর কাতাধারে দাঁড়িয়েছিল যখন "প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা। কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা?" তারা সাক্ষী ছিল কী যখন সুবর্ণরেখা নদী দেখে প্রভু "যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী?" এরাই কী তবে তারা যারা প্রভুর বনের ভিতর গমন পথের ধারে পাতার দোনায় মুড়ে রেখে দিয়েছিল ফলমূল— কেঁদ্-ভেলা-ভুড়রু আম-কলা-বেল? এরাই কী তবে তারা যারা প্রভুকে বন পথে বহু সুখ দিয়েছিল— "কৃষ্ণকৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল। বনপথে আনি মোরে এত সুখ দিল?"

আজ আদিত্যদের মিনিবাস প্রথমে গিয়েছিল মোগলমারি। নেকুড়সেনী রেলস্টেশন পেরিয়ে। খড়গপুর-দাঁতন পিচ সড়কের পুবে। দাঁতন তখনও প্রায় দু-আড়াই মাইল দূরে। সখিসেনা বা শশিসেনার পাঠশালায়। এখন তো প্রায় দু একর জুড়ে ইট-পাথরের ঢিবি, সে-ঢিবি পনের ফুট উঁচু! পাঞ্জাবির হাতা ঝুলিয়ে আদিত্য বলে চলে, কিন্তু এককালে এখানেই ছিল শশিসেনা আর অহিমানিকের পাঠশালা। কে শশিসেনা? কে অহিমানিক? রাজার মেয়ে আর চাষার ছেলে। অমরাবতীর রাজা বিক্রমকেশরী, তাঁরই মেয়ে শশিসেনা বা সখিসেনা। আর গরীব চাষীর ছেলে অহিমানিক। দুইয়ে দুইয়ে ভাব। বড় হয়ে গোপনে বিয়ে আর পলায়ন। কেউ বলে পালাবার কালে তাদের দুজনকেই রাজার লোকেরা মেরে ফেলে। ঐ নিয়েই কবি ফকিররামের কাব্য 'সখিসেনা'! সখিসেনা, সখিসেনা। দু'ছাঁদ শুনিয়েও দিয়েছে আদিত্য— "এক দিন ইন্দ্ররাজা দেবসভা করি। ব্রহ্মাআদি দেবগণ বসীলা সারি সারি।। দেবগণের নাম কহীয়ে প্রত্যক্ষে। সবাকার নাম সুন কহী একে একে।। প্রথমে বসীলা ইন্দ্র সভা বিদ্যমানে। তারপর আইলা ব্রহ্মা হংসবাহনে।।....."

শুনতে শুনতে নুকুর ফট্ করে মনে পড়ে গিয়েছিল বৈকি পাথরডহরার হাটুয়াদের সঙ্গে এক ইস্কুলে তার পড়াশোনার কথা। সেই ছেঁড়া চটের আসন, কালিঝুলি মাখা। বনের আঁউলা বাঁউলা আলু-তুণ্ডা জনারসিজা তেঁতুল বীচি দিয়ে মহুলসিজার 'টিফিন'। তাই দেখে হাটুয়া ছেলেদের মেয়েদের হাসাহাসি! তাদের ঘরের লোকেরা তো দুপুরে 'বাবু-বাছা' করে ভাত খেতে ডাকতে এসেছে, মাছ কী মাংসভাত। সেই তাদের ঘরের ছেলেদের সঙ্গে শশিসেনা আর অহিমানিকের মতো প্রেম? ভাব-ভালবাসা? ঠোঁট টিপে হাসে নুকু। তবে কী আর হচ্ছে না? ঐ তো সাবিত্রী-সন্তোষিয়া—

ছিল তো নাম অমরাবতী, কী করে হয়ে গেল মোগলমারি? তবে কী কেউ বা কারা মোঘলদের ধ্বংস করেছিল এখানে? হ্যাঁ, এখানেই আকবরের আমলে রাজা টোডরমল আর সেনাপতি মুনিম খাঁয়ের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল পাঠানদের, পাঠানদের নেতৃত্বে ছিলেন সুলেমান করনানীর পুত্র দাউদ খাঁ। যুদ্ধে মোঘলদের জয় হলেও মোঘলসৈন্য হতাহত হয়েছিল প্রচুর। রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল তুরকা-নহঞ্জরা-অমরাবতী। আর সেই থেকে মোগলমারি। মোগলমারি, মোগলমারি। তার আগে সুলেমান করনানীর সেনাপতি কালাপাহাড় যখন দাঁতনে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে শ্যামলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান সুবৃহৎ একটা পাথরের ষাঁড়ের সামনের পা দুটো মুড় মুড় করে ভেঙে দিচ্ছিল, নারায়নগড়ের ব্রহ্মাণী-রুদ্রাণী-ইন্দ্রানীদেবী যখন কালাপাহাড়ের ভয়ে মন্দির ছেড়ে ভদ্রকালীর

জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে পাথর হয়ে যাচ্ছেন, খড়গপুরে কালাপাহাড় হিড়িম্বেশ্বরীর মন্দির ভেঙে তছনছ করে দিলে হিড়িম্বা দেবী যখন কোনোমতে পচাপুকুরের জলে ডুবে নিজেকে রক্ষা করছেন, চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর শিবকে আর উর্জুনাথ শিবকে তাঁর পুরোহিতরা যখন কালাপাহাড়ের ভয়ে পাথর-চাপা দিয়ে বটগাছের তলায় মাটিতে পুঁতে রাখছেন তখনও কী লক্ষ্মীরানীর পূর্বপুরুষরা আঁউলা-বাঁউলা আলু-তুণ্ডা কুরকুট-মুরকুট ঢ্যামনা-গোই-গোধির সন্ধানে ডুব্কা-ডুংরি-বনঝাড়-তপোবন মায় জঙ্গলমহাল ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে? লাটাচুলী-সাতনলা-আঠাকাঠি চুলের ফাঁস খেড়িয়া-জাল খাঁচায় পোষা গুঁড়ুর-কয়ের নিয়ে নিশ্চিন্তে বনের কপ্‌তি-কয়ের-ক্যারকেটা খেড়িয়া-ঝিঁকর-বরা ধরে বেড়াচ্ছে? নাকি শালপাতার চুটা বানিয়ে কালাপাহাড়কে কুর্নিশ করে বলেছিল, লিজিয়ে জাঁহাপনা! আদিত্যর জানতে বড়ো কৌতূহল হয়। লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে কিছু জানে কী না? তার উত্তরে দলছুট হয়ে ঘুরে বেড়ানো নুকু উত্তর দিয়েছিল, না, সে কিছু জানে না। তবে একথা জানলেও জানতে পারে তাদের বড়সোলের গজনা।

তারপর তারা গিয়েছিল এক্তারপুর-তকিনগর-সাতদেউলা। দাঁতনের অনতিদূরেই। ততক্ষণে নুকুর মনের ভিতর উঠছে-ডুবছে কড়িয়া-বামনদা। বসন্ত কামিল্লার কথা মতো সেখানেই গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা নীলুয়া-হাড়িয়া-বড়কই-লাইবুকা আদরী-ভাদরী-নিয়তি-পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীরা! আদিত্য স্যারকে সে বলে রেখেছে অন্তত আধঘণ্টার জন্য হলেও সেখানে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু কেন? তার উত্তরে কিছুই ভাঙেনি লক্ষ্মীরানী, শুধু মাথা নিচু করে ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি খুঁড়েছে। কেন জানি তার বিশ্বাস 'না' বলতে পারবে না আদিত্য স্যার। হলও তাই, জামার হাতা ঝুলিয়ে আদিত্য বলেছিল, আচ্ছা। তারপর ধুতির কোঁচা দুলিয়ে ছোটাছুটি ফেলে দিয়েছিল সে। কী আছে এক্তারপুর-তকিনগর-সাতদেউলায়? আছে তো বড়জোর ধর্মসাগর, ঝগড়েশ্বর জীউ আর কিচকেশ্বরীর মন্দির! আর তাছাড়া কবেকার পোড়া ইট! মাটির তলার এই ইট দিয়েই নাকি একদা তৈরি হয়েছিল উড়িষ্যার রাজঘাট রোড। নাকি এরকম অজস্র পোড়া ইটের স্তূপের উপরই দণ্ডায়মান দাঁতন শহর আর তার আশপাশ। এর মধ্যে ধুলোয় অবহেলায় কোথায় পড়ে আছে 'চড়কাপড়া শিব', আঙ্গুয়ায় শ্যামলিয়া পুকুরের চার কোণে চার-চারটি পাথরের 'কাছিম', উত্তর রায়বাড়ের আন্‌কা গাছের তলায় 'জটিয়াবাবা', কোথায় উড়িশাল-বেনাপুরায় তেঁতুলগাছের নিচে সাপের ফনা ঢাকা মা মনসা, সর্বমঙ্গলার মন্দিরে কোথায় গড়বেতায় তাল-বেতাল, কোথায় অর্জুনবনি-ভিকনগরে বগার মাঠে পড়ে আছে বকরাক্ষসের হাড়, বকডিহির কৃষ্ণ এখনও রাত্রে পুরোহিত মুড়কি-ভোগ দিতে ভুলে গেলে ভাঁড়ারের হুড়কো খুলে নিজেই মুড়কি খায়, কোথায় গোপীবল্লভপুরে সুবর্ণরেখার 'কাতা'ধারে ফেলে যাওয়া শ্রীরাধার পায়ের নূপুর কুড়োতে এখনও আসে ললিতা—

এক্তারপুর-তকিনগর-সাতদেউলায় গ্রীষ্মের এই মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে আদিত্যর কাছে তখন সব যেন একাকার একাকার! ওদিকে গোপা-তনিমা-তন্দ্রা-ভারতী-শাশ্বতীর কাছ থেকে দলছুট লক্ষ্মী ঝগড়েশ্বরজিউর মন্দিরের পিছনের মাঠটায় যেখানে গরু-ছাগল চরছিল, গরু চরাচ্ছে হাটুয়া গরুবাগালরা, ছাগল চরাচ্ছে হাটুয়া ছাগলচরানীরা, সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একাএকা! আসলে সে গরুবাগাল ছাগলবাগালদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে জেনে নিচ্ছিল কড়িয়া-বামনদা কোনদিকে? মিনিবাসে সেখানে যেতে কতক্ষণ লাগে? তারা আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, হা সেবাটে। যাইতে আউ কেতে টাইম লাগে। মিনিবাসে পৌঁচি যাব হুশ করি! বলেই তারা ফের মেতে উঠেছিল খেলায়। নুকুর মনে জেদ চেপে গিয়েছিল জোর— যতদূরেই হোক আজকের মধ্যে সে পৌঁছবেই পৌঁছবে কড়িয়া-বামনদা।

এখন বামনদায় পৌঁছে এই চায়ের দোকানে অন্যান্যদের সঙ্গে বসে থেকেও বুক তার ধক্ ধক্ করছে, থেকে থেকে মনে পড়ছে ঝগড়েশ্বর জিউর মন্দিরের পিছনে গাছতলায় একজন দাঁড়িয়ে বাকিরা গাছে চড়ে হাটুয়া গরুবাগালরা ও কী খেলছিল! সুর করে ও কী বলছিল— "গাছছুয়ারে গাছছুয়া-"

এখানে, এই এতদূরে এখন পর্যন্ত কাউকে কিছু না বলে কেন এসেছে সে। চুপ করে একা একাই বসে থেকেছে নুকু, গোপা-তনিমা-তন্দ্রা-শাশ্বতীরাও তার সঙ্গে তেমন কথা বলেনি। একমাত্র ভারতী, তাঁতীদের মেয়ে, তার সঙ্গে তার একটু-আধটু ভাব, সেই কেবল যেচে যেচে একটা-আধটা কথা বলে যায়।

সে-ই বলল, কিগো রানী, দাঁতুন-সাতদেউলার মতো এখানেও কিছু আছে নাকি চৌদ্দদৌলা-পোড়াইট-পাথরের দাঁতুনকাঠি? নাকি সখিসেনার পাঠশালার মতো লক্ষ্মীসোনার পাঠশালা?

মুখ টিপে হেসে এতক্ষণে উত্তর দিল নুকু, আছে বৈকি মিনা, এখানকার ধানবিলে মাটি-চাপা পড়ে আছে লক্ষ্মীসোনার পাঠশালা ত পাঠশালা, গোটা গাঁ—

সব কিছু খুলে বলতে গিয়েও বলতে পারে না নুকু। ধক্ করে ওঠে বুকটা। পাছে তার গাঁয়ের লোক, লোকজনের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখে তার সম্বন্ধে কত কী ভেবে নেয় তন্দ্রা-তনিমা-গোপা আর শাশ্বতীরা। তাই নিজেকে ফের খপাৎ করে খোলের ভিতর গুটিয়ে রাখে নুকু।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! একটা কিছু উপায় তো করতেই হবে তাকে। সুলুক-সন্ধান করে এতদূর এসেছে যখন, চোখের দেখা তো একবার দেখেই যাবে সে।

মনস্থ করল— গোপা-তনিমা-তন্দ্রা-শাশ্বতীরা বাদ, এমন কী ভারতীও না, ছেলেরাও না, কেবলমাত্র সে যাবে অদ্বৈত পৈড়্যার বাড়ি, আর যাবে আদিত্যস্যার।

আলা-ভোলা আদিত্যস্যার, ধুতির কোঁচা দুলিয়ে জামার হাতা ঝুলিয়ে সদাসর্বদা ব্যস্ত এটা-ওটা আলোচনায়। এই তো এখন ফতুয়া-পরা চা-দোকানীর কাছে খোঁজ নিচ্ছে কোথায় ধারে-কাছে 'কোরঙ্গা' বলে একটা 'জাত' আছে— যারা নুরুন দিয়ে কাঠে আর বেলকাঁটা-লেবুকাঁটা দিয়ে বউড়ি-ঝিউড়িদের হাতে-বুকে 'খদা' আঁকে।

'খদা' তার মানে উল্কি। ফতুয়া-পরা চা-বুড়োরও অগাধ জ্ঞান। সে শোলক কেটে বলল, "চাষি চিনে ধান পানুয়া চিনে পান। গয়লা চিনে গাই-মহিষ করঙ্গা চিনে কাঠ।।"

করঙ্গা-গ্রাম আছে বৈকি— অউ ত নদীধারে।

সে আরো বলল— তারা নাকি এসেছে কিষ্কিন্ধ্যা পাহাড় থেকে। হয়ত তাদের দেখতে কালই সেখানে হাজির হবে আদিত্যস্যার।

লাজ-লজ্জা-ভয় কাটিয়ে এতক্ষণে আদিত্যস্যারকে আলাদা ডেকে মনের কথাটি খুলে বলল লক্ষ্মী, এতদূরে এসে না বলে তার উপায়ও ছিল না, বলতে তাকে হতই।

শুনে তো লাফিয়ে উঠল আদিত্য। আরে আরে, যাদের দেখতে বনে-জঙ্গলে অভিযানের পর অভিযান চালিয়েছে সে, যাদের নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে চলেছে সে, যাদের এককপি ফটো তুলতে পোজের পর পোজ নিয়ে কতবার ক্যামেরা তাক করেছে সে, একবারের তরেও সে সফল হয়নি, আজ সেই তারা কী না এত কাছে! সেই তাদেরই একজনা আজ তাকে তাদেরই কাছে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্ছে, আর আদিত্য যাবে না? এখন-এখনই যেতে চায় সে, পারে তো এখনই তাকে নিয়ে চলুক লক্ষ্মী।

ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়ল আদিত্য। আগে আগে লক্ষ্মী। সঙ্গীরা, ছেলেসঙ্গীরা মুখ

টিপে হাসল। ফিস্ ফিস্ করে টিপ্পনি কাটল— "কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা—"

হাসুক, কাটুক। এই তো ধানছড়া ধানের টুঙ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গিয়েছে তারা। কেউ বা এখনও পড়ে আছে পিছনে। বসন্ত কামিল্লাই তো চাপে পড়ে বলে দিয়েছে গিরিহার নাম অদ্বৈত। মোকাম বামনদা।

বামনদা, বামনদা।

এই কদিন নুকুর মনে মনে কতবার যে ঘুরপাক খেয়েছে নামটা! পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ ঘেঁটে ঘেঁটে সে দেখেছে— কোথায় কোনদিকে অবস্থিত বামনদা।

সেই তো বাস থেকে নামার আগেই বাসে চড়ে চলে এসেছিল তারা লোধাপাড়ার ঘরে-দুয়ারে কাঁটা-ঝাঁপ দিয়ে, বন-জঙ্গল তাদের বিহনে ফাঁকা! বৃথাই সে লিখেছিল কবিতা, "বনে জনম বনে মরণ বন লোধাদের হকের ধন— কঁহে দে রানী কঁহে দে মুনু, বন আমাদের মা বঠে"—

সেই বনকেই কী না তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তারা এসে গেল নামাল খাটতে? বৃথাই সে দোরখুলির লোধাপাড়ার মাটিতে পুঁতেছিল 'অরণ্য সপ্তাহে' পাওয়া 'বোগেনভিলিয়া'। বৃথাই সে কবিতার ছোঁয়ায় একদিন বদলে দিয়েছিল লোধাপাড়া— লোধাপাড়ার ঘরগুলি হয়ে গিয়েছিল পাকার, ধুলিভরা কুল্‌হিরাস্তা হয়ে গিয়েছিল পিচের, জুনিয়ার হাই, হাইয়ার সেকেণ্ডারী— ডাক্তারখানা-হাসপাতাল-হেলথ্‌সেন্টার-ওষুধদোকান— চালের গুদাম-কাপড়ের দোকানে গিজ্ গিজ্ করছিল—

আর তাই ফেলে রেখে তারা কী না চলে এসেছিল হাটুয়াদের কোন্ অঝোরঝর পাড়াগাঁয়ে!

একে-তাকে জিজ্ঞাসা করতে করতে অর্ধেক টিন অর্ধেক পাকা সুবিশাল বাড়িটার কাছে হাজির হল নুকু ও আদিত্য। এই তবে বাড়ি অদ্বৈতর! খামার থেকে ধানবোঝাই একটা লরি বেরিয়ে গেল গাঁক গাঁক করে।

গুরভার বউ গুরভাকে এক ঢোক ধর্মের জল খাইয়ে বড়ো স্বস্তিতে এসে বসেছিল খামারে। গিরিহা-গিরিহানীর ঘরের দিকে চেয়ে হাঁ করে।

তার পেটের ভিতর গজ্ গজ্ করছিল আজ সকাল থেকে একটার পর একটা ঘটে যাওয়া ঘটনা-অঘটনা!

"আম ফলে থোকা থোকা তেঁতুল ফলে বাঁকা। নামাল দেশে দেখে আইলম রাঁঢ়ির হাতে শাঁকা।"— এতদিনে শুধু রাঁঢ়ির হাতে শাঁকা নয়, 'রাঁঢ়ির হাতে শাঁকা'র চেয়েও দামী অনেক কিছুই সে দেশে ফিরে বলতে পারবে।

গিরিহানীর লম্বা হাতের আরো কিছু তুক-গুণ দেখে ফেলার আশায় আশায় কী গিরিহা-গিরিহানীর বাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে এখন বসে আছে গুরভার বউ?

ধানবোঝাই ট্রাকটা গেল আর ফাঁকা খামারে মুখোমুখি হয়ে পড়ল নুকু আর গুরভার বউ।

দেখামাত্র কী যে করবে প্রথমে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না সে। 'ভ্যাল্ ভ্যাল্' করে খানিক তাকিয়ে থাকল। মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ তুলল। তারপর নুকুর দিকে পিছন-ঘুরে চালাঘরের উদ্দেশ্যেই দৌড়ুল।

ততোধিক দৌড়ে তাকে পিছন থেকে জাপটে ধরল নুকু। মুখ দিয়ে এসময় নুকুও একটা আওয়াজ তুলল।

গুরভার বউয়ের মনে হল যেন জন্মের মতো তাকে আঁকড়ে ধরে আছে নুকু, আর সে

ছাড়বে না। এভাবেই জাপটে ধরে নুকু টানতে টানতে তাকে ফের নিয়ে যাবে দোরখুলি তপোবন-মাঝুড়ুবকায়!

আদিত্য একটু সরে দাঁড়াল আড়ালে, পাছে তাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে লক্ষ্মীরানীর লোকজন। আড়াল থেকে ক্যামেরা তাক করল সে— এমন ছবি আর পাবে কোথায়!

এবার মুখোমুখি হয়ে জড়াজড়ি করে কাঁদতে লাগল নুকু আর গুরভার বউ। শব্দ করে কাঁদছে না নুকু, তার চোখের জল ঝরে যাচ্ছে অঝোরঝর। গুরভার বউ লাগামছাড়া কান্নায় মাঝেমাঝেই ফুঁপিয়ে উঠছে।

চালাঘর থেকে দৌড়ে এসেছে গুরভা, রান্নাবাড়া ছেড়ে উঠে এসেছে নিয়তি। পোখরি-আড়ার আশপাশে কালকাসুন্দি-বাঁশ-কুকশিমা-বাসকের ঝোপে-ঝাড়ে লাটায়-পাটায় গুটুল-হাতে কাদাখোঁচা-ডাহুক-ক্যারকেটার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুরুয়া, এই নামাল দেশে ভুবনালোধার মেয়ে নুকুকে দেখে দৌড়ে এল সেও।

বেরিয়ে এসেছে মেসিনঘরের লোকজন, তারা নামালিয়াদের রগড় দেখে হাসছে— এ আবার কে? কোত্থেকে এল? তাকে জড়াজড়ি করে এত কান্নাই বা কেন? আর ঐ যে ক্যামেরা হাতে পটাপট ফটো খিঁচে চলেছে লোকটা— ঐ বা কে? পোশাক-আশাকে ভদ্রস্ত?

দোতলার বারান্দায় ভিজা-চুলে এসে দাঁড়িয়েছে নীলিমাও। স্নান-ঘরে গায়ে জল ঢালতে ঢালতেই শুনেছে সে 'হুরি'— তবে কী অসুস্থ লোকটার— গুরভা না গোবর্ধনের— হয়ে গেল কিছু কী!

উঁ-হু, ঐ ত গুরভা।

হা শুন নিয়তি, কী হেলা রে? এতে কোন্দল-হুরি কাঁহি কি? কেন এত গোলমাল?

এখন কার কথা কে শোনে! নুকুকে নিয়েই মেতে আছে লোকজন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীলিমা দেখল— নামালিয়া না, নামালিয়াদের মধ্যে অন্য কেউ, ধনী ঘর ঝিঅ— যেন বেনা বনে মুক্তো, মউড়মণি!

কে সে?— জানবার আগ্রহে মেসিনঘরের 'কচি'-কে ডাকল নীলিমা, শুনি যা মনা—

কচি মুহূর্তে এর-তার কাছে বিশেষত আদিত্যের কাছে সঠিক খবর নিয়ে দৌড়ুল গিরিহানীর কাছে।

এদিকে ধানবিড়া মাথায় খামারে এসে পড়ল ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। অদ্বৈতর ভাই শ্রীমন্তর বিলে যারা ধানকাটায় লেগেছে হাড়িয়া-লাইবুকা-নাকফুড়রিরা— এখনো তো আসে নাই।

চালাঘরে এরমধ্যেই পড়ে গেল ধুন্দুমার। ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীদের মধ্যে শুরু হল হুড়োহুড়ি— কে কতটুকু গা ঘেঁষে বসতে পারে নুকুর।

এন্নিতেই দোরখুলির লোধাপাড়ায় নুকুকে তেমন ভালো চোখে দেখতে পারেনি ভুটকীরা, কে জানে 'লিখাপড়া-জানা-মেইয়া' কী বলতে কী বলে দেবে ফট্ করে! তার উপর সে আর কতটুকু থাকে লোধাপাড়ায় লোধাঘুপচিতে? থাকে তো ইস্কুলে, দু'বেলা পেট পুরে খায় আর পড়ে! তাদরে মতো কী আর লোধাঝোড়-ভালুকঝোড়-খেড়িয়াঝোড়ে ঢুকে আলকুসি ল-বিছুটির রোঁয়া গায়ে মেখে কিরকিচ-বেল-বাঘনখীর কাঁটা পায়ে ফুটিয়ে চিহড়-হাতিবাঁধা-দুধিয়া লতায় ছাঁদা-বাঁধা হয়ে আলু-তুণ্ডা-কেঁদ-ভেলা-ভুঁড়রু সরুবালি-বড়বালি-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া-ঝালুয়া-শালপণ্ডড়া টুঁড়ে এনেছে! কই বলুক তো—

কোথায় আছে সীতাচৌকি?

সুরগুঁজা ফুল কখন ফোটে?

ভাল্লুক গোধি কী কাজে লাগে?

তেজপাতা গাছ তপোবনের কোন্ দিকে আছে?

আর, পোয়াতি সীতার জিভ-ছোলা রামদাতন?

দেশ থেকে এসেছে নুকু, তাকে কত কী জিজ্ঞাসা করার আছে, অথচ নিয়তির পেটে আসছে তো মুখে আসছে না! হাণ্ডুল-মাণ্ডুল হয়ে যাওয়া কথার ভিতর থেকে সে একটা কথা কোন মতে তুলে এনে জিজ্ঞাসা শুরু করল নুকুকে।

হেঁ নুকু—

কী?

আমাদের ভুগড়ার পাঁদাড়ে সেই জোড়া তালগাছে কী 'জালি' এসেছে?

নাই কাকি, সে ত দেখি নাই।

হতাশ হয়ে নিয়তি মনে মনে বলল, তবে কী কত্তে এলি? মুখে বলল, গাছ দুটা আছে ত?

হেসে ফেলে নুকু বলল, তা আছে। তবে—

নুকু কী বলবে এখনই ফিরে না গেলে গাছ দুটো আর রাখা যাবে না? কাঠচোরেরা এসে কেটে নিয়ে তালের ডোঙা বানাবে, করাত দিয়ে চিরে তক্তা বানিয়ে ঘর ছাওয়ার 'বাতা' করবে, পুকুরের ঘাট জমির 'হিড়' বাঁধাবে?

কী তবে?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চাঁদবদনী যেমন বলে ফট্ করে বলল, ঝড় নাই ঝাপট নাই, শুক্না ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকা জলজ্যান্ত গাছ দুটা কী এম্নি এম্নি শুধা শুধাই উড়ে যাবে? ভাব্বিস্ নাই ফুলুয়ার মা, তর যেম্নি গাছ তেম্নি আছে, ঘর যাঞে খালি গাছ হিলাবি আর তাল কুড়াবি—

তুই থাম মুখপুড়ি—

বলেই তাকে থামিয়ে দিল লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা, নুকুর কাছে জানতে তার এখনও কত কথাই বাকি। ইস্ কোনটা সে আগে বলবে কোনটা পরে?

নুকু বলল, নাই রে দিদি, তোদের বিহনে গাছপালা সব ফাঁকা—

ফাঁকা মানে?

ফাঁকা মানে ফাঁকা ফাঁকা লাগে আর কি! মনে পড়ে যায় তার নিজেরই লেখা কবিতার লাইন—

"অনাহার ক্লিষ্ট শীর্ণ কুকুর হেথা হোথা ঘুরে,
তপ্তরোদে কোকিলছানা কুহু কুহু করে।"

লোধাপাড়ার অবস্থা এখন তো তাই!

মাঝুড়ুব্কার জোড়া শালগাছ দুটা ত আছে?

আছে।

আর সুরথ-তিলোচনকুম্হারের বাঁশঝাড়?

আছে।

কেঁদবুদা-বেনাবুদা?

আছে।

কার যেন মনে পড়ে গেল সরুবালি-চিকনবালির বাঁশতলায় কী একটা জিনিস লুকিয়ে রেখে এসেছে সে, আছে তো?

আচ্ছা ভালা, সরুবালি-চিকনবালির বাঁশতলা এখ্নো আছে ত?

আছে।

আর কী, আর কী— হুঁ, দখিণসোলের কচড়াগাছটা? কচড়ার কালেই ত চলেঁ এসেছি, ই-বছর কে তুলল এত কচড়া?

কে আবার— বারোভূতে।

বুলান-হদহদির ভাদুগাছটা?

আছে।

আরেকজন নিজে নিজেই বলল, ঠাকুরবাঁধের ধ' গাছটা ত নাই— সে আনেকদিন!

নেই, কিন্তু ধ'গাছের কথা উঠতেই এসে গেল রাইবুর কথা।

হেঁ মিনা, রাইবুভাশুর আর গুড়গুড়িয়া ঘুরে এসেছে?

এখনো জেল-হাজতে, জামিন হয় নাই।

চোখের দেখ্‌তা দেখতে পেয়েছিস?

নাই।

আর পাবি নাই, শালারা পোঁদে হুড়কা গুঁজে বাঘঝাঁপা-সরোর খাঁদু আর গুনধরের মতো লাশ গুম করে ছাড়বে!

শিউরে উঠল নুকু, শিহরিত হল নিয়তি-পুনোই-ভুটকী-গুরুবারী-চাঁদবদনীরা। —লোকটাকে মেরেই ফেলবে লোকগুলা!

যে বলার সে তো বলে দিয়েই চালাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, সে গুরভা।

গুরভা, গুরভা।

বাইরে এসে আদিত্যর চোখে চোখ পড়তেই চোখ পিট্ পিট্ করল সে। বড়খাঁকড়ির হাটে লোকটাকে কতবার দেখেছে! কিন্তু তার সঙ্গে তাদের 'মেইয়া'টার কী? মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সাবি আর সন্তোষিয়াকে। ভুবনা-ফুলটুসুয়ার 'মেইয়া' কী সেদিকেই এগুচ্ছে? নাকি মাষ্টারলোকটার সঙ্গে তার লেঁখাপড়ার সম্পর্ক আছে?

কে জানে কী! অ-জাত বি-জাতের লোকটাকে নিয়ে তো এতদূর এসেছে!

বাবু-বাবু লোকটা এখন খালি ফটো খিঁচছে! তাদের মতো 'ন্যাঙটাভুটুং পাদের কুটুম' লোকেদের ফটো নিয়ে সে কী করবে! নিশ্চয় কোনো ধান্দা আছে।

ফটোর 'ছামু' থেকে ফট্ করে নিজেকে সরিয়ে রাখল গুরভা।

আদিত্য পড়েছে মুস্কিলে। এতক্ষণ যে-কটা ছবি সে তুলেছে, সবই বাইরের, ভিতরের একটাও না। কিন্তু চালাঘরের ভিতরে এখন যে কী ঘটছে ধুন্দুমার, কত কী হচ্ছে— তার একটা কিছুও তুলতে পারছে না সে। কারণ তাদের মুখোমুখি হতেই ভয় পাছে তাকে দেখে তারা হুড়োহুড়ি করে নিজেদের লুকিয়ে ফেলে, এদিক-ওদিক দৌড়ে বনে-জঙ্গলে না হোক পুকুরের ধারে ঝোপে-ঝাড়ে আচমকা ঢুকে পড়ে!

মেসিন-ঘরের 'কচি'কে সে কাছে ডাকল, শোনো তো খোকা।

কচিই বলল, আসুন না, এখানে বসুন!

হাস্কিং মিলের ভিতর থেকে চট-জলদি একটা চেয়ার টেনে এনে ধুলো ঝেড়ে আদিত্যকে বসতে দিল কচি।

চেয়ারে বসেই আদিত্যর চোখ চলে গেল অদ্বৈত পৈড়্যার অর্ধেক টিন-অর্ধেক পাকা বাড়িটার দিকে। বেশ অবস্থাপন্ন বাড়ি, সদ্যকাটা ধানের গাদা লাট হয়ে আছে গৃহস্থের খলা-খামারে। হলদে-সবুজের সমারোহ চারদিকে। তার উপর বৈকালিক বারান্দায় হলদে শাড়ি

পরে দণ্ডায়মান এক সুন্দরী নারী।

আদিত্যর মনে হল, গৃহবধূ-ই।

এরা কারা? এই গৃহস্থের পদবী তো পৈড়্যা, অদ্বৈত পৈড়্যা। একটু আগে চা-দোকানীর মুখেই তো শুনছিল আদিত্য এই গ্রামেই কতরকম পদবী আছে—

পৈড়্যা, প্রতিহার, জানা, কাঁড়ার, দিণ্ডা, বেরা, মাইতি, মান্না—

চায়ের দোকানেই বসা আরেকজন ছোকরা বলছিল, শুধা অউ গেরামে কেনে পাশের গাঁ কড়িয়া-গৌড়দায় বি হরেক টাইটেল্—

ঘোড়া, হাতি, বাগ, বেতাল, গুড়িয়া, পালোধি, সাউ—

কেনি রেনজুড়ায় হরিহর ডিঙ্গাল, অষ্ট টুঙ আছে নি?

আদিত্য তো বই পড়েই জেনেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাম্রলিপ্ত থেকে দুর্যোধনের পক্ষে যারা যোগ দিয়েছিল তারা ছিল 'ম্লেচ্ছ'। 'কর্বট' জনপদের লোক। 'কর্বট' কী কাঁথি-এগ্রা-দাঁতন-বেলদা-নারায়নগড়?

এইসব পদবীধারী লোকেরাই কী 'কর্বট' জনপদের লোক? ঋক্ সংহিতায় 'কীকট' বাজসেনীয়-মনুতে 'কৈর্বত'?

হালিক আর জালিক—

যারা হাল দিয়ে চাষ করে হালিক কৈবর্ত, যারা জাল দিয়ে মাছ ধরে জালিক কৈবর্ত। কৈবর্ত মাহিষ্য কী এক?

উঁ-হু।

দাশরাজার কন্যা মৎস্যগন্ধা আর পরাশরের ঔরসে কৈবর্ত, ক্ষত্রিয় পিতা আর বৈশ্যমাতার ঔরসে মাহিষ্য—

কে জানে কোনটা ঠিক! তবে অদ্বৈত পৈড়্যা যে হালিক হাব-ভাব দেখেই বুঝেছে আদিত্য।

হালিক-জালিক যা-ই হোক, চেয়ারে বসে বড়ো স্বস্তিতে ক্যামেরাটা খুলল সে। আর খুলেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল আদিত্য! তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি কখন 'রিল' ফুরিয়েছে ক্যামেরাটায়।

তবে কী এখানে তোলা ছবি ওঠেনি একটাও? তবে কী সে এবারেও 'ফ্লপ্'?

কচিকে জিজ্ঞাসা করল আদিত্য, এখানে কোথায় 'রিল' পাওয়া যায়? ফটোর দোকান আছে কোথাও?

মাথা নাড়ল কচি।

—বেলদা ন গনে আউ এঠিরে পাব কাঁহি?

বেলদা না গেলে আর এখানে পাওয়া যাবে না।

হতাশ আদিত্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল, যতসব ভালগার!



শতুরার বউ নিয়তি ভারি উতলা হয়েছিল ছেলের জন্য। বারবার সে জিজ্ঞাসা করছিল নুকুকে—এর মধ্যে একবারও কী তার 'আজা'র সঙ্গে দোরখুলি আসেনি ফুলেশ্বর? তোমরা

নেই কাকী, কার জন্য সে লোধাপাড়ায় আসবে—উত্তরে স্পষ্ট জানয়ে দিয়েছিল নুকু। বলেছিল—আর তোমাদেরও বলিহারি, ধানকাটার কাজ করতে চাও যদি তো এতদূরে আসতে হবে কেন? আমাদের ওদিকে কী চাষাভুষা নেই? ধারে-কাছে ধানবিল নেই? কেন, বড়োডাঙার মহাজন-ঘরের চাষবাস কী কম? নদীপারে বড়খাঁকড়ির বাবুঘরের ওদিকেও তো যেতে পারো?

জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়ার মতো এমন করে বুকে ঘা মেরে মেরে বলল নুকু যে হাড়িয়া-লাইবুকা-নাকফুড়রির মতো হাড়ে হাড়ে চটা ছেলেরা পর্যন্ত দেশে ফিরে যাবার 'মন' করল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! ফের যে-কে-সেই, সেই এককথা—দেশে-ঘরের চাষারা তাদের নেবে কেন? 'চোর' 'চোর' বলে 'দূর দূর' করে ভাগিয়ে দেবে না? আর তাছাড়া সেদিকে—সান্তাল-ভূঁয়া-ভুমিজ-বাউড়ি-বাগদী—কত মজুরই তো বেকার বসে আছে!

নুকু যে সে-সব জানে না, তা নয়। বুঝেও না-বুঝের মতো বলতেই হয় তাকে। তার বলাবলিতে যদি তারা ফিরে যায় দেশে! তাদের অভাবে লোধাপাড়া যে খাঁ খাঁ করছে! মাতব্বর রাইবু নেই, তার প্রাণের দোসর গুড়গুড়িরা নেই। বিপদে-আপদে পড়লে—ঐ তো ক'ঘর— তখন কে কাকে রক্ষা করবে? তাদের না হয় 'ধরমবাপ' বঙ্কা মাহাতো আছে। তবে হ্যাঁ, মাহাতোপাড়ার লোকজন যেখানে সহায় সেখানে এক পুলিশ ছাড়া গাড়বাবুরা ছাড়া তাদের গায়ে হাত তুলবে না আর কেউ। চোর-ডাকাত না হোক—কী-ই বা আছে লোধাদের যে চোর-ডাকাত ঢুকবে লোধাপাড়ায়— কিন্তু হাতিশুঁড় বাবা? কোথায় কোন্ বিহারমুলুকের দলমা-না-কলমা পাহাড় থেকে পাকা ধানের লোভে দলে দলে নেমে আসছে হাতির পাল! হয়ত নদী পেরিয়ে এদিকেও চলে আসবে।

আচ্ছা করে হাতির কথা শুনিয়েছিল নুকু। আর তাই শুনে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা ভয়ে অস্থির হয়েছিল বৈকি—ঘরদুয়ার সব ভেঙে চুরমার করে দেয় যদি হাতিশুড় বাবা। তারা তো নেই, কে আর নুড়ো জ্বেলে 'পি-ছে' 'পি-ছে' বলে রাতভিত হাতি খেদাবে? ভেঙে দেয় দেবে, কী আর হবে? এতদিন নরসিঙা ভাঙত, এখন না হয় ভেঙে দেবে হাতিশুঁড়।

ভবী ভুলবার নয়, এতদ্ সত্ত্বেও এখন-এখনই ফিরে যেতে কেউ চায় না। আর ফিরবেই বা কেন—এমন নিশ্চিন্তে প্রতিদিন 'বন-ভুজ্নী'র আয়োজন সেখানে আর কোথায়? এখানকার মতো চাইলেই ভিতর-ঘর থেকে ঝুড়ি ভরে 'সিধা' বের করে দেবে রান্নার জন্য আর কে? কোন্ গিরিহানী?

তাছাড়া আজ বাদ কাল বামনদার শীতলামাড়োতলায় শীতলাপূজা, নাকি মস্ত মোচ্ছব! সাতদিন ধরে 'যাত্' বসবে, ভিডিও দেখাবে, যাত্রা হবে, আরো কত কী হবে! ভুটকী-পুনোই-গুরুবারী-চাঁদবদনীরা তো কিছুতেই যাবে না। যায় যদি তো মেলা দেখেই যাবে।

তার উপর রাইবুর বিহনে এখন তো গুরভাই মাতব্বর।—সেই বলুক না এই পরিস্থিতিতে কী করা যাবে? গুরভা তো বেঁকে বসেছিল আগাগোড়াই—কিছুতেই নিজে সে ফিরবে না, কাউকে সে ফিরতেও দেবে না। নীলুয়া থাকলেও বলত সেই এক কথা, হারগিজ্ নাই, ঘুঁরিই নাই যাব এখ্নেই। বলেই তার ইল্লিকে শিকলি ধরে এক হ্যাচকায় হয়ত টেনে আনত কাছে।

নীলুয়া নেই, থাকলে হয়ত ফাটাফাটি লেগে যেত নুকুর সঙ্গে! গিরিহাদের এত ধান পড়ে আছে মাঠে, ছোট গিরিহার কাজ এই তো সবে শুরু হয়েছে! কাজ ফুরোতে না ফুরোতেই লোকে আবার এসে কাজের জন্য যাচাযাচি করছে—এসব ফেলে রেখে এখনই তাদের যাওয়া হবে না। নুকুর মুখের উপর স্পষ্ট বলে দিয়েছিল গুরভা। তাছাড়া নুকুর উপর মনে মনে

চটেও আছে গুরভা। —সে কেন এল বড়খাঁকড়ি হাই ইস্কুলের ঐ মাষ্টারটার সঙ্গে? আমাদের জাতের নিয়ম-কানুন সব উঠে গেছে নাকি? রাইবু নেই তো লোধাপাড়ার লোধাসমাজের সব রীত্-নীত্ উঠিয়ে দিতে হবে নাকি? রাইবু থাকলে এসব কী মেনে নিত মুখ বুজে? মনে নেই? মনে নেই— নামাল খাটতে যাবার কথা বলতে এসে কী হেনস্থাটাই না হয়েছিল বসন্ত কামিল্লার? 'দূর্ দূর্' করে চ্যালাকাঠ নিয়ে মারতে তেড়ে উঠবে না তাকে? সাবিত্রী-সন্তোষের কথা কী মনে নেই? চিহড়লতায় বেঁধে রেখে সেরাতে—

তার চোখের সাক্ষাতে আসতে পারত ঐ পর-পুরুষের সঙ্গে ভুবনার ফুলটুসুয়ার লিখা-পড়া-জানা 'মেইয়া'টা? বেজাত-কুজাতকে ঘরের ভিতরে হাতে ধরে টেনে আনা— মনে মনে রাগে জ্বলে উঠেছিল গুরভাও। 'ফটো খিঁচা' থেকে বিরক্তিতে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল সে। ফের যদি লোকটা তার দিকে ক্যামেরা তাক করত তবে 'ফটো-খিঁচা-যন্তর' হিঁচড়ে টেনে নিত না গুরভা?

ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা তো কিছুতেই নুকুর কথায় ফিরে যেতে রাজি হল না। এমন এমন যে শতুরা, যে কী না বাদনা পরবে মদ খেয়ে লোধাপাড়ার কুল্‌হিময় নুকুরই লেখা গীতটায় সুর দিয়ে গেয়ে বেড়িয়েছিল— "দরখুলির জঙলে কপ্‌তি-গুঁড়ুর পাখ ডাকে— চল্ রানী চল্ মুনু পা ফেলাঞে একসঙে"—সেও নুকুর মুখের উপর বলে দিল, নারে মা, আর কটা দিন যাক।

যাবার আগে নীলেশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল নুকু। অপেক্ষা করছিল তার ফিরে আসার। নামাল খাটতে এসে নাকি কাজকাম ছেড়ে হুটমুট এদিক-ওদিকে চলে যাচ্ছিল নীলু। তবে যেখানেই যাক সে তো ফিরে আসে বেলা ডুবলেই। আজ এলো না কেন? তার অনুপস্থিতিতে যেন কত কথাই না-বলা থেকে গেল নুকুর!

হাড়িয়া-লাইবুকা-নাকফুড়রিরা নীলেশ্বরেরই চেলা। তারা তেমন আমল দেয়নি নুকুকে। কে নুকু? কেন নুকুর কথায় তাদে ফিরে যেতে হবে এখনই? এসেছে তো স্ব-ইচ্ছায়। কেউ তাদের ধরে-বেঁধে নিয়ে আসেনি। এখন যেতে হয় যদি তো স্ব-ইচ্ছাতেই যাবে। নচেৎ হাতে ধরে টানলেও যাবে না। হার্‌গিজ না!

অদ্বৈত-নীলিমা খানিক থম্ হয়ে বসেছিল বারান্দায়। হাল-চাল দেখছিল। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের ভিতর যুক্তি-পরামর্শ করে নেমে এসেছিল নিচে।

এসেই হাঁক-ডাক, কাঁইরে শত্রুঘ্ন, কাঁইরে চন্দ্রবদনী, বিড়া কটা খরখর পিটি পকা, নাহানে সবু ত ভিজি যিব। দেখচুনি পশ্চিমে মেঘ ধরুচি— যিদি জলঝড় হেই যায়!

পশ্চিমে সত্যি সত্যি মেঘ ঝিলিক দিচ্ছে, জল-ঝড় হতে পারে। তার আগেই ধান ঝেড়ে যদি বস্তা বন্দী করা যায়! তাই এত তাড়া অদ্বৈতর। আসলে তা নয়, 'কে একজন এসেছে' তাকে নিয়ে নামালিয়াদের এত ফূর্তি-ফর্তা কাজের ক্ষতি করে—কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না সে।

কিরে ঢের হউচি, এবার উঠি পড়!

বলে উঠল অসভ্যের মতো।

বলেই তার চোখ পড়ে গেল আদিত্যর দিকে। লোকটা চেয়ার পেতে মেসিনঘরের বারান্দায় বসে আছে। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি সে আদিত্যর সঙ্গে। না বললে অভদ্রতা হয়, সে যে-ই হোক বাড়ি বয়ে এসেছে।

উঁ-হু, সে কথা বলতে চায় এম্নি এম্নি কী আর, জানার জন্যই লোকটার আসল মতলবটা। ভুজুং-ভাজাং দিয়ে নামালিয়াদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় কী না সে!

তাই যদি হয় তবে তো মহা ফাঁপরে পড়ে যাবে অদ্বৈত-শ্রীমন্তরা। শুধু অদ্বৈত-শ্রীমন্ত কেন, আরো যাদের কাজ করে দেয়ার কথা আছে তারাও।

নামালিয়া, নামালিয়া।

যদি নামাল খাটতে না-ই আসে নামালিয়ারা, তবে পুবাল দেশের এত বাঘমারী পড়িয়া চিড়িয়ামারী পড়িয়া দক্ষিণের বিল-উত্তরের বিল পুবের বিল-পশ্চিমের বিল চাষাবাদের কাজ তুলে দেবে কারা?

রোয়ার সময় রোয়া, কাড়হানের সময় কাড়হান, কাটার সময় কাটা—এত কাজ নামালিয়ারা না হলে কী তুলে দেবে কুলিদা-মুলিদা-ভিঙ্গিগেড়িয়া-পানিতুনিয়ার কাকমারা আড়িশা ধাকুড় ধুমারা?

অদ্বৈত দেখেছে বুড়োর চায়ের দোকানের কাছে একটা মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে লোকটা একা আসেনি, তার সঙ্গে এসেছে একদঙ্গল ছেলে-ছোকরা, মেয়েও আছে কয়েকটা।

স্যার, কোত্থেকে আসছেন?

মেদিনীপুর।

ট্যুরে বুঝি?

ঘাড় নাড়ল আদিত্য।

চায়ের দোকানের কাছে মিনিবাসটা, আপনাদের?

ফের ঘাড় নাড়ল আদিত্য।

তার মন খারাপ, ক্যামেরায় ছবি ওঠেনি একটাও।

ট্যুর, মিনিবাস—খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিল অদ্বৈত। তারপরেই বলেছিল, মনে কিছু করবেন না স্যার, একটা কথা জানতে চাইছি—

হ্যাঁ, বলুন না!

ঝুলন্ত হাতাটা গুটিয়ে নিয়েছিল আদিত্য।

এইসব আফুয়া কুলি-কামিনদের সঙ্গে আপনার কী?

প্রথমে বিরক্তই হয়েছিল আদিত্য, পরে হাসতে হাসতে সব বৃত্তান্তই বলল। এও জানাতে ভুলল না—আজ যে আপনার চালাঘরে এসেছে সে একটা 'জিনিয়াস'—

অদ্বৈত শুনে-টুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, অ।

কে জানে মনে মনে বলল কী না, "হীরার ব্যাটা হীরা, উদ্ খাইতে ক্ষুদ নাই কলমিশাকে জিরা।"

তবে আতিথেয়তার জন্য অবশ্যই বলল, বাড়ি বয়ে যখন এসেছেন স্যার, এক কাপ চা খেয়ে যান অন্তত—কাঁই রে কচি, ভিতর ঘরকু যা, তোর বউদিকে খল্ল খর—

না, না—চা এই তো খেয়ে এলাম দোকানে!

চা ছেড়ে এবার আলাপে মন দিল অদ্বৈত। বলল, ট্যুরিং পাটি যখন যান না—

অদ্বৈত দু-চাট্টা জায়গার নাম করল ধারে-কাছের। সে বলেছিল, এই তো ঘরের ধারে চৌদুনিয়ায় একটা দ্রষ্টব্য স্থান আছে, যান না ঘুরে আসুন স্যার।

চৌদুনিয়া, চৌদুনিয়া।

সাতদেউলার পরে পরেই চৌদুনিয়া। যেন সাত একে সাত সাত দু-গুনে চৌদ্দ, ধারাপাতের নামতার মতো। অদ্বৈতর কথা অনুসারে চৌদুনিয়া গ্রামে দু-দুটো সুবিশাল প্রান্তর আছে—'বাঘমারী পড়িয়া' আর 'চিড়িয়ামারী পড়িয়া'। একদা ঘন জঙ্গল বাঘেদের আবাস, অধুনা 'পড়িয়ার বিল'।

তো 'চিড়িয়ামারী পড়িয়া' নিয়েই অদ্বৈতর সুলুক সন্ধান। তার মতে— কে বলতে পারে 'চিড়িয়ামারী পড়িয়ায়' রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খননকার্য চালালে সাতদেউলা তো সাতদেউলা মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার মতো একটা কিছু সভ্যতা-টভ্যতা পাওয়া যাবে না? যেখানকার একটা মাছখেকো বকও কী না শিকারী ডাঁহাবাজ বাজপাখীকে মেরে ফেলে!

চৌদুনিয়ার জঙ্গলে শিকারে এসেছিল উৎকলের 'রনঝাঁপেরা'। 'রনঝাঁপ' তার মানে রনঝম্প ব্যাধেরা। তাদের সঙ্গে ছিল তীরধনুক, শিকারী তিতির-বাজ। ভয়ঙ্কর বাজেদের শিস্ দিয়ে ছেড়ে দিলেই নিমেষে ধারালো ঠোঁটে আর ডানার দাপটে কাবু করে ফেলে 'শিকার'কে।

শিকার করতে করতে একদা ক্লান্ত রনঝাঁপ সর্দার কাঁধে বাজপাখিকে বসিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল এক সরোবরের তীরে গাছতলে। জলাশয়ের ধারে একটাই মাত্র বক তার লম্বা ঠোঁটে খুঁটে খাচ্ছিল চানা-চুনো মাছ। হঠাৎ কী খেয়ালে সর্দার শিস্ দিয়ে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল তার শিকারী বাজপাখিকে। সে এক ভয়ঙ্কর বাজ! কিন্তু হলে কী হবে, এর আগে আগে যে কী না নিমেষে কাৎ করে ফেলেছে শ'য়ে শ'য়ে রকমারি চিড়িয়াকে, সেই কী না সেদিন বকের লম্বা ঠোঁটের আঘাতে চিৎপাত হয়ে উল্টে পড়ল! প্রাণ দিল বেঘোরে!

কাহিনী শুনে অবাক-আশ্চর্য হয়ে গেল আদিত্যও।

অদ্বৈত বলল, বল্‌নে বিশ্বাস করবেন নি— রনঝাঁপরা অখনও আছেন! বে-খেয়ালে ওড়িয়া বলে ফেলেছিল অদ্বৈত পৈড়্যা। শুধরে নিয়ে বলল, আছেন মানে তাঁরাই তো এখন কাজলাগড়ের জমিদার—কাজলাগড়ের নাম শোনেন নি স্যার? এই কাজলাগড়েই তো বসে "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরি বসুন্ধরা"র কবি ডি.এল.রায় 'সাজাহান' নাটকের ঐ গানটি লিখেছিলেন— ঐ যে "আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি—"

বলতে পেরে গর্ব বোধ করল অদ্বৈত, এক ফাঁকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরী বউ নীলিমার দিকেও খানিক তাকিয়ে নিল বুক ফুলিয়ে।

আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল আদিত্যও। তার মনজুড়ে তখন অতীত স্মৃতিময়তা—সমুদ্র তীববর্তী এই দেশ থেকে সেই কবে ম্লেচ্ছরা গিয়েছিল দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে কুরুক্ষেত্রে, কবে প্লিনি-টলেমি এই দেশ 'তালুক্তি' বা 'তমালিতেস'-কে নিয়ে লিখেছিল বিবরণ, কবে এসেছিল তাম্রলিপ্তে অশোক পুত্র মহেন্দ্র কন্যা সংঘমিত্রাকে বোধিদ্রুমের ডাল হাতে দিয়ে সিংহল যাত্রায় 'সী অফ' করতে, কালিদাসের কালে রাজা রঘু সুহ্মপ্রদেশ জয় করে এইদেশের উপর দিয়ে সেই কবে গিয়েছিল 'কপিশা' বা কংসাবতী পেরিয়ে উৎকলে, কবে যে 'তান-মাই'-য়ে পায়ে হেঁটে এসেছিল ফা-হিয়েন হিউয়েনসাঙ, তখনও কী এদেশে ডেঁউশগাছে গাছে পাকা ডেঁউশ ম-ম করত, তখনও কী বাজপাখি বককে শিকার করতে এলে উল্টে বক-ই মেরে ফেলত বাজপাখিকে, রাজা শশাঙ্ক যখন অতবড় শরশঙ্কা দীঘি খনন করল এদেশে তখনও কী মাটির তলা থেকে উঠে আসেনি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ফেলে দেওয়া সেই পাঞ্চজন্য, মোঘলমারী-সাতদেউলায় তো উঠে এসেছে আকছার বৌদ্ধমূর্তি ভাঙা দেবদেবী পোড়া ইট সিংহ-বৃষ-চলন্ত মৃগ, কে জানে কবে খুর্‌রম এসে কাটিয়ে গেল নারায়নগড়ে, সাগরপুর-নুটিবেড়-রাধাপুর-এগরার লাগোয়া নেগুয়া মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সদ্য আসা বঙ্কিমের চাঁদপুরের বাঙলোয় নিশীথে কে এসে করাঘাত করে যায়, কপালকুণ্ডলা না কাপালিক, কখন নিভৃতে চৌদুনিয়ায় কানুনগো ডি.এল রায় ক্যাম্প থেকে ফিরে ঝরে পড়া বকুল দিয়ে স্ত্রী সুরবালার সারাদিনের গাঁথা মালা গলায় পরে লিখে ফেলে—"আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি"—

নীলেশ্বরের ফিরে আসার অপেক্ষায় আর না থেকে নুকু ওরফে লক্ষ্মীরানী ফিরে চলল। সবেগে বামনদা ছেড়ে গেল তাদের মিনিবাস।

তারা চলে গেল। কিন্তু চিন্তায় রেখে গেল অদ্বৈতদের। এমন একটা দিন তো আসবেই যখন নামালিয়ারা আর এদিকে আসবে না। ঘরের ধারেই খাটবে-খুটবে, কাজ পেয়ে যাবে সরকারী বে-সরকারী। তখন কী করে যে চাষের কাজ তুলবে অদ্বৈতরা। ধারে কাছে কুলি-কামিন আর কই? যাও বা আছে সংখ্যায় অল্প। তার উপর তাদেরও খেতি-খামার আছে, বেশিরভাগ তো মাস-মাইনেতে ঢুকে গেছে মিলে, ইটভাটায়।

নীলিমা বলল, চিন্তা ছাড়ি দও। নামাল খাটতি এই দিয়ার নামালিয়ারা আসবই। কথার অছি—উঠলা বাই ত কটক যাই। তারমনকার স্বভাবর অছি ঘুরিঘুরি বুলা—

তা ঠিক। লোকগুলো হা-ঘরে, ঘর-ঘর করে বটে, তবে ঐ ঘরই খুঁজে মরে আজীবন, পেয়েও ঘর করে না। ঐ পরের ঘরেই কাজ করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

অদ্বৈত বলল, নীলি কহুচ ঠিক, তারমনকার স্বভাবর অছি ঘুরি ঘুরি বুলা— সোউ বলে না 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'? একবার যিদি নেশা ধরি যায় ত বছর-কু-বছর না আসি পারব নি।

নামালিয়াদের অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই এখন অদ্বৈতদের বলা-ভরসা। ফের খামারে নেমে হৈ চৈ শুরু করে দিল অদ্বৈত। হিঁয়াকা মাটি উঁহা। একধারের বিড়া হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেল ওধারে।

মনে মনে ভাবনা— সবই তো ঠিক আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঐ মাষ্টারের মতো দু-চাট্টা লোকজন—তারাই তো খেপিয়ে তোলে, কুমন্ত্রনা দেয় নামালিয়াদের ভিতর অল্প হলেও লেখাপড়াজানা দুয়েকটা ছেলেমেয়েকে।

আজ যেমন। মেয়েটা এসেছিল ফুসলিয়ে ফেরৎ নিয়ে যেতে গোটা দলটাকে। পারল না, হেরে তো গেল।

উল্লসিত অদ্বৈত চালাঘরে এসে উঁকি মেরে বলল, কাঁইরে চন্দ্রবদনী, আজ কী তরকারি হেলা? তোর গিরিহানী শুকামাছ দেইচি না ন-দেইচি? শুকা-তেন্তুলি দেই টক করিচু ত?

হঁ গিরিহা।

আউ কি?

আলু-পুঁইমেচড়ি।

খাসা হেইচি, খা।

হঁ-অ।

খাইকি টিভি দেখবু ত আয়।

বিনোদনের উপকরণ মজুত রাখতে হয় বৈকি, নচেৎ পরের দিন সে কাজ করবার রসদ কোত্থেকে পায়। ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা টিভির কথায় তো নেচে উঠল। তাদের ভিতর পড়ে গেল সোরগোল। শুধু আজ বলে নয় গিরিহার ঘরে এক 'পাঁতায়' বসে তারা তো টিভি দেখেছে আগেও।

গুরুভার বউ শরাবণের বউ আদরী-ভাদরীরা ঘরের ভিতর যেতে সাহস করে না, তারা দূর থেকে খলায় বসে 'নীল' আলোর ঝল্‌কানি দেখে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলে ওঠে, বাস রে। কী আলো। ঐ আলোই, আর কিছু মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না।

কিন্তু সাফা ছুনার মা লাদনগাড়িয়ার 'বিটিছুনা' আলোর ছেেঁ দেখে অত সহজে ভোলে না। সে এক পা এক পা করে একদিন-প্রতিদিন এগোয়, গাদাগাদি করে লোকের মাথাগুলো দেখে। ছবিটা পুরা হয় না, পুরো সে বুঝতে পারে না, ঝপ্ করে সরে যায় ছবিটা। ফের

গোড়া থেকে সে শুরু করতে চায়, আর হয় না। কেবলই ভেঙে যায়, কেবলই ভাঙে।

আজ সে ঠিক করেছে যে করেই হোক ছেমড়িদের সঙ্গে এক পাঁতাতেই বসবে। গিরিহা-গিরিহানী তাকে না-করবে না।

গুরুভার বউয়ের আবার অতটা পোষায় না, সে বরঞ্চ গিরিহানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, চোখের দু'পাতা কখনো এক করবে না। কিন্তু টি.ভির দিকে, ঐ 'লীল' আলোর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে না থাকতেই দু'চোখের পাতা নিমেষে এক হয়ে যাবে তার, সে ঘুমে ঢুলে পড়বে।

তাই সে যেতে চাইলেও ছেমড়িরা তাকে নিতে চাইবে না। খোঁটা দিয়ে বলবে, হঁ-অ খাল্লি ত ঢুল্লে পড়িস নিদেঁ! অমন সুন্দর বিছ্না পাতা আছে নিদাঁবি ত ইখানেই নিদাঁ ন মার, টিভি দেখে ওর কাজ নাই আর।

গুরভার বউ যাবে না, সে বরঞ্চ সদ্য 'টেনক' হয়ে ওঠা অসুস্থ গুরভার কাছেই বসে থাকবে। একটানা বকর বকর করে চলবে— আজ সকাল থেকে ধর্মের জল আনতে গিয়ে সে কী দেখতে কী দেখে ফেলেছে।

গুরকুঁদা বড় মুখ করে তাকে জানিয়ে দিয়েছে ধর্মের কল থেকে জল আনতে যাবার দরকার ছিল না, তার ঝাড়ফুঁকেই গুরভা উঠে বসেছে, 'টেনক হয়ে' হাঁটা-চলা করছে।

হয়ত তাই, আবার তাই নয়— কে জানে কী? ভুবনার মেয়েটা চলে যাবার পরে খানিক গুম হয়ে বসে থাকল গুরভা।

তার মাথায় শতেক চিন্তা, রাইবু নেই, এর পরে কী দশা হবে লোধাপাড়ার? গুড়খার বেটা নীলুয়াটা তো একতন্ত্রের, ফুলটুসুয়ার 'মেইয়া' নুকুটা গুড়খার বহিন সাবির মতো বেজাত-কুজাতে মজেছে। রাইবুর বিহনে এখন গুরভাই তো মাতব্বর। সেই জোরেই তো আজ শতুরার বউয়ের 'নাইকুণ্ডলে' মাটি থাপতে গিয়েছিল সে। আছড়ে তাকে.ফেলে দেবে না লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা?

সেই রাগও মন থেকে মুছে যায়নি এখনও। কিন্তু লোধাদের 'গোঁসাঘর' ঠাকুরবাঁধ আর এখানে সে পাবে কোথায়! পাঁড়কাকপ্তি-ক্যারকেটা-জলপিপি না হোক, ঝুঁজকো সাঁঝবেলায় কয়েকটা কুঁড়বক, গরুর গায়ের 'কেতর' খুঁটে খাওয়া ধব্‌লা বক বাদুড়-চামচিকা গিরিহার পোখরি-আড়ায় ঝাঁকড়া গাছপালায় অনবরত কৈ-কচালি করে চলেছে আর মাকু টানছে।

চালাঘরের পিছনে ঐ 'গোঁসাঘরেই' ঢুকে গেল গুরভা। পিছনে পিছনে গেল গুরভার বউ।

খেয়েদেয়ে তড়িঘড়ি টি.ভি দেখতে গিরিহার ঘরের দিকে চলল হল্লা করে ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। শতুরার বউ নিয়তি যাবে একটু পরে লুকিয়ে লুকিয়ে।

আশপাশের দুয়েকটা হাটুয়াঘর থেকেও টি.ভি দেখতে আসে ভুটকী-পুনোইদের সমবয়সী মেয়েরা। অঞ্জনা না খঞ্জনা সবিতা না কবিতা—কী যেন তাদের নাম। তবে তাদের বসবার লাইন আলাদা।

গুরুবারি-চাঁদবদনীরা দেখেছে সকাল-বিকাল কখনো কখনো তারা তাদের ঘরের নাচ-দুয়ারে কোলে-কাঁখে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে একপা তুলে 'হুঁটে হুঁটে' কী সব বলে 'ফুডু-মুডু' 'গলা-মলা' করে। কোলের শিশুকে গাছ দেখায় পাখি দেখায়—

একটা-আধটা তো শুনে শুনে তাদেরও মুখস্থ। ঐ যে, "টুক মাউসি, টুক মাউসি তু যা মু যাউছি— নদীকু গলা, পানি পিইলা ফুড়ুই করলা উড়ি গ-অ-লা।।"

কতদিন পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদ্‌নীরা গোল হয়ে কাঁধ জড়াজড়ি করে চালাঘরে ধানবিলে ঐ কথাগুলো তাদের মতোই আউড়েছে আর পেট খুলে হেসেছে!

সামনের 'পাঁতায়' বসা অঞ্জনা-সবিতাদের সারি সারি পিঠ দেখে পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীদের কী আর মনে পড়েনি— 'টুক মাউসি টুক মাউসি'—? ফিস্ ফিস্ করে তারা কী আর বলেনি— 'ফুডুই করলা উড়ি গ-অ-লা'?

অঞ্জনা-সবিতারা মাঝে মাঝে পিছন ফিরে কটমট করে তাকায়, কখনো-সখনো মুখে একহাতের কব্জি চাপা দিয়ে হাসে। কেন যে হাসে!

মেসিন-ঘরের দু'চারজন, তারমধ্যে সেই ম্যানেজার লোকটাও, খবর শোনার অছিলায় আগেভাগেই গিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে।

তাদের সঙ্গে গিরিহানী কখনো একটানা বসে ছবি দেখেনি, সে হয়ত দেখে রাতের দিকে তার বরের সঙ্গে। তবে মাঝে মাঝে এসে পিঠে শাড়ির আঁচলা ফেলে ঝুঁকে পড়ে কী যেন খুঁজে যায়! 'গেহলী বহু'র তখনও কী আর দু'ঠোঁট বুজে থাকে? বিড়বিড় করে কী আর 'রোদন' বলেনি—"নদী সেপারে কি বাজিলা তুরী মাগো। ঝিঅ গলা বলি আইলা হুরি মাগো"—?

গিরিহা-গিরিহানীর ছেলে-মেয়ে দুটো দোতলার ঘরে পড়তে বসে, সাঁঝ-সকাল তাদের মাষ্টার আসে পড়াতে। সময় সময় তারা হুটোপুটি করে নেমে আসে নিচে। এসেই টিভির 'নব্' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী সব করে! কেউ তাদের বাধা দেয় না। দিলেও শুনছে কী না!

যেতে যেতে ভুটকী আহলাদে বলে, আজ টিভি কাল ভিডিও— হেঁ ন?

কুথায়?

কেন্নে, মাড়োতলে। জান্‌নিস নাই— আজ বাদ কাল শীত্‌লাপূজা। 'যাত' বসবে।

হুঁ, তাইত।

গিরিহা বলেছে— কালকে একবেলা কাম আড়বেলাকে ছুটি—

ছুটি, ছুটি।

লাইবুকা-সুরুয়া-হাড়িয়া-নাকফুড়রিদের আবার অত ফূর্তি নেই, তারা গিরিহার ঘরের ভিতর যেতেও সাহস করে না, টিভি দেখা তো দূর অস্ত্!

ঐ বড়জোর হাটতলার চায়ের দোকান, নচেৎ ধানকুটা মেসিনঘরের বারান্দা, চালাঘরের ভিতর তো সব বুড়ো-হাবড়ারা।

এ তো আর লোধাপাড়া না। এদিকে মাঝুডুব্কা ওদিকে তপোবন, মাঝে দোরখুলি। লোধাপাড়া, লোধাপাড়া। একটু দূরে বুলান-মগরা-হদহদির ওধারে রুখনীমারা-মুঢ়াকাটির মাহাতোদের গ্রাম। শেঁ-শেঁ করে বুলান-হদহদির ধানবিলে যখন সন্ধ্যা নামে, মগরার জলে খল্‌বল্ করে ওঠে চ্যাঙ-গোড়ুই, ঝিলিমিলি চাঁদের আলোয় রুখনীমারা-মুঢ়াকাটির মোরাম রাস্তায় সর্ সর্ করে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতেও যখন থমকে থেমে পড়ে সাইকেলিয়া, হি-হি ঠাণ্ডায় কুমহারপাড়ায় যখন 'আঁথোল-পিটনায়' পাথরে ন্যাতা বুলিয়ে ঢাব্-ঢুব্ সারারাত 'ভেঁইচা'কে পিটে পিটে হাঁড়ি-কুঁদা বানায় কুম্হাররা, যখন খালধারে দখিনসোলের বিলে-বাতানে শিয়াল-ভুঁড়া শিয়ালরা কাঁকড়া খুঁজতে বেরিয়ে শীতে 'হু-উ-উ-উ-উ' করে হুরি করে, তখন খালি গায়ে 'জাড়' তাড়াতে, দেহে উত্তাপ আনতেই লোধা হা-হানারা চ্যাঙড়ারা 'চাঙু' বাজিয়ে বন্দনা করে—

এহি বাটে আসুছন্তি গাঁয়ের বড়াম
উত্তর-দক্ষিণ-পূরব-পশ্চিম—আহে-
তার নামে সজিয়া যোগাই মুইরে
এহি বাটে আসুছন্তি মা যে শীতলা

রোগিনী-যুগিনী-বসন্তকুমারী-আহে-
তার নামে সঞ্জিয়া যোগাই মুইরে-

শুধু কী চ্যাঙড়ারা, ছা-ছানারা— মাঝে মাঝে বুড়ো-হাবড়ারাও দলে এসে ভিড় করে। রাইবু-শতুরা-গড়কুঁদা-গুড়গুড়িয়ারা। শত্রুঘ্নলোধার গলাটি ভালো, সে আবার গাইতে গাইতে নিজেরই 'রচে' ফেলা দু-চাট্টা লাইন কোন্‌ফাঁকে ঢুকিয়ে দেয়। সেই যেমন—

দুখ হরনীরে কালহরনীরে
দূর বনে পালাঞে যাব চল না রে—
কারর কন্দ খাই নাই
কারর লতা ছিঁড়ি নাই
খাই বনের পাতা—
তবু আসে নরসিঙা লিতে হামাদের মাথা—

লোধাপাড়া না থাক এখানে, লাইবুকা-হাড়িয়ারা মেসিনঘরের বারান্দায় বসে গেল 'চাঙু' নিয়ে। মনে আজ তাদের খানিক ফূর্তি এসেছে, নুকু এসেছিল ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে তাদের। পারেনি, মুখ চুন করে ফিরে গেছে সে।

নীলুয়া নেই, থাকলে হয়ত একটা ফাটা ফাটি কাণ্ড বেধে যেত নুকুব সঙ্গে। নীলুয়া নেই, থাকলে হয়ত এতক্ষণে সে হাটচালার চায়ের দোকানে আর নয়ত বামনদার ক্লাবঘরে। ফুটবল খেলায় 'এক্সপার্ট' নীলেশ্বরকে ক্লাবের ছেলেরা আবার খাতির করে 'গুরু' বলে।

গুরুই বটে নীলেশ্বর, হাড়িয়ারা ভাবে জানগুরুর মতো কত কী যে সে জানে। হুটহাট এদিক-সেদিক বেরিয়ে কত কী খবরই যে সে বয়ে আনে! কোথায় কোন্ লোধাদের গ্রাম খুঁজে খুঁজে কাঁকোই না মামনসায় পাতিয়ে আসে 'স্যাঙাত', কোথায় ইল্লি কাঁধে পার্টি অফিসে গিয়ে দরবার করে আসে অসুস্থ নামালিয়াদের জন্য খাওয়া খরচ, কোথায় বেনাড়ুবি না শঙ্করীডাঙায় কবেকার ইস্কুলের বন্ধুর খোঁজে একাএকাই সে বেরিয়ে যায়— শিখে আসে কতরকম তুক-গুণ-ম্যাজিক—

থাকলে এতক্ষণে সেসব গল্পে রাত ভোর করে ছাড়ত না নীলেশ্বর? নীলেশ্বর, নীলেশ্বর।

নীলেশ্বর নেই, হাড়িয়া-লাইবুকা-নাকফুড়রিরাও কেমন যেন ছাড়া ছাড়া। তার উপর ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীরাও 'ডেমক' দেখিয়ে চলে গেল গিরিহার ঘরে টিভি দেখতে। 'শুধা-শুধাই' হাতে তালি মেরে নাকফুড়রি বলল, আজ আর নীলুয়া আসছে নাই লাইবুকা, বেড়ে ফাঁকা লাগছে—চাঙটা নামা।

চাঙুটা ঝুলিয়ে রাখা আছে চালাঘরের 'বাতায়'। এখন গ্রীষ্মের কাল, চাঙুর চামড়া বেশ টান টানই আছে। বর্ষার মাস হলে চামড়া ঢিলে হয়ে যায়, আগুনে সেঁকে তবেই বাজাতে হয়, না হলে সুর আসে না ঠিকমতো।

লাইবুকার গলাটা পিঠা, 'ঘিন্ ঘিন্ তাক্‌তা' মুখে মুখেই বোল তুলে গুন গুন করে গাইতে গাইতে, "মাঘেতে মকর মিঠা কটুতলে সীম গো সজনী কান্ত বিনে কান্দে প্রাণে দিবসে" চাঙ আনতে চলল চালাঘরে, সে খুব 'হাউসি'।

নাকফুড়রি-হাড়িয়ারা আসর বসাতে থপাথপ মাটিতে ধুলোয়-মুলোয় বসে যাচ্ছে দেখে মেসিনঘরের লোকটা দরদ দেখিয়ে বলল, টিকে সবুর কর, পটিয়া পাতি দেইচি।

ধুলোবালিতে কেন বসবে, হেঁশের 'পাটিয়া' পেতে দিচ্ছে সে, সেখানেই আসর বসাক নামালিয়ারা। মেসিনঘরের বারান্দায় হ্যাজাকের আলো জ্বলছে গর্ গর্ করে।

আরোই উল্লসিত হয়ে উঠল চাঙ-পার্টিরা, ফুর্তিতে মেসিনঘরের লোকটার কাছেই চেয়ে বসল এক বাণ্ডিল বিড়ি।

দেনেঅলা লোকটা বলল, হুঁ হুঁ নাচা-গানা হউ আগে, বিড়ি কেনে সিগারেট দেমি।

বিড়ি-সিগারেট দিক বা না দিক, চাঙু নিয়ে বসে গেল লাইবুকা-হাড়িয়া-নাকফুড়রিরা। বসে বসে কী আর চাং তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তবে তারা প্রথমে বন্দনা করল ঐ বসে বসেই, "পরথমে বন্দনা করি আহে—"

দোয়ারকিরা ধুয়ো দিল, "আহে গুরু বন্দিতে বন্দিলি। আহে গুরু বন্দিতে বন্দিলি।।"

সাকুল্যে চারজন, দু-দুটো 'চাঙু'। একটা হাড়িয়ার হাতে আরেকটা নাকফুড়রির। বাঁ হাতে ধরে চাঙুর চামড়ায় ডান হাতের আঙুল দিয়ে কুড় মুড়। তাতেই বাজনার তালে তালে চাঙুর কাঠে তার দিয়ে বাঁধা ঘুঙুরের তাই ঘুনাঘুন—

আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নাকফুড়রি, চাঙু বাজাতে বাজাতে গোলাকারে একপাক ঘুরে এল সে। ততক্ষণে চালাঘরের 'ছামুতে' খুঁটিতে হেলান দিয়ে আঁচলায় ঠোঁট চাপা উদগত হাসি লুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আদরি-ভাদরিরা।

বাজনা থামতে না থামতেই উঠে দাঁড়াল লাইবুকাও। শাড়ি পরে ঘোমটা দেয়ার নকল ভঙ্গি করে ঘন ঘন আঁচলা উড়িয়ে 'নুইয়ে-নুইয়ে' মেয়েদের গলায় গাইতে থাকল—

"চাঁদ-অ উপরে যেমন
চাঁদ দিছে দেখা হে
চাঁদ দিছে দেখা।
এহি জুহি জাহি চাম্পা
বামে আছে বান্ধা
চৌদিকে ভমরা চলুক ঝাঁকে
'ও দূতী গো ওরূপ দেখ-অ না
কদম্বতরু মূলে।।"

এতক্ষণ দোয়ারকিরা চুপ মেরে লাইবুকার আড়ঙ-ভড়ঙ দেখছিল, গানের কলি শেষ হতেই 'আ-হা আ-হা' করে সমস্বরে ধুয়ো ধরল, "কদম্বতকমূলে আহে, কদম্ব তরুমূলে আহে—"

কেউ কেউ ফিস ফিস করল, কঠিন গান বঠে, টুকচার লরম দেখে ধর না ক্যানে লাইবুকা।

মেসিনঘরের লোকটা কিন্তু হেঁশের পাটিয়ায় এক প্যাকেট সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে দীলদরিয়া মেজাজে বলে উঠল, বেশ গাউচু, কী সোন্দর কথা— "ও দূতী গো ওরূপ দেখ-অ না কদম্বতরু মূলে"—

বলেই সে নিজের জানা দু'পদ আউড়ে দিল—
"যমুনার জলকে যাতে শ্যাম দাঁড়ায় কদম্বতলে
ও তার রূপ মনে করি, হেরিতে না পারি
গুমরি গুমরি করি রোদন
মনের আশা কবে হবে গো মিলন।
সে লম্পটটার সনে নিধু বৃন্দাবনে
কবে হবে যুগল মিলন।।"

ও হৈ বেশ বেশ! বলে হাড়িয়া-নাকফুড়রি-সুরুয়ারা এমন কী লাইবুকাও ধুয়ো ধরল, "আহে কবে হবে যুগল মিলন, আ হে কবে হবে যুগল মিলন।"

রাত হচ্ছে, রাত বাড়ছে। বামনদার চৌহদ্দিতে রাত ক্রমশ ঘন হচ্ছে। ঘন, ঘন। ধানবিলে একনাগাড়ে কোমর নুইয়ে নুইয়ে ধান কাটার যা ধকল! অদ্বৈত পৈড়্যার চালাঘরের অন্ধকারে হেঁশের বিছানায় কেউ কেউ এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কেউ তো 'জাগর' থেকে চালাঘরের ছামুতে দাঁড়িয়ে ছ-ছনা চ্যাঙড়া-ম্যাঙড়াদের 'হাউস' দেখছে। গুরভা গুরভার বউ এইরাতে অদ্বৈতর পোখরি-আড়ার নিম-কুকশিমা-ডাব-করঞ্জ-কালকাসুন্দির জঙ্গলে খুঁজে নিয়েছে যে যার সে তার মতো লোধাঝোড়! ওদিকে অদ্বৈতর ঘরের ভিতর গাঁক গাঁক করে টিভি চলছে। টিভির সামনে আশপাশের হাটুয়াঘরের অঞ্জনা-সবিতাদের সঙ্গে 'আগুপিছু' বসে টিভি দেখছে ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। আজ বাদ কাল শীতলামাড়োতলায় গাওনা হবে 'শীতলামঙ্গল' যাত্রাপালা, তার ফাইনাল রিহার্সেল চলছে পুলিনদাশের আখড়ায়। বিরাট রাজার পাটরানী সুদেষ্ণার 'রোদন' আছে একজায়গায়। কিন্তু রোদন করতে বসার ভঙ্গিটাই ঠিক হচ্ছে না। রানীর 'রোল' যে করছে সে এসেছে দীঘার রামনগর থেকে, ভাড়াটিয়া আর্টিস্ট। 'শুন শুন প্রাণকান্ত মোর উত্তর, কান্ত গো মোর উত্তর" বলে রোদন শুরু করলেও হাঁই হাঁই করে উঠছে পুলিন দাশ, বলে, হচ্ছে না। মাড়োতলায় সাজো সাজো রব, বাঁধা হচ্ছে প্যান্ডেল, মেলার দোকানীরা যে যার দোকানঘর সাজাতে ব্যস্ত। এসেছে খড়, খড়ে মোড়া কাচের জিনিস, বাক্স-পেঁটারা, রসিদবই নিয়ে আদায়ে শশব্যস্ত মাড়োতলার কর্মকর্তারা। পাঁচরোলের জউপুতুল-হিংলিপুতুল-বৌপুতুলের দোকানী তো এসেইছে, এসেছে মঙ্গলামাড়োর বিখ্যাত ডাঙ-পুতুল নাচের দল 'মহামায়া পুতুল থিয়েটার' প্রোপ্রাইটার হরেকৃষ্ণ ঘোড়ই। তার দলে দুজন ফিমেল— কাল তারা নামাচ্ছে মেলায় 'মানভঞ্জন' আর 'নদের নিমাই'। বাঁশির বাজনদার অঙ্গদ ঘোড়ই বাঁশিতে মহড়ায় সুর তুলেছে—"আমার নিমাই যাবার কালে কোকিল কেন ডাকলি নারে....?" সে সুরের উথাল-পাথাল হাওয়া মাড়োতলার আলো অন্ধকারে নির্মীয়মান দোকানঘরের গলি-ঘুঁজিতে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে খড়মড়িয়ে চাট্টি শুকনো পাতাপত্তর উড়িয়ে ফুটন্ত দুধের কড়াইয়ে দুধ উথ্‌লিয়ে শন্‌ শন্‌ করে পাক খেতে খেতে যখন বামনদার হাটুয়াদের ঘরদোর ধানে ভরা খলা-খামার ডিঙিয়ে হামলে পড়ে অদ্বৈত পৈড়্যার হেঁসের বিছানাপাতা চালাঘরে তখন শত্রুঘ্নলোধা আর থাকতে না পেরে, "ঘিন্‌ ঘিন্‌ তাক্‌তা ঘিন্‌ ঘিন্‌ তাক্‌তা" হাতে তালি বাজাতে বাজাতে চাঙের আসরে নেমে পড়েই রঙের গান ধরে দেয়—

"আনুছি ফল নিয় কিনি গো সাঙাতুনী
আনুছি ফল নিয় কিনি।
আম-জাম-কদলী-কূল পিয়ারা-নারিকেল
দর করিন নিয় কিনি গো সাঙাতুনী
আনুছি ফল নিয় কিনি—"

কোথায় পড়ে আছে তপোবন-সুখজুড়ি-মাঝুড়ুবকা, কোথায় লই-লতির 'চের' খুঁজে খুঁজে আলু-তুণ্ডা 'তাড়া', ঢ্যামনা-গোঙ্গী-গোধির সন্ধানে ভোখলা পেটে লোধাঝোড় ভালুকঝোড় তন্নতন্ন হাঁটা, কোথায় কুড়্হার-বুড়িয়ায় কাঁচা শালগাছ কেটে নরসিঙার হাতে ধরা পড়ে পাঁচকাহিনা-চাঁদাবিলা বীট অফিসে চালান হয়ে যাওয়া, কোথায় পেট থেকে কথা বের করতে বড়দারোগার রুলের বাড়ি খুঁচিয়ে পাঁজরা ভেঙে দেওয়া, কোথায় শাবল-খন্তায় 'হিড়' কেটে ধোঁয়া দিয়ে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে গর্ত থেকে 'উন্দুর' বের করে তার চোখ-না-ফোটা লাল লাল বাচ্চাগুলোকে কাঁচায় চিবিয়ে খাওয়া কচ্‌মচ্‌, কোথায় এ-কাঁধে সে-কাঁধে ছ' ছ' বারোটা শালবল্লা নিয়ে রাত-ভিত নদীবালিতে মস্‌ মস্‌ হাঁটা, নদীপারে মহাজনের ঘরে গিয়ে বেচে দেওয়া

শালবল্লা চুরি করে ফের অন্যমহাজনকে ফন্দি করে সেরাতেই বেচে দেওয়া, কোথায় হাটে গিয়ে হাটুয়ালোকজনের কাছে 'জঙ্গলের রাজা' সাজা, কী কর—জিজ্ঞাসার উত্তরে বড়মুখ করে বলা, 'রাজত্বি', কোথায় পড়ে থাকল চিরসখা সীতানালার ঝিরিঝিরি পায়রা-চঁচরা জল, ভোখলা পেটে দু-আঁজলা খেয়ে নিলেই পেট ভরে যায়, কোথায় কচড়া-মহুলের বন, সাঁওতাল-ভুঁইয়া-ভূমিজ মেয়েদের সঙ্গে কুসুম-কচড়া কুড়োনো নিয়ে মারামারি, পোহাতারা না দেখে বেভুলে সাঁই সাঁই মাঝরাতে ঠেকা-পাছিয়া বগলে মহুল কুড়োতে বেরিয়ে আচম্বিত কালমুহা-কালপুরুষার হাবড়ে পড়ে যাওয়া, কোথায় পাথরডহরার লোকজন দৌড়ে এসে ঠেকা-পাছিয়া ভরতি সব মহুল কেড়ে নিয়ে বলবে, খুল্ শালি খুল্ কাপড়, কোথায় ইস্কুলের মাষ্টার ছেঁড়া ফ্রকের ফুটোয় ঝুন্‌ঝুনি বেতের ডগাল ঢুকিয়ে বুকের কুঁড়ি-কুসুমে সুড়সুড়ি দেবে, টঙস টঙস করে কোথায় ডুব্‌কা-ডুংরি-লাটা-পাটায় ভুড়ভড়িতলায় চিরোল চিরোল শুশনি-স্মরক্তি-বনপুঁই-চেঁকা-নাহাঙা শাক তুলবে, তা নয় কোথায় কোন্ পুবদেশে নামাল খাটতে এসে গিরিহার ঘরে হাটুয়ামেয়েদের সঙ্গে পা ছড়িয়ে বসে টিভি দেখছে, টিকিট কেটে ভিডিও দেখছে, বাইগন-শুকামাছ-তেন্তুলি দিয়ে রাঁধা তরকারির সঙ্গে মুঠো মুঠো শুকনো ভাত খেয়ে চালাঘরে হেঁশের বিছানায় খড়ের বালিশে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে, ফুর্তিতে মেসিনঘরের দাওয়ায় হেঁশের পাটিয়ায় আসর জমিয়ে হাটুয়াদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছে গান বাজাচ্ছে চাঙ—

এখানে সাঙাত ব্রহ্মা কুমার সাঙাতুনী ব্রহ্মকুমারী আর কোথায়, তবু হাতে যেন টাটকা ফল নিয়ে শত্রুঘ্নলোধা হলে-ঢলে গাইছে—"আনুচি ফল-অ নিয় কিনি গো সাঙাতুনী—"

দোয়ারকিরা আরো ফুর্তিতে ধুয়ো ধরল—"আনুচি ফল-অ নিয় কিনি গো সাঙাতুনী"—

চালাঘরের ছামুতে দাঁড়িয়ে থাকা লোধা বউড়ি-ঝিউড়িদের কী আর মনে পড়েছে না—চঁদরপুর-বড়োডাঙা-কিয়াঝরিয়ার হাটুয়াপাড়ায় কেঁদ-জাম-কুল-ভুড়রুর ঝুড়ি নিয়ে বেচতে যাওয়ার কথা? একেক গণ্ডা কেঁদ্ তো একেক আনা!— পৈসা নাই লিব-অ, পৈসা কী জলে ধুয়ে খাব— এক কাঠা চাউড় দে গিরিহানী!

চাল, চাল।

ঝুড়িতে পাতা গামছার উপর কাঠা উপুড় করে চাল ঢেলে দেয় গিরিহানী, বদলে গাছ-পাকা কেঁদ্ গণ্ডাগণ্ডা। সফেদার মতো চাপ দিয়ে ভেঙে কালো কালো 'মুজি' বেছে খাওয়া। খেতেও 'অম্রুতো'!

তা বলে কদলী-নাড়িয়েল?

হায় গ মাই, নাড়িয়েল গাছ কুথাও নাই, কদলীগাছ যাও বা আছে তপুবনের আশ্রমে, সে-আশ্রম কী আর আছে? সেই নিগমামন্দিল, সীতাধুনি, ভোগঘর—

সাধুবাবাও নাই, সে-আশ্রমও নাই, ভোগঘরের কপাট-জানলাও হাওয়া। কদলীগাছের থোড় পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছে হা-ঘরে লোধারাই। তবু—

তবু বলল কী না 'আনুছি কদলী নাড়িয়েল' শতুরা!

চালাঘরের ছামুতে দাঁড়িয়ে লোধাবউড়িঝিউড়িরা আঁচলে মুখ ঢেকে হাসে, কাঁধে হাত দিয়ে জরপ করে।

রাত বাড়ে, রাত বাড়তে থাকে চড় চড় করে। এতক্ষণে লাইবুকা ধরেছে—

"বসে থাকি পাশাপাশি
অকারণে গেল রাত্তি হে—
মন দিয়ে মন পাওয়া গেল না।
তুমি থাকো সাথে

ঝিকিমিকি রাতে—
মন দিয়ে মন পাওয়া গেল না।।”

লাইবুকাছোঁড়াও রঙের গীত কী কম জানে! তপোবনের 'মকর যাতে' ফি বছর গিয়ে মাহাতো-করণ-কুম্‌হার-কাম্‌হারদের কাছ থেকে এত কিছু শিখে এসেছে। আশায় আশায় থাকে বউড়ি-ঝিউড়িরা, লাইবুকা সেই রঙের গীতটা কখন ধরে, সেই যে সেই— “কুল্‌হি দিগের পিঁড়ায় বসে দুটি তারা গুনবি। আসছে লো তোর ভালোবাসা মিঠাই খালা ধরবি।। যে ছোঁড়ির মরদ নাই তার মন কেমন করে যে। উলটি-পালটি ছোঁড়ি করটে ঘুমায় রে।।”

মাড়োতলায় পূজা কমিটির মিটিং-এ যাবে অদ্বৈত। ডাকুয়া ডাক দিয়ে গেছে দু'বার। “এই যাচ্ছি যাব” করে ডাকুয়াকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে। বচ্ছরকার পূজা, যাবে বৈকি, যেতে তো হবেই।

কিন্তু খামারে ধান ঘরভরতি নামালিয়া হল-বলে সুন্দরী বউ দু-দুটো ফুটফুটে ছেলে-মেয়ে— এসব ঐশ্বর্য্য ছেড়ে যেন কিছুতেই বেরোতে পারছে না।

খামারে পিটা ধানগুলি পড়ে আছে এখনও, ঝাড়া ধানের বিড়া চাপা দিয়ে রেখেছে নামালিয়ারা। দিগন্তে মেঘের ঝিলিক, যদি বা আবহাওয়া রিপোর্টে ঝড় বৃষ্টির কোনো পূর্বাভাষ নেই, তবু—

খেয়ে-দেয়ে নামালিয়ারা জিরোচ্ছে, কেউ কেউ ভাত-ঘুমে ঢলে পড়েছে, তবু হেঁকে-ডেকে খলার ঝাড়া ধানগুলো তোলাতেই হবে গুদামে।

ঘর থেকে উঠোনে বেরিয়েই 'কাঁইরে-হাঁইরে' করতে যাবে অদ্বৈত, আর দেখে কী মেসিনঘরের দাওয়ায় নামালিয়া ছোঁড়ারা লাগিয়েছে বেশ— ধিত্‌কা ধিনা!

কেমন যেন 'উধাস' হয়ে গেল অদ্বৈতও। নামালিয়াদের হাঁক না পেড়ে সে হাঁক দিল নীলিমাকে।

নীলি, দৌড়ি আস, দেখি যাও— এরমেনকার কী আনন্দ। চ্যাচ্চেড়ি বজাই নাচুচি গাউচি!

চ্যাচ্চেড়ি বাজনা বাজিয়ে নাচছে গাইছে।

গাঁক গাঁক করে টিভি চলছে। চাঙ-বাজনার আওয়াজ একটু-আধটু কানে গেলেও তেমন আমল দেয়নি নীলিমা— নামালিয়াদের ভিতর তো এরকম হয়েই থাকে। অদ্বৈতর ডাক নীলিমা শুনতে পেল না।

নীলিমাকে সত্যি-সত্যি আসার জন্যই যে ডাক দিয়েছে অদ্বৈত— এমন নয়। বলতে হয় বলা।

খা-খামারে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে ধানবিড়া, ধানগাদা। চাপ চাপ অন্ধকার অলি-গলিতে। আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি অদ্বৈতর ঘরে।

চালাঘরের ওদিকটায় নামালিয়ারা, মেসিনঘরের ওপাশে চাঙ-পার্টিরা। ভিতর ঘরে টিভি দেখায় মত্ত নীলিমা-চাঁদবদনীরা। দোতলার নিরিবিলি এক ঘরে 'টিউটরের' কাছে পড়ায় ব্যস্ত পৈড়্যাদের ছেলেমেয়েরা। আলো সেখানে সেখানে। বাদবাকি অন্ধকার।

অন্ধকার, অন্ধকার।

টর্চ-হাতে অদ্বৈত বেরিয়ে আচমকা দেখল—নীলিমার মতোই ঢ্যাঙা, নীলিমারই শাড়ি-পরা। ও কে? কে ও?

টর্চ নিভিয়ে ফেলল অদ্বৈত। একবার জ্বেলেই। নীলিমা-নীলিমা বউটা চলন্ত টিভিঘরের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে। টর্চের আলো মুখ থেকে নিমেষে সরে যেতেই গিরিহাকে চিনতে পারল সে।

আর চিনতে পেরেই, গিরিহাকে বেরোতে দেখেই অন্ধকারে চুপিসাড়ে মিলিয়ে যেতে লাগল নিয়তি। বড়ো সুস্থির গতি তার, যেন এক্ষুণি হাতে ধরে তাকে ফের ফিরিয়ে আনবে গিরিহা।

অদ্বৈত দেখেই বুঝেছে—নামালিয়াদের ঢ্যাঙা বউটা, লক্ষ্মন না শত্রুঘ্নলোধার বউ, বাইরে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে টিভি দেখছিল সে।

একটু দৌড়ে অদ্বৈত তার হাত চেপে ধরল খপ্ করে।

চালি যাউচু কেনে? টিভি দেখবু ত ঘুরকু চ।

হ্যাঁ-এ-ও, বলেই হেসে আহ্লাদে গলে জল হয়ে গেল লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা। আজ আড়বেলায় এক পর-পুরুষ তার নাভিতে মাটি থাপছিল, আর এখন এই আরেক পুরুষ তার হাত ধরল!

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে আরেক হাত দিয়ে গিরিহার হাত ধরল নিয়তি, কেমন যেন রোঁয়া রোঁয়া!

ধাঁই করে মনে পড়ে গেল তার, অনেকদিন আগে সেই যে ভোর রাতে দরজায় ঠক্ ঠক্—

কে?

আমি শতুরা।

ঘুমের ঘোরেই আগড় খুলে শতুরাকে দেখে চমকে উঠে ফের বিছানায় দৌড়ে গিয়ে দেখল, আগের শতুরা এই এক চাঁখর একটা ঝুরকার ভিতর দিয়ে রুমরুম বেরিয়ে যাচ্ছে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে নিয়তি ধরতে গেল, দেখল, তার সারা গা রোঁয়া রোঁয়া—

ঘরের দিকে না গিয়ে বিড়াগাদার অন্ধকার ঘুপচীর দিকে নিয়ে যেতে যেতে "আমিই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব" এই ভঙ্গিতে লোধানীকে জড়িয়ে ধরে অদ্বৈত ফিস্ ফিস্ করে বলল, টিভি দেখবু ত আগে কহুনি কেনে? লুকি লুকি তোকে টিভি দেখতে হব কেনে, তু ত ঘরের লুক। যা না ঘরর ভিতর— কেমুন আরামসে চন্দ্রবদনী টিভি দেখতে বুস্‌সে।

নিয়তি তো ঘরের লোক, তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে টিভি দেখতে হবে কেন? যাক না সে ঘরের ভিতর, কেমন আরামে টিভি দেখতে বসে গেছে চাঁদবদনীরা!

তা ঘরের ভিতর না গিয়ে বিড়াগাদার ওদিকে কেন? আলোয় না এসে অন্ধকারে? তার উপর এত যত্নে এত আদরে আহ্লাদে নিয়তিলোধানীর মাথা ঘুরে গেছে, সে ভেবে পাচ্ছে না সে কী করবে! গিরিহাই বা তাকে নিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে কী করছে!

না, তাকে বেশিদূর নিয়ে গেল না অদ্বৈত, কে জানে কেন খালি বিড়াগাদার ঘুপচীতে অন্ধকারে জড়িয়ে ধরে ফের ফিস্ ফিস্ করে বলল, কাল তোর গিরিহানীকে কহি দেমি— হঁ হঁ তোতে আউ গটে চক্রা-বক্রা শাড়ি দিতে।

মাগনায় আরো একটা ফুল কাটা চক্রাবক্রা শাড়ি! লোধানীর চোখ চক্ চক্ করে উঠল লোভে। গলায় একটা অদ্ভুত স্বর তুলে সে বলল, হ্যাঁ-এ-এ-এ—!

অদ্বৈত তাকে হাতে ধরে টানতে টানতে টিভিঘরের দরজায় এনে ছেড়ে দিয়ে নীলিমাকে বলল, কাঁই গো শুনুচ? শত্রুঘ্নর অউ বউটা বাহারে খাড়া হি কি লুকি লুকি টিভি দেখথিলা, ঘরর ভিতর টিকে জ্যেগা করি দও।

ঘরের বাইরের কত লোকই তো ঘরের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে টিভি দেখছে! নামালিয়া বউটাকে বাইরে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে টিভি দেখতে কেন হবে— আসুক সে ঘরের ভিতর।

উঠে দাঁড়িয়ে হেসে অভ্যর্থনা করল নীলিমা, আয় আয় রে গেহলী!

অদ্বৈত চলে গেলে কপট ধমকের সুরে নিয়তিকে সে বলল, "গুরুজন সঙ্গে বহু লো লুগা রখিবু, মুন্ডে।"

বুঝতে পেরে মুহূর্তে মাথায় কাপড় টেনে দিল লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা। কখন গিরিহার সঙ্গে জড়াজড়িতে খুলে পড়েছে মাথার ঘোমটা।

এখন লোধাঝোড়ের ভিতর ঢুকে বসে আছে গুরভা, গুরভার বউ। এদিকে সুনসান, সুনসান। যা কিছু 'ছরি' সব তো ওদিকে। গিরিহার ঘরে, মেসিনঘরের দাওয়ায়।

লাটাপাটা ঝুড়ে ঝুড়ে 'লোধাঝোড়' বানিয়ে মাগ-মরদ কতবার যে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছে তপোবন-পাচকাঁহিনা-কমলাসোলের জঙ্গলমহাল, কত যে শিয়রচাঁদা কত যে হুঁড়ার-ল্যাকড়া-রামবাঘা-ভুঁড়াশিয়াল তাদের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে, কত যে লই-লতি চিহড়-দুধিয়া-হাতিবাঁধা দু'হাতে পড় পড় করে ছিঁড়ে ফেলেছে তারা, কত যে কিরকিচ-বাঘনখী-পিটনাসিজের কাঁটা গায়ে ফুটে রক্ত ঝরিয়েছে তাদের, কত যে কাদাম-কারাম চাঁদড়-আঁকনলী দুধিগদ-ধুদ্দকুলের চারা দু'হাতে উপড়ে ফেলে দিয়েছে তারা—

গুরভা গুরভার বউ এখানেও আশশ্যাওড়া-কালকাসুন্দি-ভাটপিটালির লাটাপাটা ঝুড়ে বানিয়ে নিয়েছে লোধাঝোড়। তারা যে দেশ-গাঁ ছেড়ে সুখজুড়ি-মাঝুডুব্‌কা-তপোবন জঙ্গলমহাল ছেড়ে নামাল খাটতে এসেছে পুবে—পুবে পুবে— তা তাদের মনেও নেই।

মনে নেই, মনে নেই।

শাবল-খন্তা নিয়ে তারা যেন এখনও এখানে খুপ্‌ খুপ্‌ করে খুঁড়ে চলেছে আলু-তুণ্ডা পানআলু-খামআলু-চুরচা আঁউলা-বাঁওলা। আজ সবে জ্বর থেকে 'টেনক' হয়ে উঠেছে গুরভা, আজ সকালে বেরিয়ে এক হাঁড়া ধর্মের জল এনেছে গুরভার বউ, আজ আড়বেলায় এক 'মেইয়ামাড়ষে'র নাই-কুণ্ডলে কলসির তলাকার শীতলমাটি থাপতে গিয়েছিল গুরভা, উপগত হতে চেয়েছিল তার সঙ্গে, সে 'মেইয়ামাড়ষ' উল্টে ফেলে দিয়েছে তাকে, সেই থেকে মনে মনে 'রাগী' হয়ে আছে গুরভা, লোধাঝোড়ের ভিতর আঁটারি-কুড়চির ডালাপালা বিছিয়ে কতদিন 'বস্‌মতার' মতো শুয়ে থেকে গুরভার 'রাগ' রুখে দিয়েছে গুরভার বউ।

আজ ফের সেই লোধাঝোড় ঝুড়ে নিয়েছে তারা, এখন সেই লোধাঝোড়ের ভিতর ঢুকে বসে আছে গুরভা, গুরভার বউ।

তপোবন জঙ্গলমহাল। এতে আছে সীতাকুণ্ড, যজ্ঞকুণ্ড। হনুমান চৌকি, তাড়কারাক্ষসীর হাড় আর আশ্রম। আর আছে সীতানালা, নাকি চিরদুঃখী সীতার অশ্রুতে গড়া ছোট নদী। তার দু'ধারে ঘাসবন, ঝামা পাথর। চাগড়া চাগড়া রসকলির তিলকমাটি। আর জলে পুরু ভেলভেটের তুল্য শুশনিশাক, ঝোপঝাড়ে টকশাক। লোধাজনমানুষ দু'হাতে ঝোপ ফেড়ে ঢুকে যায়, যেন মায়ের গর্ভে ঢুকে। তারপর দেহতত্ত্বের গোলকধামে বিচরণ। তারপর দু'হাতে ঝোপ ফেড়ে বেরিয়ে আসা।

বউয়ের পিঠের উপর লদকে পড়ল গুরভা।

উঁ-হু, আজ থাক।

কেন্নে?

নাই গ', শরীল তুমার জুতের নাই।

কী করে জানলে?

রাগে ফুঁসছে গুরভা। শতুরার বউ আজ তাকে ঝেড়ে ফেলেছে।

জ্বব থিক্যে এই ত উঠলে!

তাথে কী? জ্বর ত নাই এখন।

গা দেখি।

এখনও টুকচার গরম।

ছাড়-অ। উ কামজ্বর।

ফের জ্বর যদি আসে?

যদির কথা লদীতে—

ততক্ষণে গুরভানীকে কজ্বায় ফেলে দিয়েছে গুরভা। 'জনের' আলো এসে পড়েছে ছাপ্‌কা ছাপ্‌কা। তাছাড়া চালাঘরের 'পাছুতে' সবটাই অন্ধকার। গাড়িয়া-আড়ার চারধার যা সাফা সাফা, ফিন্ ফুটছে আলোর। জলপোকা ডাকছে। আচমকা এ-গাছ সে-গাছ ঝাঁপিয়ে উঠল দুয়েকটা রাতচরা। আর তাছাড়া খস খস ঝুর ঝুর। মাটিয়া 'উন্দর-টুন্দুর' হবে, মাটি ঝুরছে। সময় নেই অসময় নেই হাঁ-হাঁ মরদ খেতে চাইলে উপায়?

অগত্যা 'বস্‌মতা'র মতো শুয়ে পড়ল।

ছাড়-অ, 'কুম্বার' পাছুতে 'বাহির' করতে কেউ যদি এসে পড়ে? রহো দেখে আসি।

বলেও উঠবার গা করল না লোধানী। খালি শুয়ে থেকে মনে-মন ভাবতে লাগল গিরিহা-গিরিহানীর 'জোড় লাগা'র কথা। সেরকমটা নিজেদেরও তো কতদিন হয়নি!

মউজে ডুবে থেকে গুরভা বলল, চুপ মার-অ। ই সময় একটা 'সিগ্রেট' হলে জমে যেত! কিন্তুক নাই, কবে যে কামিল্লার সঙে ফের দেখা হবে!

কামিল্লা, কামিল্লা।

বসন্ত কামিল্লার কথায় লোধানীরও শোক উথলে উঠল। একটা আঙট হয়েছে, চুর-বালাও হযেছে, কিন্তু পায়ের আরেকটা আঙট? ফিরেই কামিল্লার চুলের মুঠি ধরে আদায় করে ছাড়বে, লোধাপাড়ায় একবাব আসুক সে।

'গিবগিতি' দিচ্ছে গুরভা, আর খুক খুক করে হাসছে গুরভানী।

কী যে আ-দেখলার মতন বেভার কচ্ছ, যেন কত্তদিন—

কত্তদিনই ত। সেই ত আসার আগে একবার!

মিথ্যে করে লোধানী বলল, তার পিছ্‌কেও আছে তুমার মনে নাই।

আজ শতুরার বউ তাকে ঝেড়ে ফেলেছে। এখন বউকে শতুরার বউ ভেবেই উপগত হল গুরভা। তার সে তেজ কী, বিক্রম কী!

'বাগী' গুরভার তেজকে কখে দিয়ে ক্ষণেক ক্ষণ ফুল্ল হয়ে উঠছে গুরভার বউ। কিন্তু তার মন জুড়ে সেই গিরিহা-গিরিহানীর 'জোড়-লাগা'—

বাত ভিত ঘুম ভাঙলে, 'বাহির' যাবার নাম করে চালাঘরের বাইরে এসে কতদিন সে তাকিয়ে থেকেছে গিরিহার দোতলা বাড়িটার দিকে। দোতলা বাড়িটা কী আর, দোতলার একটা ঘরের দিকে। একটা ঘরেই কী আর, ঘুরে ঘুরে এ-ঘরে একবার সে-ঘরে একবার। তাদেব মতো বন-জঙ্গল লাটা-পাটা আড়াল-আবডাল আর পাবে কোথায়। একবার তো গুরভা তাকে এক ল্যাদা বহেড়াগাছের উপর তুলে কত কী করল। পাছে পড়ে যায়— সেই ভযে লোধানী সারাক্ষণ সিঁটকে থাকল।

রাতভিত বাইরে দাঁড়িয়ে কী কর? দৈবাৎ ধরা পড়ে গিয়ে গুরভার বউ বলে, তারা গুনি। —তার মানে? জিজ্ঞাসার উত্তরে গুরভার বউ ফের বলে, এ গো 'বাহির' করে গাড়িয়ার পানিতে পা ধুঞে যেই দাঁড়িয়েছি অম্নি দেখি কী মাথার উপর তারা তিনটা জ্বলজ্বল করছে। তিনটা, কিন্তুক আরেকটা কই? তিনটাতে অশুভ চারটাতে শুভ। খুঁজ খুঁজ। সারা

মেঘপাতালেই তিনটা বই চারটা তারা নাই। ত চার তারা দেখার তরে রাতভিত অমন ভ্যাল্ ভ্যাল্ দাঁড়িয়ে থাকি আর যেগো তারাই গুনি— একটা তারা দুইটা তারা—

এখন এখানে এই চালাঘরের পিছনে ঝুঁজকো জঙ্গলের ভিতর গুরভার হাবড়ে শুয়ে থেকে আচমকা ডাকটা শুনে ফেলল গুরভার বউ— সেই যে সেই— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

ঠিক শুনছে ত? কান খাড়া করে নিথর হয়ে পড়ে থেকে মনে-মন মিলিয়ে নিল ডাকটা— উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টু-টু-উ-উ-উ—

ঐ যে ঐ, ধড়ফড়িয়ে নড়ে উঠল গুরভার বউ, শুনচ?

কী?

এত্ত পষ্ট তাও শুনতে পাচ্ছ নাই? ঐ যে পাখটা চঁচ্‌রা ফুলিয়ে ডাকচে!

ধুস্! কুথায় কী! পাখ-পাখাল এখুন সব রাতঘুমে। আন্ শুনতে ধান শুনচ। ইসময় চুপচাপ মড়ার পারা বেভার কর—উঁ-হু-হু নড়ো নাই।

বার বার মাথা তুলে পাখিটাকে 'চিহ্নৎ' করার চেষ্টা করছে লোধানী। আর বারে বারেই তার মাথাটা হাত দিয়ে চেপে দিচ্ছে গুরভা—উঁ-হু-হু মাথাও নাড়ো নাই।

মরদের হাঁ-হাঁ খিদার কাল। এসময় কোনোকিছু 'বেগড়বাঁই' করলে তার ফল কিন্তু ভালো হবে না। ভেবেচিন্তে মড়ার মতো নিথর হয়ে পড়ে থাকে গুরভার বউ। কিন্তু পাখিটা—

সে ভবী তো ভুলবার না। খানিক দম নিয়ে সাঁসড়া-করঞ্জ-ডাব-নিমের পাতা হুড়জুড়িয়ে ডাকতে ডাকতে আসছে। গিরিহার পোখরি-আড়ার চারধারে যেন ঘুরে ঘুরে ডাকছে।

—উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ-উ—

পাখিটা ডাকতে ডাকতে এবার যেন 'জোড়-লাগা' গুরভা-গুরভার বউয়ের দেহের উপর আচমকা ডানার ঝাপট মেরে উড়ে যাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল গুরভার বউ।

এ গো ঐ ত ল্যাজটা!

তাকে ধমকে উঠল গুরভা, ধুর মড়ি! রাখ তোর ধাঁধাঁ—ঐ বলে নাই—"কাদাখোঁচা উড়ে গেল ল্যাজটা থাকল বাঁধা?"

হাসল গুরভা, গুরভার বউও হেসে ফেলল।

বলল, হঁ খাল্লি তুমার অবিশাস! পাখটা গরুর গলার ঘাগর-ঝালের মতন পষ্ট ডাকতে ডাকতে কানের কানকুটরি পোকা পর্যন্ত বাহির করে ছেড়ে দিল্ল আমার, আর তুম্মি বলচ কী নাই— কী পাখ? কাই পাখ? আরেকটুন হৈলে আমার হাতমুঠায় ধরা পড়ে যাইত নাই তার ভজকু ল্যাজটা!

গুরভা ফের বলল, কী দেখতে কী দেখেছ— চুপ মার-অ।

চুপ মেরে গেল গুরভালোধানী। খানিক চুপ মেরে থুম হয়ে ডাকটার গোড়া ধরতে চেষ্টা করল—সঠিক কোনদিক থেকে উঠে আসছে ডাকটা। কান খাড়া করে পড়ে থাকল সে। যা করছে করুক গুরভা।

একবার মনে হল বামনদার বিলের দিক থেকেই গুঁড়ো ঝরানি ডাকটা গুঁড়ো ঝরাতে ঝরাতে উঠে আসছে—উ-ল-টু-টু! টি-উ-ল-টু-টু!! টি-উ-ল-টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

পরক্ষণেই মনে হল ডাকটা ঘাগর বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে চড়কাপাড়া-দক্ষিণ আড়বনা হয়ে সরশঙ্কার ওদিকে, ডেঁউশগাছটার মাথার উপর দিয়ে অর্জুন-করঞ্জ-নিম-বেল পেরিয়ে—টি-উ-ল টু-টু! —উ-ল টু-টু!! টু-টু-উ-উ-উ—

এই নিয়ে দিনে-রাতে দু'বার! ধর্মের জল আনতে গিয়ে সেই তো সরশঙ্কায় মাছউলীর সঙ্গে দেখা-হওয়া-ইস্তক। ভাট-পিটালির বনে, অর্জুন-পাকুড়-খিরিস-করঞ্জার ডালে, বাবুল-

সুবাবুল-ইউকেলিপটাশ-কাঁটাবাবলার মগড়ালে, ডেঁউস-চালতা-টভা-ডেমুরের গাছে—কোথায় কোথায় যে ডেকে উঠেছিল পাখিটা!

তখনও ধরতে পারেনি, এখনও না। কিন্তু কোথাও না কোথাও ডাকছে তো! গুরভানী ভাবল—এ কী তপুবনের সেই পাখটাই? ফুলটুসুয়া-রাইবু-গুড়গুড়িয়া-সোমবারি-ভুটকী-পুনোই—কে না শুনেছে তার ডাক?

সে-ডাক একজন শুনে তো আরেকজন শুনতে পায় না। যে-শুনে তার বুকের ভিতরটা হদ্ হদ্ করে, হাগুল-মাগুল হয়ে যায় তার অন্তরটা। এখন যেমন গুরভার বউয়ের ভিতরটা হয়ে যাচ্ছে ফালা ফালা। ভিতরে ভিতরে মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে কে জানে কী!

অই যে ঐ শুন-অ, ডাকচে—

দু'হাতে গুরভার মাথার চুল ধরে ঝাঁকিয়ে দেয় গুরভাব বউ। —উ-ল-টু-টু! টি-উ-ল-টু-টু —কীরকম পষ্ট না?

কাই? কিছু ত শুনচি নাই?

বুকের ঢৌলে কান পেতে গুরভা বলল, খাল্লি ত ধুক্ ধুক্ কচ্চে ধুকপুকিটা! কুথায় পাখ! পাগল হএ্যেচ?

গুরভার বউও খানিক ভাবল, সত্যিসত্যি পাগল হয়ে গেছে নাকি সে? সকাল থেকে এই নিয়ে দু'বার শুনল। তার আগেও একবার— ঐ যে খড়পপুরের আগে কলাইকুণ্ডার সে-পাশের জঙ্গলটায়!

খানিক থম মেরে আছে এখন পাখিটাও। ডাকাডাকি নেই, ওড়াউড়ির ঝটাপটি নেই। চাঙের আসরে নেমে গেছে শতুরাও। সে গীত গেয়ে সাঙাতুনীকে ফল বেচছে—"আনুছি ফল-অ নিঅ কিনি গো সাঙাতুনী—"। নাচতেও পারে শতুরা মেয়ে সেজে।

লোধাঝোড়ে ঘাসপাতার বিছানায় কান খাড়া করে শুয়ে আছে লোধানী—এই বুঝি ডেকে উঠবে পাখিটা গলা ফুলিয়ে ধুলমাদুল কাঁপিয়ে! তিড়ুন না টিড়লিং—কে জানে কী 'পাখ'! সৎ-এর না 'পেঁদের'—কে জানে কী 'পাখ'! সত্যি সত্যি ডাকে না মনের 'ভরম'—কে জানে কী! উঁ-হু, উঁহু—কে জানে কী আবার, স্পষ্ট ডাক, টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু, নিজের কানে শুনছি ঘুরতে-ফিরতে! তবে যে 'ভালা' সে-ডাক একজন শুনে তো আরেকজন শুনতে পায় না—এর কী ভেদ কী ভাঙানী? কে জানে কী!

সুখে বুঁদ হয়ে গুরভা এতক্ষণে কবুল করে, জানলে? ঐ পাখ ন পাখমারা একদিন আমাকেও ঘিরেছিল গিরিহার পোখরিআড়ায়— তার মানে আশপাশকে আছে কুথাও।

বলতে না বলতেই গুরভানীর কানে ডাকটা ফের এসে পড়ল— টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!!

কী অঝোরঝর ডাক! কী 'কুহুড়া' ঢাকা ডাক— এই শোনা যায় তো ঐ শোনা যায় না! কী গুঁড়োঝরানি ডাক— ডাকতে ডাকতে গেল, যেতে যেতে ডাকের গুঁড়ো ফেলে গেল! যেমন করে পরিষ্কার আকাশে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যায় 'উড়াকল'।

—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু—

'জোড়' ছেড়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়াল গুরভার বউ— এগো ঐ-ঐ ত যাচ্ছে—

তাকে ফের এক হ্যাঁচকায় টেনে নিল গুরভা। রাগত স্বরে বলল, কাজের কালে যতসব অকাজ! চঁচরা ফুলিয়ে ডাকুক না ওর'ম গণ্ডা গণ্ডা পাখ। শালার পাখ ন পাখমারা। সেই বলে নাই— মন ন মতিভরম?

দ্বিগুন বিক্রমে বউয়ের ভিতর অর্ন্তগত হল গুরভা।



ঠাণ্ডা উপোস। তার মানে অরন্ধন। সারাদিন চুলো জ্বলবে না, রান্নাও হবে না। কিন্তু তাতে ভিনদেশী নামালিয়াদের চলবে কী করে? থাকুক শীতলাপূজা, পেটপূজা তো করতেই হবে। পেটে দম না থাকলে, গতরে বল না থাকলে খাটবে কী করে সারাদিন? সারাদিন, সারাদিন। গিরিহানী 'সিধা' বের করে দিল— চাল-ডাল-আলু-বৈতাল-পুঁইখাড়া। শুকামাছ-তেন্তুলী আজ থাক। পূজার দিন নিরামিষই খাক। ঘুমোবার আগেই কালকের রান্না রেঁধে রাখুক নামালিয়ারা। তারপর ভাতে জল ঢেলে ঘুমিয়ে পড়ুক। ঘুম থেকে উঠেই পেটপুরে খেয়ে মাঠে যাক, নচেৎ মাঠেই নিয়ে যাক হাঁড়িটা। সেখানেই 'স্যালো'র জলে হাত-মুখ ধুয়ে 'বাসিয়াম' খেতে বসে যাক।

টিভি-দেখা শেষ হতে চাঁদবদনীর হাতে 'সিধা'র ঝুড়িটা গছিয়ে দিল নীলিমা, যা রদ্‌নী, এ বেলে রাঁধিনে। কাল ত অরন্ধন, চুল্‌হা জ্বলবে নি!

ধুম পড়ে গেল পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীদের ভিতর। আদরী-ভাদরী-গুরভানীরা ঢুলতে ঢুলতেও জেগে বসল। ফের রান্ধাবাড়া! মোচ্ছব, মোচ্ছব।

ওদিকে মেসিনঘরের দাওয়ায় এখনও চলছে চাঙুনাচের আখড়া, চাঙুগানের মহড়া। "নুই নুই গেঁড়হা কুড়হায়—"। কোমর বেঁকিয়ে গেঁড়ী-গুগলি কুড়োনোর ভঙ্গিতে নাচছে লাইবুকা-শতুরা। ফিট্ আলো জ্বলছে হ্যাজাক লাইটের। তার শেঁ-শেঁ আওয়াজ।

আশপাশের লোক যখন রাতের খাওয়া সেরে ঘুমোবার উদ্যোগ করছে, কেউ কেউ ঢলে পড়েছে ঘুমে তখন কী না হাঁড়া-কড়া-বালতির ফের ঠোকাঠোকি লাগছে অদ্বৈতর চালাঘরে।

কখনো কী, এই জীবনে কখনো একসঙ্গে এতলোকের রান্ধাবাড়া খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কী দোরখুলির লোধাপাড়ায়! এ যে 'বনভুজ্‌নী' 'বনভুজ্‌নী'। হাটুয়ারা যেমন যায় দেশ-গাঁ ছেড়ে বনে-বিজনে বন-ভোজন করতে তেমনি লোধারাও যেন দোরখুলি ছেড়ে নিজেদের দেশ-গাঁ ছেড়ে এসেছে পুবে নামালদেশে 'বনভুজ্‌নী' করতে।

চাঁদবদনী দৌড়ে গেল ওদিকে, ওদিক থেকে দৌড়ে এল পুনোই, এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল নিয়তি, ওদিক দিয়ে ঢুকল গুরভার বউ। যেতে যেতে এ-ওর ঘাড়ের উপর পড়ল, কেউ কেউ ইচ্ছা করে পড়ে যেতে যেতে জড়িয়ে ধরে বলল, এগো টুকচার দেখে চল্ ন!

তারপর দুজন দুজনে জড়াজড়ি করে হাসল।

হাসাহাসি ঠাট্টা-ঠিসারা জরপ-হেঁয়ালি চলতে থাকল, চলতেই থাকল। রাত বাড়ছে, রাত বাড়তেই লাগল।

গুড়কুঁদা-গুরভা-বধিরামরা অন্ধকারে তিনমাথা এক করে, শালপাতার 'চুটা' তো নেই এখানে, সুতোবাঁধা বান্ডিলের বিড়ি খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে খুক খুক করে কাশছে। তাদের ভিতর কেউ একজন, হ্যাঁ গুড়কুঁদা-ই, এবার শরাবণের বউকে ধরে জরপ করে বলল, "বাইরা গো কইন্যার মা জামাই দেখবি তো। কি দেখবি জামাই গো মা গালদুটা তুবাঁ।।" —ইবার বিটির বেহা ত দিতে হবে কইন্যার মা, সে-জামাইয়ের গাল যতই তুবাঁ হোক।

শরাবণের 'বহু' বলল, হুঁ ত দিব্ব।

কবে দিবি?

এই ঘুরল্যেই। আষাঢ় কী বদনীর বাপের নামে নাম— ঐ মাসেই।

পন দিবি ক'ট্যাকা?

এক ট্যাকাও না।

তব্বে? কী করে বেহাঘর হবে মুনুর মা?

কেনে, বরের মা-বাপই ট্যাকা দিঞে বহু চুমাবে!

অস্ত গুড় আধসের না বদ্নীর মা। সেই বলে নাই— "আগে চুমাব আপনার বেটাকে, পেছু চুমাব হাঁড়িছুতারের বিটিকে"?

শরাবণের বউও তেম্নি জরপ করে উত্তর দেয়, "লিঞে যা লিঞে যা তোদের কেঁদ্ মুড়্হা। নাই দিব শিশুলা কইন্যা।।"

বরের মা-বাপ যদি বেটার বউকে কালাহাঁড়ির সঙ্গে তুলনা করে তবে মেয়ের মা-বাপও জামাইকে কালো কুচকুচে কেঁদুগাছের গুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করতে ছাড়বে কেন?

গুড়কুঁদালোধা হার মেনে বলল, নাই নাই মুনুর মা, হামদের মুনুর কেঁদ্‌মুড়হার সঙে বেহা কেনে হবে, ওর বেহা হবে রাজার বেটার সঙে— শ্বশুবঘরে এমন কাপড় দিবে যে ধারে ধারে নাম লিখা—ওরে ধারে ধারে নাম লিখা—

আসতে-যেতে বেহাঘরের কথা শুনেও চাঁদবদনী রা কাড়ে না। কিন্তু পুনোই-ভুটকী-গুরুবারিরা হাত টেনে ধরে, ওলো বল্ ন কিছু!

কী বলব?

গুরুবারি বলল, যাই বলিস্ আমি কিন্তুক 'কাঁকড়া' ধরব—

ধর্ না কেনে খালেবিলে গজ্ দিঞে!

বলেই চাঁদবদনী হাসল।

ধুর মড়ি! পিঠে একটা কিল মেরে গুরুবারি বলল, ঐ খেতি-কাঁকড়া নাকি? আমি ত 'বাঁধাপনী' বসলে 'বহনইয়ের' গোড় ধুয়াতে বসে তার বুড়াআঙুল ধরব—এমন জোরে ধরব যে দশ ট্যাকা নাই দিলে ছাড়ব নাই, হঁ-অ!

তারপর সে কুলডিহা না ডাহিপালে তার মাউসীর বাড়িতে মাসতুতো দিদির বিয়েতে 'কাঁকড়া' ধরে একবার কতটাকা পেয়েছিল চাঁদবদনী-পুনোই-ভুটকীদের বড় মুখ করে শুনিয়ে দিল। চাঁদবদনীর 'বেহাঘর' বসলে বর-কনের পা ধুইয়ে 'কাঁকড়া' ধরার ডাক তো পাবে তারাই— ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরাই!

শুধু কী 'কাঁকড়া-ধরা', কাদা-খেলা হরিণ-মারা গাছের সঙ্গে 'বেহা'—আছে তো কত কিছুই! সে সব উদ্‌যাপনের আশায় আশায় এখন থেকেই চাঁদবদ্নীকে টানা-হিঁচড়ান উস্তন-খুস্তন শুরু করল গুরুবারি-পুনোই-ভুটকীরা।

চাঁদবদ্নী তো আগাগোড়াই বলে গেল এককথা— ধুর হ মুখপুড়ীরা! এখন কে বেহা কচ্ছে! ভোক্‌লা শ্বশুরঘরের পাটরা কুঁড়্হা খাতে নাই যাব ন্ন!

তবু ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা বলতে ছাড়ে না— হঁ হঁ সে দেখা যাবে ছামড়াতলে কে আগু বসে! যুবড়া থাকতে থাকতে রে মুনু গিরিহানীর কাছে শিখে লে দু-চাট্টা কাঁদ্‌না— ঐ যে কী বলে হাটুয়ারা কাঁদে— "উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি মাগো। ঘুরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি মাগো"—

হো-হো করে হেসে উঠে সকলে। এমন কী চাঁদবদনীও। নিয়তি-আদরি-ভাদরি-গুরভানীরাও।

রাত বাড়ে, রাত তো বাড়েই। রান্নাবাড়া সেরে নাচা-গানা থামিয়ে নামালিয়ারাও ঘুমিয়ে পড়ে। গুরভার বউয়ের চোখে কিন্তু ঘুম আসে না। সে 'পিসাব' করতে বেরিয়ে তারা খোঁজে— "একটা তারা দুইটা তারা বামনঘরের ঝারাপারা—"

দুটো তো হল কিন্তু আর দুটা?

খোঁজ খোঁজ! সারা মেঘপাতাল ঢুঁড়ে চোখ তো নেমে আসে নিচে। নিচে, নিচে। একেবারে গিরিহা-গিরিহানীর দোতলাবাড়িটার অন্দর মহলে। অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে। হালকা 'কুহুড়া' যেন ঢেকে আছে গোটা বাড়িটাকে!

অন্ধকারে চোখ সইয়ে সইয়ে গুরভার বউ তারা খোঁজে। উঁ-হু তারা কী আর, খোঁজে 'জোড়-লাগা' গিরিহা-গিরিহানীকে। কেমন লম্বা হাতে গিরিহানী জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে গিরিহাকে!

একতলায় এখনও আলো জ্বলছে। পাতলা ফিনফিনে। গুরভাব বউয়ের মনে হল— এ আলো তো জ্বলেই। সারারাত, সারারাত। আগেও দেখেছে। আলোর বিহনে পাছে উপর থেকে নিচে, নিচ থেকে উপরে যেতে-আসতে অন্ধকারে কেউ না হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়!

আর তাছাড়া 'বাঘযুগ্‌নী' পোকা। ঐ যে 'ডালে বসে পেছনটা জ্বলে'— ভুচুঙ ভুচুঙ করে 'টিপা লাইট' জ্বালতে জ্বালতে একবার এদিকে যাচ্ছে তো একবার সেদিকে। কখনো জ্বলে উঠছে ঘরের উত্তরে তো কখনো দক্ষিণে। এই জ্বলল পুবে তো ঐ জ্বলে উঠল পশ্চিমে।

গুরভার বউয়ের দৃষ্টি কেমন গুলিয়ে যায়। ঘুলিয়ে যাচ্ছে চোখের চাহনি। চোখ রগড়ে ফের চোখ খুলে গুরভার বউ। এক্ষুণি কী দেখতে কী দেখে ফেলবে সে।

চোখ ঝারাপারা করে আচমকা মেঘপাতাল থেকে তারা খসে পড়ল হুড়মুড় করে। পাপী তারা, পাপীতারা! কুঁড়ে আঙুল দাঁতে কামড়ে বুকে থুথু ছিটিয়ে নিল সে তৎক্ষনাৎ।

ছি ছি, কী দেখতে কী দেখে ফেলল সে!

আর এসময়ই মাড়োতলার মিটিং সেরে ঘরে ফিরল অদ্বৈত। উঠোনে পা দিয়েই দেখল— চালাঘরের ওদিকে কে যেন রুমকুম দাঁড়িয়ে! স্ত্রীলোক।

ফট্ করে মনে পড়ে গেল তার— শত্রুঘ্নলোধার ঢ্যাঙা বউটার কথা। সেই কী একভাবে দাঁড়িয়ে আছে এখনও? যাবার আগে সে কী কবতে কী করে বসেছিল আজ! নীলিমা কী ধরতে পেরেছে? উঁ-হু নীলিমা যের'ম সরলা ভোলাভালা, রাতদিন তো 'আদর্শ নারী' 'গেহলা ঝিঅ' বেহুলা-তিলোত্তমার 'রোদন' নিয়ে পড়ে আছে— অতকিছু সে ভাববেও না।

তবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অদ্বৈত। এখন কোনদিকে যাবে সে? ডাইনে থাকল তার নিজের ঘর, বাঁয়ে থাকল নামালিয়াদের চালাঘর। ডানদিকে আছে নিজের বউ নীলিমা, বাঁয়ে দাঁড়িয়ে নামালিয়াদের বউ নিয়তি না ফিয়তি।

দুটোই তার। আপনার, আপনার। এখন সে যাবে কার কাছে? যেদিকে খুশি সে যেতেই পারে।

খানিক থমকে থেকে নিজের ঘরের দিকেই হনহন করে হাঁটা দিল অদ্বৈত।

মাড়োতলার পূজাকমিটিতে আজ ছিল শেষ মিটিং। ক্লাবের রজতজয়ন্তী, পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব— তাই এবছরের পূজার বাজেটও বেশি, চাঁদাও ধরা হয়েছে বেশি বেশি। তার উপর মাড়োতলার শীতলামন্দির পাকা করার উদ্দেশ্যে টিকিট কেটে মেলায় একদিন যাত্রাও বসবে। কলকাতার নামী 'নট্ট কোম্পানী'। বায়না হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই।

মিটিং-য়ে দেরি করে ঢুকেছিল অদ্বৈত। তার জন্য তাকে কথাও শুনতে হয়েছিল গনেশ মণ্ডলের কাছ থেকে—

কিগ অদা, ধানটান সবু কাটি পকিল, তুমহর আউ কী চিন্তা? আমহর অখনও কিছি হেলানি!

অদ্বৈতকে ঠেস মেরে বলা। সে যেন ধানটান সব কেটে ফেলল, তার আর কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু তাদের এখনও কিছুই হল না। তবু—

তবু তারা মিটিং-য়ে এসেছে যথাসময়েই। কিন্তু অদ্বৈত—

গনেশ মণ্ডল ফের বলল, খালি চাষবাসর কাজ লেইকি ব্যস্ত থাকলে হব। গাঁর কথা বি কিছি চিন্তা টিন্তা করতে হব ত?

হঁ-হঁ এসব কথা কী কহুচ, আমে কী কস্তে হব কুহ না?

মিটিনে আইতে এত্তে বিলম্ব হেলা কাঁইকি অদা?

অদ্বৈত 'বলব না' 'বলব না' করেও বলে ফেলল, আজ সকালনু হনুমান রাইস মিলে ধান পঠাইতে হেলা। সবু কাজটাজ সারি গুছাই-গাছাই নিতে টিকে বিলম্ব হেই গলা আউকি।

বেশ বেশ, অখন স্বস্তি করি বুস্‌স দেখি।

বলেই তার উপর বাড়তি কিছু চাঁদা ধার্য করেছিল কমিটি। অদ্বৈত নারাজ হয়নি, মেনে নিয়েছে হাসিমুখেই। মনে ফূর্তি ছিল নামালিয়াদের এক বউকে সদ্য জড়িয়ে এসে। সেই বউটাই কী এখন এখানে দাঁড়িয়ে? কিন্তু কেন? অদ্বৈতর মনে ঘোরতর সন্দেহ—এক 'খঁড় লুগা' দেবে বলেছিল বলেই কী? জড়াজড়ির জন্য মাত্র এক খণ্ড কাপড়? ধুস্! সে তো দিনমানেই চাইতে পারে। তার জন্য এত রাতে ওভাবে দাঁড়িয়ে?

চিন্তাটা উড়িয়ে দিয়েছিল অদ্বৈত। কে জানে কার বউ— শত্রুঘ্নর বউই বা কেন হবে। হয়ত আর কেউ। 'ছোট বাইরে' সারতে চালাঘরের বাইরে এসেছে, আচমকা অদ্বৈতকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঘরে ঢুকে বাড়তি চাঁদার কথা নীলিমাকে বলতেই অদ্বৈতর গেহলী বউ নীলিমাও বলল, বচ্ছরকার পূজা, ঠাকুরর নামে বাড়তি কিছি চাঁদা-ভেদা দিছ, বেশ করিচ! তেবে ইস্তি পর পব যিদি চাপ আসি যায় তাহানে কী করি পারব! অউ ত সেদ্‌নে চাপ দিলা—নামালিয়া মেনকার কাহার যদি কিছি অসুখ-বিসুখ হেই যায়, কাজ না করনেও খাই-খরচা মজুরি বি তাকো দিতে হব। কি কউ?

হ্যাঁ, তাই তো। আর এইভাবে যদি খাটতে খাটতে একসঙ্গে দু-পাঁচজন অসুখে পড়ে যায় তবে তো চাষীর দফা রফা! অদ্বৈত বলল, ইগো তাঁকর চাপ মান্য না করি উপায় কী নীলি? কার সাঙে 'লজ্' করতে হব ভাবি দেখিচ কী?

'লজ্'— তার মানে ঝগড়া। জলে বাস করে কী কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায়? অদ্বৈত জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, হউ, এখুন সে-সব বাদ দও, যা হিবার হিবে—

বলেই বউকে বিছানায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অদ্বৈত, নীলিমা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, কী হউচি! আগে কিছি খাই লিঅ।

তাই তো, এখনও রাতের খাওয়া হয়নি। কাল তো আবার ঠাণ্ডা উপোস, দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেল অদ্বৈত।

ঘরের ভিতর খেতে বসলেও অদ্বৈতর মন পড়ে থাকল বাইরে। বাইরে, বাইরে। আচ্ছা, বাইরে যে দাঁড়িয়ে সে কে? সে কী সেই শত্রুঘ্নর বউ? যাকে সে জড়িয়ে ধরেছিল মাড়োতলায় যাবার আগে? কী চায় বউটা? সে কী তবে দাঁড়িয়েছিল তারই অপেক্ষায়? এখনও কী দাঁড়িয়ে? তখন একটা কিছু ঘটতে গিয়েও ঘটেনি, পুরা হয়নি আদ্ধেকটা, তবে এখনই কী সেইটা পুরা করতে চায় বউটা?

তাড়াহুড়োয় খেয়ে 'বেসিন' ছেড়ে ঘটি-হাতে আঁচাতে বাইরেই এসে গেল অদ্বৈত। কেউ নেই, সুনসান! খালি তো জোনাকি, বিড়াগাদার আলো-আঁধারি আর ভুলিটা। এই কদিন কুকুরটা চালাঘরের আশপাশে ঘুরঘুর করেছে, এদিকে পা মাড়ায়নি বড় একটা। এখন অদ্বৈতকে দেখে লেজ নাড়ছে।

অদ্বৈত বিড় বিড় করল, যা না, এতেদিন কাঁই থিলু, শত্রুঘ্নর বউর কোত্‌র খাইকি শুই পড়। বলেই কুলকুচোর একদলা জল ফেলে দিল কুকুরটার গায়ে। একপাক ঘুরে কুকুরটা সত্যি সত্যি চলে গেল চালাঘরের দিকে। কে জানে শত্রুঘ্নর বউয়ের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়বে কী না।

গলা খাঁকারি দিল, গলায় আওয়াজ তুলে কুলকুচো করল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করল। কিন্তু কেউ নেই আর দাঁড়িয়ে রুমরুম। চালাঘর থেকে কেউ বেরিয়েও এল না হুড়মুড়।

নিস্তেজ অদ্বৈত, 'বিস্তর রাত হেলা নিঁদ আসুচি' বলে বউ নীলিমার কাছে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। খানিক জেগে থেকে মনে মনে নীলিমা 'ভাঙানী' ভাঙছে—

"চকট মকট মাঝির ডোবা।
রজনীকালকু পাউচি শোভা।।
ডাঙ্গিয়া ন দেনে ঘুমাই যায়।
রস ঢালি দেনে ফর ফর্ হাসে।
তা দেখি বাঙ্গরি সভার বসে।।—"

তেড়া-বেঁকা, মধ্যিখানে ডোবা। রাতের বেলা শোভা পায়। কাঠি দিয়ে উস্‌কে না দিলে ঘুমিয়ে পড়ে। রস ঢেলে দিলে ফর্ ফর্ করে হাসে। ছোটখাটো জিনিসটা সভায় বসে থাকে— কী জিনিস? উত্তরটা নীলিমার পেটে আসছে তো মুখে আসছে না!

রাত বাড়ছে, রাত গাঢ় হচ্ছে। রাত বাড়তে বাড়তে রাত গাঢ় হতে হতে একসময় পাতলা ফিকেও হয়ে আসে রাত। ভুরখা-ইপিল বা পোহাতারা উঠে রাত ভোর করে দেয়। লোধাজনমাড়ষ নামালিয়া লোধারা বিশেষত বউড়ি-ঝিউড়িরা ভোর রাতে 'পিসাব' করতে বেরিয়ে তারা খোঁজে। তারা খোঁজে, তারা খোঁজে— একটা তারা দুইটা তারা—। দুটো তো হল আর দুটো? বাকি তারা খুঁজতে খুঁজতে হয়ত হয়ে যায় দিশাহারা। দিশা হারিয়ে 'ঘর-বাহির' করে, কেউ কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে গিরিহা-গিরিহানীর ঘরের দিকে। এই করে রাত শেষ হয়ে যায়, রাত আর থাকে না।

পরের দিন সকাল।

কাজ আজ আধা-আধি, হাফ-ছুটি। গিরিহা গতকালই ঘোষণা করে দিয়েছে—একবেলার কাম দুবেলার মজুরি। গ্রামে আজ শীতলাপূজা কী না। শীত্‌লাবুড়ির পূজা? সে তো লোধারা সেরে এসেছে চোত্ মাসে, মহুল পড়ার কালে। এখন এখানে? গিরিহার লোকেরাই বলে— শুধু কী ফাল্গুন-চৈত্র, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়-শরাবণ আশ্বিন-কাত্তিকেও হয়। —মায়ের দয়া হিনে ঠাকুরর পূজা ন দেই উপায় কী? সে মউসরেই হউ পৌষেই হউ।

ভোরভোর উঠেই তাড়া দিতে শুরু করেছে অদ্বৈত, হঁ ঢের বেল হেলানি, উঠি পড়। জলদি বিলকু চ। আজ ত আধাআধি, যত্‌টা পারু কাটি পকা।

অদ্বৈত তো বলবেই আধাআধি সময়ে কাজটা পুরা করতে। কিন্তু কাল অনেক রাত অব্দি নামালিয়ারা নাচাগানা করেছে, টি.ভি দেখেছে, রন্ধাবড়া করেছে, ঘুমোতে ঘুমোতেই তো রাত হয়ে গেছে আদ্ধেক। গা আর বইছে না। তবু গিরিহার ডাকাডাকিতে হুড়হুড় করে উঠে পড়ল।

আজ আবার সকাল সকাল ফিরে এসেছে নীলুয়া। কাল রাতে সে কোথায় ছিল, কী খেল—এত কিছু জানার, ঐ নিয়ে জরপ করার সব অবসর নামালিয়াদের আর কোথায়! যা

হওয়ার হবে ঐ ধানবিলে। হাড়িয়া-লাইবুকা-বড়কই-নাকফুড়রিরাও যে-যার সে-তার তৈরি হয়ে উঠে পড়ল।

কে বলবে কাল রাতে এই লাইবুকা-শতুরা-হাড়িয়ারা নাচে-গানে 'চাঙ'-এর আসর মাৎ করে দিয়েছে! আজ সকালেই ফের যে-কে সেই, চোখ পিট্ পিট্। চোখে আলো আর সইছে না।

কিন্তু ইল্লি-কাঁধে নীলেশ্বর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এদ্দিক-ওদিক। এই গেল পোখরি-আড়ার পুবে তো এই চলে গেল মেসিনঘরের পশ্চিমে। ইল্লিকে নিয়ে এই খেলল তো এই পড়ে থাকল খানিক লেখাপড়ি নিয়ে। নোটবুক খুলে কীসব লিখে ফেলল চর চর করে!

আর আর নামালিয়ারা তাকে দেখে কী আর বুঝছে না— কত কী ম্যাজিক-ট্যাজিক গুণ-তুক শিখে এসেছে নীলুয়া? খালি যা সময়ের অপেক্ষা, তার কাছে ধৈর্য্য ধরে বসলেই সে আগাপাশতলা শিখিয়ে দেবে, এম্নি হাবভাব।

বাকি যা গুরভা, ঐ কেবল নীলুয়াকে ডেকে ধমকে দিল, হঁ বেটা, খাটতে এসে খালি ঘুরে বুল্লেই হবে? সেই বলে নাই, তোর ত দেখি— "চল্ বলতেই কাঁধে ঝুলি"? নাই খাটলে কামাবি কী করে? সেই আছে নাই— "রইল বলদ ঘরে নাই চলল হালে, তার দুঃখু সর্বকালে!"

গুরভার জ্ঞান শুনে নীলেশ্বর বলল, হঁ হঁ, অত বলবার কী আছে, এই ত যাচ্ছি— চল্ বে হাড়িয়া লাইবুকা—

হাড়িয়া-লাইবুকা-নাকফুড়রিরা নীলেশ্বরের কথামতো হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল শ্রীমন্তর বিলের দিকে। লাইবুকা তো ধানকাটা নিয়ে দু কলি গীতও রচে ফেলল নিজে নিজে— ধানবিলে চল লো ধনি দেখাঁই দিব কেরদানি— আনুছি ধান-অ নিয় কিনি—"

চাঁদবদনী-গুরুবারি-ভুটকীরা সে-গান এক কান দিয়ে শুনে বের করে দিল আরেক কান দিয়ে। আঁচল ঝেড়ে ফেলল। সেই আঁচলই পেতে গিরিহানীর কাছে মুড়ি নিয়ে যে যার কাজে চলল। ধান কাটতে তারা যাবে অদ্বৈতর বিলে।

যেতে যেতে উলুক-ঝুলুক চেয়ে দেখল মাড়োতলার দিকে। এর মধ্যেই জমজমাট! বসে গেছে দোকানপাট, কেউ কেউ এখনও হাতুড়ি ঠুকে পেরেক মারছে, ঠকঠাক আওয়াজ।

'উড়া-কাঠ' খাটানো হয়েছে। 'উড়া-কাঠ' তার মানে নাগরদোলা। কাঠের ঘোড়া-হাতি রেলগাড়িগুলো পিঠে কাঠ-বাঁধা অবস্থায় ঝুলে আছে শূন্যে। এখন কী, সে তো উড়বে ওবেলা।

হাটুয়া ছা-ছানারা কিন্তু এখন থেকেই সেদিকে চেয়ে আছে হাঁ করে। চাঁদবদনী আড়চোখে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখল—'ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুম' কেউ আছে নাকি? 'বোস-ওঠা' ছেঁড়া কানি-পরা কেউ কেউ আছে নাকি? না না, একটাও নেই। হাটুয়াঘরের ছেলেমেয়েদের রকম-সকমই আলাদা, নামালদেশের ব্যাপার-স্যাপারই 'ভিনুরকম'।

'ভিনু রকম', 'ভিনু রকম'।

ভিন্ন রকম, ভিন্ন রকম।

চুড়ি-মনিহারীর দোকান বসেছে সারি-কে-সারি। চাঁদবদনী মনে মনে ভাবছে বৈকি— তাদের ওদিকে গুরুবারের হাটে ঐ তো মোটে একজনই! নুয়াসাইয়ের শিট-ঘরের সুবোধ শিট আর নয়ত সুধীর শিট। কুম্হারপাড়ার গুরুবারের হাটে চুড়ি-বালার দোকান দেয়। ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীরা বনের আঁউলা-ঝাঁউলা কেঁদ-ভুড়রু বেচতে গিয়ে কতদিন দেখে এসেছে। কুম্হারঘরের ছুঁড়ি-ছেমড়িরা দু'হাতে চুড়ি-বালা পরে হাত নাচাতে নাচাতে যাচ্ছে।

শুধু কী গুরুবারের হাটে, সুধীর শিট-সুবোধ শিট কুম্হারপাড়া-কাম্হারপাড়া-

মাহাতোপাড়া-হাটুয়াপাড়ায়ও ঘুরে ঘুরে ফেরি করে। কিন্তু দোরখুলির লোধাপাড়ায় কোনোদিনও পা মাড়ায় না। ভুল করেও না।

চাঁদবদনীর জেদ চেপে গেল মনে—এতদিন ডুব্‌কা-ডুংরিতে খেলাচ্ছলে দু'হাতে দুধিয়া-লতার চুর-বালা পরেছে, আজ সে সত্যিকারের চুড়ি পরবে। চুড়ি পরে হাত নাচাতে নাচাতে কুম্‌হার ছুঁড়িদের মতো টুসুগীত গাইবে, ঐ যে— "হামার টুসু দখিন যাবে হাতে দিব দশ টাকা। মনে করে আনবে টুসু গো হাতি দাঁতের চুরবালা।।"

ধানবিলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাঁদবদনী আচমকা বলে উঠল, চল্ ন লো উদিক দিয়ে শীত্‌লাবুড়ির থানে।

বলেই পথ বদলে আনসাট্‌কা মাড়োতলার দিকে হাঁটতে লাগল সে। তার দেখাদেখি গুরুবারি-পুনোই-ভুটকীরাও।

দেখতে পেয়ে চিঁড়রা-কাঁধে নীলুয়া হুঙ্কার দিয়ে উঠল, হুটপাট এদিক-সেদিক যাস নাই তোরা।

গেলে কী হয়?

আমি বলছি তোরা যাবি নাই!

আমি যাব— তুঁই আমার কী করবি?

বলেই নীলুয়ার নিষেধসত্ত্বেও তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল চাঁদবদনী। গজ্ গজ্ করে বলতে বলতে গেল, কাহারো ধারি নাই ধুরি নাই, আমনার পায়ে চলি— আমাকে কাহার কী বলার আছে?

তাই তো, চাঁদবদনীকে আটকায় কার সাধ্য! দোরখুলির লোধাপাড়ায় থাকলে এতক্ষণে সে টঙস-টঙস করে কোথায় কতদূরে না যেত! গোঠটাঁড়ের মাঠ, কুম্‌হারপাড়া-কাম্‌হারপাড়া-বড়োডাঙা-খান্দারপাড়া। ঠেকা-পাছিয়া বগলে গরুর নাদি কুড়োতে, ধানের টুঙ-ইঁদুর ধান-ভাঙা হাঁড়ির খাপরা, নদীধারে খালধারে গেঁড়ি-গুগলি-শামুক কুড়োতে।

কেউ তাকে মানা করেনি, কেউ-ই না। কুম্‌হারপাড়া লোধাপাড়াব মহা 'হরি'র সময়েও সে অত জনমাড়ষের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কুম্‌হারপাড়ার কুল্‌হিরাস্তায়, স্বচক্ষে দেখে এসেছে কুশগাছ-আর গেঁদাফুলের 'পৈড়ান-ওঠা'!

আজ তাকে, নীলুয়া না ফীলুয়া, কোথাকার কে মানা করলে শুনবে কেন সে? পুনোই-ভুটকী-গুরুবারিরা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ফের চলতে শুরু করল। চলল চাঁদবদনীর পিছু পিছু।

আর কিছুই বলল না নীলুয়া, কিছুই করল না। খালি হাড়িয়া-লাইবুকাদের বলল, চ ত বে!

বলেই সে ঈষৎ দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল। যেন এগিয়ে গিয়ে কোথাও সে কারোর কাছে নালিশ করবে চাঁদবদনীর নামে। তাই দেখে ফচ্‌কে ছোঁড়া লাইবুকা গান ধরল—

"আখড়াতলে বিটি দাঁড়ালি কেনে?
লাচ গ বিটি লাচ, খেল গ বিটি খেল
ই জীবন গ বিটি আড়াইদিন—"

নাকফুড়রি-সুকুয়া-হাড়িয়ারা হাসাহাসি করল। কাল কোথায় চলে গিয়েছিল নীলুয়া, কাল যে এসেছিল নুকু, তার সঙ্গে তার দেখা হল না—এসব কথা তাকে জানিয়ে দিয়েছিল হাড়িয়া-লাইবুকারাই।

নুকুর কথায় খানিক চুপ মেরে থাকল নীলুয়া। তারপরই বলল, ত তোদের উচ্চশিক্ষিত 'হাই-এডুকেট' দিদিমণি কী বলল?

কী আর বলবে, ভুলাঁয়-ভালাঁয় লিয়ে যেতে এসেছিল ঘরে। কেউ কেউ ত পিছু ধরেছিল যাবেক বলে— আমরা ত মুখের উপর বললম, যার মন চায় যাক আমরা কিন্তুক কিছুতেই যাচ্ছি নাই—নাই যাব গ দিদি, হঁ।

এসব কথা বলে নীলুয়াকে তাতিয়ে নীলুয়ার আরো ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল হাঁড়িয়া-লাইবুকারা। সে না হলে, সে না থাকলে তাদের আর জমবে কেন! 'চ ত বে' ডাক শুনেই তারা বুঝেছিল একটা কিছু ফাটাফাটি হবে, নীলুয়াটা তো ঐ রকমই!

কিন্তু না, নীলুয়া-হাড়িয়া-বড়কই-লাইবুকা যতসব চ্যাঙনা-ম্যাঙনারা আর 'হুরি' না করে সুড়সুড় নেমে গেল শ্রীমন্তর বিলে। অদ্বৈত-শ্রীমন্ত আজ দু'ভাই-ই সকাল সকাল জমিতে এসে গেছে। হাফ-বেলাতেই যাতে পুরাকাজ উঠে যায় তাই সরে-জমিনে দেখতে।

অদ্বৈত বসে আছে 'হিড়ে'। শ্রীমন্ত আদরী-ভাদরীদের সঙ্গে নেমে গেছে বিলে। সেই পুরোনো গত্, অদ্বৈত এই যদি বলল, পাঁহী চাঁড় চাঁড় লেই চল্ চন্দ্রবদনী, নাহানে যাইতে 'লেট' হেই যাব, মু মেলার কথা কউচি মনা, তো শ্রীমন্ত উস্কানি দিচ্ছে লাইবুকা-হাড়িয়াদের, হাবিজাবি গল্প না করে খর খর হাত চালা কচিরা, মেয়েদের কাছেও তোরা যে হেরে যাচ্ছিস, ছি!

শ্রীমন্তর ওদিকটায় জোর 'হুরি' তুলল নীলুয়া-লাইবুকা-বড়কই-নাকফুড়রিরা। এদিকে অদ্বৈত টিপ্পনি কাটল, ঢামুয়া টকাটা ঘুরি আসিচি! মু চিন্তা করুচি— কাঁই ভাগি গলা কী না!

আজ আবার কাজে লেগেছে গুরভা। গিরিহার কথা শুনে খাড়া হয়ে সে বলল, ঢামের কথা বল্লিস নাই গিরিহা, ছেনামানুষ, যাব্বেক আর কুথায়! আমরা ভাবলম লদী পাঁইরাই উ গ্যাছে দ্যাশে। নাই, এখন ত দেখছি আশপাশকেই আছে! সেই বলে নাই—জইড়তল বটতল সেই ত বুড়ির পোঁদতল?

অশ্বত্থতল-বটতল বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙ্গ যে-চুলোয় থাক না, সেই তো সে ফিরে এসেছে নামালিয়াদের কাছে! নদী পেরিয়ে ইচ্ছা করলে সে তো যেতে পারত নিজেদের ঘরে দোরখুলির লোধাপাড়ায়।·তা নয় কাক-কুইরী জাগার আগে সে তো ঠিক এসে পড়েছে বামনদার চালাঘরে!

চুপ মেরে গেল অদ্বৈত— বেফাঁস একটা কিছু বলে ফেলাও মুস্কিল! তার উপর সে দেখেছে যতবার যাই বলুক এই আড়িশা ধাকুড় ধুমা ছোঁড়াটার বিরুদ্ধে, রুখে দাঁড়িয়েছে এই লোকটাই। কে জানে কী আছে তার সঙ্গে!

এতক্ষণে গল্পে-গুজবে মশগুল হয়ে গেছে নীলেশ্বর। ধানকাটার বিরাম নেই, ধানের গোড়ায় দা-এর পোঁচ পড়ে চলেছে ঠিক মতোই। নামাল নিয়ে ফাঁদা লাইবুকার গান— "সকালেই শুই উঠি দে গো বিটি নাম্হালের টাকা, নাম্হালের টাকা তো আর মুফতে হয় না—চামরাঙা দেহে হায় কালি পড়িল—" গল্পের ঠেলায় সেই গান যা এখন থেমে গেছে। শঙ্করীডাঙার লোধামেয়েদের শরীরস্বাস্থ্য বর্ণনায় কান খাড়া করে আছে লাইবুকা।

নীলুয়া বলে চলেছে, তাদের তো আর আলু-তুগ্গ তাড়তে হয় না, কাঠ-পাতা ছিঁড়তে হয় না, কোথায় কাঁকড়ো কোথায় বন-কুঁদড়ি আঁতিপাঁতি ঢুঁড়তে হয় না, খেতে হয় না আঁউলা-বাঁউলা কুরকুট-মুরকুট আলতিশাক-বিছুতিশাক গোধিসাপ-ঢ্যামনাসাপ খঙ্গা-বঙ্গা। তারা খায় মুঠা মুঠা শুকনাভাত চাযের চালের, কত রকম মাছ বহন্তি নদীজলের। আর নদী-সে তো হাত বাড়ালেই—

কোন লদী নীলুয়া, কোন লদী?

নদী তো ঐ একটাই— কুঠীঘাটে যা পাতিনায় তা, রোহিণী-লবকেশরপুরেও যা নয়াগ্রাম-ভসরাঘাটেও তা, আর সেই তো দাঁতনেও—

সুবর্ণরেখা, সুবর্ণরেখা।

কোথায় বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙা আর কোথায় নীলপুরা-বড়া-কোটপাদা-পলাশিয়া-পানসোলা বেলমুলার নদী সুবর্ণরেখা! তবু নীলেশ্বর বলতে ছাড়ল না— সে তো হাত বাড়ালেই—

লদী ধারে যাস নাই নীলু?

নাই, গেলেই ত ঘর যেতে মন করবে।

নুকুর মুখের উপর যতই বলুক— ঘর নাই যাব গ দিদি— ঘরের কথায় মুহূর্তে আনচান করে উঠল হাড়িয়া-লাইবুকা-বড়কইরা। ঐ তো কটা ভুগড়া, কুম্বাঘর! তাও তো ভাঙা কুম্বা, এককালে দু-চাট্টা টিন যাও বা ছিল—এখন তো সব হাওয়া। তার উপর জল-ঝড়িয়া নরসিঙার বুট, হাত-লাঠির কেরদানি-চালের দফা রফা! তবু তো আছে ঠাকুরবাঁধ, সরুবালি-চিক্কনবালির বাঁশতলা, মাঝুডুব্‌কা, তপোবন-পাতা ঝড়ঝড়—

কেউ একজন ফট্ করে বলে বসল, তালে ঘর যেতে তোরও মন করে?

হঁ করে বৈকি—

কী বলতে কী বলতে যাচ্ছিল নীলুয়া, এক হেঁচকায় শিকলি টেনে ইল্লিকে কাঁধে তুলল। ফের সাবধান হয়ে বলল, তবে সে 'ঘর' আলাদা.ঐ বলে নাই—জননী জন্মভূমি— ও তোরা বুঝবি নাই।

নাই বুঝলম বেশ, কিন্তু একটাকেও পটাতে পারলি নাই?

শঙ্করীডাঙার চিকন চিকন মেয়েদের কথা তুলল লাইবুকা। সেই সঙ্গে শুনিয়েও দিল দু'কলি—"লিব লিব মন ছিল, তকে লিবার বড় মন ছিল। এত যদি লিবার মন ছিল ত, শিশুবেলা সিন্দুরদান কেনে নাই দিলি।।'

শঙ্করীডাঙার নিটোল নিটোল লোধামেয়েদের নীলেশ্বরের এত যদি পছন্দ তবে শিশুবেলায় না হোক এখনই সিঁদুর ঘষে সে কেন একটাকেও নিয়ে এল না?

বড়কই বলল, পটাতে মন করলে নীলুয়ার আর কতক্ষণ! আছে ত এখনও দিনাকতক. উসব ত হবেই। কিন্তু—

কী?

ফিস ফিস করে বড়কই বলল, চাঁদবদ্‌নীর কী হবে?

নীলুয়ার মন বুঝে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করল বড়কই-লাইবুকা-নাকফুড়রিরা। লাইবুকাই বলল, ধুর বে! জানিস নাই— ঘরের কইন্যা সিঁগননাকী, শিশুবেলা থিক্যে দেখে আসছি উয়ার নাকে পোঁটা।

বন্ধুর নাম কি বললি?

জিতেন।

আচ্ছা ভালা, জিতেনের কুনো বহিন-টহিন নাই? —"শিমলফুলটি দেখতে ভালা উপরে লাল ভিতরে কালা।" লাইবুকা।

নীলেশ্বর মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলল, না, নেই। তবে তার এক পিসি আছে, বাবাজিদের নামে নাম বকড়ি—

বলেই বকড়িবিটির গল্প শুরু করে দিল নীলেশ্বর। সে-গল্প আর ফুরোয় না, ফুরোয় না। কিয়াডাংরির ঝুঁজকো জঙ্গলে দেখা, তারপর ইল্লির মাধ্যমে আলাপ, তার সঙ্গেই তো কিয়াডাংরি পেরিয়ে শঙ্করীডাঙায় জিতেনের বাড়ি যাওয়া—

নীলেশ্বর শুনিয়ে দিল— আমার যেমন সাবিবিটি জিতেনেরও তেমন বকড়িবিটি। দুজনকার মিল একেবারে কাটে কাট!

বকড়িবিটিও কী বেহা করেছে কুম্‌হার ছাউ?

নীলুয়া তো আর সত্যি সত্যি জানে না— জিতেনের বকড়িপিসি বিয়ে করেছে কী না। তবু মিথ্যে করেই সে বলল, জিতেনের বকড়িবিটি এখনো বেহা-ই করে নাই।

ফট্ করে তার মনে পড়ে গেল—হ্যাঁ তাই তো, অশ্বত্থগাছতলায় খাটিয়ার বাজুর সঙ্গে দড়ি দিয়ে যার ষাঁড়া-খুকড়া বাঁধা— সেই পাদুরাবুড়াই তো জরপ করে জিতেনের পিসিকে বলেছিল, হঁ ধনি, তুঁই যবে আমাকে সাঙা করবি, সাঙা ন বিহা?

সাঙা না বিয়ে?

প্রথমবার বিয়ে তো বিয়েই, দ্বিতীয়বার বিয়ে তো 'সাঙা'। পাদুরাবুড়া নির্ঘাত বিয়ে করেছে একবার, তার সঙ্গে বকড়ির প্রস্তাবিত দ্বিতীয়বার বিয়ে তো সাঙা-ই। তার মানে তো আর প্রমাণ হল না— বকড়িপিসিও বিয়ে করেছে একবার? তবে সরুপাড় টিয়ারঙের খুড়দা শাড়ি পরেছিল বকড়ি, স্পষ্ট মনে আছে নীলুয়ার।

বকড়িবিটি বেহা নাই করুক, তোর সাঙাৎ জিতেনও কী বেহা করে নাই?

নাই, তবে—

কী তবে?

নীলুয়া বুক ফুলিয়ে বলল, তবে কত মেয়ে যে এসে পায়ে পড়ছে, সাধাসাধি করছে! জিতেন খালি একবার 'হাঁ' করলেই হল। কিন্তু এখন সে বিয়ে করবে নাই, তার টাইম কোথায়— সে তো এখন 'পাটিবাজি' করছে!

সাইকেল মেরামতি থেকে পার্টিবাজি—জিতেনের অজস্র গুণের কথা গড় গড় করে হাড়িয়া-লাইবুকা-বড়কই-নাকফুড়রিদের শুনিয়ে গেল নীলুয়া। শুধু কী বড়কই-হাড়িয়া-লাইবুকারাই শুনল, এ-বিল সে-বিল শ্রীমন্তর বিল উপছে অদ্বৈতর বিলে এসে সে কথা কী ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীদেরও কানে ঢুকল না?

ঢুকছে বৈকি। নীলুয়া তো প্রত্যেকবার এইরকমই করে। মাঝে মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎই কোথায় কোথায় যে উধাও হয়ে যায়, সাঙাৎ-ঘর বন্ধুর বাড়ি অমুক বিটি অমুক ফুফার ঘর ঘুরে এসে মউজ করে লাইবুকা-হাড়িয়াদের শোনানোর ছলে চাঁদবদনী-গুরুবারিদেরও শুনিয়ে দেয়।

শুনতে শুনতে সময় সময় বিরক্ত হয়ে চাঁদবদনী ধানকাটা থামিয়ে ভুটকী পুনোইদের হাঁক দিয়ে বলে, জল সঁসাচ্ছে, চ ত জল খাঞে আসি! বলেই দলবল নিয়ে জল খেতে সে 'স্যালোয়' যায়। জল তো খায়ই, আঁজলা-আঁজলা জল নিয়ে মুখে-চোখে ছিটায়। নিজের মুখে ছিটিয়ে এর-তার মুখে-দেহেও ছিটিয়ে দেয়। 'জল-জল' করে মাঝে মাঝে কী আর গেয়ে ওঠে না—"জলে হেল জলে খেল জলে তুমার কে আছে। ভাল করে ভাইবে দেখ গ' জলে শ্বশুরঘর আছে—?"

চাঁদবদনী-পুনোই-গুরুবারিরা দলবেঁধে জল খেতে চলে গেলেও নীলুয়ার গল্প ফুরোয় না। ফুরোয় না, ফুরোয় না। বরঞ্চ দ্বিগুন আক্রোশে সে আরো জুতসই গল্প ফেঁদে বসে। তাব ঝুড়িতে এখনো তো কত কী আছে!

উঠল ম্যাজিকের কথা।

নীলুয়া বলল, ম্যাজিক কী না জানি নাই তবে নিজের চোখে ত দেখে আইলম।

ধান কাটতে কাটতে খাড়া হয়ে লাইবুকা-নাকফুড়রিরা উৎসুক হয়ে বলল, কী দেখলি নীলুয়া, হঁ কী দেখলি?

নীলুয়া গম্ভীর হয়ে বলল, দেখে আইলম— একটা ইন্দুর হাতিকে গিলছে!

হঁ-অ?

প্রথমে অবাক হয়ে পরক্ষণে নীলুয়ার 'ঢপ' বুঝে হো হো করে হেসে উঠল লাইবুকা-বড়কই-হাড়িয়ারা।

নীলুয়া বলল, হাসছিস তোরা, কিন্তুক হাসির কথা লহে—সত্যি সত্যি একটা ইন্দুর হাতিকে গিলছে!

কে জানে কী কথা বলতে চায় নীলেশ্বর! পেটে তো আছে খানিকটা কালি-গোলা জল। তাই সে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলে। কথাতেই তো আছে— "টিকটিকি হয়ে ডুমুর গিলছে"। সেই ধরে বলছে কী না নীলেশ্বর!

তাই তাই।

নীলেশ্বর এবার তুলল শঙ্করীডাঙার বাট-ভিখারী শুশনি নায়েকের প্রসঙ্গ। পঞ্চায়েৎ থেকে পঁচিশ শতক ধানী জমি বর্গা পেয়েছিল বাট-ভিখাবী শুশনি। পাঁচরোলের বড়চাষী বাবলু শাসমল সেই জমি ফের হাতিয়ে নিল। হাতি হয়ে গিলে ফেলল ইঁদুরকে।

এবার ঠিক তার উল্টোটা। সেই জমি পুনরুদ্ধারে নেমেছে শঙ্করীডাঙার জিতেন-বলাই-ত্রিলোচন-খুদু-বাঁঠু-মার্কুগুরা। কী করে ইন্দুর হয়ে এবার হাতিকে গিলে ফেলবে—সেই ম্যাজিকটাই শিখে এসেছে নীলুয়া। সেই যে সেই—"মাননীয় শ্রী......"

হাবি-জাবি গল্পে মেতে আছে হাড়িয়া-নাকফুড়রি-লাইবুকারা, মাতিযে রেখেছে নীলুয়া। হাতের দা তেমন খর খর চলছে না। সুর আসছে তো ঠিক তাল আসছে না। অদ্বৈতর থেকে পিছিয়ে পড়ছে শ্রীমন্তর নামালিয়ারা।

হিড়মুড়ায় বসে সেসব দেখে যাচ্ছে অদ্বৈত, কিন্তু এসব দেখেও যেন দেখছে না সানোভাই শ্রীমন্ত। মাঝে মাঝে নামালিয়াদের গল্প শুনে সেও হাসাহাসি করছে। চাষবাসের কাজে কম মনোযোগী, ধান ছেড়ে পান কী চিংড়ি চাষে মাথা বেশি— সেই 'বকার বুজলি বহা' ভাইকে পেয়ে নামালিয়ারাও বুঝে গেছে। কথায় আছে না— "উশাস মাটি-এ বিলেই হাগে?" নরম মাটি পেলে বিড়ালে পায়খানা করে।

'রকম' দেখে উঠে দাঁড়াল অদ্বৈত। নিজের বিল ছেড়ে সে এখন যাবে সানো ভাই শ্রীমন্তর বিলে।

উত্তরের বিল দক্ষিণের বিল, পুবের বিল হোক আর পশ্চিমের হাক— বামনদার সব বিলেই আজ আধাআধি। আদ্ধেক কাজ পুরা মজুরি। মাড়োতলায় বচ্ছরকার পূজা, অন্যকাজ ব্যবসাদি দোকানপাট বন্ধ। আধবেলার জন্য কম বেশি সব চাষি-গিরিহাই এসে গিয়েছে বিলে। হাত লাগিয়েছে ধান কাটার কাজে, কেউ কেউ ছাতামাথায় হিড়মুড়ায় বসে। ঠাট্টা-ঠিসারা করছে ধানকাট্‌নীদের সঙ্গে। ধানকাটনীরাও তেমন, ঘুরে-দাঁড়িয়ে উত্তর দিচ্ছে 'জবপ' করে। কাটা ধানবিড়া নিয়ে যেতে গরুর গাড়ি লেগেছে। গাড়ির জোয়াল থেকে ছাড়া গরু শ্যাঁ-ফোঁ আওয়াজ তুলে মুখ দিতে চাইছে ধানবিলে। কিন্তু পারছে না, মুখে যে 'জালি' দেওয়া!

অদূরে বামনদার মোরামরাস্তায় ধানের গাড়ি ছাড়াও চলেছে ভ্যানরিক্সা-ট্যাম্পো-ম্যাটাডোর ঢকাং ঢকাং। 'হাউসি' লোকজন এর মধ্যেই যেতে শুরু করেছে শীতলামাড়োতলায়। লোক যেমন যাচ্ছে তেম্নি আসছে মেলায় বেচাকেনার দ্রব্যাদি। পণ্ডায় পণ্ডায় রসের জিলিপি তৈরি করার তৈজস—কড়া-হাতা-খুন্তি। কেশরআলু, ঢেন্ডিপালি।

অদ্বৈত যেমন গেল শ্রীমন্তের বিলে, তেম্নি উমেশ ভঞ্জ পাড়ি দিল বসন্তের বিলে, রমেশ ভুএ্যা একবার টুঁ মেরে এল পূর্ণরাজের 'পড়িয়া'য়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয় স্বচক্ষে দেখা—কে কাকে টেক্কা মেরেছে, কে কত আচ্ছা আচ্ছা তাগড়াই নামালিয়া জুটিয়েছে, বিশেষত মহিলা। পুবের বিল দক্ষিণের বিল কী উত্তরের বিলে আজ পড়ে গেছে উৎসব।

উৎসব, উৎসব।

এপাশ ওপাশ ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি। এই শোনা গেল, শিগ্রি অউ ক'পাঁহি কাটি পকা, মেলাকু যাইতে হব নি? তো আরেকদিক থেকে ভেসে এল—তু হলু বড়চাষী, আমহর ছুটোখাটো, তোর কথা আলাদা। পরক্ষণেই গলা ছেড়ে জিজ্ঞাসা—সবু ধান বেচি দিলু অদা? দর কী যায়েটে? কেউ আর কাউকে বলল, তু এতেদিন মেদিনীপুরে কার কোত্‌রে গেছলু রে? সবই জানা, তবু একজন আরেকজনের কাছে এম্নি এম্নি জানতে চাইল—'যাত্রা কুম্পানী' কী পালা নামাইটেরে, 'মীরার বঁধুয়া' নাকি 'শাশুড়ি আসামী বউ দারোগা'?

মেলায় যেতে হবে, মেলা-দেখার লোভে তাড়াতাড়ি ধান কাটা, ধানের দর, ধান বেচা, মেদিনীপুরে কার কাছে যাওয়া, আজ কী যাত্রা—এসবই কথার কথা, আসলে এক ফাঁকে চোরা চোখে দেখে নেওয়া এই মরসুমে কার বরাতে কেমন জুটেছে নামালিয়া!

নামালিয়া, নামালিয়া।

হাটুয়া গিরিহারা গেলু-থিলু যায়েটে-আসেটে খুড়ুমুড়ু ভাষায় যতই যা কিছু বলে যাক, নামালিয়াদের মন কিন্তু পড়ে আছে মেলায়, বিশেষত গুরুবারি-ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীদের। না জানি কত কী হবে সে-বেলায় শীতলাবুড়ির মাড়োতলায়!

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ যেন বিলে চড়িই-চটি নেমেছে বেশি বেশি। বনি-পায়রা-কপ্‌তি-বক। এক পা তুলে এক পা ফেলে পাঁহি মাপছে, পাঁহি ভাঙছে আর ঘাড় 'নুই নুই' করে খুঁটে খাচ্ছে পোকামাকড়, ধানপোকা ধানের গু। পাখি ধরার আঠাকাঠি আজও নিয়ে এসেছে সুরুয়ারা। কতক্ষণ আর থাকবে বিলে! ফাঁদ পাততে না পাততে এখনই তো ধানকাটা সেরে যেতে হবে গিরিহার ঘরে। আর তাছাড়া ঠাণ্ডা-উপাস, চুল্‌হা-ই জ্বলবে না তো পাখির মাংস জুত্‌ করে রাঁধা? শুধু ধরলে তো হবে না, ধরো রে পালক-চুলক উপড়াও রে আগুনে ঝলসাও রে কাটো রে রাঁধো রে আর তাছাড়াও মন তো পড়ে আছে মেলায়!

ধানের 'টুঙ' কুড়োতে এসেছে কে জানে কোথাকার ঝিউড়ি-বউড়িরা। ঝুড়ি বগলে আঁচল চাপা দিয়ে ধানের শিষ লুকোচ্ছে— টুঙের বদলে সময় সময় একটা আস্ত ধানশিষ কী আর হাত মুঠোয় উঠে আসছে না? লোধানামালিয়ারা দেখেও দেখছে না। অথচ টুঙ তো টুঙ টুঙের একটা ধানও খুঁজে পেতে পাড়িয়া-পাকুড়তলা-জাঁতালের বিল-বুলান-হদহদি টঙস-টঙস করে কোথায় কোথায় না গেছে! শাবলে-খন্তায় আস্ত হিড় কেটে "খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি" ইঁদুরের গর্ত চুঁড়ে খুঁজে বের করে এনেছে ইঁদুর-ধান! আজ টুঙ, একটা আস্ত ধানশিষ তো কোন্ ছার বড়ো অবহেলায় কেটে ফেলছে গোছা গোছা ধানগাছ। কেটে হালা করে হেলাফেলায় ছড়িয়ে দিচ্ছে মাঠময়।

মাঠময়, মাঠময়।

মাড়োতলায় মাইক বাজতে শুরু করেছে। কাঁপা কাঁপা সে-আওয়াজ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এতদূরে ধানবিলেও এসে যাচ্ছে। গান নিয়ে লাইবুকার উৎসাহটাই বেশি। সে ধানকাটা থামিয়ে কান খাড়া করে শুনছে। সুরটা আসছে তো কথাগুলো আসছে না—

সে বিড় বিড় করে সুরটা খুঁজছে, উঁ-হু মিলছে না। মিলুক আর নাই মিলুক সে তো পাঁতা-নাচের একটা সুর ধরল—

"হামার বঁধু কাঠ চিরে পাঁচকাহিনার বনে
ও ননদ লো হামি যাব নিজেই 'ব্যাইসাম' দিতে—"

মাইক তো একরকম, কে যেন, কারা যেন বিলের কোন দিকটায় কেঁদরা কী চার-ছ'আনার ব্যাঙ-বাজনা কী চেরপেটি একটানা বাজিয়ে চলেছে। বাজনাটা কাঁপতে কাঁপতে ধানগাছের মাথায় এসে ধানগাছের মাথা দোলাচ্ছে।

মেলায় কেনা চেরপেটি? ব্যাঙ-বাজনা? চ্যাঙ্গা-ম্যাঙ্গারা হাত নেড়ে বাজাতে বাজাতে ধানগাছের মাথা সমান হয়ে আলপথে হেঁটে চলেছে পুবের বিল থেকে উত্তরের বিলে, উত্তরের বিল থেকে দক্ষিণের বিলে।

নাকি কেঁদরা? সান্তালরা নামাল খাটতে এসে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কেঁদরা, কাঁড়বাঁশের ছড় দিয়ে তাই এখন বাজাচ্ছে— রুঁ-অ-রুঁ-রুঁ-অ-রুঁ রুঁ-অ-রুঁ-রুঁ-অ-রুঁ—

একটানা তো একটানা, থামছে না। থামছে না, থামছে না। কেঁদে কেঁদে উঠছে, উঠে ফের গলে গলে পড়ছে। দিঙ্ দিঙ্ করে বেলাও বাড়ছে। তিতিবিরক্ত গিরিহারা উঠ্-বস্ করছে, এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারছে। হাটুয়া ভাষায় বলাবলি করছে— কেঁউ-কেঁউ করি বিলেই ডাকুছি কে? কার মনর এতে রস হেলা? বজাইবু ত যা না মাড়োতলকু— সিত্র আজ কেতে রকম নাচাগানা হেউছি!

কেঁউ কেঁউ করে বিড়াল ডাকছে কে? কার মনে এত রস হল? বাজাতে চায় যাক না মাড়োতলায়—সেখানে কত রকম নাচগান আজ! শ্রীমন্তর বিলে এসে অদ্বৈত হাড়িয়া-লাইবুকা-নীলুয়াদের উদ্দেশ্য করে বলল, কিরে টকামনে—কাজের বেলায় কুড়িয়া নিবার বেলা চটপটিয়া—খালি ত ফাসুর ফুসুর, হাসুচু-গাউচু। ধান কাটুবু কতবা?

গিরিহার তেড়া-বেঁকা কথায় গা জ্বলে যাচ্ছিল নীলুয়ার। কিন্তু মুখ ফুটে একটা কিছু বলল না—আগের দিন কামাই করে এই তো সবে সে কাজে লেগেছে।

লাইবুকার বলতে ইচ্ছা হয়েছিল বৈকি— ধান কাটছি না তো কী আলু-তুণ্ডা তাড়ছি? সেও চেপে গেল। ওবেলা মেলা দেখার ভিডিও দেখার পয়সা তো নিতে হবে গিরিহার হাত থেকেই।

দাদা যতটা কড়া করে বলতে পারে মুখচোরা শ্রীমন্ত আবার ততটা পারে না। সে শুধু বলল, ছেড়ী দেই কি পত্‌লি মাড়া যায়! ছাগল দিয়ে কী আর ধান মাড়ানো যায়!

কী বলতে চায় শ্রীমন্ত? অদ্বৈত ভাবল ভাই কী এই কথাই বলতে চায়— দাদা বেছে বেছে যতসব অঘা-বঘা নামালিয়াদের ঠেলে দিয়েছে তার দিকেই?

তাকে যেন পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে অদ্বৈত বলে উঠল, ছেড়ী কাঁই দেখলু রে সবু ত ছেড়ীর বাপ। আচ্ছা, তুই ঘর যা— মু দেখিটি নেগুড়ে হাত দিনে কী করি কুঁড়িয়া গরু পছেই যায়! লেজে হাত দিলে কী করে তারা পিছিয়ে যায়!

সত্যি সত্যি ঘরে চলে গেল শ্রীমন্ত, নামালিয়াদের নিয়ে পড়ে থাকল অদ্বৈত। সে জানে কী করে 'ছেড়ী' দিয়েও পত্‌লি মাড়ানো যায়। 'বিলেই ডাক'টা এখনও কিন্তু থামেনি—রুঁ-অ-রুঁ রুঁ-অ-রুঁ করে বেজেই চলেছে। বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে।

সুরুয়া-লাইবুকা-হাড়িয়ারাও ধানকাটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা কী আর জানে না— 'পাঁহী' শেষ না হলে তাদের ছাড়বে গিরিহারা! আর তাছাড়া পাঁহী কোনমতে শেষ করতে পারলে তাদেরও তো ছুটি। ছুটি, ছুটি। ছুটির পরে সেজে গুজে তারাও তো যাবে মেলায়।

ধান কাটতে কাটতে হাতের দা ফেলে গা ঝাড়া দিয়ে আঁতকে উঠল চাঁদবদনী, ইগো মা!

কী? কী হৈল রে?

ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরাও ধান-কাটা থামিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শাড়ি-ব্লাউজ ঝাড়তে ঝাড়তে চাঁদবদনী বলল, পিঠে বেলাউজের ভিতর কী একটা সামাইল দেখ ত ধন!

মুহূর্তে জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে পুনোই মুঠো করে তুলে আনল একটা গুছিপোকা। ফেলে দিয়ে পিঠে কিল মেরে বলল, ডরপেলকু কাঁহিকা, গুছিপোকাকেও তোর ডর! আমার যে জামায় অতবড় খোঁচা দিয়ে মাইয়ের চারধারে গিরগিতি দিল মাষ্টারটা তারবেলা?

হো হো করে হেসে উঠল ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা।

চিৎকার-চেঁচামেচি-হাসাহাসি শুনে শ্রীমন্তর বিল থেকেই অদ্বৈত হাঁক ছাড়ল, আরি আউ কেতে হাসাহাসি করবু! তমানে হাসবু কতবা কাটবু কতবা আবলে মেলাকু যাবু কতবা?

তাই তো, এত উঠা-পড়া হাসাহাসি করলে তারা ধান কাটবে কখন আর মেলাতেই বা যাবে কখন?

মেলা মেলা। যেন নামালিয়াদের মুখের সামনে আজ 'মেলা' নামের কী একটা জিনিস অবিরত নেড়ে চলেছে গিরিহারা আর তারই লোভে লোভে নামালিয়ারাও পুতুলের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে, এগিয়ে-পিছিয়ে ধানের পাঁহী কেটে চলেছে।

মেলার নামে কোথায় কোথায় না গিয়েছে তারা! বাঁদনায় শিং-য়ে তেল-সিঁদুর গলায় গেঁদাফুলের মালা পরা গরুর 'যাত' দেখতে গোঠটাঁড়ের মাঠে, মকরে আখের বিল মুগচনার বিল পেরিয়ে আলতা-সিঁদুর-মালা-ঘুনসির মকর-যাত দেখতে মহিষাসুরের দঁকে, শিবরাত্রিতে শিবচর্তুদশীর মেলা দেখতে দেউলবাড়ের রামেশ্বরে, 'বান্নি'র মেলায় ঝুলন আগু-মাড়া-গয়লাভার দেখতে পিল্ পিল্ করে খান্দারপাড়ার কুঁড়পুকুরের ধারে—

ঐ হৈ-রৈ করে মেলাতেই যাওয়া, মেলার ভিতরে তো নয় মেলার বাহিরে কোথাও 'থাপস্ গাদা' হয়ে বসে থাকা! উলু-ভুলু চোখে চেয়ে চেয়ে দেখা— ঐ তো নুয়াসাহীর ভূমিজপাড়ার মড়ে সিং 'ফরি খেলা'র দল নিয়ে মহিষাসুরের মকর-যাতে মাথার উপর পাঁই পাঁই করে লাঠি ঘোরাচ্ছে আর মথো ডোম ঢোল বাজাচ্ছে, ঐ তো 'মহড়া নাচে' কাগজের কাঁড়-কাঁড়বাঁশ নিয়ে নেচে নেচে আসর মাত্ করে দিচ্ছে ফাটাদার সিংয়ের ছেলে লালমোহন সিং, ঐ তো গোঠটাঁড়ের 'গরু-খুঁটায়' শুকনা গরু-চামড়া নিয়ে কপালে ধানের 'মোড়' পরা রাগী গরুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গোবরাসাঁওতাল! এর ভিতর দিয়ে তার ভিতর দিয়ে ঐ একজনাই— ঐ চাঁদবদনীই— একবার কী করে মেলার এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ঢুকে পড়েছিল কুমহারপাড়ায়! নচেৎ আর সবই তো বাহির বাহির। পয়সা কোথায় যে মেলায় ঢুকে একটা কিছু কিনে ফেলবে! আর পয়সা ছাড়া মেলায় ঢুকে এদিক-সেদিক এ-দোকান সে-দোকান ভ্যাল্‌ভ্যাল্ করে চেয়ে থাকলে লোকে তো বলবে 'চোর'!

চোর, চোর!

কিন্তু নামাল দেশের মেলায় যেতে তো সাধাসাধি করছে গিরিহারাই। শুধু কী সাধাসাধি, হাতে গুঁজে দিচ্ছে মেলা দেখার পয়সা। খাও রে, ভিডিও দেখ রে, ঢেঙ্গী খেলো রে!

অদ্বৈত সুযোগ খুঁজছিল কী করে কাল রাতের সেই বউটার মুখোমুখি হয়ে দুটো রসের কথা সে বলে ফেলে। তার এখনও ধন্দ যায়নি— সন্ধেবেলায় যাকে সে জড়িয়ে ধরেছিল আর রাতের বেলায় যাকে সে দেখেছিল রুমরুম দাঁড়িয়ে থাকতে— সে কী একজনাই? এই শত্রুঘ্নর বউটাই?

নীলিমার দেওয়া পুরাতন একটা শাড়ি পড়েছে সে। কথা দিয়েছিল অদ্বৈত মেলায় যেতে তাকে আরও একটা চক্রাবক্রা শাড়ি পাইয়ে দেবে নীলিমাকে বলে-ক'য়ে।

কোমর নুইয়ে নুইয়ে একটানা ধান কেটে চলেছে নিয়তিলোধানী। একবারের তরেও এদিকে তাকায়নি। অদ্বৈতর দৃষ্টি পড়ে গেল এখন তার দিকেই।

ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীদের 'হুরি'-তে শ্রীমন্তর বিল ছেড়ে নিজের বিলে একেবারে নামালিয়া বউড়ি-ঝিউড়িদের 'পাঁহী'-তে হাজির হয়ে গেল অদ্বৈত। ততক্ষণে 'হুরি' থেমে গেছে নামালিয়া বউড়ি-ঝিউড়িদের।

তবু মরীয়া হয়ে অদ্বৈত গায়ে পড়ে শত্রুঘ্নর বউ নিয়তিকেই জিজ্ঞাসা করল, কি গ শত্রুঘ্নর

বোহ্, আজ যে মোটে রা কাড়লুনি? চুপ কেনি?

'হুরি' করলে দৌড়ে আসছে গিরিহা, আবার কথা না বললেও বলে কী না— আজ যে মোটে রা কাড়লুনি? বড় অদ্ভুত লোক তো!

সটান খাড়া হয়ে দাঁড়াল বউটা। বলল, হঁ কী বলছিস?

তার অমনধারা খাড়া হয়ে জবাব দেওয়াব ভঙ্গিতে বাকি বউড়িরা হেসে উঠল। সাপের মতো যেন ফনা তুলে দাঁড়িয়েছে নিয়তি।

অদ্বৈত দেখল— বউটা সত্যি সত্যি ঢ্যাঙা, তবে 'তাগদ' আছে—যুজতে পারবে।

কেঁদ্‌রাটা 'রুঁ-অ-রুঁ রুঁ-অ-রুঁ' করে এখনো বেজে চলেছে। ধুলমাদুল ধুলমাদুল। তুলো ধুনোর মতো যেন ধুনে দিচ্ছে বামনদার পুবের বিল উত্তরের বিল দক্ষিণের বিল। শুধু কী ধান, ধানবিল— মাঠে থাকন্তি ধানকাট্‌নীদের ভিতরটাও যেন ফালা ফালা করে চিরে দিচ্ছে। এ ফোঁড় ও ফোঁড়।

কী যেন একটা কোথাও ঘটে চলেছে! টের পাচ্ছে সবাই কিন্তু বলতে পারছে না। ভিতরে ভিতরে 'থকো বকো' হয়ে যাচ্ছে চিন্তায়। চিন্তাটাকে মাছি তাড়ানোর মতো উড়িয়ে দিতে চাইছে কেউ কেউ, পারছে না।

অদ্বৈত পড়ে গেছে মুস্কিলে, কী বলতে কী— বলতে এসেছিল সে, কথাব খেই হারিয়ে লোধানীদের সঙ্গে সেও হেসে উঠল।

বলল, কে কী বাজ্‌না বজাইচে ক ত? বিলেই ছানাপরি সকালনু মিউঁ-মিউঁ করি কানর খোল বার করি পকিলা!

কে কী বাজাচ্ছে? সকাল থেকে বিড়ালছানার মতো মিঁউ মিউঁ করে কানের খোল পর্যন্ত বের করে ছাড়ল!

আড়মোড়া ভাঙল লোধানী। ভেঙে একটা হাত মাথার উপর বেড় দিয়ে আরেক হাতে হাতটা টেনে ধরে বলল, কে কী বাজাচ্ছে— তার হামি কী জানি গিরিহা! তকে শুনতে বা কে বলছে— শুন্‌নিস নাই।

অদ্বৈত দেখল— ভারি অদ্ভুত ভঙ্গিমা! ঢ্যাঙা বউটা ঢঙও জানে, ছলাকলা!

সে ফের মনে মনে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার 'নবাব নবাব' পোজ্‌টা নিয়ে এল। ধানরোয়া ধানকাটার মরশুমে যার চালায় যার খলায় যত সরেস নামালিয়া বিশেষত মেয়েরা— সে তত বড় চাষী।

বড়চাষী অদ্বৈত গানবাজনা ছেড়ে অতঃপর মন দিল চাষবাসেব কাজে। শতুরার বউকে প্রায় ঠেলা দিয়ে বলল, হঁ হঁ, বেল ঘুরি গলানি, যা যা আর ক'পাঁহী কাটি পকা।

ধান কাটতে নেমে গেল নিয়তি। দিঙ দিঙ্ করে বেলাও বেড়ে চলল। একসময় কে যেন ঘন্টাও বাজিয়ে দিল হাফ-ছুটির। যে যার পাঁহী শেষ করে উঠে পড়ল। মাঠময় এখন শুধু নামালিয়াদের হাঁড়িকুঁড়ি বাসনকোসন বাটি-তাটিয়ার ঠোকাঠুকি। খালি বাসনকোসন নিয়ে বাসায় ফিরে চলল নামালিয়া বউড়ি-ঝিউড়িরা। কাটাধানের হেলা মুচড়ে মুচড়ে তখনও বেঁধে চলেছে নামালিয়া পুরুষরা। তাদের ছুটি এখনও হয়নি। ধানবিড়া বাঁধবে, বেঁধে কেউ তুলবে গরুর গাড়িতে কেউ তুলবে ট্রাক্টরে, কেউ কেউ সিকা-বাঁউক কাঁধে স্নিক্ স্নিক্ আওয়াজে ঝমর ঝমর ধানছড়া দুলিয়ে পৌঁছে যাবে গিরিহার খলা-খামারে। আর কেউ ছুটির ঘন্টা পড়ে গেলেও উঠছে না, এখনই কী, আরেকটু গুছিয়ে নিক। ছুটি হলেই কী উঠতে হবে! গিরিহার কাজ তো তারই কাজ, গিরিহার চাষ তো তারই।

বাজনদারেরও এখনও ছুটি হয়নি। রুঁ-অ-রুঁ রুঁ-অ-রুঁ —একটানা বেজেই চলেছে বেজেই চলেছে।

কোনদিক থেকে আসছে বাজনাটা বাতাস শুঁকে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল অদ্বৈত। উঁ-হু, ধরতে পারছে না।

বাজনদার কী মাটিতে শুয়ে পড়ে বাজাচ্ছে? সে কী গাছে উঠে ডালপালার আড়ালে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বাজাচ্ছে? নাকি কলের বাঁশি বাজিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেছে আর কোথাও?

শত্রুঘ্নর বউটা তো বেশ বলেছে, "তোকে শুনতে বা কে বলছে," শুনব না শুনব না করে সত্যি সত্যি এবার কানে আঙুল দিয়েছে অদ্বৈত। বিড় বিড় করে দেহবন্দন করেছে, "হাট কইতে হাট বন্দম। বাট কইতে বাট বন্দম। ঘাট কইতে ঘাট বন্দম। ভূত কাইতে ভূত বন্দম।। প্রেত কইতে প্রেত বন্দম—"

কাঁইরে গোবর্দ্ধন, উঠি পড়। দেহে তোর অখনও বল আসেনি, অসুখনু অউ ত সারি উঠলু! গিরিহার কাজকে নিজের কাজ ভেবে তখনও বিড়া বেঁধে চলেছে গুরুভা।



একদিনেই কেমন বদলে গিয়েছে অদ্বৈত পৈড়্যার খলা-খামার ঘর-দোর। একই তো সব জিনিস— সেই চালাঘর মেসিনঘর পোখরিআড়া ধানের গুদাম আনাজখেতি পুরাতন বউ পুরোনো ছেলেমেয়ে— কিন্তু একবেলাতেই কেমন যেন সব অন্যরকম। অন্যরকম, অন্যরকম। শুধু কী অদ্বৈত পৈড়্যার ঘরদোর-বাখুল-পরিবার-পরিজন, বদলে গিয়েছে গোটা বামনদাই, বামনদার অলিগলি রাস্তাঘাট দোকানপাট মায় লোকজনও। যে সমস্ত ঘরের হাটুয়া বউ-ঝিরা সচরাচর বাহির হত না ঘর থেকেই, আজ তারা সেজে-গুজে ঘর-বাহির করছে। নাচদুয়ারে দাঁড়িয়ে 'হুরি' করছে গজল্লা করছে, রাস্তায় চলমান লোকজন দেখছে আসন্তি-যাওন্তি— কে গেল কে এল। যে সমস্ত 'গেহলী' সুন্দরী বউড়ি-ঝিউড়িরা সহজে রা কাড়ত না, অনেক জিজ্ঞাসা করলে বড়জোর উত্তর করত 'হাঁ' 'না'— আজ তারাই বড়ো মুখরা হয়েছে। কাউকে আসতে দেখলে বলছে, মাড়োতলান্নু আইল? কাউকে যেতে দেখলে বলছে, মাড়োতলাকু যাউচ? ছোট ছোট 'টকামানে' তো সেই সকাল থেকেই বেরিয়ে পড়েছে, মাড়োতলা আলো করে জুড়ে বসেছে। 'ফু-ড়-র-র-র ফু-ড়-র-র-র' করে একটা বাজল ঘরের ভিতর তো আরেকটা বাজল ঘরের বাহিরে। পটকা দো-দমাও ফাটছে থেকে থেকে। সে কী শুধু বামনদায়? বামনদার দেখাদেখি আশপাশের গ্রাম কুলিদা-কড়িয়া-পাঁচকুনিয়া-ডিঙ্গিগেড়িয়ায়। বামনদা ফাটাচ্ছে তো তারাও—কোথাও কিছু না এম্নি এম্নি—ফাটিয়ে দিল দু-চাট্টা। বামনদার ভদ্র পাঁচজনা, মাড়োতলা পূজা কমিটির মেম্বাররা রীতিমত আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে আশপাশের গ্রামের বাবু-ভাইয়েদের কাছে, পঞ্চায়েতে। আমন্ত্রপত্র পেয়ে তারাও চাঁদা হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছে আগেভাগে থোক কিছু টাকা আনাজপাতি বৈতাল-কুমড়া-পুঁইখাড়া। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সপরিবারে তারা আসবে ওবেলা-স্কুটারে-বাইকে-মোটর কারে।

অদ্বৈতর বউ নীলিমার কাছে মাড়োতলার শীতলাপূজার গুরুত্ব বড়ো কম নয়। তার বাপের বাড়ি উড়িশা থেকে পূজা দেখতে বাবা-মা দাদা-বউদি কেউ না কেউ আসবেই আসবে. প্রতিবছরই তো আসে। আর তাই এই দিনটার জন্য মুখিয়ে থাকে নীলি, মনে মনে কী আর আক্ষেপ করে বলে না— "মাগো, ফিরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি?"

সকাল থেকেই সে খুব মউজে আছে। ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীরা সকালে যতক্ষণ ছিল— তাদের সঙ্গে খুনসুটি করেছে, বিল থেকে বেলাবেলি ফিরে এলে আবার তাদের পিছনে লেগেছে।

অন্যদিন হলে রাগ-চড়া দেখিয়ে বলত, এতে খর খর চালি আইলু? আউ টিকে কাটি আস্তু—

এত তাড়াতাড়ি চলে এলি? আর ক'পাঁহি ধান কেটে এলে পারতিস! কিন্তু আজ সে বলল, কাঁইরে বদ্‌নী, সাজুগুজু হেলা? মেলা দেখতে আউ যিবু কত্‌বা?

মেলা, মেলা।

এখনো খলায় পড়ে আছে ধান, এখনো ঝাড়া হয়নি পুরোপুরি। ধান ঝেড়ে বস্তায় 'অটার' করে গুদামে না তুললে গিরিহা কী আর তাদের মেলা দেখতে ছেড়ে দেবে? সে গিরিহানী যতই বলুক হলে-ঢলে!

চাঁদবদনীও তেমন, ঘুরিয়ে উত্তর দিল হাটুয়াতেই, ছুটি হবে যত্‌বা।

হাটুয়া গিরিহানীর সঙ্গে থেকে থেকে এতদিনে সে কিছু হাটুয়া ভাষাও শিখে ফেলেছে। উত্তর শুনে পুনোই-ভুটকী-গুরুবারিরা যেমন হেসে উঠল, নীলিমাও হাসল।

'গেহলী' গিরিহানী হলে-ঢলে যখন মেলা-দেখার কথা তুললই, তখন পুনোই-ভুটকী-গুরুবারিরা চাঁদবদনীকে চিমটি কেটে বলল, বল্ না বদ্‌নী, এসময়ই বল্ এই ত সুযোগ — চেয়ে নে না ঝলমল ঝলমল শাড়ি!

চাঁদবদনীও কেমন যেন বলে ফেলল, হঁ ত শাড়ি নাই দিলে সাজব কী করে গিরি্হানী? শাড়ি ত দিতে হবেক।

বলেই চাঁদবদনী ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিদের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসল। সত্যি-সত্যি সে লজ্জায় পড়েছে। আসলে সে তো আর আদেখলার মতো হাত পেতে শাড়ি চাইছে না, বলতে হয় বলা আর কি।

নীলিমা গিরিহানী খানিক চুপ করে থাকল, এ-ঘর ও-ঘর করল, সহসা কথার কোনো উত্তর দিল না।

পুনোই-ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরাও হাতের কাজ খর খর সারতে লাগল। হাতের কাজ বা আর কী— ধানঝাড়ার কাজ তো করছে বড়রা, ধান পাছড়ানোব কাজ করছে মা-কাকিরা। তারা বড়জোর বিড়া-গাদায় ওঠা লোকটার হাতের কাছে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে আর গাদায় ওঠা লোকটা সে-বিড়া লুফে নিয়ে গাদা করছে। একটা-দুটো বিড়া হাতের নাগাল না পেয়ে পরক্ষণেই মাটিতে কী পুনোই-ভুটকী-চাঁদবদনীদের মাথায় পড়লে হাসির হল্লা উঠছে।

উপরঅলা বেজার-বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ টিপ্‌নি কাটছে, ছেড়ী দিএ্রে কী পত্‌লি মাড়া যায়?

কী বল্লি?

কাই কিছু নাই।

ধানঝাড়া চলছে। কাঠের পাটায় পিটে ধুপধুপ! হাঁসকল থেকে কপাটটা খুলে এনে ধান ঝাড়বার পাটা করেছে পুরুষরা। পুরুষদের ভিতর ধানঝাড়তে নেমে পড়েছে গুরভার বউও। সেও পুরুষদের সমান সমান ধান পিটছে। তার শাড়ির আঁচলাটা ঘুরিয়ে মাথায় ফেট্টি করে বাঁধা।

ভুটকী-পুনোই-চাঁদবদনীরা খলা ছেড়ে উঠে এল মেসিনঘরের দাওয়ায়। ঐ যে খোঁটা দিল—ছেড়ী দিএ্রে কী আর পত্‌লি ঝাড়া যায়! ঐ যে ছেড়ী বলল!

ছেড়ী, তার মানে তো ছাগল। ছাগল বলল!

বসল গোল হয়ে। একথা-সেকথার পরে উঠল 'মেলা-যাতের' কথা। শীতলা-মাড়োতলার মেলা দেখতে গিরিহা-গিরিহানী 'ট্যাকা' দিলে তারা কী কী কিনবে? মহিষাসুর জ়লার 'মকরযাতে' কুঁড়পুকুরের ধারে 'বান্নি যাতে' রামেশ্বরের ডাঙায় শিবচতুর্দশীতে তারা কি কি কিনেছিল— সব একে একে মনে করল।

চুড়ি, চুড়ি, চাঁদবদনী দু'হাতে চারটা চারটা আটটা চুড়ি কিনেছিল মহিষাসুরের মকর-যাতে কাচের।

সেই যে সেই লীল রঙের?

হঁ-অ লীল ত বঠে, তার ভিত্‌রে ভিত্‌রে ধব্‌লা সুতার দাগ ছিল।

ভুটকী বলল, আমি বাবা চুড়ি-উড়ি কিনি নাই, উসব আমার ভাল্‌লাগে নাই। যা পৈসা খাএঞই উড়াঁয় দিলম, কটা আর পৈসা!

কী খাইলি?

তকে বলি— এক গিলাস লাল সরবৎ আরেকটা লাল 'হুল'।

হুল কী লো, বল্ আইসক্রিম। পুনোই ক'ক্লাস স্কুলে পড়েছে যে!

তুঁই কী খাইলি, পুনোই?

মেলায় যাই নাই তার ফের খাওয়া! সেবার আমি জামশোলে—আমার আজা ঘরে।

হঁ-হঁ মনৎ পড়ছে। তেখন তুঁই মামুঘরে—স্বরগ যাছি লাড়ু খাছি—মকর যাতে যাস নাই ধনি কিন্তুক বান্নিযাতে?

হঁ বান্নি যাতে—

কী খাইলি?

খাএঞছি চড়েছি।

কী চড়লি লো? কী চড়লি?

হাতিঘোড়া।

তার মানে?

উড়াকাঠের ঘুরনদাঁড়িতে ঘোড়ায় বসে একবার ঘুরেছি আরেকবার হাতিতে।

ব্বাস রে!

হঁ, তবু ত বলতে পারব— হাতি চড়লম ঘোড়া চড়লম—

এই ফাঁকে গুরুবারি শুনিয়ে দিল দু'কলি— "হাতি চড়ি আয়ো ত ইন্দর রাজা ঘোড়া চড়ি আয়ো ত করম রাজা—"

এমন সময় পুনোইকে ইশারা করে ডাক দিল ধানকুটা মেশিনঘরের সেই ম্যানেজার লোকটা। অমনি পুনোইও দৌড়ে গেল সেদিকে।

তাই দেখে হাসাহাসি করল ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। বলল, খালভরা লোকটার সঙে পুনিয়ার একটা কিছু আছে।

আছে মানে? নির্ঘাত আছে। সেদিন উকে কোড়ে বসাঁই—

কোড়ে বসাঁই কী লো ভুটকী?

কোড়ে বসাঁই খুব দুলছিল লোকটা-দুল দুল—

ধু-র মুখপুড়ি! ধমকে উঠল চাঁদবদনী।

তুঁই ধমকালে কী হবেক? দেখিস লোকটা পুনোইকে 'যাত্‌' দেখার ট্যাকা দিবেক।

চাঁদবদনী বলল, হঁ যাকে যা খুশি বললেই হবেক?

বেশ বেশ, বিশাস নাই করিস পুনোই আইলেই জিগাস কর।

হাসতে হাসতে পুনোই বেরিয়ে এল, হাতে একটা দশটাকার নোট। দেখিয়ে বলল, লোকটা মেলা দেখতে দিল আমাকে।

বলেই নোটটা নাচাচ্ছে।

তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভুটকী-গুরুবারি।

তোকে মাগনা দিল?

হঁ-অ, মাগনাই ত।

তুঁই কিছু দিস নাই?

কী দিব্ব?

তুঁহে-ই জানিস।

বিরক্তিতে তাদের থামিয়ে দিল চাঁদবদনী। —থাম্ ভেড়ের-ভেড়ের কী যা-তা বকছিস? লোকে শুনলে বলবে কী?

আর এমন সময়ই ডাক দিল গিরিহানী, কাঁইরে বদ্নী শুনি যা—"শুন শুন মোর দুলনী—"

দোতলায় ডাক দিয়ে নীলিমা শাড়ির পুঁটলি নিয়ে গুন গুন করতে করতে নেমে এল নিচে। সায়া-ব্লাউজ বিক্রেতার মতোই বসে গেল পুঁটলি খুলে।

চাঁদবদনী দৌড়ুল। একটু তফাতে তার পিছু পিছু দৌড়ুল ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা। খলায় দাঁড়িয়ে গেহলী বউয়ের কীর্তি দেখছিল অদ্বৈত। দান-খয়রাতিতে পাছে সব শাড়ি বিলিয়ে দেয় নীলিমা, তাই হাঁক পেড়ে বলল, গটে শাড়ি অউ শত্রুঘ্নর বোহুটার লাগি রখি দও নীলি, মু তাকু কথা দেইছি।

কাকে গ' কাকে? —কোন্সি বিলাসিনীবালা নাইলেন শাড়ি পিন্ধিবা?

অউ যে ঢেঙাটা।

চোখ তুলে নীলিমা দেখে নিয়ে বলল, অ নিয়তি না ফিয়তি। তাকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে গাইল—"কলঙ্ক অর্জিবু নাহিঁ লো পরঘরকু ভাঙ্গি—"

ধান পাছড়াতে পাছড়াতে নিয়তি কুলোয় মাথা চাপা দিয়ে বলে উঠল, হেঁ কী বলছে বোহুটা—যেন উড়িয়া ভাষা বুঝি নাই!

নিয়তি মিঙ মিঙ করে কথাগুলো বললেও তার কথা কেউ শুনেও শুনল না, সব তো চেয়ে আছে গিরিহানীর দিকে, তার শাড়ি-কাপড়ের বাণ্ডিলটার দিকে।

বেছে বেছে একটা শাড়ি মেলে ধরল নীলিমা সারা অঙ্গে বুটি দেওয়া, বেগুন-বীচি বেগুন বীচি।

কী রে বদ্নী তোর মনে ধরুচি নি?

হঁ আমার ফের মনে ধরাধরি—হাতে করে যা দিবি তাই লুব।

খুব যে পাক্লা পাক্লা কথা! এই নে ধর—

বলেই শাড়িটা টিপ্ করে চাঁদবদনীর বুকের উপর ছুঁড়ে দিল নীলিমা। বলল, যা আগে গা ধেই আয়—পছে পরবু।

আগে স্নান করে আয়, পরে পরবি।

শুধু কী শাড়ি? সঙ্গে দিল সায়া-ব্লাউজ। চাঁদবদনী ঝিলমিল ঝিলমিল বেগুনবীচি শাড়িটা বুকে পেতে দেখল।

দেখল তার বুক, তার যৌবন। কেমন দুধ-বোঁটায় গিঁথে আছে শাড়িটা! লজ্জায় শিউরে উঠল সে। শাড়িটা কোনমতে কাঁধে ফেলেই দৌড়ুল।

পিছু পিছু এল ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা। শাড়ি না হোক তারাও তো পেয়েছে ম্যাক্সি, ফ্রকজামা। কাজকাম সারা হলে শাড়ি পাবে নিয়তি-গুরভানী আর আর নামালিয়া বউড়ি-ঝিউড়িরাও।

এবারের জন্য, খালি এ বছরের জন্যই নয়, বছর বছর জামাকাপড় জমিয়ে রাখে নীলিমা। শুধু কী নীলিমা, বামনদা-কড়িয়ার সব হাটুয়া বউয়েরাই এ-কাজটা সেরে রাখে। শুধু কী শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ, বাসি ম্যাক্সি-সালোয়ার-নাইটি-ফ্রকজামা আরো কতকি! হা-ঘরে নামালিয়ারা এসে দেখলেই হামলে পড়বে। আর দিনকে দিন খলায়-খামারে ধানবিলে নামালদেশের রাস্তাঘাটে বেঢপ-বেখাপ্পা-জবরজঙ্গী পোশাক পরা জনমানুষ নির্বিকার হেঁটে-চলে বেড়াবে। গুরভালোধার গামছা পরা গায়ের উপর নির্দ্বিধায় উঠে যাবে ছেঁড়া-ফাটা ওভারকোট, চাঁদবদনীর শাড়ির নিচে পড়ে থাকবে সালোয়ার কামিজ, নিয়তিলোধানী শাড়ির উপরই চড়িয়ে দেবে ঝিলমিলে নাইটগাউন। কে কী পরছে কেই বা দেখছে, কে কী বলছে কে-ই বা শুনছে— শুধু হাসাহাসি করে মরে নিজেরাই।

পুজোর ঢাক বাজছে মাড়োতলায়। ঘট উঠছে। ক্লাবের পঁচিশ বছর পূর্তি বলে এবার মাড়োতলায় ঢাক এসেছে পঁচিশটা! পঁচিশটা ঢাক বেজে উঠল একসঙ্গে। শুধু কী ঢাক— কাঁসর ঘন্টা শাঁখ খোল-করতাল। কীর্তনিয়ার দল উলু দেওয়ার ভঙ্গি করে হরিনামের সুর তুলল।

সুর শুনেই নামালিয়া লোধারা ভাবল—তা'লে মোচ্ছবও হবে। মনে নেই সেই 'তপুবনে'—ছ্যায়েং ছ্যাচেং ছ্যায়েং ছ্যাচেং, খোল-করতাল-মৃদঙ্গ সহযোগে চব্বিশপ্রহর অষ্টম-প্রহর? কাঁচা কলাপাতায়, শালপাতার 'থালি'তে সাদাসাদা ভাত আর কাঁচা মুগের ডাল— খাওরে দাওরে, যার যত খুশি? তবু ফুরোচ্ছে না, আসছে ত আসছে? এক পাঁতায় হাড়ি-মুচি-ডোম, কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয়, সব এক-সমান?

ঢাকের আওয়াজ শুনে মনে পড়ে গেল নীলিমারও। সে হাঁক পাড়ল অদ্বৈতকে, কাঁই গো শুনুচ? আজ টিকে বেলাবেলি গা ধেই লও, খাইদাই, মাড়োতলাকু যাও, চাষবাসর কাজ ত বছর-কু-বছর বছরর তিন টাইম হেই থায়, কিন্তু গাঁর শীতলাঠাকুরর পূজা—

অদ্বৈত বলল, হঁ গ মু যাউচি, মোর ধুতি-পাঞ্জাবি বাহার কর-অ।

গা ধেই আস, সবু রেডি।

বামনদার রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে একটা বাস এল— যাত্রাপার্টির। আসল নায়ক-নায়িকারা এখনো আসেনি, এসেছে ছোটখাটোরা আর হালুইকরেরা হাঁড়া-কড়া-হাতা-খুন্তি-বালতি নিয়ে। যাত্রাপার্টির রান্নাবান্না পেটপূজার জোগাড়যন্ত্র করবে তারাই। বাস থেকে নেমেই সিগারেট ধরিয়ে কোথায় খোঁড়া হবে উনুন, জল আনতে হবে কতদূর থেকে—তদারকি শুরু করে দিল তারই।

তাই দেখতে চ্যাঙনা-ম্যাঙনারা ছুটছে, ছুটছে বড়রাও।

আসি গলা আসি গলা—

কী আইলা রে? কী আইলারে?

কলকাতাওয়ালা কলকাতাওয়ালা—

কলকাতাওয়ালা কী রে?

'হ্যান্ডবিল' ছড়ানোর মতো করে ছেলেটা বলতে বলতে যাচ্ছে—

নানী বুঝভানি— আসি গলা আসি গলা লট্ট কুম্পানীর যাত্রাপালা—

একগাল হেসে বুড়ি বলে, তাই ক', মু বি ত এই কথাই ভাবথিনি রে— আমিও তো এই কথাই ভাবছিলাম।

বুড়িঠাকুরমার সঙ্গে 'জরপ' করতে ছাড়ল না ছেলেটা। বলল, "গাড়িয়া পানি গোড় ঝিঁটানি, পুখুর পানি জাড়। ব্যস্ত হই কহুছি নানি, দেওর সাঁগ ছাড়।।"

বলেই দৌড়ুল পাঁই পাঁই করে, নাগালের মধ্যে পেলে হয়ত নানিবুড়ি তার পিঠেই হাতের লাঠিটা ভাঙত! তবু গালি দিয়ে বলল, নৈস্যার পুআ নৈস্যা, "তোকে উদ্‌বিলেই-ই খাউ। মোর মনের দুঃখ যাউ।"

উদ্‌বেড়ালে অতবড় ছেলেটাকে কী করে খাবে? তবু উদবেড়ালেই তাকে খাক! দেওরকে জড়িয়ে অশ্লীল কথা বলেছে যে তাকে উদ্‌বেড়ালেই খাওয়া উচিৎ। তবে যদি মনের দুঃখ ঘোচে!

রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে বুড়ি ফিরছে, উল্টোদিক থেকে এক মুরুব্বি খর খর পায়ে মাড়োতলায় যাচ্ছে।

কে যায়েটে?

কাই কোউ না।

মুরুব্বি যাচ্ছে বামনদার প্রাইমারি ইস্কুলে। যাত্রাপার্টিদের সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তদারকির ভার তারই উপর। এত তাড়াতাড়ি যে যাত্রাপার্টির বাস এসে পড়বে— তার ধারণা ছিল না। তাই দৌড়ুচ্ছে।

মাড়োতলায় মাইকে বারে বারেই ঘোষণা হচ্ছে— "আসুন! দেখুন!! সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ!!!"

একটা চোঙের গলা ছাপিয়ে উঠছে আরেকটা চোঙের গলা, কখনো যাত্রাদলের কখনো পুতুল নাচের কখন বা ভিডিও-সিনেমার। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে কখনো কখনো 'লোকক্লাবের'। কেউ বলছে "সিঁদুর নিও না মুছে" কেউ বলছে "নদের নিমাই" কেউ বলছে "ঝিল্ কি উস্‌পার"। আর কেউ "সমগ্র পল্লীবাসিকে জানাচ্ছি—"

ঝপাং!

লাফ দিয়ে পুকুরের জলে স্নান করতে নেমে গেল ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। এক ডুব দিয়েই মাটি হাতে মাথা ঘষল কেউ কেউ, পোখরি ধারের কাঁকড়ামাটি।

চাঁদবদনী এক টুকরো সাবান পেয়েছিল গিরিহানীর কাছ থেকে, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। চাঁদবদনীর গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুনোই বলল, দে টুক্।

আগে ত হামার মাথাটুকু ঘষি, যা জট!

সাবান তো নয় সাবুন।

গুরুবারি বলল, ওলো আগে মাট্টি দিয়ে ঘষ তার পিছুকে সাবুন বুলা, তব্বে ন জট ছাড়বে।

কোত্থেকে শতুরার বউ উড়ে এসে জুড়ে বসল ছেমড়িদের মাঝে। বলল, হামার তরে টুকচার রাখ্‌খিস ঝিআরি।

হঁ কাকী, হামার মাথাটা হোক ন আগে।

একটুকরো সাবান এ-হাত সে-হাত এ-মাথা সে-মাথা ঘুরতে লাগল। ঘুরে ঘুরে হতে লাগল ফিনফিনে পাতলা, পাতলা হতে হতে—

কেউ বলল, ই গো কী ফেনা গ! কেউ বলল, ই গো কী ব্বাস গ'!

লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা নিয়তি বলল, ও লো বাসসাবুন বঠে ন, বাস ত উঠবেই।

হঁ খালি ত মহ্কাচ্ছে।

বিলাইতি সাবুন বটে ন, ই কী তর তিলকমাটি? হামার বাপের দেশ লাদনগাড়িয়ায় উর'ম কত্ত দেখেছি!

কে যেন বলল, যাই বল্‌লিস— হামদের খালধারের তিলকমাট্টিও ফেলনা লহে, ফেনা নাই উঠুক কিন্তুক ঘষলে চুল তোর চিক্ চিক্ করে।

উঠল তিলকমাটির প্রাচুর্যের কথাও। তপোবনের খালধারে তো খালধারে, তিলকমাটির একটা আস্ত 'হুড়ি' আছে পাতিনা-তালডাংরায় যেতে নদীধারে।

তিলকমাটি হুড়িতে ডর-ভর নেই, স্যাঙাত আছে। ত্যামন ধুকপুকানি বাড়লে হাতের কড়ে আঙুল দাঁতে ছুঁয়ে বুকে থুতু দাও, দিয়ে স্যাঙাতকে ডাক-অ— স্যাঙাত হে-হে-হে-হে! 'অ্যাঙাত হে-হে-হে-হে' বলে সেই স্যাঙাত ছায়া-ছাঁয়রা রূপে তোমার আগে কখন বা পিছে থেকে বুকে বল-সাহস দেবে। দেখতে দেখতে তিলকমাটি হুড়ি তুমি অনায়াসে তরে যাবে।

তিলকমাটি হুড়ির মতো হুড়ি নামালদেশে আর একটাও নাই!

সাবান নিয়ে চাঁদবদনীদের আ-দেখলাপনা দেখে রাগে জ্বলে যাচ্ছিল নীলেশ্বর। একবাব তার মনে হয়েছিল বৈকি— কেন যে মরতে এদের নিয়ে এতদূরে এলাম! কূয়ার ব্যাঙ কূয়াতে থাকলেই হত। সেই বলে নাই— হ্যাঙলাকে দিল ঘি-ভাত, হ্যাঙলা বলে কি ভাত?

সাবান মাখা হল গায়ে-মাথায়। এবার জলখেলা খেলছে পুনোই-ভুটকী-গুরুবারিরা। কোথায় একদিন ছাড়া ছাড়া কাক-সিনান করত বুলান-হদহদিতে, শীতের কালে মাসে একদিনও জল ছোঁয়াত কী ছোঁয়াত না দেহে, আজ তারা উদোম হয়ে গিরিহার গাড়িয়ায় জলখেলা খেলছে!

মেসিনঘরের দাওয়ায় বসে অপেক্ষায় ছিল হাড়িয়া-লাইবুকারা— কখন মেয়েরা উঠবে আব তারপরে নামবে ছেলেরা। বড়রা বউড়িরা তো এখনও খলায় ধান পিটছে ধান পাছড়াচ্ছে।

লাইবুকা বলল, আজ ওরা উঠবে নাই নীলুয়া, চ হামরা নামি।

নীলুয়া বলল, থাম ন দেখি— কতদূর বাড়ে।

তুঁই তব্বে বসে বসে দ্যাক্, হামার গা কুট্‌কুটাচ্ছে।

বলেই সে গা চুলকোতে শুরু করল। সত্যি সত্যিই তো ধানের সুঙ লেগে আছে গায়ে, সাদা সাদা, গা তো চুলকোবেই।

হাঁক পাড়ল গিরিহা—

কাঁইরে উঠি পড় ঝিউড়িমনে, এতে বেলজা হাঁসির পারা গা ধোঁচু? মেলা যাবু কতবা?

এত বেলা অব্দি মাদী হাঁসের মতো গা ধুচ্ছিস, মেলা যাবি কখন?

মেলা, মেলা।

যেন কী এক চুষিকাঠির নাম মেলা। মেলার নাম কর কাজ হয়ে যাবে ঠিক ম্যাজিকের মতো। ধান কাটতে কাটতে থেমে গেলে, একজনের 'পাহী' আরেকজনের 'পাহী' থেকে পিছিয়ে পড়লে, ধান কাটতে কাটতে বারবার 'উঠা-পড়া' হলে মেলা দেখার নাম কর সব ঠিক হয়ে যাবে ম্যাজিকের মতো!

অদ্বৈত আড়ালে গেলেই গা থেকে জল ঝরাতে ঝরাতে চালাঘরে সুড়সুড় ঢুকে গেল ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা। বেলা পড়ে এল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ঢুকে গেল আর আর নামালিয়ারাও। খড়ের উপর হেঁসের বিছানায় খানিক গড়িয়ে তো নিক চোখ বুজে— মেলাফেলা সে না হয় হবে পরে!

যখন বেলা পড়ে আসে পাড়িয়ার বিলে বুলান-হদহদিতে মাঝুড়ুবকায় তপোবনে কেঁদ-কইম-বহেড়া-শাল-পিয়াশাল ধ-আসনের জঙ্গলে কাক-চিলের ডানার ঝাপটের মতো কাঁপতে কাঁপতে মাঠময় ঘুরে বেড়ায় ছায়া-ছাঁয়রা রৌদ্রছায়া তখন কোথায় বা থাকে চালাঘর খড়ের বিছানা হেঁসের মাদুর এমন কী কোথায় পড়ে থাকে পাতার কুম্বা-কুঁড়িয়া, ঢ্যামনা-গোই-গোধি খঙ্গা-বঙ্গার সন্ধানে টঙস টঙস ঘোরা, দৌড় দৌড়, ভোখলাপেটে আঁজলা আঁজলা জল খাওয়া, কাঁচায় কচমচিয়ে চিবিয়ে খাওয়া চিরোল চিরোল চেঁকাশাক, শালগাছের ছাল ছাড়িয়ে মুচড়ে রস নিঙড়ে গলায় ঢালা—

খেয়ে উঠে গুরভা হল্‌দা সুতায়বাঁধা বিড়ি টানতে টানতে বউকে বলল, কী যে ল্যাওড়া 'মেলা মেলা' কর-অ! তার চে' ঘুমাও দেখি— নু'য়ে নু'য়ে ধান কাটার ধকল কত।

হঁ-অ, তদের ঘুম পায় তর্‌হা ঘুমাও, ছা-ছানারা মাগনা 'যাত্' দেখার আর কী কভু এমন অব্‌সর পাবে?

গুরভার বউ গা ধোয়ার সময় বালি দিয়ে রগড়ে রগড়ে পায়ের আঙট হাতের চুর বালা সাফা করেছে, 'যাত্' দেখার ইচ্ছা তারও তো ষোলআনা!

অথচ গুরভা তাকে কিছুতেই কাছ-ছাড়া করছে না। আসলে রোগে ভোগা দুব্‌লা লোকটা ভয় পাচ্ছে— ফের যদি জ্বর আসে?

হাফ-গুনিন গুড়কুঁদা ঘুরছে-ফিরছে, গুরভার গায়ে হাত দিয়ে দেখছে আর বলছে, ন্নাই, ঠিক আছে।

মুচকি হেসে গুরভা বলছে, হঁ তর ডাগ্‌তরি ত!

গিরিহার বাড়িতে এবেলা লোক এসেছে, আত্মীয়-কুটুম্ব। এত বড় মেলা--লোক তো আসবেই। যখন কুঁড়পুকুরের ধারে একমাস ধরে 'বান্নিব যাত্' চলে, মইষাসুরেব দঁকে সাতদিন ধরে 'মকর যাত'— তখন গৌড়ি-গুগলি খঙ্গা-বঙ্গা কাজলপাতিশাক তুলতে কুমারডুবি জলায় কী সীতানালা খালধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পাশ থেকে তারা কী দেখেনি পাতিনা-তালডাংরা-কুহী-যুগীডিহা থেকে খালপাড় ধরে কুম্‌হারপাড়া-কাম্‌হারপাড়ায় 'কুটুম' আসছে তো আসছে— কারোর মাথায় পুঁটলি, হাতে ঝোলাঝুলি, লাল-নীল-টিয়া রঙের নতুন নতুন কাপড়, কোলে বাচ্চা। কেউ বা বেলুন উড়িয়ে, ফুড়ুর ফুড়ুর প্লাস্টিকের বাঁশি বাজিয়ে, কাঠি লোজেন্স চুষতে চুষতে, আর কেউ চ্যা-ভ্যাঁ কাঁদতে কাঁদতে।

সেই রকমই গিরিহার বাড়িতে 'কুটুম' এসেছে। কুটুম, কুটুম। তারা দোতলার বারান্দায় বসে তাকিয়ে আছে 'চালাঘরের' এদিকেই। তাদের নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত গিরিহানী ঘরের ভিতর ঢুকছে বেরুচ্ছে।

সেদিকেই তাকিয়ে পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীদের ভিতর থেকে ভুটকীই বলল, আজকের দিনটা কেমন 'মকর' 'মকর' লাগছে।

হঁ ত মকরগীত শুনাই দে।

অম্নি ভুটকী কলের পুতুলের মতো গেয়ে উঠল—

"টুসুর মাকে বলেঁছিলম টুসুর বেহা দেও না গ।
বেহা দিলে ছ্যাইলা হৈল লাতি কোলে লেও না গ।।
লাতি লিলে বেশ করিলে কি কি গয়না দিলেঁ গ।
হাতে দিলম চুর-বালা পায়ে দিলম আঙট গ।।
আর কি দিব বল গ।

লাতি খুঁজে হাতি লিতে
হাতি কুথায় পাবো গ।"

হাসতে হাসতে ওকে থামিয়ে দিল চাঁদবদনী। বলল, থাম থাম খালভরি, মকরের এখনও ঢের দেরি, বাঁদনাই আইল নাই ত মকর! যখন-তেখন মকরগীত গাইতে নাই রানী।

হুঁ?

যেন মকর-বাঁদনা এলে সত্যি সত্যি তারা কত 'হাউস' করে! হাতের 'কড়' গুনে দিনক্ষণ দেখে ঠিক ঠিক সময়ে শুরু করে বাঁদনাগীত মকরগীত! রুখনীমারা মুঢ়াকাটির মাহাতো 'ছুঁড়িরা', কুম্‌হারপাড়া কাম্‌হাড়পাড়ার বউড়িঝিউড়িরা বাঁশের নতুন পাছিয়ায় টুসু বসিয়ে মকরগীত গাইতে গাইতে বুলান-হদহদিতে টুসু-ভাসানে এলে 'আদেখলার' মতো দূরে দাঁড়িয়ে ঐ বড়জোর শুনে শুনে টুসুগীত মুখস্থ করে। গোঠটাঁড়ের মাঠে গরুখেলা দেখতে গিয়ে 'অহীরা গীত' যতটা পারে শুনে শুনে সড়গড় করে। ঐ বলে না—"পেটে ভাত নাই যার জাত নাই তার"? তাদের আবার পরব, ঠিক টাইমে টাইমে তাদের আবার পরব গীত গাওয়া চাই।

ভুটকী বলল, 'মকর মকর' মনে হৈল ত মকরগীত শুন্নাই দিলম, তার আবার টায়েম-অটায়েম কী বদনী?

হঁ ত বেশ বেশ, লাতির জন্য হাতি খুঁজছিস? মেলায় চ, হাতি কুথায় পাবো গ, দেখাঁই দিব-অ।

আরেকপ্রস্ত হাসির হল্লা উঠল। কে জানে কেন দোতলার বারান্দায় একই সঙ্গে হেসে উঠল গিরিহা-গিরিহানীর কুটুম্বরাও। মেলায় তারাও কী হাতি-ঘোড়া কেনা-কাটার গল্প করছে?

মেলার 'উড়াকাঠে' সত্যিসত্যি তো কাঠের ঘোড়া-হাতি-রেলগাড়ি বাঁধা আছে। হয়ত এতক্ষণে ছাউ-ছানাকে পিঁঠে নিয়ে ঘোড়া-হাতি ছুটছে। ছুটছে, ছুটছে।

ভুটকী বলল, তাই চ বদনী, মেলায় লাতির জন্যে হাতি কিনি। হাতি যে কিনব পৈসা কুথায় পাবো গ?

কেনে গিরিহা দিবে গিরিহানী দিব্বে।

বলেই ফের হাসির হল্লা তুলে দিল পুনোই-ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। ঝিউড়িদের রকম দেখে হেসে উঠল গুরুভার বউ-নিয়তি-আদরী-ভাদরীরাও।

গিরিহা-গিরিহানী সত্যিসত্যি মেলা দেখার জন্য প্রত্যেক নামালিয়ার হাতেই দশ-দশ করে বিশ টাকা বখশিস দিল। চাঁদবদনীর হাতে অদ্বৈত গুঁজে দিল আরো দশ। গিরিহানীর কাছে আব্দার করে চাঁদবদনী চেয়ে নিল ফের দশ।

দশ, দশ।

এই করে লোধানামালিয়াদের কাছে মেলা দেখার টাকা জমে গেল মেলা। কেউ কেউ টাকা পেয়ে ভাবল— মেলায় আলতু-ফালতু খরচ না করে টাকাটা জমিয়েই রাখবে। কেউ ভাবল— যানে দো, আর কটা দিন এখানে থেকে কামাতে পারলে ওরকম দশ-বিশ টাকা কত আসবে! অতএব উৎপাতের পয়সা চিৎপাতেই যাক। মেলা দেখার টাকা মেলাতেই খরচ হোক।

সারা বামনদা আজ ভেঙে পড়েছে মাড়োতলার মেলায়। হৈ হৈ করে নামালিয়ারাও মাড়োতলার মেলায় যাচ্ছে।

শুধু কী অদ্বৈত পৈড়্যা শ্রীমন্ত পৈড়্যার নামালিয়ারা, রমেশ ভুএ্যা-উমেশ ভুএ্যা-পূর্ণরাজ, কোন্ গিরিহার নামালিয়ারা না মেলা দেখার কম-বেশি কড়কড়ে নোট হাতে পেয়েছে! শুধু কী বামনদা, আশপাশের গ্রাম কড়িয়া-কুলিদা-সাতিয়া-গৌড়দার নামালিয়ারাও গজল্লা করতে করতে মেলা দেখতে মাড়োতলায় আসছে।

একদল এল উত্তর থেকে বিচিত্র পোশাকে তো আরেকদল এল দক্ষিণ থেকে 'র‍্যা-এ-চ-অ' 'র‍্যা-এ-চ-অ' সুরে কেঁদ্‌রা বাজাতে বাজাতে। 'রুঁ-অ-রুঁ' 'রুঁ-অ-রুঁ' করে বাজাতে বাজাতে মাঠঘাটের সেই বাজনদার কে জানে কোন্ দলে ভিড়ে মেলায় এসেছে!

চাঁদবদনী চালাঘরের পিছনে গিরিহানীর দেওয়া শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ পরে সামনে এসে দাঁড়ালে পুনোই-ভুটকী-গুরুবারিরা হাঁ হয়ে দেখল—ইস্ কী দেখতে লাগছে বদ্‌নীকে!

হাড়িয়া-সুরুয়া-লাইবুকা-নাকফুড়রিদের এসব নিয়ে, চাঁদবদনীকে নিয়ে, কোনো মাথা দুখা নেই। কিন্তু নীলুয়া—

নীলেশ্বর আড়চোখে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখল চাঁদবদনীকে। শিকলিবাঁধা ইল্লিকে ছেড়ে দিয়ে, ফের ইল্লিকে খোঁজার নাম করে চালাঘরের সামনে খানিক ঘুর ঘুর করল।

তারপর এক হেঁচকায় ইল্লিকে কাঁধে তুলে সঙ্গী সাথীদের হাঁক দিয়ে মেলায় বেরিয়ে গেল সে।

নীলুয়া গেল, আর চাঁদবদনীর গায়ে পড়ে পুনোই বলে উঠল, তকে আজ যা সুন্দর লাগছে বদ্‌নী, দেখ্‌খিস নীলুয়া তকে আজ মেলায় 'টানবে'।

কী বললি? কে টানবে?

কেনে নীলুয়া? আর ঢং করিস নাই—

তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে চাঁদবদনী, ভয়ে পালিয়ে গেল পুনোই। কী বলতে কী বলে ফেলেছে সে!

দৌড়ে এল ভুটকী-গুরুবারিরা। বলল, পেটে এক-দু' দাগ কালি গোলা জল আছে নাই? তার গরম। হিংসুক, তোর উপর হিংসা করছে। দ্যাক, মনে মনে নীলুয়াকে ঐ ছুঁড়ি তুক করছে কী নাই!

অত কথার ধার ধারল না চাঁদবদনী। বলল, যা যা, জলদি কাপড় পর। চোখ থেকে রাগ যেন ছিটকে বেরুচ্ছে এখনও।

যেন এক্ষুণি সে শাড়ি তুলে দৌড়ুবে পাঁই পাঁই করে। দৌড় দৌড়। মুহূর্তে গোঠটাঁড়ের মাঠ পেরিয়ে কুম্‌হারপাড়া কাম্‌হারপাড়া ছাড়িয়ে খালধার-নদীধারের পাশ দিয়ে কিয়াঝরিয়া-বিরিবাড়িয়া ফাটাদারবুড়ির আমতলা-কষাফলতলা হয়ে মাঝুডুবকা-সুখজুড়ি গোবরা সাঁওতালের কুরথিডাহি মাড়িয়ে ফের দোরখুলির লোধাপাড়ায়।

লোধাপাড়ায়, লোধাপাড়ায়।

এখানে আর লোধাপাড়া কোথায়, এই কদিনে তবু তো চেনা হয়ে গিয়েছে বামনদার উত্তরের বিল দক্ষিণের বিল পুবের বিল, অদ্বৈত-শ্রীমন্তর ঘরদুয়ার খলাখামার হাটখোলা চায়ের দোকান শীতলামাড়োতলা—

পারে তো কুদি মেরে সেসব জায়গাতেই একপাক দৌড়ে আসে চাঁদবদনী, পা তার সব্ সব্ করে।

গিরিহানীর দেওয়া শাড়ি-জামা পরে এলে পুনোই ভুটকী-গুরুবারিদেরও কম সুন্দর লাগল না। কথায় আছে না—যৌবনকালে ব্যাঙও সুন্দর? ভুটকী-পুনোইরা তো মানুষ! একটু ঘষামাজা করে নিলেই হাটুয়ামেয়েদেরও ঘাড়ে হাগবে।

থুতনি নেড়ে দিয়ে সেই পুনোইকেই বলল চাঁদবদনী, আর তকে যা লাগছে, তারবেলা? কোন্ ছুঁড়া আজ তকে টানবে?

হঁ কোথায় চাঁদে আর মেনি বাঁন্দরের পোঁদে।

বলেই কথা বাড়াল না আর পুনোই, কী বলতে কী বলে ফেলবে, ফের রাগে দপ্ করে জ্বলে উঠবে চাঁদবদনী। চাঁদবদনী, চাঁদবদনী।

চাঁদবদনীর সঙ্গে মিলমিশ্ হয়ে মেলায় চলল পুনোই। ঐ যে বলল, 'আর তকে যা লাগছে, তার বেলা' কথাটা ভুলতে পারছে না। মনে-মন আউড়ে চলেছে, আর টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছে তার শাড়ি ঢাকা বুক, এখনও তো কুঁড়ি কুসুম!

মেলায় আগু আমি পান খাব। পুনোই-ই বলল।

কী পান লো রানী?

মসলা দিয়া খিলি পান।

ভুটকী বলল, অত 'পান পান' করিস নাই বহিন, শুন্নিস নাই— মকর সিনাতে এসে মাহাতো ছোঁড়ারা তপুবনের কাল্হা জলে জাড়ে হি-হি করে গীত গাহে—"জোড়া জোড়া পানের খিলি এত কেনে চুন দিলি? ওলো, এত কেনে চুন দিলি? এতদিনের ভালোবাসা লো আজ কী বলে জবাব দিলি?"

—পান খাস নাই, খেলে ছাড়াছাড়ি হঞে যাবে।

ছাড়াছাড়ি? কার সঙে?

কেন্নে, ঐ মিসিনেব লোকটার সঙে।

বলামাত্রই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল পুনোই। কিল উঁচিয়ে তাড়া করে গেল ভুটকীকে। বলতে বলতে গেল, বল্ ভালোবাসার কী দেখলি? না'লে কিলাব খালভরি!"

ভুটকীও দৌড়ুল। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে আসছে, মাড়োতলার আলোও এতদূর পর্যন্ত এসে গেছে, লম্বা লম্বা আলোর ডুম রাস্তার দু'ধারে।

একা একা ইদিক-উদিক যাস না লো ছুট্রে, আঁড়গা-ধরা ধরতে পারলে আর ছাড়বে নাই তদেরকে।

'আঁড়গা-ধরা'—তার মানে ছেলেধরা, এক্ষেত্রে মেয়েধরা। ভুটকী-পুনোইকে হুঁশিয়ার করে দিল চাঁদবদনী। এদিকে ভালুকঝোড় ল্যাকড়াঝোড় না থাকলেও কতই তো রয়েছে ভালুক-ল্যাকড়া!

মেলায় ঢোকার মুখে সত্যি সত্যি তারা দাঁড়িয়ে গেল পানদোকানে। পানদোকানীকে অর্ডার করল, দুকানী, পান বনা ত!

নামালিয়া মেয়েদের রঙঢঙ দেখে হেসে ফেলল দোকানী, বলল, কটা?

চাঁদবদনী আঙুল তুলে নিজেদের গুনতি করে বলল, চাট্টা।

মিঠা?

হঁ মিঠা-ই।

খয়ের না বিনা খয়ের?

যা দিবি দে ন।

চুন?

ভুটকী পুনোইকে ফের খোঁচা মেরে বলল, কি লো চুন দিবেক?

তাকে গাঁক করে একটা কিল মারল পুনোই।

চাঁদবদনী বলল, এ গো দুকানী, চুন না দিলে পান হয়? কবে থ্রে দুকানদারি করছিস?

ফের হাসল দোকানী। বলল, অউ ত আজনু। ঝিঅমানে বেশি চুন দিনে গাল পুড়ি যায়।

পুড়ুক। পানে চুন-খয়ের নাই দিলে মুখ লাল হয়, হেঁ দুকানী?

যেন উঠতে-বসতে মচর মচর করে কতই না তারা পান খায়, মুখ লাল করে ঘুরে বেড়ায়! পান নয়, খায় ত বড়জোর পানআলু। অবিকল পানপাতার মতো দেখতে পানআলুর পাতা। জলে পানআলুর গোছা গোছা পাতা ছিঁড়ে সাজিয়ে দোকান-দোকান খেলা কত যে খেলেছে তারা!

খেয়ে কী আর দেখেনি? মুখে দিয়েই ফেলে দিয়েছে ছিঃ থুঃ করে। কেমন ল্যাল্লেলে আর তেতো।

চালাকি করে পানের সঙ্গে কিছুটা জর্দা মিশিয়ে দিল দোকানী। তাই খেয়ে ঠোঁট লাল করে ফেলল ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা। ঘড়িক-ঘড়ি যারা মুঠো মুঠো মতিহারদোক্তা চুনের সঙ্গে মিশিয়ে মুখে পুরে রাখে, তাদের পানের সঙ্গে চুন দিলেই বা কী, জর্দা মিশালেই বা কী?

কিছুই যায় আসে না। ঐ তো তারা দিব্যি হেলতে-দুলতে চুড়ির দোকানে গেল। আর কেউ চুড়ি পরবে না, ঠুনকো কাচের চুড়ি পরে তারা পয়সা নষ্ট করবে না, তাদের জঙ্গলের দুধিয়ালতাই ভালো, কেবলমাত্র চুড়ি পরবে চাঁদবদনী।

চুড়ি-দোকানীর পাশেই জড়ি-বটি নিয়ে বসেছে দাড়িঅলা একটা লোক, মাথায় 'পাগ-বাঁধা'। শুধু কি জড়ি-বটি, হাড়গিলে-ধনেশপাখির ঠোঁট, কাঁকড়াবিছার তেল, নানারকম দাঁত, হাড়, 'এঁকেড়-বেঁকেড়' কতরকম শিকড়বাকড়! সাপের বিষ, সাপের মণি—বলছে তো সাপের মণি!

তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে দুজন খদ্দের। জড়ি-বটি বিক্রেতা তাদের 'ঢপ' দিচ্ছে, ধর্মকথা শোনাচ্ছে—"বটগাছ তলে ঘর। নিতি পড়ু থায় বটপতর।।" ভাইমেনে তেবে শুন-অ—

এই মেদিনীপুরেই সমুন্দরের আশপাশেই—সে দীঘাও হতে পারে রামনগরও হতে পারে—সেই প্রথম বটগাছের 'পোঙ' জন্মালো। বটগাছ বড় হল, প্রতিদিন তার পাতা ঝরতে লাগল, পড়তে লাগল। তার তলাতেই একদিন সাধুবাবার ঘর, তার মানে আশ্রম ফুটে উঠল। আশ্রমে যোগে মগ্ন এক সাধুবাবা। একা সেই সৃষ্টির আদিতে! যোগ ভেঙে গায়ের ময়লা ডলে ঝেড়ে ফেলতেই এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে! কী বুঝল? দেহের মইলানু নারীর জন্ম—তাই মাইয়ামানুষ এত নোংরার জাসু! সেই নারী তো হাত জোড় করে বলল, প্রভু কহি দও কী করতে হব! সাধুবাবা বলল, মোর কৌপিন কাচি আন সমুন্দরনু। সমুদ্রের জলে সাধুবাবার পরা-কৌপিন কাচতে কাচতে স্ত্রীলোকটি দেখল—কৌপিনের ময়লা থেকে ছিটকে উঠছে সোনা-দানা-হীরা-জহরৎ! তাইনেই বুঝি দেখ মইলানু অর্থের জন্ম—

দে দুকানী চুড়ি পরায়েঁ দে।

দোকানদার দেখেই বুঝেছে এরা নামালিয়াবা। বলল, কোন্ হাতে?

কন্ হাতে কী—দুহাতেই দুগাছা-দুগাছা চারগাছা। উঁ-হু উঁ-হু লাল না, চুড়ির বাণ্ডিলে হাত রেখে চাঁদবদনী বলল, এই যে লীল লীল ভিতরে হল্দা সুতা।

চুড়ি-দোকানী জড়িবটি-বেচা-কবিরাজ লোকটার কথকতা আড়কানে শুনছিল, খানিক অন্যমনস্ক। বলল, শুধু চুড়ি পরবি মেঝেন আর কিছু লুবুনি?

আগে ত চুড়হি পরা!

অযথা হাসল দোকানদার, হাসি হাসি মুখ করে অতঃপর চুড়ি পরাচ্ছে—

মাথায় 'পাগ-বাঁধা' কবিরাজ লোকটা ততক্ষণে বলতে লেগেছে—আউ একদিন সোউ

সুন্দরী সাধুবাবাকে হাত জোড় করি কউচি, প্রভু কী করতে হব কুহ! সাধুবাবা তাকু আদেশ দিলা—মোর কৌপিন কাচি আন। এবেলে কৌপিন কাচিবার কালরে ফুলর সুবাস উঠি থায় আর সেই ফুলের গন্ধে নারীমনে কামভাব এসে যাবে না? তাহানে বুঝ— দেহর মইলানু কামভাব ভি আসি গলা!

শালা যত্তসব গাঁজাখুরি কথা!

দাঁতে দাঁত চেপে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে বলতে চাঁদবদনীর কেঠো হাতে চেপে চেপে চুড়ি ঢোকাচ্ছে দোকানী—

আঃ দুখাচ্ছে!

দোকানী রসিকতা করে বলে, এখন একটু ত 'দুখ' লাগবেই মেঝেন। তারপর রাঙা চুড়ি পরে রিন্‌ঠিন্ করে হাত নেড়ে নেড়ে যখন কত প্রেমিক ছোঁড়াকে 'দুখ' দিবি— তার বেলা?

পিছন থেকে আচমকা চাঁদবদনীকে ঠেলা দিল ভুটকী-গুরুবারিরা। দোকানীর গায়ের উপর প্রায় পড়ে যেতে যেতে চাঁদবদনী বলল, খালভরা!

মেঝেন, কী বল্লি?

কাই কিছু নাই।

খিল খিল করে হেসে উঠল নামালিয়া লোধাঝিউড়িরা। বলল, ও তুঁই বুঝবি নাই।

দাঁড়িয়ে থেকে ছটফট করছিল পুনোই, সে তো চুড়ি পরবে না। এই ফাঁকে সে বলল, তোরা চুড়ি পর, হামি টুকচার উদিকটা ঘুরে আসি।

কুনদিক লো? দেক্‌খিস হারাঁই যাস নাই।

বলতে না বলতেই পুনোই হারিয়ে গেল ভিড়ের ভিতর।

পুনোই চলে গেলে ভুটকী বলল, ঐ লোকটাও মেলাকে এস্‌ছে, হামি লিজের চোখে দেখেছি। উহে-ই ওকে ড়াকছে। তাই হড়বড়াচ্ছে।

কাই? কুনদিকে?

ফিসফিস করল গুরুবারি।

আছে কুনোদিকে ঘাপ্ মারিঁ।

এতটুক্ ডর-ভয় নাই?

নাই ত, লিলাজ মাইয়া, লিখাপড়া জানে যে! দেখলি নাই নুক্কুকে— কার সঙে এতদূর একা একা ঘুত্তে এস্‌ছে!

তাই তো, লেখাপড়াজানা ভুবনলোধার মেয়ে কুমারী লক্ষ্মীরানী মল্লিক নিজেদের আত্মীয়স্বজন ছাড়াই একা একা 'এক্‌স্‌কারসনে' এসেছিল এতদূর! নিজের চোখেই তো দেখেছে তারা। এখন একথা সেকথা পাঁচকথা তো বলতেই পারে ভুটকী-গুরুবারিরা।

মিঠাইয়ের দোকানে এক মজাদার কাণ্ড হয়েছে।

পাশাপাশি দু -দুটো তক্তপোশের উপর দু-দুটো দোকান। তক্তপোশের উপর সাজানো চুড় চুড় সুঁটিভাজা, চিনি জড়ানো মুচমুচে গজা, গরম জিলিপি। দুটো দোকানের ভিতর জোর কম্‌পিটিশান।

কম্‌পিটিশান, কম্‌পিটিশান।

এ হাঁকছে তো সে হাঁকছে। একদল খরিদ্দার এ-দোকানের তক্তপোশের ধার ঘেঁষে ভিড় করলে, খদ্দের ভাগাবার উদ্দেশ্যে সে-দোকান চেঁচামেচি শুরু করছে। 'কনসেশান' দেবে বলে হাঁকাহাঁকি করছে।

কন্‌সেশান, কন্‌সেশান।

অমনি কিছু লোক দৌড়ুল সেদিকে। এ-দোকানীর মাথায় তখন এসে গেছে নতুন বুদ্ধি, শুরু করে দিল 'কুইজ'। ছান্তায় করে টাট্‌কা গরম জিলিপি রসের কড়াই থেকে তুলতে তুলতে 'ঢক' বলছে—

ইড়িংবিড়িং সিটকিসিড়িং
পণ্ডায় পণ্ডায় রস।
আমার জন্য মেলা থেকে
আনবো গোটা দশ।।

'ঢক'-টি বলেই দোকানদার বাজি ধরছে— এই ঢকটি যে ভাঙি দব তাকু দেমি গোটা দশ।

চুড়ি পরা শেষ করে চাঁদবদনী বলল, চল্ লো ঝিলাপি খাই।

এর মধ্যেই উত্তর এসে গেছে— জিলিপি, জিলিপি।

উত্তরদাতা হাত পাতল—দও দুকানী, মোকে গোটা দশ দও এখুন। মু ত 'ঢক' ভাঙি দেলে।

টাকায় দুটো।

এক হাতে ঠোঙায় দশটা জিলিপি ভরে আরেক হাতে দোকানী দাম চাইছে— পাঁচ টাকা!

অক্ষুণি ত হাঁকথিল গ —এই ঢকটি যে ভাঙি দব তাকু দেমি গোটা দশ?

দোকানদার একগাল হেসে বলছে, আরে বাপা সে ত আফুয়া কথা, 'আড়ভেটাইজ'।

ইন্তি পরি না কইনে মোর দুকানে লুক আসব কেনে?

দশটা নয় তাকে পাঁচটা জিলিপি ফাউ দিয়ে কোনোমতে ম্যানেজ দিল দোকানী।

তৎক্ষনাৎ হাজির হয়ে চাঁদবদনী আঙুল দেখিয়ে বলল, তিন জ্যেগায় দুটা করে ছ'টা ঝিলাপি—

হাঁপাতে হাঁপাতে পুনোই এসে পিছু থেকে জড়িয়ে ধরে বলল, আর হামারটা?

মেলা জমে গিয়েছে বেশ। কী না এসেছে! কী না বিক্রি হচ্ছে। দাদ-হাজা-চুলকানির মলম, অর্শ-ভগন্দরের অব্যর্থ ওষুধ, বিষহরির তেল, ইঁদুর মারা বিষ, গুড়বাদাম, তিলের খাজা, বরফি সুজি, শোনপাপড়ি, রোল-চাউমিন, পায়ের আঙট, চুল-চিপুনী-কাঁটা, গেঞ্জি-জামা ফুলপাতা-আঁকা আসমান-জমিন শাড়ি ধুতি-মশারি শাবল-খন্তা-কোদাল-কুড়ুল-হাতা-খুন্তি-বঁটি-কাটারি, কাঠের পিঁড়ি-বারকোশ-মাদুর-মাদুর কাঠি-রঙিন জাল-জালকাঠি-মুলোর বীচি-তুলোর বীচি মায় কলার কান্দি পর্যন্ত। বেনাডুবি-শঙ্করীডাঙার লোধারা এনেছে পানের টুকরি-ঠেকা-পাছিয়া—

টেপ রেকর্ডারে মুহুর্মুহু বেজে চলেছে— "এই যে দাদারা শেয়ালকুত্তার বাচ্চারা"—

মেলায় আগেভাগেই এসেছে নীলুয়া-লাইবুকা-হাড়িয়া-নাকফুড়রিরা। নীলেশ্বর এক 'পাকিট' সিগারেট কিনেছে, তাই ভিডিও হলের সামনে দাঁড়িয়ে মউজ করে টানছে। ভাগাভাগি করে খাচ্ছে সিগারেট। একবার এ একটু টানল তো পরক্ষণেই টানল খানিক আরেকজন।

পাশাপাশি পুতুল নাচের হল আর ভিডিও হল। ঐ নিয়ে মারামারি! ভিডিও হলের মালিক কিছুতেই তার আশপাশে পুতুল নাচের 'শো' করতে দেবে না। তাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়েছে মেলা কর্তৃপক্ষকে।

পুতুল নাচ নয়, যাত্রাও নয়— নীলুয়া-সুরুয়া-লাইবুকারা আজ ভিডিও শো দেখবে 'ববি"। কাঠপুত্‌লির এদিক-সেদিক নাচ আর কী দেখবে! সত্যি সত্যি পুতুল তো আর নাচে না, তাকে লোকে নাচায়!

হঁ পুত্‌লিও নাকি মানুষের পারা সিগ্রেট খায়? গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া ছাড়ে? লাইবুকা জিজ্ঞাসা করে।

নীলুয়া বলে, তার কায়দা আছে। পুত্‌লির মুখের ভিতর নল পুরা থাকে। পর্দার আড়ালে যে-লোকটা পুতুল নাচায় বিড়ি খেয়ে সেই লোকটাই নলের ভিতর ধোঁয়া ছাড়ে আর সেই ধোঁয়া কাঠপুত্‌লির মুখ দিয়ে গল্‌ গল্‌—

নাকি কথা বলতে বলতে মুখ দিয়ে পুচুর করে থুতুও ফেলে?

হঁ ঐ নলেবই কারসাজি! নলের ভিতর সামান্য জল ঢেলে ফুঁ দিলেই ফু-ফু করে থুতু!

হঁ এত্‌ক্ষণে বুঝলম।

হাড়িয়া বলে, আচ্ছা ভালা, কাঠপুত্‌লি কী করে হাত-পা তুলে নাচে?

কেন্নে, উপর থিক্যে সুতায় টান দিয়ে পর্দার আড়ালে তর-হামার মতন লোকে পুত্‌লিকে নাচায়। হাতের সুতা টানলে হাত উঠে, পায়ের সুতা টানলে পা—

পুত্‌লির পা আছে নীলুয়া?

নাই, কোমর থেকে শুধু ত কাপড়।

পুতুল নাচের হলের সামনে টেবিল পেতে দলের জুড়িদার লোকটা টিকিট কাটছে। ছাউ-ছানারা সেই সঙ্গে তাদের মা-বাবারা-বড়রা টিকিট কেটে হলে ঢুকছে। মাইক-ম্যান মাইক ফুঁকে বলছে— পুতুল শুধু নাচে না, পুতুল কাঁদেও। আসুন-দেখুন-আজকের পালা "নিমাইসন্ন্যাস", শচীমাতা কেমন কাঁদছে!

অমনি ফুলেটওয়ালা ফুলেটে বাজিয়ে দিল— "আমার নিমাই যাবার কালে নূপুর কেন বাজিলি নারে—"

ধুস্‌! ফুলপ্যান্ট পরে মাটিতে বসে কী আর পুতুলনাচ দেখা যায়! উসব পুত্‌লি-ফুত্‌লি ছাড়, ভিডিও দেখব—"ববি"-ডিম্পল কাবাডিয়া—

বলেই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল নীলুয়া, তার আগে আয় ত দেখি কোনদিকে ঘুরছে চাঁদবদনীরা।

'ঢেন্ডিপালী বসা' নিয়ে বেধেছে বিতর্ক। 'লোক-ক্লাবের' ছেলেরা এসে মানা করছে, বসতে দিচ্ছে না।

শীতলামাড়োতলার মেলায় বরাবরই 'পালী' বসিয়ে আসছে গৌড়দার অখিলেশ্বর জানা। এ বছরই ক্লাবের ছেলেরা এসে হুজ্জুতি করছে, বলছে 'পারমিশান' দেখাতে।

কার 'পারমিশান'? মেলা কমিটি জড়ি-বটি-মকরধ্বজ ডেমরিয়া-তাবিজ বিক্রেতা থেকে শুরু করে পুতুলনাচ-ভিডিও হলকেও বসতে দিয়েছে, ঢেন্ডিপালীও বসুক না। যার ইচ্ছা হয় খেলবে, যার ইচ্ছা হবে না খেলবে না।

কিন্তু 'লোক-ক্লাবের' দাবী—পারমিশান চাই খোদ দাঁতন থানা থেকে। আর অখিলেশ্বরও থানায় যাবে না, সে তো জানে পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা।

অদ্বৈত পৈড়্যাকেই ধরল অখিলেশ্বর।

অদ্বৈতভাই টিকে দেখ না।

'পালী' গুটিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ঠির ঠির করে কাঁপছে অখিলেশ্বর।

'পালী'-তে বড় বড় ইস্কাপন-চুড়িতন-হরতন, কবেকার মান্ধাতা আমলের, রং চটে-মটে

একশা! তবু দু'ঘণ্টা বসাতে পারলে খোরাকি উঠে আসবে দু'মাসের। খেলার লোকও ঘুর ঘুর করছে আশপাশে। ঐ তো কুলিদার মিহিরলাল মাইতি— একের নম্বর জুয়াড়ি।

কেউ কেউ 'ফিতা-খেলা' শুরু করেছে মেলার এদিক-ওদিক। স্রেফ হেরিকেনের তিন-চার হাত ফিতা, গুটিয়ে নানা কায়দায় ভাঁজ করা। একটা উড্-পেন্সিল হাতে নিয়ে ভাঁজের মধ্যে গুঁজে দাও। যদি ফিতা পেন্সিলে না আটকে সর্ সর্ করে খুলে যায় তবে তোমার জিৎ, আটকে গেলে তোমার হার।

অদ্বৈত বলল, পূজাফাণ্ডে কেত্তে টাকা দেইচন?

অখনও দেইনি, রোজগার হিনে তেবে ত দেমি—

সোউ ত ভুল করিছন। কিছিকিছি চাঁদা-ভেদা আগুনু কমিটিকু আহুরি কিলাবকু দেইথিনে আজ এই ভুগান্তি তুমহর হিতানি। হউ গটেয় যুক্তি কইমি?

কী?

কিলাবের রাজকিশোরকু চুপি চুপি কিছি টাকা দেই আসুন।

অখনও বউনি হেলানি অদ্বৈতভাই, টাকা দেমি কিস্তিকি? হেউ তমে যখন কুহ্চ—

পিছনে হাতে ধরা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা 'শকুনির পাশা', লম্বা লম্বা পায়ে অখিলেশ্বর 'লোক-ক্লাবের' মাতব্বর রাজকিশোরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল, মনে মনে বলতে বলতে গেল, মা গ শীতলাবুড়ি! দিনকু দিন আউ কেত্তে রঙ্গ দেখতি হব! রাজকিশোর অউ সেদিনকার ছা—

নাগরদোলার কাছে চাঁদবদনীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নীলুয়াদের।

'উড়া-কাঠের' হাতি-ঘোড়ায় চেপে হাটুয়া ছা-ছুয়ারা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা। একেকটা হাতি-ঘোড়ায় চেপে আছে দু'জন-দু'জন। ছেলে তো ছেলে, মেয়ে তো মেয়ে। ঘুরতে ঘুরতে হাসতে হাসতে এর-তার পিঠের উপর বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে।

চাঁদবদনী বলল, লাতির জন্যে হাতি কুথায় পাবি?—ঐ ত হাতি ভুটকী।

হঁ-অ।

হাতির পিঠে উঠবি ন কি?

নাই, তর-হামার যা গতর, উঠলে হাতি যদি ভেঙে পড়ে!

অত সস্তা? কতদিন ধরে কত ছাউ-ছানা হাতির পিঠে উঠছে-নামছে! উঠতে-নামতে পিঠে কড়া পড়ে গেছে হাতিশুঁড়বাবার। আয়, উঠেই দ্যাক ন মার!

যেন সত্যিসত্যি টেনে-হিঁচড়ে 'উড়া-কাঠে' উড়িয়েই ছাড়বে চাঁদবদনী, ডাক শুনে ভয়ে তো এর-তার পিছনে লুকিয়ে পড়ল ভুটকী।

কাণ্ড দেখে নাগরদোলার মালিক মুচকি মুচকি হাসছিল। এবার সেও বলল, হঁ আস, বেলে ঘুরি যাও।

'উড়া-কাঠের' মালিকও একপ্রস্ত নাগরদোলায় চড়ে যেতে ডাকছে নামালিয়া ধানকাটনীদের। টিকিটের দাম এমন কী আর, মাত্রই আটআনা!

আটআনা, আটআনা।

নাগরদোলার চলতি খেলা শেষ হয়ে নতুন খেলা শুরু হতে না হতেই দল থেকে দলছুট হয়ে একা একাই টিকিট কেটে ঘোড়ায় চড়ে বসল পুনোই।

তার কিত্তি দেখে তো থ ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। আর এসময়ই এল হাড়িয়া-লাইবুকা-নীলুয়ারা।

পুনোইকে নাগরদোলায় চড়তে দেখে চিঁড়রা-কাঁধে নীলুয়া ধমকে উঠল, নাম, নাম্ বলছি! কোথায় মাথা ঘুরে পড়ে মরবি, অভ্যাস নাই পুনিয়া!

ঘোড়ার পিঠে গাঁথা ডাণ্ডাটাকে আঁকড়ে ধরে ততই ঘন ঘন পা দোলায় পুনোই, নীলুয়াকে তার থোড়াই কেয়ার! কে বলে তার অভ্যাস নেই— বটের ঝুরি ধরে সীতানালা খালধারে কী চিহড়লতার দোলনা টাঙিয়ে মাঝুড়ুব্‌কায় তারা কী আর দোলে নি? দুলুনির চোটে গাছের ডাল পর্যন্ত মড়মড় করে ভেঙে পড়েছে! তবু তো তারা মাথা ঘুরে কখনো পড়ে মরেনি? বরঞ্চ পাছার ধুলো ঝেড়ে ফের অন্যডালে ঝুলে পড়ে পা দুলিয়ে গীত গেয়েছে —"দোল্ দোল্ দোলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি। বর আসবে এখুনি লিঞে যাবে তখুনি—"

নীলুয়ার হম্বিতম্বি দেখে রোখ চেপে গেল চাঁদবদনীর। সে ভুটকী-গুরুবারিদের হাত ধরে টানল, বলল, আয় ত হামরাও 'উড়া-কাঠে' উড়ব, দেখি কে কাকে মানা করে!

সত্যি সত্যি টিকিট কেটে নাগরদোলায় উঠে বসল ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখল হাড়িয়া-সুরুয়া-নাকফুড়রিরা। রাগে-সন্তাপে ইল্লির শিকলিটা মাটিতে আছড়ে ফেলল নীলুয়া।

খালি যা লাইবুকা টিটকারি মারল, দোলায় চড়েঁ সরগ্ যাবে লাড়ু খাবে— ওদের যেতে দে নীলুয়া!

রাগে গরগর করতে করতে দলবল নিয়ে ভিডিও হলের দিকে চলে গেল নীলেশ্বর। আগের 'শো' ভাঙতে আর তেমন দেরি নেই।

যেতে যেতে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল শতুরার বউযের সঙ্গে। নীলুয়াকে বলল, ওরা কোন্‌দিকে পুত্রা?

হাত দেখিয়ে নীলেশ্বর কোনমতে বলল, ঐ ত ওদিকে। তর্‌হা একলা যে কাকী?

নাই হাড়িয়ার মা আছে উদিকে, আণ্ডট দেখছে।

তবু শতুরার বউ নিয়তিকেও সাবধান কবে দিল নীলেশ্বর, মেলার বাইরে আঁধারে কোথাও এদিক-ওদিক যাবে নাই কাকী, পুনিয়াদের মানা করলেও শুনছে নাই! চাঁদবদনীর নাম মুখেও আনল না নীলেশ্বর।

হাসল নিয়তি, গুড়খার বেটা নীলুয়াটা বরাবরই পাকা। সামলাবি ত তোর চাঁদবদনীকে সামলা।

তপোবনের কোন্ অঝোরঝর জঙ্গলে কী ঝড়িয়া কী জাড় কী গরমি একলা একলা ঘুরে বেড়াতে যার এতটুকু ডর লাগল না, মাড়োতলার এইটুকু মেলায় তার কী ডর? তার উপর মেলার মাতব্বর গিরিহা অদ্বৈতর যখন চোখ পড়েছে তার উপর— সে যখন তাকে রেখেছে চোখে চোখে?

চাঁদবদনী-ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিদের নয়, গিরিহা অদ্বৈতকেই মনে মনে মেলায় খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। নাকছাবি-আণ্ডটের দোকানে গুরভার বউকে বসিয়ে রেখে "দাঁড়াও মেয়্যা-ছানাগুলাকে দেখে আসি" বলেই বেরিয়ে পড়েছে নিয়তি।

নিয়তি, নিয়তি।

এ কী হল নামালিয়া লোধা-লোধানীদের! দোরখুলি-সুখজুড়ি-তপোবনের জঙ্গলমহাল ছেড়ে তারা এখন রাতকে দিন করা ডায়নামোর আলোয় হাটুয়াদের গায়ে গা ঠেকিয়ে কোথাকার কোন্ বামনদার মাড়োতলার মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে— নাগরদোলায় চড়ছে চুড়ি

পরছে পায়ের আঙুট নিয়ে দরাদরি করছে ভিডিও হলে ঢুকে হিন্দী ছবি দেখছে। তার উপর লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যনা নিয়তি চলেছে আবার অভিসারে!

এই কদিনে লোধা-লোধানীরা এত স্মার্ট এত ফরোয়ার্ড হয়ে গেল কী করে? নাকি পতঙ্গের পাখা গজায় মরিবার তরে?—সেই বর্ষার দিনগুলোয় যেমন করে বাহির হয় 'সালুই পোকারা'।

বড় বড় পেটঅলা পিছন মোটা একপ্রকার পিঁপড়েই। মাটি কী গোবরগাদা থেকে ভুস্ ভুস্ বেরিয়ে সদ্যসদ্য গজিয়ে ওঠা ডানা মেলে ফর্ ফর্ করে এদিক-সেদিক ঐ ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভিতরেও উড়ে বেড়ায় আর পাতলা ডানা ছিঁড়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। হাউসী ছা-ছানারা দৌড়ে এসে টুকায় ভরে কুড়িয়ে নিয়ে যায় আর বালির খলায় চাল-ভাজার মতো ভেজে খায়।

বামনদার মাড়োতলার মেলায় এসে নামালিয়া লোধা-লোধানীদেরও কী তদ্রূপ অবস্থা?

নাগরদোলায় দু'পাক খেয়েছে কী খায়নি ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা, পুনোই চিৎকার করে বলে উঠল, ওলো বদ্‌নী ঐ দ্যাক্ স্বপনভাতুয়া!

চমকে উঠে ঘাড় ঘুরালো চাঁদবদনীরা। তাই তো, ঐ তো কেমন ভ্যাল্ ভ্যাল্ করে এদিকেই তাকিয়ে আছে ছোকরাটা। একা কী আর, সঙ্গে আছে তার বন্ধু-বান্ধবরাও।

চাঁদবদনী বলল, ঘরের কাছকে মেলা, এক গেরামের লোক— সে ত আসতেই পারে দেখতে। তুঁই-হামি ত বাইরের লোক, নামালিয়া।

তবু পুনোই ইঙ্গিত করতে ছাড়ল না। বলল, খালি ঐ লো বদ্‌নী-একগেরামের লোক, মেলা দেখতে আসা? ঠোঙায় ভরে রাতভিত মুড়হি দিতে যে এল, তারবেলা?

দিঙ্ দিঙ্ করে মাথায় আগুন উঠে গেল চাঁদবদনীর। এত বড় কথা তার মুখের উপর চোপা করে বলে— এত বড় সাহস! পারে তো ঘুরন্ত 'উড়া-কাঠ' থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে চাঁদবদনী, পুনোইকেও চুলের মুঠি ধরে নামায়, বলে, কী বল্লি? আরেকবার বল, শাঁসনলা তোর ছিঁড়ে ফেলব না খালভরি!

কিন্তু কিছুই করল না চাঁদবদনী, একটা কথাও বলল না, পুনোইয়ের কোনো কথাকেই ধর্তব্যে আনল না সে। উল্টে গুরুবারি-ভুটকীকে নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকল, হাসাহাসি করল, নাগরদোলা থামলে পুনোইকে বাদ দিয়েই তারা তিনজনে চলে গেল অন্যদিকে।

দলছুট হয়ে গেল পুনোই, একা হয়ে গেল পুনোই। সে খানিক থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর মরীয়া হয়ে খুঁজতে লাগল স্বপন ভাতুয়াকে। যদি ফের দেখা হয়ে যায় স্বপনকে সে চোখে-চোখে রাখবে, চোখে চোখে—

ইতিমধ্যে গাঁজা-কল্‌কে এসে গেছে, খদ্দেন দুটি কল্‌কে সেজে টিকায় আগুন দিয়ে 'পাগ-বাঁধা' কব্‌রেজকে দিল। কব্‌রেজ চোখবুজে দীর্ঘক্ষণ কল্‌কেয় টান দিয়ে 'পেরসাদ' করেই হাতবদল করে দিল খদ্দেরকে।

খদ্দের দুটি গাঁজা টানার উদ্যোগ করছে, ধোঁয়া গিলে কব্‌রেজ বলল, কী সে কী, তোরমানে ত নাবালক, কিস্‌সু বুঝুনি। ক' ত কেনে মহাদেবর গলে ১০৮টা হাড়ের মালা আউ কালীর গলে ১০৮টা মুণ্ডুমালা? তেবে শুন—

কব্‌রেজ বলে চলে, সোউ যে কৌপিন কাচিবার কালরে সুবাস উঠি থায় আছরি সুবাসনু নারীমনে কামভাব আসি থায়—

কৌপিনের সুগন্ধে সেই যে নারীমনে কামভাব এসে গেল, সেই থেকে কামার্ত নারী

অস্থিরচিত্তে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল টুঁড়ে বেড়াল পুরুষের খোঁজে। কাউকে পেল না, কাউকেই না, সেই যোগী সাধুবাবাকেও না।

ইগো না, সোউ নারীকু সৃষ্টি করি সাধুবাবা ত অদৃশ্য হেই গলা! কিন্তু সেই যে কৌপিনের সুগন্ধ, সেই গন্ধ শুঁকেই নারী 'হেই গলা' গর্ভবতী। দশ মাস দশদিন পরে হাতের তালু ফুঁড়ে বেরুল ব্রহ্মা, নাভি চিরে বিষ্ণু আর ত্রিশূল দিয়ে যোনি ভেদ করে মহেশ্বর—

কী বুঝলা?

হঁ, সবু ত ঠাকুরর লীলা।

লীলা বলি লীলা—

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জন্মিবার কিছিদিন পর সোউ নারী ব্রহ্মাকু কইলা তার স্বামী হিতে।

ব্রহ্মা ত 'মা-মা' বলি ডাকলে।

তারপর বিষ্ণু—

বিষ্ণু বি 'মা-মা' বলি ডাকলে।

অত্তপর ভোলাবাবা মাহাদেব কোত্‌রে যাই স্বামী হিতে তাকু প্রার্থনা জনাইলে মাহাদেব বি 'মা-মা' বলি ডাকলে।

তেখুন সোউ নারী মাহাদেবকু হাঁ-করি খাইতে গলা।

অগত্যা আউ কিছি উপায় ন দেখি মহাদেব রাজি হেই গলা। তেবে এক শর্তে—

কী?

কব্‌রেজ বলল, মাহাদেব নারীকু এই বলি শর্ত দিলা— তারমেনকার স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহ হেই যাব যিদি তানে ১০৮ বার ১০৮ রূপ ধারণ করি পারে!

সেই থেকে মহাদেব আর মাকালীর ১০৮ রূপ ধারণ, মহাদেবের গলায় ১০৮টা হাড়ের মালা আর মাকালীর গলায় ১০৮টা মুণ্ডমালা।

অউ রুদ্রাক্ষের মালাটা ঠিক কত হিনে দিব, কব্‌রেজ কুহ ত?

যা হোক একটা খদ্দেরও তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জন্মকথা শুনে জিনিস কিনতে উদ্যোগী হয়েছে! সে বলল, হউ যা দবু দে না। তোর সাঙে ফের দরাদরি! জয়বাবা তিলেশ্বর শিব!

মেলায় লোক সমাগম হয়েছে প্রচুর। দূর দূর গাঁ থেকে লোক এসেছে মেলা দেখতে। স্কুটারে সাইকেলে মোটর সাইকেলে লাল মারুতিতে। কেউ কেউ এসেছে ভ্যান-রিকস্যায় চেপে, পিছনে পা ঝুলিয়ে বসে। হাটুয়া বউড়ি-ঝিউড়িদের দামী দামী শাড়ি-জামায় মেলা-মণ্ডপ ঝলমল করছে।

কানের কাছে হাটুয়া ভাষায় কী সব বলতে বলতে একদল গেল তো ওদিক থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে এসে গেল আরেক দল। আর মেলাকমিটি মাইকে তো হরদম বলতে লেগেছে— "সমস্ত পল্লীবাসিদের প্রতি জানাই—"

জোড়ায় জোড়ায়, স্বামী-স্ত্রীতে বুড়ো-বুড়িতে। শীতলাবুড়ির থানের সামনে চাঁদোয়ার নিচে সাদা শাড়ি সাদা থান পরা কতক বৃদ্ধারা তো বসে আছে সেই সাঁঝ থেকেই। চামর দুলিয়ে ধূপ-ধূনার ধোঁয়ায় আরতি হচ্ছে।

পুরাতন শীতলামন্দিরের গায়ে নারায়নের অনন্ত শয্যা, দশাবতার। শীতলা চাঁদনি, শীতলা পঞ্চরত্ন। তিনটা মাথা তিনটা হাত ছ'টা পা— শীতলামূর্তির পাশে কিম্ভূত কিমাকার জ্বরাপাত্র।

পুনোই দলছাড়া, ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা তিনজনে ঠাকুর দেখছে। শীতলাবুড়ি ছেড়ে তাদের চোখ এখন পড়ে আছে 'জরাপাত্রে'। তিনমাথা তিনহাত ছ'পা—এ কেমন ঠাকুর? দেখলে গা শির শির করে!

চামর-দোলানো লোকটা এবার সাদা থান-সাদা শাড়ি পরা হাটুয়া বুড়িদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, কাই গো মা, আস-অ—

বলেই জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপটা বাড়িয়ে ধরল। মণ্ডপে বসে থাকা বৃদ্ধারা একে একে উঠে গিয়ে প্রদীপের শিখায় দু-হাত মেলে ধরে তাত নিয়ে বুকের উপর হাত দুটো আড়াআড়ি রাখল।

গুরুবারি বদনীকে ঠেলা মেরে বলল, হাই দেখ্ লো বদ্নী, কীর'ম নিয়া পুইছে!

'নিয়া'-তার মানে আগুন পোহাচ্ছে।

হেসে উঠে চাঁদবদনী বলল, ধুর মড়ি! নিয়া পুইছে কী লো— বল্ ঠাকুর চুমাচ্ছে!

বলেই চাঁদবদনীর মনে হল— তারাও তো গিয়ে প্রদীপের আলোয় হাত সেঁকে বুকে ঠেকিয়ে ঠাকুর চুমাতে পারে! যাবে নাকি?

এই যাবি?

উত্তরের অপেক্ষা না করে একা একাই ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেল চাঁদবদনী। যেমন করে এক বাঁদনার দিনে গোঠটাঁড়ের মাঠে 'গরু-খুঁটা' দেখতে আসা কুম্হার ঝিউড়ি-বউড়িদের ভিতর মিশে গিয়ে তাদের কুল্হি তাদের ঘর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল চাঁদবদনী।

মণ্ডপে এখন সাদা থান আর সাদা শাড়িদের ভিতর পড়ে গিয়েছে হুড়োহুড়ি, একে একে দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই। তার ভিতর দিয়ে তাব ভিতর দিয়ে পঞ্চপ্রদীপের কাছে চলে যাবে চাঁদবদনী।

এসময়ই একটা 'হুরি' উঠল। সমগ্র মেলাটাকে কে যেন ঘুলিয়ে দিল। একটা কৌটোয় মেলার লোকজনকে ভরে কৌটোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কে যেন মাড়োতলায় আছড়ে ফেলল। এপাশের লোককে নিয়ে গেল ওপাশে, এদিকের লোক চলে গেল ওদিকে। ধরা-হাত আপনা-আপনি ছেড়ে গেল, ছাড়া-হাত আবার কে যেন ধরে ফেলল। দল-ছুট হয়ে গেল এ-ও।

দল-ছুট, দল-ছুট।

কেউ কেউ ঢুকে গেল ভিডিও হলে, কেউ কেউ বেরিয়ে এল ভিডিও হল থেকে। পুতুলনাচ দেখে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল একদল, আরেকদল বলতে বলতে ঢুকল, 'দেখি ত আমড়াতড়ার মা শীতলার দলের সঙ্গে কম্‌পিটিশানে এই দলটা পারে কী না! আমড়াতড়ার দলে সেই একটা গান আছে না—"সব জাতি তো মানুষ রে ভাই, ভিন্ন কোনো কিছুই নাই। সবার গায়েই লালরক্ত, কালো কিন্তু কারোর নয়....?" আহা কী গান! কী গান!'

এবার মাইকে ঘন ঘন বলছে— "বাবারা মায়েরা অভিভাবকেরা ছোট ছোট খোকাখুকু ভাইবোনেদের হাত শক্ত করে ধরে থাকুন। যে কেউ যে কোনো মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। ভলেন্টিয়াররা যে যেখানে থাকুন মেলায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখুন....।" ঘোষণা কেটে দিয়ে তারপরেই গান হচ্ছে—"বড়লোকের বিটি লো লম্বা লম্বা চুল, এমন মালা গেঁথে দিব লাল গেঁদা ফুল...."

প্রেমিকের সঙ্গে মেলায় এসেছে প্রেমিকা। একা কী আর তাকে আসতে দিয়েছে মা-বাবা? সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে গেঁড়ি-গুগলি—তারই ছোটবোন কিংবা পাশের বাড়ির বান্ধবী। তখন থেকে সেই তো প্রেমিকার কানে ফুসুর ফাসুর মন্ত্রণা দিয়ে চলেছে—বাগে যখন পেয়েছিস বড়োসড়ো একটা কিছু হাতিয়ে নে। তোকে অমুকদা যখন দিতেও চায়। প্রেমিকা ভাবছে—কী

নেবে, কী নেবে! বান্ধবী তাকে ছড়া কেটে বুঝাচ্ছে, 'কথার অছি—অত্‌বা তোর পড়িছে পাশা। গঁড়ে নে লো ঝুমকা-বিছা।' এখন তোর দান এসেছে, ঝুমকা-বিছা গড়িয়ে নে।

আবার কেউ কেউ প্রেমিকার জন্য ঝুমকা-বিছা তো বিছা, কানফুল গড়িয়ে নিয়েই মেলায় এসেছে। কখন সে আসবে— বসে আছে অপেক্ষায়। অপেক্ষায়, অপেক্ষায়। সেই বলে না— "শনিবারের হাট, কানফুল ঘিনি জাগনু বাট?" শনিবারের হাটবারে কানের দুল হাতে নিয়ে পথ জাগছে— এই পথে যদি সে আসে! কিন্তু কই সে তো আসছে না!

সে তো আসছে না, সে তো আসছে না।

ভুটকী-গুরুবারি ভিড়ের ঠেলায় কোথা থেকে কোথায় এসেছে! কিন্তু চাঁদবদনী তো আসছে না! এই তো এদিক দিয়ে ওদিকে গেল পঞ্চপ্রদীপে চুমা খেতে। তবে কী ওদিক দিয়ে চলে গেল আর কোথাও?

কার সঙ্গে গেল?

স্বপনভাতুয়ার? স্বপনভাতুয়া তাকে কী কোনো 'লালচ্' দেখিয়েছে? নাকি সে নীলুয়ার সঙ্গে ঢুকে পড়েছে ভিডিও শো'য়ে?

চারজন ছিল। পুনোই গেলে তিনজন হল। তিনজন ছিল। চাঁদবদনী গেলে দুজন হল।

ভুটকী-গুরুবারি, গুরুবারি-ভুটকী।

চ ত এইটুক মেলা কুথায় আর হারাঁয় যাবে! ঘুরতে ঘুরতে নির্ঘাৎ দেখা হঁয়ে যাবে কুনো এক লোধাঝোড়ে।

ইখানেও লোধাঝোড়!

হঁ ত কী?

বলেই চারচোখে তাকিয়ে থেকে এর-ওর কাঁধে হাত রেখে মাথা নামিয়ে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল।

কাঁদছিস?

কাই নাই। তোর চইখেও ত জল?

হঁ দ্যাক্ ন মার, চইখে জব্‌রা পড়ল।

আয় ফুঁ দি।

গুরুবারিকে জড়িয়ে ধরে একবার তার বাঁ চোখের পাতা মেলে একবাব তার ডানচোখের পাতা মেলে পর্যায়ক্রমে ফুঁ দিতে লাগল ভুটকী।



ভিডিও শো চলল সারারাত ধরে। পুতুলনাচও টেনে রাখল অনেকক্ষণ। যাত্রা তো ভেঙে গেল ঠিক সময়েই। মেলায় যারা ঘুরছিল ফিবছিল বাড়ি যাবার তাদের কোনো তাড়া ছিল না, বাড়ি যাবার তাদের কোনো মন ছিল না। কেন কী ক্ষতি হত যদি সারারাত ধরে মেলা চলত? মাড়োতলা আলোয় আলোময় থাকত? একটা সময় পেরিয়ে ঝুপ্ ঝুপ্ করে একটা-দুটো আলো তো নিভতে লাগল। যদিও রাস্তার দুধারের আলোগুলো জ্বলেছিল সারারাত, সারারাত চলেছিল ভিডিও শো। 'ববি', 'আরাধনা', 'ঝিল্ কি উস্‌পার'। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেজে যাচ্ছিল—"বড়লোকের বিটি লো"। হাটুয়া কত বড়লোকের বিটি-ই তো মেলায় এসেছিল, কত কী কিনল-টিনল, কত কী খেল, চাউমিন-চিকেন-মোগলাই পরোটা। তারপর বাবা-মায়ের

হাত ধরে সুড় সুড় করে ঢুকে গেল ঘরে। স্বামীর হাত ধরে কোমর জড়িয়ে যারা থেকে গেল তারা গেহলী বউড়িরা। তাদের যুবা বয়স, তারা বাড়ি ফিরবে না, সারারাত ধরে তারা পরের পর দেখে যাবে ভিডিও শো।

শীতলাবুড়ির থানের কাছে হাটুয়াবুড়িদের ভিড়ে চাঁদবদনীকে হারিয়ে ফেলেছিল ভুটকী-গুরুবারিরা। কে জানে কোনো হাটুয়াবুড়ির হাত ধরে এতক্ষণে তার ঘর পর্যন্ত চলে গিয়েছে কি না চাঁদবদনী! তাকে তো বিশ্বাস নেই। হাটুয়াবুড়িরা ঠাকুর চুমাচ্ছে আর তাই দেখে তারও ৩তো বাই উঠল, সেও ঠাকুর চুমাবে।

ঠাকুর চুমাবে, ঠাকুর চুমাবে।

ঠাকুরথান ছেড়ে গুরুবারি-ভুটকীরা ফের ফিরে গিয়েছিল আগের আগের জায়গায়। নাগরদোলায়, 'ঝিলাপি'-র দোকানে, চুড়ি-চুর-মনিহারীর দোকানে। না, যেমনকার 'উড়াকাঠ' তেমনি উড়ে চলেছে। ভিড় এতটুকুও কমেনি। বরঞ্চ রাত যত গাঢ় হচ্ছে নাগরদোলায় ভিড়ও তত বেড়ে চলেছে।

বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে।

লোক কী আগের চেয়েও কম জড়ো হয়েছে 'ঝিলাপি'-র দোকানে? 'পোঙায় পোঙায় রস ভরে কী কম 'ঝিলাপি' বিক্রি করছে দোকানী? আসলে আজ তো 'ঠাণ্ডা উপাস', কারো ঘরে চুল্‌হা জ্বলেনি, তাই মেলায় এসে 'মুড়হি-ঝিলাপি' ঠোঙায় ঠোঙায় খেয়ে যাচ্ছে।

ভুটকী গুরুবারিকে বলেছিল, মুড়হি-ঝিলাপি খাবি নাকি একঠোঙা? তখন তারা শুধু খেয়ে গিয়েছিল 'ঝিলাপি'— এখন মুড়হি-ঝিলাপি। গুরুবারি বলেছিল, নাই খাই যদি ত একসঙেই খাব্ব, আগে তো বদনীকে খুঁজে আন্নি।

খোঁজ, খোঁজ। মুড়ি-জিলিপির দোকান ছেড়ে তারা গিয়েছিল ফের শাঁখা-চুড়ির দোকানে। দূর থেকে দেখেই মনে হয়েছিল— পিছ্ন ঘুরে চুড়ি পরছে চাঁদবদনীই। চাঁদবদনী, চাঁদবদনী। দু'গাছা দু'গাছা চার গাছাতেও হল না, ফের সাজ্‌নীদের মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দোকানীর দু'হাতে! আর কী হেসে হেসে কথা বলছে, দোকানী হাসি হাসি মুখ করে ঠেলে-গুঁজে চুড়ি পরাচ্ছে!

প্রথমটা দৌড়ে তারপর এক পা এক পা করে চুপিসারে গিয়ে পিছ্ন থেকে দু'হাতে জাপটে ধরল ভুটকী। 'আ-হা-হা কর কী কর কী' বলতে বলতে চুড়ি পরানো থামিয়ে দোকানীও 'ভ্যাল্‌ ভ্যাল্‌' করে তাকিয়ে থাকল। যে-চুড়ি পরছিল সেও জাপটা-জাপটিতে এতটাই হকচকিয়ে গিয়েছিল যে প্রথমটায় একটা কথাও বলতে পারেনি।

ভুটকী কেঁদে ফেলল।

হাঁটু মুড়ে বসলে পিছ্ন থেকে অবিকল চাঁদবদনী! সে চোখ মুছে বলল, হেঁ-এ-এ আমি বলি চাঁদবদনী।

গুরুবারি বলল, কিছু মনে কর-অ নাই দিদি, আমরা একজনাকে খুঁজছি।

ততক্ষণে দোকানীর মনে পড়েছে বৈকি— এই তো একটু আগেই নীল নীল ভিতরে হল্‌দে সুতা— দু' গাছা দু' গাছা চার গাছা—

সে বলল, হঁ সোউ গাঁটিয়া-গুঁটিয়া ছট্‌ফটিয়া মেঝেনটার কথা কহুচ ত?

দুজনেই ঘন ঘন মাথা নাড়ল। চুড়ি পরতে বসা মেয়েটা বলল, মনে করার কী আছে, ভুল মানুষের হতেই পারে! একেকজনের আদলই ঐরকম— পিছ্ন থেকে দেখতে একরকমই লাগে।

ভয় পেয়ে গিয়েছিল ভুটকী পাছে মেয়েটা তার জাপটা-জাপটিতে ভয়ানক রেগে যায়।

কিন্তু না, চাঁদবদনীর মতো একরকমই শাড়ি পরা মেয়েটা তো হেসে বলল— এরকম হয়, হতেই পারে।

খন্দের চলে যাচ্ছে দেখে চুড়ি-দোকানীও বলল, অউ টিকে মেলা কাঁই আর যাব, চাঁইফরকি মাইয়া ঘুরি বুলেটে! সঙ্গী নাই ত কী হিবে— তুমারমনে আস-অ, দু' গাচ্ছা চুড়ি পরি যাও। গলার হার কানর দুল নাকফুল কোমরর বিছা— দেখি যাও।

ভুটকী-গুরুবারি কোনমতে বলল, হঁ ঘুরেঁ আসছি।

বলেই তারা দৌড়ুল, দৌড়ুল শীতলাথানের দিকে, ভাবতে ভাবতে গেল— হয়ত এতক্ষণে বদ্‌নী ফিরে এসে তাদের দুজনকেই খুঁজছে, আর দেখতে না পেয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবছে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে অঝোরঝর মেলায় কোথায় যে হারিয়ে গেল মেয়েদুটা, এখন তাদের মা-বাপকে কী যে বলব!

চ চ, চাঁড় চাঁড় চ— যদি ফের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়!

ফের দৌড়ুল শীতলাবুড়ির থানে। ঠাকুর-চুমানো শেষ হয়ে গিয়েছে কবেই। সাদা সাদা থান আলতা-পাড় শাড়িপরা বুড়িরা ফের বসে গিয়েছে যে-যার সে-তার— কিন্তু চাঁদবদনী নেই কোথাও।

মণ্ডপের চারধারটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল ভুটকী-গুরুবারিরা। একবার, দু'বার তিনবার। না, চাঁদবদনী কোথাও নেই। তবে কী ভুটকী-গুরুবারিরা এল এখানে আর তাদের খোঁজে চাঁদবদনী গেল সেখানে— ফের সেই জায়গায়, নাগরদোলায়— চুড়ি-চুরবালা— ঝিলাপির দোকানে?

ধানকুটা মেশিনের ফিতার মতো একবার এখানে একবার সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে ঘুরে বেড়াল ভুটকী-গুরুবারিরা। যেমনকার তেমন, যে-যার সে-তার, চাঁদবদনী নেই কোথাও!

তবে কী ঘরে ফিরে গিয়েছে চাঁদবদনী? হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই-সেই। মেলায় তাদের খুঁজে না পেয়ে বদ্‌নী হয়ত ফিরে গিয়েছে ঘরেই।

চালাঘরে, চালাঘরে।

এখনও কাতারে কাতারে লোকজন যাচ্ছে-আসছে। নামালদেশে এত লোকজনও থাকে! শালুইপোকার মতো বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছে ভুস্ ভুস্!

চালাঘরে পৌঁছে দেখল— গিরিহা-গিরিহানীরা নেই, তাদের ঘরে-আসা কুটুমবাটুমরাও 'যাত্' দেখতে মাড়োতলায়। শুধু চালাঘরে পড়ে পড়ে 'নির্ধুমসে' ঘুমোচ্ছে ধানকাট্‌নী নামালিয়ারা। নেই শুধু শতুরার বউ গুরভার বউ— 'হাউসী' তারা মেলা দেখে বেড়াচ্ছে, মেলা দেখে বেড়াচ্ছে নীলুয়া-হাড়িয়া-লাইবুকা-বড়কই-সুরুয়া-নাকফুড়রিরাও।

ভুটকী-গুরুবারির গলা পেয়েই জেগে উঠেছিল শরাবনের বউ, চাঁদবদনীর মা। সে বলল, হেঁ গুরুবারি, বদ্‌নী কাই?

ভুটকী বলল, সে ত আগেই এসেছে, আসে নাই?

কাই, ইখানে ত নাই।— এই টুরার বাপ, এগো শুনছ!

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল শরাবনলোধা, বলল, হঁ হঁ, কী হএেছে?

ভুটকী-গুরুবারিরা 'যাত্' থিক্যে ঘুরিঁ আইল, হাম্‌দের বদ্‌নীটা এখ্‌নও আসে নাই।

আসবেক। কারোর সঙে হয়ত ঘুরছে লঙ্ লঙ্ করে।

খোঁজ খোঁজ, পুনোই ত এখনো আসেনি!— ঐ তা'লে পুনিয়ার সঙেই ঘুরছে। ফের হাই

তুলে ঘুমোতে গেল শরাবন-শরাবনের বউ, চাঁদবদনীর বাপ-মা।

এতক্ষণে ভুটকী-গুরুবারিরও খেয়াল হল— হ্যাঁ তাই তো। পুনোইয়ের সঙ্গে তো ঘুরতে পারে চাঁদবদনী।

ফিস্ ফিস্ করে ভুটকী গুরুবারিকে বলল, কিন্তুক একজনের সঙে আরেকজনের যের'ম খাড়াখাড়ি ভাব— পারবে তারা পারবে মেলায় হাত ধরাধরি করে একসঙে ঘুরতে?

হুঁ, চাঁদবদনীর কাছে ফের পারা না-পারা। ছাড় ত— নির্ঘাত দুজনকে বগলদাবা করে ভিডিওয় ঢুকেছে নীলুয়া। এতক্ষণ মজাসে 'সিনিমা' দেখছে।

ভুটকী-গুরুবারিরা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে খালি যা ভাবল— ইস্ চাঁদবদনীকে খুঁজতে মেলা না দেখেই সাত তাড়াতাড়ি তারা ফিরে এসেছে ঘরে!

স্বপনভাতুয়াকে নিয়ে ঠেস মেরে কথা বলায় রেগে গিয়েছিল চাঁদবদনী। আর তাই পুনোইকে ফেলে রেখেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীরা। একা হয়ে গিয়েছিল পুনোই। মেলায় আবার একলা-দুখলা কী? গিজ্ গিজ্ করছে লোকজন। কিছুক্ষণ একা একাই ঘুরে বেড়ালো পুনোই। একা একা ঘুরতে ঘুরতে এ-দোকান সে-দোকান দেখতে দেখতে আসলে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেই ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীদের। চোখে চোখে রাখতে চেয়েছিল সেই তাদেরকে। বিশেষত চাঁদবদনীকে— দেখি ত দেখি ভালা স্বপনভাতুয়ার সঙে ঢঙীটা কথা বলে কি না! ভাতুয়াটাই বা তার হাত ধরে টানাটানি করে কি না! না, সেই তো চোখের দেখ্‌তা একঝলক স্বপনভাতুয়াকে দেখেছিল নাগরদোলার ওখানে—উড়াকাঠে উড়বার কালে। আর তো দেখে নাই! দেখতে না পেয়ে সাব্যস্ত করেছিল সে—হাটুয়া মাইয়া-ছানার তার কী অভাব আছে? সে কেন ঘুরে বেড়াবে লোধামাইয়াদের পিছু পিছু?

চাঁদবদনীকেও আর দেখতে পায়নি পুনোই। অনেকক্ষণ পরে সে দেখতে পেয়েছিল— ভুটকী-গুরুবারি—মাত্র ঐ দুজনকে। চাঁদবদনীকে ছাড়াই তারা দুজনে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবে কী চাঁদবদনীর সঙ্গে ঐ দুজনেরও রাগারাগি— হয়ে গিয়েছে ছাড়াছাড়ি? হতেই পারে, দেখতে-শুনতে ভালো বলে চাঁদবদনীর যেমন 'ডাঁট'!

মনে হয়েছিল বৈকি পুনোইয়ের— তাদের সঙ্গেই দলে ভিড়ে যায়। এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু না, এসময়ই তার হাত ধরে টান দিল নির্মাল্য, মেসিনঘরের সেই লোকটা।

একা একা যে? তোর সাথীমানে কাঁই গলা?

বুকে বল পেয়ে গেল পুনোই। মনে মনে এই তো খুঁজছিল সে। বলল, আছে কুথাও এদিক-সেদিক। তারপরে বলল, তুঁইও ত একা।

হাসল নির্মাল্য। হাতে চাপ দিয়ে বলল, একা কি পাঁই? অউ ত তু আছু মো সাঙ্গঁর। একা কী জন্য? এই তো তুই আছিস আমার সঙ্গে।

পুনোইও হাসল—হেঁ-এ-এ-এ।

তারপর তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে মেলার এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত চষে বেড়ালো। পুনোই যা যা বায়না করল নির্মাল্য তাই তাই খাওয়ালো তাকে।

রস্‌গুল্লা খাওয়াবি?

হউ খা, ক'টা?

দুটো আঙুল দেখাল পুনোই।

দুটো রসগোল্লা খেয়ে চোখ চক্ চক্ করে উঠল পুনোইয়ের।

নির্মাল্য বলল, আউ কী খাবু?

এগো ঐ যে কালিয়া কালিয়া—

লেডিকিনি?

হঁ।

দুটো আঙুল মুখে পুরল পুনোই। লেডিকিনি না বিকিকিনি—কে জানে কী!

নির্মাল্য দোকানীকে বলল, অদা পৈড়্যার নামালিয়া জেনাদা। শখ হেইচি মণ্ডা মিঠাই খাবার। দও ত দুটিয়া লেডিকিনি দও।

মিষ্টিদোকানী জেনা বলল, খেঁটন নাহানে ধানবিলে কোমর নুই নুই খাটব কী করি নির্মাল্য?

সাদা চিনামাটির ডিসের উপর দুটো কালো কালো লেডিকিনি আর একটা চামচ দিয়ে জেনাদোকানী বলল, লে মেঝেন!

মুহূর্তে খাওয়া শেষ করে পুনোই বলল, টুকচার রস দে দোকানী।

রসে তো ভাসুচু। ফের রস খাবু কি রে! —হেই চুটিয়া আউ টিকে রস দে ত মেঝেনকে।

চামচে এক চামচ রস তুলে তলায় হাত পেতে রেখে দৌড়ে এসে পুনোইয়ের ডিসের উপর উপুড় করে ঢেলে দিয়ে হাটুয়াছোঁড়াটাও হাসল।

লেডিকিনি-রসগোল্লা খাইয়ে পুনোইয়ের হাত ধরে বলির পাঁঠার মতো হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল নির্মাল্য।

অত্‌বা কী করবু? কী দেখবু ক'—ভিডিও? পুত্‌লিনাচ?

যাত্রা দেখতে নির্মাল্য হারগিজ যাবে না, না। কে জানে কোথায় ফের দেখা হয়ে যাবে অদ্বৈতর সঙ্গে। সকাল থেকেই তো শুনে আসছে— অদ্বৈত পৈড়্যার লোকজন আজ নট্ট কোম্পানীর যাত্রা দেখবে একেবারে স্টেজের কাছে চেয়ারে বসে ভি-আই-পি আসনে। যাত্রা হবে মাড়োতলা থেকে সামান্য দূরে ইস্কুল-টাঁড়ে।

ইস্কুল-টাঁড়ে, ইস্কুল-টাঁড়ে।

ছাড়ি দে পূর্ণিমা, যাত্রা বাদ দি আর কী দেখবু ক'?

যা দেখাবি। পুনোই বলেছিল।

উঁ-হু, ভিডিও দেখতেও যাবে না নির্মাল্য। নামালিয়াদের লম্বা লম্বা চুলঅলা ছোঁড়াগুলো সেখানে ভিড় জমায়। যদি তাকে দেখে ফেলে তাদেরই এক ছুঁড়ির সঙ্গে তখন? স্বপ্নার মতো 'খেঁড়রোবুচি'র দশা করে ছাড়বে না তার?

ছাড়ি দে, ভিডিও বি দেখতে হবনি—নীলুয়া-লাইবুকা এরমেনে হলে ঢুকি 'ফিলিম' দেখিছ্‌ন।

পুনোই শাড়ির আঁচলা ঝেড়ে বলল, দেখুক, দেখলেই বা। আমরাও দেখব, নীলুয়াকে হামি ডরাই নাকি?

নির্মাল্য মনে মনে বলল, তুই না ডরাস্, তোকে কিছু করলও না, কিন্তু মোকে সে ছাড়ি দিবে কেনে? অতএব—

তু ছাড়ি দে পূর্ণিমা, চ।

পুনোইয়ের কী যাত্রা কী ভিডিও কী পুত্‌লিনাচ—কোনোটাই দেখার তেমন আগ্রহ নেই। বিনা পয়সায় লোকটা দেখাতে চাইছে, তাই আর কি।

সে সামনে-পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে ফিরে দেখছিল—চাঁদবদনী-ভুটকী-গুরুবারিরা তাদের দুজনকে দেখছে কি না। —খালভরিরা দেখুক না!

আগু কভু দেখিছু?

কী?

পুতুলিনাচ।

নাই। আমাদের উদিকটায় উ-সব নাই।

তাহানে অউটায় ঢুকি পড়।

রীতিমত টিকিট কেটে পুনোইকে প্রায় জড়িয়ে ধরে 'হলের' ভিতর ঢুকে গেল নির্মাল্য। এখানে স্টেজটুকুতেই যা আলো, আর তো বাকি অন্ধকার!

পুতুলনাচ ভেঙেছিল ঠিক সময়েই। অবশ্য একটু রাত করে। এত রাতে সে আর কার সঙ্গেই বা বাসায় ফিরবে? নির্মাল্যই হাত ধরে নিয়ে চলল তাকে। অদ্বৈত পৈড়্যার বাড়ি থেকে একটু তফাতে তার হাত ছেড়ে দিল সে।

বলল, যা তুই আগু আগু, মু যাউচি পছে পছে।

বলেই খানিকটা পিছিয়ে রাস্তার ধারে পেচ্ছাপ করতে নেমে গেল নির্মাল্য।

চালাঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই শরাবনের বউ বলল, কে আইলি রে? বদ্‌নী?

নাই হামি পুনোই, জেঠি।

বদ্‌নী কাই রে?

এখ্‌নো আসে নাই! অরা ত আমাকে দল থিকে ভিনু করে দিল জেঠি— ঐ ভুটকী-গুরুবারিরা। সেই থিকে আমি ত একলা একলা—

চুপটি করে শুয়ে থেকে শুনছিল ভুটকী-গুরুবারিরা। দাঁতে দাঁত টিপে তারা হিস্ হিস্ করে বলছিল, এত্‌খন কার সঙে লটর-পটর করছিলি ঢঙী? মেসিনঘরের ঐ লোকটার সঙে? বলে কী না একলা একলা!

হাই তুলে শরাবনের বউ বলল, ফুলুয়ার মা হাড়িয়ার মা এখ্‌নো আসে নাই।

তবে দ্যাক্—অদের সঙেই ঘুরছে-ফিরছে। মেলায় ত লোক এখ্‌নো গিজ্ গিজ্ করছে।

বলেই নিজের জায়গাটায় চুপটি করে শুয়ে পড়ল পুনোই। শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে গেল—আজ 'যাত্' দেখার শখ তার মিটিয়ে দিয়েছে লোকটা।

হাড়িয়ার মাকে 'আগুট' বাছতে বসিয়ে রেখে শতুরার বউ নিয়তি ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীদের খোঁজার নাম করে মেলায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল অদ্বৈতকেই। কে জানে কেন কাল রাত থেকে তার মনও তো উতলা হয়েছে লোকটার জন্য। কাল রাতে কী মনে করে তাকে তো জড়িয়ে ধরেছিল লোকটা। কাল থেকে খালি তো লোকটার মুখে 'শত্রুঘ্নর বোহু' 'শত্রুঘ্নর বোহু'! আগে তো কথায় কথায় 'চন্দ্রবদনী' 'চন্দ্রবদনী', 'কাঁই-মাই।' একটা দিনের মধ্যেই লোকটার ভাবসাব রকমসকম বদলে গিয়েছে—কেমন যেন ভিন্নরকম। 'ভিনুরকম' 'ভিনুরকম'।

অদ্বৈতর খোঁজে মেলার ভিড়ের ভিতর হুড়বড়িয়ে ঢুকে গেল লোধানী। মেলা তো মেলা—হাটুয়াদেরই মেলা। চারধারে লোক আর লোক, মেয়ে-মরদ, হাটুয়া ছা-ছু আরা। খালি তো 'যায়েঠে' 'আসেঠে' 'খাউচি' 'যাউচি' 'হুঁগ' 'কি গ'। উড়িয়া আর উড়িয়া! এগুলেও ভেড়ের ভেড়ের পিছোলেও ভেড়ের ভেড়ের।

ছুটকে-ছাটকে দু-চারজন তাদের মতো নামালিয়া কী আর নেই? মেলার একধারে তারা জড়ো হয়ে কেঁদ্‌রা বাজিয়ে ছো করছে। সাঁওতালরা। হাটুয়াছোঁড়ারা তাদের ঘিরে ধরে উৎসাহ দিচ্ছে। সাঁওতালী ধুতি পরে—কোঁচা নেই, পিছনের দিকে কাছাটাকে কোঁচার মতো ঝুলিয়ে রেখে—নাচছে পাঁতানাচ সান্তাল মরদরা। ধানকাট্‌নী 'মাইয়ারা'ও আগু-পিছু করে নাচছে 'নুয়ে নুয়ে' কোমর বেঁকিয়ে। লোধাদের চাঙের মতো তারাও তো এনেছে ধামসা-মাদলা। —হেতাং হেতাং দাঁঃ দাতাং দাতিং হেতাং দি হেতাং হেতাং দিঃ—। তার মাঝখানে মাঝখানে মাথায় 'পাগ-বাঁধা' খড়ের ল্যাজওয়ালা হাউসী ছোকরা মাটি থেকে দু-তিন হাত লাফ দিয়ে উঠে 'কুলকুলি' মারছে।

মেলা জমে যাবে না ভারি!

নাচ দেখতে আর থেকে গেল না নিয়তি। কে জানে কতদূরে এসে পড়েছে সে! ফের সে দৌড়ুল আঙট-দোকানীর ওদিকে—যেখানে গুরভার বউ বসে বসে আঙট বাছছে। এতক্ষণে কী আর সেখানে আছে গুরভানী?

হায় গ মাই— গুরভার বোহুর এত আঙটে মন—এখনো আঙট দেখছে!

আঙট, আঙট।

নিয়তিকে দেখে আঙটের দোকান থেকে উঠে পড়ল গুরভার বউ। দোকানীকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিয়তিকে বলল, দ্যাক্‌ ন মার একফোঁটকা একটা আঙটের দাম বলে কী না কুড়ি টাকা!

হঁ ত নাই লিব্বেক? পানপাতার কাজ করা রূপার আঙট যে! নিয়তি বলল ফিস্‌ ফিস্‌ করে। যেন লাদনগাড়িয়ার বিটিছ্যানা সোনা-রূপা কত চেনে!

মুখ বেঁকিয়ে গুরভার বউ বলল, ছাড় ত ফুলুয়ার মা, হাম্‌দের বসন্তিয়াই ভালো। কামিল্লা উর'ম আঙট মাগ্‌নাই দিব্বে।

মাগনাই দিবে, মাগনাই দিবে।

একরকম টানতে টানতে নিয়তিকে আঙটের দোকান থেকে 'ঝিলাপি'-র দোকানে নিয়ে এল গুরভানী। —লে মিঠাই খাবা!

তক্ষুনি দুটো দুটো চারটে জিলিপির অর্ডার দিল নিয়তি। খেতে খেতে গুরুভার বউ এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করল, এগো বদ্‌নীদের সঙে দেখা হয় নাই?

নাই। দেখা হঞেছিল নীলুয়া, তোর ব্যাটা হাড়িয়াদের সঙে। কে জানে কুথায় কুথায় ঘুরছে ছুঁড়িরা! বদ্‌নীটা যা ছট্‌ফটিয়া!

নামালিয়া লোধানীদের দেখে খুশি হয়েছিল মিঠাই-দোকানী। বলল, ঠুঙায় আউ দুইটা দেই?

দে। তোর যখন মন হঞেছে। দুজনে খিল খিল করে হাসছে।

দোকানীও ঠিসারা করে হেসে বলল, তুমারমেনকে দেখনে কার না মন হয় মেঝেন?

কেনে? কেনে দুকানী? চেপে ধরলে আর কিছু বলতে পারে না মিঠাই-দোকানী, খালি হাসে। হাসি দেখে লোধানীরা বলে, অ রে দাঁত-গিজড়ীয়া! ফের হাসে দোকানী, হাসতে হাসতে অবশ্য দুটো জিলিপি ফাউ করে দেয় মিঠাইওয়ালা।

জিলিপি খেয়ে গুরভার বউ বলে, চ লিয়তি আগে ত মায়ের মুখ দেখে আসি।

মায়ের মুখ দেখতে শীতলাথানে চলল লোধানীরা। শীতলাবুড়ির থানের সামনে সেই তো চাঁদোয়ার নিচে সাদা শাড়ি সাদা সাদা থান-পরা বুড়ি-বউড়িরা। ধূপ-ধুনায় ধোঁয়াক্কার। নারায়ণের অনন্তশয্যা, দশাবতার। শীতলা চাঁদনি শীতলা পঞ্চরত্ন—ঐ তো ছ'পা তিন হাত

তিন মাথা কিম্ভূতকিমাকার জরাপাত্র! তার ভিতরে তুঁত-রঙা মায়ের মুখ ঝকমকাচ্ছে।

ঝকমকাচ্ছে, ঝকমকাচ্ছে।

গহনাসোহাগী গুরুভার বউ আচমকা বলে উঠল, হুই দ্যাক্ ফুলুয়ার মা নাকফুল। সোনা-ই বঠে। এত যে ঝিকঝিকাচ্ছে!

বসে থাকা সার সার সাদা থানপরা বুড়ি আলতা-পাড় সাদাখোলের শাড়িপরা বউড়িদের পিছনে এতদূরে দাঁড়িয়ে থাকা গুরুভার বউয়ের চোখ ঠিক চলে গিয়েছে মায়ের নাকপাটায়। এক ফুঁটকি নাকছাবিতে।

দেখে ফেলে নিয়তিলোধানীও বলল, নাই দিদি, সোনা লহে। রাঙতা। বলেও তার মনে হল—হতেও পারে সোনার। পুবালদেশে চারধারে 'হাতির ল্যাখেন' যা সব বড়লোক দেখছি। নাকফুল তো নাকফুল, শীতলাবুড়ির গোটা 'মেড়'টাই মুড়ে দিতে পারে সোনায়।

বুড়িদের বউড়িদের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নমো করল লোধানীরা। বলাবলি করল—এ গো বাড়ুন-হাতে শীতলাবুড়ির কত বড় 'মেড়'! আমাদের উদিকে শীতলাঠাকুরের 'মেড়' আর কোথায়! সবই ত মাকড়াপাথরের উপর সিঁদুর-লেপা!

কার পিঠে বসে আছে, ক'ত?

আঙুল উঁচিয়ে গুরভার বউ বলল, কেনে ঘোড়ার পিঠে— ঐ ত।

পিছন থেকে কে একজন হাটুয়া তৎক্ষণাৎ বলে দিল, ঘোড়া কাঁই দেখুছু মেঝেন—দেবী বসিছন গধার পিঠে।

গাধা, গাধা।

শতুরার বউ নিয়তিলোধানী ফিস্ ফিস্ করে শুনিয়ে দিল— ঠিক্কেই ত, করমগীতেই ত আছে—"হাতি চড়ি আয়ো ত ইন্দররাজা। ঘোড়া চড়ি আয়ো ত করমরাজা।।" শীতলাবুড়ির ঘোড়া কেনে হবে, ঘোড়া ত করমরাজার।

এগো জানি কী আর নাই? আজকাল সময়ে সবকিছু পাসরাঁই যায়।

আর দাঁড়ালো না লোধানীরা। শীতলাবুড়ির থান ছেড়ে তারা গেল যাত্রাটাঁড়ের দিকে। শতুরার বউ নিয়তির চোখ তো খালি ঘুরে বেড়ায় অদ্বৈতর খোঁজে। অদ্বৈত, অদ্বৈত।

এদিকে তারা ঘুণাক্ষরেও জানল না—এই তো একটু আগে এখানেই দাঁড়িয়েছিল ভুটকী-গুরুবারি। এই তো একটু আগে এখান থেকেই ঠাকুর চুমাতে গিয়ে হারিয়ে গেল চাঁদবদনী।

যারা বড়জোর চিনত দোরখুলির লোধাবস্তির আশপাশটুকু, বুলান-হদহদি-রুখনীমারা-মুঢ়াকাটি-সুখজুড়ি, ধ-তলা-জোড়াশালতলা-করনতলা আশধান-কুরথিক্ষেত-আখুবিল-মুগচনার ক্ষেত, বড়জোর চিনত তপোবন জঙ্গলমহালের চার-চৌহদ্দি—এদিকে পাঁচকাহিনা ওদিকে কমলাসোল, সুবর্ণরেখানদী 'সে-পারে' হাতিবান্ধি-আন্ধারি-কুস্তুড়িয়া, নদী 'এ-পারে' বড়োডাঙা-থুরিয়া-খান্দারপাড়া-পাতিনা-তালডাংরা, মেলা বলতে মহিষাসুর দঁকের মেলা, রামেশ্বরে শিবচতুর্দশী আর বারুণীর মেলা, মহড়ানাচ-ফড়িখেলা, খাবার বলতে কেঁদ্-ভেলা-ভুড়রু ঢ্যামনা-গোই-গোধি, তারাই কী না আজ এই কদিনে এতদূরে এই নামালদেশে এসে কত স্মার্ট কত ফূর্তিবাজ হয়ে উঠল, হাটুয়াদের গায়ে গা ঠেকিয়ে হাঁটল, নাগরদোলায় চড়ল, জিলিপি-মিঠাই খেল, এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে কত জিনিস ঢুঁড়ে দেখল, ভিডিও দেখল, পুতুলনাচ দেখল, মন করে যদি তো হারিয়েও গেল—

হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

গিরিহার বাড়িতে চালাঘরে যখন ফিরে এল নিয়তি, ফিরে এল গুরভার বউ ততক্ষণে চাঁদবদনীর মা শরাবনের বউ লোধানী মেশিনঘরের বারান্দা আর চালাঘরের সামনের উঠোনটা

প্রায় পঞ্চাশবার এদিক-ওদিক করেছে। উঠোন ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে রাস্তার দিকে। উঁকিঝুঁকি মেরেছে মেলার দিকে। এদিক-ওদিক দিয়ে হাটুয়ারা হাটুয়া ভাষায় কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে, তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে যে যার ঘরের দিকে। ঘরের দিকে, ঘরের দিকে।

গুমরে উঠেছে শরাবনের বউলোধানী—কী এমন মেলা যে রাতভর জেগে থেকে দেখতে হবে! রামেশ্বরের ডাঙায় সারারাত ধরে শিবচতুর্দশীর মেলা হয় বটে। তবে কার সঙ্গে কী! শতুরার বউ গুরভার বউই বা এতক্ষণ কী করছে— চ্যাঙড়া ছাউ-ছানাদের মতো? বদ্নীকে নিয়ে তারা কী এখনও আসতে পারছে না?

হ্যাঁ মেলার দিক থেকে হুরি আসছে বটে, —মাইক বাজছে, গান হচ্ছে, কত ঢঙের বাজনা বাজছে! হেতাং দাঃ দিং হেতাং দাঁ। শরাবনের বউলোধানীর বুঝতে অসুবিধা হল না—মেলায় ধামসা-মাদল নিয়ে এসে গেছে সাঁওতালরাও। পাঁতা-নাচ নাচছে তারা। লোধানীর মনে হল—আরেকটু এগিয়ে মেয়ের খোঁজে মেলায় যাবে নাকি সে? একলা যাবে? নাকি সঙ্গে নেবে শরাবনকে?

উঁ-হু, মরদ তো ঘুমে কাদা। ঝোঁকের বসে একা একাই শরাবনের বউ এগিয়ে গেল অনেকটা। দূর থেকে দেখল— তিনজন হলতে-ঢলতে আসছে। দেখে বড় নিশ্চিন্ত হল শরাবনের বউ—ঐ ঐ তাহলে বদনীটা আসছে। তাহলে এতক্ষণ সে হাড়িয়ার মা আর ফুলুয়ার মায়ের সঙ্গেই ছিল?

তা ভালো।

আর তাহলে এগিয়ে যাবার দরকার কী—মেয়ে যখন আসছে! মেয়ে যখন আসছে, মেয়ে যখন আসছে। নিশ্চিন্ত মনে গিরিহার ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল চাঁদবদনীর মা, শরাবনের বউলোধানী।

গরুর নাদি কুড়োতে ধানের টুঙ খুঁজতে গেঁড়ি-গুগলি-খঙ্গা-বঙ্গা ধরে আনতে ভেলা-ভুড়রু-কেঁদ্-কষাফল বনের পাল্হা-পতর বেচতে হাটুয়াদের কত দূর দূর গাঁ-গঞ্জে বিলে-ঝিলে মেয়ে তো একা একাই যায়, বান্নি-মকর-রামেশ্বর-কালুয়াষাঁড়ের মতো কত 'যাতে'ই মেয়ে তো দলে ভিড়ে যায়—কই একদিনের তরেও তো মেয়ের জন্য এত উতলা হয়নি চাঁদবদনীর মা! আজ যেমন!

আচমকা ঘরের দিকে আসতে আসতে ঘুরে দাঁড়ালো চাঁদবদনীর মা। কিছুটা এগিয়েও গেল ফের। উঁহু—যা ভাবছে তা তো নয়, সে তো নয়। অন্য লোক, অন্যলোক। হুলর বলর এগিয়ে আসছে। হাটুয়া ভাষায় কঁড়-অ-মড়-অ বলতে বলতে তাকে ছাড়িয়ে তারা চলেও গেল।

ঐ যাচ্ছে। তারা কেউ নিয়তিও না গুরভার বউও না, চাঁদবদনীও না। থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে চাঁদবদনীর মা এতক্ষণে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বের করল— না স্বর না কান্না। খেতে খেতে বিষম খেলে যেমন হয়!

তারপরই শুরু করে দিল বিড় বিড় করে—যেন পাশাপাশি হাঁটা আরেক লোধানীকে মেয়ের সম্পর্কে শুনিয়ে শুনিয়েই বলছে, এগো শুন্ ন্ন, আমার মেইয়া বলে বলছি নাই, মেয়েটা বেড়ে ছটফটিয়া! এই আছে ত এই নাই, এই হেথা ত ঐ হোথা—

কোথায় মেয়ে? গিরিহার ঘরে ফিরে মেশিনঘরের দাওয়ায় খুঁটি ধরে অঝোরঝর কাঁদতে বসল শরাবনের বউ। শরাবন ঘুমে কাদা—শুনতে পাচ্ছে না। গোটা চালাঘরটাই ঘুমুচ্ছে—শুনতে পাচ্ছে না। গিরিহা অদ্বৈতর বাড়িটাও ফাঁকা, সবাই তো মেলা-টাঁড়ে—শুনতে পাচ্ছে না। অথচ শরাবনের বউ কাঁদতে কাঁদতে হাল্লাট হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছে, কেউ এসে

এক্ষুনি তাকে ধরে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করুক—এগো খালি খালি কাঁদছিস কেনে? এই ত আমি বদ্‌নী তোর বিটি তোর ছামুতেই!

গুরভার বউয়ের মনে নেই, তার মনেও থাকে না—কার সঙ্গে মেলায় দেখা হয়েছিল আর কার সঙ্গে হয়নি। সে মনেও করতে পারছে না— চাঁদবদনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কী হয়নি।

শতুরার বউ নিয়তি বলল, নাই গো মিনার সঙে দেখা হয় নাই, দেখা হএেছিল নীলুয়া-হাড়িয়া-সুরুয়াদের সঙে। ঘুরছে-ফিরছে আর ভিডিও দেখছে। মন বলছে—তাদের সঙেই আছে, ভুটকী-গুরুবারিদের সঙে যখন আসে নাই! ওরা ত সারারাত ভিডিও দেখবে। চুপ মার এগো কান্দিস নাই—নিজেদের লোকের সঙেই আছে। রাত পুহালেই দেখবি তোর মেইয়া তোর কাছেই গুটুর গুটুর আসছে!

গুরভার বউও বলল, হঁ লিয়তি ত ঠিক্কেই বলছে—হাড়িয়া-সুরুয়ারা ত আসে নাই। বদ্‌নী অদের সঙেই আছে। রাত ঢের হৈল বদ্‌নীর মা, ঘুমাবি চ। বলেই তার হাত ধরে টানতে লাগল গুরভার বউ।

ঘুম কী আর আসে? মায়ের মন কী আর মানে? হেঁসের বিছানায় একটু-আধটু গড়িয়ে নেয়, ফের একটা কিছু খুটখাট আওয়াজ হলেই হেঁসের ফেঁসের করে উঠে পড়ে। ঘুমন্ত এর-তার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে—পাছে ঘুমের ঘোরে কোন্ ফাঁকে মেয়ে এসে শুয়ে পড়েছে পাশে!

উঁ-হু উঁ-হু, সে-মেয়ের গতরের গড়নই আলাদা। হাত বুলালেই মালুম হয়। ছটফটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে চাঁদবদনীর মা।

প্রথমটায় ধাঁধিয়ে যায় চোখ, চোখের সামনে ঝিলিমিলি দেখতে থাকে সে। ধীরে ধীরে চারধারটা স্পষ্ট হয়। কানেও ভেসে আসে মেলা থেকে কলের গান, মাদল-ধামসার টিলিঙ ডুবুল্ ডুবুল্—

ঘাড় হেলিয়ে তারা দেখে শরাবনের বউ—পোহাতারা উঠল কী? ভোরপোয়াতি তারা? আর কবে উঠবে? আর কতক্ষণে রাত ভোর হবে? হিঝল-বিঝল এত তারা ফুটল আর সেই তারাটা ভুরভুরাটা—ভুরখা ইপিল এখনও উঠল না?

দোরখুলির লোধাবস্তির ঝুপড়িতে মহুল-কচড়ার রাতগুলোয় ঘুমের চটকা এমনি কতবার যে ভাঙে, কতবার যে 'পিসাব' করার অছিলায় ঘরবাহির করতে হয়! ঘাড় হেলিয়ে তারা দেখতে হয়। সাতভায়া-দধিভারিয়া-কালপুরুষা জ্বলজ্বল করে কিন্তু ভোরপোহাতি তারার তালাশ করতে ভারি দিগ্‌দারি হয়।

মেঘপাতাল থেকে চোখ নামিয়ে নেয় শরাবনের বউ, আর দেখে—খলার ধানগাদার ওধারে গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার গোটা বাকুলটায় শেঁ-শেঁ অন্ধকার! জনমাম্মি নেই। গিরিহা গিরিহানী তাদের কুটুমবাটুমরা ছাউছানারা—সবাই তো গিয়েছে মাড়োতলার মেলায়! এখনও কেউ ফিরে আসেনি।

তাই দেখে আঁতকে উঠল লোধানী—এ গো হায় দ্যাখো গো! খালি খালি মেইয়াটার তরে এতক্ষণ আঁইটাই করছি। গিরিহা-গিরিহানীর সঙেও ত থাকতে পারে। লোকদুটা এত যে 'চাঁদবদ্‌নী' 'চাঁদবদ্‌নী' করে উঠতে বসতে। মেলায় দেখা হলে তাকে কী আর ছেড়ে দেবে গিরিহা-গিরিহানী? হাতে ধরে বলে উঠবে না—কাঁই রে চন্দ্রবদনী আয় রে চন্দ্রবদনী? আমার মন বলছে দ্যাখ-অ তুমরা—আর কারো সঙে না মেইয়া আমার গিরিহার সঙেই আছে।

খুশিতে উথলে উঠল লোধানী। মাথার দু'ধারে পটাপট দু-দুটো কিল মেরে আপনার মনে বলল, কী মাথা না মুড় রে বাবা! ফাল্‌না-তুস্‌কা-ট্যাক্‌ কত কী আসছে যাচ্ছে আর এই কথাটা এতক্ষণ মাথায় আসছে না!

নিশ্চিন্তে ফের চালাঘরে ঘুমোতে গেল লোধানী, শরাবনের বউ চাঁদবদনীর মা। ওদিকে রাত, মেলার রাত পুতুলনাচের রাত ভিডিও হলের রাত যাত্রার রাত বাড়তে লাগল। রাত বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল। কত তারা উঠল কতদিকে। কত পাপীতারা কতদিকে ঝরে গেল। হাউই দো-দমা ফাটল। কতবার যে ঝ্যাএ-এং ঝ্যা-এ-এং করে কাঁসর ঘণ্টা বাজল! কত ধূপকাঠি-ধুনা যে পুড়ে ছাই হল শীতলামন্দিরে শীতলামাড়োতলায় তার কোনো লেখাজোখা নেই।

চালাঘরে খড়ের উপর খড়্ মড়্ করে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে শীতলা-মাকে দণ্ডবৎ করল লোধানী। পুবে করল পশ্চিমে করল উত্তরে করল দক্ষিণে করল। বিড়বিড় করে বলল, ছ্যানাকে ভালয় ভালয় ফিরাঁয় দে ঠাকুর, আর কিছু নাই পারি আর-বছর লইতন মহুলের গুড় দিএ্রে পূজা দিব-অ-স্তর!

তাছাড়া আর কীই বা করার আছে লোধানীর! এ-বছরকার মতো মহুল তো খোঁচ থেকে ঝরে শুকনা হয়ে গেছে কবেই! সে তো তারা মহুল কুড়িয়ে খলায় শুকিয়ে বস্তায় পুরে বেচে দিয়ে এসেছে নামাল আসার আগেই!

করার কিছু নেই, করার কিছু নেই। অগত্যা হাত-পা গুটিয়ে জুবুথুবু হয়ে না ঘুমিয়ে কান খাড়া করে বসে থাকল লোধানী—কখন দলবল নিয়ে মেলা দেখে ঘরে ফিরবে গিরিহা-গিরিহানী। চাঁদবদনী আসবে যে তাদের সঙ্গেই।

নীলিমার বাপের বাড়ি থেকেও লোক এসেছে বামনদার শীতলামাড়োতলার 'যাত্' দেখতে। প্রতিবছরই কেউ না কেউ আসেই। এবার এসেছে অদ্বৈতর শ্বশুর-শাশুড়ী। নীলিমার মা-বাপ। আর তাই নীলিমার আনন্দের অন্ত নেই। অন্ত নেই, অন্ত নেই।

এম্নিতেই 'গেহলা ঝিঅ'-এর মতো হাবভাব, সারাক্ষণই তো গুনগুন—"আরেন্দা বারেন্দা" "সোহারী-বেহারী"—

অদ্বৈতর ছেলেটা বায়না ধরেছিল—শীতলাঠাকুরের আরতির সময় সে ধুনুচি-নাচ নাচবে আর নাচ দেখিয়েই সে মোহিত করে ছাড়বে সেই কোন্ উড়িষামুলুক থেকে আসা তার দাদু-দিদাকে।

ধুনোর মাল্‌সা ছাড়াই নাচের অঙ্গভঙ্গি করে দেখাল অদ্বৈতর বেটা। আর তাই দেখে উড়িষার দাদু-দিদিমা হেসে বলল, অরু বাপা তোর নাচ দেখি আমে ত মোহিত হউছন্তি—শুন, এহি পরি নাচ নাচি পারে আমর দেশর কেলুচরণ মহাপাত্তর। তাঙ্ক শিষ্য নাকি তু?

অরু জানে না—কে জানে কে কেলুচরণ। মালসায় আগুন নিয়ে কেমন সে নাচতে পারে। তার শিষ্য কেন হবে—সে তো নাচ শিখেছে 'লোক-ক্লাব'-এর নান্টুদার নাচ দেখে দেখে।

মাড়োতলায় যাবার জন্য পা তার সর্ সর্ করছে, আর তর সইছে না। সে তার বাবার হাত ধরে টানাটানি করছে, শিগ্গি উঠি পড়— ঐ শুনুচ ঢাকে কাঠি পড়লা!

পড়ুক, অদ্বৈত ছেলেকে বলেছে, আরতি কী একবার হবে, হবে তো বারবার— সন্ধ্যারতি নৈশারতি তার আবার সন্ধিপূজা। —কেত্তে নাচবু নাচ না!

অরুর সেই এক কথা এক গোঁ—নাচতে হয় তো নাচবে সে সবার আগে আরতির প্রথমেই। তাকে দিয়েই ধুনুচি-নাচের আসর শুরু হোক।

তাই সন্ধ্যারতির আগে আগেই মেলায় আসতে হয়েছে অদ্বৈত-নীলিমাকে। সঙ্গে এসেছে নীলিমার বাবা-মাও।

শীতলাথানে প্রথম আরতি—দেখবার লোক যেমন মেলা, নাচবার লোকও তো মেলা! কিন্তু নাচতে চাইলেই কী সবাইকে নাচতে দেওয়া যায়? নাচবে তো তারা, তাদেরই ছেলে-মেয়েরা ঘরের লোকেরা যারা গণ্যমান্য। আর নাচবে 'লোক ক্লাবের' সদস্যরা।

অদ্বৈত পৈড়্যার ছেলে ধুনুচি নাচবে—এ আবার বলতে হবে! মালসায় ধুনার আগুন নিয়ে নাচুক না সে যত খুশি! —চ্যা-এ-এ-ড় দ্যানে দ্যান দোক্তাপূজা—

অদ্বৈত-নীলিমার মেয়ে তনিমার আবার অত নাচানাচিতে মন নেই। উল্টে সে বিরক্ত—কে জানে এরা নাচের নাম করে কতটা সময় এখানে বইয়ে দেয়! মেলা দেখতে এসে কোথায় ঘুরে বেড়িয়ে মনের আনন্দে মেলা দেখবে তা নয় একজায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধেইতা ধিনা।

সে দল ছেড়ে হাত ছাড়িয়ে পালাতে চায়, একা একাই ঘুরতে চায়—কিন্তু ঘুরতে তাকে দিলে তো! মা তো সর্বক্ষণ হাত মুঠো করে চেপে ধরে বলছে, হাত চাপি থা তনি নাহানে হারিই যিবু!

হারিয়ে যাবে, —মায়ের যেমন কথা! আজ না হয় শীতলাথানে মেলা, ভিড় তো ভিড়, পূজার দিনগুলো ছাড়া অন্যদিনগুলোয় মাড়োতলা তো পড়ে থাকে ফাঁকা। এদিক-ওদিকে আর কতটুকু দূরত্ব! এই তো বড়রাস্তা থেকে নেমে হাটতলা-শীতলাতলা-ক্লাবঘর ছাড়িয়ে সাউপুকুরের আড়া। রাস্তার ওপাশে না হয় চলে গিয়েছে অনেকটা, যাত্রার প্যান্ডেল অব্দি। সীতাহরণ খেলায় যে কেউ কেন, সে নিজেই দম নিয়ে ছো-কিত্-কিত্ করতে করতে এ-মুড়ো সে-মুড়ো ঘুরে আসতে পারে এক নিশ্বাসেই। এইটুকুর মধ্যে কেউ হারিয়ে যায়?

মায়ের হাত ছাড়িয়ে আচমকা সে দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল, দৌড়ে তাকে ধরে আনল অদ্বৈত।

বলল, অমন হাত ছাড়িই যাউ কাঁইরে মা, দাদু-দিদার কোত্র বসি দ্যাক্ না—অরু কিত্তি নাচ দেইচি।

দাদু-দিদার কাছে বসে দ্যাক্না—অরু কেমন নাচ দিচ্ছে।

শ্বশুর-শাশুড়ী বউ-ছেলে-মেয়েদের শীতলাথানে বসিয়ে রেখে অদ্বৈত চলে গেল, বলে গেল— তমানে এইঠি বুস্‌স, মুঁ টিকে অফিসনু ঘুরি আসি।

অফিস? তারমানে মেলার মূলমঞ্চ, মেলা-পরিচালন কমিটির অফিস, যেখান থেকে মাইকে ঘন ঘন বলা হচ্ছে—

অদ্বৈত পৈড়্যা তো মূলমঞ্চে মেলা-পরিচালন কমিটির মান্যগণ্য সদস্যদের পাশে একসঙ্গে বসবেই বসবে। একজন 'লোক ক্লাব'-এর ছোকরা পায়ের উপর পা দিয়ে বসেছিল চেয়ারে, অদ্বৈতকে দেখামাত্র তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে, বলল, তুমে বুস-অ অদাদা!

অদ্বৈত বসতে বসতেই বলল, কম করি দশহাজার লুক্ক ত হবে—কী কও সামন্ত?

সামন্ত নামের লোকটি হেসেই বলল অদ্বৈতকে, ইগো না, দশ হাজার কী কও অদা, কম-সে-কম বিশ-বাইশ হাজার লুক্কর ধাক্কা! আজ্জাত এত্তে লুক্ক মাড়োতলার মেলায় কবু হেইচি কী? রেকর্ড! আজ পর্যন্ত মাড়োতলার মেলায় এত লোক কী কখনো হয়েছে?

বামনদার শীতলামাড়োতলার মেলায় দর্শনার্থীর প্রাচুর্য নিয়ে মঞ্চে আলোচনা চলল

কিছুক্ষণ। কথায় কথায় উঠল নন্দীগ্রামের বামুনআড়ার শীতলামেলার কথাও। নাকি সেখানে লোক হয় আরো বেশি—প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার।

বামুনদা-বামুনআড়া। বামনদার লোকজন বামনআড়ার শ্রেষ্ঠত্ব মানবে কেন? তারাও রঙ চড়িয়ে বলল, তবে তাদের মেলায়ও লোক এসেছে পঞ্চাশ-ষাট হাজার। ঐ তো লোকে লোকারণ্য! চারদিকে ফূর্তি ফূর্তি! কেউ কেউ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে বলে উঠল—ধা ধিন ধিনদা এই নিয়ে বামন্দা!

বামন্দা, বামন্দা।

বেশিক্ষণ বসল না অদ্বৈত। তার প্রোগ্রাম তো করাই আছে এক নাইট সে সপরিবারে যাত্রা দেখবে।

অদ্বৈতর ছেলে অরুর যেমন জেদ—প্রথম তো প্রথমেই, তেন্নি চাড় অদ্বৈতর—যাত্রা দেখতে হয় তো প্রথম নাইটেই।

সেই যাত্রা দেখতে গিয়েছিল অদ্বৈত। 'মীরার বঁধুয়া'। মীরার গলায় মধু যেন উপচে পড়ছিল। গলা কী, গান কী! আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল অদ্বৈতর শ্বশুর-শাশুড়ি।

যাত্রা দেখতে দেখতে মা মেয়েকে বার বার বলছিল, নীলি, দেখুছন্তি রে মা—এ যে তোহর সাক্ষাৎ রাধা! হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করি কাঁদে—কাঁদি কাঁদি আঁখি রাঙা করি দেউছন্তি—

দউ, তুমে চুপ কর। যেস্‌সে লুক্‌ক কী— নায়িকা হউছন্তি বীণা দাশগুপ্ত!

বীণা দাশগুপ্ত, বীণা দাশগুপ্ত।

বীণা দাশগুপ্তের 'মীরার বঁধুয়া' দেখতে দেখতে বেশ রাত হয়ে গেল। যাত্রা শুরুই হয়েছিল দেরি করে। কারণ আসতে আসতে কোথায় নাকি রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল নায়িকার।

যান্ত্রিক গোলযোগ, করার কী আছে? তবু প্যান্ডেলে ঘন ঘন হাততালি আর মড়া নিয়ে যাবার সোরগোল উঠেছিল— বল্ হরি হরিবোল, বল হরি হরি-ই-ই-ই বো-ও-ও-ও-ল।

কিন্তু তারপরে বীণা দাশগুপ্তের অভিনয় দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছে যাত্রামোদীরা। মড়াকান্না নয়, সত্যি সত্যি কেঁদে ভাসিয়েছে মা-মাসিরা।

অদ্বৈতও যাত্রা দেখার ফাঁকে ফাঁকে একবার বউয়ের দিকে একবার শ্বশুর-শাশুড়ির দিকে একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বারবার বলে উঠছিল, কেমন?

তারমানে পূজা কমিটিতে সে-ই ত আছে, তার পরামর্শেই ত আজ শীতলামাড়োতলায় যাত্রার আসর বসেছে। যে-সে যাত্রা কী আর—সেরার সেরা যাত্রা।

নেহাৎ এসব যাত্রায় মেডেল দেওয়ার রেওয়াজ নেই, নচেৎ শ্বশুর-শাশুড়ি বউ ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে আসরে বীণা দাশগুপ্তকে ডেকে এনে 'মীরার বঁধুয়া' যাত্রায় সেরা অভিনয়ের জন্য তার বুকে সেফ্‌টিপিনে গেঁথে দিত দু-দশ টাকা নয় একেবারে একশ টাকার কড়কড়ে নোট!

যাত্রা দেখে ফেরার সময় সবচেয়ে বেশি কথা বলছিল নীলিমাই তার মায়ের সঙ্গে। তারও যে মনে হয়েছে বীণা দাশগুপ্ত তো নয়, স্বয়ং রাধাই!

সবচেয়ে বেশি সময় চুপ করেছিল অদ্বৈতর বেটা অরু। —কী যে যাত্রা যাত্রা! এতক্ষণ যাত্রায় না থেকে সে তো 'দাঁড়' নিয়ে আরো কয়েকবার ধুনুচি-নাচ নাচতে পারত!

হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল তার, তার বাবাই তো বলেছিল—আরতি কী একবার হবে, হবে তো বারবার—সন্ধ্যারতি নৈশারতি ফের সন্ধিপূজা—কেন্তে নাচবু নাচ না!

ভোর রাতের সন্ধিপুজা তো এখনও বাকি। মনে পড়তেই সে তার বাবার হাত টেনে ধরে বলল, এখুন ঘর যাইতে হেবনি—

তার মানে?

—কী করবু?

সন্ধিপূজা না কী হেব যে?

হঁ, সে ত ভোর রাতর।

হউ ভোর মু দেখিমি।

হো হো করে হেসে উঠল অদ্বৈত। —সোউ তোর ধুনুচি-নাচ?

বকুনি দিয়ে নীলিমা বলল, অরু কাল সকালা তোর পড়া অছি না?

থাইনেই বা—

শুইবু কতবা বিছনারু উঠবু কতবা?

ঠিক উঠি যিমি।

তা সত্ত্বেও এবার তার দাদু-দিদিমা নিষেধ করল। দাদু বলল, অরু গটেয় কথা অছন্তি না? সোউ যে—হরির নাম কী বোঝা বোঝা? অউ ত ভালা—মেলা দেখাও হেলা যাত্রা দেখাও হেলা। এবে নিঁদ আসুছন্তি ঘরকু চ।

বলেই একটা মস্ত হাই তুলল অদ্বৈতর শ্বশুর। তার দেখাদেখি অদ্বৈতর শাশুড়িও।

অগত্যা ঘরের দিকেই এগিয়ে চলল অরু। চলল মানে? বাবা-মা দাদু-দিদিমাকে পিছনে ফেলে ঘাড় গুঁজে দৌড়ুল।

দৌড়ুল বটে তবে নিজেদের ঘরের ভিতর ঢুকল না। ফের বাবা-মা দাদু-দিদিমার দিকে পিছিয়ে এল।

সবাই মিলে যখন ঘরে ঢুকল তখন এক লোধানী তাদের দিকেই দৌড়ে এল। খানিকটা দৌড়ে এসে পুনরায় পিছিয়ে গেল।

পিছিয়ে গেল, পিছিয়ে গেল।

—নাই এদের সঙেও ত চাঁদবদনী আসে নাই!

একজন নামালিয়া কামিনকে এতরাতে এভাবে দৌড়ে আসতে দেখে অদ্বৈত ভাবল—শত্রুঘ্নর সেই বউটা কী? এতরাতে সে বুঝি তার জন্যই—

না নিঁদেই চাঁইফরকি ঘুরি বুলিচু কাঁইকি?

না ঘুমিয়ে চনমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কী জন্যে?

মেয়্যাটা আমার এখ্‌নও মেলা থিক্যে আসে নাই।

কুন মাইয়াটা?

মোদের মেয়্যা গ চাঁদবদনী।

শুনে কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকল অদ্বৈত। বলে কী এতরাতেও মেলা দেখে আন্‌খা মেয়েমানুষ চন্দ্রবদনী ঘরে ফিরেনি!

তারপরই দুম্‌ করে অদ্বৈতর জিজ্ঞাসা, নীলেশ্বর সোউ বাব্‌রিচুলঅলা ছুয়াটা— নীলুয়া না ফীলুয়া—মেলারু ফিরি আসিছে?

ন্নাই। সে ত এখ্‌নও আসে নাই। হাড়িয়া-লাইবুকা-সুরুয়া—ছোঁড়ারা কেহ-ই মেলা থিক্যে আসে নাই।

নিশ্চিন্ত হয়ে অদ্বৈত বলল, তাহানে এত্তে হাঁসফাঁস করুচু কাঁইকি? যা শুই পড়। মাইয়া তোর নীলুয়ার সাঙে ফিলিম দেখেরে—হ্যা-হ্যা—

হ্যাঁ তাই ত। বড়কই-লাইবুকা-হাড়িয়া-নাকফুড়রি-নীলুয়ারা ত মেলা-টাঁড় থেকে এখনও আসেনি। যা হুজুগে হয়ত তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে 'টকি' দেখছে মেয়েটা।

টকি দেখছে মেয়েটা, টকি দেখছে।

অদ্বৈতর মতোই যেন নিশ্চিন্ত হয়ে গেল চাঁদবদনীর মা'টাও। সুড়সুড় করে সে ফের ঢুকে এল ঘরের ভিতর।

ঘরের ভিতর ঢুকে চাঁদবদনীর বাপের পাশটায় বসে ডানহাত দিয়ে বাঁ-হাত, ফের পরক্ষণেই বাঁ হাত দিয়ে ডানহাতটা শুধুশুধুই চুল্‌কে নিল বারকতক তারপর গাঁদার-গুঁদুর করতে করতে হাত রাখল শরাবণলোধার পিঠের উপর।

যেন জেগেই শুয়েছিল শরাবণ। হাত রাখা মাত্রই তড়াক করে উঠে পড়ল। হাঁ হাঁ করে জিজ্ঞাসা করল, আসে নাই? এখ্‌নও আসে নাই?

হঁ, আসবার সোময় হোক তব্বে ত আসবে। শুনলম ত 'টকি' দেখছে।

কে বলল?

গিরিহা-গির্‌হানী। এই ত মাগ্‌-ভাতারে টাঁড় থিক্যে আইল।

তা'লে? কার সঙে টকি দেখছে?

কেন্নে, লাইবুকা-নীলুয়ারা কেহ্-ই ত আসে নাই।

অ।

নিশ্চিন্ত মনে শরাবণলোধাও অতঃপর গলা-খাঁকারি দিয়ে জল সরতে চালাঘরের পিছন দিকে হুমদুম বেরিয়ে গেল।

জল-বিয়োগ করছে শরাবণ। করতে করতে তার আচমকা মনে এল—মেলা বড় না রাত বড়? এ-মেলা যে ফুরোয় না, ফুরোয় না। এখনও 'টকি' আছে, টকি দেখছে আ-দেখলা মেয়েটা। এ-রাতও ফুরোয় না, শেষ হয় না। এখনও রাত আছে, রাত সাঁই সাঁই করছে, কাল্‌পুরষা-সাতভায়া-দধিভারিয়া উঠলেও পোহাতারা এখনও উঠেনি।

আর কবে উঠবে ভোর-পোহাতি তারা? ভুরখা-ইপিল?

কী মনে হতেই অমন ধীর ঠাণ্ডা প্রকৃতির শরাবণলোধাও অধৈর্য হয়ে যাহোক তাহোক একটা 'ফাবড়া' কুড়িয়ে আন্‌সাটকা ছুঁড়ে দিল পোখরি-আড়ার লাটাপাটার ভিতর দিয়ে দূরে।

দূরে দূরে।

সে-ফাবড়া এ-ঝোপ সে-ঝোপে ঠোক্কর খেতে খেতে আর কতদূরেই বা গেল! ঝপ্‌ করে থেমে গেল বড়জোর বিশ-বাইশ গজ দূরে!

তবে একটা হোক দুটো হোক ঘুমন্ত জীবকে তো জাগিয়ে তুলল! —আমার মেয়্যা মেলাটাঁড় থিক্যে এখ্‌নও আসে নাই আর তোমরা ঘুমাচ্ছ? উঠো, জাগত হও!

সত্যি সত্যি একটা রাতচরা জেগে উঠে শরাবণের কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল সাঁক্‌ করে।

চালাঘরে ফিরে শরাবণ ডাকল গুরভাকে, এ্যায় গুরভা! গুরভা!

বউয়ের ধাক্‌লানিতে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠল গুরভা। —হঁ বড়ভাই?

মেয়্যাটা এখ্‌নও ফিরল নাই—

হাড়িয়া-সুরুয়া— আমাদের ম্যাড়াগুলাও ত আসে নাই।

বলেই শালপাতার চুটা ধরাল গুরভা, টানল, টানতে দিল শরাবণকে।

বলল, অতত ভাব্‌ব নাই, মেলাটাঁড়ে মিলেজুখে হাউস করছে। বাপের জন্মে তুমি-আমি

ত কুনোদিনও করি নাই।

কাশতে কাশতে একটু যেন হাসলও গুরভা।

ফের চুপচাপ। চালাঘরের ভিতর অঝোরঝর অন্ধকার, সাঁই সাঁই রাত। চুটা যতক্ষণ জ্বলেছিল, আগুনের 'ফুড়্গুনি'ও ততক্ষণ এদিক-ওদিক উড়ছিল।

একসময় চুটাও চুপ, আগুনের 'ফুড়্গুনি'ও চুপ। অঝোরঝর চুপ। তার ভিতরে আচমকা এতক্ষণ চুপ থাকা একটা কান্না যেন হেঁচকি তোলার মতো একবার উঠেই থেমে গেল।

চাঁদবদনীর মা শরাবণের বউলোধানী।

যেন রাতের অন্ধকারে কুল্হিরাস্তার মোড়ে লুল্হি কুকুরটা সুর করে মাত্র একবার কেঁদে উঠেই থেমে গেল।

থেমে গেল, থেমে গেল।

কিন্তু রাত তো আর থেমে নেই, রাত বাড়ছে। মেলাও এখনও থামেনি। এখনো একটা-দুটো হাউই-ছুচি সর্ সর্ করে উপরে উঠে ফেটে যাচ্ছে ফু-উ-স্ করে।

তারপর তো উলুরি-ঝুলুরি আগুনের ফুড়্গুনি। ঐ একটা পড়ল ওধারে বামনদার পুবের বিলে, এই আরেকটা পড়ল এধারে বামনদার উত্তরের বিলে। দক্ষিণের বিলে, বাঘমারি পড়িয়া-চিড়িয়ামারি পড়িয়ায় কী আর পড়ছে না? পড়ছে।

তবে ঐ একটা-দুটো। তাও অনেকক্ষণ বাদে বাদে।

একসময় থেমে গেল সবকিছুই। হাউই আর ফাটল না। পোহাতারাও উঠে গিয়ে রাত পুইয়ে দিল। সকাল হয়ে এল।

খেল খতম্ পয়সা হজম!

নীলুয়া-হাড়িয়া-সুরুয়া-লাইবুকারা হৈ হৈ করতে করতে গিরিহার ঘরে ফিরছে। চালাঘরে।

দলটা হুড়মুড় করে এসে গেলে 'কাই আমার বদ্নী কাই' বলে শরাবনের বউলোধানী প্রথমে বাঘ-ঝাঁপ দিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর দলটার ভিতর চাঁদবদনীকে দেখতে না পেয়ে নীলুয়ার চুলের মুঠি ধরেই ঘন ঘন ঝাঁকাতে লাগল আর বলতে লাগল, আমার বদ্নীকে তুঁই কুথায় ফেলে আইলি রে নীলুয়া— মেইয়াটা যে এখ্নও ফিরল নাই—

কুল্হিরাস্তার মোড়ে থেমে থাকা লুল্হি কুকুরটা সুর করে ফের কাঁদতে লাগল। কাঁদতে থাকল অঝোরঝর।



ফিরে চলেছে, ফিরে চলেছে। নামালিয়া লোধারা ফিরে চলেছে। অকালে শেষ হয়ে গেছে তাদের নামাল-খাটা পুব-খাটা।

আর আসবে না তারা পুবে। পুব খাটতে নামাল খাটতে। দোরখুলিতে ফিরে গিয়ে "আম ফলে থোকা থোকা তেঁতুল ফলে বাঁকা—নামাল দেশে দেখে আইলাম রাঁড়ির হাতে শাঁখা"-র মতো একটা কিছু বলতেও আর তাদের মন যাবে না।

বলতে মুখ উঠবে না, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে।

অথচ আসার সময় কত আকুলি-বিকুলি, গজল্লা। হুড়োহুড়ি, হুড়োহুড়ি। বাসে বসে এর-তার গায়ে ঢলতে ঢলতে আসা। বমি করতে করতে আসা। চুর-বালা-আঙুট দেখতে দেখতে আসা।

আসার সময় তারা এসেছিল যতজন, মাঝরাস্তায় কমে গিয়েছিল একজন। এখন তার থেকেও কম আরেকজন।

আরেকজন, আরেকজন।

আসার সময় যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল, এখন আর তারা সে-রাস্তায়ও ফিরবে না। শর্টকাট করতে তারা যাবে বেলদা-কেশিয়াড়ীর মোড় ঘুরে লছিপুবের উপর দিয়ে ভসরাঘাট।

ভসরাঘাট। নদী পেরুলেই ওপারে লুয়াগাঁ নয়াগ্রাম।

আর তারপর তো বালিগেড়িয়া-খড়িকামাথানীর পাশ দিয়ে চেনা রাস্তা পাঁচকাহিনা—

শখ ছিল ট্রেনে চেপেই ফিরবে তারা। —ধুদ্দুর! টেরেনের মুহে পিসাব্ করে দিই! আর ট্রেনেও চড়বে না তাবা।

হা-পা পা-পা তেঁতুল পা-পা
যাকে পাবি তাকে খা-বা।

—তোর যাকে ইচ্ছা তাকে খা, তবু, এগ্‌গো লোদ্ধাদের আর খাস নাই!

এই ক'দিনে বড় চেনা আপনার হয়ে গিয়েছিল বামনদা। বামনদাব উত্তরেব বিল দক্ষিণের বিল পুবের বিল। বাঘমারি পড়িয়া চিড়িয়ামারি পড়িয়া।

হাটতলা, শীতলামাড়োতলা।

গিরিহার ঘর-দুয়ার চালাঘর খড়ের উপর হেঁসের বালিশ-বিছানা পোখরিআড়া।

ধানের সুণ্ড বিঁধাতে আর আসবে না তারা। হলিয়ে-ঢলিয়ে বাবু-ভায়াদের খেতিতে নেমে ধানকাটা। সেই বাসিয়াম বেলা থেকে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ধানগাছের গোড়ায় গোড়ায় দা চালিয়ে ধানকাটা—

পড়ে থাক 'পাঁহী', আ-কাটা ধান, চটি-বনা-ধানপোকা। আর তারা 'ছুট্' মুড়ে মুড়ে কাটা ধানের 'হেলা'য় গিট দিয়ে বিঁড়া বাঁধবে না। ঝমর ঝমর ধানের শিষ দুলিয়ে কাঁধে কী মাথায় করে গিরিহার খলা-খামারে আর আনবে না বিঁড়া-ভার, ধানবোঝা।

আ-গাদা বিঁড়া, আছড়ানো-পাছড়ানো, অটংগাগুলো পড়ে থাক—

নামালিয়া লোধারা আর সেদিকে ফিরেও চাইবে না। মুখ তুলেও দেখবে না। আর তাদের ঘন ঘন শুনতেও হবে না— 'আউ কেতে উঠাপড়া হেবু চন্দ্রবদনী' 'খর খর কর, খর খর' 'বিহান ধরতি হব' 'ঝপাঝপ্ সবু বিড়া বাঁধি পকা—'

জন্মের মতো, এ-জন্মের মতো তারা ছেড়ে যাচ্ছে বামনদা। গিরিহা-গিরিহানীর খলা-খামার। 'শুকা-তেন্তুলি দেই টক, আলু-বাইগন ঘণ্ট—'

কানের কাছে গুনগুন করে কথায় কথায় আর তাদের শুনতে হবে না, তারা শুনতেও পাবে না— "হেলা তো বয়স ষোল সতের। যিবু ত শাশুঘরকু এথর।।" কিংবা "যেবে তু হোইবু গড়িয়াঘাট পথর পরি। তেবে সিনা ঝিঅ হোইবু ভবে আদর্শ নারী।।"

মাড়োতলাকে গড়। শীতলাবুড়িকে দণ্ডবৎ।

ঐ দূর থেকে। দূর থেকে, দূর থেকে। ধারেকাছে আর যাবে না। নামালিয়া লোধারা আর যাবে না কোনোরকম মেলায়-'যাতে'। হারগিজ্ না। ঐ বলে নাই— "বারে বারে বারণ করি

তপুবনে যাইও না, তপুবনে যাইও না, তপুবনের কাল্হা জলে লো গায়ের বরণ ফিরবে নাই?"

গায়ের বর্ণ ফিরুক আর নাই ফিরুক তবু তারা বারে বারে ঐ তপোবনেই যাবে— আর পুবেও না পশ্চিমেও না, নামালেও না পুবালেও না।

পড়ে থাকল চালাঘর, পোখরি-আড়া। তবু, এই ক'দিনেই চাঁচড়া আর বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা চালাঘরটুকুকে তারা যে যার সে তার মতো করে তুলেছিল দোরখুলির লোধাবস্তির একেকটা পাতার কুম্বাঘর।

যে যার মতো ঢুকত বেরুত, খড়ের উপর হেঁসের বিছানায় নম্‌থম্‌ শুয়ে পড়ত। চালের বাতায় গুঁজে রাখত শখের দোক্তাপাতা।

দোক্তাপাতা, দোক্তাপাতা।

হুটমুট নেশা করতে মন গেল ত চোখ বুজেই হাত গুঁজে টেনে আনত নেশার দ্রব্য। চুন-গুটুল। যেন চালাঘরের চালবাতায় কী আর হাত গুঁজেছে দোরখুলির পাতার কুম্বায়!

খানিকটা দোক্তাপাতা এখনও যে গোঁজা আছে চালাঘরের চালবাতায়! নামালিয়া লোধারা আসার সময় আনতেই ভুলেছে!

থাক, সেটুকু না হয় খাবে পরের নামালিয়ারা, ক'দিন বাদেই যারা আসবে 'কাদো' করতে ধান রুইতে।

দোরখুলির লোধারা আর আসবে না পুবে। পুব খাটতে নামাল খাটতে। আর এসে বসবে না গিরিহার পোখরি-আড়ায় বিরলে রোদন করতে।

পোখরি-আড়া, সেও তো এই ক'দিনে হয়ে গিয়েছিল লোধাদের বাঁধগোড়া, ঠাকুরবাঁধ। লোধাদের গোঁসাঘর!

এই লোধানী সেই লোধানী কতবার যে গোঁসা করে পোখরি-আড়ায় বসে গালে হাত দিয়ে সাফা ছাউ ধলা ছাউয়ের কথা মনে করে রোদন করেছে! চকাচকী তালগাছদুটির কথা মনে আসায় হুর্‌ হুর্‌ করে কেঁদে ভাসিয়েছে!

একজন তো তেলে না লুবু কাঁকড়ার দাঁড়া দেখতে পেয়ে কাঁকড়া ধরতে জলে নেমে আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিল সোনার গাগরা—

হাত-ছাড়া সোনার গাগরা ধরতে নামালিয়া লোধারা আর আসবে না অদ্বৈত পৈড়্যার পোখরি-আড়ায়। একটা কেন দশটা বসন্তও আর তাদের আনতে পারবে না ভুলিয়ে-ভালিয়ে।

"ঘেনী ঘেনীচ ঘেনী ঘেনীচ" বলে মুখে-টাকরায় আওয়াজ করতে করতে মেসিনঘরের বারান্দায় আর কোনোদিনই চাঙ-নাচের আসর বসাবে না লাইবুকা-হাড়িয়া-বড়কই-নাকফুড়্‌রিরা।

মেঘপাতালে হাজার তারা লক্ষ তারা কোটি কোটি তারা ফুটলেও অদ্বৈত পৈড়্যার খলা-খামারে আলো-আঁধারে হেঁসের পটিয়ায় বসে আর কোনোদিনই তারা শুনবে না ভুটকী-গুরুবারিরা— "একটা তারা দুইটা তারা বাভনঘরের ঝারাপারা—"

কিংবা, পুট্‌ করে হেঁয়ালি দিতে চাঁদবদনী আর আসবে না— "এক খাম বত্রিশ খুঁটা যে নাই জানে তার একুশটা বেটা।"

শুধু একজনই, একজনই, সে নাকফুড়্‌রি, একবার মনস্থ করেছিল এক দৌড়ে ফিরে গিয়ে তার আঠাকাঠিটা নিয়ে আসে।

গত পরশু ছোটগিরিহা শ্রীমন্তর ধানবিলে সে পেতে এসেছিল পাখি ধরার কলকাঠি। সুতোয় বাঁধা জ্যান্ত ঘুরঘুরিয়া পোকাটা এত তেজের সঙ্গে ঘুরছিল যে মনে হচ্ছিল আঠাকাঠি নিয়েই সে কোথাও না চলে যায়!

সেদিন হাফ-ছুটি হয়ে গিয়েছিল বিলে। অই আঠাকাঠি ফেলে রেখেই আসতে হয়েছিল নাকফুড়্‌রিকে। কে জানে এই দুদিনে কত পাখি যে লটকাল!

ফিরে চলেছে, ফিরে চলেছে।

নামালিয়া লোধারা ফিরে চলেছে। সঙ্গে চলেছে পোঁটলা-পুঁটলি-কাপড়ছেঁড়া-মট-বিঁড়া, সেই এনামেলের গিনা-গেলাস বাটি-তাটিয়া, সেই শাবল-খন্তা-দা-কাতান কুড়হার-বুড়িয়া-কাঁড়-কাঁড়বাঁশ।

বড়রাস্তায় গিয়ে বাসেই উঠবে তারা। যে কোনো বাস— বেলদা-কেশিয়াড়ি মোড় ঘুরে ভায়া কেশিয়াড়ি—। তাদের বাসে তুলে দিতে এসেছে বামনদার 'লোক ক্লাব'-এর ছেলে-ছোকরারা।

নীলুয়াকে যেন ঘিরে নিয়ে চলেছে তারা। তাদের যত কথা যেন ঐ নীলুয়ার সঙ্গে।

কেউ পিঠ থাপ্‌ড়ে দিচ্ছে, কেউ হাতের মুঠো চেপে ধরে কথা বলছে ফিস্ ফিস্ করে। কেউ আবার হাত ধরেই আছে তার, ছাড়ছে না।

এই ক'দিনে এত ভাব হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে নীলুয়ার!

'লোক ক্লাব'-এর ছেলেরাই বাস থামিয়ে বাসে তুলে দিল নামালিয়া লোধাদের। হুড়মুড় করে বাসে উঠে গেল তারা।

হুড়মুড় হুড়মুড়!

কে জানে ঠিক সময়ে উঠতে না পারলে হয়ত তাকে ফেলে রেখেই চলে যাবে বাসটা, ঐ ভয়! একজন গেছে, 'গিন্‌তি'-তে কমে যাবে আরেকজন।

উঠেছে সবাই, কিন্তু এখনও উঠছে না নীলেশ্বর। 'লোক ক্লাব'-এর ছেলেরাই বাসটা থামিয়ে রেখেছে। কথা বলছে ঐ নীলুয়ার সঙ্গে।

সেই বিলাতি প্যান্ট-শার্ট, মাথায় বাঁধা চক্রাবক্রা রুমাল। গলায় তার পিসির দেয়া ঝকঝকে হার।

কাঁধে-মাথায় 'ইল্লি'টা নেই। এই দুদিন কেথায় কোথায় যে পড়েছিল সে! এখন সে বাসে বড়কইয়ের হাতে।

অবশেষে বাস ছাড়ল, বাসে উঠে পড়ল নীলুয়াও। 'লোক ক্লাব'-এর ছেলেরা তলায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হাত নাড়ছে, চলন্ত বাসের সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে—

উ কী! অত কীসের হাত লাড়ালাড়ি? এ গো বলছে কী— যাস নাই? যাস নাই?

নীলুয়ার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে লোধা-লোধানীরা দেখল, বাসের ভিতর থেকে নীলুয়াটাও হাত নাড়ছে। বলছে কী— যাব নাই? যাব নাই?

হাজার অনুরোধ করলেও নামালিয়া লোধারা আর নামাল খাটতে ফিরবে না, টেনে-হিঁচড়ে নামালেও আর তারা বাস থেকে নামবে না।

বাসের মধ্যে যে যার জায়গা দখল করে গ্যাট হয়ে বসে থাকল। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখনও হাত নেড়ে চলেছে নীলুয়া। নীলুয়াই।

তার নাড়ানো হাত-মুঠ চেপে ধরে তাকে একরকম জোর করেই বাসের সিটে টেনে আনল লাইবুকা।

কেমন ধপাস্ করে বসে পড়ে নীলেশ্বর জুলুজুলু চোখে বাসের এ-মাথা ও-মাথা চেয়ে চেয়ে দেখল।

ফাঁকা বাস, কেবল তাদেরই লোকজনে ভরা। ঐ তো সে-মাথায় বসে আছে গুরভা, ভুলেও সে আর তাকাচ্ছে না নীলুয়ার দিকে।

শরাবণলোধাকে ঘিরে ধরে বসে আছে গুড়কুঁদা-গুড়দুম-শতুরা-চামটুরা আর এদিকে শরাবণের বউলোধানীকে ঘিরে রেখেছে গুরভার বউ, নিয়তি-আদরী-ভাদরীরা। গুরুবারি-ভুটকীরা বসে আছে যে যার সে তার।

চুপচাপ চুপচাপ।

এত চুপচাপ কেন? এই তো তারা আসার সময় কত কী করে এল! হৈ রৈ করে ঘরে দুয়ারে কাঁটাদুয়ারী, কুঁড়িয়া-কুম্বার মেঝের মাটি খুঁড়ে তুপে রেখে এল বাটনা-বাটা শিলনোড়া, কত কী গোপন দ্রব্য, কিছু রেখে এল কিছু তো নিয়ে এসেছিল সঙ্গে, মহুলবস্তা-কুসুমমুজি-গোলগোল হাঁসাপাথর ঠেকা-পাছিয়া-খাপোই-খলুই আঠাকাঠি-কড়রকাঠের চাঙ, আসার সময় এত 'হুরি' কবেছিল তারা, এত বেজেছিল কেঁদ্‌রা চাঙ-বাজনা ব্যাঙ-বাজনা যে অ-নামালিয়ারা যারা খলায়-খামারে দাঁড়িয়ে নামালিয়াদের 'ছো' দেখছিল, তারা ঘরে ঢুকে 'আগড়' টেনে দিয়েছিল।

এতদিন বাদে নামাল দেশে, পুবে, পুবের বিল-উত্তরের বিল-দক্ষিণের বিলে তার কতক ফেলে-ছড়িয়ে সেই যখন ঘরে ফিরছে তারা তখন এত চুপচাপ কেন? তাদের মন কেন উথলে উঠছে না, বুক কেন হদ্‌কে উঠছে না এই ভেবে— আর দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই তো তারা পৌঁছে যাবে রুখনীমারা-দোরখুলির লোধাবস্তিতে! সুখজুড়ি-মাঝুডুব্‌কা-ঘোড়াটাপুর নারদা-নিগুই-তপোবন-জঙ্গলমহালে?

বাস থেকে নেমেই 'আড়িশ' ভাঙতে তারা হয়ত খানিক দৌড়ে নেবে এদিক-সেদিক লাটায়পাটায়, ঘরদুয়ার থেকে উঠে যাবে কাঁটাদুয়ারী, কুঁড়িয়ার মাটি খুঁড়ে চালবাতায় হাত গুঁজেই দেখে নেবে রেখে যাওয়া জিনিসটা আছে তো ঠিক? তারপর হয়ত দলে ভিড়ে বেরিয়ে পড়বে জঙ্গলে, পাতা ছিঁড়তে ঝাঁটি কুড়োতে, খেড়িয়াঝোড়-ভালুকঝোড়-লোধাঝোড়ের অন্ধিসন্ধিতে ঢুকে লাটাপাটার পাল্‌হা-পতর উল্টে উল্টে তন্ন তন্ন করে ঢুঁড়ে দেখবে— এই ক'দিনে কত বড় হয়েছে কাঁকড়ো-কুঁদরি? চেঁকাশাকের চিরোল চিরোল ডগ্ মেলেছে ঝোপেঝাড়ে কতদূর? মহুল-কচড়া কেঁদ্-কুসুম বেল-বৈঁচির দিন শেষ, তা বলে কুড়কুড়িয়া-সরুবালি-বড়বালি-কাড়হান-কুরকুট-ভেলা-বাদভেলা তো এখনও রয়ে গেছে ঢের? হয়ত ঘরে ঢোকার আগেই তারা দৌড়ুবে তপোবনে সীতাকুণ্ডে নিগমা মন্দিরে। আঁজলা ভরে খাবে সীতানালার পায়রা-চঁচ্‌রা জল, সে-জলে নিজেদের ছায়া দেখবে গুরভা-গুড়কুঁদা-আদরী-ভাদরীরা। হয়ত গামছায় ছেঁকে তুলবে পুঁটি-দাঁড়িকিনি-চাঁদখুড়ী মাছ—

আর তো ক'ঘণ্টা বাদেই তারা এত কিছু হাত বাড়িয়ে আগের মতোই ছুঁতে পারবে, কাঠিখুঁচি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কেটে দেখতে পারবে, এই কদিনে কত বড় হয়েছে আলুতুঙা— এত সব ভেবেও তাদের মন আনন্দে নেচে উঠছে না? তবে কী এখনও মায়া পড়ে আছে পুবে? গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার ধানবিলে?

চুপচাপ চুপচাপ।

ঐ তো গুরভা বসে আছে এক কোণে, নীলুয়া থেকে অনেকটা দূরে। গুরভা যেন ইচ্ছা করেই নীলুয়াকে এড়িয়ে চলছে। ঘাড় তুলেও দেখছে না তাকে।

ঐ নীলুয়া আর বসন্তিয়ার প্রলোভনে পড়েই তো তারা এসেছে নামালে, নামাল খাটতে!

বাস চলছে। চলন্ত বাসের ঝুরকায় চোখ রেখে গুরভা তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এখন সকালবেলা। খেতি-খামারে বিলে-বাতাসে এক-দুজন লোক হড়বড়িয়ে নেমে যাচ্ছে।

বেলা আরেকটু উঠলে তারাও তো নেমে পড়ত বিলে! এতক্ষণে গিরিহা "কাঁই-মাই"

"উঠুচ-ফুটুচ" করে কানের পোকা বের করে ছাড়ত না? গিরিহানী হাত ভরে পাছিয়া থেকে ভুজা-মুড়হি ঢালত—

গুরভা যেন স্পষ্ট শুনল, "কাঁই গো শুনুচ—নীলেশ্বর-চন্দ্রবদনী ভুজা মাগুচি!" ধড়ফড়িয়ে চোখ দুটো বুজে ফেলল গুরভা।

খাকুড়দা-জাহালদা-বেলদা।

যেদিক দিয়ে তারা এসেছিল বাস এখন ছুটে চলেছে সেদিকেই। সেদিকেই। বাসে তেমন ভিড়-ভাট্টা নেই যে কতক উঠে বসবে ছাদে। আসার সময়ে গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা তো বসেছিল বাসের উপরে সেই টোঙে!

হাটুয়া বাবুভায়ারা বাসে উঠছে-নামছে। বাসের ভিতর নামালিয়া লোধারা গ্যাঁট্ হয়ে বসে আছে দেখে তারা ভুরু কুঁচকাচ্ছে, বসতে না পেয়ে অস্থির হচ্ছে, কেউ যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেও, "বাপের কালে নাই দুলি, আজ দিচ্ছে পা তুলি।"

দোষ করেছে নামালিয়ারা। আলবাৎ করেছে। আগেভাগেই বাসে উঠে পড়ে সিট দখল করে বসে আছে!

চোখ পিট্ পিট্ করা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে নামালিয়া লোধাদের! চোখ পিট্ পিট্ করল গুরভা। আর তারপর আচমকা দেখল— এক দঙ্গল ফুরফুরে মেয়ে—মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে লেখাপড়া করতে যাচ্ছে, তারা যেন চলন্ত বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেল ছোটাচ্ছে—

—উরি ব্বাসরে!

ঝপ্ করে গুরভার মনে পড়ে গেল নুকুর কথা। নুকু, নুকু। ভুবনা-ফুলটুসুয়ার 'মেইয়া' নুকু। সুলুকসন্ধান করে সে তো এসেছিল তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে? বুদ্ধি করে সেদিন যদি তার সঙ্গেই তারা সবাই ফিরে যেত, তবে আজ আর—

চুপচাপ চুপচাপ।

এত যে 'হাল্লাপাটি'— নীলুয়া-হাড়িয়া-লাইবুকা-বড়কইরা— আসার সময় তেল্ মাটি ঘোল্ করে ছেড়েছিল গোটা বাসটা, কথায় কথায় অঙ্গুলিহেলনে থামিয়ে দিচ্ছিল বাসটা, হুড়দুড় করে যখন তখন নেমে পড়ছিল বাস থেকে, চপ-মুড়ি-পকৌড়া কিনে এনে ঠোঙায় করে এগিয়ে দিচ্ছিল বাকিদের, লে মার খা! বাপের জন্মে চপ ত কখনও খাস নাই—

সেই তারাই এখন চুপ মেরে আছে, মুখে কুলুপ এঁটেছে। ইল্লিটাও আর লাফাচ্ছে না। নীলুয়াই আর তাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

সে এখন বড়্কইয়ের কাঁধে। ইল্লির শিকলিটা বাঁধা আছে বড়্কইয়ের ডানহাতের কব্জিতে। শিকলি খুলে শিকলি দিতে গেল নীলুয়াকে।

এত জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীলেশ্বর যে বাসের মেঝেয় ঝনাৎ করে শব্দ উঠল! আর সে-শব্দে চমকে উঠে ভয়ে বাসের জানালা গলে কাঠবিড়ালিটা একেবারে ছাদে!

হাটুয়ারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, ভাগি গলা ধর্ ধর্ ছুআ ও ছুআ!

কোথায় আর পালাবে, শিকলির মাথাটা তো আটকা পড়ে আছে বাসের জানালার গ্রিলে! খপ্ করে মুহূর্তেই শিকলিটা হাতের কব্জায় নিয়ে এল নীলুয়া।

এতক্ষণে নীলুয়া। শিকলি টেনে বাসের ছাদ থেকে নিচেয় নামিয়ে নিয়ে এল ইল্লিকে। তারপর হাতমুঠোয় রেখে আলতো কয়েকটা থাপ্পড় মারল তার পিঠে।

চুপ করে আদরের থাপ্পড় খেল ইল্লি। তারপরই লাফ দিয়ে ল্যাজ মোটা করে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকল নীলুয়ার কাঁধে।

একটা চিড়রাকে নিয়ে নীলুয়ার কিস্তি-কেরামতি দেখে রাগে রি রি করে জ্বলে উঠল গুরভা।

একটা 'কাঠবিলেই' আর একটা ছোকরার মধ্যে ভাব-ভালবাসা দেখে বাসের হাটুয়ারা কিন্তু হাসল। তারা বলাবলি করল, কথায় অছি— "বিলেই নাই পুসবু তো মুষা পুষ।" বিড়াল নাই যদি পুষিস্ তো ইঁদুর পোষ।

তাদেরই একজন বাসের গায়ের একটা লেখা দেখিয়ে পরক্ষণেই বলে উঠল, কী লিখা অছি পড়ি দেখ-অ— "প্রেম প্রীতি ভালবাসা। এই তিন নিয়ে পথে আসা।।"

আরেকজন আরেকটু এগিয়ে বলতে যাচ্ছিল, "জীবে প্রেম করে যেইজন—" আচমকা মাত্র একবারই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীলুয়া।

গুরুবারি-ভুটকীরা বসেছে একধারে, একসঙ্গে। পুনোই বসেছে আরেকধারে, একা একাই। সেই মেলা দেখা থেকেই দু'দল দু'দলে ছাড়াছাড়ি। কথা নেই।

জঙ্গল ছেড়ে তারা এসেছিল নামালে। অনেক দূরদেশে। এখন দূরদেশ ছেড়ে তারা ফিরে চলেছে স্বদেশে। সুখজুড়ি-মাঝুডুবকায় দোরখুলির জঙ্গলে।

মাঝের কটা দিন কোমর নুইয়ে নুইয়ে পাঁতা-নাচের মতো তারা সার বেঁধে কেটে যাচ্ছিল ধান। ঐ চাঙ্-নাচের গানেই তো আছে—

নুই নুই গেঁড়্হা কুড়ায় ধলভুঁইয়ানি।
চুন-দক্তায় ভুলাঁই রাখে চিক্কীগড়্যানি।।

কোমর ঝুঁকিয়ে গেঁড়ি-গুগলি কুড়োয় ধলভুঁইয়ের মেয়ে, তাকে কী না চুন-দোক্তার মতো শুধু নেশার দ্রব্য দিয়েই ভুলিয়ে রেখেছে চিক্কীগড়ের লোকজন!

বামনদার গিরিহা-গিরিহানীও তাই, গিরিহার মেসিনঘরের লোকটাও তাই। যে কী না মেলায় তাকে এটা-সেটা কিনে দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল।

পুনোই বারেবারেই পড়ে যাচ্ছিল হাটুয়াদের খপ্পরে!

সেই হাটুয়ামাস্টার, মাথা-ছ্যাত্‌রানো ঝুনঝুনি বেত, ছেঁড়া জামার ফুটো, আর ফুটোয় লাগাতার 'গিরগিতি'। গিরগিতি, গিরগিতি।

সেই হাটুয়া-ছুআ, লটপটি মহুলগুড়, দাঁতে লটকে 'ইলাস্টিকের' মতো যা কী না বেড়ে যায়, বেড়ে যায়। মওকা পেয়ে হাটুয়া-ছুআ পুনোইয়ের বগলে, বুকের কুঁড়ি-কুসুমে গিরগিতি দেয়। গিরগিতি, গিরগিতি।

এবার এই মেসিনঘরের লোকটা—অমূল্য না নির্মাল্যও— দুটো রস্‌গুল্লা দুটো লেডিকিনি আর এক চামচ রস খাইয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে পুত্‌লিনাচের তাঁবুতে...

পুনোই মনে মনে ভাবে—যতই যাই করুক, চাঁদবদনীর মতো সে তো আর—

গুরুবারি-ভুটকীদের চোখের সামনে এখনও ভাসছে। জ্বল্ জ্বল্ করে।

পানদোকানীর কাছে-পান খেল, যে-সে পান তো নয় মিঠাপান, চুন-খয়ের-জর্দা দেয়া।

দোকানীকে ঠেস্ মেরে বললও, "এগো দুকানী চুন নাই দিলে পান হয়? কবে লে দুকানদারি করছিস?"

চুড়ি-দোকানীর কাছে চুড়ি পরল। দু'হাতেই। দু-গাছ্ব দু-গাছ্ব চার গাছ্ব। নীল নীল ভিতরে হলদা সুতা।

চুড়ি পরা শেষ করে ঐ তো বলল, "চল্ লো ঝিলাপি খাই।" তিন জায়গায় দুটো করে ছটা ঝিলাপি।

'উড়া-কাঠে' উড়তে পুনোই ঝট্ করে উঠে বসল ঘোড়ায়! কাঠের ঘোড়া। তাই দেখে "পড়ে মরবি, নাম্" বলে হম্বিতম্বি করল নীলেশ্বর।

নীলুয়ার হম্বিতম্বি দেখে তার কী রাগ! কী রাগ! দেমাক দেখিয়ে ফট্ করে বলল, "আয় ত হামরাও উড়া-কাঠে উঠব, দেখি কে কাকে মানা করে!"

মানা করলেই বা, কে কার মানা শুনছে! হতাশায় রাগে গর্ গর্ করতে করতে নীলুয়াও 'উড়া-টাঁড়' ছেড়ে চলে গেল অন্যদিকে।

আর তারপরই তো ঝগড়া বেধে গেল ঐ পুনোইয়ের সঙ্গে। কী আস্পর্দ্ধা! তার মুখের উপর বলে কী না, "ঠোঙায় ভরে রাতভিত মুড়হি দিতে যে এল, তার বেলা?"

বাদ, বাদ। বাদ হয়ে গেল পুনোই। চারজন ছিল, তিনজন হল।

তিনজনে মিলেই তো ঠাকুর দেখছিল। শীতলাঠাকুর। তিন মাথা তিন হাত ছ'পা কিম্ভূতকিমাকার 'জরাপাত্র'। ঘিয়ের জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপ।

কী যে বাঈ উঠল! ঐ প্রদীপের আলোয় হাত সেঁকে হাটুয়াদের মতো ঠাকুর চুমাবে। আর ঐ চুমাতে গিয়েই তো—

তাদের চোখের সামনে এখনও সবকিছুই জ্বল্-জ্বল্ করছে।

গুরুবারি ভুটকীকে ঠেলা দিয়ে বলল, হায় দ্যাক্ ভুটকী—নীলুয়া কাঁদছে!

আসার সময় যা হয়েছিল হাঁপরহাটি, সেই বমি বমি ভাবটা আর নেই। মুখে জলও উঠে আসছে না বুড়্ বুড়্ করে। তবু মুখে শাড়ির আঁচলাটা চেপে আছে লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা।

লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা, লাদনগাড়িয়ার বিটিছানা।

'আজা ঘরে' পড়ে আছে তার সাফাছানা ফুলেশ্বর, ফুলু। —কই তার জন্য তো তার মনটা এখন হুদ্ হুদ্ করছে না?

করবে কী, ঘুরে আসছে যখন দেখা তো হবেই।

আর তাদের ভুগড়ার পিছনের চকাচকি তালগাছ দুটি? পাতা ঝন্ঝাড় করে। —কই সেখানে ফুল এল কী এল না, ফুল ঝরে গিয়ে কষি ধরল কী ধরল না, কষি বড় হয়ে তাল হল কী হল না, তাল পাকল কী পাকল না—নিয়তিলোধানী তো সেসব ভাবনা এখন ভাবছে না?

ভাববে কী, ফিরছে যখন নিজের চোখেই তো দেখতে পাবে।

আসার সময় ঘুপচীর চালবাতায় কী-একটা জিনিস গুঁজে রেখে এসেছিল, পেটে আসছে তো মুখে আসছে না, মনটা আঁই-টাঁই করছিল। —কই এখন তো সেসব মনেও আসছে না?

আসবে কী, ঘুরে আসছে যখন ঘরে গিয়ে চালবাতায় হাত গুঁজেই তো দেখতে পাবে।

এখন সে ভাববে—যা কিছু ছেড়ে এল তার কথা। তার কথা-ই। কোথাও কী একটা মায়া থেকে গেল?

নিয়তিলোধানী তো বারে বারেই ঘাড় ঘুরিয়ে বাসের পিছনদিকে দেখছে।

এমন এমন যে আঙট—সেই আঙটের দিকেও এখন গুরভাবউয়ের মন নেই। কোথায় আর পাঁচজন হাটুয়া প্যাসেঞ্জারের সামনে আঙট-পরা পা'টা বাড়িয়ে দেখাবে, আলোয়-ভালোয় ঝিলিক দিয়ে উঠবে আঙটটা, তা নয় আঙট-পরা পা'টা যেন বাসের সিটের তলায় লুকিয়েই রাখছে গুরভাবউ।

বসন্ত কামিল্লার কাছে আরেকটা পায়ের আঙটের আব্দার করতে তার আর মন চাইছে না।

মন চাইছে না, মন চাইছে না।

মন তো পড়ে আছে সেই হাটুয়া মেয়েটার চলনপথের দিকে। ঐ তো ডাঙা-ডহর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছাগলগুলোকে বাটিয়ে নিয়ে চলেছে মেয়েটা—

একমাথা পাঁড়রা চুল, উলুরি-ঝুলুরি। কতই বা উমর—আট কী দশ। দেখা হয়েছিল ধর্মের জল আনতে নেকবাটিয়া যাবার পথে। ডেঁউসগাছের তলায় ছাগল চরাচ্ছিল মেয়েটা।

পাকলা পাকলা কথা কী! কোনদিক দিয়ে আর কতটা যেতে হবে নেকবাটিয়া?

তার উত্তরে হাত-পা নেড়ে ঝেড়ে বলেছিল—"অউ ত মুরাম রোড দি' সিধা সরশঙ্কা, শুশনি-কলমি-শালুক ল ল করেটে, গাছতলকু গাছতলুক ছাই ছাই"—গাছের তলায় ছায়ায় ছায়ায়—

তার মা হতে চেয়েছিল গুরভার বউ। সুরুয়া-হাড়িয়া-নাকফুড়রি তার তিন-তিনটা ছেলে, একটাও মেয়ে নেই! হাটুয়া 'ঝিঅর' মা হতে চেয়েছিল সে।

কেমন মা? যে কী না সময়মতো মেয়ে না এলে পিটিয়ে পাট করবে। —"এত্যে বেলে ঘরকু ন গলে মা মোকে মারিবু, যাই"—

সেই তো নাচ-দুয়ারে 'এড়ি' উঁচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রেখে দেখা—কই, এখনো তো আসছে না?

এখনও কত কাজ! কলাপাতা কাটা, ঢেঁকিতে গুঁড়িছাঁটা, পান-বিড়িব ব্যবস্থা করা, গাই-দোয়া, বামুন ডাকা, ধূপধুনা—এগো, আজ কিসের পূজা? কোন্ ঠাকুরেব মান্‌সিক?

কিছুতেই মনে করতে পারছে না। বাসে বসে ভিতরে ভিতরে হান্ডুল-মান্ডুল হয়ে যাচ্ছে গুরভাবউ। সেম্ সেম্ করে ঘামছে।

আর এসময়ই পাখিটা যেন 'কান-চল'-এ ডেকে উঠে বাসের ঝুরকা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, ঐ যাচ্ছে বাসের আগে আগে—

—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু!!!

ও, তাহলে আসার সময়ই সঙ্গে এসেছিল পাখিটা মাঝুডুবকা-তালখুড়ক-ঘোড়াটাপুর-নারদা-নিগুই-তপোবন জঙ্গলমহালের সেই কোন্ সুদূর মুলুক থেকে? এখন যাবার সময়ও বনের 'পাখ' বনেই ফিরে যাচ্ছে ঘর-ফিরতি লোধা-লোধানীদের সঙ্গে?

যেন ঘিরে ধরে নিয়ে চলেছে 'ধরমপাখ'। ঐ তো ঐ, বাসের 'ছামু'-তে চক্কর মেরে ডাকতে ডাকতে পাখিটা ফিরে আসছে 'পাছু'-তে—

—উ-ল টু-টু! উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ—

ডাকটা বাসরাস্তা থেকে পিছ্‌লে দু'ধারের বিলে-বাতানে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। ফের উঠে আসছে ঐ তো—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!! টি-উ-ল টু-টু!!!

গুরুভাবউ কাউকে কিছু বলল না। ডাকটাকে যেন গাপ্ করে ঢুকিয়ে নিল পেটের ভিতর। চুপ।

আর তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বাসের অন্যান্যদের। আর কেউ কী শুনতে পাচ্ছে? ঐ তো গুরভা, ঐ তো গুঁড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারা। হাটুয়ারা।

কেউ কেউ তো ঘুমের ঘোরে এর-তার গায়ে ঢলে পড়ছে। যারা জেগে আছে তাদেরও তো হিন্দোল নেই। অথচ এত স্পষ্ট!

বিলে-বাতানে ঐ যে নেমে গেল পাখিটা, পাখির ডাকটা, গুরভাবউয়ের মনে হল আর বুঝি সে আসছে না। নামালিয়া লোধাদের কিছুটা এগিয়ে দিয়ে সে ফিরে গেল বামনদায়। বামনদার উত্তরের বিলে-দক্ষিণের বিলে-পুবের বিলে।

এগো নাই গ' নাই—

মাত্র এক-দু মিনিট। তারপরই তো হরি-ঝুরি করে পাখিটা ফের এসে গেল—উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু!

গেল তো এদিক দিয়ে, কী করে এসে গেল ওদিকে? তবে কী একটা, না দুটা? 'চিহ্নত' রাখতে গুরভাবউ কান খাড়া করল।

ডাকটা একবার টুইয়ে উঠে গিয়ে পরক্ষণেই খাদে নামছে। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও কী একবার উপরে উঠছে নিচেয় নামছে?

চোখের দেখা দেখতে গুরভালোধানী বাসের ঝুরকায় উঁকি-ঝুঁকি মারছে। তাই দেখে পাশে বসা আরেক লোধানী মাথাটা সরিয়ে নিচ্ছে। কে জানে কখন মাথার উপরই ভক্ করে—

এগো নাই—

ঝাঁ ঝাঁ করে গুরভালোধানীর প্রায় মাথার উপর দিয়েই এবার ডেকে উঠল পাখিটা। —উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! টু-টু-উ-উ—

বাসের ঝুরকা থেকে সাঁক্ করে সরে এল গুরভার বউ। ধপাস্ করে বসে পড়ল 'সিটে'। এবারও কিছু বলল না।

অথচ কতবার বলতে মন গেল তার—ঐ যে ঐ শুন-অ! কীর'ম কোঁত্ পেড়ে পেড়ে ডাকছে—টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! এত্ত পষ্ট আর ম'লা শুনতে পাচ্ছ নাই? কানে কী কালা নাকি?

ডাকতে ডাকতে একসময় থেমে গেল পাখিটা। থামল কী আর, খানিক জিরেন দিয়েই হয়ত ফের চঁচ্রা ফুলিয়ে ডেকে উঠবে। ঘেমে নেয়ে-ওঠা গুরভাবউ শাড়ির আঁচলা দিয়ে এতক্ষণে ঘাড়ের গলার ঘাম মুছল।

পাখিটা থামল আর কঁকিয়ে কেঁদে উঠল শরাবণের বউ। তার চুলে মাথায় হাত বুলিয়ে ওদিকে শতুরার বউ নিয়তিলোধানী বলছে, শুনতে পেল গুরভার বউ, কাঁদ-অ নাই গ দিদি! সেই বলে নাই—

যাহার পায়রা সে ত লিয়ে গেছে
বাপ ত ভাবিছে মা-এ ত কাঁদিছে
যাহার পায়রা সে ত লিয়ে গেছে—

লম্বা শ্বাস ছেড়ে গুরভার বউ বলল, হঁ ঠিক্কেই, মেইয়াটা আমাদের পেখম মেলা পায়রাই ছিল বঠে!

কাল ভোররাতে চাঁদবদনীর মা যখন নীলুয়ার চুলের মুঠি ঝাঁকিয়ে বলল—চাঁদবদনী মেলা থেকে এখনও ফেরেনি, তখন নীলুয়া তার দলবল নিয়ে ফের দৌড়ুল মেলা-টাঁড়ে।

মেলা তখন ভেঙে গেছে। চায়ের জন্য চা-দোকানী খালি যা জল গরম করছে কেটলিতে। ধোঁয়া উড়ছে।

দূরের দূরের দোকানীরা গাঁটরী বেঁধে তাদের মালপত্র চাপিয়ে দিচ্ছে ভ্যানরিক্সায়। মাল নিতে কোথাও এসেছে ট্রাক্টর, টেম্পো।

ভিডিও হল, পুতলি-নাচের ছাউনি এখনও খোলা হয়নি। গেটের মুখে চারদিকে ঝরাপাতার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কাটা টিকিটের ছেঁড়া।

বড়কই-হাড়িয়া-লাইবুকা-নীলুয়ারা প্রথমে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল পুতলি-নাচের ঘেরা চৌহদ্দিতে। এই তো 'শো' ভাঙল ভিডিও-ঘর। পুতলি-নাচ তো শেষ হয়েছে কবেই।

পুত্‌লি-নাচের ভাঙা আসরে ঢুকে পড়ে নীলুয়ারা দেখল—'স্টেজে'র উপরই পুতুলনাচের কারিগররা ঘুমোচ্ছে হাঁ করে। কাঠপুত্‌লিগুলোও আ-ঢাকা বাক্সোয় পড়ে আছে।

তাদের না জাগিয়ে হাড়িয়া-লাইবুকারা ঢাকাঢুকি সরিয়ে হাঁটকে-পাটকে দেখছিল। একজন ঘুম থেকে উঠে হাই তুলতে তুলতে আচমকা হাই চেপে রেখেই বলল, আরে আরে তোরমেনে কী করুচ? ঢুকল কী করি, আঁ?

বোধহয় লাইবুকাই। বলল, কেনে, ঢুকতে এখনও টিকিট লাগবে? বলেই পড়ে থাকা একমুঠো টিকিট কুড়িয়ে ছুঁড়ে দিল তার দিকে। তারপরই পুত্‌লি-নাচের ঘর ছেড়ে তারা ঢুকে পড়েছিল ভিডিও হলে।

ভিডিও হলের লোকেরা এই তো সবে 'শো' শেষ করেছে, ঘুমোয়নি। টেবিলের উপর খুচরো পয়সা গুনছে। ডাকাত পড়েছে ভেবে প্রথমেই নোটগুলো চকিতে লুকিয়ে ফেলল।

বয়স্ক মতো একটা লোককে নীলেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, কারোর সঙে আমাদের একটা মেয়েছেলে ভিডিও দেখতে এসেছিল?

হউ, আসি থায়। এই দিয়ার কেত্তে মাইয়ালুক ত ভিডিও দেখি গলা— কার কথা কহুচ?

এই তল্লাটের কত মেয়েলোকই তো ভিডিও দেখে গেল— কার কথা বলছ?

বড়কই-ই বলল, আমরা আমাদের চাঁদবদ্‌নীর কথাই বলছি।

ও, তাহলে ডাকাত নয়। ডাকাত নয়, ডাকাত নয়। ভরসা পেয়ে দু'কলি গেয়েও দিল বুড়ো মতো লোকটা—"সুহাগ চাঁদবদনী ধনী নাচো ত দেখি—"

দ্যাক্ কেমা এঠি-সেঠি কার সাঙ্গর সুহাগ চাঁদবদনী নাচি বুলিচি। কোথায় এখানে-সেখানে কার সঙ্গে নেচে বেড়াচ্ছে। পাশের সহকারী লোকটাকে চোখ ঠেরে বলল, কি কউ শ্রীকণ্ঠ?

উত্তেজনায় রাগে খুচরো পয়সার টেবিলটাকেই পা দিয়ে উল্টে দিল নীলেশ্বর। তারপর দলবল নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল হল থেকে।

হেথা-হোথা পাতা তক্তপোষের উপর কেউ কেউ ঘুমোচ্ছিল। ঢাকাঢুকি সরিয়ে দেখল—সবই ছেলে, মেয়েলোক একটাও নেই। তলায় উঁকিঝুঁকি মারল হাড়িয়া-লাইবুকা-সুরুয়ারা।

কুণ্ডলী পাকিয়ে দু-চাট্টা কুকুর যা শুয়ে আছে তক্তপোষের তলায়। খুঁচিয়ে কুকুরগুলোকেই বের করে আনল হাড়িয়ারা। তারপর নেড়ী-ভুল্‌হি-লুল্‌হি মিলে সে কী ভু-উ-স্কার!

ভোর হয়ে গেছে তবু সাঁওতালী নাচ তখনও থামেনি। লম্বা লম্বা কাছা ঝুলিয়ে সাঁওতাল নামালিয়ারা ধামসা-মাদল বাজিয়ে চলেছে, খোঁপায় ফুল আর বড়বড় বেলকুঁড়ি কাঁটা গুঁজে লালফিতা ঝুলিয়ে পাঁতা-নাচ নেচে চলেছে সাঁওতাল মেয়েরাও। তাদের ঘিরে রেখেছে হাউসী হাটুয়ারা।

নীলুয়া-হাড়িয়া-লাইবুকাদের বদ্ধমূল ধারণা—আছে তো আছে চাঁদবদ্‌নী ওখানেই আছে। আ-দেখ্‌লা মেয়েটা সাঁওতালী নাচ দেখছে। হয়ত দেখতে দেখতে ভুলেই গেছে ঘরে ফিরতে।

দু'হাতে ঠেলে ভিড়ের ভিতর ঢুকে গেল নীলুয়া। কনুইয়ে কনুই গলিয়ে 'নুইয়ে নুইয়ে' নেচে চলেছে মেয়েরা। —ঐ তাদের ভিতর চাঁদবদ্‌নী কী একজনা? তেলে-জলে কখনও মিশ্ খায় না। তবু, তবু নীলুয়া মনে-প্রাণে তাদের ভিতরই চাঁদবদনীকে খুঁজে চলল।

চ ত যাত্রা-টাঁড়ে, যদি কেউ—

কী?

কত কী হতে পারে, বলেই মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে নীলুয়া বলল, আমার আর কিছু মাথায় আসছে নাই।

বলামাত্রই হাড়িয়া-লাইবুকারা দৌড়ুল যাত্রা-টাঁড়ে। অভিনেতা অভিনেত্রীর ঢঙে সোজা উঠে গেল স্টেজের উপরে। কপালে হাত রেখে অনেক দূরে যেন বহিরাগত শত্রুসৈন্যের আগমন দেখার 'পোজ' নিয়ে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল—

না, নেই।

যাত্রা-টাঁড়ে কী ইস্কুলঘরের ভিতরে। কোথাও নেই, নেই কোথাও।

"তোরা ওদিকটা দ্যাক্—", হাড়িয়া-সুরুয়া-লাইবুকাদের বলে নীলুয়া একা একাই দৌড়ুল ধানবিলে। ভোরের ধানবিল। ধানগাছে ধানগাছে শিশিরের জালি।

কাটাধান এখনও পড়ে আছে বিলে। আগে নীলুয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল স্যালো ঘরটা—

না, নেই।

তারপর টিস্ টিস্ করে লাথি মারল অদ্বৈতর বিলে। কাটাধানের হেলা ছিন-ছাতুর করে ঘেঁটে দিল এদিক-ওদিক। লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ল পাঁহী।

দু-চারজন ভোর ভোর ধানবিলে টহল দিচ্ছিল। কাণ্ড দেখে তারা বলাবলি করল, এ গুআটা কে? অদা পৈড়্যার বিলে নামি সবু ধানবিড়া বুনি দেইচি! —ধর্ ধর্ ত রে! মার্ মার্ ত রে!

হৈ হৈ করে তেড়ে আসতে দেখে নীলুয়াও দৌড়ুল। দৌড়ুল ফের গ্রামের দিকে, অদ্বৈত পৈড়্যার ঘরের দিকে।

মেলা দেখা রাত, জাগর-উজাগর রাত, রাতের চট্কা যেন এখনও লেগে আছে, গ্রামের ঘুম যেন এখনও ভাঙেনি। অদ্বৈত পৈড়্যার পরিবারও ঘুমোচ্ছে।

নীলুয়া-হাড়িয়া-নাকফুড়্রি-লাইবুকারা গিরিহার ঘরের দরজায় দমাদ্দম লাথি মারছে। "আঁই আঁই" করে খেপা মোষের মতো চেঁচাচ্ছে।

ধাক্কাধাক্কিতে মেসিনঘরের লোকগুলোও জেগে উঠেছে— বিশেষত নির্মাল্য। দৌড়ে গিয়ে নীলুয়াকে পিছন থেকে জাপ্টে ধরল সে।

বলল, এসব কী হউচি? থাম-অ!

উগ্রচণ্ড বড়কইই বলল, থামব কেনে? আমাদের একটা মাইয়া মেলা থিক্যে এখনও ফিরল নাই আর ইদিকে গিরিহা ভঁস্ ভঁস্ করে ঘুমাচ্ছে? বলেই সে দরজায় আরো কয়েকটা লাথি মারল নির্মাল্যর সাক্ষাতেই।

বেলা যত বাড়ল দিঙ্ দিঙ্ করে চারদিকে খবরও রটে গেল তত। খোঁজাখুঁজির মাত্রাও বেড়ে গেল তিনগুণ চতুর্গুণ!

অদ্বৈত খুঁজল। অদ্বৈতর ভাই শ্রীমন্ত খুঁজল। একজন উত্তরে গেল তো আরেকজন দক্ষিণে। পুবে-পশ্চিমে। কড়িয়া-কুলিদা-জেনকাপুর-গৌড়দা, আশপাশের গ্রাম ছেড়ে সরশঙ্কা-নেকবাটিয়া-পাইকবাড়-চাউলিয়া এমনকি দাঁতন পর্যন্ত। অদ্বৈতর বউ নীলিমা তো ঘরে বসে সারাক্ষণই বলে গেল—"ঝিঅ যেপরি চঞ্চলা চাঁইফরকি—তার সাঙ্গর নিয়া বন্ধুবান্ধব জুটি যাইতে বেশি টাইম লাগবনি। হউ, তুমে দেখ, ছেমড়ি কার সাঙ্গর ভাগি যাউচি!"

শোনামাত্রই 'লোক ক্লাব'-এর সদস্যরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা আরও দূর দূর গেল। সাইকেলে মোটরবাইকে। ওদিকে এগ্রা-কাঁথি-রামনগর-দীঘা এদিকে খাকুড়দা-বেলদা-নারায়ণগড় এমনকি খড়গপুর পর্যন্ত। যদি কারোর সঙ্গে ভেগে যায়, কেউ যদি ভাগিয়ে নিয়ে যায়!

না, কোনো হদিসই মিলল না। অদ্বৈত খালি চোখে চোখে রাখল নীলুয়াকে। তার যেন কেবলই মনে হল, নীলুয়া ছাড়া আর কেউ না, নীলুয়াই—

পড়ে থাকল ধানকাটা, ধানবিলে যাওয়া। রান্ধাবাড়া। বনভুজনীর খাওয়া-দাওয়া। লম্বা হাত করে মুড়হি দিতে এসেছিল গিরিহানী। কেউই আর আঁচল পেতে গামছা মেলে ধরে মুড়হি নিল না।

'সিদা' দিতে এসেছিল নীলিমা। চাল-ডাল-গোলআলু, বৈতাল-বাইগন, শুকা-তেন্তুলি। কেউ নিতে গা করল না।

পোখরি-আড়ায় এককোণে লাটাধারে নীলেশ্বর। তাকে ঘিরে রেখেছে হাড়িয়া-সুরুয়া-বড়কই-লাইবুকারা। কোথায় শিক্‌লি আটকে বাঁধা-ছাঁদা হয়ে পড়ে আছে তার পোষা কাঠবিড়ালি 'ইম্লি'।

এতদিনে সঙ্গে আনা কাঁড়-কাঁড়বাঁশ বের করেছে সে। পাথর দিয়ে গোছা গোছা 'পাটন' ঘষে ধার দেখছে। মাঝে মাঝে ছোট মাতব্বর গুরভা এসে 'নজর' করে যাচ্ছে তাকে। —কে জানে কখন কী করে বসে উগ্রচণ্ড নীলুয়া।

শরাবণ শরাবণের বউ সেই যে ঢুকেছে চালাঘরে আর বেরুচ্ছে না। চাঁদবদনীর মা পেটতাবুড় দিয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছে। তার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে কখনও শতুরার বউ কখনও গুরভার বউ।

—এগো কান্দিস নাই! বুকের ধন হারা মানিক ঠিক ঘুরেঁ আসবে। যদি বুকের দুধ ঠিকঠাক খাবাঁই থাকিস—ঐ বলে নাই, "মায়ের গভ্যে ছিলি যখন দুধ খাইলি কার"?

শতুরার বউ নিয়তি বলল, হঁ তাই ত—"গাই আইল বাগাল আইল বাছুরী কুথায় থাকল"— চিন্তার কথাই ত দিদি। চিন্তা নাই?

বৈকালে, সন্ধের মুখে 'লোক ক্লাব'-এর ছেলেরাই খাবার এনে কোনমতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাইয়ে গেল নামালিয়া লোধাদের। খেল না কেবল শরাবন আর শরাবনের বউ। মেয়ে না ফিরলে তারা দাঁতে কুটোটিও কাটবে না।

মেয়ে বড়, না খাওয়া বড়?

'বিনায় বিনায়' কাঁদছে চাঁদবদ্‌নীর মা—

মুনু কোথায় গেল গো
দুনিয়া আঁধার—

অগত্যা খবর গেল থানায়। দাঁতন থানায়। খবর দিল ঐ [illegible]-ক্লাব'-এর ছেলেরাই। এক ঘণ্টাও গেল না থানার জীপগাড়ি এসে দাঁড়ালো অদ্বৈতর [illegible]

জীপের পিঁ পিঁ আওয়াজে দোতলা থেকে একতলায় নামতে হল অদ্বৈতকেও। খোঁজাখুঁজি সেরে সেই যে উঠেছিল আর তো সে নামেনি!

জীপগাড়ি এল, বড় দারোগাও এল, কিন্তু জীপগাড়ির ভটর ভটর আওয়াজ শুনেও আজ আর কেউ ডাঁটো মাগ ফেলে রেখে লাটায় পাটায় ঢুকে পড়ল না। বরঞ্চ হেডলাইটের জোরালো আলোয় চোখের পাতা খুলে রেখেই চোখ পিট্‌ পিট্‌ করল লোধাপুরুষরা।

টুকি-টাকি জিজ্ঞাসা করল বড়দারোগা। কী যেন বলতে—কী যেন বলতে—হড়বড়িয়ে এগিয়ে আসছিল নীলুয়া, তাকে আঁকড়ে ধরে রাখল গুরভা-গুড়কুঁদা-শতুরারা। রাইবু-গুড়গুড়িয়ার মতো তাকেও যদি ধরে নিয়ে যায় বড়দারোগা?

জীপগাড়িটা গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল অদ্বৈতকে। বড়দারোগা বলল, থানায় যে একবার আপনাকে আসতে হবে অদ্বৈতবাবু।

দাঁতন থানার চৌহদ্দি আর কতদূর! ওদিকে বেলদা থানা, এগ্রা-পটাশপুর, আর এদিকে বড়জোর মোহনপুর ফাঁড়ি। মৌজা দুর্গো পঞ্চান্নটা—

চিরুনী তল্লাশি করে জীপটা আবার ঘুরে এসেছিল রাত বারোটায়। এসেই তুলে নিয়ে গেল নীলুয়া-গুরভা-শরাবনকে। খবর ছিল—একজনকে পাওয়া গেছে নদীধারে সোনাকনিয়ার ইটভাটায়।

তারপর?

তারপর আর কী? সব শেষ! কে বা কারা চাঁদবদনীকে ইটভাটায় তুলে নিয়ে গিয়ে—

এমনভাবে পড়ে আছে যেন ঘুমোচ্ছে, "কাঁই রে চন্দ্রবদনী, তু এত্তে বেলা যা শুইচু, উঠি পড়, বিলকু যাইতে হবনি?" বলে গিরিহা অদ্বৈত ডাক দিলেই সে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়বে।

পুলিশ আগেই ধরেছিল অদ্বৈত পৈড়্যার ভাতুয়া স্বপনকে।

কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠেছিল নীলেশ্বর, অদ্বৈতকে দেখিয়ে দারোগাকে বলেছিল, ঐ লোকটাকে এখনও হাতকড়া পরাচ্ছেন না কেন? আপনাকে পরাতেই হবে হাতকড়া।

দর্ দর্ করে ঘামছিল দারোগা।

বলল, অযথা চেঁচাবেন না, আইন নিজেদের হাতে নেবেন না। আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন।

'লোক-ক্লাব'-এর সদস্যরা নীলুয়াকে সরিযে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বলেছিল, ক'দিন থেকে যান, আরো কতজন ধরা পড়ে দেখুন না! আমরা কাউকেই ছাড়ছি না।

বাসটা বেলদা-কেশিয়াড়ী মোড় ঘুরে ছুটল কেশিয়াড়ীর দিকে সোজা পশ্চিমে। পশ্চিমে, পশ্চিমে। আর আসবে না তারা পুবে। পুব খাটতে নামাল খাটতে।

এ যেন সেই— "বেলদারে গলি কেশিয়াড় রে গলি নারানগড়ে যাই বিশ্রাম কলি—"

না না, নারায়ণগড়ে এ-বাস আর যাবে না। নীলুয়ার স্যাঙাৎ-ঘরে যাওয়াও এ-যাত্রায় আর হবে না। সেদিকে তাব আর মনও নেই। তবু কে জানে কেন—ফিরে ফিরে তো তাকাচ্ছিল নীলুয়া!

চাঁদবদনীকে পেখম-মেলা পায়রা বলেছিল গুরুভার বউ। বলেই চুপ করেছিল অনেকক্ষণ। হঠাৎ কী মনে করে নিজে নিজেই বলে উঠল— "মায়ে কান্দে বাপে কান্দে চারকোনা ধরিয়েঁ। ও যে গেলি বাছা গেলি রে দুনিয়া আঁধার করে।।" দুনিয়া আঁধার করে মুনু চলে গেল—দেশে ঘুরেঁ আমরা কী বলব? কী করে মুখ দেখাব লোককে?

বলেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ফেলল গুরুভার বউ।

তাই তো কত বড় মুখ করে এক কথায় দেশ-গাঁ ছেড়ে ঘর-দুয়ার ছেড়ে ঘরের দুয়ারে কাঁটা ঝোপ ফেলে, কী না কী গায়ে-হাতে ধানের সুঙ বিঁধাতে তারা এসেছিল নামাল খাটতে!

এখন ঘরের 'মাইয়া'-কে ভাসান দিয়ে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। ফিরে গিয়ে বলবে কী জটাদিদিকে? ভুবনার বউ ফুলটুসিকে? দুধের বাছা টুরাকে?

গুরভাবউয়ের দেখাদেখি আর আর লোধানীরাও শাড়ির আঁচলা দিয়ে চোখ মুছল।

কেশিয়াড়ী ছেড়ে বাসটা লছিপুরের দিকে হুড়দুড়িয়ে ছুটে যেতেই মনটা চনমন করে নেচে উঠল নীলুয়ার। আরেকটু বাদেই তো এসে পড়বে লছিপুর হাইস্কুল।

লছিপুর হাইস্কুল, লছিপুর হাইস্কুল।

বাস থেকে নেমে এক দৌড়ে স্কুলে ঢুকে কী টিপ্ করে হেডমাস্টারকে একবার প্রণাম করে আসবে নীলেশ্বর?

কেশিয়াড়ী গেল। এসে গেল লছিপুর। বাসও থামল। বাস থেকে নেমে কোথাও আর দৌড়ে গেল না নীলেশ্বর। সে ইন্দ্রির শিকলি টেনে ধরে বাসেই বসে থেকে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে।

ঐ তো ইস্কুলের মাঝমাঠে পতাকা উড়ানোর খুঁটিটা। পতাকা নেই, পতাকা উত্তোলন হবে পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে। এখন একটা কাক বসে আছে খুঁটিটায়।

নীলুয়ার মনে পড়ল—তার তলায় দাঁড়িয়ে সেও স্বাধীনতা দিবসে কেমন জোরে জোরে বলত, "বন্দে মাতরম্"। মনে মনে এখনও কী একবার বলল না, "বন্দে মাতরম্"?

ভসরাঘাট এসে যেতেই এপারের বাসের দৌড় শেষ হয়ে গেল, খেল খতম্। বাস থেকে পিল্ পিল্ করে নেমে পড়ল নামালিয়া লোধারা। সেই মট-বিড়া পোঁটলা-পুঁটলি-গিনা-তাটিয়া-শাবল-খন্তা-দা-কাতান-কুড়হার-বুড়িয়া-কাঁড়-কাঁড়বাঁশ—

লটবহর যা নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সবই কী ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে? নাকি কতক থেকে গেল গিরিহার চালাঘরে? কতক বাসের সিটের নিচে?

সবকিছুই ভুলে ক'দণ্ড হাঁটকে-পাঁটকে দেখল, 'গিন্‌তি' করল— রামে রাম-দুই-তিন—

টিপে-টুপে দেখল, না, ঠিকই তো আছে, তবু যেন হালকা-পলকা, 'উধাস' 'উধাস'। বাস থেকে চাঁদবদনীর মাকে হাতে ধরে নামিয়ে নিয়ে এল দুজনে। শতুরার বউ আর গুরভার বউ। মাটিতে বসিয়ে দিতেই সে গড়িয়ে গেল। আর পারছে না।

ওদিকে শরাবনকে নিয়ে থাপস্-গাদা হয়ে বসে আছে গুরভা-শতুরা-গুড়কুঁদারা। এতক্ষণে গুরভা বলার মতো কথা পেয়ে বলল, কী করবি আমাদের কপালটাই খারাপ। রাইবুর বহিনটা গেল, গুড়খার বহিনটা গেল, তোর বিটিটাও গেল, ভুবনার মেয়্যাটাও যাব যাব করছে— সেদিন দেখলি নাই একটা বেজাতের পরপুরুষের সঙে—

—গাছগুলাই যদি মরে যায় সব ফল ধরবে কুথায়? আর ফল নাই ধরলে লোধাবংশ নির্বংশ হবে নির্ঘাত। হঁ কী নাই?

মাথা নাড়ল শতুরা-গুড়কুঁদারা।

কথা ঠিকই। কাঠিখুঁচি খুঁজে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগল তারা।

তাই তো, এ ভাবে তো তারা ভাবে নাই!

নদী এসে গেল। লোধাবউড়ি-ঝিউড়িরা এতক্ষণে একটা চেনা জিনিস দেখতে পেয়ে নিজেদের ভিতর বলাবলি করল, হঁ সেই বড়লদীটাই, একেই লদী—

মনটা কী প্রসন্ন হয়ে গেল তাদের? নদী যখন এসে গেছে তখন ঘর যেতে আর তাদের দেরি নেই।

দেরি নেই, দেরি নেই।

এই তো সেই কুলবুদা বেনাবুদা পিট্‌নাসিজ্ মনসাসিজের বন, হেথা-হোথা চাগড়া চাগড়া বিরি-বাইগনের ঝাড়। ভস্‌কা বালি, পা দিলেই মস্ মস্ করে। এই বালি নদীজল পেরিয়ে কাঠভার কাঠবোঝা নিয়ে দিনে-রাতে কী ঝড়িয়া-বর্ষায় শীতে-গ্রীষ্মে কখনও নৌকায় কখনও পায়ে হেঁটে হাজারবার যে কাঠ বেচতে হাটে গিয়েছে তারা, শুধু ঘাটটাই যা আলাদা। সেটা না হয় বড়োডাঙা-কুস্তড়িয়া আর এটা লুয়াগাঁ-ভসরাঘাট।

—হঁ জল ত একেই, একেই নদী—

জলে নেমে দু-হাতে আঁজলা করে জল খেল লোধাবউড়ি-ঝিউড়িরা, লোধাপুরুষরা।

'পায়রা-চঁচ্‌রা' জল। আর কী ঠাণ্ডা! বেলা তো ঢের হল, কেউ কেউ এই ফাঁকে স্নানটাও সেরে নিল, হাত-পা খেলিয়ে নিচেয় নেমে উপরে উঠে, ব্যাঙ-ডুব দিয়ে কাক-ডুব দিয়ে।

এর কাছে কোথায় লাগে গিরিহা অদ্বৈত পৈড়্যার পোখরি-আড়া! কেউ কেউ বলল, সে ত পচা গাড়িয়া।

ভুটকী-গুরুবারিদের মনে হল, 'মকর-সিনান'। মকর স্নান, মকর স্নান। কারণ জল থেকে উঠেই তারা তো পরে নিয়েছে গিরিহানীর দেয়া সেই 'বাইগন-মুজি'র ছাব্‌কা ছাব্‌কা শাড়ি!

গায়ে জড়িয়েই ভুটকীর মনে পড়ে গেল শীতলা মাড়োতলার মেলার দিনটার কথা।

গিরিহার ঘরে একটার পর একটা কুটুম আসছে। দোতলার বারান্দায় বসে কুটুমরা তাকিয়ে আছে চালাঘরের দিকে। তাদের নিয়ে ব্যস্ত গিরিহার বউ ঘরে ঢুকছে-বেরুচ্ছে। এটা খাওয়াচ্ছে সেটা খাওযাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে চাঁদবদনীকে ভুটকী বলেছিল, "আজকের দিনটা কেমন 'মকর' 'মকর' লাগছে।" চাঁদবদনী বলেছিল, "হঁ ত মকরগীত শুনাই দে।" ভুটকী গেয়েছিল সেই গীতটা, সেই যে—"লাতি খুঁজে হাতি লিতে হাতি কুথায় পাবে গ'।" তাকে থামিয়ে দিয়েছিল চাঁদবদনী, "থাম থাম খালভরি, মকরের এখনও ঢের দেরি, বাঁদনাই আইল নাই ত মকর! যখন-তখন মকরগীত গাইতে নাই রানী"—

মনে পড়তেই গুরুবারির পিঠের উপর মুখ রেখে হুর হুর করে কেঁদে ফেলল ভুটকী।

হাড়িয়া-বড়্‌কই-লাইবুকাদের নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল নীলুয়া, টাইম জানতে বাসের। দলবল নিয়ে ফিরে এসে 'কাতাধারে' দাঁড়িয়ে আছে। 'কাতাধার'—তার মানে নদীর তীর।

নদীর তীর, নদীর তীর।

গরমের দিন, নদীতে তেমন জল নেই, নৌকা কী ডোঙা ছাড়াই পারাপাব কবা যায়। তার উপর ভসরাঘাটে ভাসাপুলেরও ব্যবস্থা আছে।

পরের পর কাঠের গুঁড়ি সাজিয়ে জলের উপর ভাসমান ব্রীজ। ব্রীজের উপর দিয়ে দৌড়োও রে লাফাও রে ঝাঁপাও রে ডুববে না। তবু লোধাবউড়িরা হাঁটুর উপর শাড়ি তুলে ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছে।

শরাবনের বউয়ের দু'হাত দু'দিক থেকে ধবে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে শতুরার বউ আর গুরভার বউ। কে জানে মনস্তাপে ঝাঁপ না দিয়ে বসে নদীজলে! সেই আছে না—"মনে কক মনস্তাপ দিমু নাকি জলেই ঝাঁপ—"

একসময় বন্ধুর বাড়ি শঙ্কবীডাঙায় পৌঁছে একটা নদীর জন্য আকুলি-বিকুলি তো কম করেনি নীলেশ্বর! মনে হয়েছিল তার—একটা নদী পেয়ে যায় যদি তো নদীজলে কুদি মেরে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে জাড়া-খেড়ি-তরমুজের বিল ভাঙতে ভাঙতে দু'পায়ে সিম-বরবটির শুঁড় জড়াতে জড়াতে উজানে আরও উজানে উঠতে উঠতে একসময় পেয়ে যাবে থুরিয়া-বড়োডাঙা-গোঠটাঁড়-মাঝুডুবকা—

আজ সেই নদী হাতের এত কাছে পেয়েও নীলেশ্বর গা করল না। শুধু হাড়িয়া-সুরুয়া-লাইবুকা-বড়্‌কইদের আঙুল দেখিয়ে বলল, নদীর কাতা ধরে ধরে ঐদিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাস যদি ত সঞ্ঝার আগেই পৌঁছে যাবি থুরিয়া—মহিষাসুর দঁক হয়ে বড়োডাঙা-গোঠটাঁড়-মাঝুডুবকা।

খুশিতে উথলে উঠে লাইবুকা বলল, চ তবে উদিক দিয়েই আমরা হাঁটি?

ধুত্‌! হাঁটতে হবে অ-নে-কটা।

বাসেই উঠল তারা। বাসের নাম 'মণিকাঞ্চন'। সেই নয়াগ্রাম-বালিগেড়িয়া-খড়িকা-পাঁচকাহিনা-নিগুই-নারদা—

এখন যে-যার সে-তার। নীলেশ্বর বাসে উঠল কী উঠল না সঙ্গে থাকল কী থাকল না—আর কোনো ভয় নেই।

ভয় নেই, ভয় নেই।

বাসে উঠে লোধাবউড়ি-ঝিউড়িরা লোধাপুরুষরা বেশ 'অসার' হয়ে বসল। প্রশস্ত হয়ে, গা এলিয়ে পা ছড়িয়ে। আর যারা যারা বাসে উঠল তারা তো সব জানা-চেনা, মাহাতো-ভুঁইয়া-ভূমিজ-করণ কী হাটুয়া মহাজনরা। নদী সে-পারের নয়, নদী এ-পারের। বিদেশের নয় এদেশের!

ঐ তো দুধারে চিরচেনা আঁটারি-চুরচুর ঝাড়, 'ডগ্' কেমন লহ লহ করছে! বাসের জানালায় হাত বাড়িয়েও ধরা যায়। সামনে আসা একটা বাসকে 'পাশ' দিতে গিয়ে এই বাসটা এত ধার ঘেঁষে সর্ সর্ করে গেল যে কতক লাটাপাটা লই-লতির ডগ্ তো লোধাবউড়ি-ঝিউড়িদের কান-মাথা ছুঁয়ে দিল। একটাকে হাতমুঠে চেপে ধরেছিল ভুটকী, কতক পাতাপতর দুহরে নিয়ে ছেড়ে দিল। গুরুবারি জিজ্ঞাসা করল, বল্ ত কী পাল্‌হা? ভুটকী বলল, সোনাল; আমাকে আর গাছপাল্‌হা চিনাস নাই। সোনালগাছের পাতা ছিঁড়ে ভাঁজ করে মুখে পুরে কত যে বাঁশি বাজিয়েছে সে! সোনালীপোকা ধরে সোনালডালে বেঁধে চরকির মতো কত ঘুরিয়েছে রিঁ-রিঁ করে! 'রিঁ-ই-রিঁ' 'রিঁ-ই-রিঁ' করে বনমধ্যে কোথায় যেন এ-পাশ ও-পাশ থেকে একটানা ডেকে চলেছে রিঁ-রিঁয়া পোকা। 'হু-উ-প' 'হু-উ-প' করে এদিক-ওদিক থেকে ডেকে উঠল হনুমান। ঐ ত ঐ ত—কে যেন বলল, হনুমানচৌকি থেকে এতদূরে চলে এসেছে সে! বড়কই-ই বলল, ল্যাজুড়ে কাটা দাগ, দেখেই চিনেছি, যে-সে লয়, তপুবনের সেই—। আরেকজন বলল, আমাদের লিতে এসেছে ও, ভুলে নাই। 'বনসিম্' সাঁড়ি-মুরগা বাঙ্ দিল কোন্ অঝোরঝর ঘোড়াটাপুর বন থেকে—চঞ্চল হয়ে উঠল নাকফুড়্‌রি। ইস্! তার অত গুণের 'লাটাচুলী'টা সে কী না ফেলে এসেছে ছোটগিরিহা শ্রীমন্তর বিলে! না হলে সে কী বাসে বসে থাকার লোক, এতক্ষণে হুড়দুড় করে বাস থেকে নেমে পড়ত না? "পাঁচকাহিনা" "পাঁচকাহিনা" বাসকন্ডাক্টার হাঁকতেই লোধারা লোধাবউড়ি-ঝিউড়িরা অস্থির হয়ে উঠল। নেমে পড়তে তাদের পা সব্ সব্ করল। কেউ যেন বললও, ইবার নামলে হয় না? ঐ তো পাঁচকাহিনা বীট অফিসের পাশ দিয়ে ঘোড়াতাড়িয়ার রাম মাহাতোর বাড়ির গাঁ ঘেঁষে অঝোরঝর ঘোড়াটাপুর জঙ্গল ভেদ করে বাঁয়ে ঘুরে ঠাকুরবাঁধের উপর দিয়ে—। নেমে পড়েছিল গুড়দুম্-গুড়কুঁদারা, মাতব্বরের মতো হাঁকাড় দিয়ে উঠল নীলুয়া, বলল, এখানে কী, আমরা ত নামব নারদা।

ফের হুড় মুড় করে উঠে পড়ল গুড়দুম্‌রা।

গাড়ি পৌঁছুল নারদায়। এখান থেকে ভোরের 'মণিকাঞ্চন' বাস ধরে তারা গিয়েছিল পুবে। পুবে, পুবে।

আর যাবে না পুবে। পুবাল খাটতে, নামাল খাটতে। বাস চলে গেল পশ্চিমে। বাস থেকে ডাইনে ঘুরে তারা নেমে হেঁটে চলল উত্তরে।

কত 'হুরি' করেছিল যাবার সময়, বাসে ওঠার সময়। এখন নামার বেলায় তারা এতটুকুও হুরি করল না। কেমন নিঃশব্দে নেমে গেল বোঁচকা-বুঁচকি মট-বিড়া গিনা-তাটিয়া শাবল-খন্তা-কাঁড়-কাঁড়বাঁশ—

এখন যে-যার সে-তার, যেতে পারে একা একাই। এই তো নারদার ভিতর দিয়ে বাবুইঘাসের ডাহি পেরিয়ে নারদার জঙ্গল ভেঙে রুখনীমারা-দোরখুলির মাহাতোদের গ্রাম, বঙ্কার দোকান, তাবাদে বুলান-হদহদি, বুলান-হদহদির সোঁতা পেরুলেই ওধারে দোরখুলির লোধাবস্তি।

কিন্তু না, একলা কেউই গেল না। একটা দলের ভিতর থেকে গেল সকলে। একটা গোটা দঙ্গল চলেছে— ঐ তো সবার আগে 'ইন্নি'-কাঁধে নীলুয়া। তার পিছনে লাইন করে লাইবুকা-হাড়িয়া-সুরুয়া-নাকফুড়রি-বড়কইরা। আগে পিছে রাম-লক্ষণ মধ্যে সীতার মতো শরাবনের বউকে ঘিরে ধরে নিয়ে চলেছে গুরভার বউ আর শতুরার বউ। দলের মধ্যে থেকেও যেন বারে বারেই পিছিয়ে পড়ছে ভুটকী-পুনোই-গুরুবারিরা। সবার পিছনে থাকা লোধাপুরুষরা তাদের তাড়া দিয়ে নিয়ে চলেছে, চ বিটি চাঁড় চাঁড় চ!

জলদি জলদি যাবে কী, ঘরের যত কাছাকাছি হল তাদের পা যেন ততই আস্তে চলল। কথা কমতে কমতে চুপ হয়ে গেল একেবারেই। 'হুরি' তারা নিজেরা করল না, কিন্তু 'হুরি'-তে কান ঝালাপালা হয়ে গেল তাদের!

কারা এত চেঁচাচ্ছে, কাঁসা পিটছে, বাজাচ্ছে ধামসা-মাদল? কোথায় আবার কী হল! বুলান-হদহদির যেখানে 'মগ্‌রা'— জমির আলের নিচে জল যাবার ভুলুক—এখন তো জল নেই, তবু সেখানে লোক জড়ো হয়েছে এত কেন? নামালিয়া লোধাদের তো যেতে হবে ওদিক দিয়েই।

তারা এসেও গেল মগ্‌রার কাছে। —লে মুনুর বাপ, হাসব ন কাঁদব—গব্‌রাবুঢ়হা তার লাতির সঙে কুকুরের বেহা দিচ্ছে! বেহাঘর, বেহাঘর—

রগড় দেখতে এত দুঃখের মধ্যেও দাঁড়িয়ে পড়ল নামালিয়া লোধারা। নাকি গোব্‌রা সাঁওতালের বেটার বেটার 'নামো' পাটিতে আগে দাঁত উঠেছে আর তাই দোষ খণ্ডাতে কুকুরের সঙে 'বেহাঘর' হচ্ছে!

ছোট থাকতে থাকতে কুকুরের সঙ্গে বিয়ে না দিলে, দোষ না খণ্ডালে বড় হয়ে, ছেলেই হোক মেয়েই হোক, সত্যি-সত্যি সে যখন বিয়ে করবে, বিয়ে করার পরে পরেই তার বউ কী তার বর নাকি অচিরেই মারা যাবে!

আর তাই গোব্‌রা এসেছে সুখজুড়ি ছেড়ে গাঁয়ের ত্রিসীমানা ছেড়ে দোরখুলির গাঁ-মুড়োয় কুকুরের সঙ্গে নাতির ঘটা করে বিয়ে দিতে। সঙ্গে লোকজন কুটুমবাটুম এসেছে প্রচুর। তাই এত 'হুরি'। তাই এত 'লাঁগড়ে' 'দং'— নাচানাচি সেরেঞ।

এখন জ্যৈষ্ঠ মাস, শুকনার দিন, মগ্‌রায় আর জল কোথায়! ঝড়িয়া-বর্ষার কাল হলে মগ্‌রায় জল বইত হদ্ হদ্ করে। রাজ্যের লোক আসত 'সিনাতে'। এখন জল নেই, তাই কলসির জল ঢেলে স্নান করাতে হচ্ছে গোব্‌রার নাতিকে।

তাও আবার হলুদগোলা জল! 'সুনুম সাসাং'! কেউ কেউ বলল, গায়েহলুদ হচ্ছে চোখ বুজ রে শালা, চোখ বুজ! হি-হি করে চোখ বুজে থাকল গোব্‌রার বেটার বেটা।

গুরুবারির কাঁধে মাথা রেখে বিড় বিড় করে গেয়ে উঠল না কী ভুটকী—"মা কৈ জাগানাক রাই সরষর তেঁড় গ। বাউ কৈ জাগানাক হেমসাগর ছড়িদ হে গ?"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নামালিয়া লোধারা। তাদের দাঁড়াতে অনুরোধ করেছিল প্রতিবেশী গোব্‌রাবুঢ়হা। হাঁড়িয়াতে চুর হয়ে 'গড়জহার' করে বলেছিল, লাতির বেহাঘর হচ্ছে, পাতড়া পেতে চাট্টি চিড়া-গুড় খাঞে যা।

সেই থাকা আর বসে বসে রগড় দেখা। তাও তো মনমরা শরাবন আর শরাবনের বউ

কিছু না মেনে যেতে চেয়েছিল—তাদের আটকে দিয়েছে নীলুয়া। সবার সঙ্গে থাকলে তবু তো ভুলে থাকবে কিছুটা!

হলুদগোলা জল গায়ে পড়তেই মাদী কুকুরটা এবার কাঁই কাঁই করে ভুঁকে উঠল। কুকুরের গলায় বাঁধা দড়িতে একটা হেঁচকা টান দিয়ে গোবরাবুঢ়্হাও হাত তুলে মারতে গেল কুকুরটাকে।

বলল, হাপা তে দালে মে, ভুলি! বাম কামি লেকান ফল বাম যামা। টিঙ্কি বুটাম সেনঃক রেসে লুবুঃক খদেম এঞাম!

ভুলি, তোকে লাঠি পেটা করব! কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না! গোব্রার কথায় কুটুমবাটুমরা হেসে উঠল। 'ঠার' না বুঝে সাঁওতাল বুঢ়হার কথা বলার ধরন দেখে নামালিয়া লোধারাও হেসে উঠল।

ইতুৎ সিঁদুর বাপলা। সিঁদুর ঘষে বিবাহ। প্রথমে মগ্রার ভুলুকে আচ্ছা করে ঘষা হল সিঁদুর। তারপর গোব্রার বেটার বেটা হলুদ-গাবা ধুতি পরে তার কুকুরবউয়ের কপালে সিঁদুর ঘষতে গেলে সামনে এসে দাঁড়ালো জগমাঝি কুলাই টুডু।

হাসতে হাসতে বলল, উঁ-হু উঁ-হু, সিঁদুর ঘষবি পরে, আগে দে আমার হলুদ-গাবা ধুতি বাবুয়া! আমার বুকটাও যে করে তোর লেকান লুটুঃক লুটুঃক!

ফের একচোট হাসাহাসি। সিঁদুর-গাবা নতুন ধুতি পেয়ে পথ ছেড়ে দিল জগমাঝি। এবার গোব্রাবুঢ়্হার নাতি কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে আচ্ছাসে সিঁদুর ঘষল— একবার দু'বার বারবার!

ছাড় ছাড় রে, কাডা হপন! বাচ্চামোষ!

তবু সে ছাড়ছে না। এ কুকুর যে তার কতদিনের চেনা!

কুকুরের গলায় পরিয়ে দিল গুলাজ ফুলের 'গালাং'। তার মানে মালা। তার গলায়ও একটা মালা পরিয়ে দিল তার ঠাকুর্দা। তারপর কুকুরটাকে নিয়ে সে ঢুকল মগ্রার 'ভুলুকে'।

এক-এক করে পারাপার করতে হবে তিন-তিনবার।

গোবরাবুঢ়্হার বেটার বেটা মালা-পরা সাদায়-লালে ছাপ্কা ছাপ্কা কুকুরটাকে নিয়ে মগ্রার এ-পার ও-পার করছে আর উপস্থিত আত্মীয়স্বজন বেদম 'হুরি' করে গিন্তি করছে—

মিৎ টাং!

একবার!

বারয়া!

দু'বার!

পেয়া!

তিন, তিন—

'ইতুৎ সিঁদুর' শেষ হল। এবার তো খাওয়া-দাওয়ার পালা। কুকুরবউয়ের গলা জড়িয়ে মিঠাই খাওয়ালো গোব্রার নাতি। আর তাকে কোলে বসিয়ে মিঠাই খাওয়ালো কুলাই টুডুর বউ মাঝি বুঢ়্হি।

এবার টাঙ্গির মতো বেঁকানো গোঁফ মুচড়ে গোব্রা অনেকক্ষণ বসে থাকা নামাল খেটে আসা লোধাদের কাছে এসে বলল, লে গুরভা, ইবার তোরা লাইন করে বুসে পড়!

ঝট্ ঝট্ এক লাইনে বসে গেল নামালিয়া লোধারা। এমনকি নীলুয়াও। প্রত্যেকের সামনে 'শালপাতড়া' বা শালপাতার থালা দিয়ে গেল একজন। আরেকজন দিয়ে গেল শালপাতার দোনা বা 'ফুডুঃক'।

দোনায় দেওয়া হবে হাঁড়িয়া। দোনা পেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ভুটকী-গুরুবারিরা—

খাবে কী খাবে না। ভাবতে না ভাবতেই পাতায় পড়ে গেল চিড়া-গুড়। তার উপর ঘটি করে একজন ছিটিয়ে গেল জল।

খাওয়া শুরু হয়েছে। শরাবনলোধার বউও শালপাত্ড়ায় চিড়া-গুড় জল দিয়ে ভিজিয়েছে, 'গসা' করে মুখে তুলবে—আর তুলতে পারল না, এতক্ষণের চেপে রাখা কান্নাটা ফের উঠে এল হুর হুর করে।

জলে ভিজানো চিড়া-গুড় পাতাতেই ফেলে রেখে কাঁদতে কাঁদতে লোধানী দৌড়ুল দোরখুলির লোধাবস্তির দিকে। খাওয়া ফেলে শরাবনও সঙ্গে চলল। তার পিছুনে নীলুয়া। শরাবনের বউ সুর করে বলতে বলতে গেল, আমিও যে গ নামাল থিক্যে ঘুঁরেই বিটির বিহা দিতম—

গুরভার মুখে সব শুনে গোব্‌রা সাঁওতাল বলল, হায়! হায়! নওয়া হাসা হড়ম বারসিঞ লাড়িৎ— মাটির গতর দুদিনের তরে। সেই বলে নাই—লাচ গ বিটি লাচ। খেল গ বিটি খেল—ই জীবন গ বিটি আড়াই দিন!



ঘরে ফিরে আসছে নুকু ওরফে লক্ষ্মীরাণী মল্লিকও। এতদিন সেও তো ছিল বাইরে বাইরে, কখনো ট্যুরে কখনো হোস্টেলে। আজ ফিরছে, ফিরতেই হচ্ছে তাকে।

দাঁতন-বাহিরী-এগ্রা ট্যুরে তারা ক্যাম্প করেছিল বেলদায়। এগ্রায় তারা যায়নি। তার আগেই বেলদা থেকে তড়িঘড়ি ফিরতে হয়েছে কলেজে। বামুনদায় অদ্বৈত পৈড়্যার খলা-খামারে চালাঘরে যখন নুকু আর আদিত্য জোর মেতেছিল ফটো তোলায়—আলাপ-আলোচনায় তখন এদিকে মিনিবাসে হাটতলায় চায়ের দোকানে গোপা-তনিমা-তন্দ্রা শাশ্বতীরা মুণ্ডুপাত করছিল নুকুর ওরফে লক্ষ্মীর।

তার সঙ্গে আদিত্য স্যারের অত কী! 'জিনিয়াস' 'জিনিয়াস' বলে এত কেন 'আপ'-এ তোলা। ঐ তো দেখতে—লোধার মেয়ে লোধা! বাপ-ঠাকুর্দারা যাব চোরলোধা! নিশ্চয় একটা কিছু আছে—সেই 'তাঁর' সঙ্গে 'তার'।

সেই একটা কিছুর সন্ধানে গোপা-তনিমা-তন্দ্রারা হাত মিলিয়েছে ছেলেদের সঙ্গেও। ছেলেরা বেরিয়ে পড়েছিল খোঁজখবর কবতে—দেখি তো দুটিতে গেল কোথায়।

বাদ সেধেছিল একমাত্র ভারতী, তাঁতিদেব মেয়ে, সেই বলেছিল— কী যা-তা বলছিস্। লোধাদের কতটুকু জানিস? যা জানিস না তাই নিয়ে বলতে আসিস্ না! লোধাদের জীবন নিয়ে একটা কবিতাও শুনিয়ে দিয়েছিল সে—

"শোচনীয় শালবনে আলুথালু টিলার আড়ালে
লোধাশবর ললনার কণ্ঠে ক্ষুধিত দিনের পদাবলী
মাথায় কাঠের বোঝা নবজাত শিশুটি আঁচলে
শুকনো ডালের সাথে মলিন লতার কোলাকুলি—"

ভ্রূ-কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিল গোপা— কার লেখা? লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের? উঁ-হু-না, হয়তো অন্য কারোর ঠিক জানিনা—তবে তার লেখাও আছে।

জানি, জানি আর বলতে হবে না, ঐ তো সেবার আবৃত্তি করেছিল কলেজে, ১৫ই আগস্টে। কী যেন কী যেন—হ্যাঁ—

"তোর সরলতার সুযোগ বুঝে
ক্রমে নিচে তোরে ঠেলিছে
সহিছু কিসের সুখেতে।
ওরে উঠরে জাগিয়া
এসেছে, এসেছে, এসেছে সময়
দুয়ারে যে তোর যাচিয়া—"

পেট খুলে হাসতে হাসতে হাটুয়াদের মেয়ে তন্দ্রা বলেছিল, আরে এ তো সেই— "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই"—টোকা!

তাদের হাসাহাসিতে নিন্দায় নিন্দায় লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের কবিতা চাপা পড়ে গিয়েছিল নিচে, 'ক্রমে নিচে'। জামার হাতা না-গুটানো পাগলা পাগলা সেজে থাকা আদিত্যস্যারের সঙ্গে লোধাদের মেয়ের এত গদগদ মাখামাখি দেখে আলোচনা সমালোচনায় মুখব হয়ে উঠেছিল গোপা-তনিমা-শাশ্বতী-তন্দ্রা, সমস্ত ছেলেরাই।

জোর 'কেচাল' বেধেছিল সে রাতে বেলদার 'ক্যাম্পে'! প্রায় বয়কট করেছিল তারা নুকুকে। এমনকি চাপে পড়ে ভারতীও ছিল দোটানায়। তবে চুপিসাড়ে সে জানিয়ে দিয়েছিল নুকুকে— বী কেয়ার, গোপা-তনিমারা তোর পিছনে লেগেছে!

কোনোকিছুই ধর্তব্যে নেয়নি লক্ষ্মী। মারো গুলি! তবে ভারি মুষড়ে পড়েছিল সে। কতদিন বাদে দেখা হয়েছিল পুনোই-ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীদের সঙ্গে! গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরা নিয়তি-আদরী-ভাদরী কাকা-জেঠা কাকী-জেঠীদের সঙ্গে! পিছন থেকে গুরভার বউকে জড়িয়ে ধরে মনে মন অঝোরঝর কেঁদে উঠেছিল না সে? তাকে আঁকড়ে ধরে গুরভার্ বউও কী লাগামছাড়া কান্নায় মাঝে মাঝেই ফুঁপিয়ে ওঠেনি?

উঠেছে, উঠেছে।

ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদেশ-বিভূঁই থেকে কড়িয়া-বামনদা নামাল-পুবাল থেকে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল সে। রাইবুকাকা নেই, গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবণ-শতুরারাও নেই। তাদের বিহনে খাঁ খাঁ করছে লোধাপাড়া-জোড়াশালতলা-খিরিশতলা-মাঝুড়ুবকা-ঘোড়াটাপুরজঙ্গল সারা তপোবন জঙ্গলমহাল!

ফিরে চলুক তারা, ফিরে চলুক।

কেউ-ই রাজি হয়নি, এমনকি ভুটকী-পুনোই-গুরুবারি-চাঁদবদনীরাও না। বলেছিল, আজ বাদ কাল মাড়োতলার মেলা, মেলা না দেখে তারা কিছুতেই ফিরবে না। হাত ধরে টানলেও না।

অথচ সেদিন, সেদিনই তারা যদি তার সঙ্গে দোরখুলিতে ফিরে আসতে চাইত, যুদ্ধজয়ের আনন্দে মহাসমারোহে কোলে-কাঁখে বসিয়ে তাদের নিয়ে আসত সে।

রটিয়ে দিয়েছিল দোরখুলি-রুখনীমারা-সুখজুড়ি-মুঢ়াকাটি-থুরিয়া-বড়োডাঙার তল্লাট জুড়ে দলমা হাতির উপদ্রবের কথাও। ঘরদুয়ার ভাঙাভাঙির আশঙ্কায় শঙ্কিতও হয়েছিল গুরভা-গুড়কুঁদা-শরাবন-শতুরারা। এতদিন না হয় নরসিঙা ভাঙত, এখন না হয় ভেঙে দেবে হাতি শুঁড়— ঐ ভরসায় 'না' করে দিয়েছিল তারাও।

বেলদার কলেজ ক্যাম্পে ফিরে সেই হতাশায় ভারি মুষড়ে পড়েছিল লক্ষ্মী। তার উপর মড়ার উপর খাড়ার ঘা'য়ের মতো ভারতী এসে বলল— একটু সাবধানে থাকিস, পিছনে লেগেছে গোপা-তনিমারা!

লাগুক, সে লাগুক— কিছুতেই ভেঙে পড়েনি নুকু, ভাঙবে কী সেই তো লিখেছে— "সবার বাহু

এক করিয়া আগায়ে চল তুই আগেতে, সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া বাঁধ রে কোমর জোরেতে—”

ট্যুর থেকে কলেজে ফিরেই আদিত্যস্যার রাতারাতি চলে গেল কলকাতায়। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল কী নিয়ে নাকি তুমুল হয়েছিল কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর! কলকাতায় ক'দিনের ছুটিতে? নাকি চিরতরে?

চিরতরে, চিরতরে।

পরে জানতে পেরেছিল নুকু— নাকি সব কিছুর মূলেই সে, তাকে নিয়েই অতকিছু! অভিযোগের উপর অভিযোগ জমা পড়েছিল আদিত্যস্যারের বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ঐ গোপা-তনিমা-তন্দ্রা-শাশ্বতীরা, ছেলেরা। জনাকতক প্রফেসারেরাও।

চলে গিয়েছে আদিত্যস্যার। সেই ঢোলা-হাতা জামার উদাস উদাস লোকটাকে আর দেখা যাবে না। আর কেউ দৌড়াদৌড়ি করবে না অসুরহুড়ায়-অসুরগড়ে-বনআসুরিয়ায় হাতিবাড়ি-ডোঙ্কি-ঘোড়াপিঞ্চায়। ছুটির দিনে, সকাল বিকাল, শান্তিনিকেতনী ঝোলাকাঁধে আর কেউ ঘুরে বেড়াবে না বড়খাঁকড়ি হাই-ইস্কুলের আশপাশের গ্রামগুলোয়—হাতিবান্দির ডোমপাড়ায়—আন্ধারি-কুস্তুড়িয়ায়। কুসমী-গড়কাটা-ডুলুং-সুবর্ণরেখা দেখে প্রাগ্‌ইতিহাসের সরস্বতী-দৃষদ্বতী ভেবে আর কেউ কল্পনায় আনবে না দুই নদীর তীরে তীরে আভীর-দরদ-তুখার-পহ্লু-কালতোয়ক-অপরান্ত-দ্রাবিড়-পুলিন্দ-শবর অধ্যুষিত সেই কোন্ 'ব্রহ্মাবর্ত'-র কথা। হাই-ইস্কুলের ছাত্রাবাসে রাতের খাবারের ঘণ্টা পড়ার পরে উপেনকম্পাউন্ডারের ডিস্‌পেনসারির আলো জ্বলতে থাকলেও খেয়ে দেয়ে আর কোনো 'আদিত্য' সেখানে হাজির হবে না, যোগ দেবে না তর্ক-বিতর্কে-আলোচনায়— কেননা বড়খাঁকড়ি হাই-ইস্কুলের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছে আদিত্য।

পূর্ণ-কালীপদ-শশাঙ্ক-তিমির-ফটিক-রঞ্জিতদের সঙ্গে নিয়ে গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে 'কুক্কুল্যা খরাবেলায়' যখন 'মির্ধার টকামানে গেড়্যাঘাটে ঝাপাসি ঝুরেঠে' তখন আর কেউ যাবে না বড়োডাঙা-নুয়াসাহী-সোলপার-বাছুরখোয়াড় গ্রামসমীক্ষায়। "উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসহি শবরীবালী"-কে দেখার অছিলায় ঘন ঘন ব্যর্থ অভিযানে মাঝুডুবকা-চিকনবালি সরুবালির বাঁশতলা পেরিয়ে জোড়া শালতলা পিয়াশালতলার উপর দিয়ে আর যাবে না দোরখুলির লোধাপাড়ায় আর কোনো 'আদিত্য'-ই। আর লেখা হবে না 'শবর চরিত'। 'শবর চরিত'-এর এখানেই শেষ।

ঘরে ফিরছে নুকু ওরফে লক্ষ্মীরাণী মল্লিক। ফেরার পথে অবশ্যই একবার খোঁজ করে যাবে রাইবুকাকার, গুড়গুড়িয়ার। শুনেছে সে— থানার 'লকআপ' থেকে তাদের চালান করে দিয়েছে মেদিনীপুর কোর্টে। রাইবু-গুড়গুড়িয়ার হয়ে কেউ জামিনে দাঁড়ায়নি, তাই হাজতবাস!

হাজতবাস, হাজতবাস।

ঐটুকু মেয়ে জানবে কী করে— কোথায় আছে মেদিনীপুর কোর্ট? একে-তাকে জিজ্ঞাসা করে, একে ধরে তাকে ধরে হাজির হয়েছিল কেরানীটোলায়। আর তারপর এ-ঘর সে-ঘর ছোটাছুটিই সার। পি.এস. কেস নং কত— তাই তো জানা নেই তার!

তবু অবশেষে জানা গেল রাইবু-গুড়গুড়িয়া চালান হয়ে গেছে মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রাম কোর্টে। বুকটা ধড়াস্ করে উঠেছিল নুকুর। এরকম তো কতই শুনেছে সে— এ-থানা থেকে সে-থানা, এ-কোর্ট থেকে সে-কোর্ট, এ-মুলুক থেকে সে-মুলুক, বরাবাজার থেকে বান্দোয়ান, বান্দোয়ান থেকে সারাইকেল্লা—

সারাইকেল্লা তো নয় মরণকেল্লা। যে যায় সে তো আর ফিরে আসে না! লাশ গুম্ হয়ে যায়—যেমন হয়েছে বাঘঝাঁপা-সরোর খাঁদু আর গুণধর কোটালের। রাইবু-গুড়গুড়িয়ারাও কী

আর ফিরবে না?

চোখ ছল্ ছল্ করে উঠেছিল নুকুর। ঝোঁকের বশে মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম বাসে উঠে বসেছিল সে। ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রাম। ঘোড়াধরার ওদিকে মস্ত 'জিহলখানা', কোর্ট, এস ডি ও অফিস। শালগাছের তলায় তলায় বাঁধানো চাতালে উকিল-মুহুরিদের ভিড়। সাদা প্যান্ট কালো কোটে গিজ্ গিজ্ করছে কোর্ট-মহল্লা।

এ-সেরেঁস্তা সে-সেরেঁস্তায় খোঁজাখুঁজি শুরু করল নুকু। ফের এ-উকিল সে-উকিল, এ-মোক্তার সে-মোক্তার, এ-কোর্ট সে-কোর্ট, এ-ঘর সে-ঘর—

মাঝে মাঝেই ঘণ্টা পড়ছে ঢং ঢং করে, আওয়াজ উঠছে একটা কী দুটো। একবার নুকু শুনল, "আসামী রাইবনিয়া মুণ্ডা তুমকো জামিন হো গিয়া!" 'রাইবনিয়া' রাইবু নয় তো? আর 'মুণ্ডা' মল্লিক? কোর্টের খাতায় ভুল নাম ভুল পদবী লেখা হয়নি তো? নুকু অপেক্ষায় থাকল, অপেক্ষায়।

না, জেলখানার গেট দিয়ে যে বেরিয়ে এল সে অন্য লোক।

মন খারাপ হয়ে গেল নুকুর। দাঁতন-এগ্রা-বাহিরী ট্যুরে-ক্যাম্পে-হোস্টেলে-কলেজে হাটুয়া মেয়েদের লাগাতার রেষারেষি, র‍্যাগিং, আদিত্যস্যারের আচমকা অন্তর্ধান— মন খারাপ তো হয়েইছিল লক্ষ্মীর। তার উপর রাইবু-গুড়গুড়িয়ার সঙ্গে দেখা করা তো দূর অস্ত্, তাদের কোনো হদিশই পেল না সে আজ পর্যন্ত—

ফিরে গিয়ে বলবে কী শিশুকাকীকে? উল্টে শিশুকাকীই না তাকে বলে বসে— "তবে আর এতদূর লেখাপড়া শিখে তোর কী হল?" সেই যেমন একদিন বলেছিল, "পেটে দু-দাগ কালির জল যেত্তে নাই যেত্তে ধরাকে সরা জ্ঞান করিস নাই?"

একেবারে ভেঙে পড়েছিল লক্ষ্মী। তার বাপ ভুবনলোধাকে তার তেমন মনে নেই, জ্ঞান হওয়া ইস্তক সে তো রাইবুকাকাকেই বাপজ্ঞানে— হতাশায় রাগে একটা পাথর তুলে সে আন্‌সাট্‌কা ছুঁড়ে মারল জেলখানার লালরঙের দেয়ালে। ঠকাং করে জোর একটা আওয়াজ উঠল। দেয়ালটা ভাঙল না বটে, তবে একটা দাগ তো থেকে গেল! সেই দাগের চারধারে দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে নুকু'র লিখে দিতে ইচ্ছা করল—

"সকাল হৈলে বনে ঝাড়ে
কাঠ কাটে আর আলু-তুণ্ডা তাড়ে
সাঁঝেরবেলা বিকে কিনে ঘরে আসি ভাই।
আমরা পশুর জাত্
তায় বনে-বাদাড়ে যাতায়াত
জেল-পিঞ্জরায় রাখেঁ আমাদের
এগ্‌জিবিশন দেখায়।।"

ঘরে ফিরছে, ঘরে ফিরছে।

ঘরে ফিরছে নুকু ওরফে লক্ষ্মীরাণী মল্লিক। ঘর— সেই তো রুখনীমারা-সুখজুড়ি-দোরখুলি-বুলান-হদহদি। মাঝুডুবকা-তালখুড়রু-ঘোড়াটাপুর-নারদা-নিগুই-তপোবন জঙ্গলমহাল। লোধাপাড়া-পাতার কুঁড়িয়া-কুম্বাঘর। জোড়াশালতলা-পিয়াশালতলা-খিরিসতলা। বেনাবুদা-কুলবুদা-কেঁদ্‌বুদা-আঁটারি-চুরচুঁ লাটা। নিজেরই হাতে লাগানো ঘরে-দুয়ারে বোগেনভিলিয়া।

কাগজফুল, কাগজফুল।

গোপীবল্লভপুর পেরিয়ে বাস চলল কমলাসোল জঙ্গলের দিকে। পশ্চিম থেকে পুবে, পুবে। একটু যেন মেঘলা মেঘলা। কখনো এক-দু'পশলা ছিপ্‌ছিপে বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে। রোদও উঠছে।

বেলা 'আড়' হয়ে গেছে কখন। মেদিনীপুর-ঝাড়গাঁ করতেই তো কেটে গেছে অনেকটা সময়। বাসের ভিতর গুম হয়ে বসেছিল নুকু। তার বারেবারেই মনে পড়ছিল দাঁতন-বাহিরী-এগ্রা সেই ট্যুরের কথা, নামালিয়া লোধাদের কথা, ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনীদের কথা। সেদিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে নীলুয়ার, সেই বাবরিচুলওয়ালা চিড়রা-কাঁধে 'মাস্তান মাস্তান' লোধা ছোকরার। সে ফিরলে না হয় তার সঙ্গেই হাত মিলিয়ে ঢুঁড়ে বেড়াত রাইবুকাকাকে, গুড়গুড়িয়াকে!

নুকু বিড় বিড় করছিল— "তুই যে তরুণ সদাই সবুজ, সবুজ যে তোর প্রাণ, কিসের ভয়ে ভীত হবি তুই হারায়ে সকল মান? তোরাই পারিস এ কাজ করিতে তুফান তুলিতে লোধাদের বুকে, চির অবহেলার প্রতিশোধ নিতে হান্‌রে আঘাত জোরে— সহিছু কিসের তরে?"

আর এসময়ই পাখিটা ঘিরে ধরল তাকে, ঘিরছে। ঘিরছে, ঘিরছে। কী রকম যেন ডাকে, ঐ তো ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে, টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু—

মনে হলো চলে যাচ্ছে পাখিটা, ডাকটা ফেলে যাচ্ছে। ডাকের গুঁড়ো তার পিছুন পিছুন ঝরতে ঝরতে যাচ্ছে,—উ-ল টু-টু টি-উ-ল টু-টু টু-টু-উ-উ-উ—

ঘোরটা ভেঙে গেল নুকুর। ঠিক শুনছে তো? ঐ তো ঐ— টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! একদম স্পষ্ট! আগেও শুনেছে, ডাক শুনে লোধাপাড়ার তাবড় তাবড় মানুষরা দু'হাত জড়ো করে নমো করে, নুকুও কী দু'হাত বুকে ঠেকিয়েই নমস্কার করবে?

বাসের জানলায় উঁকিঝুঁকি মারল, পিচরাস্তার দু'ধারে শাল-আসনগাছের 'ডগ' হিলছে, লক্ষ্মী বিড় বিড় করে ডাকল কী— "আয় রে পাখি ল্যাজঝোলা খেতে দেব দুধছোলা?"

বাস এখন চাঁদাবিলা আর কমলাসোলের মাঝখানে, অঝোরঝর জঙ্গলে। দু-ধারের বন-ঝাড়ে লাটায়-পাটায় রাস্তার ধারে একটা-দুটা কাঁচাডাল ভাঙা, কারা যেন ডাল ভেঙে 'চিহ্নত' দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকেছে।

যেতে যেতে পড়ল রাস্তার ধারে, ডাইনে-বাঁয়ে একটা-দুটা বাসস্ট্যান্ড, সিমেন্টের শেড করা। যাত্রী নেই, তার তলায় পা ছড়িয়ে বসে কেউ কেউ একমনে বনখেজুরের পাতা দিয়ে 'পাটিয়া' বুনছে। পাশেই তার গরু চরছে, চুরনী গরুর গলায় ঘণ্টি বাজছে।

পাখিটা চলে গিয়েছিল, আবার যেন হুড়ঝুড় করে এসে গেল। এখন বাসের সামনে সামনে যাচ্ছে, টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! টি-উ-ল টু-টু! যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে বাসটাকে!

নুনগুঁড়ি 'ছাগল-ভড়কানো' বৃষ্টি পড়ছে মাঝে মাঝে, আবার থেমেও যাচ্ছে, রোদ উঠছে। বাসের সামনের কাচের জানলায় গুঁড়ি গুঁড়ি জলের দাগ। চ্যান্-ফচ্ছকারা বাসে বসেই সুর করে গাইছে— 'মেঘ হচ্ছে খরা হচ্ছে খেঁক্‌শিয়ালের বেহাঘর হচ্ছে—"

নারদার মোড়ে বাসটা থেমে গেলে বাস থেকে ঝপ্ করে নেমে পড়ল নুকু। ছাতা খুলল, ফের নুনগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এক-দু মিনিট বাদে থেমেও গেল।

ওবেলা এখানেই বাস থেকে নেমেছিল নামালিয়া লোধারা। এখন নামল নুকু। সেদিন একটুর জন্য দেখা হয়নি, দেরি করে ফেলেছিল সে।

আজ তাদের সঙ্গে তার দেখা তো হবেই হবে। এখন শুধু দেখার— কোন্‌দিকে গেল 'সে'? সেই টি-উ-ল টু-টু পাখিটা।

স মা প্ত